সিনেমার সব উপন্যাস

প্রেমেন্দ্র মিত্র

সিনেমার সব উপন্যাস

পত্র ভারতী
৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯
ফোন ২২৪১ ১১৭৫ ফ্যাক্স ২৩৫৪ ০৪৬২
ই-মেল : patrabharati@vsnl.net
ওয়েবসাইট : patrabharati.com

CINEMAR SAB UPANYAS
by
Premendra Mitra

ISBN 81-8374-006-5

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
মানস চক্রবর্তী

টার গ্রাফিক্স
রুপ রায়

ফোটোগ্রাফ
সৌজন্যে
গৌতম চট্টোপাধ্যায় (নন্দন গ্রন্থাগার)

Publisher
PATRA BHARATI
3/1 College Row, Kolkata 700 009
Phone 2241 1175 Fax 2354 0462
e-mail : patrabharati@vsnl.net Website : patrabharati.com

'পত্র ভারতী'র পক্ষে ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

সিনেমার সব উপন্যাস

প্রেমেন্দ্র স্মৃতি

১৮৬৮-তে আমবা ছিলাম দার্জিলিঙে। এক জিপিজিপি বৃষ্টি-ঝরা দুপুরে একটা রেজিস্টার্ড প্যাকেট এল। হঠাৎ এটা কী? কেন? খুলে দেখি প্রেমেন্দ্র মিত্রর আনকোরা নতুন বই *'আগ্রা যখন টলমল'*। উলটেপালটে দেখতে-দেখতে আবিষ্কাব করি বইখানা উৎসর্গ করেছেন মঞ্জু ও আমার নামে। আমরা তো অভিভূত। কী করে তাঁর, ঠিক ভাবে বললে, তাঁদের এত স্নেহ পেলাম? কোথায় শুরু?

তখন তিস্তার ধারে জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলে ক্লাস সেভেনে পড়ি। আমার বইপোকা দাদা কোথা থেকে নিয়ে এসেছিলেন একটা ছেঁড়াখোঁড়া দেব সাহিত্য কুটীরের পূজা বার্ষিকী— *'আজব বই'*। তাতে ছিল *'আকাশের আতঙ্ক'* নামে একটা গল্প। গল্পের এক জায়গায় তিস্তা নদীতে রাত ভরে নৌকো বেয়ে জাল ফেলে মাছ ধরাব কথা ছিল। কিন্তু তিস্তার জেলেরা ওভাবে মাছ ধরে না। দাদার পরামর্শে দেব সাহিত্য কুটীরেব ঠিকানায় প্রেমেন্দ্র মিত্রকে চিঠি দিলাম। বেশ কয়েক মাস পরে, যখন ব্যাপাবটা ভুলে গেছি তখন এল খুব খুদে খুদে অক্ষরে লেখা একটা পোস্টকার্ড। প্রথম বাক্যটি ছিল একেবারে বাহুল্যহীন, 'চিঠি পেলাম।' আর নিচের সই 'প্রেমেন্দ্র মিত্র'। চিঠিতে জানতে চেয়েছিলেন ওই ভুলের জন্য গল্পের রস 'ক্ষুণ্ণ' হয়েছে কিনা। টুকু-টুকু করে লেখা কথাটা যে 'ক্ষুণ্ণ' সেটা বুঝতে কষ্ট হয়েছিল। চিঠিটা পেয়ে আমি খেপে গেলাম তাঁর আরও লেখা পড়বার জন্য। প্রথমেই পূর্বাশা পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন দেখে ভিপিপিতে 'মহানগর' বইটি আনালাম। আর শহরের দোকানেই পেলাম সিগনেট প্রেস প্রকাশিত *'ড্রাগনের নিশ্বাস'* ও কবিতার বই *'ফেরারী ফৌজ'* এবং বেঙ্গল পাবলিশার্সের বই *'কুড়িয়ে ছড়িয়ে'* যাতে ছিল *'তেলেনাপোতা আবিষ্কার'* নামে একটা আশ্চর্য গল্প। এক-একটা বই পড়ি আর তাঁকে চিঠি লিখি। কিন্তু আর উত্তর আসে না।

স্বাধীনতার পরের বছর মামাতো দিদির বিয়েতে আসি কলকাতায়, ভবানীপুরের পদ্মপুকুর রোডে। পাড়ার এক দাদা পূর্ণ থিয়েটারের পাশ দিয়ে বলরাম বসু ঘাটের পথে আমাকে পৌঁছে দিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাড়িতে। সদর দরজা দিয়ে ঢুকেই সামনে একটা

উঠোন, তার বাঁ হাতি একটা ঘরে তুমুল আড্ডা হচ্ছিল। ঘরের ডান দিকে মোড়ার উপরে মাথায় চুলের জঙ্গল নিয়ে গায়ে চাদর জড়িয়ে বসে ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, তাঁর সামনে একটা নিচু টেবল এবং ঘরের বাঁ-দিকে একটা তক্তপোশের ওপর বসে যাঁরা আড্ডা দিচ্ছিলেন তাঁদের দু-জনকে খুব চিনি। ধীরাজ ভট্টাচার্য আর নবদ্বীপ হালদার। এঘরের থেকে ডাক শুনে উঠোনের ওদিক থেকে এলেন সাদাসিধে শাড়ি পরা এক মহিলা যাঁকে দেখলেই মা বলে চেনা যায়। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল, 'তোমার বউদি। আর, এ-ই সুরজিৎ। সেই জলপাইগুড়ির তিস্তা নদীর জেলে।' বউদি বললেন, 'এ যে একদম বাচ্চা।' রাগ হল। কবে তেরো পেরিয়েছি। আমি 'বাচ্চা'? কিন্তু তাঁর চোখে ও হাসিতে, কথার স্বরে ও সুরে এমন কিছু ছিল যাতে যে কোনও মানুষ রাগ-দুঃখ ভুলে যাবে। ইনি যদি বউদি হন তবে উনি হন প্রেমেনদা। বলে রাখি, বউদির মুখের ভাষা ছিল যেমন প্রাণে ভরা তেমনই মুখের ভাব ছিল স্নেহে গাঢ়।

সেদিন আড্ডাঘরে বসে থাকতে-থাকতে বুঝলাম কথা হচ্ছে প্রেমেনদার নতুন যে-ছবি শীঘ্রি রিলিজ হবে সেটা নিয়ে। ছবিটার নাম *'কালো ছায়া'*। ধীরাজদা জিগ্যেস করলেন, জলপাইগুড়িতে সিনেমা হল আছে কি না। দুটো আছে শুনে বললেন, 'তা হলে জলপাইগুড়িতে বসেই দেখতে পাবে প্রেমেন কী কাণ্ড করেছে। পর্দায় আমি একসঙ্গে দুটো চরিত্র। একজন অথর্ব্ব আর একজন সটান। বাংলা সিনেমায় এমন টেকনিক এই প্রথম।' জলপাইগুড়িতে *'কালো ছায়া'* যখন আসে আমি তখন ক্লাস টেনে। সত্যিই আশ্চর্য ছবি। হৃদয়াবেগের নয়, বুদ্ধির দৌড়ের ছবি। *'সে আবার এসেছিল'* অথর্বর ভূমিকায় ধীরাজদার এই আতঙ্ক ও বিস্ময়মেশানো উচ্চারণ আমার আজও মনে আছে।

ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে আমার পাখা গজাল। একা-একাই জলপাইগুড়ি থেকে চলে আসি কলকাতায়। প্রেমেনদার বাড়িটা ছিল ধর্মশালার মতো। একবার এক বন্ধুকে নিয়েও সে-বাড়িতে উঠি। তখনকার দিনে প্রেমেনদা সাহিত্য ছেড়ে সিনেমার দিকে বেশি ঝুঁকেছেন। শিল্পের একটা মাধ্যম ছেড়ে আর একটা মাধ্যমে কোনও-কোনও শিল্পী কেন আত্মপ্রকাশ খোঁজেন? সবটাই কি টাকার জন্য? রবীন্দ্রনাথ কেন ছবি আঁকলেন? কেন নাচগানের দল গড়লেন? প্রেমেন্দ্র মিত্রর শিল্প-প্রতিভার মধ্যে ছিল সেই তাগিদ যা আত্মপ্রকাশ খুঁজেছিল পরিচিত মাধ্যম ছেড়ে নতুন-নতুন মাধ্যমে—গানে, সিনেমায়, মঞ্চে। রোজগারের ব্যাপারও ছিল। কিন্তু মানুষ সে-পথেই রোজগার করতে চায় যে-পথে নিজেকে প্রকাশ করতে মন চায়।

তাঁর প্রথম যৌবনের বন্ধু ধীরাজ ভট্টাচার্য থাকতেন একই রাস্তার উত্তর দিকে। এককালে তিনি কবিতা-গল্প লিখতেন। প্রেমেনদার কথায় আমি জীবনানন্দ দাশ-এর *'সাতটি তারার তিমির'* কিনেছি দেখে আমার কাছ থেকে বইটি নিয়ে কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করে বললেন, 'জীবনানন্দের কাছে গেলে বোলো, আমার বড় ভালো লেগেছে।' তিনি প্রায় রোজই আসতেন প্রেমেনদার বাড়িতে। শশাঙ্কবাবু, নীতিশবাবু ছিলেন তাঁর ফিল্ম ইউনিটের কলাকুশলী বা সহকারী। নীতিশবাবু ভারী গলায় খুব আড্ডা জমাতে পারতেন। এঁর মুখের আদলেই অজিত গুপ্ত ঘনাদার ছবি আঁকতেন। নবদ্বীপ হালদার কাছেই কোথাও থাকতেন। তাঁরও খুব যাওয়া-আসা ছিল। পাহাড়ী সান্যালকে একবার দেখেছি খুব রসিয়ে আড্ডা দিতে ও মধ্যে-মধ্যে ফরাসি উদ্ধৃতি শোনাতে। তিনি *'সেতু'*-তে অভিনয় করেছিলেন। উত্তর কলকাতা থেকে আড্ডার টানে আসতেন শ্যাম লাহা যিনি 'হুয়া' নামেও পরিচিত ছিলেন। কানু

বন্দ্যোপাধ্যায়কেও আড্ডার জন্য আসতে দেখেছি। প্রণতি ঘোষ, নমিতা সিন্‌হা ও অভি ভট্টাচার্যকে আসতে দেখেছি কাজের কথাবার্তার জন্য। সুখেন দাসের অভিনেতা জীবনের শুরু প্রেমেনদার *'কুয়াশা'* ছবিতেই। একটা সময় তিনি প্রেমেনদার বাড়িতেই থাকতেন। *'কুয়াশা'* উপন্যাসের থেকে সিনেমার *'কুয়াশা'* অনেকটাই আলাদা। আবার সাহিত্য জগতের সাগরময় ঘোষ, রমাপদ চৌধুরী, সন্তোষকুমার ঘোষ প্রমুখের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় প্রেমেনদার বাড়িতেই। সন্তোষদা যখন দিল্লির হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডে চাকরি নেন তখন প্রেমেনদার বাড়িতেই তাঁর পরিবার রেখে যান।

প্রথম ফিল্ম শুটিং দেখি প্রেমেনদার *'ডাকিনীর চর'*। নারকেল ডাঙার অরোরা স্টুডিয়োতে বিরাট সেট বানানো হয়েছিল। লোকজন, হইহল্লা, হাঁকাহাঁকির মধ্যে নায়িকা সবিতা চট্টোপাধ্যায় 'ডায়ালগ' 'ডায়ালগ' বলে কান্নাকাটি জুড়ে দিলেন। তখন ওই হট্টগোলের মধ্যে কোলের ওপর ফাইল রেখে প্রেমেনদা নায়িকার ডায়ালগ লিখতে শুরু করলেন। *'সেতু'*, *'ময়লা কাগজ'* প্রভৃতি ছবির পরে আবার *'ডাকিনীর চর'* কেন? তিনি যখন 'ময়লা কাগজ' করেন আমি তখন শান্তিনিকেতনে বি.এ পড়ছি। তাঁদের বাড়িতে প্রায়ই আসতাম শান্তিনিকেতন থেকে। তখন দেখেছি উন্নত মানের নতুন ধরনের ছবি করার জন্য তাঁর উৎসাহ উত্তেজনা।

একদিন বলেছিলেন সাহিত্য আর সিনেমা দুটোই শিল্পকর্ম, কিন্তু দুটো সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনের আর্ট। ভালো সাহিত্য একা-একা রাত জেগে নিঃশব্দে করার কাজ আর সিনেমা অনেকে একসঙ্গে জুটে হইহই করে করার কাজ। ভালো স্টোরি, ভালো স্ক্রিপ্ট, ভালো ডায়ালগ, ভালো ফটোগ্রাফি, ভালো এডিটিং, ভালো মিউজিক, ভালো অ্যাকটিং, এমনকী ভালো প্রিন্টিং—এরকম অনেকগুলোর একটা ভালো যোগাযোগ হলে একটা ভালো সিনেমা হয়। লোকে প্রধানত নায়কনায়িকা কমেডিয়াম ভিলেন এদেরকেই চোখে দেখে। এদের পেছনে থাকে কত লোকের কত দিনের কত পরিশ্রম। আর্ট ডিরেক্টার কত মিস্ত্রি খাটায়। ক্যামেরাম্যান কত ইলেকট্রিসিয়ান চায়। প্রোডাকশনের ম্যানেজার কত ঝামেলা পোহায়। আর সবার পেছনে ডিরেকটার। কিন্তু তারও টিকি বাঁধা থাকে সম্পদলালের হাতে মানে ফিনানসিয়ারের খাতায়। ডিরেকটারও প্রোডিউসার-ফিনানসিয়ারের পরাধীন। অনেকদিন আগের কথা, তাই তাঁর সব কথা মনে নেই। তবে এই ধরনেরই অনেক কথা বলেছিলেন।

'ময়লা কাগজ' ছবিটা না চলার জন্য তাঁর বেদনা ও হতাশাও দেখেছি। বোধহয় অনেক ঋণও হয়ে গেছল। বলেছিলেন, 'ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল-এর দর্শক হয়েছে বটে, কিন্তু নতুন বাংলা ছবির দর্শক তৈরি হতে এখনও দেরি আছে, আরও অপেক্ষা করতে হবে।' সেটা ১৯৫৪ সাল। এটা খুব দুঃখের কথা যে না *'ময়লা কাগজে'*-র প্রিন্ট না স্ক্রিপ্ট কোনওটাই এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। সেনসর করার জন্য ফাইনাল ছবির একটা স্ক্রিপ্ট তো লিখতেই হত। এখানে বলে রাখি অনিল চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম ছবি *'ময়লা কাগজ'*, তিনি পরে নাম করেন অন্যান্য নামী পরিচালকদের ছবিতে।

চলচ্চিত্রের কাহিনি ও চিত্রনাট্যর জন্য পঞ্চাশের দশকে প্রেমেন্দ্র মিত্রর এত খ্যাতি হয় যে তাঁকে উনিশশো বাহান্ন সালে তখনকার বম্বের বিখ্যাত চিত্র-পরিচালক জ্ঞান মুখার্জি ধরে নিয়ে যান বোম্বাইয়ে। কিন্তু তিনি বম্বের জীবনযাত্রার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেননি। কিছুদিন বাদেই ফিরে আসেন। আবার পঞ্চান্ন সালে যেতে বাধ্য হন। ভিলে পার্লেতে রাজার হালে থাকেন। সেবারেও বম্বের স্বাচ্ছন্দ্য বেশি দিন সহ্য হয়নি। হয়তো প্রিয়সঙ্গ-কাতর হয়ে পড়েন। কিংবা সাহিত্যে আরও বেশি মনোনিবেশের জন্য ব্যাকুলতা বোধ করেন। সেই

ব্যাকুলতা থেকে ষাটের দশকে যেসব উপন্যাস লেখেন সেই সবগুলোই যেমন বিষয়বস্তুতে তেমনই রচনাশৈলীতে অভিনব।

প্রেমেনদা অন্যের ছবির স্ক্রিপ্ট সংলাপ সুদ্ধু পুরোটা লিখে দিতেন, তাতে সিকোয়েন্স সীন ভাগ করে কোন শট কীভাবে নেওয়া হবে সেসবেরও নির্দেশ ইংরেজিতে লিখে দিতেন যেমন 'ঘড়ি থেকে tilt down করে পাহাড়ীয় close up'। কিন্তু নিজের ছবির সংলাপ অনেক সময় ধরতাইটুকু লিখে ছেড়ে দিতেন শুটিঙের সময় পুরো করে দেবেন বলে। *'ডাকিনীর চর'* করেই তিনি নিজের উদ্যোগে ছবি করা বন্ধ করেন। আর ছবি পরিচালনার দায়িত্ব থেকেও অবসর নেন *'চুপি চুপি আসে'*, করার পর। ফিরে আসেন সাহিত্যে।

সিনেমার জন্য তাঁর সাহিত্যও তাঁর সাহিত্যকর্মেরই অঙ্গীভূত, বৃহত্তর অর্থে। যেমন *'দাবী'* বা *'পথ ভুলে'*র মতো কাহিনি। এসব কাহিনির ছবিগুলোকে বই বলা হত। চল্লিশের দশকে ওইসব বই অথবা পরবর্তীকালের *'ভাবীকাল'*, *'অভিযোগ'* কিংবা আরও পরের *'ওরা থাকে ওধারে'*, *'হাত বাড়ালেই বন্ধু'* প্রভৃতি বাঙালি দর্শকদের প্রচুর প্রশংসা পেয়েছিল। এসব অন্য পরিচালকদের ছবি, কিন্তু গল্প চিত্রনাট্য এবং অনেক গান ছিল তাঁরই রচনা। তাঁর নিজের পরিচালিত ছবিগুলোর মধ্যে *'পথ বেঁধে দিল'*, *'নতুন খবর'*, *'কুয়াশা'*, *'কাঁকনতলা লাইট রেলওয়ে'* প্রভৃতি যথেষ্ট নাম করেছিল। তবে কোনওটারই কাহিনি তাঁর সাহিত্যের তথা *'হয়তো'* কি *'কুয়াশায়'* বা *'ভস্মশেষ'* অথবা 'জনৈক কাপুরুষের কাহিনি'র মতো উচ্চাঙ্গের তথা সূক্ষ্মরুচির নয়। অথচ তিনি বলতেন যে তাঁর সাহিত্যের গল্প আর সিনেমার গল্প আসলে একইরকম ভাবনা থেকে লেখা, তবে সাধারণ দর্শকের কাছে মানে যারা নিজেদের জীবনের একঘেয়েমি থেকে কিছুটা সময় অন্যদের সঙ্গে হেসে-কেঁদে রোমাঞ্চিত হয়ে কাটাতে আসে তাদের কাছে পৌঁছতে হলে এবং সবার উপরে প্রোডিউসারের টাকা একটু লাভের সঙ্গে ফেরত দিতে হলে সবটা উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের মাত্রায় রাখা যায় না, একটু আপোসরফা করতেই হয়। বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্য নিয়ে তৈরি বিলিতি ছবির বেলাতেও এই ব্যাপার। সিনেমা সাধারণভাবেই একটু মোটা দাগের আর্ট।

এটা ঘটনা যে বাংলা সিনেমায় যখন গ্রামীণ সমাজের অথবা নাগরিক বিত্তবান শ্রেণীর কাহিনি দেখানো হত তখন *'সমাধান'* ছবিতে প্রেমেন্দ্র মিত্রই প্রথম বাঙালি শিল্পপতি ও শ্রমিকের সম্পর্ককে নিয়ে আসেন, যে-ধারায় পরে বিমল রায় তৈরি করেন *'উদয়ের পথে'*, আর প্রেমেন্দ্রই প্রথম গান ছাড়া বাংলা সিনেমার কথা ভেবে যে-কাহিনি ও চিত্রনাট্য লেখেন তার অবলম্বনে নীরেন লাহিড়ী করেন *'ভাবীকাল'*, তাছাড়া বাংলায় তিনি *'কুয়াশা'* ছবিতে কথার বদলে নীরবতা দিয়ে যেভাবে বহু দৃশ্যকে বাঙ্ময় করে তোলেন কিংবা ক্লোজ আপ-এর বা নিবিড় পর্যবেক্ষণের ব্যবহারে যেভাবে *'ময়লা কাগজ'*-এ নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টি করেন, বিশেষ করে টেবল ফ্যানের নিচে আটকে যাওয়া একটা কাগজের ফরফরানির দৃশ্য, তা ১৯৫৩-৫৪ সালের বাংলা ছবিতে অভিনব ছিল। একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, যেসব বাংলা ছবি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের সভাতে আলোড়ন তোলে সেসব ছবির অনেকগুলি লক্ষণ প্রেমেন্দ্র মিত্রর ছবিতে আমরা প্রথম দেখতে পাই। মনে হয় বাংলা সিনেমার ইতিহাসে তিনি যেন আলো-আঁধারিতে না দেখা কোন ভোরের পাখির কলকাকলি।

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

বাবার কথা

পরিসংখ্যান অনুযায়ী চলচ্চিত্র জগতে বাবার প্রথম প্রবেশ ১৯৩৭ সালে *'গ্রহের ফের* চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য লেখার মাধ্যমে। তখন আমার বয়েস ৪/৫ বছর মাত্র। কাজেই সেই সময়ের কথা আমার পক্ষে লেখা সম্ভব নয়। এরপরে বাবা দীর্ঘদিন চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আমার মনে হয় এর পেছনে দুটি কারণ রয়েছে। এক, তাঁর বহুমুখী প্রতিভার একটি বহিঃপ্রকাশ। দুই, আর্থিক দায়বদ্ধতা। সেই সময় সাহিত্য করে আর্থিক সঙ্গতি রক্ষা করা অতি দুরূহ কাজ ছিল। আমাদের শৈশবের সেইসব দিনের ঘটনা এখনও স্মৃতির কোঠায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য না থাকলেও আমাদের মনে তার কোনও প্রভাব পড়েনি। তার একমাত্র কারণ হল মা'র স্নেহ, ভালোবাসা এবং সংসারের প্রতি, আমাদের যত্নের প্রতি তাঁর ক্লান্তিহীন অবদান। তাঁর ধীর, স্থির, বুদ্ধিদীপ্ত সংসার পরিচালনা, সেইসব সংকটের বিন্দুমাত্র ছোঁয়া আমাদের স্পর্শ করতে দেয়নি।

আমরা তখন কলকাতার স্কুলে পড়াশুনা করতাম। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কলকাতায় বোমাবর্ষণ হওয়ার পর আমরা কলকাতার পাট উঠিয়ে ঝাড়গ্রামে চলে যাই। বাবা কলকাতায় থেকে কাজ করতেন এবং সপ্তাহান্তে ঝাড়গ্রামে গিয়ে আমাদের সঙ্গে দেখা করে আসতেন। সেই সময়ে ঝাড়গ্রামে স্বনামধন্য পরিচালক ধীরেন গাঙ্গুলি মহাশয়ও সপরিবারে থাকতেন। ছোটবেলায় আমরা তাঁর অনেক স্নেহ পেয়েছি।

এরপর যুদ্ধ বিরতি এবং কলকাতার পরিস্থিতি একটু শান্ত হওয়ার পর আমরা আবার ফিরে আসি। সেই সময় অর্থাৎ ১৯৪৩ সালে বাবা তাঁর প্রথম কাহিনি, চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় *'সমাধান'* চলচ্চিত্র নির্মাণের কাজে ব্যস্ত। আমরা দেখতাম রোজ সকালে উঠে বাইরের ঘরে বসতেন। লোকজন আসতেন। তাঁদের সঙ্গে কাজের কথাবার্তা হত। স্বনামধন্য অভিনেতা ধীরাজ ভট্টাচার্য মহাশয় (আমরা ধীরাজ কাকা বলে ডাকতাম) রোজ সকালে আসতেন এবং গল্প গুজব করে মা'র হাতে করা চা খেয়ে, বাড়ি যেতেন। এরপর বাবা স্নান, খাওয়া সেরে সকাল ১০/১১টার মধ্যে বেরিয়ে পড়তেন। সারাদিন বাইরেই কাটত তাঁর। ফিরতে-ফিরতে

কোন কোনদিন রাত ১২টা/১টা হয়ে যেত। এই দৃশ্য দেখতে-দেখতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। সেই বয়সে বা পরবর্তীকালেও আমরা ভাইবোন কেউই স্টুডিয়োতে যাইনি বা বাড়িতে অভিনেতা, অভিনেত্রী কেউ এলেও উৎসুক হয়ে দেখার বা কাছে যাওয়ার চেষ্টা করিনি। কিন্তু অন্দর মহলে থেকেও যেটা উপলব্ধি করতাম, তা হল, বাবার অধ্যবসায়, তাঁর আত্মমগ্নতা। সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রেও যা অহরহ দেখতে অভ্যস্থ ছিলাম। কী পরিমাণ পরিশ্রম যে তিনি করতে পারতেন তা আজও ভাবলে বিস্ময় জাগায়। সোম থেকে শনি, সারা সপ্তাহ চলচ্চিত্রের কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখলেও, রবিবার কিন্তু ছুটি। সেদিন তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ। সেদিন তিনি সাহিত্য জগতের মানুষ; সাহিত্য-স্রষ্টা। প্রতি রবিবার সকালে আমাদের বাড়িতে সাহিত্যের আড্ডা বসত। সেই সময়ের স্বনামধন্য কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, অধ্যাপক, সর্বস্তরের গুণীজনেব আগমন হত। বাবা মধ্যমণি। মজলিসি মানুষ ছিলেন। দুপুর ১টা/২টো পর্যন্তও আড্ডা চলত কোনও-কোনও রবিবার। সোমবার থেকে আবার চলচ্চিত্র জগতে।

এরমধ্যে ১৯৪৪ সালে আমরা তিন ভাইবোন শান্তিনিকেতনে চলে যাই স্কুলের পাঠ সাঙ্গ করতে। ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত কলকাতার সঙ্গে সম্পর্ক শুধু ছুটির দিনগুলিতে। তাবপব আবার কলকাতা, কলেজে অধ্যযন। বাবা তখন পুবোপুরি চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত। *'কালোছাযা* ছবিটি প্রস্তুতির সময়ে গোরাদা (গৌরাঙ্গ প্রসাদ বসু—কাবেরী বোসের দাদা) ও শিশিরদা (শিশির মিত্র) রোজ আসতেন। ধীরাজ কাকা তো যথারীতি আসতেনই। এরপব বাবা নিজের কোম্পানি 'মিত্রাণী' খুলে পরপব অনেকগুলি সাড়া জাগানো ছবি কবেন। আমাব মনে আছে সেই সময় রোজ সকালে প্রায় ৩০/৪০ কাপ চা হত এবং তার জন্যে বাবা একজন লোক নিয়োগ করেছিলেন। আব যতবাব চা হত, ভেতর-বাড়িতে মা'র জন্যে একটা বড় কাপে চা যেত। মা'র চায়ের নেশা ছিল প্রচণ্ড। তাব ফলস্বরূপ পরবর্তীকালে তাঁর 'কলিক ব্যথা' শুরু হয়ে যায়। যা রীতিমতো চিকিৎসা করে সারাতে হয়। ১৯৬০ সালে শেষ ছবি *'চুপি চুপি আসে'* পরিচালনা করার পর চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে সরাসবি যুক্ত আর থাকেননি। আবার সম্পূর্ণভাবে সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেন।

বাবার মধ্যে একটা অস্থিরতার ভাব আমরা ছোটবেলা থেকেই অনুভব করতাম। তাঁর সামগ্রিক জীবনে সৃজনশীলতার নানান ক্ষেত্রে তাঁর অনায়াস বিচবণ সেই অস্থিরতারই পরিচায়ক। পত্রভারতী প্রকাশনার শ্রীত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাবার বহুমুখী প্রতিভার একটি বিশেষ দিক তুলে ধরার প্রচেষ্টায় তাঁর লেখা উপন্যাসাকৃত দশটি চলচ্চিত্র কাহিনি একত্রে প্রকাশ করার যে উদ্যোগ নিয়েছেন, তারজন্যে আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

মৃন্ময় মিত্র

বাবার কথা

বাবা যখন ছায়াছবির জগতে চিত্র-পরিচালক এবং প্রযোজক হিসেবে কাজে যুক্ত ছিলেন অর্থাৎ যে-সময়ে উনি চলচ্চিত্র জগতে বিচরণ করছেন, তখন আমি স্কুল এবং কলেজের ছাত্র। খুব বেশি ভালো কবে বুঝতাম না ওসব এবং উনিও বুঝতে দিতেন না; অর্থাৎ পছন্দ করতেন না যে সিনেমা নিয়ে খুব বেশি আমরা মাতামাতি করি। শুটিং পর্যন্ত দেখতে দিতেন না। উঠতি ছেলেমেয়েবা সেই সময়ে ওনার কাছে এসে সিনেমায় নামব বলে অনুরোধ করলে উনি বলতেন,—আগে মন দিয়ে পড়াশুনা করো;—যদি একান্তই তাতে ব্যর্থ হও, অকৃতকার্য হও, তখন নয়তো এসো সিনেমা-জগতে,—তখন দেখা যাবে।

বাড়িতে Artist-দের আসত দেখেছি তখনকার বিখ্যাত সব। যেমন পাহাড়ী সান্যাল, অনিল চ্যাটার্জি, সাবিত্রী চ্যাটার্জি, নবদ্বীপ হালদার, শ্যাম লাহা, ভানু ব্যানার্জি, জহর রায়, ইত্যাদি ইত্যাদি আরও কত জন। আর ধীরাজ ভট্টাচার্যমশাই তো বাড়িতে বাবার সকাল-বেলার আড্ডায় নিত্য-সঙ্গী। একবার বেশ একটা মজা হয়েছে। একদিন মা রান্নাঘরে একমনে রান্না করছেন। বাবা বাইরের ঘরে জমাটি আড্ডায় ব্যস্ত। সেই সময়ে সাবিত্রী চ্যাটার্জি এসে হঠাৎ বান্নাঘরে ঢুকে—"বৌদি কী রান্না করছেন" বলে মা'র গলা জড়িয়ে ধরে মাকে খুব আদর-আপ্যায়ন করতে শুরু করলেন। পরে মাকে বললেন,—আসলে আজ প্রেমেনদার ছবিতে Shooting, —কিন্তু Dialogue মুখস্ত করে আসিনি, একেবারে ভুলে গেছি। আব Part ভুলে গেলে 'দাদা' মানে 'প্রেমেনদা' ভীষণ বকাবকি করেন। তাই আপনাকে একটু management করে দিতে হবে। মা হেসে বল্লেন,—ও, এইজন্যে আমাকে অত খাতির, আদর! আচ্ছা ঠিক আছে,—বলে দেব ওনাকে,—যাতে না বকে।

ওনার রচিত, পরিচালিত গোয়েন্দা-কাহিনি *'কালোছায়া'* তখনকার দিনে সফলতম এক রহস্য ছবি। রুদ্ধশ্বাস ছবির একেবারে শেষমুহূর্তে জানা বা বোঝা যেত, আসল অপরাধী কে। প্রযুক্তিগত ভাবে অনেক দুর্বল তখনকার দিনে উনি তাতে ধীরাজ ভট্টাচার্য মহাশয়কে দিয়ে Double-Roll করিয়ে এক বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিলেন। এছাড়া এই ছবিতে কোনও

গান ছিল না এবং এমনকী কোনও নারী-চরিত্র-ও ছিল না,—যা তখনকার দিনে প্রথাগতভাবে এক অবধারিত অঙ্গ ছিল। ছবি তোলা অর্থাৎ Shooting যখন প্রায় ষোলো আনাই শেষ, তখন Producer গৌরাঙ্গ প্রসাদ বসু (সাহিত্যিক) এবং শিশির মিত্র (অভিনেতা) এসে বাবাকে অনুরোধ করলেন যে অন্তত তখনকার দিনের প্রেক্ষাগৃহের সামনের সারির দশ-আনা দর্শকদের কথা ভেবেও ওদের মনোরঞ্জনের জন্যে নিদেনপক্ষে একটা গান এবং এক Heroine-এর ওনার গল্পে ঢোকাবার ব্যবস্থা করুন (যা ওনার মূল কাহিনিতে ছিলই না)। তখন বাবা বাধ্য হয়ে সিনেমার গল্পের সঙ্গে মিল রেখে এক নারী-চরিত্র সৃষ্টি করলেন এবং গানও রচনা করলেন।

এইরকম আরও অনেক বিচিত্র ঘটনা আছে, বাবার এই সিনেমা-জগতে বিচরণকালে যা বলতে গেলে বাবাকে নিয়েই একটা সিনেমা-সম কাহিনি-চিত্র হয়ে যায় হয়তো। কিন্তু সেইসব কথা এখানে না বলে শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে সিনেমার সেইসব প্রায় হারিয়ে যাওয়া বিখ্যাত চলচ্চিত্র-কাহিনি-গুলিকে পুনরুদ্ধার করে পুনঃপ্রকাশের যে ব্যবস্থা করেছেন, তারজন্যে পাঠকদের সঙ্গে-সঙ্গে আমরাও সন্তান হিসেবে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ প্রকাশকের কাছে।

হিরণ্ময় মিত্র

পথ ভুলে

রংপুর স্টেশন। প্ল্যাটফর্ম লোকে লোকারণ্য। নিখিল বঙ্গ দন্ত চিকিৎসক সম্মিলনীর মনোনীত সভাপতি ডাক্তার রায় আসছেন কলকাতা থেকে, তাই সম্মিলনীর সম্বর্ধনা সমিতির সভাপতি থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য কর্মীদের সকলেই এসে জড়ো হয়েছেন স্টেশন প্ল্যাটফর্মে। নানাবিধ পোস্টার এবং পতাকায় স্টেশন প্রাঙ্গণ মেলাতলার মতো রং-চঙে হয়ে উঠেছে। পোস্টারগুলির মধ্যে সকলের আগে চোখ পড়ে প্রকাণ্ড দু-পাটি দাঁত সংযুক্ত পোস্টারটির ওপর। পতাকাগুলিতেও নানারকম বাণী শোভা পাচ্ছে। সেইসব বিচিত্র বাণীর মাত্র কয়েকটি এখানে উল্লেখ করছি ঃ

দাঁত তোলালে দাঁতের যন্ত্রণা যাবে না।
দাঁত তোলাও আর বাঁধাও।
দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বোঝো।

দাঁতের গোড়ার রোগ সকল রোগের গোড়া।
আক্কেল দাঁত উঠিলেই আক্কেল হয় না।
মানুষের আদিম অস্ত্র দাঁত।
জয় সভাপতি দন্তবাগীশ ডাক্তার রায়ের জয়।

নিখিলবঙ্গ দন্ত চিকিৎসক সম্মিলনী, রংপুর।

ট্রেন আসবার আর বিশেষ দেরি ছিল না আর সেই কারণেই সম্বর্ধনা সমিতির সভাপতি রায়বাহাদুর অধরনাথ থেকে ভল্যান্টিয়ার পর্যন্ত রীতিমতো ব্যস্ত এবং উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। অনেকে তো ফুলের মালা পর্যন্ত হাতে নিয়ে তৈরি!

রায়বাহাদুর একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'চিনতে পারবে তো হে!' গুণদাচরণ হেসে বললে, 'চিনতে পারব না, বলেন কী মশাই। কনফারেন্সের প্রেসিডেন্ট তায় আমেরিকা ফেরত অত বড় দাঁতের ডাক্তার।'

রায়বাহাদুর বললেন, 'আহা, দাঁতের ডাক্তার বলে তো আর দাঁত দেখে চেনা যাবে না।'

গুণদা বললে, 'না, না, তা কেন। আমাদের বিনোদবাবু তো তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আসছেন।'

রায়বাহাদুর বললেন, 'না হে, সেই তো হয়েছে বিপদ। বিনোদ যে আসতে পারবে না বলে টেলিগ্রাম করেছে—পরের ট্রেনে আসবে জানিয়েছে।'

রায়বাহাদুর গলাবন্ধ চায়না সিল্কের কোটের পকেট থেকে টেলিগ্রামটা বার করে গুণদাকে দেখালেন। গুণদার উৎসাহ তবু কমল না। সে বললে, 'তাতে আর হয়েছে কী! আমরা না চিনলেও এত বড় মিছিল দেখে তিনি কি আর আমাদের চিনতে পারবেন না?'

ট্রেন আসবার ঘণ্টা পড়ে গেল। চাষি গোছের একটা লোক ভয়ে ছুটতে-ছুটতে টিকিট ঘরের সামনে এসে টিকিটবাবুকে বললে, 'শুনছেন বাবু, তিনটের গাড়ি কটায় ছাড়বে কইতে পারেন?'

টিকিটবাবু ঘাবড়ে গেলেন। মিনিটখানেক তার মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে থেকে বললেন, 'কী বললে?'

লোকটা বললে, 'আজ্ঞে তিনটের গাড়ি ক'টার সময়...' বলতে-বলতেই সে যেন নিজের বোকামিটা বুঝতে পারল, ফ্যাল-ফ্যাল করে একবার টিকিটবাবুর মুখের দিকে চেয়ে পিছু হাঁটতে-হাঁটতে সরে পড়ল। ঠিক তার পিছন দিয়ে যাচ্ছিলেন স্থানীয় থিয়েটারের ম্যানেজার নকড়িবাবু। কলকাতা থেকে বিখ্যাত গাইয়ে এবং অভিনেতা নটবর লাহিড়ী আসছেন এই ট্রেনে স্থানীয় থিয়েটারে অভিনয় করতে। নকড়িবাবু তাঁর সহকারী ফ্যালারামকে নিয়ে এসেছিলেন তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যেতে। হাতে ছিল তার মস্ত একটা পোস্টার—লাল শালুর ওপর তুলো দিয়ে নটবর লাহিড়ীর নাম লেখা। টিকিটঘরের সামনে থেকে পিছু হাঁটতে-হাঁটতে লোকটা একেবারে নকড়ির ঘাড়ে এসে পড়ল—পোস্টারটা ছিটকে পড়ে গেল মাটিতে।

ম্যানেজার দাঁতমুখ খিঁচিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'দেখেছ, দেখেছ ব্যাটার কাণ্ড! কোথায় বিজ্ঞাপনটা পড়বে, না উলটে দিয়ে চলে গেল।'

পোস্টারটা তুলতে-তুলতে ফ্যালারামকে বললেন, 'খুব বিজ্ঞাপন দিয়েছি কী বল ফ্যালারামবাবু? বঙ্গরঙ্গমঞ্চের কন্দর্পকান্তি, কিন্নরকণ্ঠ অপ্রতিদ্বন্দ্বী নট নটবর লাহিড়ী আপনাদের মাঝখানে...'

ফ্যালারাম বললে, 'আজ্ঞে ওটা মাঝখানে নয়, সামনে হবে। থিয়েটার তো আর যাত্রা নয়।'

ম্যানেজার চটে উঠলেন ঃ 'দ্যাখ ফ্যালা, বিশ বছর থিয়েটার চালাচ্ছি, তুই এসেছিস আমায় বিজ্ঞাপন লেখাতে? আমার খুশি আমি মাঝখানে লিখবো। আমি যদি সামনের বদলে পিছনে লিখি কী করতে পারিস তুই?'

ফ্যালারাম বললে, 'পেছনে কেন আপনি ল্যাজে লাগান, আমার বাকি ছ'বছরের মাইনে চুকিয়ে দিন, থিয়েটারে কাজ আমি করতে চাই না।'

ম্যানেজার সুর নরম করে বললেন, 'আহা চটিস কেন, চটিস কেন! এবারটা যা হয়ে গেছে যাক, আসছে বারে ঠিক সামনে লাগিয়ে দেব দেখিস। কিন্তু ব্যাপার কী বল দেখি! গোটা প্ল্যাটফর্মটাই যে দন্ত বিকাশ করে হাসছে...।'

ফ্যালারাম সগর্বে জবাব দিলে, 'তাতে আর আশ্চর্য কী! অত বড় অভিনেতা আসছেন...'

দন্ত চিকিৎসক সম্মিলনীর সম্বর্ধনা সমিতির একজন সদস্য একটি পতাকা হাতে নিয়ে এই দিকে আসছিলেন, ফ্যালারামের কথাটা তাঁর কানে গেল। তিনি বললেন, 'অভিনেতা আবার কে? ডেন্টিস্ট কনফারেন্সের সভাপতি ডাক্তার রায় আসছেন।'

ম্যানেজার তার কথাটা প্রায় লুফে নিয়ে ব্যঙ্গ কণ্ঠে বললেন, 'আসছেন নাকি! তাই বুঝি স্টেশনে এমন দাঁত কপাটি লেগেছে! কিন্তু তিনি তো আর গোটা ট্রেনটা কামড়ে আসছেন না, ট্রেনে অন্য দু-চারজন লোকও আছে। নটবর লাহিড়ীর নাম শুনেছেন—বিখ্যাত গাইয়ে ও অভিনেতা। তিনিও আসছেন এই ট্রেনে আমাদের থিয়েটারে অভিনয় করতে, বুঝলেন?'

যাঁকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলো বলা হল তিনি বুঝলেন কি-না বলা শক্ত, তবে আর বাক্যব্যয় না করে সেখান থেকে সরে গেলেন।

চলন্ত ট্রেনের কামরায় ডাক্তার রায় এবং তাঁর সহকারী গোবিন্দকে দেখা গেল। রংপুর আসতে আর দেরি নেই, কাজেই দুজনে সুটকেশ এবং বিছানা গুছোতে ব্যস্ত। ডাক্তার রায়

এসব ব্যাপারে একেবারে আনাড়ি, সুটকেস গুছোতে গিয়ে যতই অগোছাল করে ফেলছেন এবং ঘর্মাক্ত হয়ে উঠছেন ততই তিনি অপ্রসন্ন হয়ে উঠছেন গোবিন্দর ওপর। অবশেষে তিনি হতাশ হয়ে বেঞ্চের ওপর বসে পড়ে বললেন, 'তুমি একটি হাঁদা গোবিন্দ। সব ছড়িয়ে পড়ে রইল, এদিকে স্টেশন এসে গেল।'

গোবিন্দ বললে, 'আজ্ঞে না স্যার এখনও ডিস্ট্যান্ট সিগন্যাল পার হয়নি, দেরি আছে।'

'দেরি আছে। দেরি আছে! তোমার ওই এক কথা। তারপর স্টেশন এসে পড়ুক, তখন নামবার সময় পাওয়া যাবে না। নাও তাড়াতাড়ি নাও, কাজের সময় কথা আমি পছন্দ করি না।'

ডাক্তার রায় উত্তেজিত ভাবে কোটের বোতাম আঁটতে লাগলেন, গোবিন্দ আবার সুটকেসের দিকে মন দিল। বোতাম আঁটা শেষ করে ডাক্তার রায় চিন্তিত ভাবে প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা, এইবারই রংপুর স্টেশন আসবে ঠিক জানো তো?'

'না এসে যাবে কোথায় স্যার, পালিয়ে তো আর যাবে না!'

'আহা তাই বলছি নাকি। কিন্তু ধরো যদি স্টেশনে কেউ না আসে?'

'বলেন কী স্যার! নিখিলবঙ্গ দন্ত চিকিৎসক সম্মিলনীর সভাপতিকে অভ্যর্থনা করতে কেউ থাকবে না তা কি হতে পারে?'

'স্টেশনে তা হলে নিশ্চয় লোক থাকবে কী বলো? কিন্তু ধরো যদি আমাদের চিনতে না পারে?'

এ-কথাটা অবশ্য গোবিন্দর এর আগে মনেও হয়নি। সে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল।

ডাক্তার রায় বললেন, 'ওই তোমার বড় দোষ গোবিন্দ! কাজ সারবে না দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভাববে!'

গোবিন্দ আবার সুটকেসের দিকে মন দিল।

এই ট্রেনেরই আর একটি কম্পার্টমেন্ট।

ফকির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কী যেন দেখবার চেষ্টা করছিল, তার হাতের খবরের কাগজখানা হঠাৎ হাওয়ার ঝাপটায় তার মুখ ঢেকে ফেলল।

সুজিত জিজ্ঞাসা করলে, 'কীহে ফকিরচাঁদ, কী দেখছো? রংপুর আসতে আর কত বাকি?'

ফকির জবাব দিলে, 'দেখতে-দেখতে চাপা পড়ে গেল যে!'

'চাপা পড়ে গেল! সে কী হে? চেন টানব না কি?'

'না, না, চাপা কেউ পড়েনি, ওই কাগজটা।'—বলেই জানলা দিয়ে আর একবার মুখ বার করে বললে, 'নাও তৈরি হয়ে নাও, রংপুর এসে পড়ল।'

সুজিতের কোনও ব্যস্ততার লক্ষণ দেখা গেল না। সে ধীরে সুস্থে সুটকেসটা বন্ধ করতে-করতে আবৃত্তির সুরে আওড়াতে লাগল ঃ

'এবার তবে খুঁজে দেখি
অকূলেতে কূল মেলে কি
দ্বীপ আছে কি ভব সাগরে...'

ফকির বললে, 'তোমার ওসব হেঁয়ালি আমার ভালো লাগে না। শুধু বখেয়া সেলাই নিয়ে এমন বাউন্ডুলের মতো ঘুরে বেড়িয়ে কী হবে?'

সুজিত তেমনি নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললে, 'তুমি বুঝতে পারছ না ফকিরচাঁদ, বঙ্গীয় বেকার-সঙ্ঘের অবৈতনিক সেক্রেটারির একটা কর্তব্য আছে তো!'

'রেখে দাও তোমার বেকার সঙ্ঘ আর তার কর্তব্য!'—ফকির বললে একটু ঝাঁঝালো স্বরে, 'বেকার-সঙ্ঘের সেক্রেটারি হয়ে এত ঘোরাঘুরি করেও তো একটা কাজ জোটাতে পারলে না।'

সুজিত তাতেও দমল না, বললে, 'আরে কাজ জুটলেই তো সাকার হয়ে যাব, তখন তো আর বেকার থাকব না। তার আগে বেকার যুবকদের তরফ থেকে সমস্ত শহর জরিপ করে বেড়াচ্ছি...কোথায় কাজের কী ভরসা হঠাৎ মিলে যেতে পারে কে জানে!'

ট্রেন এসে থামতেই চারিদিকে যেন হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেল। যারা মালা নিয়ে অপেক্ষা করছিল তাদের মধ্যে শুরু হল কে আগে ডাক্তার রায়ের কাছে পৌঁছবে তারই প্রতিযোগিতা। চারিদিকের ছুটোছুটি ঠেলাঠেলির মধ্যে রায়বাহাদুরের গলা শোনা গেল ঃ 'কই হে, তাঁকে দেখতে পাচ্ছ?'

সুজিত আর ফকির তাদের কম্পার্টমেন্ট থেকে নামবার উপক্রম করছিল, কে একজন সুজিতকে দেখিয়ে বললে, 'আজ্ঞে ওই যে—ওই সেকেন্ড-ক্লাস কম্পার্টমেন্ট—ওই তো দাঁড়িয়ে আছেন, চেহারা আর পোশাক দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।'

ব্যস, আর যায় কোথায়? সবাই ছুটল সেই সেকেন্ড-ক্লাস কামরার দিকে। সমবেত কণ্ঠে অভ্যর্থনা শুরু হয়ে গেল ঃ 'আসুন-আসুন, নেমে আসুন।'

সুজিত এবং ফকির দুজনেই রীতিমতো আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সুজিত নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, 'নামবার জন্যে ব্যাকুল হয়েই আছি, কিন্তু আপনারা।'

অভ্যর্থনা সমিতির একজন প্রবীণ সদস্য এগিয়ে এসে বললেন, 'আমরা আপনার অভ্যর্থনার জন্যেই এখানে সমবেত হয়েছি। ইনি রায়বাহাদুর অধরনাথ, রিসেপসান কমিটির চেয়ারম্যান।'

রায়বাহাদুরকে দেখিয়ে দিয়ে তিনি হাঁকলেন, 'কই হে, মালা কোথায়?' মালা হাতে করে কয়েকজন সুজিতের সামনে এসে দাঁড়াল। রায়বাহাদুর এবং আরও কয়েকজন মিলে সেগুলি সুজিতের গলায় পরিয়ে দিলেন। ফকির কী বলবে, কী করবে কিছুই ঠিক করতে পারছিল না, এক-একবার ভাবছিল, লাফ দিয়ে প্লাটফর্মে পড়ে চোঁচা দৌড় দেয়, কিন্তু তার আগেই কে একজন একগাছি মালা নিয়ে তার সামনে এসে বললে, 'আপনাকেও পরতে হবে।'

ফকিরের কপাল দিয়ে দরদর করে ঘাম পড়তে লাগল। নিশ্চয়ই এদের কোথাও ভুল হয়েছে, নইলে তাকে...!

সুজিতের দিকে চাইতেই সুজিত তাকে মালাটা পরবার জন্যে চোখে-চোখে ইশারা করলে, ফলে ফকিরচাঁদ বিনা প্রতিবাদেই মালা পরে ফেলল।

সভাপতির আগমন উপলক্ষে স্থানীয় হাইস্কুলের পণ্ডিতমশাইকে দিয়ে যে গান লেখানো হয়েছিল, ছেলের দল এইবার সমবেতকণ্ঠে সেটা গাইতে শুরু করে দিল।

ফকিরচাঁদের মনে হল তার কানের কাছে কতকগুলো বোমা ফাটছে।

সুজিত ট্রেন থেকে নামতেই রায়বাহাদুর বললেন, 'কলকাতা থেকে আসতে খুব বেশি কষ্ট হয়নি তো?'

সুজিত নিরাসক্ত কণ্ঠে জবাব দিলে, 'না, কষ্ট আর কী! শুধু যা টিকিট কেনবার...'

'টিকিট কেনবার কষ্ট!' রায়বাহাদুর ক্ষুব্ধ, ক্ষুণ্ণভাবে বলে উঠলেন, 'আহাম্মুকরা আপনাদের দিয়ে টিকিট কিনিয়েছে। কী অন্যায়।'

'অন্যায় বইকী! আমাদের দিয়ে টিকিট কেনানো অত্যন্ত অন্যায়!'—সুজিত তেমনি নিস্পৃহভাবে বলে উঠল।

রায়বাহাদুর বললেন, 'ছি, ছি, কী লজ্জার কথা!'

সুজিত বললে, 'যাক আর লজ্জিত হবেন না। যা হবার তা হয়ে গেছে। ব্যাপার কী জানেন, পারতপক্ষে আমরা টিকিট কিনি না।'

রায়বাহাদুর বললেন, 'ঠিক কথাই তো! আপনারা টিকিট কিনবেন কী!'

সুজিত ফকিরের দিকে চাইলে, তারপর বললে, 'আমিও ঠিক এই কথাই রেল কোম্পানি আর ফকিরচাঁদকে বোঝাতে চাই।'

ফকিরকে দেখিয়ে সুজিত অমায়িকভাবে বললে, 'এঁরই নাম ফকিরচাঁদ, আমার সহকারী।'

রায়বাহাদুর বললেন, 'বেশ, বেশ, আলাপ করে সুখী হলাম।'

সুজিত হাসতে-হাসতে বললে, 'পরে আরও হবেন।'

এদিকে থিয়েটারের ম্যানেজার নকড়িবাবু সহকারী ফ্যালারামকে নিয়ে নটবর লাহিড়ীর সন্ধানে প্ল্যাটফর্মের এধার থেকে ওধার পর্যন্ত ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত কলকাতার সেই বিখ্যাত গাইয়ে এবং অভিনেতাকে কোথাও আবিষ্কার করতে না পেরে তিনি ফ্যালারামের দিকে চেয়ে হতাশ কণ্ঠে বললেন, 'কী হে হল কী! কোনও পাত্তাই তো নেই। না আসবার কারণ তো কিছু বুঝতে পারছি না। রওনাই হয়নি নাকি?'

ফ্যালারাম চুপ করে একটু ভাবলে, তারপর বললে, 'রওনা হয়তো ঠিক হয়েছিলেন, কিন্তু মাঝপথে গাড়ি বদলেছেন।'

'গাড়ি বদলেছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, গাড়ি ছেড়ে হয়তো বোতল ধরেছেন।'

ম্যানেজার এতটা বিশ্বাস করতে পারলেন না, বললেন, 'তোর যেমন কথা। দাঁড়া, আর একবার প্ল্যাটফর্মটা ভালো করে খুঁজে দেখি।'

তিনি আবার নটবর লাহিড়ীর খোঁজে চললেন।

প্ল্যাটফর্মের আর একপ্রান্তে ডাক্তার রায় তাঁর বিছানা এবং সুটকেশ নিয়ে নেমে কী করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। তাড়াতাড়ি নামবার সময় তিনি বিছানাপত্র এমন ভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে ফেলেছিলেন যে [illegible] তাঁকে প্রায় ছোট ছেলের মতো অসহায় মনে হচ্ছিল। গোবিন্দ বাকি কটা জিনিস নিয়ে ট্রেন থেকে নামতেই ডাক্তার রায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হে, আর কিছু গাড়িতে নেই তো?'

গোবিন্দ [illegible] বললে, 'শুধু গদিগুলোই আছে স্যার!'

'আহা, গদিগুলো কি তোমায় আনতে বলেছি? কিন্তু এদিকে যে কারও দেখা নেই। তোমাকে তখনই [illegible]ছিলাম কাজ নেই এমন বে[illegible] জায়গায় এসে। এদের কি আর বুদ্ধিশুদ্ধি আছে, হয়তো ভুলেই গেছে লোক পাঠাতে।'

নকড়ি ফ্যালারামকে নিয়ে এইদিকেই আসছিলেন; ডাক্তার রায়ের কথার শেষটুকু তাঁর

সজাগ কানকে ফাঁকি দিতে পারলো না; নকড়ি এগিয়ে এসে ব্যগ্রকণ্ঠে ডাক্তার রায়কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা কার জন্যে অপেক্ষা করছেন? নিশ্চয় আপনারা কলকাতা থেকে আসছেন?'

ডাক্তার রায় বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

নকড়ি উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, 'তা বলতে হয়। আমরা এতক্ষণ গরু খোঁজা করে বেড়াচ্ছি। চলুন, চলুন! আপনাদের জন্যে ভেবে এতক্ষণ সারা হচ্ছিলাম। নাও না হে ফ্যালারাম, জিনিসপত্র তোলো, গাড়ি ডাকো।'

ফ্যালারামের কোথায় যেন খটকা লাগছিল, সে একটা ঢোক গিলে বললে, 'দাঁড়ান, আগে পরিচয়টা নিন!'

ম্যানেজার বললেন, 'পরিচয়! কীসের পরিচয়! মুখ দেখে লোক চিনিস না? বিশ বছর থিয়েটারের ম্যানেজারি করছি, হাঁ করলেই গুণী লোক চিনতে পারি। নাও জিনিসপত্র তোলো'—নকড়ির আগ্রহের তোড়ে ফ্যালারামের আপত্তি খড়ের কুটোর মতো ভেসে গেল। মোটামুটি ব্যাপার দাঁড়াল এই ঃ নিখিলবঙ্গ দন্ত চিকিৎসক সম্মিলনীর সম্বর্ধনা সমিতির উৎসাহী সদস্যরা ডাক্তার রায় মনে করে বেকার-সঙ্ঘের অবৈতনিক সম্পাদক সুজিতকে নিয়ে চলল শোভাযাত্রা সহকারে এবং রংপুর পূর্ণিমা থিয়েটারের প্রবীণ ম্যানেজার নকড়ি ডাক্তার রায়কে নটবর লাহিড়ী মনে করে ঘোড়ার গাড়িতে নিয়ে চললেন তাঁর বিখ্যাত থিয়েটারের উদ্দেশ্যে।

কিন্তু সত্যি যিনি নটবর লাহিড়ী—সেই স্বনামধন্য অভিনেতা ও গায়ক, তিনি কোথায়?

ট্রেন রংপুর স্টেশন ছাড়তেই দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি কামরায় সাঙ্গোপাঙ্গ পরিবেষ্টিত অবস্থায় তাঁকে দেখা গেল। শুধু দেখা গেল বললে সবটুকু বলা হয় না, বলতে হয় দর্শন লাভ করা গেল। চারিদিকে মদের বোতল, কাচের গ্লাস, সিগারেটের টুকরো, পানের পিচ...তারই মধ্যে বসে নটবর লাহিড়ী, হাতে একটি বোতল। বোতলে তরল পদার্থের আর এক বিন্দুও অবশিষ্ট নেই, সেইটিকেই তার গ্লাসের ওপর উপুড় করে ধরে আছে। বহুক্ষণ ধরে বহু প্রকার চেষ্টা করা সত্ত্বেও যখন এক ফোঁটাও পড়ল না, নটবর তখন বললে, 'কই পড়ছে না কেন বাবা!'

বন্ধুদের মধ্যে একজনের তখনও একটু হুঁস ছিল, সে বললে, 'থাকলে তো পড়বে, বোতল যে একেবারে খালি।' নটবর চটে উঠল, 'খালি কীরকম? এই তো খানিক আগে ভর্তি ছিল। তা হলে বার করো আর এক বোতল।'

বন্ধুটি বললে, 'না, না, নটবর আর খেয়ো না, শেষে মাইরি স্টেশন চিনে নামতে পারব না। রংপুরে নটবর লাহিড়ীর অভাবে একটা কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে।'

অতদূর ভাববার অবস্থা নটবরের ছিল না, সে বললে, 'আপাতত বোতল বার না করলে আমি নিজেই কেলেঙ্কারি করব।'

অগত্যা বন্ধুটি টলতে-টলতে উঠে বাক্স খুলে আর একটি বোতল বার করে নটবরের কাছে নিয়ে এল।

রংপুর স্টেশন যে পার হয়ে গেছে সে কথা নটবরও জানল না, তার বন্ধুরাও না।

সুজিতকে নিয়ে শোভাযাত্রা চলেছিল শহরের রাস্তা দিয়ে। মোটরের পিছনদিকের সিটে রায়বাহাদুর অধরনাথ, সুজিত এবং গুণদাচরণ। ফকির এবং ড্রাইভার সামনের দিকে।

যেতে যেতে গুণদাচরণ সুজিতকে বললেন, 'দেখুন, আপনি সত্যি দয়া করে এই এতদূর আসবেন আমরা ভাবতে পারিনি।'

সুজিত বললে, 'আমিও ঠিক পারিনি, তবু কীরকম এসে পড়লাম।'

গুণদাচরণ বললেন, 'আমরা সে জন্য অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। কী করে আপনাকে ধন্যবাদ জানাব ভেবে পাচ্ছি না।'

সুজিত একটা ঢোক গিলে বললে, 'আমিও একটু ভাবনায় পড়েছি, আচ্ছা, আপনাদের কোনওরকম ভুলটুল...'

'ভুল? বলেন কী?' সুজিতের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে রায়বাহাদুর বললেন, 'এর চেয়ে ভালো নির্বাচন আর কী হতে পারে? বাংলাদেশের দন্ত চিকিৎসক সম্মিলনীতে সভাপতি হবার পক্ষে আপনার চেয়ে যোগ্য লোক আর কে আছে?'

সুজিত একটা নিশ্বাস লুকিয়ে ফেলে বললে, 'শুনে সুখী হলাম। ছেলেবেলা থেকে দাঁতের কদরটা ভালো করেই বুঝেছি, একরকম দাঁতের জোরেই দুনিয়ায় টিকে আছি বলতে পারেন। কিন্তু পুরস্কারটা বোধহয় একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে; সম্মিলনীর সভাপতিত্ব করাটা কী উচিত হবে—তার চেয়ে বেকার সমস্যা সম্বন্ধে...'

গুণদাচরণ বললেন, 'আজ্ঞে আপনি সভাপতি, আপনাকে আমরা কী বলব। অভিভাষণে আপনি যে বিষয়ে ইচ্ছা বলবেন। তা ছাড়া বেকার সমস্যাই বলুন আর যাই বলুন, সব সমস্যার মূলে ওই দাঁত!'

'নিশ্চয়। কিন্তু আপাতত কোথায় চলেছি বলুন তো?'

'আমাদের চেয়ারম্যান রায়বাহাদুরের বাড়িতে। সেখানেই আপনার থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। আগেই তো আপনাকে একথা জানান হয়েছিল...'

সুজিত এবার একটু বিব্রত বোধ করতে লাগলো। অত্যন্ত অপ্রতিভ, ডানপিটে ছেলে, জীবনে কোনও অবস্থায় হার স্বীকার করতে নারাজ, কিন্তু এখন মোটরের খোলা হাওয়াতেও কপালে ঘাম দেখা দিল। রংপুরে থাকবার জায়গা নেই, তাই এদের ভুলের সুযোগ নিতে সে দ্বিধা করেনি, কিন্তু তাই বলে একেবারে রায়বাহাদুরের বাড়িতে—

সুজিত একটা ঢোক গিলে বললে, 'কিন্তু...'

রায়বাহাদুর হাসতে-হাসতে বললেন, 'আপনার কোনও অসুবিধে হবে না।'

সুজিত বললে, 'না, তা হবে না। সত্যি কথা বলতে কী, এতটা সুবিধে আমরা আশাই করিনি। কী বল হে ফকির চাঁদ?'

ফকির চমকে উঠে বললে, 'কী বলব বুঝতে পারছি না।'

নটবর লাহিড়ীর আগমন উপলক্ষে পূর্ণিমা থিয়েটারের বাড়িটা আমপাতা এবং ফুল দিয়ে যথারীতি সাজানো হয়েছিল এবং বাড়ির দেওয়ালে ও তার আশেপাশে এমন এতটুকু জায়গা ছিল না যেখানে কলকাতার বিখ্যাত অভিনেতার আগমনসূচক বিজ্ঞাপন ও প্ল্যাকার্ড পড়েনি। স্কুল কলেজের ছেলেরা তো সকাল থেকেই থিয়েটার বাড়ির আশেপাশে ঘোরাফেরা শুরু করে দিয়েছিল। ম্যানেজার নকড়ি ডাক্তার রায়কে নিয়ে যখন পূর্ণিমা থিয়েটারের সামনে পৌঁছলেন তখন সেখানে রীতিমতো একটি ভিড় জমে গেছে—কলকাতার অ্যাক্টর, তাকে একেবারে সামনা-সামনি দেখা, সে কী কম সৌভাগ্য! ম্যানেজার সেই কৌতূহলী জনতার মাঝখান দিয়ে ডাক্তার রায় এবং গোবিন্দকে নিয়ে সগর্ব-পদ ফেলে ভিতরে ঢুকে গেলেন। ফ্যালারামও যেতে-যেতে কৃপামিশ্রিত দৃষ্টিতে সকলের দিকে চাইতে ভুলল না।

থিয়েটারের ভিতরে স্টেজের ওপর কয়েকটি মেয়ে নাচের মহলা দিচ্ছিল। নকড়ি প্রভৃতির আবির্ভাবের সঙ্গে-সঙ্গে নাচ বন্ধ হয়ে গেল।

ডাক্তারবাবু একটু সন্দিহান হয়ে উঠেছিলেন, তিনি বিব্রত ভাবে ম্যানেজারকে বললেন, 'দেখুন, এটা থিয়েটার বলে মনে হচ্ছে না?'

নকড়ি অমায়িকভাবে উত্তর দিলেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, এই তো আমাদের বিখ্যাত পূর্ণিমা থিয়েটার। এইখানেই আপনাদের থাকবার সব বন্দেবস্ত করে দিয়েছি। কোনও অসুবিধে হবে না। অভিনয়ের পর কোথাও যাবার পর্যন্ত দরকার হবে না।'

ডাক্তার রায়ের মনের খটকা ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠছিল, তিনি অসহায়ভাবে গোবিন্দর দিকে চাইলেন, গোবিন্দ চেয়ে রইল তাঁর দিকে।

ডাক্তার রায় বললেন, 'কিন্তু আমরা যে শুনেছিলাম স্বয়ং চেয়াবম্যান।'

নকড়ি ডাক্তারের কথাটা শেষ করতে দিলেন না, বললেন, 'বাইরে ওরকম কত কথা শুনবেন মশাই। চেয়ারম্যান—চেয়ারম্যান আবার কে মশাই? যা কিছু তা এই শর্মা, ম্যানেজার বলতে ম্যানেজার, প্রোপ্রাইটার বলতে প্রোপ্রাইটার, পমটার বলতে পমটার। আপনি ও-সব কারও কথায় কান দেবেন না, শুধু আমাকে চিনে রাখুন।'

ফ্যালারাম কাশতে-কাশতে দু-পা এগিয়ে এসে বললে, 'আর, এই ফ্যালারামকে। তা ছাড়া আব সবাই জানবেন ভাঙচি দেবার তালে...'

ডাক্তার নিশ্চিন্ত হতে পারেননি, দন্ত চিকিৎসক সম্মিলনীর সঙ্গে পূর্ণিমা থিয়েটারের যোগসূত্রটাও খুঁজে পাচ্ছিলেন না, একটু ইতস্তত করে বললেন, 'কিন্তু থিয়েটারের ভেতর থাকাটা...'

'কেন তাতে দোষ কী মশাই?' নকড়ি ক্ষুণ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

জবাব দিলে গোবিন্দ, 'না, না, তা নয়, তবে যদি কোনও বদনাম-টদনাম হয় সেই ভয় কি না...'

ফ্যালারাম মুখে একটা অদ্ভুত শব্দ করে বললে, 'হুঃ, ব্যাঙের আবার সর্দি!...'

গোবিন্দ কথাটাব মাহাত্ম্য বুঝতে না পেরে ডাক্তার রায়ের মুখের দিকে চাইল।

নকড়ি বললে, 'না, না ওসব কথা ভাববেন না, আসুন আপনাদের ঘর দেখিয়ে দিই। তারপর একটু বিশ্রাম করে, মানে একটু চা-টা খেয়ে গানের রিহার্স্যালে বসা যাবে—কী বলেন?'

'গান! বলে কী লোকটা?' ডাক্তার রায় যেন আকাশ থেকে পড়লেন, বললেন, 'কই গানের কথা তো ছিল না! আমি শুধু—।'

'গানের কথা ছিল না!'—নকড়ির গলার স্বর চড়ে গেল, 'আমায় পথে বসাবেন না কি? গান গাইবেন না তো আপনাকে এতগুলো টাকা দিয়ে আনলাম কী জন্যে?'

ডাক্তার রায়ের মাথার মধ্যে সব গোলমাল হয়ে যেতে লাগল। প্রথমটা ভাবলেন, তামাসা। নকড়ির মুখের দিকে চেয়ে মত বদলাতে হল। কিন্তু দন্ত চিকিৎসক সম্মিলনীর সভাপতিকে গান গাইতে হবে, তাও আবার রিহার্স্যাল দিয়ে? আমেরিকার মতো প্রগতিশীল দেশেও কেউ এতটা কল্পনা করেছে কি না...

ডাক্তার বললেন, 'আপনি ভুল করছেন, আমি দাঁতের—'

'দাঁতের ব্যথা হয়েছে? ওষুধ আনিয়ে দিচ্ছি। তাতে গানের অসুবিধা কী? ওসব বাজে কথা রাখুন মশাই, ব্যগ্রতা করছি, দোহাই আপনার, আপনারা আমায় এমন করে ডোবাবেন না। পূর্ণিমা থিয়েটার অমাবস্যা হয়ে যাবে।'

'কিন্তু দাঁতের...।'

'ওষুধ যা চান এখুনি আনিয়ে দিচ্ছি—চানতো দাঁতও তুলিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু দোহাই আপনার, গান আপনাকে গাইতেই হবে—।'

ডাক্তার রায়কে কোনও কথা বলবার অবসর না দিয়ে নকড়ি তাঁর হাত ধরে টেনে নিয়ে চললেন।

রায়বাহাদুর সুজিত এবং ফকিরকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন। প্রকাণ্ড বাড়ি, পুরোদস্তুর হাল ফ্যাসানে সাজানো এবং গোছানো। ফকির দু-হাতে দুটো সুটকেশ নিয়ে নেমে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল, ভিতরে যাওয়ার সময় হোঁচটও খেলে দু-চার বার। সুজিতও কম বিব্রত বোধ করছিল না, কিন্তু যে-কোনও অবস্থায় নিজেকে মানিয়ে নেবার একটু ক্ষমতা ছিল বলে বাইরে থেকে তাঁর অস্বস্তির ভাবটা মোটেই বোঝবার উপায় ছিল না।

তারা রায়বাহাদুরের পিছনে-পিছনে হলঘরটায় ঢুকতেই দু-দিক থেকে দুজন চাকর এসে ফকিরের হাত থেকে সুটকেশ দুটি নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। ফকির আপত্তি জানাবার চেষ্টা করতে যাচ্ছিল, কিন্তু সুজিতের দিকে চোখ পড়তেই তাকে সে চেষ্টায় ক্ষান্ত হতে হল।

ঘরের মধ্যে রাজলক্ষ্মী এবং রমা বসেছিল। রায়বাহাদুর পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'ইনি আমার বোন আর এটি আমার ভাগ্নি রমা। ইনিই ডাক্তার রায়, এর কথা তো সবই শুনেছ। আর ইনি হলেন ডাক্তারবাবুর অ্যাসিস্ট্যান্ট ফকিরবাবু।'

সুজিত আর ফকির ওদের নমস্কার জানাল।

রায়বাহাদুর বললেন, 'মঞ্জু কোথায় গেল? মঞ্জু আর মায়াকে তো দেখছি না।' রমা কী যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাব আগেই সিঁড়িতে কাদের ছুটোছুটি এবং খিল-খিল হাসির শব্দ পাওয়া গেল। পরমুহূর্তেই মায়ার পিছনে-পিছনে ট্রাউজার পরা একটি তরুণী ছুটতে-ছুটতে নেমে এল।

মায়া রায়বাহাদুরের কাছে এসে হাঁফাতে-হাঁফাতে বললে, 'বাবা দেখো না—' ট্রাউজার পরা মেয়েটি মঞ্জু। তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মায়া রায়বাহাদুরের চারিদিকে ঘুরতে লাগল এবং ঘুরতে-ঘুরতেই বলল, 'বাবা দেখো না, দিদি আমায় ধরে নিয়ে যাচ্ছে...'

মঞ্জু বললে 'বারে! তুমি আমার টেনিস র‍্যাকেট লুকিয়ে রেখেছিলে কেন?'

মায়া বললে 'বাঃ! আমি তো কবে বার করে দিয়েছি।'

মঞ্জুর এইরকম ধিঙ্গিপনা রমার ভালো লাগে না। সে বলে উঠল, 'আঃ মঞ্জুদি! কী অসভ্যতা হচ্ছে। দেখছ না কারা এসেছেন?'

মঞ্জু এতক্ষণে সুজিতেব দিকে চাইলো; সে চাওয়ার মধ্যে দেখার চেয়ে তাচ্ছিল্যের ভাবটাই বেশি। পরক্ষণেই মুখ ফিরিয়ে বললে, 'ও ঃ 'I am sorry !'

রায়বাহাদুর এতক্ষণ প্রসন্নমুখে বড় আর ছোট মেয়ের দৌরাত্ম্য উপভোগ করছিলেন, এবার সুজিতের দিকে চেয়ে বললেন, 'এটি আমার বড় মেয়ে মঞ্জু আর এটি আমার ছোট মেয়ে মায়া।'

সুজিত তাড়াতাড়ি একটা নমস্কার জানাল মঞ্জুকে। মঞ্জুও নিতান্ত নিয়মরক্ষা হিসাবে একটা প্রতি নমস্কাব জানাল। মায়া এই ফাঁকে সরে পড়বার চেষ্টা করছিল, কিন্তু সেটুকু মঞ্জুর দৃষ্টি এড়াল না, সে তখনই তার পিছু নিল। তারপর দুজনেই ছুটতে-ছুটতে বেরিয়ে গেল, দূর থেকে শোনা গেল তাদের খিল-খিল হাসির শব্দ।

রায়বাহাদুর একটু কুণ্ঠিতভাবে বললেন, 'মা-মরা মেয়ে, একটু বেশি দুরন্ত আর খামখেয়ালি। কিছু মনে করবেন না ডাক্তার রায়।'

রাজলক্ষ্মী বললেন, 'মনে নিশ্চয় করেছেন। এত বড় মেয়ের একটা জ্ঞানগম্যি নেই, তোমার বেশি প্রশ্রয় পেয়েই তো এই রকম হয়েছে।'

রায়বাহাদুর সুজিতের দিকে চেয়ে বললেন, 'দেখুন প্রশ্রয় আমি ঠিক দিই না। তবে কি জানেন...'

সুজিত বললে, 'আপনি লজ্জিত হবেন না রায়বাহাদুর। ছেলেরা তো চিরদিন প্রশ্রয় পেয়ে এসেছে, এখন মেয়েদের একটু প্রশ্রয় দিয়ে দেখলে ক্ষতি কী!'

সুজিতের কথায় সবাই হেসে উঠল।

রায়বাবাহাদুর বললেন, 'চলুন, চলুন, ভিতরে চলুন। এতটা পথ ট্রেনে এসে নিশ্চয় পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছেন, বিশ্রাম করে একটু সুস্থ হয়ে নিন।'

দোতালায় রমার ঘর। ড্রেসিং টেবিলের সামনে রমা ঠোঁটে লিপস্টিক ঘষছিল।

রাজলক্ষ্মী ঘরে ঢুকে বললেন, 'আহা দিব্যি ছেলেটি। অত বড় ডাক্তার কে বলবে! দেমাক নেই, কেবল হাসিখুশি।'

রমা বললে, 'এরই মধ্যে তোমাব মাযা পড়ে গেল মা?'

'তা পড়েছে বইকী একটু! অমনি একটি জামাই যদি পেতাম।' রাজলক্ষ্মী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। রমার মুখে মুহূর্তের জন্যে বুঝি লজ্জার আভা লাগল, তারপরই সে লিপস্টিকটা নামিয়ে রেখে বললে, 'ওসব আশা করো না মা। মামাবাবু মনে-মনে কী এঁচে রেখেছেন জানো তো? মঞ্জুর সঙ্গে ডাক্তার রায়ের বিয়ের কথাটা এইবার পাকা করে ফেলবেন।' রাজলক্ষ্মী মুখ ভার করে বললেন, 'হ্যাঁ, ডাক্তারের তো আর দায় পড়েনি ওই ধিঙ্গি মেয়েকে বিয়ে করবে। কেন, ভালো মেয়ে কী আর নেই! চোখ থাকে তো দেখতে পাবে।'

'চোখ কি সকলের থাকে!' বলে রমা লিপস্টিকটা আবাব তুলে নিয়ে আয়নায় মুখ দেখতে লাগল।

রাজলক্ষ্মী বললেন, 'চোখ যদি না থাকে, ফুটিয়ে দিতে হয়!'

রায়বাহাদুরের বাড়িতে দোতালায় সুজিত এবং ফকিরের জন্যে যে ঘরটি নির্দিষ্ট হয়েছিল, দেখা গেল ফকির তার দরজাটি সন্তর্পণে বন্ধ করে দিয়ে সুজিতের কাছে এগিয়ে এল। সুজিত একটা শোফা দখল করে বসল এবং একটা সিগারেট ধরিয়ে বললে, 'কোথায় উঠবে ভেবে অস্থির হচ্ছিলে ফকিরচাঁদ, এখন খুশি হয়েছ?'

ফকির বললে, 'হ্যাঁ এখন শুধু হাজতে গিয়ে উঠলেই নিশ্চিন্ত হই।'

সুজিত হাসতে-হাসতে বললে, 'তুমি ভড়কে গেলে ফকিরচাঁদ?'

'ভড়কাব না, কি কাজটি করে বসেছ ভাব দেখি!

'আহা, আমি কী করলাম হে! সবই তো লীলাময়ের ইচ্ছা!'

'তোমার ঠাট্টা ইয়ার্কি আমার ভালো লাগছে না, এখন কী করবে বলো দেখি?'

'সেটা ঠিক বলতে পারছি না, তবে যে স্বনামধন্য ডাক্তার রায় নই, নেহাত সুজিত চক্রবর্তী, বেকার সঙ্ঘের কপর্দকহীন অবৈতনিক সেক্রেটারি এটা জানতে পারলে এঁরা বোধ হয় খুশি হবেন না।'

'শুধু খুশি হবেন না? ধরে পুলিশে দেবেন।'

সুজিত নির্বিকারভাবে বললে, 'সে অবস্থায় এরকম একটা সদিচ্ছা এঁদের মনে উদয় হওয়া আশ্চর্য নয়।'

'তবু তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছ?'—ফকির উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আমার যে ভয়ে হাত-পা পেটের ভেতর সেঁধিয়ে যাচ্ছে।'

'না, না সেটা হতে দিও না। হাত-পা গুলোর এখন হঠাৎ বিশেষ প্রয়োজন হতে পারে। তুমি একবার চট করে বাইরেটা দেখে এস, অতিথি সৎকারের জন্য বাইরে এদের কেউ ওৎ পেতে বসে আছে কি-না।'

ফকিরের মুখ আরও শুকিয়ে গেল; সে প্রায় কাঁদ-কাঁদ ভাবে বললে, 'ও বাবা! তা হলেই তো গেছি—তাও থাকতে পারে না-কি?'

'কিছু বিশ্বাস নেই, এঁদেব অতিথি বাৎসল্য যেরকম গভীর! নাও, তুমি চট করে ঘুরে এস।'

ফকির নিতান্ত অনিচ্ছুকভাবে চারিদিক লক্ষ করতে-করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সুজিত শোফায় হেলান দিয়ে সিগারেট টানতে-টানতে ভাবতে লাগল সমস্ত ব্যাপারটা। জীবনে দুঃসাহসিক কাজ সে কম করেনি, অবশ্য এবারের কাণ্ডটা একটু বেশি ঘোরাল, তা হলেও.

ফকির তখনই ফিরে এল।

সুজিত বললে, 'কী হল?'

'আছে।'

'কে আছে?'

'আছে বলছি।'

'কে আছে ছাই বলো না।'

'কুকুর।'

সুজিত হেসে উঠল, 'তাই ভালো। কোনও লোক-টোক নেই তো?'

'না, আর কেউ কোথাও নেই। এই বেলা সরে পড়তে হবে।'

'একটু ভেবে দেখলে হতো না?'

'আবাব কী ভেবে দেখবে?'

'বিশেষ কিছু না। এদের একেবারে হতাশ না করে এ বেলাব মতো আহারটা এখানেই শেষ করে গেলে হতো না? এদের আতিথ্যের একটা সম্মান রাখা উচিত।'

ফকিরের আর এক মুহূর্তও এ-বাড়িতে থাকবার ইচ্ছা বা সাহস ছিল না, সে বললে, 'তাহলে তুমি সম্মান রাখো, আমি চললাম।'

সুজিত বললে, 'তাহলে আমার আর থাকা চলে কী করে! বাড়িটার ওপর আমার কেমন একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল সেইজন্যেই...তা যাক গে, চলো।'

সুজিতের করুণ কণ্ঠ ফকিরের সঙ্কল্পচ্যুত করতে পারল না, সে নিজের সুটকেশটা তুলে নিয়ে সোজা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। অগত্যা সুজিতকেও নিজের সুটকেশ তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ধীরে-ধীরে পা বাড়াতে হল।

সুজিত যখন ঘরের বাইরে এসে পৌঁছাল, ফকির তখন হন-হন করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে নিচে চলে গেছে। সুজিত এদিক-ওদিক চেয়ে তাকে আবিষ্কার করবার চেষ্টা করছিল, এমন সময় পিছন থেকে কে যেন ডাকলে—

'শুনুন, শুনে যান—'

কণ্ঠস্বর মঞ্জুর। সুজিতের চিনতে দেরি হল না।

মঞ্জু নিচে নামবার সিঁড়ির কাঠের রেলিং-এর ওপর বসে আপেল খাচ্ছিল।

সুজিত সেই দিকে এগিয়ে গেল।

মঞ্জু বললে, 'কোথায় যাচ্ছিলেন?'

বুকের মধ্যে সুজিতের হৃদপিণ্ডটা পিং-পঙের বলের মতো লাফিয়ে উঠল; সে একটা ঢোক গিলে বললে, 'এই মানে—এই একটু ঘুরে-টুরে দেখছিলাম'

এরপর সুজিত মঞ্জুর তরফ থেকে আরও কয়েকটি কৌতূহলী প্রশ্ন মনে-মনে আশা করছিল, কিন্তু মঞ্জু শুধু বললে 'ও!' বলেই তার ঝকঝকে দাঁতগুলি দিয়ে নিশ্চিন্তমনে আপেলটায় একটা কামড় বসিয়ে দিল।

সুজিত তবুও কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে রইল। তারপর সবিনয়ে জিজ্ঞাসা কবল, 'এবার আমি যেতে পারি বোধহয়?'

'না দাঁড়ান।' বেলিং-এর ওপর বসে পা দোলাতে-দোলাতে মঞ্জু হুকুম দিলে।

সুজিত বললে, 'যথা আজ্ঞা, কিন্তু আপনার এভাবে বসাটা একটু বিপজ্জনক নয় কী?'

'তাতে আপনার কী?'

মঞ্জু ভ্রুকুটি করেই বললে কথাটা; বলতে গিয়ে একটু উত্তেজিত আর অন্যমনস্ক হয়েছিল বোধ হয়; ফলে কেবল দুটি হাতের সাহায্যে রেলিং-এর ওপর নিজের ভারটা সামলাতে পারল না, পড়ে যাবার উপক্রম করল। বলা বাহুল্য সুজিত তাকে ধরে ফেলল; শুধু ধরে ফেলল না, রেলিং থেকে তাকে নামিয়ে দিয়ে হাসতে-হাসতে বললে, 'এইজন্যেই শাস্ত্রে উচ্চাসনে বসতে মানা।'

কিন্তু মঞ্জুর চোখে চোখ পড়তেই তার মুখের হাসি তখনই মিলিয়ে গেল। রাগে ফুলতে-ফুলতে মঞ্জু বললে, 'আপনাকে তা বোঝাবার জন্যে আমি ডাকিনি।'

সুজিত বললে, 'কী জন্যে আহ্বান করেছেন তা জানবার সৌভাগ্য কিন্তু এখনও আমার হয়নি।'

'আপনি আমায় ধবতে গেলেন কেন?'—মঞ্জু ফেটে পড়ল।

সুজিত বললে, 'নিছক পরোপকারের প্রেরণা—ছেলেবেলা থেকে কেমন একটা বিশ্রী স্বভাব, কারও বিপদ দেখলে চুপ করে থাকতে পারি না।'

মঞ্জুর কণ্ঠস্বর এবার রীতিমতো তীব্র হয়ে উঠল, 'নিজের সম্বন্ধে আপনার ধারণা খুব উঁচু না? নিজেকে মস্ত একটা লোক মনে করেন!'

'আমায় লজ্জা দেবেন না। ওই আমার একটি মাত্র দুর্বলতা।'

'আপনার লজ্জা আছে! লজ্জা থাকলে আপনি এখানে আসতেন না।' সুজিত এতক্ষণ সপ্রতিভ ভাবটা কোনওবকমে বজায় রেখেছিল, এবার তার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল মুহূর্তের জন্য। তবে কি মঞ্জু আসল কথাটা...!

কোনওরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে সুজিত বললে, 'এখানে আমার—অনেক বাধা ছিল, কিন্তু লজ্জাটা তার মধ্যে ধর্তব্য বলেই মনে হয়নি। এসে খুব অন্যায় করলাম বোধ হয়।'

'বোধহয় নয়, নিশ্চয় করেছেন। আপনার মতলব আমি জানি।'

'তা হলে আমার চেয়ে একটু বেশি জানেন আপনি। এখনও আমি মতলবটা ঠিক করবার সময় পাইনি।'

মঞ্জু তবু শান্ত হল না, বললে, 'যা ভাবছেন তা হবে না, বাবা যাই বলুন, আমি আপনাকে বিয়ে করতে পারব না।'

সুজিতের মনে হল কে যেন তাকে মুহূর্তের জন্যে ইন্দ্রলোকে পৌঁছে দিয়ে তখুনি আবার মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল। নিজেকে সামলে নিয়ে সে বললে, 'শুনে ভয়ানক হতাশ হলাম। কিন্তু এ দুর্ভাগ্যের কারণটা কি শুনতে পাই? আমি অযোগ্য কীসে ঠিক বুঝতে পারছি না।'

মঞ্জু বললে, 'আপনি তো দাঁতের ডাক্তার—একটা দাঁতের ডাক্তারকে আমি বিয়ে করবো মনে করেছেন?'

'আমি কিছুই মনে করিনি। কিন্তু দাঁতের ডাক্তার হওয়া কি অপরাধ? দাঁতের ডাক্তার তো নিরীহ ভালো মানুষরাই হয়ে থাকে।'

মঞ্জু জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল। সিঁড়ির নিচে হলঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ফকির এতক্ষণে ঘামছিল, এবার সে অধৈর্য হয়ে হাত নেড়ে ইশারা করল সুজিতকে নেমে আসবার জন্য। সুজিত তাকে ইঙ্গিতে আর একটু ধৈর্য ধারণ করতে বললে।

মঞ্জু বলে উঠল, 'নিরীহ ভালো মানুষ লোক আমি ঘৃণা করি। আপনি যদি ভালো চান তো এই বেলা এখান থেকে সরে পড়ুন।'

'এতক্ষণ সেইটেই উচিত বলে মনে হচ্ছিল, কিন্তু এখন কেবল একটু সন্দেহ হচ্চে...আচ্ছা ধরুন, যদি না যাই।'

'তা হলে আপনাকে পস্তাতে হবে। আপনার জীবন আমি দুর্বহ করে তুলব।'

'না, না, অত লোভ দেখাবেন না, আমি বড় দুর্বল। মনে হচ্ছে বুঝি আর যাওয়া হল না।'

'কিন্তু আপনাকে আমি সাবধান করে দিলাম, মনে থাকে যেন।'

'আহা, তাইতেই তো মুশকিলে ফেললেন।'

মঞ্জুর জবাবের জন্যে অপেক্ষা না করে সুজিত এবার সিঁড়ির দিকে তাকাল। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বিরক্ত হয়ে ফকির ইতিমধ্যে সিঁড়ির ওপর উঠে এসেছিল।

সুজিত তাকে এগিয়ে আসতে ইশারা করে দুষ্টুমিভরা একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করল মঞ্জুর মুখের দিকে।

ফকির দরজার কাছে উঠে আসতেই সুজিত তাকে ঘরে ঢুকে পড়তে বলল।

ফকির ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে, সঙ্গে-সঙ্গে সুজিতও।

মঞ্জুর সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছিল। 'কী অসভ্য লোক uncultured ! যেতে বললে যায় না, গালাগালি দিলে অমায়িক ভাবে হাসে, রাগে না, উত্তেজিত হয় না...কী আশ্চর্য!'

হাতের আধ খাওয়া আপেলটা মঞ্জু ছুঁড়ে মারল সুজিতের দিকে। সেটা কারও গায়ে লাগল না। সুজিত হাসতে-হাসতে দরজা বন্ধ করে দিলে।

ঘরের মধ্যে ফকিরচাঁদ হতাশ হয়ে গালে হাত দিয়ে বসেছিল। সুজিত কাছে আসতেই সে প্রায় কাঁদ-কাঁদ স্বরে বললে, 'শেষে এই তোর মনে ছিল। চলে যাবার কি আর কোনও পথ ছিল না?'

সুজিত হাসতে-হাসতে বললে, 'তুমি বুঝতে পারছ না ফকিরচাঁদ, ভেবে দেখলাম

ভাগ্য যখন জুটিয়েই দিয়েছে তখন এরকম একটা আশ্রয় ফট করে ছেড়ে যাওয়া উচিত হবে না। দেখাই যাক না কী হয়।'

'কী হবে তা তো আগেই জানি। তোমার সঙ্গে বেরিয়েই আমার এই সর্বনাশ।'

সুজিত কিছু বলবার আগেই বন্ধ দরজায় মৃদু করাঘাত শোনা গেল।

ফকির আর্তকণ্ঠে বলে উঠল, 'এই রে! ওই মেয়েটাই এসেছে আবার! বাবা, মেয়ে নয় তো চিতেবাঘ।'

সুজিত অবিচলিতভাবে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিল। দেখা গেল, মঞ্জুব বদলে রমাকে। একটু কুণ্ঠিতভাবে সে বললে, 'আসতে পারি কি?'

সুজিত বললে, 'নিশ্চয়ই।'

রমা ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে বললে, 'আপনাদের জন্যে একটু চা নিয়ে এসেছিলাম।'

রমার পিছনে-পিছনে একজন চাকরকে দেখা গেল চায়ের সরঞ্জাম সমেত ট্রে হাতে।

সুজিত বললে, 'আপনি আবার এখুনি এ কষ্ট করতে গেলেন কেন? আমরা তো স্নানটান সেরেই খেতে বসব। এখন চায়ের কোনও দরকার ছিল না।'

রমা বললে, 'না, না, সে কী কথা! গাড়িতে ক্লান্ত হয়ে এসেছেন। আর আমার এতে কী-ই বা কষ্ট!'

চাকর ট্রেটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে চলে গেল। রমা চা তৈরি করতে লাগল।

দরজার বাইরে মুহূর্তের জন্য মঞ্জুকে দেখা গেল—মুখ গম্ভীর, চোখ দুটো ছুরির ফলার মতো শাণিত।

সেখান থেকে সরে এসে মঞ্জু বসল নিজের ঘরে পিয়ানোর সামনে। হঠাৎ মনটা কেমন বিস্বাদ হয়ে গেছে। বাজাতে ভালো লাগছিল না, তবু মঞ্জু বাজাতে লাগল।

মায়া ছুটতে-ছুটতে এসে জিজ্ঞাসা কবলে, 'মনে আছে তো দিদি?'

'কী মনে আছে?'—মায়ার দিকে না চেয়েই মঞ্জু প্রশ্ন করল। মায়া অবাক হয়ে বললে, 'বাঃ আজ যে আমাদের প্লে।'

মঞ্জুর তরফ থেকে কোন ও উৎসাহের পবিচয় পাওযা গেল না, পিয়ানোর রিডগুলোর ওপর এলোমেলো আঙুল চালাতে-চালাতে মঞ্জু বললে, 'তা জানি।'

মায়া বললে, 'এঁদের সকলকে নেমন্তন্ন করতে হবে কিন্তু।'

'আবার কাদের নেমন্তন্ন করবি? সবাইকে তো বলা হয়েছে।'

'বাঃ, এই যে যাঁরা এলেন—এঁদের বলবে না? তোমাকেই বলতে হবে দিদি।'

'আমার দায় পড়েছে। পারব না।'

মঞ্জু আবার পিয়ানোর দিকে মন দিল। মায়া কিন্তু ছাড়বার মেয়ে নয়। সে হঠাৎ খিল-খিল করে হেসে উঠে বললে, 'জানি কেন পারবে না। আমি জানি। আমি জানি গো।'

'কী জানিস ফাজিল মেয়ে? বেরো এখান থেকে।'

মায়া এবার দুষ্টুমিভরা উজ্জ্বল দুটি চোখ মেলে চাইল দিদির মুখের দিকে, তারপর বললে, 'ডাক্তারবাবু কিন্তু বেশ লোক দিদি।'

মঞ্জু মিউজিক টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে বললে, 'হ্যাঁ, ঠিক হায়নার মতো।'

মায়া ঘুরপাক খেয়ে আর একবার খিল-খিল করে হেসে উঠল, তারপর হাততালি দিতে-দিতে বললে, 'বলে দেব।'

মঞ্জু বললে, 'বলিস তুই।'

'দেখো, ঠিক বলে দেব।'

বলতে-বলতে মায়া ছুটল সেখান থেকে। মঞ্জুও ছুটল তার পিছনে-পিছনে।

পূর্ণিমা থিয়েটারের সাজঘরটা নটবর লাহিড়ীর আগমন উপলক্ষে শয়নকক্ষে রূপান্তরিত হয়েছে এবং ডাক্তার রায়কে সেইখানেই বিশ্রাম করতে দেওয়া হয়েছে। ঘরের দেয়ালে ঝুলছে নানাবিধ রংচঙে পোশাক—রাজা থেকে বাউল, সন্ন্যাসী পর্যন্ত সবার। গোবিন্দ কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়ে সেগুলি নিরীক্ষণ করছে।

ডাক্তার রায় চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে-দিতে হঠাৎ উত্তেজিত ভাবে বলে উঠলেন, 'আমি কিন্তু এখানে কিছুতেই থাকব না গোবিন্দ, কিছুতেই না।'

গোবিন্দ মন দিয়ে একটা জরির পোশাক পরীক্ষা করছিল, কথাটা তার কানে গেল না। ডাক্তার রায় আবার চিৎকার করে উঠলেন, 'আমি বলছি, আমি এখানে কিছুতেই থাকতে পারব না। বুঝেছ গোবিন্দ?'

গোবিন্দ পোশাকটা দেখতে-দেখতেই জবাব দিল, 'বুঝেছি স্যার।'

'বুঝেছি স্যার!'—ডাক্তার রায় ধমকে উঠলেন, 'কী বুঝেছ?'

'আজ্ঞে, আপনি এখানে থাকবেন না।'

'কিন্তু কেন থাকব না বুঝেছ?'

'না স্যার, আমি বুঝতে পারছি না। এমন খাশা জায়গা ছেড়ে...

'খাশা জায়গা? তুমি এটাকে খাশা জায়গা বলো! জানও এরা আমায় গান গাইতে বলে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ মানে? এরা আমাকে গান গাইতে বলে আর তুমি বলছ আজ্ঞে হ্যাঁ?'

গোবিন্দ এবার একটু বিব্রত হয়ে বললে, 'কী বলব তা হলে স্যার?'

ডাক্তার রায় সশব্দে চায়ের পেয়ালাটা ঠেলে রেখে বললেন, 'আমার মাথা বলবে, মুণ্ডু বলবে—'

'আপনি রাগ করছেন স্যার!'

'রাগ করব না! আমি দাঁতের ডাক্তার, আমি গান গাইতে যাব কেন?'

'কিন্তু এদের যেন গানের দিকেই ঝোঁক বেশি মনে হচ্ছে স্যার, দাঁত সম্বন্ধে কোনও আগ্রহ তো দেখছি না!'

ডাক্তার রায় এবার কতকটা শান্তভাবে বললেন, 'আমিও তো তাই বলছি। দাঁত সম্বন্ধে যারা উদাসীন তাদের এখানে আমি একদণ্ড থাকতে চাই না। তুমি গাড়ি ডাকো গোবিন্দ, আমি এখুনি চলে যাব।'

'কিন্তু স্যার....'

'আবার কিন্তু কী?'

'না...এই বলছিলুম কী...আজ থিয়েটারটা দেখে গেলে হতো না?' ডাক্তার রায় উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'না, না, তুমি যাও, এখুনি গাড়ি ডেকে আনো। আর শোনো, এরা কেউ যেন টের না পায়। কাউকে কিছু বোলো না। খুব চুপি-চুপি যাবে, বুঝেছ?'

গোবিন্দ উপায়ান্তর না দেখে বিমর্ষ মুখে বেরিয়ে গেল।

ম্যানেজার তাঁর ঘরে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে গড়গড়া টানছিলেন। সখীসঙ্ঘের একটি

মেয়ে তাঁর মাথার পাকাচুল তুলে দিচ্ছিল। কয়েকজন অভিনেতা একপাশে বসে গল্পগুজব করছিল।

গোবিন্দকে সামনে দিয়ে যেতে দেখে নকড়ি হাঁক দিলেন, 'কি গো গোবিন্দবাবু চলেছ কোথায়?'

গোবিন্দ দরজার সামনে এসে বললে, 'একটু কাজে। মানে—দেখুন, একটা গাড়ি ডাকিয়ে দিতে পারেন?'

'গাড়ি? গাড়ি কী হবে?'

গোবিন্দ এবার সাবধান হবার চেষ্টা করল, 'ওইটি আমায় জিজ্ঞাসা করবেন না, বলতে পারব না।'

ম্যানেজার সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলেন। গড়গড়ার নলটা নামিয়ে রেখে বললেন, 'সে কী হে! গাড়ি ডাকিয়ে দিতে বলছ, অথচ কেন গাড়ি চাই তা বলতে পারবে না?'

'আজ্ঞে না, গাড়ি আপনি ডাকিয়ে দিন। আর কিছু আমি বলতে পারব না।'

নকড়িকে এবার উঠে দাঁড়াতে হল।

'ব্যাপারটা কী বলো তো? যাবে কোথায়? আর এখন গেলে ফিরেই বা আসবে কখন?'

'গেলে আর ফিরে আসছি!...'

বলেই গোবিন্দর খেয়াল হলো যে কথাটা প্রায় বেফাঁস করে ফেলেছে। তখনই প্রবল বেগে মাথা নেড়ে বললে, 'উঁহু, আমি কিছু বলতে পারব না।'

আর কিছু বলবার দরকাব ছিল না। গোবিন্দর মুখ থেকে যেটুকু আভাস পাওয়া গেছে ঝানু নকড়ির কাছে তাই যথেষ্ট। তিনি চিৎকার করে উঠলেন, 'তোমার ঘাড় বলবে। বলি মতলবটা কী তোমাদের? আমাদের ফাঁসিয়ে এখান থেকে সরে পড়তে চাও? দাঁড়াও দেখচি—'

ফ্যালারামের নাম ধরে ডাকতে-ডাকতে তিনি সাজঘরের দিকে ছুটলেন। গোবিন্দ তাঁর পিছনে যেতে-যেতে বললে, 'দেখুন, আমি কিন্তু কিছু জানি না—'

গাড়ির অপেক্ষায় ডাক্তার রায় উত্তেজিত হয়ে সাজঘরেব ভেতর ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। নকড়ি ফ্যালারাম আর গোবিন্দকে নিয়ে ঘরে ঢুকেই চেঁচাতে শুরু করলেন, 'এ আপনার কীরকম ব্যবহার মশাই? চালাকি করবার আর জায়গা পাননি? সারা শহরে পোস্টার পড়ে গেছে—সব টিকিট বিক্রি, এখন আপনি পালাতে চান?'

ডাক্তার রায় নকড়ির কথার বিন্দুবিসর্গ বুঝতে না পেরে বললেন, 'কী বলছেন আপনি?'

'কী বলছি বুঝতে পারছেন না? লুকিয়ে-লুকিয়ে গাড়ি ডাকতে পাঠিয়েছিলেন কী জন্যে?'

ডাক্তার রায় এবার রোষ-কষায়িত নেত্রে গোবিন্দর দিকে চাইলেন।

গোবিন্দ বললে, 'আমি কিন্তু কিছু বলিনি স্যার।'

নকড়ি আবার চেঁচাতে শুরু করলেন, 'কারও কিছু বলবার দরকার নেই। আপনার চালাকি আমি গোড়া থেকেই ধরতে পেরেছি। পূর্ণিমা থিয়েটারের ম্যানেজার, বিশ বছর থিয়েটার চালাচ্ছি মশাই—আপনার মতো ঢের-ঢের অ্যাক্টর আমার দেখা আছে। দেখি আপনি

কোথায় পালান—দেখি স্টেজে নেমে আপনাকে গান গাইতে হয় কি না।'

ব্যাপারটা ডাক্তার রায়ের কাছে এবার পরিষ্কার হয়ে আসছিল, তিনি বললেন, 'কিন্তু দেখুন...আপনাদের একটা ভয়ানক ভুল হয়েছে।'

'ভুল তো হয়েছেই। আপনার মতো অ্যাক্টরকে খাতির করে বায়না দিয়ে কলকাতা থেকে আনিয়েছি, ভুল আমার হয়নি? কিন্তু তাই বলে পুরোপুরি লোকসান দিতে রাজি নই জানবেন। কই হে ফ্যালারাম, ডাক সবাইকে, গানের রিহার্স্যাল এখুনি বসবে—।'

নকড়ির হুকুমে ফ্যালারাম সত্যি আর সবাইকে ডাকবার জন্যে বেরিয়ে যাচ্ছিল, ডাক্তার রায় মরিয়া হয়ে বলে উঠলেন, 'কী আশ্চর্য! আমি কতবার আপনাদের বলবো আমি গান জানি না, আমি অ্যাক্টর নই।'

নকড়ি তবু নিরস্ত হলেন না, বললেন, 'ক্রমে-ক্রমে আরও কত কী বলবেন, বলুন আপনি নটবর লাহিড়ী নন?'

'তা তো নই। সেই কথাই তো বলছি—।'

'কথা আর আমি শুনতে চাই না মশাই। আপনি যদি বলেন, চিড়িয়াখানার খাঁচার শিক ভেঙে পালিয়ে এসেছেন, তবু আমি ছাড়ব না।'

ডাক্তার রায় কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, সেই সময়ে পূর্ণিমা থিয়েটারের বিখ্যাত অভিনেত্রী কুসুমিকা এসে ঢুকল ঘরে।

'এত গন্ডগোল কীসের বলুন দেখি! কী হয়েছে কী?'

কুসুমিকাকে দেখেই ম্যানেজার বললেন, 'এই যে বুঁচি এসে পড়েছিস, মাইরি দেখ দেখি কাণ্ডটা—'

নকড়ি ডাকনাম ধরে ডাকায় কুসুমিকা খুশি হল না, ভ্রুকুঞ্চিত করে বললে, 'ম্যানেজারবাবু—'

ম্যানেজার ভুল শুধরে নিয়ে বললেন, 'থুড়ি কুসুমিকা দেবী! আসুন, আসুন। দেখুন কী মুশকিল হয়েছে—এই আমাদের বড় অ্যাক্টর নটবর লাহিড়ী—'

নকড়ির মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কুসুমিকা ডাক্তার রায়কে নমস্কার জানিয়ে বললে, 'ও আপনিই নটবর লাহিড়ী? আপনার সঙ্গে আলাপ করে অত্যন্ত খুশি হলাম। আপনার অভিনয় কখনও দেখিনি, কিন্তু আপনার সম্বন্ধে আমার গভীর শ্রদ্ধা আছে—'

ডাক্তার রায় কী বলবেন ঠিক করতে না পেরে বলে ফেললেন 'হ্যাঁ...আমিও...'

'না, আপনার সঙ্গে আমার পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়নি, তবে আমার নাম হয়তো আপনি শুনে থাকবেন।'

কুসুমিকা এর উত্তরে একটা প্রশংসাসূচক মন্তব্য আশা করছিল, কিন্তু ডাক্তার রায়ের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'কই না তো!'

কুসুমিকার মুখ অন্ধকার হয়ে গেল, নকড়ি তাল সামলাবার জন্যে বললেন, 'আরে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিতেই ভুলে গেছি। ইনিই কুসুমিকা দেবী। আজ বিশ বছর ধরে আমাদের পূর্ণিমা থিয়েটারের হিরোইন...'

নকড়ির শেষ কথাটায় কুসুমিকা চটে উঠল বললে, 'ম্যানেজারবাবু, আমায় অপমান করবার অধিকার আপনার নেই।'

'অপমান!'—নকড়ি যেন আকাশ থেকে পড়লেন, 'অপমান আবার কখন করলাম?'

কুসুমিকা ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'অপমান নয়? আপনি বলতে চান, বিশ বছর আমিই

আপনাদের একমাত্র হিরোইন?'

নকড়ি ব্যাপারটা ঠিক ধরতে না পেরে বললেন, 'সে কথা তো আমরা সগর্বে বলে থাকি!'

'তা বলবেন বইকী! আমার বয়স না বাড়ালে আপনার সুখ হবে কেন? বিশ বছর ধরে আমি হিরোইন সাজছি—তা হলে আমার বয়স কত হল শুনি? আমি কি চালশে বুড়ি?'

নকড়ি এতক্ষণে কুসুমিকার রাগের কারণটা বুঝতে পারলেন, বললেন, 'না, না, তুমি বিশ বছরের ছুঁড়ি, আঁতুড় ঘর থেকে এসে আমাদের হিরোইন সাজছ। দ্যাখ বুঁচি, সখী সেজে এক দুই তিন করে পায়ে তো চড়া পড়ে গিয়েছিল। আমার দেখতা হিরোইন হলি, আমার কাছে আর চাল মারিস না।'

কুসুমিকাও ছাড়বার পাত্রী নয়, তার কাংসবিনিন্দিত পেটেন্ট গলার ঝঙ্কার দিয়ে বললে, 'তবেরে মট্‌রা, সাজঘরে মেয়েদের মুখে রং মাখিয়ে পায়ে ঘুমুর বেঁধে দিতিস, আজ বড় ম্যানেজারি ফলাতে এসেছিস না? তোর দেখতা আমি হিরোইন হয়েছি নারে মুখপোড়া?'

নকড়ি সমান পাল্লা দিয়ে চেঁচাতে শুরু করলেন, 'দ্যাখ বুঁচি, খবরদার বলে দিচ্ছি—সত্যি বলছি আমি রেগে যাব—রেগে গিয়ে একটা কুরুক্ষেত্র করে বসব।'

'করো না কুরুক্ষেত্র; আমি কি ভয় করি নাকি? হাটে হাঁড়ি আমি ভেঙে দিচ্ছি। বলি কার্ পয়সায় তোর থিয়েটার চলছে রে হতচ্ছাড়া? আমায় তুই অমনি হিরোইন করেছিস? আমি না থাকলে কোন চুলোর দুয়োরে ম্যানেজারি করতিস?'

জোঁকের মুখে নুন পড়লে যেরকম অবস্থা হয় ম্যানেজারের অবস্থা দাঁড়াল ঠিক সেইরকম। সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর সুর গেল পালটে, 'আহা, থাক, থাক, থাক...'

'কেন, থাকবে কেন?'

'আহা চটিস কেন? মাইরি বুঁচি, থুড়ি কুসুমিকা দেবী, এই নাক কান মলা খাচ্ছি—কোন ব্যাটা আর বয়সের কথা তোলে। তুই চট করে একটা গান শুনিয়ে দে দেখি—'

'আমার গান গাইতে দায় পড়েছে।'—কুসুমিকা একটা ঝাঁকানি দিয়ে মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল।

'আহা রাগ করিস কেন! নটবরবাবুকে একটা গান শুনিয়ে দিবি নে? উনি মনে করবেন কী। কী বলেন নটবরবাবু?'

নকড়ি ডাক্তারের মুখের দিকে চাইলেন। ডাক্তার এতক্ষণ নির্বাক হয়ে কুসুমিকা নকড়ির বচনামৃত পান করছিলেন, নকড়ির শেষ কথাটায় চমকে উঠে তিনি বললেন, 'আমায় কিছু বলছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আবার কাকে!'—নকড়ি এবার হাসতে-হাসতে বললেন, 'আমাদের হিরোইনের একটা গান শুনুন। আপনাদের কলকাতায় এমন গান পাবেন না মশাই। কই হে ফ্যালারাম, হারমোনিয়ামটা কই?'

ফ্যালারাম হারমোনিয়ামটা নিয়ে এল। তারপর সেইখানেই সকলে বসলেন। গোবিন্দ উৎসাহিত হয়ে উঠল। 'ডাক্তারবাবু যেন কী! এমন গান বাজনা ছেড়ে...'

কুসুমিকা হারমোনিয়ামটা টেনে নিয়ে বললে, 'আমার কিন্তু ভারি লজ্জা করে।'

আমেরিকা ফেরত ডাক্তার রায়ের জন্যে চেয়ারম্যান অধরবাবু সে রাত্রে বিলিতি

প্রথায় খাওয়াদাওয়ার একটু বিশেষ আয়োজন করেছিলেন এবং তার ফলে সুজিত ও ফকিরকে বাড়ির আর সকলের সঙ্গে ডিনার টেবিলে বসে কাঁটা-চামচ ধরতে হয়েছিল। বাবুর্চি খাদ্যবস্তুগুলি পরিবেশন করে যাবার পর মঞ্জু এসে ঘরে ঢুকল। সুজিতের পাশের চেয়ারটাই শুধু খালি ছিল, বসতে গেলে সেইটাতেই বসতে হয়। মঞ্জু কিন্তু বসল না, মুখ গম্ভীর করে দাঁড়িয়ে রইল।

রায়বাহাদুর বললেন, 'কই মা মঞ্জু, বোসো।'

মঞ্জু চেয়ারটা সুজিতের কাছ থেকে সশব্দে খানিকটা সরিয়ে এনে বিরক্তভাবে তাতে বসে পড়ল। সবাই অবাক হয়ে চাইল মঞ্জুর দিকে।

ফকিরচাঁদ কাঁটা-চামচ সামনে দেখে বিষম বিব্রত বোধ করছিল, তার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন কোনও শোকসভায় যোগদান করতে এসেছে।

আহার পর্ব শুরু হল। কিন্তু মুশকিল হল ফকিরের। জীবনে সে কোনওদিন কাঁটা-চামচ ব্যবহার করেনি। কোন হাতে কাঁটা আর কোন হাতে চামচ ধরতে হয় সেটুকুও বেচারির জানা নেই। আর পাঁচজনের দেখাদেখি কোনওরকমে সে কাঁটা-চামচ ধরল বটে, কিন্তু এমন বে-কায়দায় ধরল যে প্লেটের খাদ্যবস্তু কিছুতেই মুখের কাছে উঠতে চাইল না। বেগতিক দেখে সুজিত তাকে ইশারায় কাঁটা-চামচ ধরবার সঠিক প্রণালীটা জানাতে লাগল।

ব্যাপারটা মঞ্জুর চোখ এড়াল না, মুখ তার আরও গম্ভীর হয়ে উঠল।

সুজিত বন্ধুকে বাঁচাবার জন্য তাড়াতাড়ি মঞ্জুকে বললে, 'তখন সময় পাইনি, আপনার আপেলটা দেওয়ার জন্যে ধন্যবাদ।'

মঞ্জু জবাব না দিয়ে অন্যদিকে চেয়ে রইল।

রায়বাহাদুর হাসতে-হাসতে বললেন, 'মঞ্জু বুঝি এরই মধ্যে আপনাকে আপেল দিয়ে এসেছে? বেশ, বেশ।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আপেলও পেয়েছি, চাও পেয়েছি।'

কথাটা বলে সুজিত রমার দিকে চাইল। রমা লজ্জিত ভাবে হাসল।

রায়বাহাদুর বললেন, 'কিন্তু আপনার খাওয়ার বোধহয় কষ্ট হচ্ছে মিঃ রায়, আমাদের এখানকার রান্না কি ঠিক—'

'উহুঁ, কিছু ভাববেন না রায়বাহাদুর। খেতে পেলেই আর আমাদের খাওয়ার কষ্ট থাকে না। বিশ্বাস না হয়, ফকিরচাঁদকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন।' ফকির কাঁটা-চামচ ধরার কায়দাটা আয়ত্ত করতে না পেরে হাত দিয়ে একখানা কাটলেট তুলে খাওয়ার চেষ্টা করছিল মরিয়া হয়ে, রায়বাহাদুর তার দিকে চাইতেই সে তাড়াতাড়ি হাতটা সরিয়ে নিয়ে বোকার মতো চেয়ে রইল। এবারও ব্যাপারটা মঞ্জুর চোখ এড়াল না, সুজিতের দিকে চেয়ে সে ব্যঙ্গ কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, 'আপনার বন্ধুটি কি আপনার সঙ্গে আমেরিকা গিয়েছিলেন মিস্টার রায়?'

সুজিত বললে, 'না শেষপর্যন্ত যেতে পারেনি!'

রমা বললে, 'উনি কতদূর গিয়েছিলেন?'

সুজিত বললে, 'আউটরাম ঘাট পর্যন্ত—আমায় তুলে দিতে।'

সুজিতের কথায় অনেকে হেসে উঠল, মঞ্জু শুধু মুখ ভার করে রইল।

রায়বাহাদুর সুজিতকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি তো চিকাগোতে গিয়েছিলেন? কোন দিক দিয়ে? নিউইয়র্ক না স্যানফ্রান্সিসকো?'

মুহূর্তের জন্য কাটলেটের টুকরোটা সুজিতের গলায় আটকে যাবার উপক্রম হল,

কোনওরকমে সেটা গিলে ফেলে সুজিত বললে, 'দেখুন, তখন একরকম দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে গিয়েছিলাম, ও আর জিজ্ঞাসা করবেন না...'

রায়বাহাদুর কথাটা ঠিক বুঝতে পারলেন না, বললেন, 'আপনার অভিভাষণে কিন্তু আমরা আপনার আমেরিকার অভিজ্ঞতার কথা শুনতে চাই।'

'নিশ্চয় শুনবেন; করুণ ও নিদারুণ আমার সব অভিজ্ঞতার কথাই তো বলব ঠিক করেছি।'

'দাঁতের কথা বাদ দেবেন না যেন?'

'আজ্ঞে না, দাঁত বাদ দিলে আর থাকবে কী?'

'আচ্ছা, আমেরিকায় মেয়েরা নাকি দাঁতের ডাক্তার হয়?' রমা জিজ্ঞাসা করলে।

সুজিত বললে, 'দেখুন, ওদেশের মেয়েরা পুরুষ ছাড়া কী যে না হয় বলতে পারি না। আজকাল মাঝে-মাঝে তাও হচ্ছে শুনতে পাই।'

রমা বলল, 'ভারি বেহায়া দেশ কিন্তু যাই বলুন।'

'নিজে না দেখেই বেহায়া বলে দিলে রমাদি?'—মঞ্জু টিপ্পনী কাটলে।

রমা বললে, 'দেখব আবার কী। শুনতে তো পাই। মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিতে যায় কোন লজ্জায়?'

'লজ্জা নয়, হয়তো পুরুষদের লজ্জা দিতে, কী বলেন মিস চ্যাটার্জি?' কথাটা বলে সুজিত চাইল মঞ্জুর দিকে।

মঞ্জু বললে, 'অনেককে লজ্জা দেওয়ার চেষ্টাও বৃথা।'

বাঁকা একটা চাউনি নিক্ষেপ করল সে সুজিতের দিকে।

রায়বাহাদুর বলে উঠলেন, 'কী কথা থেকে কী কথা যে বলিস আমি বুঝতে পারি না। কোথায় ডাক্তার রায়ের কাছে দুটো dentistry-র কথা শুনব, না যত বাজে কথা।'

মঞ্জু বললে, 'তুমি যত পারো লেকচার শোনো বাবা, আমার অত মাথা বা দাঁতের ব্যথা নেই।'—বলেই সে প্লেটটা সরিয়ে রেখে টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ল। কারও দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

রায়বাহাদুর বিস্ময়াবিষ্ট কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'কী হল মঞ্জুর, হঠাৎ অমন করে চলে গেল যে! দেখ না মা রমা।'

মঞ্জু উঠে যাওয়াতে রমা মনে-মনে খুশি হয়েছিল, কিন্তু রায়বাহাদুরের হুকুম, অমান্য করবার উপায় নেই, উঠতে-উঠতে মুখ ভার করে সে বললে, 'কী জানি ওর মেজাজ বোঝাই ভার, যাই দেখি আবার—'

সবাই অন্যমনস্ক রয়েছে দেখে ফকির এই ফাঁকে কাটলেটের একটা টুকরো কোনও রকমে মুখের ভিতর চালান করবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু চেষ্টা সফল হল না, কাঁটা থেকে বিচ্যুত হয়ে টুকরোটা ছিটকে গিয়ে পড়ল একেবারে রায়বাহাদুরের গায়ে—তাঁর পরিষ্কার ধবধবে জামাটার ওপর সঙ্গে-সঙ্গে একটা দাগ হয়ে গেল। মনে-মনে মৃত্যুকামনা করল ফকিরচাঁদ, কাঁটা হাত থেকে টেবিলের ওপর পড়ে গেল। সবাই কটমট করে তার দিকে চেয়ে আছে দেখে ফকির নিতান্ত অপ্রস্তুত ভাবে বলে উঠল, 'মাছ-মাংস খাই না কি না, আমি একেবারে ভেজিটেবিল।'

ফকিরের বলবার ইচ্ছা ছিল যে সে একেবারে নিরামিষাশী, কিন্তু ঠিক ইংরেজি প্রতিশব্দটা মনে করতে পারল না।

প্রাণপণে হাসি চেপে সুজিত অধরবাবুকে বললে, 'কিছু মনে করবেন না রায়বাহাদুর।' গোলযোগের মধ্যে কেউ-কেউ টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। রায়বাহাদুর বলে উঠলেন, 'না, না, মনে করব কেন! তা আপনারা উঠলেন কেন? ফকিরবাবু আপনাকে আর একখানা কাটলেট—?'

আবার কাটলেট! তার চেয়ে ফকির বরং নিজের মাথাটা চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে রাজি আছে। রায়বাহাদুরের প্রশ্নের উত্তরে সে বললে, 'আজ্ঞে না, আমার খিদে নেই।'

টেবিলের ওপর সাজানো নানাবিধ ভোজ্যদ্রব্যগুলির দিকে চেয়ে গোপন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে ফকিরচাঁদ। খিদেয় তার পেটের ভেতরটা ফুটো ফুটবল ব্লাডারের মতো ক্রমশ চুপসে যাচ্ছিল।

মঞ্জু তার ঘরে জানলার কাছে একা দাঁড়িয়েছিল, রমা এসে বললে, 'অমন করে চলে এলে যে মঞ্জু? ডাক্তার রায় কী মনে করবেন বলো তো!'

'ডাক্তার রায়ের মন নিয়ে তো আমার মাথা ব্যথা নেই, তোমার থাকে তো গিয়ে সান্ত্বনা দিতে পারো।'—কথা বলতে-বলতে মঞ্জু ঘুরে দাঁড়াল।

রমা বললে, 'যা মুখে আসছে তাই বলছ যে। সান্ত্বনা দেবার লোক তুমি না আমি?'

'আমি কেন হতে যাব। আমার দায় পড়েছে—'

'দায় পড়ে কি না পরে বুঝবে। এরকম মেজাজ কিন্তু ভালো নয়।'

'কেন বলো তো?'

'ডাক্তার রায় ভুল বুঝতে পারেন।'

'ডাক্তার রায়, ডাক্তার রায়।' মঞ্জু এবার ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'তোমাদের সকলের কাছে ওই নামটা জপমালা হয়ে উঠেছে। ডাক্তার রায় ঠিক বুঝুন ভুল বুঝুন, আমার কী!'

রমা একটু আশ্চর্য হয়ে মঞ্জুর দিকে চাইল, তারপব বললে, 'কিছু নয় তো? ঠিক বলছ?'

মঞ্জু বললে, 'বেঠিক কেন বলব? কী তোমার হয়েছে বলো তো? যত সব বাজে-বাজে কথা জিজ্ঞাসা করছ। আমি চললাম, মায়ার আজ আবার অভিনয়, তার ব্যবস্থা করতে হবে।'

মঞ্জু ঘর থেকে চলে গেল। রমা দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। তার মুখ দেখে মনে হল—কী এক অজানা কারণে সে মনে-মনে রীতিমতো খুশি হয়ে উঠেছে। পিয়ানোয় গিয়ে বসল রমা।

ডিনার-টেবল থেকে উঠে ওপরে এসেই ফকির বললে, 'খিদে পেয়েছে।'

সুজিত বললে, 'বলো কী হে?' এই মাত্র যে ডিনার-টেবিল থেকে উঠে এলে?'

'উঠে এলুম তো কী হল?' ফকির বেশ রাগত ভাবে বললে, 'খাবার চোখে দেখলেই পেট ভরে না কি?'

'চোখে দেখলে মানে?'

'চোখেই তো দেখলাম। ওই ছুরি কাঁটা দিয়ে মুখে কিছু তোলা যায়? তোমার সঙ্গে এসেই এই দুর্দশা। জেলে তো যেতেই হবে, তার আগে পেটটাও ভরল না! আমি এখানে কিছুতেই থাকব না।'

সুজিত সান্ত্বনাছলে বললে, 'আহা! ব্যস্ত হচ্ছ কেন? তোমার খেতে পেলেই তো হল?'

'নাঃ, আমার খাবার আর দরকার নেই। ঢের সুখ হয়েছে, আমি চললাম।'

'এরই মধ্যে কোথায় চললেন ফকিরবাবু?'—রায়বাহাদুর ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে বললেন, 'খেয়ে-দেয়ে একটু বিশ্রাম করুন।'

ফকির তিক্ত-বিরক্ত কণ্ঠে বলে উঠল, 'আজ্ঞে না, খাওয়া হয়েছে, আর বিশ্রামের দরকার নেই।'

অধরনাথ বিস্মিত, বিব্রত হয়ে সুজিতের মুখের দিকে চাইলেন। সুজিত তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'ফকিরচাঁদের একটা বদ অভ্যাস আছে রায়বাহাদুর, বেশি খাওয়ার পর ও বিশ্রাম করতে পারে না, একটু ঘুরে বেড়ানো ওর চাইই—'

অধরনাথ বললেন, 'বেশ তো। আপনাদের এখনও বাড়িটাই দেখানো হয়নি। আসুন না ঘুরেটুরে সব দেখবেন।'

সুজিত বললে, 'তাই চলো না ফকিরচাঁদ, ঘুরেটুরে খাওয়াও হজম হবে, বাড়িটাও দেখা হয়ে যাবে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ আমিও তাই বলছি।'

রায়বাহাদুর উৎসাহ করে ওদের বাড়ি-ঘর দেখাতে নিয়ে গেলেন। ওপর থেকে নিচে, এ-ঘর থেকে ও-ঘর। ফকিরচাঁদের ক্ষুধার তাড়না ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠতে লাগল, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পা দুটো ব্যথা করতে লাগল, কিন্তু মুখ ফুটে কিছুই বলতে পারলে না। এই ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে সুজিতের একটা মতলব ছিল এবং মতলবটা ফকিরচাঁদের জন্যই, কিন্তু ফকির তার কিছুই বুঝতে না পেরে মনে-মনে সুজিতের আদ্যশ্রাদ্ধ করতে লাগল।

নিচেতলায় এসে সুজিত খানিক পরে বললে, 'কী হে, পিছিয়ে পড়ছ কেন ফকিরচাঁদ? এতক্ষণে খাওয়া হজম হয়ে গেছে নিশ্চয়!'

ফকির গোমড়া মুখে জবাব দিলে, 'হ্যাঁ।'

'আবার খিদে পেয়ে থাকে তো বলুন?'—রায়বাহাদুর জিজ্ঞাসা করলেন।

ফকির দাঁতে-দাঁত চেপে জবাব দিলে, 'আজ্ঞে না।'

সুজিত বললে, 'আচ্ছা রায়বাহাদুর, আপনার বাড়ির সব তো দেখা হল। কিচেনটাই বা বাদ যায় কেন? ভাঁড়ার বা রান্নাঘর এগুলোও একবার দেখা দরকার।'

ফকির প্রতিবাদ জানাল, 'না, না, ভাঁড়ার বা রান্নাঘর দেখবার কোনও দরকার নেই।'

রায়বাহাদুর বললেন, 'না, না, ভাঁড়ার রান্নাঘরটাও দেখুন না; যতদূর সম্ভব আধুনিক ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করেছি।'

সুজিত বললে, 'খাওয়া তো হজম হয়ে গেছে, আর ভয় কী ফকিরচাঁদ। চলো, চলো।'

রায়বাহাদুর ওদের নিয়ে কিচেনে এলেন। সত্যিই একেবারে আধুনিক ব্যবস্থা। ইলেকট্রিক উনুন থেকে, রেফ্রিজারেটর পর্যন্ত কিছুই বাদ যায়নি। মিটসেফের ভেতর ঝকঝকে কাঁচের প্লেটে নানাবিধ খাদ্যবস্তু থরে-থরে সাজানো। ফকিরের রসনা জলময় হয়ে উঠল, নিশ্বাস পড়তে লাগল ঘন-ঘন। রায়বাহাদুর যদি দু-মিনিটের জন্যেও ঘরের বাইরে যেতেন, তা হলেই...

রায়বাহাদুর রেফ্রিজারেটর খুলে তার কায়দা-কানুনগুলো দেখাচ্ছিলেন।

শেলফের ওপর কয়েকটা ট্রে-তে কেক-পেস্ট্রিজ প্রভৃতি সাজানো ছিল, সুজিত সে দিকে ফকিরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললে, 'বাঃ চমৎকার! দেখলে খিদে পায়, কী বলো?'

ফকির বিরক্তভাবে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে মনে-মনে সুজিতের মুণ্ডুপাত করতে লাগল। সুজিত বললে, 'খাওয়া সম্বন্ধে ফকিরচাঁদের বৈরাগ্য বড় বেশি রায়বাহাদুর—'

রায়বাহাদুর হাসতে-হাসতে ফকিরের দিকে চাইলেন। সুজিত সেই অবসরে খানকয়েক কেকের টুকরো তুলে নিয়ে ফকিরের হাতে গুঁজে দিল। রায়বাহাদুর দেখতে পেলেন না, রেফ্রিজারেটর বন্ধ করে ওদের নিয়ে বেরিয়ে এলেন।

ওরা কিচেন থেকে বেরোতেই দেখা গেল মায়া তাদের দলবল নিয়ে অভিনয়ের জন্যে সেজে-গুজে এই দিকেই আসছে। রায়বাহাদুরকে দেখেই মায়া ছুটে এল তাঁর কাছে, বললে, 'বাঃ, আমাদের প্লে দেখবে না বাবা? এস শিগগির।'

'এই যে যাচ্ছি মা। চলুন ডাঃ রায়।'

'তোমরা দেরি কোরো না যেন। এস শিগগির—'

বলতে-বলতে মায়া তার দলবল নিয়ে ছুটল হলঘরের দিকে।

ফকির তার কেক-সমেত হাতখানা পকেটে পুরে কী করে সেগুলোর সদব্যবহার করা যায় তারই উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করছিল। রায়বাহাদুর বললেন, 'আসুন ফকিরবাবু।'

ফকির চমকে উঠল, তাবপর মরিয়া হয়ে বললে, 'মাফ করবেন, আমি একটু পবে যাচ্ছি।'

উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করে সে ওপরে উঠে এল তাদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরে।

নিচের হলঘরটির একপ্রান্তে ছোট্ট একটি স্টেজ বেঁধে ছেলেমেয়েদের অভিনয়ের আয়োজন করা হয়েছিল। রায়বাহাদুর সুজিতকে নিয়ে যখন হলে ঢুকলেন তখন অভিনয় শুরু হয়ে গেছে, একটা নাচ চলছে। রমা, রাজলক্ষ্মী এবং আমন্ত্রিতরা যে যার আসন দখল করে বসেছেন। মঞ্জু স্টেজের সামনে—ঠিক দর্শকদের সামনে বসে নাচের সঙ্গে পিয়ানো বাজাচ্ছে।

স্টেজের ওপর নাচছিল মায়া। নাচ শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই সেখানে সাহেবি পোশাক পরা একটি তরুণের আবির্ভাব হল। তরুণ ছেলেটি বলে উঠল, 'তোমার নাচ চমৎকার হয়েছে প্রীতি! (মায়া যে ভূমিকাটিতে অভিনয় করছিল তাব নাম প্রীতি) আমার ইচ্ছে হচ্ছে তোমায় একবার ইউরোপটা টুর করিয়ে নিয়ে আসি। অন্তত ভারতবর্ষের সব শহরগুলোয় একটা করে Show দিলে ক্ষতি কী!'

প্রীতি ঃ 'আমি তো বাইরে কোথাও নাচি না।'

তরুণ ঃ 'নাচো না! What a waste of salent কেন নাচবে না বলো দেখি? তোমার এই আর্ট, এ কী শুধু ঘরের? এ যে বাইরের, বিশ্ববাসী সকলের জন্য। এতবড় একটা প্রতিভা লুকিয়ে রাখা অপরাধ।'

প্রীতি ঃ 'কিন্তু সংসারে আরও বড় কাজও তো আছে। সেগুলো অবহেলা করা অপরাধ নয় কি?'

তরুণ ঃ 'কিছু না, কিছু না। সমাজ সংসার সব ভাসিয়ে দাও, খালি নাচো আর নাচাও। মনে রেখো, বিশ্ব তোমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে।'

প্রীতি ঃ 'বিশ্বকে তাহলে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে বলবেন।'

প্রীতি ওরফে মায়া চলে গেল। ছেলেটি বোকার মতো স্টেজের ওপর দাঁড়িয়ে রইল। দর্শকদের করতালির মধ্যে যবনিকা নেমে এল।

রমা তার চেয়ারটা সুজিতের কাছে টেনে এনে বললে, 'এসব ছেলেমানুষি আপনার খুব খারাপ লাগছে বোধহয়?'

সুজিত বললে, 'মোটেই না। ছেলেমানুষি আমার অত্যন্ত ভালো লাগে, বিশেষত তা যদি ছেলেমানুষের হয়।'

রায়বাহাদুর হাসতে-হাসতে বললেন, 'আপনি বড় চমৎকার কথা বলেন ডাঃ রায়! বিনোদের কাছে শুনে আমার কিন্তু আপনার সম্বন্ধে একেবারে অন্যরকম ধারণা ছিল।'

সুজিত ঘাবড়ে গিয়ে বললে, 'বিনোদ? কে বিনোদ—?'

'ওই যে আমাদের বিনোদ—'

রায়বাহাদুর আর কিছু বলা দরকার মনে করলেন না। সুজিতও তার কর্তব্য ঠিক করে ফেললে, প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠল, 'ও আমাদের বিনোদ, তাই বলুন, না ওর কোনও কথা শুনবেন না। লোকটা এ পর্যন্ত আমাকে চিনতে পারল না। সত্যি কথা বলতে কী আমরা পরস্পরকেই ভালো করে চিনতে পারিনি।'

রায়বাহাদুর বললেন, 'কাল বিনোদ এলেই আমি সে-কথা বলব। বলব—ছেলেবেলা থেকে জানো—তার খুব পরিচয় দিয়েছিল তো?'

সুজিতের মুখ শুকিয়ে এসেছিল, তবুও সে উৎসাহের ভাবটা বজায় রেখেই বললে, 'নিশ্চয় বলবেন, বলা উচিত।...কালই তিনি আসছেন বুঝি?'

'হ্যাঁ, টেলিগ্রাফ করে তো তাই জানিয়েছে। অবশ্য কাজটা তার অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে। কাল আপনাকে সঙ্গে করে আনাই তার উচিত ছিল। সঙ্গে তো আসেইনি, টিকিটটা পর্যন্ত কিনে দেয়নি...ছি, ছি!'

'যাক, যা হবার তা হয়ে গেছে। ওকথা আর তুলবেন না। হয়তো বিনোদবাবু এলে আমাদের আসা আর হয়ে উঠত না।'

রায়বাহাদুর সুজিতের কথার গূঢ় অর্থটা ধরতে পারলেন না, কিন্তু কোথায় যেন একটা খটকা লাগল, তিনি একটু আশ্চর্য হয়ে সুজিতের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'আজ্ঞে...।'

সুজিতও ভুল শোধরাবার চেষ্টা করল, 'না, বলছিলাম, একসঙ্গে আসা হয়তো আমাদের ভাগ্যে নেই। তবে কাল বিনোদবাবু নিশ্চয়ই আসছেন, কি বলুন?'

রায়বাহাদুর বললেন, 'না এসে যাবে কোথায়!'

'ঠিক, না এসে যাবে কোথায়!' সুজিত এবার তাড়াতাড়ি মুখটা ঘুরিয়ে নিল মঞ্জুর দিকে, হাসবার চেষ্টা করে বললে, 'আপনি এত চমৎকার বাজান তা জানতাম না।'

'আমার সম্বন্ধে আর সব কথাই বুঝি জানতেন?'—মঞ্জু বললে।

'না, কিছুই জানতাম না, সেটাই তো আফশোস।'

'জেনেও আফশোস করবেন হয়তো।'

'আফশোস যখন করতেই হবে, তখন না জেনে করার চেয়ে জেনে করাই ভালো নয় কী?'

'আপনার যা অভিরুচি।'

মঞ্জু ঠাট্টা করল কিনা বোঝা গেল না। সুজিত একটু চুপ করে থেকে বললে, 'বললে বিশ্বাস করবেন না, অভিরুচি প্রবল, কিন্তু অবসর মিলবে কী না তাই ভাবছি।'

কথাটা ভালো বুঝতে না পরে মঞ্জু একটা সন্দিহান দৃষ্টি নিক্ষেপ করল সুজিতের মুখে। মঞ্চের ওপর যবনিকা উঠল। অগত্যা সেই দিকেই মন দিতে হল সকলকে।

ফকিরচাঁদ মায়াদের অভিনয় দেখতে যাবার সময় করে উঠতে পারেনি। সুজিতের সংগৃহীত কয়েকখানা কেক উদরস্থ করে এবং তার সঙ্গে পূর্ণ দুটি গ্লাস জল সংযোগ করে সারাদিনের পরিশ্রম ও দুশ্চিন্তা-জনিত অবসাদে হঠাৎ কীরকম মুহ্যমান হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়েছিল—আর ওঠবার চেষ্টা করেনি। অভিনয় দেখে সুজিত যখন ওপরে উঠে এল ফকির তখন ঘুমের সমুদ্রে সাঁতার কাটছে। সুজিতও যথেষ্ট ক্লান্তি বোধ করছিল, ফকিরকে না জাগিয়ে সেও নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ল।

ঘুমের সমুদ্রে ভাসতে-ভাসতে ফকিরচাঁদ স্বপ্ন দেখছিল—নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য, চোষ্য, লেহ্য এবং পেয়, থরে-থরে তার চারিদিকে সাজানো, শুধু সাজানো নয়, এত কাছে যে হাত বাড়ালেই সেগুলি সোজা মুখগহ্বরে চলে আসতে পারে। এই পরম লোভনীয় দৃশ্য দেখতে-দেখতে ফকির উত্তেজিত হয়ে উঠে বসল বিছানায় ওপর। উত্তেজনার আতিশয্যে ঘুমটা ভেঙে গিয়েছিল; ফকির চোখ মেলার সঙ্গে-সঙ্গে সবিস্ময়ে আবিষ্কার করল যে খাওয়ার জিনিস মনে করে সে মাথার বালিশটা কখন প্রাণপণে কামড়ে ধরেছে। ক্ষুব্ধ মর্মাহত ফকির বালিশটা ছুঁড়ে ফেলে বিছানা থেকে নামল। কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে ঢক-ঢক করে খেয়ে ফেলল। তারপর অস্থিরভাবে খানিক ঘুরে বেড়ালো ঘরের মধ্যে—মুখ দেখে মনে হল সে যেন জীবনের সর্বাপেক্ষা দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চলেছে, হিটলারের রাশিয়া আক্রমণের সঙ্কল্পের মতো একটা কিছু।

এত বড় একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে ফকিরের মিনিট দুয়েকের বেশি সময় লাগল না। ভেজান দরজা খুলে ফকিরচাঁদ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। ফকিরের বালিশ ছুঁড়ে ফেলার শব্দে সুজিতের ঘুম আগেই ভেঙে গিয়েছিল, এতক্ষণ সে নিজের বিছানায় পড়ে নিঃশব্দে তার বিচিত্র কার্যকলাপ লক্ষ করছিল। ফকির ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে সেও বিছানা ছেড়ে তার সঙ্গ নিল।

দেখা গেল ফকির সিঁড়ি দিয়ে নেমে নিচে এল। তারপর চলল কিচেনের দিকে। নিচেতলার আলো নেভানো ছিল, ফকির অন্ধকারে হাতড়াতে-হাতড়াতে সুইচ খুঁজতে লাগল। হঠাৎ পা লেগে কী একটা জিনিস সশব্দে পড়ে গেল। ফকির আড়ষ্ট হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর আবার খুঁজতে-খুঁজতে একটা সুইচের সন্ধান পেল। আলো জ্বলতে সে দ্রুত পদে লক্ষস্থলের দিকে অগ্রসর হল। সুজিত একটু তফাতে থেকে অনুসরণ করছিল, ফকির জানতে পারলে না।

ওপরে মঞ্জু তার ঘরে শুয়ে ইংরেজি একটা গল্পের বই পড়ছিল, ফকিরচাঁদের অসাবধানতায় নিচে যে শব্দ হয়েছিল সেটা তার কানে গেল। কৌতূহলী হয়ে সে বিছানা থেকে উঠে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। দেখল নিচে আলো জ্বলছে। আরও কৌতূহলী হয়ে সে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে শুরু করল।

ফকিরচাঁদ তখন রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। আলোও জ্বালা হয়েছে। ঘন-ঘন নিশ্বাস পড়ছে ফকিরের, খাবার জিনিস ছাড়া আর কোনও কথা তার মনে নেই, চোখের সামনে যা কিছু পাওয়া গেল তাই দু-হাতের মুঠোয় ভর্তি করে সে ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার জন্যে ফিরে দাঁড়াতেই দেখল, সুজিত দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে হাসছে।

বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে ফকিরচাঁদ বোধহয় চেঁচাতে যাচ্ছিল, হঠাৎ বাইরে সেই সময় মঞ্জুর স্লিপারের শব্দ শোনা গেল। ফকিরের মুখ ছাই-এর মতো সাদা হয়ে গেল, সে কাঁদবে, চিৎকার করবে—না কোনও একটা আলমারির মধ্যে ঢুকে যাবে কিছুই ঠিক করতে পারল না। শেষ পর্যন্ত স্থির করলে, পালাবে। যা থাকুক কপালে, পালাবে। ফকির দৌড় দেবার চেষ্টা করতেই সুজিত তার গেঞ্জি টেনে ধরল, চাপা গলায় বললে, 'আহম্মক! এখন পালাবে কোথায়?'

ফকির বললে, 'তা হলে—?'

সুজিত বললে, 'শোনো যা বলি। কে আসছেন তা জানি না, কিন্তু তাঁকে আমি যা বলব তুমি শুধু মুখ বুঁজে শুনে যাবে। হ্যাঁ, না, কিছু বলবে না, চোখের পাতা যদি না ফেলে থাকতে পারো তা হলে আরও ভালো হয়।'

পায়ের শব্দ রান্নাঘরের দরজায় এসে থামল। তারপর শোনা গেল মঞ্জুর গলা, 'ভেতরে কে?'

পর মুহূর্তেই মঞ্জু ভিতরে ঢুকল।

ঘুমের ঘোরে মানুষ যেমন ভাবে উঠে দাঁড়ায়, দেখা গেল ফকির ঠিক সেই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। মঞ্জু কী বলতে যাচ্ছিল, সুজিত ইশারা করে তাকে কথা বলতে নিষেধ করল।

ফকির ঠিক তেমনি ভঙ্গিমায় এগিয়ে যেতে লাগল।

মঞ্জুর মতো মেয়েও অবাক হয়ে গিয়েছিল, সুজিতের কাছে সরে এসে চাপা গলায় প্রশ্ন করলে, 'ব্যাপার কী?'

'চুপ করুন, এখুনি জেগে উঠবে।'

ফকির ঠিক সেইভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মঞ্জু জিজ্ঞাসা করলে, 'কে জেগে উঠবে? আপনার বন্ধু কি ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে হাঁটছেন নাকি?'

'ওই তো বিদঘুটে রোগ।'—সুজিত গম্ভীরভাবে বললে।

মঞ্জু বললে, 'তা জাগিয়ে দিন না। রোগ সেরে যাবে।'

সুজিত মুখ-চোখে একটা আতঙ্কের ভাব এনে বললে, 'সর্বনাশ! জাগিয়ে দিলে আর রক্ষে আছে! জেগে উঠলেই একেবারে অজ্ঞান—আর জ্ঞান হবে না। তাইতো পিছনে-পিছনে থেকে সাবধানে পাহারা দিতে হয়।'

'কিন্তু...ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে হঠাৎ কিচেনে...'

'কিচেনে ঢুকেছিলেন আমাদের সৌভাগ্য! ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে ও কোথায় না যেতে পারে—কিছু বলবার তো জো নেই। বললেই জেগে উঠবে আর জেগে উঠলেই জ্ঞান থাকবে না।'

'এ রোগ ওঁর কত দিন?'—মঞ্জুর কথার ভঙ্গিতে এবার যেন একটু সন্দেহের খোঁচা।

সুজিত বললে, 'তা অনেক দিনের। কেন বলুন তো? আপনি কোনও ওষুধ-টষুধ জানেন নাকি?'

'এখন না! জানলেও আশা করি ভেবে একটা কিছু বার করতে পারব।'

'আপনার কাছে তা হলে চিরকৃতজ্ঞ থাকব। আচ্ছা নমস্কার। দেখি আবার কোথায় গেল।'

সুজিত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। মঞ্জু কতকটা নিজের মনেই বললে, 'হুঁ, রোগ বেশ

কঠিন বলেই মনে হচ্ছে।'

ওপরে এসে ঘরে ঢুকে সুজিত দরজা বন্ধ করলে। ফকির আগেই এসে বিছানার ওপর গালে হাত দিয়ে বসেছিল। সুজিতকে দেখেই সে আর্তকণ্ঠে বলে উঠল, 'সারাদিন, সারারাত উপবাস। তুমি বলো কী। আমি কাল সকালেই চলে যাব। আর একদণ্ড নয়।'

সুজিতও উত্যক্ত হয়ে উঠেছিল, ভাবনাও জাগছিল নানারকম। বিশেষ বিনোদবাবুর আসবার কথাটা শোনবার পর থেকে। বিছানার ওপর ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে দিয়ে সুজিত বললে, 'এখন প্রস্তাবটা তোমার মন্দ ঠেকছে না ফকিরচাঁদ!'

'তা হলে তুমি যাবে?'—ফকির উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

সুজিত বললে, 'থাকবার সম্ভাবনা বিশেষ উজ্জ্বল বলে মনে হচ্ছে না। বিনোদবাবু কাল সকালেই আসছেন, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎটা তেমন প্রীতিকর হবে কি?'

'নাঃ, যাওয়াই ভালো ফকিরচাঁদ। তবে কী জানো...না, থাক।'

সুজিত একটা দীর্ঘনিশ্বাস চাপবার চেষ্টা করল।

সকাল বেলা। ট্রেন এসে থেমেছে একটা বড় স্টেশনে।

ট্রেনের দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় নটবর লাহিড়ী এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গরা নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুচ্ছে। নিশ্চিন্ত মনে মানে, গত রাত্রে অত্যধিক তরল পদার্থ সেবনের ফলে এখন দিন না রাত সেটুকু পর্যন্ত বোঝবার ক্ষমতা তাদের নেই।

নটবর লাহিড়ী ঘুমোচ্ছিল নিচের বাঙ্কে। একজন টিকিট-চেকার উঠে কামরার অবস্থা দেখে কিছুক্ষণ হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর নটবব লাহিড়ীর কাছে গিয়ে ডাকল, 'ও মশাই উঠুন না, দয়া করে টিকিটটা দেখান।'

নটবর একবার আরক্ত চোখ মেলে চাইল বটে, কিন্তু তখনই আবার পাশ ফিরে শুতে-শুতে বললে, 'যান, যান, ঘ্যান-ঘ্যান করবেন না! টিকিট! টিকিট আবার কীসের? সব টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে।'

ওপরের বাঙ্ক থেকে নটবরের একজন সঙ্গী জড়িত কণ্ঠে বলে উঠল, 'বুকিং Closed মশাই। ফুল হাউস। নটবর লাহিড়ী স্বয়ং থিয়েটারে নামছে। তিনদিন আগে টিকিট কিনে রাখেননি কেন?'

টিকিট-চেকার চটে উঠল, 'বাজে বকছেন কেন মশাই? কী নটবর লাহিড়ী দেখাছেন? আপনাদের রেলের টিকিট বার করুন।'

'রেলের টিকিট! oh I see'—নটবর এবার পকেট হাতড়ে টিকিট বার করলে, তারপর জিজ্ঞাসা করলে, 'কিন্তু রেলের টিকিট একেবারে রংপুরে গিয়ে দেখালে হবে না?'

'রংপুর!' টিকিট-চেকার আশ্চর্য হয়ে বললে, 'রংপুর তো কাল ছেড়ে এসেছেন।'

নটবর বোধহয় কথাটার তাৎপর্য সম্পূর্ণ উপলব্ধি করলে না, বললে, 'ছেড়ে এসেছি বলে কি আর দেখা পাব না! একি কাজের কথা হল। My dear checker, are you the chancellar of the Exchepuer !'

নটবরের মুখ দিয়ে তখনও ভক-ভক করে মদের গন্ধ বেরুচ্ছিল।

চেকার ধমকে উঠল, 'মাতলামি রাখুন। এতো সব রংপুরের টিকিট। আপনাদের সব excess fair with fine লাগবে।'

ওপরের বাঙ্কের লোকটি শেকল ধরে টলতে-টলতে কোনওরকমে নিচে নেমে এল।

তারপর চেকারকে বললে, 'excess fair কেন? জোচ্চুরি পেয়েছ বাবা? চাই না আমরা এমন ট্রেনে চড়তে, আমাদের যেখান থেকে এনেছ সেইখানে পৌঁছে দাও, ব্যস!'

চেকার বললে, 'চালাকি রাখুন মশাই। গোলমাল করলে এখুনি পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দিতে পারি জানেন?'

নটবরের দলের আর একজন এতক্ষণ নির্বিকার চিত্তে ঘুমুচ্ছিল, পুলিশ কথাটা কানে যেতেই সে ধড়মড় করে উঠে বসল...চেকারের মুখের দিকে টকটকে রাঙা দুটি চোখ মেলে চাইল কিছুক্ষণের জন্য...কী বুঝলে সেই জানে, হঠাৎ উঠে পড়ে দৌড় দিল দরজা লক্ষ করে...চেকার তাকে ধরে ফেললে।

'পালাচ্ছেন কোথায়? excess fair-এর টাকা কে দেবে?'

লোকটা বিনা বাক্যব্যয়ে পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করে বললে, 'আমি দিচ্ছি বাবা, আমি দিচ্ছি। যা তোমার ধর্মে হয় কেটে নাও, পুলিশ ডেকো না।'

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে ফকিব দেখল সুজিত তার বিছানায় নেই, মুখ শুকিয়ে উঠল ফকিরের। তাড়াতাড়ি জামাটা গায়ে দিয়ে নিচে নেমে এল। খোঁজ নিয়ে জানা গেল সুজিত বাগানের দিকে গেছে। বাড়ির সংলগ্ন মস্ত বাগান, ফকির তাড়াতাড়ি সেখানে ছুটল। সুজিতকে আবিষ্কার করে বললে, 'বেশ লোক তো তুমি? আমি ঘুম থেকে উঠে তোমায় চারিদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, আর তুমি দিব্যি বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছ? এখন বাগানে বেড়াবার সময়?'

'অতি প্রশস্ত সময় ফকিরচাঁদ।' সুজিত হাসতে-হাসতে বললে, 'প্রাতে বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের মতো উপকারী স্বাস্থ্যের পক্ষে আর কিছু নেই।'

ফকির বললে, 'কাল থেকে সারা দিনরাত—আমি প্রায় বায়ু সেবন করেই আছি, সে খেয়াল আছে? আজ সকালে না আমাদের পালাবার কথা?'

'হুঁ, তাই তো ভাবছি।'

'এখনও ভাবছ? আর ভাববার সময় আছে? তোমার বিনোদবাবু কখন আসছেন?'

'তাই তো ভাবছি।...আচ্ছা ধরো, বিনোদবাবু তো কোনও কারণে নাও আসতে পারেন। পৃথিবীতে নিত্য কতরকম ঘটনাঃ ঘটছে—ভূমিকম্প, বজ্রাঘাত, ট্রেন দুর্ঘটনা, নিদেনপক্ষে কলার খোসায় পা পিছলে পড়ে যাওয়া—তুমি বলতে চাও বিনোদবাবু—ভগবান না করুন, একটা কিছুও হবে না?'

সুজিতের কথাবার্তা এবং ভাবগতিক দেখে মনে হল না যে তার যাবার কোনও রকম তাড়া আছে। ফকির চটে উঠে বললে, 'জানি না আমি—তুমি তা হলে যাবে না, আমি বুঝতে পারছি।'

বলতে-বলতেই দেখল রায়বাহাদুর এইদিকেই আসছেন; ফকির বললে, 'আর যাওয়া হয়েছে! ওই যে তোমার রায়বাহাদুর এইদিকেই আসছেন। একটা কেলেঙ্কারি না হয়ে আর যায় না।—বলে সে সরে পড়ল।'

রায়বাহাদুর কাছাকাছি এসে বললেন, 'এই যে ডাক্তার রায়। আপনারও বুঝি প্রাতঃভ্রমণের বাতিক আছে।'

সুজিত বললে, 'আজ্ঞে ভ্রমণটাই আমার একটা বাতিক, তা সকালই কী আর মধ্যাহ্নই কী?'

রায়বাহাদুর হাসতে-হাসতে বললেন, 'দেখুন যত আলাপ হচ্ছে ততই আপনাকে আমার বড় ভালো লাগছে। আপনি যে অত বড় আমেরিকা ফেরত ডেন্টিস্ট তা মনেই হয় না।'

সুজিত একটু খটকায় পড়ল। লোকটা কি সন্দেহ করছে নাকি? না, মুখ দেখে তা মনে হয় না। সুজিত সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠল, 'তা আপনার মনে করবার দরকার কী! মনে করুন না, আমি কেউ নয়, একটা বাউণ্ডুলে ভবঘুরে।'

'কী যে বলছেন?' 'না, না, আমি তা বলছিনে, কিন্তু আপনার অমায়িক ব্যবহারে আমি সত্যিই মুগ্ধ। আর দেখুন, একটা কথা কাল থেকে আমি আপনাকে বলি-বলি মনে করেও বলতে পারছি না।'

'কী কথা?' সুজিতের মুখের ধার-করা হাসির ওপর ভাবনার ছায়া পড়ল। কিন্তু মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণেই সে হাসতে-হাসতে বললে, 'যা বলবার বলে ফেলুন। আমার সবরকম কথাই গা সওয়া আছে। এখন না বললে আর হয়তো বলবার সময় নাও পেতে পারেন।'

'সে কী কথা! আপনি তো কনফারেন্সের পর কয়েকদিন থেকে যাবেন বলেছিলেন। জরুরি কোনও দরকার পড়েছে নাকি?'

মনে-মনে বিনোদকে কল্পনা করলে সুজিত, তারপর বললে, 'না, এখনও ঠিক পড়েনি, তবে বলাও যায় না।—যে-কোনও মুহূর্তে পড়ে যেতে পারে।'

'সেটা কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা হবে ডাঃ রায়। আমরা বিশেষ ভাবে আশা করে আছি যে আপনার সঙ্গ আমরা কিছুদিন পাব।'

সুজিত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'আপনাদের নিরাশ করতে আমিও মনে ব্যথা পাব। তবে সবই নির্ভর করছে ঘটনার ওপর—কিম্বা দুর্ঘটনার ওপরও বলতে পারেন।'

রায়বাহাদুর কথাটা বুঝতে পারলেন না। ভারি ধোঁয়াটে কথা ডাক্তারের। তিনি সবিস্ময়ে সুজিতের মুখের দিকে চাইলেন।

সুজিত বললে, 'সত্যি কথা বলতে কী, আমি একটা দুর্ঘটনার জন্যেই অপেক্ষা করছি—মারাত্মক না হোক, একটা ছোটখাটো দুর্ঘটনা।'

রায়বাহাদুর বিস্ময় আর চাপতে পারলেন না, সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি আবার জ্যোতিষ-টোতিষেও বিশ্বাস করেন নাকি? দুর্ঘটনা ঘটবে কি না আগে থেকে কেউ বলতে পারে?'

'ঘটবে না তাই বা কে বলতে পারে।'

পরম দার্শনিকের মতো উদাস একটা ভাব নিয়ে সুজিত চলে এল সেখান থেকে।

হলঘরে পৌঁছে সুজিত দেখল, মঞ্জু কাঠের সিঁড়ির রেলিঙের মাথা থেকে সড়াৎ করে গড়িয়ে একেবারে নিচে নেমে এল। এটা তার অনেক দিনের অভ্যাস। জায়গাটা নিরিবিলি থাকলেই সে এই ভাবে ওপর থেকে নিচে নামবার কসরৎ করে। আজও নিরিবিলি ভেবেই রেলিং দিয়ে নেমেছিল। কিন্তু নেমে এসে দেখল সিঁড়ির তলায় দাঁড়িয়ে সুজিত তার দিকে চেয়ে হাসছে। চমকে উঠল মঞ্জু, রাগও হল একটু।

মঞ্জু উঠে দাঁড়াতেই সুজিত বললে, 'প্রাতঃপ্রণাম!'

মঞ্জু কোনওরকমে একটা প্রতিনমস্কার জানাল বটে, কিন্তু কথা কইল না।

সুজিত নিজেই মৌনভঙ্গের চেষ্টা করল, সিঁড়ির রেলিং জিনিসটার সার্থকতা এতদিনে বুঝতে পারলাম। এর আগে ওটাকে বিপদের বেড়া বলেই জানতাম।

মঞ্জু এবারও কোনও কথা বলল না, বরং চলে যেতে উদ্যত হল।

সুজিত পিছন থেকে ডাকল, 'শুনুন—'

মঞ্জু ঘুরে দাঁড়াল চোখ-মুখে বিরক্তির ভাব নিয়ে।

সুজিত বললে, 'আপনাকে একটা আনন্দ সংবাদ দিচ্ছি। আপনার কাছে বোধহয় হারই মানতে হল শেষ পর্যন্ত। ভেবে দেখলাম, এখান থেকে চলে যাওয়াই আমার উচিত।'

মঞ্জু এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললে, 'শুনে সুখী হলাম।'

সুজিত আশা করছিল তার চলে যাওয়ার সংবাদে মঞ্জুর মুখে হয়তো একটু ভাবান্তর ঘটতে পারে, কিন্তু তেমন কিছুই হল না। সে আবার বললে, 'একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—আমি যে দাঁতের ডাক্তার তা কি আপনি কিছুতেই ভুলতে পারেন না?'

মুহূর্তের জন্য মনে হল মঞ্জুর মুখের কাঠিন্য গলতে শুরু করেছে। কিন্তু না, ওটা সুজিতেরই মনের ভুল বোধহয়।

মঞ্জু বললে, 'না, তা ভুলব কেন?'

'না, ধরুন আমি যদি দাঁতের ডাক্তার না হতাম, তা হলে আপনার এতটা চক্ষু-পীড়ার কারণ থাকত কি?'

মঞ্জু বললে, 'কী হলে কী হতো তা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আমার নেই।'

সুজিত ঘাবড়াল না, আজ সে ব্যাপারটা খানিকটা—মানে যতদূর সম্ভব পরিষ্কার করতে বদ্ধপরিকর। সে বললে, 'কিন্তু সুবিচার করবার ধৈর্যও কি আপনার নেই? দেখুন দাঁতের ডাক্তার হওয়াটা আমার জীবনে দৈব দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছু নয়। আমার তাতে সত্যি কোনও হাত নেই। এমনকী চিরকালের মতো ডাক্তারিটা অস্বীকার করতেও আমি প্রস্তুত।'

'এসব কথা আমার শোনবার কি কোনও প্রয়োজন আছে?'

'শুধু দাঁতের ব্যথার সময় আমার কথা আপনার মনে পড়বে এ আমি চাই না।'

'আপনার কথা আমার মনেই বা পড়বে কেন!'

মঞ্জু একটা নিস্পৃহ, নিরাসক্ত ভাব দেখিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

সুজিত সেইখানেই দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল। কী আশ্চর্য। হঠাৎ যে অন্যায়টা করে ফেলেছে ডাক্তার রায় সেজে—সেটা শোধরাবার জন্যে এখানে আসবার পর থেকে সে কত ভাবে কত চেষ্টাই না করল। রায়বাহাদুর থেকে আরম্ভ করে তাঁর এই আরবি ঘোড়ার মতো টগবগে দুরন্ত মেয়েটিকে সে আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টার ত্রুটি করেনি যে আসল ডাক্তার রায়ের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই...কিন্তু কেউ এখনও তাকে ভালো করে সন্দেহ পর্যন্ত করল না।

সুজিত দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে এই সব ভাবছে, হঠাৎ মনে হল বাইরে মঞ্জু যেন কার সঙ্গে কথা কইছে। সুজিত উৎকর্ণ হয়ে উঠল।

শোনা গেল মঞ্জুর গলা, 'এই যে বিনোদবাবু। বাবা আপনাকে খুঁজছিলেন।'

বিনোদবাবু বললেন, 'ডাক্তার রায় তা হলে ঠিক মতো পৌঁছেছেন?'

মঞ্জু, 'তা ঠিক পৌঁছেছেন। আপনার ডাক্তার রায় খোয়া যাবার জিনিস নয়?'

বিনোদ, 'না, তা নয়। তবে ডাক্তার রায় বড় নার্ভাস লোক কি না। গাড়ি থেকে নেমেই দেখা করতে আসছি। ভেতরে আছেন তো?'

মঞ্জু, 'তাই আছেন বলেই তো জানি। যান না—'

ভেতরে দাঁড়িয়ে সুজিত কথাগুলো শুনতে-শুনতে এই সকালবেলাতেই ঘেমে উঠেছিল। প্রথমে ভাবলে জানলা টপকে পালায়। কিন্তু না, সেটা নেহাত ছেলেমানুষি হবে। মন ঠিক করে ফেলতে সুজিত দেরি করল না। অত্যন্ত সঙ্কট অবস্থায় তার বুদ্ধিটা তাড়াতাড়ি খেলে।

বিনোদ ঘরে ঢুকতেই সুজিত বললে, 'আসুন বিনোদবাবু। আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি।'

বিনোদ আশ্চর্য হয়ে বললে, 'আমার জন্যে?...আপনাকে তো ঠিক...।'

সুজিত তার অস্ত্র ছাড়তে শুরু করল, 'আমাকে ঠিক চিনতে পারবেন না।'

'আপনি ডাক্তার রায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন তো?'

'হ্যাঁ, আমার মস্ত একটা ত্রুটি হয়ে গেছে। তাঁকে সঙ্গে করে কাল আসবার কথা ছিল।'

সুজিত দু-নম্বব ছাড়ল, 'তিনি তো সেই দুঃখই করছিলেন; দুঃখ কেন, অভিমানও বলতে পারেন। চলে যাওয়ার সময় সেই কথাই বলে গেলেন—।'

বিস্ময়ের আতিশয্যে বিনোদের বাটার ফ্লাই গোঁফটা প্রায় আধ-ইঞ্চি ওপরে উঠে গেল। 'তিনি চলে গেলেন নাকি? কই, মিস চ্যাটার্জি তো বললেন না!'

'বলতে বোধহয় তিনি লজ্জা পেলেন। ডাক্তার রায়ের যাওয়াটা একটু আকস্মিক কি না!'

'সে কী! কনফারেন্সে তিনি থাকবেন না নাকি? কী হল কী?'

'কী যে হল ঠিক বলতে পারব না। কিন্তু তিনি তো চলে গেলেন।'

'কোথায় চলে গেলেন? আর আসবেন না নাকি?'

'দেখে শুনে তো সেই রকমই মনে হল।'

বিনোদ ধপ করে একটা সোফার ওপর বসে পড়ল। গালে হাত দিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে-ভাবতে বললে, 'এখন উপায়? রায়বাহাদুর কী করলেন? তিনি যেতে দিলেন কী বলে?

সুজিত তিন নম্বর ছাড়ল, 'আমরাও তো তাই বলি। যেতে দেওয়া কোনওরকমেই উচিত হয়নি। বিশেষ ওরকম রাগারাগির পর।'

'রায়বাহাদুরের সঙ্গে ডাক্তার রায়ের বাগারাগি? কী বলছেন কী?'—বিনোদ উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াল।

'বলাটা অবশ্য আমার উচিত নয়'—সুজিত হাত কচলাতে-কচলাতে বলে চলল, 'তবে রায়বাহাদুরের পক্ষেও কাজটা ভালো হয়নি।'

বিনোদ খেপে উঠল, 'আমি রায়বাহাদুরের সঙ্গে এখুনি দেখা করে বলছি। তিনি তো এরকম ছিলেন না। অতবড় মাননীয় অতিথির সঙ্গে এই ব্যবহার?'

'সেই তো কথা। কিন্তু রায়বাহাদুরের সঙ্গে আপনার দেখা করাটা এখন বোধহয় উচিত হবে না।'

'কেন?'

'কাজটা করে ফেলে তিনি একেবারে মরমে মরে আছেন। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা আর তাকে দেবেন না। কোনওরকমে তিনি এখন ডাক্তার রায়কে ফিরিয়ে আনবার জন্য ব্যাকুল। আপনি চেষ্টা করলে বোধ হয় পারেন।'

'কিন্তু ফিরিয়ে আনব কোথা থেকে। কোথায় তিনি গেছেন তাও জানি না। এক আমি ছাড়া এখানে তিনি কাউকে তো চেনেনও না।'

'তা হলে আপনার কাছেই গেছেন হয় তো। আপনিই এখন আমাদের একমাত্র ভরসা বিনোদবাবু।'

বিনোদ বিস্মিত হয়েছিল, উত্তেজিত হয়েছিল, ক্ষুব্ধ হয়েছিল, এবার অভিভূত হল। সাদা-সিধে লোক, কাজ-পাগলা মানুষ, ডাক্তার রায়কে সম্মিলনীতে হাজির করতে পারলে পাঁচজনের তারিফ পাবার আশা আছে, না আনতে পারলে পাঁচজনের কাছে ছোট হতে হবে। বিনোদ তখনই রাজি হয়ে বললে, 'বেশ আমি চললাম। যদি ফিরিয়ে আনতে পারি তো রায়বাহাদুরকে আমি একবার দেখব। এখন আমি কিছু বলছি না'—হাত-পা নাড়ার আতিশয্যে বিনোদের কাঁধের চাদরটা কোটের ওপর থেকে পড়ে গিয়েছিল, সেটাকে যথাস্থানে স্থাপিত করে বিনোদ যাবার জন্যে পা বাড়াল।

ঠিক সেই সময় রায়বাহাদুর সেখানে হাজির হলেন।

'এই যে বিনোদ।'

বিনোদ গম্ভীর মুখে বললেন, 'আপনাকে এখন কিছু বলতে চাই না রায়বাহাদুর।'

এখন কিছু না বলবার কারণ কী হতে পারে রায়বাহাদুর তার কিছুই অনুমান করতে পারলেন না। অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'সে কী হে? চললে কোথায়?'

'এখন কিছু বলতে চাই না।'—বলতে-বলতে বিনোদ বেরিয়ে গেল উত্তেজিত ভাবে।

রায়বাহাদুর সুজিতের দিকে চেয়ে বললেন, 'কী ব্যাপার বলুন তো? বুঝতে পারছি না কিছু!'

সুজিত হাসতে-হাসতে হাসতে বললে, 'বুঝবার আর কী আছে রায়বাহাদুর। বিনোদবাবু চিরকালই কী-যেন একরকম!'

পূর্ণিমা থিয়েটারের সাজঘর। জন দুই ড্রেসার মিলে ডাক্তার রায়কে ইন্দ্রজিতের পোশাক পরাচ্ছে; চেলির কাপড়, জরিদার বেনিয়ান, মাথায় জরিদার পাগড়ি, কোমরে তলোয়ার কিছুই বাদ যায়নি। মেকআপ-ম্যান মুখে রং মাখিয়ে ঠোঁটের ওপর একজোড়া গোঁফ বসিয়ে তার কর্তব্য পালন করেছে। ফ্যালারাম ডাক্তারকে পাট মুখস্থ করাবার জন্যে খাতা হাতে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ডাক্তার বায় কিছুতেই রং মেখে সং সাজতে রাজি হচ্ছিলেন না, তাঁকে প্রায় ধরে-বেঁধে সাজানো হয়েছে।

সাজপোশাক শেষ হবার পর ড্রেসার বললে, 'আয়নায় চেহারাখানা একবার দেখুন স্যার—ঠিক কলকাতার মতো হল কিনা বলুন।'

আয়নায় নিজের চেহারা দেখে ডাক্তারেব কান্না পেতে লাগল। তিনি বললেন, 'এই পোশাক পরে কী করে বার হব?'

ম্যানেজার নকড়ি বললেন, 'কেন পোশাকটা খারাপ কীসের? কলকাতায় কী এমন সাচ্চা জরির পোশাক পরতেন? ওসব চাল এখানে দেখাবেন না মশাই।'

ফ্যালারাম বললে, 'নিন, নিন, আপনার পার্টটা আর একবার ঝালিয়ে নিন।'

ম্যানেজার বললেন, 'হ্যাঁ, ভালো করে পড়িয়ে দাও ফ্যালারাম, আর সময় নেই। আমি স্টেজটা দেখে আসি ততক্ষণ। ড্রপ উঠে গেল।'

নকড়ি উঠে গেলেন, ড্রেসার এবং মেকআপ-ম্যানও গেল তাঁর পিছনে-পিছনে।

ফ্যালারাম বললে, 'শুনুন, হিরোইন মানে ইন্দ্রজিৎ-পত্নীর গান শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আপনার প্রবেশ।'

'প্রবেশের পরেই একটা মূর্ছা হয় না?'—প্রশ্ন করে ডাক্তার করুণভাবে চাইলেন ফ্যালারামের দিকে।

ফ্যালারাম বললে, 'মূর্ছা কী মশাই? অত বড় বীর ইন্দ্রজিৎ রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে। সে অন্দরমহলে ঢুকে মূর্ছা যাবে কেন?'

'নাঃ, ভাবছিলাম তা হলে আর বেশি হাঙ্গামা থাকে না।'

ফ্যালারাম গরম হয়ে উঠল, 'আপনার চালাকি রেখে দিন, শুনুন, হিরোইন আপনাকে দেখে বলবে—'

"তবু ভালো, মনে তব পড়িয়াছে এতক্ষণে
দাসীরে তোমার, কিন্তু নাথ, রণসাজ
সাজে কি হেথায়, কত মধুরাতি যেথা
কাটায়েছ কুসুম-বাসরে।"

ডাক্তার চোখ কপালে তুলে বললেন, 'অ্যাঁ!'

'অ্যাঁ নয়, আপনি বলবেন,

"বাসর যাপিতে নয়, আসিয়াছি লইতে
বিদায়! বীরের প্রেয়সী তুমি,
রণসাজে আশঙ্কা কী হেতু?"

'নিন, বলুন।'

ডাক্তার রায় অসহায় ভাবে বলে উঠলেন, 'ওই অত কথা বলতে হবে? কবিতা যে আমার মুখস্থ হয় না।'

ফ্যালারাম খাতাখানা ছুঁড়ে ফেলে চেঁচিয়ে উঠল, 'এই রইল তা হলে আপনার পার্ট। আমার দ্বারা হবে না। আমি যাচ্ছি ম্যানেজারের কাছে।'

ফ্যালারাম বেরিয়ে গেল। ডাক্তার রায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলেন। এই বিচিত্র পোশাকে লোকের সামনে বেরোতে হবে? তার চেয়ে মৃত্যুও ভালো। ভাবতে-ভাবতে তিনি মন ঠিক করে ফেললেন। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, ডাক্তার রায় সাজঘর থেকে বেরিয়ে চোরের মতো পা টিপে-টিপে স্টেজের পিছন দিকে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

স্টেজের ওপর তখন সখীগণ পরিবেষ্টিতা ইন্দ্রজিৎ-পত্নী গান গাইছে আর সখীরা গানের সঙ্গে কোনওরকম সম্বন্ধ না রেখে ধুলো উড়িয়ে দুম দাম শব্দে নাচছে। ম্যানেজার উইংসের পাশ দিয়ে মুখ বাড়িয়ে একান্ত আগ্রহ ভরে এই নৃত্যগীত উপভোগ করছিলেন, ফ্যালারাম তাঁর কাছে এসে বললে, 'ঢের-ঢের বেয়াড়া অ্যাক্টর দেখেছি মশাই, আপনার নটবর লাহিড়ীর জুড়ি দেখিনি। ওকে পার্ট পড়ানো আমার কর্ম নয়।' ম্যানেজার উইংস ছেড়ে ভিতর দিকে পিছিয়ে গেলেন, তারপর বললেন, 'আরে ওসব চালাকি ওদের দস্তুর। স্টেজে বেরিয়ে ঠিক সিধে হয়ে যাবে দেখো। খালি নজর রেখো যেন পালাতে না পারে।'

ফ্যালারাম বললে, 'না পালাবে কোথায়? বাইরের সব দরজায় পাহারা।'

নকড়ি বললে, 'ঠিক আছে। চলো এইবার নিয়ে আসি—আর দেরি নেই। এই নাচের পরই তো ইন্দ্রজিতের প্রবেশ।'

ফ্যালারামকে নিয়ে নকড়ি এলেন সাজঘরের সামনে, বাইরে থেকে হাঁক দিলেন, 'আসুন লাহিড়ীমশাই, সময় হয়েছে।'

ভেতর থেকে কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। ম্যানেজার হন্তদন্ত হয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লেন, পিছনে ফ্যালারাম। কিন্তু ঘরের ভেতর কারও সন্ধান পাওয়া গেল না।

ম্যানেজার টাকে হাত বুলোতে-বুলোতে বললেন, 'গেল কোথায়?'

ফ্যালারাম বললে, 'এই খানিক আগেই তো ছিল।'

'হুঃ যত সব—'

বিরক্তিসূচক একটা শব্দ করে নকড়ি প্রায় ছুটতে-ছুটতে সাজঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কর্মচারীদের একজন সামনে দিয়ে যাচ্ছিল, নকড়ি জিজ্ঞাসা করলেন, 'লাহিড়ীমশাইকে দেখেছ? নটবর লাহিড়ী?'

'—আজ্ঞে না।'

'আজ্ঞে না!'—নকড়ি দাঁত মুখ খিঁচিয়ে চেঁচাতে শুরু করলেন, 'তা হলে জল-জ্যান্ত লোকটা গেল কোথায়, হাওয়ায় উবে গেল? বাইরের দরজায় কে পাহারায় ছিল?'

লোকটি বললে, 'আজ্ঞে, আমিই ছিলাম। সেখান দিয়ে মাছিটি পর্যন্ত গলে যায়নি।'

'তা হলে আমার সর্বনাশ করে লোকটা গেল কোথায়?'

ম্যানেজার পাগলের মতো চারিদিকে ছুটোছুটি শুরু করে দিলেন।

নটবর লাহিড়ীকে স্টেজে হাজির করতে না পারলে বিশ বছরের ম্যানেজারির গর্ব ধূলিসাৎ হবে, মুখে চুন-কালি মাখিয়ে ছাড়বে শহরের স্কুল কলেজের ছেলেরা।

অন্য একদিকের উইংসের ফাঁকে দাঁড়িয়ে গোবিন্দ এতক্ষণ বিস্ফারিত চোখে সখীদের নাচ দেখছিল। নকড়ি তাকে দেখতে পেয়েই সেখানে এসে হাজির হলেন।

'এই যে গোবিন্দ, বাবা গোবিন্দ, তোমার মনিবটি কোথায় বলো তো বাবা?'

গোবিন্দ ডাক্তার রায়ের অন্তর্ধান কাহিনির কিছুই জানত না, বললে, 'জানি না তো। আমি নাচ দেখছিলাম, ফাস্ট কেলাস নাচ।'

'নাচ না আমার গুষ্টির পিণ্ডি। এই নাচের পরেই ইন্দ্রজিতের প্রবেশ। লাহিড়ীমশাইকে খুঁজে না পেলে আমি যে দয়ে মজে যাব। সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

প্রম্পটার থেকে সিন-শিফটাররা পর্যন্ত সবাই এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল ম্যানেজারের চারিদিকে। ম্যানেজার তাদের লক্ষ করে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছ কী? খোঁজো না সব আহম্মকের দল। যেমন করে হোক তাকে খুঁজে বার করো।'

কর্মচারীরা সন্ত্রস্ত হয়ে এদিক-ওদিক ছুটল।

ম্যানেজার ফ্যালারামের দিকে চাইলেন, 'তুমি যাও, উইংসের ফাঁক থেকে সখীদের ইশারা করে বলে দাও নাচটা চালিয়ে যেতে।'

ফ্যালারাম বললে, 'নেচে-নেচে পা ধরে যাবে যে!'

ম্যানেজার হাত পা ছুঁড়তে-ছুঁড়তে বললেন, 'পা ধরে যায়, বসে-বসে নাচবে, শুয়ে-শুয়ে নাচবে—শুয়ে-শুয়ে ঘাড় ব্যথা হয়ে গেলে আবার উঠে নাচবে, ঘুরে ফিরে নাচবে, যতক্ষণ পারে নাচবে।'

ফ্যালারাম ম্যানেজারের হুকুম তামিল করতে ছুটল।

ডাক্তার রায়কে পাওয়া যাচ্ছে না শুনে গোবিন্দ একটু মুষড়ে পড়েছিল। আহা, এমন জমাট নাচ-গান শেষটা বুঝি সব মাটি হয়ে যায়। সেও এদিক-ওদিক ঘুরে ডাক্তারের খোঁজ করতে লাগল। ঘুরতে-ঘুরতে এসে পড়ল স্টেজের পিছন দিকটায়। এখানে পুরানো, ভাঙা সিনের কাঠ স্তূপাকার করে রাখা। হঠাৎ গোবিন্দ তারই মধ্যে আবিষ্কার করল ডাক্তার রায়ের মুখ। ডাক্তার রায় ভাঙা কাঠগুলোর মধ্যে আত্মগোপন করে নিশ্বাস নেবার জন্যে হঠাৎ বোধ হয় মুখটা একবার বার করেছিলেন, গোবিন্দ সেইটুকু সময়ের মধ্যে তাঁকে দেখে ফেলল, বিস্ময়-বিহ্বল কণ্ঠে ডাকলে 'স্যার!'

ডাক্তার রায় হাত নেড়ে তাকে নিঃশব্দে সেখান থেকে চলে যেতে ইশারা করলেন। গোবিন্দ ইশারার মর্মোদ্ধার করতে না পেরে হাঁ করে তাঁর দিকে চেয়ে রইল। ডাক্তার রায়ের মাথার রক্ত গরম হয়ে উঠেছিল। তিনি ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে গোবিন্দকে চুপ করে থাকতে বললেন।

তাতেও কোনও কাজ হল না।

গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করলে, 'এখানে ঢুকেছেন কেন স্যার?'

ডাক্তার রায় চাপাগলায় গর্জাতে লাগলেন, 'ঢুকেছি আমার খুশি। তুমি এখান থেকে যাও দেখি আহম্মক।'

গোবিন্দ মাথা চুলকাতে-চুলকাতে বললে, 'আজ্ঞে যাচ্ছি। কিন্তু আপনার থ্যাটার তো স্টেজের পিছন দিকে নয়, সামনের দিকে।'

'আমি জানি। তুমি যাও।'

'ভুলে এসে পড়েছেন বুঝি?'

ডাক্তার রায়ের ইচ্ছা হল একখণ্ড কাঠ তুলে গোবিন্দর মাথায় বসিয়ে দিয়ে তাকে চিরকালের মতো চুপ করিয়ে দেন। কিন্তু ইচ্ছা হল মাত্র। ওরকম মারাত্মক কিছুই তিনি করে উঠতে পারলেন না। তার বদলে খানিকটা সংযত হয়ে বললেন, 'না, আমি একটা জিনিস খুঁজছি।'

'কী খুঁজছেন স্যার? আমি খুঁজে দেব?'—গোবিন্দ উৎসাহিত হয়ে উঠল।

ডাক্তার রায় দাঁতে-দাঁতে ঘষতে-ঘষতে বললেন, 'না, না, না। বলছি তোমায় খুঁজতে হবে না, তুমি যাও। দয়া করে যাও।'

গোবিন্দকে তবু নিরস্ত করা গেল না, সে বললে, 'টর্চ আনব স্যার? ম্যানেজারকে ডেকে আনব?'

কী বিপদ! এমন মুশকিলে মানুষ পড়ে! তাও আবার নিজের সহকারীর জন্যে! ডাক্তার রায় অসহায় কণ্ঠে বললেন, 'কাউকে ডাকতে হবে না, দোহাই গোবিন্দ, তুমি যাও।'

'কিন্তু স্যার...।'

নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও গোবিন্দ যাওয়ার জন্যে দু-পা পিছিয়ে গেল। কিন্তু যেতে হল না। ম্যানেজার নকড়ি ফ্যালারামকে নিয়ে এইদিকেই আসছিলেন। গোবিন্দকে দেখতে পেয়ে বললেন, 'কী হে গোবিন্দ? পিছু ফিরে হাঁটা অভ্যাস করছ নাকি?'

'আজ্ঞে না—দেখছিলাম।'—গোবিন্দ গোটা দুই ঢোক গিললে।

ম্যানেজারের সন্দেহ হল, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী দেখছিলে?'

'স্যারের ওখানে কিছু হারিয়েছে কি না।'

'স্যার মানে তোমার মানিব! ওই ভাঙা সিনগুলোর পিছনে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, তিনি কী খুঁজছেন!'

ম্যানেজার সদর্পে কাঠের স্তূপের দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে বললেন, 'এইবার খুঁজে বার করাচ্ছি!'

ডাক্তার রায়কে খুঁজে পেতে এরপর দেরি হল না।

ম্যানেজার চিৎকার করে উঠলেন, 'আপনার কীরকম আক্কেল বলুন তো মশাই? আপনার জন্যে থিয়েটার মাটি হয়ে যেতে বসেছে, আর আপনি এখানে লুকিয়ে বসে আছেন?'

ডাক্তার সেখান থেকেই বললেন, 'লুকিয়ে? কে বললে লুকিয়ে? আমি...এই...এদিকটা একটু দেখছিলাম।'

'আমরা এদিক-ওদিক অনেকদিক দেখে রেখেছি মশাই, আপনি বেরিয়ে আসুন দেখি; নইলে কলকাতার অ্যাক্টর বলে মান আর রাখতে পারব না।'

অগত্যা ডাক্তার রায়কে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে হল। ডাক্তার রায় যখন সেই ভাঙ্গা কাঠের স্তূপে বসেছিলেন, তখন একরাশ পিঁপড়ে বিনাবাধায় তাঁর জামার ওপর উঠে বসেছিল, জরিদার পাগড়ি চেলির কাপড়েও ঢুকেছিল দু-চারটে। উত্তেজনার আতিশয্যে ডাক্তার রায় সেটা খেয়ালই করেননি। তিনি বেরিয়ে আসতেই নকড়ি আর ফ্যালারাম তাঁকে প্রায় বন্দি করে স্টেজের দিকে নিয়ে চলল।

এদিকে পূর্ণিমা থিয়েটারের গেটে ততক্ষণে একটা গাড়ি এসে থেমেছে। গাড়ি থেকে নামল নটবর লাহিড়ী আর তার দুজন বন্ধু। গাড়িভাড়া চুকিয়ে দিয়ে নটবর বন্ধুদের একজনকে জিজ্ঞাসা করলে, 'ওহে এইটেই তো পূর্ণিমা থিয়েটার?'

বন্ধু বললে, 'সাইনবোর্ড আর প্ল্যাকার্ডের ভিড় দেখে তো তাই মনে হচ্ছে। ঢুকে পড় দুর্গানাম করে।'

'কিন্তু প্লে তো আরম্ভ হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে।'

'নটবর লাহিড়ী আবার কবে সময়মতো প্লে করতে নেমেছে। তুমি যে সশরীরে এসেছ এই তো ওদের ভাগ্যি!'

'তোমরাও এস না সঙ্গে।'

'না, না, তুমি বরং একাই যাও। আমরা বাইরে আছি।'

'নটবর একাই থিয়েটারের ভিতর ঢুকল।'

স্টেজের ওপর নাচগান শেষ হয়ে গেছে, কুসুমিকা ইন্দ্রজিতের জন্যে অপেক্ষা করছে। কলকাতার স্বনামধন্য নটবর লাহিড়ীকে চাক্ষুষ দেখবার জন্যে দর্শকরা অডিটোরিয়মে রুদ্ধনিশ্বাসে অপেক্ষা করছে।

উইংসের পাশে ম্যানেজার আর ফ্যালারাম তখন ডাক্তার রায়কে ঠেলে স্টেজে পাঠাবার চেষ্টা করছে। ম্যানেজার যতই বলেন, 'যান না মশাই, এইবার ঢুকুন।' ডাক্তার ততই বলেন, 'এই যে যাই....'

কিন্তু যেতে গিয়ে পা আর সরে না। অনেকটা বলিদানের পাঁঠার মতো অবস্থা। এর চেয়ে মুশকিল হয়েছে পাগড়িটা নিয়ে। কখন যে সেটা মাথা থেকে খুলে হাতে নিয়েছিলেন সেটা ডাক্তার রায়ের খেয়ালই ছিল না। এখন হাত থেকে সেটা কোথায় রাখেন সেই ভাবনাতেই তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন। ওটা যে আবার মাথাতেই পরা যায় সেটা আর

মনেই নেই। বিব্রত হয়ে তিনি পাগড়িটা একবার সোজা ম্যানেজারের হাতেই তুলে দিলেন, উত্যক্ত ম্যানেজার আরও উত্যক্ত হয়ে সেটা তাঁকে ফেরত দিতে-দিতে বললেন, 'আপনি খেলা শুরু করলেন যে! শেষে কি আপনাকে ধাক্কা মেরে পাঠাতে হবে?'

ডাক্তার বললেন, 'না, না, এই যে যাই।'

তাড়াতাড়িতে পাগড়িটা গোবিন্দর হাতে দিয়ে তিনি চোখ কান বুঁজে স্টেজের মধ্যে ঢুকে পড়লেন, কিন্তু দু-পার বেশি এগোতে পারলেন না। অডিটোরিয়াম-ভর্তি অসংখ্য মাথা স্টেজের দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে, ডাক্তার রায়ের বুকের ভেতর হাতুড়ি পেটার আওয়াজ হতে লাগল। কুসুমিকা পর্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতে লাগল, মনে-মনে মুণ্ডুপাত করল ডাক্তারের। কিন্তু ডাক্তারের তখন সে কথা ভাববার অবস্থা নয়। আবার ভিতরে ঢুকে পড়া যায় কি না দেখবার জন্যে তিনি উইংসের দিকে চাইলেন। দেখা গেল, পাগড়িটা গোবিন্দর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ম্যানেজার ক্রোধে, ক্ষোভে প্রায় উর্ধ্ববাহু হয়ে নৃত্য করছেন। আর বলছেন, 'দেখেছ, দেখেছ...এটা আবার ফেলে গেল?'

'এই যে দিয়ে আসছি স্যার!'—বলেই গোবিন্দ নকড়িকে কোনও কথা বলবার অবকাশ না দিয়ে পাগড়িটা তাঁর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে স্টেজে ঢুকে পড়ল, কেউ বাধা দেবার সময় পর্যন্ত পেল না।

স্টেজের ওপর কুসুমিকা দেখল যে আর অপেক্ষা করা যায় না, সে নিজেই ইন্দ্রজিৎ-বেশি ডাক্তারের দিকে এগোতে লাগল এবং ঠিক সেই সময় পাগড়ি হস্তে আবির্ভাব হল গোবিন্দর! একেবারে খাঁটি পৌরাণিক নাটক, তারই মাঝে মালকোঁচা-মারা কাপড় আর হাফসার্ট-পরা গোবিন্দ এসে পাগড়িটা ইন্দ্রজিতের হাতে দিয়ে তৎক্ষণাৎ ভিতরে ঢুকে গেল। দর্শকদের আসন থেকে হাসির ফোয়ারা ছুটল, কেউ-কেউ শিস দিতে লাগল, কুসুমিকার মুখ পর্যন্ত লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল।

দর্শকদের হাসির ঢেউ একটু কমতে কুসুমিকা ওরফে ইন্দ্রজিৎ-পত্নী ডাক্তার রায়ের সামনে গিয়ে বলতে শুরু করল—

'তবু ভালো, এতক্ষণে মনে তব পড়িয়াছে
দাসীরে তোমার! কিন্তু নাথ, রণসাজ
সাজে কি হেথায়...'

ডাক্তার রায় কিছুই বুঝতে পারছিলেন না, কুসুমিকার কথা শেষ হওয়ার আগেই তিনি বলে ফেললেন, 'আমি এসেছি।'

তাঁর এই আগমন ঘোষণার জন্যে কেউই প্রস্তুত ছিল না, না দর্শকরা, না কুসুমিকা—বোধহয় ডাক্তার রায় নিজেও না। কুসুমিকা একটা তীব্র দৃষ্টি হানলে ডাক্তারের দিকে, তারপর চাপা গলায় বলল, 'একই! পার্ট ভুলে গেলেন নাকি?'

পার্ট তো পার্ট, ডাক্তার রায় নিজেকেই ভুলে যাবার উপক্রম করছিলেন, কারণ ভাঙা কাঠের স্তূপ থেকে যে পিপীলিকাকুল প্রথমে তাঁর জামায় এবং পরে জামার মারফতে দেহের বিভিন্ন অংশে শত্রুসেনার মতো অনুপ্রবেশ করেছিল, তারা এই সময় সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণ শুরু করে দেওয়ায় তাঁর আর কিছু ভাববার অবসর ছিল না। মনে হচ্ছিল, জামাটা গা থেকে খুলে ফেলে স্টেজের ওপরই তিনি শুয়ে পড়বেন। কিন্তু না, অতটা বিপর্যয় হল না, কেবল হাত দুটো তাঁর কখনও জামার তলায়, কখনও কানের পাশে কখনও পায়ের কাছে ওঠা-নামা করতে লাগল এবং সেই অবস্থাতেই তিনি আর্তকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'আমি এসেছি, এসেছি...বিদায়!'

দু-একটি পিঁপড়ে ইতিমধ্যে তাঁর কর্ণকুহরে প্রবেশের চেষ্টা করছিল এবং কয়েকটা ঢুকে পড়েছিল দেহের নানা দুর্গম অংশে; ফলে ডাক্তার রায় 'বিদায়' কথাটি উচ্চারণ করেই লাফাতে শুরু করলেন।

কুসুমিকা ভয়ে দু-হাত পিছিয়ে গেল। দর্শকদের হাসি আর হট্টগোলে কানপাতা দায় হয়ে উঠল। ম্যানেজার নকড়িও উইংসের পাশে এতক্ষণ লাফাচ্ছিলেন—রাগে, এইবার তিনি চিৎকার করে উঠলেন, 'ড্রপ! ড্রপ! ড্রপ ফেলো।...'

ড্রপ পড়তেই—ম্যানেজার তীরবেগে স্টেজের ওপর এসে ডাক্তার রায়ের একটা হাত চেপে ধরে বললেন, 'মশাই, আপনি কী ভেবেছেন বলুন তো?'

ডাক্তার পিঁপড়ের আক্রমণ নিবারণের জন্যে শরীরের বিভিন্ন স্থানে থাবড়া মারতে-মারতে বললেন, 'কিছু ভাবতে পারছি না মশাই, শুধু পিঁপড়ে।'

'পিঁপড়ে!' ম্যানেজার কিছুই বুঝতে না পেরে বললেন, 'পিঁপড়ে কী মশাই?'

ডাক্তার রায় পোশাক খুলতে-খুলতে বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, লাল পিঁপড়ে—জামায়, কাপড়ে, কানে, সর্বাঙ্গে।'

ম্যানেজার বিশ্বাস করলেন না, ডাক্তারের হাতখানা আরও জোরে চেপে ধরে বললেন, 'চালাকি করবার আর জায়গা পাননি? কোথায় পিঁপড়ে?'

ডাক্তার রাযের গা থেকে কয়েকটা পিঁপড়ে ইতিমধ্যে নকড়ির গায়ে গিয়ে উঠেছিল, তাঁকেও তারা আক্রমণ শুরু করলে। ডাক্তার রায় আর কিছু বলবার আগেই দেখা গেল ম্যানেজারও পিঁপড়ের কামড় খেয়ে লাফাতে শুরু করেছেন।

ডাক্তার রায় আর দেরি না করে সেই গোলযোগের মধ্যে গোবিন্দকে নিয়ে অন্য দিক দিয়ে সরে পড়লেন।

মিনিটখানেক পরে ম্যানেজার দেখলেন, আসামী পালিয়েছে। তিনি ছুটলেন তার সন্ধানে।

নটবর লাহিড়ী আসছিল এইদিকে, ধাক্কা লাগল দুজনের। নটবর বললে, 'কিছু যদি না মনে করেন একটা কথা বলি—'

ম্যানেজার খিঁচিয়ে উঠলেন, 'মনে করব না? বিলক্ষণ মনে করব। সরে যান বলছি, আমাব কোনও কথা শোনবার সময় নেই।'

নটবর বললে, 'আহা ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আপনি নটবর লাহিড়ীকে চান তো?'

'আলবৎ চাই! এখন দেখতে পেলে বাছাধনকে বুঝিয়ে দেব কত ধানে কত চাল!'

ম্যানেজার ধাক্কা দিয়ে নটবরকে সরিয়ে ছুটল ডাক্তারের সন্ধানে। নটবরও ছুটল তাঁর পিছনে।

অডিটোরিয়মে গণ্ডগোলের জন্য থিয়েটারের গেটে লোকজন কেউ ছিল না।

ডাক্তার রায় হাঁফাতে-হাঁফাতে বেরিয়ে এলেন। গোবিন্দ পিছিয়ে পড়েছিল, ডাক্তার রায় বললেন, 'শিগগির, শিগগির গোবিন্দ। দেরি কোরো না, বেরিয়ে পড়।'

গোবিন্দ বললে, 'আজ্ঞে দরজায় কেউ নেই যে!...'

'আহাম্মক! দরজায় কেউ থাকলে বুঝি তোমার সুবিধে হত?'

নির্বোধ গোবিন্দর জন্য নতুন করে বিপদে পড়বার ইচ্ছা তাঁর ছিল না, তিনি গোবিন্দকে হিড়-হিড় করে টানতে-টানতে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন।

রাস্তায় পা দেওয়ার খানিক পরেই একটা ঘোড়ারগাড়ি পাওয়া গেল। ডাক্তার রায় গোবিন্দকে নিয়ে উঠে বসলেন। গাড়িওয়ালা জিজ্ঞাসা করল, 'যাবেন কোথায়?'

ডাক্তার রায় বললেন, 'যেখানে হোক নিয়ে চল।...না-না, ডাক্তারখানায় চল, যে কোনও ডাক্তারখানায়।'

কোচম্যানের চাবুক খেয়ে গাড়ির ঘোড়া দুটো ছুটতে লাগল।

এদিকে ম্যানেজার দলবল নিয়ে গেটের কাছে হাজির হলেন। সেখানে কাউকে দেখতে না পেয়ে ফ্যালারাম বললে, 'তারা পালিয়েছে।'

'পালিয়েছে মানে?' ম্যানেজার হাঁকতে লাগলেন, 'কোথায় পালাবে? আমি সারা শহর চষে ফেলব। আমি হুলিয়া বার করব।'

নটবর বললে, 'তার আগে অধমের একটা কথা শুনবেন?'

ম্যানেজার খিঁচিয়ে উঠলেন, 'আমি মরছি আমার নিজের জ্বালায় আর আপনি কানের কাছে এসে প্যান-প্যান করছেন! ওহে, তোমরা এই লোকটাকে এখান থেকে বার করে দিতে পারো না?'

দু-একজন নটবরের দিকে এগোবার চেষ্টা করছিল, নটবর বললে, 'দাঁড়াও-দাঁড়াও। একটু ধৈর্য ধরো দিকি। আপনাদের নটবর লাহিড়ীকে পেলেই হল তো? আমি বলছি তিনি পালাননি।'

'পালাননি! তিনি কোথায় তা হলে?'

'সশরীরে এই আপনাদের সামনে। আমিই আসল নটবর লাহিড়ী, আদি ও অকৃত্রিম। যিনি পালিয়েছেন তিনি জাল, নকল, ভেজাল।'

নকড়ির মুখ দিয়ে কথা সরছিল না। বিস্ফারিত চোখে কিছুক্ষণ নটবরের দিকে চেয়ে থাকবার পর তিনি বললেন, 'আপনিই নটবর লাহিড়ী?...আরে হ্যাঁ, তাই তো যেন চেনা-চেনা লাগছে। আরে কী আশ্চর্য...এতক্ষণ বলতে হয় মশাই।'

নটবর হাসতে-হাসতে বললে, 'এখানে আসবার পর সেই কথাই তো বলবার চেষ্টা করছি। কিন্তু শুনছে কে!'

নকড়ি নটবরের দিক থেকে চোখ ফেরালেন না, বলতে লাগলেন, 'আরে তাই তো! এই তো ঠিক নটবর লাহিড়ী—একেবারে হুবহু নটবর লাহিড়ী! ও ফ্যালারাম, এই তো আমাদের নটবর লাহিড়ী!'

ফ্যালারাম বললে, 'আমার তো সেই স্টেশনেই ধোঁকা লেগেছিল। শুধু আপনার বোকামিতে এই গণ্ডগোল!'

ম্যানেজার আবার চড়া সুর ধরলেন, 'আমার বোকামি! বিশ বছর থিয়েটার চালাচ্ছি, আমি অ্যাক্টর চিনি না বলতে চাস? দেখ ফ্যালো—'

ফ্যালা ভড়কালো না, বেশ জোর গলাতে বললে, 'কী ফ্যালা-ফ্যালা করছেন। আমায় চোখ রাঙাবেন না বলছি। দিন আমার মাইনে চুকিয়ে, আমি এমন থিয়েটারে থাকতে চাই না।'

ম্যানেজারের সুর পালটে গেল, 'আহা, রাগ করিস কেন! আমি তো বলছি আমার একটু ভুল হয়েছিল। কিন্তু এবার ঠিক চিনেছি, এ একেবারে আসল নটবর!'

নটবরের হাত ধরে তিনি সাজঘরের দিকে নিয়ে গেলেন।

ডাক্তার রায় ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে নানা জায়গায় ঘুরলেন, কিন্তু পছন্দমতো ডাক্তারখানা খুঁজে পেলেন না। শেষটা গাড়িওয়ালা বিরক্ত হয়ে বললে, 'রাত তো অনেক

হল, আর কত ঘুরব মশাই। ঘোড়াগুলোর যে জান যায়!'

ডাক্তার রায় বললেন, 'একটা দাঁতের ডাক্তারখানা খুঁজে বার করলে হতো না?'

গাড়িওয়ালা বিরক্ত কণ্ঠে বললে, 'না মশাই না, আর পারব না। আমার ভাড়া চুকিয়ে দিন।'

'দেব বাবা দেব। তার আগে যদি রাত্তিরে থাকার মতো একটা জায়গা—মানে কোনও হোটেলে পৌঁছে দিতে পারো?'

'হোটেলে যাবেন তো ডাক্তারখানা খুঁজছিলেন কেন? ভ্যালা সওয়ারি জুটেছে!'

বিরক্ত কোচম্যান ঘোড়া দুটোর পিঠে চাবুক হাঁকাতে লাগল।

রায়বাহাদুর অধরনাথের বাড়ির দোতালার ঘরে ড্রেসিং টেবলের সামনে দাঁড়িয়ে সুজিত দাড়ি কামাচ্ছিল আর ফকিরচাঁদ দাঁড়িয়েছিল জানলার কাছে—উদাস চোখে বাইরের দিকে চেয়ে। কামানো শেষ হতে সুজিত বললে, 'তা হলে আর একটা রাত কাটল ফকিরচাঁদ!'

ফকির বললে, 'কাটল বইকী।'

সুজিত বললে, 'এখন থেকে ঘরেই তোমার খাওয়ার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, সুতরাং ক্ষুধানিবারণ সম্বন্ধে তোমার অভিযোগ করবার আর কিছু নেই তো?'

'না।'

'বড় সংক্ষিপ্ত জবাব দিচ্ছ। তুমি কি বৃথা বাক্যব্যয় আর করবে না ঠিক করেছ?'

'তুমি কী বলে এখানে থেকে গেলে বলো তো? কোন সাহসে তুমি এখনও এখানে বসে আছ? আজ বিকালে conference। তোমার সেখানে কী অবস্থা হবে ভেবেছ? ভেবে দেখেছ আসল ডাক্তার রায়ের চেনা লোক কেউ থাকলে তোমার কি দুর্দশা হবে? এখনও কি তোমার চৈতন্য হবে না?'

সুজিত একটু হাসলে, তারপর গম্ভীর মুখে বললে, 'সবই বুঝছি ফকিরচাঁদ, তবু মনে হচ্ছে, ভাগ্য কি নেহাত মিছিমিছি এই ভুলের জটটা পাকিয়ে তুলেছে? এর মধ্যে কি একটা গভীর, মহৎ উদ্দেশ্যের আভাস দেখতে পাচ্ছ না; যার জন্যে সব বিপদ তুচ্ছ করা যায়।'

'ভাগ্যের না হোক, তোমার উদ্দেশ্য অন্তত দেখতে পাচ্ছি।'

'সত্যি দেখতে পেয়েছ? ভাগ্যের এই রসিকতার ভেতর দিয়ে বেকার সমস্যার একটা কিনারার পথ তুমি দেখতে পাচ্ছ?'—সুজিত উৎসাহিত কণ্ঠে বলে উঠল।

—ফকির বললে, 'পাচ্ছি বইকী! রায়বাহাদুরের ওই ডাকাত মেয়েটির সঙ্গে তুমি প্রেমে পড়েছ। বেকার সমস্যার চেয়ে বিয়ের প্রতি আপাতত তোমার ঝোঁক একটু বেশি।'

'আমার প্রতি তুমি একটু অবিচার করছ ফকিরচাঁদ। বিয়ে করে বেকার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা বাংলা দেশের ছেলেদের একটা বিশেষত্ব বটে, কিন্তু আমি ঠিক সেকথা ভাবছি না। অবশ্য এ বিষয়ে রায়বাহাদুরের সঙ্গে আমার একটু আলাপ আলোচনা দরকার।'

ফকির আর কিছু বলবার আগেই নিচে একটা কলরব শোনা গেল। ফকির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল লোকজন চারিদিকে ছুটোছুটি করছে, রায়বাহাদুর থেকে বাড়ির মেয়েরা পর্যন্ত জড় হয়েছে গেটের কাছে এবং সহিস গোছের একটা লোক দুরন্ত একটি ঘোড়ার মুখের লাগামটা টেনে ধরে তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করছে।

ব্যাপার কী বুঝতে না পেরে সুজিত আর ফকির দুজনেই তখনই নিচে নেমে এল।

বিব্রত বিচলিত রায়বাহাদুরের পাশে দাঁড়িয়ে রাজলক্ষ্মী দেবী বলছিলেন, 'তোমাকে

কতবার বলেছি, মেয়েছেলেকে অত আদর দেওয়া ভালো নয় দাদা। ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে এই যে জন্মের মতো খোঁড়া হয়ে থাকবে...এখন বোঝো।'

রায়বাহাদুর চিন্তাকুল কণ্ঠে বললেন, 'শুধু খোঁড়া হয়ে ফিরে এলেও যে বাঁচি। কিন্তু কী যে হয়েছে আমি বুঝতেই পারছি না। যদি সাংঘাতিক কিছু একটা—'

রাজলক্ষ্মী বললেন, 'ঘোড়া যখন শুধু ফিরে এসেছে তখন একটা কিছু হয়েছে নিশ্চয়।'

ফকির এবং সুজিত দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ওদের কথা শুনছিল। সুজিত ব্যাপারটা অনুমান করে নিল। মঞ্জু ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে গিয়েছিল, তারপর বেকায়দায় কখন ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েছে—ঘোড়াটি মঞ্জুকে না নিয়ে একাই ফিরে এসেছে।

রায়বাহাদুরের কাছে এসে সুজিত বললে, 'এসব গবেষণা রেখে আগে মঞ্জু দেবীর খোঁজটা নেওয়া উচিত নয় কি? এখানে দাঁড়িয়ে আলোচনা করে কোনও লাভ আছে?'

রায়বাহাদুর বললেন, 'ঠিক। আমিও তাই বলছি।'

'কোনদিকে তিনি বেড়াতে যান আপনার জানা আছে তো?'

'তা আছে।'

'তা হলে আর দেরি করবেন না। আপনার গাড়িটা বার করুন।'

সোফার গ্যাবেজ থেকে গাড়ি নিয়ে এল। সুজিত আর বাক্যব্যয় না কবে রায়বাহাদুরকে নিয়ে গাড়িতে উঠে বসল। গাড়ি চলল মঞ্জুব সন্ধানে।

নানা জায়গায় খুঁজেও মঞ্জুর কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত গাড়ি শহরের বাইরে এসে পড়ল। এদিকটা ফাঁকা, কোথাও বা মাঠ কোথাও বা জঙ্গল। সুজিত গাড়ি থামিয়ে রায়বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করলে, 'উনি এদিকটাতেও প্রায়ই বেড়াতে আসেন বলছিলেন না?'

রায়বাহাদুর বললেন, 'তাইতো আসে। হঠাৎ এমন কাণ্ড হবে কে জানত। দেখতে পাব বলে যে আর ভরসা হচ্ছে না ডাক্তার রায়।'

সুজিত বললে, 'মিছে ভাববেন না, তাঁকে সুস্থ অবস্থাতেই পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস।'

সুজিতের কথায় রায়বাহাদুর উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন; হঠাৎ তার একটা হাত চেপে ধরে বললেন, 'না পেলে জীবনে যে আমার আর কিছু থাকবে না ডাক্তার। পাঁচ বছব বযস থেকে মা-মরা মেয়েকে একাধারে বাপ-মা হয়ে মানুষ করেছি। আমার যা কিছু কাজকারবার শুধু ওরই জন্যে। শেষকালে কি...'

'কেন আপনি উতলা হচ্ছেন, এমন কী হয়েছে যার জন্যে...'

সুজিতকে কথা শেষ করতে না দিয়ে রায়বাহাদুর বললেন, 'আমি যে অনেক আশা করেছিলাম ডাক্তার রায়। আমার বয়স হয়েছে, ক্ষমতায় আর কুলোয় না। ভেবেছিলাম আপনার হাতে মঞ্জুর সঙ্গে আমার সব কিছুর ভার তুলে দিয়ে আমি একটু বিশ্রাম করতে যাব এবার। আমার সব আশা এমনি করে বৃথা হয়ে যাবে?'

সুজিত মনে-মনে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। যাক এদিকটা তা হলে ঠিক আছে। কিন্তু এখন আনন্দ প্রকাশ করবার সময় নয়, আরও কিছু কর্তব্য নিষ্ঠার পরিচয় দেওয়া দরকার। সুজিত বললে, 'এসব কথা শুনে সুখী হলাম, কিন্তু এখন এসব উচ্ছ্বাস শুনতে গেলে মঞ্জু দেবীকে খোঁজার দেরি হয়ে যাবে। আপনি গাড়িতে বসুন। আমি নেমে একটু খুঁজে দেখি।'

তাই হল। মোটর থেকে নেমে সুজিত প্রথমে মাঠটা ঘুরে দেখল। তারপর এগিয়ে গেল জঙ্গলের দিকে।

মঞ্জু এই জঙ্গলের মধ্যেই ছিল। ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে চোট লেগেছিল পায়ে, হাঁটবার চেষ্টা করেও বেশি দূর যেতে পারেনি; একটা ঝোপের আড়ালে বসে বিশ্রাম করছিল।

সুজিত খানিক পরে সেই ঝোপটার কাছে এসে পড়ল। মঞ্জু তাকে লক্ষ করে ভেতর দিকে সরে গেল। সুজিত তাকে এই অবস্থায় দেখে এটা তার ইচ্ছা নয়।

সুজিতের সন্ধানী দৃষ্টি কিন্তু ভুল করল না। মঞ্জুকে আবিষ্কার করে সে মনে-মনে হাসল, কিন্তু মুখের ভাবটা আগের মতোই চিন্তাকুল করে রাখল, যেন মঞ্জুকে দেখতেই পায়নি। এরপর কী করা কর্তব্য সেটাও সে মনে-মনে ঠিক করে ফেললে।

খোঁজাব ভান করতে-করতে কয়েক পা এগিয়ে গেল; তারপর আবার সেই ঝোপটার কাছে এসে দাঁড়াল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আকাশের দিকে চেয়ে—যেন নিজের মনেই বলতে লাগল, না, খোঁজ পাওয়া আর গেল না। কোথায় কোন খানায় কিম্বা ডোবায় পড়ে আছে। আনাড়ির আবার এসব ঘোড়ায় চড়ার সখ কেন?

'আনাড়ি' কথাটায় মঞ্জুর আপত্তি ছিল। তার মুখ রাগে রাঙা হয়ে উঠল। সুজিত আড়চোখে একবার ঝোপের দিকে চেয়ে নিয়ে বললে, 'যাই, রায়বাহাদুরকে বলি গিয়ে যে মেয়ের আশা তাঁকে ত্যাগ করতে হল।'

মঞ্জু আরও চোটে উঠল। কী আশ্চর্য লোকটা! মঞ্জুকে খুঁজে পাওয়া যাক বা না যাক, সে ঘোড়ায় চড়তে জানুক বা না জানুক তার এত মাথা ব্যথা কেন?

মঞ্জু উত্তেজিত হয়ে ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসবার উপক্রম করতেই কাঁটালতায় তার জামার হাতাটা আটকে গেল, হাতেও ফুটল কয়েকটা কাঁটা। মঞ্জু নিজের অজ্ঞাতেই শব্দ করে ফেলল, 'উঃ!'

সুজিত যেন এই মাত্র তাকে দেখতে পেলে এমনি একটা ভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে-আসতে বললে, 'এই যে আপনি এখানে! ঘোড়া থেকে পড়ে অক্ষত আছেন যে!'

মঞ্জু জামার হাতাটা কাঁটালতা থেকে ছাড়াবার চেষ্টা করতে-করতে বিরক্তভাবে বললে, 'আপনি বোধ হয় তাতে দুঃখিত!'

সুজিত বললে, 'পরোপকারের এত বড় একটা সুযোগ ফসকালে দুঃখ একটু হয় বইকী! আপনাকে আমি অন্য কোনও বিষয়ে সাহায্য করতে পারি কি?'

'কোনও দরকার নেই। আপনি যান।'

রাগ দেখাবার জন্যে মঞ্জু এমন জোরে মাথাটা নাড়লে যে কাঁটালতায় জামাটা আরও বেশি জড়িয়ে গেল। মঞ্জু যতই হাতটা টেনে নেবার চেষ্টা করে, কাঁটাগুলো ততই যেন বেশি করে ফুটতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সুজিতই এগিয়ে এসে কাঁটার আঘাত থেকে তাকে উদ্ধার করলে, মঞ্জু ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে এমন গম্ভীর হয়ে গেল যেন সুজিত একটা মস্ত অন্যায় করে ফেলেছে।

সুজিত বললে, 'আপনাকে এ অবস্থায় ফেলে আমার যাওয়াটা কি ঠিক হবে? বিশেষ করে, আপনার সাহায্যের জন্যই যখন আমার এখানে আসা।'

'আপনাকে আমি সাহায্যের জন্য ডাকিনি।'

মঞ্জু যেন ফেটে পড়ল। সুজিত তবু নিরস্ত হল না; বললে 'কিন্তু আমি যে না ডাকতেই

এসেছি। জানেন তো, কারও বিপদ দেখলে আমি চুপ করে থাকতে পারি না, ওই আমার এক বদ অভ্যাস।'

'আমার কোনও বিপদ হয়নি, আর হলেও আপনার সাহায্য নিতে আমি চাই না।'

'তা হলে আমি নাচার। কিন্তু ভেবে দেখুন, আপনার কত কাজে আমি লাগতে পারতাম! হাত ভেঙে থাকলে first aid, পা ভেঙে থাকলে কাঁধে করে নিয়ে যাওয়া...'

মঞ্জুর পায়ের চোট সামান্য হলেও তখনও একটু ব্যথা করছিল, কিন্তু তাই বলে দাঁতের ডাক্তারের সাহায্য নিতে হবে? কখনও না।

মঞ্জু বললে, 'আপনি এখান থেকে যাবেন কি না বলুন। নইলে আমি চিৎকার করব।'

সুজিত বললে, 'সেটা শুধু অনর্থক পরিশ্রম করা হবে। এই তেপান্তরে সে মধুর স্বর কে শুনবে বলুন! তার চেয়ে আমি চলে যাচ্ছি। আপনি বরং বিশ্রাম করে কিঞ্চিৎ শক্তি সংগ্রহ করুন। এখান থেকে শহর পর্যন্ত হেঁটে যাওয়া তো কম কথা নয়।'

সুজিত কয়েক পা এগিয়ে গেল। এখান থেকে হেঁটে বাড়ি যাওয়ার কল্পনায় মঞ্জুর মুখ শুকিয়ে উঠেছিল। সে ডাকলে, 'শুনুন।'

'হ্যাঁ, বলুন।'—ফিরে এসে সুজিত জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি তা হলে মতলব বদলালেন?'

মঞ্জু, সত্যিই সুজিতের সাহায্য চাইতে যাচ্ছিল। কিন্তু সুজিতের 'মতলব' কথাটায় সে আবার চটে উঠল। বললে, 'না, আপনি বাবাকে গাড়ি নিয়ে আসতে বলবেন।'

সুজিত অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভাবে সবিনয়ে প্রশ্ন করলে, মাফ করবেন, কিন্তু...সেটা কি উচিত হবে?'

'তার মানে?' মঞ্জু বাঁকা চোখে তার দিকে চাইল।

সুজিত বললে, 'মানে অতি পরিষ্কার। আপনার বাবাকে গিয়ে খবর দেওয়াও একরকম সাহায্য তো? আমার সাহায্য নিতে আপনি যখন একেবারেই নারাজ, তখন জুলুম জবরদস্তি করে সাহায্য করাটা কি অন্যায় হবে না?'

'বেশ, আপনি যেতে পারেন।'

'হ্যাঁ, যাচ্ছি। আমি মনে করব, আপনার সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি।' মঞ্জু উত্তর না দিয়ে স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রইল।

সুজিত নীল আকাশের দিকে দার্শনিকোচিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে-করতে বললে, 'ভুলে যাবার চেষ্টা করব যে আপনি তেপান্তরের মাঝে একা অসহায় ভাবে পড়ে আছেন। লোক নেই, জন নেই, তেষ্টা পেলে এক ফোঁটা জল পর্যন্ত পাবার উপায় নেই।'

মঞ্জু তেমনি ভাবে চেয়ে রইল, সুজিত বললে, 'আচ্ছা চলি, রায়বাহাদুর গাড়িতে বসে এতক্ষণ কী ভাবছেন কে জানে!'

মঞ্জু প্রায় লাফিয়ে উঠে জিজ্ঞাসা করলে, 'বাবা গাড়িতে এসেছেন?'

'এসেছেন বইকী।'

'আর আপনি আমায় কিছু বলেননি?'

'বলার কোনও দরকার হয়নি। তিনি আমাকেই আপনার খোঁজে পাঠিয়েছেন। আমি যখন বলতে গেলে আপনাকে খুঁজেই পেলাম না, তখন সে কথা তুলে আর লাভ কী। আচ্ছা নমস্কার! আশা করি আপনি এটুকু রাস্তা নিরাপদে যেতে পারবেন। এমন বেশি নয়, বড় জোর ঘণ্টা তিনেক সময় লাগবে।'

সুজিত মঞ্জুর দিকে চেয়ে এবার সত্যি-সত্যিই হাঁটতে শুরু করল।

মঞ্জু দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল, লোকটা সত্যিই যদি বাবার কাছে কোনও কথা না বলে, বাবা যদি হতাশ হয়ে গাড়ি নিয়ে ফিরে যান...তাহলে? দুপুর রোদে এতটা পথ হেঁটে যাওয়া নিশ্চয়ই সম্ভব নয়, বিশেষত পায়ের ব্যথাটা এখনও...

মঞ্জুও চলতে শুরু করল।

সুজিত পিছু ফিরে একবার মঞ্জুকে দেখে মনে-মনে হাসল। তার স্ট্র্যাটেজি এবারও নির্ভুল!...

সুজিত এবার একটু ধীরে হাঁটতে লাগল। খানিক পরে মঞ্জু তার কাছাকাছি এসে পড়তে সুজিত গম্ভীর মুখে বললে, 'আপনি আসছেন, আমি এতে অত্যন্ত সুখী হলাম। কিন্তু দেখবেন, শেষে যেন সাহায্য করবার অপবাদ দেবেন না।'

মঞ্জু জবাব না দিয়ে হাঁটতে লাগল। মনে-মনে বললে, Incorrigible! সুজিতের পিছনে-পিছনে মঞ্জু জঙ্গল আর মাঠ পেরিয়ে রাস্তায় এসে পৌঁছতেই রায়বাহাদুর গাড়ি থেকে নেমে এসে বললেন, 'এই যে মা মঞ্জু। আমি এতক্ষণ ভেবে সারা হচ্ছিলাম। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ ডাক্তার রায়।'

সুজিত বললে, 'উহুঁ, আমাকে ধন্যবাদ দেবেন না রায়বাহাদুর। মঞ্জু দেবী তা হলে হয়ত আবার মাঠে কিম্বা জঙ্গলে ফিরে যেতে পারেন।'

রায়বাহাদুর ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেরে একবার মেয়ের দিকে, আর একবার সুজিতের দিকে চাইলেন, তারপর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, 'আজ আপনি না থাকলে—'

রায়বাহাদুরের কথা শেষ হবার আগেই মঞ্জু বিরক্তি সহকারে বলে উঠল, 'বাবা, তুমি এখন যাবে, না দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কথা কইবে? আমি আর দেরি কবতে পারছি না—'

উত্তেজিত মঞ্জু গাড়িতে উঠল এবং অন্যমনস্ক ভাবে ড্রাইভারের পাশের আসনটিতে বসে পড়ল। সুজিত হাসি চেপে গম্ভীর মুখে এগিয়ে এল এবং ড্রাইভারের সিটে বসল। সুজিত গাড়ি চালাবে মঞ্জু এটা কল্পনা করেনি, তাকে ড্রাইভারের আসনে দেখেই সে নেমে যাবার চেষ্টা করল; কিন্তু সুজিত তাকে নামবার অবকাশ না দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল। রায়বাহাদুর আগেই পিছনের সিটে গিয়ে বসেছিলেন।

ডাক্তার রায় গোবিন্দর সঙ্গে ঘুরতে-ঘুরতে বহু কষ্টে রায়বাহাদুরের বাড়ি খুঁজে বার করলেন। বাইরে ফকিরচাঁদ চাকর-বাকরদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে গল্প করছিল। ডাক্তার রায় এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এইটে তো রায়বাহাদুর অধবনাথের বাড়ি।'

চাকরদের একজন বললে, 'হ্যাঁ।'

ডাক্তার রায় বললেন, 'তাঁকে একটু খবর দিতে পারো? বলবে, ডাক্তার রায় এসেছেন।' ফকিরের মুখ শুকিয়ে গেল। চাকররাও কম অবাক হয়নি। তাদের একজন বললে, 'আজ্ঞে...তিনি তো ডাক্তার রায়ের সঙ্গেই বেরিয়ে গেলেন।'

এবার আশ্চর্য হবার পালা ডাক্তার রায়ের। তিনি গোবিন্দর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'সে কী!'

গোবিন্দ ডাক্তার রায়কে দেখিয়ে বললে, 'ইনিই তো ডাক্তার রায়।'

ফকিরের বুক ঢিপ-ঢিপ করছিল, সে একটু এগিয়ে এসে বললে, 'কী বললেন? আপনিই ডাক্তার রায়, মানে দাঁতের ডাক্তার?'

ডাক্তার রায় বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি কাল আসতে পারিনি—বড় একটা বিভ্রাটের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম—'

ফকিরের মাথার মধ্যে যেন কয়েকটা বড় লাট্টু ঘুরছিল বোঁ-বোঁ করে। সে একটা ঢোক গিলে বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, বুঝতে পারছি, ভীষণ বিভ্রাট।'

তারপর অন্যমনস্কতার ভান করে সেখান থেকে সরে গেল।

ডাক্তার রায় চাকরদের বললেন, 'আমি রায়বাহাদুরের জন্যে একটু অপেক্ষা করতে পারি?'

চাকররা তাঁকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে ড্রয়িং রুমে বসালে।

খানিক পরেই গাড়ি সমেত সুজিত, রায়বাহাদুর আর মঞ্জু ফিরে এল। মঞ্জুকে ফিরে পেয়ে সবাই খুশি হয়ে উঠল। মঞ্জু ভিতরে চলে গেল।

রায়বাহাদুর ড্রয়িংরুমের দিকে যেতে-যেতে বললেন, 'ডাক্তার রায় আমি আজকের এই ব্যাপারে ভাগ্যের নির্দেশ দেখতে পাচ্ছি।'

ফকির বারান্দার এক পাশে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে ইশারা করে সুজিতকে বোঝাবার চেষ্টা করছিল যে ব্যাপার ঘোরাল হয়ে উঠেছে, সে যেন ভেতরে না ঢোকে...

সুজিতের মন তখন জয়ের নেশায় ভরপুর। সে রায়বাহাদুরকে হাত করে ফেলেছে, আর ভাবনা কী! সুজিত ফকিরকে দেখেও দেখল না, রায়বাহাদুরের সঙ্গে ড্রয়িংরুমের দিকে যেতে-যেতে বললে, 'আমিও পাচ্ছি। কিন্তু তার মানেটা এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।'

রায়বাহাদুর বললেন, 'না, আর আপত্তি করবেন না ডাক্তার রায়। মঞ্জুকে খুঁজে বার করবার ভার আজ যেমন করে নিয়েছেন, তেমনি করে তার সব ভার এবার আপনি নিন।' ফকির তখনও ইশারায় আসন্ন বিপদের গুরুত্বটা সুজিতকে বোঝাবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু সুজিতের সেদিকে আর চোখ পড়ল না। রায়বাহাদুরের কথার জবাবে সে হাসতে-হাসতে বললে, 'দেখুন...আপনি এখনও—বলতে গেলে আমার কোনও পরিচয়ই পাননি।'

'যা পেয়েছি তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।'

রায়বাহাদুরের সরল বিশ্বাস সুজিতের মনে কাঁটার মতো বিঁধছিল, সে ঠিক করলে, আসল ব্যাপারটা তাঁকে জানাবে। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সে বললে, 'না, রায়বাহাদুর, আপনাকে এবার আমি গোটাকতক সত্যি কথা বলতে চাই। গোড়া থেকে আপনারা আমার সম্বন্ধে একটা অত্যন্ত ভুল ধারণা করে বসে আছেন, সেটা আমি এবার ভেঙে দিতে চাই।'

রায়বাহাদুর হাসতে-হাসতে বললেন, 'আপনার সম্বন্ধে ধারণা আর ভাঙবার নয়। আর কিছু না হোক, আমি মানুষ চিনি।'

সুজিত আরও লজ্জিত, আরও অসহায় বোধ করতে লাগল। কী আশ্চর্য! একটা অন্যায় হয়ে গেছে বলে সত্যি কথা বলবার চেষ্টা করলেও কেউ সে কথা শুনতে চাইবে না।

ড্রয়িং রুমে ঢুকতে-ঢুকতে সুজিত শেষবার চেষ্টা করল, 'তবু আজ সব কথা আপনাকে শুনতে হবে।'

রায়বাহাদুর বললেন, 'বেশ তো, শুনবোখন তার জন্যে তাড়াতাড়ি কীসের!'

ডাক্তার রায় এবং গোবিন্দ এই ঘরেই ছিল। রায়বাহাদুর ঘরে ঢুকতেই ডাক্তার রায় উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আপনিই কি রায়বাহাদুর অধরনাথ চ্যাটার্জি?'

রায়বাহাদুর, 'আজ্ঞে হ্যাঁ...কিন্তু আপনাকে তো ঠিক—'

ডাক্তার রায় বললেন, 'না, আপনার সঙ্গে আমার আগে দেখা হয়নি। আর হবেই বা কী করে বলুন। যা বিভ্রাটে পড়ে গেলাম রংপুর স্টেশনে নেমেই—কী বলব মশাই, আমায় কি না থিয়েটারে ধরে নিয়ে গিয়ে বলে গান গাও...!'

রায়বাহাদুর কিছুই বুঝতে পারছিলেন না, আশ্চর্য হয়ে ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন...

ফকির ওদের পিছনে-পিছনে ঘরে ঢুকে ক্রমাগত ইশারা করে যাচ্ছিল—এবার সুজিতের চোখ পড়ল সেই দিকে। সঙ্গে-সঙ্গে ব্যাপারটা সে অনুমান করে নিতে চেষ্টা কবল!

ডাক্তার বলছিলেন, 'শুধু তাই নয় মশাই...সং সাজিয়ে শেষে স্টেজের ওপব দাঁড় করিয়ে দিলে—এই জিজ্ঞাসা করুন গোবিন্দকে।'

গোবিন্দ সায় দিতে দেরি করল না, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, তা দিলে। পেলেটা কিন্তু খাসা ছিল।'

ডাক্তার রায় ধমকে উঠলেন, 'তুমি চুপ করো গোবিন্দ। খাসা প্লে ছিল। খাসা ছিল তো আমার কী! আমি কি থিয়েটারের অ্যাক্টর?'

গোবিন্দ বললে, 'আজ্ঞে না। তা কেন...।'

রায়বাহাদুর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সুজিতের দিকে চাইলেন। সুজিত ইশারা করে বোঝাবার চেষ্টা করল যে লোকটির বোধহয় মাথার ঠিক নেই।

রাযবাহাদুর বললেন, 'আপনি তা হলে কী?'

ডাক্তাব রায় বললেন, 'আমি...'

সুজিত দেখল, বোমা ফাটবার আর দেরি নেই। লোকটি নিশ্চয়ই ডাক্তার রায়, তিনি আসল পরিচয়টা দিয়ে ফেললেই তার সমস্ত রঙিন কল্পনা এক মুহূর্তে ধূলিসাৎ হবে। কথার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য সে তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করলে, 'আপনি কি তা হলে সত্যি অভিনয় করলেন?'

'অভিনয় করবো আমি? বলেন কী? আমি কি রংপুরে অভিনয় করতে এসেছি? কোথায় বলে...'

কোথায় কী বলে তা শোনবার ধৈর্য, প্রয়োজন বা সাহস সুজিতের ছিল না। সে বললে, 'ঠিক বলেছেন। কোথায় বলে রংপুর—একি অভিনয় করবার জায়গা! হ্যাঁ হত কলকাতা কি দিল্লি...।'

ডাক্তার রায় বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন, বললেন, 'না, না, আমি তা বলছি না, আমি বলছি যে...।'

সুজিত বললে, 'আপনাকে কিছু বলতে হবে না। আর একটি কথাও আপনার উচ্চারণ করবার দরকার নেই। আপনার মনের অবস্থা আমরা ভালো করে বুঝতে পারছি। বলেন কী মশাই, একটি নিরীহ নিষ্কলঙ্ক, নিরপরাধ লোককে ধরে স্টেজে নামিয়ে দেওয়া—এ কি মগের মুলুক! এখানে কি আইন নেই?'

রায়বাহাদুর সুজিতকে বললেন, 'দেখুন ডাক্তার রায়, আমরা এখনও এঁর পরিচয়টা ঠিক...।'

ডাক্তার রায় লজ্জিতভাবে বললেন, 'ওঃ! আমার পরিচয়টাই বুঝি দিতে ভুলে গেছি! আমি—।'

সুজিত বাধা দিয়ে বললে, 'উহুঁহুঁ, পরিচয় কী দেবেন আবার! পরিচয় তো আপনার মুখে লেখা রয়েছে। মুখ দেখে পরিচয় বুঝতে পারছেন না রায়বাহাদুর?'

'মুখ দেখে সকলের পরিচয় বোঝা যায় না।'

কথাটা বললে মঞ্জু, বিনোদের সঙ্গে ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে।

সুজিতের চোখের সামনে সব ঝাপসা ঠেকতে লাগল।

মঞ্জু শ্লেষ-তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললে, 'দেখুন না বিনোদবাবু, আপনার বন্ধু ডাক্তার রায়কে মুখ দেখেই চিনতে পারছেন তো?'

বিনোদ যেন আকাশ থেকে পড়ল।

'ডাক্তার রায়! কে বলল ইনি ডাক্তার রায়!'

মঞ্জু তেমনি বিদ্রুপভরা কণ্ঠে বলল, 'কে আর বলবে। উনি নিজেই নিজের পরিচয় দিয়েছেন। কারও জন্যে অপেক্ষা করেননি।'

বিনোদ একবার ভালো করে সুজিতের দিকে চাইল। এই লোকটাই তাকে ধাপ্পা দিয়ে সেদিন তাড়াতাড়ি এখান থেকে বিদায় করে দিয়েছিল, তার জন্যে তাকে কম নাকাল হতে হয়নি। বিনোদ ক্ষিপ্তকণ্ঠে বলে উঠল, 'এইযে দেখছি উনি কেমন ডাক্তার রায়। এখুনি পুলিশে খবর দিন। একে জেলে না পাঠিয়ে ছাড়ছি না।'

রায়বাহাদুরের মাথার মধ্যে সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। সুজিতকে তিনি সত্যি ভালোবেসে ছিলেন। বিনোদের ধমকানি তাঁর ভালো লাগল না; তিনি বলে উঠলেন, 'আঃ বিনোদ। তোমার মাথা খারাপ! কাকে যা তা বলছ জানো?'

বিনোদ বললে, 'জানি বইকী! একটা জোচ্চোর, একটা ধাপ্পাবাজ, একটা...' রাগে বিনোদ আর কথা খুঁজে পেল না, বাটারফ্লাই গোঁফটা শুধু ঠোঁটের ওপর নাচতে লাগল...।

বিনোদের কথার ভাবটা সুজিতই পূরণ করলে, 'হ্যাঁ, বলুন বলুন—একটা জালিয়াৎ।'

বিনোদ বললে,'—হ্যাঁ, একটা জালিয়াৎকে...।'

বলেই তার খেয়াল হল যে কথাটা সুজিত-ই জুগিয়ে দিয়েছে। সে আরও খেপে উঠল। সুজিতের মুখের দিকে জ্বলন্ত একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে বললে, 'আপনি...আপনি এখনও নির্লজ্জের মতো দাঁড়িয়ে কথা বলছেন।'

মঞ্জু বললে, 'ওইটেই যে ওঁর বিশেষত্ব!'

রায়বাহাদুর আর সহ্য করতে পারছিলেন না, তিনি মঞ্জুর দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'তোরা সবাই কি পাগল হয়ে গেলি নাকি? কী হচ্ছে কী! ব্যাপারটা কী তাই আগে জানতে চাই—'

বিনোদ বললে, 'আশ্চর্য! এখনও জানেননি! বুঝতে পারেননি কি আপনাকে কী রকমভাবে জঘন্য প্রতারণা করা হয়েছে। ডাক্তার রায় ভেবে যাকে আপনি সসম্মানে বাড়িতে জায়গা দিয়েছেন সে জাল।'

রায়বাহাদুর বিশ্বাস করলেন না, বললেন, 'জাল! কখনও না। হতে পারে না। বিনোদ তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

'আমার মাথা খারাপ হয়েছে?' বিনোদ গর্জে উঠল, 'জানেন আমি ছেলেবেলা থেকে ডাক্তার রায়কে চিনি—।'

রায়বাহাদুর দমলেন না, বললেন, 'তা হলে ছেলেবেলা থেকে তোমার মাথা খারাপ! আমার বাড়িতে, আমার অতিথিকে অপমান করবার কোনও অধিকার তোমার নেই।'

বিনোদ রাগ করে বললে, 'বেশ, আমি চাই না কোনও কথা বলতে।'

মঞ্জু বললে, 'তোমার মাননীয় অতিথির পরিচয় তা হলে তুমি নিতে চাও না বাবা?'

রায়বাহাদুর বললেন, 'আঃ, মা! তুই আবার এসবের ভেতর কেন? ওঁর কী আর পরিচয় নেব বলো তো? উনি যদি ডাক্তার রায় না হবেন তা হলে কে ডাক্তার রায়?'

ডাক্তার রায় এতক্ষণ নির্বাক বিস্ময়ে এই নাটকীয় কাণ্ড-কারখানা লক্ষ করছিলেন, এইবার এগিয়ে এসে বললেন, 'আজ্ঞে, আমি...।'

রায়বাহাদুর বিরক্ত হয়েই ছিলেন, আরও বিরক্তভাবে বললেন, 'হ্যাঁ বলুন কী বলবেন। আপনি জানেন কে ডাক্তার রায়?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই কথাই তো বলছি। আমি—'

'তবু আমি! আমি কীসের? কে ডাক্তার রায় তাই বলুন।'

'আজ্ঞে ডাক্তার রায় হলাম আমি অর্থাৎ আমিই ডাক্তার রায়। কিম্বা বলতে পারি, আমিও যে ডাক্তার রায়ও সে, অথবা—।'

'থামুন, থামুন। আমায় বুঝতে দিন। আপনি বলছেন, আপনিই আমেরিকা ফেরত দাঁতের ডাক্তার—।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার বিশ্বাস তাই—'

বিনোদ এর আগে ডাক্তার রায়কে দেখবার ফুরসত পায়নি, ডাক্তার রায় কথা বলতে শুরু করার সঙ্গে-সঙ্গেই সে তাঁর কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। এইবার ডাক্তার রায়কে জড়িয়ে ধরে সে বলে উঠল, 'এই তো—এই তো ডাক্তার রায়।'

বিনোদ এবার গর্বিত একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করল রায়বাহাদুরের দিকে। রায়বাহাদুরের মাথায় ভেতর ভূমিকম্প শুরু হয়েছিল, পায়ের তলায় মার্বেলের মেঝে ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছিল যেন; তিনি একান্ত অসহায় ভাবে সুজিতের দিকে চেয়ে বললেন, 'তা হলে, তা হলে ..।'

সুজিত বললে, 'বুঝেছি। সমস্যাটা এবার আমাকেই সরল করে দিতে হবে। দেখুন, আমি দাঁতের ডাক্তাব নই, হাত, পা, নাক, মুখ...কোনও কিছুরই ডাক্তার নই। আমি নিতান্ত নগণ্য সাধারণ একজন সুজিত চক্রবর্তী, কলিকাতা বেকার-সঙ্ঘের ভ্রাম্যমান অবৈতনিক সেক্রেটারি।'

বিনোদ বললে, 'জুয়োচোর-সঙ্ঘের সেক্রেটারি। আপনি যদি ডাক্তার রায়ই না হন তা হলে কী জন্যে ওই নামে এ বাড়িতে এসে উঠেছেন? কী জন্যে এতদিন ধরে এঁদের ঠকিয়েছেন? আপনার মতলব কী?'

'মতলব ওঁর অত্যন্ত গভীর!'—মঞ্জু বিদ্রুপেব আর একটা বাণ ছুঁড়ল।

বিনোদ বললে সুজিতকে, 'জানেন এব জন্যে আপনাকে জেলে যেতে হবে?'

সুজিতের অবস্থা দেখে ডাক্তার রায় নিজেই কুণ্ঠিত হয়ে পড়ছিলেন; বললেন, 'আঃ বিনোদ, উনি কী বলতে চান আগে ওঁকে বলতেই দাও না।'

সুজিত তাঁব দিকে চেয়ে বললে, 'ধন্যবাদ ডাক্তার রায়, আপনার নামটা বাধ্য হয়ে ক'দিন ব্যবহার করেছি বলে আপনার কাছে মার্জনা চাইছি। কিন্তু সত্যি জানবেন—অপরাধটা স্বেচ্ছাকৃত নয়। রংপুরে এসে পৌঁছন মাত্র এমন ঘটা করে ওই নামটা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয় যে আমি কিছু বলবার ফুরসতই পাইনি!'

বিনোদের রাগ তখনও পড়েনি, সে'বলল, 'ফুরসত কি এতদিনেও আপনার মেলেনি?

আপনি কি বুঝতে পারেননি যে নাম ভাঁড়িয়ে এভাবে এঁদের বাড়িতে থাকা জুয়োচুরি?'

'বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছি।' সুজিত ম্লান একটু হেসে আবার বলতে লাগল, 'তবু কেন জেনে শুনেও সত্য কথা বলতে পারিনি বা চলে যাইনি জানেন?'

কথাটা বলে সুজিত মঞ্জুর দিকে চাইল, যেন যে-কৈফিয়ত সে দিতে চলেছে সেটা শুধু মঞ্জুর জন্যেই। মঞ্জু আশ্চর্য হয়ে মুহূর্তের জন্যে তার মুখের দিকে চাইল, পরমুহূর্তেই মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে অন্যদিকে চাইবার চেষ্টা করল। ভালো করে লক্ষ করলেই বোঝা যেত —কঠিন বরফের গায়ে আগুনের আঁচ লেগেছে—।

সুজিত বললে, 'আমাদের মতো হতভাগাদের পক্ষে মিথ্যা জেনেও এমন স্বপ্ন ভেঙে ছেড়ে যাওয়া কঠিন বলে। দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র আর ভাগ্য মিলে আমাদের মতো হাজার-হাজার বেকার ছেলের সঙ্গে যে জুয়াচুরিটা করেছে তার কোনও খোঁজ রাখেন? আমরা শিক্ষা পেয়েছি, সে-শিক্ষার ভিতর দিয়ে বড়-বড় আশা-আকাঙ্খা আমাদের ভেতর জাগিয়ে বড়-বড় কীর্তির স্বপ্ন আমাদের দেখিয়ে, শেষকালে নিষ্ঠুর ভাবে আমাদের বুঝতে দেওয়া হয়েছে যে, আমাদের হাত-পা বাঁধা, কোনও দিকে কোনও ভরসা আমাদের নেই। নিজেদের কোনও যোগ্যতা আছে কি না সেটুকু যাচাই করবার সুযোগও আমরা পাব না। সব দিকের দরজা আমাদের কাছে বন্ধ, মাথা খুঁড়লেও সে দরজা খোলা যায় না.. ।'

সুজিত একবার ভালো করে চেয়ে দেখল সবার মুখের দিকে, তারপর ধরা গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে আবার বলতে শুরু করল, 'চারিদিকে এই নিস্ফলতা—তার মাঝখানে দৈব বোধহয় পরিহাস করে ক'দিনের জন্যে এই সৌভাগ্যের মরীচিকা আমাদের দেখিয়েছিল। তার প্রলোভন জয় করতে আমি পারিনি স্বীকার করছি, তার জন্যে যা শাস্তি দিতে হয় দিন, আমি প্রস্তুত আছি।'

সুজিতের কথা শেষ হওয়ার পর সবাই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কেবল দেখা গেল মঞ্জু ধীরে-ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

সুজিত তার কাছে গিয়ে বললে, 'আপনার কাছে আমার ক্ষমা চাওয়াটা বিশেষ ভাবে দরকার মঞ্জু দেবী—হয়তো আমি আপনার উপযুক্ত সম্মান সবসময় দিতে পারিনি।'

মঞ্জু ফিরে চাইল না সুজিতের দিকে...সে প্রায় ছুটতে-ছুটতে বেরিয়ে গেল। সুজিত মিনিটখানেক সেইদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর ফিরে এল আর সকলের কাছে। তারপর রায়বাহাদুরকে লক্ষ করে বললে, 'ইচ্ছে করলে আপনি আমায় জেলে দিতে পারেন রায়বাহাদুর, তবে আমার সঙ্গীটি নির্দোষ। শুধু আমার জেদেই তাকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও এখানে থাকতে হয়েছে। ওকে আমার অপরাধের সঙ্গে জড়াবেন না,—এই আমার অনুরোধ।'

ফকির এগিয়ে এসে বললে, 'হুঃ! তুমি একাই জেলে যাবে ভাবছ বুঝি! উহুঁ, সে হবে না। আমি তোমার সঙ্গ ছাড়লে তো!...নিন, যা করতে হয় চটপট করে ফেলুন রায়বাহাদুর।'

রায়বাহাদুর কুণ্ঠিতভাবে বললেন, 'আপনারা অত্যন্ত ভুল করছেন, জেলে দেবার কথা কি আমি বলেছি?'

সুজিত বললে, 'না বলে থাকলে সেজন্য আমরা অবশ্য আপনাকে পেড়াপীড়ি করব না। এখন আপনার অনুমতি পেলে আমরা আমাদের জিনিসপত্র নিয়ে বিদায় হতে পারি।' রায়বাহাদুর কী বলবেন ঠিক করতে পারছিলেন না, বললেন, 'আপনি চলে যাচ্ছেন...এতে অবশ্য আমার কিছু বলবার নেই....।'

'বলতে আপনি অনেক কিছুই পারেন। শুধু বলা কেন, জেলে না দিয়ে অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় করলেও আমরা বিস্মিত বা দুঃখিত হব না।'

'না-না, সে কী কথা। আমি বলছিলাম কী—সেই যখন যাবেনই, এ বেলাটা এখানে থেকে গেলে হতো না?'

বিনোদের আর সহ্য হল না, ব্যঙ্গকণ্ঠে বলে উঠল, 'এ যে জামাই বিদায় করছেন বলে মনে হচ্ছে রায়বাহাদুর! এরকম জালিয়াতকে জেলে না দেওয়া কত বড় অন্যায় তা ভেবে দেখেছেন?'

ডাক্তার রায় বিনোদের ওপর আগেই চটে ছিলেন, এ-কথার পর আর ভদ্রতা বজায় রাখতে পারলেন না, ক্ষিপ্তকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'তুমি বড় বেয়াদপ বিনোদ। না বুঝে শুঝে বড় বাজে বকো—।'

সুজিত এবার সত্যিই লজ্জিত বোধ করল, ডাক্তারের কাছে এসে বললে, 'আপনার মতো লোকের নাম জাল করাও সৌভাগ্য বলে মনে হচ্ছে।'

রায়বাহাদুরের দিকে চেয়ে সুজিত বললে, 'আপনাকে আর একবার—শেষবার ধন্যবাদ জানিয়ে যাই রায়বাহাদুর। লজ্জাবোধ করবার ক্ষমতা ভেবেছিলাম অসাড় হয়েই গেছে, কিন্তু আপনার কাছে আজ সত্যিকার লজ্জা পেয়ে গেলাম। যাও ফকিরচাঁদ, আমাদের জিনিসগুলো নামিয়ে নিয়ে এস।'

ফকির নিঃশব্দে ওপরে উঠে গেল।

সুজিত ফকিরকে নিয়ে চলে গেছে প্রায় মিনিট পনের আগে। ওদের যাওয়ার সময় মঞ্জু দেখা করাটাও দরকার মনে করেনি! ওপরে উঠে এসে সেই যে নিজের ঘরে ঢুকেছে, এখনও সেইখানেই—জানলার ধারে চুপ করে বসে আছে।

রমা হাঁফাতে-হাঁফাতে ঘরে ঢুকে বললে, 'ছি, ছি, কী ঘেন্নার কথা! সব শুনেছিস তো মঞ্জু?'

মঞ্জুর তরফ থেকে কোনও জবাব পাওয়া গেল না।

রমা ওর কাছে এসে বললে, 'একেবারে পাকা জুয়োচোর! আমাদের সকলের চোখে এমন করে ধুলো দিয়ে গেল।'

মঞ্জু এবার মুখটা ফিরিয়ে রমার দিকে চাইল বটে, কিন্তু কিছু বলা দরকার মনে করলে না। রমা বলতে লাগল, 'মামাবাবুরই অন্যায়। না জেনে শুনে যাকে তাকে একেবারে জামাই আদরে বাড়িতে এনে তুললেন! এটা কি তাঁর উচিত হয়েছে? এমন জানলে আমরা তার সামনে বেরোতাম, না কথা কইতাম!'

'তা কইতে না বটে!' মঞ্জু এতক্ষণে কথা বলল, 'বিলেত ফেরত নয়, ডাক্তার নয়, সামান্য একটা নিষ্কর্মা বেকার...এর সঙ্গে আবার কীসের মেলামেশা!'

মঞ্জুর কথার উহ্য খোঁচাটা রমার মগজ পর্যন্ত পৌঁছল না, সে উৎসাহিত হয়ে বললে, 'নিশ্চয়ই। আমার এখন যা রাগ হচ্ছে! মামাবাবু কী বলে ওকে অমনি ছেড়ে দিলেন তা জানি না। এমন জোচ্চোরকে পুলিশে দেওয়া উচিত ছিল।'

মঞ্জু আর একবার রমার মুখের দিকে চাইল ভালো করে, তারপর হাসতে-হাসতে বললে, 'তোমার রাগটাই বেশি মনে হচ্ছে? মনে হচ্ছে তুমিই যেন সবচেয়ে বেশি ঠকেছ?'

রমা এবারও খোঁচাটা ধরতে পারলে না, বললে, 'মাথামুণ্ডু নেই, কী যে কথা বলো।

আমি একা ঠকব কেন! সবাই তো ঠকেছে। ও যে ডাক্তার রায় নয়, একটা জোচ্চোর তা কি কেউ বুঝতে পেরেছিল?'

মঞ্জুর মুখে আরও একটা শক্ত কথা এসে পড়ছিল, কিন্তু তার আগেই পিসিমা অর্থাৎ রাজলক্ষ্মী দেবীর কাংস্যবিনিন্দিত কণ্ঠে বারান্দা এবং আশপাশ চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠল, 'ফেলে দে দূর করে ফেলে দে স্যুটকেশ। ও আবার ফেরত দিতে যেতে হবে।'

রাজলক্ষ্মী হাঁফাতে-হাঁফাতে মঞ্জুর ঘরে ঢুকলেন। পিছনে স্যুটকেশ হাতে একজন চাকর।

'কী হয়েছে মা? এতো চেঁচাচ্ছ কেন?'—রমা জিজ্ঞাসা করলে।

'চেঁচাব না?' রাজলক্ষ্মী বর্তুলাকার শরীরটি উত্তেজনার আতিশয্যে ঘোরাতে-ঘোরাতে বললেন, 'দাদার জন্যেই তো এই ফ্যাসাদ। যত রাজ্যের জোচ্চার, জালিয়াত, বদমাইশকে উনি ঘরে এনে তুলবেন খাতির করে আর তোমায় আমায়—।'

'কী হল কী?'—রমা উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল, 'কিছু চুরি করে পালিয়েছে নাকি? আমি তো তখন থেকে বলছি পুলিশে দিতে...।'

জুয়োচোর, জালিয়াত, চোর...শুনতে-শুনতে মঞ্জু অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, এবার আর চুপ করে থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলে, 'কী হয়েছে কী পিসিমা জানতে পারি! কী চুরি গেছে?'

রাজলক্ষ্মী বললেন, 'চুরি গেছে কি না জানি না বাপু, তবে সেই দুই জোচ্চোরে তাদের ঘরে একটা স্যুটকেশ ফেলে গেছে। এখন এই স্যুটকেশ নিয়ে কী করি বলো?'

মঞ্জু বা রমা কিছু বলবার আগেই তিনি চাকরটাকে লক্ষ করে বলে উঠলেন, 'দাঁড়িয়ে আছিস কেন হতভাগা? ও স্যুটকেশ রাস্তায় ফেলে দিয়ে আয়গে। খাতির করে ওদের আবার ফিরিয়ে দিয়ে আসতে হবে নাকি? যা, ফেলে দিগে যা...।'

ফেলে দেওয়াটা ঠিক যুক্তিযুক্ত হবে কি না বুঝতে না পেরে চাকরটা ইতস্তত করতে লাগল।

মঞ্জু বললে, 'না দাঁড়াও, রাস্তায় ফেলতে হবে না।'

রাজলক্ষ্মী আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'রাস্তায় না ফেলে কী করবে কী? কোথাকার চোরাই মাল কে জানে—বাড়িতে রেখে শেষে আর একটা ফ্যাসাদ হোক আর কী!'

মঞ্জু বেশ দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠল, 'বাড়িতে রাখতে হবে না, ও স্যুটকেশ আমি ফিরিয়ে দিয়ে আসছি।'

রমা আর রাজলক্ষ্মী—মা ও মেয়ে দুজনেই অবাক হয়ে মঞ্জুর মুখের দিকে চাইল। রমা বললে, 'বলো কী মঞ্জু! তুমি নিজে স্যুটকেশ ফেরত দিতে যাবে? সেই জোচ্চোরটার কাছে... ।'

মঞ্জু তাচ্ছিল্য ভরা একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করল ওদের দুজনের দিকে, তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে-যেতে বললে, 'হ্যাঁ...।'

চাকরটি স্যুটকেশ সমেত তাকে অনুসরণ করল।

নিচে নেমে মঞ্জু গাড়ি বার করে সোজা স্টেশনের দিকে রওনা হল। চাকরটার কাছ থেকে স্যুটকেশটা নিতে ভুলল না।

মঞ্জু যখন স্টেশনে পৌঁছল তখন ট্রেন ছাড়বার ঘণ্টা পড়েছে। চারিদিকে লোকজনের ভিড়, ছুটোছুটি।

বুকিং অফিসের সামনে এসে মঞ্জু ক্লার্ককে জিজ্ঞাসা করলে, 'ট্রেন কি এখনই ছেড়ে দেবে নাকি?'

'হ্যাঁ, এই তো ছেড়ে দিলে।'

স্যুটকেশ হাতে মঞ্জু ছুটল প্ল্যাটফর্মের দিকে। হুইসল পড়ল ট্রেনের। গার্ড পতাকা নাড়লে।

মঞ্জু ট্রেনের কামরাগুলোর দিকে দৃষ্টি রেখে ছুটছিল—ট্রেন ধীরে-ধীরে চলতে শুরু করল, কিন্তু ফকির বা সুজিতের কাউকে চোখ পড়ল না। ট্রেন ক্রমশ প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে দূরে, আরও দূরে চলে গেল। মঞ্জু দাঁড়িয়ে রইল উদাস চোখে সেই দিকে চেয়ে।

কে বলবে এ সেই মঞ্জু, যে ব্রিচেস পরে, ঘোড়ার চড়ে, কথায় যার ছুরির ফলার ধার?

হঠাৎ পিছন থেকে সুজিতের গলা শোনা গেল, 'একি মিস চ্যাটার্জি! আপনি এখানে?'

মঞ্জু চমকে উঠল। মুখ ফিরিয়ে দেখল, সত্যি সুজিত আর ফকির! বিস্ময় আর আনন্দের ঘোরটা কাটিয়ে উঠতে-উঠতে মঞ্জু বললে, '...আমি...আমি...মানে আপনি তা হলে. যাননি?'

'না, এখনও যাবার সুবিধে পাইনি।'

'তা হলে যাবেন কখন? ট্রেন তো এইমাত্র ছেড়ে গেল।'

'তা গেল বটে, কিন্তু ট্রেন ছাড়লেই তাতে উঠে বসব, এতটা বেহিসেবি বাউণ্ডুলে এখনও হয়ে উঠতে পারিনি। যে ট্রেনটা ছেড়ে গেল সেটা আমাদের নয়। কলকাতায় যাবার ট্রেন এইবার ছাড়বে।'

মঞ্জু যেন একটু দমে গেল, বললে, 'আপনি তা হলে কলকাতায় যাচ্ছেন?'

'একটা কোথাও যেতে তো হবে। তা ছাড়া ভেবে দেখলাম মিস চ্যাটার্জি, যে ডুবতে হলে কুয়োর চেয়ে সমুদ্রে ডোবাই ভালো। বেকার যদি হতেই হয় তো কলকাতায় হওয়ার একটা মহিমা আছে, কি বলুন '

মঞ্জু উত্তর দিল না, বোধ হয় একটু আনমনা হয়ে গেল। হাতের স্যুটকেশটা এগিয়ে দিতে-দিতে বললে, 'আপনি এই স্যুটকেশটা ফেলে এসেছিলেন। মনে পড়েনি বোধহয়!'

'মনে খুব পড়েছিল, কিন্তু ফিরে চাইতে যাবার সাহস ছিল না।'

সুজিত হাসবার চেষ্টা করল। মঞ্জুও হেসে ফেলল।

সুজিত বললে, 'আপনি নিজে এটা পৌঁছে দিতে আসবেন আমি কল্পনা করতে পারি নি। আপনাকে কী করে যে ধন্যবাদ জানাব—।'

মঞ্জু এতক্ষণ সুজিতের দিকে চেয়েছিল, হঠাৎ মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিল।

সুজিত একটা দীর্ঘশ্বাস লুকোবার চেষ্টা করে বলতে লাগল, 'মনে হচ্ছে এতক্ষণে আপনি আমাদের ক্ষমা করতে পেরেছেন। এখান থেকে অন্তত সেই সান্ত্বনাটুকু নিয়ে যেতে পারব।'

'আপনি বোধহয় তাতেই সন্তুষ্ট?'—মঞ্জু হঠাৎ ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে উঠল।

'নিশ্চয়ই! তবে বেশি আর কী আশা করতে পারি বলুন!'

মঞ্জুর কণ্ঠস্বর হঠাৎ আশ্চর্য রকম কঠিন হয়ে উঠল, সে জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনি এখানে কেন এসেছিলেন বলতে পারেন?'

'এত কাণ্ডকারখানার পর এরকম একটা ছেলেমানুষি প্রশ্ন করবার কোনও মানে হয় না কি?'

সুজিত একটু ঘাবড়ে গিয়ে আবার বললে, 'নিয়তির টানে বলতে পারেন। তবে আনত কাজের খোঁজে...।'

'কাজের খোঁজে! আপনি কাজ করবেন? কাজ করতে আপনি যেন সত্যিই চান?' কথাগুলো বলতে-বলতে মঞ্জু এমন উত্তেজিত হয়ে উঠল যে সুজিতের মতো ছেলেকেও আশ্চর্য হতে হল।

একটু অপ্রস্তুত ভাবেই সে বললে, 'কাজ চাই না! কী বলছেন আপনি? তা হলে এতদিন কী জন্যে ব্যাকুল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি?'

মঞ্জু এবারে যেন ফেটে পড়ল, 'সেটা আপনার সখ, আপনার বিলাস। কাজের খোঁজ করা আপনার কাছে একটা ছল মাত্র। আসলে আপনি এমনি করে ভেসে বেড়াতেই ভালোবাসেন। কোনও বন্ধন, কোনও দায়িত্ব আপনি মানতে শেখেননি। আপনার কাছে কিছুরই দাম নেই, সবই আপনার কাছে খেলা—।'

বলতে-বলতে মঞ্জুর গলা ভেঙে এসেছিল, হঠাৎ হাতের স্যুটকেশটা সশব্দে প্ল্যাটফর্মের ওপর নামিয়ে রেখে বললে, 'এই নিন আপনার স্যুটকেশ, যেখানে খুশি আপনি যেতে পারেন এখন—।'

বিস্মিতবিহ্বল সুজিত ভাবলে, এ আবার কী! এত দিন যে-মেয়ে তাকে আঘাত না করে কথা কয়নি, আজ সবাই যখন তাকে সাধারণ একটা বাউণ্ডুলে মনে করে বিদায় করে দিল, ঠিক সেই মুহূর্তে...

সুজিত বিহ্বল কণ্ঠে ডাকলে, 'শোনো, মঞ্জু—।'

'না। আর কিছু শুনতে চাই না। আপনার মতো লোকের সঙ্গে জীবনে আর দেখা হবে না, এইটেই আমি সৌভাগ্য বলে মনে করি।'

সুজিত কোনও কথা বলবার আগেই দেখা গেল মঞ্জু দ্রুত পায়ে তাদের কাছ থেকে অনেকটা দূরে চলে গেছে।

ফকির এতক্ষণ নির্বাক বিস্ময়ে এক পাশে দাঁড়িয়েছিল, এইবার কথা বলবার অবসর পেল। বললে, 'আমি গোড়া থেকেই জানি মেয়েটার মাথায় ছিট আছে! কী আবোল-তাবোল বকে গেল দেখ তো!'

সুজিত ম্লান একটু হাসল। কথা বলবার মতো মনের অবস্থা তখন তার নয়।

ফকির বললে, 'কী হে! কথা কইছো না যে?'

সুজিত বললে, 'কথা তো দিনরাতই বলছি ফকির, জীবনে শুধু কথা বলতেই তো শিখেছি। আজ একটু চুপ করে থাকতে দাও।'

সুজিতের মুখের দিকে চেয়ে ফকির আর কিছু বলতে পারল না।

কলকাতা যাবার ট্রেন ছাড়বার ঘণ্টা পড়ল।

সুজিত প্ল্যাটফর্ম থেকে স্যুটকেশটা তুলে নিয়ে ট্রেনের দিকে পা বাড়াল, পিছনে-পিছনে চলল ফকির।

দিন কয়েক পরের কথা।

কলকাতার এক অখ্যাত গলিতে কলিকাতা বেকার সঙ্ঘের অফিস। অফিস ঘরটিকে

দেখে যদিও অফিস বলে মনে হওয়া শক্ত, কিন্তু ঘরটি বেশ বড়। ঘরের মেঝেয় খানকয়েক মাদুর-পাতা এবং এই মাদুরগুলিতে সভ্যদের ভিড়। একদল ক্যারাম খেলায় ব্যস্ত, একদল কন্ট্রাক্ট ব্রিজের হাঁক-ডাকে মত্ত, আর একদল পাশার ঘুঁটি নিয়ে উন্মত্ত। অবশ্য এইটুকু বললেই বেকার সঙ্ঘের সবটুকু পরিচয় দেওয়া হয় না। ঘরের এক প্রান্তে বড় একটা টেবিল, খানকয়েক চেয়ারও আছে এবং এই চেয়ারগুলি দখল করে আপাতত যারা বিরাজ করছে তাদের দুজনকে আমরা চিনি। এরা সুজিত আর ফকির।

সুজিত তার সামনের ছেলেটির দিকে চেয়ে বললে, 'হ্যাঁ, এই আমার শেষ কথা।'

ছেলেটির নাম অশোক। অশোক বললে, 'কিন্তু কেন বলো দেখি? এতদিন ধরে বেকার সঙ্ঘে আছ, এ-সঙ্ঘ একরকম নিজের হাতেই গড়ে তুলেছ, এখন তুমি ছেড়ে যাবে কেন?'

সুজিত বললে, 'সত্যিকার কিছু গড়তে পারিনি বলেই ছেড়ে যাব। হুজুক করা ছাড়া আর কী আমরা করেছি বলতে পারো? সমাজ, রাষ্ট্র আর ভাগ্যকে দোষ দিলে তো চলবে না। আমরা নিজেদের দোষেও বেকার।...আলসেমি করে একটু আড্ডা দিতে পারলে আমরা আর কিছু চাই না।'

সুজিত চেয়ার ছেড়ে উঠল—যেদিকে তাস খেলা চলছিল এগিয়ে গেল সেই দিকে। খেলায় মত্ত চারজন হাতের তাসের দিকে তন্ময় হয়ে চেয়ে সিগারেট কিম্বা বিড়ি টানচে। গা-জ্বালা কবতে লাগল যেন সুজিতের। দিনের-পর-দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়া গলাধঃকরণ আর ক্যালবার্টসনের আদ্যশ্রাদ্ধ!

সুজিত একজনের হাতের তাসগুলো টেনে নিয়ে মেঝেয় ছড়িয়ে ফেলে দিল। সে এবং অপর তিনজন প্রায় সমস্বরে আর্তনাদ করে উঠল, 'আরে, করো কী!'

সুজিত বললে, 'বেকার সঙ্ঘ কি এরই জন্যে করা হয়েছিল নাকি?'

ও পক্ষের জবাব পাওয়ার আগেই সে এগিয়ে গেল পাশা খেলোয়াড়দের দিকে। ছকটা টেনে ফেলে দিয়ে সুজিত বললে, 'এরই নাম বোধ হয় বেকার সমস্যার মীমাংসা কী বলো?'

খেলোয়াড়রা মর্মাহত হয়ে উঠে দাঁড়াল। হঠাৎ নিকটতম আত্মীয়ের মৃত্যুসংবাদ পেলেও তারা বোধ হয় এতটা ব্যথা পেত না।

সুজিত বললে, 'দল বেঁধে আড্ডা দেওয়াকে গালভরা একটা নাম দিলেই সেটা বড় জিনিস হয়ে ওঠে না। তার জন্যে ত্যাগ দরকার, সাধনা দরকার।—না ভাই, আমায় তোমরা মাপ করো। এ-তামাসা অনেকদিন হয়েছে, আর নয়।'

বেকার সঙ্ঘ গড়ে তোলার মূলে সুজিতের প্রচেষ্টাই ছিল সবচেয়ে বেশি, সবাই তাকে ভালোবাসত যেমন, শ্রদ্ধা-ভয়ও করত ঠিক তেমনি। তার মুখের ওপর কথা বলার ক্ষমতা অনেকেরই ছিল না।

অশোক শুধু বললে, 'এখন যাচ্ছ যাও, কাল সকালেই আবার ধরে নিয়ে আসব।'

সুজিত বললে, 'না ভাই, তা পারবে না, কারণ, এখন থেকে আমার নিজের ঠিকানা আমি নিজেই জানি না।'

ফকির এগিয়ে এসে বললে, 'চলো তা হলে। একসূত্রে বাঁধিয়াছি দুইটি জীবন।'

সুজিত বললে, 'না ফকিরচাঁদ, এবার আমার দুর্ভাগ্যের সঙ্গে তোমাকেও আর জড়াতে চাই না। এবার আমায় একাই যেতে হবে। গুড বাই টু ইউ অল।'

সুজিত চলে গেল। ফকির ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে রইল।

অশোক জিজ্ঞাসা করলে, 'কীহে! সুজিতের হঠাৎ বৈরাগ্য উদয় হল যে?'

টেবলে বসে ছেলেদের একজন একতাড়া চিঠি নিয়ে বাছছিল, ফকির কিছু বলবার আগেই সে বললে, 'কিছু না ভাই কিছু না, বক্তৃতার একটা প্যাঁচ মেরে গেল।'

ক্যালবার্টসন-পন্থীরা আবার তাস নিয়ে বসল। ছড়ানো তাসগুলো কুড়োতে-কুড়োতে তাদের একজন বললে, 'ধ্যেৎ! আমাদের নির্ঘাত রাবারটা মাটি হয়ে গেল।'

পাশার দলও ছক সাজাতে লাগল। তাদের একজন বললে, 'আরে দূর, আমার তিনটে ঘুঁটি পেকে এসেছিল।'

যে ছেলেটি চিঠি বাছাই করছিল সে হঠাৎ মুখ তুলে বললে, 'ওকে ডাক ভাই—সুজিতকে, শিগগির—ওর একটা চিঠি আছে।'

ফকির তাড়াতাড়ি টেবলের কাছে এগিয়ে এল।

অশোক বললে, 'তাকে এখন পাবে কোথায়! ঠিকানাও তো বলে গেল না যে পৌঁছে দেওয়া যাবে!'

চিঠি বাছাইয়ে নিযুক্ত ছেলেটি হাতে একখানা খাম নিয়ে নাড়াচাড়া করতে-করতে বললে, 'চিঠিটার একটু বিশেষত্ব আছে মনে হচ্ছে। খামটার চেহারা দস্তুরমতো বনেদী, ছাপ দেখছি রংপুরের—'

'রংপুরের! দেখি—'

ফকির হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিয়ে নিল।

অশোক বললে, 'রেখে দাও তোমার কাছে, যদি ঘুরে আসে তা হলে পাবে।'

ফকির খামখানা টেবলের ড্রয়ারে সযত্নে তুলে রাখল।

রায়বাহাদুর অধরনাথ চ্যাটার্জি ড্রয়িংরুমে বসে ডাক্তার রায়ের সঙ্গে আলাপ করছিলেন। মঞ্জুও ছিল সেখানে।

রায়বাহাদুর হঠাৎ কী যেন ভাবতে-ভাবতে বলে উঠলেন, 'মিস্টার রায়, তিন তিনখানা চিঠি দিলাম বেকার সঙ্ঘের ঠিকানায়, তবু একটার উত্তর নেই! দেখেছেন তার ব্যবহারটা। বলুন তো এতে রাগ হয় কি-না!'

ডাক্তার রায় বললেন, 'হয়তো চিঠি সে পায়নি।'

'পায়নি মানে?' রায়বাহাদুর বললেন, 'নিশ্চয়ই পেয়েছে। পেয়েও সে উত্তর দেয়নি। আমি ভালো করে জানি তার এইরকম স্বভাব।...যাক চিঠি না দিলে আমার বয়ে গেল। আমি যেন তার জন্যে ভেবে-ভেবে সারা হয়ে যাচ্ছি। হুঁঃ।'

চেয়ার থেকে উঠে তিনি এবার ঘরময় পায়চারি শুরু করে দিলেন। বোঝা গেল চিন্তার ঝড় উঠেছে মনে। কয়েক মিনিট এইভাবে পায়চারি করতে-করতে তিনি ডাক্তার রায়ের সামনে এসে থামলেন এবং পুনশ্চ বলতে শুরু করলেন, 'তার কীসের এত রাগ অভিমান বলতে পারেন? ভুল যা হবার তা তো হয়েই গেছে। ব্যস, আমি তো তার জন্যে কিছু বলিনি বাপু। তবে হ্যাঁ, চলে যাওয়ার সময় অবশ্য ধরে রাখিনি। কেন তা রাখব শুনি? আমার শরীরে কি রাগ থাকতে নেই? কিন্তু তারপর যে এতবার করে ফিরে আসতে লিখলাম...'

ডাক্তার রায় বিব্রত বোধ করছিলেন রায়বাহাদুরের অজ্ঞতায়।

মঞ্জু হঠাৎ বলে উঠল, 'কেন তা লিখতে গেলে বাবা? তিনি পরের নাম জাল করে

তোমায় ঠকিয়ে গেলেন, আর তুমিই যেন তাঁর কাছে দোষী হয়ে আছ! কেন?—কী দরকার ছিল অমন লোককে আসতে অনুরোধ করবার?'

রায়বাহাদুর বললেন, 'কিছু না, কিছু না! কোথাকার একটা ভবঘুরে বাউণ্ডুলে, দু-দিনের জন্য এসে ধাপ্পা দিয়ে ডাহা ঠকিয়ে চলে গেল, তাকে আবার ফিরে আসতে লেখে! কেন যে তখন আমার তাকে হঠাৎ ভালো লেগে গিয়েছিল!—'

'অমন অপদার্থ লোককে ভালোলাগা একটা অপরাধ, অন্যায়।' বলতে-বলতে মঞ্জুও উঠে দাঁড়াল।

রায়বাহাদুর মঞ্জুর দিকে চেয়ে বললেন, 'ঠিক বলেছ মা। বুঝেছেন ডাক্তার রায়, মঞ্জু ঠিক কথা বলেছে। ওরকম একটা অপদার্থ অকর্মণ্যকে ভালোলাগার কোনও মানে হয়? মঞ্জু তাই তার ওপর গোড়া থেকেই চটা।'

ডাক্তার রায় হাসতে-হাসতে বললেন, 'আপনারা দুজনেই তার ওপর একটু বেশি চটা বলে মনে হচ্ছে!'

মঞ্জু ততক্ষণে ঘর ছেড়ে চলে গেছে।

রায়বাহাদুর বললেন, 'চটব না! জানেন, আর একটু হলেই মঞ্জুকে আমি ওর হাতে তুলে দিয়েছিলাম। অবশ্য তখন সে যে আপনি নয়—মানে আপনি যে সে নয়—অর্থাৎ... '

'অর্থাৎ তাকে ডাক্তার রায় মনে করেছিলেন।'

'ঠিক বলেছেন। উঃ, কী ভুলই করতে যাচ্ছিলাম বলুন তো।'

বলবার আগে ডাক্তার রায় কী যেন ভাবলেন, তারপর বললেন, 'কিন্তু ভুলটা যে এখনও করতে যাচ্ছেন রায়বাহাদুর। আপনি আমার আর মঞ্জুর সম্বন্ধে যা ভেবেছেন—'

'না, না, আর আমায় নিরাশ করবেন না ডাক্তার রায়। মা-মরা মেয়ের বাপ হওয়া যে কত ঝঞ্ঝাট তা আপনি বুঝবেন না। ওকে উপযুক্ত হাতে তুলে না দেওয়া পর্যন্ত আমার স্বস্তি নেই। এইটুকু আমায় অনুগ্রহ করুন। আমার মেয়ে কোনও দিক থেকে আপনার অযোগ্য হবে না, এইটুকু আমি আপনাকে জোর করে বলতে পারি।'

ডাক্তার রায় রীতিমতো বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন; এই ক'দিনে মঞ্জুকে জানবার যতটুকু সুযোগ তাঁর হয়েছে তাতে তাকে তিনি আদৌ বুঝে উঠতে পারেননি। এ অবস্থায়...।

তিনি বললেন, 'আমি নিজের যোগ্যতার কথা ভাবছি রায়বাহাদুর। আমিও তো ওঁর অযোগ্য হতে পারি।'

অধরনাথ বললেন, 'কী যে বলেন আপনি!'

ডাক্তার রায় বললেন, 'না রায়বাহাদুর, আমার কথা আপনাকে শুনতে হবে। দেখুন সারাজীবন শুধু পড়াশুনো নিয়েই কাটিয়েছি, জীবনে অন্য কোনও কথা ভাবিনি। অন্য কিছু জানি না, সাত সমুদ্দুর পার হয়ে বিদ্যে হয়তো কিছু শিখে এসেছি, কিন্তু সাধারণ ব্যাপারে নিজের বাড়িতেও আমি এখনও একান্ত অসহায়। যাকে বিয়ে করব তার কাছে আমি বোধহয় ঝঞ্ঝাটের বোঝা ছাড়া আর কিছুই হতে পারব না! জেনে শুনে এ বোঝা আমি কারও ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাই না।'

রায়বাহাদুর হাসতে-হাসতে বললেন, 'আপনার মতো লোকের বোঝা বওয়া যে কোনও মেয়ের পক্ষে সৌভাগ্য।'

ডাক্তার রায় ভালো করে কিছু ভাবতে পারছিলেন না, এই ক'দিনের সামান্য

মেলামেশায় তাঁর নিভৃত্ত মনের স্থির-সমুদ্রে ঝড়ের বাতাস যে ওঠেনি একথা বলা যায় না, কিন্তু তাই বলে...।

তিনি অসহায় ভাবে, কতকটা নিজের মনেই বলে উঠলেন, 'কিন্তু মঞ্জুর কি মত আছে?'

'তার মত? তার কখনও অমত হতে পারে!' রায়বাহাদুর অবিশ্বাসের হাসি হাসলেন।

ডাক্তার রায় তবু ইতস্তত করতে লাগলেন, বললেন, 'না রায়বাহাদুর, তার মতটা তবু জিজ্ঞাসা করা দরকার।'

রায়বাহাদুর বললেন, 'বেশ, আজই জিজ্ঞাসা করুন। এ আর কী!'

অধরনাথ বাড়ির ভিতরে এসে রাজলক্ষ্মীর কাছে কথাটা পাড়লেন। শুনে রাজলক্ষ্মীর মুখ শুকিয়ে গেল।

'বল কী দা'দা! মঞ্জু বিয়ে করতে রাজি হবে ডাক্তার রায়কে! তুমি জিজ্ঞাসা করতে বলো করছি, কিন্তু আমার মুখ ব্যথাই সার।'

'কেন বলো তো? ও কি রাজি হবে না মনে হচ্ছে?'

'চোখ থাকতে যদি দেখতে না পাও, আমি কী করব! ক'দিন ধরে ওর ভাবগতিক লক্ষ করেছ? হাসি নেই, মুখে কথা নেই; দিন-রাত যে-মেয়ে দস্যিগিরি করে বেড়াত, বাড়ি থেকে সে বার হয় না।'

মঞ্জু বাড়ি থেকে বেরোয় না, খেলাধুলো ছেড়ে দিয়েছে! রায়বাহাদুর উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন, 'কই, আমি তো কিছু জানি না। অসুখ-বিসুখ কিছু করল নাকি?'

রাজলক্ষ্মী একটা অদ্ভুত মুখভঙ্গি করে বললেন, 'তুমি কোথা থেকে জানবে বলো! এ তো বাইরের অসুখ নয়। বুকেব ব্যারাম গো, বুকেব ব্যাবাম।'

'বুকের ব্যারাম! মঞ্জুর বুকের দোষ হয়েছে আর তোরা আমায় কিছু জানাসনি, একটা ডাক্তার পর্যন্ত ডাকানো দরকাব মনে করিসনি।'

দুশ্চিন্তায়, উত্তেজনায় রায়বাহাদুর চটে উঠলেন।

যে ঘরে কথাবার্তা হচ্ছিল, মঞ্জু আসছিল সেই ঘরেই। পিসিমার কথাগুলো বাইরে থেকেই তার কানে গেল। তার মুখ গম্ভীর হল, ভিতরে না গিয়ে সে বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। ভিতরে রাজলক্ষ্মী বলছিলেন, 'শোনো কথা! ডাক্তার কী করবে। পারো তো সেই জোচ্চারটাকে ধরে আনো—খাতির করে যাকে ঘরে ঢুকিয়েছিলে। সে গিয়ে অবধি মেয়ে চোখে অন্ধকার দেখছে। খাওয়া নেই, ঘুম নেই—'

'তুই কার কথা বলছিস? সেই সুজিত?'

'হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তোমার সেই পেয়ারের জালিয়াত সুজিত। মেয়ে তো তারই জন্যে হেদিয়ে মরছে। ডাক্তার রায়কে বিয়ে করতে রাজি হবে ও? ডাক্তার রায়ের সঙ্গে হেসে দুটো কথা কইতেও তো এ পর্যন্ত দেখলাম না।'

শেষ কথাটা রাজলক্ষ্মী অবশ্য একটু রং চড়িয়ে বললেন। মঞ্জুর কবল থেকে ডাক্তার রায় উদ্ধার পাক, এইটেই তাঁর আন্তরিক ইচ্ছে, তা হলে রমার এগোবার পথটা পরিষ্কার হয়।

রায়বাহাদুর চিন্তিত ভাবে পায়চারি করতে-করতে বললেন, 'তাই তো, একথা তো ভাবতে পারিনি। আমি যে বড় আশা করেছিলাম ডাক্তার রায়ের হাতে মঞ্জুকে তুলে দিয়ে একটু নিশ্চিন্ত হব। কিন্তু ওর যদি এ বিয়েতে মত না থাকে, ও যদি অসুখী হয়...।'

রায়বাহাদুর অধরনাথ যেন দুস্তর সমুদ্রের মাঝখানে হালহারা ভাঙা নৌকোর [illegible] লাগলেন।

বাইরে থেকে মঞ্জু সব কথাই শুনল। এবার ধীরে-ধীরে সেখান থেকে চলে গেল। ঘরের ভেতর মঞ্জুর পিসিমা আবার ঝঙ্কার দিলেন, 'এখন বোঝো! বেয়াড়া আদর দিয়ে মঞ্জুর মাথাটি খেয়েছ—।'

'আদর! আদর! তোরা কেবল আদরই দেখছিস!'—রায়বাহাদুর আর রাগটা চাপতে পারলেন না, 'মা-মরা মেয়ে দুটো একটু হেসে খেলে বেড়ায়, তাতেও কি দোষ! কী শাসন ওদের করব বলতে পারিস? নিজে মা হয়ে তুই ওদের দুঃখ বুঝিস না?'

রাজলক্ষ্মীর মন আরও বিষিয়ে উঠল, গলার স্বর আর এক পর্দা চড়িয়ে দিয়ে তিনি বললেন, 'তা আমি ওদের দুঃখ বুঝব কী করে! বাপের বোন পিসি, তাও বিধবা হয়ে তোমার ঘাড়ে পড়ে আছি, আমি হলুম পর। বেশ তো, মেয়ের দুঃখ ঘোচাতে আনো না আদর করে সেই জোচ্চোরটাকে ডেকে—'

রায়বাহাদুর বললেন, 'জোচ্চোর কে নয়, অবস্থাগতিতে তাকে জোচ্চোর সাজতে হয়েছিল, আর সে যাই হোক না কেন, আমার মেয়ের সুখের কাছে কোনও বিচার আমার নেই, পারলে আমি তাকেই ডেকে আনতাম।...কিন্তু তাব খোঁজ কি আর পাব!'

রাজলক্ষ্মী আর কিছু বলবাব আগেই বাইরে মঞ্জুব হাসিব শব্দ শোনা গেল। পরমুহূর্তেই দেখা গেল ডাক্তাব রায়কে নিয়ে সে ঘবে ঢুকছে।

বাবা এবং পিসিমাকে কোনও কথা বলবার অবকাশ না দিয়ে মঞ্জু বলতে লাগল, 'জানো বাবা, ডাক্তার রায় এমনই কুনো, ঘর থেকে বেরুতে চান না'

বিব্রত, লজ্জিত ডাক্তার রায় বললেন, 'না, আমি—মানে. .এই একটু।'

মঞ্জু বললে, 'উনি একলা একখানা বই মুখে করে বসে ছিলেন, আমি জোর করে ধরে এনেছি। ভালো করিনি বাবা?'

বায়বাহাদুর আশ্চর্য হয়েছিলেন যেমন, খুশিও হয়েছিলেন তেমনি। উৎসাহিত কণ্ঠে তিনি বললেন, 'নিশ্চয় ভালো করেছ, খুব ভালো করেছ। বুঝেছেন ডাক্তার রায়, রাত-দিন বই মুখে কবে বসে থাকা অত্যন্ত অন্যায়, কী বলে—স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত খারাপ।'

মঞ্জুর চোখে-মুখে হাসি যেন উছলে উঠছিল, সে রায়বাহাদুরের কাছে এসে বললে, 'ওঁকে নিয়ে খুব খানিকটা বেড়িয়ে আসব বাবা? তোমার এখন গাড়ির দরকার নেই তো?'

'কিছু না, কিছু না, গাড়ির আবার কী দরকার। আজকাল গাড়ির আমার দরকার হয় না।'

'তা হলে আমরা কিন্তু সেই সন্ধের আগে আর ফিরছি না, কী বলেন ডাক্তার রায়?'

মঞ্জু কৌতুকভরা চোখে ডাক্তার রায়ের দিকে চাইল। তারপর তাচ্ছিল্যভরা একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করল পিসিমার মুখের ওপর।

ডাক্তার রায় বললেন, 'আর কিছু বলবার আছে বলে তো মনে হয় না।'

মঞ্জু আবার খিল-খিল করে হেসে উঠল এবং তারপর ডাক্তার রায়কে নিয়ে যেন একটা ঝড় তুলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অধরনাথও একবার রাজলক্ষ্মীর দিকে চেয়ে ঘর থেকে চলে গেলেন। রাজলক্ষ্মীর বুকের ভেতরটা যেন জ্বালা করছিল। মিনিটখানেক চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে তিনি বললেন, 'জানি না বাবা, এ আবার কী ঢং!'

সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে মঞ্জু ডাক্তার রায়কে বলে, 'আপনাকে এমন হঠাৎ জোর করে টেনে আনলাম, আপনি কী মনে করছেন কে জানে!'

ডাক্তার রায় উত্তর না দিয়ে হাসলেন। দুজনে নিচে নেমে এল!

মঞ্জু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, 'আচ্ছা, আমার ব্যবহার দেখে আপনি খুব আশ্চর্য হচ্ছেন —নয়?'

'না।'

'অবাক হচ্ছেন না? এরকম অদ্ভুত ব্যবহার! বলা নেই, কওয়া নেই, আপনাকে জুলুম করে ধরে নিয়ে এলাম—।'

ডাক্তার রায় মঞ্জুর মুখের দিকে চেয়ে কী যেন ভাবছিলেন, বললেন, 'দেখুন এই দু-দিনে এত কিছু অদ্ভুত ব্যাপার আমার জীবনে ঘটেছে যে অবাক হতে একরকম ভুলেই গেছি।'

'অর্থাৎ আমাকে অনেক আপদের মধ্যে আর একটা আপদ মনে করছেন। আমি আপনার কাছে আর একটা দুর্ঘটনা মাত্র?'

মঞ্জু এমনভাবে ডাক্তারের মুখের দিকে চাইল যে তিনি বিচলিত হয়ে পড়লেন। সত্যি, মেয়েদের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠ ভাবে আলাপ করাটা তিনি প্রায় ভুলেই গেছেন; কোনও রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বললেন, 'না, না, তা নয়। অনেক দুর্ঘটনার মধ্যে স্মরণীয় ঘটনা।...তা যাক, এখন শহরটা না ঘুরে চলুন বাগানটায় বেড়ানো যাক...'

'বেশ, তাই চলুন।'

দুজনে ওরা বাগানে এল। বাগানে এসে মঞ্জু কিন্তু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। ডাক্তার রায়ের সেটুকু চোখ এড়াল না। খানিক পরে হাসতে-হাসতে তিনি বললেন, 'আমার সঙ্গে বেড়ানোটা কিন্তু আপনার পক্ষে একটা শাস্তি। কেন যে এমন খেয়াল হল আপনার!'

'বেড়ানোটা শাস্তি কেন?'

'এই জন্যে যে কোনও আনন্দই আমি আপনাকে দিতে পারব না। দুটো চটকদার কথা বলে আপনাকে মোহিত করে রাখব সে ক্ষমতাও আমার নেই। এক যদি বলেন তো দাঁত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ দাঁত-ভাঙা আলাপ করতে পারি—।'

ডাক্তার রায় হাসবার চেষ্টা করলেন।

মঞ্জু এবার সোজা ডাক্তারের চোখের দিকে চাইল, তারপর জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনি নিজেকে এত ছোট করে দেখেন কেন?'

ডাক্তার রায় জবাব না দিয়ে শুধু একটু হাসলেন।

মঞ্জু আবার বললে, 'কিংবা আমাকেই এত খেলো ভাবেন যে মনে করেন, বাইরের চটক দেখেই আমি মুগ্ধ হই, তার বেশি তলিয়ে দেখবার ক্ষমতা আমার নেই?'

'না, না, অমন কথা আমি মোটেই বলিনি। আমার প্রতি অবিচার করবেন না।'

'সুবিচার করেই বলছি, বাজে লোকের বাজে কথা শোনার চেয়ে আপনার মতো লোকের নীরব সঙ্গ পাওয়াও আমি সৌভাগ্য মনে করি।'

ডাক্তার রায় এবার রীতিমতো আশ্চর্য হয়ে মঞ্জুর মুখের দিকে চাইলেন। 'ব্যাপার কী? জীবনে নানা জাতের, নানা ধরনের মেয়ের কথা জানবার সুযোগ হয়েছে, কিন্তু তাদের কেউ তো এমন আকস্মিকভাবে তাঁকে জড়াবার চেষ্টা করেনি? মঞ্জুর এই অতিরিক্ত সৌভাগ্য বোধের হেতুটা কোথায়? একজনকে জোর করে নিজের কাছে ছোট করবার জন্যে আর

একজনকে অহেতুক বড় করে তোলার চেষ্টা নয় তো? বাজে লোকের বাজে কথা! কিন্তু বাজে লোকটিই বা কে?

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে তিনি বললেন, 'শুনে অত্যন্ত বাধিত হলাম। এরকম প্রশংসার খুব জুতসই একটা জবাব দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত ছিল বুঝতে পারছি, কিন্তু...।'

'কিন্তু—' মঞ্জু কৌতুকছলে বললে, 'ভাষায় কুলোচ্ছে না বলছেন? ভাষার খুব অভাব তো দেখছি না!'

'অনেক সময় বোবার মুখেও কথা জোটে, সেটা আপনার সঙ্গের গুণ।'

'এবার বোধহয় আমার blush করা উচিত?'

'না, না, পরিহাস করবেন না। সত্যি আপনার প্রশংসার প্রশয় পেয়েই আজ আমাব যেন সাহস বেড়ে গেছে এবং এই সাহস থাকতে-থাকতেই আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই'

মঞ্জু কিছু না বলে ওঁর মুখের দিকে চাইল। ডাক্তার রায় কিন্তু ঘাবড়ে গেলেন। মঞ্জু বললে, 'কী চুপ করে রইলেন যে? সাহস কি ফুরিয়ে গেল এর মধ্যে?' ডাক্তার রায় একটা ঢোক গিললেন।

'না, না, কী করে কথাটা পাড়বো ঠিক বুঝতে পারছি না। অথচ এ-বিষয়ে আপনার মতামত জানা আমাব একান্ত দবকার।'

মঞ্জুর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠেছিল। সে মুহূর্তের জন্যে ডাক্তার রায়ের মুখের দিকে চেয়ে স্থির কণ্ঠে বললে, 'কথাটা পাড়বার চেষ্টায় আপনাকে আর বিব্রত হতে হবে না ডাক্তার রায়। আপনি কী বলতে চাইছেন আমি জানি।'

ডাক্তার রায় বিস্মিত হযে মঞ্জুর দিকে চাইলেন।

মঞ্জু বললে, 'আমার মতামত যদি আপনার কাছে এত দামি হয় তা হলে শুনুন, আমার এ বিয়েতে সম্পূর্ণ মত আছে।'

'মত আছে! আমার এ সৌভাগ্য যে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না মিস চ্যাটার্জি।'

ডাক্তার রায় অকপট ভাবেই কথাটা বললেন, কিন্তু মঞ্জু হঠাৎ যেন কেঁপে উঠল।

'কেন বিশ্বাস করতে পারছেন না? কেন বলতে পারেন? আমার এ বিয়েতে মত দেওয়া কী এমন একটা আশ্চর্য ব্যাপার? আমি কী এমন একটা অসাধারণ মেয়ে যে শুধু রূপকথার রাজপুত্রের আশাতেই পথ চেয়ে থাকব? রূপকথার রাজপুত্রদেরও আমি জানি— সে আলেয়ার চেয়ে সামান্য একটু আলোর দাম আমার কাছে অনেক বেশি; অনেক বেশি!'

শেষের দিকে মঞ্জুর গলার স্বর প্রায় কান্নার মতো শোনাল এবং কথা শেষ করেই সে প্রায় ছুটতে-ছুটতে বাগান থেকে বেরিয়ে বাড়ির মধ্যে চলে গেল।

ডাক্তার রায় স্তম্ভিত হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন।

বাজে লোকের বাজে কথা আর রূপকথার রাজপুত্রের আশায় পথ চেয়ে থাকা। অত্যন্ত হঠাৎ, অন্ধকার রাত্রিতে বিদ্যুতের ঝিলিকের মতো ডাক্তার রায়ের মনে হল, এ দুটোর মধ্যে ঘনিষ্ঠ একটা যোগ রয়েছে। কথা যত বাজে হোক, রাজপুত্র নিশ্চয়ই। আলেয়া হোক, তবু আলোকচ্ছটা; তার কাছে সামান্য আলোর দাম কতটুকু।

রাজপুত্রকে চিনতে ডাক্তার রায়ের দেরি হল না।

রায়বাহাদুর তাঁর ঘরে ডাক্তার রায়ের জন্য উৎকণ্ঠিত আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন।

ডাক্তার রায় ঘরে ঢুকতেই তিনি উঠে দাঁড়িয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, 'আসুন, আসুন। আজ আমার কী আনন্দের দিন।'

ডাক্তার রায় মনস্থির করেই ঘরে ঢুকেছিলেন, রায়বাহাদুরের কথার জবাবে একটু হাসলেন মাত্র।

রায়বাহাদুর আরও উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, 'আমি তখনই বলেছিলাম মঞ্জুর মতের জন্যে ভাবনা নেই, বলুন আর তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবার আছে?'

'না, তাঁর মত আমি জেনেছি।'

'জেনেছেন! তা হলে আর দেরি করবার দরকার তো নেই! ওঃ! কতবড় ভার যে আমার মন থেকে আজ নেমে গেল। জানেন না ডাক্তার রায়, আজ আমার কী আনন্দের দিন...।'

ডাক্তার রায় একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'কিন্তু একটু দেরি করতে হবে রায়বাহাদুর। আমি একবার কলকাতায় যাচ্ছি।'

'বেশ তো। আমিও মঞ্জুদের নিয়ে কয়েক দিনের মধ্যেই যাচ্ছি! আমার তো ইচ্ছে সেইখানেই—'

'সে ভালো কথা। কিন্তু তার আগে আমার একটা কাজ না করলেই নয়।'

'কী বলুন তো?'

'সুজিতবাবুকে আমায় খুঁজে বার করতে হবে।'

'সুজিত কে? সেই হতভাগা, অপদার্থ, ভবঘুরে—'

'হ্যাঁ রায়বাহাদুর, সেই হতভাগা অপদার্থ ভবঘুরেটাকেই আমার খুঁজে বার করা একান্ত দরকার। তাকে না পেলে আমাদের এই অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হবে না।'

রায়বাহাদুরকে আর কোনও কথা বলবার অবকাশ না দিয়ে ডাক্তার রায় নিজের ঘরে চলে এলেন।

রাত্রিতে রায়বাহাদুর তাঁকে আরও দু-একটা দিন কাটিয়ে কলকাতায় ফেরবার জন্যে বারংবার অনুরোধ করলেন। কিন্তু ডাক্তার রায়কে আর আটকে রাখা গেল না। পরদিন সকালের ট্রেনেই তিনি কলকাতা রওনা হলেন।

কলকাতায় এসে ডাক্তার রায় বেকার সঙ্ঘের অফিসটা অতিকষ্টে খুঁজে বার করলেন। সেখানে কিন্তু সুজিত বা ফকিরকে পাওয়া গেল না। খবর পাওয়া গেল সুজিত কিছুকাল আগে সঙ্ঘের মায়া কাটিয়েছে, তবে ফকির এখনও আসে যায়। ফকিরের নামে একখানা চিঠি লিখে রেখে ডাক্তার রায় হতাশ মনে ফিরে এলেন।

দিন দুই পরে ফকির, ডাক্তার রায়ের ক্লিনিকে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করল। কিন্তু তার কাছেও সুজিতের খোঁজ পাওয়া গেল না।

ডাক্তার রায় ভাবনায় পড়লেন; বললেন, 'কী আশ্চর্য! আপনিও সুজিতবাবুর কোনও খবর রাখেন না?'

'আজ্ঞে না, সেই বেকার সঙ্ঘ ছেড়ে যাওয়ার পর থেকেই একেবারে নিরুদ্দেশ। চেষ্টা আমি কম করিনি মশাই, কিন্তু তার কোনও পাত্তাই পেলাম না।'

'আচ্ছা এরকম অজ্ঞাতবাসের কারণটা কী বলতে পারেন?'

'উহুঁ। এতকাল মেলামেশা করছি, এরকম তো কখনও দেখিনি।'

ডাক্তার রায় অস্থির ভাবে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তারপর গোবিন্দর দিকে চেয়ে বললেন, '—তাই তো! বড় মুশকিলই তা হলে হল দেখছি। সুজিতবাবুকে খুঁজে বার করবার কোনও উপায়ই তো দেখছি না গোবিন্দ।'

গোবিন্দও ভাববার চেষ্টা করছিল, সে বললে, 'আজ্ঞে না। উপায় কিছু দেখছি না।'

ডাক্তার রায় বিরক্ত হয়ে তার মুখের দিকে চাইলেন, তারপর বললেন, 'তোমায় আমি উপায় খুঁজে বার করতে বলিনি বাপু।'

'আজ্ঞে?'

'কোনও পেশেন্ট বাকি আছে দেখতো? থাকে তো ডাকো।'

—গোবিন্দ বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ আছে।'

'আছে তো নিয়ে এস।'

গোবিন্দ বেরিয়ে রোগীরা যেখানে অপেক্ষা করে সেই ঘরে গেল। ডাক্তার রায় তেমনি পায়চারি করতে লাগলেন। সুজিতকে না পেলে তাঁর সব চেষ্টাই যে মাটি হয়ে যাবে, কিন্তু তাকে খুঁজে বার করবার আশাও আর আছে বলে মনে হয় না। তা হলে কি...।

গোবিন্দ রোগী নিয়ে ফিরে এল।

ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরা ক্ষীণকায় একটি লোক। লোকটি ঢুকল হাত জোড় করে, যেন কোনও অনুগ্রহ চাইছে ডাক্তার রায়ের কাছে। ডাক্তার রায় নিজের চিন্তায় ডুবে ছিলেন, লোকটির দিকে ভালো করে লক্ষও করলেন না, সোজা তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলেন দাঁত তোলার চেয়ারে।

লোকটি কী যেন বলবার চেষ্টা করছিল, ডাক্তার রায় চেয়ারের সঙ্গে তার মাথাটা ঠিক করে সেট করে মাথার ওপরের আলোটা খানিকটা নামিয়ে এনে বললেন, 'হাঁ করুন।'

লোকটি বিনা বাক্যব্যয়ে হাঁ করল। ডাক্তার রায় অভিনিবেশ সহকারে তাকে পরীক্ষা করলেন, কিন্তু কোনও উপসর্গই চোখে পড়ল না। বেশ একটু আশ্চর্য হয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে আপনার?' বত্রিশ পাটি দাঁতই তো পরিপাটি রয়েছে দেখছি।'

লোকটিও বেশ বিব্রত এবং আশ্চর্য হয়েছিল, সে প্রায় দমবন্ধ করে জবাব দিল 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ মানে? দাঁতে ব্যথা-টেথা আছে?'

'আজ্ঞে না।'

ডাক্তার রায় আশ্চর্য এবং বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তবে কি সখ করে দাঁত দেখাতে এসেছেন।'

লোকটি বললে, 'আজ্ঞে না, এসেছি অনেক দুঃখে। দাঁত আছে তবু চিবোতে পারি না।'

'দাঁত আছে তবু চিবোতে পারেন না! বলেন কী?'

সমস্ত দন্তচিকিৎসা-শাস্ত্র মনে-মনে মন্থন করবার চেষ্টা করলেন ডাক্তার রায়, কোথাও এরকম অসুখের নজির পাওয়া গেল না।

লোকটি খুব কুণ্ঠিত ভাবে বললে, 'আজ্ঞে খেতে না পেলে চিবোই কী করে বলুন? দয়া করে যদি একটা চাকরি দেন—'

'চাকরি? আপনি দাঁত দেখাবার নামে চাকরি চাইতে এসেছেন? আপনি চাকরি চান?'

'আজ্ঞে চাকরি কে না চায়। আর চাকরির জন্যে কী না করা যায় বলুন।'

লোকটার কথা শুনতে-শুনতে ডাক্তার রায় যেন নতুন করে কী ভাবতে শুরু করেছিলেন। তিনি কতকটা নিজের মনেই বললেন, 'চাকরি—চাকরি কে না চায়—না?'

হঠাৎ ফকিরের দিকে চেয়ে উৎসাহিত কণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন, 'হয়েছে ফকিরবাবু, হয়েছে। এবার সুজিতবাবুকে আমি নির্ঘাত খুঁজে পেয়েছি।'

ফকির কিছুই ভালো করে বুঝতে পারছিল না, এর মধ্যে সুজিত চক্রবর্তী এল কখন! সে জিজ্ঞাসা করলে, 'কোথায়?'

ডাক্তার রায় বললেন, 'কোথায় আবার! এইখানে, এইখানে।'

রোগীকে ছেড়ে তিনি নিজের টেবিলে এসে বসলেন, প্যাডটা টেনে নিয়ে কলম বার করে খস-খস করে কী লিখতে লাগলেন। ফকির কৌতূহল চাপতে না পেরে উঁকি মেরে দেখতে লাগল। দেখল ডাক্তার রায় লিখছেন, 'কর্মখালি—বিশেষ কাজের জন্য শিক্ষিত, কর্মঠ একজন ভদ্র যুবক দরকার—যোগ্যতানুসারে উপযুক্ত বেতন দেওয়া হইবে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় দরখাস্ত করুন।'

বিস্ময়ে ফকিরের চোখ বড়-বড় হয়ে উঠেছিল, সে বললে, 'এ তো বিজ্ঞাপন!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কর্মখালির বিজ্ঞাপন বুঝতে পারছেন না, সুজিতবাবুর যদি সত্যি চাকরির দরকার থাকে তা হলে এ বিজ্ঞাপনে তাঁকে সাড়া দিতেই হবে, তাঁর একখানা দরখাস্ত আমি পাবই।'

কথামতো কাজ করতে ডাক্তার রায় দেরি করলেন না। সেইদিনই গোবিন্দকে দিয়ে খবরের কাগজগুলোয় বিজ্ঞাপন পাঠিয়ে দিলেন। পরদিন থেকে কাগজে-কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপা হতে লাগল এবং তার দিন দুই পর থেকে শুরু হল দরখাস্ত আসতে। রাশি-রাশি লেফাফায় দেরাজ, টেবিল সব ভর্তি হওয়ার উপক্রম হল। ব্যাপার দেখে ডাক্তার রায় বললেন, 'এ যে গোটা বাংলা দেশটাই দরখাস্ত করে ফেলেছে দেখছি।'

গোবিন্দ বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, তা হবে বইকী।'

ফকির আর গোবিন্দর সাহায্যে ডাক্তার রায় চিঠিগুলো বাছাই শুরু করলেন। নানা জায়গা থেকে নানা লোকের দরখাস্ত। কিন্তু যার জন্যে টাকা খরচ করে বিজ্ঞাপন দেওয়া তার নামটা কোনও দরখাস্তের নিচে খুঁজে পাওয়া গেল না।

ডাক্তার রায় বললেন, 'না, আর কোনও আশা নেই। তুমি কিছু পেলে হে গোবিন্দ?'

গোবিন্দ বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ পেয়েছি। সুজিত বোস, সুজিত দাস—।'

ডাক্তার রায় বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, 'দাস-বোস দিয়ে কী করব! চক্রবর্তী চাই।'

ফকির বললে, 'আজ্ঞে আমি চক্রবর্তী পেয়েছি। এই যে—হরিপদ চক্রবর্তী।'

ডাক্তার রায় বললেন, 'তবে আর কী! ল্যাজা-মুড়ো কেটে একসঙ্গে জুড়ে দাও, সব ঝঞ্ঝাট চুকে যাক।'

নিরাশ হয়ে তিনি উঠে পড়লেন। একখানা খাম তাঁর শার্টের হাতার সঙ্গে কীরকম করে লেপটে গিয়েছিল, তিনি উঠে দাঁড়াতেই সেটা ঠক করে টেবিলের ওপর পড়ল। এখানা আগে চোখে পড়েনি, ডাক্তার রায় খুলে পড়তে লাগলেন। পড়তে-পড়তে তাঁর চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, 'পেয়েছি, পেয়েছি!'

সবাই আশ্চর্য হয়ে তাঁর দিকে চাইল। তিনি আবার বললেন, 'এই তো পেয়ে গেছি।'

কী পেয়েছেন, কাকে পেয়েছেন, এসব প্রশ্নের মীমাংসা হবার আগেই মঞ্জুকে নিয়ে রায়বাহাদুর সেখানে উপস্থিত হলেন। ডাক্তার রায়ের কথাটা রায়বাহাদুরের কানে গিয়েছিল,

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী পেয়েছেন ডাক্তার রায়?'

ডাক্তার রায় বিব্রতভাবে বললেন, 'এই যে আপনারা এসেছেন। আমি দেখতে পাইনি।'

মঞ্জু হাসতে-হাসতে বললেন, 'হ্যাঁ, আপনি একটু উত্তেজিত ছিলেন।'

'ব্যাপার কী ডাক্তার রায়?'—রায়বাহাদুর জিজ্ঞাসা করলেন।

ডাক্তার রায় বললেন, 'ব্যাপার এমন কিছু নয়। তারপর, আপনারা কলকাতায় এলেন কবে?'

জবাব দিলেন রায়বাহাদুর, 'কাল এলাম মঞ্জুকে নিয়ে—আপনার তো কোনও সাড়া শব্দ নেই। তাই বেড়াতে বেরিয়ে ভাবলাম একবার খোঁজটা নেওয়া দরকার—তা আপনি তো খুব ব্যস্ত দেখছি।'

'না, মানে ব্যস্ত আর কী!'

'তবে আমরা এখন চলি, কাল বিকেলে কিন্তু আমার ওখানে আপনার যাওয়া চাই। ওইখানেই চা খাবেন। এই আমাদের ঠিকানা—'

রায়বাহাদুর কার্ড বার করে ডাক্তারের হাতে দিলেন। ডাক্তার রায় কার্ডটা হাতে নিয়ে কী যেন ভাবলেন। ভাবছিলেন তিনি গোড়া থেকেই, মানে—মঞ্জু আর রায়বাহাদুরের আবির্ভাবের পর থেকেই। এবার একটু বেশি করে ভাবলেন। তারপর বললেন, 'না রায়বাহাদুর কাল বিকেলে আপনাদেরই চায়ের নেমন্তন্ন রাখতে হবে আমার এখানে।'

রায়বাহাদুর বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'কেন বলুন তো?'

ডাক্তার রায় বললেন, 'এখন কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না, তবে একটা কিছু আশ্চর্য ঘটনার জন্য প্রস্তুত থাকতে পারেন।'

আশ্চর্য ঘটনাটা যে কী হতে পারে সেটা রায়বাহাদুর কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারলেন না। একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'আচ্ছা বেশ, তা হলে আমরা এখন চলি।'

'এসেই চলে যাবেন? একটু বসবেন না?'—ডাক্তার রায় বললেন।

জবাব দিল মঞ্জু, 'আপনার এখানে বসা নিরাপদ মনে হচ্ছে না। হঠাৎ যদি দাঁত তুলে দেন।'

হাসতে-হাসতে সে রায়বাহাদুরের সঙ্গে চলে গেল। ডাক্তার রায় ওদের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এলেন। তারপর ফকিরচাঁদকে একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে উত্তেজিত ভাবে বললেন, 'এই দ্যাখো সুজিত চক্রবর্তীর দরখাস্ত। এখুনি তাকে চিঠি লিখে দাও। কাল বিকেলেই যেন চাকরির জন্যে দেখা করতে আসে। ঠিক বিকেল চারটা—রায়বাহাদুর ওই সময়েই আসছেন।'

ফকির চিঠি লিখতে বসল।

পরদিন বিকাল। চারটে বাজতে আর মিনিট কয়েক বাকি।

ডাক্তার রায়ের ক্লিনিকে ভিজিটার্স-রুমে মঞ্জু আর রায়বাহাদুর বসে। চা-জলখাবার আগেই দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলো শেষ হয়েও এসেছে, ডাক্তার রায় কিছুক্ষণ থেকে একদৃষ্টিতে ঘড়ির দিকে চেয়ে কী ভাবছিলেন, হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন।

মঞ্জু জিজ্ঞাসা করলে, 'এত ঘন-ঘন ঘড়ি দেখছেন কেন ডাক্তার রায়?'

ডাক্তার রায় প্রায় চমকে উঠে বললেন, 'ও! ঘড়ি দেখছি বুঝি! এই মানে দেখছিলাম ক'টা বাজে—'

'আমি কিন্তু ভাবলাম বুঝি আপনার আশ্চর্য ঘটনার সময় হয়ে এল'—মঞ্জু বললে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি কী যেন আশ্চর্য ব্যাপার দেখাবেন বলেছিলেন ডাঃ রায়?' রায়বাহাদুরও কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।

ডাক্তার রায় আরও বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি এতক্ষণ রুদ্ধনিশ্বাসে প্রতীক্ষা করছিলেন সুজিত চক্রবর্তীর আবির্ভাবের জন্য। সুজিতকে মঞ্জু আর রায়বাহাদুরের কাছে পৌঁছে দিতে পারলেই তাঁর দায়িত্ব শেষ হয়। কিন্তু কোথায় সেই বেকার বাউণ্ডুলে সুজিত? চাকরি নিশ্চিত জেনেও যে এল না।

রায়বাহাদুরের কথার জবাবে ডাক্তার রায় বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলেছিলাম। এখনও আশা করছি যে কথা রাখতে পারবো। ক্ষমা করবেন, আমি এখুনি আসছি...'

বলতে-বলতে তিনি পাশের ঘরে চলে গেলেন।

সেখানে ফকিরচাঁদ অপেক্ষা করছিল। ডাক্তার রায় বললেন, 'ব্যাপার কী বলুন তো? চারটে বাজে, এখনও যে সুজিতবাবুর দেখা নেই!'

ফকির বললে, 'আমি একটু এগিয়ে দেখব নাকি?'

ডাক্তার রায় বিমর্ষমুখে বললেন, 'এগিয়ে আর কী দেখবেন! তিনি এগিয়ে না এলে দেখবেন কাকে?'

'তবু আমি না হয় একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়াই। বাড়ি চিনতে হয়তো ভুল হতে পারে।'

'বেশ তাই দাঁড়ান। কিন্তু আগে থাকতে যেন সব কথা তাঁর কাছে ফাঁস করে ফেলবেন না, দেখবেন।'

ফকির বিজ্ঞতার হাসি হেসে বললে, 'না, না, আপনি কিছু ভাববেন না, আমি অতটা আহাম্মক নই।'

ফকির এসে রাস্তায় দাঁড়াল। ট্রাম-রাস্তার ধারেই ডাক্তার রায়ের ক্লিনিক।

ট্রাম থেকে লোক নামলেই ফকিরের বুক ধড়াস করে ওঠে, ওই বুঝি সুজিত এল! পরমুহূর্তেই নিরাশায় তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। এমনই মিনিট পনেরো অপেক্ষার পর সত্যি সুজিতকে ট্রাম থেকে নামতে দেখা গেল। রাস্তা পার হয়ে ফুটপাতে উঠে সুজিত বাড়ির নম্বর খুঁজতে লাগল।

ফকির তাকে দেখতে পেয়ে ছুটতে-ছুটতে গিয়ে বললে, 'আর খুঁজতে হবে না, চলে এস।'

সুজিত ফকিরকে দেখে রীতিমতো আশ্চর্য হয়েছিল; বললে, 'আরে ফকিরচাঁদ যে! তুমি এখানে কী করছ?'

ফকির একমুখ হেসে বললে, 'এই তোমার জন্যে হা-পিত্যেশ করে দাঁড়িয়ে আছি।'

'আমার জন্যে? বল কী? তুমি জানলে কোথা থেকে?'

'এত ফন্দি-ফিকির করে তোমায় বার করা হল আর আমি জানব না!'—ফকির বেশ মুরুব্বিয়ানার সুরে বললে, 'এখন চলো দেখি তাড়াতাড়ি, ওঁরা সবাই অপেক্ষা করে বসে আছেন।'

সুজিত আরও আশ্চর্য হয়ে গেল, বললে, 'ওরা আবার কে হে?'

ফকির আবার একটু মুরুব্বিয়ানার হাসি হেসে বললে, 'কে আবার জানো না যেন! আরে রায়বাহাদুর আর তাঁর মেয়ে। ডাক্তার রায় আজ ওঁদের নেমন্তন্ন করে আনিয়েছেন যে, তোমায় হঠাৎ হাজির করে তাঁদের একেবারে অবাক করে দেবেন বলে।'

বলতে-বলতেই ফকিরের মনে পড়ে গেল যে ডাক্তার রায় তাকে এসব কথা সুজিতকে বলতে মানা করে দিয়েছিলেন। ফকিরের মুখ শুকিয়ে গেল, সে জিভ কামড়ে বললে, 'ওই যা!...'

'কী হল কী?'

'ডাক্তার রায়ের মানা ছিল, তোমায় যে সব বলে ফেললাম।'

সুজিত সমস্ত ব্যাপারটা মনে-মনে একবার ভালো করে ভেবে নিল। বেশ বোঝা যাচ্ছে যে ডাক্তার রায় তাকে চাকরি দেওয়ার লোভ দেখিয়ে এতদূর টেনে এনেছেন, চাকরি দেওয়ার জন্যে নয়, মঞ্জুদের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেওয়ার জন্যে! তিনি ভেবেছেন, সুজিত চক্রবর্তী মঞ্জু-বিহনে মারা যেতে বসেছে! কিন্তু সুজিত অত দুর্বল প্রাণ নিয়ে জন্মায়নি। আগে তাকে আত্ম প্রতিষ্ঠা করতে হবে, তারপর ওসব স্বপ্ন দেখার সময় পাওয়া যাবে ঢের। কিন্তু ডাক্তার রায়ের যদি সত্যিই তাকে চাকরি দেওয়ার ইচ্ছা থাকে? এমনও তো হতে পারে যে মঞ্জুরা নিতান্তই হঠাৎ আজ এখানে এসেছে। সুতরাং সামান্য একটা মেয়েকে এড়াবার জন্যে বেকারত্ব মোচনের এত বড় একটা সুযোগ ছাড়া কি উচিত হবে? চিরকালের অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় মানুষটা বলে উঠল, 'না, না, একবার গিয়ে আসল ব্যাপারটা দেখতে ক্ষতি কী? মঞ্জুকে এড়ানোই যদি দরকার হয় তা হলে সামান্য একটু ছদ্মবেশই কি তার পক্ষে যথেষ্ট নয়?'

একটু চুপ করে থেকে সে ফকিরের কানে-কানে কী বলল। তারপর ছুটে গিয়ে একটা চলন্ত ট্রাম ধরে তাতে উঠে পড়ল।

ফকিরচাঁদ ফিরল ক্লিনিকের দিকে।

এদিকে সেই আশ্চর্য ঘটনার অপেক্ষায় বসে থাকতে-থাকতে রায়বাহাদুর অস্থির হয়ে উঠেছিলেন, মঞ্জুও রীতিমতো বিরক্ত হয়ে পড়েছিল। শেষপর্যন্ত মঞ্জু বললে, 'নাঃ, আর অপেক্ষা করা যায় না ডাক্তার রায়। আপনার আশ্চর্য ব্যাপার আশ্চর্য রকম লেট বলতে হবে।'

'আর একটু বসুন, আমার অনুরোধ।'

ডাক্তার রায়ের কাতর কণ্ঠে রায়বাহাদুব কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন, বললেন, 'না, অনুরোধ করবার কী দরকার। বেশ তো আমরা বসে আছি, আরও না হয় খানিক—কিন্তু ব্যাপারটা কী বলুন তো?'

মঞ্জু হাসতে-হাসতে বললে, 'ব্যাপারটা বলে ফেললে আর আশ্চর্য থাকবে না যে!'

'তাই তো বটে!' রায়বাহাদুর বললেন, 'আচ্ছা আর খানিক বসাই যাক তা হলে, আমাদের কোনও কষ্ট তো আর নেই।'

এই সময় গোবিন্দ এসে একটা স্লিপ দিল ডাক্তার রায়ের হাতে। কাগজটা পড়তে-পড়তে ডাক্তার রায় বিষম উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। স্লিপে সুজিত চক্রবর্তীর সই! এতক্ষণে তাঁর প্রতীক্ষা সফল হল। সুজিতকে ভেতরে পাঠিয়ে দেবার নির্দেশ দিলেন তিনি গোবিন্দকে। তারপর মঞ্জুর দিকে চেয়ে বললেন, 'হ্যাঁ সেই আশ্চর্য ব্যাপার এবার আপনারা সত্যি দেখতে পাবেন। জানেন কাকে এত দিনে খুঁজে বার করেছি? কে এখন দেখা করতে এসেছেন জানেন?'

আসল ব্যাপারটা রায়বাহাদুর বা মঞ্জু কেউই অনুমান করতে পারেনি। ওরা দুজনেই প্রশ্ন করল, 'কে?'

ডাক্তার রায় বিজয়গৌরব-প্রদীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, 'সুজিত চক্রবর্তী।'

রায়বাহাদুর বিস্ময়-বিহুল কণ্ঠে বললেন, 'সুজিত চক্রবর্তী!' মঞ্জু কিছু বললে না, শুধু একটা বাঁকা চাহনি নিক্ষেপ করল ডাক্তারের দিকে।

ডাক্তার রায় উৎকণ্ঠিত আগ্রহে দরজার দিকে চেয়েছিলেন। কিন্তু মিনিটখানেক পরে যে লোকটি দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকল তার দিকে চেয়ে মাথা প্রায় ঘুরে গেল। সুজিত চক্রবর্তী নয়, দাড়ি গোঁফওলা একটা লোক—পাঞ্জাবি গোছের। ডাক্তার রায় যে মস্ত ভুল করেছেন সেটা বোঝাবার জন্যেই মঞ্জু বোধহয় ব্যঙ্গের হাসি হেসে মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিল।

বিস্ময়ের ঘোরটা একটু ফিকে হতে ডাক্তার রায় আগন্তুকের দিকে চেয়ে বললেন, 'আপনি কে? এখানে কী জন্যে?'

সুজিত ধরা না দেবার জন্যে সর্বরকমে প্রস্তুত হয়ে এসেছিল। সহজভাবে কথা বললে পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে পারে, তাই তোতলামি শুরু করলে, 'আজ্ঞে...আ—আমি—সু—সু—সু—সুজিত—চ—চক্কোত্তি। আ—আপনার চি—চিঠি পেয়ে দে—দে—দেখা কত্তে...'

'আপনি সুজিত চক্রবর্তী?'

'আ—আজ্ঞে, বরাবর ও—ওইটেই আ—আমার না—না— নাম। তা—প—পছন্দ না হয় ব—ব—ব—বদলে দেব।'

'না, না নাম পালটাতে আমি বলিনি। কিন্তু....'

ডাক্তার রায়ের মনে হল তিনি একটা ভাঙা নৌকোয় ভাসছিলেন, এবার সেটাও তলিয়ে যাচ্ছে! সুজিত চক্রবর্তী নামে সংসারে কত লোক আছে, দরখাস্ত করলেই তাকে বেকার সঙ্ঘের ভূতপূর্ব সেক্রেটারি বলে মনে করে নিতে হবে—এ কী কথা! এমন ভুল তাঁর হল কী করে?

মঞ্জু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ধন্যবাদ ডাক্তার রায়! সত্যি আশ্চর্য করে দিয়েছেন।—চলো বাবা আমরা যাই। ডাক্তার রায় এখন বোধহয় ব্যস্ত থাকবেন।'

ডাক্তার রায় প্রায় আর্তকণ্ঠে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না মিস চ্যাটার্জি। ব্যাপারটা যে এরকম দাঁড়াবে তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি।'

মঞ্জু ব্যাপারটা কতকটা অনুমান করেছিল, রায়বাহাদুর কিন্তু কিছুই অনুমান করতে পারেননি। তিনি একবার ডাক্তার রায়ের মুখের দিকে, একবার মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'আমি যে এর কিছুই বুঝতে পারছিনে।'

মঞ্জু বললে, 'বোঝবার চেষ্টা করলে আরও আশ্চর্য হবে বাবা। চলো আমরা যাই।'

রায়বাহাদুর উঠতে-উঠতে বললেন, 'বেশ, তাই চলো। আপনি কিন্তু ডাক্তার রায় আমাদের ওখানে আসছেন—'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, তা যাব বইকী!'

ডাক্তার রায় যেন স্বপ্নের ঘোরে জবাব দিলেন।

রায়বাহাদুরকে নিয়ে মঞ্জু বেরিয়ে গেল। আর দুজনের মতো মঞ্জুও সুজিতকে চিনতে পারেনি। ডাক্তার রায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলেন, দাড়ি-গোঁফওলা এই লোকটাকে নিয়ে এখন কী করা যায়!

চেয়ারে বসে ডাক্তার রায় গালে হাত দিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলেন।

সুজিত এগিয়ে এল তাঁর কাছে, বললে, 'খুব কি হতাশ হয়েছেন ডাঃ রায়?'

এবার সে স্বাভাবিক কণ্ঠে, সহজভাবে কথা বলছিল। ডাক্তার রায় চমকে উঠে তার

মুখের দিকে চাইলেন, বললেন 'আপনি!...'

সুজিত হাসতে-হাসতে বললে, 'হ্যাঁ আমিই আসল, আমিই নকল, আমিই সত্য, আমিই মায়া। কীরকম ছদ্মবেশটা হয়েছে বলুন দেখি?'

ডাক্তার রায় খুশি হতে পারলেন না। রায়বাহাদুর আর মঞ্জুর কাছে খেলো হওয়ার রাগে তিনি যেন দপ করে জ্বলে উঠলেন; বললেন, 'খাসা হয়েছে মশাই, খাসা হয়েছে। কিন্তু এ ছদ্মবেশের মানে কী বলতে পারেন? এ চালাকির অর্থ?'

'তা হলে আমার সঙ্গে আপনার চালাকিটার অর্থ কি জানতে পারি?'

'আপনার সঙ্গে আমার চালাকি।'

'চালাকি নয়? চাকরির চার ফেলে আমায় ধরে এনে সকলের সামনে হাস্যাস্পদ করতে চেয়েছিলেন। আপনার সেই ফন্দি আমি ব্যর্থ করেছি মাত্র।'

ডাক্তার রায় ব্যথা পেলেন সুজিতের কথায়। যাঁর জন্যে তাঁর এত চেষ্টা সেই তাঁকে ভুল বুঝল। আঘাতটা তিনি নিরবেই সহ্য করলেন, একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'খুব ভালো কাজ করেছেন। কিন্তু এরকম চালাকি করে ধরে আনায় আমার কোন স্বার্থ আছে বলতে পারেন?'

'নিঃস্বার্থ উদ্দেশ্যটা তো ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'উদ্দেশ্য আপনাকে খুঁজে বার করা এবং তাও আমার নিজের স্বার্থের জন্যে নয়।'

সুজিত আশ্চর্য হয়ে বললে, 'আমার মতো হতভাগা বেকার বাউণ্ডুলেকে শুধু-শুধু খুঁজে বার করার গরজ কার হতে পারে?'

'কার গরজ হতে পারে তা কি আপনি এখনও জানেন না? আপনি কি কিছু বোঝেননি?'

ডাক্তার রায় স্থির দৃষ্টিতে সুজিতের মুখের দিকে চাইলেন, তারপর বলতে লাগলেন, 'শুনুন সুজিতবাবু, মিথ্যা অভিমানের বশে জোর করে জীবনে দুঃখ টেনে আনবেন না। রায়বাহাদুর আর মঞ্জুর সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবার জন্যেই আপনাকে ফন্দি করে এখানে এনেছিলাম, তাতে আপনি আমায় হাস্যাস্পদ করেছেন। তাতে আমার কোনও ক্ষতি নেই। এখন তাঁদের সঙ্গে সহজভাবে দেখা করবেন চলুন।'

'ক্ষমা করবেন, তাঁদের সঙ্গে দেখা করবার কোনও প্রয়োজন আমি দেখি না।'

'কোনও প্রয়োজন দেখেন না? রায়বাহাদুর আপনাকে কত স্নেহ করেন জানেন। মঞ্জুর মনের কথা কি আপনি কিছুই বোঝেননি?'

তাদের চলে আসার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে রংপুর স্টেশনে মঞ্জুর আবির্ভাবের কথা মনে পড়ল সুজিতের। তবে কী?...কিন্তু না, সে শুধু কল্পনা।

সুজিত বললে, 'এসব কোনও কথাই আমি বুঝতে চাই না ডাঃ রায়! ও আকাশ-কুসুমে আমার লোভ নেই।'

ডাঃ রায় আর একটা আঘাত পেলেন। তাঁর সব ধারণাই কি ভুল? সত্যি যদি ভুলই হয় তা হলে সেটা পরীক্ষা করে দেখতে ক্ষতি কী? এতদূর যখন এগিয়েছি, তখন আরও একটু অগ্রসর হওয়া যাক।

সুজিত বললে, 'আচ্ছা নমস্কার, আমি চললুম।'

'দাঁড়ান, যাচ্ছেন কোথায়?'

সুজিত যেতে-যেতে ফিরে দাঁড়াল। ডাক্তার রায়ের মুখ দেখে মনে হল তিনি কিছু

একটা স্থির করে ফেলেছেন। তিনি বললেন, 'আসল কাজের কথাই যে বাকি।'

'আসল কাজ?'—সুজিত আশ্চর্য হল।

'হ্যাঁ, যার জন্যে আপনাকে আনা হয়েছিল।'

'ডাকা হয়েছিল তো চাকরির নাম করে।'

'সেই চাকরিই আপনাকে দেওয়া হবে। আপনি করতে রাজি আছেন, না চাকরি খোঁজা আপনার একটা ভান?'

'ভান হলে কি আমার দরখাস্ত পেতেন? একটা কাজ দিয়েই তো পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। যে-কোনও কাজ দিয়ে দেখুন—বড় বা ছোট যে-কোনও কাজ, তাতে যদি আমার গাফিলতি দেখেন তখন যা খুশি তাই বলতে পারেন।'

'যে-কোনও কাজ করতে তা হলে আপনি প্রস্তুত?'

'নিশ্চয়।'

'তা হলে যে-কোনও কাজ আপনাকে দেওয়া যেতে পারে। কি বলুন?...আচ্ছা, আপনি গাড়ি চালাতে পারেন?'

'পারি।'

'বেশ, আজ থেকে আপনার কাজ—আমার গাড়ি চালাবেন। আপত্তি আছে?'

'কিছু মাত্র না।'

ডাক্তার রায় একটু চুপ করে থেকে আরও কী যেন মনে-মনে স্থির করে ফেললেন, তারপর বললেন, 'শুনুন, আর একটা কথা। আপনাকে এই চেহারাতেই ড্রাইভারি করতে হবে। ছদ্মবেশটা বদলালে চলবে না।'

'এই চেহারায়?' —সুজিত আরও বেশি আশ্চর্য হল।

'হ্যাঁ এই চেহারায়। যে চেহারা নিয়ে আপনি চাকরি খুঁজতে এসেছেন আমি শুধু সেই চেহারাই চিনি। আপনার অন্য কোনও চেহারা আমি মানব কেন?' সুজিত ডাক্তার রায়ের মতলবটা ঠিক ধরতে পারল না। কিন্তু লোকটিকে সে মনে-মনে শ্রদ্ধা করত, খুব খারাপ কোনও উদ্দেশ্য যে তাঁর থাকতে পারে এ কথা সে বিশ্বাস করতে পারল না। তা ছাড়া, অভাবটা তার বর্তমানে একেবারে চরম সীমায় পৌঁছেচে। এসময় যদি সত্যিই একটা চাকরি পাওয়া যায় সেটা সে ছাড়বে কোন সাহসে? ছদ্মবেশে থাকতে তার সুবিধেও তো কম নয়, জানাশুনো লোকের কাছে অন্তত চক্ষুলজ্জায় পড়তে হবে না।

সুজিত ডাক্তার রায়ের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল।

ডাক্তার রায় বললেন, 'আপনার কাজ কিন্তু আজ থেকেই শুরু। আজ মানে এখনই। যান, গ্যারেজে গিয়ে গাড়ি বার করুন। রায়বাহাদুরের বাড়ি যেতে হবে।'

'রায়বাহাদুরের বাড়ি?'

না, না, সুজিতের পক্ষে সেটা অসম্ভব। ডাক্তার রায় যদি মঞ্জুকে নিয়ে হাওয়া খেতে যান তা হলেও কি সুজিতকে গাড়ি চালাতে হবে না-কি? অসম্ভব।

সুজিত প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল। ডাক্তার রায় গম্ভীর মুখে বললেন, 'সুজিতবাবু strict obedience। চাকরি করতে এসে প্রশ্ন প্রতিবাদ চলবে না। আমি ওগুলো পছন্দ করি না।'

মহাসমস্যায় পড়ল সুজিত। একদিকে মান-মর্যাদা, হৃদয়ঘটিত দুর্বলতা, আর একদিকে জীবনে প্রথম বেকারত্ব মোচনের সুযোগ।

জলের চেয়ে রক্ত গাঢ়। চাকরির মোহ সুজিত ছাড়তে পারল না। ডাক্তার রায়ের

কাছ থেকে চাবি নিয়ে গাড়ি বার করতে গেল।

ডাক্তার রায় মনে-মনে হাসলেন।

কলকাতায় মঞ্জুর কিছুই ভালো লাগছিল না। রংপুরের বাড়িতে তবু দিবারাত্রি ছুটোছুটি, মায়ার সঙ্গে খুনসুটি, ঘোড়ায় চড়া এবং আরও পাঁচটা বাজে কাজ নিয়ে সময় কাটাবার উপায় ছিল, কিন্তু এখানে হয় চুপ করে বাড়িতে বসে থাকা, নয়তো বড় জোর মোটরে চড়ে সিনেমায় যাওয়া, এ ছাড়া কিছুই করবার নেই। মঞ্জু হাঁফিয়ে উঠল। রায়বাহাদুরকে বললে, 'আর কতদিন কলকাতায় থাকবে বাবা? আমার ভালো লাগছে না।'

রায়বাহাদুর বললেন, 'সে কী মা? এই তো সবে এসেছি, এর মধ্যে ভালো লাগছে না কী? তা ছাড়া ওখানেও তো তোর ভালো লাগছিল না।'

'এখানেও লাগছে না। এমন একা-একা থাকা যায়! মায়াকে আনলেও তো পারতে।'

রায়বাহাদুর হাসতে-হাসতে বললেন, 'তারা সবাই আসবে মা, সবাই আসবে।'

'সবাই আসবে! কবে?'

'এই তোর বিয়েব দিনটা ঠিক হয়ে গেলেই।'

মঞ্জুর মুখ আবও গম্ভীর হয়ে উঠল, বললে, 'ওঃ বিয়ে! বিয়ে কি না করলেই নয় বাবা?'

রায়বাহাদুর সবিস্ময়ে মেয়ের মুখের দিকে চাইলেন, 'কেন বে? এ বিয়েতে তোর তো কোনও অমত নেই মা!'

'কই আমি কী তা বলেছি?'

বাইরে মোটরেব শব্দ পাওয়া গেল।

রায়বাহাদুব বললেন, 'বোধহয ডাক্তার রায় এলেন। আমি এখনই আসছি, তুই ততক্ষণ আলাপ কর।'

রায়বাহাদুর ব্যস্ত ভাবে বেরিয়ে গেলেন। মঞ্জু ড্রেসিং টেবলের সামনে গিয়ে প্রসাধনে মন দিল। প্রসাধন শেষ করে চলল ড্রয়িং রুমে। ডাক্তার রায়কে নামিয়ে দিয়ে সুজিত গাড়ি নিয়ে বাড়ির বাইরে অপেক্ষা করছিল। মনে নানা চিন্তার ঝড়! জীবনে অনেক অদ্ভুত অবস্থায় পড়েছে, কিন্তু এমন বেকায়দায় পড়েনি কখনও। নিরুপায় সুজিত চক্রবর্তী গাড়ির স্টিয়ারিং-এ মাথা রেখে ঘুমোবার ভান করে রইল।

ডাক্তার রায় ড্রয়িংরুমে অপেক্ষা করছিলেন।

মঞ্জু ঘরে ঢুকে বললে, 'নমস্কার। আব কোনও নতুন surprise এনেছেন নাকি?'

'Surprise! নাঃ surprise আর কোথায় হল। শুধু-শুধু আপনাকে কষ্ট দেওয়ার জন্যে ক্ষমা চাইছি।'

'কষ্ট কীসের! এক হিসেবে আমাদের তো অবাকই করে দিয়েছিলেন। যা একটা আবিষ্কার দেখালেন!'

'আর লজ্জা দেবেন না। আমারই বোকামি! সুজিত চক্রবর্তী নামটা দেখেই আমি নেচে উঠেছি, ও নামে যে আরও পাঁচ হাজার লোক থাকতে পারে সে খেয়াল আমার হয়নি।'

'কিন্তু হঠাৎ আপনার সুজিত চক্রবর্তীকে খোঁজবার খেয়াল হল কেন? এ ধারণা আপনার হল কী কারণে যে তার খোঁজ পেলেই আমরা অবাক ও আহ্লাদে আটখানা হয়ে

যাব!'

ডাক্তার রায় মঞ্জুর দিকে ভালো করে চাইলেন, তার চোখে চোখ রেখে বললেন, 'সে-ধারণাটা কি একেবারেই ভুল মিস চ্যাটার্জি?'

'নিশ্চয়ই ভুল। শুধু ভুল নয়, এরকম ধারণা করা আপনার অন্যায়।'

ডাক্তার রায় জবাব না দিয়ে মৃদু হাসলেন।

মঞ্জু বলতে লাগল, 'সুজিত চক্রবর্তী কে এমন একটা লোক, কে তিনি আমাদের যে তার জন্যে আমরা দিনরাত ভেবে মরছি ভাবছেন। তাঁকে খুঁজে পাওয়া না পাওয়ায় আমাদের কী আসে যায়!

ডাক্তার রায় বললেন, 'একটা সহজ কথা এবার সহজ ভাবে বলব মিস চ্যাটার্জি, রাগ করবেন না। মিথ্যে অভিমানের বশে নিজের মনকে ফাঁকি দিয়ে সাধ করে অসুখী হবেন না।'

ডাক্তার রায়ের কথা শুনে মঞ্জু এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল, তারপর হঠাৎ যেন জ্বলে উঠলো আগুনের শিখার মতো, 'তার মানে? আপনি কী বলতে চান? সুজিত চক্রবর্তীর জন্যে আমি ভেবে মরছি, তাঁকে—তাঁকে আমি ভালোবেসেছি!'

ডাক্তার রায় বললেন, 'সেটা কি এমন কিছু অন্যায় বা অসম্ভব। সুজিতবাবুকে ঈর্ষা করলেও তাঁর আকর্ষণ তো অস্বীকার করতে পারি না।'

'আপনি কি সুজিতবাবুর জন্যেই আজ এখানে এসেছেন?' মঞ্জু বসেছিল, উঠে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, 'আপনার সঙ্গেই আমার বিয়ের ঠিক হয়েছে জানতাম। সেটা যদি আপনার কাছে দায় বলেই মনে হয় তা হলে আর কারও কাঁধে আমায় নামাবার চেষ্টা না করে স্পষ্ট বললেই তো পারেন। সুজিতবাবুকে বদলি দেওয়ার চেষ্টা না করেও ছাড়া পাবেন।'

ডাক্তার রায়ও উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'যাক বাঁচলাম। কী খুশি যে আমায় করলেন মিস চ্যাটার্জি তা বলতে পারি না।'

'খুশি?'

'খুশি নয়! আর আমাদের বিয়ের কোনও বাধাই রইল না। জানেন না সেই হতভাগা বাউণ্ডুলেটাকে আপনি ভালোবাসেন ভেবে এই ক'দিন কী দুঃখটাই না পেয়েছি। যে কাঁটাটা রাতদিন মনের মধ্যে খচ-খচ করছিল সেটা একেবারে...।'

রায়বাহাদুর এই দিকেই আসছিলেন। দরজার বাহির থেকে কাঁটা কথাটা তাঁর কানে গেল। হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে তিনি বললেন, 'কাঁটা! কার গলায় কাঁটা ফুটল। ওরে এক গ্লাস জল, না, না একটা পাকা কলা—না, না, কী বলে...।'

তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ডাক্তারের দিকে চাইলেন।

ডাক্তার রায় হাসতে-হাসতে বললেন, 'তার চেয়ে একটা পাঁজি চেয়ে আনতে বলুন।'

'পাঁজি! পাঁজি দেখে কাঁটা তোলাটা...'

'না, না, কাঁটা তুলতে নয় রায়বাহাদুর, পাঁজি দরকার বিয়ের তারিখ ঠিক করতে।'

রায়বাহাদুর প্রথমে যেন নিজের কানটাকেই বিশ্বাস করতে পারলেন না। ডাক্তার নিজে পাঁজি চাইছে...তা হলে...

ব্যাপারটা বোধগম্য হতে তিনি আহ্লাদে অস্থির হয়ে পড়লেন। 'ওঃ হো, বিয়ের তারিখ! তা হলে এবার ঠিক করা যেতে পারে! দেরি করবার কোনও দরকার নেই তা হলে?'

'কিছু মাত্র না।' বলে ডাক্তার রায় মঞ্জুর দিকে এগিয়ে গেলেন, তারপর বললেন,

'শুধু আমার একটা অনুরোধ আছে মিস চ্যাটার্জি। আপনি আমায় রংপুর দেখাতে চেয়েছিলেন—কাল সন্ধ্যায় আমি আপনাকে কলকাতায় ঘুরিয়ে সেই ঋণ একটু শোধ করতে চাই—।'

রংপুরের পূর্ণিমা থিয়েটারে অভিনয় করতে নেমে ডাক্তার রায় যথেষ্ট ভড়কে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু কলকাতায় নিজের অভিনয় শক্তি দেখে তিনি নিজেই মনে-মনে মুগ্ধ হলেন।

রায়বাহাদুর তাঁর প্রস্তাবে আপত্তির কোনও কারণ দেখতে পেলেন না, উৎসাহিত কণ্ঠে বললেন, 'বেশ তো, বেশ তো! সে আর এমন কী কথা! আজই তো যেতে পারে মঞ্জু।'

'না, আজ নয় রায়বাহাদুর! এতখানি সৌভাগ্যের জন্যে আজ ঠিক প্রস্তুত নই। তা ছাড়া একেবারে নতুন ড্রাইভার, তাকে দু-একদিন পরীক্ষা না করে মিস চ্যাটার্জিকে নিয়ে বার হতে সাহস হয় না।'

'আপনি আবার নতুন ড্রাইভার রাখলেন নাকি?' রায়বাহাদুর প্রশ্ন করলেন।

ডাক্তার রায় হাসতে-হাসতে বললেন, 'একেবারে নতুন। তবে আমার ভরসা আছে, দু-একদিনের মধ্যে সে পাকা হাতের পরিচয় দিতে পারবে। রীতিমতো একটা আবিষ্কার বলা যায়।'

মঞ্জুর দিকে চেয়ে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

পরদিন বিকেলে বাড়ি থেকে বার হওয়ার সময় ডাক্তার রায় একটা বেতের বাস্কেট দিলেন সুজিতের হাতে, বললেন, 'যত্ন করে রাখবেন। যখন চাইব তখন এটা আমার হাতে দেবেন বুঝলেন?'

সুজিত ঘাড় নাড়াল।

রায়বাহাদুরের বাড়িতে এসে মঞ্জুকে খবর দেওয়ার জন্যে ডাক্তার রায় ভিতরে চলে গেলেন। সুজিত কৌতূহলী হয়ে বেতের বাস্কেটটা খুলে দেখল—ভিতরে একটা মদের বোতল, একটা গ্লাস এবং গোটা দুই সোডার বোতল। ডাক্তার রায় মদ খান। সুজিতের বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা রইল না। এতদিন মানুষ চেনে বলে তার একটা অহঙ্কার ছিল, কিন্তু এখন মনে হতে লাগল, মুখ দেখে মানুষ যাচাই করার মতো ভুল আর নেই।

সুজিত তখনও অবাক হয়ে মদের বোতলটার দিকে চেয়ে ছিল, ডাক্তার রায় বেরিয়ে এলেন।

সুজিত বললে, 'এ আবার কী ব্যাপার মশাই! আপনার এসব রোগ আছে বলে তো জানতাম না!'

ডাক্তার রায় দিব্যি সপ্রতিভ কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'কিছুদিন চাকরি করলে ক্রমশ সবই জানতে পারবেন। কিন্তু মনিবের সমালোচনাটা কি তার সামনে করা উচিত। ডিসিপ্লিন, ডিসিপ্লিন মিঃ চক্রবর্তী—ভুলবেন না আমি ডিসিপ্লিন চাই।'

সুজিত বললেন, 'ডিসিপ্লিন আমি ভুলিনি, ছদ্মবেশই তার প্রমাণ। কিন্তু মিস চ্যাটার্জি এগুলো দেখলে কী ভাববেন?'

ডাক্তার রায় বললেন, 'তার চেয়ে আপনার এমন সহজ সতেজ গলা শুনে তিনি কী ভাববেন তাই ভাবুন। আপনার চাকরির qualification-এর মধ্যে তোতলামিটাও একটা

গুণ, এটা আপনার ভোলা উচিত নয়।'

সুজিত মনে-মনে ডাক্তার রায়ের ওপর রীতিমতো অপ্রসন্ন হয়ে উঠেছিল। এতক্ষণ আশা ছিল যে মদের বোতল প্রভৃতির একটা সন্তোষজনক কৈফিয়ত হয়তো তিনি দেবেন, কিন্তু তার নির্লজ্জ কথাগুলোর পর সে-আশাও রইল না। সুজিত বেশ ক্রুদ্ধভাবে বলে উঠল, 'দেখুন, আপনার কাছে চাকরি নিয়েছি বলে আপনি যদি মনে করে থাকেন—।'

কথাটা শেষ করা হল না; দেখা গেল মঞ্জু বাড়ি থেকে বেরিয়ে গাড়ির দিকে আসছে। ডাক্তার রায় সেদিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, 'এমন পরিষ্কার গলা শুনলে মিস মঞ্জু আপনাকে চিনে ফেলতে পারেন, অবশ্য তাই যদি আপনার মতলব হয়—।'

মঞ্জু এসে পড়ল গাড়ির কাছে।

সুজিত তাড়াতাড়ি বাস্কেটটা সরিয়ে ফেলে বললে, 'আ—আমার তা—তাই ম—মতলব। আমার য—যদি তা—তা—'

ডাক্তার রায় বললেন, 'হ্যাঁ তারপর—?'

মঞ্জু কিছু বুঝতে না পেরে বললে, 'ব্যাপার কী ডাক্তার রায়?'

'কিছু না। এই আমার ড্রাইভারকে একটু তাতাচ্ছিলাম।'

'তাতাচ্ছিলেন!' মঞ্জু আশ্চর্য হয়ে চাইল ডাক্তারের দিকে।

ডাক্তার রায় বললেন, 'হ্যাঁ মোটরের মতোই আমার ড্রাইভারকে মাঝে-মাঝে তাতিয়ে দিতে হয় নইলে চলে না। নিন উঠে পড়ুন, আর দেরি করবেন না।'

মঞ্জু গাড়িতে উঠল, 'ডাক্তার রায় তার পাশে গিয়ে বসলেন।'

সুজিত গম্ভীর মুখে গাড়িতে স্টার্ট দিল।

সন্ধ্যা হয়েছে। ডাক্তার রায়ের গাড়ি এসে থামল লেকের একটা জনবিরল অংশে। সুজিত গাড়ি থেকে নেমে দরজা খুলে দিল। মঞ্জুকে নিয়ে ডাক্তার রায় নামলেন। মঞ্জু বললে, 'শহর দেখাতে বেরিয়ে এখানে নামলেন যে বড়?'

'শহর দেখানোটা একটা ছল।'—বলে ডাক্তার রায় সুজিতের দিকে চেয়ে হাসলেন। সুজিত যথাসম্ভব গাম্ভীর্য বজায় রেখে নিজের সিটের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

মঞ্জু যেতে-যেতে বললে, 'কেন বলুন তো, হঠাৎ এমন খেয়াল?'

ডাক্তার রায় মঞ্জুর একেবারে কাছ ঘেঁসে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ তার হাত ধরে ফেলে বললেন, 'খেয়াল তো হঠাৎই হয় মিস চ্যাটার্জি। তা ছাড়া এমন কিছু অন্যায় খেয়াল তো নয়, দুদিন বাদে যার সঙ্গে বিয়ে হবে তার সঙ্গে এই নির্জনে একটু হাত-ধরাধরি করে চলবার সাধ কার না হয়!'

সামনেই একটা বেঞ্চ পাওয়া গেল। মঞ্জুকে একরকম জোর করেই তার ওপর বসিয়ে দিলেন। দূর থেকে সুজিত জ্বলন্ত দৃষ্টি দিয়ে ওদের দুজনকে দেখতে লাগল।

মঞ্জু বেঞ্চের ওপর বসে বললে, 'আপনার মধ্যে এত কবিত্ব ছিল ডাক্তার রায়!'

ডাক্তার রায় মঞ্জুর পাশটিতে বসতে-বসতে বললেন, 'আমার ভেতর কত কী যে ছিল তা আবিষ্কার করে আমি নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছি মিস চ্যাটার্জি। অবশ্য এসবই আপনার গুণ, চকমকি না ঠুকলে এ মরা কাঠে আগুন জ্বলত না।'

ডাক্তার রায়ের আজকের ব্যবহারে মঞ্জুর রীতিমতো খটকা লাগছিল, এই শান্ত শিষ্ট মানুষটির এই আকস্মিক ছেলেমানুষির সঠিক একটা কারণ হাজার চেষ্টা করেও সে খুঁজে পাচ্ছিল না। একটু চুপ করে থেকে সে বললে, 'আপনি কি আজ এখানে এইসব কথাই

শোনাবেন?'

'শুধু এই সব?' ডাক্তার রায় তার গাড়িটার দিকে একবার চেয়ে নিয়ে কণ্ঠস্বর আর এক পর্দা চড়িয়ে দিয়ে বলতে লাগলেন, 'এর চেয়ে ভালো-ভালো অজস্র কথা আমি আপনাকে শোনাব, একটু ধৈর্য ধরুন। ড্রাইভার, এই ড্রাইভার—'

ডাক্তার রায়ের ডাক শুনে সুজিত বেঞ্চের দিকে এগিয়ে এল—মুখে-চোখে স্পষ্ট বিরক্তি।

মঞ্জু ড্রাইভারকে আসতে দেখে বললে, 'একটু সরে বসুন ডাক্তার রায়, আপনার ড্রাইভার আসছে, কী ভাববে—'

ডাক্তার রায় সরে বসবার আগেই সুজিত এসে পড়ল। ডাক্তার রায় কিছুমাত্র বিব্রত বোধ না করে মঞ্জুর দিকে চেয়ে রইলেন। যেন সুজিতকে দেখতেই পাননি। রাগে সুজিতের কানের ডগা পর্যন্ত লাল হয়ে উঠেছিল, ইচ্ছে করছিল এক থাপ্পড় মেরে বেরসিক ডাক্তারকে সেখান থেকে হটিয়ে দেয়; কিন্তু কিছুই সে করল না। প্রাণপণে নিজেকে সংযত করে মনিবের হুকুমের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল। ডাক্তার রায় কিন্তু ড্রাইভারকে তখনই কোনও আদেশ দেওয়া দরকার মনে করলেন না, বরং তাকে শুনিয়ে-শুনিয়ে বলতে লাগলেন, 'হুঁ, ড্রাইভার আবার একটা মানুষ, তার আবার মনে করা!.... কিন্তু তোমায় মিস চ্যাটার্জি বলে আব কত ডাকব বলো তো? এবার থেকে শুধু মঞ্জু বলে ডাকবো কেমন?'

বলতে-বলতে মঞ্জুর একটা হাত তিনি নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিলেন। তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতির ফলে মঞ্জু রীতিমতো বিরক্তি বোধ করছিল, হাতটা ছাড়িয়ে নিতে-নিতে সে আড়ষ্ট ভাবে বললে, 'বেশ তাই বলবেন, কিন্তু—।'

সুজিত কী করবে স্থির করতে না পেরে হঠাৎ কেশে ডাক্তার রায়ের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করল। ডাক্তার রায় এতক্ষণে ড্রাইভারের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার সুযোগ পেলেন যেন, বললেন, 'ওঃ এই যে ড্রাইভার! গাড়ি থেকে বাস্কেটটা নিয়ে এস দেখি।'

এবার সত্যিই সুজিতের গায়ের সমস্ত রক্ত যেন মাথায় উঠে গেল। বলে কী লোকটা? ভদ্রমহিলার সামনে মদের বোতল বার করবে নাকি?

ডাক্তার রায় আবার বললেন, 'শুনতে পাচ্ছ না, আমার বাস্কেটটা নিয়ে এস।'

সুজিত বললে, 'দেখুন, এখনও আমি...।'

আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিল সুজিত, ডাক্তার রায় তাকে ইঙ্গিতে নিষেধ করলেন। অর্থাৎ স্মরণ করিয়ে দিলেন যে সে প্রথমত ড্রাইভার, দ্বিতীয়ত তোৎলা।

সুজিতের কিন্তু তখন সে কথা মনে নেই, সে বললে, 'আপনাকে আমি সা—'

তার বলাব উদ্দেশ্য ছিল আপনাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি, কিন্তু তার কথা শেষ হবার আগেই ডাক্তার রায় বললেন, 'সা রে গা মা সাধতে বলিনি, বাস্কেটটা আনতে বলেছি। চাকর-বাকরদের যদি একটু ডিসিপ্লিন জ্ঞান থাকে!'

ক্ষুব্ধ, মর্মাহত সুজিত ফিরে গেল মোটরের দিকে বাস্কেটটা আনবার জন্যে।

ডাক্তার রায় মনে-মনে খুশি হয়ে উঠছিলেন। সুজিত চটেছে! অর্থাৎ ওষুধ ধরতে শুরু করেছে। দেখা যাক, আর কতক্ষণ সে আত্মসংযমের মহিমা প্রচার করতে পারে।

মঞ্জুর দিকে ফিরে ডাক্তার রায় বললেন, 'তারপর কী বলছিলাম তখন?'

মঞ্জু বিরক্ত ভাবে বললে, 'আমি মুখস্থ করে রাখিনি, কিন্তু এখান থেকে উঠলে হয় না?'

'সে কী! এরই মধ্যে উঠবে কী! এখনও তো চাঁদই ওঠেনি।'

'আপনি কি চাঁদ দেখে এখান থেকে উঠবেন না কি?'

'তাই তো ওঠা উচিত! সেই যে কবি কালিদাস বলে গেছেন—।'

'কী বলেছেন কবি কালিদাস?'

'সেই যে—ঘরে যদি থাকো তো চাঁদ না উঠলে বাইরে যেও না, বাইরে যদি থাকো তো চাঁদ না দেখে ঘরে ফিরো না।'

চাঁদ সম্বন্ধে চটকদার কোনও কথা শোনবার ধৈর্য মঞ্জুর ছিল না, কৃষ্ণপক্ষের রাত—চাঁদ উঠতে এখনও অনেক দেরি, এই ভেবেই সে অস্থির হয়ে উঠেছিল; ডাক্তার রায়ের কথা শেষ হতেই সে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, 'কালিদাস ও-রকম কথা কখনও বলেননি।'

'বলেননি? না বলে থাকলে অত্যন্ত অন্যায় করেছেন, বলা উচিত ছিল।'

ইতিমধ্যে সুজিত বাস্কেটটা নিয়ে ফিরে এসেছিল, ওটা সে বেঞ্চের ওপর নামিয়ে রেখে একটু সরে দাঁড়াল। ডাক্তার রায় বাস্কেট থেকে মদের বোতল আর গ্লাস বার করলেন, তারপর সোডার বোতলটা খুলতে-খুলতে মঞ্জুর দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন, 'তা ছাড়া...এমন জায়গা ছেড়ে তোমার বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করে মঞ্জু? মনে করো এ আমাদের অভিসার রাত্রি।'

বলতে-বলতে ডাক্তার রায় সুজিতের দিকে একটা চোরা চাহনি নিক্ষেপ করলেন; সুজিত বিরক্ত হয়ে আরও কয়েক পা পিছিয়ে গেল।

ডাক্তার রায় এবার কণ্ঠস্বরে আরও একটু উচ্ছ্বাস ঢেলে বলতে লাগলেন, 'এই নির্জন প্রান্তরে শুধু তুমি আর আমি...।'

মঞ্জু আর সহ্য করতে পারল না, উঠে দাঁড়িয়ে তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললে, 'আপনি ক্রমশ অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করছেন ডাক্তার রায়।'

'বাড়াবাড়ি!'—ডাক্তার রায় বোতল থেকে খানিকটা তরল পদার্থ গ্লাসে ঢেলে সোডা মিশিয়ে চুমুক দিলেন, তারপর আবার বলতে শুরু করলেন, 'তুমি একে বাড়াবাড়ি বলো মঞ্জু! আমার ভালোবাসার উচ্ছ্বাসকে তুমি এমনি করে অপমান করছ! তুমি এত নিষ্ঠুর!'

ডাক্তার রায় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার মদের গ্লাসে চুমুক দিলেন। নিজের অদ্ভুত অভিনয়-দক্ষতায় তিনি হাসবেন না কাঁদবেন, ঠিক বুঝতে পারছিলেন না।

মঞ্জু বললে, 'আপনি ভদ্রলোক বলে আমার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু...এটা কী হচ্ছে আপনার?'

'এটা?' ডাক্তার রায়ের কথাগুলো এবার একটু জড়িত হয়ে এল—'কেন, একটু drink করছি, কালিদাস বলেছেন, 'তুমি আমার পাশে আর হাতে এই সুরার পাত্র— ।'

'Hang your Kalidas!'

'এই জন্যে আমায় এখানে এনেছেন, এইভাবে আমায় অপমান করবার জন্যে?'

'কী বলছ মঞ্জু? একটু drink করেছি বলে তুমি অপমান বোধ করছ? আমাদের আমেরিকায় necking party-তে drink না করলে মেয়েরা অপমান বোধ করত—।'

'আমি আপনাদের আমেরিকার necking party-র মেয়ে নই। আমায় বাড়ি পৌঁছে দিন, আমি আর এক মুহূর্ত এখানে থাকতে চাই না।'

ডাক্তার রায় গ্লাসে আরও খানিকটা মদ ঢেলে এক চুমুকে খেয়ে ফেললেন; তারপর মঞ্জুর হাতটা ধরে ফেলে বললেন, 'তুমি—তুমি রাগ করছ dearie! লক্ষ্মীটি, রাগ কোরো

না—সারাজীবন যার সঙ্গে ঘর করতে হবে তার ওপর এত তুচ্ছ কারণে রাগ করতে আছে।'

সুজিত অদূরে উত্তেজিত ভাবে পায়চারি করছিল; তাকে দেখে মনে হচ্ছিল, বুনো বাঘকে কে যেন খাঁচায় আটকে রেখেছে!

ডাক্তার রায়ের কথার জবাবে মঞ্জু বললে, 'আপনার সঙ্গে সারাজীবন ঘর করতে হবে? আপনাকে এতদিন চিনতে পারিনি তাই—এখন বলছি, আমায় ছেড়ে দিন।'

মঞ্জু সজোরে তার হাতটা ডাক্তার রায়ের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিল।

ডাক্তার রায় তাকে ধরবার জন্যে হাত বাড়াতে-বাড়াতে বললেন, 'তা কি হয় dearie! অভিসার-লগ্ন কি বৃথা যাবে?'

মঞ্জুর হাতটা তিনি আবার চেপে ধরলেন।

মঞ্জু বলতে লাগল, 'ছাড়ুন, আমায় ছেড়ে দিন—আমায় ছেড়ে দিন।...'

সুজিতের পক্ষে আর নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকায় অভিনয় করা সম্ভব হল না। মঞ্জু, তার মঞ্জু—এমনি ভাবে একটা মাতালের হাতে লাঞ্ছিত হবে, সে কি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখতে পারে? সে ফিরে এল ওদের কাছে।

ডাক্তার রায় ধমকে উঠলেন, 'তুম্—তুমকো কোন বোলায়া? যাও—'

সুজিত বললে, 'না।'

'না এতদূর স্পর্ধা?'

'আপনাকে আমি ভালো কথায়—'

'ভালো কথায়? what the devil you mean? তুমি ভুল করছ, তুমি একটা ড্রাইভার। গেট্ আউট—।'

সুজিত মারবার জন্যে ঘুসি তুলেছিল, কিন্তু পারল না, ভদ্রতা এসে বাধা দিল। রাগে, দুঃখে, অপমানে মাথা হেঁট করে সরে গেল।

ডাক্তার রায় বললেন, 'কিছু মনে করো না মঞ্জু, বেয়াদপ ড্রাইভারটাকে আমি কালই তাড়িয়ে দেব।'

তিনি আবার মঞ্জুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, মঞ্জু তাঁর কাছ থেকে সরে এসে ডাকল, 'ড্রাইভার, ড্রাইভার—'

সুজিত থমকে দাঁড়াল।

মঞ্জু তার কাছে গিয়ে বললে, 'তুমি—তুমি আমায় একটু দয়া করে বাড়ি পৌঁছে দাও। আমি তোমায় যা চাও বখশিস দেব।'

ডাক্তার রায় নাটকীয় ভঙ্গিতে হাততালি দিয়ে উঠলেন, 'বাঃ চমৎকার। শেষে ওই বেয়াদপ ড্রাইভারটা তোমার বিশ্বাসের পাত্র হল মঞ্জু? কিন্তু তুমি ভুলে যেও না যে ও আমার ড্রাইভার—'

মঞ্জু বললে, 'আপনার ড্রাইভার হতে পারে, কিন্তু আপনার মতো মাতাল, বদমায়েশ, ইতর নয়। ওর ভেতর আপনার চেয়ে হয়তো মনুষ্যত্ব বেশি আছে—'

ডাক্তার রায় মনে-মনে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। এমনি একটি মুহূর্তের জন্যই তো তাঁর এত আয়োজন, এত চেষ্টা। চরম অভিনয়-প্রতিভার পরিচয় দেবার সময়ও তো এই।

মঞ্জুর দিকে চেয়ে তিনি বললেন, 'তাই নাকি। কিন্তু তবু ওর সঙ্গে তোমায় আমি যেতে দিতে পারি না। তোমাকে এখানেই থাকতে হবে।'

ডাক্তার রায় এবার হাত বাড়িয়ে মঞ্জুকে প্রায় নিজের বুকের কাছে টেনে নেওয়ার

চেষ্টা করলেন।

সুজিত স্থান, কাল, পাত্র ভুলে গেল। টান মেরে খুলে ফেলল মুখের গোঁফ-দাড়ি আর মাথার পাগড়িটা। তারপর গর্জে উঠল, 'Lay off your hand!'

ডাক্তার রায় চমকে ওঠার ভঙ্গি করে বললেন, 'ও বাবা! এ তো ড্রাইভারের বুলি নয়। এ যে অন্য চেহারা—।'

বেঞ্চ থেকে মদের বোতলটা তুলে নিয়ে তিনি এক ঢোক খেয়ে ফেললেন।

সুজিত তাঁর সামনে এসে বললে, 'হ্যাঁ, বাধ্য হয়েই এই চেহারা দেখাতে হল।'

ডাক্তার রায় বিস্ময়-বিহ্বল কণ্ঠে বললেন, 'আরে. এ যে বেকার বাউণ্ডুলে সুজিত চক্রবর্তী দেখছি! একেবারে নাটকীয় আবির্ভাব!'

মঞ্জু বিহ্বল হয়ে পড়েছিল, সুজিতের মুখের দিকে চেয়ে শুধু বললে, 'তুমি!'

সুজিত হাসতে-হাসতে বললে, 'তুমি কী ভেবেছিলে?'

মঞ্জু বললে, 'ভেবেছিলাম আমায় হয়তো ভুল বুঝেছ। হয়তো আর আসবে না।'

সুজিত মঞ্জুর হাত ধরে বললে, 'সেই ভুলই আর একটু হলে করতে যাচ্ছিলাম।'

ডাক্তার রায় আবার হাততালি দিতে-দিতে মত্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'বাঃ! চমৎকার মিলন দৃশ্য। কিন্তু এ দৃশ্যে আমার স্থানটা কোথায় জানতে পারি—?'

'আপনার স্থান আপাতত এইখানেই—এই মাঠের মাঝখানে। চলো মঞ্জু—।'

মঞ্জুকে নিয়ে সুজিত গাড়ির দিকে চলল।

ডাক্তার রায় তাদের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। মুখে হাসি!

মঞ্জুকে মোটরে তুলে সুজিত গাড়িতে স্টার্ট দিল। ডাক্তার রায় স্খলিত পায়ে প্রায় ছুটতে-ছুটতে গিয়ে গাড়িতে ওঠবার চেষ্টা করলেন। সুজিত তাঁকে ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দিয়ে বললে, 'তা হয় না ডাক্তার রায়। এ গাড়িতে দুজনের বেশি ঠাঁই নেই।'

'কিন্তু গাড়িটা কি আমার নয়?'—ডাক্তার রায় যেন শেষ চেষ্টা করলেন।

সুজিত গাড়ি ছেড়ে দিয়ে বললে, 'ভয় নেই, গাড়ি যথাসময়ে ফেরত পাবেন।'

অন্ধকার চারিদিকে গাঢ় হয়ে এসেছিল, তারমধ্যে গাড়িটা হারিয়ে যেতে দেরি হল না।

ডাক্তার রায় মদের বোতলটা ফেলে দিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন।

হঠাৎ বড় ক্লান্ত, বড় একা মনে হচ্ছিল। কিন্তু জীবনে এত ভালো অভিনয় তিনি কখনও করেননি। রংপুরের পূর্ণিমা থিয়েটারের ম্যানেজার ভাগ্যে জোর করে তাঁকে স্টেজে ঠেলে দিয়েছিল, নইলে তাঁর এত বড় সুপ্ত প্রতিভার কথা তিনি বোধহয় জানতেও পারতেন না। এই ভেবে তিনি খুশি হবার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু হঠাৎ মনে হল চোখে কী পড়েছে। জল আসবে নাকি?

হাসবার চেষ্টা করলেন তিনি। দুটি লোক ভুল করে উলটো পথে চলে যাচ্ছিল, তাদের তিনি যথাস্থানে এনে মিলিয়ে দিয়েছেন। আজকের স্বেচ্ছাকৃত ট্রাজেডির মধ্যে এইটুকুই তো যথেষ্ট সান্ত্বনা।

ডাক্তার রায় জোর করে পা-দুটোকে টেনে নিয়ে চললেন...।

প্রতিশোধ

কোনও এক মধুর সকাল বেলায়, বাংলার কোনও একটি গ্রামের প্রান্তে গ্রামের জমিদার-পুত্র বিজয়নারায়ণ চৌধুরীর বন্দুকের গুলিতে আহত একটি রক্তাক্ত পাখি পাশের গ্রামের একটি মেয়ের গায়ের ওপর গিয়ে না পড়লে এ কাহিনির সূত্রপাত হতো না। সব কিছু নিয়ে প্রশ্ন করা যাদের অভ্যাস, তাঁরা অবশ্য এরকম ঘটনা-সমাবেশে আপত্তি তুলতে পারেন। তাঁরা বলতে পারেন যে রক্তাক্ত পাখিটি ওই মেয়েটির গায়ে ছাড়া আর কি কোথাও পড়বার জায়গা পায়নি। আমরা উত্তরে বলতে পারি যে পাখিটি যে কোনও জায়গাতেই পড়তে পারত কিন্তু তাহলে এ কাহিনি অলিখিত-ই থাকত। আমাদের নিত্যকার একঘেয়ে জীবনে সহসা একদিন অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটে বলেই অসাধারণ কাহিনির সূত্রপাত হয়।

ছেলেটির পরিচয় আগেই একটু দেওয়া হয়েছে। সে গ্রামের প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর একমাত্র পুত্র। বহুদিন কলকাতায় থেকে পড়াশোনা করবার পর ছুটিতে এবার গ্রামে এসেছিল কিছুদিন বিশ্রাম করতে। কিন্তু গ্রামের নিস্তরঙ্গ একঘেয়ে জীবনে বিশ্রাম তার কাছে ক্রমশ বিস্বাদ হয়ে উঠেছে। সেই জন্যেই বুঝি সকালবেলা উদ্দেশ্যবিহীনভাবে সে বন্দুক হাতে পাখি শিকারে বেরিয়ে পড়েছিল। কিন্তু পাখি মারতে গিয়ে নিয়তি তাকে দিয়ে এমন অসাধারণ লক্ষ্যভেদ করাবে তা বুঝি তার ছিল স্বপ্নেরও অগোচর। পাখিটি যে মেয়েটির গায়ের ওপর গিয়ে পড়ল তাকেও একটু চেনা দবকার। নির্মলা গ্রামের দবিদ্র পুরোহিত উমানাথ ভট্টাচার্যের একমাত্র মেয়ে। বয়স নিতান্ত অল্প নয়; অর্থাভাবেই এতদিন বিয়ে-থা বোধহয় হয়নি। প্রকৃতিটি একদিকে যেমন মধুর, আর একদিকে তেমনি দৃপ্ত। সকালবেলায় সবে পূজার জন্য উপকরণ সংগ্রহ করে সে বাড়ি ফিরছিল, হঠাৎ এই বিভ্রাট। পূজার উপাচার এইভাবে নষ্ট হওয়ায় অত্যন্ত রেগে উঠে সে বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়েই বন্দুক হাতে বিজয়ের দেখা পেল। পরিচিত-অপরিচিত, শোভনতা-অশোভনতা বিচার করবার ধৈর্য তখন তার নেই। একেবারে আগুন হয়ে গিয়ে সে প্রথমেই ভর্ৎসনা করে বললে, 'কীরকম লোক আপনি? এটা বাঘ ভাল্লুকের জঙ্গল নয়—মানুষের গ্রাম তা জানেন? বন্দুক নিয়ে বাহাদুরিটা গ্রামের ভেতর না দেখালেই নয়?'

বিজয় ফুঁ দিয়ে বন্দুকের নলটা পরিষ্কার কবে নিতে-নিতে হঠাৎ এই অতর্কিত আক্রমণে একটু বিস্মিত হয়েই মুখ তুলে তাকালে। সঙ্কুচিতভাবে বলতে গেল, 'দেখুন আমি ঠিক...'

কিন্তু নির্মলা তাকে আর কথা শেষ করতে দিলে না, নিজের রক্তাক্ত শাড়ির আঁচলটা দেখিয়ে ঝাঁঝের সঙ্গে বললে, 'দেখেছেন কী হয়েছে? আমার সমস্ত পুজোর আয়োজন আপনি নষ্ট করে দিয়েছেন, জানেন? কী অধিকারে আপনি গ্রামের মধ্যে শিকার করেন?'

এই ভর্ৎসনার মাঝেও মেয়েটিকে বিশেষ মনোযোগ দিয়ে বিজয় এতক্ষণ লক্ষ করছিল। মেয়েটি চুপ করতেই সে বললে, 'আমার সত্যি অপরাধ হয়েছে, আমায় ক্ষমা করো নির্মলা।'

এবার নির্মলার বিস্মিত হওয়ার পালা। নিজের নাম অপরিচিতের মুখে শুনে অবাক হয়ে তার দিকে তাকাতেই বিজয় হেসে বললে, 'আমায় চিনতে পারছ না নির্মলা? আমি বিজয়।'

খানিক বিস্মিত হয়ে বিজয়ের দিকে তাকিয়ে থেকে নির্মলা এবার মুখ না নামিয়ে পারলে না, বললে, 'কিন্তু এখানে পাখি মারা খুব অন্যায় হয়েছে!'

ঈষৎ ভর্ৎসনার ঝাঁঝ থাকলেও সুর তার এখন অনেক নরম।

বিজয় হেসে বললে, 'তা স্বীকার করছি, কিন্তু পাখিটা এমন বেয়াড়া ভাবে তোমার

গায়েই গিয়ে পড়বে তা ভাবতেই পারিনি।' বিজয় একটু থেমে আবার জিজ্ঞাসা করলে, 'আমায় কি তুমি চিনতেই পারনি নির্মলা?'

নির্মলা মাথা নিচু করে বললে, 'পেরেছি।'

'তাহলে এখনও ক্ষমা করনি বুঝি—?'

'আমি কি তা বলেছি!' নির্মলার গলার স্বরে এখনও যেন বিরোধের আভাস।

'ক্ষমা যে করেছ তাও তো বলনি! কিন্তু আগেও তো আমি পাখি মেরেছি নির্মলা। মনে পড়ে? তখন কিন্তু পাখি শিকারে তোমার বেশ উৎসাহই ছিল। এমনকী আমার হাত থেকে এয়ারগান কেড়ে নিয়ে ছুঁড়েছ!'

নির্মলা এবার হেসে ফেললে,—বিজয় আর একটু কাছে এগিয়ে এসে বললে, 'তা হলে মনে পড়েছে দেখছি। ওঃ কী দুষ্টই ছিলাম আমরা!'

নির্মলার মুখের সমস্ত মেঘ এবার কেটে গেছে দেখা গেল, নিজের অজ্ঞাতেই সে উৎসাহের সঙ্গে বলে ফেললে, 'মনে হচ্ছে যেন এই সেদিন।'

বিজয় একটু হেসে বললে, 'ঠিক সেদিন নয়, অনেক দিন হল। তোমায় তো আমি চিনতে পারিনি প্রথমে। কত বড় হয়ে গেছ!'

'তুমি নিজে বুঝি ছোটটি আছ, আমি তো ভেবেছি কে না জানি এক জাঁদরেল শিকারি।'

'কিন্তু জাঁদরেল শিকারিকেও যা ধমকটা দিলে—'

নির্মলা গম্ভীর হওয়ার ভান করে বললে, 'অন্যায় করলে ধমক খাবে না? তুমি অমন করে পাখি মারলে কেন?'

'আহা! আবার সে কথা কেন? পাখি না মারলে কি তোমার সঙ্গে দেখা হতো?'

'তুমি ভারি নিষ্ঠুর তো? পাখি না মারলে বুঝি দেখা আর হতো না?'

'কী করে হতো?—পড়াশুনোর জন্যে ক'বছর আর গ্রামে আসিনি। তোমরা আমাদের গ্রাম ছেড়ে এগাঁয়ে উঠে এসেছ তা তো জানিই না।'

'পড়াশুনোর ছুতো করা কেন?' এবার নির্মলার স্বর আবার বুঝি একটু ঝাঁঝাল, 'বলো শহর ছেড়ে এখানে আসতে ভালো লাগত না।'

'তা একেবারে মিথ্যে বলনি, সময় যেন এখানে কাটতেই চায় না। আজকে নেহাত কিছু না পেয়েই তো বন্দুকটা নিয়ে বেরিয়েছিলাম।'

'এমন পোড়া গ্রামে না এলেই পারো। এখানে কি মানুষ আসে।'—বলে নির্মলা মুখ ফেরালে।

অভিমানের সুরে বিপদের আভাস পেয়েই বিজয় তাড়াতাড়ি বললে, 'অমনি খেপে গেলে তো? আমি কি তাই বললাম। শুধু দেখতেই বড় হয়েছ, স্বভাবটি ঠিক তেমনই আছে দেখছি।'

'এ তো তোমার শহর নয়, এখানে রোজ-রোজ কেউ বদলায় না'—নির্মলার স্বর এখন গম্ভীর।

বিজয় গলা নামিয়ে বললে, 'শহর তো তাই বার-বার হার মেনে ফিরে আসে।'

নির্মলার চোখে একটু আবেশ যেন দেখা দিয়েছিল, তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে সে বললে, 'বাবার পুজোর বেলা হয়ে গেল, আমি চলি—'

নির্মলা কয়েক পা এগিয়ে গেল। বিজয় একটুখানি কী যেন ভেবে নিয়ে তার সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে বললে, 'দাঁড়াও আমি যাব যে।'

'তুমি কোথায় যাবে?'

'কেন, তোমাদের বাড়ি।'

'আমাদের বাড়ি যাবে তুমি!'—নির্মলা সত্যি বিস্মিত।

'কেন, যাইনি কখনও। ছেলেবেলায় কত জ্বালাতন করেছি তোমার বাবা-মাকে!'

'এখন তো আর ছেলেবেলা নয়—'

বিজয় হেসে বললে, 'যেতে বারণ করছ তা হলে? কিন্তু—কিন্তু আমার যে ভয়ানক পিপাসা পেয়েছে। একটু জল খেতে দেবে না?'

'এই সকাল বেলায় পিপাসা!'—নির্মলা হেসে ফেললে।

বিজয় অম্লানবদনে বললে, 'আমার ওইরকম বেয়াড়া পিপাসা!'

নির্মলা হাসি চেপে গম্ভীর হয়ে বললে, 'বুঝেছি, চলো।'

নির্মলাদের বাড়ি বেশি দূর নয়। বাড়িটি দেখলেই এই পরিবারটির সাংসারিক অবস্থাটি বুঝতে দেরি হয় না। চালে খড় নেই, চারিধারের দেওয়াল বহুদিনের সংস্কার অভাবে ধ্বসে পড়েছে; কিন্তু তবু উঠান থেকে মাটির দাওয়া পর্যন্ত সমস্ত পরিষ্কারভাবে নিকানো-পোঁছানো দেখে বোঝা যায় যে অস্বচ্ছলতা এ-সংসারে কোনও অভাবের গ্লানি আনেনি। বিজয়কে দাওয়ার কাছে দাঁড় করিয়ে নির্মলা ঘরের ভেতর গেছল। হঠাৎ মস্ত বড় একটি জল ভরা ঘড়া এনে তার সামনে বসিয়ে দিয়ে বললে, 'নাও খাও!'

বিজয় প্রথমে অবাক হয়ে তারপর হেসে ফেললে।

'এটা কি পান করবার না স্নান করবার?'

'স্নান করবার কেন হবে? তোমার না ভয়ানক পিপাসা?'—বলে নির্মলাও হাসল। নির্মলা হয়তো আর কিছু বলত কিন্তু ইতিমধ্যে মা এসে অপরিচিত একটি যুবককে বাড়ির ভেতর দেখে একটু সঙ্কুচিত হয়ে মাথায় কাপড় টেনে সবিস্ময়ে নির্মলার দিকে তাকালেন। মায়ের ভাবগতিক দেখে নির্মলা হেসে ফেলে বললে, 'চিনতে পারলে না মা? ইনি মস্ত বড় শিকারি, তবে জঙ্গলের চেয়ে গ্রামের ভেতরেই রক্তারক্তি করতে ভালোবাসেন।'

মা এতক্ষণে চিনতে পেরেছেন। বললেন, 'তুই থাম বাপু! আমাদের বিজয় না? কী আশ্চর্য আমি যে ভাবতেই পারিনি তুমি এই গরিবের কুঁড়েতে দেখা করতে আসবে।'

নির্মলা বিজয়ের দিকে একবার দুষ্টুমির হাসি হেসে বললে, 'উনি কী আর এমনি এসেছেন মনে করো। এসেছেন নেহাত পিপাসার জ্বালায়।'

মা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'ওমা তা জল-টল দিসনি?—'

নির্মলা হাসি চেপে বললে, 'হ্যাঁ, জল তো দিয়েছি মা।'

'শুধু জল দিয়েছিস নাকি, দেখ দিকি কী কাণ্ড!—মা ব্যাকুল হয়ে উঠলেন, কিন্তু পরের মুহূর্তেই দুঃখের সঙ্গে বললে, 'কিন্তু গরিবের ঘরে কী বা তোমায় দেব বাবা। দুটো মুড়কি-মোয়াও নেই।'

নির্মলা গম্ভীর হওয়ার ভান করে বললে, 'তুমি থামো মা! জমিদারের ছেলে মুড়কি-মোয়া খায় না।'

প্রসঙ্গটা তাড়াতাড়ি বদলাবার জন্য বিজয় বললে, 'আর আমার কিছু দরকার নেই মাসিমা। আমি আপনাদের সঙ্গে দেখা করতেই এসেছিলাম।'

মা খুশি হয়ে বললেন, 'বেশ করেছ বাবা। সেই ছেলেবেলায় আসতে, তারপর কতদিন দেখিনি!'

বিজয় একটু সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল, 'আমি যে এখানে ছিলাম না মাসিমা। এই ক'বছর কলকাতাতেই পড়াশুনা করেছি, তাই আসতে পারিনি।'

'আর তারপর এই একমাস ছুটিতে এসে আমাদের বাড়ি আর খুঁজে পাচ্ছিলেন না—নইলে কবে আসতেন।'—নির্মলার চোখে-মুখে দুষ্টুমির হাসি।

বিজয়ের পক্ষে অবস্থাটা একটু অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ বাইরে দুজনের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। একজন নির্মলার বাবা গ্রামের পুরোহিত উমানাথ ভট্টাচার্য, আর একজন গ্রামেরই একটি অত্যন্ত পরোপকারী ছেলে, নাম পরিতোষ। বিজয়ের সে বাল্যবন্ধু।

শোনা গেল, পরিতোষ পুরুতমশাইকে মৃদু ভর্ৎসনা করতে-করতে আসছে, 'আপনি তার চেয়ে বনে গিয়ে বাস করুন। সংসার করবার বিড়ম্বনা আপনার কেন!'

বাড়ির ভেতর ঢুকে একটি পুঁটলি নির্মলার মায়ের হাতে তুলে দিয়ে সে বললে, 'এই নাও মাসিমা! ভাগ্যিস আমি ছিলাম, নইলে আজও উমাখুড়ো তোমাদের উপোসের ব্যবস্থা করে আসছিলেন। জমিদার বাড়ির আদায়পত্র উনি রাস্তা থেকেই বিদায় করে দিচ্ছিলেন আর কী?'

উমানাথ ভট্টাচার্য মৃদু প্রতিবাদ করে বললেন, 'না—না, ঘোষাল বড় মুখ করে চাইলে সকাল বেলা—'

'তাই দরাজ হাতে দক্ষিণার টাকাটা দিয়ে দিলেন, কিন্তু তার ওপর এই চাল-ডালগুলোও না দিলে চলছিল না'—বলে পরিতোষ হাসলে।

উমানাথ সলজ্জভাবে কৈফিয়ত দেওয়ার চেষ্টা করলেন, 'জানো না পরিতোষ ওদের বড় অভাব। দুবেলা খেতে পায় না।'

পরিতোষ বাধা দিয়ে বললে, 'আর আপনার বাড়িতে বুঝি দুবেলা যজ্ঞি লেগে আছে!'

উমানাথ আরও যেন বিব্রত হয়ে বললেন, 'না—না, তা নয়, তবে কী জানো, আমাদের এমন এক-আধদিন উপোস করা অভ্যেস আছে!'

এবার সবাই হেসে ফেললে।

পরিতোষ বললে, 'সুতরাং আর ভাবনা কী? আচ্ছা, নির্মলা কত বড় হয়েছে সে খেয়াল আপনার আছে? ওর বিয়ে-থার ব্যবস্থা করতে হবে না? শুধু উপোস করতে জানলেই হবে?'

উমানাথ এবার হেসে বললেন, 'সে ভাবনা ভগবান ভাববেন।'

'তার বেলা ভগবান ভাববেন!' পরিতোষ সকৌতুক স্বরেই বললে, 'শুধু ঘোষালের ভাবনাটা বুঝি ভগবানের হয়ে আপনাকে ভাবতে হবে? বাঃ ভগবানের ওপর কী দয়া। চলে এসো বিজয়, এদের সঙ্গে বেশিক্ষণ থাকলে আর মাথার ঠিক থাকবে না।'

নির্মলার মা এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন, মেয়ের বিয়ের প্রসঙ্গে এইবার না বলে পারলেন না, 'তুমি ঠিক বলেছ বাবা পরিতোষ! এত বড় সোমত্ত মেয়ে, ওকে আর ঘরে রাখা যায়?'

পরিতোষ হেসে বললে, 'বেশ তো, তাহলে ঘর থেকে বার করে দিন? কী বলিস নির্মলা?'

মা গম্ভীর হয়ে বললেন, 'না বাবা হাসবার কথা নয়। তোমরা যদি একটু চেষ্টাচরিত্র না করো তাহলে আর কে করবে। ওঁকে তো জানো, কোনও কাজ যদি ওঁকে দিয়ে হয়। অথচ মেয়ে তো দেখতে-দেখতে তালগাছ হয়ে উঠেছে।'

পরিতোষ নির্মলার দিকে চেয়ে হেসে বললে, 'ওই তো নির্মলার দোষ। আচ্ছা মাসিমা,

এবার নির্মলাকে বাড়ি থেকে বিদেয় না করে ছাড়ছি না। যেখান থেকে হোক একটা পাত্র ধরে আনবই। আর আমিই বা কেন—এই বিজয় তো আমার চেয়ে ভালো পারবে। কীহে বিজয়! তোমার জানা-শুনো কলকাতাতে বন্ধুদের ভেতর একটা পাত্র মিলবে না?'

বিজয় গম্ভীর হওয়ার ভান করে বললে, 'পাত্র মিলবে কিন্তু পাত্রীর সঙ্গে মিলবে কিনা তাই ভাবছি।'

এবার নির্মলাই বিজয়ের দিকে ভ্রূভঙ্গি করে ফোঁস করে উঠল, 'মা সারা সকাল বসে-বসে এই বাজে গল্প করবে? কাজ-কর্ম আর নেই? আমি বাবার পুজোর জোগাড় দিতে চললাম।'

নির্মলা সত্যিই আর সেখানে দাঁড়াল না। সেদিকে চেয়ে হেসে পরিতোষ বললে, 'ওহে লক্ষণ ভালো নয়। নির্মলা চটেছে। আমি চললাম। কিন্তু বিদেয় আমি নির্মলাকে করবই।'

বিজয়ও তার সঙ্গ নিয়ে বললে, 'আচ্ছা মাসিমা আর একদিন আসব একেবারে ভালো পাত্রের খবর নিয়ে।'

নির্মলার মা খুশি হয়ে বললেন, 'আমাদের ভাগ্য বাবা।'

পরিতোষ আর বিজয় ছেলেবেলার বন্ধু। ছেলেবেলায় এই গ্রামে একসঙ্গে পড়াশুনা করেছে। গ্রামের পথে একসঙ্গে ফিরতে-ফিরতে পরিতোষ হেসে বললে, 'তারপর কুমার বাহাদুর! তোমায় এদের বাড়ি দেখব বলে তো আশা করিনি!'

বিজয় জবাব দিলে, 'কেন এমন আশ্চর্যটা কীসের? ছেলেবেলার সাথী। তখন তো এ বাড়িতেই সারাদিন কাটাতাম।'

'কিন্তু ছেলেবেলা তো আর নেই, এখন তো আর গ্রামে আসতেই চাও না। ক'বছর পরে গ্রামে এলে বলো তো?'

বিজয় একটু লজ্জিত হয়ে পড়ল, 'সত্যি ভাই পড়াশুনার জন্যে...

পরিতোষ আবার গম্ভীর হয়ে উঠল, 'দেখো ভাই ও দোহাই দিও না, ছুটিছাটায় এক-আধবার গ্রামে এলে পড়াশুনার ক্ষতি হয় না! এদিকে গ্রাম-গেল গ্রাম-গেল বলে চিৎকার করো অথচ তোমাদের মতো লোক যদি গ্রামে না আসে, গ্রামের দিকে না চায়...

বিজয় হেসে ফেলে বললে, 'ওই তোমার বক্তৃতা আরম্ভ হল তো ভাই, আমার দোষ আছে স্বীকার করি, কিন্তু তোমার মতো গ্রামের জন্য প্রাণ দিতে তো পারতাম না।'

পরিতোষ একটু ম্লান হেসে বললে, 'আমার কথা ছেড়ে দাও, মা-বাবা-মরা অনাথ ছেলে মামাদের দয়ায় মানুষ। এই গ্রাম ছাড়া আর কী নিয়ে থাকব বলো। কিন্তু আমার মতো লোকের দ্বারা কতটুকুই আর সম্ভব, কতটুকুই আর হতে পারে—তোমাদের মতো লোক যদি গ্রামের দিকে না চায়—

পরিতোষের কথা আর শেষ হল না। গ্রামের একটি ছেলে দূর থেকে ছুটতে-ছুটতে এসে হাঁপাতে-হাঁপাতে বললে, 'পরিতোষদা তোমাকেই খুঁজতে বেরিয়েছি...।'

যেসব ছেলেদের দল নিয়ে পরিতোষ গ্রামের নানা কাজ করে বেড়ায়,—ছেলেটি তাদেরই একজন। সম্প্রতি গ্রামের বাউরিপাড়ায় একটি নোংরা নর্দমা পরিতোষ নতুন করে কাটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করছিল। সেই নর্দমা কাটা নিয়েই গোলযোগ বাধার সংবাদ ছেলেটি পরিতোষকে দিতে এসেছে।

সে বললে, 'বাউরিরা ঠিক কাজ করছিল। আমাদের আচার্যঠাকুর তাঁর দলবল নিয়ে এসে গোল বাধাচ্ছেন, বলছেন, সকলকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, নইলে একঘরে করবেন।

বামুন কায়েতের ছেলে হয়ে বাউরিদের নর্দমা ঘাঁটা। আপনাকে তো যা নয় তাই শাপমন্যি দিচ্ছেন—'

পরিতোষ হেসে বললে, 'তা দিনগে যান; কিন্তু ছেলেরা একটু ঘাবড়ে গেছে নাকি?'

'তা দু-একজন একটু ঘাবড়েছে বইকী? তাছাড়া বাউরিরা বলছে, কাজ নেই আমাদের নর্দমায়। আচার্যিঠাকুর তাদের পাপের ভয় দেখিয়েছেন, তার চাইতে বেশি দেখিয়েছেন জমিদারের ভয়। বামুন-কায়েতদের ছেলেদের নিয়ে নর্দমা ঘাঁটানোর মজা তিনি দেখিয়ে দেবেন বলেছেন।'

'আচ্ছা চল দেখছি'—বলে পরিতোষ একটু অগ্রসর হতেই দেখা গেল গ্রামের গোঁড়া দলের পাণ্ডা আচার্যিমশাই সেই দিকেই আসছেন।

আচার্যিমশাই একটি অপরূপ চরিত্র। ফোঁটা তিলক নামাবলির ঘটা দেখে কে বলবে তাঁর পেটে-পেটে অত কুটিল কুচক্রীর বুদ্ধি। একসঙ্গে জমিদার-পুত্র আর পরিতোষকে দেখে তিনি একেবারে গলায় মধু ঢেলে বললেন, 'এই যে বাবা বিজয় ভালো আছ তো, কেমন বাবা পরিতোষ সব কুশল তো?'

পরিতোষ একটু কৌতুকের হাসি হেসে বললে, 'ভালো আর থাকতে দিচ্ছেন কই আচার্যিমশাই?'

'সে কী কথা বাবা!'—আচার্যিমশাই একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন,—'আমি তো দিনরাত তোমাদের মঙ্গল কামনা করছি, তোমরা হলে গ্রামের সব, কী বলে রত্ন।'

'তাই বুঝি সকাল বেলায় আমাদের একঘরে করবার ব্যবস্থা করে এলেন?'

পরিতোষের শ্লেষটা এবার বড় স্পষ্ট। আচার্যমশাইয়ের ধৈর্য রইল না, চেঁচিয়ে উঠলেন,—'একঘরে! একঘরে আবার কাকে করব—ওইসব হতভাগারা লাগিয়েছে বুঝি! তা বাউরি বাগদির নর্দমা ঘেঁটে প্রায়শ্চিত্ত না করলে একঘরে করব না তো কি ধূপ-ধুনো দিয়ে পুজো করব। এসব কুমতলব ভালো মানুষের ছেলেদের যারা দেয়—'

পরিতোষ নিতান্ত শান্ত স্বরে বললেন, 'এসব কুমতলব আমিই দিয়েছি আচার্যিমশাই।'

আচার্যিমশাই জ্বলে উঠলেন, 'তুমি দিয়েছ—তুমি কেন দিয়েছ শুনি? সব ধিঙ্গি হয়ে পল্লীমঙ্গল করে বেড়াচ্ছেন। গাঁয়ের ছেলেগুলোর মাথা তো এমনই খেয়েছ, তাদের জাত-জন্মগুলো না খেলে আর চলছে না! বামুন-কায়েতের ছেলেদের দিয়ে নর্দমা ঘাঁটানো!'

পরিতোষ তবু শান্ত অবিচল। একটু হেসে বললে, 'বামুন-কায়েতের ছেলেরা নর্দমা ঘাঁটেনি, নর্দমা বাউরিরা নিজেরাই কাটছে। কিন্তু বামুন-কায়েতদেরও এটা সমান প্রাণের দায় তা জানেন, জানেন গ্রামের যে ভালো পুকুরটার ওপর সকলেব ভরসা, বাউরিদের নোংরা জল সেখানে এসে পড়ে বলেই এই নর্দমা কাটাবার ব্যবস্থা হচ্ছে। তার চেয়ে বাউরিদের নোংরা জলে গাঁয়ে রোগ লাগলেই বুঝি ভালো হতো।'

'রোগ—রোগ অমনি লাগলেই হল।'—আচার্যিমশাই খেঁকিয়ে উঠলেন,—'বৃহৎ জলে দোষ নেই—এই হল শাস্ত্রের কথা। আর লাগলই বা রোগ, তাই বলে জাত-জন্ম খুইয়ে অস্পৃশ্যদের নর্দমা ঘাঁটতে হবে? আমায় আর ন্যাকা বুঝিও না বাবু। তোমার কী বলো না, তিন কুলে কেউ নেই, তোমার জাত গেলেই বা কী আর থাকলেই বা কী? কিন্তু এসব অনাচার আমরা গ্রামে থাকতে হতে দেব না এই বলে রাখলাম। মনে রেখো এখনও ঠাকুর-দেবতা জাগ্রত, আচার্যিঠাকুর এখনও মরেনি।'

আচার্যমশাই একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে চলে গেলেন। বিজয় পরিতোষের দিকে চেয়ে

দুঃখের হাসি হেসে বললে, 'গ্রামের জন্যে প্রাণ দেওয়ার এই তো প্রতিদান। যাদের ভালোর জন্য এত করছ তারাই তোমায় অভিসম্পাত দিয়ে যাচ্ছে।'

পরিতোষ খানিক চুপ করে রইল, তারপর বললে, 'নিজের ভালো এরা বোঝে না বলেই তো এদের ছেড়ে দেওয়া যায় না ভাই—যাকগে তুমি আর এসব ভেবে দুঃখ পাও কেন? তোমার ছুটি তো ফুরিয়েছে, আজ-কালের মধ্যেই বোধহয় চলে যাবে?'

বিজয় হঠাৎ কেমন যেন একটু লজ্জিত হয়ে পড়ে বললে, 'না, ভাবছি দু-একদিন থেকেই যাব।'

বিজয়ের একটু লজ্জিত বোধ করবার কারণ ছিল। ক'দিন ধরে গ্রামের একঘেয়ে জীবন অসহ্য লাগায় সে রোজই যাই-যাই করছে, নেহাত তার মায়ের অনুরোধেই তাকে ক'টাদিন থেকে যেতে হয়েছিল। এখন হঠাৎ যে কারণেই হোক, গ্রামে আরও কয়েকদিন থাকার ইচ্ছে তার হয়েছে। সে ইচ্ছের কথা জানাতে একটু সঙ্কোচ তো হওয়ারই কথা। তার অবস্থাটা বেশি অস্বস্তিকর হয়ে উঠল বাড়িতে ফিরে। তার এই নতুন সঙ্কল্পের কথা মা জানেন না। বিজয় বাড়িতে ফিরতে প্রতিদিনের মতো তিনি আর একবার অনুরোধ করলেন, 'দু-একদিন আর থেকে গেলে হতো না বাবা।'

বিজয়ের হল মহাবিপদ, সোজাসুজি মা'র কথায় রাজি হতেও লজ্জা হয়, অথচ আপত্তি জানাবারও উপায় নেই।

বিজয়ের বোন মাধবীও মা'র সঙ্গে দাদার ঘরে এসেছিল জিনিসপত্র গুছিয়ে দিতে। একে হাসিখুশি আমুদে মেয়ে তার ওপর বিজয়ের সঙ্গে পিঠোপিঠি বলে, দাদা বলে সমীহ সম্মান সে বিশেষ করে না। সে তৎক্ষণাৎ ফোড়ন দিয়ে বললে, 'কেন মুখ ব্যথা করছ মা, দাদা এখন শহুরে হয়ে গেছে, এই গাঁয়ে এখন আর ভালো লাগে! এখানে কোথায় স্ট্রান্ড, কোথায় চৌরঙ্গি—একটা লেকও ছাই নেই!'

'বড্ড ফাজলামি হচ্ছে মাধবী!'—ছোট বোনকে শাসিয়ে মা'র কাছে বিজয় নালিশ জানালে,—'জানো মা বিয়ে হওয়ার পর থেকে মাধবীর আস্পদ্ধা বড় বেড়েছে। ও আমায় দাদা বলে মানতেই চায় না।'

মাধবী অম্লান বদনে বললে, 'তুমিও তা হলে বিয়েটা তাড়াতাড়ি করে ফেলো না তা হলেই আবার মানব।'

বিজয় তাচ্ছিল্যের ভান করে বললে, 'তোর মানবার জন্যে তো আর আমার ঘুম হচ্ছে না যে বিয়ে করতে যাব।'

ভাই-বোনের তর্ক থামিয়ে মা হেসে বললেন, 'আচ্ছা তোকে বিয়ে এখন করতে হবে না। কিন্তু কালই তোর না গেলে নয়, এখনও ছুটি তো তোর আছে।'

বিজয় যেন নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে বললে, 'তা তো আছে।'

মা আগ্রহ সহকারে বললেন, 'তবে কেন এত তাড়াতাড়ি যাওয়ার জন্য জেদ করছিস বাবা, এই তো এতদিন বাদে এলি, থাক না আর দু'দিন।'

নিতান্ত যেন দায়ে পড়ে বিজয় বললে, 'আচ্ছা বলছ যখন তখন—'

কিন্তু মাধবীকে অত সহজে ফাঁকি দেওয়া যায় না, সে সবিস্ময়ে বললে, 'তুমি যে অবাক করলে দাদা, হঠাৎ এমন সুমতি তো ভালো লক্ষণ নয়! এই না গাঁয়ে একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলে।'

বিজয় গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করে বললে, 'মা যখন অত করে বলছেন।'

'তা হলে মা আর যেটা বলছেন, সেটাও সুবোধ ছেলের মতো করে ফেলো না। বিয়েটা যদি—'

মাধবীর কথার মাঝেই বিজয় ফোঁস করে উঠল, 'দেখো মা মাধবীকে মানা করে দাও। ফের যদি বিয়ে-বিয়ে করে জ্বালাতন করে, তা হলে কিন্তু আমি থাকতে পারব না।'

'না—না জ্বালাতন করবে না। তোর ইচ্ছে না থাকলে আমরা আর জোর করে কী করব!' বলে কোনওরকমে বিজয়ের কলকাতা যাওয়াটা বন্ধ করার খুশিতেই মা ঘর থেকে চলে গেলেন।

'বেশ, দেখব তোমার এ ভীষ্মের পণ কতদিন থাকে!' বলে মাধবীও ঘর থেকে চলে যাচ্ছিল। বিজয় একটু ইতস্তত করে তাকে ডেকে বললে, 'শোন মাধবী।'

মাধবী ফিরে এসে দাঁড়াল, কিন্তু বিজয় পড়ল দারুণ বিপদে। আসল কথাটা কীভাবে এখন পাড়া যায়। মাধবী অবস্থাটা বোধহয় একটু অনুমান করে বললে, 'কী বলছ?'

বিজয় আমতা-আমতা করে বললে, 'হ্যাঁ, কী যেন বলছিলাম, ওঃ—মনে পড়েছে। হ্যাঁরে—সেই ছেলেবেলায় আমাদের বাড়ি আসত তোর খেলার সাথী, কী যেন মেয়েটার নাম, মনে পড়ছে না।'

'খেলার সাথী তখন তো কত আসত, বেলা, সুরমা, ললিতা—'

বিজয় অধৈর্য হয়ে বললে, 'না—না অন্য কী একটা নাম, আর তার সঙ্গে তোর খুব ভাব ছিল।'

মাধবীর চোখে-মুখে এবার কৌতুকের হাসি ফুটে উঠল—'ব্যাপারটা কী বলো দেখি দাদা, তাদের কাউকেই মনে মনে ঠিক করেছ নাকি? তা এ-কথাটা আগে বলতে হয়। মাকে বলি এখনই।'

বিজয় চটে উঠল, 'ওই জন্যেই তো কোনও কথা বলতে ইচ্ছে করে না। তুই এমন ফাজিল হয়েছিস।'

'আচ্ছা—আচ্ছা আর ফাজলামি করব না। কিন্তু আমাদের সঙ্গে খুব ভাব ছিল তো নির্মলার। আমাদেব পুরুতমশায়ের মেয়ে।'

বিজয় যতদূর সম্ভব নির্বিকার থাকার ভান করে বললে, 'হ্যাঁ—হ্যাঁ নির্মলা।'

'ও, নির্মলা নামটাই ভুলে গেছলে' মাধবীর চোখে দুষ্টুমির হাসি। 'আমার চেয়ে তোমার সঙ্গে বুঝি ভাব কম ছিল? ছেলেবেলা তাদের বাড়িতেই তো কাটাতে।'

'আহা তাই তো বলছি। তার সঙ্গে তোর দেখা-টেখা হয় না?'

'আমি শ্বশুরবাড়ি চলে যাওয়া অবধি, আর তেমন হয় কই।'

'দেখা তুই না করলে হবে কোত্থেকে, নইলে এই পাশের গাঁয়ে'—বলেই বিজয় বুঝল মস্ত একটা ভুল হয়ে গেছে।

মাধবী আঙুল নেড়ে শাসিয়ে বললে, 'দাদা এবার তো ধরা পড়েছ!'

'ধরা—ধরা—বাঃ ধরা কীসের!' বিজয় যেন বিশেষ বিরক্ত!

কিন্তু মাধবীকে অত সহজে ঠকানো যায় না, বললে, 'নির্মলারা পাশের গাঁয়ে উঠে গেছে কেমন করে জানলে তুমি? তা হলে নিশ্চয় খোঁজ নিয়েছ।'

বিজয় অপ্রস্তুত হয়ে বললে, 'না, না, এই মানে সেদিন হঠাৎ দেখা হয়ে গেল কিনা।'

'আর শুনছি না কোনও কথা। আমি ঠিক বুঝেছি তখনই, ভেতরে একটা কিছু আছে; নইলে হঠাৎ গাঁয়ের ওপর তোমার এত টান পড়ে।...আমি এখন বলছি মাকে। বড্ড আমায় বিয়ের কথায় ধমক দেওয়া হয়।'

বিজয় এবার কাতর হয়ে বললে, 'এই মাধবী—দোহাই তোর! সত্যি বলছি তোকে এবার কলকাতা থেকে...একটা—তুই যা চাস এনে দেব।'

মাধবী কিন্তু নির্মম। 'এর ওপর আমায় ঘুস দিতে চাচ্ছ যখন তখন ব্যাপারটা বেশ গুরুতর—আমি এই চললাম।'

মাধবী ঘরের বাইরে যেতে-না-যেতেই সিঁড়িতে বিজয়ের বাবা জমিদার বীরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। বীরেন্দ্রনারায়ণ অত্যন্ত রাশভারী গম্ভীর চেহারার লোক। স্নেহের ফল্গুধারা যদি তাঁর অন্তরে কোথাও থাকে তা হলেও বাইরে কোনও আভাস তার নেই। গ্রামের লোক থেকে বাড়ির সবাই তাঁকে যতটা শ্রদ্ধা করে—ভয় করে তার চেয়েও অনেক বেশি। তাঁর মুখের সামনে মুখ তুলে কথা বলবার সাহস তাঁর ছেলেমেয়েরও নেই। বীরেন্দ্রনারায়ণ ঘরে ঢুকে এদিক-ওদিক চেয়ে বলেন, 'বিজয়! কই তোমার জিনিসপত্র গোছানো হয়নি এখনও?'

বিজয় মাথা নিচু করে সঙ্কুচিতভাবে বললে, 'না, এখনও গোছানো হয়নি।'

একটু যেন বিরক্তির সঙ্গে বীরেন্দ্রনারায়ণ প্রশ্ন করলেন, 'কেন?'

বিজয় কোনওরকমে সাহস সঞ্চয় করে জানালে, 'ভাবছিলাম এখনও ছুটি আছে। আরও দু-চার দিন যদি এখানে থাকি।'

বীরেন্দ্রনারায়ণকে কিন্তু অসন্তুষ্ট হতে দেখা গেল না, বললেন, 'বেশ ভালো কথা, তোমার পড়াশুনার ক্ষতি না হলেই হল।'

বিজয় এবার সাহস করে বললে, 'এখানে নির্জনতায় পড়াশুনার সুঁবিধেই হচ্ছে।'

'খুব ভালো কথা।' বলে বীরেন্দ্রনারায়ণ চলে গেলেন।

মাধবী একেবারে চলে যায়নি। বাইরে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে দাদার করুণ অবস্থাটা উপভোগ করছিল। বাবা যেতেই সে ঘরে ঢুকে দাদার গলা নকল করে ব্যঙ্গের স্বরে বললে, 'এখানে নির্জনতায় পড়াশুনোর সুবিধে হচ্ছে এবং তার চেয়ে সুবিধে হচ্ছে নির্মলার সঙ্গে দেখার।'

বিজয় ফিরে তাকিয়ে শাসন করবার আগেই দেখা গেল মাধবী এ তল্লাট ছেড়ে গেছে।

মাধবী কিছু মিথ্যে বলেনি। পরের দিন সকালবেলা বিজয়কে নির্মলাদের বাড়ির কাছেই ঘোরাফেরা করতে দেখা গেল। নেহাত আকস্মিকভাবেই বোধহয় নির্মলার সঙ্গে তার দেখাও হয়ে গেল। নির্মলা তখন পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে একটি বেলগাছ থেকে পুজোর জন্যে বিল্বপত্র সংগ্রহে ব্যস্ত, বিজয়কে সে দেখতে পায়নি। বিজয় নিঃশব্দে তার পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললে, 'আমি তুলে দেব?'

নির্মলা চমকে ফিরে তাকিয়ে একেবারে অবাক! 'তুমি!'

'দেখে আশ্চর্য হলে নাকি?' বিজয় হাসল।

নির্মলা এতক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে, গম্ভীর হয়ে বললে, 'তা একটু হলাম।'

'কেন বলো তো? আমার এখানে বেড়াতে আসা এমন একটা নতুন কিছু?—'

নির্মলা বিজয়ের দিকে না চেয়েই গম্ভীরস্বরে বললে, 'এটা তো ঠিক বেড়াবার জায়গা নয়। গ্রামে এত ভালো জায়গা থাকতে এখানে কি কেউ বেড়াতে আসে?'

বিজয় গাছ থেকে নিজেই পাতা তুলতে শুরু করে অম্লান বদনে বললে, 'ভালো-

মন্দ যার-যার নিজের পছন্দ। আমার যদি এদিকটাই ভালো লাগে। অবশ্য তুমি যদি অসন্তুষ্ট হও তা হলে আর আমার এদিকে আসা হয় না।'

নির্মলা একবার বিজয়ের দিকে চেয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললে, 'আমার আবার সন্তোষ-অসন্তোষ কীসের? আমার তো আর কেনা জায়গা নয় যে তোমাকে বারণ করব। তোমার যেখানে খুশি বেড়াতে আসতে পারো।'

'কেনা জায়গা হলে বুঝি আমায় আসতে দিতে না!'—বলে বিজয় হাসল।

'তুমি বড় বাজে বকো।'—বলে নির্মলা সেখান থেকে সরে যেতে গিয়ে অবাক হয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলে, 'আরে ওকী, হচ্ছে কী?'

বিজয় একটু ক্ষুণ্ণ হয়েই বললে, 'বাঃ তোমার জন্যে বেলপাতা তুলছি।'

এবার নির্মলা হেসে ফেললে, বললে, 'খুব! এই বেলপাতায় পুজো হবে! তোমার না পায়ে জুতো!'

বিজয় এবার নিতান্ত অপ্রস্তুত। নির্মলাকে সাহায্য করার আগ্রহে জুতো পায়ে থাকার কথা তার খেয়াল-ই ছিল না। নিজের বোকামিতে তার হাসি আর থামতে চায় না। নির্মলাও হেসে লুটোপুটি।

হঠাৎ এই দৃশ্যের মাঝে ধূমকেতুর মতো আচার্যিমশাই-এর উদয়। আচার্যিমশাই এই দিকেই যাচ্ছিলেন বিশেষ জরুরি কোনও কাজে, কিন্তু এরকম একটা মুখরোচক ব্যাপার একেবারে অবহেলা কী করে করেন।

'এই যে বাবা বিজয়! কল্যাণ হোক, কল্যাণ হোক, সব ভালো? এদিকে বেড়াতে এসেছিলে বুঝি। ভালো-ভালো, সকালে বায়ু সেবন স্বাস্থ্যের পক্ষে অতি হিতকর আর গ্রামের এ-দিকটাই, কী বলে, বেশ ফাঁকা। আর দৃশ্যও অতি মনোহর। আমাদের মা নির্মলার রোজ এদিকে পুষ্পচয়নে আসা চাই-ই।'

আচার্যিমশাই হয়তো আরও কিছু বলতেন; কিন্তু ইতিমধ্যে আর একজন যে তাদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে তা তিনি খেয়ালই করেননি। হঠাৎ পেছন থেকে কে বলে উঠল, 'আপনিও কি এদিকে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছেন আচার্যিমশাই?'

চমকে পেছনে ফিরে তাকিয়ে আচার্যিমশাই দেখলেন, পরিতোষ তাঁর দিকে চেয়ে মৃদু-মৃদু হাসছে। আচার্যিমশাই-এর প্রশান্ত মূর্তি গেল লুপ্ত হয়ে, খেঁকিয়ে উঠে বললেন, 'প্রাতঃভ্রমণ! আমি বেরুব প্রাতঃভ্রমণে। কেন আমার কি খেয়েদেয়ে কাজ নেই। কাল রাত থেকে গরুটা ঘরে ফেরেনি, ভোর ইস্তক খুঁজে-খুঁজে হায়রান হয়ে গেলাম। আমি প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছি!'

পরিতোষ কোনও রকমে হাসি চেপে বললে, 'আহা চটেন কেন? প্রাতঃভ্রমণে বেরুনোটা আপনার পক্ষে এত লজ্জার কথা তা কী করে জানব বলুন? কিন্তু আপনার গরু তো শুনলাম ওরা খোঁয়াড়ে দিয়েছে।'

'খোঁয়াড়ে দিয়েছে।' আচার্যিমশাই একেবারে আগুন হয়ে উঠলেন, 'আমার গরু খোঁয়াড়ে দিয়েছে! কোন হতভাগার এত বড় বুকের পাটা।'

'ওই যে হতভাগার সবজির বাগানের বেড়া ভেঙে কাল আপনার গরু ঢুকেছিল'—পরিতোষ একেবারে শান্ত নির্লিপ্ত।

'আমার গরু বেড়া ভেঙে বাগানে ঢুকেছিল।' আচার্যিমশাই রাগে একেবারে ফেটেই পড়েন বুঝি।

পরিতোষ তবু তেমনি শান্তস্বরে মৃদু হেসে বললে, 'আমরাও তো তাই অবাক হচ্ছি আচার্যিমশাই। এতবড় একটা মহাপ্রাণ পণ্ডিতের গরু হয়ে কিনা এমন দুর্মতি! পরের সবজির বাগানের দিকে কুদৃষ্টি। আপনার দৃষ্টান্তে ও বেটার কিছু ফল হল না। গো-মূর্খ তা হলে আর বলেছে কেন?'

আচার্যিমশাই আর দাঁড়াতে পারলেন না। দূর থেকে তাঁর শেষ কথা শোনা গেল, 'আচ্ছা আমি দেখে নেব। আমার গরু খোঁয়াড়ে দেয় কোন বেটা—নির্বংশ করে ছাড়ব!'

আচার্যিমশাই-এর আস্ফালনে বিজয় বুঝি একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেছল, নির্মলা যে ইতিমধ্যেই ফুলের সাজি নিয়ে চলে গেছে তা সে লক্ষই করেনি। নির্মলা তখনও বেশি দূর যায়নি। চেষ্টা করলে হয়তো আবার গিয়ে কথা বলা যায়। কিন্তু বিজয়ের কেমন সঙ্কোচ হল, বিশেষ পরিতোষের সামনে ধরা পড়াটা সে চায় না।

কিন্তু নির্মলার সঙ্গে দেখা করবার একটু সুযোগের ব্যবস্থা তার যে না করলেই নয়। রোজ অকারণে এদিকে প্রাতঃভ্রমণে আসা যায় না, ছেলেবেলার মতো যখন-তখন নির্মলাদের বাড়ি গিয়ে হাজির হতেও বাধে। সুতরাং এদিকে আসা ও নির্মলাদের বাড়িতে যাওয়ার একটা চলনসই ছুতো তার চাই।

ছুতো তার হঠাৎ মিলেও গেল। পরিতোষের সঙ্গে কথা কইতে-কইতে তখন দুজনে কাছের একটি অত্যন্ত নোংরা পানায়-দামে মজা পুকুরের ধারে এসে পড়েছে। হঠাৎ পরিতোষকে থামিয়ে সে সাগ্রহে বললে, 'আচ্ছা আমার একটা কথা রাখবে?'

হঠাৎ এরকম উত্তেজনা ও আগ্রহের স্বর শুনে একটু অবাক হয়ে পরিতোষ বললে, 'কী কথা শুনি আগে।'

'এই পুকুরটা পরিষ্কার করা যায় না! দামে-পানায় মজে অবস্থা হয়েছে দেখছ—এই যে গ্রামে এত ম্যালেরিয়া তার মূল কোথায়? এই সব পুকুরেই তো'—বিজয় রীতিমতো বক্তৃতা শুরু করে দিলে।

পরিতোষ এবার হেসে বললে, 'তা তো সব বুঝলাম। কিন্তু এরকম হাজা-মজা পুকুর তো একটা নয়। এই পুকুরটার ওপরে হঠাৎ বিশেষ করে ঝোঁক কেন?'

এবার বিজয় একটু বিব্রত হয়ে পড়ল। 'মানে ঠিক এটা নয়, তবে কী জানো, একটা থেকে শুরু করতে হবে তো। তা ছাড়া—তা ছাড়া আমি কী ঠিক করেছি জানো? আমি গ্রামে একটা সাঁতারের ক্লাব করে দিতে চাই। তোমরা যদি এ পুকুরটা পরিষ্কার করে ফেল আমি নিজেই সাহায্য করব।'

পরিতোষ তার পিঠ চাপড়ে বললে, 'ভালো কথা, কিন্তু সাহায্য মানে শুধু টাকার সাহায্য নয়—আম্মাদের সঙ্গে জলে নামতে হবে, পারবে?'

বিজয় সোৎসাহে জানালে, 'বাঃ পারব না, আমি তো জলে নামতেই চাই।'

বিজয়ের পুকুর পরিষ্কারের উদ্দেশ্য যাই থাক সঙ্কল্পটা আন্তরিক।

পরের দিন সকালবেলাই পরিতোষের দলবলের সঙ্গে তাকে সত্যিই সেই পুকুরের ধারে হাজির হতে দেখা গেল। কিন্তু তখন সেখানে সেই পুকুর নিয়ে দুই শরিকের মধ্যে রীতিমতো একটা খণ্ড-যুদ্ধ বেধেছে। দুই শরিকের সম্বন্ধটা অতি নিকট। খুড়ো আর ভাইপো। কিন্তু তাদের ঝগড়ার ধরন দেখে কে তা অনুমান করবে।

খুড়ো বুঝি আগে এসে পুকুরে জেলে দিয়ে জাল ফেলেছিলেন। শোনা গেল তিনি

বংশীকে নির্দেশ দিচ্ছেন, 'আর একটু ডানদিক ঘেঁষে জাল ফেল বংশী। নইলে কি মাছ সেধে ডাঙায় উঠে আসবে।'

কিন্তু বংশী জাল বাগিয়ে ধরবার আগেই দেখা গেল পুকুরের আরেক পাড়ে বংশদণ্ড হাতে ভাইপো গণেশলাল মারমুখো হয়ে দাঁড়িয়ে। বংশদণ্ড আস্ফালন করে সেখান থেকেই সে শাসাচ্ছে, 'খরবদার বলছি বংশী। জাল এদিকে ফেলেছিস কি তোর জালের আমি দফা-রফা করেছি।'

বেচারা বংশী সভয়ে জাল হাতে নিয়ে খুড়োর মুখের দিকে চাইল। তিনি ভাইপোকে উদ্দেশ করে বললেন, 'আমি ফেলছি জাল আর তার দফা-রফা করবি তুই।' তারপর বংশীকে হুকুম দিলেন, 'ফেল তুই বংশী, ফেল ডানদিক ঘেঁষে; দেখি হারু চক্কোত্তি থাকতে কে তোর জালের দফা-রফা করে। জ্যান্ত এই পুকুরে পুঁতে ফেলব না!'

বংশী দুজনের আস্ফালনের মাঝে পড়ে সভয়ে জানালে, 'আজ্ঞে আমি গরিব মানুষ।'

গণেশলাল বাঁশ হাতে করে তখন একেবারে এ-পাড়েই এসে হাজির হয়েছে। খুড়োকে শাসিয়ে বললে, 'এখনও ভালো কথায় বলছি কাকা, বুঝে-সুঝে জাল ফেল, নইলে খুড়ো বলে আর মানব না বলে রাখলাম।'

খুড়োও খেপে উঠলেন, 'মুখ সামলে কথা বলবি গণশা! বুঝে-সুঝে জাল ফেলব মানে?'

'আলবাত বুঝে-সুঝে ফেলবে। জানো এই পুকুরের আমি দস্তুর মতো সাড়ে তিন আনার শরিক।' গণেশলাল পিছু হঠবার পাত্র নয়।

'কাকে সাড়ে তিন আনার শরিক দেখাচ্ছিস! জানিস দস্তুর মতো পৌণে পাঁচ আনা আমার!'

গণেশলাল তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, 'জানি, জানি! তা পৌণে পাঁচ আনা হিসেব করে জাল ফেল না। কেউ তো কিছু বলছে না।'

'হিসেব করে ফেলব মানে?'

আলবাত হিসেব করবে। তোমার পৌণে পাঁচ আনার মাপ হল বারো হাত এক বিঘৎ তিন আঙুল। তার এক চুল এগিয়েছে কি আমি দেখছি।'

এবার হারু চক্কোত্তি আগুন হয়ে উঠলেন, 'জল মেপে আমায় জাল ফেলতে হবে। এ তোর বাবাকেলে একলার পুকুর পেয়েছিস।'

যেমন খুড়ো তেমনি ভাইপো; গণেশলাল তৎক্ষণাৎ জবাব দিলে, 'বাপ তুলো না বলছি কাকা, তোমার বাপের নাম তাহলে ভুলিয়ে দেব বলে রাখছি।'

পরিতোষ, বিজয় প্রভৃতি এতক্ষণ কাছে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল। এবার পরিতোষ বাধা না দিয়ে পারলে না, হেসে জিজ্ঞেস করলে, 'ব্যাপার কী হারু-খুড়ো! সকালবেলায় খুড়ো-ভাইপোতে এত প্রেম কীসের?'

হারু চক্কোত্তি একজনকে মধ্যস্থ পেয়ে যেন বেঁচে গেলেন। বললেন, 'শোনো, শোনো তোমরা। ওই হতভাগা ষাঁড়ের গোবর আমায় বাপ তোলে, আমি ওর আপন খুড়ো।'

পরিতোষ হেসে বললে, 'আহা আপনার বাপ তো ওরই ঠাকুরদা, নিজের ঠাকুরদাকে একটু তুলে ধরেছে এ আর এমন কী অন্যায় করেছে। কিন্তু ব্যাপারটা কী নিয়ে একটু শুনতে পাই কি।'

হারু চক্কোত্তি বুঝিয়ে দিলেন, 'এমন কথা কেউ কখনও শুনেছ। আমায় বলে কিনা জল মেপে জাল ফেলতে হবে।'

গণেশ এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এইবার গর্জে উঠল, 'মাপতে হবে না তো কী! পুকুর তো তোমার একলার নয়!'

আবার খুড়ো-ভাইপোয় বুঝি লাঠালাঠি বাধে। পরিতোষ দুজনকে সরিয়ে দিয়ে বললে, 'আহা থামুন-থামুন, একটা কথা শুনবেন আমার। পুকুরের মাপ নিয়ে মারামারি করবার আগে পুকুরটা সাফ করবার একটা ব্যবস্থা করলে হয় না। কী অবস্থা হয়েছে পুকুরটার দেখেছেন?'

হারু চক্কোত্তি বিরক্তির স্বরে বললেন, 'দেখেছি। কিন্তু আমি করব কী? আমি পুকুর সাফ করি আর ওরা মজা মারুক কেমন? সেটি হচ্ছে না বাবা।'

পরিতোষ এবার হেসে ফেললে, 'তা তো বটেই, নিজের ক্ষতি হয় হোক, কারুর উপকার কিছুতে না হয়। কিন্তু পুকুর আপনাদের সাফ করতে হবে না, আমরাই সেটা করে দিচ্ছি, তারপর আপনারা মাপ-জোক ভাগ-বাটোয়ারা করবেন।'

হঠাৎ এই প্রস্তাবে প্রথমে দুজনেই হতভম্ব হয়ে খানিকক্ষণ একেবারে চুপ। তারপর খুড়ো-ভাইপোতে আর বিশেষ মতভেদ নেই দেখা গেল।

খুড়ো খেঁকিয়ে উঠলেন, 'তার মানে? তোমরা পুকুর সাফ করবে কীরকম?'

ভাইপো তাতে যোগ দিয়ে বললে, 'আমাদের পুকুর তোমরা সাফ করবে মানে?'

পরিতোষ যথাসম্ভব শান্ত স্বরে বোঝাতে চেষ্টা করলে, 'পুকুরটা আপনাদের, কিন্তু গাঁয়ের স্বাস্থ্যের দায় আমাদের সকলের। আপনারা যখন হাত দেবেন না তখন আমাদেরই সাফ করতে হবে।'

খুড়ো-ভাইপো সব বিরোধ ভুলে এবার একেবারে এক দলের দলী হয়ে পড়লেন। গণেশ হেঁকে উঠল. 'কিছুতেই না, কখনও না, আমাদেব পুকুর হেজে যাক মজে যাক, তোমাদের কীহে বাপু। কী বলো কাকা?'

হারু চক্কোত্তি তৎক্ষণাৎ সায় দিয়ে জানালেন. 'নিশ্চয়ই! ভারি সব গ্রামের হিতৈষী এসেছেন, পুকুর সাফ করে গাঁয়ের স্বাস্থ্য ভালো করবেন। আমাদের পুকুর আমরা যেমন খুশি নোংরা করে রাখব। কী বলিস গণশা?'

'আলবাত! আমাদের পুকুর আমবা পচিয়ে দেব।' গণেশ এখন খুড়োর সঙ্গে একেবারে একাত্মা!

যথাসময়ে যথাস্থানে হাজির হওয়া আচার্যিমশাই-এর একটা বিশেষত্ব। তিনি কখন এসে দাঁড়িয়েছেন কেউ দেখেনি। এবার গোলোযোগটা বেশ পাকিয়ে উঠেছে দেখে প্রসন্ন হাসি হেসে এগিয়ে এসে বললে, 'এই তো আমি উপস্থিত। বিষয়টা আমি অবিলম্বে মীমাংসা করে দিচ্ছি।'

কিন্তু পরিতোষের আর তখন ধৈর্য নেই। সে ধমক দিয়ে বললে, 'থাক বিষয়টা কাউকে মীমাংসা করতে হবে না। আমরা পুকুর পরিষ্কার করবই। আপনারা যা পারেন করুন গে যান!'

সেই সঙ্গে ছেলেদের সে হুকুম দিলে, 'তোমরা লেগে যাও!' ছেলেদের আর দুবার বলতে হয়! তারা তখন জলে নেমে গেছে। এই ছেলের দলের বিরুদ্ধে আপাতত কিছু করতে খুড়ো-ভাইপো কারুরই সাহসে কুলোল না। কিন্তু তবু পরিতোষকে একবার শাসিয়ে তারা বললে, 'কাজটা কিন্তু ভালো হচ্ছে না বলে দিচ্ছি।'

পরিতোষ তার জবাব পর্যন্ত না দিয়ে সরে গেল, আচার্যিমশাই একবার শেষ চেষ্টা করে বিজয়ের কাছে নালিশ জানালেন, 'এই যে বাবা বিজয়! তুমি এখানে উপস্থিত থাকতে

এমন একটা অন্যায় অত্যাচার!'

কিন্তু বিজয়ের কাছেও সুবিধে হল না। 'অন্যায় অত্যাচার তো কিছু হচ্ছে না আচার্যিমশাই। বরং নিখরচায় আপনাদের পুকুর পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে, তাতে আপনাদের আপত্তিটা কীসের?' বলে সেও পুকুরে নেমে গেল।

পাড়ে দাঁড়িয়ে রাগে ফুলতে-ফুলতে গণেশ বললে, 'এর একটা হেস্তনেস্ত না করলে নয় আচার্যিমশাই।'

হারু চক্কোত্তি হাত পা নেড়ে বললেন, 'আমি থানা-পুলিশ না করে ছাড়ব না।'

কিন্তু আচার্যিমশাই অত সহজে বিচলিত হন না। তাঁর বুদ্ধি আরও গভীর রাস্তায় চলে। তিনি একটু বাঁকা হাসি হেসে বললেন, 'অত ব্যস্ত নয়, ব্যস্ত নয়, সময়ে সব হবে শুধু কিঞ্চিৎ ধৈর্য প্রয়োজন। ভেতরে গভীর রহস্য আছে একটা। সেই মূল ধরে নাড়া দিতে হবে।'

আচার্যিমশাই-এর মনটা কুটিল কিন্তু এ-ক্ষেত্রে তাঁর অনুমানটা একেবারে ভুল নয়। বিজয়ের পুকুর পরিষ্কারের আগ্রহটা নেহাত সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ যে নয় খানিক বাদেই সেটা যেন টের পাওয়া গেল। বিজয় আর সকলের সঙ্গেই জলে নেমেছিল পুকুর সাফের কাজে। হঠাৎ হাতের একটা আঙুল অন্য হাতে চেপে ধরে দেখা গেল সে পাড়ে উঠে পড়েছে।

একটি ছেলে জিজ্ঞাসা করলে, 'কী হল কী বিজয়দা?'

'আঙুলটা কেটে গেল ভাই। আসছি এখুনি বেঁধে'—বলে বিজয় আর কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই সেখান থেকে উধাও।

খানিক বাদেই তাকে দেখা গেল একেবারে নির্মলাদের বাড়ির উঠানে।

'নির্মলা! নির্মলা! শিগগির!'

নির্মলা হঠাৎ বিজয়ের এরকম ডাক শুনে উদ্বিগ্ন হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। 'কী হয়েছে কী?'

'শিগগির একটা কিছু নিয়ে এস, ভয়ানক কেটে গেছে।' বিজয় তখনও আঙুলটা চেপে ধরে আছে।

নির্মলা অস্থির হয়ে উঠল, 'কেটে গেছে।' তাড়াতাড়ি কাছে এসে আঙুলটা ধরে সে বললে, 'কই কোথায় কেটেছে দেখি?'

আঙুলটা দেখার পর মুখের ভাব কিন্তু তার বদলে গেল, 'হুঁ খুব কেটেছে তো!'

বিজয় রীতিমতো গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করে বললে, 'এখন রক্তটা বন্ধ হয়েছে তাই বুঝতে পারছ না!'

নির্মলার মুখও রীতিমতো গম্ভীর, 'খুব বুঝতে পারছি কিন্তু এখানে তো তেমন কোনও ওষুধ নেই।'

বিজয় তাড়াতাড়ি বললে, 'না-না, ওষুধের দরকার হবে না, তুমি একটু বেঁধে দাও না তাহলেই ঠিক হয়ে যাবে।'

'বেশ তাই দিচ্ছি।'—নির্মলা ঘরে গিয়ে একটা কাপড়ের ফালি এনে যেমন-তেমন করে একটু জড়িয়ে দিয়ে বললে, 'নাও বাঁধা হয়েছে!'

বিজয় হতাশ-স্বরে বললে, 'এর মধ্যে বাঁধা হয়ে গেল। ভালো করে বেঁধেছ তো?'

এবার নির্মলার মুখের না হোক চোখের হাসি চাপা রইল না, বললে, 'মিছিমিছি আর ওর চেয়ে ভালো করে বাঁধা যায় না।'

'মিছিমিছি!' বিজয় একেবারে যেন আকাশ থেকে পড়ল! 'তুমি বলো কী নির্মলা, তোমার একটু মায়া দয়া নেই! এই একটা আঁচড় থেকে কত কী হতে পারে জানো? দস্তুর মতো সেপটিক হয়ে উঠতে পারে।'

'কী করে আর জানব বল।' নির্মলা একটু হেসে বললে, 'আমি তো আর ডাক্তারি পড়ি না। কিন্তু পুকুর সাফ করতে হাত কাটে কী করে? জলে খুব ধার বুঝি!'

'তা হলে তুমি আমার আঙুল কাটা বিশ্বাস করো না!' বিজয় এখনও গম্ভীর।

নির্মলাও হাসি চেপে বললে, 'বিশ্বাস করছি না আবার, খুব বিশ্বাস করছি, আমি শুধু ভাবছি—'

'ভাবছ আবার কী?'

'না এই ভাবছি, এরপর নতুন কী ছুতো খুঁজে বার করবে, পিপাসা হয়েছে, পান খাওয়া হয়েছে, আঙুলও কেটেছে, তারপর?'—বলে নির্মলা আর হাসি চাপতে পারলে না।

বিজয়ও প্রথমটা হেসে ফেলেছিল, তারপর যেন অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়ে রাগের সঙ্গে বললে, 'তুমি তাহলে মনে করো আমি ছুতো করে তোমায় দেখতে আসি? তুমি মনে করো পুকুর পরিষ্কার করতে আসা, আমার একটা ছল—তোমার ধারণা তোমায় না দেখে আমি থাকতে পারি না?'

বিজয়ের গম্ভীর স্বরে সত্যি একটু অবাক হয়ে নির্মলা তার দিকে তাকাতেই বিজয় কাছে এসে হঠাৎ সুর পালটে মৃদু হেসে বললে, 'সত্যি তাই নির্মলা, সত্যি আমি নিজেই বুঝতে পারছি না কী করে এমন হল!'

নির্মলা এবার মুখ ফিরিয়ে নিলে। বিজয় পাশে গিয়ে বসে বললে, 'তুমি রাগ করলে নির্মলা?'

'না রাগ করব কেন, কিন্তু এ ভালো হচ্ছে না। আমাদের মধ্যে অনেক তফাত, আমাদের দূরে থাকাই উচিত।' নির্মলার স্বর এবার সত্যি-সত্যি গম্ভীর, যেন প্রচ্ছন্ন বেদনায় ভারী।

'এ উচিত-অনুচিত কার দিক থেকে বিচার করছ নির্মলা?' বিজয়ের গলায় এবার সুস্পষ্ট ব্যাকুলতা।

'সকলের দিক থেকে, সব দিক থেকে আমাদের মধ্যে বাধা!'

বিজয় উত্তেজিত স্বরে বলে, 'সব দিকের কথা পরে ভাবব, তোমার নিজের দিকটা আগে শুনি। তোমার নিজের মনে যদি অবশ্য বাধা থাকে...'

'আমার কথা কি তুমি জানো না—কিন্তু আমার কথায় কী আসে যায়।' নির্মলা এবার চোখ তুলে তাকাল বিজয়ের দিকে, সে চোখে আসন্ন অশ্রুর গাঢ় ছায়া।

বিজয় তেমনি উত্তেজিত ভাবে বলে, 'তাইতেই যা কিছু আসে-যায় নির্মলা। আর কোনও দিক থেকে কোনও বাধা আমি মানি না, মানব না।'

একটু থেমে সে আবার বললে, 'আজই তোমার কাছে কোনও শেষ উত্তর আমি চাই না নির্মলা। কিন্তু জেনো সে উত্তর একদিন আমি নেবই।'

বিজয় নির্মলার মুখের দিকে না তাকিয়েই বেরিয়ে যায়।

পুকুর পরিষ্কার তারপর নিয়মিতভাবে চলতে থাকে, সেই অজুহাতে বিজয়ের নির্মলার সঙ্গে দেখাশোনারও বিশেষ অসুবিধা হয় না। এবং একদিন নির্মলার হৃদয়ের উত্তর আর গোপন রাখা যায় না।

নির্মলা দুর্বলভাবে বিজয়কে এখনও বোঝাতে চেষ্টা করে, 'কিন্তু তুমি বুঝতে পারছ না চারিদিকে কত আমাদের বাধা। তুমি যা ভাবছ, তা হওয়ার নয়।'

মুখে বললেও বোঝা যায় নির্মলার মন তার নিজের অজ্ঞাতে কখন দুর্বল হয়ে এসেছে।

বিজয় জোর করে বলে, 'তুমি বাধাগুলো বড় বেশি করে দেখছ নির্মলা। আর বাধা যতই হোক হার মানব কেন? শুধু তুমি একবার সায় দাও।'

নির্মলা বিজয়ের দিকে একবার চোখ তুলে আবার নামিয়ে নেয়। বিজয় আবার বলে, 'তুমি পাশে থাকলে আমি সমস্ত সংসারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারি নির্মলা। কিন্তু তার দরকার হবে না। আমি বলছি সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি শুধু মত দাও, আমি মাকে জানাই।'

নির্মলা মাথা নিচু করেই বলে, 'বেশ। আমার আর কিছু বলার নেই।'

আচার্যিমশাই ও তাঁর দলবল পুকুর পরিষ্কারের কাজে তারপর আর কোনও বাধা দেননি। কিন্তু তাই বলে তাঁরা চুপ করে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই। বিজয় ও নির্মলার মেলা-মেশার ব্যাপারটা আচার্যিমশাই ভালো করেই লক্ষ করেছেন। এবং একদিন তাঁকে দলবল সমেত একেবারে জমিদারের কাছারিতে উপস্থিত দেখা যায়। জমিদারমশাই তখনও আসেননি। জমিদারের দক্ষিণহস্তস্বরূপ সরকারমশাই-এর কাছেই আচার্যিমশাই ভূমিকাটা সেরে রাখেন। শোনা যায় আচার্যিমশাই বলছেন, 'সব বিপর্যয়ের মূল ওই মেয়েটা। ওরই জন্যই এত গণ্ডগোল।'

সরকারমশাই লোকটি একটি দুর্বোধ্য। তাঁর কথাবার্তার অর্থ সব সময়ে ঠিক পরিষ্কার বোঝা যায় না। মনে হয় লোকটির বাইরের পরিচয়ের পেছনে আর একটা মানুষ লুকিয়ে আছে। স্বয়ং জমিদারমশাইও যেন তাঁকে একটু সমীহ করে চলেন।

সরকারমশাই বলেন, 'বটে, তাই নাকি? মেয়েটাই তাহলে আপনার মতে যত নষ্টের গোড়া!'

আচার্যিমশাই উৎসাহিত হয়ে বলেন, 'আমার মতে তো তাই! শুধু আমার মতেই বা কেন? এই তো এরা এখানে উপস্থিত, এদেরই জিজ্ঞাসা করে দেখুন না!'

হারু চক্কোত্তি ও গণেশলাল দুজনেই সেখানে উপস্থিত। দুজনেই সায় দিয়ে বলে, 'আজ্ঞে হাঁ! কী মোহজালই না বিস্তার করেছে।'

শশিভূষণ গম্ভীর স্বরে বলেন, 'অর্থাৎ সহজ ভাষায় ঢলাচ্ছে। কিন্তু আমাদের অমন দেবতুল্য ভালো মানুষ পুরুত ঠাকুরের মেয়ে কি না...'

আচার্যিমশাই শশিভূষণকে কথাটা আর শেষ করতে দেন না, বলে ওঠেন, '—শোন সরকার মশাইয়ের কথা, পুরুত ঠাকুর ভালো মানুষ বলে...'

গণেশলাল তাঁর ওপর ফোড়ন দিয়ে বলে, '—হ্যাঁ, গোবরে পদ্মফুল কি হয় না?'

সবাই এই অপূর্ব উপমায় স্তম্ভিত।

'আঃ তুমি থামো দেখি গণেশ! উপমা অমনি প্রয়োগ করলেই হল নাকি?' আচার্যিমশাই গণেশলালের নির্বুদ্ধিতায় না চটে পারেন না। গণেশলালের মূর্খতা মাঝে-মাঝে সত্যিই মারাত্মক।

শশিভূষণ একটু হেসে বলেন, 'কেন আচার্যিমশাই, উপমাটা মন্দ কী? পদ্মফুলের লোভেই না সব অলি এসে জুটেছে।'

গণেশলাল খুশি হয়ে মাথা নাড়ে। শশিভূষণ আবার বলেন, 'কিন্তু এই অলিগুলি

পদ্ম ছেড়ে হঠাৎ আপনাদের পুকুরের পানায় নজর দিচ্ছে কেন? সেখানে তো কোনও মধু নেই।'

হারু চক্কোত্তি এবার তেতে ওঠেন, 'সেখানে ওদের শ্রাদ্ধের পিণ্ডি আছে। সব গ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষা করছেন। আমাদের চার পুরুষের পুকুর ওঁরা জোর করে সাফ করবেন।'

আচার্যিমশাই বাঁকা হাসি হেসে বলেন, 'আহা চটো কেন খুড়ো, ব্যাপারটা অত সরল নয়, গভীর রহস্য আছে ভেতরে, বুঝলেন সরকার মশাই! ওদের পুকুর পরিষ্কারটা উপলক্ষ মাত্র।'

'লক্ষ বুঝি ওই পদ্মটি?' শশিভূষণ হেসে বললেন, 'কিন্তু নিশানাটা বড় দূর হয়ে গেল না আচার্যিমশাই? সারাদিন পুকুরের পাঁক ঘাঁটলে পদ্মের খবর নেওয়ার সময় কোথায়?'

আচার্যিমশাই সকলের দিকে একবার অর্থপূর্ণভাবে চেয়ে বললে, 'যার খবর সে ঠিক নিচ্ছে। কী বল হে?'

হারু খুড়ো সায় দেন, 'তা ছাড়া আর কী?'

'যাকে বলে বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা,' গণেশলাল আবার উপমা প্রয়োগ করে।

আচার্যিমশাই চটে উঠে বলেন, 'আঃ গণেশ!'

শশিভূষণ হেসে বলেন, 'আমাদের গণেশের উপমাগুলি একেবারে কালিদাসস্য। কিন্তু ঘোগটিকে চিনতে পারলুম না তো!'

'চিনবেন কেমন করে সরকারমশাই! সে কি সহজে চেনা যায়! আমরাই তো তাজ্জব!' আচার্যিমশাই এবার শশির কানে-কানে বলেন, 'স্বয়ং আমাদের জমিদার-পুত্র।'

শশিভূষণের মুখে কোনও বিকার দেখা যায় না। একটু হেসে তিনি বলেন, 'ওঃ তাই বুঝি জমিদারমশাই-এর কাছে সুসংবাদটা দিতে এসেছেন।'

আচার্যিমশাই যেন অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলেন, 'আমাদের একটা দায়িত্ব বোধ তো আছে। অমন একটা হীরক খণ্ডের মতো ছেলে একটা কুহকিনীর মায়ায় নষ্ট হয়ে যাবে...।'

'সে আপনারা প্রাণ থাকতে দেখতে পারবেন না, বুঝেছি। কিন্তু জমিদারকে না জানিয়ে তার হীরক খণ্ডের মতো ছেলেটিকে কুহকিনীর মায়া থেকে উদ্ধার করা যেত না কী?' শশিভূষণের গলার স্বরে বোঝবার উপায় নেই তিনি বিদ্রূপ করছেন না সহজ কথা বলছেন।

আচার্যিমশাই কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'কীরকম?'

শশিভূষণ ব্যাখ্যা করেন, 'কুহকিনীদের শুনি শিকার পেলেই হল। তা একটা শিকার জুটিয়ে দিলেই তো হয়। এই আমাদের গণেশের মতো নিরীহ নধর একটি। গণেশের বোধ হয় আপত্তি নেই।'

গণেশলাল হঠাৎ খুশিতে লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে—'আমায়? হেঁঃ আমায় সে আমলই দেয় না। সেদিন পুকুরের ধারে একটু ইশারায় ডেকেছি, যা ফোঁস করে উঠল। আমার সঙ্গে তার যেন সোনায় সোহাগা।'

উপমার অভিনবত্বে সবাই নির্বাক!—শুধু আচার্যিমশাই হতাশ ভাবে বলে ওঠেন, 'নাঃ বাতুল, বাতুল।'

শশিভূষণ হাসি চেপে বলেন, 'তাই তো বড় দুঃখের কথা! যাক তাহলে যা করবার হয় করুন। জমিদারমশাই তো এসে পড়েছেন।'

জমিদার বীরেন্দ্রনারায়ণ ঘরে ঢুকে অতিথিদের দিকে একটু বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিজের আসনে বসে বলেন, 'তারপর আপনারা কী মনে করে আচার্য্যিমশাই? আপনাদের

দর্শন তো বিশেষ সৌভাগ্য ছাড়া পাওয়া যায় না।'

আচার্যিমশাই বিনয়ে একেবারে গলে গিয়ে বলেন, 'আজ্ঞে একটু নিবেদন ছিল।'

জমিদারমশাই একটু তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই বলেন, 'বেশ, নিবেদন করে ফেলুন।'

আচার্যিমশাই যেন অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গে জানান, 'দেখুন গ্রামে তো আর বাস করা চলে না।'

'তা হলে বাস তুলে দিন।'—বীরেন্দ্রনারায়ণের কণ্ঠস্বরে কোনও সহানুভূতি দেখা যায় না।

আচার্যিমশাই একটু থমকে গেলেও হাল ছাড়েন না, 'কিন্তু আপনি থাকতে গ্রামের এই দুর্গতি!...'

বীরেন্দ্রনারায়ণের বিরক্ত দৃষ্টির সামনে আচার্যিমশাই-এর আর বাক-স্ফূর্তি হয় না। জমিদারমশাই শশিভূষণের দিকে ফিরে বিরক্তির সঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন, 'ব্যাপারটা কী?'

শশিভূষণ নিতান্ত যেন সরলভাবে বলেন, 'ব্যাপারটা গুরুতর! ওদের কোনও পচা পুকুর গাঁয়ের ছেলেরা মিলে পরিষ্কার করতে লেগেছে।'

বীরেন্দ্রনারায়ণের ঠোঁটের কোণে একটু হাসির আভাস দেখা যায়, সেটা চেপে তিনি বলেন, 'আপনাদের তাতে বড্ড অসুবিধে হয়েছে বুঝি?'

আচার্যিমশাই তাড়াতাড়ি সুর বদলে জবাব দেন, 'আজ্ঞে না। পুষ্করিণী উদ্ধার তো শুভ কাজ, ভালো কাজ, আমার তো তাতে, কী বলে উৎসাহই ছিল। কিন্তু পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারের নামে যদি এমন অনাচার শুরু হয়—'

বীরেন্দ্রনারায়ণ ধমকে ওঠেন, 'ভণিতা রেখে সোজা করে ব্যাপারটা বলুন দেখি, আর যদি না পারেন তো যান, আমায় মিছিমিছি বিরক্ত করবেন না।'

আচার্যিমশাই সকাতরে জানান, 'বিরক্ত কী করতাম, নেহাত আমাদের বিজয় এর ভেতর না থাকলে...'

'বিজয়! আমার ছেলে? কী করেছে সে?' জমিদারমশাই কঠিনভাবেই আচার্যিমশাই-এর দিকে তাকান।

সে দৃষ্টির সামনে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে আচার্যিমশাই যথাসম্ভব মধুর কণ্ঠে বলেন, 'না, না, না, সে কী করবে? নিষ্কলঙ্ক, দুগ্ধপোষ্য শিশু বললেই হয়, সে তো মহৎ উদ্দেশ্যেই পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করতে গেছল, সেখানে যে অমন ডাকিনী তার মস্তক চর্বণ করবার জন্যে বসে আছে তা আর জানবে কী করে।'

এবার বীরেন্দ্রনারায়ণের কণ্ঠস্বর গম্ভীর হয়ে ওঠে, 'আচার্যিমশাই আমার ধৈর্য বেশি নয়। যা বলবার তাড়াতাড়ি বলুন।'

আচার্যিমশাই সভয়ে কোনওরকমে জানান, 'বলব আর কী? বলবার আর কী আছে। নেহাত নিজের চক্ষে দেখা তাই।'

তারপর নিজে আর শেষ করতে না পেরে আর সকলকে সাহায্যে আহ্বান করেন, 'কই হে বল না, তোমরাও তো দেখেছ। পুরুত ঠাকুরের মেয়ে নির্মলা না, কী নাম ছুঁড়িটার, গাছতলায় বিজয়ের সঙ্গে কী ঢলাঢলি। অতবড় আইবুড়ো সোমত্থ মেয়ে। বিয়ে দিলে তিন ছেলের মা হত...'

জমিদারমশাই-এর মুখ অনেকক্ষণ থেকেই কঠিন হয়ে আসছিল, এবার তাঁর বজ্রগম্ভীর স্বর শোনা যায়, 'আচার্যিমশাই!'

আচার্যিমশাই সভয়ে নীরব হয়ে যান। বীরেন্দ্রনারায়ণ বলেন, 'আপনাদের বক্তব্য বোধহয় শেষ হয়েছে। এখন আপনারা যেতে পারেন।'

আচার্যিমশাই ও তাঁর দলবলকে তবু ইতস্তত করতে দেখে শশিভূষণ হেসে বলেন, 'মানটা বজায় থাকতে-থাকতেই যাওয়া ভালো নয় কী আচার্যিমশাই।'

'হ্যাঁ, এই যে'—আচার্যিমশাই নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই ক্ষুন্ন মনে দলবল সমেত বিদায় নেন। জমিদারমশাই তাঁদের শেষ কথা জানিয়ে দেন, 'আর একটা কথা ভবিষ্যতে মনে রাখবেন। আমার ছেলের চরিত্র নিয়ে আপনাদের মাথা না ঘামালেও চলবে।'

আচার্যিমশাই বা তাঁর দলবল আর উত্তর পর্যন্ত দিতে সাহস করে না।

তাদের দল চলে যাওয়ার পর খানিকক্ষণ ঘর একেবারে নিস্তব্ধ। বীরেন্দ্রনারায়ণের গম্ভীর চিন্তানিমগ্ন মুখের দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে শশিভূষণ নীরবে নিজের কাজ করে যান। হঠাৎ বীরেন্দ্রনারায়ণের ডাক শোনা যায়, 'শশি'—

শশিভূষণ মুখ ফেরায়। বীরেন্দ্রনারায়ণ তার দিকে না তাকিয়েই গম্ভীর স্বরে বলেন, 'পুরুতমশাইকে খবর দেবে! কাল-ই যেন এখানে আমার সঙ্গে দেখা করেন।'

কথাগুলো বলেই বীরেন্দ্রনারায়ণ ঘর থেকে চলে যান। শশি সেদিকে না চেয়ে একটু হাসে তারপর খানিক চুপ কবে থেকে তার হিসাবের খাতায় কী যেন কাটাকাটি করে। দেখা যায় হিসাবের অঙ্কের বদলে সেখানে লেখা আছে, 'মা আমায় ঘুরাবি কত চোখ বাঁধা বলদের মতো।'

পরের দিন সকাল বেলা। বিজয় তার পড়বার ঘরে টেবিলের ধারে বসে। কিন্তু সামনে বই খোলা থাকলেই কি পড়া হয়! দেখা যায়, বিজয় অন্যমনস্কভাবে কলম দিয়ে একটা কাগজে হিজি-বিজি কেটে চলেছে। হঠাৎ পেছনে মাধবীর গলাব স্বর শুনে সে চমকে ওঠে।

'দাদা কী পড়াশুনাই করছে রাতদিন, পড়ে-পড়ে দাদার মাথাই না খারাপ হয়ে যায়।'

মাধবী কখন চুপি-চুপি পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে বিজয় জানতেই পাবেনি। তার দিকে ফিরে যথাসম্ভব গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করে সে বলে, 'করছি তো পডাশুনা। তোকে এখানে ফাজলামি করতে কে ডেকেচে!'

'ও আমি এসে পড়ায় বাধা দিলাম বুঝি?' মাধবীর গলার স্বরও রীতিমতো গম্ভীর। হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠে সে ছোঁ মেরে দাদার হাতের কাগজটা কেড়ে নিয়ে বলে, 'বাঃ চমৎকার! তোমাদের পড়ায় এসব বুঝি আঁকতে হয়, আর আর...'

যেন অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে কাগজটা লক্ষ করে মাধবী বলে, 'আর এই নি—র—ম—লা এই নামটা বুঝি লিখে জপ করতে হয়।'

বিজয় এবার সত্যি খেপে উঠে কাগজটা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে তীব্র প্রতিবাদের স্বরে বলে, 'কখনও না! কখনও ও-নাম ওখানে লেখা নেই।'

'নেই বুঝি? তাহলে আমারই ভুল। কিন্তু কাগজে না লিখে মনে-মনে জপ করছিলে তো?'

'করছিলাম, বেশ করছিলাম, তুই এখান থেকে বেরো। রাতদিন এক বাজে কথা।' বিজয়কে রীতিমতো বিরক্তই মনে হয়।

'বেশ যাচ্ছি।' বলে মাধবী যেন অত্যন্ত ক্ষুন্ন হয়ে চলে যাওয়ার উপক্রম করে।

বিজয়কে সুতরাং নরম হতেই হয়। মাধবীই তার একমাত্র সহায়। তাকে চটানোটা নিরাপদ নয়। বিজয় গলা নামিয়ে বলে, 'চলে যাচ্ছিস নাকি?'

'বাঃ তাড়িয়ে দিলে চলে যাব না।'

'না, শোন না। এদিকে আয়'—বিজয়কে অনুরোধ করতে হয়।

কিন্তু মাধবী এখন সুবিধে পেয়েছে, 'দরকার কী বাবা। তোমার পড়ার ক্ষতি হবে।'

'না—না শোন না। বিজয়কে আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়েই মিনতি করতে হয়।

মাধবী কাছে এলে সে এবার আসল কথাটা কোনওরকমে বলে ফেলে, 'আচ্ছা মনে কর যদি—এই যদি ধর—ধর সত্যিই যদি নির্মলাকে আমি বিয়ে করতে চাই।'

মাধবীর মুখ-চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে খুশিতে, কিন্তু সুবিধে পেয়ে সে একটু জ্বালাতন না করে ছাড়ে! সে যেন নিতান্ত অবিশ্বাসের সঙ্গে বলে, 'যা, বাজে কথা।'

বিজয়কে এবার সাগ্রহে নিজের আন্তরিকতার প্রমাণ দিতে হয়, 'না—না বাজে কথা নয়, সত্যি বলছি বিয়ে আমি করতে পারি কিন্তু আর কাউকে নয়।'

এইবার মাধবী হেসে ফেলে বলে, 'ওই মা আসছে, মাকে বলব তাহলে?'

'এই না—না, এখন নয়।' বিজয় সন্ত্রস্ত, ভীত হয়ে ওঠে।

মাধবী আরও তাকে জ্বালাতন করবার জন্যে বলে, 'কেন এখনই তো ভালো, একেবারে তোমার সামনেই কথাটা পেড়ে ফেলি না?'

'না—না, দোহাই তোর, এখানে নয়।'—বিজয় সকাতর মিনতি জানায়, এবং হঠাৎ একটা বই টেনে নিয়ে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে পড়তে বসে যায়।

মা এসে ভর্ৎসনা করে বলেন, 'খাওয়া-দাওয়া কী সব ঘুচিয়ে দিলি বিজয়, কখন থেকে খাবার নিয়ে বসে আছি, খাবার হুঁশই নেই।'

মাধবী দাদার দিকে একবার হেসে তাকিয়ে বলে, 'হুঁশ কী করে থাকবে মা, দাদার এখন...' বিজয় সভয়ে তার দিকে তাকাতেই মাধবী হেসে কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলে, 'যা এক ভাবনা ঢুকেছে মাথায়!'

মাধবী শেষপর্যন্ত বোধহয় অপ্রস্তুত করে ছাড়বে-ই। বিজয় হতাশ হয়ে উঠে পড়ে বিরক্তির ভান করে বলে, 'নাও তোমরাই এ ঘরে বসে-বসে গজর-গজর কর। আমার আর পড়েশুনে কাজ নেই।'

সে রীতিমতো রেগেই ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

'শোন-শোন বিজয় যাসনি,' মা উদ্বিগ্নস্বরে ডাকেন। তারপর বলেন, 'সত্যি আমাদের তো অন্যায় বাপু, পড়াশুনার সময় এসে বিরক্ত করলে তো রেগে যাবেই।'

মাধবী এবার হেসে ফেলে, 'পড়াশুনা নয় মা, পড়াশুনা নয়। দাদার এখন একটা বিয়ে দেওয়া দরকার শিগগির।'

মা দুঃখের সঙ্গে বলেন, 'তাতে কি আমার অসাধ, কিন্তু ও তো বিয়ের নাম শুনলেই খেপে ওঠে।'

'ঠিক নাম শুনলে খেপে উঠবে না। দেখবে, সুড়-সুড় করে গিয়ে ছাদনাতলায় হাজির হয়েছে। তুমি এখন যার-তার নাম করলে রাজি হবে কেন?'

মা কিন্তু কিছু বুঝতে না পেরে বলেন, 'মেয়ে দেখতেই রাজি না হলে ঠিক-বেঠিক কী করে বুঝব বাপু।'

মাধবী মাকে একেবারে অবাক করে দিয়ে বলে, 'মেয়ে তো দেখে ঠিক হয়ে আছে—

হ্যাঁ গো হ্যাঁ, নির্মলাকে জানো তো!'

'আমাদের পুরুতঠাকুরের মেয়ে?' মা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেন।

'হ্যাঁ, দাদার শুধু তাকেই পছন্দ। এখন তুমি বাবাকে বলে রাজি করালেই হল।' মাধবী এবার পরিহাস ছেড়ে দাদার হয়ে সত্যিই ওকালতি করে বলে, 'সত্যি মা, নির্মলা ভারি ভালো মেয়ে, বাবাকে তোমায় বলতেই হবে।'

'বলব তো, কিন্তু উনি কি রাজি হবেন?'—মা'র মুখ একটু যেন গম্ভীর হয়ে ওঠে।

মাধবী তবু জেদ করে, 'কেন রাজি হবে না মা, নির্মলার মতো বউ তোমরা কোথায় পাবে? তাছাড়া দাদার যখন এরকম পছন্দ।'

মা হতাশভাবে বলেন, 'সবই তো বুঝলাম, কিন্তু আমাদের চেয়ে নিচু ঘরের—পুরুতের মেয়ে উনি কি আনতে চাইবেন। ওঁর মতামত তো জানিস।'

মাধবী এবার রেগে ওঠে, 'গরীব বলেই কি ঘর ছোট হয় মা, ঠাকুরের পুজো যার হাতে হয়, তার মেয়ে ঘরে আনবার যোগ্য নয়?'

'এসব কথা আমায় বলে তো কোনও লাভ নেই মা, আমি ঘরও বুঝি না, বংশও বুঝি না, আমি শুধু মানুষই বুঝি। কিন্তু ওর কাছে বংশের মান সবচেয়ে বড়, সেখানে আর কেউ নেই, আর কিছু নেই। তবু বলে দেখব একবার,'—বলে মা গম্ভীরমুখে ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

বিজয়ের ঘরে মাধবী যখন মা'র কাছে দাদার হয়ে ওকালতি করতে ব্যস্ত তখন জমিদারের কাছারি ঘরে, নির্মলার বাবা, জমিদাবেব জরুরি তলবে এসে হাজির হয়ে বসে আছেন। জমিদারমশাই সাধারণত তাঁকে পুজো-আচ্চার ব্যাপারেও ডেকে পাঠান না। আজকের এই বিশেষ আহ্বানে পুরুতমশাই তাই একটু বিস্মিতই হয়েছেন। অনেকক্ষণ সামনে বসে থাকলেও বীরেন্দ্রনারায়ণ এ পর্যন্ত তাঁব দিকে দৃষ্টিপাত করবার অবসর পাননি। পুরুতমশাই নিজের উপস্থিতিটা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেবেন কিনা ভাবছেন, এমন সময় হঠাৎ জমিদারমশাই কাগজপত্র থেকে মুখ তুলে বলেন, 'আপনি আর বসে কেন পুরুতমশাই, আপনি যেতে পারেন।'

ডেকে এনে এতক্ষণ বসিয়ে রাখার পর এই কথার কোনও অর্থ না পেয়ে পুরুত মশাই একটু বিস্মিতভাবে উঠে পড়ে বলেন, 'আচ্ছা তা হলে আসি,'—একটু ইতস্তত করে তিনি তারপর জিজ্ঞাসা করেন, 'কিন্তু আমায় কী জন্যে যেন স্মরণ করেছিলেন?'

'ও হ্যাঁ তাও বটে, বসুন আর একটু তাহলে!'—জমিদারমশাই যেন হঠাৎ ব্যাপারটা স্মরণ করে নিতান্ত সাধারণ ভাবে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনার একটি মেয়ে আছে না পুরুতমশাই?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ ওই একটি মেয়ে।'

'মেয়ে বেশ বড় হয়েছে, বিবাহযোগ্যা?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, বয়স বরঞ্চ একটু বেশিই হয়েছে।'—পুরুতমশাই জানান।

'তা বিয়ে দেননি কেন!' চৌধুরীমশাইয়ের স্বর ক্রমশই যেন গম্ভীর হয়ে ওঠে।

পুরুতমশাই কিন্তু হেসে জবাব দেন, 'জন্ম মৃত্যু, বিবাহ এ তো আমাদের হাতে নয়!'

'কিন্তু চেষ্টা তো আমাদের হাতে। চেষ্টা করেছেন?'

'তেমন কিছু নয়, সংস্থানও তো কিছু নেই।'

জমিদারের মুখ আরও কঠিন হয়ে ওঠে, 'হুঁ, কিন্তু বিয়ে তা বলে তো আর ফেলে রাখা যাবে না।'

পুরুতমশাই চুপ করে থাকেন।

জমিদারমশাই আবার বলেন, 'বয়স্থা মেয়ে অবিবাহিতা থাকলে গ্রামে নানান কথা উঠতে পারে তা তো বোঝেন।'

এবার সত্যি বিস্মিত হয়ে উমানাথ বলেন, 'কথা উঠবে কেন? মানুষের অদৃষ্ট আর অবস্থা নিয়ে তো আর কথা হতে পারে না।'

'কিন্তু কথা তবু ওঠে পুরুতমশাই। আপনি আপনার মেয়ের জন্যে পাত্র দেখুন।' বীরেন্দ্রনারায়ণের কথাগুলি আদেশের মতোই শোনায়। একটু চুপ করে থেকে তিনি আবার বলেন, 'খরচের জন্যে ভাববেন না, তার একটা ব্যবস্থা করা যাবে।'

উমানাথ এতক্ষণে যেন সমস্ত কথার একটা মানে খুঁজে পেয়ে সকৃতজ্ঞ ভাবে বলেন, 'আপনার অনেক অনুগ্রহ।'

পর মুহূর্তে বীবেন্দ্রনারায়ণের কথায় তাঁকে চমকে উঠতে হয় একটু। বীরেন্দ্রনারায়ণ. বলেন, 'একটা কথা মনে রাখবেন। এই মাসের মধ্যে আপনার মেয়ের বিয়ে হওয়া দরকার।'

'এই মাসের মধ্যেই!' উমানাথ সত্যিই বিস্মিত!—'কিন্তু হঠাৎ এমন তাড়াহুড়ো করে কি পারব?'

'পারতে হবে পুরুতমশাই, মেয়ের বিয়ে এমন কিছু আশ্চর্য ব্যাপার নয়। চেষ্টা থাকলে একদিনেই দেওয়া যায়।'

উমানাথ সত্যি মনে-মনে আহত হয়ে ম্লান হেসে বলেন, 'আচ্ছা দেখি।'

উমানাথ তারপর বিদায় নমস্কার করে চলে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ জমিদার মশাই তাঁকে ডেকে বললেন, 'আর শুনুন, বয়স্থা আইবুড়ো মেয়ে বাড়িতে থাকলে যার তার বাড়িতে আসা উচিত নয়।'

উমানাথ ভালো মানুষ হলেও নির্বোধ নয়। কথাটার তাৎপর্য বুঝে খানিক স্তম্ভিত হয়ে থেকে ধীরে-ধীরে বললেন, 'বাড়িতে তো যে সে কেউ আসে না, চৌধুরীমশাই! কখনও-কখনও পরিতোষ আর এই ক'দিন আমাদের বিজয়....।'

বীরেন্দ্রনারায়ণ উমানাথকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই অত্যন্ত কঠিন স্বরে বললেন, 'বিজয় আমার ছেলে বলে তার কিছু সাত খুন মাপ নয় পুরুতমশাই!'

উমানাথের মুখ দিয়ে আর কোনও কথা বার হল না। খানিক চুপ করে ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে থেকে তিনি ধীরে-ধীরে অবসন্ন পদে বেরিয়ে গেলেন।

মাধবীর কাছে সমস্ত কথা শোনার পর থেকেই বিজয়ের মা অন্নপূর্ণা দেবী স্বামীর কাছে প্রস্তাবটা একবার পাড়বার জন্যে উৎসুক হয়েছিলেন। খানিক আগে পুরুতমশাই কাছারি ঘরে স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন জেনে তাঁর একটু কেমন ভরসাও বেড়েছিল। বীরেন্দ্রনারায়ণ কাছারি ঘর থেকে বাড়িতে ফিবে বিশ্রাম করতে বসা মাত্র তিনি আর অপেক্ষা করতে পারলেন না। ঘরে ঢুকে একটু উদগ্রীব হয়েই জিজ্ঞাসা করলেন, 'পুরুতমশাই এসেছিলেন না? কেন গো?'

বীরেন্দ্রনারায়ণ গম্ভীর মুখে শুধু বললেন, 'ডেকে পাঠিয়েছিলাম।'

'ডেকে পাঠিয়েছিলে? কেন বল· তো?'

বীরেন্দ্রনারায়ণ এবার ঈষৎ হেসে বললেন, 'সে খবরও তোমার দরকার?'

অন্নপূর্ণা স্বামীর কাছে একটা আসনে বসে পড়ে খুশি মুখে বললেন, 'তা দরকার হতে পারে না! আমি পুরুতমশাইয়ের কথাই তোমায় বলতে এলাম যে!'

বীরেন্দ্রনারায়ণ আলবোলায় দুবার টান দিয়ে ঈষৎ কৌতুকের সঙ্গে বললেন, 'তা বলে ফেল। পুজোর ঘটা একটু বাড়াবার দরকার বুঝি?'

'না গো না। পুরুতমশাইয়ের একটি মেয়ে আছে জানো?'—অন্নপূর্ণা নিজেই কথাটা এবার পেড়ে ফেললেন।

বীরেন্দ্রনারায়ণের মুখ এক মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে উঠল, বললেন,—'জানি।'

'ভারি ভালো মেয়ে, রূপে-গুণে একেবারে লক্ষ্মী!'

'বুঝলাম, তারপর?' বীরেন্দ্রনারায়ণের কণ্ঠস্বর অত্যন্ত কঠিন।

অন্নপূর্ণা কিন্তু নিজের উৎসাহে তখন অধীর, স্বামীর কোনও পরিবর্তন লক্ষ না করেই বললেন, 'পয়সার অভাবে পুরুতমশাই মেয়েটির এখনও বিয়ে দিতে পারেননি।'

বীরেন্দ্রনারায়ণ কঠিন স্বরে বললেন, 'এবার যাতে পারেন তার ব্যবস্থার জন্যেই পুরুত মশাইকে ডেকেছিলাম।'

'তার জন্যে ডেকেছিলে? কী আশ্চর্য আমি যে সেই কথা তোমাকে বলতে এসেছি। সত্যি আমাদের বিজয়ের সঙ্গে এতো ভালো মানাবে...'

অন্নপূর্ণা উচ্ছ্বসিতভাবে আরও অনেক কিছুই বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ স্বামীব গম্ভীব রুক্ষস্বরে তাঁর চমক ভাঙল। বীরেন্দ্রনারায়ণ তাঁকে থামিয়ে বললেন, 'বিজয়ের সঙ্গে মানাবার কথা কোথা থেকে আসছে? পুরুত মশাইয়ের মেয়ের বিয়ের সঙ্গে বিজয়ের কোনও সম্পর্ক নেই। উনি পাত্র খুঁজবেন, আমি খরচ দেব বলেছি এই পর্যন্ত।'

অন্নপূর্ণার মুখ এক মুহূর্তে ম্লান হয়ে গেল। কোনও আশা আব নেই বুঝেও তিনি শেষ চেষ্টা করে বললেন, 'কিন্তু অমন ভালো মেয়ে। আমি যে বড় আশা করেছিলাম।'

কিন্তু বীরেন্দ্রনারায়ণ পাহাড়ের চেয়ে কঠিন। স্ত্রীর দিকে ফিরে বেশ একটু তিক্তভাবেই তিনি বললেন, 'তোমার আশা একটু অদ্ভুত। একটা কথা ভুলে যেও না, যে শুধু সুন্দরী আর ভালো মেয়ে হলেই চৌধুরী বাড়ির বউ হওয়ার যোগ্যা হয় না।'

অন্নপূর্ণা নীরবে ম্লানমুখে স্বামীর শেষ কথা শুনে উঠে যাচ্ছিলেন, বীরেন্দ্রনারায়ণ আবার তাঁকে ডেকে বলে দিলেন, 'আর বিজয়কে বলে দিও, কালই যেন সে কলকাতায় রওনা হয়। তার এখানে থাকার আর প্রয়োজন নেই।'

ভাগ্যের নিষ্ঠুরতম আঘাত মানুষের অতি বড় আনন্দের মুহূর্তেই বুঝি আসে। মাধবী ও মায়ের কাছে আশা ও আশ্বাস পেয়ে বিজয় অত্যন্ত উৎসাহভরেই নির্মলাদের বাড়িতে গিয়েছিল। মা একবার প্রস্তাব করলে বাবার যে অমত হবে না এ বিষয়ে এখন তার আর কোনও সন্দেহ নেই। সেই বিশ্বাসের জোরেই নির্মলাকে সে গিয়ে জানালে, 'জানো আজ মা'র মত পেয়েছি, আর মা বললে বাবা যে মত দেবেন সে বিশ্বাস আমার আছে।'

নির্মলার মুখে একটু ম্লান হাসি দেখে সে আবার বললে, 'এখনও তোমার ভয় ঘোচেনি, না নির্মলা?'

নির্মলা শান্ত স্বরে বললে, 'ভয় নয়, তবে বেশি ভরসা করে দুঃখ পেতেও আমি চাই না।'

বিজয় জোর দিয়ে বললে, 'দুঃখ পেতে হবে না নির্মলা—'

নির্মলা একটু চুপ করে থেকে বললে, 'বাবা আজ তোমাদের ওখানেই গেছেন যে। জমিদারমশাই ডেকে পাঠিয়েছেন।'

বাবা ডেকে পাঠিয়েছেন—বিজয় এতটা বুঝি নিজেও আশা করেনি। উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে বললে, 'আমি জানতাম নির্মলা, বাবা কিছুতেই আপত্তি করবেন না, তাঁর ওপরটাই পাথরের মতো শক্ত কিন্তু ভেতরটা কত কোমল তা সকলে বুঝতে পারে না।'

হঠাৎ উমানাথের ডাকে বিজয়ের সমস্ত স্বপ্নই পরমুহূর্তেই চুরমার হয়ে গেল। উমানাথ সেই মাত্র কাছারী-বাড়ি থেকে ফিরছেন, তাঁর অবসন্ন বেদনাময় মুখে, বীরেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে সাক্ষাতের সমস্ত ইতিহাস যেন স্পষ্ট করে লেখা। বিজয় পাংশুমুখে কাছে গিয়ে দাঁড়াল। উমানাথ একটু ইতস্তত করে বললেন, 'তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে বাবা।'

বিজয় তাঁর সঙ্গে একটু এগিয়ে যাওয়ার পর তিনি খানিক চুপ করে থেকে অনেক কষ্টে যেন বললেন, 'তোমার বাবা, নির্মলার বিয়ের জন্যে আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন,—নির্মলার বিয়েতে তিনি সাহায্য করতে চান কিন্তু যেখানে হোক বিয়ে এ মাসেই দেওয়া চাই।'

বিজয় স্থাণুর মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। উমানাথ খানিক নীরব থেকে বিজয়ের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কোনওমতে জমিদারের শেষ আদেশ জানালেন '—আর—আর, তোমার এ বাড়িতে আসা-যাওয়া তিনি পছন্দ করেন না।'

ন্যায় হোক, অন্যায় হোক, বাবার আদেশ চিরকাল নির্বিচারে মেনে নিতেই বিজয় অভ্যস্ত, কিন্তু এবার যেন তার ভেতর কোথায় বিদ্রোহের আভাস জেগেছে মনে হল। মনে হল কী যেন একটা সঙ্কল্প তার মনের ভেতর গড়ে উঠেছে। বাড়ির আবহাওয়া অত্যন্ত থমথমে। মা সাহস করে বিজয়কে কোনও কথা বলতেই পারেন না। বিজয়ের অভিমানের আঘাতটা মাধবীকেই সইতে হয়। বিজয়ের কলকাতা যাওয়ার দিন সকালবেলা মাধবী কী যেন কথা বলতে দাদার ঘরে এসেছিল, বিজয় তাকে শুনিয়ে দিলে, 'বাবা যেতে বলেছেন, বেশ আমি আজই চলে যাচ্ছি। কিন্তু আর যদি গ্রামে না আসি তা হলে কিন্তু আশ্চর্য হসনি।'

মাধবীর চোখ জলে ভরে এল, বললে, 'অমন কথা কেন বলছ দাদা? মা'র মনে কত দুঃখ লাগবে বুঝতে পারছ না?'

বিজয় ফোঁস করে উঠল, 'আর আমার দুঃখটা বুঝি কিছু নয়। আমি অন্যায় কিছু করতে চাইছি?'

'আমরা কি তা বলেছি!' মাধবী কাতরভাবে বললে, 'আমি তো মাকে বলতেই মা রাজি হয়েছেন। কিন্তু বাবার যে একেবারে মত নেই। মাকে তবু আবার একবার বলতে বলেছি।'

'না আর কাউকে কিছু বলতে হবে না। আমার যা করবার ঠিক করে ফেলেছি,' বেশ রুক্ষ স্বরেই কথাগুলো বলে বিজয় ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মা কাছাকাছি থেকে সমস্ত কথাই শুনেছেন। ঘরে ঢুকে ব্যথিত স্বরে বললেন, 'কী করব, আমি যে কিছুই ঠিক করতে পারছিনে। উনি যা একবার না বলে দিয়েছেন আর তাকে হ্যাঁ করানো যে অসম্ভব!'

মাধবী এবার উষ্ণস্বরেই বললে,'যাই বল মা, বাবার এটা খুব অন্যায়। বংশমর্যাদাটা কি এতবড় জিনিস যার কাছে মানুষের সব-কিছু আশা-আনন্দ বলি দেওয়া যায়?'

বিজয় অন্তত অত সহজে সব-কিছু বলি দিতে যে প্রস্তুত নয়, খানিক বাদে পরিতোষের সঙ্গে তার আলাপেই তা বোঝা গেল। বাবার আদেশের বিরুদ্ধে সামনা-সামনি বিদ্রোহ করবার সাহস তার না থাকলেও একেবারে নিশ্চেষ্ট হয়ে হাল সে ছেড়ে দেয়নি। পরিতোষকে বাইরে এক জায়গায় ডেকে নিয়ে গিয়ে ব্যাকুলভাবে সে বলছে শোনা গেল, 'তোমাকে এটা করতেই হবে ভাই। তুমি ছাড়া আর কেউ আমাদের বাঁচাতে পারে না।'

পরিতোষ তখন গভীর ভাবে এই সমস্যার কথাই ভাবছে, কোনও উত্তর তার কাছে না পেয়ে বিজয় আবার সকাতবভাবে বললে, 'দুটো জীবন একেবারে ছারখার হয়ে যায় এই কি তুমি চাও? নির্মলার যদি অন্য জায়গায় বিয়ে হয়, আমাদের দুজনের কী হবে তা কি তুমি বুঝতে পারছ না।—আমরা আর কেউ ছেলেমানুষ নই পরিতোষ। আমাদের মনের দাগ জলের দাগ নয়!'

'কিন্তু আমি ভাবছি এরকম গোপন ব্যাপারের পরিণামটা কি ঠিক ভালো হবে?' পরিতোষের গলার স্বরে অনিশ্চয়তার গভীর উৎকণ্ঠা।

বিজয় ব্যাকুলভাবে বোঝাবার চেষ্টা কবলে, 'পরিণাম কিছু খারাপ হতে পারে না পরিতোষ। আমি জানি, বাবা আজ যাই বলুন, একদিন সবই ক্ষমা করবেন, মা'র তো মত এখনই আছে।'

একটু চুপ করে থেকে সে আবার বললে, 'এখন শুধু কাজটা হয়ে যাওয়া দরকার। নির্মলার বাবা দুর্বল, নিরীহ লোক। আমি চলে গেলে যাতে কোনও পীড়নেও নির্মলার বিয়ে তিনি আর না দিতে পারেন, সেইটে আমি করে যেতে চাই।'

বিজয়ের যুক্তি হয়তো নিতান্ত অবহেলার যোগ্য নয়, তবু পরিতোষ আর একবার বলে দেখলে, 'তোমার বাবা যাতে মত দেন, তার আর একবার চেষ্টা করলে হয় না।'

'না ভাই হয় না'—বিজয় দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে জানালে, 'বরং হিমালয়কে টলানো যাবে তবু বাবাকে এখন টলানো যাবে না। শুধু তাতে তাঁর জেদ বাড়বে এবং সমস্ত পণ্ড হয়ে যাবে। এখন আমি যা বলছি তাই একমাত্র পথ।'

খানিক নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে আর একবার বিষয়টা যেন নিজের মনে ভেবে নিয়ে পরিতোষ বললে, 'বেশ চল!'

একবার কর্তব্য স্থির করে ফেললে কোনও দ্বিধা-দ্বন্দ্বকে প্রশ্রয় দেওয়াব মতো লোক পরিতোষ নয়। নির্মলার বাবা উমানাথের কাছে পরিতোষই ব্যাপারটা বুঝিযে বললে, 'এ ছাড়া আর কোনও উপায় তো দেখছি না উমাখুড়ো। আর সত্যি জমিদারমশাই একমাত্র ছেলের ওপর চিরকাল রাগ করে থাকতে পারেন না! একদিন তিনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে সব ক্ষমা করবেনই।'

নিরীহ উমানাথ কেমন যেন একটু বিমূঢ় হয়ে গেছলেন। পরিতোষের ওপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস; তবু তিনি একবার বললেন, 'কিন্তু লুকিয়ে বিয়েটা বড় খারাপ কাজ হয় না?'

'লুকিয়ে শুধু ক'দিনের জন্য! যতদিন না বাবার এই জেদটা কেটে যায়,'—এবার বিজয় বুঝিয়ে বললে।

উমানাথ তার দিকে ফিরে বললেন, 'তার চেয়ে কিছুদিন অপেক্ষা করলে হত না। ততদিনে তোমার বাবার মত...।'

বিজয় জোরের সঙ্গে বললে, 'অপেক্ষা করবার কোনও দরকার নেই, আমি বলছি এতে কোনও অন্যায় হবে না, একথাও আমি বলছি যে বাবা ভবিষ্যতে আমায় ক্ষমা করেন

ভালো, না করলেও আমি দুঃখ করব না। যা উচিত মনে করি তার জন্যে সবরকম ত্যাগ করতে আমি প্রস্তুত।'

উমানাথ খানিক চুপ করে থেকে পরিতোষকেই উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আমি বুঝতে পারছি না পরিতোষ। ভালো-মন্দ আমি কিছু ভাবতে পারছি না। শুধু তুমি যদি মত দাও....'

'আমিও যে না বলতে পারছি না উমাখুড়ো।'—বলে পরিতোষ তার অমত করার আসল কারণ জানাল, 'তা ছাড়া আমার মতে, আসল মনের বন্ধন যেখানে হয়ে গেছে সেখানে বাইরের অনুষ্ঠান লুকিয়ে না প্রকাশ্যে হল সেটা অবান্তর। জমিদার মশাইয়ের অমতটা তাই আমার কাছে খুব বড় কথা নয়।'

'তা হলে যা ব্যবস্থা হয়, তুমিই করো।'—বললেন উমানাথ।

'ব্যবস্থা আজ রাত্রেই করতে হবে উমাখুড়ো। এখানে গোপনে বিয়ে সেরেই বিজয় কলকাতায় রওনা হয়ে যাবে।'

সেই রাত্রে অতি গোপনে উমানাথের ভাঙা কুঁড়েতে বিজয় ও নির্মলার বিয়ে হয়ে গেল। সাক্ষী রইল একা পরিতোষ। সে বিয়েতে ঘটা নেই, উৎসব নেই, সমস্ত অনুষ্ঠানের ওপর কী যেন একটা আশঙ্কার ছায়া। গোপন বিয়ে সেরেই বিজয়কে ট্রেন ধরবার জন্যে বাড়ি গিয়ে স্টেশনের জন্যে রওনা হতে হল। নির্মলার কাছে ভালো করে বিদায় নেওয়ার সময়টুকু তার মিলল না।

গ্রামের অন্ধকার পথে শশিভূষণের সঙ্গে ঘোড়ার গাড়িতে যেতে-যেতে বিজয় বুঝি চলে আসবার আগে ম্লান আলোয় দেখা নির্মলার কাতর মুখখানির কথাই ভাবছিল। নব বরবধূর এ এক অদ্ভুত বিদায় নেওয়া। কতদিনে আবার দুজনের দেখা হবে কেউ জানে না। কী যে তাদের ভাগ্যে আছে, অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে কিছুই তারা অনুমান করতে পারে না।

বিজয় আচ্ছন্নের মতো স্টেশনে পৌঁছল। তাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় তুলে দিয়ে শশিভূষণ যখন নিজের থার্ডক্লাস গাড়িতে গিয়ে উঠলেন তখন বিজয়ের ভাবগতিক তাঁকেও চিন্তিত করে তুলেছে।

নির্মলার সে রাত্রে ঘুম আর আসে না, আসবার কথাও নয়। একা ঘরে বিছানার ওপর বসে সে বুঝি গত কয়দিনের অপ্রত্যাশিত ঘটনাগুলির ধারাই ভালো করে বোঝবার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ মনে হল কে যেন বাইরের দরজায় ধীরে-ধীরে আঘাত করছে। নির্মলা উঠে দাঁড়াল।

দরজায় আবার টোকার শব্দ পেয়ে ঘরের লণ্ঠনটিব আলো বাড়িয়ে বাহিরের উঠানে গিয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'কে?'

'আমি নির্মলা, দরজা খোলো।'

একি! এ তো বিজয়ের কণ্ঠস্বর! নির্মলা কম্পিত বুকে দরজা খুলে বললে, 'তুমি, তুমি চলে যাওনি!'

'না নির্মলা যেতে পারলাম না! ট্রেন থেকে নেমে চলে এলাম।'

'ট্রেন থেকে নেমে?'—নির্মলা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

'খুব কি অন্যায় করেছি নির্মলা? তুমি কি খুব রাগ করলে?'

নির্মলা তার দিকে খানিক চেয়ে থেকে ধীরে-ধীরে বললে, 'না রাগ করিনি। কিন্তু তুমি আসবে যে তা...'

বিজয় ব্যাকুলভাবে তার কথাটা নিজেই পূরণ করে বললে, 'ভাবতে পারনি কেমন? আমি কাল সকালেই চলে যাব নির্মলা, কেউ কিছু জানবার আগেই চলে যাব। শুধু তোমায় আর একবার না দেখে যেতে পারলাম না। মনে হল, কতকাল আর দেখা হবে না, কত কথার কিছুই বলা হয়নি...'

কথা বলতে-বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে বিজয় আবার একটু ক্ষুণ্ণস্বরে বললে, 'না তুমি অসন্তুষ্ট হয়েছ বুঝতে পারছি, আমি তাহলে এখুনি যাচ্ছি।'

নির্মলা এবার কাতর হয়ে বললে, 'না, না তোমায় যেতে তো আমি বলিনি। আমি বাবা মাকে ডাকি?'

'তাঁদের ডাকবে?' বিজয় যেন সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। 'কিন্তু এখন না ডাকলেও কোনও ক্ষতি নেই নির্মলা, কাল সকালে যাওয়ার আগে ডাকলেই হবে।'

একটু চুপ করে থেকে সে আবার হেসে বললে, 'হয়তো তুমি ভয় পাচ্ছ নির্মলা। আমাদের বিয়ে যে হয়ে গেছে তাও তুমি ভুলে যাচ্ছ বোধ হয়।'

'তা ভুলব কেন?' নির্মলা হেসে মাথা নিচু কবল।

তাহলে আমরা কি এখানেই দাঁড়িয়ে থাকব নির্মলা?' বিজয় হেসে জিজ্ঞাসা কবল।

'না, না, এস।'—বলে নির্মলা আলো দেখিয়ে বিজয়কে ঘবে নিয়ে গেল। বিজয় ঘরে গিয়ে বিছানার ওপর বসে নির্মলাকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হেসে বললে, 'ওইখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে? কাছে এসে বসতে নেই বুঝি?'

নির্মলা হেসে কাছে এসে দাঁড়াতে বিজয় আবার বললে, 'সত্যি, এখনও তোমার দূরে থাকতে ইচ্ছে করে?'

সলজ্জ হেসে নির্মলা বললে, 'ইচ্ছা করলেই কি আসা যায়?'

বিজয় আদর করে কাছে টেনে নিয়ে বললে, 'কেন যায় না নির্মলা। কোনও বাধা তো আজ সত্যি নেই। আর কেউ না জানুক আমরা তো জানি আমাদের বিয়ে হয়েছে। সে বিয়েতে কি তোমার বিশ্বাস নেই?'

'বিশ্বাস না থাকলে এমন কবে এখানে থাকতে পারতাম? আমি সেকথা ভাবছি না—'

'কী ভাবছ তুমি?'—জিজ্ঞাসা করল বিজয়।

'ভাবছি তোমার বাড়িতে যদি জানতে পারে।'

বিজয় হেসে বললে, 'কেউ জানতে পারবে না। কাল ভোবের ট্রেনে আমি চলে যাব। সেখানে গিয়ে বলব, মাঝখানে একটা স্টেশনে চা খেতে নেমে আর উঠতে পারিনি।'

নির্মলাকে হাসতে দেখে বিজয় আবার বললে, 'হাসছ নির্মলা। ভাবছ, কত ফন্দিই না করে এসেছি। কিন্তু সত্যি কোনও ফন্দি আগে থাকতে করিনি। হঠাৎ ট্রেনে উঠে আর বসতে পারলাম না। মনে হল তোমায় একবার না দেখলে নয়, কোনও কথাই তোমার কাছে আমার বলা হয়নি।'

বিজয় তার জামাটা খুলে এবার টেবিলের উপর রাখলে। সেটা গুছিয়ে রেখে নির্মলা জিজ্ঞাসা করলে, 'তুমি বুঝি অনেক দিন কলকাতায় থাকবে?'

'হ্যাঁ, এখানকার হিসেবে অনেকদিন, হয়তো দু-মাস সেখানে থাকতে হবে। এতদিন অন্তত তোমার হাতের চিঠি না পেলে কিছুতেই থাকতে পারব না। চিঠি দেবে তো?'

'কিন্তু তোমার ঠিকানা তো জানি না।'

বিজয় হেসে বললে, 'সেই জন্যেই আবার এলাম নির্মলা। মনে হল ঠিকানাটাও তোমায় বলে আসা হয়নি।'

পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে তার ওপর ঠিকানাটা লিখে বিজয় নিজের ফাউন্টেন পেনটা সুদ্ধ টেবিলের ওপর রেখে বললে, 'এই আমার ঠিকানা লেখা রইল, আমার কলমটাও সঙ্গে-সঙ্গে রেখে দিলাম। এই কলমটা দেখলে অন্তত, আমায় চিঠি লেখার কথা তোমার মনে পড়েবে নির্মলা। আচ্ছা কালই আমায় একটা চিঠি লিখবে বল, লিখবে? বল অন্তত, একদিন অন্তর তোমার চিঠি আমি পাবই।' বিজয়ের স্বরে অসীম ব্যাকুলতা।

'আর তুমি বুঝি লিখবে না!'

'নিশ্চয় লিখব'—বলে হঠাৎ বিজয় আলোটা নিভিয়ে দিলে।

'কেন আলোটা কী দোষ করলে?'—হেসে জিজ্ঞাসা করলে নির্মলা।

বিজয়ের হাসি শোনা গেল অন্ধকারে, 'দোষ করেনি। বাইরের চাঁদের আলো ওর ভয়ে ঢুকতে পারছে না ঘরে।'

বিজয় কলকাতা রওনা হয়ে যাওয়ার দু-দিন পরেই জমিদার বীরেন্দ্রনারায়ণ শশিভূষণের কাছ থেকে একটা চিঠি পেলেন। চিঠির শেষ দিকটা পড়ে তাঁকে বিশেষ চিন্তিত দেখা গেল। সরকারমশাই লিখেছেন—

> *...কাল সত্যই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। বিজয় বাবাজীবন অবশ্য নিরাপদেই আজ আসিয়া পৌঁছিয়াছে। শুনিলাম পথে ট্রেন হইতে কোনও কারণে নামিয়া আর সময়মতো উঠিতে পারে নাই। সেই জন্যে পরের ট্রেনে তাঁহাকে আসিতে হইয়াছে। ব্যাপারটা কেমন অস্বাভাবিক বলিয়া আপনার গোচর না করিয়া পারিলাম না। আমার নমস্কার জানিবেন। নিবেদন ইতিঃ*
>
> *বশংবদ*
>
> *শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়*

বিজয়ের মা কী কাজে সেই সময়ে ঘরে এসেছিলেন। স্বামীর হাতে চিঠি দেখে তিনি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কার চিঠি গো? বিজয় এর মধ্যে চিঠি দিয়েছে?'

'না বিজয় নয়, সরকার মশাই।'—বীরেন্দ্রনারায়ণ গম্ভীর মুখে জানালেন।

অন্নপূর্ণা উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সরকার মশাই! কেন? বিজয়ের শরীর-টরির...'

'শরীর তার ভালোই আছে। কোনও ভয় নেই। তবে আমায় আজই কলকাতায় যেতে হবে।' অত্যন্ত অপ্রসন্নমুখে কথাগুলো বলে জমিদার উঠে পড়লেন।

অন্নপূর্ণার উদ্বেগ তাতেই বেড়ে গেল। বললেন, 'তুমি আমায় কী যেন লুকোচ্ছ। সত্যি বল, বিজয়ের কিছু হয়েছে কি?'

'তোমায় বলবার মতো কিছু হয়নি, জেনে রেখো সে ভালোই আছে।' বলে জমিদার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কলকাতায় বিজয়ের পড়াশুনার জন্যে একটি আলাদা বাসা ঠিক করা আছে। দেখাশুনা করে শশিভূষণ।

বীরেন্দ্রনারায়ণ পরের দিন সেখানে গিয়ে উঠলেন এবং সকালেই তাঁকে শশিভূষণের সঙ্গে গম্ভীর মুখে বিজয়ের প্রসঙ্গই আলোচনা করতে দেখা গেল।

বীরেন্দ্রনারায়ণ গম্ভীর মুখে শশিভূষণকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় নেমেছিল তুমি কিছু টের পাওনি?'

'কী করে পাব বলুন, আমি তো ভিন্ন কামরায়। পাহারা দিতে হবে জানলেও না হয় জেগে থাকতাম।' শশিভূষণের সেই নিজস্ব অদ্ভুত গলার স্বর ও ভঙ্গি। সসঙ্কোচে কৈফিয়ত দিচ্ছেন, না, মনে-মনে হাসছেন, বোঝবার উপায় নেই।

খানিক চুপ করে থেকে বীরেন্দ্রনারায়ণ বললেন, 'কলকাতায় পৌঁছেই আমায় তার করনি কেন?'

'আপনাকে মিছিমিছি ব্যতিব্যস্ত করবার ভয়ে। সেখান থেকে তো আপনি কিছুই কবতে পারতেন না, শুধু বাড়ির সবাই ব্যতিব্যস্ত হত।' একটু থেমে শশিভূষণ আবার বললে, 'আমি গ্রামের স্টেশন মাস্টারকে 'তার' করেছিলাম।'

এবার জমিদারমশাই সত্যি অবাক হলেন, 'গ্রামের স্টেশন মাস্টারকে?'

শশিভূষণ জমিদারমশায়ের বিস্ময়টা একটু উপভোগ করে বললেন, 'হ্যাঁ, তাঁর ফিরতি তারেই জানলাম, বিজয় পরের দিন ভোরের ট্রেনে সেখান থেকে রওনা হয়।'

'বিজয় রাত্রে গ্রামেই ছিল! কোথায়?' বীরেন্দ্রনারায়ণ চেষ্টা করেও গলার স্বর সংযত রাখতে পারলেন না।

শশিভূষণ অসহায় ভাব করে বললেন, 'তা কী করে জানব বলুন?' •

জমিদার গম্ভীর হয়ে শুধু বললেন, 'হুঁ।' তারপব তিনি সে ঘর থেকে চলে যাওয়ার উপক্রম করতেই শশিভূষণ হঠাৎ আবার বললেন, 'বিজয়ের নামে গ্রাম থেকে একটা চিঠিও এসেছে। চিঠিটা আমাদের বাড়ির নয়।'

বীরেন্দ্রনারায়ণ থমকে দাঁড়ালেন। তারপর শশির দিকে অবাক হযে খানিক চেয়ে থেকে বললেন, 'চিঠি তাকে দিয়েছ?'

'না এখনও দিইনি।'

'চিঠিটা দাও'—বলে জমিদার হাত বাড়ালেন এবং শশির কাছ থেকে চিঠিটা নিয়ে চলে যেতে-যেতে বললেন, 'চিঠিটা আমার কাছে থাক।'

জমিদারমশাই ঘর থেকে চলে যাওয়ার পর শশিভূষণ আপন মনে হেসে নিজের কাজে বসতে যাচ্ছেন, এমন সময়ে বিজয় হাসিমুখে এসে বললে, 'Good Morning শশিকাকা। ও তুমি আবার গুডমর্নিং টর্নিং বোঝ না, কিন্তু সুপ্রভাত বোঝ তো? চমৎকার সকাল যাকে বলে। কী চমৎকার সকালটা আজ বল তো?'

শশিভূষণ একটু হেসে বললেন, 'আমাদের তো আর সকাল নেই বাবা। সন্ধে ঘনিয়ে এসেছে।'

বিজয় হেসে উঠল। তারপর জিজ্ঞাসা করলে, 'আচ্ছা কাকা, আমার চিঠি-পত্র কী এসেছে দাও দেখি?'

ক্ষণেকের জন্যে শশিভূষণের মতো লোককেও যেন একটু বিব্রত মনে হল। একটু থতমত খেয়ে বললেন,—'চিঠি! না, কই চিঠি তো আসেনি।'

'না, না, নিশ্চয় এসেছে তুমি দেখো'—বিজয় নাছোড়বান্দা।

শশিভূষণ আরও যেন বিব্রত হয়ে বললেন, 'দেখব কী বল, চিঠি তো আর অদৃশ্য

জিনিস নয়।'

বিজয়ের মুখের হাসি এবার সত্যি মিলিয়ে গেল। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল নির্মলার চিঠি আসবেই--'চিঠি আসেনি, সত্যি চিঠি আসেনি?' সে আরেকবার জিজ্ঞাসা করলে, তারপর শশিভূষণকে মাথা নাড়তে দেখে অত্যন্ত বিষণ্ণ মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

চৌধুরীমশাই নিজের ঘরে গিয়ে চিঠি খুলে পড়ে প্রথমে স্তম্ভিত; তারপর একেবারে রেগে আগুন হয়ে উঠলেন। তৎক্ষণাৎ শশিভূষণকে নিচে থেকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন গম্ভীর স্বরে,—'এ চিঠিতে কী আছে জানো?'

'আজ্ঞে না, আমি তো খুলে পড়িনি'—শশিভূষণের কণ্ঠস্বরে একটু যেন প্রচ্ছন্ন কৌতুক।

চৌধুরীমশাইয়ের সেইটুকু লক্ষ করবার মতো অবস্থা তখন নয়। রাগে আগুন হয়ে তিনি বললেন, 'বিজয় লুকিয়ে পুরুত মশাইয়ের মেয়েকে বিয়ে করেছে।'

শশিভূষণের মুখেও এবার বুঝি বিস্ময়ের চিহ্ন দেখা গেল। জমিদারমশাইয়ের রাগ চড়েই চলেছে, বললেন, 'আমার মতের বিরুদ্ধে সে লুকিয়ে বিয়ে করতে সাহস করল! কিন্তু ও জানে না যে বীরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী নিজের ছেলের অপরাধও ক্ষমা করে না।'

শশিভূষণ বেশ শান্তকণ্ঠে মন্তব্য করলেন, 'হয়তো জানে বলেই লুকিয়ে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছে।'

জমিদারমশাই তার দিকে বিরক্তভাবে একবার তাকালেন, তারপর গম্ভীর স্বরে বললেন, 'এ বিয়ে আমি মানব না। আমি ওকে ত্যজ্যপুত্র করব।'

'তাতে বিয়েটা ওর কাছে বাতিল হয়ে যাবে না।' আবার মন্তব্য করলেন শশিভূষণ।

জমিদারমশাই আবার আগুন হয়ে উঠলেন, 'এই অন্যায় আমি তা বলে সহ্য করব?'

'ন্যায়-অন্যায় আপনি জানেন; তবে সহ্য না করবার সোজা পথ ছেলেকে ত্যাগ করা নয়'—শশিভূষণের স্বর এবার বেশ গম্ভীর।

চৌধুরীমশাই খানিক চুপ করে থেকে এই কথাটাই যেন ভালো করে ভেবে নিয়ে বললেন, 'আমি আবার ওর বিয়ে দেব।'

শশিভূষণ হাসলেন, 'ও আপনারই ছেলে। জোর করে মোচড় দিতে গেলে ভেঙে যাবে। ওকে সইয়ে-সইয়ে ছাড়া নোয়ানো যাবে না।'

এবারেও চৌধুরীমশাইকে বেশ খানিকক্ষণ ভাবতে হল। তারপর তিনি বললেন, 'বেশ আজ থেকে পুরুতমশায়ের বাড়ির কোনও চিঠি যেন ওর হাতে না যায়। সমস্ত চিঠি আসবামাত্র তুমি ছিঁড়ে ফেলবে।'

'আর বিজয় যে চিঠি দেবে,' জিজ্ঞাসা করলেন শশিভূষণ।

'বিজয় তো নিজে চিঠি ফেলে না?'

'তা ফেলে না বটে; আমার হাত দিয়ে ডাকঘরে পাঠায়।'—বললেন শশিভূষণ।

চৌধুরীমশায় হুকুম দিলেন, 'সে চিঠিও যেন ডাকঘরে না পৌঁছয়। বিজয়ের গ্রামে যাওয়াও আমি বন্ধ করলাম।'

শশিভূষণ একটু হেসে বললেন, 'শুধু তাতেই কিছু হবে বলে মনে হয় না। কুপথ্যি বন্ধ হলেই রোগ সারে না, ওষুধও চাই।'

'হুঁ, তার ব্যবস্থাও করব।'

জমিদার মশাইয়ের কথা শেষ হওয়ার আগেই যেন ভাগ্যের নির্দেশের মতো বাইরে একটা মোটরের হর্ন বেজে উঠল।

দেখা গেল, একটি বেশ সমৃদ্ধ চেহারার মোটর সেখানে এসে থেমেছে। ভেতরে তিনটি তরুণী ও একজন বর্ষিয়সী মহিলা। দুবার ড্রাইভার হর্ন দেওয়ার পরও কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে বর্ষিয়সী মহিলা বললেন, 'কই কারুর তো সাড়া নেই। ঠিক এই বাড়ি তো?'

সবচেয়ে ছোট মেয়েটি বুঝি একটু বেশি চঞ্চল। সে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মা নম্বর দেখতে পাচ্ছ না।'

মা ড্রাইভারকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'যাও না ড্রাইভার, তুমি না হয় নিজে নেমেই চিঠিটা দিয়ে এস না। তাতে তোমার মান যাবে না।'

ড্রাইভার নেমে গিয়ে দরজায় দুবার ধাক্কা দিয়ে কোনও সাড়া-শব্দ না পেয়ে ফিরে এসে বললে, 'কই কাউকে তো দেখতে পেলাম না।'

কেউ কিছু বলবার আগেই ছোট মেয়েটি ড্রাইভারের হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে দরজা খুলে নেমে পড়ল। তারপর 'আচ্ছা আমিই যাচ্ছি, একটা চিঠি দিয়ে আসতে মারামারি ব্যাপার!' বলে দে ছুট।

সমস্বরে মা ও বোনেরা এবার পিছন থেকে চিৎকার করে উঠলেন। 'এই বুলা, বুলা! দেখছ কাণ্ড! ছিঃ-ছিঃ, কী হচ্ছে কী বুলা।'

কিন্তু বুলা তখন একেবারে দরজায়, সেখান থেকে ফিবে একবার বললে, 'আমি এখুনি দিয়ে আসছি মা।'

তারপর ভেতরে সে অন্তর্ধান।

গাড়িতে মা'র অবস্থা দেখে বোঝা গেল বুলাই তার জীবনের একটি প্রধান উৎকণ্ঠা ও উপদ্রব। প্রায় মূর্ছা যাওয়ার উপক্রম হয়ে হাতপাখা চালাতে-চালাতে বললেন, 'না, মান-সম্ভ্রম আর রইল না। বুলা আমায় পাগল করে দেবে।' বড় মেয়েকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'অনু আমার স্মেলিংসল্ট।'

মেয়েরা মায়ের পরিচর্যায় ব্যস্ত হয়ে উঠল।

বুলা তখন দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে তর-তর করে উঠে একেবারে জমিদারমশাইয়ের ঘরে গিয়ে হাজির হয়েছে। জমিদারমশাই ও শশিভূষণ দু-জনেই তাকে দেখে অবাক। সে কিন্তু বেশ সপ্রতিভ ভাবে জিজ্ঞাসা করলে, 'এটা বীরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর বাড়ি তো?...' তারপর উত্তরের অপেক্ষা না করেই জমিদারমশাইয়ের কাছে এসে নমস্কার করে বললে, 'বাঃ, আপনিই তো জ্যাঠামশাই!'

বীরেন্দ্রনারায়ণ একেবারে হতভম্ভ, 'আমি?'

'হ্যাঁ, আমি দেখেই চিনেছি, বীরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর নাম কি যাকে-তাকে মানায়! আমি কিন্তু ভেবেছিলাম আপনার...'বলেই খিলখিল করে হেসে উঠে বুলা বললে, 'না বলব না।'

জমিদারমশাই এই অনর্গল হাসি ও কথার মধ্যে একটু ফাঁক পেয়ে সবিস্ময়ে বললেন, 'কিন্তু আমি তো...'

কথা আর তাঁকে শেষ করতে হল না। বুলা আবার হেসে উঠে বললে, 'আমায় চিনতে পারছেন না বুঝি? আমি বাবার কাছ থেকে আসছি। ওই যা! দেখেছেন কী ভুল! শুধু বাবা বললে আপনি চিনবেন কী করে? আমার বাবা হলেন রাজীব মুখোপাধ্যায়—'

এতক্ষণে জমিদারমশায় একটু আলো দেখতে পেয়ে বললেন, 'ও তুমি রাজীবের মেয়ে?'

'হ্যাঁ ছোট মেয়ে', বুলার কথার উৎস আবার খুলে গেল। 'আপনি আমায় চিনতে পারেননি তো? কী করে চিনবেন! আমায় কত ছোট দেখেছেন, আর আমি এখন দিদির সমান লম্বা হয়ে উঠেছি। কিন্তু দিদির মতো সুন্দর হইনি। মা তো রোজ বলে তালগাছ। ওই যা আসল কথাই ভুলে যাচ্ছি। বাবা একটা চিঠি দিয়েছেন আপনাকে।'

চিঠিটা বার করে চৌধুরীমশাইয়ের হাতে দেওয়ার পর, তিনি পড়বার উপক্রম করতেই বুলা হেসে বললে, 'চিঠি আর পড়বেন কী? আপনাদের যেতে হবে আমাদের বাড়ি, আজকেই। আপনি আর আপনার যে ছেলে এখানে থাকেন। বাবার অসুখ কিনা, পেনশন নিয়ে কলকাতায় আসা অবধি অসুখ। অসুখের চেয়ে অবশ্য অসুখের বাতিক বেশি। রাতদিন খালি ভাবেন, অসুখ হয়েছে। আমরা কত হাসি।' বলেই বুলা আর এক দফা হেসে নিলে, তারপর বললে, 'হ্যাঁ যা বলছিলাম। বাবার অসুখ বলে আসতে পারলেন না, কিন্তু বাবা আমাদের পাঠিয়েছেন।'

জমিদারমশাই সস্নেহে হেসে বললেন, 'বোলো, আমি নিশ্চয়ই যাব!'

বুলা তৎক্ষণাৎ বলে উঠল, 'সে আমি জানতাম। আপনারা খুব পুরোনো বন্ধু না? বাবার কাছে আপনার কত গল্প শুনেছি।'

হঠাৎ একটা কথা মনে হওয়ায় সে উঠে পড়ে বললে, 'না, আমি যাই তাড়াতাড়ি। মা, দিদিরা এতক্ষণ বোধ হয় ভেবে সারা হচ্ছেন। ওরা যা ভীতু।'

জমিদারমশাই একটু ব্যস্ত হয়ে পড়ে বললেন, 'তোমার মা, দিদিরা এসেছেন নাকি?'

'এসেছেন তো! ওই বাইরে মোটরে আছেন।' কথাটা বলে ফেলেই জিভ কেটে সে বললে, 'ওই যা আপনাকে বলে ফেললাম, মা শুনলেই রাগ করবেন। ওরা এখন unofficially এসেছেন কিনা!' বুলার আবার হাসি উথলে উঠল। 'আমি যাই এখন', বলে দরজা পর্যন্ত ছুটে গিয়ে সে আবার বললে, 'তখন কী বলতে যাচ্ছিলাম জানেন? বলতে যাচ্ছিলাম যে আমি ভেবেছিলাম আপনার আরও মস্ত গোঁফ হবে।'

তারপর বুলা আর সেখানে দাঁড়ায়! সিঁড়িতে দ্রুত পায়ের শব্দের সঙ্গে একটা মিষ্টি উচ্ছ্বসিত হাসি শোনা গেল।

জমিদারমশাই এমন মেয়ে তাঁর জীবনেও দেখেননি। এ যেন প্রাণের উচ্ছ্বসিত ঝরনাধারা। তিনি স্নেহ-স্নিগ্ধ মনে মেয়েটির কথাই ভাবছিলেন। শশিভূষণের কথায় তাঁর যেন চমক ভাঙল।

রাজীববাবুর মেয়েগুলি সুন্দরী বলে মনে হয়। তবে বোধহয় একটু হাল-ফ্যাসানের।

জমিদারমশাই একটু কী যেন ভেবে নিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, আজ বিজয়কে নিয়ে ওদের বাড়ি যাব ঠিক করলাম। অনেক দিনের পুরোনো বন্ধু!'

আর কোনও কথা তারপর হল না। জমিদারমশাইয়ের ঘর থেকে নিচে নামতে-নামতে শশিভূষণকে গুনগুন করে গাইতে শোনা গেল—

'আমার দোষ কিছু নাই শঙ্করী
সাধুর সঙ্গে সাধু সাজি চোরের সাথে সড় করি।'

বিজয় ঘরে বসে নির্মলাকে চিঠি লিখছিল। লিখছিল,—

'এই সামান্য কথাটুকু তুমি রাখতে পারবে না আমি সত্যই ভাবিনি নির্মলা। আমি সত্যই বিশ্বাস করেছিলাম তোমার চিঠি পাব। একটুখানি চোখের আড়াল হতেই যদি এমন

ভুল হয় তাহলে আমায় ভুলতে তোমার তো বেশিদিন লাগবে না। তোমার চিঠি না পেয়েও এই চিঠি দিচ্ছি। এর উত্তর দিতে একটুও দেরি কোরো না কিন্তু...'

চিঠি লেখার মাঝেই চৌধুরীমশাইয়ের বাইরে থেকে ডাক শোনা গেল, 'বিজয়।'

তাড়াতাড়ি চিঠি শেষ করে বিজয় সেটি পকেটে ফেলে উত্তর দিলে, 'যাই বাবা।'

বাইরে বেরিয়ে আসতেই জমিদারমশাই গম্ভীর স্বরে আদেশ দিলেন, 'তুমি তৈরি হয়ে নাও তাড়াতাড়ি। আমার সঙ্গে বেরুতে হবে।'

'কোথায় বাবা?'

'আমার পুরোনো বন্ধু রাজীববাবুর বাড়ি। কলকাতায় কিছুদিন হল এসেছেন। তোমার আলাপ করা বিশেষ দরকার।'

বিজয় একটু ইতস্তত করে বললে, 'কিন্তু আমি...'

'যাও তৈরি হয়ে নাও শিগগির।' অসহিষ্ণুভাবে আদেশ দিয়ে চৌধুরীমশাই চলে গেলেন।

বিজয় খানিক নিরুপায় হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে শশিভূষণের কাছে গিয়ে বললে, 'এই চিঠিটা এখুনি ফেলবার ব্যবস্থা করবে শশিকাকা, ভয়ানক জরুরি বুঝেছ!'

শশিভূষণকে চিঠিটা দিয়ে ক্ষুণ্ণস্বরে বললে, 'বাবার আবার কী খেয়াল, রাজীববাবুর বাড়ি যেতে হবে।'

শশিভূষণ উত্তরে একটু হাসলেন মাত্র। সে হাসির অর্থ বিজয় আর কেমন করে বুঝবে!

চৌধুরীমশাইয়ের পুরাতন বন্ধু রাজীববাবু এককালে বড় সরকারি চাকুরে ছিলেন। এখন অবসর গ্রহণ করে কলকাতায় বাড়ি করে সেইখানেই বাস করছেন। অবস্থা বেশ ভালো, রুচি মার্জিত ও আধুনিক। তবে স্ত্রী হেমাঙ্গিনীর সামাজিক উচ্চাশায় মাঝে-মাঝে তাঁকে একটু বিব্রত হতে হয়। রাজীববাবু থেকে আরম্ভ করে মেয়েরা সবাই হেমাঙ্গিনীর শাসনে তটস্থ। এক ছোট মেয়ে বুলা যা একটু ব্যতিক্রম। হেমাঙ্গিনীর ভ্রূকুটি তাকে সবসময়ে দাবিয়ে রাখতে পারে না।

সেদিন সকালবেলা বীরেন্দ্রনারায়ণ ও তাঁর ছেলের অভ্যর্থনার জন্যই হেমাঙ্গিনী একটু বেশি ঘটা করে আয়োজন করেছেন। আসবাবপত্র থেকে মেয়েদের সাজ পোশাক সব দিকেই তাঁর প্রখর দৃষ্টি পড়েছে। বড় মেয়ে অণিমা ড্রয়িং-রুমে ফুলদানিতে ফুল সাজাচ্ছিল। ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে হেমাঙ্গিনী সেখানে ঢুকে মেয়ের পোশাকের দিকে চেয়ে বিরক্ত হয়ে উঠলেন, 'অণিমা, তবু তুমি হাইকলারটা পরে আসোনি? না তোমাদের নিয়ে আর পারব না! আর ওই শাড়িটা! না কতবার বলব, ও ছাই রং তোমায় মানায় না flame colourটা পরনি কেন?'

অণিমা মা'র কথার ওপর কথা কওয়া বৃথা বুঝেও মৃদু প্রতিবাদ করে, 'কিন্তু মা—'

হেমাঙ্গিনী একেবারে অধৈর্য হয়ে পড়েন, 'না, তোমরা আমায় পাগল করে দেবে, একটা সামান্য জামা পর্যন্ত নিজেরা বুঝে পরতে পারো না।'

এবার পেছন থেকে বুলার হাসি শোনা যায়। সে বলে ওঠে, 'আমি বললাম দিদিকে, মা তোমায় একেবারে আগুন না লাগিয়ে ছাড়বেন না। একেবারে ছুঁলেই ভস্ম।'

হেমাঙ্গিনী গম্ভীরভাবে ধমক দিয়ে বলেন, 'বুলা!'

বুলা অতি কষ্টে হাসি চেপে অন্য দিকে মুখ ফেরায়। হেমাঙ্গিনী অণিমাকে আবার আদেশ দেন, 'যাও অণিমা যাও, হাইকলার ব্লাউস আর সেই শাড়িটা পরে এস। আমায় আর জ্বালাতন করো না।'

রাজীববাবু তখন ঘরে ঢুকছেন, একটুখানি মেয়ের পক্ষে ওকালতি করবার চেষ্টা করে বলেন, 'কেন মিছামিছি এত ব্যস্ত হচ্ছ বল তো। এ তো আর state reception নয়! আমার পুরোনো বন্ধু আসছে তাঁর ছেলেকে নিয়ে...'

'তুমি চুপ কর দেখি!'—হেমাঙ্গিনী ধমকে ওঠেন। 'তোমার বন্ধুর তোমার মতো রুচি নাও হতে পারে। যাও অণিমা যাও, দাঁড়িয়ে থেক না।'

বুলার হাসির সঙ্গে টিপ্পনী শোনা যায়, 'যাও না দিদি, শেষে মা'র আবার এখুনি smelling salt-য়ের দরকার হবে।'

সত্যি বুলাকে নিয়ে আর পারা যায় না। হেমাঙ্গিনী আবার শাসন করেন, 'বুলা!'

বুলা একেবারে নেহাত ভালো মানুষের মতো মা'র কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলে, 'না মা আমি শুধু বলছিলাম, তোমায় মিছামিছি জ্বালাতন করা কেন? আমি এ জামাটা বদলে আসব মা?'

'না, তোমায় আর জামা বদলাতে হবে না।' হেমাঙ্গিনী অপ্রসন্ন মুখে অন্যদিকে চলে যান।

বুলা যেন নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হয়ে বলে, 'বেশ বদলাব না।' তারপর মেজদিদি লিলির কাছে দুঃখ জানিয়ে বলে, 'জানিস মেজদি, মা'র শুধু দিদি আর দিদি। আমাদের পোশাকের একবার খুঁতও ধরে না!'

লিলি নেহাত নিরীহ শান্ত মেয়ে! তার মুখে কদাচিৎ একটা কথাও শুনতে পাওয়া সৌভাগ্য। বুলা তাই বাবার কাছে গিয়ে নালিশ জানিয়ে বলে, 'খুব অন্যায় নয় বাবা?'

রাজীববাবু একটু হেসে আদর করে বলেন, 'তোমাদের পালাও আসবে মা, কোনও ভাবনা নেই, যতদিন নিরাপদে আছ, দুঃখ কোরো না।'

রাজীববাবু রসিকতাটা গোপনেই করবার চেষ্টা করেছিলেন, হেমাঙ্গিনীর কিন্তু কথাটা কানে যায়। তারপর আর রক্ষা আছে! হেমাঙ্গিনী রুদ্রমূর্তিতে স্বামীকে শাসন করেন, 'ওই করেই তো মেয়েগুলির মাথা খেয়েছ। আমি যা করব তাতেই শুধু ঠাট্টা।'

হঠাৎ বাইরের দরজায় বেল বেজে উঠতেই এ যাত্রা রাজীববাবু নিষ্কৃতি পান।

হেমাঙ্গিনী ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বলেন, 'ওই, ওই এসেছে বোধহয়! যাও বুলা যাও, অণিমাকে ডাক শিগগির। দেখ দেখি কী কাণ্ড—' হেমাঙ্গিনী সাদর অভ্যর্থনার উপযুক্ত হাসি মুখে টেনে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ান। কিন্তু তাঁকে এবার হতাশ হতে হয়। বীরেন্দ্রনারায়ণ ও তাঁর ছেলের বদলে একটি সুবেশ এবং একটু বোকা-বোকা ধরনের ছেলে ঘরে ঢুকে বলে, 'আমি—আমি, am I welcome? মানে আমি কি স্বাগত?'

'ও, তুমি!'—হেমাঙ্গিনী মুখের বিরক্তি গোপনের কোনও চেষ্টা করেন না।

আগন্তুক ছেলেটি একটু বিব্রতভাবে বললে, 'I didn't know I was expected, মানে জানতাম না আমি প্রত্যাশিত।'

বুলা হেসে উঠে বলে, 'না মিঃ হালদার, আপনি অপ্রত্যাশিত, দেখছেন না মা কীরকম...'

বুলার কথা শেষ হওয়ার আগেই হেমাঙ্গিনী হাঁক দেন, 'বুলা—'

'না, মা, আমি শুধু বলছিলাম মিঃ হালদার হঠাৎ আজ এসে পড়ায় মা কীরকম খুশি হয়েছেন।'—বুলা তৎক্ষণাৎ একেবারে নিরীহ ভালো মানুষটি।

মিঃ হালদার অবস্থাটা বুঝতে না পেরে নির্বোধের মতো একটু হাসেন।

রাজীববাবু তাঁর ওপর দয়া-পরবশ হয়ে বলেন, 'বসুন মিঃ হালদার। আজ আমার একজন বন্ধু আসছেন কিনা, সবাই তাই একটু ব্যস্ত।'

মিঃ হালদার আশ্বস্ত হয়ে এক জায়গায় বসে বললেন, 'I see, I hope I shall not be in the way—মানে, আশা করি আমি পথের বাধা হব না।'

'হলে একটু সরে দাঁড়াবেন তৎক্ষণাৎ,'—ফোড়ন দেয় বুলা।

সকলে হেসে ওঠে, এবং সেই হাসাহাসির মধ্যেই চৌধুরীমশাই বিজয়কে নিয়ে প্রবেশ করেন। রাজীববাবু এগিয়ে যান তাঁদের দিকে।

হেমাঙ্গিনী অস্থির হয়ে উঠে বলেন, 'দেখ দেখি অণিমা এখনও নামল না।'

বুলা বলে ফেলে, 'দাঁড়াও মা, যা হাইকলারের ফরমাস করেছ। তাড়াতাড়ি নামতে পারছে না।'—তারপর চট করে মা'র দৃষ্টির অন্তরালে সরে পড়ে।

নেহাত অতিথিদের সামনে বলে হেমাঙ্গিনীকে শাসনটা আপাতত স্থগিত রাখতে হয়।

রাজীববাবু, বীরেন্দ্রনারায়ণ ও বিজয়কে সঙ্গে করে ভেতবে এনে বলেন, 'ওঃ কতদিন বাদে দেখা বল তো?'

'হ্যাঁ, আমি তো তোমার ছোটমেয়েকে দেখে চিনতে পারিনি'—বলে চৌধুরীমশাই চারিধারে একবার চোখ বুলিয়ে দেখেন, 'তোমার কি এই দুটি মেয়ে নাকি?'

হেমাঙ্গিনী তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে জানান, 'না বড়টি, বড়টি এখনও আসেনি। নমস্কার।'

'নমস্কার, ভালো আছেন তো?' বীরেন্দ্রনারায়ণ ও বিজয় দুজনে হাত তুলে নমস্কার করেন।

'ভালো আর কই? এইটি বুঝি আপনার ছেলে?' সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করেন হেমাঙ্গিনী।

'হ্যাঁ, এই আমার ছেলে বিজয়, এখানে কলেজে পড়ে।'

রাজীববাবু সস্নেহে বললেন, 'আমি আগে তো জানতাম না, তা হলে আগেই কবে ডেকে আনতাম।'

চৌধুরীমশাই বলেন, 'এখন থেকেই আসবে। এখানে তুমিই তো ওর অভিভাবক।'

'খুব ভালো কথা! বিজয় এটা তোমার নিজের বাড়ি মনে করবে এখন থেকে'—বলে বীরেন্দ্রনারায়ণের দিকে ফিরে রাজীববাবু বলেন, 'চল হে আমরা এদের ছেড়ে একটু নিরিবিলি বসে গল্প করিগে যাই।'

'চল,' বলে বীরেন্দ্রনারায়ণও উঠে পড়েন।

বুলা হঠাৎ হেসে বলে ওঠে, 'বাবা, প্রথম দিনেই যেন শুধু অসুখের গল্প করো না। জ্যাঠামশাই আর তাহলে আসবেন না।'

'বুলা'—হেমাঙ্গিনীর চাপা গলার ভর্ৎসনা শোনা যায়।

রাজীববাবু ও বীরেন্দ্রনারায়ণ কিন্তু বুলার কথায় হেসে উঠে তাকে একটু আদর করে ওপরে চলে যান।

হেমাঙ্গিনী এবার বিজয়ের প্রতি ভালো করে মনোযোগ দেন, 'এইখানে এতদিন আছ অথচ চেনা-পরিচয় হয়নি, কী আশ্চর্য বল তো! এসব তোমার আপনার জনের মতো। এইটি আমার মেজ মেয়ে লিলি, এইটি আমার ছোট মেয়ে বুলা।'

বুলা সঙ্গে-সঙ্গে জুড়ে দেয়, 'ভালো নাম বিনীতা' এবং মা'র চোখের শাসন যেন দেখতেই পায়নি এমনি ভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

ইতিমধ্যে মিঃ হালদারের কাশির শব্দ শোনা যায়।

বুলা সেদিকে ফিরে হেসে উঠে বলে, 'মা তুমি মিঃ হালদারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছ না! উনি neglected মানে, কী বলে অবহেলিত বোধ করতে পারেন।'

বুলাকে শাসন করা সম্বন্ধে হতাশ হয়ে হেমাঙ্গিনী অপ্রসন্ন স্বরে বলেন, 'হ্যাঁ, উনি আমাদের একজন পরিচিত,—মিঃ হালদার।'

মিঃ হালদারের পক্ষে কিন্তু ওইটুকুই যথেষ্ট, উচ্ছ্বসিতভাবে বিজয়ের করমর্দন করে তিনি বলেন, 'so glad to meet you, মানে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে অত্যন্ত খুশি।'

'জানেন বিজয়বাবু, মিঃ হালদার ইংরেজি কথা কিছুতেই বলবেন না ঠিক করেছেন।' বুলা মিঃ হালদারের পরিচয়টা স্পষ্ট করে দেন।

মিঃ হালদার একগাল হেসে বলেন, 'হ্যাঁ, আমি কী বলে ওই একটু foreign travel মানে বিদেশ ভ্রমণ করেই বাংলা ভুলে যাওয়াটা একেবারে unpardonable crime মানে, ক্ষমাহীন অপরাধ মনে করি।'

হাসাহাসির মধ্যে অণিমা ঘরে ঢোকে। দেখা যায়, মা'র কথামত পোশাক সে এখনও বদলায়নি। হেমাঙ্গিনীর কঠোর ভর্ৎসনা নেহাত বিজয় উপস্থিত বলেই জিভের আগায় এসে আটকে যায়। তিনি যথাসম্ভব নিজেকে সম্বরণ করে অণিমার পরিচয় দেন। তারপর সকলকে বসতে বলে বলেন, 'চা-টা আসছে, ততক্ষণ একটু গান-টান হতে পারে, কী বল বিজয়?'

বিজয় গোড়া থেকেই এই অপরিচিত আবেষ্টনে একটু আড়ষ্ট; নেহাত অসহায়ভাবে জানায়,—'আজ্ঞে তাই হোক না।'

হেমাঙ্গিনী উচ্ছ্বসিত স্বরে বলেন, 'তোমায় বিজয় বলছি বলে কিছু মনে করো না যেন, তুমি বলতে গেলে আমাদের ঘরের ছেলের মতো।'

বিজয় কিছু বলবার আগেই মিঃ হালদার অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ স্বরে বলে ওঠেন, 'আমায় কিন্তু হালদার বলে ডাকা আপনার অন্যায়।'

হেমাঙ্গিনী তাকে একেবারে অবজ্ঞা করে বিজয়কে বলেন, 'তুমি একটা গান গাও না বিজয়!'

'না, আমায় অনুরোধ করবেন না!'—বিজয় সলজ্জভাবে জানায়।

'আচ্ছা অণিমাই একটা ধর না।'—বললেন হেমাঙ্গিনী।

'আজকে নয় মা'—অণিমা আপত্তি করে।

কিন্তু সে আপত্তি টেঁকে না। হেমাঙ্গিনী কঠিন স্বরে বলেন, 'আজকে নয় মানে? কেন, আজকে কী দোষ হয়েছে?'

অণিমা নেহাত অনিচ্ছার সঙ্গে উঠে যায়। মিঃ হালদার তার পিছু-পিছু যাওয়ার চেষ্টা করতেই হেমাঙ্গিনী ধমক দিয়ে ওঠেন, 'আহা তুমি আবার কোথায় যাচ্ছ, হালদার?'

মিঃ হালদার থতমত খেয়ে বললেন, 'না এই পিয়ানোটা বাজাতে।'

'ও নিজে বাজিয়ে গাইতে পারবে, তুমি বস।'—হেমাঙ্গিনী ধমক দেন। মিঃ হালদার

শুকনো মুখে এসে বুলা ও লিলির মাঝে বসে পড়েন। চায়ের আয়োজন তখন এসে পড়েছে। মিঃ হালদারের প্লেটে বুলা স্তূপাকার করে কেক টোস্ট সাজাতে থাকে। মিঃ হালদার আপত্তি জানাবার চেষ্টা করলে হেসে উঠে বলে,—'ওটা consolation মানে সান্ত্বনা।'

বিজয় কলকাতায় গিয়েছে কবে! কিন্তু আজও নির্মলা তার কাছ থেকে একটি চিঠিও পায়নি। প্রতিদিন আকুল আগ্রহে রতন পিওনের ডাকবিলির সময় সে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে। প্রতিদিন হতাশভাবে তাকে ফিরতে হয় ঘরে। বিজয়ের এ ঔদাসীন্যের কোনও মানে সে খুঁজে পায় না। কোনও অপরাধ তো সে করেনি। তবে বিজয় এরই মধ্যে কি তাকে ভুলে গেল? না, সে কথা নির্মলা বিশ্বাস করতে পারে না। তাদের শেষ বিদায়ের আগেকার সেই রাতের কথা তার মনে এখনও যে উজ্জ্বল হয়ে আছে। বিজয়ের সেই আকুলতা, সেই আশ্বাস সে কি শুধু ভান? না, নির্মলা তা বিশ্বাস করতে পারে না। কিন্তু তা হলে বিজয় এমনভাবে নীরব হয়ে আছে কী করে? আশঙ্কায় দুর্ভাবনায় নির্মলার দিনরাত্রি দুর্বহ হয়ে ওঠে। ম্লানমুখে প্রতিদিন সে চিঠির আশায় দরজায় দাঁড়িয়ে থেকে যখন ফিরে আসে তখন মনে হয় পৃথিবী বুঝি অন্ধকার হয়ে গেছে।

মা কাতর ভাবে জিজ্ঞাসা করেন, 'রতন পিওন গেল না এদিক দিয়ে?'

নির্মলা কোনও জবাব দিতে পারে না।

'আজও বিজয়ের কোন চিঠিপত্র এল না?' মা উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করেন।

'না' বলে নির্মলা নিজের ঘরে বিছানায় মুখ গুঁজে উদ্যত অশ্রু দমন করবার চেষ্টা করে।

এদিকে বিজয়ও নির্মলার অদ্ভুত আচরণের কোনও কারণ খুঁজে পায় না। দিনের পর দিন এতগুলি চিঠির একটিরও উত্তর সে কি দিতে পারত না! কী তার বাধা? কী তার অসুবিধা? এতগুলি চিঠির একটিও কি সে পায়নি? এমন কথা তো বিশ্বাস করা যায় না। মাসের পর মাস কেটে যায়। বিজয় কী যে করবে কিছুই ভেবে পায় না।

শশিভূষণ সবে বুঝি নির্মলার কাছ থেকে আসা একটি চিঠি ছিঁড়ে ছেঁড়া কাগজের চুবড়িতে ফেলেছেন। বিজয় ক্লান্ত ম্লানমুখে ঘরে ঢুকে বলে, 'আজও কোন চিঠিপত্র নেই বোধহয় শশিকাকা?

'না চিঠি তো নেই কোনও!' শশিভূষণের কণ্ঠেও যেন কথাটা বেধে যায়।

বিজয় চুপ করে খানিক দাঁড়িয়ে থেকে বিষণ্ন স্বরে বলে, 'জানো কাকা, আমি ছুটিতে দেশে যেতে চেয়েছিলাম, বাবা বারণ করে চিঠি লিখেছেন; আমার দেশে যাওয়া কেন বারণ, বলতে পারো কাকা?

শশিভূষণ তার মুখের দিকে চাইতে পারেন না, বলেন, 'বোধহয় পড়াশুনার ক্ষতি হবে ভেবে...'

'কেন, দেশে কি পড়বার জায়গা নেই?'

'দেশে তো তুমি নিজেই আগে যেতে চাইতে না বিজয়?' বলেন শশিভূষণ।

বিজয়ের মনের ক্ষোভ আর চাপা থাকে না। বলে, 'কিন্তু এখন যদি দেশে যেতে চাই তবে অন্যায়টা কী হয়? আমার কি নিজের দেশে যাওয়ার অধিকারও নেই?'

শশিভূষণ একটু চুপ করে থেকে বলেন, 'অধিকারের কথা তো হচ্ছে না বিজয়। তোমার বাবা নিশ্চয় তোমার ভালোর জন্যেই... আপাতত...'

বিজয় এবার আর নিজেকে সামলাতে পারে না। উগ্রস্বরে বলে, 'হ্যাঁ, তোমরা সবাই মিলে আমার ভালোই করো শুধু। এত ভালো আর সইতে পারছি না।'

শশিভূষণ কী জবাব দেবেন ভেবে পান না।

হঠাৎ দরজায় বুলার তরল মধুর হাসির শব্দ শোনা যায়। অনিমা ও লিলির সঙ্গে ঘরে ঢুকে সে হেসে বলে, 'কেমন আমি বলেছিলাম না বিজয়দাকে বাড়িতেই পাব। যা কুনো লোক, উনি আবার কোথায় বেরুবেন।'

বিজয়ের কাছে এগিয়ে গিয়ে তার হাত ধরে সে বলে, 'নিন তাড়াতাড়ি আসুন দেখি।'

'সে কী! কোথায় যাব?' অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে বিজয়!

'বাঃ, আমরা যে picnic-এ যাচ্ছি। আপনাকে অবশ্য আগে থাকতে জানানো হয়নি? কিন্তু সেটা ইচ্ছে করে। জানলে আপনি আগে থাকতে পালাবার সুযোগ পেতেন তো?' বুলা হেসে ওঠে।

অনিমা মৃদু ভর্ৎসনা করে, '—আ বুলা।'

বুলা মুখখানা অত্যন্ত গম্ভীর করে দিদির কাছে এসে শাসনের সুরে বলে, 'দেখ দিদি, মা'র মতো কথায়-কথায় খিট-খিট করো না। তোমায় মানায় না।'

'কিন্তু ওর যদি যাওয়ার ইচ্ছে না থাকে।' অনিমা মৃদুস্বরে জানায়।

'ইচ্ছে আছে গো আছে। তোমার মতন, প্রাণ চায় চক্ষু না চায় ভাব!'—বলে বুলা হেসে ওঠে! অনিমা বুলার মুখের কাছে হার মেনে নিরুপায় হয়ে একটু সরে দাঁড়ায়।

বুলা গম্ভীরমুখে বিজয়ের দিকে ফিরে তাকে দোষ দেয়, 'দিলেন তো দিদিকে চটিয়ে?'

'আমি? কেন আমি কী করলাম?' বিজয় সঙ্কুচিতভাবে বলে।

'বাঃ! আপনি ছাড়া কে? আমরা এতগুলো মেয়ে এসে অনুরোধ করছি তার কোনও দাম নেই? জানেন, আর কেউ হলে ধন্য মনে করত। জানেন, মিঃ হালদার কখন থেকে সেজেগুজে এসে বসে আছেন, তবু তাঁকে বলতে গেলে নেমন্তন্নই করা হয়নি।'

এবার সবাই হেসে ওঠে। বুলা বিজয়কে জোর করে টানতে-টানতে বলে 'নিন চলুন আপনার কোনও আপত্তি শুনছি না।'

নির্মলাদের বাড়ির দরজায় হঠাৎ সেদিন সাড়া পড়ে গেল। জমিদার বাড়ির জমকালো পালকি সেখানে এসে থেমেছে। পালকির ভেতর থেকে নেমে আসে জমিদারের মেয়ে মাধবী। নির্মলা বাড়ির দাওয়াতেই প্রতিদিনের মতো ম্লানমুখে বসে ছিল। হঠাৎ মাধবীকে দেখে অবাক হয়ে উঠে এসে বলে, 'একী মাধবী।'

মাধবী তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'তবু ভালো। তুই চিনতে পারলি!'

তাকে সঙ্গে নিয়ে দাওয়ায় আসন পেতে বসিয়ে নির্মলা বলে, 'তুই আসবি ভাবতেই পারিনি।'

'তা তো পারবিই না, কিন্তু না এসে কী করি বল, তুই তো আর যাবি না।'

'আমি কী করে যাই বল?'—নির্মলা ম্লানমুখে বলে।

'কেন ঘোমটা দিয়ে চৌদলায় চড়ে'—মাধবী পরিহাসের সুরে কথাটা বলেই নির্মলার ম্লানমুখের দিকে চেয়ে থেমে যায়। তারপর গলার স্বর তার গাঢ় হয়ে আসে বেদনায়,—'তেমনি করে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থাই তো করেছিলাম, কিন্তু ভাগ্যে হল কই!'

নির্মলা নীরবে মুখ ফিরিয়ে থাকে।'

মাধবী আবার বলে, 'কেন যে বাবার এত জেদ বুঝি না, দাদা তো সেই থেকে আর দেশে পর্যন্ত আসে না। মা রাতদিন কাঁদাকাটা করে, বাড়িতে এমন একটা...'

'এ-সব কথা থাক মাধবী,'—শান্তস্বরে নির্মলা বাধা দেয়।

নির্মলার মুখের দিকে চেয়ে ব্যথিত স্বরে মাধবী বলে, 'না সত্যি আমারই অন্যায়।' এসব কথা বলতেও তোর কাছে আসিনি। শ্বশুরবাড়ি চলে যাচ্ছি কে জানে কতদিনের জন্যে। তার আগে তোর সঙ্গে একবার দেখা না করে যেতে পারলাম না।'

মাধবী নির্মলার মুখটি ধরে নিজের দিকে সাদরে ফেরাতে-ফেরাতে হঠাৎ চমকে উঠে সবিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। নির্মলা শক্ত হয়ে বসে থাকে কাঠের মতো।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে মাধবী ধরা গলায় বল্‌ল, 'আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না নির্মলা?'

নির্মলার চোখ দিয়ে এবার নিঃশব্দে জলের ধারা নেমে আসে, কিন্তু তবু কণ্ঠস্বর তার শান্ত। 'তুমি এসেছ ভালোই হয়েছে! সবকথা শুনে যাও। তারপর যা বিবেচনা হয় কোরো।'

ইতিমধ্যে মা সেখানে এসে পড়েন। মাধবী তাঁর পায়ের ধুলো নেওয়ার পর তিনি হেসে বলেন, 'তখন থেকে দুজনে চুপ করে বসে আছিস। তোদের কি ঝগড়া-ঝাঁটি হল নাকি?'

মাধবী জোর করে হাসবার চেষ্টা করে বলে, 'হ্যাঁ মাসিমা ভয়ানক ঝগড়াঝাঁটি! একেবারে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে যাবে। আপনি এখান থেকে যান দেখি। আমরা চুপচাপ ঝগড়াটা শেষ করে নিই।'

মা একটু স্নেহের হাসি হেসে সেখান থেকে সরে যান।

নির্মলা একে-একে সমস্ত ঘটনাই মাধবীর কাছে খুলে বলে। একটি মাত্র দরদীর কাছে এমন করে প্রাণের কথা খুলে বলতে পাওয়া যেন তার কাছে একটা সৌভাগ্য। মাধবী সমস্ত শুনে অনেকক্ষণ গুম হয়ে চুপ করে থাকে। তারপর কাতর স্বরে বলে, 'আমি তো সবই বুঝলাম। কাল শ্বশুরবাড়ি চলে যাচ্ছি, সেখানে বা এখানে ঘুণাক্ষরেও কেউ আমার কাছ থেকে একথা জানতে পারবে না। তবু গাঁয়ে বেশিদিন কি একথা লুকিয়ে রাখা চলবে? কেউ কি এখনও কিছু সন্দেহ করেনি?'

'হয়তো করেছে!'—উদাসভাবে বলে নির্মলা।

'সব বুঝেও কিছুই আমার ক্ষমতা নেই,—এই আমার সবচেয়ে দুঃখ। না আমি যাই,'—বলে চোখের জল মুছে হঠাৎ মাধবী উঠে চলে যায়।

নির্মলা তাকে পালকি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে যেতেও যেন পায়ের জোর পায় না। স্থাণুর মতো সেইখানেই উদাসভাবে বসে থাকে।

গ্রামের লোকের সন্দেহ করার কথাটা নেহাত অমূলক কল্পনা নয়।

পুকুরঘাটে পাড়ার মেয়েদের ঘোঁট ইতিমধ্যে পাকাতে শুরু করেছে দেখা যায়। স্নান করতে-করতে একটি মেয়েকে সঙ্গীর সঙ্গে আলাপ করতে শোনা যায়।

'হ্যাঁ লো হ্যাঁ, আমরা তো আর ঘাসে মুখ দিয়ে চরি না। তুই-ই বল না, এই ক'মাস তাকে পুকুরঘাটে দেখেছিস কোনওদিন?'

যাকে প্রশ্নটা করা হয়, সে বিস্ময়ের ভান করে বলে, 'তা দেখিনি বটে, কিন্তু তলে-তলে এত কাণ্ড তা কী করে জানব বল?'

এক গাদা বাসন নিয়ে এসে ঘাটের ওপর সশব্দে নামিয়ে নতুন আগন্তুক একটি বর্ষিয়সী মহিলা বলেন, 'তলে-তলে কি কাণ্ড লা মালতী?'

'না, না, ও কিছু না লক্ষ্মীদি!'—বলে মালতী।

মালতীর সখি প্রতিবাদ করে, 'আহা বলই না লক্ষ্মীদিকে। বলতে ভয়টা কীসের? আমরা তো কারুর চালায় ঘর বেঁধে থাকি না।'

তারপর সে বেশ রসাল স্বরে বলে, 'ব্যাপারটা আর কী বলব লক্ষ্মীদি। খবর তো আর কিছু রাখো না? তোমাদের পাড়ায় অমন একটা বিয়ে হয়ে গেল।'

'কার আবার বিয়ে হল পাড়ায়?'—চতুর্থ মহিলার এবার আবির্ভাব হয়।

মালতী এবার নিজেই সোৎসাহে জানায়, 'হয়েছে গো রামের মা, হয়েছে, অত ধূমধাম যজ্ঞি কিছু টের পেলে না। তোমরা তা হলে কানে তুলো দিয়েছিলে বোধহয়।

বর্ষিয়সী মহিলা এবার সবিস্ময়ে বলেন, 'লক্ষ্মীর যেমন কথা। আমরা কানে তুলো দিয়ে থাকি! বলে পাড়ার কেউ কুটোটি নাড়লে আমরা টের পাই। একটা বিয়ে এমনি হয়ে গেলেই হল?'

মালতী বলে, 'বিয়ে না হলে কেউ কখনও মাথায় সিঁদুর দেয় শুনেছ।'

এবার পর-পর মন্তব্য হয়—

'ওমা সে আবার কী কথা!'

'সেই তো কথা!'

'বলিস কী লা, কী ঘেন্না—কী ঘেন্না।'

'ছিঃ-ছিঃ গলায় দড়ি জোটে না মা।'

বর্ষিয়সী মহিলা এবার আসল কথা পাড়েন, 'তা কাক পক্ষী টের পেল না? বিয়েটা হল কার সঙ্গে? বর কী হাওয়ায় এল হাওয়ায় গেল নাকি?'

একজন প্রস্তাব করে, 'চল না সেটা জিজ্ঞেস করেই আসি। খুব রগড় হবে কিন্তু।'

এ প্রস্তাবে সকলেরই সায় আছে দেখা যায়।

মানুষের মধ্যে কোথায় বুঝি নিষ্ঠুরতার চিরন্তন বীজ আছে। দুর্বল অসহায়কে উৎপীড়ন করায় তার অহেতুক আনন্দ! পাড়ার মেয়েরা পুকুরঘাট থেকে সদলবলে সত্যিই নির্মলাদের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়। একজন ডাক দেন, 'কোথায় গো নির্মলার মা! নির্মলার মা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে এতগুলি প্রতিবেশিনীকে একত্রে দেখে কী যেন অজানা আশঙ্কায় শিউরে ওঠেন। মেয়েদের একজন ব্যঙ্গ করে বলে, 'অনেকদিন দেখা-শোনা নেই তাই একবার দেখতে এলাম গো, সব ভালো তো?'

নির্মলার মা সঙ্কুচিতভাবে বলেন, 'হ্যাঁ, সব ভালো।'

'কই নির্মলা গেল কোথায়? কতদিন তাকে দেখিনি।'

মা আরও সঙ্কুচিত হয়ে উঠে কাতরভাবে বলেন, 'তার শরীরটা খুব খারাপ কিনা।'

'ও শরীর খারাপ বুঝি! তাই বলি নির্মলাকে পাড়ায় দেখতে পাই না কেন?' নিষ্ঠুরভাবে একজন পরিহাস করে।

আর একজন তারই সঙ্গে ফোড়ন দিয়ে বলে, 'কতদিন শরীর খারাপ গা?' সবাই হেসে ওঠে।

মালতী বুঝি সবার অগ্রণী। সে বলে, 'শরীর খারাপ বলেই তো দেখতে আসা। কী বল গো?'

'তাছাড়া আর কী? আর শরীর খারাপের ওষুধপত্তরও তো আছে।'

মা'র চোখ এবার বেদনায়-অপমানে অশ্রুসজল হয়ে আসে—কাতরভাবে মিনতি করে বলেন, 'আমরা তোমাদের কাছে কোনও অপরাধ তো করিনি, কেন তোমরা আমাদের নিয়ে তামাসা করতে এসেছ।'

সকলে যেন আকাশ থেকে পড়ে বলে, 'তামাসা, ওমা! আমরা তামাসা আবার কোথায় করলাম! নির্মলাকে অনেকদিন দেখিনি তাই...।'

নির্মলা অনেকক্ষণ ঘরের ভেতর থেকে এদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ নীরবে শুনেছে, এবার আর সে বসে থাকতে পারে না। ধীর অবিচলিত ভাবে বাইরে এসে দাঁড়িয়ে কঠিন স্বরে বলে, 'এই আমি এসেছি।'

প্রথমটা সবাই তার মুখের দিকে চেয়ে তার দৃপ্ত কঠিন ভঙ্গিতে একটু বুঝি বিব্রতবোধ করে। তারপর সে অস্বস্তি সামলে উঠতে দেরি হয় না। একজন বলে, 'নাও দেখা হল তো? তোমরা নিশ্চয়ই ভেবে সারা হচ্ছিলে।'

মালতী তার কাছে এগিয়ে গিয়ে বলে, 'সত্যি ভাই নির্মলা, অনেকদিন তোকে না দেখে এমন ভাবনা হয়েছিল।'

তারপর হঠাৎ নির্মলার মাথাটা ধরে সকলের দিকে ঘুরিয়ে সে পরম উল্লাসে বলে, 'দেখো গো যা বলেছিলাম ঠিক কিনা?'

'ওমা, তাই তো সত্যিই!'

'সিঁথিতে সিঁদুর যে!'

'কবে বিয়ে হল গো নির্মলার মা?'

'পাড়া-পড়শী আমরা, আমাদের একটা খবর দিলে না?'

নির্মলা ঠিক প্রস্তর মূর্তির মতোই দাঁড়িয়ে থাকে। মা'র চোখ জলে ভরে ওঠে, কিন্তু তার চোখে শুধু যেন আগুন।

আগন্তুকেরা এবার আর দাঁড়াতে যেন ভয় পায়। চলে যেতে-যেতে একজন শুধু টিপ্পনি করে বলে, 'চল গো চল, বিয়েতে না করুক, নির্মলার মা নাতির ভাতে নেমন্তন্ন করবেখন।'

সবাই চলে যাওয়ার পর মা-ই প্রথম একেবারে ভেঙে পড়েন। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন 'এ যে আর সহ্য হয় না মা, কী জন্যে এত লাঞ্ছনা তোকে সইতে হবে?'

নির্মলা মা'র দিকে ফিরে তাকায়, জীবনের অসীম অতল হতাশা এর চেয়ে গভীরভাবে মানুষের দৃষ্টিতে বুঝি ফুটে উঠতে পারে না। অত্যন্ত অস্ফুট গলায় সে বলে, 'এর চেয়ে আরও লাঞ্ছনা যে বাকি আছে মা'—তারপর আর দাঁড়াতে না পেরে দাওয়ার ধারে বসে পড়ে।

মা নির্মলার গলার স্বরে হঠাৎ অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। ব্যাকুলভাবে তার কাছে গিয়ে বসে তাকে দুহাতে জড়িয়ে সভয়ে প্রশ্ন করেন,—'আরও?'

এতক্ষণ বাদে নির্মলার সমস্ত আত্মসম্বরণের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। মায়ের কোলের ওপর মুখ গুঁজে পড়ে সে কেঁদে ফেলে, 'হ্যাঁ মা আরও। এখনও কেউ কিছুই জানে না মা, তোমাকেও সাহস করে বলিনি...'

অশ্রুর উচ্ছ্বাসে কথা আর শেষ করতে পারে না। মা'র মুখ দিয়ে অস্ফুট আর্তনাদের মতো শুধু বার হয়,—'নির্মলা।'

যে সম্ভাবনার কথা তাঁর কল্পনাতেও স্থান পায়নি তারই আকস্মিক নিদারুণ উপলব্ধিতে তিনি একেবারে বিমূঢ় হয়ে যান।

মা'র কোল থেকে অশ্রুপ্লাবিত মুখ তুলে নির্মলা শুধু একবার আহত পাখির মতো কাতরভাবে মা'র দিকে তাকিয়ে আবার মা'র কোলে লুটিয়ে পড়ে। স্তব্ধ স্তম্ভিত পাথরের মূর্তির মতো মা ও মেয়ে অনেকক্ষণ সেইখানেই নিঃশব্দে বসে থাকে। পরস্পরকে কোনও কিছু বলবার ভাষা আর তাঁদের নেই।

কিন্তু এমন সর্বনাশের মুখে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকাও সম্ভব নয়। নির্মলার মা পরের দিন সকালেই উমানাথকে সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়ে বলেন, 'না তোমাকে যেতেই হবে। বুঝতে পারছ না কী সর্বনাশ তা হলে হবে। আর কি আমাদের লজ্জা সঙ্কোচের সময় আছে। আমাদের মান-সম্ভ্রম, মেয়েটার জীবন পর্যন্ত যে যেতে বসেছে।'

নিরীহ ভালোমানুষ উমানাথ এই বিপদে আরও যেন বিমূঢ় হয়ে পড়েন। আচ্ছন্নের মতো তিনি বলেন, 'আমি যাচ্ছি। কিন্তু জমিদারকে তুমি চেন না। একবার তাঁর কথা রাখিনি। তিনি যে আর কোনও অনুনয় বিনয়ে গলবেন, তা তো মনে হয় না।'

নির্মলার মা কাতরভাবে বলেন, 'কেন তিনি কি মানুষ নয়, তাঁর কি হৃদয় পাষাণ? তাঁর নিজের রক্ত যেখানে বইছে সেখানেও কি তাঁর একটু মমতা হবে না। একটা নিরীহ নিরপরাধ মেয়েকে এত বড় কলঙ্কের মধ্যে তিনি ঠেলে দেবেন। এমন করে আমাদের সর্বনাশ করে তাঁর কী লাভ হবে।'

উমানাথের আশঙ্কাই কিন্তু সত্য, চৌধুরীমশাই তাঁকে রীতিমতো অপমান করেই বলেন, 'আজ আমার কাছে কী জন্যে এসেছেন পুরুতমশাই? আপনার মেয়েকে কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচাতে? তার জন্য আমার কী দায় বলতে পারেন? একদিন আপনার মেয়ের বিয়েতে আমি সাহায্য করতে চেয়েছিলাম। সে সাহায্য আপনি নেননি। ব্যস আমাদের সকল সম্পর্ক চুকে গেছে।'

উমানাথ কাতরভাবে বলতে যান, 'কিন্তু সে তো আপনারই পুত্রবধূ।'

জমিদারমশাই তাঁকে সরোষে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ করে বলেন, 'আমার পুত্রবধূ! বিয়ের সময় আমাকে সাক্ষী রেখে বিয়ে দিয়েছিলেন বোধহয়।'

উমানাথ তবু মিনতি করেন, 'আপনাকে সবই তো বললাম! তখন নিরুপায় হয়ে যে কাজ করেছি তার জন্য আমায় যে শাস্তি দিতে হয় দিন। কিন্তু এই একটা নির্দোষ মেয়ের এমন সর্বনাশ হতে দেবেন না।'

'নির্দোষ হলে তার সর্বনাশ হবে কেন?'—জমিদারের কণ্ঠে কঠিন ঔদাসীন্য।

'কেন হবে, তা আপনাকে আর কী বোঝাব? আপনি যদি তাকে পুত্রবধূ বলে স্বীকার না করেন, তাহলে কী কলঙ্ক তার নামে গ্রামে রটবে তা কি আপনি বোঝেন না?'

উমানাথের কাতর আবেদনে কিন্তু কোনও ফলই হয় না। চৌধুরীমশাই নিষ্ঠুরভাবে বলেন, 'বুঝি আমি সব পুরুতমশাই। কিন্তু আপনার মেয়ে কার সঙ্গে ভ্রষ্টা হয়ে নিজের সর্বনাশ বাধিয়েছে বলে, আমি তাকে পুত্রবধূ বলে স্বীকার করে নেব এ-কথা ভাববার স্পর্ধা আপনার কী করে হল?'

বজ্রাঘাতের মতো নিস্তব্ধ উমানাথের মুখ দিয়ে খানিকক্ষণ কোনও কথাই বার হয় না, তারপর তিনি অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, 'আপনি কী বলছেন? আপনি তা হলে কোনও কথাই বিশ্বাস করেন না? বিজয়ের সঙ্গে নির্মলার যে সত্যি বিয়ে হয়েছে তাও কি আপনি

অবিশ্বাস করেন?'

'নিশ্চয়ই অবিশ্বাস করি।' চৌধুরীমশাই বজ্রগম্ভীর স্বরে জানান, 'আমার অজান্তে এই গ্রামের মধ্যে আমার ছেলের সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে হয়েছে এই কথা আপনি আমায় বিশ্বাস করতে বলেন? আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি পুরুতমশাই। আপনার মেয়ের কলঙ্কের সঙ্গে আমার ছেলের নাম আপনি জড়াতে চেষ্টা করবেন না। তাহলে গ্রামে বাস করা আপনার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠবে।'

উমানাথ কী যেন বলবার চেষ্টা করেন। দুবার তাঁর মুখ দিয়ে অস্ফুট একটা শব্দ ছাড়া আর কোনও কথা কিন্তু বার হয় না। হতাশভাবে চৌধুরীমশাই-এর মুখের দিকে খানিক তাকিয়ে আচ্ছন্নের মতো তিনি ধীরে-ধীরে বেরিয়ে যান।

মেয়েদের মুখ থেকে পুরুষদের ভেতর কথাটা রটতে তখন আর বাকি নেই। উমানাথের বাড়িতে ঢোকবার পথে তখন গ্রামের মাতব্বরদের জটলা শুরু হয়ে গেছে। বেণীখুড়ো, গণেশ ইত্যাদি মিলে একপালা আলোচনা শেষ করবার পর আচার্যিমশাই এসে যোগ দিয়েছেন।

বেণীখুড়ো আচার্যিমশাইকে সোল্লাসে জিজ্ঞাসা করে, 'শুনেছেন তো আচার্যিমশাই, শুনেছেন তো সব?'

আচার্যিমশাই পরম বিজ্ঞের মতো সর্বজ্ঞতার বাহাদুরি দেখিয়ে বলেন 'শুনব আবার কী হে? আমায় শুনতে হয় না, রাম না হতে রামায়ণ আমি আগেই অনুমান করিতে পারি।'

'ভেবেছিল সিঁথিতে সিঁদুর দিলেই আমাদের চোখে ধুলো দেবে।'—বেণীখুড়ো হেসে ওঠেন।

গণেশ উপমা প্রয়োগ করে, 'হ্যাঁ তেল দাও সিঁদুর দাও ভবি ভোলবার নয়।'

'কিন্তু আমরা থাকতে গ্রামে এমন অনাচার কিছুতেই হতে দেব না, এর একটা বিহিত করা চাই'—আচার্যিমশাইয়ের কথা শেষ হওয়ার আগেই দেখা যায় উমানাথ সেই দিকে আসছেন। 'চুপ-চুপ পুরুতমশাই আসছেন,'—বলে সবাই আসন্ন উপাদেয় ঘটনাটির জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ায়।

উমানাথ আচ্ছন্নের মতোই পথ দিয়ে হাঁটছিলেন। হঠাৎ আচার্যিমশাইয়ের ডাকে তিনি চমকে ফিরে তাকান। আচার্যিমশাই হেসে বলেন,—'বলি ব্যস্ততা কীসের? আমাদের প্রতি যে দৃষ্টিপাতই করছেন না।'

উমানাথ বিমূঢ়ভাবে জিজ্ঞাসা করেন,—'আমায় কিছু বলছেন?'

সকলে এবার তাঁকে ঘিরে ধরে। আচার্যিমশাই বলেন,—'হ্যাঁ বলছি, এত ব্যস্ত কেন? বাড়িতে জামাই আসবে নাকি?'

'জামাই?'—উমানাথ বিমূঢ়ভাবে তাঁদের দিকে তাকান।

বেণীখুড়ো নির্মম বিদ্রুপের সুরে বলেন, 'হ্যাঁ জামাই! মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন, জামাই বোঝেন না?'

আচার্যিমশাই ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলেন, 'কন্যার বিবাহে আজকাল আর জামাইয়ের দরকার হয় না হে, কী বলেন পুরুতমশাই, সিঁথিতে সিঁদুর দিলেই সব শুদ্ধ।'

এসব কথার উত্তর দেওয়ার মতো মনের অবস্থা তখন উমানাথের নয়। করুণ অসহায়ভাবে তাদের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে তিনি নীরবে চলে যাওয়ার চেষ্টা করেন।

কিন্তু তারা তাঁকে সেটুকু অনুগ্রহ করতে প্রস্তুত নয়।

আচার্যিমশাই তাঁর পথ আটকে সরোষে বলেন, 'কিন্তু যা ভেবেছেন পুরুতমশাই, তা হবে না। গ্রামের বুকের ওপর যা খুশি অনাচার আপনি করবেন, আর আমরা তাই চোখ বুঁজে সহ্য করব? তা ভাববেন না। কার সঙ্গে কোথায় আপনার কন্যার বিবাহ হয়েছে আমরা সমস্ত জানতে চাই।'

গণেশ উপমা প্রয়োগের এ সুযোগ অবহেলা করে না, বলে 'নিশ্চয়ই চাই, বিয়ে বললেই বিয়ে হল কিনা? বেল পাকলে কাকের কী?'

'আঃ, তুমি কী যে বকো গণেশ!'—আচার্যিমশাইকে ধমক দিতে হয়। তারপর উমানাথকে তিনি বলেন, 'শুনুন পুরুতমশাই, এই গ্রামের পাঁচজন মাতব্বর এখানে উপস্থিত, আপনার কন্যার বিবাহের রহস্য এইখানেই আমরা শুনতে চাই, কী বলেন আপনারা?'

'নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই!'—সকলেরই এ-বিষয়ে সায় আছে দেখা যায়।

উমানাথ কাতরভাবে মিনতি করেন, 'আপনারা মাপ করুন আমাকে, কোনও কথা বলবার মতো মনের অবস্থা আমার নয়। দোহাই আমায় ছেড়ে দিন।'

এ কাতর মিনতিতে বুঝি পাষাণও গলে যায়। কিন্তু সমাজের যারা রক্ষক তাঁদের অত কোমল হলে কি চলে। গণেশলাল তাদের সকলের হয়ে রুখে উঠে বলে, 'ছেড়ে দেব মানে, আপনার মেয়ে গ্রামের সকলের মুখ পুড়িয়ে দিয়ে যাবে, আর আমরা চুপ করে থাকব ভেবেছেন।'

একটি লোক কিছুক্ষণ আগে থেকে এই ভিড়ের বাইরে দাঁড়িয়ে সমস্ত ব্যাপারটা শুনছিল। চেহারা দেখলে তাকে ভবঘুরে বলে মনে হয়। মুখে একমুখ দাড়ি। পরনে নোংরা ছেঁড়া পোশাক। লোকটি এইবার ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে বলে, 'চুপ করে তো থাকবে না, কিন্তু কী করবে বলতে পারো?'

খানিকক্ষণ সবাই তার দিকে চেয়ে হতভম্ব হয়ে থাকে। তারপর আচার্যিমশাই প্রথম বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে বলেন, 'আরে আমাদের পরিতোষ যে, কত কাল তোমায় দেখিনি, কোথায় গিয়েছিল বল তো?'

পরিতোষ কঠিন স্বরে বলে,—'গিয়েছিলুম জেলে এবং আপনাদের সকলের মাথাগুলো ফাটিয়ে এখন একবার ফাঁসি যাওয়ার ইচ্ছে আছে।'

নিজের অজান্তেই সকলে কেমন সঙ্কুচিত হয়ে সরে দাঁড়ায়।

পরিতোষ উমানাথের হাত ধরে বলে,—'চল উমাখুড়ো। এই ছুঁচোগুলোর গন্ধে এখানে টেঁকা যাচ্ছে না।'

শিকার একেবারে হাতছাড়া হয় দেখে আচার্যিমশাই শেষ চেষ্টা করে বলেন, 'তুমি সব কথা এখনও জানো না পরিতোষ!'

পরিতোষ ফিরে দাঁড়িয়ে বজ্রকঠিন স্বরে বলে, 'সব কথা জানলে হয়তো নিজেকে সামলাতে পারব না আচার্যিমশাই। তার চেয়ে ভালোয়-ভালোয় সব সরে পড়ুন।'

সবাই সভয়ে পিছিয়ে যায় এবং পরিতোষ উমানাথকে নিয়ে বাড়ির ভেতর চলে যাওয়ার পর আচার্যিমশাই ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলেন, 'ওই আকাঠ গোঁয়ারটাই সব নষ্টের মূল।'

গণেশের এবার আস্ফালন শুরু হয়, 'আপনারা সবাই আমায় ধরে ফেললেন, নইলে দিচ্ছিলাম আমি একটি রদ্দায় ঠান্ডা করে। একেবারে সাপের পাঁচ-পা দেখিয়ে ছেড়ে দিতাম।'

আচার্যিমশাই এবার কিন্তু চটে যান, 'তুমি থামো গণেশ। কে আবার তোমায় ধরলে?'

গণেশলাল কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে বলে, 'ওই মানে—ধরতে যাচ্ছিলেন তো!'

নির্মলাদের বাড়িতে বসে পরিতোষ একে-একে সব কথাই শোনে। বহুদিন দেশের কাজেই সে গ্রাম ছাড়া। এত ব্যাপার যে সেখানে হয়ে গেছে তার কোনও খোঁজই সে রাখে না। সমস্ত ব্যাপার শুনে সত্যি অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে সে বলে, 'এ যে আমি বিশ্বাস করতে পাচ্ছি না মাসিমা। জমিদার মশাইয়ের এ ব্যবহারের মানে আমি বুঝি, কিন্তু—কিন্তু বিজয় তো সেরকম ছেলে নয়।' নির্মলার দিকে ফিরে সে জিজ্ঞাসা করে, 'একটা চিঠির উত্তরও সে দেয়নি?'

নির্মলার কাছ থেকে কোনও জবাবই আসে না। বহুক্ষণ আগে থেকে কঠিন মুখে নিস্তব্ধ হয়ে সে দূরের একটি চালার খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গ্রামের মাতব্বরদের কাছে তার কলঙ্কের কথা নিয়ে বাবার লাঞ্ছনা সবই বোধ হয় সে শুনেছে। কিন্তু তার মুখে বেদনার কোনও ছাপ যেন আর নেই। কোনও ভয়ঙ্কর সঙ্কল্পের দৃঢ়তায় সে মুখ প্রচণ্ড ঝড়ের আগের আকাশের মতো গম্ভীর ও ভয়ঙ্কর।

নির্মলার হয়ে তার মা-ই জবাব দেন, 'না বাবা, গিয়ে অবধি কোনও চিঠি সে দেয়নি। ছুটিতে দেশেও আসেনি।'

'আশ্চর্য! আমি এর মানেও বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে সব বোধহয় আমার দোষ।' পরিতোষ অত্যন্ত অনুতপ্তভাবে বলে।

উমানাথ ব্যথিত স্বরে বলেন, 'তোমার কী দোষ বাবা, আমরা সবাই সরল বিশ্বাসেই এ কাজ করেছিলাম।'

'কিন্তু আমি এতদিন বাইরে না থাকলে এত সব কিছুই ঘটতে পারত না।' পরিতোষের স্বরে গভীর অনুশোচনা ফুটে ওঠে। 'তোমাদের এমন সর্বনাশ হচ্ছে জানলে দেশোদ্ধারের জন্যেও আমি জেলে যেতে পারতাম না।'

উমানাথ অসহায়ভাবে বলেন, 'সবই অদৃষ্ট।'

পরিতোষ কিন্তু এবার উষ্ণ হয়ে ওঠে,—'অদৃষ্ট বলে হাল ছাড়তে আমি রাজি নই উমাখুড়ো। আমি আজ রাত্রেই কলকাতায় যাচ্ছি। সেখানে বিজয়কে আমি সামনা-সামনি সব জিজ্ঞাসা করতে চাই।'

পরিতোষ সেখান থেকে উঠে এসে চলে যেতে-যেতে একবার নির্মলার কাছে দাঁড়ায়, কিন্তু বলবার কোনও কথা খুঁজে না পেয়েই বোধহয় নীরবে আবার চলে যায়।

বাড়ির বাইরে চলে আসবার পর হঠাৎ পিছন থেকে সে নির্মলার ডাক শুনতে পায়,—'পরিতোষদা।'

পরিতোষ দাঁড়িয়ে পড়ে। নির্মলা কাছে এসে দৃঢ় স্বরে বলে, 'তোমায় কলকাতায় যেতে হবে না।'

'কেন রে? হল কী?'—পরিতোষ সস্নেহে জিজ্ঞাসা করে।

'না পরিতোষদা, আমার জন্যে আর তোমাদের কোন দুঃখ পেতে হবে না।'—নির্মলার স্বর কঠিন।

'আচ্ছা, আচ্ছা সেসব আমি বুঝবখন।' পরিতোষ সুরটা হালকা করবার চেষ্টা করে।

নির্মলা কিন্তু তীব্রস্বরে বলে, 'আমি বলছি তোমার কোথাও যাওয়ার দরকার হবে না—সব সমস্যার মীমাংসা আমি নিজেই করব।'

শেষ কথাগুলো বলবার সময় কিন্তু কোথা থেকে অশ্রুর বন্যা এসে তার সমস্ত অটলতা ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে অশ্রু গোপন করবার চেষ্টায় সে সেখান থেকে চলে যায়। পরিতোষ বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

অন্ধকার রাত। স্টেশনে যাওয়ার পথে নির্মলাদের বাড়ি একবার হয়ে যাওয়ার জন্যে পরিতোষ সেই দিকেই যাচ্ছিল। হঠাৎ পাশের পুকুরের জলে কী একটা শব্দ পেয়ে সে থমকে দাঁড়াল।

ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক, তবু প্রথমটা তেমন কিছু সন্দেহ তার হয়নি। কিন্তু হঠাৎ সকাল বেলার সমস্ত কথা মনে পড়তেই সে শিউরে উঠে পুকুরের ধারে ছুটে গেল। অন্ধকারে বিশেষ কিছুই দেখা যায় না। তবু অস্পষ্ট একটি নারীমূর্তি মনে হল যেন গভীর জলের দিকে নেমে যাচ্ছে। পরিতোষ সশঙ্ক ব্যাকুল স্বরে ডাকলে,—'নির্মলা।'

নারীমূর্তি যেন চমকে ফিরে তাকাল। এবার একেবারে নিঃসন্দেহ হয়ে পরিতোষ ব্যাকুল ভাবে আবার ডাকলে,—'কী হচ্ছে নির্মলা, এত রাত্রে তুমি এখানে কেন?'

নারীমূর্তি তবু নড়ে না দেখে সে নিজেই জলে খানিকটা নেমে গিয়ে বললে,—'উঠে এস নির্মলা! শোন, শোন, কী করছ তুমি পাগলের মতো?'

ধীরে-ধীরে নির্মলা এবার তার দিকে এগিয়ে এল। তারপর হাতের ঘড়াটা পাড়ের ধারে রেখে প্রায় হিংস্রভাবে বললে, 'পাগলের মতোই যদি করি! —মানুষের কি কখনও পাগল হওয়ার অধিকারও নেই? কেন তুমি বাধা দিলে? আমায় মরেও কি তোমরা শান্তি পেতে দেবে না?'

পরিতোষ নির্মলার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে স্নিগ্ধ সহানুভূতির স্বরে বললে, 'আমি বাধা দিইনি নির্মলা, তোমার নিয়তিই বাধা দিয়েছে। নইলে ঠিক এমনি সময় স্টেশনে যাওয়ার পথে তোমাদের বাড়ি আসার কথা আমার মনে হতো না—তোমায় আমি দেখতেও পেতাম না। কিন্তু ছিঃ ছিঃ তুমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলে কেন নির্মলা?'

'কেন যাচ্ছিলাম?' নির্মলার স্বরে এখনও তিক্ততা।—'আমি মরলেই সব সমস্যাব মীমাংসা হয়ে যাবে বলে। বাবা মা'র লাঞ্ছনা, তোমাদের দুর্ভাবনা সব শেষ হয়ে যাবে।'

পরিতোষ শান্তস্বরে বললে, 'কিন্তু এখনও এত হতাশ হওয়ার তো কিছু হয়নি নির্মলা। আমি তো কলকাতায় বিজয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। আমি আগে ফিরে আসি...'

নির্মলা পরিতোষকে বাধা দিয়ে বললে, 'কিন্তু আর যে আমার একদিনও এ গ্লানি সহ্য করবার ক্ষমতা নেই পরিতোষদা। আমার জন্যেই বাবা-মা'র এই লাঞ্ছনা। কাল সকালেও যে তাঁদের কাছে মুখ দেখাতে আমি পারব না, কিছুতেই পারব না। আমার আত্মহত্যা ছাড়া আর কোনও পথ নেই।'

নির্মলার গলার স্বরে এবার অসহায় হতাশা। পরিতোষও সে স্বরে কাতর হয়ে বললে, 'না, না নির্মলা এমন অবুঝ হয়ো না, অকারণ নিন্দা গ্লানি মানুষের জীবনে আসে...।'

'না পরিতোষদা', নির্মলা ব্যাকুল স্বরে বলে উঠল, 'ও-সব কথা আমি জানি, কিন্তু তবু আমি আর সইতে পারছি না। তার চেয়ে তুমি আমায় তোমার সঙ্গে কলকাতায় নিয়ে যাও। আমি তাঁর সামনে গিয়েই একবার দাঁড়াতে চাই।'

'তা কী করে হয় নির্মলা!'—পরিতোষ ব্যথিত স্বরে বললে।

'কেন হয় না পরিতোষদা? এখানে আমায় মরতে দিতে যদি না চাও—তা হলে

একবার শেষ সুযোগ দাও তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করবার।'—নির্মলা ব্যাকুলভাবে মিনতি জানালে, 'আমার যা জিজ্ঞাসা করবার আমি নিজেই তাঁকে জিজ্ঞাসা করব।'

পরিতোষ তবু ইতস্তত করে কী বলতে যাচ্ছিল, '—কিন্তু নির্মলা—'

নির্মলা দৃঢ়স্বরে বললে, 'কোনও কিন্তু আর এতে নেই। নিন্দে গ্লানির কথা ভাবছ? যা হয়েছে তার চেয়ে আর কি বেশি হবে বলতে পারো? না পরিতোষদা, আমায় সঙ্গে যদি না নিয়ে যাও তাহলে এখানে এসে আর আমায় দেখতে পাবে না। এখানে মুখ দেখাতে আর আমি পারব না।'

পরিতোষ অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। এত বড় সমস্যার এক মুহূর্তে কি মীমাংসা করা যায়! তারপর নিরুপায় হয়ে অন্য কোনও পথ না দেখতে পেয়েই বললে, 'বেশ চল্ তা হলে। তোদের একসঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে আমার দায়িত্ব অন্তত শেষ হোক।'

পরিতোষ অতি বড় দুঃসাহসে সমস্ত দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে নিয়ে শুধু এই আশাতেই নির্মলাকে কলকাতায় সঙ্গে নিয়ে যেতে রাজি হয়েছিল যে, বিজয়ের সঙ্গে একবার নির্মলার দেখা করিয়ে দিতে পারলে সমস্ত সমস্যার সহজ মীমাংসা হয়ে যাবে। নির্মলার যেরকম মনের অবস্থা তাতে গ্রামে তাকে রেখে আসা সত্যি সে নিরাপদও বোধ করেনি।

কিন্তু ভাগ্য যখন বিরোধী হয় তখন সামান্য একটু অপ্রত্যাশিত ঘটনার চড়ায় মানুষের সমস্ত আশা চুরমার হয়ে যায়।

একটি ছ্যাকড়া গাড়িতে নির্মলাকে সঙ্গে করে সে বিজয়ের কলকাতার বাসায় এসেছিল। নির্মলাকে গাড়িতে বসিয়ে সে বিজয়ের খোঁজ করতে গেল ভেতরে, যাওয়ার সময় বলে গেল, 'তুমি একটু অপেক্ষা কর নির্মলা। বিজয়ের সঙ্গে আমি আগে দেখা করে আসি। এতদিন এমন উদাসীন হয়ে থাকার কী কৈফিয়ৎ সে দেয় তা তো শোনা দরকার।'

বিজয়ের বাসার বাইরে বাগানে একজন মালী ফুলেব গাছে জল দিচ্ছিল। তাকে ডেকে পরিতোষ বললে, 'ওহে ভেতরে গিয়ে বিজয়বাবুকে একবার খবর দাও তো, বল দেশ থেকে...'

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই মালী জানালে, 'আজ্ঞে বাবু তো এখানে নেই। বাইরে হাওয়া খেতে গেছেন!'

পরিতোষের মনে এ সম্ভাবনার কথা একবারও উদয় হয়নি। স্তম্ভিত হয়ে সে বললে, 'হাওয়া খেতে গেছেন!'

পরিতোষের অবস্থা দেখে মালীরও বুঝি একটু সহানুভূতি হল। সে বিস্তারিতভাবে জানালে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, বাবুর বন্ধুদের বাড়ির সবাই গেলেন কিনা। তাঁরও ছুটি ছিল বলে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন।'

একটু চুপ করে থেকে পরিতোষ জিজ্ঞেস করলে, 'কোথায় গেছেন তা জানো না বোধ হয়।'

'আজ্ঞে না,—সরকারমশাই থাকলে বলতে পারতেন, তিনিও এখানে নেই।'

পরিতোষ হতাশ মুখে গাড়ির কাছে ফিরে এল। তাকে আসতে দেখে নির্মলা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে, 'আমি এবার নামব পরিতোষদা?'

পরিতোষ যথাসম্ভব হালকা করে বলবার চেষ্টা করলে, 'না রে এখন নামা হবে না।'

নির্মলার মুখ কিন্তু শুকিয়ে গেল। পরিতোষের মুখের দিকে চেয়ে গাঢ় বেদনার স্বরে সে বললে, 'তিনি বুঝি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চান না পরিতোষদা।'

পরিতোষ জোর করে হেসে উঠে বললে, 'তুই পাগল হয়েছিস! সে এখানে থেকেও আমাদের সঙ্গে দেখা করবে না তা কি হতে পারে। ছুটিতে দুদিন কোথায় বেড়াতে গেছে। ফিরে এলেই দেখা হবে।'

নির্মলা ক্লান্ত বিষণ্ণ সুরে বললে, 'কিন্তু আমরা এতদিন কী করব পরিতোষদা? গ্রামে তো আর ফিরে যেতে পারব না।'

'না-রে, না, গ্রামে ফিরতে হবে না। কটা দিন বইতো নয়। এইখানেই কোথাও কাটিয়ে দেবখন।' পরিতোষ এমন ভাব দেখালে যেন ব্যাপারটা মোটেই গুরুতর নয়।

কিন্তু নির্মলা অত সহজে প্রবোধ মানতে আর পারলে না। হতাশ স্বরে বললে, 'তোমায় আর কত কষ্ট দেব পরিতোষদা। আমার জন্য আর কত দুঃখ লাঞ্ছনা তুমি সইবে। তার চেয়ে তুমি কোনও আশ্রমে-টাশ্রমে আমায় রেখে চলে যাও...'

পরিতোষ হেসে উঠল, 'থাক ঢের হয়েছে। আমার জন্যে আর অত ভাবতে হবে না। এখন চ দেখি, একটা আস্তানা খুঁজে বার করি।'

নির্মলাকে আর কোনও কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে গাড়িতে উঠে গাড়োয়ানকে সে আদেশ দিলে, 'এগিয়ে চল গাড়োয়ান।'

সম্বল আর তাদের কতটুকু। আস্তানা খুঁজতে শেষপর্যন্ত তাই এক বস্তিতে গিয়ে হাজির হতে হল। সেইখানেই বাড়িওয়ালা রাখালরাজ চক্কোত্তির সঙ্গে পরিচয়।

লোকটি কথা বলে একটু বেশি। ঘর দেখাতে নিয়ে গিয়ে টিনের চালাটার বাইরে থেকেই সে বক্তৃতা শুরু করে, 'হ্যাঁ টিনের বাড়ি মশাই একশোবার বলুন টিনের বাড়ি।'

পরিতোষ ও নির্মলার কাছে কোনও প্রতিবাদ না পেয়ে খুশি হয়ে সে আবার বলে, 'তা যেমন গুড় তেমনি তো মিষ্টি! ঘর পিছু পাঁচ টাকায় তো আর দালান কোঠা হয় না।'

পরিতোষ ও নির্মলা কোনও কথা অবশ্য বলে না।

রাখালরাজ সোৎসাহে বলে চলে, 'তবে একটি কথা বলে রাখছি। রাখালরাজ চক্কোত্তির কাছে কোনও হাঙ্গামাটি পাবেন না। দরকার হলে রাখালরাজ কানা, কালা, বোবা সব হতে জানে। এই যে আপনারা! —ভদ্রলোকের মতো চেহারা অথচ উঠেছেন এসে বস্তিতে,— সঙ্গে মোটঘাটও নেই। তা আমি কিছু জিজ্ঞেস করেছি একবার! কেন করব, কেন?'

পরিতোষ ও নির্মলার দিকে একটু ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টি হেনে সে আবার বলে, 'যার ব্যয়রাম সে বুঝবে! আমার কী বলুন না। মাস-মাস ভাড়াটি ঠিক গুণে পেলে রাখালরাজ কারোর হাঁড়িতে কাঠি দিতে যায় না।'

পরিতোষ ও নির্মলাকে একটু আহত ও সঙ্কুচিতভাবে পরস্পরের দিকে তাকাতে দেখে রাখালরাজ একেবারে অন্য দিকে ঘুরে যায়। 'কিন্তু খাঁটি গেরস্ত ছাড়া রাখালরাজ কাউকে ভাড়া দেয় না বুঝলেন! —ও আধা সিকের কারবার এখানে নেই।'

ততক্ষণে বাইরের চটের পরদাটা সরিয়ে রাখালরাজ বাড়ির উঠানে তাদের নিয়ে এসেছ। সেখানে থেকে টিনের পার্টিসান দেওয়া অনেকগুলি কামরার একটিতে তাদের নিয়ে যেতে-যেতে রাখালরাজ বলে, 'এই বাড়ি মশাই! আহামরিও নয়! দূর ছাইও কেউ বলতে পারবে না। এখন আপনাদের পছন্দ হয় নেবেন, না হয়...'

রাখালরাজ শেষ কথাটা উহ্য রেখেই পরিতোষের মুখের দিকে সাগ্রহে তাকায়।

পাশাপাশি দু'টি ঘর। এদিক-ওদিক একটু ঘুরে দেখে পরিতোষ বলে, 'না আমরা এই ঘরই নেব ঠিক করলাম!'

'বেশ! বেশ!'—রাখালরাজ একগাল হেসে বলে, 'জানেন মশাই! এই আপনাদের মতো ভদ্দরলোক ভাড়াটে পেলে আর আমি কিছু চাই না! কী বলে...'

পরিতোষ রাখালরাজের উচ্ছ্বাস থামিয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'ভাড়াটা কি আগাম দিতে হবে?'

রাখালরাজ অত্যন্ত উদার হয়ে বলে, 'না, না, না, না! বলেন কী! আগাম ভাড়া দেবেন কি! রাখালরাজ লোক চেনে মশাই! যখন খুশি আপনি ভাড়া দেবেন।'

ঘরের দরজায় ঘোমটা ঢাকা একটি মূর্তিকে কিছুক্ষণ থেকে দেখা যাচ্ছিল। হঠাৎ সেই ঘোমটার ভেতর থেকে অত্যন্ত তীব্র শাসনের তীক্ষ্ণ ডাক শোনা যায় 'এদিকে একবার এস তো!

রাখালরাজের চেহারা এক মুহূর্তে বদলে যায়। থতমত খেয়ে ঢোক গিলে হাত কচলে সে আমতা-আমতা করে বলে, 'ওইটি, ওইটি—কী বলে, আমার পরিবার। আর দেখুন — মানে কিছু যদি মনে না করেন,—এই বলছিলাম কী, —অসুবিধে না হলে ভাড়ার টাকাটা যদি...'

পরিতোষ ব্যাপারটা বুঝে হেসে বলে, 'না, না। ভাড়া আমি আগামই দিচ্ছি।'

ভাড়ার টাকাটা গুণে নিয়ে পরিবারের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে রাখালরাজ বলে, 'তা হলে আর কী, ঘর তো হয়ে গেল, এবার জিনিস-পত্তর সব আনিয়ে ফেলুন। কী বলে,— ঘর-সংসার তো আর হাওয়ায় পাতা যায় না। বলেন তো আমিই সব ব্যবস্থা...'

নির্মলা দূরের একটি জানালার দিকে গিয়ে ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। সে দিকে চেয়ে পরিতোষ গম্ভীর মুখে বলে, 'না থাক, আপনাকে কষ্ট করতে হবে না।'

রাখালরাজের আরও একটু ঘনিষ্ঠতা করবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু এদের ভাবগতিক দেখে হতভম্ব হয়ে সে বেরিয়ে যায়।

নির্মলা ও পরিতোষের গ্রাম থেকে চলে যাওয়ার খবরটা রটে যেতে বেশি বিলম্ব হয়নি। নানাজনের কল্পনায় ব্যাপারটা ইতিমধ্যে যথাসম্ভব বিকৃত ও রসাল আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। গ্রামের মাতব্বররাও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকেননি। আচার্যিমশাই সদল বলে একেবারে জমিদারের কাছারিতে গিয়েই কথাটা তোলেন, 'আজ্ঞে বড় কুৎসিত, বড় নোংরা ব্যাপার, কিন্তু তাবলে অবহেলা তো করা যায় না! এরকম ব্যভিচার, কী বলে সমস্ত গ্রামের কলঙ্ক সমাজপতি হিসাবে আমাদের একটা কর্তব্য তো আছে।'

বেণীখুড়ো সায় দিয়ে বলেন,—আলবাত, এর উচিত সাজা দরকার, একেবারে টিট করে দিতে হবে।

জমিদারমশাই এতক্ষণেও কোনও কথা বলেননি। তাঁর বদলে শশিভূষণই জবাব দেন, 'কিন্তু যাদের টিট করবেন, তারা তো পগার পার। পরিতোষ আর নির্মলাকে পাচ্ছেন কোথায়?'

গণেশলাল সোৎসাহে সে সমস্যার সমাধান করে দেয়, 'কেন? নির্মলা না থাক তার বাপ তো আছে, যাকে বলে মধ্বাভাবে গুড়ম্ দদ্যাৎ।'

আচার্যিমশাই বিরক্ত হয়ে ওঠেন, 'আঃ গণেশ!'

কিন্তু গণেশের উপমা এখন থামায় কে? সে অদম্য উৎসাহে বলে, 'মানে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে,—মানে—মানে কেঁচো খুঁড়তে সাপ আর কী?'

উপস্থিত সকলের মুখে অত্যন্ত বিরক্তির ভাব দেখে গণেশলাল শেষপর্যন্ত অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়ে চুপ করে।

জমিদারমশাই গম্ভীর ভাবে বলেন, 'তা হলে নির্মলার বদলে তার বাপকে শাস্তি দিতে পারলেই আপনারা খুশি।'

বেণী খুড়ো সানন্দে জানান, 'নিশ্চয়ই! রীতিমতো একেবারে ধোপা-নাপিত বন্ধ।'

জমিদারমশাই খানিক চুপ করে থেকে বেশ কঠিন স্বরে বলেন, 'বেশ তা হলে আমার কাছে সময় নষ্ট না করে ধোপা-নাপিতের কাছেই যান।'

সকলে একেবারে হতভম্ব। আচার্যিমশাই অত্যন্ত বিমূঢ়ভাবে বলেন, 'আজ্ঞে ধোপা-নাপিতের কাছে।'

জমিদারমশাই কোনও উত্তরই দেন না। শশিভূষণই কথাটা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন, 'সোজা কথাটা বুঝতে পারলেন না আচার্যিমশাই, ধোপা-নাপিত বন্ধ করতে হলে তাদের মতামতটা আগে নেওয়া দরকার নয় কী? যান-যান দেরি করবেন না, ধোপা-নাপিত আবার খুঁজে বার করতে হবে তো?'

খানিক নির্বোধের মতো দাঁড়িয়ে থেকে আচার্যিমশাইকে সদল বলে এবার বিদায় নিতে হয়। যাওয়ার সময় নমস্কারটা করে যাওয়ার কথাও তাদের মনে থাকে না।

সবাই চলে যাওয়ার পর জমিদার আসন থেকে উঠে পড়ে বলেন, 'এরা আর যেন আমায় বিরক্ত করতে না আসে শশি।'

শশিভূষণ ঘাড় নেড়ে বলে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ,' তারপর একটু মাথা চুলকে বলে, 'কিন্তু আমি ভাবছিলাম!'

'কী ভাবছিলে?'—গম্ভীরমুখে জিজ্ঞাসা করেন চৌধুরীমশাই।

'না, ভাবছিলাম, শরীরটা কেমন ক'দিন জুৎ নেই, দুদিন একটু বাইরে ঘুরে এলে হত। এই বিজয় এখন যেখানে হাওয়া খেতে গেছে। গাঁয়ের খবরাখবরটাও তো তার পাওয়া দরকার।'

জমিদার খানিক শশিভূষণের দিকে নীরবে চেয়ে থাকেন। তারপর মুখে কোনও ভাবান্তর প্রকাশ না করেই বলেন, 'বেশ যেতে পাবো।'

চৌধুরীমশাই আর সে ঘরে দাঁড়ান না।

শশিভূষণ আপন মনে একটু হেসে সেই পুরোনো গানটাই গুন-গুন করে গায়।

গ্রামে যাওয়া তার নিষেধ। নির্মলার কোনও খোঁজও সে পায়নি। অত্যন্ত মনমরা অবস্থায় রাজীববাবুদের সঙ্গে তাঁদের দার্জিলিং-এর বাড়িতে ছুটিটা কাটাবার নিমন্ত্রণ বিজয় তাই আর প্রত্যাখান করতে পারেনি।

রাজীববাবুদের এই দার্জিলিং-এর বাড়িতেই একদিন শশি হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়।

বিজয় অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'কী ব্যাপার শশিকাকা। তুমি হঠাৎ এসে হাজির যে, সব খবর ভালো তো?'

শশিভূষণ হেসে বলেন, 'ভালো বাবা সব ভালো। আমি এই এমনই এসে পড়লাম। কাজকর্ম এখন মন্দা, তাই ভাবলাম দু-দিন তোমাদের এখান থেকেই ঘুরে যাই। ওই তোমাদের কী বলে, হাওয়াবদল করে ভাঙা শরীরটা যদি একটু মেরামত হয়।'

একটু চুপ করে থেকে বিজয়ের মুখের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে তিনি বলেন, 'তাছাড়া গাঁয়ে ক-দিন যা হৈ-হুজুগ গেল, বেরুবার জন্য প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠছিল।'

'গাঁয়ে আবার কী হল?'—সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করে বিজয়।

'সেসব নোংরা কথা শুনে তোমার আর কাজ নেই। ছুটিতে গাঁয়ে যাওনি ভালোই করেছ। গেলে মিছিমিছি মেজাজটা বিগড়ে যেত। আমবাই তো থ বনে গেছি।'

একটু হেসে যেন অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে শশিভূষণ আবার বলেন, 'এমন নিষ্কলঙ্ক সৎ ছেলে বলে যাকে জানতাম...'

বিজয় বাধা দিয়ে গম্ভীর হয়ে বলে,—'বলতে হয় একটু স্পষ্ট করে বল কাকা, কার কথা বলছ?'

'ওই তোমাদের পরিতোষ গো, তার পেটে-পেটে এত ছিল, কে জানত?'—শশিভূষণের মুখ দিয়ে যেন হঠাৎ কথাটা বেবিয়ে যায়।

'কী করেছে সে?'—রূঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করে বিজয়।

শশিভূষণ যেন নিতান্ত অনিচ্ছাসহকারে বলেন, 'আমার এসব কথা না তোলাই ভালো ছিল দেখছি, তোমার ছেলেবেলার বন্ধু।'

বিজয় আবার বাধা দিয়ে উষ্ণস্বরে বলে, 'হ্যাঁ সেই জন্যই সব কথা শোনা দরকার। গাঁয়ের সবাই তার বিরুদ্ধে আমি জানি। সবাই মিলে পিছু লেগে গাঁ ছাড়া করেছে বোধ হয়।'

শশিভূষণ এবার যেন ক্ষুণ্ণ হযেই গলা একটু চড়িয়ে রাগের সঙ্গে বলেন, 'গাঁ তাকে ছাড়তে হয়নি, সে নিজেই গাঁ ছেড়েছে। আর একা নয়,—একটি মেয়েকে নিয়ে, একজন দেবতুল্য ব্রাহ্মণের সর্বনাশ করে।'

'শশিকাকা!'—বিজয় রুক্ষস্বরে প্রায় ধমক দিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

শশিভূষণ যেন অত্যন্ত আঘাত পেয়ে ক্ষুণ্ণস্বরে বলেন, 'ওই জন্যই তো আমি কিছু বলতে চাইনি আগে। তুমি নেহাত বলিয়ে ছাড়লে—আর লুকিয়েই বা রাখব কেন? কী ভয়ানক অন্যায় বল দেখি। পুরুতমশাই-এব মুখের দিকে তো তাকানো যায় না।'

বিজয়ের মুখ হঠাৎ যেন ফ্যাকাশে হয়ে যায়, 'পুরুতমশাই! কী বলছ কাকা?'

'তবে আর কী শুনছ। পুরুতমশায়ের একটি মেয়ে ছিল না? তাকে নিয়েই তো পরিতোষ আজ ক'দিন নিরুদ্দেশ!'—শশিভূষণ কথাগুলি তাড়াতাড়ি বলে ফেলেন।

'নির্মলা'—বিজয় আর কিছু বলতে পারে না।

শশিভূষণ অন্য দিকে মুখ ফিরিয়েই বলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নির্মলাই তার নাম। এখন তো শোনা যাচ্ছে অনেক দিন আগে থেকেই ওদের ভেতরে-ভেতরে এসব চলেছে। এখন শুধু কেলেঙ্কারিটা আর চাপবার উপায় নেই বলেই গা-ঢাকা দিয়েছে বাধ্য হয়ে।' কেন বলা যায় না বিজয়ের চোখের দিকে শশিভূষণ আর চাইতে পারেন না। বিজয় পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। শশিভূষণ একটু চুপ করে থেকে বলেন, 'যাকগে, তুমি আর মিছিমিছি ওদের কথা ভেবে মন খারাপ কর না।'

হঠাৎ বিজয় হেসে ওঠে উচ্চৈস্বরে। শশিভূষণও সে হাসিতে চমকে ওঠেন। 'তুমি পাগল হয়েছ কাকা যার খুশি সে জাহান্নমে যাক—আমার কী এসে যায়!' বলে বিজয় আবার হেসে ওঠে। সেই হাসির সঙ্গেই আর একটি তরল মিষ্টি হাসি শোনা যায়। দমকা হাওয়ার মতো উচ্ছ্বসিত হাসির সঙ্গে ঘরে ঢুকে বিজয়ের হাত ধরে বুলা বলে, 'বিজয়দা শিগগির

দেখবে এস চুপি-চুপি! যা একটা মজা হয়েছে—'

'কোথায় কী মজা হয়েছে?' বিজয়কে যেন অত্যন্ত উৎসাহী বলে মনে হয়।

'মা একটা বেদেনীকে ধরে দিদিকে—তুমি এসই না'—বুলা আর কথাটা শেষ না করেই বিজয়কে টানতে-টানতে নিয়ে যায়। দূর থেকে তাদের হাসির শব্দ শোনা যায়। শশিভূষণকে কিন্তু কেন বলা যায় না মোটেই খুশি মনে হয় না। কেমন আচ্ছন্নের মতো আড়ষ্টভাবে তিনি বসে থাকেন।

বিজয়কে টানতে-টানতে বাইরে নিয়ে গিয়ে, চুপ করে থাকবার ইশারা করে বুলা এক জায়গায় দাঁড় করায়। সেখান থেকে দেখা যায় হেমাঙ্গিনী একজন বেদেনী ডাকিয়ে অণিমাকে একটা তাবিজ বাঁধাবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল।

অণিমাও তাবিজ কিছুতেই পরবে না, হেমাঙ্গিনীও ছাড়বেন না। বলেন, —'কেন, একটা তাবিজ পরলে কী হয়? হাত তো তাতে ক্ষয়ে যাবে না?'

অণিমা মায়ের সব অত্যাচার সহ্য করলেও এ ব্যাপারে বিদ্রোহী হয়ে ভ্রূকুটি করে বলে, 'না, তাবিজ পরতে যাব কেন?'

বেদেনী উৎসাহ দিয়ে বলে, 'পরলে ভালো হোবে। জলদি-জলদি সাদি হোবে। রাঙা দুলহা আসবে। এ তাবিজের বহুত গুণ।'

বেদেনী তাবিজটা বাঁধবার চেষ্টা করতেই ঝাঁকানি দিয়ে তার হাত সরিয়ে দিয়ে অণিমা বলে, 'দরকার নেই অমন গুণের তাবিজ!'

'দরকার নেই কীরকম!'—হেমাঙ্গিনী এবার রীতিমতো রেগে ওঠেন। বেদেনীর হাত থেকে তাবিজটা নিয়ে নিজেই জোর করে অনিমার হাতে বেঁধে দিয়ে বলেন, 'আমি এত কষ্ট করে বেদেনী ডাকিয়ে আনলাম কী অমনি!'

অণিমার তখনকার মুখের অবস্থা সত্যি দেখবার। বিজয় আর বুলা হাসি চাপতে পারে না। সে হাসির শব্দে তাদের দেখতে পেয়েই অণিমা আর মা'র শাসনও মানে না। সেখান থেকে একেবারে নিজের ঘরের দিকে ছুট দেয়।

হেমাঙ্গিনীও হাসির শব্দে ফিরে তাকান। তারপর সরোষে সকল গোলমালের মূল বুলাকে দেখতে পেয়ে ডাক দেন—'বুলা!'

কিন্তু বুলার কি আর তখন পাত্তা আছে! বিজয়কে নিয়েই সে সেখান থেকে দৌড় দিয়েছে।

অণিমা লজ্জায় নিজের ঘরে গিয়ে একটু বুঝি নিরাপদ বোধ করছিল। এখানে কেউ তাকে অনুসরণ করে আসবে সে ভাবেনি। হাতের দিকে চেয়ে তাবিজটা ছিঁড়ে ফেলবে কি না ভাবছে, হঠাৎ দরজার দিকে তাকিয়ে সে চমকে ওঠে। বিজয় আর বুলা সেখানে কখন নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে।

বিজয় দুষ্টুমির হাসি হেসে জিজ্ঞাসা করে, 'দেখি অণিমা, তোমার হাতে ওটা কী?'

বুলা খিল-খিল করে হেসে ওঠে।

অণিমা অত্যন্ত বিব্রত হয়ে এক মুহূর্ত তাদের দিকে তাকিয়েই পাশের দরজা দিয়ে ছুটে একেবারে বাইরে বেরিয়ে যায়। বিজয় কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয়। কী যেন নতুন উত্তেজনা আজ তার মধ্যে এসেছে। এঘর-ওঘর থেকে আরম্ভ করে সমস্ত বাড়িটা ঘুরে শেষপর্যন্ত বাইরের বাগানে গিয়ে একটি নির্জন বেঞ্চিতে অণিমাকে ধরে ফেলে সে বলে,—'এইবার!'

বিজয় এমনভাবে কোনওদিন তার সঙ্গে কথা বলেনি। অণিমা লজ্জায় মাথা নিচু

করে বলে, 'না, আমি যাই।' বিজয় কিন্তু জোর করেই তাকে বসিয়ে রেখে হেসে বলে, 'না যেতে দেব না।'

তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে অণিমার হাতের তাবিজটা দেখিয়ে বলে, 'এই বুঝি তোমার বর ধরবার ফাঁদ?'

বিজয়ের গলার স্বরে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে অণিমা তার দিকে তাকায়। বিজয় হঠাৎ হাত বাড়িয়ে তার তাবিজটা ধরে ফেলে কঠিন স্বরে বলে, 'এ তাবিজ যদি আমি ছিঁড়ে ফেলে দিই! যদি বলি আমায় ধরবার জন্যে কোনও ফাঁদ তোমার লাগবে না, কোনও কৌশলের দরকার নেই।'

অণিমা চমকে উঠে সন্ত্রস্তভাবে তার দিকে তাকায়। বিজয় সত্যিই তাবিজটা ছিঁড়ে দূরে ফেলে দিয়ে বলে, 'মা কী বলবেন ভাবছ। মা কোনও কিছু বলবেন না, তিনি যদি জানেন তোমায় বিয়ে করবার জন্যে কোনও তাবিজ, কোনও তুকতাকের সাহায্য আমার লাগবে না।'

অণিমা কম্পিত-কাতর স্বরে বলে, 'তুমি, তুমি কী বলছ!'

বিজয় যেন হঠাৎ আরও উগ্র হয়ে ওঠে,—'কী বলছি। কেন আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না। আমি বিশ্বাস করবার মতো লোক নই। হৃদয় নিয়ে খেলা করাই আমার ব্যবসা! ভালোবাসার ভান করে শেষপর্যন্ত আমি নির্মমভাবে প্রতারণা করেই বেড়াই।'

একটু থেমে সে যেন আরও হিংস্র ভাবে বলে, 'বেশ। কঠিনভাবে সে কথা আমায় শুনিয়ে দাও। অপমান করে আমায় তাড়িয়ে দাও।'

অণিমাব চোখ সজল হয়ে আসে। মুখ নামিয়ে অশ্রু গোপন করবার চেষ্টা করে বলে, 'আমি তা তো বলিনি। আমি শুধু ভেবেছিলাম...'

'কী তুমি ভেবেছিলে?'—বিজয় প্রায় চিৎকার করে ওঠে।

তার দিকে কাতর চোখ তুলে অণিমা দ্বিধাজড়িত স্বরে বলে, 'আমি ভেবেছিলাম, তোমার মনে হয়তো আমার জায়গা হবে না।'

বিজয় অনেকক্ষণ চুপ করে অণিমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। তার দৃষ্টিও ধীবে-ধীরে যেন সজল হয়ে আসে। কোমল ধরা গলায় সে এবার বলে, 'কেন জায়গা হবে না, অণিমা? আমি নিজে যে নিরাশ্রয়। জীবনে শুধু আঘাতই পেয়েছি। সে আঘাত সে বঞ্চনার ব্যথা তুমিই শুধু জুড়িয়ে দিতে পার অণিমা। তোমায় কাছে পেয়ে আমি হয়তো সব ভুলতে পারব।'

বিজয় অণিমার হাতটা নিজের কাছে টেনে নেয়। হঠাৎ পাশ থেকে বুলার হাসির শব্দ শোনা যায়। সে কখন লুকিয়ে এসে সেখানে বসেছে কেউ জানে না। অণিমা কিছু বলবার আগেই সে চারিদিক আনন্দের হাসিতে মুখর করে ছুটে পালিয়ে যায়।

বিজয়ের কলকাতা ফেরার অপেক্ষায় পরিতোষ আর নির্মলা এখনও পর্যন্ত দরিদ্র বস্তির সেই বাটিতেই বাস করছে। নির্মলার সন্তান সেইখানেই ভূমিষ্ঠ হয়েছে। পরিতোষের যৎসামান্য উপার্জনে কোনওমতে তাদের দিন চলে। এই দারিদ্র, দুঃখ, কষ্ট, গ্লানির মধ্যে সন্তানের মুখের দিকে চেয়েই যা কিছু সান্ত্বনা নির্মলা পায়। অভাব অনটন যখন দুঃসহ হয়, তাকে ও পরিতোষকে জড়িয়ে সাধারণের স্বাভাবিক সন্দেহ যখন অত্যন্ত পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে তখন একটি মাত্র ক্ষীণ আশা সম্বল করে ছেলেটিকে বুকে চেপে ধরে সে এই কঠিন পরীক্ষার দিন পার হওয়ার শক্তি সংগ্রহ করে। পরিতোষের মনে কিন্তু যেন কোনও হতাশা,

দুঃখ বা সংশয় নেই। সারাক্ষণ হাসিমুখে কী অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই দুঃখের সংসার সে চালাবার চেষ্টা করে তা দেখে নির্মলার মন শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে। তার ও তার সন্তানের জন্যে পরিতোষের এই আত্মত্যাগে নির্মলার একদিক দিয়ে অবশ্য কুণ্ঠার সীমা নেই। এই মানুষটিকে এমনভাবে বিব্রত করার কোনও অধিকার তো তার নেই। তার মহত্ত্বের ওপর এই বোঝা আর কতদিন সে চাপিয়ে রাখবে। কিন্তু উপায়ই বা কী? এখনও পর্যন্ত বিজয় কলকাতায় ফেরেনি। কবে যে ফিরবে তাও নির্মলা জানে না।

সেদিন সকালে বাসন-কোসনগুলো মেজে ঘরের তাকে তুলে রাখতে এসে নির্মলা দেখে দোলনায় শোয়ান তার ছেলেটির হাতে একটা নতুন খেলনা দিয়ে পরিতোষ তাকে আদর করছে। মৃদু ভর্ৎসনার সুরে নির্মলা বললে, 'পরিতোষদা, আবার বুঝি খোকার খেলনা কিনে এনেছ?'

'আহা কী সামান্য একটা খেলনা!'—পরিতোষ যেন লজ্জিত।

এইবার খোকার মাথায় একটা নতুন রঙিন টুপির দিকে নির্মলার দৃষ্টি গেল। বললে,—'সামান্য একটা খেলনা! আর ওই টুপিটা কেন?'

পরিতোষ যেন অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল,—'ওই রাস্তায় বিক্রি করছিল, সস্তায় পেয়ে গেলাম তাই। তাতে হয়েছে কী?'

নির্মলা কিন্তু সত্যি এবার যেন অসন্তুষ্ট হল। পরিতোষ অসামান্য পরিশ্রম করে, কীভাবে যে তাদের সংসার চালাচ্ছে তা আর তার জানতে বাকি নেই। একটু রাগ করেই সে বললে, 'হয়েছে কী! এসব বাজে খরচ করবার কী দরকার ছিল বল তো?'

'একটা টুপি কিনলেই বাজে খরচ হল?'—পরিতোষ কথাটা এড়িয়ে যেতে চায়।

কিন্তু নির্মলা তাকে সে সুযোগ দিলে না,—'কই? তোমার যে জুতো কেনবার কথা, তা কিনেছ?'

'জুতো?'—পরিতোষ যেন অবাক হয়ে বললে, 'জুতো এখুনি কেনবার কী দরকার! দেখলাম এ জুতোটায় তালি দিলে এখনও মাসখানেক বেশ চলে যাবে।'

অত্যন্ত ক্ষুণ্ণস্বরে নির্মলা বললে, 'না এ তোমার অত্যন্ত অন্যায় পরিতোষদা। ওই ছেঁড়া পেরেক ওঠা জুতো নিয়ে সারাদিন তোমায় কাজের ধান্দায় ঘুরে বেড়াতে হয়। তবু তুমি একটা টুপি কিনে পয়সা নষ্ট করে এ'ল। কী হবে ওই বাহারের টুপিতে?'

একটু চুপ করে থেকে সে আবার ধরা গলায় বললে, 'গরীবের ছেলের ওসব লাগে না।'

এবার পরিতোষই যেন রাগ করে উঠল, 'গরীবের ছেলে, গরীবের ছেলে, করিসনি নির্মলা। তোর বাপ গরীব হতে পারে, কিন্তু ওর বাপ-ঠাকুরদা ওকে অমন একটা ন্যাকড়ার টুপির বদলে সোনার টুপি পরাতে পারে।'

কথাটা তারপর ঘুরিয়ে নেওয়ার চেষ্টাতেই পরিতোষ বললে, 'আর দেখ নির্মলা, আমি চেয়ে-চেয়ে দেখছিলাম, এ বেটা ঠিক একটি খুদে জমিদারমশাই হবে। একেবারে ঠাকুরদার নতুন সংস্করণ!'

খোকার নাকটা ধরে আদর করে পরিতোষ আবার সস্নেহে বললে, 'কেমন ঠিক কিনা? তুই দেখ নাকটা।'

'আহা কী নাক!'—নির্মলা কথাটাকে যেন আমল দিতেই চাইলে না, ফিরে প্রশ্ন করলে, 'কিন্তু তোমার এত খুশি ভাব কেন আজ বল তো।'

পরিতোষ এবার বেশ একটু রহস্যময় হয়ে উঠে বললে, 'ও সেই কথাই তোকে বলিনি বুঝি। জানিস,—না থাক এসেই বলব।'—পরিতোষ যেন একটু ইতস্তত করে চুপ করে গেল।

'কী বলই না পরিতোষদা, শুনে যাও।'—নির্মলা কৌতূহলী হয়ে উঠল।

'একটু বুঝি আর ধৈর্য ধরতে পারলি না?'—পরিতোষ হেসে উঠল, 'শোন তাহলে, বিজয় কলকাতায় এসেছে খবর পেয়েছি। আমি এখুনি যাচ্ছি দেখা করতে। একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে আসব। বাপ-বেটায় দেখা হবে, তাই তো বেটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে গেলাম একটু।' খোকাকে আর একবার আদর করে হাসতে-হাসতে পরিতোষ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নির্মলা বুঝি নিজের হৃদয়ের অকস্মাৎ উদ্দাম স্পন্দন দমন করতে না পেরেই স্তব্ধ হয়ে রইল দাঁড়িয়ে।

পরিতোষ অনেক আশা করেই বিজয়ের কলকাতায় আসার সংবাদ পেয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে গেছল। সেখানে অত বড় স্বপ্নভঙ্গের আঘাত যে তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে সে কী করে জানবে!

পরিতোষ যখন বিজয়ের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছোলে তখন সেখানে বাইরে একটি মোটর দাঁড়িয়ে আছে। পরিতোষ প্রবেশ করবার আগেই বাড়ির ভেতর থেকে একজন সুন্দরী ভদ্রমহিলার সঙ্গে বিজয়কে সেজেগুজে বেবিয়ে আসতে দেখা গেল। পরিতোষ সাগ্রহে এগিয়ে গিয়ে ডাকলে,—'বিজয়!'

বিজয় কিন্তু তাকে যেন দেখতে না পেয়ে ভদ্রমহিলাকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলে গেল! পরিতোষ অত্যন্ত অবাক হয়ে পেছন থেকে আবাব বললে,—'বিজয়, আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

ভদ্রমহিলা আর কেউ নয়, অণিমা। সে-ই বিজয়ের দৃষ্টি পরিতোষের দিকে আকর্ষণ করে বললে,—'তোমায় ভদ্রলোক যে কী বলছেন।'

বিজয় একবার ভ্রূকুটি করে পরিতোষের দিকে তাকিয়ে অণিমাকে বললে, 'আচ্ছা, তুমি মোটরে গিয়ে বসগে, আমি আসছি।'

অণিমা গাড়ির দিকে চলে যাওয়ার পর বিজয় অত্যন্ত কঠিন অপ্রসন্ন মুখে পরিতোষের সামনে এসে দাঁড়াল।

পরিতোষ নির্বোধ নয়। বিজযের এই অপ্রত্যাশিত আচরণে অত্যন্ত বিস্মিত ও ক্ষুণ্ণ হয়ে সে বললে, 'আমায় দেখে তুমি খুশি হওনি মনে হচ্ছে বিজয়।'

'সেটা যখন বুঝতেই পেরেছ, তখন আর বলে লাভ কী!' বিজয়ের কণ্ঠস্বরে গভীর বিদ্বেষ ও ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই নেই।

পরিতোষ সত্যি বিমূঢ় হয়ে গেল। বিজয়ের দিকে খানিক চেয়ে থেকে আহত স্বরে বললে, 'কিন্তু তোমার এ ব্যবহারের কারণ তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'সে বোঝবার ক্ষমতা তোমার থাকলে নির্লজ্জের মতো তুমি এখানে আসতে সাহস করতে না'—বিজয়ের কণ্ঠ যতদূর তিক্ত হতে পারে।

পরিতোষ অসহায় ভাবে বললে, 'তুমি কী বলছ বিজয়! এসব কথার অর্থ কী?'

তোমার কাছে অর্থ ব্যাখ্যা করবার সময় আমার নেই পরিতোষ। আমায় তাড়াতাড়ি বেরুতে হবে।

অত্যন্ত রুক্ষভাবে কথাগুলো বলে বিজয় চলে যাওয়ার উপক্রম করতেই পরিতোষ

কাতর স্বরে বললে, 'কিন্তু আমি যে তোমার জন্য আজ পাঁচ মাস অপেক্ষা করে আছি বিজয়; আমার যে অনেক কথা আছে।'

'তোমার অনেক কথা থাকতে পারে, কিন্তু আমার সময় বা উৎসাহ কিছুই নেই, আমি চললুম।'

বিজয়কে সত্যিই চলে যেতে উদ্যত দেখে পরিতোষ কাতরভাবে বললে, 'তুমি কী হয়েছ বিজয়! এ যে আমার ধারণার অতীত! শোন, আমি নির্মলার কাছ থেকে আসছি।'

বিজয় তাকে রূঢ়স্বরে বাধা দিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললে, 'তুমি জাহান্নম থেকে এসে, সেইখানেই যেতে পারো। আমার সেসব কথা শোনবার দরকার নেই।'

পরিতোষ বিস্ময়ে বেদনায় অভিভূত স্বরে বললে, 'তোমার স্ত্রী, তোমার ছেলের কথাও শোনবার তোমাব দরকার নেই? তোমার জন্যে পরিচয়, আশ্রম সব খুইয়ে যারা পথে এসে দাঁড়িয়েছে, তুমি তাদের স্বীকার করতে চাও না?'

বিজয় পরিতোষের দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে তিক্তস্বরে বললে, 'তোমার অভিনয়ের ক্ষমতা আছে বটে পরিতোষ! একদিন তোমার মহত্বে তাই সত্যি বিশ্বাস করেছিলাম, কিন্তু আজ তোমার ও বক্তৃতায় আমায় ভোলাতে পারবে না। শোন, আমার স্ত্রীকে আমি অবশ্যই স্বীকার করি এবং তিনি ওইখানে ওই গাড়িতে বসে আছেন।'

পরিতোষ স্তম্ভিত হয়ে অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমার স্ত্রী? তুমি বিয়ে করেছ?'

'তা না হলে কী সেই কুলটাব শোকে সন্ন্যাসী হয়ে থাকব মনে করেছিলে! যাও— এ খবরটা তোমার নির্মলাকে দাওগে যাও।' সুতীব্র বিদ্রূপে পরিতোষকে আহত করে বিজয় সেখান থেকে চলে গেল।

পরিতোষ সেখানে দাঁড়িয়ে রইল আচ্ছন্নের মতো।

বিজয়কে সঙ্গে নিয়ে আসবার কথা বলে পরিতোষ সেই সকালবেলা বেরিয়েছিল, ফিরে এল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। সারাদিন কোথায় কীভাবে যে তার কেটেছে সে যেন নিজেই স্মরণ করতে পারে না।

দুর্ভাবনা আশঙ্কার মাঝে নির্মলার সাবাদিন কেটেছে নিদারুণ উৎকণ্ঠায়। পরিতোষের ফিরতে যত দেরি হয়েছে তত সে অস্থির হয়ে উঠেছে সংশয়ে, শঙ্কায়, দুর্ভাবনায়। এতক্ষণে পরিতোষকে ফিরতে দেখে অনেক কথাই একসঙ্গে বলবার জন্যে সে উন্মুখ হয়ে ওঠে! কিন্তু পরিতোষের মুখের দিকে চেয়ে সে স্তব্ধ হয়ে যায়। সে মুখ দেখে বিজয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের কোনও বিবরণই যেন তার জানতে বাকি থাকে না। প্রাণপণে নিজেকে সম্বরণ করে সে সহজ গলায় হালকা করে বলবার চেষ্টা করে, 'বাঃ বেশ লোক তো? আমি সেই তখন থেকে বসে-বসে খালি ঘড়ি দেখছি। সেই সকালে বেরিয়েছ আর এই বিকেলে তোমার ফিরে আসার সময় হল?'

পরিতোষ কোনও উত্তর দেয় না। আচ্ছন্নের মতো ঘরের এক কোণে ঘাড় গুঁজে বসে থাকে।

অনেকক্ষণ ঘরে আর কোনও শব্দ শোনা যায় না। নির্মলা তারপর বুঝি আর নিজেকে সামলাতে পারে না। অস্ফুট কাতর স্বরে ডাকে, 'পরিতোষদা—'

পরিতোষের তবু যেন কোনও সাড়া নেই। ধরা গলায় ধীরে-ধীরে নির্মলা বলে, 'তোমার সঙ্গে দেখা বুঝি করলে না?'

পরিতোষ এবার তার দিকে ধীরে-ধীরে মুখ ফেরায়, বলে, 'দেখা না করলেই ভালো ছিল বোধহয়,'—তার গলার স্বরে বিষাদ ও তিক্ততার অদ্ভুত সংমিশ্রণ। হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে সে আবার বলে, 'সে তোমার নাম শুনতেও চায় না নির্মলা, সে আবার বিয়ে করেছে।'

নির্মলা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে। চোখে তার অশ্রু নেই, মুখে কোনও ভাবান্তর নেই, মনে হয় সে মুখ যেন পাথর দিয়ে তৈরি। অনেকক্ষণ পরে সে ধীরে-ধীরে বলে, 'আমি জানতাম।'

অভিমানে বেদনায় পরিতোষের স্বর জ্বালাময় হয়ে ওঠে,—'জানতে? তা হলে আমায় সেখানে যেতে বারণ করনি কেন নির্মলা! যেচে তোমায় এ অপমান তা হলে নিয়ে আসতে আমায় হত না।' তীব্রভাবে কথাগুলো বলে পরিতোষ আবার যেন ভেঙে পড়ে। শুধু তার মুখ দিয়ে গভীর আক্ষেপের মতো বার হয়, 'ওঃ এতবড় পাষণ্ড সে হতে পারে আমি ভাবতে পারিনি। আমার সমস্ত শরীর যেন তার কাছে দাঁড়িয়ে অশুচি হয়ে গেছে মনে হচ্ছে।'

নির্মলা আর সেখানে দাঁড়াতে পারে না। ধীরে-ধীরে বিছানায় গিয়ে মুখ গুঁজে লুটিয়ে পড়ে। রুদ্ধ কান্নার আবেগে তার সমস্ত দেহ শুধু দুলে উঠতে থাকে। পরিতোষ তার পাশে গিয়ে বসে তার গায়ে হাত রাখে। তার সহানুভূতিও কিন্তু বিজয়ের ওপর ঘৃণায় বিদ্বেষে অন্য এক রূপ নিয়ে প্রকাশ পায়, 'কার জন্য তুমি কাঁদছ নির্মলা? সত্যিই মনে কর তোমার বিয়ে হয়নি। ওকে তোমার স্বামী বলে ভাবতে ঘৃণা হওয়া উচিত।'

নির্মলা হঠাৎ অশ্রুসিক্ত কাতর মুখ তুলে বলে, 'না, না ও কথা বোলো না।'

'বলব না! একশোবার বলব।' পরিতোষ উগ্র হয়ে ওঠে—'নিজের শয়তানী মতলব হাসিল করতে ফাঁকি দিয়ে যে দুটো মন্ত্র পড়বার ভান করলে সেই তোমার স্বামী—আর ...আব—'

কী যেন বলতে গিয়ে পরিতোষ হঠাৎ থেমে যায়। তারপর নিজেকে সম্বরণ করার জন্যই যেন সেখান থেকে সরে গিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। সমস্ত ঘর আবার নিস্তব্ধ।

সে নিস্তব্ধতা কিছুক্ষণ বাদে ভাঙে বাইরের একটি বালিকার কণ্ঠের ডাকে, গোয়ালাদের মেয়ে দুধ দিতে এসেছে। বাইরে থেকে সে ডাকে, 'কই গো দুধ নিয়ে যাও না।'

কারুর কোনও সাড়া শব্দ না পেয়ে সে ঘরে ঢুকে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে, 'বা রে! বর-বউ মিলে এ-ঘরে বসে গল্প হচ্ছে আর আমি চেঁচিয়ে মরছি!'

পরিতোষ আর নির্মলার সঙ্কুচিত দৃষ্টি একবার পরস্পরের সঙ্গে মিলে যায়। মেয়েটি আবার খেঁকিয়ে ওঠে, 'কোথায় দুধ রাখব বল?'

শান্তস্বরে নির্মলা বলে, 'ও ঘরে বাটি আছে, তাইতে ঢেলে রেখে যা!'

'ইস, নিজে বুঝি আর বরের কাছ থেকে উঠতে পারলে না,' মুখভঙ্গি করে মেয়েটি ঘর থেকে দুধের বালতি নিয়ে বেরিয়ে যায়।

নির্মলা আর পরিতোষ অনেকক্ষণ কেউ কারুর দিকে তাকাতে পারে না। অনেকক্ষণ বাদে পরিতোষই প্রথম নির্মলার দিকে এগিয়ে আসে। তার মুখে যেন একটা নতুন সংকল্পের দৃঢ়তা। এমন দৃষ্টি তার চোখে কোনওদিন দেখা যায়নি, 'তোমার এখনও হয়তো এসব শুনলে লজ্জা করে নির্মলা; কিন্তু আমার আর করে না। আমি জানি— এই গ্লানির মধ্যেই আমাদের বাস করতে হবে চিরদিন। আমাদের আর কোনও সম্পর্ক কেউ কখনও বিশ্বাস করবে না।'

পরিতোষ একটু চুপ করে থেকে যেন নতুন শক্তি সংগ্রহ করে নিয়ে এক নিশ্বাসে

বলে যায়, 'তাই ভাবি, কেন এ সম্পর্ক আমরা সত্য করে তুলব না? যা মিথ্যে গ্লানি হয়ে আছে তা কেন সত্যে মধুর হয়ে উঠবে না!'

নির্মলা সচকিতভাবে পরিতোষের দিকে মুখ তুলে তাকায়—সে দৃষ্টিতে বিস্ময় না আতঙ্ক, বেদনা না বিমূঢ়তা কী যে সবচেয়ে প্রধান স্পষ্ট করে বোঝা যায় না। পরিতোষ উত্তেজিতভাবে বলে 'ভাবছ, কী আমি বলছি!' তার গলার স্বর কাতর হয়ে আসে। 'এসব কথা কোনওদিন হয়তো বলতাম না, বলবার প্রয়োজনও হত না। দুর্বলতা বল, পাগলামি বল, দিনের-পর-দিন তোমার পাশে থেকে তোমায় দেখে আমার মনের মধ্যে যে আকুলতা জমে উঠেছে কোনওদিন তোমার কাছে তা প্রকাশ করতাম না। কিন্তু আজ সমাজ-সংসার সবাই আমাদের ত্যাগ করেছে; কোথাও আমাদের জায়গা নেই। এই নির্মম উদাসীন পৃথিবীতে পরস্পরের হাত ছাড়া আর আমাদের ধরার কিছু নেই। আজ আর তাই নিজেকে সংবরণ করতে পারছি না।'

পরিতোষ এক মুহূর্ত চুপ করে। তারপর ব্যাকুলতায় তার গলার স্বর আবার তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। 'কেনই বা সম্বরণ করব নির্মলা! সমস্ত পৃথিবী আমাদের অস্বীকার করেছে, আমরা কেন সমস্ত পৃথিবীকে অস্বীকার করব না। কেন আমরা তাদের দেওয়া অপমান গ্লানিকে উপেক্ষা করে নতুন করে নিজেদের জীবন গড়ে তুলব না।'

পরিতোষ থেমে যায়। নির্মলা ধীরে-ধীরে অশ্রু-সজল চোখ অন্য দিকে ফিরিয়ে নেয়। সে অশ্রু অপ্রত্যাশিত আঘাতের না সমবেদনার কে জানে!

পরিতোষ তার কাছে গিয়ে বসে ধীরে-ধীরে বলে, 'আমি জানি, তোমার মনে আমার সেরকম কোনও স্থান নেই। হয়তো শুধু একটু শ্রদ্ধা ছাড়া আর কিছু দাবি করতেও আমি পারি না। তবু কোনদিন শ্রদ্ধার চেয়ে বেশি কিছু পাব, এই আশাই আমার কাছে যথেষ্ট নির্মলা।'

কথাগুলি বলেই পরিতোষ উঠে পড়ে। তারপর নিজের ঘরের দিকে চলে যাওয়ার পথে আবার ফিরে দাঁড়িয়ে বলে, ' 'সব কথায় তোমার যদি আঘাত লেগে থাকে, তাহলে শুধু এই ভেবেই ক্ষমা কর যে আমিও সামান্য দুর্বল মানুষ ছাড়া আর কিছুই নই। একটু স্নেহ, একটু ভালোবাসার ক্ষুধা আমি জয় করতে পারিনি।'

পরিতোষ আর সেখানে দাঁড়ায় না। 'তোমার উত্তর এখুনি আমি চাই না নির্মলা, তার জন্যে অপেক্ষা করবার ধৈর্য আমার আছে'—কোনওমতে এই কথাগুলি বলেই নিজের ঘরে চলে যায়। নির্মলা যেমন মুখ ফিরিয়েছিল তেমনি ভাবেই নিথর নিস্পন্দ হয়ে বসে থাকে।

রাত গভীর হয়। মনের মধ্যে সারাদিন যে ঝড় তার গেছে, তারই আঘাতে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পরিতোষ কখন একসময় ঘুমিয়ে পড়ে, সে নিজেই জানতে পারে না। হঠাৎ কী একটা আওয়াজে ধড়মড় করে সে উঠে বসে। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় প্রথমটা সে বুঝতে পারে না, বাইরে না মনের ভিতরই একটা প্রচণ্ড ঝড় চলেছে! নির্মলার ঘরে আবার একটা আওয়াজ শোনা যায়। পরিতোষ উদ্বিগ্নভাবে ডাকে, 'নির্মলা।'

কোনও সাড়া নেই নির্মলার।

পরিতোষ উঠে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে আবার তাকে ডাকে, এবারও কোনও সাড়া পাওয়া যায় না। টিনের চাল কাঁপিয়ে দমকা একটা ঝোড়ো হাওয়া যেন আর্তনাদ

করে যায়। নির্মলার ঘরে আবার সেই শব্দ।

পরিতোষ আর দ্বিধা না করে মাঝের দরজাটা খুলে নির্মলার ঘরে গিয়ে ঢোকে। ঝড়ের বেগে ঘরের একটি জানালার পাল্লাদুটি সশব্দে খুলে আবার বন্ধ হয়ে যায়। এই শব্দই সে পাশের ঘর থেকে শুনেছে নিশ্চয়।

কিন্তু নির্মলা কোথায়? ঘরের বাইরে যাওয়ার দরজা খোলা। দোলনায় তার সকালবেলার কিনে দেওয়া পুতুলটি শুধু পড়ে আছে। দোলনার কাছে গিয়ে পরিতোষ বেদনা-বিমূঢ় ভাবে গিয়ে দাঁড়ায়। পুতুলটি অন্যমনস্কভাবে হাতে তুলে নিতে গিয়ে চিঠিটা এবার সে দেখতে পায়। যন্ত্রচালিতের মতো চিঠিটা খুলে সে পড়ে। একবার নয় বারকয়েক পড়ে তবে যেন চিঠির মর্ম সে বুঝতে পারে। নির্মলা লিখে গেছে,—

পূজনীয়েষু,

খোকাকে নিয়ে আমি চলে যাচ্ছি। বিশ্বাস কর যে তোমার ওপর রাগ করে বা তোমার কথায় আঘাত পেয়ে নয়। শুধু আমার আর এখানে থাকা উচিত নয় বলেই যাচ্ছি। আমি এবার বুঝেছি যে, আমি সংসারের অভিশাপ। যেখানে থাকব শুধু সর্বনাশই ডেকে আনব। বাপ-মা'র জীবন আমার জন্য বিষ হয়ে গেছে তারপর তোমার মতো দেবতাকেও আমি কোথায় নামিয়ে এনেছি! এর চেয়ে বড় দুঃখ আর আমার কিছু নেই। আর কিছু লিখতে পারছি না। তুমি আমায় ক্ষমা কর, আমায় খোঁজবার চেষ্টা কর না। ইতি—

প্রণতা নির্মলা।

চিঠিটার মর্ম বুঝে আচ্ছন্নের মতো অনেকক্ষণ পরিতোষ সেখানে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ ঝড়ের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

সারারাত পরিতোষ উদ্দেশ্যহীনভাবে নগরের পথে-পথে নির্মলাকে খুঁজে বেড়ায়। তারপর সকাল হতেই তাকে বিজয়ের বাড়িতে দেখা যায়। তার খ্যাপার মতো উস্কো-খুস্কো চেহারা দেখেও অপ্রসন্নভাবে বিজয় বলে, 'আবার তুমি এখানে?'

পরিতোষ কাতরভাবে বলে, 'তুমি তাড়িয়ে দিয়েছিলে তবু না এসে পারলাম না বিজয়! আমাদের ভয়ানক বিপদ। নির্মলা কাল রাত্রে বাড়ি থেকে চলে গেছে।'

বিজয় বিদ্রুপের হাসি হেসে বলে, 'শুনে বিশেষ আশ্চর্য হলাম না। তাছাড়া এ সংবাদ আমার শোনবার কোনও দরকার নেই।'

এ অবজ্ঞা মাথা পেতে নিয়ে পরিতোষ ব্যাকুলভাবে বলে, 'তুমি বুঝতে পারছ না বিজয়। তাকে এখুনি খুঁজে না পেলে কী সর্বনাশ হবে, এই কলকাতা শহরে ওই ছেলেটি নিয়ে কী বিপদে সে পড়তে পারে! কিছু সে জানে না, কোনও আশ্রয় তার নেই।'

'আশ্রয় না পেয়েই চলে যাওয়ার মতো নির্বোধ সে নয়'—বিজয়ের গলায় নিষ্ঠুর বিদ্রূপ, সে নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলে, 'আর চলে যে যাবে সে তো জানা কথা। একদিন আমাকে ছেড়ে তোমার ওপর ভর করেছিল, আজ আবার তোমায় ছেড়ে আর কারুর ওপর ভর করেছে দেখগে যাও।'

'তুমি কী বলছ তুমি নিজেই জানো না বিজয়! নির্মলার ওপর চরম অবিচার তুমি

করেছ। কিন্তু এখন এমন করে নির্মম হোয়ো না। তোমার ছেলের খাতিরেও তাকে খুঁজে বার করতে আমায় সাহায্য কর!'

'না, কোনও সাহায্য আমি করব না'—তীব্র ঝাঁঝালো গলায় বিজয় চিৎকার করে ওঠে।—'এবং তোমাকেও বলছি এরপর নির্মলার কথা নিয়ে আমার কাছে এলে তুমি অপমানিত হবে।'

বিজয় তার দিকে না তাকিয়েই ভেতরে চলে যায়। বিমূঢ় অসহায়ভাবে পরিতোষ অবশেষে বেরিয়ে আসে।

কিন্তু যত অপমানই ভাগ্যে থাক পরিতোষ তো নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকতে পারে না। পরিতোষকে সমস্ত দ্বিধা-সঙ্কোচ জয় করে জমিদার বীরেন্দ্রনারায়ণের কাছে আবার যেতে হয়। কাতরভাবে সে তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করে, 'আমার সম্বল কতটুকু। কতটুকুই বা আমার ক্ষমতা? কিন্তু আপনি চেষ্টা করলে, এখনও তাকে খুঁজে বার করতে পারেন, এখনও,—এখনও তাদের বাঁচানো যায়!'

বীরেন্দ্রনারায়ণ কাছারি ঘরে বসেই পরিতোষের কথা শুনছিলেন।

অদূরে শশিভূষণ তার খাতাপত্রের মধ্যে নিমগ্ন। বীরেন্দ্রনারাযণকে খানিক চুপ করে থাকতে দেখে যেটুকু আশা পরিতোষের হয়েছিল পর মুহূর্তে তাঁর রুক্ষস্বরে সে আশা তার চুরমার হয়ে যায়। চৌধুরীমশাই গম্ভীর ভাবে বলেন, 'কিন্তু আমার তাদের খোঁজবার কোনও দায় তো নেই।'

পরিতোষ তবু বলে, 'আপনি অন্তরে-অন্তরে জানেন সত্যি দায় আছে কিনা! আর কেউ না বুঝুক আপনি মনের ভেতর জানেন যে, সে নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক। যে সন্তান নিয়ে সে আজ নিরাশ্রয় হয়ে পথে বেরিয়েছে তার মধ্যে যে আপনাদের বংশের রক্তই বইছে এ-কথা জেনেও এমন নিষ্ঠুর হবেন না। আপনার অভিমানে যদি কোনও দিন ঘা লেগে থাকে তার শোধ কি এতদিনেও হয়নি? আপনার বংশধর ওই দুধের শিশুকে না মারলে কি তার তৃপ্তি হবে না।'

বীরেন্দ্রনারায়ণ মাথা নিচু করে সমস্ত কথাই শোনেন।

পরিতোষের দীর্ঘ আবেদনের মাঝে কোনও বাধা তিনি দেন না? কে জানে হয়তো হৃদয়ের কোনও গভীর স্তরে গিয়ে পরিতোষের মিনতি তাঁকে আঘাত করেছে কি না।

শশিভূষণকে খাতাপত্র থেকে একবার মুখ তুলে তাঁর দিকে তাকাতে দেখা যায়।

কিন্তু হঠাৎ বীরেন্দ্রনারায়ণ কী যেন রুদ্ধ আবেগ চাপতে না পেরে একেবারে ফেটে পড়েন, 'এসব উপদেশ তোমার কাছে শুনতে প্রস্তুত নই। তোমার ধৃষ্টতা অনেক সহ্য করেছি, কিন্তু আর নয়। তুমি যাও!'

পরিতোষ বুঝতে পারে আর কোনও আশা নেই। ম্লানমুখে সে বলে, 'দোহাই আপনার, এখনও ভেবে দেখুন।'

বীরেন্দ্রনারায়ণ বজ্রগম্ভীরস্বরে হাঁকেন, 'যাও।'

অপমানে, বেদনায়, হতাশায়, পরিতোষের চোখে এবার সত্যি জল আসে। বিহ্বলভাবে খানিক সামনে তাকিয়ে থেকে সে ধীরে-ধীরে বেরিয়ে যায়।

সমস্ত কাছারি ঘর কী একটা নিদারুণ অস্বস্তিতে যেন স্তব্ধ।

সে স্তব্ধতা প্রথম ভাঙে শশিভূষণের কথায়। হঠাৎ খাতাপত্র থেকে মুখ তুলে নেহাত যেন কথায়-কথায় তিনি বলেন,—'ছেলেটা শুনলাম দেখতে চমৎকার হয়েছিল।'

'তুমি চুপ কর শশিভূষণ!'—চৌধুরীমশাই প্রায় গর্জন করে ওঠেন।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি তো চুপ করেই আছি'—বলে শশিভূষণ আবার খাতাপত্রে নিবিষ্ট হন। কিন্তু মুখ তাঁর বন্ধ হয় না। খানিক বাদেই বলেন, 'কাঙাল ভিখিরিদের অমন কত ছেলে পথে-ঘাটে না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে, তাতে কার কী?'

চৌধুরীমশাই কঠিনভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে বলেন,—'যার যেমন কাজ, তাকে তেমন শাস্তি পেতে হবে। আমাদের তা নিয়ে ভাবনা করবার কিছু নেই।'

'কিছু না, কিছু না, কোথাকার কে তার জন্য আবার ভাবনা! 'শশিভূষণের গলায় ঠিক ঔদাসিন্য কিন্তু ফুটে ওঠে না—'এতদিনে হয় তো স্লবাড়ই হয়ে গেছে। আর জন্মে কর্মদোষ ছিল নিশ্চয়, এজন্মে তাই শাস্তি।'

বীরেন্দ্রনারায়ণ আর যেন সহ্য করতে পারেন না। ঘর থেকে সবেগে তাঁকে বেরিয়ে যেতে দেখা যায়। কিন্তু দরজার কাছে গিয়ে তিনি ফিরে দাঁড়ান। তারপর নেহাত যেন তাচ্ছিল্যভাবে বলবার চেষ্টা করেন, 'তোমার যদি ইচ্ছে হয় তুমি কলকাতায় গিয়ে খোঁজ করতে পার।'

শশিভূষণ উত্তর দেন না। খাতায় কী একটা লেখা তিনি সযত্নে কাটছেন দেখা যায়। সেখানে লেখা আছে।—

'মা আমায় ঘুরাবি কতো
চোখ বাঁধা বলদের মতো।'

জমিদারমশাই ইতিমধ্যে আবার তাঁর কাছেই এসে দাঁড়িয়েছেন। শশিভূষণ যেন লজ্জিত হয়ে খাতাটা মুড়ে ফেলেন। চৌধুবীমশাই বলেন, 'তুমি আজই রওনা হতে পার।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ তাই ভাবছি,' জমিদাব ফিরে চলে যেতেই শশিভূষণের মুখে মৃদু একটু হাসি দেখা যায়।

শশিভূষণ কলকাতায় এসে নির্মলাকে খোঁজবাব চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখেন না। থানায়-থানায় খবব দিয়ে ও খোঁজ নিয়ে, নিজেদেব লোক সর্বত্র লাগিয়ে যেভাবে তিনি নির্মলার জন্য ব্যাকুলভাবে শহর চষে বেড়ান তাতে সত্যি একটু অবাকই হতে হয়। জমিদারের চেয়ে তার যেন বেশি দায় এখন নির্মলাকে খোঁজবার।

কিন্তু এত করেও নির্মলার কোনও খোঁজ মেলে না। শশিভূষণ ক্রমশ হতাশ হয়ে ওঠেন। নির্মলা কি তাহলে কলকাতাতেই নেই? ওই একটি দুধের শিশুকে নিযে এই মহানগরীতে সে কি সত্যিই চিরদিনের মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে?

নির্মলা কিন্তু কলকাতার বাইরে কোথাও যায়নি। অনেক দুঃখ অনেক দুর্যোগের পর রাঁধুনীরূপে একটি গৃহস্থ বাড়িতে সে আশ্রয় পেয়েছে। কিন্তু ভাগ্য তার প্রতি এতটা সুপ্রসন্ন বেশি দিন থাকে না। সেদিন সকালে সে রান্নাঘরে বসে রাঁধছিল। তার ছেলেটিকে একটি ভাঙা খেলনা দিয়ে কাছেই রেখেছিল বসিয়ে। হঠাৎ ছেলেটি ডুকরে হাত-পা ছুড়ে কেঁদে ওঠে। নির্মলা ফিরে দেখে মনিবের দুরন্ত ছেলেটি কখন এসে তার খেলনাটি কেড়ে নিয়েছে।

নির্মলা উঠে এসে মিষ্টি করে বলে, 'ওটা দিয়ে দাও মনু, দেখছ না কাঁদছে।'

'কাঁদছে তো বয়ে গেল!' মনিবের আদরের ছেলে মনু যেমন অসভ্য তেমনি স্বার্থপর।

'ওটা তো তোমার নয়, কেন তুমি নিচ্ছ?'—আবার শান্তস্বরে বলে নির্মলা।

'বেশ করেছি নিচ্ছি এটা তো আমি কাল কিনেছি!' মনু অম্লান বদনে বলে।

'ছিঃ, মিথ্যে কথা বলতে নেই'—নির্মলা মৃদু একটু শাসন করে।

আদুরে গোপাল মনু চিৎকার করে ওঠে, 'আমি মিথ্যেবাদী? তুই, তুই মিথ্যেবাদী!'

দূর থেকে মনুর চিৎকারে তার মা এবার এসে উপস্থিত হন 'কী হয়েছে কী, গণ্ডগোল কীসের?'

মনু একেবারে মা'র কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে কেঁদে উঠে বলে, 'দেখ না মা, বামুন ঠাকরুণ আমায় যা-তা বলে গাল দিচ্ছে।'

মনুর মা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন, 'তুমি তো বেশ লোক বাছা, আমারই খেয়ে-পরে আমার ছেলেকে গালমন্দ! এত বড় তোমার আস্পর্ধা।'

নির্মলা সমস্ত ব্যাপার দেখে হতভম্ব। শান্তস্বরে তবু সে বলে, 'গালমন্দ দিইনি, মিথ্যে কথা বলছিল তাই বলছি।'

'কী—ছোট মুখে বড় কথা!'—মনুর মা গর্জন করে ওঠেন। 'আমার ছেলে মিথ্যেবাদী! পথে-পথে ভেসে বেড়াচ্ছিলে, দয়া করে ঘরে এনে ঠাঁই দিয়েছি, আবার আমার মুখের ওপরই চোট! বেরিয়ে যাও! বেরিয়ে যাও! আমার বাড়ি থেকে।'

এত বড় অপমানেও নির্মলা রেগে ওঠে না। রাগ করবার তার অধিকার কোথায়? খানিক বিষণ্ণভাবে তাকিয়ে থেকে শান্তভাবে বলে, 'কেন মিছে রাগ করছেন, আমার আশ্রয় নেই বলেই তো বার-বার আমায় তাড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখান!'

'ইস! আশ্রয় তো নেই কিন্তু তেজ তো আছে ষোল আনা।' মনুর মা খেঁকিয়ে ওঠেন! 'না বাপু, তোমার মতন রাঁধুনী আমার দরকার নেই; কোনদিন কী রান্নায় মিশিয়ে বাড়িসুদ্ধ মারো আর কী? তুমি এখুনি বেরোও, এখুনি বেরোও, এখুনি এই কাপড়ে, বেরোও বলছি।'

এরপর আর কোনমতেই বুঝি থাকা চলে না। ম্লান অশ্রুসজল মুখে রোরুদ্যমান ছেলেটিকে কোলে তুলে নিয়ে তালি দেওয়া কাঁথাটি জড়িয়ে নির্মলা ধীরে-ধীরে সে-বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।

তারপর পথে-পথে একটি অসহায় নিঃসম্বল সন্তানের জননীর দিন যে কীভাবে কাটে তার বর্ণনাও বুঝি দুঃসহ। দুর্দশার শেষ সীমায় উপস্থিত হয়ে সন্তানকে কোলে নিয়ে ভিক্ষামাত্র যখন তার সম্বল হয়েছে, তখন পথের ধারের একটি গ্যাসের তলায় তার দেখা পাওয়া যায়। শিশুটিকে বুকে করে পথচারীর দয়ার ওপর নির্ভর করে সে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে।

আকাশে ঘনঘটা। ঝিরঝির করে বৃষ্টির আর বিরাম নাই। ঝিরঝিরে বৃষ্টি মাঝে-মাঝে এক-একবার প্রবল হয়ে উঠছে। ছেলেটিকে কোনওমতে বৃষ্টি থেকে ছেঁড়াকাঁথা ঢাকা দিয়ে বাঁচিয়ে তবু নির্মলাকে দাঁড়িয়েই থাকতে হয়। ভিক্ষাটা এখনও বুঝি স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়নি। কেউ কিছু দিতে এলেও লজ্জা ও সঙ্কোচ এসে হাত বাড়াতে বাধা দেয়।

পাশেই একটি সাধারণ চায়ের দোকান। সেখান থেকে বেরিয়ে ছাতা মাথায় দিয়ে একটি লোক নির্মলার কাছ দিয়ে যেতে-যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়। নির্মলা একবার তার মুখের দিকে চেয়েই সঙ্কুচিতভাবে আরও অন্ধকারের দিকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু লোকটি তবু ছাড়ে না। আরও কাছে মুখটা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বলে, 'আরে কে, আমাদের নির্মলা না? নির্মলার কোনও উত্তরের অপেক্ষা না রেখেই উল্লসিত কণ্ঠে বলে, 'ঠিক চিনেছি বাবা! আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারে এমন মেয়েছেলে তো দেখলাম না; তা বাবা জড়োয়া বেনারসীই পর আর ছেঁড়া কাঁথাতেই ঢাক—একবার দেখেছি তো ব্যস ছাপা হয়ে গেছে।' নির্মলা তবু নীরব। লোকটিকে সে অবশ্য চিনতে পেরেছে। যে বাড়িতে পরিতোষ ও সে

প্রথম কলকাতায় আশ্রয় নিয়েছিল, লোকটি তার বাড়িওয়ালা। রাখালরাজ চক্রবর্তী।

রাখালরাজ একটু চুপ করে থেকে হেসে বলে, 'তারপর পথে এসে দাঁড়িয়েছ তা হলে? পথে ভাসিয়ে দিয়ে সে বেটা সটকান, কেমন? সে আগেই জানতাম,—সব ব্যাটাই দেয়। সবাই তো আর রাখালরাজ চক্কোত্তি নয়! একবার পা ফসকে ছিল, ব্যস সেই থেকে রাজরানি করে রেখেছি দেখগে যাও। তা বলি, থাকা হয় কোথায়? ঘরটর নিয়েছ নাকি? নিতেই হবে বাপু। না নিয়ে থাক, চল বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি! খাসা বন্দোবস্ত! খাট পালঙ, বার্নিস করা সিসে-বসানো আলমারি, সব একেবারে মজুত। খালি মাসে-মাসে কিস্তির টাকাটা গুণে গেলেই হল। তা তুমি পারবে...বেটা এখনও সব ফতুর করে যেতে পারেনি, রূপ যৌবন কী বলে...'

রাখালরাজ সোৎসাহে কতক্ষণ বকে যেত কে জানে? কিন্তু নির্মলা এবার অস্ফুট কাতর কণ্ঠে বাধা দিয়ে বলে, 'আমার ছেলের দুদিন ধরে জ্বর! দু'দিন ধরে কিছু খায়নি।'

রাখালরাজের চেহারা তৎক্ষণাৎ বদলে যায়, 'অ্যাঁ, ছেলের জ্বর। রামঃ-রামঃ! এই তো সব মাটি করে দিলে দেখছি? ওই ছেলে-পুলে শুনলেই যে মনটা অন্যরকম হয়ে যায়! দেখ দিকি কোথা থেকে একটা ল্যাঠা বাধিয়ে বসলে? তা ছেলের জ্বর তো রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিজছ কেন?'

রাখালরাজ রীতিমতো বিরক্ত হয়ে ওঠে। নির্মলার কাছ থেকে কোনও উত্তর না পেয়ে নিজের মনে আবার বলে, 'বুঝেছি, দাঁড়াবার জায়গা আর নেই। ভালো ফ্যাসাদ বাধল তো এই সন্ধ্যাবেলায়! তোমায় দেখে এখন চলেই বা যাই কী করে? ভদ্দর লোকের ছেলে হলে না হয় দুটো পয়সা দিয়েই সরে পড়তাম। আমাদের শালার যত মরণ, তোমায় ফেলেও যেতে পারি না।'

রাখালরাজের অস্থিরতাটা সত্যি উপভোগ্য। একটু ইতস্তত করে সে আবার বলে, 'চল, নেহাত আমার গেরো, নিয়ে যেতেই হবে। সে খাণ্ডার মাগী আবার দু-শো কথা শোনাবেখন। তা শোনালে আর কী করছি বলো। ছেলের জ্বর! দেখ দিকি—নাও এস।'

ছাতাটি সযত্নে নির্মলার মাথায় ধরে রাখালরাজ এবার অগ্রসর হয়। নির্মলাকেও সঙ্গে যেতে হয়।

এটুকু অনুগ্রহে আপত্তি জানাবার মতো অবস্থা তার এখন নয়। রাখালরাজ যেতে-যেতে অভ্যাস মতো বকতে শুরু করে, 'ছেলের জ্বর তা আমাদের ওখানে দুদিন আগে যাওনি কেন? গেলে কী তোমায় কেউ ঝাঁটা মেরে বিদায় করত! বলিহারী বুদ্ধি বটে! তা-না হলে আর বলে মেয়ে মানুষ!'

নির্মলাকে সঙ্গে নিয়ে, বাড়ির বাইরে পৌঁছে কিন্তু রাখালরাজ একবার থামে, তারপর একটু যেন ইতস্তত করে বলে, 'এখানে একটু দাঁড়াও বাপু, আমি আগে একটু হাওয়া বুঝে আসি। বলা তো যায় না, এখন ডাকিনী না যোগিনী, না মোহিনী কোন মূর্তিতে আছেন।'

নির্মলাকে সেখানে দাঁড় করিয়ে রেখে রাখালরাজ বেশ একটু সভয়েই নিজের ঘরে গিয়ে ঢোকে। তারপর একগাল হেসে দুবার মাথা চুলকে বলে, 'কাপড় গুছোচ্ছিস বুঝি?'

যাঁকে উদ্দেশ্য করে মোলায়েম কণ্ঠে এ প্রশ্ন করা হয় রাখালরাজের সেই পরিবার কাংশকণ্ঠে খেঁকিয়ে ওঠেন, 'কেন দেখতে পাচ্ছ না? চোখের মাথা খেয়েছ?'

'ওই তো তোর দোষ। একটা ভালো করে কথা বলতে গেলাম!'—রাখালরাজ যেন অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ।

কিন্তু অপর পক্ষের তাতে কিছু মাত্র নরম হওয়ার লক্ষণ দেখা যায় না। 'আর ভালো কথায় কাজ নেই। আমার বলে মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল,—সংসার নিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি, উনি ভালো কথা শোনাতে এলেন!'

রাখালরাজ হাওয়া বুঝে অত্যন্ত সহানুভূতির সুরে বলে, 'সত্যি তোর বড্ড খাটুনি।'

'আর সোহাগে কাজ নেই! কী রাজ ঐশ্বয্যি দিয়ে রেখেছ? খাটুনি নিয়ে আবার আফসোস।' মুখ নাড়া দিয়ে বাড়ির গিন্নি বাইরে যাওয়ার উপক্রম করেন।

'আহা রাগ করিস কেন?' রাখালরাজ ব্যস্ত হয়ে ওঠে, 'ভাবছিলাম তোর একটা সঙ্গের লোক-টোক থাকত, একটু কাজের সুসার হত, দুদণ্ড গল্প-টল্প করতিস...'

রাখালরাজের কথাটা আর শেষ করতে হয় না। আগুনে যেন ঘি পড়ে। 'বলি মতলবটা কী বল তো? বুড়ো বয়সে পালক গজিয়েছে বুঝি?' গিন্নি মারমুখী হয়ে ওঠেন।

রাখালরাজ সভয়ে দু-পা পিছিয়ে বলে, 'আরে রামঃ-রামঃ! কী যে বলিস তুই, আমি মানে—আমাদের সেই ভাড়াটে মেয়েটা ছিল না,—বড় দুঃখে পড়েছে। পথে-পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিল...'

'ও হতচ্ছাড়া, তুমি তাকে ফুসলে এনে এইখানেই রাখতে চাও? আমারই বুকের ওপর বসে দাড়ি ওপড়ান?' গিন্নি এবার সত্যি গলার চোটে পাড়া মাথায় করে বলেন—'আন না একবার দেখি, মুড়ো খ্যাংরা দিয়ে বিদেয় করব। আমার নাম বিদ্যেধরী...'

রাখালরাজ শশব্যস্ত হয়ে বলে, 'আহা করিস কী! শুনতে পাবে। এই বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।'

'কী? একেবারে বাড়িতে এনে তুলেছ বুঝি! দাঁড়াও'—বলে বিদ্যেধরী রণ-রঙ্গিনী মূর্তিতে ঘর থেকে বার হয়। রাখালরাজ সভয়ে পিছু-পিছু তাকে সামালাবার চেষ্টায় যেতে-যেতে বলে, 'আরে শোন...'

কিন্তু কে কার কথা শোনে। একেবারে বাঘিনীর মতো বিদ্যেধরী গিয়ে নির্মলার সামনে দাঁড়ায়। রাখালরাজ ব্যাকুলভাবে জানায়, 'শোন-শোন, ওর ছেলের জ্বর, ক'দিন ধরে খেতে পায়নি।'

বিদ্যেধরী একবার রাখালরাজ, একবার নির্মলার মুখের দিকে বারকয়েক অগ্নি দৃষ্টিতে তাকায়। তারপর তেমনি ঝাঁঝাল গলায় বলে, 'হ্যাঁগা ভালো মানুষের মেয়ে! ছেলে নিয়ে তো পথে ভেসেছ বুঝেছি, কিন্তু গলায় ফাঁস দেওয়ার আর কী মানুষ ছিল না শহরে? আমার সর্বনাশ করতে এই উজবুকটিকে ধরেছ কেন?'

নির্মলা সকাতর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলে, 'না, না— আমি চলে যাচ্ছি, আমি তোমাদের কোন ক্ষতি করতে চাইনি।'

'না ক্ষতি করতে চাও না! রোগা ছেলে নিয়ে ঘরের দরজা থেকে শুকনো মুখে ফিরে যাও, আর আমাদের শাপ-মন্যি লাগুক আর কী।'

নির্মলা বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বিদ্যেধরী আবার ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, 'ঢং করে আর দাঁড়িয়ে কেন? দয়া করে এসে বাড়িতে ঢোকো, কৃতার্থ হই। ভালো আপদ হয়েছে।'

মুখখানা বিরক্তিতে বিকৃত হলেও দেখা যায় ছেলেটিকে সে নিজেই কোলে তুলে নিয়েছে। তারপর আর একবার খেঁকিয়ে উঠে সে বলে, 'একেবারে সাবাড় করে এনেছ দেখছি! গা একেবারে পুড়ে যাচ্ছে যে!'

নির্মলাকে ছেড়ে এবার স্বামীর দিকে বিদ্যেধরী মনোযোগ দেয়, 'হাঁ করে দাঁড়িয়ে কেন? দুধ-টুদ আনতে হবে না, রোগা ছেলে খাবে কী?'

'হ্যাঁ, এই যে যাই'—বলে থতমত খেয়ে রাখালরাজ বেরিয়ে যায়।

হেঁচকা দিয়ে নির্মলার হাতটা টেনে বিদ্যেধরী যেন জেলের কয়েদীর মতো তাকে ধরে নিয়ে যায় ভেতরে।

নির্মলা আবার আশ্রয় পায়।

কয়েকমাস কেটে গেছে। শশিভূষণ এখনও নির্মলার বা তার ছেলের কোনও সন্ধান পাননি। তবু তিনি হাল ছেড়ে দেননি। তাঁর কেমন একটা অটল প্রতিজ্ঞা যে নির্মলাকে খুঁজে বার করতেই হবে।

অনেক দিন পরে একদিন থানা থেকে প্রথম যেন আশা পাওয়া যায়।

থানার ইনস্পেক্টার বলেন, 'দেখুন এবারেও ঠিক করে বলতে পারছি না, তবে আমার মনে হয় এই ঠিকানাতে একবার খোঁজ করে দেখতে পারেন।'

'আচ্ছা, তাই দেখি একবার!' বলে ঠিকানা নিয়ে শশিভূষণ বিদায় নেন।

ইনস্পেক্টার হেসে বলেন, 'কী মশাই, একটা ধন্যবাদ দিয়েও গেলেন না?'

'ধন্যবাদটা খুঁজে পাওয়ার পর দেবখন।'—বলে, শশিভূষণ আর অপেক্ষা করেন না। সোজা গ্রামেই রওনা হন।

নির্মলা এখনও সেই আশ্রয়েই আছে, কিন্তু তার ছেলেটির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। সে জ্বর আর তার সারেনি। ধীরে-ধীরে শীর্ণ হয়ে সে এখন প্রায় বিছানায় মিশিয়ে গেছে বললেই হয়।

নির্মলা সেদিন রুগ্ন ছেলের বিছানার পাশেই আচ্ছন্নের মতো বসে ছিল। অভাব, দুঃখ, দুর্ভাবনা, হতাশা সমস্ত মিলে তার মুখে এমন একটা ছাপ ইতিমধ্যে এঁকে দিয়েছে যে তাকে চেনাই যায় না। তার দৃষ্টি দেখে মনে হয় যেন পৃথিবীতে কোথাও আর আলো তার জন্যে নেই। বিদ্যেধরী পাশের ঘর থেকে এসে নির্মলাকে তীক্ষ্ণকণ্ঠে শাসন করে উঠল, 'চুপ করে বসে আছ যে বড়। ক'টা বাজে খেয়াল আছে। ওষুধ দেওয়ার সময়টাও আমি বলে দেব? শুধু বসে ভাবলেই তো ছেলের রোগ সারবে না?'

ক্লান্ত কণ্ঠে নির্মলা বললে, 'আর সারবে বলে তো আশা হচ্ছে না দিদি?'

'শোন কথা! অসুখ আর কারুর ছেলের হয় না যেন কোনদিন।' বিদ্যেধরী যেন জ্বলে উঠল!—'তুমি উঠে একটু অন্য কাজে যাও দেখি! আমি একটু বসি। সারাদিন গুমরে-গুমরে নিজেও যে সাবাড় হওয়ার জোগাড় করেছ।'

নির্মলা উঠে দাঁড়াতেই হঠাৎ বাইরে থেকে রাখালরাজের গলা শোনা গেল। রাখালরাজ কাকে যেন বলছে, 'আসুন-আসুন এই বাড়ি বইকী। আলবত এই বাড়ি। রাখালরাজ চক্কোত্তি বললে এ তল্লাটে কোন বেটা না চিনবে।'

নির্মলা ও বিদ্যাধরী দুজনে একটু ত্রস্ত হয়ে উঠল। রাখালরাজ সর্বপ্রথম ঘরে ঢুকে একগাল হেসে বাহাদুরী স্বরে বললে,—'হুঁ, হুঁ, আগেই জানতাম এ যে-সে ঘরের মেয়ে নয়! ও যতই ছাই চাপা দাও, আগুন কি আর চাপা থাকে? তা ছাড়া রাখালরাজের চোখকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়।'

বিদ্যাধরী খেঁকিয়ে উঠল, 'কী বকছ কী?'

কিন্তু রাখালরাজের আজ বুঝি একটা মস্ত কীর্তির দিন। এই সর্বপ্রথম বোধ হয়

পরিবারের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে সোৎসাহে সামনের দরজার দিকে ফিরে সে বললে,—'এই যে আসুন না, আসুন না, এই ঘরে। এখানে লজ্জা করবার কেউ নেই।'

বিদ্যাধরীকে একবার দেখিয়ে দিয়ে সে আবার বললে, 'আমার ইস্তিরী। ও সকলের সামনে বেরোয়।'

ঘরে অপরিচিত লোককে ঢুকতে দেখে বিদ্যাধরী রাখালকে একবার রক্ত চক্ষু দেখিয়ে ঘোমটা দিয়ে সরে দাঁড়াল। নির্মলা কিন্তু কঠিন হয়ে যেখানে ছিল সেখানেই রইল দাঁড়িয়ে। ঘরে যাঁরা ঢুকেছেন তাঁদের সে চেনে। তাঁদের একজন জমিদার বীরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী স্বয়ং আর একজন শশিভূষণ। সঙ্গে করে গ্রামের ডাক্তারকেও তাঁরা নিয়ে এসেছেন। আর এনেছেন, ফলের একটি ঝুড়ি। সেটি বিছানার কাছে এনে শশিভূষণ নামিয়ে রাখতেই রাখালরাজ একগাল হেসে বললে, 'কেমন ঠিক মিলেছে তো। মিলতেই হবে, আমি সেই গোড়া থেকেই জানি...দুঃখিনী সীতার উদ্ধার কি না হয়ে পারে? কিন্তু রাখালরাজ অযত্ন করেছে সে কথাটি বলতে পারবে না...'

বীরেন্দ্রনারায়ণ ঘরের সকলের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বিছানায় শোয়ান রুগ্ন শিশুটিকেই বিশেষ ভাবে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। এবার রাখালরাজকে বাধা দিয়ে গম্ভীর ভাবে নির্মলার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন.—'কতদিন অসুখ হয়েছে?'

রাখালরাজই ব্যস্ত হয়ে জবাব দিলে, 'আজ্ঞে তা কম দিন নয়, দেখতে-দেখতে এই ক'মাস হয়ে গেল। তাও ভাগ্যে এই রাখালরাজ রাস্তা থেকে দেখে আদর করে ঘরে এনে...'

বিদ্যাধরীর চোখের শাসনেই রাখালরাজ কথাটা মাঝপথে শেষ করলে, চৌধুরীমশাই নির্মলার দিকে ফিরে তাকে উদ্দেশ্য করেই আবার বললেন,—'অনেক খোঁজ করে আমায় এখানে আসতে হয়েছে। তোমায় গোটাকতক কথা বলতে চাই।'

নির্মলা পাথরের মূর্তির মতো নিথর নিস্তব্ধ। কোনও কথাই তার মুখ দিয়ে বার হল না।

বীরেন্দ্রনারায়ণ আবার বললেন, 'এ ছেলের যা অবস্থা হয়েছে দেখছি উপযুক্ত চিকিৎসা করেও একে বাঁচানো বোধহয় কঠিন। কিন্তু তবু যদি বাঁচে তাহলে এঁকে এই দারিদ্রের মধ্যে মানুষ করে তুলতে তুমি তো পারবে না।'

বীরেন্দ্রনারায়ণ নির্মলার কাছে একটা উত্তরের আশাতেই বোধ হয় চুপ করলেন। কিন্তু নির্মলা তবু নীরব। তার চোখের দৃষ্টিতে শুধু কী যেন একটা দুর্জ্ঞেয় দীপ্তি।

'আমি একে এখান থেকে নিয়ে যেতে চাই।' বীরেন্দ্রনারায়ণের কণ্ঠস্বরে এবার সত্যকার ব্যাকুলতা ফুটে উঠল, 'ওর চিকিৎসার কোনও ত্রুটি আমি রাখব না। যদি আমাদের ভাগ্যে ও বাঁচে তাহলে ওকে মানুষ করবার জন্য যা প্রয়োজন সবই আমি করব। কোনও অভাব ও কোনদিন জানতে পারবে না।'

রুগ্ন শিশুটি এতক্ষণ ধরে লোলুপ ভাবে ফলের ঝুড়িটির দিকে চেয়েছিল। বীরেন্দ্রনারায়ণের কথার মাঝখানেই সে ক্ষীণ কাতর কণ্ঠে বায়না করে উঠল, 'আমি ওই একটা নেব।'

শশিভূষণ তাড়াতাড়ি দুটি ফল তুলে বীরেন্দ্রনারায়ণের হাতে দিলেন। বীরেন্দ্রনারায়ণ সস্নেহে সে দুটি ছেলেটির হাতে দিতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ হিংস্র বাঘিনীর মতো সে ফল তাঁর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, নির্মলা মূর্তিমতী প্রলয়ের মতো তাঁদের দিকে ফিরে দাঁড়াল। তীব্র বিদ্বেষের স্বরে বললে, 'আমার ছেলেকে আপনি নিয়ে যেতে এসেছেন?

তাকে চিকিৎসা করে বাঁচিয়ে তুলবেন? তাকে মানুষ করবেন? কেন আপনার এত অনুগ্রহ বলুন তো?'

ছেলেটি তখন ফল না পেয়ে কাতরভাবে কেঁদে উঠেছে। সেদিকে একবার চেয়ে বীরেন্দ্রনারায়ণ বললেন, 'আমায় ভুল বুঝো না...আমি তোমার ভালোর জন্যই—'

কিন্তু নির্মলার স্বর আরও হিংস্র হয়ে উঠল, 'হ্যাঁ, এই ছেলের ভালোর জন্যই আপনার দুর্ভাবনার সীমা নেই। আপনি জানেন ওর দেহে আপনাদেরই বংশের রক্ত ও আপনাদের নিজের। তাই ওকে বাঁচাতে হবে, মানুষ করতে হবে। আর আমি, আমি শুধু উনুনের পোড়া ছাই। পুড়ে খাক হয়ে যা কাজে লাগবার লেগেছি। এখন আস্তাকুড়েই তাই আমার জায়গা। কিন্তু যা আশা করেছেন তা হবে না।'

'কিন্তু তা না হলে ও ছেলে বাঁচবে না!'—বীরেন্দ্রনারায়ণের এমন দুর্বল কাতর কণ্ঠস্বর কেউ বুঝি কখনও শোনেনি।

'বাঁচবার দরকার নেই!' নির্মলা যেন সত্যি উন্মাদ হয়ে গেছে, 'ও মরবে আমি জানি, আর তাই আমি চাই। হ্যাঁ, তাই আমি চাই। ওকে আপনি নিয়ে যেতে পারবেন না, এ আপনার জমিদারী নয়। ও এইখানে তিলে-তিলে মরবে। আর আপনি জানবেন আপনার বংশধর না খেতে পেয়ে, বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে। যান-যান এখান থেকে।'

রুগ্ন শিশু তখনও কাঁদছে 'আমায় ওই দিলে না কেন? আমায় ওই দাও।'

'না!' বলে চিৎকার করে সমস্ত ফলের ঝুড়িটা দরজার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নির্মলা উন্মত্তভাবে বললে,—'যান নিয়ে যান আপনাদের জিনিস। আমার ছেলের মুখে এর বদলে আমি বরং বিষ তুলে দেব, তবুও এ জিনিস তাকে ছুঁতে দেব না।'

নির্মলার সে মূর্তির সামনে বীরেন্দ্রনারায়ণও এক মুহূর্তে যেন কেমন অসহায় অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেলেন। শীর্ণ ছেলেটি দুর্বলভাবে তখনও ডুকরে কাঁদছে। একবার সেদিকে একবার নির্মলার দিকে চেয়ে কম্পিত পদে তিনি যেন বজ্রাহতের মতো অচেতন ভাবে ঘর থেকে ধীরে-ধীরে বেরিয়ে গেলেন। শশিভূষণ ও ডাক্তারকেও তাঁর পিছু-পিছু ঘর থেকে যেতে হল।

নির্মলা আবার যেন পাথরের মূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে গেছে, তার কাছে এসে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বিদ্যাধরী বললে, 'কী করলে নির্মলা?'

হঠাৎ যেন নির্মলার চেতনা ফিরে এল, আর্তনাদের মতো তার কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল, 'কী করলাম আমি। আমি কী করলাম দিদি? মা হয়ে আমি ছেলের মরণ কামনা করলাম, তাকে অভিশাপ দিলাম।'

বিছানায় লুটিয়ে পড়ে ছেলেটিকে বুকের ভেতর প্রাণপণে চেপে ধরে সে কেঁদে উঠল। 'এ যে আমার মনের কথা নয় ঠাকুর। এ যে আমার মনের কথা নয়!'

বস্তি থেকে বার হয়ে তন্দ্রাচ্ছন্নের মতো বীরেন্দ্রনারায়ণ বড় রাস্তায় তাঁর গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। শশিভূষণ তখনও রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখে বললেন, 'তুমি এস শশিভূষণ।'

শশিভূষণ তার দিকে খানিক অদ্ভুত ভাবে চেয়ে থেকে বললেন,—'না, আমি আর যাব না?'

'তুমি কি তা হলে পরে আসবে?'—ক্লান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন চৌধুরীমশাই।

'আমি একেবারে ছুটি নিচ্ছি চৌধুরীমশাই।'—বলে, শশিভূষণ অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

বীরেন্দ্রনারায়ণ বিমূঢ় ভাবে শশিভূষণের দিকে চেয়ে রইলেন। শশিভূষণের কথার মর্ম সত্যিই বোঝা যায় না।

শশিভূষণ একটু চুপ করে থেকে একটু যেন আবেগের সঙ্গেই এবার বললেন,—'হ্যাঁ চৌধুরীমশাই অনেককাল আপনার নুন খেলাম, নেমকহারামিও কখনও করিনি। ভালো, মন্দ ন্যায়-অন্যায় আপনার যাতে ভালো হবে মনে করেছি অম্লান বদনে তা করেছি। কিন্তু আর ভালো লাগছে না। কোথা থেকে অনেক যেন ময়লা জমে গেছে মনে। ভাবছি প্রয়াগে গিয়ে একটা ডুব দিয়ে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াব। একটা পেট ঠিক চলে যাবে।'

বীরেন্দ্রনারায়ণ তবু বিমূঢ় ভাবে বললেন, 'তুমি যদি তীর্থ ভ্রমণ করতে চাও...'

'না, তীর্থে-টীর্থে আমার বিশ্বাস নেই! আমি এমনি বাউন্ডুলের মতো ঘুরে বেড়াব।' বলে শশিভূষণ ম্লানভাবে একটু হাসলেন।

বীরেন্দ্রনারায়ণ খানিকক্ষণ কোনও কথাই বলতে পারলেন না, তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে প্রায় অস্ফুট স্বরে বললেন, 'তুমিও আমায় ছেড়ে যাচ্ছ শশি।' আবার একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'আমিও যদি সব ছেড়ে যেতে পারতাম।'

শশিভূষণ একটু ব্যাকুল হয়ে উঠলেন এবার, 'না-না আপনি কোথায় যাবেন? গ্রামে কাল আপনার নাতির অন্নপ্রাশন। আপনি সেখানে না থাকলে চলে?'

বীরেন্দ্রনারায়ণ পৌত্রের অন্নপ্রাশনের উল্লেখে মনে হল একবার যেন কেঁপে উঠলেন, তারপর ক্লান্ত কণ্ঠে বললেন, 'হ্যাঁ, আমায় যেতেই হবে।'

শশিভূষণ ড্রাইভারকে গাড়ি চালাতে আদেশ দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

বীরেন্দ্রনারায়ণকে নিয়ে গাড়ি দূরের রাস্তায় অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পরও খানিকক্ষণ তাঁকে সেইখানেই অন্যমনস্ক ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। তারপর ধীরে-ধীরে নগরের জনতার মাঝে কখন তিনি মিশে গেলেন কে জানে!

বিজয় ও অণিমার প্রথম সন্তান, জমিদারের প্রথম পৌত্রের অন্নপ্রাশন। জমিদার বাড়িতে বিরাট উৎসব। উমানাথই পুরোহিত রূপে সমস্ত অনুষ্ঠান সমাধা করতে বসেছেন। গ্রামসুদ্ধ নিমন্ত্রিত হতে কারুর বাকি নেই। বহুদিন বাদে মাধবীও বাপের বাড়ি এসেছে। তাকে অনুষ্ঠানের আগেই এক কোণে সোৎসাহে শাঁখ বাজাতে দেখে অণিমা হেসে বললে, 'তুমি যে আগে থাকতেই শাঁখ বাজাতে শুরু করলে ঠাকুরঝি, এখন যে দেবি আছে।'

মাধবী চিরদিনের মতোই এখনও হাসিখুশি আমুদে। হেসে বললে, 'যা পারি বাজিয়ে নিই বৌদি। ভাইপোর বিয়ে অবধি হয়তো বাঁচব না, ভাতেই তাই সাধ মিটিয়ে নিচ্ছি।'

বাবা, তোমার আশা তো কম নয়! অণিমা স্নিগ্ধ হেসে বললে 'এরই মধ্যে ভাইপোর বিয়ের কথা ভেবে ফেলেছ! তা আশা যখন করেছ তখন বিয়ে না দেখে যাচ্ছ কোথায়?'

'না বউদি, আশা করলেই কি হয়!' মাধবীর গলার স্বর একটু ভারী হয়ে এল। 'মা'র কতই তো আশা ছিল কিন্তু তিনি আর দেখে যেতে পারলেন কই?'

অন্নপূর্ণা কিছুদিন হল অণিমার বিবাহের পরই এ-সংসার থেকে চিরকালের মতো বিদায় নিয়েছে।

তাঁর কথা মনে করে দুজনে খানিক নিস্তব্ধ হয়ে রইল। অণিমাই প্রথম ব্যথিত স্বরে বললে, 'এই আনন্দের দিনে আর একজনের কথাও মনে হচ্ছে ঠাকুরঝি।'

মাধবী তার দিকে খানিক অদ্ভুতভাবে চেয়ে থেকে হাসি দিয়ে সমস্ত ব্যাপার হালকা

করার চেষ্টায় বললে, 'আচ্ছা খুব হয়েছে! সতীন না হলে আর সুখ হচ্ছে না বুঝি? দাদার কাছে কোনওদিন বলে ফেলনি তো?'

'না, তুমি যখন বারণ করেছ!'—মৃদুকণ্ঠে বললে অণিমা।

'খুব লক্ষ্মী মেয়ে!' বলে, হেসে তাকে আদর করে মাধবী বললে, 'এখন ওদিকে যাও দেখি, দাদা হাঁ করে বৎসহারা গাভীর মতো তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তিলেক অদর্শনেই অন্ধকার!'

মাধবী হেসে চলে যাওয়ার পর অণিমা নিজের ঘরে যাওয়ার পথেই স্বামীর দেখা পেয়ে পেছন থেকে হেসে বললে,—'কীগো, কাকে খুঁজছ এমন আকুল হয়ে?'

'এই যে তোমাকেই খুঁজছি।'—বলে বিজয় ফিরে তাকালে।

অণিমা স্নিগ্ধ হেসে বললে, 'তাই ভালো, কিন্তু একটু সাবধান হতে হয়। ঠাকুরঝি ঠাট্টা করছিল যে।'

'কী ঠাট্টা করছিল?'

'বলছিল তোমার নাকি তিলেক অদর্শনেই অন্ধকার।' বলে অণিমা হাসল।

বিজয়ও হেসে বললে, 'নেহাত মিথ্যে বলিনি। অবস্থাটা প্রায় তদ্রুপ, কিন্তু শোন, বড় ভাবনায় পড়েছি। বাবা এখনও এলেন না কেন বুঝতে পারছি না, সকালের গাড়িতে আসবার কথা।'

'তা হলে এই গাড়িতেই আসবেন।' বিজয়কে আশ্বাস দিয়ে অণিমা বললে, 'নিশ্চয় কোনও দরকার পড়েছে সেখানে। নইলে তিনি কখনও দেরি করতে পারেন আজকের দিনে?'

হঠাৎ দুজনের কথার মাঝখানে শাঁখ হাতে ঘরে ঢুকল মাধবী। বকুনি দিয়ে বললে, 'বাঃ তোমরা তো বেশ? গল্প করবার আর সময় পেলে না! পুরুতমশাই বসে আছেন। সময় হতে চলল। তোমরা যাও।'

'এই যে আমি যাচ্ছি।'—বিজয় যেন অপ্রস্তুত,—'কিন্তু বাবা তো এলেন না।'

'বাবা এই এলেন। আমি তাঁকে খবর দিতে যাচ্ছি। তোমরা আগে ছেলে নিয়ে যাও দেখি ওখানে। খোকা কোথায়?'

'ঝি যে তাকে বাইরে নিয়ে গেল,'—বললে অণিমা।

'দেখ দেখি ঝির আক্কেল!' মাধবী বিরক্ত হয়ে উঠল, 'এখন কি বাইরে বেড়াতে যাওয়ার সময়। যাও তাকে ডাকিয়ে নাও। আমি যাচ্ছি বাবার কাছে।'

মাধবী বাবার ঘরে ঢুকেই একটু বিস্মিত হয়ে গেল। বীরেন্দ্রনারায়ণ ঘরের একধারে মাথা নিচু করে বসে আছেন। তাঁর বসার ভঙ্গিটাই কেমন যেন অদ্ভুত। মনে হয় হঠাৎ কী যেন অপ্রত্যাশিত আঘাতে তিনি ভেঙে পড়েছেন।

মাধবী উৎকণ্ঠিতভাবে ডাকল,—'বাবা!'

মনে হল বীরেন্দ্রনারায়ণ যেন শুনতে পাননি। কাছে এসে তাঁর মুখের চেহারা দেখে আরও উদ্বিগ্ন হয়ে মাধবী জিজ্ঞাসা করলে, 'কী হয়েছে বাবা? তোমার শরীর খারাপ?'

বীরেন্দ্রনারায়ণ মুখ তুলে মাধবীর দিকে তাকালেন। ম্লান কণ্ঠে বললেন, 'শরীর? না, শরীর তো ভালোই আছে।'

বাবার এমন কণ্ঠস্বর মাধবী আগে শোনেনি। অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে উঠলেও আসন্ন অনুষ্ঠানের খাতিরে সে বললে, 'ওদিকে যে সময় হয়ে গেছে। তোমার জন্যই সবাই অপেক্ষা করে আছে। তুমি চল।'

'আমি...আমি যাব?' বীরেন্দ্রনারায়ণ বিমূঢ়ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন। একটু চুপ করে থেকে ধরা গলায় বললেন, 'আমি না গেলে হয় না?'

'কী বলছ বাবা?' মাধবী অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠল, 'খোকার ভাত, তুমি থাকবে না, তা কি হয়?'

'খোকার ভাত! না, আমার নিশ্চিত যাওয়া দরকার।' বীবেন্দ্রনারায়ণ জোর করে উঠে দাঁড়াতে গিয়েও যেন পারলেন না। আবার বসে পড়ে হঠাৎ শঙ্কাতুর কণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু আমার যে কেমন ভয় হচ্ছে মাধবী!'

'সে কী কথা বাবা? কী বলছ তুমি?' মাধবী এবার অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে উঠল।

বীরেন্দ্রনারায়ণ আবার তার দিকে খানিক উদভ্রান্তের মতো চেয়ে থেকে ধীরে-ধীরে বললেন, 'তুই...তুই বুঝতে পারবি না মাধবী। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যেন কোনও অমঙ্গল...যেন...'

তিনি কথাটা আর শেষ করতে পারলেন না। মাধবী কিছু ভালো করে বুঝতে না পারলেও এ অবস্থায় শক্ত হওয়াই উচিত বুঝে বললে,—'ছিঃ বাবা! এসব কথা বলতে আছে! তুমি তো এমন নও।'

বীরেন্দ্রনারায়ণ ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর জোর করে যেন শক্তি সংগ্রহ রে বললেন, 'না, আমি এমন নই, আমি চিরকাল শক্ত, কঠিন। কিছুতেই আমি ভেঙে ড়িনি। চ, চ, আমি যাচ্ছি।'

বীরেন্দ্রনারায়ণ কম্পিত পদে নিজেই এগিয়ে গেলেন। ব্যাপার কিছুই বুঝতে না পেয়ে র্ভাবনায় মাধবীর চোখে তখন জল এসেছে। আঁচলে চোখের জল মুছে সে বাবাকে অনুসরণ রলে।

অনুষ্ঠানের জায়গায় ওদিকে তখন হইচই শুরু হয়ে গেছে। প্রাথমিক ক্রিয়া কর্ম শষ করে পুরোহিত উমানাথ খোকাকে আনতে বললেন। কিন্তু যে ঝি তাকে নিয়ে গেছে ার দেখা নাই। এদিকে শুভ লগ্ন নষ্ট হয়ে যায়।

বিজয় ব্যস্ত হয়ে উঠে বললে, 'কই, এখনও খোকাকে নিয়ে এল না। সে ঝি গেল কাথায়?'

চারিদিকে ছুটোছুটি পড়ে গেল। এদিক-ওদিক খোঁজবার পর দেখা গেল ঝি খোকাকে য়ে নিশ্চিন্ত মনে বাড়ির বাইরের বাগানে হাওয়া খাচ্ছে। সকলের ধমক খেয়ে সে খোকাকে কালে নিয়ে সভামণ্ডপের দিকে ব্যস্তভাবে দৌড়ে গেল।

বীরেন্দ্রনারায়ণ তখন বাইরের সিঁড়ি দিয়ে মাধবীব সঙ্গে নামছেন। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে তনি ভীতস্বরে বললেন, 'না, আমি যাব না মাধবী! আমি যেতে পারছি না..'

বীরেন্দ্রনারায়ণ বুঝি টলেই পড়ে যাচ্ছিলেন, মাধবী তাকে ধরে ফেলে বললে, 'একী বা! কেন তুমি অমন করছ?'

উদভ্রান্তভাবে বীরেন্দ্রনারায়ণ বললেন, 'কেন! কেন!' তারপর সভামণ্ডপ প্রবেশ থের দিকে চেয়ে তিনি হঠাৎ আতঙ্কে শিউরে উঠলেন। সেই সঙ্গেই সভামণ্ডপ থেকে ভীত ার্তনাদ উঠল অসংখ্য লোকের কণ্ঠে।

খোকাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি দৌড়ে আসতে গিয়ে বাইরের দরজার চৌকাঠে হোঁচট য়ে ঝি খোকাকে সুদ্ধ সজোরে নিচের উঠানে আছাড় খেয়ে পড়েছে।

এক মুহূর্তের একটা রূদ্ধশ্বাস স্তব্ধতা!

তারপরই আবার চারিদিক শঙ্কিত ব্যাকুল চিৎকারে মুখর হয়ে উঠল।

'জল, জল, ডাক্তার।'

একজন গিয়ে খোকাকে মাটি থেকে তুলে নিলে। তার শরীর রক্তাক্ত। কোনও সাড়া নেই।

বীরেন্দ্রনারায়ণ ছাইয়ের মতো পাংশুমুখে সেদিকে চেয়ে এতক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। হঠাৎ পাগলের মতো বলে উঠলেন, 'আমি জানতাম, আমি জানতাম মাধবী।'

কাঁপতে-কাঁপতে তিনি সেইখানেই বসে পড়লেন, মাধবী কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ওধারে দেখা গেল, অণিমার কোলে কে খোকাকে এনে তুলে দিয়েছে। খোকার সাড় তখনও ফিরে আসেনি। যন্ত্রচালিতের মতো অণিমা তাকে কোলের ওপর ধরে নিয়ে বসে আছে। তার চোখে জল পর্যন্ত নেই। একবার মুখ তুলে স্বামীর দিকে তাকিয়ে সে শূন্য দৃষ্টিতে সামনে চেয়ে বসে রইল।

কয়েকজন খোকার মুখে জলের ছিটে দিচ্ছিল। কে একজন যেন খবর দিলে, ডাক্তারবাবু আসছেন।

নগরের ওপর সন্ধ্যার অন্ধকার হতাশার মতো গাঢ় হয়ে এসেছে, দরিদ্র পল্লীতে ধোঁয়ার ও ধূলিতে বিষাক্ত সে অন্ধকার নেমে এসেছে রুদ্ধশ্বাস বেদনার মতো, এমন একদিনে পরিতোষ নির্মলাকে আবার খুঁজে পেল।

বাড়ির বাইরের দাওয়ায় সিঁড়ির ধারে নির্মলা শূন্য দৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে বসে আছে। অন্ধকারে তার মুখ ভালো করে দেখা যায় না। পরিতোষ ধীরে-ধীরে কাছে এসে দাঁড়াল।

নির্মলা পদশব্দে মুখ তুলে তার দিকে খানিকক্ষণ অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে রইল। মনে হল পরিতোষকে সে যেন চিনতে পারছে না। অনেকক্ষণ বাদে ক্লান্ত বিষণ্ণ কণ্ঠে সে বললে, 'এসেছ পরিতোষদা! এতদিন বাদে এলে?'

এ-কণ্ঠস্বর পরিতোষের কাছেও অপ্রত্যাশিত। হৃদয়ের কোনও গভীর ক্ষত থেকে এ-স্বর যেন রক্তাক্ত হয়ে বেরিয়ে আসছে। পরিতোষ কাতরভাবে বললে, 'আমি যে তোমায় খুঁজে পাইনি নির্মলা। তোমায় খোঁজবার জন্য এতদিন কী না করেছি। এতদিন...'

'এখন খুঁজে পেয়েছ তো? কিন্তু পেয়ে কী লাভ হল।'—নির্মলার দৃষ্টি উদভ্রান্ত, কথা কেমন যেন অসংলগ্ন। 'কী দেখতে তুমি এলে, কাকে দেখতে? খোকাকে? খোকাকে দেখতে?'

হঠাৎ নির্মলার কণ্ঠস্বর যেন রুদ্ধ হয়ে গেল। পরিতোষ অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠে বললে, 'হ্যাঁ খোকা। খোকা কোথায়? কেমন আছে?'

নির্মলার দৃষ্টি আবার কেমন যেন বদলে গেল। যেন অত্যন্ত সহজভাবে সে ধীরে ধীরে বললে, 'খোকা খুব ভালো আছে! খুব ভালো! আর তার কোনও অসুখ নেই, কোনওদিন আর তার অসুখ হবে না।'

পরিতোষ ঠিক কিছু বুঝতে না পেরে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করে বললে, 'চল নির্মলা ভেতরে চল।'

'না, না ভেতরে যাব না, ভেতরে যেতে পারব না।' নির্মলা আবার যেন কোনও দুর্বোধ্য ভয়ে শিউরে উঠল, তারপর অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, 'ওরা খোকাকে এইখান দিয়ে নিয়ে গেছে, অনেক দূরে নিয়ে গেছে!'

পরিতোষের বুঝতে আর কিছু বাকি রইল না। বেদনায় স্তব্ধ হয়ে অনেকক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকবার পর ব্যথিতকণ্ঠে বললে, 'কেন তুমি এমন করে চলে এলে নির্মলা, কেন তুমি এমন করে নিজের সর্বনাশ করলে!'

নির্মলা নীরবে তার দিকে শুধু মুখ তুলে তাকালে, কিছু বললে না...

পরিতোষ আবার গভীর অনুশোচনার সঙ্গে বললে, 'আমি অন্যায় করেছিলাম, মুহূর্তের ভুলে তোমায় অপমান করেছিলাম। তুমি তো আমায় যা খুশি বলতে পারতে, আমাকে যে-কোনও শাস্তি দিতে পারতে। আমার মুহূর্তের ভুল আমার চিরদিনের লজ্জা হয়ে থাকত। তার বদলে নিজেকে কেন তুমি এমন করে শাস্তি দিলে!'

পরিতোষের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নির্মলা বিষণ্ণ কণ্ঠে শুধু বললে, 'এ-সব কথা থাক পরিতোষদা।'

'যা হয়ে গেছে তার কোনও প্রতিকার নেই জানি, কিন্তু তবু এ আফসোস যে মরে গেলেও যাবে না যে আমি তোমার সব দুঃখের মূল।' পরিতোষের কণ্ঠে কথাগুলো চাপা আর্তনাদের মতো শোনাল।

'তা তো সত্যি নয়!'—নির্মলা যেন আবার সহজ স্বাভাবিক হয়ে গেল।

পরিতোষ কিন্তু প্রবোধ মানল না। ব্যাকুলভাবে বললে, 'তুমি না বল, তবু আমি জানি, আমার অপরাধের সীমা নেই। আমায় শুধু তার একটু প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও নির্মলা। তুমি আমার সঙ্গে চল।'

নির্মলা হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, অদ্ভুত স্বরে বললে, 'যাব, তোমার সঙ্গে!'

'আমি তোমায় কোনও অসম্মান করব না নির্মলা। আমার সমস্ত দুর্বলতা অনুশোচনায় পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।'

পরিতোষের কণ্ঠে অসীম কাতরতা। গভীর আগ্রহের সঙ্গে সে আবার বললে, 'তোমার জীবনে আর কোনও সান্ত্বনাই নেই জানি, তবু একটু শান্তি তোমায় দেওয়ার অধিকার আমায় দাও, আমার নিজের অভাগী বোন মনে করে তোমায় আমি সেবা করব সারা জীবন!'

পরিতোষ চুপ করলে। নির্মলা খানিক তার মুখের দিকে অদ্ভুতভাবে চেয়ে থেকে বললে, 'আমায় তুমি শান্তি দিতে চাও?'

নির্মলার চোখের দৃষ্টি এবার পরিতোষকে শঙ্কিত করে তুলল। স্নিগ্ধকণ্ঠে সে বোঝাবার চেষ্টা করলে, 'আর তো কিছু দেওয়ার ক্ষমতা আজ আর কারও নেই!'

হঠাৎ নির্মলার চোখ যেন জ্বলে উঠল। তীব্রকণ্ঠে সে বললে, 'কিন্তু শান্তি আমি চাই না, বুঝেছ, শান্তি নয়। আমি শুধু প্রতিশোধ চাই।'

'প্রতিশোধ?'

'হ্যাঁ, যারা আমার সমস্ত জীবন ছারখার করে দিয়েছে, বিনাদোষে যারা আমায় শাস্তি দিয়েছে, তাদের জীবনও আমি অভিশাপে বিষিয়ে দেব'—নির্মলা যেন হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে গেছে।

'কী বলছ নির্মলা?'—সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে পরিতোষ!

তিক্ত জ্বালাময় কণ্ঠে নির্মলা জবাব দিলে, 'ভাবছ আমি সামান্য পথের ভিখারি, আমি তাদের কী করতে পারি? সব পারি এখন। একদিন আমার ভয় ছিল, মানের ভয় লোকলজ্জার ভয়, আজ আমার কিছু নেই। আমি গ্রামে ফিরে যাব।'

'গ্রামে যাবে!'—পরিতোষের কণ্ঠস্বরে শঙ্কিত বিস্ময়!

'হ্যাঁ, সেখানে সুখ-স্বচ্ছন্দে, নিশ্চিত আরামে যারা দিন কাটাচ্ছে তাদের সামনে আমার নিজের কলঙ্ক নিজে গিয়ে প্রকাশ করব।'

নির্মলা যেন আর এক মানুষ হয়ে গেছে। তার দৃষ্টিতে তার কণ্ঠস্বরে কী এক উন্মত্ত উত্তেজনা। সত্যিই সে যেন মূর্তিমতী প্রতিহিংসা। তীক্ষ্ণকণ্ঠে সে তখন বলে চলেছে, 'জীবন তাদের তারপর বিষিয়ে উঠবে না! স্ত্রী চমকে উঠবে না স্বামীর মুখের দিকে চাইতে! ঘৃণায় ভয়ে তাদের বুক শিউরে উঠবে না, সন্দেহে অবিশ্বাসে তাদের জীবন অভিশপ্ত হয়ে উঠবে না দিনের-পর-দিন! আমি তাই যাচ্ছি...এখুনি যাচ্ছি।'

উন্মাদিনীর মতো নির্মলা হঠাৎ ছুটে সেখান থেকে রাস্তায় বেরিয়ে গেল।

পরিতোষ কেমন যেন বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল। নির্মলার এই অপ্রত্যাশিত আত্মপ্রকাশে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠে সে ব্যাকুলভাবে নির্মলার জন্য চারিদিকে তাকাল।

কোথায় নির্মলা!

রাস্তায় বেরিয়ে সে কোনও দিকে তাকে দেখতে না পেয়ে আবার ব্যাকুলভাবে ডাকলে, 'নির্মলা! নির্মলা!'

নির্মলার কোথাও তবু দেখা নেই। এরই মধ্যে সে গেল কোথায়! পরিতোষ সত্যি শঙ্কিত হয়ে উঠল। প্রায়ান্ধকার গলিতে-গলিতে অর্ধরাত্রি পর্যন্ত সন্ধান করেও নির্মলাকে কিন্তু পাওয়া গেল না। নির্মলা তার বাড়িতেও ফেরেনি। কিন্তু এবার নির্মলাকে খুঁজে যে না পেলেই নয়। গভীর নিস্তব্ধ রাত্রে নির্জন নগরের পথে পরিতোষেব ব্যাকুল আহ্বান তাই ধ্বনিত হতে লাগল—'নির্মলা!'

শহরে নির্মলার কোনও খোঁজ না পেয়ে, পরিতোষকে শেষপর্যন্ত গ্রামেই যেতে হল নির্মলার সন্ধানে। নির্মলার মনের যা বর্তমান অবস্থা, তাতে সত্যিই নিজের সঙ্কল্প কাজে পরিণত করতে তার পক্ষে গ্রামে ফিরে আসা কিছুমাত্র আশ্চর্য নয়। কিন্তু পরিতোষকে সে সর্বনাশ নিবারণ করতেই হবে। নির্মলাকে যেমন করে হোক ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া তার চাই-ই। গ্রামে এসে পবিতোষ প্রথমে উমানাথেব বাড়িতেই গেল।

উমানাথ তখন বাড়ি থেকে বার হচ্ছিলেন হঠাৎ পরিতোষকে সঙ্কুচিতভাবে ঢুকতে দেখে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে, 'তুমি!'

পরিতোষ বিষণ্ণ মুখে বললে, 'হ্যাঁ, আবার এলাম। না এসে উপায় ছিল না বলেই এলাম। নির্মলা, নির্মলা কী গ্রামে এসেছে?'

নির্মলার মা অদূরে দাঁড়িয়েছিলেন, নির্মলাব নাম শুনে ব্যাকুলভাবে কাছে এসে বললেন, 'নির্মলা! তুমি কী বলছ পরিতোষ!'

পরিতোষ ব্যথিত স্বরে বললে, 'জানি তোমরা সবাই ভুল বুঝেছ।'

এখন সমস্ত কৈফিয়ৎ দেওয়ার সময় আমার নাই। নির্মলার খোঁজ আমার সবার আগে দরকার—'বল সে এসেছে এখানে?'

উমানাথ এবার জবাব দিলেন, 'সে এখানে আসবে কেন? আসবেই বা কোন সাহসে?' তাঁর কণ্ঠস্বর শান্ত, কিন্তু তাঁর তলায় কত গভীর যে বেদনা আছে তা বেশিক্ষণ চাপা রইল না। একটু চুপ করে থেকে ধরা গলায় তিনি আবার বললেন, 'আর তুমিও না এলে পারতে পরিতোষ। আমি কাউকে দোষ দিই না, কিন্তু নির্মলা বলে আমাদের যে কোনও মেয়ে ছিল এটুকু আমরা ভুলে থাকতে চেয়েছিলুম, সেটুকু দয়াও তোমরা করলে না।'

নির্মলার মা আঁচলে চোখ মুছে ধীরে-ধীরে সেখান থেকে সরে গেলেন। পরিতোষ খানিক চুপ করে থেকে ব্যথিত স্বরে বললে, 'আপনারাও শেষে এই বুঝলেন। যাক, এখন

আর আমি কিছুই বলতে পারব না। যদি সময় হয় সবই বুঝতে পারবেন একদিন।'

উমানাথ অতি দুঃখের হাসি হেসে বললেন, 'আমি সমস্ত বোঝাবুঝির বাইরে চলে গেছি পরিতোষ, কিন্তু আর দাঁড়াতে পারছি না। বিজয়ের ছেলের কঠিন অসুখ, এই শান্তি-জল নিয়ে এখুনি আমায় যেতে হবে।'

অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে পরিতোষ এবার বললে, 'বিজয়ের ছেলের অসুখ, আর আপনি তার জন্য শান্তি-জল নিয়ে যাচ্ছেন।'

উমানাথ বিষণ্ণভাবে আবার হাসলেন, বললেন,—'হ্যাঁ, আমি যাচ্ছি! জমিদার আমার ওপর এইটুকু অনুগ্রহ এখনও রেখেছেন, এখনও আমি তাঁদেরই পুরোহিত।'

সবিস্ময়ে তাঁর দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে পরিতোষ বললে, 'আশ্চর্য! জমিদার মশাইকে আমি বুঝতে পারলুম না, আপনাকেও নয়।'

'কোনও মানুষকেই তেমন করে বোঝা যায় না পরিতোষ! মানুষ সোজা অঙ্কের হিসাব নয়।' শান্ত স্বরে কথাগুলি বলে উমানাথ একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, 'তুমি ইচ্ছে করলে আমাব এখানেই থাকতে পারো এখন!'

'না, আমি এখানে থাকতে আসিনি, থাকবার উপায় নেই। আমায় এই গাঁয়ের আশে-পাশেই থাকতে হবে, যেমন করে হোক নির্মলাকে আমায় এখান থেকে নিয়ে যেতেই হবে।' বলে পরিতোষ বেরিয়ে গেল।

উমানাথ তখনও স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। নির্মলার মা অনেক কষ্টে এতক্ষণ বুঝি নিজেকে সম্বরণ করেছিলেন। এবাব কাছে এসে ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী বললে পরিতোষ? নির্মলা এখানে আসবে? নির্মলা এখনও বেঁচে আছে?'

উমানাথের চোখও বুঝি সজল হয়ে এসেছিল, কিন্তু প্রাণপণে নিজেকে সম্বরণ করে কঠোর স্বরে তিনি বললেন, 'ছিঃ-ছিঃ, এখনও তার জন্যে ভাবনা! এখনও জানো না যে নির্মলা বলে কেউ কখনও ছিল না আমাদের!'

নির্মলার মা অশ্রুপ্লাবিত মুখে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। উমানাথ ধীরে-ধীরে বেরিয়ে গেলেন।

নির্মলা মুহূর্তের অপ্রকৃতিস্থতায় মিথ্যা কোনও সঙ্কল্প করেনি। সত্যিই একদিন ছিন্ন মলিন বেশে উন্মাদিনীর মতো গ্রামের পথে তাকে দেখা গেল। কত দীর্ঘ পথ পর্যটন করে কীভাবে সে সেখানে এসে পৌঁচেছে কে জানে। অনাহারে পথের ক্লান্তিতে শরীর তার শীর্ণ, কিন্তু চোখে তার যেন কী এক অস্বাভাবিক দীপ্তি। চোখের এই বহ্নির ইন্ধন জোগাতেই যেন তার দেহ ক্ষয় হয়ে গেছে।

গ্রামের পথ অতিক্রম করে দেখা গেল জমিদারবাড়ির দেউড়িতে সে এসে দাঁড়িয়েছে। দারোয়ানেরা তাকে বুঝি ঢুকতে দিতে চায় না।

নির্মলা হিংস্র ভাবে চিৎকার করে উঠল, 'ঢুকতে দেবে না, আমায় ঢুকতে দেবে না?'

তারপর উন্মাদের মতো হেসে উঠে তীক্ষ্ণস্বরে বললে, 'তা তো দেবেই না! আমি যে এই রাজপুরী ধ্বসিয়ে দিতে এসেছি, আমি যে তোমাদের সর্বনাশ করতে এসেছি—আমি যে এ বাড়ির অভিশাপ।'

'চুপ, চুপ মাগী, চেঁচাসনি, চেঁচালে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দেব।' —দারোয়ানেরা ধমক দিয়ে উঠল।

একজন তাকে শাসিয়ে জানালে, 'জানিস, বাবুর ছেলের অসুখ।'

'ছেলের অসুখ!' নির্মলার কণ্ঠে যেন অমানুষিক উল্লাস! 'ছেলের অসুখ তো সবে শুরু। এখনও তো কিছুই হয়নি, এখনও অভিশাপ লাগেনি এ বাড়ির গায়ে! প্রত্যেক ইটখানা যেদিন এর খসে পড়ে যাবে, ভিত যেদিন নড়ে উঠবে...'

দারোয়ানেরা রুখে উঠল মারমুখী হয়ে, 'খবরদার মাগী ফের যদি চেঁচাস—'

হঠাৎ ভেতরের উঠানের কাছে কার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'কে ওখানে?'

দারোয়ানেরা অণিমাকে দেখে ফিরে দাঁড়িয়ে সেলাম করে বললে, 'একটা পাজি ভিখারি মাগী মা, তাড়ালেও যেতে চায় না।'

অণিমা একটু এগিয়ে এসে স্নিগ্ধস্বরে আদেশ দিলে, 'না, না ওকে তাড়িও না।' তারপব নির্মলাকে উদ্দেশ্য করে বললে, 'তুমি এস, ভেতরে এস, কিছু মনে করো না ওদের কথায়। ওরা জানে না, তুমি রাগ করে ফিরে গেলে আমার ছেলের অকল্যাণ হবে।'

নির্মলা এতক্ষণ ধরে অণিমাকেই একদৃষ্টে লক্ষ করেছে। এবার ধীরে-ধীরে তার কাছে এগিয়ে গিয়ে অদ্ভুতভাবে তাব দিকে খানিক চেয়ে থেকে বললে, 'তুমি বুঝি এ-বাড়ির বউ? তুমি আমায় ডাকছ? আমায় ভেতরে যেতে বলছ?'

নির্মলাব তীক্ষ্ণ অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে কেমন একটু অস্বস্তি বোধ করলেও অণিমা স্নিগ্ধ হেসে শান্তস্বরে বললে, 'হ্যাঁ, তুমি ভেতবে এসে বস, তোমার যা চাই তাই দেব, তুমি রাগ করো না।'

নির্মলা আর কোনও প্রশ্ন করল না। শুধু তীক্ষ্ণ বিদ্রুপের দৃষ্টিতে চারিদিক লক্ষ করতে-করতে ধীরে-ধীরে অণিমাব সঙ্গে ভেতরে চলে গেল।

ভেতরের একটি বাবান্দার কাছে তাকে দাঁড় করিয়ে অণিমা স্নিগ্ধ স্বরে বললে, 'বস, আমি এখুনি আসছি।'

অণিমা চলে যাওয়ার পর খানিকক্ষণ মনে হল যেন নির্মলা কেমন বিহ্বল হয়ে গেছে। ওপরে কোথা থেকে শিশুর কান্না মাঝে-মাঝে ভেসে আসছে। হঠাৎ নির্মলা সচকিত হয়ে উঠল, তারপর নিচে থেকে সামনেব সিঁড়ি দিয়ে ধীরে-ধীরে ওপরে উঠে গিয়ে সামনের ঘরের জানালায় গিয়ে দাঁড়াল।

জানালা থেকে ভেতরেব সবকিছু দেখা যায়। বিছানাব ওপর রুগ্ন শীর্ণ শিশু শায়িত। একজন ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করছে। উদ্বিগ্ন কাতর মুখে বিজয়, জমিদার, উমানাথ সবাই সেদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

শিশুটি আবার যন্ত্রণায় কাতরে কেঁদে উঠল। নির্মলার মনে হল তার চোখের সামনে সব যেন ঝাপসা হয়ে আসছে অশ্রুতে।

এই ঘর যেন তার চোখের ওপব আর এক জীর্ণ কুটিরে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে, নোংরা মলিন শয্যায় যেন তাবই শিশু শেষ নিশ্বাস টানছে। নিজের অজ্ঞাতেই বুঝি নির্মলা অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল। সে শব্দে সেদিকে ফিরে চেয়ে বিজয়ই প্রথম সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'কে? কে ওখানে?'

আর সকলেও এবার সচকিত হয়ে জানালার দিকে ফিরে তাকাল। বিজয় তখন ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। ক্ষণিক বিভ্রম কেটে গিয়ে আবার নির্মলার মুখ হিংস্র কঠিন হয়ে উঠল। উদ্ধতভাবে এগিয়ে গিয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে সে বললে, 'কে আমি চিনতে পারছ না! ভালো করে দেখ, চিনতে পারো কি না? কোনওদিন কোনওখানে আমায় দেখেছিলে কিনা?'

বিজয় যেন হঠাৎ কোনও প্রেতমূর্তি দেখেছে। সমস্ত মুখ তার ফ্যাকাসে! অস্ফুট কম্পিত স্বরে সে শুধু বললে, 'তুমি! নির্মলা।'

'নামটা এখনও ভোলোনি দেখছি!' নির্মলার কণ্ঠ আবার হিংস্র হয়ে উঠল, 'আমিও ভুলিনি, কোনওকিছুই ভুলিনি। তাই তো এসেছি এতদূর থেকে তোমাদের দেখতে, তোমাদের সর্বনাশ দেখতে। ওই বুঝি তোমার ছেলে বিছানায় শুয়ে মরছে, যেমন করে আমার ছেলে মরেছে, দিনের-পর-দিন, বিনা ওষুধে না খেতে পেয়ে! তোমাদের অনেক টাকা আছে, অনেক ক্ষমতা,—তবু ও ছেলে বাঁচবে না—আমার অভিশাপে—আমার মরা ছেলের অভিশাপ—'

নির্মলার উন্মত্ত চিৎকার ছাপিয়ে আর একটি বজ্রগম্ভীর স্বর এবার শোনা গেল, 'নির্মলা!'

নিরীহ ভালো মানুষ উমানাথের চেহারা একেবারে যেন বদলে গেছে। বহ্নিদীপ্ত মূর্তিতে তিনি সামনে এসে দাঁড়ালেন।

নির্মলার হঠাৎ যেন চমক ভেঙে গেল। প্রায় সশঙ্ক দৃষ্টিতে উমানাথের দিকে তাকিয়ে সে কম্পিত স্বরে ডাকলে, 'বাবা!'

কিন্তু উমানাথ গর্জন করে উঠলেন, 'না, আমি তোমার বাবা নই। তুমি আমার মেয়ে নও। আমার মেয়ে মরে গেছে,—অনেক দিন মরে গেছে; আমার মেয়ে বেঁচে থাকলে, নিজে পুড়ে খাক হয়েও আর কারুর সংসারে হিংসার আগুন ধরাতে আসত না। তোমার ছেলে মরে গেছে বলছ? তুমি মা নও, তাই সে তোমায় ছেড়ে গেছে। মা হলে এই রুগ্ন মরতে-বসা ছেলের ঘরে এসে তুমি অভিশাপ দিতে পারতে না।' একটু থেমে আবার বজ্রগম্ভীর স্বরে তিনি বললেন, 'তুমি যাও! এখনও যদি লজ্জা থাকে তো গিয়ে সত্যি করে মর।'

নির্মলার যেন এক মুহূর্তে আবার গভীর রূপান্তর ঘটে গেছে। কোনও কথা আর তার মুখ দিয়ে বার হল না। অসহায় কাতরভাবে একবার সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে সঙ্কোচ গ্লানিতে মাথা নিচু করে অশ্রু সজল চোখে সে ধীরে-ধীরে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু জমিদার বীরেন্দ্রনারায়ণ আর বুঝি সহ্য করতে পারলেন না। হঠাৎ তিনি যেন আর্তনাদের মতো বলে উঠলেন, 'না, না, ওকে যেতে দিও না! ও ফিরে গেলে এ সংসারে সত্যি অভিসম্পাত লাগবে!'

অনিমা কিছুক্ষণ আগে থাকতেই এখানে এসে দাঁড়িয়েছে। ধীরে-ধীরে তাকে এবার চলে যেতে দেখা গেল। বীরেন্দ্রনারায়ণ এগিয়ে যাচ্ছিলেন, বিজয় তাঁকে বাধা দিতে তিনি যেন পাগলের মতো অস্থির হয়ে উঠলেন, 'তোরা জানিস না, সমস্ত অপরাধ আমার! মিথ্যে বংশের অভিমানে অন্ধ হয়ে আমি ওর সমস্ত জীবন ছারখার করে দিয়েছি। সব জেনেও ওর মিথ্যে কলঙ্ক রটনায় সাহায্য করে তোর মন ভেঙে দিয়েছি, জোর করে তোদের তফাত রেখে ওর সর্বনাশ করেছি!'

স্তম্ভিত বিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে বিজয় কঠিন স্বরে বলে উঠল, '—বাবা!'

জমিদার পরম অপরাধীর মতো কুণ্ঠিত কাতর স্বরে বললেন, 'আমার বিচার পরে করিস বিজয়, আগে ওকে ফিরিয়ে আন। নইলে আমি জানি এ বংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে না, ওর দীর্ঘনিশ্বাসে সব ছাই হয়ে যাবে।'

বিজয়ের হাত ছাড়িয়ে বীরেন্দ্রনারায়ণ নিজেই এবার ছুটে গেলেন বাইরে।

অনিমা আগেই গিয়ে সেখানে নির্মলার কাছে দাঁড়িয়েছে।

বীরেন্দ্রনারায়ণ কাছে গিয়ে কাতর স্বরে বললেন, 'তুমি ফিরে এস মা, আমাদের ক্ষমা করে তুমি ও ছেলেকে বাঁচিয়ে তোল।'

'চল দিদি, আমি তোমায় মিনতি করছি।' অনিমা এবার নির্মলার হাত ধরলে।

বিহ্বলভাবে অনেকক্ষণ তাদের দিকে তাকিয়ে থেকে তারপর সঙ্কুচিত অস্ফুট কণ্ঠে নির্মলা বলে, '—আমি! আমি যাব?'

স্নিগ্ধস্বরে অনিমা বললে, 'হ্যাঁ দিদি, তুমি এসে কোলে তুলে নিলে ও যদি বাঁচে।'

নির্মলা তবু বিমূঢ় বিহ্বলভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

অনিমা সকরুণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আবার বললে, 'আমি সব জানি দিদি, ঠাকুরঝির কাছে সব শুনেছি। শুধু কাউকে কিছু বলবার উপায় নেই বলে, মুখ বুঁজে থেকেছি। তোমাদের কাঁদিয়ে এ সুখ আমি চাই না দিদি। চল।'

নির্মলাকে নিজেই সে এবার ধীরে-ধীরে ফিরিয়ে নিয়ে গেল ঘরেব দিকে। স্বপ্নচালিতের মতো মনে হল—নির্মলাব নিজের কোনও শক্তি আর যেন নেই।

তখন ডাক্তারবাবু ছাড়া সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন। নির্মলাকে নিয়ে অনিমা শিশুর শয্যার পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই ডাক্তারবাবু তাদের দিকে চেয়ে কী বুঝে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অশ্রু-সজল চোখে বীরেন্দ্রনারাযণ ও উমানাথ এ দৃশ্য দেখছিলেন।

ডাক্তারবাবু একটু হেসে বললেন, 'আর আমার বিশেষ কোনও দরকার হবে বলে মনে হয় না চৌধুরীমশাই।'

বীরেন্দ্রনারায়ণের মুখ প্রসন্ন হাসিতে ভরে গেল, বললেন, 'না ডাক্তার, আর ভয় নেই আমি জানি। কী বল উমানাথ?'

হঠাৎ আনন্দে সবকিছু ভুলে, তিনি উমানাথের পিঠ চাপড়ে দিলেন।

বিজয় ডাক্তারকে বাইরে এগিয়ে দিয়ে তখন ফিরছে, হঠাৎ পেছন থেকে পরিতোষ হাঁফাতে-হাঁফাতে এসে বললে, '—নির্মলা! নির্মলা এখানে এসেছে শুনলাম!'

বিজয় একটু হেসে বললে, '—হ্যাঁ, এসেছে।'

পরিতোষ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতভাবে বললে, 'আমি সারাক্ষণ পাহারায় ছিলাম বিজয়, সত্যি আমি ওকে আসতে দিতাম না কিছুতেই। তোমরা ওকে কিছু বোলো না। আমি ওকে নিয়ে যাচ্ছি। ও তোমাদের কোনও ক্ষতি করবে না।'

বিজয় আবার অদ্ভুতভাবে হেসে বললে,—'না বোধহয়।'

'কই কোথায় সে?'—ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করলে পরিতোষ।

'চল দেখাচ্ছি।'—বলে বিজয় তাকে ঘরের জানালার বাইরে নিয়ে গিয়ে দাঁড়াল।

সবিস্ময়ে পরিতোষ ভেতরে চেয়ে দেখলে। দেখা গেল নির্মলা শিশুকে বুকে তুলে নিয়ে তার দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। নির্মলার কাঁধেই মাথা রেখে অনিমাও চেয়ে আছে সেই দিকে। পরিতোষের উৎকণ্ঠিত মুখ ধীরে-ধীরে প্রসন্ন হাসিতে ভরে গেল।

আর এক জানালায় তখন দুর্ধর্ষ জমিদার বীরেন্দ্রনারায়ণ ও নিরীহ পুরোহিত উমানাথ একসঙ্গে চোখ মুছছেন!

দাবী

সভার আয়োজনের দিক থেকে কোনও ত্রুটি ছিল না। ছাপানো অভিনন্দনপত্র থেকে ফুলের মালা পর্যন্ত কিছুই বাদ যায়নি। সভার কাজও চলছিল বেশ সুশৃঙ্খলভাবে, হঠাৎ একটি লোকের সামান্য দু-একটি কথায় সমস্ত আয়োজন যেন পণ্ড হয়ে গেল।

এরকম ব্যাপার যে ঘটতে পারে তা কেউ ভাবতে পারেনি।

অভিনন্দনপত্র পাঠের পর হীরালাল বলছিল, 'আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই যে, আমাদের জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান রায়বাহাদুর চুনিলাল চৌধুরী আজ তাঁর স্বগ্রামে পদার্পণ করেছেন বলে ভূষণা গ্রাম আজ ধন্য, ভূষণা গ্রামের অধিবাসীরা ধন্য; ভূষণা গ্রামের মাটি ধন্য। রায়বাহাদুর এ-গ্রামের গৌরব, এ-জেলার গৌরব, এ-দেশের গৌরব। তাঁহার গৌরবে ভূষণা প্রায় আজ গৌরবান্বিত। তিনি তাঁর একমাত্র কন্যা সুমিত্রাদেবীকে নিয়ে তাঁর পৈত্রিক বসতবাটিতে অবস্থান করতে স্বীকৃত হয়ে আমাদের সকলকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।'

হীরালাল বোধহয় আরও কিছু বলত। কিন্তু তার আগেই ভিড় ঠেলে এক ভদ্রলোক একেবারে সভার মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন।

রায়বাহাদুর চুনিলাল চৌধুরী তাঁর মেয়ে সুমিত্রাকে নিয়ে বসেছিলেন ঠিক সেইখানে এবং সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল তাঁদেরই মুখের ওপর। এবার সবাই চাইল সেই লোকটির দিকে। আশ্চর্য হয়েছিল সবাই, কিন্তু হঠাৎ মুখ ফুটে কেউ কিছুই বলতে পারল না।

লোকটি বলতে লাগল, 'আপনারা আমায় ক্ষমা করবেন। আমি বক্তা নই, বক্তৃতা দেওয়া আমার পেশাও নয়! কিন্তু জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান রায়বাহাদুর চুনিলাল চৌধুরী মহাশয়ের আগমন উপলক্ষে আপনাদের সমবেত ব্যাকুল উচ্ছ্বাস শুনতে-শুনতে নিজেকে যেন বরদাস্ত করতে পারলাম না। আপনাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য আমার কণ্ঠও হঠাৎ ব্যাকুল হয়ে উঠল। আমার মনে হয় রায়বাহাদুরের নাম উল্লেখেই আপনাদের কণ্ঠ যেন ভাবে গদগদ হয়ে উঠেছে, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। শুনতে পেলাম ভূষণা তাঁর নিজের পৈতৃক বাসভূমি। জলকষ্টে কয়েক বৎসর এ-গ্রামের দুর্গতির সীমা নেই। সামান্য দুটি টিউবওয়েলের ব্যবস্থা আজ দু-বছর তাঁর দপ্তরে আবদ্ধ হয়ে আছে—।'

ব্যাপারটা ঠিক কোন দিকে গড়াচ্ছে তা বোধহয় সভায় উপস্থিত কেহই ঠিক অনুমান করতে পারছিলেন না, তাঁরা সবাই আশ্চর্য হয়ে লোকটির মুখের দিকে চেয়েছিলেন। এদিকে-ওদিকে শুধু চাপা গুঞ্জন উঠছিল। কিন্তু সুমিত্রা আর চুপ করে থাকতে পারল না। হীরালালের দিকে চেয়ে ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলে উঠল, 'কেন আপনারা ওঁকে দাঁড়াতে দিলেন, কে এই অভদ্র লোকটা!'

হীরালাল জবাব দিল, 'শিশির রায়, আমাদের চ্যারিটেবল ডিসপেন্সাবির নতুন ডাক্তার! তিনি গ্রামে আসা অবধি আমাদেব হাড়-মাস জ্বালিয়ে খাচ্ছে।'

'কিন্তু ওঁকে আপনারা কথা কইতে দিচ্ছেন কেন?' সুমিত্রা বলে ওঠে—'বার করে দিন ওঁকে এখান থেকে!' রায়বাহাদুর একটু বিব্রত বোধ করছিলেন, কিন্তু ভাবটা গোপন রেখে তিনি বললেন, 'থাক না মা, দেখাই যাক না ওর কী বলবার আছে।'

সুমিত্রা কিন্তু নারাজ। প্রবল আপত্তি জানিয়ে সে বলে, 'না বাবা, তোমার নিজের গ্রামে তোমার এই অপমান আমি কিছুতেই হতে দেব না।'

হীরালাল এবং বোর্ডের কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্যেব মুখের দিকে চেয়ে সে বলতে লাগল, 'আপনারা এখনও চুপ করে রয়েছেন? এই সম্মানের জন্যেই কি বাবাকে আপনারা ঘটা করে গ্রামে ডেকে এনেছিলেন? ওই শিশিরবাবুই তা হলে গ্রামের কর্তা, আপনারা কিছুই নন?'

হীরালালের পক্ষে এরপর চুপ করে থাকা অসম্ভব। শিশির ডাক্তারের দিকে একটু এগিয়ে সে প্রায় চিৎকার করে বলে উঠল, 'নেমে যান আপনি এখান থেকে, নেমে যান। আপনাকে কেউ বক্তৃতা দিতে ডাকেনি, আর আপনার প্রলাপ কেউ শুনতেও চায় না।'

হীরালালের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সভার আরও দু-চার জন বলে উঠল, 'নেমে যান, বেরিয়ে যান।' শিশির কিন্তু বিব্রত না হয়ে বেশ সপ্রতিভাবেই বলতে লাগল, 'মনে হচ্ছে, আমার বক্তৃতায় আপনারা বড় বেশি বিচলিত হয়েছেন এবং সেইটুকুই আমার আনন্দ। আমার আর বেশি কিছু বলবার নেই। এই সভায় নির্লজ্জ চাটুকারিতায় যে ফানুস আপনারা ফাঁপিয়ে তুলেছিলেন, তা যদি আমার বিদ্রুপে একটুখানি ফুটো হয়ে থাকে, তা হলেই আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করব। আমি আর আপনাদের সময় নষ্ট করতে চাই না।'

রায়বাহাদুর হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। মেয়ের দিকে চেয়ে বললেন, 'চল মা!'

হীরালালের মাথায় যেন বাজ পড়ল। বিচলিত বিব্রতকণ্ঠে সে রায়বাহাদুরের পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, 'কিছু ভাববেন না, এসব ছেলে-ছোকরাদের বাঁদরামি। এখনি আমি সব ঠান্ডা করে দিচ্চি।'

রায়বাহাদুর বোধহয় হীরালালের ওপর খুব বেশি নির্ভর করতে পারলেন না, বললেন, 'কিছু মনে কোরো না হীরালাল, আমি আর এখানে থাকতে পারছি না।'

সুমিত্রাও হীরালালের মুখের দিকে চেয়ে ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বলে, 'এর পরও আপনারা বাবাকে এখানে থাকতে বলেন?'

হীরালাল কী করবে ঠিক করতে পারে না, বলে 'সব নষ্টের মূল ওই ডাক্তার, ও যে সভায় এসে এমন শয়তানি করবার সাহস করবে তা আমি ভাবতে পারিনি।'

রায়বাহাদুর বললেন, 'এসব কথা এখন থাক হীরালাল। যদি এ-বিষয়ে কিছু আলোচনা করবার থাকে, সন্ধ্যার পর আমার বাড়িতে যেতে পার।'

হীরালাল বলে, 'আজ্ঞে যাব বইকী, নিশ্চয়ই যাব। ওই শিশির ডাক্তারকে টিট করার একটা ব্যবস্থা যদি না করতে পারি, তা হলে আমাদের গাঁয়ে বাস করাই উচিত নয়।'

সুমিত্রা বলে, 'শিশির ডাক্তারকে তো আপনারাই এনেছিলেন গ্রামে।'

কথাটা অস্বীকার করার উপায় ছিল না, কাজেই তাকে বলতে হল, 'তখন কি জানি ওই কেঁচো একদিন ফণা তুলে দাঁড়াবে। এমন বেয়াড়া ডাক্তার কখনও দেখিনি।'

রায়বাহাদুর বললেন, 'তোমার সভা তুমি সামলাও হীরালাল, আমরা চলি।' মেয়ের হাত ধরে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

কিছু পরেই হীরালাল রায়বাহাদুরের বাড়িতে হাজির হল।

উমেশ চৌধুরী বাড়ির পুরানো সরকার। হীরালাল প্রথমেই তাকে দলে টানলে এবং বুঝিয়ে দিলে যে, এ-অপমানের শোধ নিতে না পারলে গ্রামে চৌধুরীদের মান-মর্যাদা আর কিছুই থাকবে না।

উমেশকে উত্তেজিত করবার পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট। এর পরেই সে উমেশকে সঙ্গে নিয়ে চুনিলালের ঘরে এসে দাঁড়াল।

উমেশ রায়বাহাদুরের সামনে গিয়ে বলল, 'এ-অপমান আমরা চুপ করে সহ্য করতে পারব না হুজুর!'

চুনিলাল একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী পারবেন তা হলে?'

উমেশ উত্তেজিতভাবে বলে উঠল, 'আপনি হুকুম দিলে আজ রাত্রেই ওর মাথাটা

ফাটিয়ে দিয়ে আসবার মতো লোকের অভাব হবে না।'

রায়বাহাদুর এবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'সে হুকুম আমি দেব কেন?'

হীরালাল বলে উঠল, 'নিশ্চয়-নিশ্চয়। তুমি জানো না উমেশ, মাথা ফাটাবার মতো সোজা ব্যাপার হলে আমাদের আর মাথা খাটাতে হতো না।' রায়বাহাদুরের দিকে চেয়ে সে বলে চলল, 'কিন্তু লোকটা সত্যি আমাদের জ্বালাতন করে তুলেচে স্যার। যেদিন থেকে গাঁয়ে ঢুকেছে, সেইদিন থেকে গাঁয়ে আর শান্তি নেই।'

সুমিত্রা দাঁড়িয়েছিল রায়বাহাদুরের পাশেই। সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনাদের ওপর শিশির ডাক্তারের এত আক্রোশই বা কেন? কী নিয়ে আপনাদের শত্রুতা?'

হীরালাল বললে, 'শত্রুতা, শুধু হিংসের! উনি কোথাকার কে? দু-দিনের জন্য চাকরি করতে এসে উনি গাঁয়ের ওপর মোড়লি করতে চান। আমরা এই গাঁয়ের মাটিতে এত বড় হলাম, আমাদের চেয়ে গাঁয়ের ওপর ওঁর দরদ বেশি! সেই দরদ দেখিয়ে উনি আমাদের হটিয়ে দিতে চান।'

সুমিত্রা বললে, 'আপনারাও তো হটেই যাচ্ছেন দেখচি। নইলে আজ উনি আপনাদের সভায় অমন সব কথা বলতে সাহস করেন?'

'হ্যাঁ, সাহস এইবার বার করচি,—হীরালাল বললে, 'একটি রিপোর্টে আমি ওর চাকরি খেয়ে দিতে পারি। কিন্তু তাতে মনের জ্বালা মিটবে না। ওকে রীতিমতো জব্দ করে বিদায় করা চাই। এমন ঘা দিতে হবে, যার দাগ সারা জীবনে মিলাবে না।'

রায়বাহাদুর চুপ করে বসেছিলেন। তার মুখের দিকে চোখ পড়তেই সুমিত্রা বলে উঠল, 'কী হল বাবা? সেই ব্যথাটা কি আবার—?'

রায়বাহাদুর কোনওরকমে বলতে পারলেন, 'হ্যাঁ মা, হঠাৎ আবার বুকের কাছটায় চাড়া দিয়ে উঠেচে।'

তাঁর মুখ চোখ বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল, একটু দম নিয়ে হীরালালের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, 'আজ আপনারা যান। কাল বিকালে যা হয় একটা স্থির করা যাবে।'

এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হঠাৎ ছেদ পড়ায় রীতিমতো মনক্ষুণ্ন হলেও হীরালাল বলল, 'আজ্ঞে তাই হবে। কিন্তু এ-রকম ব্যথায় একজন ডাক্তার ডাকলে হতো না?'

'ডাক্তার বলতে তো তোমাদের ওই শিশির ডাক্তার!' একটু চুপ করে থেকে রায়বাহাদুর বললেন, 'কোনও দরকার নেই হীরালালবাবু! একটু ঘুমুতে পারলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

হীরালাল চলে যাওয়ার পর রায়বাহাদুর ঘুমোবার চেষ্টা করলেন। ঘরের প্রকাণ্ড দেওয়ালগিরির আলোটা কমিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু অনেকক্ষণ পরেও রায়বাহাদুর ঘুমোতে পারলেন না, ব্যথাটা যেন ক্রমশ বেড়ে উঠতে লাগল। সুমিত্রা সমস্তক্ষণ তাঁর মাথার শিয়রে দাঁড়িয়েছিল। একসময় জিজ্ঞাসা করল, 'শহর থেকে ডাক্তার ডাকলে ভালো হতো না বাবা?'

'না, না, তাতে কোনও লাভ নেই। শহর থেকে ডাক্তার পাঁচ-ছ ঘণ্টার আগে আনা যাবে না। তার চেয়ে আমার ঘুমের ওষুধটা দে। ঘুমোতে পারলেই সেরে যাবে।'

রায়বাহাদুর যেখানেই যান, ঘুমের ওষুধটা সঙ্গেই রাখতেন। সুমিত্রা তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে গিয়ে ওষুধটা নিয়ে এল।

ওষুধ খেয়ে রায়বাহাদুর বললেন, 'অত ভয় পাচ্ছিস কেন মা! এ তো আজকের ব্যথা নয়। মাঝে-মাঝে এমন হয়, আবার সেরে যায়।'

'কিন্তু সেবারের মতো যদি বাড়াবাড়ি হয়?' সুমিত্রা একটু বিচলিতভাবে বলতে লাগল, 'কেন বাবা তুমি আজ গ্রামে থাকতে রাজি হলে? এ-অপমানের পর আমাদের এখানে থাকা মোটেই উচিত হয়নি।'

রায়বাহাদুর ম্লান হেসে বললেন, 'এ যে আমাদের নিজেদের গ্রাম। এখানে অপমানিত হয়ে চলে গেলে লজ্জা যে আমাদেরই।'

'তা হলে যারা এ-গ্রামে তোমার অপমান করবার সাহস করেচে, তাদের তুমি উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করো। তুমি জানো না বাবা, রাগে আমার সমস্ত শরীর কী করচে?'

কথা বলতে-বলতে রায়বাহাদুরের মুখের ওপর চোখ পড়তেই সে থেমে গেল। তাড়াতাড়ি সে বললে, 'না বাবা, আমার এসব কথা বলা অন্যায় হয়েচে। তুমি ঘুমোবার চেষ্টা করো।' চাদরটা রায়বাহাদুরের বুক পর্যন্ত টেনে দিয়ে সুমিত্রা ধীরে-ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে এল; নিজের ঘরে এসে সুমিত্রা ক্লান্তভাবে বসে পড়ল। মোটরে কলকাতা থেকে এতদূর আসা, সভার হট্টগোল...সমস্তদিন এক মুহূর্ত বিশ্রাম করবার অবকাশ তার ঘটেনি। কিন্তু শরীরের অসহ্য ক্লান্তির মধ্যেও শিশির ডাক্তারের সেই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ মাখানো কথাগুলো সে যেন কিছুতেই ভুলতে পারছিল না। মনে হচ্ছিল, গেঁয়ো ডাক্তারের ধৃষ্টতার একটা সমুচিত উত্তর দিতে না পারলে সে যেন কিছুতেই স্থির হতে পারবে না। মাথার মধ্যে অনেকগুলো প্ল্যানও তার ঘোরাফেরা করছিল, কিন্তু হঠাৎ রায়বাহাদুরের বুকের ব্যথাটা বেড়ে ওঠায় সব গোলমাল হয়ে গেল। এখন তিনি সুস্থ হয়ে উঠলে কোনওরকমে তাঁকে কলকাতায় নিয়ে যেতে পারলে সে বাঁচে। চেয়ারে বসে-বসেই সুমিত্রা ঘুমিয়ে পড়েছিল, হঠাৎ ঝিয়ের ডাকে ঘুমটা ভেঙে গেল।

'দিদিমণি, দিদিমণি!'

সুমিত্রা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। শোনা গেল পাশের ঘর থেকে ঝি বলছে, 'শিগগির আসুন দিদিমণি, বাবুর খুব কষ্ট হচ্ছে।'

সুমিত্রা তাড়াতাড়ি রায়বাহাদরেব ঘরে গিয়ে ঢুকল। সরকারমশাই থেকে বাড়ির অনেকেই ঘরের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। রায়বাহাদুর যন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন। সুমিত্রা তাঁর কাছে গিয়ে বললে, 'আমি ডাক্তার ডাকতে পাঠাই বাবা।'

ঝি বললে, 'শিশির ডাক্তারকে আনব দিদিমণি?'

রায়বাহাদুর ক্লান্তকণ্ঠে বললেন, 'না, না, কোনও ডাক্তারের দরকার নেই! আমায় একটু জল দে।'

সুমিত্রা তাঁকে জল খাইয়ে সরকারমশাইকে জিজ্ঞাসা করলে, 'এখানে কাছাকাছি আর কোনও ডাক্তার নেই সরকারমশাই?'

'না দিদিমণি, দু-কোশ দূরে হীরাচরে বুড়ো কবরেজমশাই আছেন। কিন্তু রাত্রে তিনি আসতে পারবেন না।'

রায়বাহাদুর সুমিত্রার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'আর কোনও ডাক্তার বোধহয় দরকার হবে না, মা। গাঁয়ের মাটিতে বোধ হয় এই জন্যই ডাক পড়েছিল।'

সুমিত্রার দুই চোখ জলে ভরে গেল। সে বলে উঠল, 'না, বাবা, অমন কথা বলো না;' উমেশের দিকে মুখ ফিরিয়ে সে বললে, 'যান সরকারমশাই, আপনাদের চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারির ডাক্তারকেই ডেকে আনুন। রাত্রে আসতে যদি আপত্তি করেন, বলবেন যত টাকা চান তাই দেওয়া হবে।'

সরকার বললেন, 'শিশির ডাক্তার সেরকম লোক নয়। রুগির ডাক পড়লে রাতবিরেত মানে না, আবার টাকার পরোয়াও করে না।'

সুমিত্রা তীব্র তিক্ত কণ্ঠে বলে উঠল, 'আচ্ছা, আচ্ছা। আপনি তাড়াতাড়ি যান দেখি।' সরকারমশাই যাওয়ার জন্য পা বাড়ালেন। রায়বাহাদুর শিশির ডাক্তারের সাহায্য নেওয়ার কথাটা ঠিক পরিপাক করতে পারছিলেন না, বললেন ঃ 'এরকম ডাক্তার কি না ডাকলে হতো না মা? একটা হাতুড়ে গোঁয়ারের হাতে প্রাণ দেওয়ার চেয়ে আমার অমনি মরা ভালো ছিল। সরকারমশাইকে মানা কর।'

সুমিত্রা কিন্তু মন স্থির করে ফেলেছিল। সে বললে, 'না বাবা, এসময় তোমার কোনও আপত্তি শুনব না।'

আধঘণ্টার মধ্যেই শিশির ডাক্তার সরকারমশাইয়ের সঙ্গে চৌধুরী বাড়িতে হাজির হল। যথারীতি রায়বাহাদুরকে পরীক্ষা করবার পর শিশির জিজ্ঞাসা করলে, এরকম ব্যথা আগে আপনার হয়েছিল?

রায়বাহাদুর চুপ করে পড়ে রইলেন। তাঁর পক্ষ থেকে কোনও জবাব পাওয়া গেল না। শিশির একটু বিরক্তভাবে আবার জিজ্ঞাসা করলে, 'এই সোজা কথাটার উত্তর দিতে পারচেন না? এর আগে এরকম ব্যথা হয়েছিল?'

রায়বাহাদুরের বদলে জবাব দিল সুমিত্রা; 'প্রায় দু-মাস আগে।'

শিশির একটু ভেবে নিয়ে বললে, 'এর আগেও নিশ্চয়ই কয়েকবার এইরকম ব্যথা হয়েছে?'

সুমিত্রা জানায়, 'হ্যাঁ, বছরখানেক আগে প্রথম আরম্ভ হয়। তখন মাস দুয়েকের মধ্যে বার-দুই কষ্ট পেয়েছিলেন।'

রায়বাহাদুর বিরক্তভাবে বলে উঠলেন, 'এত কথা তো আপনার জানবার দরকার নেই। যদি পারেন তো এখনকার মতো এ যন্ত্রণা কমাবার ব্যবস্থা করুন। না পারেন ছেড়ে দিন।'

'চিকিৎসা ব্যাপারটা জেলাবোর্ড চালানোর মতো সোজা ব্যাপার নয় রায়বাহাদুর! যেমন-তেমন করে জোড়াতালি দিয়ে চিকিৎসা হয় না!' একটু থেমে শিশির আবার বলল, 'যন্ত্রণা কমলেই আপনার রোগ সারবে না। তার জন্যে বেশ কিছুদিন চিকিৎসা দরকার।'

'সে ব্যবস্থা আমি কাল শহরে গিয়েই করব। এখন আমার এ যন্ত্রণা কমানো যাবে না?'

'তা যাবে। কিন্তু কাল আপনার শহরে যাওয়া হবে না।'

রায়বাহাদুর রেগে উঠলেন। বললেন, 'অসম্ভব! কাল আমায় শহরে যেতেই হবে; অত্যন্ত জরুরি মিটিং।'

'মিটিং যত জরুরি হোক, কাল কেন, এখন পনেরো দিন আপনার কোনওরকম নড়াচড়া চলবে না। এখানেই বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে।'

রায়বাহাদুর উত্তেজিতভাবে বলে উঠলেন, 'পনেরো দিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে? পনেরো দিন তোমার মতো হাতুড়ে গেঁয়ো ডাক্তারের কথায় আমি বিশ্বাস করি মনে করেছ? কী জান তুমি?'

শিশির একটু হেসে বললে, 'অত উত্তেজিত হবেন না, আপনার অসুখ তো তাতে বাড়বেই! যন্ত্রণাটা হয়তো আর কমানো যাবে না।'

ব্যাগ খুলে কয়েকটা বড়ি বের করে শিশির সুমিত্রার দিকে চেয়ে বললে, 'আপাতত যন্ত্রণা কমাবার জন্য এই বড়ি দিয়ে যাচ্চি! এখুনি একটা খাইয়ে দেবেন। আর দু-ঘন্টার মধ্যে ঘুম না হলে আর একটা দেবেন। ঘুমের পর সকালে এই প্রেসক্রিপশন মতো ওষুধ চলবে।' শিশির ডাক্তার প্রেসক্রিপশন লেখায় মন দিল।

রায়বাহাদুর বললেন, 'রেখে দাও তোমার সকালের প্রেসক্রিপশন, আমি কাল সভায় যাবই!'

শিশির বললে, 'সে সভা তা হলে আপনার শোকসভা হবে!'

রায়বাহাদুর আরও রেগে উঠলেন। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা এমনি বিশ্রী দাঁড়াল যে, শিশির আর সেখানে বসে সময় নষ্ট করার কোনও সঙ্গত কারণ খুঁজে পেল না। ব্যাগটা বন্ধ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বারান্দায় পৌঁছেই শিশির দেখলে, সুমিত্রাও এই দিকেই আসছে। সুমিত্রা শিশিরের কাছে এসে কোনও কথা না বলেই শিশিরের হাতে দশ টাকাব একখানা নোট দিতে গেল।

শিশির কিন্তু নোটখানা নিলে না। বললে, 'অত্যন্ত দুঃখিত। চেঞ্জ আমি সঙ্গে আনিনি।'

'চেঞ্জ দরকার নাই। রাত্রের কল হিসাবে সবটাই আপনার ভিজিট।'

'আপনাদের উদারতায় খুশি হলাম। কিন্তু আপনারা বড়লোক বলেই বেশি ভিজিট নিয়ে আপনাদের বেশি খাতির দেখানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার ভিজিট দিনে-রাত্রে সকল সময়েই এখানে দু-টাকা। তাও আবার যে দিতে পারে সে দেয়। আপনারা দিতে পারেন, সুতরাং দু-টাকাই আপনাদের কাছ থেকে নেব। এখন খুচরো না থাকে পরে প্রেসক্রিপশনের সঙ্গে ডিসপেন্সারীতে পাঠিয়ে দেবেন।'

সুমিত্রার মুখ কঠিন হয়ে উঠেছিল, কী একটা শক্ত কথা বলতে যাচ্ছিল, এমনসময় ঘরের ভেতর থেকে রায়বাহাদুরের কণ্ঠস্বর শোনা গেল '—সুমিত্রা!'

'যাই বাবা,' বলে সুমিত্রা ফিরে দাঁড়াল। শিশিরও নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

ভেতর থেকে রায়বাহাদুরের কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল—'আমি ওই হাতুড়ে বদমায়েস ডাক্তারের কোনও কথা শুনতে চাই না। তুমি এখুনি শহরে গাড়ি পাঠাও ডাক্তার ঘোষকে ডাকতে।'

ঘরের ভেতর পৌঁছে সুমিত্রা বললে. 'তা পাঠাচ্চি বাবা, কিন্তু এই বড়িটা তুমি আপাতত খেয়ে নাও।'

'না, ওর কোনও বড়ি খেতে চাই না।'

'না, বাবা খেয়ে নাও। শহরের ডাক্তার না আসা পর্যন্ত এতে যন্ত্রণা কম হতে পারে।'

সরকার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াতেই সুমিত্রা তাকে বললে, 'যান সরকারমশাই, গাড়ি নিয়ে শহর থেকে ডাক্তার ঘোষকে ডেকে নিয়ে আসুন। ডাক্তার ঘোষকে না পান, যে কোনও বড় ডাক্তারকে—তিনি যা চান তাই দিয়ে নিয়ে আসবেন, যত তাড়াতাড়ি পারেন।'

সরকারমশাই সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে চলে গেলেন।

সুমিত্রা চুনিলালের শয্যাপার্শ্বে গিয়ে বসল।

শহরের কোনও বড় ডাক্তারই কিন্তু বাড়িতে আসতে রাজি হলেন না। ডাক্তার ঘোষ যখন ভূষণায় পৌঁছলেন তখন পরদিন সকাল আটটা। হীরালাল তার আগেই চৌধুরী বাড়িতে পৌঁছেছিল। ডাক্তার ঘোষ এসে রায়বাহাদুরের অসুখের ব্যাপারটা জেনে একবার তাঁর বুক পিঠ পরীক্ষা করলেন। তারপর শিশিরের প্রেসক্রিপশনটা দেখতে-দেখতে বললেন, 'ডাক্তার

রায় যে বড়িটা দিয়েছিলেন সেটা খেয়ে তা হলে যন্ত্রণা কম ছিল আর ঘুমও হয়েছিল?'

'তা হয়েছিল,' সুমিত্রা বলে।

ডাক্তার ঘোষ জিজ্ঞাসা করেন, 'কিন্তু এই প্রেসক্রিপশনের ওষুধটা আনানো হয়নি কেন?'

জবাব দিল হীরালাল? 'হ্যাঁ আপনিও যেমন। গাঁয়ের এক হাতুড়ে আনাড়ি ডাক্তার নেহাত দায়ে পড়ে রাত্রে ডাকতে হয়েছিল! প্রেসক্রিপশনের ওষুধ খেতে গেলেই হয়েছে আর কি!'

'গাঁয়ের ডাক্তারের উপর আপনাদের কোনও বিশ্বাস নেই দেখছি,' ডাক্তার ঘোষ বলেন।

'বিশ্বাস! একটা আনাড়ি হাতুড়ে!' রায়বাহাদুর বলে ওঠেন।

হীরালাল ফোড়ন দিল ঃ 'বিশ্বাস কী করে হবে বলুন! রায়বাহাদুরের আজ শহরে জরুরি মিটিং, না গেলে নয়। আর সে বলে গেল কিনা পনেরো দিন বিছানা থেকে নড়াচড়া চলবে না!'

'তাই বললেন বুঝি।' ডাক্তাব ঘোষ একটু হেসে জিজ্ঞাসা করেন।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, সেইজন্যেই তো আপনাকে ডাকা।'

ডাক্তার ঘোষ একটু চুপ কবে থেকে বলেন, 'কিন্তু আমার ওপর তো আপনারা বিশ্বাস রাখতে পারবেন না।'

'না, না, সে কী কথা!' হীরালাল বলে ওঠে।

'বাধ্য হয়েই বলচি। কারণ আমাবও মত এই, অন্তত পনেবো দিন আপনার বিছানায় শুয়ে থাকা উচিত। কোনওরকম নড়াচড়া হলেই বোগ জটিল হযে ওঠবাব সম্ভাবনা।'

রায়বাহাদুরের মুখটা ক্রমশ অপ্রসন্ন হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য না বেখেই ডাক্তার ঘোষ বললেন, 'তা ছাড়া আমি নিজেও এই প্রেসক্রিপশনের চেয়ে অন্য বিশেষ কিছু দিতেও পারচি না।' তিনি একটু থামলেন, তারপর প্রেসক্রিপশনেব দিকে চেয়ে বললেন, 'দেখা হলে, আমি তাঁকে এই কঠিন রোগের চমৎকার ডায়গনসিসের জন্য ধন্যবাদ জানাতাম।'

বলা বাহুল্য, রায়বাহাদুর খুশি হতে পারলেন না। তিনি বলে উঠলেন, 'তা হলেও আমি তার হাতে থাকতে রাজি নই। চিকিৎসা যা করবার আপনিই করুন।'

ডাক্তার ঘোষ কিন্তু রাজি হলেন না। বললেন, 'মাপ করবেন বায়বাহাদুর! চিকিৎসার চেয়ে পয়সাই আমাদের কাছে বড় হয়ে উঠেছে সত্যি! তবু আমাদের Professional etiquette—পেশাদারি লৌকিকতা বলে একটা জিনিস আছে। একজন ডাক্তার যখন আগে আপনাকে দেখেছেন তখন তিনি কোনও কাবণে নেহাত অক্ষম না হলে অন্য একজন ডাক্তাবের পক্ষে আপনার চিকিৎসাব ভার নেওয়া অসম্ভব। আপনাকে অন্য ডাক্তার আগে দেখেচেন জানলে তিনি নিজে না ডাকলে আমি এভাবে আসতে রাজি হতাম না।'

টুপি মাথায় আঁটতে-আঁটতে ডাক্তার ঘোষ বললেন, 'ভয় পাবেন না, আপনি হাতুড়ের হাতে পড়েননি, যিনি আপনার চিকিৎসা করচেন তাঁকে আমি চিনি না, তবে তিনি যে একজন ডাক্তার এইটুকু আপনাকে জোর করে বলে যেতে পারি।'

তিনি হীরালালকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। রায়বাহাদুর মুখখানা গম্ভীর করে পাশ ফিরে শুলেন। সুমিত্রা দাঁড়িয়ে রইল স্তব্ধ হয়ে।

হীরালাল কিন্তু ডাক্তার ঘোষকে নিচে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এল।

'বড় চ্যাটাং-চ্যাটাং কথা এই ডাক্তারের। শহরে যেন আর ডাক্তার নেই। বলতে বলতে সে রায়বাহাদুরের দিকে চাইল—'আপনারা কিছু ভাববেন না। আমি এখুনি শহর থেকে অন্য ডাক্তার আনবার ব্যবস্থা করচি। টাকা দিলে কোন ডাক্তার না আসে একবার দেখব।'

সুমিত্রা কিন্তু হীরালালের এতখানি উৎসাহের আগুনে যেন এক কলসি জল ঢেলে

'আর কোনও ডাক্তার ডাকবার দরকার নেই হীরালালবাবু। ওঁদের প্রফেসনাল এটিকেট যদি কিছু থাকে তা ভাবতে গিয়ে মিছিমিছি অপমান গায়ে পেতে নিতে আমরা আর চাই না। আপনি শিশির ডাক্তারকেই আর একবার খবর দেবেন।'

রায়বাহাদুর বলে ওঠেন,—'এখানে কাল রাত্রে আমার আসাই ভুল হয়েচে।'

সুমিত্রা বলে, 'তো যখন হয়েচে তখন আর উপায় কী। তাছাড়া ডাক্তারের সঙ্গে আমাদের পয়সা দিয়ে চিকিৎসার সম্পর্ক। আমরা ভিজিট দেব, সে চিকিৎসা করবে। আর কিছু তা ভাবার দরকার নেই।'

হীরালাল সায় দিল—'নিশ্চয়, নিশ্চয় তা ছাড়া আব কী? হাজার হোক আমাদের মাইনে করা চাকর বইতো নয়! কাজও নেব, আবাব বিদেয়ও করব সময় হলে। না, না, ও ঠিক আছে। আমি এখুনি গিয়ে ডাক্তারকে পাঠিয়ে দিচ্চি। আর প্রেসক্রিপশনটাও নিয়ে যাচ্চি ওষুধ আনতে।

গ্রাম ছোট, ডিসপেন্সারিও ছোট। আর এই ছোট ডিসপেন্সারি যে লোকটির অবিশ্রান্ত উৎসাহে এখনও সচল হয়ে আছে, তার নাম হরিহর। হরিহর ডাক্তারের কম্পাউন্ডার।

সেদিন ডিসপেন্সারির ছোট বারান্দাটিতে রোগীর ভিড় হয়েছিল একটু বেশিরকম। সেই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল ছোট্ট একটি মেয়ে, তাঁর পুঁটি। হরিহর অতগুলি রোগী থাকতে ওষুধ তৈরি করে দিল পুঁটির হাতে, আর তাতেই বাধল গোলযোগ।

রাখালদাস গাঁয়ের একজন মাতব্বর লোক। সে বলে উঠল, 'এ তোমার কীরকম বিচার হরিহর! আমি বলে সেই কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি, আর তুমি কিনা পুঁটি আসতেই ওষুধ দিয়ে দিলে!'

হরিহর জবাব দিলে, 'তাতে হযেছে কী?'

আর একজন বলে উঠল, 'হয়েছে কী? কেন, আমাদের অসুখটা বুঝি অসুখ নয়?'

হরিহর বললে, 'খুব জরুরি দরকার থাকে, পয়সা ফেল না; তাড়াতাড়ি ওষুধ মিলবে।'

রাখালদাস খেঁকিয়ে উঠল—'বাঃ পয়সা দেব কেন? সবাই অমনি ওষুধ নিয়ে যাবে, আর আমাদের বেলাতেই পয়সা!'

হরিহর একজনের জন্য কয়েকটা পুরিয়া মুড়তে-মুড়তে জবাব দিল; 'অমনি ওষুধ গরীবের জন্য, রাখালদাসের মতো হাড় কেপ্পন সুদখোর টাকার কুমিরের জন্য নয়। টাকায় ছাতা পড়ে যাচ্ছে, উনি এসেছেন মাগনা ওষুধ নিতে।'

রাখালদাস প্রায় চিৎকার করে বলে, 'দেখ হরিহর, না হয় তুমি কম্পাউন্ডারই হয়েচে। কিন্তু গালাগালি দিও না বলে রাখচি। ডাক্তারবাবুকে বলে তোমার চেয়ে বেশি পাণ্ডাকে কালই আনিয়ে দিতে পারি, জান।'

ঠিক সেই সময় শিশির ঘরে ঢুকে হাসতে-হাসতে জিজ্ঞাসা করল, 'কী ব্যাপার হরিদা?

এত ঝগড়া কিসের?'

রাখালদাস সোৎসাহে শিশিরের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলতে লাগল—'শুনুন তো ডাক্তারবাবু, শুনুন আপনাদের এই কম্পাউন্ডারের কথা।—আমায় কিনা গালাগালি দিয়ে বলে, পয়সা দিয়ে ওষুধ নিতে হবে। বলে, সবার বেলায় মাগনা আর আমার বেলায় পয়সা। বলে আমি নাকি টাকার কুমির।'

শিশির হাসতে-হাসতে বলল, 'দাও হরিদা রাখালদার ওষুধটা তাড়াতাড়ি দিয়ে দাও! কোনও ভাবনা নেই রাখালদা তোমার ওষুধ ঠিক পাবে।'

বিজয়গর্বে রাখালের মুখ দীপ্ত হয়ে উঠল। হরিহর রাগে গরগর করতে-করতে বললে, 'এসব বাড়াবাড়ি দু-চক্ষে দেখতে পারি না। দয়া করবার যেন আর লোক নেই এ-গাঁয়ে। টাকায় যার স্যাঁতলা পড়চে—'

'টাকা থাকতে যে হাত পেতে চাইতে আসে সেই তো আরও দয়ার পাত্র হরিদা'—বলতে-বলতে শিশির নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল।

হরিহর বললে, 'রায়বাহাদুরের বাড়ি থেকে খানিক আগে হীরালালবাবু ডাকতে এসেছিলেন। সেখানে এখুনি যাওয়া দরকার।'

শিশির বললে, 'তার আগে যারা এখানে এসেছে, তাদের দেখাটা ঢের বেশি দরকার। এদের দেখেই যাবখন।'

হরিহর কতকটা আপন মনে বললে ঃ 'সে আপনার মর্জি!'

•

ওদিকে সুমিত্রা ডাক্তারের জন্যে তখন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। কী একটা কাজে বারান্দা দিয়ে সে যাচ্ছিল, এমনসময় হীরালালকে উপরে উঠতে দেখা গেল। সুমিত্রা অপ্রসন্ন মুখে বললে, 'কই আপনাদের শিশির ডাক্তার তো এখনও এলেন না!'

হীরালাল বলল, 'সে কী, আমি তো কোন সকালে খপর দিয়ে এসেচি।'

রীতিমতো বিরক্তভাবে সে আবার বললে, 'এইজন্যেই তখন আপনাকে বলেছিলাম, শহর থেকে অন্য কোনও ডাক্তার ডেকে আনি। কী স্পর্ধা ভাবুন দেখি! কত বড় ভাগ্য তোর যে, তুই রায়বাহাদুরের চিকিচ্ছে করবার সুযোগ পাচ্চিস। ডাক দিলে তুই ছুটে আসবি না আর সব ফেলে! তার বদলে কিনা সাহেবি চাল।'

হীরালাল এক মিনিট থামল, কিন্তু সুমিত্রার তরফ থেকে আর কোনও কথা না পেয়ে বললে, 'আমি আর একবার না হয় যাই।'

সুমিত্রা কোনও কথা বলেনি, কারণ এতক্ষণ তার দৃষ্টি ছিল বারান্দার ওপারে বাইরের পথের দিকে। সেইদিকে চোখ রেখেই সুমিত্রা বললে, 'আপনাকে আর যেতে হবে না; তিনি বোধ হয় এই দিকেই আসছেন।'

সুমিত্রার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখা গেল, শিশির চৌধুরী বাড়ির দিকেই আসছে। তার পিছনে-পিছনে সাইকেল চালিয়ে আসছে একটি মেয়ে, বয়স চোদ্দো-পনেরোর কম নয়। শিশির এক মনে পথ চলছিল, সেদিকে লক্ষ্যই করেনি, পিছন থেকে বেলের ঘন-ঘন আওয়াজে সেই দিকে ফিরে তাকাল। মেয়েটি তাকে কী একটা বলতে গিয়ে হঠাৎ তাল সামলাতে না পেরে সাইকেল থেকে একেবারে পড়ে যাওয়ার উপক্রম! কিন্তু তার জন্যে সে ভয় পেয়েছে বলে মনে হল না, বরং তার খিলখিল হাসি জনবিরল পল্লীর পথ মুখর করে তুলল। শিশির হাসতে-হাসতে এগিয়ে গিয়ে মেয়েটিকে সাইকেল থেকে নামতে সাহায্য করলে।

শিশির ডাক্তারের সঙ্গে মেয়েটির কী কথা হল তা বারান্দা থেকে শোনা গেল না। কিন্তু সেইদিকে চেয়ে সুমিত্রার দুই চোখ যেন অস্বাভাবিক প্রখর হয়ে উঠল। হীরালালের দিকে চেয়ে সুমিত্রা বললে, 'আপনাদের গ্রাম তো খুব আপ-টু-ডেট দেখছি হীরালালবাবু, এতবড় মেয়ে সাইকেল চড়ে রাস্তায় বের হয়! শহরেও তো এইরকম দৃশ্য দেখা যায় না।'

হীরালাল মুখভঙ্গি করে বলে উঠল, 'ওদের কথা আর বলবেন না। সমস্ত গ্রামের কলঙ্ক! যেমন উন্মাদ বাবা তেমনি ধিঙ্গি অসভ্য মেয়ে।'

'উন্মাদ বাপটি কে?' সুমিত্রা জানতে চাইল।

হীরালাল বললে, 'ওই আমাদের বেণীমাধববাবু। এতকাল বাইরে কোথায় কন্ট্রাকটারি করতেন। বুড়ো বয়সে গ্রামে ফিরে এসেছেন সকলকে জ্বালাতে। ওই বুড়োই তো শিশির ডাক্তারের সব বদ মতলবের সহায়।'

সুমিত্রা কোনও কথা না বলে আবার বাইরে পথের দিকে চাইল। এবার দেখা গেল, সেই ধিঙ্গি মেয়েটা হাত ধরে শিশিরকে প্রায় টানতে-টানতে নিয়ে চলেছে। ওরা খানিকটা কাছে এসে পড়ায় এবার তাদের কথাবার্তাও শোনা গেল।

মেয়েটি বললে, 'না এখুনি আপনাকে আমাদের বাড়ি যেতে হবে।'

শিশির হাসতে-হাসতে বললে, 'যাব রে পাগলি যাব। কিন্তু এখানে একটা 'কল' আছে সেটা সেরেই তোমার ওখানে যাব।'

মেয়েটি অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলে উঠল, 'আহা! এখানে আবার কীসের কল! ও ভূতুড়ে বাড়িতে কেউ থাকে নাকি!'

শিশির জবাব দিল, 'হ্যাঁরে আজকাল থাকে। ওই দেখছিস না।' বলে সে চৌধুরী বাড়ির বারান্দার দিকে আঙুল দেখাল। সুমিত্রা সেটা লক্ষ করে একটু বিরক্তভাবে সরে এল সেখান থেকে।

শিশির মেয়েটিকে আবার বললে. 'আমি এখানকার কাজ সেরেই যাচ্ছি, বুঝেছিস।' মেয়েটি এবার মুখ ভার করে সাইকেলে উঠে পড়ল, যেন সে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

শিশির হাসতে-হাসতে বললে, 'শোন ইলা শোন। রাগের চোটে যেন বাইক-সুদ্ধ খানায় পড়ে হাত-পা ভাঙিস না।'

'ভাঙি ভাঙব। আপনাকে তো আর জুড়ে দিতে হবে না,' বলতে-বলতে ইলা সাইকেল দিল চালিয়ে। শিশির একটু হেসে চৌধুরী বাড়ির দিকে পা বাড়াল। শিশির রায়বাহাদুরের ঘরে ঢুকতেই হীরালাল বলে উঠল, 'আপনার দেরি দেখে ভাবছিলাম, কোনও জরুরি 'কলে' গেছেন বুঝি!'

শিশির খাটের পাশের চেয়ারটায় বসতে-বসতে বললে, ''কল' ছিল না, তবে তার চেয়ে জরুরি কাজ ছিল—ডিসপেন্সারির দাতব্য রুগিদের দেখা!'

সুমিত্রা প্রশ্ন করল, 'দাতব্য নয় বলেই কি এখানে রুগি দেখতে আসা আপনার কাছে জরুরি কাজও নয়!'

'নিশ্চয় জরুরি! কিন্তু তার সময় আছে। বেশি দরকার পড়লে আপনারা তো আবার খবর পাঠাতেন!' রায়বাহাদুরের দিকে চেয়ে শিশির বললে, 'ব্যথা তারপর নতুন করে হয়েছে কি?'

জবাব দিলে সুমিত্রা, 'না!'

'ঘুম হয়েছিল?'

'হ্যাঁ, খানিকটা।'

'বেশ, তাহলে এই ওষুধই এখন চলবে। পথ্যি যথাসম্ভব হালকা, আজকের মতো দুধ-বার্লি, মিষ্টি ফলের রস, এরারুট বিস্কুট, কিন্তু...।'

'পথ্যি কী খেতে হবে আমি জানি,' রায়বাহাদুর বাধা দিয়ে বলে উঠলেন! 'কিন্তু এই ভাবে কতদিন আমায় অকর্মণ্য করে, শুইয়ে রাখতে চান, জানতে পারি?'

শিশির বললে, 'একথা জানতে চাইছেন দেখেই বোঝা যাচ্ছে আপনার খানিকটা উন্নতি হয়েছে। কিন্তু আপনাকে আগেই বলেছি, শুয়ে আপনাকে এখন বেশ কিছুদিন থাকতে হবে। খেতাবের জন্য লোককে যত খাতির করেছেন, আর সিকি খাতির শরীরকে করলে, এরকম রোগে আপনাকে শুয়ে থাকতে হতো না।'

রায়বাহাদুর বিরক্তভাবে বলে উঠলেন, 'এসব কথা আপনার কাছে শুনতে চাই না।'

'তুমি চুপ করো বাবা! মিছিমিছি উত্তেজিত হয়ো না।' বলে সুমিত্রা শিশিরের দিকে চাইল। চাপা গলায় বললে, 'কিন্তু আপনি কি আপনার ডাক্তারির সীমার একটু বাইরে যাচ্চেন না, শিশিরবাবু?'

শিশির বললে, 'রোগী যদি ডাক্তারের ওপর মুরুব্বিয়ানা করে, তাহলে ডাক্তারকে বাধ্য হয়েই সীমা একটু ছাড়তে হয়! যাই হোক, আপাতত ভাবনার অন্য কোনও কারণ নেই! ঠিকমতো বিশ্রাম ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা হলে এবং ওষুধ-পত্র খেলে, দিন পনেরোর মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন, আশা করি!'

'সেই দিন পনেরো!' রায়বাহাদুর ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলে ওঠেন—'দিন পনেরো আমি এখানে কিছুতেই শুয়ে থাকব না।'

সুমিত্রা বললে, 'আচ্ছা এসব কথা এখন থাক বাবা।'

শিশিরের দিকে চেয়ে সুমিত্রা আবার বললে, 'আচ্ছা, নমস্কার ডাক্তারবাবু! দরকার হলে বাড়িতে খবর দিলেই বোধহয় আপনাকে পাওয়া যাবে?'

হীরালাল বলে উঠল, 'উঁহুঁ, উনি আবার বাড়িতে সবসময় থাকেন না। ওঁকে পেতে হলে—'

শিশির কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে বললে, 'আমাকে ডিসপেন্সারি ছাড়া আর কোথায় পাওয়া যায় তা হীরালালবাবু ভালোভাবেই জানেন; বেণীমাধববাবুর বাড়িতে খোঁজ করলেই আমায় পাবেন।'

'ও, সেইখানেই আপনি থাকেন! আচ্ছা নমস্কার!'

সুমিত্রার কণ্ঠস্বর এবার একটু অদ্ভুত শোনাল—'হীরালালবাবু, আপনি শিশিরবাবুকে নয় নামবার সিঁড়িটা—'

শিশির চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। স্টেথসকোপটা পকেটে পুরতে-পুরতে শিশির বললে, 'নামবার সিঁড়িটা জানি, কিন্তু আমি শুধু ভিজিটের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। কথাটা বাধ্য হয়ে মনে করিয়ে দিতে হল, মনে কিছু করবেন না।'

'ও! না, না, আমারই দোষ। আপনার কালকের ভিজিটটাও দেওয়া হয়নি।' সুমিত্রা টাকা বার করতে-করতে বললে, 'আপনি বেশি ভিজিট দিলে নেন না, কিন্তু ভিজিটের কথা ভোলেনও না দেখছি।'

শিশির হাসবার চেষ্টা করে বললে, 'না তা ভুলি না।'

আর একমুহূর্ত অপেক্ষা না করে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুমিত্রা সেদিন বেড়াতে বেরিয়েছিল। গ্রামের জনবিরল পথ ধরে চলতে-চলতে সে এসে পড়েছিল প্রচণ্ড এক বাগানের মধ্যে, হঠাৎ গানের মিষ্টি সুরে তাকে থমকে দাঁড়াতে হল। কিন্তু সুরটা যে কার কণ্ঠ এবং কোনদিক থেকে ভেসে আসছে, সেটা বোঝা গেল না। কৌতূহলী চোখে চারিদিকে চাইতে-চাইতে সুমিত্রা এগিয়ে চলেছিল।

হঠাৎ নারী-কণ্ঠে প্রশ্ন হল, 'বাঃ! আপনি এখানে কখন এলেন? পেয়ারা খাবেন একটা?'

বিস্মিতা সুমিত্রা মুখ তুলে চেয়ে দেখে. পেয়ারা গাছের ডালে বসে ইলা তাকে প্রশ্ন করছে।

'নাঃ, তোমার গান শুনি।' সুমিত্রা হাসতে-হাসতে বললে।

ইলা গাছের ডালে বসেই পা দুলোতে-দুলোতে আবার গান শুরু করে।

গান শেষ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই সুমিত্রা চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়ায়! ইলা কিন্তু এত সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। গাছের ডাল থেকে ঝুপ করে মাটিতে নেমে এসে প্রশ্ন করে, 'বাঃ চলে যাচ্ছেন যে বড়!'

'আর কী করব তাহলে?' সুমিত্রা এগিয়ে যেতে-যেতে বলে।

'বাঃ, আমাদের বাড়ি যাবে না?'

যেন সুমিত্রার ইলাদের বাড়িতে যাওয়ার কথাটা অনেক আগে থেকেই স্থির হয়ে আছে।

'তোমাদের বাড়িতে?' সুমিত্রার কণ্ঠে বিস্ময় আর কৌতুক।

'না গেলে আপনাকে ছাড়ছে কে? বাবা কত খুশি হবেন। শিশিরদার কাছে আমি সব শুনেচি।'

'আসুন!'—হাত ধরে সুমিত্রাকে প্রায় টেনে নিয়ে যেতে-যেতে ইলা বলে, 'একটা কথা কিন্তু আপনাকে বলে রাখি, বাবার যন্ত্রপাতির যেন নিন্দে করবেন না।'

'না, না, নিন্দে করব কেন' একটু বিব্রতভাবেই বলে সুমিত্রা—'কিন্তু যন্ত্রপাতি আবার কী?'

'সে আবার এক পাগলামি। চলুন না দেখবেন। বাবা তো রাতদিন কারখানা ঘরেই থাকেন।'

আর কোনও কথা জিজ্ঞাসার অবসর না দিয়ে, সুমিত্রাকে ইলা হিড়-হিড় করে টেনে নিয়ে চলল।

সুমিত্রাকে সঙ্গে নিয়ে ইলা যখন বেণীমাধবের কাছে পৌঁছল, তখন একমনে কী একটা যন্ত্র নিরীক্ষণ করছেন।

'বাবা, এই দেখ কে এসেছেন!'

বেণীমাধব যন্ত্র থেকে মুখ না তুলেই বলেন, 'বেশ, ভালো আছ তো মা?'

'সে কী বাবা, তোমার যে এখনও পরিচয় হয়নি।'

'তাইতো, তাইতো!'—বেণীমাধব যেন রীতিমতো বিব্রত হয়ে পড়েন।

'ইনি হলেন আমাদের জমিদারবাবুর মেয়ে'—পরিচয় দিতে গিয়ে ইলা সুমিত্রার দিকে চেয়ে বলে, 'এই যাঃ, আপনার নাম তো জানি না।'

'আমার নাম সুমিত্রা।'

'তাহলে, আপনি আমার সুমিত্রাদি।'

বেণীমাধবের পাশে দাঁড়িয়েছিল আর একটি মেয়ে, বয়সে ইলার চেয়ে কিছু বড়। তার দিকে চেয়ে ইলা বলে, 'ওই আমার বড়দি মীরা।'

মীরা সুমিত্রাকে নমস্কার জানায়। কিন্তু বেণীমাধব বা মীরা সুমিত্রাকে দেখে কথা জিজ্ঞাসা করবার পূর্বেই ইলা আবার শুরু করে ঃ 'জানেন সুমিত্রাদি, আমরা বাবার আগের পক্ষের দুয়োরানীর মেয়ে আর বাবার সত্যিকার আদরের সুয়োরানীর—ছেলে মেয়ে এই সব।'

ইলা ঘরময় ছড়ানো নানারকম যন্ত্রপাতির দিকে আঙুল দেখিয়ে হাসতে শুরু করে। সুমিত্রাও হেসে ওঠে এবং সঙ্গে-সঙ্গে বেণীমাধবও সে হাসিতে যোগদান করেন! কিন্তু হাসির মাঝেই হঠাৎ যেন ছেদ পড়ে যায়। মীরার মুখের দিকে চেয়ে বেণীমাধব বললে, 'জানো মা, আমার একটি মেয়ে জন্মদুঃখী।'

কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য স্বাভাবিক রাখবার চেষ্টা করে তিনি আবার বলেন, 'আর একটা পাগলি। কিন্তু পাগলি ঠিক বলছে মা, ওদের দিকে চাইবার সময় আমি পাইনি।'

'লক্ষ্মী বাবা, অমন কথা বোলো না। তোমার মতোন বাবা ক'জনের আছে।'

ইলা যেন বেণীমাধবের মনের মেঘটা কাটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে।

বেণীমাধব সুমিত্রার দিকে চেয়ে বলেন, 'কী জানো মা, এ একটা নেশা। বুড়ো বয়সে, লোকে নেশা ধরে, আমার আফিং হল এই কলকব্জা। অন্য দেশের লোক কলের দৈত্য দানবকে বেঁধে কাজ করাচ্ছে, আমাদের গরিব দেশে সে যখন নেই, সে সাহসও নেই। আমাদের শুধু দুটো হাত, তা-ও অকেজো! সেই ছোট হাতে যাতে অন্তত দশটা হাতের কাজ হয়, তাই আমাব চেষ্টা। জানি মা সবই হয়তো মিথ্যে, দেশের লোকের সাড়াই নেই। ওই যে শিশির ডাক্তার বলে না, যে এদেশ একবার সেই আদ্যি কালের গরুগাড়ি চড়েছিল আর তা থেকে নামেনি, কথাটা তো মিথ্যে নয়। কিছু মনে কোরো না মা, বুড়ো মানুষ একটু বেশি বকি, লোকে বিরক্ত হয়—'

'না, না, সে কী বলছেন, আমার খুব ভালো লাগছে। আমি একদিন সব ভালো করে দেখে যাব।' শিশিরের কথা এসে পড়ায় একটু ভাবান্তর ঘটলেও সুমিত্রা সহজভাবেই কথাগুলো বলবার চেষ্টা করে।

ইলা বলে ওঠে, 'থাম বাবা, শিশিরদা যে এঁদের বাটীতে ডাক্তারি করেন। এঁর বাবাকে দেখছেন।'

'তাই নাকি। শিশিরকে তাহলে জানো!'—বেণীমাধব যেন খানিকটা চিন্তিত হয়ে বলতে থাকেন, 'গাঁয়ে ওই একটা মানুষ আছে মা, কেমন করে ভুলে এসে পড়েছে। আর সব তো পোকামাকড়, সবাই বুকে হাঁটে। কারুর বিষ আছে, কারুর নেই, এই যা তফাত। কিন্তু তোমার বাবা যে শিশিরকে বাড়ি ঢুকতে দিলেন! এত খাঁটি লোক ওঁর ধাতে নয় না।'

বেণীমাধবের মুখে ঠিক এই ধরনের কথা শোনবার জন্য সুমিত্রা প্রস্তুত ছিল না, কাজেই বিব্রত বোধ করা তার পক্ষে স্বাভাবিক। বোধহয় তার সেই ভাবটি লক্ষ করেই মীরা বলে ওঠে, 'ওসব কথা থাক বাবা।'

মেয়ের কাছে বাধা পেয়েও বেণীমাধব নিবস্ত হন না, বলেন 'থাকবে কেন মা! বুড়ো হয়েছি, দাঁত পড়েছে আর কি মুখ সামলে কথা বলতে পারি?' সুমিত্রার দিকে চেয়ে তিনি বলেন, 'সত্যি কথা, তোমার বাবা বড় বোকা লোক, ফসল ফেলে আগাছারই চাষ করে যাচ্ছেন।'

'বাবা তো এখানে থাকেন না, সব কথা কী করে জানবেন।'

সুমিত্রা ঠিক অসন্তুষ্ট হয়েছে কি না, বোঝা যায় না।

বেণীমাধব আরও উৎসাহিত কণ্ঠে বলতে থাকেন, 'ওই না থাকাটাই যে অপরাধ মা। নিজের গাঁয়ে এসে দুদিন থাকলে বুঝতে পারতেন শিশিব ডাক্তাব এ-গাঁযেব কতখানি। ও-তো এখানে শুধু ডাক্তারি করতে আসেনি। এ-গাঁয়ে সাত জন্ম থাকলেও যে ডিগ্রির খরচা উঠবে না তা সে জানে। ও এসেছে শুধু রোগ সারাতে নয়, এদেব মানুষ কববাব তপস্যা নিয়ে।'

বেণীমাধব বোধহয় আরও কিছুক্ষণ শিশির ডাক্তারের গুণগান কবতেন, শিশির ডাক্তার স্বয়ং এসে পড়ায় ছেদ পড়ল।

'এই যে শিশিরদা, নিজের প্রশংসাটি শুনবার জন্য ঠিক সময এসেছ তো।' দুষ্টুমি ভরা কণ্ঠে ইলা বলে ওঠে।

শিশির মৃদু হেসে সুমিত্রার দিকে চেয়ে নমস্কার জানায়।

'নমস্কার' শিশিরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সুমিত্রা তাকাল ইলাব দিকে।

'আচ্ছা এখন তাহলে আসি। আর একদিন আবাব আসব।'

সুমিত্রা যাওয়ার জন্য পা বাড়ায়।

শিশিব একটু এগিয়ে এসে সুমিত্রার দিকে চেয়ে বলে ওঠে—'দেখুন, এখুনি আপনি চলে গেলে নিজেকে আমাব কিন্তু অত্যন্ত অপরাধী মনে হবে।'

'কেন বলুন তো?' সুমিত্রা এবাব শিশিরের দিকে ঘুবে দাঁড়ায়।

'মনে হবে যে, আমি এমন অসময়ে না এলে আপনাকে চলে যেতে হতো না।'

মুহূর্তের জন্য চুপ করে থেকে সুমিত্রা বলে, 'আমি আপনার জন্যেই চলে যাচ্ছি মনে করছেন?'

'ঘটনার যোগাযোগ সেই রকমই তো মনে হচ্ছে।'—শিশির হাসবার চেষ্টা করে।

'না, নিজেকে অতখানি মর্যাদা দেবেন না। আমি নিজে থেকেই যাচ্ছি। বাবাকে অনেকক্ষণ একলা রেখে এসেছি। আমার যাওয়া দরকার।'

সুমিত্রা যাওয়ার জন্য আবার পা বাড়ায়। শিশির একমুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর সুমিত্রার দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে বলে, 'নিজের মনকে প্রবোধ দিতে আপনাকে আমায় এগিয়ে দিতেই হবে।'

'এগিয়ে দিতেই হবে!'—সুমিত্রার কণ্ঠে বিস্ময় আর কৌতূহল।

'হ্যাঁ, না দিলে মনে খুঁত থেকে যাবে।' একটু থেমে শিশিব যেন সুমিত্রাকে আঘাত দেওয়ার জন্যেই বলে, 'ভয় নেই, এগিয়ে দেওয়ার জন্য ফী লাগবে না। ডাক্তারি পোশাক ছেড়ে এসেছি।'

শিশিরের কথার ধরনে সবাই হেসে ওঠে। সুমিত্রা কিন্তু শিশিরের সঙ্গে যাওয়ার কথায় আর আপত্তি করে না। এগিয়ে যেতে-যেতে বলে, 'ডাক্তারিটা আপনার শুধু পোশাক, তা জানতাম না।'

'আমায় কতটুকুই বা জানেন!' শিশির সুমিত্রার সঙ্গে যেতে-যেতে বলে।

বেণীমাধব আর ইলা ওদের যাওয়ার পথের দিকে খানিক চুপ করে চেয়ে থাকেন। তারপরে ইলা যেন নিজের মনেই বলে ওঠে, 'দু-জনকে ভারি চমৎকার মানায় কিন্তু।'

'আমাদের চোখে যা মানায়, বিধাতা যে তা মানেন না;'—বলে বেণীমাধব আবার যন্ত্রপাতিগুলোর দিকে মন দেওয়ার চেষ্টা করেন।

মীরা এবং ইলা দুজনেই এবার বাড়ির ভিতরের দিকে পা বাড়ায়। কিন্তু ওদের চলে যাওয়ার আগেই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত অবস্থায় হীরালাল এসে হাজির হয় সেখানে।

'আপনি কী আমায় মানসম্ভ্রম রেখে গাঁয়ে বাস করতেও দেবেন না?'—বেণীমাধবের দিকে চেয়ে হীরালাল যেন রাগে ফেটে পড়ে।

মানসম্ভ্রম জিনিসটা কোনওদিন তোমার ছিল কি, যে আজ নালিশ করতে এসেছ! হীরালালের দিকে না চেয়েই বেণীমাধব কথাগুলো বলেন।

'আপনি কোনও কিছুরই ধার ধারেন না, আমি জানি।' হীরালাল বলতে থাকে, 'কিন্তু এসব অনাচার অন্য কোথাও করলে আমার বলবার কিছুই থাকত না। আপনার বুড়ো বেহায়া মেয়ে গাছে উঠে পেয়ারা পাড়বে, ধিঙ্গি হয়ে রাস্তায় বাইক চড়ে বেড়াবে, এতে যে আমারই মাথা হেঁট হয়, লোকে আমাকে দোষ দেয়।'

'লোকে অত নির্বোধ বোধহয় নয় হীরালাল।' বেণীমাধব বেশ শান্তভাবেই বলেন, 'আমার মেয়ে বেহায়া হলে তোমার মাথা হেঁট হবে কেন?'

'নেহাত একটা সম্পর্ক আমাব কপালে হয়েছিল তাই!'

'সম্পর্কটা আমবা যখন ভুলে গেছি, তখন তুমি তা প্রচার করতে এত ব্যস্ত কেন, বুঝতে পারছি না তো!' বেণীমাধবের কণ্ঠস্বর কঠিন হয়ে ওঠে, 'শোনো হীরালাল, তোমার মতলব আমি জানি। আমার মেয়েকে তুমি একদিন নিষ্ঠুরভাবে ত্যাগ করে টাকার লোভে নতুন করে বিয়ে করেছিলে! আজ আমি হঠাৎ বড়লোক হয়েছি মনে করে তুমি ভাঙা সম্পর্ক নতুন করে ঝালিয়ে নেওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়েচ। কিন্তু যা ভাবচ তা হবে না হীরালাল।

'কী ভাবছি আমি? আমি আপনার টাকার প্রত্যাশী?'

'তা না হলে আগে তো কখনও ঘন-ঘন এমন নানা ছুতোয় আমাদের বাড়ি আসতে না। কিন্তু তোমার বৃথা আশা হীরালাল।' মীরার দিকে চেয়ে বেণীমাধব বলতে থাকেন, 'আমার মেয়ে দুঃখ যা সইবার সয়েছে, তার আর চারা নেই। কিন্তু আর আমি তাকে অপমান সইতে দেব না। আমি মরে গেলে আমার সম্পত্তির এক কপর্দকও যাতে তুমি না পাও, তেমনি করে আমি উইল করেছি। শিশির ডাক্তার তার ট্রাস্টি, এটুকু জেনে রাখো।'

বেণীমাধব আর সেখানে দাঁড়ালেন না।

হীরালাল উত্তেজিতভাবে ইলার দিকে এগিয়ে গিয়ে বলতে আরম্ভ করে, 'শুনলে, শুনলে তোমার বাবার কথা। আমায় শাসিয়ে গেলেন, সম্পত্তির কানাকড়ি দেবেন না! আমি যেন ওঁর টাকার কাঙালি!'

'শিশির ডাক্তার কেন এখানে ঘুর-ঘুর করে আসে, তা যেন আমি বুঝি না!' একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলবার চেষ্টা করে হীরালাল এবার মীরার দিকে তাকায়—'ভেবেছিলাম, ভুলচুক যা হয়ে গেছে এবার তা শুধরে নেব। বিয়ে না হয় আর একটা করেছিলাম। কিন্তু সে তো মরে গিয়ে সব গোলে মিটিয়ে দিয়েছে। এখন আর তোমায় নিয়ে যেতে বাধা কী! কিন্তু এসব কথার পর আর কি ইচ্ছে হয়।'

মীরা একপাশে মাথার ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়েছিল। তার তরফ থেকে এতটুকু সাড়া পর্যন্ত পাওয়া যাবে না। হীরালাল আবার শুরু করে, 'সেদিন রায়বাহাদুরের মেয়ে সুমিত্রাদেবী তোমাদের কাণ্ড দেখে কীরকম ছি-ছি করতে লাগলেন। তোমার বাবা না হয় কারও ধার ধারেন না, কিন্তু আমাকে তো সমাজে মেলামেশা করতে হয়।'

ইলা বলে, 'সুমিত্রাদেবী আজ এখানে এসেছিলেন খানিক আগেই।'

'এখানে এসেছিলেন?' হীরালালের গলার স্বর আশ্চর্য রকম বদলে যায়।

'হ্যাঁ, এইমাত্র শিশিরদার সঙ্গেই যাচ্ছেন!' ইলার কণ্ঠে দুষ্টুমির সুর।

হীরালাল মিনিটখানেক চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। কী যে ভাবে ঠিক বোঝা যায় না। তারপর যেন ঘুম থেকে চমকে উঠে বলে ঃ 'ও শিশির ডাক্তারের সঙ্গে গেল বুঝি! ওঃ, আচ্ছা—'

হীরালাল তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়, যেন কী একটা ভয়ানক জরুরি কাজ তাব মনে পড়ে গেছে!

দু-তিন দিন পরের কথা। রায়বাহাদুর দোতলার বারান্দায় বড় একটা কৌচে হেলান দিয়ে সিগার টানছিলেন, কিন্তু তাঁর চোখ দুটো নিবদ্ধ ছিল হাতের খবরের কাগজের পাতাটার ওপর। হীরালাল যেন রায়বাহাদুরের খবরের কাগজ পড়া শেষ হওয়ার অপেক্ষায় তাঁর পাশেই উদগ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

শিশিরকে সঙ্গে নিয়ে সুমিত্রা এসে দাঁড়াল সেখানে।

'ডাক্তারবাবু এসেছেন বাবা।'

'ডাক্তারকে তো আজ 'কল' দেওয়া হয়নি,' খবরের কাগজের পাতা থেকে মুখ না তুলেই রায়বাহাদুর বলেন!

উত্তর দেয় শিশির।—'কল না দিলেও আমাদের কখনও-কখনও আসতে হয় রায়বাহাদুর। বিশেষত আপনাদের মতো রোগীর বাড়ি।'

রায়বাহাদুরের মুখের সিগারটা হঠাৎ কেড়ে নিয়ে শিশির বলে ঃ 'হুঁ, এই জন্যেই তো আসাটা আরও ঠিক হয়েছে। এ সিগার খেতে আপনাকে হুকুম দিলে কে?'

'আমি কারও হুকুমের তোয়াক্কা রাখি না।'

রায়বাহাদুর যে অত্যন্ত অপ্রসন্ন হয়েছেন তা তাঁর কণ্ঠস্বরেই বোঝা যায়।

'তা জানি। কিন্তু আপনার দুর্বল দেহ যন্ত্রটা রাখে'—সিগারটা বারান্দার বাইরে ফেলে দিয়ে শিশির সুমিত্রাকে জিজ্ঞাসা করে ঃ 'এ সিগার কে এনে দিয়েছে?'

'আমি তো জানি না। আমি তো সিগারের বাক্স আমার ঘরে তুলে রেখেছিলাম।' সুমিত্রা জানায়।

শিশির রায়বাহাদুরের মুখের দিকে চাইতেই তিনি বলেন, 'ও সিগার আমি নিজে আনিয়েছি।'

'তা বুঝেছি। কিন্তু এনে দিলে কে'—শিশির জানতে চায়।

'আমি—আমি মানে,' রায়বাহাদুর বললেন, 'তাই একটা এনে দিলাম,' হীরালাল বলে।

'আপনি তো রায়বাহাদুরের পরম হিতৈষী দেখা যাচ্চে।' শিশিরের কণ্ঠস্বর একটু কঠিন হয়ে ওঠে, 'আমি ওঁকে পনেরো দিন শুয়ে থাকতে বলেছি, আপনি দেখছি ওকে একেবারেই শুইয়ে দিতে চান। দেখি আপনার Pulse, দেখি জিভটা দেখি—'

'কোনও দরকার নেই, আমি বেশ ভালো আছি'—রায়বাহাদুরের মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু শিশির তাঁর জিভটা পরীক্ষা না করে নিরস্ত হয় না। তারপর সুমিত্রার দিকে চেয়ে বলে, 'হ্যাঁ চুরুটের বাক্সটা আজই পুড়িয়ে ফেলবেন। আর ওষুধ যেমন চলছে তেমনি চলবে।'

হীরালাল যে এতক্ষণ কিছু বলবার অপেক্ষায় ছিল, এতক্ষণে সুযোগটা সদ্ব্যবহার

করে। 'শুধু ওষুধে আর কী হবে ডাক্তারবাবু, সঙ্গে-সঙ্গে আর একটা ওষুধ যখন চালাচ্ছেন—'

'তার মানে?' শিশির একটু আশ্চর্য হয়েই প্রশ্ন করে।

'তার মানে?' হীরালাল খবরের কাগজখানা রায়বাহাদুরের হাত থেকে নিয়ে শিশিরের সামনে মেলে ধরে, 'এতে ভূষণা গ্রাম সম্বন্ধে যে চিঠিটা বেরিয়েছে সেটা একবার পড়ে দেখুন না।'

'আমার দরকার নেই।'

'দরকার নেই তা জানি। কী বেরিয়েছে তা তো আপনার অজানা নয়। কিন্তু লোকালবোর্ড সম্বন্ধে মিথ্যে অপবাদগুলো ঠিক এই সময়েই কাগজে বার না করলে চলতো না? রায়বাহাদুরের এই কঠিন অসুখে—'

হীরালালের উচ্ছ্বাসের মাঝ পথেই শিশির বলে ওঠে, 'রায়বাহাদুরের অসুখ বলে লোকালবোর্ডের সাতখুন তো মাপ হয়ে যায় না হীরালালবাবু; তাছাড়া লোকালবোর্ড যদি ওঁর এতই প্রাণের জিনিস হয় যে তার নিন্দে ওঁর প্রাণে লাগে, তাহলে নিজের শরীরের সঙ্গে রায়বাহাদুব তারও চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন!'

'আপনি তাহলে বলতে চান লোকালবোর্ডকে রোগে ধরেছে! এসব অভিযোগ আপনি সত্য বলেন?'

'আমি কিছুই বলতে চাই না হীরালালবাবু, এখানে আমি ডাক্তার মাত্র।'

'বাইরেও শুধু ডাক্তারি নিয়ে থাকলেই বোধহয় ভালো করতেন শিশিরবাবু! দু-নৌকায় পা দেওয়াটা ভালো নয় শুনেছি।' রায়বাহাদুরের কণ্ঠে হুমকির সুরটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

শিশির কিন্তু বেশ শান্তভাবে জবাব দেয়, 'সেটা পায়ের টাল আর নৌকার হালের উপর নির্ভর করে রায়বাহাদুর। প্রাণের ভয় যার বেশি সে তো ডাঙা ছেড়ে এক নৌকাতেই পা দেয় না। আচ্ছা আমি এখন আসি।'

বেরিয়ে যাওয়ার আগে শিশির সুমিত্রার মুখের দিকে চেয়ে বলে, 'ওষুধটা এখনই একবার দেবেন।'

শিশির ঘরের বাইবে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই হীরালাল রুদ্ধ আক্রোশে যেন ফেটে পড়ে।

'দেখলেন, আস্পর্ধাটা দেখলেন একবার। আপনার মুখের ওপর বলে গেল লোকালবোর্ডের চিকিৎসা দরকার।'

'বাবার এখন বিশ্রাম দরকার হীরালালবাবু, এসব আলোচনা এখন না করলেই ভালো হয়।'

'ওঃ, হ্যাঁ, তাই বটে। আচ্ছা আমি বরং এখন আসি।'

সুমিত্রার গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে আর কোনও কথাই বলবার সাহস হীরালালের হয় না। সে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে সুমিত্রাকে বলতে শোনা যায়, 'আর ভবিষ্যতে এরকম কাগজপত্র এখানে দেখাতে আসবেন না।'

'না, না, কাগজপত্র আর কীসের। নেহাত একটা হাতে এসে পড়ল তাই।'

হীরালাল একটু বিব্রতভাবেই বিদায় নেয়। সুমিত্রা এবার রায়বাহাদুরের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

'ওষুধটা খেয়ে নাও বাবা।'

'ওষুধ আমি খাব না। কালই আমি শহরে যাব!'

'না বাবা, তা কী হয়। আর ক'টা দিন বইতো নয়।'

'ক'টা দিন! ও মুখ্যু গোঁয়ার জানে কী?'

সুমিত্রা একটু হেসে জবাব দেয়, 'ডাক্তারিটা অন্তত জানে বাবা।'

'হুঃ।' রায়বাহাদুর বিরক্তভাবে মুখটা ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। সুমিত্রা ওষুধের শিশি আর গ্লাসটা এনে তাঁর সামনে টিপয়ের ওপর রাখে।

আরও কয়েকটা দিন পরে।

রায়বাহাদুর তাঁর ঘরে বসেছিলেন। সুমিত্রা শিশি থেকে ওষুধ ঢেলে তাঁকে খাওযাবার ব্যবস্থা করছিল। শিশির ঘুরে ঢুকতেই রায়বাহাদুরের মুখখানা আবার অপ্রসন্ন হয়ে উঠল। শিশির বোধহয় তাঁর সেই ভাবান্তরটুকু লক্ষ করেই বলে, 'যাক, আর আপনাকে ওষুধ খেতে হবে না। এই শেষ।'

অত্যন্ত বিরক্তভাবে ওষুধটুকু খেয়ে নিয়ে রায়বাহাদুর বলেন, 'এখানে থাকাও আজই শেষ। ক'টা দিন আমার বাজে নষ্ট!'

'তা বলতে পারেন বটে, তবে ক'টা দিন বাজে নষ্ট করে যা মেরামত হয়ে গেলেন ক'টা বছর এখন তার জোরে স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে দিতে পারবেন। যদি না অবশ্য অতিবিক্ত অত্যাচার করেন।'

হাত জোড় করে নমস্কার জানিয়ে শিশির বলে, 'আমার কাজ শেষ হয়েছে, আমি চলি।'

রায়বাহাদুর শুকনো একটা নমস্কার জানিয়ে চুপ করে থাকেন, একটি কথাও বলেন না।

সুমিত্রা দাঁড়িয়েছিল রায়বাহাদুরের পাশটিতে মাথা হেঁট করে, তার পক্ষ থেকেও একটা ধন্যবাদের কথা শোনা যায় না। মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করে শিশির ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। তারপর সুমিত্রা বোধহয় মিনিটখানেক সেখানে স্থির হয়ে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে আর সেই এক মিনিটের মধ্যেই হঠাৎ কী যেন একটা ঠিক করে ফেলে।

'আমি আসছি বাবা—'

রায়বাহাদুরের উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই সুমিত্রা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

রায়বাহাদুর রীতিমতো আশ্চর্য হয়ে মেয়ের চলে যাওয়ার ভঙ্গিটা লক্ষ করেন। কিছুই ঠিক বুঝতে পারেন না।

বারান্দা দিয়ে সিঁড়ির দিকে যেতে-যেতে সুমিত্রার ডাকে শিশিরকে রীতিমতো আশ্চর্য হয়েই থামতে হয়।

'কই ভিজিট না নিয়েই চলে যাচ্ছেন যে।' সুমিত্রা যে প্রায় ছুটতে-ছুটতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে তার প্রমাণ তার নিশ্বাস চাপবার চেষ্টা থেকেই বোঝা যায়।

'ও ভুলে গিয়েছিলাম—'

'এরকম ভুল আপনার তো হওয়ার কথা নয়।' সুমিত্রা শিশিরের মুখের দিকে চেয়ে হাসবার চেষ্টা করে।

'আজকাল তো হচ্ছে দেখছি।' শিশিরের কণ্ঠস্বর তার নিজের কাছেই যেন একটু বেসুরো শোনায়।

'কিন্তু আমি ভুলিনি দেখছেন;' সুমিত্রা তার নিজের ঘরের সামনে গিয়ে বলে, 'আসুন।'

শিশির আরও একটু আশ্চর্য হয়ে সুমিত্রার পিছনে-পিছনে তার ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ায়। সুমিত্রা কোনও কথা না বলে আলমারি খুলে সুদৃশ্য একটি ছোট বাক্স বার করে। বাক্সটি খুললে দেখা যায় সোনা বাঁধানো একটি ফাউন্টেনপেন।

'এ আবার কী!' শিশির কণ্ঠস্বর বিস্ময়ে বিহ্বল।

'বাবাকে আপনি ভালো করে দিয়েচেন, এ তারই কৃতজ্ঞতার চিহ্ন।' সুমিত্রা যেন ভালো করে শিশিরের দিকে চাইতে পারে না।

'না, না, এসব কী পাগলামি করচেন'—শিশির আপত্তি জানাবার চেষ্টা করে, 'তা ছাড়া আমি ডাক্তার মানুষ, এ সৌখিন জিনিস নিয়ে কী করব?

'কী আর করবেন, লিখবেন। কী একটা ভাঙা কলমে প্রেসক্রিপশন লেখেন, পড়াই যায় না।'

সুমিত্রার কণ্ঠে এবার যেন ছেলেমানুষির সুর।

শিশির মুহূর্তের জন্য চুপ করে থেকে কী যেন ভাবে। তারপর সুমিত্রার চোখের দিকে চেয়ে বলে; 'কিন্তু এ-কলমে প্রেসক্রিপশন যে মোটেই লিখতে পারব না।'

'কেন বলুন তো?'

'সব ভুল হয়ে যাবে হয়তো!'

'না, না, হবে না, নিন এ-কলম আপনাকে নিতেই হবে'—সুমিত্রা যেন নিজের অজ্ঞাতেই কলমটা বাক্স থেকে তুলে নিযে শিশিবের কোটের বুকপকেটে পরিয়ে দিতে যায়। পর মুহূর্তেই কী যেন মনে পড়ায় নিজেকে সংবরণ করে ফেলে, কলমটা ধীবে-ধীরে নামিয়ে রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে—যেন শিশির কী করে তাই দেখবাব অপেক্ষায়!

শিশিরও এতক্ষণ বিস্মিত, মুগ্ধ চোখে চেয়েছিল সুমিত্রাব দিকে। হঠাৎ তার মনে হয় এতদিন সে যে সুমিত্রাকে দেখেছিল এ সে নয়। এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে কলম সমেত কাস্কেটটা তুলে নিয়ে সে পকেটে রাখে, তাবপব বলে, 'আচ্ছা ধন্যবাদ। নমস্কার'—

'নমস্কার'...সুমিত্রা যেন অনেক দূব থেকে কথা বলে।

শিশির দ্রুত পায়ে ঘর ছেড়ে বেবিযে যায়। সুমিত্রা সেইখানেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িযে থাকে। তার দু-চোখের উদাস দৃষ্টি গ্রাম প্রান্তের গাছপালাগুলো ছাড়িয়ে আরও কতদূরে ভেসে যায় কে জানে! এমনিভাবে কতক্ষণ সে একা ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল তার হিসাব নেই—

'আমি ভেবে দেখলাম—'

হঠাৎ ঘরের মধ্যে শিশিরের কণ্ঠস্বব শুনে সুমিত্রা চমকে উঠল! শিশির যে কখন ফিরে এসেছে তা সে বুঝতেই পারেনি।

'ভেবে দেখলাম, পুরস্কার যদি নিতেই হয় এত সামান্য পুরস্কারে আমার চলবে না।' শিশিরের কণ্ঠস্বরে রীতিমতো আত্মপ্রত্যয়ের সুর, এরইমধ্যে সে যেন অনেকখানি সাহস সঞ্চয় করে ফেলেছে।

'এটা তা হলে আপনি নেবেন না?' সুমিত্রার কণ্ঠস্বর আহত।

'নিতে অবশ্য পারি, কিন্তু এর চেয়ে অনেক বেশি কিছুর, অনেক বড় কিছুর দাবী জানানো রইল।'

শিশির এবার পূর্ণদৃষ্টি দিয়ে সুমিত্রার মুখের দিকে চায়। সে দৃষ্টির সামনে সুমিত্রা যেন কেঁপে ওঠে।

'তার মানে?'

'তার মানে?' শিশির যেন কী একটা কথা বলতে গিয়ে থেমে যায়। তারপর বলে, 'আর একদিন বলব।'

'আর একদিন! কিন্তু আমরা যে আজই শহরের বাড়িতে চলে যাচ্ছি'—সুমিত্রা যেন কৌতূহল চেপে রাখতে পারে না।

শিশির এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে জানায়, 'আপনাদের শহরের বাড়ি কি এতই দুর্গম যে আমার মতো দুঃসাহসীকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে!'

সুমিত্রার মুখের কোনও কথার জন্যে অপেক্ষা না করেই শিশির ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। সুমিত্রা প্রথমে যেন নিজেকে ঠিক বিশ্বাস কবতে পারে না। মনে হয় ভুল শুনেছে কিংবা ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছে হয়তো! খাটের বাজুতে হেলান দিয়ে অনেকক্ষণ সে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে আর শিশিরের কথাগুলো মনে-মনে আবৃত্তি করে। হঠাৎ তার সমস্ত দেহ-মন অপরূপ এক মাধুর্যে ভরে ওঠে। প্রথম প্রণয় নিবেদনের আকস্মিক উপলব্ধির আনন্দে বিহ্বল সুমিত্রা অলসভাবে বিছানায় নিজেকে এলিয়ে দেয়।

রায়বাহাদুরের কলকাতায় ফিরে যাওয়ার পর শিশিরের মনে হয় সমস্ত ভূষণা গ্রামখানাই যেন তার কাছে শূন্য হয়ে গেছে। চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারির সেই ভাঙা টিনের চালার মধ্যে বসে রুগি দেখতে-দেখতে শিশির যেন মাঝে-মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। এতদিন এইসব রুগিদের দেখা এবং আবশ্যকমতো তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করাই ছিল শিশিরের জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দ। এখন যেন মনে হয়, এই ডিসপেন্সারি, রুগি আর প্রেসক্রিপশনের জগতের বাইরে আর একটা জগত আছে এবং সেখানকার আহ্বান অস্বীকার করবার ক্ষমতা তার নেই।

সেদিন দুপুরে রুগি দেখবার পালা চুকে যাওয়ার পর শিশির হঠাৎ হরিহরকে জিজ্ঞাসা করে, 'এখন কলকাতা যাওয়ার ট্রেন আছে হরিকাকা?'

হরিহর একটু আশ্চর্য হয়ে প্রশ্নে করেন, 'এই দুপুর রোদ্দুরে!'

শিশির বলে, 'আমার তো সাইকেল রযেচে, স্টেশনে যেতে কতক্ষণ আর লাগবে। ট্রেন আছে কিনা তাই বল—'

'ট্রেন আবার থাকবে না কেন, আধ ঘণ্টা অন্তর কলকাতায় যাওয়ার ট্রেন পাওয়া যায়। কিন্তু হঠাৎ...'

'হঠাৎ নয় হরিকাকা আমাকে যেতেই হবে।'

হরিহর ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেরে হাঁ করে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকেন।

ভূষণা থেকে কলকাতার দূরত্ব মাইল-চল্লিশের বেশি নয়, কাজেই সেখানে পৌঁছতে শিশিরের ঘণ্টা তিনেকও লাগে না, তারপর ফার্ন রোডের কাছাকাছি গিয়ে রায়বাহাদুরের প্রকাণ্ড বাড়িটা খুঁজে নিতে আর কতক্ষণ।

শিশিরকে দেখে সুমিত্রা কিন্তু সত্যই আশ্চর্য হয়ে যায়।

'সত্যিই এলেন তা হলে?'

'বাঃ, আপনাকে তো বলেই রেখেছিলাম। রায়বাহাদুর কোথায়?'

'ওপরে।'

'চলুন তার সঙ্গে দেখা করে আসি। কেমন আছেন তিনি?'

'ভালোই আছেন তিনি, কিন্তু তাঁর সঙ্গে আর দেখা করে দরকার নেই।'

শিশির একটু চুপ করে থেকে বলে, 'তা হলে কি আপনি আমায় ধুলো পায়ে বিদায় নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন? আমি কিন্তু তাতে রাজি নই।

শিশিরের কথা বলবার ভঙ্গিতে হেসে ফেলে সুমিত্রা বলে, 'আমিও না। কেবল ভাবচি বাবার কথা। জানতে পারলে তিনি খুব রাগ করবেন।'

'বাবাকে আপনি খুব ভয় করেন বুঝি?'

'সাধারণ নিয়মে একটু করতেই হয়।'

শিশির একটু ভেবে বলে, 'তা হলে এক কাজ করুন। বিশেষ একটা কাজে যাচ্চেন বলে রায়বাহাদুরের কাছে ছুটি নিয়ে আসুন। তারপর কোনও সিনেমা কিংবা রেস্তরাঁয়...আমি বরং বাইরে একটু অপেক্ষা করি।'

সুমিত্রা কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বলে, 'মাফ করবেন, এরকমভাবে বাইরে যাওয়ার অভ্যেস আমার নেই! তাছাড়া বাবার কাছে শুধু-শুধু কতকগুলো মিছে কথা বলতেও আমি পারব না।'

'আচ্ছা, নমস্কার। তা হলে চললাম।'

শিশির যাওয়ার জন্য পা বাড়ায়। সুমিত্রার চোখেমুখে এতক্ষণ যে উৎসাহের আলো লেগেছিল সেটা যেন হঠাৎ নিভে আসে। কিন্তু অল্পক্ষণের জন্য। তারপরই সে মন স্থির করে ফেলে।

'আপনি আমার পড়ার ঘরে বসবেন চলুন।'

'কিন্তু...'

সুমিত্রা এবার হাসতে-হাসতে বলল, 'কোনও ভয় নেই আপনার। বাবা নিচে নামেন খুব কম, তাছাড়া এ-দিকটায় একেবারেই যান না।'

সুমিত্রার পড়ার ঘরে পৌঁছে শিশির কিন্তু বলবার মতো কোনও কথাই যেন খুঁজে পায় না।

সুমিত্রা তার অস্বস্তির ভাবটা লক্ষ করে হাসতে-হাসতে প্রশ্ন করে—'হঠাৎ চলে এলেন, বেচারি রুগিগুলোর কোনও ক্ষতি হবে না তো?'

শিশির জবাব দেয়, 'বেচারি রুগিদের জন্যে হরিকাকা আছেন, কিন্তু স্বয়ং ডাক্তার যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে তা হলে তার কলকাতায় আসা ভিন্ন উপায় কী?'

শিশিরের মুখের দিকে দুষ্টুমিভরা চোখে চেয়ে সুমিত্রা বলে, 'শুনেছি ডাক্তারেরা নিজেদের অসুখের বেলাতেই রোগ নির্ণয় করতে ভুল করে ফেলেন। আপনার বেলায় সে ভয় নেই তো?'

শিশির হাসতে-হাসতে বলে, 'সম্ভবত নয়, তা হলে এতদূর ছুটে আসতাম না।'

শিশির তারপর একটু চুপ করে থেকে বলে, 'আপনার দেওয়া ফাউন্টেনপেনটা পকেটে পুরে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময়ও এ-সম্বন্ধে আমি কিছু ভাবিনি কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে হঠাৎ মনে হল আপনার কাছে আমার আরও অনেক কিছুই দাবী করবার আছে। তাই আবার ফিরে এলাম। হয়তো অন্যায় হয়েছিল, কিন্তু এখন আর কোনও উপায় নেই...'

'...আচ্ছা, বেশ হয়েছে। চুপ করে বসুন তো, আমি চা নিয়ে আসি...'

চায়ের পালা শেষ হওয়ার পর ঘরের মধ্যে অপরাহ্নের আলো ধীরে-ধীরে নিস্তেজ হয়ে আসে।

সুমিত্রা বলে, 'বাবার বেড়াতে যাওয়ার সময় হল।'

'অর্থাৎ এবার আমার সরে পড়া উচিত। না, সত্যিই আর আপনাকে বিব্রত করা ঠিক হবে না।'

শিশির চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, তারপর কতকটা যেন নিজের মনেই বলে, 'দেখুন, ছেলেবেলা থেকে আত্মীয়-স্বজনের বালাই একরকম নেই বললেই হয়, নিজের খেয়াল আর খুশি নিয়েই চলতে শিখেছি বরাবর। তাই সবসময় হয়তো আদব-কায়দা মেনে চলতে পাবি না। কিন্তু সে দোষটা আমার নয়, আমার অভ্যাসের।'

'দোষ কে দিচ্ছে আপনাকে! কবে আসবেন আবার?'

'এই তো মুশকিল! আবার সাহস দিচ্ছেন?'

'দুঃসাহস তো আপনার আছেই। আমি একটু প্রশ্রয় দিচ্চি মাত্র। '

শিশির এবার ছেলেমানুষের মতো উৎসাহিত কণ্ঠে বলে ওঠে, 'তা দিন। আমার তরফ থেকে কোনও অসুবিধা হবে না। সময় পেলেই ছুটে আসব।'

সুমিত্রা কিছুক্ষণ শিশিরের উৎসাহদীপ্ত মুখেব দিকে চেয়ে থেকে বলে, 'ওঃ আগে আপনাকে কী ভয়ানক গম্ভীর বলে জানতুম। কথা কইতে পর্যন্ত ভয় হতো।'

'সেইজন্যেই তো একদিন বলেছিলাম কতটুকুই বা জানেন আমার সম্বন্ধে!' শিশির হাসতে-হাসতে জবাব দেয়।

উপরতলা থেকে এইসময় রায়বাহাদুরের খাস চাকরের হাঁক শোনা যায়, 'দারোয়ান, ড্রাইভারকে গাড়ি বার করতে বল।'

ঘরের মধ্যে শিশির আর সুমিত্রা দুজনেই সচকিত হয়ে দুজনের মুখের দিকে তাকায়। তারপর শিশির বলে, 'এবাব আমারও বেরিয়ে পড়া দরকার। আচ্ছা নমস্কার...।'

শিশির বেরিয়ে যাওয়ার পরও সুমিত্রা আচ্ছন্নের মতো কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ যেন সজাগ হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে উপরে উঠতে থাকে।

রায়বাহাদুরের সঙ্গে তাকেও রোজ বেড়াতে যেতে হয়।

মাস-খানেক পরে রায়বাহাদুরের কলকাতার বাড়িতে হঠাৎ একদিন হীরালালের আবির্ভাব। প্রাথমিক কুশল প্রশ্নাদির পর আসল কথায় পৌঁছতে হীরালালের দেরি হয় না।

'আপনি গ্রাম ছেড়ে চলে আসার পর শিশির ডাক্তারের দাপটটা যেন আবও বেড়েচে। আমাদের উপরেই যত আক্রোশ, কারণ আমরা আপনার অনুগত। কিন্তু তাতেও ক্ষতি ছিল না, যদি আপনার নামে পর্যন্ত ঠেস দিয়ে কথা না বলত। স্কুলবাড়ির কন্ট্রাক্ট নিয়ে সেদিন মিটিং-এ যা বললে তা যদি শুনতেন।'

'আর শুনতে পারি না হীরালাল,—রায়বাহাদুর অধৈর্য হয়ে বলে ওঠেন, 'বেছে-বেছে চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারির কী ডাক্তার জোগাড় করেচ। একেবারে আমার জীবনের শনি হয়ে উঠল! গাঁ ছেড়ে কলকাতায় এসেও শান্তি নেই!'

'আজ্ঞে তখন কী করে বুঝব বলুন যে ওর ভেতর এত শয়তানি আছে! এই দেখুন না গাঁয়ে আপনার এত বদনাম করবার পরও কোন মুখে যে এ-বাড়িতে আসে তাই তো আমি ভেবে পাই না।'

'কে এ-বাড়িতে আসে? শিশির ডাক্তার? কী বলছ তুমি!'—বিস্মিত রায়বাহাদুর যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারেন না।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, এখন তো হামেশাই আসে।' বেশ স্বাভাবিক কণ্ঠেই হীরালাল জানায়, এই তো আজই দেখে এলাম নিচে বসে সুমিত্রা দেবীর সঙ্গে গল্প করচে।

রায়বাহাদুরের মুখ কঠিন হয়ে ওঠে এবং হীরালাল তারপর আর সেখানে দাঁড়ানো সমীচীন মনে করে না।

হীরালাল কথাটা মিছে বলেনি। রায়বাহাদুর যখন হীরালালের সঙ্গে আলাপ করছিলেন, তখন ওপরে উঠবার সিঁড়ির ঠিক তলায় দাঁড়িয়ে সুমিত্রা শিশিরকে বলছিল, 'না, না, আজই কী দরকার। বাবার সঙ্গে দু-দিন পরে দেখা করলেও চলবে।'

শিশির রাজি হয় না। বলে, 'অত ধৈর্য আমার নেই। উঁহু, আর চলছে না। ওদিকে গাঁয়ের রুগিরা, এদিকে তুমি—এই দোটানার মাঝে টানা-পোড়েন করতে আমি আর পারছি না।'

'তা তোমার রুগিদের নিয়েই থাক না।' সুমিত্রার চোখে মুখে দুষ্টুমি যেন উছলে ওঠে।

'তা হলে আমার রোগ যে আবার সারে না!' শিশির রীতিমতো হতাশার ভঙ্গি করে।

'কিন্তু বাবা'...সুমিত্রা যেন হঠাৎ সঙ্কোচ বোধ করে।

'না, না, কোনও ভাবনা নেই—শিশির অভয় দেয়, 'তোমার বাবার হার্ট আমি ভালো করে পরীক্ষা করে দেখেছি। এরকম একটা প্রস্তাবে তাঁর হঠাৎ হার্টফেল করবার কোনও সম্ভাবনা নেই!'

হাসতে-হাসতে শিশির সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে আরম্ভ করে। মিনিট খানেক ইতস্তত করে সুমিত্রাও উপরের দিকে পা বাড়ায়।

শিশিরের পায়ের শব্দে একবার তাকিয়েই রায়বাহাদুর মুখটা ফিরিয়ে নেন। তার মুখটা অস্বাভাবিক কঠিন হয়ে ওঠে। শিশির এগিয়ে এসে নমস্কার জানায়। রায়বাহাদুর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে তাঁর মুখের চুরুট নির্গত ধোঁয়ার কুণ্ডলীর দিকে চেয়ে থাকেন!

শিশির বলে, 'আমাকে দেখে আপনি খুব খুশি হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু এবার আমি আপনার চিকিৎসার ব্যাপারে আসিনি।'

'আমার সময় অল্প, যা বলবার আছে বলুন।' রায়বাহাদুরের কণ্ঠ তাঁর মুখের মতোই গম্ভীর।

'দেখুন অনেক কথাই বলব ভেবে এসেছিলাম, কিন্তু আপনার ভাবগতিক দেখে বাধ্য হয়েই ভূমিকাটা বাদ দিতে হচ্চে।' এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে শিশির আবার বলে, 'আমার আসল কথা হল—আপনার মেয়েকে আমি বিয়ে করতে চাই।'

রায়বাহাদুর কোনও কথা বলেন না, স্তম্ভিতভাবে শিশিরের মুখের দিকে চেয়ে থাকেন।

শিশির একটু অপেক্ষা করে আবার বলে, 'আপনার অনুমতি কি আমরা পেতে পারি?'

শিশিরের পিছনে সুমিত্রাকে এসে দাঁড়াতে দেখে রায়বাহাদুরের বিস্ময় আর ক্রোধের মাত্রা দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। বজ্রকঠিন কণ্ঠে তিনি বলেন, 'শোন, এ-পর্যন্ত চাকর ডেকে কাউকে বার করে দেওয়ার দরকার আমার আগে কখনও হয়নি—'

'আজও হবে না।' রায়বাহাদুরের বক্তব্য শেষ হওয়ার আগেই শিশির বলে, 'কারণ

আমি নিঃশব্দে এখনি বেরিয়ে যাব এবং আপনার মেয়েকে যদি ভুল না বুঝে থাকি তা হলে সে-ও আমার সঙ্গে যেতে দ্বিধা করবে না।'

শিশির যাওয়ার জন্য পা বাড়ায়। সুমিত্রাও তাকে অনুসরণ করে।

রায়বাহাদুর যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারেন না; মনে হয়, হঠাৎ ভূমিকম্পে ঘরের মেঝেটা দুলে উঠলেও তিনি এরচেয়ে বেশি আশ্চর্য হতে পারতেন না।

'সুমিত্রা।'—রায়বাহাদুর গম্ভীর কণ্ঠে হাঁক দেন।

সুমিত্রা ফিরে দাঁড়ায়; রায়বাহাদুর উত্তেজনায় কাঁপতে থাকেন—'আমি জানতে চাই এই স্কাউন্ড্রেল, এই লোফার আমার বাড়িতে দাঁড়িয়ে আজ যে অপমান আমায় করলে তার সাহস সে কোথা থেকে পেলে! কোনও উৎসাহ সে তোমার কাছে পেয়েচে কি না?'

সুমিত্রা নির্বাক।

'তা হলে কি বুঝব, আমার অনুমতি না পেলেও তুমি ওরই সঙ্গে যেতে চাও—ওকেই বিয়ে করতে চাও?'

এবারেও সুমিত্রার তরফ থেকে সাড়া পাওয়া যায় না!

রায়বাহাদুর একটু চুপ করে থেকে বলেন, 'বেশ, তাহলে একথাও জেনে রাখ যে আজ থেকে আমার মেয়ে বলে কেউ নেই, আমি নিঃসন্তান, আমার সম্পত্তির এক কানাকড়িও তুমি কোনওদিন পাবে না।'

রায়বাহাদুর হয়তো ভেবেছিলেন একথার পর সুমিত্রাকে অন্তত দু-মিনিট দাঁড়িয়ে ভাবতে হবে। কিন্তু সেরকম কিছুই ঘটল না। করুণ একটু হেসে সুমিত্রা বলে, 'তোমার স্নেহই যখন হাবাচ্ছি, তখন সম্পত্তি না পাওয়ার দুঃখ কি তার চেয়ে বেশি হবে বাবা!

রায়বাহাদুরের পায়ের কাছে নত হয়ে প্রণাম করে সুমিত্রা শিশিরের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। রায়বাহাদুর যেন চিৎকার করে একবার মেয়েকে ডাকতে যান, কিন্তু পরমুহূর্তে তাঁর মুখটা আবার কঠিন হয়ে ওঠে, বজ্রাহত বনস্পতির মতো সেই শূন্যঘরে তিনি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন...

কলকাতা থেকে সুমিত্রাকে নিয়ে শিশিব ওঠে এসে ভূষণার বেণীমাধবের বাড়িতে। বেণীমাধব আর ইলার উৎসাহে সুমিত্রার সব দুর্ভাবনা যেন একমুহূর্তে শূন্যে মিলিয়ে যায়। বেণীমাধবের বাড়ি থেকেই ওদের বিয়ের ব্যবস্থা হয় এবং বুড়ো হরিহর কম্পাউন্ডার একাই একশো হয়ে কয়েক দিনের মধ্যেই সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন সেরে ফেলেন। বিয়ের রাত্রে ইলা তো হাসিতে, গল্পে, গানে বাসরঘর একেবারে মুখরিত করে তোলে। গান শেষ করে সুমিত্রাকে বলে, 'শুনলে তো গান। এখন বখশিস দাও।'

সুমিত্রা বলে, 'এর আবার বখশিস কী? এ-গান ভালো নয়।'

'কেন? নিজের গায়ে লাগল বলে, না?'

'তা কেন, সেই গাছ থেকে যেমন গান শুনেছিলাম, এ তেমন নয়, গাছে না চড়লে তোমার গলা খোলে না বোধহয়।'

বাসরসুদ্ধ সবাই সুমিত্রার কথায় হেসে ওঠে। কিন্তু ইলা দমে যাওয়ার মেয়ে নয়। বলে, 'ভাগ্যে সেদিন গাছে চড়েছিলাম, তা নইলে অমন করে পাশে বসতে আজ পেতে না।'

সুমিত্রার মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে। এমনসময় দেখা যায় হরিহর আর বেণীমাধব

একটু ব্যস্তভাবেই সেই দিকে আসছেন। মীরা বলে, 'ওই দেখ, বাবা আর হরিকাকা আবার তাড়া দিতে আসচেন।'

'আর তো দেরি করলে চলে না বেণীদা!' হরিহর বর-বউকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

বেণীমাধব মেয়েদের দিকে এগিয়ে যান।

'ওরে, তোরা এবার এদের ছেড়ে দে! হরি, ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।'

'হরিকাকার যেন আর তর সইচে না। আর একটু থাক না হরিকাকা।'

'থাকবার যে আর সময় নেই দিদি। একটু সময় ভালো থাকতে-থাকতে তো বাড়ি নিয়ে গিয়ে তুলতে হবে। পাঁজিটা যে বেয়াড়া—'

হরিহরের কথায় বাধা দিয়ে ইলা বলে ওঠে, 'তুলবে গিয়ে তো তোমার সেই ডিসপেন্সারিতে, সেখানে ভাঁড়ারে থাকবে ওষুধ আর হেঁসেলে ঢুকবে রুগি। তার চেয়ে এখানে থাকলেই হতো না?'

'না গো না,'—হরিহর ঘাড় নেড়ে আপত্তি জানায়, 'হরি কি আর সে ডিসপেন্সারি রেখেচে! একবার দেখবে চল না।' শিশির আর সুমিত্রার দিকে চেয়ে বলেন 'নাও, ওঠো এখন।'

'সত্যি ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করচে না,'—ইলা সুমিত্রার গলা জড়িয়ে ধরে,—'বিয়েটা বড্ড তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেল।'

'তা তোমার বিয়ে না হয় সাতদিন সাতরাত্তির ধরে দেওয়া যাবেখন'—হরিহর বললেন। ঘরসুদ্ধ সবাই তার কথায় হেসে ওঠে।

সুমিত্রা এবং শিশির উঠে দাঁড়ায়।

হরিহর বলেন, 'আহা টোপরটা পড়ে রইল যে, ওটা মাথায় দিতে হয়।'

টোপরটা তুলে নিয়ে তিনি শিশিরের মাথায় পরিয়ে দেন।

'বাবা! হরিকাকার পান থেকে চুণ খসবার উপায় নেই।' ইলা হেসে জিগ্যেস করে—'এত শিখলে কোথায় বল তো হরিকাকা? নিজে তো চিরকাল আইবুড়ো।'

'পরের বিয়ে দিতে-দিতে নিজের আর বিয়ের সময় পেলাম কই।'—হরিহর সুমিত্রাকে আর শিশিরকে নিয়ে এগিয়ে যেতে-যেতে জবাব দেন।

খবরটা যথাসময়ে রায়বাহাদুরের কানে পৌঁছুল হীরালালেরই মারফতে।

'আমার শ্বশুর এই বেণীমাধব বুড়োটি কম যান না। ঘটা করে উনিই তো নিজের বাড়িতে বিয়ে দিলেন। তবে আমিও সব কিছুর হিসেব রেখেছি, যারা-যারা এ-বিয়েতে গেছলেন তাদের সকলের নাম আমি টুকে রেখেচি।'

রায়বাহাদুর বলেন, 'এসব কথা আর আমায় শোনাতে তুমি এস না, হীরালাল। যারা সব অনিষ্টের মূল তাদের যদি কোনওদিন শায়েস্তা করতে পার, তাহলে এখানে এসে মুখ দেখিও, নইলে তোমার ও নিত্যি কাঁদুনি আমি শুনতে পারি না।'

হীরালাল যেন এমনি একটা হুকুম প্রত্যাশা করছিল, তাই উৎসাহের ভাবটা গোপন রেখে বলে, 'আজ্ঞে শায়েস্তা কি আর করতে পারি না, তবে হাজার হলেও আপনার জামাই!'

'জামাই! জামাই!'—ক্ষুব্ধ বিরক্তকণ্ঠে রায়বাহাদুর বলে ওঠেন, 'কে আমার জামাই? আমি কতবার তোমায় বলেচি, আমি নিঃসন্তান, আমার মেয়ে বলে কেউ নেই।'

রায়বাহাদুরের কঠিন মুখের দিকে চেয়ে কথা বাড়াবার সাহস হীরালালের হয় না।

রাত অনেক হয়েছে। বৃষ্টির শব্দে চারিদিক মুখরিত। মাঝে-মাঝে বিদ্যুতের চমক আর দূরে কোথাও বাজ পড়ার শব্দ।

ঘরের ভিতর শিশির ডিসপেন্সারির খাতাপত্রগুলো পরীক্ষা করছিল। বিয়ের পর মাস খানেকের মধ্যে নূতন গৃহস্থালী রচনার ব্যস্ততায় এসব দিকে মন দেওয়ার অবসর বিশেষ ঘটেনি।

অনেকক্ষণ ধরে খাতার হিসাবগুলো দেখতে-দেখতে শিশিরের সমস্ত শরীর যেন ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে। খাতাখানা বন্ধ করে সুমিত্রার দিকে চায়।

'কী গো রাত কটা বাজল খেয়াল আছে?'

সুমিত্রা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে হাত পেতে বৃষ্টির ছাঁট উপভোগ করছিল। শিশিরের ডাকে হাসতে-হাসতে ফিরে দাঁড়িয়ে সুমিত্রা বলে, 'খেয়ালটা তোমার এতক্ষণ ছিল কি?'

'আহা, আমার না হয় কাজ ছিল, তুমি তো শুতে গেলে পারতে'—শিশির অনুযোগ করে।

সুমিত্রা শিশিরের আরও কাছে এসে দাঁড়ায়; বলে, 'ইচ্ছে করচে না যে!'

'আমি কিন্তু এবার বাতি নিভিয়ে দেব,'—খাটের দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে শিশির বলে।

'দাও না, বেশ তো হবে।'

শিশির আলোটা নিভিয়ে দিয়ে বিছানার দিকে এগিয়ে যায়। সুমিত্রার কিন্তু শুতে যাওয়ার কোনও লক্ষণই দেখা যায় না। সে আবার সেই জানালার ধারটিতে গিয়ে দাঁড়ায়। হু-হু করে জলো হাওয়া ঢুকচে ঘরের ভিতর, বিদ্যুতের ঝিলিকে অন্ধকার ঘরের ভিতরটা মাঝে-মাঝে আলো হয়ে উঠচে।

বাতাসে মাটির সোঁদা গন্ধ, সুমিত্রা যেন নিশ্বাসের সঙ্গে তাই বুক ভরে উপভোগ করে। শিশির ফিরে গিয়ে দাঁড়ায় সুমিত্রার পাশটিতে। সুমিত্রার একখানি হাত আস্তে-আস্তে টেনে নেয় নিজের হাতের মুঠোয়। জিজ্ঞাসা করে, 'সত্যি কী মতলব বল তো? রাতটা কি জেগেই কাটাবে নাকি?'

'কাটালেই বা দোষ কী! এমন রাত আর ক-টা পাওয়া যায়? ঘুমোলেই তো সব খরচ।'

দুজনে ওরা দুজনের দিকে চেয়ে হাসে।

'তুমি বুঝি চাও রাতটা না ফুরোয়?'—শিশির জিজ্ঞাসা করে।

তাই তো চাই।

সুমিত্রার চোখে-মুখে নারী-হৃদয়ের অনাদিকালের রহস্য যেন বিচ্ছুরিত হয়ে ওঠে। সেদিকে চেয়ে শিশির যেন মুহূর্তের জন্যে কী ভাবে। তারপর দীর্ঘশ্বাস লুকোবার চেষ্টা করে বলে, 'আচ্ছা সত্যি করে বল তো সুমিত্রা, এই অভাবের সংসারে সাধ করে এসে তোমার মনে কি কখনও কোনও আপশোস হয় না।'

'আপশোস! তা হয় বইকী,'—সুমিত্রা দুষ্টুমিভরা চোখে শিশিরের মুখের দিকে চায়। শিশিরও একটু আশ্চর্য হয়ে তাকায় সুমিত্রার মুখের দিকে।

সুমিত্রা সজোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলবার চেষ্টা করে বলে, 'আপশোস হয়, এমন আনাড়ি হাতুড়ে ডাক্তারকে বিয়ে করলাম, যে বুকে কল বসায়, তবু মনের কথা বোঝে না।'

এবার অন্ধকারে নদীর কল গুঞ্জনের মতো ঘরের মধ্যে শোনা যায় শুধু ওদের দুজনের হাসি।

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবার পর শিশির বলে, 'আমার এক-এক সময় কেমন ভয় হয় সুমিত্রা, এ-স্বপ্ন বুঝি হঠাৎ ভেঙে যাবে।'

'না, না, অমন কথা বলো না,'—সুমিত্রা তাড়াতাড়ি শিশিরের মুখে হাত চাপা দিতে যায়, আর ঠিক সেইমুহূর্তে মনে হয় কে যেন বাড়ির বাইরের দরজায় সজোরে ধাক্কা দিচ্ছে।

'ওকী বলো তো?'—সুমিত্রা একটু শঙ্কিতভাবেই প্রশ্ন করে।

শিশির জবাব দেওয়ার আগেই বাইরের দরজায় ধাক্কাটা যেন আরও প্রবল হয়ে ওঠে। সুমিত্রার এবার বুঝতে বাকি থাকে না যে, কেউ ডাকতে এসেছে। মুহূর্তের মধ্যে তার মুখখানি বিষণ্ন হয়ে ওঠে।

সুমিত্রার মুখখানি তুলে ধরে শিশির বলে, 'ছিঃ সুমিত্রা, ডাক এলেই যেতে হবে। যেদিন থেকে ডাক্তার হয়েচি, সেদিন থেকে তো আর নিজের মালিক নিজে নই।'

শিশির এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দেয়। কাপড়টা হাঁটুর ওপর পর্যন্ত তুলে ছাতার মধ্যে গুটিশুটি মেরে হরিহরকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বোঝা যায় যে, সত্যিই কোথাও থেকে 'কল' এসেচে।

'কী খবর হরিকাকা?' শিশির জিজ্ঞাসা করে।

'রতনগাঁ থেকে কারা নাকি ডাকতে এসেচে। হার্টের অসুখ ভয়ানক জরুরি ডাক এখুনি নাকি না গেলে নয়।' একটু চুপ করে থেকে হরিহর আবার বলেন, 'কী বলব কাল সকালে আসতে?'

শিশির বলে, 'না, না, বলুন গে আমি এখুনি যাচ্চি।'

'রতনগাঁ কতদূর হরিকাকা?' সুমিত্রা জিজ্ঞাসা না করে পারে না।

'তা বেশ দূর। এ-গাঁ ছাড়িয়ে বনবাদাড় ভেঙে দু-ক্রোশের কম তো নয়।'

'সত্যি কি না গেলে নয়?'—সুমিত্রা এবার কাতরভাবে শিশিরের মুখের দিকে চায়, বলে, 'মুখ্যু গাঁয়ের লোক, মিছিমিছি কত ভয় পায়। হয়তো সামান্য অসুখ, কাল সকালে গেলেও চলবে।'

শিশিরকে কিন্তু নিরস্ত করা যায় না।

'কী ছেলেমানুষি করছ সুমিত্রা। রাত্রে রুগি দেখতে আগেও তো কতবার গিয়েচি!'

কথাটা সত্যি, কিন্তু আজ যেন সুমিত্রার মন কী এক অমঙ্গলের আশঙ্কায় বিহ্বল হয়ে পড়ে।

শিশিরের কাছে গিয়ে প্রায় অনুচ্চারিত কণ্ঠে সুমিত্রা বলে, 'আজ আমার মনটা কেমন করচে।'

আলনা থেকে কোটটা পাড়তে-পাড়তে শিশির বলে, 'ও তোমার মনের ভুল। তোমার কিছু ভয় নেই। হরিকাকা বাইরে ডিসপেন্সারিতে রইলেন। আমি যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরে আসব।'

হরিহরকে সঙ্গে নিয়ে শিশির বেরিয়ে যায় আর সুমিত্রা জানালার কাছে ফিরে এসে শূন্যদৃষ্টি দিয়ে ঝড়ের মাতামাতি দেখে।

শিশিরের রতন-গাঁয়ে পৌঁছতে রাত একটা বেজে যায়। সেখানে এক জরাজীর্ণ চালাঘরের মধ্যে প্রদীপের আলোয় অর্ধ অন্ধকার এক ঘরের মধ্যে তাকে রুগি দেখতে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘরের মধ্যে চৌকির ওপর শুয়ে রুগি, আশেপাশে তিন-চারজন লোক।

ভালো করে রুগির বুক-পিঠ পরীক্ষা করে শিশির বলে, 'এ-অসুখ তো নতুন নয় অনেক দিনের দেখছি।'

রোগীই কোনওরকমে জবাব দেয়, 'আজ্ঞে হ্যাঁ আজ বছর পাঁচেক এইরকম—'

'তা এই রাত্রে হঠাৎ সাত তাড়াতাড়ি আমায় ডাকবার কি দরকার ছিল?—দিনের বেলায় ডাকলেই তো পারতেন।'—শিশির একটু বিরক্তভাবেই কথাগুলো বলে।

রুগির আশেপাশে যারা দাঁড়িয়েছিল তাদেরই একজন বলে ওঠে, 'আজ্ঞে, কী করব বলুন হঠাৎ একেবারে নাড়ি ছাড়বার মতো অবস্থা। মনে হল এখুনি বুঝি যায়!'

'এরকম তো আগেও হয়েচে, তখন করেচেন কী? কই কোনও দিন ডাকেননি তো?'—শিশির জানতে চায়।

'আজ্ঞে, ডাকব কী করে!'—সেই লোকটাই আবার জানায়, 'এ গাঁয়ে তো থাকেন না। আজ সকালে সবে কুটুমবাড়ি থেকে এসেই এই হাঙ্গামা।'

প্রেসক্রিপশন লিখতে-লিখতে শিশির জিজ্ঞাসা করে, 'নাম?'

আজ্ঞে বেণীমাধব রায়—রোগী নিজেই জানায়।

'কী বললেন?'

'বেণীমাধব রায়'—রোগী আবার বলে।

প্রেসক্রিপশন লেখা শেষ করে শিশির বলে, 'শুনুন একটা বড়ি দিচ্চি। যখন খুব বাড়াবাড়ি হবে, তখন এর একটা জলে গুলে খেতে দেবেন, অন্য সময় নয় বুঝেচেন? এ ছাড়া একটা মিক্সচারও থাকবে।'

শিশির আবার লিখতে শুরু করে।

কল থেকে শিশির আবার যখন ভূষণায় ফিরে এল, তখন ভোর হতে দেরি নেই। সুমিত্রা ঘুমোয়নি, বিছানায় শুয়ে কী একটা বই পড়বার চেষ্টা করচে।

কোটটা খুলতে-খুলতে শিশির বলে, 'মিছিমিছি কী ভয়টা পেয়েছিলে বল তো? এই তো দিব্যি রুগি দেখে ফিরে এল্'ম, কিছু হল? তবে এমন চমৎকার রাতটা মাটি হল, এই যা দুঃখ।'

'সত্যি কেন হঠাৎ মনটা এমন করে উঠেছিল, কে জানে!' বিছানা থেকে উঠে সুমিত্রা শিশিরের কাছে এসে দাঁড়ায়।

'যাক, সশরীরে যখন ফিরে এসেচি তখন তো আর ভাবনা নেই।' শিশির ক্লান্ত দেহটা বিছানায় এলিয়ে দেয়। চোখ বুঁজে ঘুমোবার চেষ্টা করে একটু। কিন্তু চোখের পাতায় ঘুম আসবার আগেই হঠাৎ হরিহর এসে হাজির হন—প্রায় ছুটতে-ছুটতে!

'শিগগির চলো সর্বনাশ হয়েচে। বেণীদা কাল রাত্তিতে মারা গেছেন।'

'বেণীমাধববাবু!' শিশির আর সুমিত্রা প্রায় একসঙ্গে বলে ওঠে।

'হ্যাঁ, কাল রাত্রে হঠাৎ নাকি হার্টফেল করে। এইমাত্র খবর পেলাম।'

শিশির বিছানা থেকে উঠে আবার কোটটা গায়ে চড়াতে শুরু করে। সুমিত্রাও আলনা থেকে একটা চাদর টেনে নিয়ে গায়ে চড়িয়ে শিশিরের সঙ্গে বেরিয়ে আসে।

বেণীমাধবের বাড়ির সামনে পৌঁছে শিশির দেখে, বারান্দার সামনে রীতিমতো জটলা শুরু হয়েছে। আরও কয়েকজনের মধ্য থেকে হীরালাল বলে ওঠে, 'এই যে শিশিরবাবু এসেছেন আপনারই অপেক্ষা করছিলাম আমরা।'

'আমার অপেক্ষা করছিলেন?' শিশির আশান্বিত হয়ে ওঠে, এখনও—এখনও তা হলে কি প্রাণ আছে? শিশির ভিতরের দিকে এগোয়।

'দাঁড়ান, দাঁড়ান মশাই। ব্যস্ত হয়ে কোনও লাভ নেই আর। কাল রাত্রেই ঘুমের মধ্যে কখন কাবার হয়ে গেছেন, আজ সকালে ডেকে তুলতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, সব ঠান্ডা।' হীরালাল অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তার সঙ্গীদের দিকে তাকায়।

মর্মাহত শিশির মিনিটখানেক চুপ করে থাকে। তারপর যেন আপন মনেই বলে, 'হার্ট ওর খারাপ ছিল কিন্তু এত তাড়াতাড়ি এরকম হবে ভাবতে পারিনি।'

'ভাবতে যে আমরাও পারছি না, মশাই। এ তো সহজ স্বাভাবিক মৃত্যু নয়।'

'আমি একবার দেখি তবু'—সুমিত্রাকে সঙ্গে নিয়ে শিশির ভিতরের দিকে এগোয়। কণ্ঠস্বরে ব্যঙ্গের খোঁচা দিয়ে হীরালাল বলে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখবেন বইকী। আপনার নিজের একবার দেখা বিশেষ দরকার।'

শিশির আর সুমিত্রা ভিতরের দিকে যেতেই হীরালাল দারোগাকে ডেকে চুপি-চুপি কী যেন বলে। দারোগাবাবু নিকটেই অপেক্ষা করছিলেন।

ভিতরে পৌঁছে শিশির এবং সুমিত্রা দেখে, বেণীমাধবের মৃতদেহ খাটের ওপর চাদর ঢাকা দিয়ে রাখা আছে;—আর ইলা, মীরা এবং বাড়ির আর দু-একজন তারই চারিপাশে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদচে।

ওদেব ঘরে ঢুকতে দেখেই ইলা যেন কান্নার আবেগে ভেঙে পড়ে—'কী হল শিশিরদা।'

শিশির সান্ত্বনা দেওয়ার কোনও ভাষাই খুঁজে পায় না। নিঃশব্দে খাটের দিকে এগিয়ে গিয়ে বেণীমাধবের দেহটা একবার পরীক্ষা করে।

'কী দেখলেন ডাক্তারবাবু?' পিছন থেকে হীরালালের কণ্ঠ শোনা যায়।

'না, কোনও আশাই নেই কাল শেষরাত্রেই মারা গেছেন। কিন্তু ব্যাপারটা সত্যিই আশ্চর্য!' মীরার দিকে চেয়ে শিশির জিজ্ঞাসা করে, 'কাল শরীর কিছু বেশি খারাপ হয়েছিল?'

'না, খুব ভালোই তো ছিলেন,' মীরা জানায়—'আপনি যে ওষুধটা রাত্রে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, সেটা খাইয়ে আমরা চলে যাই। তারপর আজ সকালে—'

'আমি কাল রাত্রে ওষুধ পাঠিয়েছিলাম!'—শিশির যেন ব্যাপারটা ঠিক ধারণা করতে পারে না।

'পাঠিয়েছিলেন বইকী, ডাক্তারবাবু!' হীরালাল এবার শিশিরের সামনে এসে দাঁড়ায়, 'এরই মধ্যে ভুলে গেলেন নাকি?'

হীরালালের কথার উত্তর না দিয়ে শিশির ছোট টেবিলটার কাছে গিয়ে ওষুধের শিশিটা তুলে নিয়ে পরীক্ষা করতে চায়। হীরালাল শিশিটা শিশিরের হাত থেকে প্রায় কেড়ে নিয়ে বলে ওঠে, 'থাক-থাক, ডাক্তারবাবু, এগুলো এখন আর নাড়াচাড়া করবেন না, পুলিশের কোনটা কী কাজে লাগে তা তো বলা যায় না?'

চাকরটার দিকে চেয়ে হীরালাল আবার বলে, 'ওরে দারোগাবাবুকে একবার ভেতরে আসতে বল।'

'দারোগা!—পুলিশ! আপনি'—স্তম্ভিত শিশির কী বলবে ঠিক করতে পারে না।

আজ্ঞে, বুঝতে পারচি, কথাগুলো আপনার ভালো লাগছে না। কিন্তু কী করব বলুন, হাজার হোক নিজের শ্বশুর তো বটে। তাঁর এরকমভাবে মারা যাওয়াটার একটু তদন্ত না

করে তো পারি না।'

কর্তব্য পালনের তাগিদে হীরালাল যেন অস্থির হয়ে ওঠে। শিশির কোনও কথা বলবার পূর্বে দারোগা এসে দাঁড়ান ঘরের ভিতরে।

'আমায় ক্ষমা করবেন। নেহাত কর্তব্যের খাতিরেই এরকম অবস্থায় আপনাদের আমায় কষ্ট দিতে হচ্ছে।'

হীরালালের দিকে চেয়ে দারোগাবাবু বলেন, 'প্রেসক্রিপশনটা কি ডাক্তারবাবুকে আপনি দেখিয়েছেন, হীরালালবাবু?'

'না, আপনি দেখান না।'

দারোগা প্রেসক্রিপশনটা শিশিরের সামনে মেলে ধরেন, 'দেখুন তো এটা আপনারই লেখা কি না?'

'হ্যাঁ, আমারই লেখা।'—প্রেসক্রিপশনটার দিকে চেয়ে শিশির সেকথা অস্বীকার করতে পারে না।

'তা হলে বাধ্য হয়ে আপনাকে একটু কষ্ট দিতে হবে ডাক্তারবাবু।' দারোগা শিশিরকে বলেন, 'এ-লাশ আমি পোস্টমর্টেমে পাঠাচ্ছি। আপনাকে থানায় গিয়ে একটা এজাহার দিতে হবে।'

এতক্ষণে যেন দারোগার প্রকৃত বক্তব্য বোঝা যায়! ঘরের মধ্যে সবাই স্তব্ধ। বিস্ময়ে এবং বেদনায় কেউ যেন কথা বলবার ক্ষমতা খুঁজে পায় না! কেবল সুমিত্রা একবার হীরালালের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বলে ওঠে, 'হীরালালবাবু।'

মনে হয়, সুমিত্রা যেন এই অল্প সময়ের মধ্যেই অনেক কিছু অনুমান করে নিয়েছে!

কিন্তু হীরালাল প্রায় নিস্পৃহকণ্ঠে জবাব দেয়, 'আমি কী করব বলুন।'

সুমিত্রার কিন্তু বুঝতে কিছু বাকি থাকে না। সেইদিনই সে কলকাতায় রায়বাহাদুরের বাড়িতে এসে হাজির হয়—মান, অভিমান, দ্বিধা-সঙ্কোচ কিছুই তাকে বাধা দিতে পারে না।

রায়বাহাদুর কিন্তু সমস্ত কথা শুনেও চুপ করে থাকেন। মেয়ের অনুরোধ, চোখের জল কিছুই যেন তাঁব মর্মস্পর্শ করে না। শেষ পর্যন্ত সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করে, 'তা হলে তুমি কিছুতেই বিশ্বাস করবে না যে এসব হচ্ছে শত্রুর ষড়যন্ত্র।'

'আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে তো কিছু আসবে যাবে না।' রায়বাহাদুর নিরাসক্ত কণ্ঠে জবাব দেন, 'আদালত শেষ পর্যন্ত সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ বিচার করে যা বিশ্বাস করবে, সেইটেই হবে আসল। তবে তুমি যদি চাও আমি বরং তার জন্যে ভালো একজন উকিল দাঁড় করাবার খরচ দিতে পারি।'

'থাক বাবা, তার দরকার হবে না।' সুমিত্রা এবার উঠে দাঁড়ায়। তার এতবড় বিপদের মুহূর্তে বাবার এই নির্মম ঔদাসীন্য সত্যিই সে কল্পনা করতে পারেনি। তা ছাড়া, তার মনে-মনে এইটুকু আশা অন্তত ছিল যে, তার মুখের কথায় বিশ্বাস করে, রায়বাহাদুর অনায়াসেই শিশিরকে নিরপরাধ বলে মেনে নেবেন এবং হীরালালের দলকে এই অপচেষ্টায় ক্ষান্ত করবার জন্য তাঁর সমস্ত প্রভাব প্রয়োগ করবেন। রায়বাহাদুরের কাছে এই আঘাত পেয়ে চরম বেদনায় তার মন তাই একেবারে কঠিন হয়ে ওঠে।

'কেন, এতে আপত্তি করবার তোমার কী আছে?' রায়বাহাদুর প্রশ্ন করেন।

আহতকণ্ঠে সুমিত্রা বলে, 'অনেক কিছু আছে বাবা। একদিন তুমি রাগের মাথায়

বলেছিলে যে, তোমার মেয়ে বলে কেউ নেই। আজ আমি সেকথা সত্যি বলে মেনে নিয়ে এখান থেকে চলে যাচ্ছি।'

রায়বাহাদুর তাকে বাধা দেওয়ার আগেই সুমিত্রা দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

পুলিশ শিশিরকে হত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার করে যথারীতি মামলা সোপর্দ করে। তারপর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে যেদিন মামলা ওঠে, সেদিন আদালতে হীরালাল থেকে আরম্ভ করে আরও অনেককেই দেখা যায়। পাবলিক প্রসিকিউটার মামলা বোঝাতে উঠে বলেন, 'আসামির নিজের হাতের সই করা প্রেসক্রিপশনের পর এই অপরাধের আর কী বড় প্রমাণ থাকতে পারে? এই প্রেসক্রিপশনই ডাক্তার শিশির রায়ের অপরাধের জ্বলন্ত প্রমাণ, নিজের বিরুদ্ধে তার নিজের হাতে লেখা অকাট্য সাক্ষ্য এতবড় প্রমাণ কেন সে নির্বোধের মতো মজুত রেখে দিয়েছিল, কেন সে সময় মতো এটা নষ্ট করে ফেলেনি, তা যদি জিজ্ঞাসা করেন, তা হলে বলব, নষ্ট করবার অবসর তাকে দেওয়া হয়নি। মৃত বেণীমাধবের বাড়িতে ডাক্তার হিসাবে তার প্রতিপত্তির সীমা ছিল না। তার ধারণা ছিল, চাতুবী কোনওদিন ধরা পড়বে না। সময় মতো নিজের পৈশাচিক কীর্তির প্রমাণ নষ্ট করে ফেলতে তাকে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হবে না। কিন্তু একটি লোকের সজাগ তৎপরতায় ডাক্তারের সব হিসেব উল্টে গিয়েছে। বেণীমাধবের মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি সেখানে গিয়ে পড়ে বাধা না দিলে, আজ সাধারণ হৃদরোগে মৃত্যু বলে অনায়াসে আসামি তার কীর্তি চালিয়ে দিতে পারত...'

সরকাবি উকিলের যুক্তি এবং ব্যাখ্যা শুনতে-শুনতে হীরালালের চোখ মুখ যেন পৈশাচিক আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

ম্যাজিস্ট্রেট শিশিরকে দায়রা সোপর্দ করলেন।

শিশিরের পক্ষ থেকে প্রধানত হরিহরের চেষ্টায় একজন উকিল খাড়া করা হয়েছিল। দায়রা আদালতে সরকার পক্ষের সওয়াল শেষ হওয়ার পর, আসামি পক্ষ থেকে বলা হল, 'প্রেসক্রিপশন যে শিশির রায়ের নিজের হাতের লেখা সে কথা আমরা অস্বীকার করি না। বেণীমাধব রায়কে যে হত্যা করা হয়েচে—একথাও আমরা স্বীকার করি। কিন্তু হত্যাকারী ডাক্তার শিশির রায় নন। তিনি শুধু একটা পৈশাচিক ষড়যন্ত্রের অসহায় শিকার মাত্র। যাবা সেই দুর্যোগের রাতে তাঁকে মিথ্যা কল দিয়ে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল, নিজেদের প্রয়োজন মতো নকল রুগি সাজিয়ে যারা সেদিন তাঁর হাত দিয়ে বেণীমাধব রায়ের নামে প্রেসক্রিপশন লিখিয়ে নিয়েছিল, তারাই বেণীমাধব রায়ের আসল হত্যাকারী।'

সরকার পক্ষে কৌঁসুলী উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, 'ইয়োর অনার, একটা কথা আমি শুধু আমার বিজ্ঞ বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করতে চাই। সেদিন দুর্যোগের রাতে ডাক্তার শিশির আর যার চিকিৎসা করতে গিয়েছিলেন, সেই নকল বেণীমাধব রায়কে তিনি সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত করতে রাজি আছেন কি?'

আসামি পক্ষের উকিল জানান, 'না, তাকে আমরা এখানে উপস্থিত করতে পারি না। তাকে সেই রাত্রের জন্য যারা সংগ্রহ করে এনেছিল, সেই ষড়যন্ত্রকারীর দলই আবার সরিয়ে দিয়েচে গ্রামে। তার অস্তিত্বের কোনও চিহ্নই নেই।'

সরকার পক্ষের কৌঁসুলী বলেন, 'আমিও তো শুধু এইটুকুই জানতে চেয়েছিলাম। আমি জানতাম, আমার বিজ্ঞ বন্ধুর কল্পনায় ছাড়া সে রোগীর কোনও অস্তিত্ব নেই।' একটু ব্যঙ্গের হাসি হেসে তিনি আবার শুরু করেন, 'কিন্তু আমরা এখানে কাল্পনিক কাহিনি শুনতে

আসিনি। প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও সাক্ষ্যই সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছবার উপকরণ। প্রেসক্রিপশনের হস্তাক্ষর যে শিশির ডাক্তারের নিজের একথা যখন স্বীকার কবে নেওয়া হয়েচে...'

সরকার পক্ষের কৌসুলীর জেরায় সুমিত্রাকে স্বীকার কবতে হয় যে, বাবার মতের বিরুদ্ধেই যে সেচ্ছায় ডাক্তারকে বিবাহ করেছিল এবং বাবাব আশ্রয় ছেড়ে স্বেচ্ছায় গ্রামে চলে গিয়েছিল।

সরকারপক্ষের কৌঁসুলী আবার জেরা করেন, 'আপনার বাবা চুনিলাল চৌধুরী যে কতখানি কঠিন প্রকৃতির লোক, তা বোধহয় আপনার স্বামী জানতেন না, কেমন? তখন তাঁব বোধহয় আশা ছিল যে একমাত্র কন্যাকে রায়বাহাদুব একদিন বাধ্য হযেই ঘবে ফিরিয়ে নেবেন?'

আসামিপক্ষের কৌঁসুলী আপত্তি করেন; বলেন, 'আমি এসব প্রশ্নে আপত্তি জানাচ্চি। এ-প্রশ্ন এ-মামলায় অবান্তর।'

সবকারপক্ষেব কৌঁসুলী কিন্তু নিরস্ত না হয়ে তাঁব বক্তব্যটা আবও ফেনিয়ে তোলেন। 'ইযোর অনার, আমি এইটুকুই বোঝাতে চাই যে, গোড়া থেকেই আসামির সব কাজের মূলে আছে অর্থেব প্রচণ্ড লালসা। সেই লালসাতেই সে রায়বাহাদুরেব একমাত্র কন্যাকে আদর্শ জনসেবকের অভিনয়ে মুগ্ধ কবে বিবাহ করবার চেষ্টা করে ও সফল হয। কিন্তু রাযবাহাদুরের অটলতায় তার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয। এখানে ব্যর্থ হয়ে সে বেণীমাধবেব সম্পত্তির জন্য লালায়িত হয়ে ওঠে। বেণীমাধবও তার মহানুভবতার অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে তাকে নিজের সম্পত্তির একমাত্র ট্রাস্টি কবে দিযেছিলেন। সে সম্পত্তি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হস্তগত করবার লোভে, বিশেষ কবে পাছে বেণীমাধব দু-দিন বাদে নিজেব ভুল বুঝতে পেরে তার হাত থেকে এ-অধিকার ফিরিয়ে নেন—এই ভযে সে অবিলম্বে তাঁকে পৃথিবী থেকেই সরিয়ে দেওয়ার আয়োজন করে।'

এক মিনিট দম নিযে কৌঁসুলী আবার বলেন, 'বহুকাল যিনি হৃদরোগে ভুগচেন, একজন ডাক্তারের পক্ষে তার হৃদস্পন্দন একেবাবে বন্ধ কবে দেওয়া এমন কিছু কঠিন কাজ নয়; সামান্য একটু ওষুধেব মারপ্যাঁচ—'

সুমিত্রা আব চুপ করে থাকতে পা'রে না, বিকারগ্রস্তের মতো চিৎকার করে ওঠে, 'না, না, এসব মিথ্যে। এসব তোমাদেব মিথ্যে।'

আদালত কক্ষের সবাই একেবারে আশ্চর্য হয়ে সুমিত্রার মুখের দিকে তাকায়; অনেকে এগিয়ে তাব চারিপাশে ভিড় করে। দর্শকদের আসন থেকে রায়বাহাদুরও যেন একটু ব্যস্ত আর উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ান, আবার খানিক পরেই কী ভেবে বসে পড়েন।

আদালতের রায়ে শিশিরের প্রতি দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হল।

রায় শুনে হরিহর আর সুমিত্রা যখন পাংশু, বিবর্ণ মুখে আদালত থেকে বাহিরে এসে দাঁড়ায়, তখন হীরালাল আর রায়বাহাদুরকে আরও কয়েকজনের সঙ্গে সেইদিকে আসতে দেখা যায়।

হীরালাল বেশ উৎফুল্ল মুখে বলতে থাকে, 'হেঁ-হেঁ, বাছাধন এখন বুঝতে পারচেন কোন হাটে ছুঁচ বেচতে এসেছিলেন। আরে জলে বসে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ করবি তুই? অত যখন তেল হয়েছিল, তখন দশটি বছর ঘানি ঘোরাও, সব তেল বেরিয়ে যাবে। কী বলেন রায়বাহাদুর?'

রায়বাহাদুরের মুখের দিকে চেয়ে সে বিজ্ঞভাবে হাসতে থাকে এবং আরও কয়েকজন সে হাসিতে যোগ দেয়। কিন্তু রায়বাহাদুর তাদের হাসিতে যোগ দিতে পারেন না। মনে হয়, তাদের কোনও কথাই তাঁর কানে যায়নি, তিনি সম্পূর্ণ অন্য কথা ভাবছেন। হীরালালের দল কিন্তু নিজেদের আনন্দে মশগুল, তারা রায়বাহাদুরের মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখাও দরকার মনে করে না। ওরা যখন এমনিভাবে নিজেদের হাসি-তামাসায় ব্যস্ত, রায়বাহাদুর তখন ওদের এড়িয়ে নিঃশব্দে অন্যদিকে এগিয়ে যান।

রায়বাহাদুরকে আসতে দেখে হরিহর আশ্চর্য হয়ে থমকে দাঁড়ান। সুমিত্রাও এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর রায়বাহাদুরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে, 'চলো হরিকাকা, আমরা যাই।'

হরিহর এবার রায়বাহাদুরের মুখের দিকে একটা জ্বালাভরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সুমিত্রাকে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু রায়বাহাদুর সাগ্রহে মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকেন।

সুমিত্রা কিন্তু কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে জবাব দেয়, 'সত্যি যদি কোনওদিন ভুলতে পারি, তা হলে তোমার বাড়ি ফিরে যাব বাবা।'

সুমিত্রার কঠিন মুখের দিকে চেয়ে রায়বাহাদুর আর কোনও কথাই বলতে পারেন না। হরিহরকে সঙ্গে নিয়ে সুমিত্রা এগিয়ে যায়। আর রায়বাহাদুর আদালত প্রাঙ্গণে হাজার রকম মানুষের ভিড়ের মধ্যে পাথরেব মূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। এই আদালত, মানুষের ছুটোছুটি সব তাঁর কাছে অর্থহীন নিষ্ঠুর তামাসা বলে মনে হয়।...

হরিহর শেষ পর্যন্ত সুমিত্রার একমাত্র নির্ভর হয়ে দাঁড়ালেন। কিন্তু আর্থিক সঙ্গতি তাঁর নিতান্তই সামান্য, নিজের খরচই জোগাতে হয় অতিকষ্টে, অপরের খরচ তিনি জোগাবেন কী করে?

তবু সুমিত্রার যাতে কোনওরকম কষ্ট না হয় সেজন্য চেষ্টার ত্রুটি রাখলেন না। একটি চালাঘর ভাড়া নিয়ে তাকে এনে তুললেন সেই ঘরটিতে, ফাই-ফরমাস খাটবার জন্যে একজন ঝি পর্যন্ত রাখা হল। কিন্তু সে সংসারে নিজেদের পেটচলা দুঃসাধ্য, সেখানে একজন ঝি পোষা যে কত বড় কঠিন ব্যাপার সেটা হরিহরের মাথায় না ঢুকলেও সুমিত্রা কয়েক মাস যেতে-না-যেতেই বুঝতে পারে। তাই একদিন সকালে সুখোর-মা কাজে আসতেই, সুমিত্রা বলে ওঠে, 'সত্যি সুখোর মা, আর তোমায় আমি রাখতে পারব না!'

'কেন বলো তো মা? কোনও কাজটা কি আমি খারাপ করেচি?' হাতের ঝাঁটাগাছা মাটিতে রেখে সুখোর-মা কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ায়, 'ওই হরে কম্পাউন্ডার আমার নামে কিছু লাগিয়েচে বুঝি? আসুক, মিনসেকে আজ দেখাচ্চি।'

সুমিত্রা বলে, 'না, না, হরিকাকা তোমার নামে কিছু লাগায়নি। আর লাগাবেই বা কেন? তুমি তো কোনও দোষ করনি। আমার আর মাইনে দেওয়ার ক্ষমতা নেই বলে তোমায় আমি ছেড়ে দিচ্চি। দেখচ তো আমার অবস্থা, এই খোলার ঘরের ভাড়াই যে কোথা থেকে দেব তা জানি না।'

সুমিত্রা কথাটা মিছে বলেনি। কারণ শিশিরের সঞ্চিত যা কিছু তা মামলার তদ্বির করতেই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে, সঙ্গে ঘুষ হিসেবে গেছে সুমিত্রার গায়ের ভারী গহনাগুলো।

সুখোর-মার কিন্তু সেসব খোঁজে দরকার নেই। সে একমিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে

বলে, 'ছেড়ে তো আমায় দিচ্চ, কিন্তু আমি যাব কোথায় শুনি? এই বাজারে কে আমায় চাকরি দেবে?'

'চাকুরি তুমি অনেক পাবে সুখোর-মা, তোমার মতো বিশ্বাসী, খাটিয়ে লোক ক'টা মেলে?'

সুমিত্রার এতবড় সার্টিফিকেটেও সুখোর মাকে সন্তুষ্ট করা যায় না। সে বলে, 'সেই সঙ্গে এমন মুখের ধারও যে মেলে না মা। কে আমার এই ক্যাঁটকেঁটে কথা শুনে আমায় আদর করে রাখবে? বলো তো কোনওখানে দু-দিনের বেশি কি আমি টিঁকতে পেরেচি?'

সুমিত্রা কী যে জবাব দেবে বুঝে উঠতে পারে না।

সুখোর মা যেন নিজের মনেই বলতে থাকে, 'না-না, তোমায় বলে রাখছি মা, হুটহুট করে যখন তখন আমায় যাও-যাও বলবে না। পেটের দায়ে ঝি বৃত্তি করি বলে কি আমাব মান অপমান নেই।'

সুমিত্রা আর কিছু বলবার আগেই হরিহরকে আসতে দেখা যায়—পিছনে কুলিব মাথায় একটা সেলাইয়ের কল। কলটা দাওয়ার ওপব নামাতে বলে কুলির হাতে হরিহর একটা দু-আনি দেন।

'খালি দো-আনা?' কুলিটা একটু অপ্রসন্নভাবে জিজ্ঞাসা করে।

'দো-আনা নয় তো কী একটা সেলাইয়ের কল বয়ে এনেছ বলে তোমায় রাজত্ব দেব? যা-যা, সবে পড়।'

হরিহর দাওয়ার প্রান্তে বসে পড়ে, চাদরের খুঁট নিয়ে কপালের ঘাম মুছতে-মুছতে বলেন, 'এই নাও মা, যা হুকুম করেচ এনেচি। কিন্তু শেষ সম্বল ওই ক'গাছা চুড়ি বেচে এ-কল কেনার কী দরকার ছিল তা এখনও আমি বুঝলুম না। এ-সেলাইয়ের কল চালিয়ে কত রোজগার হবে তাও জানি না।'

'যাই হোক, ভিক্ষে করার চেয়ে তো ভালো হবে,'—সুমিত্রা বলে।

'কিন্তু এ-কাজ কি তোমার সাজে!' কথা বলতে-বলতে হরিহরের কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে আসে, 'চিরদিন যে রাজ-ঐশ্বর্যের মধ্যে মানুষ, এমন খাটুনি তার ক-দিন সইবে! কোথা থেকে তোমায় এই ভাঙা কুঁড়েয় টেনে এনেচি—ভাবতেই আমার বুক ফেটে যায়।'

একমুহূর্ত চুপ করে থেকে সুমিত্রা বলে, 'তা হলে সব ভুলে গিয়ে মাথা হেঁট করে সেই রাজ-ঐশ্বর্যের মধ্যে কি তুমি ফিরে যেতে বল হরিকাকা?'

হরিহর কী জবাব দেবেন ঠিক করে উঠতে পারেন না। সুমিত্রা যেন আপন মনেই বলে, 'না হরিকাকা, পারলে সেখানে অনেক আগেই যেতাম। টাক অ·ভাবে প্রিভিকাউনসিলে মামলার আপিলও আজ বন্ধ হয়ে থাকত না। তিনি বিনা দোষে এ ্ অপবাদ নিয়ে জেল খাটচেন জেনেও যা পারিনি, নিজের সুখের জন্যে তাই করব মনে কর।'

সুমিত্রার চোখে জল এসে পড়ে। সেটা লুকোবার জন্যে তাড়াতাড়ি সে ঘরের ভিতর গিয়ে ঢোকে।

হরিহর এবার সুখোর-মার দিকে চেয়ে বলেন, 'কী যে হবে সুখোর-মা আমিও কিছু বুঝতে পারচি না। মার এ ধনুকভাঙা পণ তো টলবার নয়, অথচ ওই তো শরীরের অবস্থা!'

'তাই তো ভাবচি!' সুখোর মা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে, 'এই দুঃখের দিনে পেটে যেটা এসেচে, তারজন্যেই যে আরও বেশি ভাবনা। বড় জোর আর তিনটে মাস বইতো নয়। তারপর কেমন করে যে কোনদিক রক্ষে হবে তা ভেবে পাই না।'

খানিকটা চুপ করে থেকে সুখোর-মা যেন নিজের মনে গরগর করতে থাকে, 'মুখপোড়া বিধেতা কি চোখের মাথা খেয়ে বসে আছে। এমন দেবতার মতো মনিব আমাদের মিনিদোষে সাজা পাবে, আর যে সত্যিকার খুনে, বদমাশ পাষণ্ড, সে করবে রাজ-ঐশ্বর্য ভোগ। এই কি বিধেতার বিচার। নুড়ো জেলে দিতে হয় না। বিধেতার মুখে!'

হরিহর ম্লান একটু হেসে বলেন, 'অমন কথা বলতে নেই সুখোর-মা। বিধাতার বিচার ঠিকই আছে। তবে তাঁর সাজা যে কোনদিক দিয়ে কখন আসে কেউ জানে না।'

বেণীমাধবের শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকে যাওয়ার পর হীরালাল তাঁর বাড়িতে বেশ জাঁকিয়ে বসেছিল। বেণীমাধব যে ঘরগুলো যন্ত্রপাতিতে ভরিয়ে রেখেছিলেন, সেগুলো খালি করে নিজের মনোমতোভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখবার একটা কল্পনাও তার মাথায় উঁকি মারছিল। বোধ করি সেই কল্পনা কাজে পরিণত করবার জন্যই সেদিন সে কারখানার ঘরগুলোর মধ্যে ঢুকে, কোন জিনিসগুলো আগে বিদায় করা দরকার মনে-মনে তারই একটা হিসাব করছিল। সঙ্গে ছিল আরও দু-চারজন লোক। এমনসময় গম্ভীর মুখে ইলা এসে দাঁড়াল ঘরের মধ্যে।

ইলার দিকে চোখ পড়তে হীরালাল বললে, 'কী ব্যাপার গো ইলাদেবী, মুখখানা যে মেঘের মতো ভার!

'আপনি নাকি এখান থেকে বাবার সব কলকব্জা সরাবার ব্যবস্থা করচেন?' ইলা জিজ্ঞাসা করলে!

'তা সরাতে হবে না! ওসব জঞ্জাল রেখে লাভ কী?'

হীরালাল অনায়াসে কথাটা বললেও ইলা সেটা মোটেই সহ্য করতে পারলে না; বললে, 'বাবার এইসব প্রাণের জিনিস আপনার কাছে জঞ্জাল। বাবার সমস্ত লুট করে খেয়েও আপনার সাধ মিটছে না, তাঁর স্মৃতিটুকুও অপমান করতে চান?'

'ছোট মুখে পাকামি ভালো লাগে না ইলা,' হীরালাল রীতিমতো ধমক দিয়ে উঠল, 'বাবার স্মৃতির জন্যে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না। তুমি এখান থেকে যাও।'

ইলার যাওয়ার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না, হীরালালের দিকে এগিয়ে এসে দীপ্ত কণ্ঠে বললে, 'না, বাবার এসব জিনিস আপনি সরাতে পারবেন না। একটুকরোও।'

হীরালাল অত সহজে নিরস্ত হওয়ার পাত্র নয়; একমুহূর্ত চুপ করে থেকে বললে, 'তোমার আস্পর্ধা বড় বেড়েচে ইলা। আদর দিয়ে শ্বশুর মশায় তোমার মাথাটি খেয়েছেন। কিন্তু তোমার মতোন বেয়াড়া মেয়েকে কী করে টিট করতে হয় তা আমি জানি। তোমার বাবার মতো আমায় আহম্মুখ ভেব না।'

হীরালালের কথাগুলো ইলার সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যায়। অশ্রু-অবরুদ্ধ কণ্ঠে সে বলে উঠল, 'আমার বাবার বাড়িতে দাঁড়িয়ে তাঁর পয়সা খেয়ে তাঁকেই আপনি আহম্মুখ বলেন! যান দূর হয়ে যান এখান থেকে। এসব জিনিস সরাবার কোনও অধিকার আপনার নেই'—অসহায় আক্রোশে ইলা যেন ফুলতে লাগল।

'অধিকার আছে কিনা দেখাচ্চি। আগে এইসব জঞ্জাল ঝেঁটিয়ে তোমার বাবার পিণ্ডির ব্যবস্থা করি'—হীরালাল সঙ্গের লোকগুলির দিকে চেয়ে ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'কী দেখচিস হাঁ করে দাঁড়িয়ে, সরা! নিয়ে যা সব সরিয়ে!'

লোকগুলো ভয়ে-ভয়ে একবার হীরালাল আর একবার ইলার দিকে তাকাল। যন্ত্রপাতিগুলো সরাবার জন্য হাত বাড়ায় এমন সাহস তাদের নেই।

বেণীমাধবের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় এই জিনিসগুলো অপরে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবে এ-দৃশ্য ইলা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারে না। লোকগুলোর দিকে এগিয়ে গিয়ে ক্ষিপ্ত

কণ্ঠে সে বলে ওঠে, 'খবরদার! যেই এ সবে হাত দিয়েচিস তো হাত কেটে দেব! দেখি, কে এতে হাত দেয়।'

ইলার সে উগ্রমূর্তির দিকে চেয়ে লোকগুলো পিছিয়ে আসে।

রাগে হীরালালের আর জ্ঞান থাকে না।

'কে হাত দেয়! আয় ব্যাটারা, দূর করে দে সব'—হীরালাল এগিয়ে যন্ত্রপাতিগুলো ধরে টানতে শুরু করে। একটা যন্ত্র নিয়ে টেনে ফেলে দেয় দূরে, তারপর আর একটা—হঠাৎ একমুহূর্তে এমন একটা কাণ্ড ঘটে যায় যা এতক্ষণ কেউ কল্পনা করতে পারেনি!

টানাটানির মধ্যে কতকগুলো ভারী-ভারী কলকব্জা হুড়মুড় করে একসঙ্গেই ভেঙে পড়ে একেবারে হীরালালের মাথার ওপর! ভীষণ একটা আর্তনাদ করে হীরালাল লুটিয়ে পড়ে সেই কলকব্জাগুলোর তলায়, আর মিনিটখানেকের মধ্যে টকটকে তাজা রক্তের স্রোত বইতে থাকে মেঝের ওপর।

স্তম্ভিতের মতো একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে ইলা চিৎকার করে ওঠে। 'সরিয়ে আনো, শিগগির সরিয়ে আনো।'

লোকগুলো ভারী কলকব্জার তলা থেকে হীরালালকে টেনে বার করবার চেষ্টা করে! ইলা ছুটে যায় বাড়ির ভিতরে জলের সন্ধানে। যেতে-যেতে বলে, 'ডাক্তার...ডাক্তারকে খবর দাও!'

অনেক কষ্টে লোকগুলি হীরালালকে যন্ত্রপাতির তলা থেকে বার করে তার শোবার ঘরে নিয়ে এসে খাটের ওপর শুইয়ে দেয়। কিন্তু রক্তের স্রোত কিছুতেই বন্ধ হতে চায় না, হীরালাল অচৈতন্যের মতো বিছানায় পড়ে থাকে। মীরা দাঁড়িয়ে থাকে হীরালালের মাথার শিয়রে পাথরের মূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে, একটা কথা পর্যন্ত বলবার শক্তি সে খুঁজে পায় না নিজের মনের মধ্যে।

খানিক পরেই ডাক্তার এসে পড়েন।

ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে, ওষুধ দিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে ডাক্তার যখন উঠে দাঁড়ান মুখ তাঁর রীতিমতো গম্ভীর।

ঘরসুদ্ধ সবাই উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। সাবান জল দিয়ে হাত ধুতে-ধুতে ডাক্তার বলেন, 'এখন ওঁকে ঠিক এই অবস্থায় থাকতে দিন, মোটে যেন নাড়াচাড়া করা না হয়। আমি একটু পরে এসে একটা ইনজেকশান দিয়ে যাব।'

মীরা আর চুপ করে থাকতে পারে না,—ডাক্তারের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে, 'সত্যি করে বলুন ডাক্তারবাবু, কোনও আশা আছে কি?'

খানিক চুপ করে থেকে ডাক্তার জবাব দেন, 'আমাদের সাধ্য আর কিছু নেই, এখন আমাদের ক্ষমতার বাইরে।'

'বুঝেচি'—অশ্রুর আবেগ রোধ করতে না পেরে মীরা এবার খাটের একপ্রান্তে মুখ লুকিয়ে অঝোরে কাঁদতে থাকে। বোধকরি তার কান্নার শব্দে সচেতন হয়ে হীরালাল চোখ মেলে চায়। স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো খানিক চুপ করে চেয়ে থেকে ডাক্তারের দিকে চেয়ে ক্ষীণকণ্ঠে, বলে, 'একবার এদিকে শুনে যাও।'

সবাই আশ্চর্য হয়ে হীরালালের মুখের দিকে চায়।

ডাক্তার খাটের দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে বলেন, 'না, না, আপনি নড়বেন না।'

'না, আমি নড়বো না, হীরালাল কোনওরকমে নিশ্বাস ফেলতে পারে ঃ 'কিন্তু একটা কথা বলতে পার ডাক্তার। আর কতক্ষণ বেঁচে থাকব?'

'ওসব কী বলচেন? ভালো হয়ে উঠবেন আপনি'—ডাক্তার স্তোকবাক্য উচ্চারণ করেন।

'মিথ্যে স্তোক আমায় দিওনা ডাক্তার!' হীরালাল ক্ষীণ একটু হাসবার চেষ্টা করে, 'আমি জানি এই আমার শেষ! কিন্তু তবু আর কয়েকঘণ্টা আমায় বেঁচে থাকতেই হবে ডাক্তার, আমায় রায়বাহাদুরের কাছে পৌঁছতেই হবে।'

ঘরের মধ্যে সবাই বিস্ময়ে নির্বাক। শুধু ডাক্তার বিস্মিত কণ্ঠে বলেন, 'কী বলচেন আপনি? সে তো এখান থেকে চার ঘণ্টার পথ।'

'চার ঘণ্টাই হোক আর চব্বিশ ঘণ্টাই হোক, এইটুকু আমাকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে ডাক্তার!'

'শুধু এই পথটুকু'—কথা বলতে-বলতে হীরালাল যেন উত্তেজিত হয়ে ওঠে, 'তুমি যত টাকা চাও তাই পাবে, তুমি শুধু আমার সঙ্গে থাকবে, আমায় বাঁচিয়ে রাখবে।'

'থাকার কথা আমি ভাবচি না হীরালালবাবু'—ডাক্তার রীতিমতো চিন্তিত হয়ে পড়েন। হীরালাল বলে, 'আর কিছু তা হলে তোমায় ভাবতে হবে না। তুমি শুধু আমার সঙ্গে চল। যেমন করে পার আমায় আর পাঁচটা ঘণ্টা বাঁচিয়ে রাখ। রায়বাহাদুরকে একটা কথা আমার না বললেই নয়।'

বাড়িসুদ্ধ সবাই আপত্তি করে, এখনও ভালো করে রক্ত বন্ধ হয়নি, এই অবস্থায়—কিন্তু হীরালালকে থামানো যায় না কিছুতেই। অবশেষে মীরা বলে, 'কিন্তু এ-যে হয় না গো! আমি কেমন করে মত দেব?'

হীরালাল আস্তে-আস্তে মীরার একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নেয়। তারপর বলে, 'আর আপত্তি করো না মীরা। আমি এখানেই মরব, কিন্তু মরেও শান্তি পাব না। আমার এই শেষ সান্ত্বনাটুকু দাও। যেমন করে পার জ্ঞান থাকতে-থাকতে আমায় রায়বাহাদুরের কাছে পৌঁছে দাও। যাও ব্যবস্থা কর—আর সময় নেই।'

মৃত্যু-পথযাত্রী স্বামীর এই অন্তিম অনুরোধের কাছে মীরাকে হার মানতে হয়!

শিশির ডাক্তার ডিসপেন্সারির চাকরি নিয়ে ভূষণায় আসবার পর থেকেই হীরালাল তাকে সুনজরে দেখতে পারেনি। এর কারণ আর কিছুই নয়, রায়বাহাদুরের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে হীরালাল লোকাল বোর্ডের টাকাকড়ি নিয়ে নির্বিঘ্নে ছিনিমিনি খেলছিল, শিশির ভূষণায় পৌঁছবার পরেই তাতে পড়ল বাধা। সেটাও হীরালাল কোনওরকমে সহ্য করে যাচ্ছিল, কিন্তু যখন শোনা গেল যে বেণীমাধব এই শিশির ডাক্তারকে তার সমস্ত সম্পত্তির ট্রাস্টি করেছেন তখন হীরালালের পক্ষে চুপ করে থাকা কঠিন হল।

তারপর থেকে শিশিরকে বিপন্ন করবার জন্যে সে চেষ্টার ত্রুটি করেনি। কিন্তু আজকের এই আকস্মিক দুর্ঘটনার পর তার মনে হল, সমস্ত চেষ্টাই তার নিষ্ফল। মানুষের বিচার এড়িয়ে গেলেও বিধাতার বিচারকে ফাঁকি দেওয়ার সাধ্য তার নেই। সুতরাং নিজে যখন যেতে বসেছে তখন শুধু-শুধু একটা নিরপরাধ লোককে দণ্ড ভোগ করিয়ে লাভ কী? তার চেয়ে রায়বাহাদুরকে সবকথা বলে যাওয়াই ভালো, হয়তো তিনি কোনও উপায় করতে পারবেন।

এইসব কথা ভেবেই সে কারও কোনও কথায় কান দিল না এবং তাকে সেই দিনই

মোটরে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হল; ডাক্তার এবং গ্রামের আরও কয়েকজন গেলেন তাদের সঙ্গে।

হীরালালের মুখে সবকথা শুনে রায়বাহাদুর কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন। তিনি বিস্মিত, ক্ষুব্ধ কিংবা ব্যথিত হয়েচেন, একথা তাঁর মুখ দেখে অনুমান করা যায় না। ধীরে-ধীরে উঠে তিনি টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে ধরেন।

খানিকক্ষণ অপেক্ষার পর ওধারের সাড়া মেলে।

'হ্যালো, কে আপনি, এটা বিনোদ সরকারের বাড়ি তো? বিনোদবিহারী সরকার, অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট? বাড়ি নেই? কখন ফিরবেন জানেন না? কিন্তু ভয়ানক জরুরি দরকার, তাঁকে যেমন করে হোক যেখান থেকে হোক খুঁজে আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দিন। যত তাড়াতাড়ি পারেন...হ্যাঁ রায়বাহাদুর চুনিলালবাবুর বাড়িতে।'

চুনিলাল হতাশ ভাবে সোফায় বসে পড়েন।

উদ্বেগ-ব্যাকুল কণ্ঠে হীরালাল জিজ্ঞাসা করে, 'পেলেন না খোঁজ, পেলেন না বুঝি?'

'না পেলাম না।' রায়বাহাদুর মিনিটখানেক চুপ করে থেকে আর যেন অন্তরের আবেগ চেপে রাখতে পারেন না—এইরকম সময় সবকথা যদি স্বীকার করতেই চাইলে তো আমার কাছে এলে কেন হীরালাল! আমার কাছে কেন এলে? তুমি কি জান না যে একজন অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ছাড়া আমার কাছে এসব কথা বলবার কোনও দামই নেই—আইন তা গ্রাহ্য করবে না।

'তখন কিছুই ভেবে দেখিনি রায়বাহাদুর, শুনে মনে হল এত বড় পাপ ঢেকে রেখে মরেও শান্তি পাব না—তাই—তাই আপনার কাছে যেমন করে পারি ছুটে এসেচি। আপনি যাকে দরকার মনে করেন ডেকে পাঠান। আমি তাঁর কাছে সব দোষ স্বীকার না করে কিছুতেই মরব না।'

হীরালাল যেন প্রাণপণে শক্তি সংগ্রহ করে সজাগ থাকবার চেষ্টা করে।

টেলিফোনটা ঝনঝন করে উঠতেই রায়বাহাদুর উঠে পড়েন।

'কে বিনোদ? হ্যাঁ, আমি চুনিলাল, কোনও কথা বলবার সময় নেই, তুমি এখুনি এই মুহূর্তে চলে এস'—রিসিভারটা নামিয়ে রেখে রায়বাহাদুর ডাক্তারকে বলেন, 'আর মিনিট দশেক বাঁচিয়ে রাখুন, দশ মিনিট আপনাকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। আপনি যা চান তাই দেব। শুধু বিনোদের কাছে ওর সব কথা যেন বলতে পারে—'

ডাক্তার অবশ্য তাড়াতাড়ি একটা ইনজেকশন দিয়ে আরও কিছুক্ষণ হীরালালকে সজাগ রাখবার চেষ্টা করেন, কিন্তু সে চেষ্টায় বিশেষ কোনও ফল হয় না। মিনিট কয়েকের মধ্যেই হীরালালের প্রাণশূন্য দেহটা কৌচের উপর এলিয়ে পড়ে। সেদিকে চেয়ে ডাক্তার বলে ওঠেন, 'আর কিছুই করবার নেই।'

রায়বাহাদুর কিন্তু এইখানেই নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। সুমিত্রাকে খুঁজে বার করবার জন্যে তিনি একাধিক লোক নিযুক্ত করেন, এবং শিশিরকে কী করে খালাস করা যায় সে সম্বন্ধে বিশিষ্ট আইনজ্ঞদের পরামর্শ নিতে থাকেন; কিন্তু আইনজ্ঞরা তাঁকে কোনওরকম উৎসাহই দিতে পারেন না। রায়বাহাদুর শেষ পর্যন্ত একদিন অধৈর্য হয়ে বলেন, 'তা হলে আপনারা বলতে চান, কিছুই আমাদের করবার নেই? দিনকে আপনারা রাত করতে পারেন, আর একজন সত্যিকার নিরপরাধ লোকের অন্যায় শাস্তি রদ করতে পারেন না? হীরালাল

তার মৃত্যুশয্যায় যা স্বীকার করে গেল, আদালত তার কোনও মর্যাদাই দেবে না? আপনারা তা হলে কী করতে আছেন?'

রায়বাহাদুর যেন সমগ্র বিচার-ব্যবস্থার ওপর খড়্গহস্ত হয়ে ওঠেন। ব্যারিস্টার একটু হেসে বলেন, 'আপনি আমাদের অকারণ দোষ দিচ্ছেন রায়বাহাদুর। এ কেসে আপিল করবার সমস্ত রাস্তাই যে বন্ধ হয়ে গেছে, একটু ভেবে দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন।'

'হুঁ, বুঝেচি'—রায়বাহাদুর চিন্তিত মুখে চুপ করে বসে থাকেন, আর কোনও কথা বলবার মতো উৎসাহ যেন খুঁজে পান না।

সুমিত্রার সন্ধানের জন্য যেসব লোক নিয়োগ করা হয়েছিল তারাও কোনও খোঁজ দিতে পারে না। এক-একজন এক-এক রকম খবর নিয়ে আসে, কিন্তু আসলে কোনওখানেই শেষপর্যন্ত তাদের সন্ধান মেলে না। রায়বাহাদুর বিরক্ত হয়ে বললেন, 'ওসব বাজে কথা অনেক শুনেচি। কোন রাস্তা থেকে কোন রাস্তায়, কোন বাড়ি থেকে কোন বাড়িতে তারা গেছে, তার ইতিহাস আমি শুনতে চাই না! আমি শুধু জানতে চাই আমার মেয়ে এখন কোথায় আছে; কোনও সন্ধান আপনারা পেয়েচেন কিনা?

লোকগুলিকে সাতদিন সময় দিয়ে রায়বাহাদুর বলেন, 'এরমধ্যে যদি আপনারা আমার মেয়ের সন্ধান না আনতে পারেন তাহলে এখানে আর মুখ দেখাবেন না।'

সাতদিনের বদলে সাতমাস কেটে যায়, ক্রমে-ক্রমে সাতটি বছর, কিন্তু সুমিত্রার খোঁজ মেলে না।

অনেকদিন পরে দরিদ্র পল্লীর একটি ছোট ঘরে আবার যখন এই গল্পের যবনিকা উঠল, তখন তারই মধ্যে ছোট্ট একটি মেয়েকে আমরা একরাশ পুতুল নিয়ে তন্ময় হয়ে খেলা করতে দেখলাম।

স্কুলের বেলা হয়ে গেছে, কিন্তু মেয়েটির সেদিকে খেয়ালই নেই! ঝি এসে বলে, 'মিনু গাড়ি এসেছে, স্কুলে চল।'

মিনু বলে, 'আমি তো যাব না। হরিদাদা কোথায়? আজকে যে আমার নতুন শাড়ি আনবে বলেছিল আনেনি কেন।'

অভিমানে মিনুর চোখ দুটি ছল-ছল করে। ঝি বলে, 'জানি না বাপু। হরিদা তোমার মার ঘরে, জিজ্ঞাসা করে দেখ!

মিনু বই-শ্লেট কোনওরকমে গুছিয়ে নিয়ে ছোটে মায়ের ঘরের দিকে।

সুমিত্রা তখন সেলাইয়ের কল নিয়ে সেলাই করতে ব্যস্ত। হরিহর কতকগুলো জামা পুঁটুলিতে বাঁধতে-বাঁধতে বলছিলেন, 'আজ তা হলে নিয়ে যাচ্ছি চারটে ব্লাউজ, দুটো সেমিজ আর দুটো ফ্রক। আর কিছু নেই তো?'

'আর পেরে উঠলাম না হরিকাকা। কাল রাত একটা পর্যন্ত জেগেও হয়ে উঠল না'—সুমিত্রা বলে।

'রাত একটা পর্যন্ত জেগেচ, বেশ করেচ। একটার বদলে সারা রাত জাগলেই তো পারতে!'—হরিহরের কণ্ঠে বিরক্তি না বেদনা কিছুই বোঝা যায় না, তিনি বলতে থাকেন, তারপর একদিন অসুখ করে বিছানায় পড়ে থাক। তা হলেই সংসারের সব দুঃখ ঘুচে যায়!'

সুমিত্রা কোনও জবাব দেওয়ার আগেই মিনু এসে বলে, 'হরিদা, আমার নতুন শাড়ি কই? আনোনি?'

'ওই যাঃ! ভুলে গেচি'—হরিহর যেন মস্ত বড় অপরাধ করে ফেলেছেন, এমনিভাবে মিনুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

'হ্যাঁ, ভুলে গেচ! রোজ-রোজ তুমি ভুলে যাও!' মিনু এবার শ্লেট আর বইগুলো নামিয়ে রাখতে-রাখতে বলে, 'বেশ, তাহলে আমিও স্কুলে যাব না।'

সুমিত্রা বলে, 'সে কী মিনু! গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েচে যে!'

'হ্যাঁ, এই একটা ফ্রক পরে রোজ-রোজ স্কুলে যাই, সবাই কীরকম ঠাট্টা করে জান।' মিনুর চোখে জল এসে পড়ে।

সুমিত্রা বলে, 'তা করলেই ঠাট্টা। সবাই তো রোজ-রোজ শাড়ি বদলাবার মতো বড়লোক নয়।'

কিন্তু এসব কথা মিনুকে বোঝান বৃথা। তাই হরিহর তাড়াতাড়ি বলেন, 'আচ্ছা দিদি, কালই তোমায় নতুন শাড়ি এনে দেব।'

বৃষ্টির পর রোদের মতো মিনুর মুখখানি হাসিতে ছেয়ে যায়।

'ঠিক আনবে তো তাহলে?'

হরিহর ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। বাইরে থেকে স্কুলের বাসের হর্ন শোনা যায়। শ্লেট আর বইগুলো তুলে নিয়ে মিনু এবার ছুটতে-ছুটতে বেরিয়ে যায়।

সুমিত্রা খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। তারপর বলে, 'সব আবদারের কেন প্রশ্রয় দাও, হরিকাকা। কাল কোথা থেকে শাড়ি এনে দেবে শুনি?'

'হবে, হবে, একটা শাড়ি বইতো নয়'—হরিহর যেন সুমিত্রাকে স্তোকবাক্যে ভুলোবার চেষ্টা করেন।

সুমিত্রা বলে, 'একটা শাড়ি কেউ তোমায় অমনি দেবে না। কী করে সংসার চলচে তা তো সবই জান। মিনুর স্কুলের মাইনেটা জোগাড় করতেই প্রাণান্ত, তার ওপর আবার এই সব বাজে খরচ কী জন্যে?'

হরিহর ঝাঁঝিয়ে ওঠেন, 'তুমি মিছিমিছি টিকটিক কোরো না মা, বাজে খরচ! শিশির ডাক্তারের মেয়ে একটার বেশি দুটো শাড়ি পরলেই যেন বাজে খরচ হয়, সংসারে যেন আর বাজে খরচ হচ্চে না...'

আরও কতকগুলো কথা যেন নিজের মনেই বলতে-বলতে তিনি পুঁটলিটা তুলে নিয়ে উঠে পড়েন।

যেতে-যেতে রাগটা পড়ে ঝি-র ওপর। রান্নাঘরের দিকে চোখ পড়তেই হরিহর বলে ওঠেন, 'বলি তোমার আক্কেলটা কী বল তো সুখোর-মা। রান্নাবান্না হয়ে গেল এখনও উনুনে গনগন করচে আঁচ। কয়লা কী মিনি-মাগনা আসে যে যত পার উনোনে ঠেসেচ।'

'ঠেসেচি তো হয়েচে কী!' সুখোর মার ঝঙ্কার রান্নাঘরের ভেতর থেকেই শোনা যায়।

'হয়েচে কী! সংসার কী করে চলছে তা খেয়াল আছে? যা খুশি বাজে খরচ করলেই হল! উনানে জল ঢেলে আঁচটা নিভিয়ে দিলেও তো পার!'

'হ্যাঁ, নিভিয়ে দিতেও পারি,' কথা বলতে-বলতে সুখোর মা দাওয়ায় এসে দাঁড়ায়, 'তারপর কাপড়-চোপড়গুলো সেদ্ধ হবে কিসে—কার চুলোতে?'

'ওঃ, কাপড় সেদ্ধ হবে বুঝি'—হরিহর এবার একটু বিব্রত হয়ে পড়েন। সুখোর মা আবার ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, 'সেদ্ধ হবে না তো কী রোজ-রোজ সাজো কাচিয়ে গণ্ডা-গণ্ডা পয়সা গুণতে হবে! আমার গতরে তো আর ঘুণ ধরেনি।'

'আহা রাগ করিস কেন, আমি কি সে কথা বলেছি—'

হরিহর আর সেখানে দাঁড়ানো যুক্তিযুক্ত মনে করেন না।

এই ক'বছরে হরিহর সুমিত্রাকে সত্যি আপনার করে নিয়েছেন। মিনু যেদিন সুমিত্রার কোলে এল সেদিন সুমিত্রার দুর্ভাবনা-দুশ্চিন্তার আর অন্ত ছিল না, কেবলই মনে হতো নিজের অদৃষ্টে যা ঘটবার তা তো ঘটেইছে, কিন্তু পেটে যেটা এসেছে তাকে কী করে মানুষ করে তুলবে। কিন্তু হরিহর একা একশো হয়ে তার সমস্ত দুশ্চিন্তা এবং দুর্ভাবনা মুছে দিয়েছিলেন। বৃষ্টির রাত্রিতে যেদিন সুমিত্রার প্রথম ব্যথা ওঠে সেদিন এই হরিহরই তাকে স্নেহময়ী মার মতো সাহস আর সান্ত্বনা দিয়েছিলেন এবং ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই সমস্ত ব্যবস্থা করে তাকে নিয়ে গিয়েছিলেন হাসপাতালে। হাসপাতাল থেকে মিনুকে কোলে নিয়ে সে যখন ফিরে এল তখনও এই হরিহর এবং সঙ্গে-সঙ্গে সুখোর-মা স্নেহ যত্ন আর সেবা দিয়ে তাকে অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই সুস্থ করে তুলেছিল। তাই আজও মাঝে-মাঝে সুমিত্রা মনে-মনে ভাবে, এই দুটি লোককে সে যদি না পেত, তাহলে এই দুঃসহ দুঃখের দিনগুলি কাটাত কী করে? কোনও মতেই বোধহয় কাটত না এবং সুমিত্রাকে হয়তো পথে-পথে ভিক্ষা করে বেড়াতে অথবা আত্মহত্যা করতে হতো। কিন্তু ভগবানের পৃথিবীতে মানুষ যেমন অন্যায় করে, অবিচার করে, তেমনি নিঃসম্পর্ক মানুষ কেমন অনায়াসে পরমাত্মীয় হয়ে ওঠে, দুঃখের জীবনে নিয়ে আসে স্নেহ আর সান্ত্বনার আশীর্বাদ। তা নইলে রসাতলের সঙ্গে পৃথিবীর চেহারার বিশেষ কোনও তফাত বোধ হয় থাকত না।

জেলখানায় শিশিরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করা থেকে, সংসারের সমস্ত ছোটুবড় কাজের বোঝা হরিহর বেশ হাসিমুখে বয়ে বেড়াচ্ছেন, কী করে সংসারের খরচ কমান যায়, আবার ঠিক কীরকম ব্যবস্থা করলে মিনু আর সুমিত্রার কোনওরকম অসুবিধা না হয়, সেদিকে তাঁর চেষ্টার ত্রুটি নেই। কিন্তু দুটো দিকের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলা বেশ একটু কষ্টকর, তাই মাঝে-মাঝে যেন তিনি কী করবেন ঠিক করে উঠতে পারেন না; আর সেইসময় তাঁর কথা আর কাজের মধ্যে সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া হয় কঠিন। সুমিত্রা কিন্তু মনে-মনে সবই বোঝে এবং বোঝে বলেই এই নিঃসম্পর্ক পরমাত্মীয়ের প্রতি তার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

যেদিন মিনু বই-শ্লেট নিয়ে বিমর্ষভাবে ক্লাসে ঢুকতে যাচ্ছিল, হঠাৎ রেনু এসে পিছন থেকে জিজ্ঞাসা করে, 'তুই খেলতে যাসনি মিনু? আমি তোকে কত খুঁজে বেড়াচ্চি।'

সমস্ত ক্লাসের মধ্যে এই রেণুর সঙ্গেই মিনুর হৃদ্যতা একটু বেশি। সেই বলে, 'সত্যি ভাই বেলাটার ভারি দেমাক। আজ একটা নতুন মোটর চড়ে স্কুলে এসেচে বলে কী চালটাই করচে। মোটর যেন আমরা কখনও চড়িনি।'

কথাটা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই বেলা এসে দাঁড়ায় সেইখানে। যেন কিছুই জানে না এমনি একটা ভাব দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'কার মোটরে চড়েছিস রে? মিনুদের নাকি? ক'খানা মোটর আছে মিনুদের?'

ঠাট্টাটা সোজা মিনুর বুকে গিয়ে বেঁধে। কিন্তু এই দাম্ভিক মেয়েটার কাছে হেরে যেতে সে নারাজ। তাই বেশ জোর গলাতেই জবাব দেয়, 'আছেই তো মোটর। আমার দাদুর তোমাদের চেয়ে ঢের বড় মোটর আছে, জানো। আমরা সে-কথা কাউকে বলে বেড়াই না, তাই।'

'তাই নাকি, বলতে লজ্জা করে বোধহয়'—অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বেলা হাসতে শুরু করে, 'তোর দাদু ট্যাক্সি চালায় বুঝি?'

ইতিমধ্যে আরও দু-চারটি মেয়ে এসে জড় হয়েছিল সেইখানে, তারাও বেলার সঙ্গে খিল-খিল করে হেসে ওঠে।

মিনু কিন্তু হটবার পাত্র নয়, ঘাড় ঘুরিয়ে দৃপ্তকণ্ঠে বলে, 'ট্যাক্সি চালাবে কেন? আমার দাদু মস্ত বড় লোক। তার কত বড় বাড়ি, কত টাকা...।'

বেলা তার বই রাখবার সুদৃশ্য চামড়ার ব্যাগটা দুলিয়ে ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে বলে, 'সে তো নাতনীকে দেখেই বুঝতে পারচি...'

অন্য মেয়েগুলি আর এক দফা হো-হো করে হেসে ওঠে।

ক্লাসের মধ্যে না ঢুকে বেলা আবার বেরিয়ে আসে। মিনুর কাছে এসে বিদ্রূপতীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে, 'একদিন তোদের মোটরটা দেখলে হতো না?'

'আচ্ছা আমি দেখাব, নিশ্চযই দেখাব'—মিনু জোর গলাতেই জানায়।

বেলাদেব দল আবার তেমনি করে হাসতে শুরু কবে! মিনু যে কী করে এদের শায়েস্তা করবে, বুঝে উঠতে পারে না। ঘণ্টা বেজে উঠতে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সকলের পিছনে ক্লাসে গিয়ে ঢোকে।

ইংরেজি টিচার রানীদি সকলের হাতের লেখাগুলো পরীক্ষা করতে-করতে হঠাৎ তাঁর চশমা সমেত মুখটা তুলে তাকান। তারপর খাতাগুলোর মধ্যে থেকে অর্ধছিন্ন একটা খাতা তুলে নিয়ে হাঁক পাড়েন, 'এ-খাতা কার?'

তাঁর মুখ দেখে মনে হয, খাতাগুলো হাতে কবে ধরতেও তাঁর রীতিমতো ঘৃণা হচ্ছে।

মিনু ভয়ে-ভয়ে তার সিট থেকে উঠে দাঁড়িয়ে করুণ চোখে রানীদির মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

রানীদি বলেন, 'ও, তোমার বুঝি! তা খাতার চেহাবা দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম। এর বদলে গোটাকতক শালপাতার ঠোঙা আনলেই তো পারতে, লেখাও হত, মুড়ি-মুড়কি খাওয়াও চলত!'

মেয়েদের মধ্যে অনেকে মুখে হাত চাপা দিয়ে ফিক-ফিক করে হাসতে শুরু করে। রানীদি এবার মিনুর দিকে চেয়ে ধমকে ওঠেন. তোমায় কতদিন বলেচি, এ-খাতায় চলবে না, ভালো বাঁধানো খাতা আনতে!'

অপমানের আঘাতটা মিনু মনে বিশেষ করেই অনুভব করে; চোখে জল আসবার উপক্রম হলেও সে কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য সংহত করে জবাব দেয়. মা বলেচেন, 'এটা ফুরুলে কিনে দেবেন।'

'ফুরুলে কিনে দেবেন!' রানীদি খাতাখানা টেবিলের উপর থেকে সশব্দে নিচে ছুঁড়ে ফেলেন, তারপর মিনুর দিকে চেয়ে তাঁর স্বাভাবিক কাংস্য বিনিন্দিত কণ্ঠে বলে ওঠেন, 'মাকে বলে দিও, ধানদুব্বো দিয়ে লেখাপড়া হয় না. তাতে পয়সা লাগে; বুঝেচ! খবরদার, এ-খাতা যেন আর আমার টেবিলে না দেখি।'

ক্ষোভে, দুঃখে মিনুর চোখের জল আর কিছুতেই চেপে রাখতে পারে না। কোনও রকমে এগিয়ে গিয়ে খাতাখানা মেঝে থেকে তুলে নিয়ে আসে। মেয়েদের মধ্যে অনেকেই তার দিকে চেয়ে হাসতে আরম্ভ করে, আর তাদের মধ্যে একজনের হাসির ঝঙ্কার রীতিমতো প্রবল হয়ে ওঠে।

হেসো না, হেসো না, রানীদি ক্লাসে ডিসিপ্লিন রাখবার চেষ্টা করেন, 'কে হাসছে কে?' বেলা তার সিট থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আদুরে গলায় বলে, 'আমি দিদিমণি—'

ও, তুমি—রানীদির গলার স্বর আশ্চর্য রকম বদলে যায়—বেলা বড়লোকের মেয়ে—দিদিমণির কাছে তাই তার একটু আলাদা খাতির। রানীদি গলাটা যথাসম্ভব মোলায়েম করে বলেন, কি হয়েচে বেলা?

বেলা বলে, 'কিছু হয়নি দিদিমণি, তবে ভাবচি, আপনি মিনুর খাতা ফেলে দিলেন, ওর দাদু জানলে রাগ করবেন।'

'দাদু রাগ করবেন?' রানীদি একটু আশ্চর্য হয়েই জিজ্ঞাসা করেন।

'ও, আপনি জানেন না বুঝি'—বেলা মিনুর দিকে একটা বাঁকা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলতে থাকে, 'মিনুর দাদু যে মস্ত বড়লোক, আমাদের স্কুলের তিন-তিনটে বাড়ির মতো তাঁর বাড়ি আর দশ-পনেরোটা মোটর আর ঘরে-ঘরে দুটো করে দারোয়ান—মিনই বলছিল দিদিমণি—'

মিনু উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানাতে চায়, বলতে চায় যে ঠিক এই ধরনের কথা সে কোনওদিনই বলেনি, কিন্তু রাগে আর দুঃখে হঠাৎ তার চোখ দিয়ে ঝরঝর করে অশ্রুর বন্যা নেমে আসে, কোনও কথাই তার বলা হয় না।

মিনুর অসহায় অবস্থা দেখে রেণু তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'মিনু একথা বলেনি।' কিন্তু বেলার রিপোর্টের পর আর কারও কথা বলাই বোকামি, তাই রেণুর দিকে চেয়ে রানীদি ধমকে ওঠেন, 'চুপ কর তুমি—'

তারপর মিনুর দিকে চেয়ে তিনি ঠাট্টার সুরে বলেন, 'তাই নাকি মিনু, তোমার দাদু এত বড়লোক, গড়ের মাঠের জমিদার বোধহয়। দমকলের যত গাড়ি আর হাইকোর্টের গোটা বাড়িটাই তাঁর, কী বল?'

মেয়েগুলি এবার একসঙ্গে খিল-খিল করে হেসে ওঠে।

রানীদি আরও যেন উৎসাহিত হয়ে ওঠেন, 'তা তোমার দাদুর নামটা কী বলো তো? এতবড় একজন লোকের নামটা আমাদের জেনে রাখা ভালো।'

মিনু ঠোঁটে-ঠোঁট চেপে কোনওরকমে কান্না চাপবার চেষ্টা করে। তার সেই অসহায় অবস্থার দিকে চেয়ে ক্লাসের ছোট-ছোট মেয়েগুলির সঙ্গে রানীদিও কৌতুক অনুভব করেন।

'কই দাদুর নামটা বল'—তিনি আবার প্রশ্ন করেন।

মিনু আর কিছুতেই নিজেকে সংযত করতে পারে না। চোখের জলে সমস্ত ক্লাস-রুমটাই যেন তার সামনে ঝাপসা হয়ে আসে।

সমস্ত দিন শুধু দাদুর কথাই মনের মধ্যে তোলপাড় করে। হরিদার কাছে দাদুর কত গল্পই সে শুনেছে, তাঁর ঘর-বাড়ি, টাকাকড়ি...সব কথাই হরিদা তাকে বলেছে, বলেনি শুধু দাদুর নামটা। কেন বলেনি কে জানে! কিন্তু দাদুর নামটা আজকে জেনে নিতেই হবে, নইলে বেলার দলকে ঠান্ডা করা যাবে না কিছুতেই। তারপর দাদুর নাম যখন ওরা শুনবে, তখন তাদের মুখের ভাব এক মিনিটের মধ্যেই কীরকম বদলে যাবে, সেই কল্পনায় মিনু যেন এতবড় দুঃখের মধ্যেও অনেকখানি উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। কিন্তু হরিদা কি বলবেন? দাদুর নাম জিজ্ঞাসা করলেই মা এমনি রেগে ওঠেন যে, হরিদা আর কোনও কথা বলবার সাহস পান না। কিন্তু হরিদার আর চুপ করে থাকলে চলবে না। সব কথা তাকে বলতেই হবে।

মনে-মনে এই সঙ্কল্প নিয়ে মিনু বাড়ি ফিরে আসে।

সন্ধ্যার পর হরিহরের সঙ্গে দেখা হতেই সে দাদুর নাম জানবার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করে দেয়।

'না, আমি কোনওকথা শুনব না, তোমায় বলতেই হবে।'

হরিহর কাছে বসে মাথা নাড়েন, কোনও জবাব দেন না।

'তাহলে কেন তুমি বলেছিলে আমার দাদু আছে, কেন বলেছিলে দাদু মস্ত বড়লোক?' মিনু রীতিমতো নালিশের সুরে হরিহরকে প্রশ্ন করে।

হরিহর বলেন, 'অন্যায় করেছিলাম দিদি, অন্যায় করেছিলাম। লক্ষ্মী দিদি, তুমি এখন ঘুমোও।'

দিদির কিন্তু ঘুমোবার কোনও লক্ষণই দেখা যায় না।

'তুমি তাহলে মিথ্যে কথা বলেছিলে? তোমার জন্যেই ইস্কুলে আমায় আজ এত অপমান হতে হল।' মিনুর চোখে জল আসবার উপক্রম।

হরিহর বিব্রত হয়ে বলে, 'মিথ্যে ঠিক আমি বলিনি দিদি...'

'তাহলে কেন তুমি নাম বলছ না? না, দাদুর নাম তোমায় বলতেই হবে, নইলে আমি ছাড়ব না। না, কিছুতেই না'—মিনু এবার হরিহরের হাত ধরে টানতে শুরু করে; বলে, 'আজ আর তুমি যাত্রার আখড়ায় যেতে পাবে না।'

হরিহর রোজ রাত্রে এইসময় যাত্রার আখড়ায় যান। একদিন নড়চড় হয় না। মিনুর জেরার মুখে পড়ে সে-কথা যেন তিনি ভুলে যেতে বসেছিলেন। এখন সে-কথা স্মরণ হতেই হরিহর ব্যস্ত হয়ে পড়েন, 'ছাড়, দিদি ছাড়, আমার দেরি হয়ে যাচ্চে।'

মিনু কিন্তু কিছুতেই ছাড়তে চায় না তাঁকে। হরিহর যেন বিরক্ত হয়ে ওঠেন,—'সে নাম শুনে তোর লাভ কী দিদি। নামেই সে শুধু তোর দাদু, আসলে তোদের শত্তুর!'

মিনুকে তবু শান্ত করা যায় না। সে বলে, 'তা হোক, নাম তোমায় বলতেই হবে।'

'তাঁর নাম রায়বাহাদুর চুনিলাল চৌধুরী, নাও এখন হল তো'—হরিহর এক রকম জোর করেই মিনুর হাতটা নিজের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলেন, 'নামটা মুখে আনতেও আমার ঘেন্না হয়। মানুষ তো নয়, শুধু পাষাণ! তোর দাদুর যদি মানুষের প্রাণ থাকত, তাহলে তোদের কি আজ এই দুর্দশা হয়?'

মিনু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিজের মনেই যেন কত কী ভাবে। তারপর বলে, 'দাদু খারাপ লোক বলে আমরা তার কাছে যাই না, না হরিদা? একবার দেখতে পেলে দাদুকে আমি এমনি বকে দিতাম।'

'আচ্ছা তাই বকে দিও, এখন চুপ করে ঘুমোও দিকি।'—হরিহরের মুখে বিষণ্ণ একটু হাসি ফুটে ওঠে। একটু চুপ করে থেকে তিনি বলেন, 'মাকে কিন্তু এসব কথা কিছু বলো না কখনও।'

মিনু জবাব দেওয়ার আগেই সুমিত্রা ঢোকে ঘরের মধ্যে। হরিহর আর মিনুর দিকে চেয়ে সে জিজ্ঞাসা করে, 'দাদু নাতনীতে লুকিয়ে-লুকিয়ে কী সলা পরামর্শ হচ্ছে? কাকে বকুনি দেওয়া হবে?'

'কিছু না, কিছু না।' হরিহর রীতিমতো বিব্রত হয়ে পড়েন। 'যত সব ছেলেমানুষী কথা! আচ্ছা, আমি এখন আসি।'

আলনা থেকে ভাঁজ-করা ছেঁড়া চাদরটা তুলে নিয়ে হরিহর বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম করেন। সুমিত্রা বলে, 'যাত্রার আখড়ায় চললে তো?'

হরিহরকে ফিরে দাঁড়াতে হয়, বলেন, 'কী করি বল, রাত হলেই মনটা কেমন উসখুস করে। অনেক দিনের নেশা।'

'তা তো বুঝলাম, সুমিত্রা একটু রাগ করেই বলে, 'কিন্তু নিজের শরীরটাও দেখতে হবে। সারাদিন ডাক্তারখানায় চাকরি করবে, বাড়ির খাটুনি খাটবে, তার ওপর রোজ-রোজ রাত জেগে এই যাত্রার সং সাজতে না গেলেই নয়! এমন করে শরীর কদিন টিকবে। না, এ-পোড়া নেশা তোমায় ছাড়তেই হবে।'

'বাঃ বেশ কথা।' হরিহর রীতিমতো রেগে ওঠেন, 'আমার যেন সাধ-আহ্লাদ-সখ বলে কিছু নেই। সারাদিন খেটেখুটে রাত্রে একটু যাত্রা করতে যাব, তাতেও তোমাদের মানা। কতদিন তোমায় বলেছি, রাত্রে একটু আখড়ায় গিয়ে মহলা না দিলে আমার ঘুম হয় না। আমায় তুমি বারণ কর না মা, বলে দিচ্চি।'

হরিহর তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে যান, আর তাঁর এই রাগ আর ব্যস্ততা দেখে সুমিত্রার মুখে ফুটে ওঠে মধুর হাসি। সত্যি এই অনাত্মীয় লোকটির সাহায্য আর আশ্রয় না পেলে আজ যে কী কবে তাকে দিন কাটাতে হতো, সেকথা ভাবতেও তার ভয় হয়। মিনু যখন প্রথম কোলে এল, সেই দিন থেকে হরিহর তাকে কোলে-পিঠে মানুষ করে সাধ্যমতো কোনও অভাবই তাকে বুঝতে দেননি! নিজের বলতে তাঁর কিছুই নেই, তাই গ্রামের ডিসপেন্সাবিব এতকালের চাকবিটা ছেড়ে দিতেও তার বিন্দুমাত্র দেবি হয়নি। সুমিত্রাকে নিয়ে কলকাতাতেই থেকে গেছেন এবং সেখানকাব এক ডাক্তারখানায় চাকরিও একটা জোগাড় করে নিয়েছেন। গ্রামের দাতব্য চিকিৎসালযেব তুলনায় এখানকার ডাক্তারখানায় খাটুনি তাঁর বেশি, কিন্তু সে খাটুনিতে তার ক্লান্তি নেই, এতটুকু বিরক্তিও না। আত্মভোলা এই মানুষটির কৃতজ্ঞতার ঋণ যে কী করে শোধ করা সম্ভব হবে, সুমিত্রা যেন ঘুমন্ত মিনুর মুখের দিবে চেয়ে শুধু সেই কথাই ভাবে।

আসল কথাটা জানা থাকলে সুমিত্রার ঋণের বোঝা বোধহয় আবও ভারী হয়ে উঠত। কারণ যাত্রার আখড়ার নাম করে হরিহর প্রতি রাত্রে যেখানে যেতেন, সেটা আর একটা ডাক্তাবখানা। দিনের চাকরির আয়ে কুলোয় না বলে বাত্রে এই উপরি আয়ের ব্যবস্থা তাঁকে গোপনে করতে হয়েছে। সুমিত্রাব সঙ্গে কথা কাটাকাটি করতে একটু সময় নষ্ট করেছিল, তাই তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে তিনি সেইখানেই পৌঁছলেন।

হরিহরকে ঢুকতে দেকে একজন কর্মচারী ডাক্তারখানার মালিকের দিকে চেয়ে বলে ওঠে, 'দেখেচেন স্যার, এতক্ষণে নবাব সাহেবের আসবার সময় হল।'

'একটু দেরি হয়ে গেল'—হরিহর সসঙ্কোচে কর্তার সামনে এসে দাঁড়ায়।

কর্তা গম্ভীরমুখে বলেন, 'একটু নয় হরিহর, একঘণ্টা দেরি আর আজ প্রথম নয়, এরকম তো প্রায়ই হচ্ছে। তা ছাড়া রাত্রের কাজ—আমায় পর্যন্ত তোমার জন্য বসে থাকতে হচ্ছে।'

যে কম্পাউন্ডাবটির ডিউটি শেষ হয়েছিল সে ফোড়ন দেয়, 'ওঁর তো এটা চাকরি নয় স্যার, উনি আসেন গায়ে ফুঁ দিযে আড্ডা দিতে। আমরাই শুধু খেটে মরি।'

কর্তা বলেন, 'রাত্রে যদি অসুবিধা হয়, তোমায় না হয় দিনেই বদলি করে দিচ্ছি, আর সত্যি, বয়স তো কম হল না, এ-বয়সে রোজ-রোজ রাত জাগবেই বা কী করে?'

'না, না, দিনে আমি পারব না স্যার,' হরিহর সজোরে মাথা নেড়ে আপত্তি জানায়। 'আমায় মাফ করবেন, কাল থেকে আমি বরং ঠিক সময়েই আসব।'

কর্তা একটু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'কী ব্যাপার বল তো? সাধ করে তুমি রাত জাগতে চাও, দিনে কী এমন তোমার অসুবিধে?'

'আজ্ঞে, আজ্ঞে সংসারের কাজ...' হরিহর যেন রীতিমতো কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে।

'সংসার? তোমার সংসার খুব বড় নাকি হরিহর? ছেলেপুলে কতগুলি?'

'ছেলেপুলে!' এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে হরিহর জবাব দেন, 'আজ্ঞে ছেলেপুলে তো নেই।'

কর্তার বিস্ময়ের মাত্রা যেন বেড়েই যায়। তিনি আবার প্রশ্ন করেন, 'ছেলেপুলে নেই, তবু বলছ সংসারের ঝঞ্ঝাট, কে আছে তাহলে সংসারে?'

'আজ্ঞে, আছে একটি নাতনী'—হরিহর জবাব দেন।

'একটি নাতনী!'—কর্তা এবার হেসে ফেলেন।

হরিহর বলে, 'হাসবেন না স্যার হাসবেন না। একটি হলে কী হয় একাই একশো।' মিনিট খানেক চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে হরিহর আবার বলেন, 'একটা নিবেদন ছিল, স্যার। যদি কিছু আগাম দিতেন তাহলে কাল বাসায় ফেরবার সময় একখানা শাড়ি কিনে নিয়ে যেতাম। ক-দিন থেকে বড্ড বায়না ধরেচে।'

কর্তা ড্রয়ারটা টানতে-টানতে বলেন, 'ছ-মাসের মাইনেটা প্রায় আগাম নিয়েই শেষ করেছ, তা খেয়াল আছে?'

হরিহর উত্তর না দিয়ে নিঃশব্দে মাথা চুলকাল। কর্তা ড্রয়ার থেকে দশ টাকার একখানা নোট বার করে হরিহরের হাতে দেন।

হরিহর নোটখানা ফতুয়ার পকেটে পুরে কাজ করবার জন্যে এগোয়। কর্তা হরিহরের দিকে চেয়ে কতকটা নিজের মনেই বলেন, 'তোমার মতো কম্পাউন্ডার পুষতে গিয়ে আমার ব্যবসাই না মাটি হয়।'

শাড়িখানা অবশ্য হরিহরের মারফতে মিনুর কাছে এসে পৌঁছল গোপনে। সুমিত্রা তখন রান্নাঘরে, কাজেই কোনও অসুবিধা হরিহরের হয়নি। শাড়ি দেখে মিনুর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ঠিক করলে শাড়িখানা পরে একেবারে রান্নাঘরে হাজির হয়ে মাকে অবাক করে দেবে। তারপর শুরু হল মনোমতো করে শাড়িখানা পরবার দুঃসাধ্য চেষ্টা। এমন করে সেখানা পরতে হবে যাতে বেলা থেকে আরম্ভ করে তার দলের সবাই একেবারে আশ্চর্য হয়ে যায়। কিন্তু এতদিন যার ফ্রক পরে কেটেছে নিজের চেষ্টায় শাড়ি পরা তার পক্ষে একটু শক্ত। তাই কাজটা সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই সুমিত্রা এসে পড়ে ঘরের মধ্যে। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সে শাড়ি পরার ধরনটা লক্ষ করে, কোনও কথাই বলে না।

মিনু মায়ের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'কীরকম হয়েচে বল না মা? ভালো হয়নি শাড়িটা?'

'হ্যাঁ, ভালো হয়েচে। হরিকাকা এনে দিলেন বুঝি?'

'হ্যাঁ মা! তোমায় বলতে হরিদা বারণ করেছিল। লক্ষ্মী মামণি তুমি হরিদাকে বকতে পাববে না। বলো বকবে না।'

সুমিত্রা একটু হেসে জবাব দেয়, 'না মা, বকব না! কিন্তু তোমার হরিদা-র বুদ্ধিশুদ্ধি আর কখনও হবে না।'

মিনু বলে, 'তা না হোক গে। হরিদা খুব ভালো। আমি তা হলে এইটা পরেই স্কুলে যাচ্ছি মা। তুমি কিন্তু হরিদাকে বকো না যেন।'

'না রে না'—সুমিত্রা হাসিমুখে মিনুকে আশ্বস্ত করে।

মিনু আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ছুটতে-ছুটতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। সুমিত্রা বাইরে দাওয়ায় এসে দাঁড়ায়।

বাইরে থেকে কে যেন ডাক পাড়ে, 'হরিবাবু বাড়ি আছেন নাকি?'

কণ্ঠস্বর অচেনা! সুমিত্রা সুখোর-মাকে বলে, 'দেখ তো কে হরিকাকাকে খুঁজচে।' সুখোর মা কী একটা কাজ করছিল, উঠে গিয়ে দরজাটা একটু ফাঁক করে লোকটা কে দেখবার চেষ্টা করে। লোকটিকে যেন চিনতে পারে না। ভেতর থেকেই জিজ্ঞাসা করে, 'কাকে চাই?'

'হরিবাবু আছেন?' লোকটি বলে, 'আমি জামার দোকান থেকে আসচি তাঁর জামার মজুরি নিয়ে।'

সুমিত্রা বলে, 'ওকে ভিতরে আসতে বল সুখোর মা।'

সুখোর মা দরজা খুলে দিতে লোকটি ভিতরের উঠানে এসে দাঁড়ায়।

'পেন্নাম হই মা, কাল রাত্তিরে হরিহরবাবুর ডাক্তারখানায় যেতে পারিনি কিনা তাই ভাবলাম সকালবেলায় বাড়িতেই দামটা দিয়ে যাই। হরিহরবাবুর যে কড়া তাগাদা!'

সুখোর মা বলে, 'তা ডাক্তারখানায় হরিবাবুকে রাত্তিরে পাবে কী করে? তিনি তো রাতে সেখানে কাজ কবেন না।'

লোকটি ঘাড় নেড়ে বলে, 'আজ্ঞে করেন বইকী। সেইখানেই তো তাঁকে পেরায় দিন দাম চুকিয়ে দিয়ে আসি। সেখান থেকেই আজ এ-বাড়ির ঠিকানা জেনে এলাম।'

লোকটি জামার পকেট থেকে কয়েকটা টাকা বার কবে সুমিত্রার হাতে দিতে-দিতে বলে, 'এই নিন মা চারটে ফ্রক, চারটে ব্লাউজ আর আটটা সেমিজের দাম।'

সুমিত্রা টাকা ক'টা হাতে নিয়ে গুনে দেখে। তারপর মনে-মনে একটা হিসাব করে নিয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'এই শুধু? হরিকাকা যে অনেক বেশি নিয়ে আসেন।'

লোকটি একটু আশ্চর্য হয়ে জবাব দেয়, 'আজ্ঞে, তা কী করে হয় দাম তো আমি ঠিক'—তার কথা শেষ হওয়ার আগেই দেখা যায় হরিহর আসছেন। লোকটি তাঁকে দেখে আবার শুরু করে, 'ওই তো উনি এসেছেন, ওকেই শুধিয়ে দেখুন না...কত করে আমরা মজুরি দিই—'

লোকটিকে উঠানের মাঝখানে সুমিত্রার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই যেন হরিহবের হাড়-পিত্তি জ্বলে গিয়েছিল। লোকটির সামনে পৌঁছেই তিনি প্রায় দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলে ওঠেন, 'তার আগে এখানে তুমি কী করতে এসেচ শুনি—এখানে তোমার আসার কি দরকার ছিল?'

এখানে আসায় এমন কী অপরাধ হতে পারে, লোকটি যেন ভেবে পায় না; জিজ্ঞাসা করে, 'আপনি হঠাৎ রাগান্বিত হচ্চেন কেন?'

'রাগান্বিত হব না'—হরিহর আবাব ঝাঁঝিয়ে ওঠেন, 'এখানে আসতে তোমায় কে বলেচে শুনি?' লোকটি বিব্রতভাবে সুমিত্রার দিকে চেয়ে বলে, 'দেখুন দিকি মা, আমার অপরাধটা কী? কোথায় বাড়ি বয়ে টাকা দিতে এলাম, আর উনি কিনা আমায় ধমকাচ্চেন!'

সুমিত্রা বলে, 'সত্যি ওর কী দোষ হরিকাকা—!'

'না, না, এসব আমি পছন্দ করি না।'—হরিহর রীতিমতো বিরক্তভাবে বলেন, 'তুমি এখান থেকে সরে পড় বাপু—'

'বেশ তাই যাচ্ছি। কিন্তু আমার অপরাধটা কী তাইতো আমি বুঝতে পারলুম না। কাল রাতে আপনার ডাক্তারখানায় যেতে পারিনি বলে—'

হরিহর আরও অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন, লোকটার মুখের কাছে হাত দুটো নিয়ে গিয়ে বলেন, 'আচ্ছা-আচ্ছা হয়েচে, তুমি এখন বিদায় হও দিকি।'

লোকটি কিছুই বুঝতে না পেরে একবার সুমিত্রা এবং আর একবার হরিহরের মুখের দিকে চাইতে-চাইতে বেরিয়ে যায়। হরিহর উঠানের মাঝখানেই মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকেন। যেন ভয়ানক একটা সর্বনাশ হয়ে গেছে তাঁর। এমনিভাবে কতক্ষণ কাটবার পর হঠাৎ তিনি সুমিত্রার দিকে চেয়ে বলে ওঠেন, 'এখন আর চুপ করে আছ কেন? যা বলবার বল? সবই তো জেনে ফেলেচ।'

'জেনেই তো চুপ করে আছি, হরিকাকা। সারাদিন খাটুনির পর রোজ রাত্রে তুমি যাত্রার নাম করে কাজ করতে যাও। আমার যা পাওনা তার ডবল মজুবি তুমি এনে দাও, এর পর কী আমার বলবার থাকতে পারে!'

শেষের দিকটায় সুমিত্রার কণ্ঠ যেন ভারী হয়ে আসে।

হরিহর বলে ওঠেন, 'তা আমি আর কী করব বল! চোখের ওপর সংসারটা তো ভেসে যেতে দিতে পারি না। এমনি দিলে তো নেবে না। পাছে তোমার মনে লাগে তাই না হয় দুটো মিছে কথা বলেচি। তাতে যা দোষ হয়েছে তার সাজা দাও। তা হলেই তো হল।'

কথাগুলো বলেন তিনি সুমিত্রাকে, কিন্তু সমর্থন খোঁজেন সুখোর-মার দিকে চেয়ে।

সুমিত্রা একটু চুপ কবে থেকে বলে, 'তোমার মতো লোকের সাজা যে আমার জানা নেই, হরিকাকা!'

'বাঃ, এ-তো মহা ফ্যাসাদ দেখচি!'—হবিহর এক মিনিট চুপ করে থেকে আবার বলেন, 'বেশ; তোমার সংসারে এপর্যন্ত কত কী দিয়েচি তার হিসেব করে না হয় একটা খত লিখে দাও। কড়ায় গণ্ডায় একদিন সুদ সুদ্ধ আদায় করে নেব। তাহলে তো হবে!'

হরিহরের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় তিনি একটা মস্ত বড় সমস্যার অতি সহজ সমাধান করে ফেলেছেন। কিন্তু সুমিত্রা ব্যাপারটা যেন ঠিক সে-ভাবে নিতে পাবে না। তাই খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'তোমাদের ঋণ যদি এত সহজে শোধ করা যেত!'

চোখে জল এসে পড়ায় সুমিত্রা আর সেখানে দাঁড়ায় না, তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর ঢুকে যায়।

হরিহর সঙ্গে-সঙ্গে সুখোর-মার দিকে চেয়ে বলতে শুরু কবেন, 'দেখলে সুখোর-মা! দেখলে তো বিচারখানা! সাজা চাইচি, তাতেও সন্তুষ্ট নয়! এখন আমি কী করি বল তো?'

হরিহর যেন আবার মহাসমস্যার মধ্যে পড়ে একেবারে দিশেহারা হয়ে যান।

সুখোর-মা খানিক তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থেকে জবাব দেয়, 'তুমি একটি আস্ত আহাম্মুখ। গলায় কলসি বেঁধে তোমার ডুবে মরাই ভালো...'

'তাই মরতাম সুখোর-মা, তাই মরতাম!' হরিহর সজোরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেন, 'সংসারে আমার ঘেন্না ধরে গেচে। নেহাত ওই মিনু-দিদি...' কথাটা শেষ না করেই হরিহর তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যান। সুখোর-মা তার দিকে চেয়ে হাসবার চেষ্টা করে, কিন্তু হঠাৎ মনে হয় তার চোখেও বুঝি জল এসে পড়বে!

স্কুলের লনের দোলনায় মিনু দোল খাচ্ছিল, রেণু দাঁড়িয়েছিল তার নিকটেই, হঠাৎ বেলা সেখানে সদলে হাজির।

দোলনাটা হাত দিয়ে টেনে ধরে বলে ওঠে, 'ওহে নাম দেখি, দোলনাটা তোমার কেনা নয়।' মিনু কিন্তু নামতে নারাজ, বলে, 'বাঃ আমি তো আগে এসেছি।'

'আগে এসে মাথা কিনেচ নাকি?' বেলা মুখ ঝামটা দিয়ে ওঠে—'তুমি একাই শুধু দোল খাবে? ভারি একটা নূতন শাড়ি পরে এসে আবদার যে ধরে না! ওরে এমন শাড়ি তোরা দেখেছিস কখনও?'

মিনুর শাড়ির দিকে আঙুল দেখিয়ে সঙ্গিনীদের দিকে চেয়ে বেলা হাসতে শুরু করে।

বেলার দলের আর একটি মেয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'এ-বুঝি তোর সেই দাদু কিনে দিয়েচে, মিনু?'

মিনু বলে, 'না, এ-শাড়ি হরিদাদা কিনে দিয়েচে।'

বেলার মুখে আবার বিদ্রূপের হাসি ফুটে ওঠে, চোখ দুটো বিস্ময়ের ভঙ্গিতে বড়-বড় করে বলে, 'ও বাবা, একা দাদুতে রক্ষে নেই, আবার হরিদাদা! তা সে দাদু গেল কোথায়, হারিয়ে গেল নাকি এরইমধ্যে?'

মিনু জোর গলায় প্রতিবাদ জানায়, 'কেন হারিয়ে যাবে। সে দাদুও আছে। তাঁর নাম রায়বাহাদুর চুনিলাল চৌধুরী।'

রায়বাহাদুর চুনিলাল চৌধুরীর বাড়িটা স্কুল থেকে খুব দূরে নয়। গাড়িতে আসতে-আসতেই প্রকাণ্ড বাড়িখানা অনেকের চোখে পড়েছে। তাই মিনুর কথা শুনেই মেয়েদের মধ্যে একজন বলে ওঠে—'ওরে শোন, শোন, রায়বাহাদুর চুনিলাল চৌধুরী নাকি ওর দাদামশায়। চাল মারবার জায়গা পায়নি।'

'আমি মিথ্যে কথা বলি না। উনিই আমাদের দাদামশাই,' মিনু বেশ অস্পষ্টভাবেই কথাগুলো বলে। সেই মেয়েটা বিশ্বাস করতে চায় না, 'বলে, তাই নাকি? তবে হবে। কিন্তু রায়বাহাদুরের বাড়ি আমাদের বাড়ির কাছেই কিনা। বুড়োর তিন কুলে কেউ আছে বলে জানতাম না।'

বেলা মিনুকে জব্দ করবার সুযোগ পেয়ে উৎসাহিত হয়ে ওঠে, বলে; 'তা মিনু একবার দাদুর কাছে গেলেই তো পারে। অত বড়লোক দাদু, কী আদরটাই না করবে মিনুকে।'

সেই মেয়েটা ফোড়ন দেয়, 'আজই চল না, দেখব তোর কেমন দাদু!'

'বেশ, আজই যাব, দেখিস।'

মিনু সগর্বে সেখান থেকে চলে যায়।

যে মেয়েটির বাড়ি রায়বাহাদুরের বাড়ির কাছেই, স্কুলের ছুটির পর বাস থেকে নামবার সময় সে মিনুকে বলে, 'কই নামলিনে মিনু, দাদামশায়ের কাছে যাবি না? এই তো তোর দাদুর বাড়ি—'

আঙুল দিয়ে মেয়েটা রায়বাহাদুরের বাড়িটা দেখিয়ে দেয়। প্রকাণ্ড বাড়ি আর প্রকাণ্ড তার গেট। গেটের পাশেই শ্বেতপাথরের উপর নাম লেখা—রায়বাহাদুর চুনিলাল চৌধুরী।

মিনুর বুক ভয়ে আর উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে। ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে কতদিন—কতদিন সে এমনি প্রকাণ্ড একটা বাড়ির স্বপ্ন দেখেছে, কিন্তু এতবড় তা সে ভাবতেও পারেনি! এর মধ্যে সে যাবে কী করে? কিন্তু বেলার দল এক দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে মজা দেখছে। মিনুর ইতস্তত করলে চলবে না, নামতেই হবে তাকে এখানে। শ্লেট আর বইগুলো গুছিয়ে নিয়ে মিনু কোনওরকমে বাস থেকে নেমে পড়ে।

মিনুর পা দুটো যেন থরথর করে কাঁপতে থাকে, কিন্তু ফিরে গেলে চলবে না, গেটের

মধ্যে তাকে ঢুকতেই হবে, আর প্রমাণ করতে হবে নিজের পরিচয়। সেই মেয়েটা এখনও দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সে কী করে তাই লক্ষ করছে।

মিনু একমুহূর্ত অপেক্ষা করেই গেটের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

মিনু সত্যি-সত্যিই ভিতরে ঢুকে পড়ায় মেয়েগুলি প্রথমটা রীতিমতো আশ্চর্য হয়ে যায়।

একজন বলে, 'আরে সত্যি-সত্যি যাচ্চে যে!'

বেলা বলে, 'দাঁড়া না, এখুনি দারোয়ান গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দেবে, তখন বুঝতে পারবে—দাদুর আদর কীরকম।'

বেলার কথায় তার সঙ্গিনীরা খিলখিল করে হেসে ওঠে। একজন বলে, 'দাঁড়িয়ে একটু মজা দেখা যাক, কী বলিস?' যে মেয়েটির বাড়ি রায়বাহাদুরের বাড়ির কাছেই সে বলে, 'না, না, স্কুলের গাড়ি এতক্ষণ দাঁড়াবে কেন? আমাদের বাড়ি থেকে রায়বাহাদুরের বাড়ির প্রায় সবটাই দেখা যায়। চলনা সবাই আমার বাড়িতে, সেইখান থেকেই বসে-বসে মজা দেখা যাবে—'

বলাবাহুল্য তার এই প্রস্তাবে সবাই রীতিমতো উৎসাহিত হয়ে ওঠে এবং কলরব করতে-করতে গাড়ি থেকে নেমে যায়।

এদিকে গেটটা পার হতেই মিনুর বিস্ময়ের মাত্রা বেড়ে যায়। দু-পাশে বাগান, মাঝখানে লাল সুরকি বিছানো চওড়া রাস্তা অনেকদূর পর্যন্ত চলে গেছে; আর পথটা যেখানে শেষ হয়েছে—বাড়ি আরম্ভ হয়েছে সেইখান থেকে। এদিকে-ওদিকে চারিদিকে চেয়ে মিনু কাউকেই দেখতে পায় না, উত্তেজনায় তার বুকের ভেতরটা কাঁপতে থাকে। মনে হয়, সে যেন হঠাৎ এক ঘুমন্ত পুরীর দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু ফিরে যাওয়া চলবে না; কিছুতেই না। স্কুলের বাসটা আর পাশের বাড়ির সেই মেয়েটা হয়তো এখনও দাঁড়িয়ে আছে। মিনু জোরে-জোরে পা ফেলে সুবকি বিছানো পথের উপব দিয়ে ভিতরের দিকে এগোতে থাকে। খানিকটা গিয়েই দেখে, বাগানের মধ্যে দাঁড়িয়ে একটা লোক—ঝাঁঝরি করে ফুলগাছগুলোয় জল দিচ্ছে।

একমুহূর্ত চুপ করে থেকে মিনু লোকটাকে জিজ্ঞাসা করে, 'এই শুনচ, এ-বাগান রায়বাহাদুর চুনিলাল চৌধুরীব?'

মিনুর প্রশ্নে একটু যেন অবাক হয়েই লোকটি তার দিকে চায়। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর বলে, 'হ্যাঁ, এই তার বাগান। তোমার কী দরকার তাকে খুকুমণি?'

'আমার দরকার,' মিনু মরিয়া হয়ে বলে ফেলে 'তিনি আমার দাদামশাই—'

কৌতুক আর বিস্ময়ে লোকটির চোখ দুটি যেন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কথাটা ঠিক শুনতে পায়নি এমনিভাবে সে জিজ্ঞাসা করে, 'কী বললে, তোমার দাদামশাই?'

'হ্যাঁ, কোথায় তিনি বল তো?' মিনু এবার বেশ জোরে-জোরে কথা বলে, 'এবার দেখতে পেলে হয়, আমি তখন বুঝিয়ে দেব তাঁকে।'

লোকটি একবার একাগ্র দৃষ্টি দিয়ে মিনুর দিকে চেয়ে দেখে আর আকাশপাতাল কত কী যেন ভাবে। কিন্তু শুধু মিনিট খানেকের জন্যে। তারপরেই মিনুর দিকে এগিয়ে এসে বলে, 'তা বুঝিয়ে দিও দিদি কিন্তু তিনি তো বাড়ি নেই—'

'বাড়ি নেই? তাহলে'...হতাশায় মিনুর কণ্ঠস্বর যেন ভেঙে পড়ে। 'তাতে কী হয়েছে

খুকু?' লোকটি এবার মিনুর একটি হাত ধরে বলে, 'এস, তোমার দাদুর বাড়ি দেখবে না?

'কে দেখাবে?'—মিনু জানতে চায়।

লোকটি হেসে জবাব দেয়, 'কেন আমি! বুড়োর সব জিনিসের আমিই তো দেখাশুনা করি...'

মিনুকে নিয়ে লোকটি এবার বাড়ির দিকে এগোয়।

অদূরবর্তী একটি বাড়ির ছাদে বেলার দলের মেয়েগুলির চোখ বিস্ময়ে বড়-বড় হয়ে ওঠে।

একজন বলে, 'আরে, বুড়োটা ওকে ভেতরে নিয়ে চলল যে!'

বেলা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে জবাব দিলে, 'ও নিশ্চয়ই রায়বাহাদুর নয়!'

যাদের বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে এই জটলা হচ্ছিল সেই মেয়েটি বলে, 'নারে, ওই বুড়োই রায়বাহাদুর—আমি ওকে চিনি, সংসারে ওর কেউ নেই, বাবা বলেন—'

বেলা যেন আশ্বস্ত হয়ে বলে, 'তাই বল। ওকে দেখে বোধহয় রায়বাহাদুরের একটু দয়া হয়েচে! কিছু খেতে দেবেন বোধহয় কিংবা দু-চারটে পয়সা। ব্যাপার বোঝা গেছে। আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই, চল যাই—'

বেলা হঠাৎ বাড়ি যাওয়ার জন্যে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে ওঠে এবং তার মুখটা যেন একটু গম্ভীর দেখায়।

বাগানটুকু পার হয়ে বাড়ির মধ্যে পৌঁছুতে আর কতক্ষণ! কিন্তু সেই অল্প সময়টুকুর মধ্যেই রায়বাহাদুরের মন যেন অতীতের ভগ্নস্তূপের মধ্যে নিঃসঙ্গ প্রেতের মতো ঘুরে বেড়ায়। আদালত প্রাঙ্গণের বাইরে সুমিত্রা যেদিন তাঁর অনুরোধ উপেক্ষা করে অনায়াসে চলে গিয়েছিল, সেদিনের কথাটাই বিশেষ করে মনে পড়ে। তারপর থেকে এই দীর্ঘকাল তিনি এই প্রকাণ্ড বাড়ির মধ্যে সত্যিই নিঃসঙ্গ প্রেতের মতো কাটিয়েছেন, ব্যাঙ্কের হিসেব, কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ডের মিটিং...এই সব বড়-বড় আর রীতিমতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিয়ে তাঁর দিন কেটেছে সত্যি, কিন্তু ছোটখাটো কথা, সহজ কথা বলার মতো একটি লোকও তিনি খুঁজেও পাননি! তাই আজ বাগানের মধ্যে ছোট একটি মেয়ের মুখে নিজের নাম শুনে, তার দিকে চেয়ে রায়বাহাদুর আশ্চর্য হওয়ার চেয়ে খুশি হয়েছিলেন বেশি। আর খানিকক্ষণ পরে একথাও বুঝতে বাকি ছিল না যে, এই মেয়েটি তাঁর কাছে এসেছে সুমিত্রার ছোটবেলার প্রতিনিধি হয়ে—সহজাত অধিকার আর দাবী নিয়ে।

বাড়ির আসবাবপত্র দেখে মিনু বিস্ময়ে একেবারে অবাক হয়ে যায়। রায়বাহাদুর মিনুর হাত ধরে একটির পর একটি ঘরে ঘুরে বেড়ান, অবশেষে তাঁকে নিয়ে আসেন নিজের ঘরটিতে। ঘরের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা খাট, পাশেই ছোট্ট একটি টিপয় আর একখানা ইজি চেয়ার। ছবি আলমারি বা ড্রেসিং টেবল...আর কিছুই নেই।

রায়বাহাদুর বলেন, 'এই তোমার দাদুর ঘর।'

খাটের কাছে এগিয়ে গিয়ে মিনু বলে, 'এই খাটে দাদু শোয়?'

রায়বাহাদুর ঘাড় নেড়ে বুঝিয়ে দেন যে মিনুর অনুমান সত্যি।

একটার পর একটা ঘরগুলোয় ঘুরে বেড়াতে তিনি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন, ইজি চেয়ারটায় বসে তিনি হাঁপ ফেলেন।

ঘরের চারিদিকে ভালো করে চোখ বুলিয়ে নিয়ে মিনু বলে, 'দাদু তো মস্ত বড়লোক, কিন্তু ঘরে তো ভালো জিনিস কিছু নেই।'

'তাও তো বটে'—রায়বাহাদুর একটু অন্যমনস্কভাবে জবাব দেন।

'দাদু বোধহয় খুব কেপ্পন, না?'

'তাই হবে বোধহয়'—রায়বাহাদুর হাসবার চেষ্টা করেন।

খাটটির দিকে চেয়ে-চেয়ে মিনু বলে, 'বাবাঃ কী লম্বা খাট। দাদু বুঝি খুব লম্বা?'

হাঁ যেমন লম্বা, তেমনি বিশ্রী'—রায়বাহাদুর জবাব দেন।

'এঃ, দাদু বিশ্রী বইকী! কখনও নয়।' মিনু সজোরে ঘাড় নেড়ে আপত্তি জানায়। রায়বাহাদুর কৌতুকের সুরে বলেন, 'বাঃ, হলেই বা বিশ্রী, তাতে তোমার কি! তোমার তো দাদুর উপর রাগ।'

মিনু বলে, 'হলেই বা রাগ, তা বলে দাদু বিশ্রী হতে যাবে কেন?'

রায়বাহাদুর বলেন, 'আচ্ছা, তা হলে বিশ্রী নয়। কিন্তু খুব খারাপ লোক, কেমন?'

মিনু একটু চুপ করে থেকে বলে, 'হ্যাঁ, তা বলতে পার।'

রায়বাহাদুর কোনও জবাব দেওয়ার আগেই মিনু দেখে, লোকটি ইজি চেয়ারের ওপর বসে। রীতিমতো আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করে, 'একী! তুমি যে দাদুর চেয়ারে বসেছ বড়!'

'অ্যাঁ!—ও, তাইতো ভুলেই গেছি...'

রায়বাহাদুর রীতিমতো বিব্রতভাবে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান।

মিনু বলে, 'দাদু দেখলে খুব রাগ কবত!'

'তা করত বইকী,' রায়বাহাদুর বলেন।

মিনু যেদিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিল, তার বিপরীত দিকের দরজা দিয়ে সেইসময় একজন চাকরকে একটা গড়গড়া নিয়ে ঢুকতে দেখা যায়। সেই দিকে চোখ পড়তেই রায়বাহাদুর যেন রীতিমতো শঙ্কিত হয়ে ওঠেন, তাড়াতাড়ি হাত নেড়ে চাকরটাকে চলে যেতে বলেন। চাকরটা কিন্তু হঠাৎ কিছুই বুঝতে পারে না, হতভম্বের মতো সেইখানেই দাঁড়িয়ে পড়ে। রায়বাহাদুর এবার রীতিমতো উত্তেজিতভাবে হাত নেড়ে লোকটাকে চলে যাওয়ার ইঙ্গিত করেন।

হঠাৎ মিনুর চোখ পড়ে যায় সেই দিকে। আশ্চর্য হয়ে সে জিজ্ঞাসা করে, 'কাকে তুমি হাত নাড়ছিলে?'

'ওই, ওই হতভাগা চাকরটাকে'—রায়বাহাদুর উত্যক্তভাবে বলে ওঠেন, 'বেটার যদি কিছু বুদ্ধিসুদ্ধি থাকে! যা ব্যাটা নিয়ে যা গড়গড়া, এখানে কে আছে যে গড়গড়া এনেছিস খাতির করে?'

বিস্মিত হয়ে চাকরটা অস্ফুটকণ্ঠে বলে, 'আজ্ঞে আপনি...'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি'—রায়বাহাদুর ঝাঁঝিয়ে ওঠেন। 'আমি বলছি, তুই নিয়ে যা এখান থেকে! যা, বেরো—।'

চাকরটা আসল ব্যাপারের বিন্দু-সর্গ বুঝতে না পারলেও, আর সেখানে দাঁড়াবার সাহসে খুঁজে পায় না।

রায়বাহাদুর বিরক্তভাবে নিজের মনেই যেন বলেন, 'যেমন হয়েছে বাড়ির মনিব, তেমনি চাকরগুলো। যত সব পাজি, বদমাস।'

'বাঃ ওর কী দোষ, ও হয়তো ভেবেছিল, দাদু এখানে আছে'—মিনু চাকরটার পক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করে।

রায়বাহাদুরের রাগ যেন আরও বেড়ে ওঠে। তিনি বলেন, 'অমন কথা ওরা ভাবে

কেন? চোখে দেখতে পায় না? যত সব আহাম্মুখ হুঃ।'

মিনু কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বলে, 'আমি কিন্তু এবার বাড়ি যাব।'

'বাড়ি যাবে?'

রায়বাহাদুর যেন স্বপ্নলোক থেকে একেবারে মাটিতে নেমে আসেন। মেয়েটির বাড়ি আছে, তাকে বাড়ি যেতে হবে, এ-কথা যেন তাঁর মনে ছিল না। খানিক চুপ করে থেকে মিনতির সুরে বলেন, 'আর একটু থাকবে না?'

মিনু বলে, 'না, মা আবার ভাববে।'

'তোমার মা ভাববেন, না?' প্রশ্নটা করে রায়বাহাদুর যেন গভীর সমুদ্রে ডুবে যান। তারপর সে ভাবটা কাটিয়ে উঠে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার মা বেশ ভালো আছে তো সেখানে? সেখানে কোনও কষ্ট নেই তো?'

মিনু জবাব দেয়, 'বাঃ কষ্ট আবার নেই। সমস্ত দিন—তারপর কত রাত পর্যন্ত মা সেলাইয়ের কলে বসে সেলাই করে—কষ্ট হয় না।'

মিনুর মুখের এই সামান্য কটি কথাতেই রায়বাহাদুর বিচলিত হয়ে ওঠেন। মিনুর দিক থেকে মুখটা ফিরিয়ে কোনওবকমে নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করে তিনি বলেন, 'তোমার মা সারাদিন—অনেক রাত পর্যন্ত সেলাই করেন, না?'

রায়বাহাদুরের চোখে জল এসে পড়ে। মিনু যাতে দেখতে না পায় সেজন্য তিনি তাকে কোলের মধ্যে টেনে নেন। মিনু আশ্চর্য হয়ে কথা পর্যন্ত বলতে পারে না। এমনিভাবে কিছুক্ষণ কাটবার পর রায়বাহাদুব বলেন, 'তুমি মাকে গিয়ে কোনও কথা বলো না কিন্তু। মা তাহলে বকবে হয়তো।'

মিনু আরও অবাক হয়ে যায়। চুপ করে কী যেন ভাবে, তারপর বলে, 'কিন্তু মাকে যে কোনও কথা লুকোতে নেই!'

রায়বাহাদুর যেন নিজের কাছে লজ্জিত হয়ে পড়ে বলেন, 'তাও তো বটে।'

মিনু খানিক চুপ করে থেকে যেন সব সমস্যার সমাধান করে ফেলে, বলে, 'আচ্ছা, দাদুকে খুঁজতে আসার কথা বলব না। বলব এক নতুন দাদুর সঙ্গে ভাব হয়েচে।'

রায়বাহাদুর আশ্বস্ত ভাবে বলেন, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ তাই বলবে। মাকে কিছু লুকোতে নেই।'

একটু পরেই তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি আবার আসবে? তোমার নতুন দাদুকে দেখতে আসবে তো?'

মিনু বলে, 'কী করে আসব! রোজ-রোজ আমায় স্কুলেব বাসে করে এখানে আসতে দেবে কেন? আজকের জন্যেই হয়তো কত বকুনি খেতে হবে।'

মিনুর কণ্ঠস্বর রীতিমতো ভারী হয়ে আসে।

রায়বাহাদুর বলেন, 'না, না, তোমায় বকুনি খেতে হবে না। তোমার জন্যে আমি যদি স্কুলে গাড়ি পাঠাই, তাহলে তুমি আসবে তো?'

মিনু কথাটা আদৌ বিশ্বাস করতে পারে না, তাই বলে, 'যাঃ, মিছে কথা। আমায় ঠাট্টা হচ্চে, না? কী করে তুমি গাড়ি পাঠাবে? কোথায় পাবে গাড়ি?'

'কোথায় পাব? তাই তো!' রায়বাহাদুর যেন মস্ত বড় সমস্যার মধ্যে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েন। তারপর হঠাৎ যেন সমস্যার সমাধান করে ফেলেচেন—এমনিভাবে বলেন, 'আচ্ছা তোমার দাদুর একটা মোটর তোমার জন্য পাঠিয়ে দিই যদি?'

'বারে! দাদুর মোটর তুমি কী করে পাঠাবে! দাদু জানতে পারলে তখন?' মিনু রীতিমতো জেরা শুরু করে দেয়।

রায়বাহাদুর তাকে আশ্বস্ত করেন, 'জানতে পারলে তো! তোমার দাদুকে জানতে দিচ্ছে কে?'

মিনু কিন্তু এতেও সন্তুষ্ট হয় না। গম্ভীর মুখে কী যেন ভাবে। তারপর বলে, 'না, তবু আমি দাদুর মোটরে চড়ব না। কেন চড়ব অমন খারাপ দাদুর মোটর!'

রায়বাহাদুর বলেন, 'আহা, দাদু অমন খারাপ বলেই তো তার মোটরে যত পারা যায় চড়ে নেবে। সে কিপটে বুড়োর ত্রিভুবনে কে আছে মোটর চড়বার! মোটরে মরচে ধরে যাচ্চে, তুমি চড়লে তার চোদ্দপুরুষ ধন্য হবে!'

লোকটার যুক্তি যেন মিনুর মনে লাগে! সে বলে, 'সত্যি তাহলে মোটর পাঠাবে? আচ্ছা, দেখব সত্যি না মিথ্যে!'

'আচ্ছা, এখনই দেখবে চল। তোমাকে মোটরে বাড়ি পৌঁছে দিক...'

মোটরে চড়বার এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে মিনু যেন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। তখুনি আবার কী ভেবে বলে, 'না, না, আজকে না...'

রায়বাহাদুর বলেন, 'তোমার কিছু ভাবনা নেই খুকুমণি। ড্রাইভার তোমাদের বাড়ি থেকে একটু দূরে চুপি-চুপি নামিয়ে দেবে। কেউ টেরও পাবে না। কেমন, রাজি তো?'

মিনু কী যেন ভাবতে-ভাবতে জবাব দেয়, 'আচ্ছা, কাল কিন্তু পাঠাতে হবে স্কুলে। দেখব তোমাব কথা ঠিক কি না।'

'আচ্ছা গো আচ্ছা!' রায়বাহাদুর হাসতে-হাসতে বলেন, 'তুমি দেখ, তোমার নতুন দাদুর কথা ঠিক কি-না।'

মিনুকে সঙ্গে নিয়ে তিনি এবার নিচে নেমে আসেন। তারপর ড্রাইভারকে ডেকে মিনুদের বাড়ির রাস্তাটা বুঝিয়ে দেন। উৎসাহ আর উত্তেজনায় বিহ্বল মিনু মোটরে উঠে বসে। কিন্তু আজ স্কুল বন্ধ হওয়ার পর থেকে যা ঘটেছে, তা যে সত্যি এটা যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না। মনে হয়, সে জেগে-জেগে স্বপ্ন দেখছে, আর মোটরটা তাদের বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছবার আগেই এ-স্বপ্ন ভেঙে যাবে।

রায়বাহাদুর নিজেই মোটরের দরজাটা বন্ধ করে দেন, তারপর বলেন, 'আচ্ছা, আবার কাল দেখা হবে দিদিমণি, কেমন?'

মিনু যেন স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো ঘাড় নেড়ে জবাব দেয়, 'আচ্ছা—'

মোটর চলতে শুরু করে, তারপর গেট পার হয়ে একেবারে রাস্তায় গিয়ে পড়ে। রায়বাহাদুর তারপরেও কতক্ষণ চুপ করে সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকেন। আশপাশ থেকে চাকর বেয়ারাগুলো বিস্ময়ে অবাক হয়ে তাঁর ভাবভঙ্গি লক্ষ করে।

বাড়ির মধ্যে ফিরে এসেই রায়বাহাদুর যে চাকরটাকে সামনে পান তাকেই ধমক দিয়ে ওঠেন, 'হতভাগা সব! এই আজ থেকে বলে রাখলাম, এই ছোট দিদিমণি যখন আসবে, তখন আমি হুজুর নই, সাহেব নই, কিছু নই—বুঝেছিস?'

চাকরটা হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থাকে, 'হাঁ কিম্বা না' কিছুই বলতে পারে না।

অদ্ভুত একটা উত্তেজনার মধ্যে মিনু সে রাতটা কাটায়—মাঝে-মাঝে মনে হয়, আজ বিকেলে স্কুল থেকে ফেরবার সময় যা ঘটেছে, তা সত্যি নয়, স্বপ্ন। দাদুর বাড়ির সেই লোকটা যদি সত্যিই তার স্কুলে তাকে আনবার জন্যে গাড়ি পাঠিয়ে দেয় তাহলে কী মজাই যে হবে, সে কথা ভাবতে-ভাবতে মিনু রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে ওঠে। কিছুতেই ঘুম আসতে চায়

না মিনুর চোখে, এক-একবার ভাবে মাকে ঘুম থেকে তুলে সব কথা বলে ফেলে। তখনই ভয় হয়, মা যদি রাগ করেন।

এমনি করেই মিনু কোনওরকমে রাতটা কাটায়।

তারপর স্কুলে।

সমস্তক্ষণ মিনু যে কী উত্তেজনার মধ্যে কাটায়, তা শুধু সেই জানে। তারপর এক সময় ছুটির ঘণ্টা বাজে। মেয়েদের দল একে-একে বাড়ি যাওয়ার জন্য স্কুল থেকে বার হয়। মিনু স্কুল থেকে বের হয় সকলের শেষে, পা যেন তার চলতে চায় না। দাদুর বাড়ির সেই লোকটা সত্যিই যদি গাড়ি না পাঠিয়ে থাকে?

বেলাদের দলই আগে বেরিয়েছিল এবং বেলার জন্যে তাদের বাড়ির ছোট্ট মোটরখানাও এসে দাঁড়িয়েছিল গেটের কাছেই। রানীদিও আসছিলেন তাদের সঙ্গে। বেলা মোটরে ওঠবার সময় রানীদির দিকে চেয়ে বলে, 'চলুন না দিদিমণি, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে যাব।'

রানীদি বেশ খুশি এবং গর্বিত হয়েই মোটরে উঠতে যাচ্ছিলেন, এমনসময় প্রকাণ্ড একটা 'ক্রাইসলার' গাড়ি এসে দাঁড়ায় সেইখানে। পাগড়ি পরা তকমা আঁটা ড্রাইভার গাড়িটা থামিয়ে দারোয়ানকে বলে, 'মিনু দিদিকো খবর দিজিয়ে, গাড়ি আয়া—'

মিনুদিদির জন্য গাড়ি! কে মিনু দিদি! দারোয়ান একটু আশ্চর্য হয়ে ড্রাইভারের দিকে তাকায়। রানীদিও যেন কথাটা বিশ্বাস করতে পারেন না, জিজ্ঞাসা করেন, 'কার গাড়ি বললে, মিনুর?'

ড্রাইভার রানীদিকে সেলাম করে জবাব দেয়, 'হাঁ মাইজি।'

রানীদি থেকে আরম্ভ করে বেলা পর্যন্ত কেউই যেন কথাটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না, এমনসময় সকলের পিছন থেকে মিনুকে এই দিকে আসতে দেখা যায়। তার দলের মেয়েগুলি উৎফুল্ল হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, 'মিনু-মিনু! তোর গাড়ি এসেচে, মস্ত বড় গাড়ি!'

গাড়ি এসেছে! উত্তেজিত মিনু দ্রুত পায়ে গেটের দিকে এগিয়ে আসে। সে গাড়ির কাছে পৌঁছুতেই ড্রাইভার রীতিমতো সম্ভ্রমের সঙ্গে সেলাম জানায়। তারপর খুলে দেয় গাড়িতে ওঠবার দরজাটা। মিনু হাসিমুখে গাড়িতে উঠে বসে।

রানীদি যেন নিজের চোখে দেখেও ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারেন না, হাঁ করে সেই দিকে চেয়ে থাকেন।

বেলা বলে, 'আসুন দিদিমণি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?'

'না, আজ থাক বেলা—।'

রানীদি হাঁটতে-হাঁটতেই বাড়ির দিকে পা বাড়ান।

রায়বাহাদুর যেন মিনুর অপেক্ষাতেই গাড়ি বারান্দার নিচে দাঁড়িয়েছিলেন, মোটরটা এসে দাঁড়াতে তিনি নিজেই ব্যস্ত হয়ে দরজাটা খুলে দেন।

মিনু মোটর থেকে নামতে-নামতে বলে, 'সত্যি-সত্যি মোটর আসবে আমি ভাবতে পারিনি।'

'আর তুমি সত্যি-সত্যি আসবে আমিও ভাবতে পারিনি। এস দিদি এস—'

মিনুর হাত ধরে তিনি ভিতরে নিয়ে যান, একেবারে তার ড্রইংরুমে। ঘরের মাঝখানে প্রকাণ্ড শ্বেতপাথরের টেবলটার ওপর বিলিতি চকোলেটের কয়েকটা বাক্স, কতকগুলো বড়

বড় পুতুল আর একরাশ ফুল। সেদিকে চেয়ে মিনুর যেন বিস্ময় আর আনন্দের অন্ত থাকে না। মিনুর আনন্দের ছোঁয়া লেগে যেন রায়বাহাদুরের মনেও খুশির জোয়ার লাগে।

মিনু বলে ওঠে, 'একী, এসব কোথা থেকে এল!'

বিস্ময়ের ভান করে রায়বাহাদুর বলেন, 'তাই তো, বুঝতে পারচি না তো! কাল রাত্রে কোনও পরী বোধহয় এখানে রেখে গেছে।'

মিনু কথাটা বিশ্বাস করে না, 'বলে, আহা পরীরা বুঝি চকোলেট খায়! পরীরা বুঝি এমনি বিলিতি পুতুল আনতে পারে?'

'পরীরা ইচ্ছা করলে সব পারে, এমন কী তোমার মতো ছোট্ট মেয়ে হয়েও আসতে পারে।' মিনুর মুখের দিকে চেয়ে রায়বাহাদুর হাসতে-হাসতে জিজ্ঞাসা করেন, 'আচ্ছা তুমি সত্যি পরী নও তো? আমার কিন্তু কেমন সন্দেহ হয় মাঝে-মাঝে।'

'বাঃ, ঠাট্টা হচ্ছে! সত্যি বল না এসব কার? কে এনেছে?' মিনু যেন আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারে না।

রায়বাহাদুর একটু চুপ করে থেকে বলেন, 'কে এনেছে বলতে পারি না; তবে এগুলো সব তোমার।'

'আমার!' মিনু যেন নিজের সৌভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারে না, বলে, 'না, না, আমার হবে কেন? আমি এসব নিয়ে কী করব?'

'এই বুড়ো নতুন দাদুকে খুশি করবে।'

'কিন্তু আমায় কি নিতে আছে? আমি কি এইজন্যেই এসেছি?'

'জানি, তুমি তোমার দাদুকে খুঁজতে এসেচ, কিন্তু সে তো আজও বাড়ি নেই।'

মিনু বোধহয় মনে-মনে কল্পনা করেছিল, তার সত্যিকার দাদুই তার জন্যে এসব এনে রেখেছে। তাই রীতিমতো ক্ষুণ্ণভাবে সে বলে, 'বাঃ, দাদু বুঝি কোনওদিনই বাড়ি থাকে না। আমি তা হলে আর আসব না।'

রায়বাহাদুর অভিমানের সুরে বলেন, 'তোমার সেই খারাপ, দুষ্টু দাদুই সব হল? আর আমি বুঝি কিছুই না।'

'বাঃ, আমি বুঝি তাই বলচি!' মিনু যেন একটু লজ্জিতভাবেই জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা, সত্যি তুমি এখানে কী কর? দাদু তোমার কে হন?'

রায়বাহাদুর একটু চুপ করে থেকে জবাব দেন, 'তোমার দাদু, তোমার দাদু আমার শত্তুর।'

'বাঃ, তাহলে তুমি এখানে থাক কেন?'

'থাকি কেন? থাকি একদিন যদি তোমার দাদুকে জব্দ করে শোধ নিতে পারি, সেই আশায়।'

মিনু হাসতে-হাসতে বলে, 'দাদুর সঙ্গে তুমি পারবে কেন? দাদু কত বড়লোক!'

মিনু মনে-মনে ভেবেছিল, লোকটি এবার নিশ্চয়ই ঘাবড়ে যাবে। কিন্তু সেরকম কোনও লক্ষণ দেখা যায় না। রায়বাহাদুর বলেন, 'হোক বড়লোক। তুমি যদি আমার দিকে থাক, তাহলে তোমার সে দাদুকে আর আমার সঙ্গে পারতে হয় না।'

'বারে! আমি থাকলে কী করে হবে! আমি তো এইটুকু ছোট্ট মেয়ে!'

মিনু কিছুই ঠিক বুঝতে পারে না, ব্যাপারটা তার পক্ষে যেন আরও ঘোরাল হয়ে ওঠে। মনে হয়, রাতদুপুরে হঠাৎ সে একটা আজবপুরীর মধ্যে ঢুকে পড়েছে, দেখা দিচ্ছে—রহস্যের পর রহস্য, আর কোনওটার কিনারা করা যাচ্ছে না।

অন্যমনস্কের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে মিনু বলে ওঠে, 'ওই যাঃ, ভুলে একটা চকোলেট খেয়ে ফেলেছি!'

রায়বাহাদুর মুখখানা যথাসম্ভব গম্ভীর করবার চেষ্টা করে বলেন, 'তাইতো, ভারি অন্যায় করে ফেলেছ! তাহলে এবার জেনে শুনেই সবগুলো খেয়ে ফেল, আর যা খেতে পারবে না তা বাড়ি নিয়ে যাও—'

মিনুর সব দুশ্চিন্তা যেন হালকা মেঘের মতো এক নিমেষে কোথায় ভেসে যায়। চকোলেটের বাক্সগুলোর দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে সে বলে, 'তুমি যদি আমার সত্যি দাদু হতে তা হলে কিন্তু বেশ হতো!'

'তেমন ভাগ্য কি আর করেছি!' রায়বাহাদুরের গলাটা হঠাৎ কেন ধরে যায় কে জানে। মুখটা তিনি মিনুর দিক থেকে ফিরিয়ে নেন।

একটু চুপ করে থেকে রায়বাহাদুর আবার বলেন, 'আর আমি তোমার সত্যি দাদু হলে, তোমার মা হয়তো খুশি হতেন না!'

কথা বলতে-বলতে রায়বাহাদুরের কণ্ঠস্বর আরও ভারী হয়ে যায়। মিনু বলে, 'বাঃ, মা কেন খুশি হবেন না। মা কত ভালো তুমি জানো না।'

'তা জানি না বটে! তোমার মার সঙ্গে তো আর দেখা হল না'—রায়বাহাদুর একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করে ফেলেন।

'কী করে হবে, মা তো আর এখানে আসবে না,' মিনু খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবে। তারপর হঠাৎ রায়বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা মাকে দেখবে?'

রায়বাহাদুর ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানান।

মিনু বলে, 'তাহলে কিন্তু টিকিট কিনতে হবে।'

'টিকিট কিনতে হবে—মাকে দেখতে।' রায়বাহাদুর রীতিমতো অবাক!

মিনু ঘাড় নেড়ে বলে, 'আহা মাকে দেখতে কেন! তোমার একটুও বুদ্ধি নেই! আমাদের স্কুলে একটা চ্যারিটি শো হচ্চে, তারই টিকিট। মা দেখতে যাবেন কি না। তুমিও যাবে!'

কথাগুলো বলতে-বলতেই কী যেন একটা মিনুর মনে পড়ে যায়। মুখখানা রীতিমতো গম্ভীর করে সে বলে, 'নাঃ, সে-ও তো হবে না।'

'কেন বলত?' রায়বাহাদুর রীতিমতো কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করেন।

'দিদিমণি বলেছেন, কুড়ি টাকার টিকিট বিক্রি না করতে, পারলে আমার পার্ট দেবেন না। অত টিকিট আমি কী করে বিক্রি করব! মা'র তো যাওয়াই হবে না।'

আশাভঙ্গের ব্যথায় মিনুর চোখদুটি ছল-ছল করে।

রায়বাহাদুর বলেন, 'বল কী এই কটা টিকিট বিক্রির জন্যে আবায় ভাবনা! আমার যত চেনা লোক আছে, তারা সবাই এইরকম চ্যারিটি শো দেখবার জন্যে পাগল। টিকিট কোথাও বিক্রি হচ্ছে একবার জানতে পারলে আর রক্ষা নেই।'

মিনু যেন তবু বিশ্বাস করতে পারে না; বলে, 'এরা দশ আর দশ-কুড়ি টাকার টিকিট কিনবে।'

'কিনবে মানে, লুফে নেবে! দশ আর দশ কুড়ি টাকা কেন? কুড়ি আর কুড়ি চল্লিশ—'

রায়বাহাদুর নিজেই যেন উৎসাহে খাড়া হয়ে ওঠেন।

মিনুর উৎসাহের অন্ত থাকে না। টিকিট বিক্রির খাতাখানা তাড়াতাড়ি বার করে

সে বলে, এই যে টিকিট বিক্রির খাতা, তুমি তাহলে ক'খানা বিক্রি করে দেবে বলো?

মিনুর হাত থেকে খাতাখানি নিয়ে রায়বাহাদুর নিজের পকেটে পুরে ফেলেন।

মিনু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'ও কী..'

রায়বাহাদুর বলেন, 'সব ক'খানাই আমার রইল।'

'সব ক'খানা!' মিনুর চোখ বিস্ময়ে বড় হয়ে ওঠে।

'ও যে অনেক টাকার টিকিট?'

রায়বাহাদুর একটু চুপ করে থাকেন, তারপর হাসতে-হাসতে বলেন, 'তুমি পার্ট করবে, তোমার মা দেখতে আসবেন, তার টিকিটের দাম কি টাকায় হয়!'

'সত্যি ওরা এমন অবাক হবে! শো কবে জানত, এই দশ তারিখে। ভুলো না যেন।'

মিনু যেন খুশি আর চেপে রাখতে পারে না।

রায়বাহাদুর বলেন, 'ও তারিখ কি আর ভোলা যায়?'

অবশেষে একদিন সেই তারিখটি এসে পড়ে—মিনু যে তারিখটির কল্পনায় ক'দিন রাত্রিতে ভালো করে ঘুমোতে পারেনি, আর সুমিত্রা দশ তারিখের প্রতিক্ষায় দীর্ঘ দশবছর ধরে মনে-মনে দিন গুণছে।

রান্নার পালাটা কোনওরকমে চুকিয়ে ফেলেই সুমিত্রা হরিহরকে বলে, 'মিনুকে এখুনি স্কুলে পাঠিয়ে দিচ্ছি হরিকাকা. ও যেন কিছু বুঝতে না পারে—'

হরিহরের কথাটা ভালো লাগে না। তাই কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বলেন, 'কিন্তু...ওকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে গেলে হতো না? আজকের এমন দিনে মিনু সঙ্গে থাকবে না. এ আমার ভালো লাগচে না। এই এক রত্তি মেয়ে কি-ই বা বুঝবে?'

সুমিত্রা বলে, 'তুমি বুঝতে পারচ না, হরিকাকা। ওই একরত্তি মেয়ে আজ কিছু বুঝতে না পারুক, ওর মনে আজকের ছবি ছাপা হয়ে থাকবে। সেটুকুও আমি চাই না।'

সুমিত্রার মুখে সকাল-সকাল স্কুলে যাওয়ার কথা শুনে মিনু কিন্তু একেবারে বেঁকে দাঁড়ায়।

'এত সকাল-সকাল আমি কিন্তু মা স্কুলে যাব না।'

সুমিত্রা বলে, 'তাতে কী হয়েচে মা। আজ তোমাদের প্লে—সকাল-সকাল একটু যেতেই হয়।'

মায়ের মুখের দিকে চেয়ে আসল কথাটা মিনু কল্পনাই করতে পারে না। বলে, 'বাঃ, এত সকাল-সকাল গেলে সবাই ভাববে, ভারি একটু ভালো নাচের পার্ট পেয়েছে কি-না; তাই একেবারে আদেখলা মতো দরজা খুলতে-না-খুলতে স্কুলে ছুটে এসেচে—'

'না, মা, তা ভাববে কেন? বরং সবাই প্রশংসা করবে। ভাববে ভালো পার্ট পেয়ে ভালো করবার আগ্রহ তাই—'

মিনু এবার কতকটা নরম হয়ে বলে, 'বেশ তা হলে তোমরাও চল এখন।'

'আমরা যাব—নিশ্চয়ই যাব, এই একটু বাদেই যাব।' বিব্রত ভাবটা লুকোবার জন্যে সুমিত্রা তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'আয় দেখি তোর চুলটা ঠিক করে দিই আয় একবার।'

মিনু সুমিত্রার কাছে এসে দাঁড়ায়। চুলটা ওর ঠিকই ছিল, তবু চিরুণী নিয়ে সুমিত্রাকে একটু রকমফের করতে হয়—আর চোখের জলটাকে কত কষ্টে চেপে রাখতে হয় তা শুধু সেই জানে।

হরিহর যেন ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি মিনুকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার সেই নতুন দাদু আসবে তো, মিনু দিদি?'

'নিশ্চয় আসবে'—মিনু একটু গর্বিত ভাবে জবাবটা দেয়। হরিহর বলেন, 'তা হলে তো আমাদের না গেলেও চলবে?'

মিনু সজোরে ঘাড় নেড়ে বলে ওঠে, 'বাঃ, তা কী করে হবে? নতুন দাদু তোমাদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই আসবে। তোমরা ঠিক যাবে তো মা?'

সুমিত্রা বলে, 'যাব রে যাব।'

হঠাৎ ক্যালেন্ডারের পাতাটার ওপর মিনুর চোখ পড়ে—আজকের তারিখটার ওপর পেন্সিলের একটা মোটা দাগ কাটা!

মিনু তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করে, 'তারিখটায় দাগ দিয়েচ কেন মা?'

বিব্রত সুমিত্রা কী যে বলবে ঠিক করতে পারে না।

'আজ তোমাদের নাচের দিন কি না, দিদি—তাই পাছে ভুলে যায় বলে মা দাগ দিয়ে রেখেচে'—হরিহর বলে ওঠেন।

তার নাচ দেখবার জন্য মার এতখানি আগ্রহের পরিচয় পেয়ে মিনু খুশি হয়ে ওঠে।

'ওঃ, তাই বুঝি? তা হলে আমি যাই মা।'

'চল হরিদা—'

'চল দিদি—'

হরিহর মিনুর সঙ্গে যাওয়ার উপক্রম করতেই সুমিত্রা বলে, 'তুমি ওকে স্কুলে পৌঁছে দিয়েই চলে এস, হরিকাকা। সময় আর বেশি নেই—'

হরিহর এগিয়ে যেতে-যেতে বলেন, 'সে আর আমায় বলতে হবে না।'

মিনুর চলে যাওয়ার পর সুমিত্রা কতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আজ শিশিরের জেলে থেকে খালাস হওয়ার দিন—হরিহর দিন পনেরো আগেই খবর নিয়ে এসেছিলেন। সুমিত্রা তখনই ক্যালেন্ডারের পাতায় দাগ দিয়ে রেখেছে; কিন্তু মিনুকে সেকথা বলতে পারেনি, ইচ্ছা করেই বলেনি। কারণ, শিশিরকে খুনের দায়ে জেল খাটতে হয়েছে এ-কথাটা সে কিছুতেই জানতে দেবে না। সুমিত্রা জানে, কুচক্রীদের ষড়যন্ত্র শিশিরকে এই দীর্ঘ দশবছর দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়েছে, কিন্তু সে কথা মিনু বুঝবে কী করে?

মিনুকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এসেই হরিহর সুমিত্রাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন—জেল ফটকে উপস্থিত থাকবার জন্যে।

ফটকের একটু দূরে ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়িটাকে দাঁড় করিয়ে রেখে হরিহর একেবারে ফটকের সামনে গিয়ে দাঁড়ান; সুমিত্রা বসে থাকে গাড়ির মধ্যে—জেল ফটকের দিকে চেয়ে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না। খানিক পরেই শিশির ফটকের বাইরে এসে দাঁড়ায়; হরিহর তাকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যান—ভাড়াটে গাড়িটার দিকে।

সুমিত্রার মুখের দিকে চেয়ে শিশিরের মুখে দশ বছর পরে আবার হাসি ফুটে ওঠে, আর সুমিত্রা দশ বছর ধরে যে চোখের জল লুকিয়ে রেখেছিল, তা আর কোনও বাধাই মানতে চায় না!

কিছুক্ষণ কেউ কোনও কথাই বলতে পারে না, দুজনে শুধু দুজনের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

হরিহর বলে ওঠেন, 'এখানে সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকলেই চলবে? ওদিকে আবার মিনুদির স্কুলে নাচ-গান দেখতে যেতে হবে—সে খেয়াল আছে?'

'মিনুর স্কুলের নাচ-গান। সে আবার কী?' শিশির যেন কিছু বুঝতেই পারে না।

হরিহর বলেন, 'সে মস্ত ব্যাপার! চল বাড়ি হয়ে আমরা স্কুলেই যাব। সেইখানেই তার সঙ্গে দেখা হবে।'

বাড়ি হয়ে জামা-কাপড় বদলে মিনুদের স্কুলে পৌঁছতে ওদের খুব বেশি দেরি হল না। হরিহর সেই ভাড়াটে গাড়িটাকেই দাঁড় করিয়ে রেখে তাতেই সুমিত্রা আর শিশিরকে স্কুলে নিয়ে গেলেন।

অভিনয় তখন শুরু হয়ে গেছে। খানিক পরেই এল মিনুর নাচের দৃশ্য। সঙ্গে ছোট মেয়েদের গান। নাচ আর গান শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই যবনিকা পড়ল, আর চারিদিক মুখর হয়ে উঠল করতালি আর আনন্দ কলরবে। তারই মাঝখানে শিশির বলে ওঠে, 'আমি, আমি তোমায় সত্যি কথা বলব সুমিত্রা? আমি এখনও সব বিশ্বাস করতে পারচি না।'

একটু চুপ করে থেকে সে আবার বলে, 'আচ্ছা, মিনু এসে কী ভাববে বল তো? তাকে কিছু বলোনি তো?'

সুমিত্রা বলে, 'না, না, আজ তুমি আসবে তা কিছু বলিনি।'

হরিহর বলেন, 'জানলে মিনুদিদি বোধহয় স্কুলের নাচেও আসত না।'

খানিক পরেই মিনু এসে পৌঁছয় মা'র কাছে—প্রায় ছুটতে-ছুটতে। তারপর সুমিত্রার গলা জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করে, 'খারাপ হয়নি তো মা?'

সুমিত্রা কোনও জবাব দেওয়ার আগেই হরিহরের দিকে চেয়ে বলে, 'বলো না হরি-দা, খারাপ হয়েচে?'

হরিহর গম্ভীর মুখে বলেন, 'খারাপ তো হয়েইচে, নইলে সবাই এত হাততালি দেয়।'

শিশিব এতক্ষণ স্নেহমুগ্ধ চোখে চেয়েছিল মিনুর মুখের দিকে। হরিহর তার দিকে চেয়ে মিনুকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কে বলো তো মিনু-দি?'

মিনু এতক্ষণে শিশিরের দিকে চাইবার অবকাশ পায়। কিন্তু সেদিকে চেয়ে হঠাৎ যেন আর কথাই বলতে পারে না!

সুমিত্রা বলে, 'চিনতে পারছ না, মিনু?'

বিস্ময় আর আনন্দে বিহ্বল মিনু কোনওরকমে বলতে পারে, 'পেরেছি!' একটু চুপ কবে বলে, 'বাবা! নয় মা?'

শিশির সস্নেহে মিনুকে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে বলে, 'কী করে চিনলে বল তো?'

'বাঃ, ফটো আছে যে।'

আনন্দে আর পরিতৃপ্তিতে শিশিরের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, সঙ্গে-সঙ্গে সুমিত্রারও। হরিহর বলেন, 'মিনুদিদিকে ফাঁকি দেওয়া অত সোজা নয়।'

সুমিত্রার দিকে চেয়ে মিনু জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি তো আগে বলোনি মা। তুমি বুঝি জানতেও না, বাবা আজ আসবে?'

সুমিত্রা হাসি চাপতে-চাপতে জবাব দেয়, 'কই আর জানতাম!'

মিনু একটু চুপ করে থেকে বলে, 'আমার নতুন দাদুর সঙ্গে ভাব করবে না মা? নতুন দাদু এসেচে যে।'

'নতুন দাদু! সে আবার কে?' বিস্মিত শিশির জানতে চায়।

জবাবটা দেয় হরিহর। 'সে আমাদের মিনুদির এক নতুন বন্ধু। রাস্তায় কেমন করে আলাপ হয়েছে। এখন আমাদের চেয়ে সেই মিনুদির অনেক বেশি আপনার লোক!'

হরিহর হেসে ওঠেন, সুমিত্রাও সে হাসিতে যোগ দেয়।

মিনু বলে, 'হরিদার যত বাজে কথা! নতুন দাদুকে আনব মা? আনব বাবা এখানে?'

শিশির বলে, 'নিশ্চয়ই আনবে! কই, কোথায় তিনি?'

সুমিত্রা মিনুর মুখে নতুন দাদুর কথা অনেক শুনেছে, কিন্তু সত্যি তিনি যে কে, তা অনুমান করতে পারেনি। শিশিরের সঙ্গে সে-ও উৎসুক হয়ে মিনুর মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

শিশির, সুমিত্রা, হরিহর যেখানটায় বসেছিল, তার ঠিক বিপরীত দিকের একটা আসনে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসেছিলেন। সেইদিকে আঙুল দেখিয়ে মিনু বলে ওঠে, 'ওই যে ওই—'

শিশির, সুমিত্রা আর হরিহর সেইদিকে চেয়ে দেখে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়; মিনুর নতুন দাদু আর কেউ নয়—স্বয়ং রায়বাহাদুর চুনিলাল চৌধুরী। মাথার চুলগুলি তাঁর সাদা হয়ে গিয়েছে, রুপোবাঁধানো লাঠিটার ওপর ভর দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে সাগ্রহে তিনি তাদের দিকেই চেয়ে আছেন! তাঁব সেই সাগ্রহ দৃষ্টিতে কী কাতর, করুণ ব্যাকুলতা।

তিনি যেন নিঃশব্দে সকলের কাছে ক্ষমা চাইছেন।

মিনু আশা কবছিল, দাদুকে দেখিয়ে দেওয়ার পর, এরা সবাই এগিয়ে যাবে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে, কিন্তু সেরকম কিছু ঘটল না। তার বদলে শিশিরের মুখটা এমনি অস্বাভাবিক কঠিন হয়ে ওঠে যে, মিনু রীতিমতো শঙ্কিত হয়ে ওঠে।

শিশির চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সুমিত্রার দিকে চেয়ে বলে, 'এসো।'

সুমিত্রা নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ায়, সঙ্গে-সঙ্গে হরিহরও।

মিনু কিছুই বুঝতে পাবে না। অসহায়ভাবে সুমিত্রার মুখের দিকে চেয়ে বলে, 'চলে যাচ্ছ কেন, মা? নতুন দাদুর সঙ্গে দেখা করবে না? তাঁর সঙ্গে কথা বলবে না?'

সুমিত্রা কোনও জবাব দেওয়ার আগেই শিশির বলে, 'না, আমাদের এখন যেতে হবে।'

'যেতে হবে কেন?' মিনু বলে, 'নতুন দাদু যে তোমাদের সঙ্গে ভাব করতেই এসেছে। আমি যে আসতে বলেছি—'

হরিহর বলেন, 'ও তোমার নতুন দাদু নয়, ওই তোমার সত্যিকার দাদামশাই।'

'সত্যিকারের দাদামশাই?'

বিস্ময়ে মিনু যেন কথা বলতে ভুলে যায়...'কিন্তু আমি যে...'

সুমিত্রা এবার মিনুব একটা হাত ধরে ফেলে দৃঢ়পদে শিশিরের সঙ্গে এগিয়ে যায়। আর মিনু হল থেকে বেবিয়ে যাওয়ার আগে করুণভাবে একবার মুখের দিকে চেয়ে নেয়।

রায়বাহাদুরের মনে হয় তার চোখের সামনে অন্ধকার একটা পরদা নেমে আসছে, আর শরীরের সেই পুরোনো যন্ত্রণাটা আবার যেন চাড়া দিয়ে উঠছে।

কয়েকদিন পরের কথা।

এই ক'দিন সুমিত্রা, শিশির আর হরিহরকে বিশেষ ব্যস্ত থাকতে হয়েছে—কলকাতা ছেড়ে বাইরে যাওয়ার উদ্যোগ-আয়োজন করতে। বাংলাদেশে শিশির আর থাকবে না, পশ্চিমে কোথাও গিয়ে প্র্যাকটিস করবে। হরিহর তো ক'দিন নিশ্বাস ফেলবার অবকাশ পাননি বললেই হয়। এদিকে সুমিত্রা আর শিশির নতুন গৃহস্থালি গড়ে তোলবার জন্য বসে-বসে বুনছে—কল্পনার জাল। চারিদিকের এই উৎসাহ-উত্তেজনার মধ্যে শুধু মিনুর মুখেই হাসি নেই। এই ক'টা দিনের মধ্যেই যেন তার বয়স অনেকখানি বেড়ে গেছে।

সেদিন সকালে মিনু চুপ করে সুমিত্রার ঘরের ভাঙা তক্তপোশটার ওপর বসেছিল। সুমিত্রা এসে খানিক তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, 'আজ একবার স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে আসবে, মিনু? যাও না হরিদার সঙ্গে—'

'না, মা, দরকার নেই।'

মিনু তক্তপোশ থেকে উঠে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। সুমিত্রা শিশিরের কাছে গিয়ে বলে, 'আমার সত্যি ওর জন্য ভাবনা হচ্ছে, এমন মন-মরা ও কখনও ছিল না।'

'পুরোনো জায়গা ছেড়ে যেতে হলে সকলেরই হয় ওরকম। নতুন জায়গায় গেলেই বোধহয় ঠিক হয়ে যাবে।' বলে শিশির একটা সিগারেট ধরায়।

সুমিত্রা একটু ইতস্তত করে বলে, 'আমার কিন্তু মনে হয়, ও যেন কী একটা ভাবচে!

সুমিত্রার মুখের দিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে নিয়ে শিশির বলে, 'যা ভাবচে তা হওয়ার নয় সুমিত্রা।'

শিশির আর সেখানে দাঁড়ায় না।

সুমিত্রা মিনিটখানেক স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে থেকে যেন নিজেব মনেই বলে, 'আমি জানি!'

পশ্চিমে যাওয়ার উদ্যোগপর্ব হিসেবে হরিহর গিয়েছিলেন কতকগুলো জিনিসপত্র কিনতে। ফিরে এসে দেখেন ঘবের বাইরের দাওয়ায় মিনু বসে আছে একা, গালে হাত দিয়ে। তার দু-চোখে যেন যত রাজ্যের দুশ্চিন্তা।

হরিহর জিজ্ঞাসা করেন, 'মিনু-দি এমন করে এখানে বসে যে?'

মিনু বলে, 'এমনি।'

খানিক চুপ করে থেকে সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা কবে, 'আচ্ছা, হরিদা, আমরা কি অনেক দূর চলে যাব?'

হরিহর বলেন, 'হ্যাঁ দিদি, সে চমৎকার জায়গা। সেখানে তোমার বাবা কাজ করবেন কি-না—সেখানেই ডাক্তারি করবেন।'

এ খবর শুনেও কিন্তু মিনুর খুশি হওয়ার কোনও লক্ষণ দেখা যায় না। খানিক চুপ করে থেকে সে আবার জিজ্ঞাসা করে, 'আর আমরা আসব না?'

'না দিদি, আর এ হতভাগা দেশে আসব না।'

হরিহরের ভাবটা রাগ না অভিমানের তা ঠিক বোঝা যায় না। মিনু আর কোনও কথাই বলে না। কিন্তু তার চোখ দুটি জলে ভরে উঠেছে—সেটুকু হরিহর তাঁর ঝাপসা চোখের দৃষ্টি দিয়েও বুঝতে পারেন। মিনুর দুঃখটা কোথায় তা যেন তাঁর কাছে লুকোন থাকে না। আর কথা না বাড়িয়ে তিনি একটু বিব্রতভাবেই ভিতরেব দিকে পা বাড়িয়ে দেন।

মিনু আবার তেমনি করে বসে-বসে ভাবে।

আজ ক'দিন দাদুর সঙ্গে তার দেখা হয় না। ঠিক ক'দিন হল?

....পাঁচ, ছয়, সাত, আট দিন। বাবা ফিরে আসবার আগে সে রোজ একবার দাদুর কাছে যেত। এখন তিনি কী ভাবছেন কে জানে? হয়তো ভাবছেন বাবাকে পেয়ে মেয়েটা একেবারেই ভুলে গেল আমায়? হলেই বা তিনি সত্যিকারের দাদু, তিনি তার সঙ্গে একদিনও একটুও খারাপ ব্যবহার করেননি। তবে? বাবা আর মা-র সঙ্গে কী নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল তা সে জানে না, কিন্তু সেদিন অমনি করে চলে আসা কি বাবার ভালো হয়েছিল? তিনি নিশ্চয়ই খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। হয়তো মনে-মনে ভেবেছিলেন, মেয়েটা তাঁকে অপমান করবার জন্যেই বাবা আর মাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল।

ছিঃ-ছিঃ, কী লজ্জার কথা! দাদুর মনে এত বড় ভুল ধারণা থাকা কিছুতেই উচিত নয়। এখুনি ভেঙে দেওয়া দরকার...

মিনুর আর কিছু ভাববার দরকার হয় না। এদিক-ওদিক চাইতে-চাইতে সে সন্তর্পণে উঠে দাঁড়ায়। তারপর এক দৌড়ে গলিটা পার হয়ে ছুট...ছুট...

রাস্তায় ট্রাম-বাস, গাড়ি ঘোড়া, মোটর, রিক্সার ভিড়—

লোকজনের অবিরাম যাতায়াত, কিন্তু সেসব দিকে কোনওরকম ভ্রূক্ষেপ না করেই মিনু ছুটতে-ছুটতে এসে পৌঁছায় একেবারে রায়বাহাদুরের বাড়ির দরজায়।

বাড়ির মধ্যে ঢুকে কিন্তু কী এক আশঙ্কায় মিনুর বুকের ভিতরটা ঢিপ-ঢিপ করতে থাকে। অন্যদিন নিচের তলায় এইখানটায় চাকর-খানসামাদের জটলা বসে, আজ কিন্তু কোনওদিকেই কাউকে দেখা যায় না।

মিনু কী করবে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তাই ভাবছে, এমন সময় একটা চাকরকে সেদিকেই আসতে দেখা যায়। মিনু প্রায় হাঁপাতে-হাঁপাতে জিজ্ঞাসা করে, 'দাদু, নতুন দাদু কোথায়?'

চাকরটা বলে, 'তাঁর তো অসুখ...'

'অসুখ, দাদুর অসুখ!' মিনু ঠিক বুঝতে পেরেছিল, তা নইলে তার মন এত খারাপ হয়েছিল কেন?

মিনু চাকরকে প্রায় অনুনয়ের সুরে বলে, 'দাদু কোথায়, আমায় দেখিয়ে দাও না।'

চাকরটা মিনুকে সঙ্গে করে সরকাবের কাছে নিয়ে যায়। সরকার মুখ গম্ভীর করে বলেন, 'তাঁর ভয়ানক অসুখ। কারও সেখানে যাওয়ার হুকুম নেই।'

কিন্তু মিনু সে হুকুম মানতে নারাজ। সে বলে, 'তা হোক। আমি যাবই।'

অগত্যা সরকার মিনুকে রায়বাহাদুরের ঘরের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যান।

রায়বাহাদুর তখন খাটের ওপব যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। তিনি শুয়ে আছেন, কিন্তু মাথার দিকটা পরপর কয়েকটা বালিশ দিয়ে উঁচু করে রাখা হয়েছে। নার্স শিশি থেকে গ্লাসে ওষুধ ঢেলে তাঁর মুখের কাছে ধরে আছে, কিন্তু রায়বাহাদুর বিরক্তভাবে মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে বলছেন, 'না, না, ওষুধ আমার দরকার নেই। তুমি যাও...'

রায়বাহাদুরের পুরোনো চাকরটা গরমজলের ব্যাগটা সেঁক দেওয়ার জন্য তাঁর কাছে নিয়ে যেতেই রায়বাহাদুর সেটা তার হাত থেকে নিয়ে মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে ওঠেন, 'বলচি তোমরা এখান থেকে যাও, আমায় কারও কোনও সেবা করতে হবে না।'

মিনু মিনিটখানেক দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে চোখের জল আর চেপে রাখতে পারে না। ঘরের ভিতর পা দিয়েই ডেকে ওঠে, 'দাদু...'

বিস্মিত বিহ্বল রায়বাহাদুরের মুখের ভাবটা আশ্চর্য রকম বদলে যায়। তিনি সোজা হয়ে উঠে বসবার চেষ্টা করতেই নার্স তাঁকে ধরে ফেলে।

মিনু এবার ঝাঁপিয়ে পড়ে একেবারে রায়বাহাদুরের বিছানার ওপর।

'দাদু...তোমার খুব কষ্ট হচ্চে দাদু? আমি হাত বুলিয়ে দেব?'

'না দিদি, তুমি এসেছ, আর তো কোনও কষ্ট নেই!' কোনওরকমে চোখের জল সামলে রায়বাহাদুর জিজ্ঞাসা করেন, 'কিন্তু তুমি কেমন করে এলে দিদি? কে তোমায় নিয়ে এল?'

'আমি নিজে একলা এসেচি!'

'একলা এসেছ? সে কি দিদি—মা বাবাকে না বলে?'

'নইলে তারা যে আসতে দিত না। আমরা যে অনেক দূরে এখান থেকে চলে যাচ্চি,

না এলে তোমায় যে দেখতে পেতাম না।'

'তাই তুমি পালিয়ে আমায় দেখতে এসেছ? এই পাষণ্ড বুড়োর ওপর তোমার এত টান?'

মিনু একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করে, 'কেন তোমার ওপর সকলের এত রাগ দাদু? কেন বাবা-মা তোমার সঙ্গে ভাব করতে চান না?'

রায়বাহাদুর একটু ম্লান হেসে জবাব দেন, 'আমি ভারি খারাপ লোক দিদি।'

মিনু সজোরে ঘাড় নেড়ে বলে, 'কই না তো। তুমি তো খুব ভালো।'

'না, দিদি না, তুই জানিস না, আমি খুব খারাপ।'

রায়বাহাদুরের মুখে আবার তেমনি ম্লান হাসি ফুটে ওঠে।

এদিকে ঘণ্টাখানেক খোঁজাখুঁজির পর মেয়ের কোনও সন্ধান না পেয়ে সুমিত্রা রীতিমতো অস্থির হয়ে ওঠে।

হরিহর শুধু হেসে বলেন, 'ভাববার কিছু নেই, ঠিক জায়গায় আছে।'

কথাটা অনুমান ক'রে নিতে শিশিরের খুব বেশি সময় লাগে না।

সে উঠে দাঁড়িয়ে জামা পরতে শুরু করে।

সুমিত্রা বলে, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'রায়বাহাদুরের বাড়ি।'

'কেন?'

'মিনুকে ফিরিয়ে আনতে।'

সুমিত্রা একবার ভাবে শিশিরকে মানা করবে, কিন্তু তার কঠিন মুখের দিকে চেয়ে কোনও কথাই বলতে পারে না। যে মানুষ কোনওদিন অসত্য আর অন্যায়ের সঙ্গে রফা করে চলতে শেখেনি তাকে সে নিষেধ করবে কী করে?

খানিক চুপ করে থেকে সুমিত্রা বলে, 'চলো আমিও যাব।'

মিনুর সঙ্গে তখন রায়বাহাদুরেব অনর্গল আলাপ চলেছে।

'আচ্ছা দাদু, তুমি কী করে খারাপ হলে বলো না? তুমি বুঝি বড্ড রাগী?'

'হ্যাঁ দিদি, বড্ড রাগী। ছেলেবেলা থেকে কিছুতেই ওটাকে সামলে উঠতে পারিনি।'

মিনু একটু চুপ করে থেকে বলে, 'আমি কিন্তু তোমায় ঠান্ডা করে রাখতে পারি দাদু।'

'কী করে বলো তো দিদি?'

'গল্প বলে, রূপকথা শুনিয়ে। তুমি দুধকুমারের গল্প শুনেছ দাদু, খুব ভালো গল্প। হাড়ের পাহাড়, কড়ির পাহাড়—'

রায়বাহাদুর কোনও কথা বলবার আগেই বাইরে থেকে শিশিরের কণ্ঠ শোনা যায়, 'মিনু।'

মিনুর মুখ মুহূর্তের মধ্যে ছাইয়ের মতো বিবর্ণ হয়ে যায়!

শিশির এসে ঘরে ঢোকে, পিছনে সুমিত্রা। রায়বাহাদুরের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই শিশির বলে ওঠে, 'মিনু এসো—'

মিনু ভয়ে-ভয়ে খাট থেকে নেমে অসহায় ভাবে শিশির আর সুমিত্রার মুখের দিকে তাকায় কিন্তু তারা দুজনেই নির্বাক, নিশ্চল। মিনু এবার ফিরে তাকায় দাদুর দিকে। তাঁর তরফ থেকেও কোনও সাড়া পাওয়া যায় না। মিনিটখানেক সেই প্রকাণ্ড ঘরখানার মধ্যে

শুধু দেওয়াল ঘড়ির টিকটিক শব্দ? তারপর মিনু বলে, 'দাদুর যে বড্ড অসুখ বাবা।'

চোখের জল সে চেপে রাখতে পারে না।

শিশির এবার রায়বাহাদুরের খাটের দিকে আর খানিকটা এগিয়ে এসে বলে, 'তুমি চলে এসো এখুনি।'

বাবার ওপর মিনুর ভীষণ রাগ হয়, কিন্তু তাঁর কথা অমান্য করবার সাহসও খুঁজে পায় না। শেষপর্যন্ত রায়বাহাদুরের দিকে অসহায় ভাবে চেয়ে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

রায়বাহাদুর বলেন, 'না, লক্ষ্মী দিদি তুমি যাও। বাবা-মার কথা শুনতে হয়।'

মিনু মনে-মনে আশা করছিল, রায়বাহাদুর তাকে ধরে রাখবার জন্য কিছু অন্তত বলবেন। কিন্তু সেরকম কিছু না ঘটায় মিনু যে কী করবে তাই ঠিক করতে পারে না। খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকার পর আবার সে খাটের ওপর উঠে দাদুর কোল ঘেঁষে বসে পড়ে। তারপর বলে, 'তোমার যে বড্ড কষ্ট হচ্চে দাদু, আমার যেতে ইচ্ছে করচে না!'

মিনুর এতখানি কাতরতাও বোধহয় শিশিরের অন্তর স্পর্শ করে না! মিনুর ওপর জোর করে বেশি বোধহয় সেইটাই পরীক্ষা করবার জন্য জিজ্ঞাসা করে, 'তোমায় কি তা হলে এইখানেই রেখে যাব মিনু?'

মিনু অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে বলে ওঠে, 'কেন তোমরা দাদুর ওপর এত নিষ্ঠুর! দাদু তো খারাপ নয়, দাদু আমাকে এত ভালোবাসেন, তোমাদেরও কত ভালোবাসেন, তবু তোমরা তাঁকে এত অসুখের মধ্যে ফেলে চলে যাচ্চ? আমরা চলে গেলে দাদুকে কে দেখবে?'

শিশির মিনুর কথার কী উত্তর দেবে হঠাৎ ঠিক করতে পারে না।

মিনু খাট থেকে নেমে এবার সোজা শিশিরের কাছে এসে দাঁড়ায়। তারপর কোথা থেকে সাহস খুঁজে পায় কে জানে, তার মুখের দিকে চেয়ে বলে, 'তুমি দাদুর অসুখ সারিয়ে দাও বাবা, দাদুর বড্ড কষ্ট হচ্চে...।'

শিশির কোনও কথাই বলতে পারে না, শুধু তার মনের মধ্যে এলোমেলো কতকগুলি প্রশ্ন জট পাকিয়ে ওঠে। আত্মীয় হিসেবে, মানুষ হিসেবে লোকটির প্রতি তার কোনওরকম দুর্বলতা এবং শ্রদ্ধা নেই একথা সত্যি, কিন্তু সে লোকটা অসহ্য রোগ-যন্ত্রণায় বিছানায় পড়ে ছটফট করছে, ডাক্তার হিসেবে তাঁর প্রতি কি তার কোনও কর্তব্যই থাকতে পারে না?

মিনুর সেই অসহায় কাতর কণ্ঠস্বর আবার শোনা যায়, 'বাবা!'

শিশির ধীরে-ধীরে রায়বাহাদুরের প্রকাণ্ড খাটখানার দিকে এগিয়ে যায়, পিছনে-পিছনে মিনু। তারপর রায়বাহাদুরের মুখের দিকে না চেয়েই জিজ্ঞাসা করে, 'সেই আগেকার ব্যথা, কেমন?'

রায়বাহাদুর নিঃশব্দে ঘাড় নাড়েন। অর্থাৎ শিশিরের ধারণা সত্যি।

শিশির এবার সুমিত্রার দিকে ফিরে তাকায়।

'যাও, হটওয়াটার ব্যাগটা আনো আগে।'

হটওয়াটারের ব্যাগটা ঘরের মাঝখানেই গড়াগড়ি খাচ্ছিল এতক্ষণ। মিনু সেটা সুমিত্রাকে দেখিয়ে দেয়। সুমিত্রা সেটা তুলে নিয়ে এগিয়ে দিতেই শিশির রায়বাহাদুরকে বলে, 'নিন, শুয়ে পড়ুন।'

রায়বাহাদুর ছোট ছেলের মতো ডাক্তারের হুকুমে নিঃশব্দে শুয়ে পড়েন।

হট-ব্যাগটা জায়গা মতো বসাতে-বসাতে শিশির জিজ্ঞাসা করে, 'ক'দিন ধরে এরকম যন্ত্রণা ভোগ করছেন?'

রায়বাহাদুর বলেন, 'সেই মিনুদিদির নাচের দিন থেকেই।'

শিশির এবার একটু অপ্রস্তুত হয়েই প্রেসক্রিপশন লিখতে শুরু করে।

মিনু বলে, 'এবার তোমার সব অসুখ সেরে যাবে দাদু, দেখো। বাবা খুব ভালো ডাক্তার—না, মা?'

সুমিত্রা একটু লজ্জিতভাবে মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে নেয়। রায়বাহাদুর একটু ক্ষীণ হাসি হেসে বলেন, 'না সারলেও আর দুঃখ নেই দিদি, এখন মরতে পারলেই আমার সব অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হয়।'

শিশির যেন ধমক দিয়ে ওঠে, 'আচ্ছা চুপ করুন দেখি! আপনার প্রায়শ্চিত্ত আমার দায় নয়, আপনাকে সারানোই আমার কাজ।'

একটু চুপ করে থেকে সে আবার বলে, 'ওষুধ আমি দিচ্ছি, কিন্তু এখন এক বছর পুরো বিশ্রাম বুঝলেন।'

রায়বাহাদুর বলেন, 'এক বছর!'

'হ্যাঁ একবছর। এর আর নড়চড় নেই।'

শিশিরের মুখে এতক্ষণে হাসি দেখা দেয় আর সেই সঙ্গে রায়বাহাদুরের সমস্ত দুশ্চিন্তাও যেন শূন্যে মিলিয়ে যায়।

শিশির আর সুমিত্রার সঙ্গে হরিহরও এসেছিলেন মিনুকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে; কিন্তু তিনি ভেতরে ঢোকেননি, বাইরে অপেক্ষা করছিলেন। ভেবেছিলেন, কতক্ষণ আর লাগবে, শিশির ডাক্তার যাবে আর হাত ধরে মেয়েটাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে আসবে। কিন্তু হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে আসা দূরে থাক, একটি ঘণ্টার পর যখন আরও মিনিট পনেরো কেটে গেল, তখন তিনি আর নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারলেন না। চাদরটা একটু ভদ্রস্থ ভাবে কাঁধের ওপর ফেলে রায়বাহাদুরের বাড়ির গেট পার হয়ে একেবারে ভিতরে ঢুকে পড়লেন। যেতে-যেতে নিজের মনেই বলতে লাগলেন, 'না, মেয়েছেলেকে সঙ্গে নিয়ে কোথাও আসাই ঝকমারি। আজ রাত্রির ট্রেনেই সকলের কলকাতা ছেড়ে রওনা হওয়ার কথা, এখনও বলতে গেলে সমস্ত কেনাকাটাই বাকি—বিদেশে গিয়ে বসবাস করা তো মুখের কথা নয়, অথচ এরা দুজনে সেই যে বাড়ের মধ্যে যেয়ে ঢুকেছে, বেরুবার আর কথাটি নেই। কী কারণ হতে পারে কে জানে! বুড়োটার কোনও অসুখ-বিসুখ করেনি তো? তাই দেখে সুমিত্রা হয়তো সমস্ত রাগ-অভিমান ভুলে বসে আছে।...কিন্তু শিশির? শিশির তো এত সহজে ভুলে যাওয়ার লোক নয়? তা হলে?

এইসব ভাবতে-ভাবতে হরিহর কখন যে একেবারে বাড়ির ভিতর এসে পড়েছিলেন সেদিকে তাঁর কোনও খেয়ালই ছিল না। চমক ভাঙল চাকরের চিৎকারে।

'আরে, আরে, কে আপনি—যাচ্ছেন কোথায়?'

'যাচ্চি তোমার পিণ্ডি দিতে! সরো...'

হরিহর হন-হন করে খানিকটা এগিয়ে চাকরটাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমাদের বাবুর ঘর কোনটা বলো দেখি বাবা?'

চাকরটা হরিহরের ভাবভঙ্গি দেখে একটু আশ্চর্য হয়ে জবাব দেয়, 'ওপরে। কিন্তু কারও যাওয়ার হুকুম নেই।'

'হুকুম নেই? যেন চিরকাল তোদের হুকুম মেনেই চলাফেরা করলাম কি না।'

চাকরটাকে আর কোনও কথা বলবার অবকাশ না দিয়েই তিনি সোজা ওপরে উঠে যান। তারপর রায়বাহাদুরের ঘরটা খুঁজে নিতে হরিহরের দেরি হয় না। কিন্তু ঘরের ভিতর ঢুকে তিনি যেন রীতিমতো অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। রায়বাহাদুরের মাথার শিয়রে সুমিত্রা, পায়ের

কাছে মিনু, আর সামনে একটা চেয়ারে বসে শিশির ডাক্তার। সকলের মুখে প্রসন্ন হাসি, দীর্ঘ দশ বছরের ব্যবধান এদের সওয়া ঘণ্টার মধ্যেই পার হয়ে গেছে।

মিনিটখানেক আচ্ছন্নের মতো দাঁড়িয়ে থেকে হরিহর বলে ওঠেন, 'আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলাম, আগেই বুঝতে পেরেছিলাম। আমে দুধে মিশে গেল, এখন আঁটি শুধু গড়াগড়ি যায়। কেমন!'

ঘরসুদ্ধ সবাই একটু আশ্চর্য হয়েই হরিহরের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

মিনু ডাকে, 'হরিদা!'

'বেশ, আমি চললাম তা হলে। এই কথাটাই বলতে এসেছিলাম।' নিজের কথাগুলোই হরিহরের কানে কীরকম বেখাপ্পা শোনায়।

শিশির চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ায়। হরিহরের দিকে যেতে-যেতে বলে, 'বাঃ, তুমি চললে কোথায়?'

হরিহর একটু ঝাঁঝালো ভাবে বলে ওঠেন, 'কেন, যাওয়ার কোনও চুলো কি আমার নেই? আর না থাকে তো নেই। তা বলে চিরকাল তোমাদের ব্যাগার খেটে মরব! নিজের সংসার ধর্মের চেষ্টা আর আমায় করতে হবে না!'

শিশির হাসতে-হাসতে বলে, 'বেশ তো, তার জন্যে এখনও অঢেল বয়স পড়ে রয়েছে। আপাতত তাড়াতাড়ি এই ওষুধটা তৈরি করিয়ে নিয়ে এসো দেখি।'

প্রেসক্রিপশনটা শিশির হরিহরের দিকে বাড়িয়ে দেয়। হরিহর উত্তেজিত ভাবে বলে ওঠেন, 'ওষুধ তৈরি করিয়ে আনব!...না, না, ওসব পারব না, আমি চললাম।'

হরিহর সত্যি-সত্যিই চলে যাওয়ার জন্যে পা বাড়িয়ে দেন। খাট থেকে নেমে এসে মিনু ডাকে, 'হরিদা!'

'আর হরিদা কেন!' মিনুর দিক থেকে তাড়াতাড়ি মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে হরিহর বলেন, 'এখন সত্যিকারের দাদু পেয়েছ, হরিদা এখন কে?'

গলার স্বরটা তাঁর ভাঙা-ভাঙা মনে হয়।

রায়বাহাদুর সমস্ত ব্যাপারটা যেন মুহূর্তের মধ্যে বুঝতে পারেন, ম্লান হেসে বলেন, 'না হরি, তুমিই ওর আসল দাদু। আমার দাদুগিরির দাবী তো নিজের দোষে কবে তামাদি হয়ে গেছল। তুমি যত্ন করে বাঁচিয়ে না রাখলে, এ দাবী কোথায় থাকত? ওষুধ তোমায় আনতে হবে না; তুমি আমার কাছে এসে বস।'

মিনু হরিহরের হাত ধরে টানাটানি শুরু করে দেয়, 'চলো হরিদা, চল...'

খাটের দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে হরিহর বলেন, 'যাচ্ছি চল। কিন্তু এটা ভালো হল না দিদি। আমি তেতো পাঁচন, অসুখের দিনে কাজে লেগেছি, কিন্তু আজ ভোজের দিনে পঞ্চ-ব্যঞ্জনের পাশে আমায় মানাবে কেন?'

রায়বাহাদুর হাসতে-হাসতে বলেন, 'তুমি পাঁচন নও হরি, তুমি পান। দুঃখের দিনে শুকনো ঠোঁট রাঙা করে রাখো, আবার ভোজের শেষে তুমি না থাকলে মুখশুদ্ধি হয় না।'

মিনু হরিহরকে টানতে-টানতে নিয়ে গিয়ে খাটের একপ্রান্তে বসিয়ে দেয়। বিব্রত হরিহর হাসবেন না কাঁদবেন, ঠিক করতে পারেন না। খানিকক্ষণ বোকার মতো বসে থেকে বলে ওঠেন, 'শুনলি দিদি শুনলি, কাজ বাগাতে বড় মানুষেরা কত মধুমাখা কথার ছলই না জানে! আমার মতো আহাম্মুকেরা তাইতে ভুলেই চিরকাল এদের গোলাম হয়ে আছে!'

নতুন খবর

এক

ওদের বাবা মারা যাওয়ার সময় জয়ন্ত আর তার বোন খুশি নেহাত ছোট। মা মারা গিয়েছিলেন আগেই। কাজেই, ওদের মানুষ করেছেন ওদের একমাত্র কাকা রায়বাহাদুর ভবানীপ্রসাদ। তখন অবশ্য ভবানীপ্রসাদ শুধু ভবানীপ্রসাদ, রায়বাহাদুর নন। অকৃতদার, নিঃসন্তান ভবানীপ্রসাদের কাছে ওরা সেদিন থেকে নিজের সন্তানেরই মতো।

পৃথিবীতে এক শ্রেণীর লোক আছে যারা ঘন আঁধার বনে সন্ধানী আলোর মতো একরোখা আর তীক্ষ্ণ, প্রদীপের আলোর মতো মৃদু-কম্প নয়। এরা জানে লক্ষবস্তুকে চিনে নিতে, তার সদ্ব্যবহার করে নিতে। ভবানীপ্রসাদ এই শ্রেণীরই।

জলে জল বাঁধে। টাকা দিয়ে টাকা বেঁধেছেন ভবানীপ্রসাদ। বংশগত কিছু সম্পত্তি ছিল। কিছু টাকা আর বসতবাড়ি। টাকা খাটিয়ে এবং তার থেকেও অনেক বেশি মাথা খাটিয়ে ভবানীপ্রসাদ আজকাল এ-অঞ্চলের বড় কন্ট্রাক্টর হয়ে উঠেছেন। ইদানীং তার ওপর জয়ন্তের বাবা মারা যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে পৈতৃক সম্পত্তির দেখাশোনা করবার দায়িত্ব পড়েছে তাঁর ওপর। খুব বেশি বয়স হয়নি ভবানীপ্রসাদের। কিন্তু জয়ন্তের বাবার মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। খোলা বাতাসে, আত্মীয়-স্বজন পরিবেষ্টিত হয়ে স্বাভাবিক মৃত্যু নয়—এ মৃত্যু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিষ্পেষণে, নির্জন অন্ধকার কারাগৃহে তিলে-তিলে জীবনোৎসর্গের ইতিবৃত্ত। এ মৃত্যু মৃত্যু নয়। এর ইতি নেই এখানে। এ বৃত্তের মতো ঘুরে-ঘুরে আসে। বর্তমান ছায়া ফেলে আগামী দিনের ওপর। প্রাচীন আশীর্বাদ রেখে যায়, নবীন এগিয়ে চলে তাই নিয়ে।

স্ফুলিঙ্গ এতটুকু হলেও শক্তি তার কিছু কম নয়। কিশোর জয়ন্ত দল গড়ে ওদের মফস্বল শহরে। সে দল কতটা করতে পারবে সে বিষয়ে ভাববার আছে বটে। কিন্তু কিছু একটা করবেই এ বিষয়ে সন্দেহ নেই জয়ন্তের। সন্দেহ নেই বটে তবে দায়িত্ব আছে ওর। বিঘ্ন সঙ্কুল পথে চলবার, আরও অনেককে পথ দেখিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব বড় কম নয়। পথে আছে সংঘর্ষ। সংঘর্ষ আছে নিজের পরিবেশের সঙ্গে। সংঘর্ষ আছে জয়ন্তর সঙ্গে ভবানীপ্রসাদের। স্নেহের বর্ম ভেদ করে মাঝে-মাঝে সে সংঘর্ষের আঘাত চিহ্ন স্পষ্ট রেখাপাত করে।

এমনই করে কেটে গেছে কয়েক বছর। এসেছে যুদ্ধ। যত না মানুষ মারার, তার থেকে বেশি করে মনুষ্যত্বকে হত্যা করার অপূর্ব যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে—শুরু হয়েছে মহাযুদ্ধ। তার ঢেউ এসে লেগেছে এদেশে। লেগেছে এই অবহেলিত মফস্বল শহরে। যে শহরে পৃথিবীর বহু সম্পদের এক কণাও এসে পৌঁছয় না সহজে। সেই গ্রামে, সেই শহরে, আজ মহাযুদ্ধের অভিশাপের ঢেউ এসে লেগেছে। আসছে সৈন্য, আসছে রণসম্ভার, রসদ। তাদের ছাউনি চাই, গুদাম চাই। আজ এখানে মাটি কেটে পথ হবে, নদীর ওপর হবে পোল, ওখানে বন-বাদাড় সাফ করে হবে এরোড্রোম। কাজ আর কাজ। শেষ নেই, অন্ত নেই। সারাদিন, সারারাত খেটেও শেষ করতে পারছেন না ভবানীপ্রসাদ। কন্ট্রাক্টের পর কন্ট্রাক্ট! নতুন ডিভিশনাল কনট্রোলার এসেছেন এখানে। খাশ বিলেত থেকে নতুন আমদানি। মিঃ ড্রামন্ড। নামটা যেন উঁচু তালের বাজনার মতোই ভবানীপ্রসাদের কানে বেজে ওঠে। সে আওয়াজ যেন সারাদিন তোলপাড় করে বেজে চলেছে ভবানীপ্রসাদের মনে-মনে। এরই মধ্যে বার কয়েক দেখা করে এসেছেন তিনি ড্রামন্ডের সঙ্গে। সুচতুর, বুদ্ধিমান লোক মিঃ ড্রামন্ড। প্রতিটি পদক্ষেপে দাবার চালের ইঙ্গিত; অরণ্য থেকে লাক্ষাস্রাবী মহীরুহকে বেছে নেওয়ার মতো অনেক মানুষের ভিড় থেকে ঠিক মানুষকে বেছে নেওয়ার তীক্ষ্ণতা তাঁর চোখে। মিঃ ড্রামন্ডও একবার

এসেছিলেন ভবানীপ্রসাদের বাড়িতে। সেদিন সাবেকি আমলের সব দেওয়াল-সজ্জা বার করা হয়েছিল। ফিতে আর ফুল। লেখা আর আঁকা। ড্রয়িংরুম...ডাইনিং রুম...কোথাও কোনও ত্রুটি নেই দিশি আবহাওয়াকে মুছে ফেলবার, ভোলবার! আবার সংঘর্ষ হয়েছে জয়ন্তের সঙ্গে। জয়ন্ত বারবার আপত্তি জানিয়েছে কাকাবাবুকে। এই কন্ট্রাক্টরি বৃটিশ-সাম্রাজ্য রক্ষার হাতিয়ার বানানোর কাজ—এই সময় আয়োজনের প্রস্তুতি, এ দেশের শত্রুতা সাধন। কিন্তু, ভবানীপ্রসাদের মন এতে ভোলেনি। বৃটিশের সাম্রাজ্য রইল কী গেল তাতে তার কিছু যায় আসে না। তবে এই কালোবাজারে যারা সুযোগ করে নিতে পারছে তাদেরই ঘরে যখন কিছু আসছে, তবে সন্ধানী ভবানীপ্রসাদের ঘরে কিছু আসবে না কেন? এই বাড়ি প্রাসাদ হবে না কেন? ভবানীপ্রসাদ রায়বাহাদুর ভবানীপ্রসাদ হবেন না কেন?

এ কেন'র আর জবাব নেই। জবাব দেওয়ার অবসর নেই—জয়ন্তের রয়েছে অনেক কাজ। এসে গেছে জনগণ-মথিত ১৯৪২-এর আগস্ট।...এসে গেছে পঞ্চাশের মন্বন্তর। কেবল কাজ আর কাজ। বিশেষ করে আজকাল একটা নতুন কাজ হাতে নিয়েছে সে। একটা নতুন কাগজ বার করছে মাসে-মাসে। নাম 'নবাঙ্কুর'। অতীতের উত্তরাধিকার সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের বীজ একটি। নবাঙ্কুরের সম্পাদক, প্রকাশক, মুদ্রাকর একাধারে সবই ওই জয়ন্ত। ভবানীপ্রসাদ এ বিষয়ে মাথা ঘামাননি প্রথমে। গ্রাহ্য করেননি একে। কিন্তু ফল্গু স্রোতকে বোঝা যায় না ওপর থেকে। নিচের জলের টান নিচে নামলেই বোঝা যায় ঠিক। কিন্তু যেদিন নবাঙ্কুর কাগজে ড্রামন্ডকে আক্রমণ করে, বিরাট সম্পাদকীয় বেরুল সেদিন আর মাথার ঠিক রাখতে পারলেন না তিনি—রায়বাহাদুর ভবানীপ্রসাদ!

কাগজটা হাতে করেই ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন ভবানীপ্রসাদ, জয়ন্তকে ধরবার জন্যে। ইচ্ছে ছিল এ কথাটা আজ ভালো করেই বুঝিয়ে দেবেন যে স্পর্ধার একটা সীমা থাকা দরকার। অনেক উপদ্রব সহ্য করেছেন তিনি, স্নেহ দিয়ে ঢেকে রেখেছেন এতদিন, কিন্তু শাসনেরও প্রয়োজন যে আছে, এবং সে শাসনের পথও যে তাঁর জানা আছে ভালোমতো, সেই কথাটাই আজ তিনি মনে করিয়ে দেবেন।

'জয়ন্ত—জয়ন্ত'—ডাকছেন আব এঘর-ওঘর খুঁজে বেড়াচ্ছেন তিনি। চাকর-বাকরেরা ভয় পেয়ে যাচ্ছে হটে। রায়বাহাদুরের হাতের মধ্যে কাগজটা যেন জ্বলছে, হাতের মুঠির মধ্যে তার আঁচ যেন বোধ করা যায়। অসহ্য!

সিঁড়ির ধারে খুশির সঙ্গে দেখা। রায়বাহাদুর বলেন, 'কোথায় গেল সে হতভাগা?'

'দাদাকে খুঁজছ কাকাবাবু? দাদা তো বাইরের ঘরে।'

'বাইরের ঘরে, আচ্ছা আমি দেখছি।'

বাইরের ঘরের একপাশে খানিকটা জমি। সে জমিতে একটা টিনের চালা মতো আছে। দেয়ালগুলো আধভাঙা। কবে যেন গুদাম করেছিলেন রায়বাহাদুরের পূর্বপুরুষ। প্রয়োজন ফুরোবার পর আর হাত পড়েনি। পড়ে আছে পড়ো-পড়ো ঘরটা।

সেইখানেই পাওয়া গেল জয়ন্তকে। সঙ্গে একজন ভদ্রলোক। গম্ভীরভাবে কী যেন আলাপ হচ্ছে ওদের দুজনের মধ্যে।

জয়ন্ত বলছিল, 'আর এই দেয়ালটা ভেঙে ফেলতে হবে বুঝেছেন।'

কথাটা কানে গেলেও বুঝতে পারলেন না রায়বাহাদুর। হাঁক দিলেন, 'জয়ন্ত!'

'কী কাকাবাবু!' একবার তাকিয়ে নিল জয়ন্ত কাকাবাবুর দিকে। কাকাবাবুর মুখে রাগের আগুন। হাতের মুঠো দিয়ে নবাঙ্কুর উঁকি দিচ্ছে। ব্যাপারটা আন্দাজ করে নিতে দেরি

হল না জয়ন্তের, মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আগের মতো গাম্ভীর্য নিয়ে বলে চলল দ্বিতীয় ভদ্রলোকটিকে—'হ্যাঁ আর দেখুন, এ দেয়ালেও দুটো দরজা করতে হবে!'

রায়বাহাদুরও নিজের কথা বলতে শুরু করছিলেন—'এই কাগজে—'

কিন্তু জয়ন্তের গলা শুনে থেমে গেলেন চকিতে। তারপর হঠাৎ চিৎকার করে কাঁপিয়ে তুললেন—'জয়ন্ত—শুনতে পাচ্ছ!'

'শুনতে পাচ্ছি।' অম্লান বদনে সাড়া দিল জয়ন্ত।

আবার শুরু করছিলেন রায়বাহাদুর—'এই কাগজে—'

জয়ন্ত ততক্ষণে সেই ভদ্রলোককে টেনে নিয়ে গেছে আর এক দিকে। একটুও যেন কথা বলবার সময় নেই জয়ন্তের। কাজ আর কাজ কেবল। জয়ন্ত বলছে, 'এদিকের দেয়ালটা—এইটাই বা রাখবার দরকার কী?'

ভদ্রলোক রায়বাহাদুরের মুখের দিকে দেখছেন আর 'হ্যাঁ' 'না' করে যাচ্ছেন। এবার কিন্তু রায়বাহাদুরের কণ্ঠস্বরে রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলেন তিনি।

জয়ন্তের কথাটা শুনে রায়বাহাদুর এগিয়ে এলেন জবাব দিতে—'না তা রাখবার দরকার কী! সমস্ত বাড়িটা ভেঙে ধ্বসিয়ে দিলেই তো হয়। কিন্তু কী ব্যাপারটা জানতে পারি?'

হাসিমুখে জবাব দিল জয়ন্ত, 'সে কী! আপনি এখনও জানেন না? এখানে যে প্রেস করব ঠিক করেছি। আমাদের কাগজ মানে 'নবাঙ্কুর' এখানেই ছাপা হবে।'

হাতের মুঠোর মধ্যে কাগজটা আর একবার চটকে নিলেন রায়বাহাদুর। দাঁতে দাঁত ঘষে বললেন, 'এখানেই ছাপা হবে! তার চেয়ে বল না এখানে আমার শ্রাদ্ধ হবে, আমার পিণ্ডি হবে। আমার ভিটেতে তুমি ঘুঘু চরাবে!'

জয়ন্তেব মুখের হাসি তখনও মিলোয়নি। সে বলে, 'আপনি যেন রাগ করেছেন মনে হচ্ছে কাকাবাবু!'

'এখনও মনে হচ্ছে!'—রেগে গিয়ে কী করবেন ঠিক যেন বুঝতে পারেন না রায়বাহাদুর।—'এখনও বুঝতে পারছ না আমি খেপে গেছি...আমার মাথায় আগুন জ্বলছে?'

'কেন কাকাবাবু?'

'কেন?' হাতের মুঠো থেকে পাকানো কাগজটা মেলে ধরে বলেন তিনি, 'কী লিখেছ—কী লিখেছ—এ কাগজে ড্রামন্ড সাহেবের বিরুদ্ধে?'

'বেশি কিছু তো লিখিনি, লিখেছি যে তাঁর মতো অক্ষম অপদার্থ খোশামোদ-প্রিয়, ঘুষ-খোর, অত্যাচারী অফিসারকে এ সাবডিভিশন থেকে কান ধরে এখুনি বের করা দরকার।'

'ও, কিছুই এমন লেখনি, কেমন? কিন্তু জানো, তোমার ওই লেখার জন্যে কী হয়েছে? জানো, আমার সমস্ত টেন্ডার এবার রিফিউজড্ হয়েছে, জানো এতদিনের কনট্রাক্টরির কারবার আমার ডুবতে বসেছে!'

'ঘুষ আর খোশামোদের ওপর যার ভরসা, সেরকম চোরাকারবার ডুবে যাওয়াই ভালো।' বলতে-বলতে হঠাৎ জয়ন্তের মুখের হাসি গেল মিলিয়ে, স্বর হল কঠিন।

'বটে, এত বড় কথা! আমি চোরাকারবার করি! যাও বেরিয়ে যাও এখনই এ-বাড়ি থেকে। এই কারবার না করলে কোথায় থাকতে তোমরা হতভাগা! আজ বড় স্বদেশী হয়েছ, না? তোমার মতো এই স্বদেশী হুজুগ করে আর জেল খেটে দাদা নিজেও মরেছে যথাসর্বস্ব খুইয়ে, বংশটারও সর্বনাশ করে গেছে, তা জানো! কে সে সব উদ্ধার করেছে? দুটো অপগণ্ড বাচ্ছা রেখে দুজনে যখন সরে পড়ল তখন কে তোমাদের মানুষ করেছে?' ঠক-ঠক করে

কাঁপতে থাকেন রায়বাহাদুর।'

একটু থেমে জয়ন্ত বলে, 'এতদিন যদি মানুষ করে থাকেন, তাহলে আজ সত্যিকার মানুষ হতে কেন বাধা দিচ্ছেন কাকাবাবু।'

'ও, আমারই সর্বনাশ করবার নাম তোমার সত্যিকার মানুষ হওয়া না? আমার বাড়ি ভেঙে তুমি প্রেস করবে! আমার যারা ভরসা তাদের নামে কাগজে গালাগাল দিয়ে আমার কারবারে লাল-বাতি জ্বালাবে! আর আমি তাই সহ্য করব ভেবেছ!'—একটু থামেন রায়বাহাদুর। তারপর গলাটা আর একটু চড়িয়ে সেই ভদ্রলোককেও শুনিয়ে বলে ওঠেন কঠিন স্বরে—'এসব কিছু এখানে চলবে না! এখানে থাকতে হলে ও-সব প্রেস, কাগজ, লেখা সব ছাড়তে হবে!'

'তাহলে এখানে না থাকাই ভালো কাকাবাবু।' একটুও না থেমে বলে জয়ন্ত।

'না থাকাই ভালো!' নিজের কথায় নিজেই যেন চমকে ওঠেন রায়বাহাদুর! 'তার মানে তুমি এখান থেকে চলে যাবে!'

'না গিয়ে, কী করি বলুন! বাবার আদর্শের কথা তো ভুলতে পারব না! প্রেস, কাগজ লেখা এসবও ছাড়তে পারব না। আপনি তো আর ও-সব এখানে করতে দেবেন না!'

'না না, ও-সব কোনও বাঁদরামি এখানে চলবে না।'

'বেশ তাহলে চলে যাচ্ছি! খুশি...খুশি...।' ডাকতে-ডাকতে জয়ন্ত বাড়ির ভেতর দিকে এগিয়ে চলে।

'খুশি, খুশিকে আবার কেন? '

'বাঃ, তাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে তো! সে তো আমারই ছোট বোন। আমি ছাড়া আর তো তার কেউ নেই।'

'আর তার কেউ নেই? একাধারে বাপ-মা হয়ে. বাপ-মা মরা ছেলে মেয়েকে মানুষ করে তুলেছিল কে? কে এতদিন ধরে তার সব দায় সব ঝক্কি নিয়েছে? তুমি?'

ডাক শুনে খুশি এসে গেছে ততক্ষণে। ভয়-চকিত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে ওদের দিকে।

জয়ন্ত বলছে জবাবে, 'না আপনিই নিয়েছেন। তার জন্যে আমরা যথেষ্ট কৃতজ্ঞ।' সমস্ত স্নেহের আবরণ ভেদ করে আজ আঘাত দিয়ে চলেছে জয়ন্ত—'কিন্তু তবু, আমি যখন তার দাদা, আমার সঙ্গেই তাকে নিয়ে যাব। ত' ছাড়া এ-বাড়িতে আর থাকাও উচিত নয়।'

'কেন, কেন উচিত নয় শুনি?' পরাজিতের স্বরে যেন প্রশ্ন করেন রায়বাহাদুর!

'যে আদর্শের জন্য বাবা জীবন দিয়েছেন তারই যেখানে অপমান হয়, সেখানে আর কী করে খুশিকে রাখতে পারি?'

'ওঃ, এত বড় কথা! বেশ, এখনই দুজনে বিদায় হও এখান থেকে—এক্ষুনি...।'

জয়ন্ত খুশির হাত ধরে এগিয়ে যাচ্ছিল। কাকাবাবুর আবার কথা শোনা গেল। 'বলি, যাচ্ছ তো, খাবে কী?'

জয়ন্ত মুখ ফিরিয়ে বললে, 'আমার নিজের তো হাজার কয়েক টাকা আছে, তাছাড়া যাহোক একটা চাকরির চেষ্টা দেখতে হবে!'

'কিন্তু, থাকবে কোন চুলোয় শুনি?'

'ভাবছি কলকাতার বাড়িটাতেই গিয়ে উঠব—সেটা তো বাবারই ছিল—!'

'হ্যাঁ, ছিল তো একটা ভাঙা পোড়ো ভুতুড়ে বাড়ি। নিজের গ্যাঁটের পয়সা খরচ করে সে বাড়ি আমি মেরামত করেছি, জানো? জানো মাসে চারশো টাকায় সেটা ভাড়া

দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে।'

'নিজেদের থাকার যখন জায়গা নেই তখন সে ব্যবস্থা বদলে দিতে হবে! আর মেরামত যদি করে থাকেন সে আপনার নিজের দোষ। ইচ্ছে করলে আপনি আবার ভেঙে দিতে পারেন।'

বেশ যেন একটা আলাদা হওয়ার দূরত্ব নিয়ে বলতে থাকে জয়ন্ত।

'ওঃ, ভেঙে দিতে পারি!'—জয়ন্তের কথাটা পুনরাবৃত্তি করে যেন তিনি আবার শুনতে চান কথাটা! '—অ্যাঁ?' মনের ভেতরটা চমকে ওঠে রায়বাহাদুরের। নিষ্ফল রাগে বলে ওঠেন, 'দূর হও, দূর হও আমার সামনে থেকে। তোমাদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই আমার!'

জয়ন্ত নীরবেই মেনে নিয়েছিল এই আদেশ। কিন্তু ছোট খুশি কেঁদে ফেলে কাকাবাবুর রাগ দেখে। ভাঙা গলায় ডাকে একবার, 'কাকাবাবু!'

'না না আমি তোর কাকাবাবু নই।' খুশির দিকে অভিমানে সজল চোখদুটো না ফিরিয়েই বলে চললেন রায়বাহাদুর, 'তোর স্বদেশী বাপের আমি কুলাঙ্গার ভাই! ওই স্বদেশি দাদার সঙ্গে তুই এক্ষুনি বিদায় হ—আমার আপদ যাক।'

কথাটা শেষ করেই, নিজেই যেন বিদায় হলেন। এমনভাবে হনহন করে চলে গেলেন রায়বাহাদুর ওদের সামনে থেকে।

খুশির মুখ দুঃখে আর কান্নায় কালো হয়ে আসে।

জয়ন্ত হঠাৎ মুখ টিপে একটু হেসে নেয়। তারপরই কঠিন হয়ে ওঠে ওর মুখ। খুশির হাতটা ধরে টান দিয়ে বলে, 'আয় খুশি।'

খুশি যায় না—যেতে হয় তাকে।

দুই

কলকাতার পথ। পথের ধারে জয়ন্তর বাবার পুরনো বাড়ি। বহুকাল আগেকার বাড়ি—তার ওপর আধুনিক রুচির সাময়িক তাগিদের জরুরি সংস্কারের ছাপ। দেখে মনে হয়, কালো মেয়ের মুখে যথেচ্ছ পাউডার ক্রিমের প্রলেপ পড়েছে।...সরু গলির ওপর এই বাড়ি। বাড়ির পাশ দিয়ে একটা ততোধিক সরু কানা গলি চলে গিয়েছে। বাড়ির মধ্যে একটা ঠান্ডা আবহাওয়া আশা করা যায়—একটা স্যাঁতসেঁতে ভ্যাপসা হাওয়া। কিন্তু ঠিক তা নয়। সংস্কারের ফলে আর কিছু না হোক এই আবহাওয়াটা দূর হয়েছে কাঁচা চুন আর বালির গন্ধে। বাহাদুরের গর্বটা ছিল বোধহয় এখানেই। অতকালের পুরনো জরাজীর্ণ বাড়িটার ভোল বদলে এমন করে তুলেছেন যে এ বাজারে তিনসংখ্যার বেশ উঁচু হারেই তা ভাড়া হয়ে যাবে। জয়ন্তের সঙ্গে সেদিনকার তর্কে তাই রায়বাহাদুর সে কথাটার উল্লেখ করে এই গর্বটুকু আস্বাদন করতে চেয়েছিলেন।

রায়বাহাদুরের আশা দুরাশা নয়। বাড়ির পিছনের ইতিহাস যা-ই হোক তার এই প্রলেপ-ধরানো রূপ দেখেই এসেছেন নটবর পাল। মাথায় গোল টাকের মরুভূমি আর কালো বার্নিশ করা মেদবহুল দেহ। গ্রামের মানুষ, কিছু কারবার আর খেতখামার ছিল। যুদ্ধের বাজারে, বর্ষার জল পেয়ে হঠাৎ বান ডাকা প্রগলভা নদীর মতো কারবারটা তাঁর দুকূল ছাপিয়ে ফুলে উঠেছে বেশ। দেশের খেতখামারের প্রয়োজন বোধহয় ফুরিয়েছে তাই কলকাতার দিকে তাঁর এই নতুন নজর।

নটবর বাড়ির খবর পেয়ে দেখতে এসেছেন নিজের চোখে। সঙ্গে এসেছে ওঁদেরই

গ্রামের দুলাল সামন্ত।

বাড়ির সরকার নটবরবাবুকে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিল। বাড়িটা মোটামুটি মনে ধরেছে নটবরবাবুর। এমন কাঁচা চুন আর বালির গন্ধ—মনে ধরা বিচিত্র নয়। নটবরবাবু দুলালকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'তা বাড়িটা নেহাত মন্দ নয়। কী বল হে দুলাল? ঘরগুলো বেশ ডাগর-ডাগর বানাইছে, দরজাগুলো খুব লম্বা চওড়া বটেক। তবে সিঁড়িটা মিছামিছি এতটা জায়গা লিছে!'

আর যাই হোক নটবর পাল তাঁর গ্রাম্য ভাষা, চালচলন কিছুই ত্যাগ করতে পারেননি। ত্যাগ করার প্রয়োজন হয়নি তাঁর।

দুলাল নটবর পালের কথায় উৎসাহিত হয়ে ওঠে। বলে, 'আজ্ঞে যা বলেছেন। সিঁড়িটা বেফজুল জায়গা নষ্ট।'

সিঁড়িটা একটু বোধ হয় বড়ই সে কথা অস্বীকার করা যায় না তবে এটাও তার আগে স্বীকার করে নিতে হয় যে নটবর পাল আর দুলাল এদের কারুরই গ্রামের বাড়িতে সিঁড়ির কোনও ব্যবস্থা নেই। প্রয়োজনই নেই বলে।

বাড়ির সরকার যেমন বলতে হয়, গুছিয়ে বলতে চায়।—'আজ্ঞে যেমন বাড়ি তেমন সিঁড়ি তো হবে, মানানসই হওয়া চাই।' একাধারে সিঁড়ি আর বাড়ির দর বাড়াতে চায় সরকার।

'আরে রাখো তোমার মানানসই।' নটবর পাল তবু কড়া করে শোনাতে চান, 'সিঁড়ি তো আর ঘর লয় হে, যে হাত-পা মেলে শুয়ে থাকবে। শুধু তো উঠবে আর লামবে, তার আবার অত বাহার কিসের?'

'একবারে খাঁটি কথা বলেছেন। সিঁড়ি তো শুধু উঠবে আর লামবে আর উঠবে। তা চওড়া হলেই বা কী আর সরু হলেই বা কী! আপনার মতো বুদ্ধিশুদ্ধি থাকলে কী আর এরকম সিঁড়ি বানায়।' দুলাল হইহই করে কথাগুলো বলে সরকারের মুখ বন্ধ করে দিতে চায়।

'আজ্ঞে সিঁড়ি তো আর এখন বদলানো যাবে না, তবে বাড়িটা মোটামুটি যদি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে ভাড়ার ব্যবস্থাটা—।' এই সুযোগে ব্যাপারটা পাকাপাকি করে নিতে চায় সরকার। সিঁড়ি সম্বন্ধে খুঁতখুঁতুনিটা শিকড় গেড়ে বসতে না দেওয়াই ভালো ওদের মনে।

'ভাড়ার কথা ভাববেন না মশাই, ভাড়ার কথা ভাববেন না। আমাদের পালমশাইয়ের যদি পছন্দ হয়ে যায় তবে ভাড়া তো আর কোন ছার, বাড়িটা কিনে নিতে পারেন এক্ষুনি। কী বলেন পালমশাই—?'

পালমশাইয়ের টাকার জোরের ইঙ্গিতটা সময় মতো লাগাতে পেরে ধন্য হয়ে জিভ দিয়ে ঠোঁটটা ভেজাতে থাকে দুলাল। যেন তার স্বাদগ্রহণ করছে সে।

'উঁহু। উ-বাড়ি কেনা-বেচার মধ্যে আমি নাই। গোটা দেশের মানুষের চোখে-চোখে থাকবে এমন মাল কিনতে যাবো কেন হে? আমায় বোকা পেয়েছ বটে।' চোখে-চোখে অভিজ্ঞতার বাঁকা আলো ঝলসায় নটবরবাবুর।

'আজ্ঞে যা বলেছেন। বুদ্ধিমান লোক কী কখনও এ বাজারে বাড়ি কেনে?'—নটবর পালকে সমর্থন করতে এক মুহূর্ত দেরি হয় না দুলালের। 'বাড়ি তো আর কালোবাজারে বিক্রির জিনিস লয়!' বিজ্ঞের হাসি হাসে দুলাল।

তারপর, একটু দম নিয়ে সরকারের দিকে তাকিয়ে বলে, 'পালমশায়ের কী ব্যবসা বুদ্ধি দেখেছেন। এ বুদ্ধি না থাকলে আর এই ক'বছরে ধুলো-মুটো সোনা-মুটো হয়ে ওঠে।'

সরকার পাকা লোক। নেহাত ভালোমানুষের মতোই মাথা নিচু করে পাকা কথা বলে, 'বাড়িটা পছন্দ হয়েছে কি না সেটা কিন্তু এখনও জানতে পারলুম না।'

'আরে দাঁড়ান মশাই?' কারবারি নটবর পাল ধমক মেরে ওঠে। 'পছন্দ অমনি এক কথায় হলেই হল। আমি পছন্দ হয়েছে বলে ফেলাই আর অমনি আপনি ভাড়াটা বাড়ায়ে দিয়ে বসুন। এ লটবরের কাছে সে চালাকিটি হবার জো লাই! আচ্ছা ওধারে ওটা কী বটে?'

বাথরুমের দিকে ইঙ্গিত করেন বলে মনে হয়। সরকার শুধোয়, 'আজ্ঞে কোনটার কথা বলছেন?'

'এই যে।'

বাথরুমের দিকেই ইঙ্গিতটা বটে।

চালাকি ধরে ফেলার হাসি হেসে বলেন নটবর, 'হেঁ-হেঁ...এই ফাঁকির কারবার ধরে ফেলেছি মশাই!'

'আজ্ঞে ফাঁকির কারবার?' সরকার সত্যি-সত্যিই চমকে ওঠে এবার। মোজেইক করা আধুনিক বাথরুমের মধ্যে ফাঁকি?

'ফাঁকি নয় তো একটা কী বটে! এই যে ভালো-ভালো জেল্লাদার পাথরগুলো এইখানে লাগাইছেন—কই বাড়ির আর কুথাও তো ইগুলা লাই?'

'এই মারবেল পাথরের কথা বলছেন? এগুলো যে শুধু বাথরুমে থাকে।'

'বাত হতে যাবে কেন?' হঠাৎ বলে ওঠেন নটবর পাল।

বাথরুম সম্বন্ধে যার ধারণার দৌড় পুকুরপাড় আর কুয়াতলা পর্যন্ত তার কাছে এমন কথা নেহাত বিস্ময়কর না হলেও সরকাব মনে-মনে বিস্মিত হাসি হাসে। বলে—'বাত নয়, বাত নয়,...বাথরুম...মানে, চানেব ঘর।'

'ঈস্, আমাকে একেবারে জল বুঝাই দিলেন! গায়ে ট্যানা জোটে না পায়ে সোনার চুট্‌কি। চানের ঘরে পাথর দিয়ে কী হবে বটে? গোটা বাড়িটা এমন করি সাজাই দিতেন তো ভাড়া যা বলতেন তাই দিয়ে দিতাম। তা ভাড়া কত বটে!'—খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে পাকা কথায় আসতে চান নটবর তাড়াতাড়ি।

'আজ্ঞে চারশো টাকা মাসে।' যুদ্ধের বাজারের দর বলে সরকার।

'চারশো টাকা...সে যে অনেক টাকা হে!' চোখ দুটো গোল-গোল করে কিছু সময় ভেবে দেখেন নটবর পাল তারপর বলেন, 'তা চারশো টাকাই না হয় দিয়ে দিব—কী বল হে দুলাল...চারশো টাকা শুনে নটবর পাল কী ডরায়ে যাবে নাকি?'

'রামঃ, রামঃ, চারশো টাকা আপনার কাছে তো হাতের ময়লা।' হাত নেড়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে দুলাল, 'তাছাড়া কলকাতা শহরে থাকবেন আপনার উপযুক্ত একটা বাড়ি না হলে চলে! আপনি তো আর হেঁজিপেজি লোক নন!'

'তাহলে পাকা কথা হয়ে গেল বটে। এখন শুধু টাকাটা লিয়ে রসিদটি লিখে দেবেন—চলেন...।'

মনে-মনে রাজি হয়ে গেল সরকার। আর যাই হোক লোক চেনে সে। আর যাই হোক ভাড়ার টাকাটা আদায় হয়ে যাবে ঠিক। গন্ডগোল বিশেষ হবে না বলেই মনে হয়। অন্তত এ মাসেরটা তো আগাম পাওয়া যাচ্ছে। কম নয়...চার-চারশো টাকা। নেহাত যুদ্ধের বাজার বলেই—তা নাহলে এ-বাড়ির ভাড়া কী আর—।

সরকার বলে, 'চলুন নিচে যাওয়া যাক। রসিদ-টসিদ নিচেই আছে।'

নিচে এসে কিন্তু সকলে হতভম্ব হয়ে যায়! রাস্তার ওপর একখানা গাড়ি দাঁড়িয়ে। গাড়ি থেকে মালপত্র নামাচ্ছে একজন। সঙ্গে একটা ছোট মেয়ে।

ব্যাপার কী? এ বাড়িতে কে এল? বাড়ি ভুল করেনি তো! অনেকরকম প্রশ্ন জমা হয়ে ওঠে।

এগিয়ে আসে সরকার। আরে এ যে জয়ন্ত আর খুশি এসে হাজির হয়েছে। ওদের চিনতে পেরে আরও বেশি অবাক হয়ে যায় সরকার। কথা নেই, বার্তা নেই, খোঁজ নেই, খবর নেই, এমনি চলে আসার মানে?...তাছাড়া রায়বাহাদুর এই সেদিন মাত্র নিজ হাতে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন বাড়ির একটা ভাড়ার বন্দোবস্ত করতে...সরকারের বিস্ময় যেন ফুরোতে চায় না।

জয়ন্ত একটুখানি হাসে। বলে, 'কী সরকার মশাই, বড় যেন অবাক হয়ে গেছেন বলে মনে হচ্ছে?'

'আজ্ঞে তা একটু হয়েছি বইকী! হঠাৎ মোটঘাট নিয়ে—'

'এখানে বাস করতে এলাম, এই সোজা কথাটা বুঝতে পারছেন না?'

কথাটা যেন অতিরিক্ত সোজা বলে বোধ হয় সরকারের। কিছুই বলে উঠতে পারে না। হাঁ করে দেখে শুধু।

নটবর পাল পিছনে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন সবই। যে বাড়ি নগদ চারশো টাকায় ভাড়া করছেন তিনি, সে বাড়িতে বাস করবে। মানে? আড়াল থেকে নিজেকে প্রকাশ করে বলে ওঠেন তিনি, 'এখানে বাস করবেন মানে? জানেন, এ বাড়ি আমি ভাড়া নিচ্ছি? নগদ চারশোটি টাকা ভাড়া!'

'এঁরা কে সরকার মশাই?' জয়ন্ত নটবর পাল আর দুলালকে দেখিয়ে প্রশ্ন করে। নটবরের কথার কোনও জবাব দেয় না।

সরকার জানায় 'এঁরা বাড়ি দেখতে এসেছেন।'

'বাড়ি দেখতে এসেছেন! বেশ, বাড়ি তাহলে এঁদের দেখান—তবে বাইরের ওই রাস্তা থেকে। গোটা বাড়িটা খুব ভালো করে ওখান থেকে দেখতে পাবেন, যতক্ষণ খুশি!'

নটবর পাল পাকা লোক। ইঙ্গিতটা তাই বুঝতে তাঁর বিশেষ দেরি হয় না। প্রায় চেঁচিয়েই ওঠেন তিনি, 'কী আমায় বাড়ি থেকে বার করে দেওয়া! জানো আমি কে বটে! আমার নাম নটবর পাল! পাঁচটি বছর মিলিটারির সঙ্গে কাজ করেছি, হুঁ!' মিলিটারি কথাটা খুব জোর দিয়ে উচ্চারণ করেন নটবর পাল। সেটা জয়ন্তকে ভালো করে শোনাবার জন্যে, কি নিজের কানে ভালো লাগে সেইজন্যে, তা বোঝা শক্ত।

দুলালও ওপাশ থেকে ফোঁস করে ওঠে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, একটু বুঝেসুঝে ওঁর সঙ্গে কথা বলবেন। নেহাত কংগ্রেস সরকার দুষমনি করে খেতাব তুলে নিলে, তাই...নইলে উনি এবার রায়সাহেব হতেন তা জানেন?'

নটবর পালও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন—'হুঁঃ।'

জয়ন্ত কিন্তু চটে না। বরং হাসি মিশিয়েই বলে, 'সেলাম তাহলে বাতিল রায়সাহেব। খেতাবের মতো আপনার বাড়ি ভাড়া করাটাও এবার বাতিল হয়ে গেল বলে আমি দুঃখিত।'

নটবর পাল নিষ্ফল আক্রোশে ফুলতে থাকেন। নেহাত কলকাতা শহর তাই আর কিছু করে উঠতে পারলেন না তিনি—! 'বলেন, আচ্ছা, যুদ্ধ থেমে গেছে তাই। তবু আমি দেখে লিব একবার। এস হে দুলাল।'

রাগ দেখিয়ে দুম্-দুম্ করে চলে যান নটবর পাল। যেতে-যেতে খুশি না হয়ে উঠেও পারেন না। মাস-মাস চারশোটা টাকা তো বড় কম নয়। যুদ্ধ তো থেমে গেছে কবে! তার ওপর আবার এই কংগ্রেসী সরকার।

জয়ন্ত বেরিয়েছিল কয়েকটা কাজে। একা এসেছে কলকাতায়। ঝি-চাকর থেকে আরম্ভ করে সব কিছুই খুঁজে পেতে জোগাড় করে নিতে হবে নিজেকে। সাহায্যের মধ্যে আছে সরকারমশাই। তবে, আজকালকার যে রকম এটা-নেই—ওটা-নেই যুগ চলেছে তাতে ভরসা নেই কারও ওপর।

খুশি একাই ছিল অতবড় বাড়িতে। সেটা খুব খুশি হওয়ার ব্যাপার নয়। একে এই নতুন শহর তার ওপর এই আধা-নতুন আধা-পুরনো দৈত্যের মতো বাড়ি। কানাগলির মুখে নির্জন বাড়িটার চেয়ে নিঃসঙ্গ মনে হয় নিজেকে খুশির।...সামনে একটা খোলা জানলা। বাইরের পৃথিবীর সামান্যতম যোগসূত্রটির দিকে তাকিয়ে থাকে খুশি। কে যেন উঁকি মারছে না জানলা দিয়ে? রোগা-রোগা মুখ, বড়-বড় চোখ!

'বলি অ-খুকি, অ-খুকি!'

আরে, লোকটা যে ওকেই ডাকছে! খুশি চমকে যায় মনে-মনে। ভয়ও পায় না যে, এমন নয়। জানলার ধারে লোকটা সম্পূর্ণই উদয় হয়েছে ততক্ষণ। বলে, 'একটু শোন তো খুকি।'

'কাকে খুকি বলছো তুমি?' খুশি বেশ কড়া হতে চেষ্টা করে মুখের ভাবে ও গলার স্বরে।

'এই তোমাকে গো দিদিমণি! এইখান দিয়ে যাচ্ছিনু, তোমাকে দেখে একটু দাঁড়ালুম।' অম্লানবদনে বলে চলে লোকটা।

'আমাকে দেখে দাঁড়ালে কেন?'

'তা দাঁড়াব না দিদিমিণি? কার মুখ দেখে আজ উঠেছিনু তাই তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।'

'না না তুমি যাও! তোমায় আমি চিনি না!' রীতিমতো ভয় পেয়ে গেছে খুশি।

'তা আর চিনবে কী করে দিদিমণি! খেতে না পেয়ে-পেয়ে উপোসে-উপোসে সে চেহারা কী আর আছে। তা দাও না দিদিমণি কিছু পয়সা, পেটভরে একবার খেয়ে আসি!'

'না না পয়সা-টয়সা হবে না। বাড়িতে এখন কেউ নেই। তুমি যাও!'

'উঃ, কলকাতা শহরটা কী অদ্ভুত!' মনে-মনে ভাবে খুশি।

'অ বাড়িতে কেউ নেই বুঝি!' লোকটা যেন উৎসাহিত হয়ে ওঠে। 'তাতে কী হয়েছে! তা বেশ তো...যাও না তোমার মা'র বাক্স থেকে গোটা দুই টাকা নিয়ে এসো দেখি চট্ করে! কেউ জানতে পারবে না।'

লোকটা বলে কী! খুশি এবার সত্যি-সত্যি রাগে, ভয়ে ও বিস্ময়ে চিৎকার করে ওঠে—'কী যা তা বকবক করছ। আমার মা'টা কেউ নেই। বাড়িতে এখন আমি একা!'

'অ! একা বলে বুঝি তোমার ভয় করছে? তা ভয় কী? এই তো আমি আছি। আমি বরং ভেতরে গিয়ে বসছি ততক্ষণ!'

'না না তোমায় ভেতরে আসতে হবে না। খবরদার বলছি ভেতরে এসো না...এসো না বলছি।' খুশি যেন আর্তনাদ করে ওঠে।

'তা কি হয় দিদিমণি!' ভালোমানুষের মতো চোখ মুখ ঘুরিয়ে বলতে থাকে লোকটা,

'তুমি একা আছ আর আমি না এসে পারি। আমি থাকতে তোমার কিছু ভয় নেই দিদিমণি! চেহারা এমন হলে কী হয়, এই রোগা হাড়ে ভেলকি খেলে...একেবারে ভানুমতির ভেলকি। গুন্ডা বদমাশ কাছে এয়েছে কী অমনি কুপোকাত...এই দেখো না হাতের গুল্।' লোকটা লিকলিকে শির-ওঠা হাত পাকাতে থাকে।

ও মাগো! ছুটে পালিয়ে যায় খুশি! লোকটা নির্ঘাত চোর না হয়ে যায় না!

'ওমা, দিদিমণি সত্যি ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল যে!' লোকটা যেন হতভম্ব হয়ে যায়।

লোকটার কাছ থেকে সরে এসেও ভয় কাটে না খুশির। বলা যায় না লোকটা আবার কী করে বসে। ওর পেছনে যে দলবল নেই তাও ঠিক করে বলা চলে না। ভয়ে কাঁপতে থাকে খুশি। এতটুকু মেয়ে হয়ে ডাকাতের সঙ্গে একা লড়বে কী করে সে?

হঠাৎ কানাগলিতে কার পদশব্দ শুনতে পাওয়া যায়। মেয়েলী জুতোর শব্দ। উৎসাহে উঁকি মেরে দেখে খুশি, যদি কাউকে পাওয়া যায়! একটি মেয়ে, বয়সে ওর দাদার চেয়ে কিছু কম হবে, পরনে সাদাসিদে শাড়ি, খুট-খুট করে যাচ্ছে সামনে দিয়ে। গলির শেষে একটা বাড়ি। দরজার মাথায় একটা সাইনবোর্ড লাগানো। তাড়াতাড়িতে পড়া হয় না খুশির। পড়বার মতো মনের অবস্থা তার নয় তখন, তবে বাড়ির ভেতর থেকে কেমন একটা খটাখট আওয়াজ আসছে কারখানার মতো।

মেয়েটিকে পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে খুশি। বুকের ভেতর ডবল করে ঢিপ-ঢিপ করতে থাকে। কাঁপা গলায় হাঁক দেয়, 'শুনছেন, শুনছেন!'

মেয়েটি এগিয়ে আসে, 'কী হয়েছে কী?'

'আমাদের বাড়িতে একটা—একটা ডাকাত এসেছে।' ফস্ করে বলে ফেলে খুশি!

'ডাকাত!' বিস্মিত হলেও হাসি পায় যেন মেয়েটির।

'হ্যাঁ, খুনে, বদমায়েস ডাকাত!' যতরকম ভয় পাওয়ার মতো কথা জানা আছে, খুশি বলে যেতে থাকে! 'দেখুন না, এত করে বলছি কিছুতেই যাচ্ছে না!'

'ও, তাহলে খুব অবাধ্য, অসভ্য ডাকাত বলতে হবে তো! কিন্তু এমন দিন-দুপুরে ডাকাত এল কী করে?'

'আমি একলা আছি কিনা তাই!'

'এই এত বড় বাড়িতে তুমি একলা আছ? আর কেউ নেই!' মেয়েটি এবার সত্যি-সত্যি অবাক হয়। এতদিন ধরে বাড়িটা দেখছে খালি পড়ে আছে। এতদিন ভাঙা ঝরঝরে ছিল ইদানীং চুন-বালির ছোঁয়াচ লেগেছে। কিন্তু এই একলা মেয়ে এখানে এল কী করে?

খুশি বলে, 'না, দাদা আমায় রেখে চাকরের খোঁজ করতে বেরিয়ে গেছে। আমরা আজ সবে এসেছি কি না!'

'ওঃ তোমরা আজ সবে এসেছ।' এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয় ওর কাছে। 'আচ্ছা চল, দেখি কীরকম তোমার ডাকাত।'

'এজ্ঞে কিছু না দিদিমণি। গরিব মানুষ ভিক্ষে করে খাই। দাও না কিছু ভিক্ষে—'

'ভিক্ষে করতে তোমার লজ্জা করে না...জোয়ান মদ্দ কাজ করে খেতে পার না?'

'তা আর পারিনা!' লোকটা যেন কৃতার্থ হয়ে ওঠে। 'মনের মতো কাজ পাই কোথায়?'

'কী কাজ পার তুমি'

'কেন হাট-বাজার রান্নাবান্না!'

'তাই নাকি? বেশ তো এদের তো শুনছি লোক দরকার! কাজ করবে তুমি?'

ওর জবাব দেওয়ার আগেই খুশি বলে ওঠে, 'না, না, ওকে দরকার নেই আমাদের। ওর রকমসকম যেরকম।'

'বেশ তো ও একটু বসুক না, তোমার দাদা এসেই না হয় যা করবার করবে? আমি এখন আসি, কেমন? পাশেই আমি আছি।'

'ভয় নেই তোমার কিচ্ছু!' মেয়েটি চলে যেতে চায় এবার। যাওয়ার আগে লোকটাকে প্রশ্ন করে, 'তোমার নাম কী?'

'নাম? নাম দুর্লভ ঠাকুর গো—দুর্লভ ঠাকুর।'

'দুর্লভই বটে।' পাতলা হাসিতে ঠোঁট রাঙিয়ে মেয়েটি চলে যায়!

খুশি বলে, 'আপনার নাম তো বলে গেলেন না? আমার ভয় করলে আপনাকে কী বলে ডাকব?'

'আমার নাম প্রণতি!'

কানাগলিতে অদৃশ্য হয়ে যায় মেয়েটি!

মুহূর্তের নিস্তব্ধতায় কানাগলির সেই সাইনবোর্ড লাগানো ঘরটা থেকে আওয়াজ ভেসে আসে খটাখট-খটাখট।

তিন

কানাগলির সেই সাইনবোর্ড লাগানো বাড়ি, যেখান থেকে শব্দ আসে খটাখট-খটাখট, সেই বাড়ির সাইনবোর্ডের লেখাটা স্পষ্ট হয়ে আসছে এবার। সেখানে বড়-বড় করে লেখা 'নবজীবন প্রেস'। তারও নিচে ছোট করে লেখা 'নতুন খবর কার্যালয়'।

প্রথমটা দেখলে হেসে ওঠে লোক। এই স্যাঁৎসেতে কানাগলির মধ্যে আবার নবজীবন? বলে নতুন খবর?—সোনার পাথরবাটি? কেউ অজ্ঞাত প্রেস মালিকের রসজ্ঞানের তারিফ করে, কেউ আবার বলে চোরের আড্ডা। কেউ-কেউ বলে, খবর তো সেই একটাই—আদি ও অকৃত্রিম—এই কানাগলিতে লোকের চোখে ধুলো দেওয়ার একটা কল মাত্র, এর আর নতুন পুরনো কী?

কিন্তু যারা জানে, তারা বোঝে 'নতুন খবর' কী ও কেন? এই কানাগলির একপ্রান্তে এই ভাঙা নড়বড়ে বাড়ির মধ্যে থেকে যে আওয়াজ নির্গত হয় প্রতিনিয়ত, সে আওয়াজ কী খবর, কী আহ্বান বহন করে আনে! যাদের মনের সে সংবেদন আছে তারা উপলব্ধি করতে পারে একপাশে পড়ে থাকা জীবন থেকে কী করে বেঁচে থাকার দাবির উদ্বোধন ঘটে! উত্তাল বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের বুকে কাগজের নৌকার মতোই যে অতলগামী জাহাজখানা, তার আর্তনাদ যতই ক্ষীণ হোক, কত সুদূরস্পর্শী, কত প্রাণময়!—একথা বোঝে যে থাকে সেই নিমজ্জমান জাহাজের একজন হয়ে।

কথাটা সত্যিই মিথ্যে নয়। খবর আসলে একটাই। বিত্তশালী প্রতিপত্তিশালীদের মনোহর চক্রান্তের চাপে পড়ে যেখানে গণমত পদদলিত, পিষ্ট, কণ্ঠরুদ্ধ, সেখানে সেই মুখোশধারী দেশসেবক জননায়কদের স্বরূপ প্রকাশের ক্ষীণ অথচ দৃপ্ত আওয়াজ ধ্বনিত করে তোলা জনগণকে সচেতন করে তোলার নিত্য নতুন প্রচেষ্টা মাত্র। একই খবর শুধু নতুন করে বলা, নতুন জোর দিয়ে বলা।

এই প্রেসের যিনি কর্মাধ্যক্ষ, যিনি পরিচালক, তাঁর জীবনের একটা ইতিহাস আছে,

অনেকটা এই কানাগলির স্যাঁতসেঁতে অন্ধকারে মতোই আশাবাদী সে কাহিনি। অল্প বয়সে অভাবে পড়ে নিবারণবাবুকে কাজ নিতে হয়েছিল এক পত্রিকা কার্যালয়ে। কম্পোজিটার ছিলেন। অন্ধকার আর ভাঙা এক ঘরে টুলের ওপর বসে একইভাবে প্রত্যহ ঘণ্টার পর ঘণ্টা অক্ষরের পর অক্ষর সাজিয়ে যেতেন তিনি কপি ধরে। তিনি একা নন, তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরও কয়েকজন লোক যারা অক্ষর সাজিয়ে চলত একটির পর একটি।...সেই সাজানো অক্ষর ছাপাখানার যন্ত্রে বৈদ্যুতিক শক্তিতে ছাপা হয়ে চলত। তারপর যখন বার হত পত্রিকা-আকারে তখন পাঠক মহলে সেই অক্ষরগুলো যে কী চাঞ্চল্য আনত তা এখনও মনে পড়ে নিবারণবাবুর। সম্পাদকের নামটা থাকত কাগজের নামের ঠিক নিচে। জ্বলজ্বল করত নিবারণবাবুর নিজে হাতে সাজানো বাছা বাছা ভালো বেশি পয়েন্টের অক্ষরগুলো দিয়ে লেখা সম্পাদকের নাম। জ্বলজ্বল করত একইভাবে, পরিচালকের নাম, প্রকাশকের নাম।...নিবারণবাবু পড়ে দেখেছেন কতবার...আগুনের মতো মনে হতো লেখাগুলো। যে লেখাগুলো অক্ষর সাজানোর সময় সেই অন্ধকার ঘরে শুধু কতগুলো পোকার মতো কিলবিল করত, সেগুলোই ছাপার পর জ্বলত আগুন হয়ে।...ইলেকট্রিক আলো একটা ছিল। কিন্তু তার আলো এসে পৌঁছত না নিবারণবাবুর টেবিলে। অনেকবার বলেছিলেন কর্তৃপক্ষকে একটা আলোর জন্যে। ফল হয়নি বিশেষ। জবাব এসেছিল—চোখে না দেখলে কম্পোজিটার হওয়া সাজে না! এটা প্রেস, কাজের জায়গা। এ জবাব শুধু মুখ বুজে শুনে যেতে হয়, প্রত্যুত্তর দেওয়া চলে না—চলে না বিশেষ করে ত্রিশ টাকা মাইনের কম্পোজিটাবের পক্ষে। তাছাড়া জবাব দেওয়ার সময় কোথায়? অন্যদিকে মন থাকলে ফর্মা বাকি পড়ে যাবে! কাজেই কেস থেকে হরফ হাতড়াতে হত নিবারণবাবুকে, তাড়াতাড়ি কাগজ ছাপা হলে মানুষের মনে তাড়াতাড়ি আগুন জ্বলবে। যে কাগজ দেশের দশের—বিশেষ করে চাষি-মজুরদের সেবা ও দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলন করবার ভার নিয়েছে. সেখানে সময় অপব্যবহার করা চলে না।

কাগজের মালিক লোক ভালো। প্রত্যেক দেশনেতা, শিল্পপতি আসা যাওয়া করেন কাগজের অফিসে। দেখা হলে টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে প্রণাম করতে হয় নিবারণবাবুকে। একটু মাথা ঝাঁকিয়ে সরে যান তিনি। কত লোকের যাতায়াত। বলতে গেলে দেশের একমাত্র প্রতিনিধি তিনি। জনমতের কর্ণধারও বটে। শ্রদ্ধা করে তাঁকে জনহিতৈষী হিসাবে।...কাগজের বিক্রি বেড়েছে অনেক। নতুন মেশিন এসেছে। বাড়িটা কাগজের নিজস্ব সম্পত্তি হয়ে গেছে। মালিক গাড়ি কিনেছেন দুখানা। শীঘ্রই একটা বড় ভ্যান কেনা হবে। ম্যানেজারের মাইনে বেড়েছে। মালিকের ছেলেকেই অবশ্য ম্যানেজার করে রেখেছেন। তাতে কাজের সুবিধা হয়। মালিকের অনুপস্থিতিতে কোনও বিঘ্ন ঘটে না। কাগজের পলিসি বজায় থাকে।...সবই বেড়েছে কাগজের বিক্রি বাড়বার সঙ্গে-সঙ্গে। শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে অনেক। কেবল দূর হয়নি নিবারণবাবুর সেই ঘরের অন্ধকার। মাইনেটা বেড়ে হয়েছে ত্রিশ থেকে বত্রিশ এই একাদিক্রমে বিশ বছরের চাকরির পর।

বিশ বছর পরে মনের মধ্যে একটা মস্ত বড় জিজ্ঞাসার চিহ্ন সাপের মতো ফোঁস করে উঠেছে। প্রশ্ন উঠেছে—কেন? কেন এই অসাম্য? কেন এই অসাধুতা, চালাকি? কেন তবে এই দেশের সর্বহারাদের উদ্দেশ্যে এই ফাঁকা আওয়াজ?

খুশিদের বাড়ির পাশে এই অন্ধকার কানাগলির মধ্যে এই নবজীবন প্রেসের খটাখট শব্দের মতো নিবারণবাবুর স্যাঁতসেঁতে জীবনে একদিন আওয়াজ উঠল। এতদিন শুধু অক্ষর দিয়ে যা সাজিয়ে এসেছেন আজকে তা-ই অক্ষরে-অক্ষরে পালন করবার ব্রত নিলেন। একটা

দল গড়লেন এই বঞ্চিত প্রেস-কর্মচারীদের নিয়ে। যাদের সাহস আছে মনে, বিশ্বাস আছে, বিদ্রোহে তারা যোগ দিল তার সঙ্গে। কাজ ছেড়ে দিলেন তাঁরা একজোটে। কিছুটা প্রলোভন এল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে, কিছুটা আবার চোখ রাঙানি ভয়-দেখানো—তাতে কারও-কারও বিশ্বাস হারাল, সাহস টলল, কিন্তু টললেন না নিবারণবাবু নিজে আর তাঁর বিশিষ্ট কয়েকজন সঙ্গী। তাঁরাই এসে জড়ো হলেন এই কানাগলির ভাঙা বাড়িতে। যার যা ছিল সঞ্চয়, জড়ো করলেন ভাঙা ঘরের ভাঙা টেবিলের ওপর। তারপর শুরু হল নবজীবন প্রেস। নতুন খবর বেরুল। সত্যিই নতুন একটা খবর। যারা মুখোশ পরে হিতৈষী সেজে বসে আছে জনগণের শ্রদ্ধার সিংহাসনে, তাদের মুখোশ খোলার দুরন্ত খবর নিয়ে আগুনের মতো জ্বলে উঠল নতুন খবরের পাতার পর পাতা।

সেই থেকে আজও নতুন খবর বেরিয়ে চলেছে মাসের পর মাস, কলেবর তার বেড়েছে, বেড়েছে গ্রাহক। তবে কানাগলির ভাঙা বাড়ি তার বদলায়নি। যে বাড়ি একদিন আশ্রয় দিয়েছিল তাঁকে সে বাড়ি নিবারণবাবু ছাড়েননি। যারা নতুন খবরকে ভালোবাসে তারা এই ভাঙা বাড়িকেও ভালোবাসে। তাই আজও হঠাৎ শোনা কানে কানাগলির মধ্যে খটাখট মেশিন চলার শব্দ চমক লাগায়, হঠাৎ দেখা চোখে বিদ্রুপ জাগায় নবজীবন প্রেসেব সাইনবোর্ডখানা। কিন্তু যারা জানে তারা জানে নতুন খবর কী ও কেন?

প্রণতি খুশির ডাকাতকে শায়েস্তা করে প্রেসে এসে ঢুকল। প্রেসের পিছনে খানকয়েক ঘর নিয়ে বিপত্নীক নিবারণবাবু তাঁর একমাত্র মেয়ে প্রণতিকে নিয়ে থাকেন। কী একটা কাজে প্রণতি বেরিয়েছিল সকালে, মনে ছিল তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে কারণ নতুন খববের সম্পাদক কুঞ্জ মজুমদারকে আজ খেতে বলা হয়েছিল ওদের বাড়িতে। তাড়াতাড়ি ফিরছিল প্রণতি কিন্তু পথে খুশিব ডাকে দেরি হয়ে গেল।

নিবারণবাবু যেন একটু উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। কুঞ্জ মজুমদার এসে বসে আছে অনেকক্ষণ। প্রণতিকে আসতে দেখে কুঞ্জই মন্তব্য করল, 'আমাকে যে আজ নেমন্তন্ন করা হয়েছে সেটা বোধ হয় ভুলেই গেছ প্রণতি—না?'

'না ভুলব কেন? বাড়ি ঢোকবার পথে হঠাৎ পাশের বাড়িতে ধরে নিয়ে গেল যে!'

'ধরে নিয়ে গেল!'

'হ্যাঁ। সে বেশ মজার ব্যাপার, পরে বলবোখন।'

কুঞ্জের সঙ্গে প্রণতির ব্যবহার বেশ সহজ, স্বচ্ছন্দ। কুঞ্জের বয়স ত্রিশেব কোঠা পার হয়েছে। তবে খবরের কাগজে কাজ করছে অনেক দিন। লেখার জোর আছে যতটা, আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা ততটা নয়। একটু অহমিকাও আছে। তবে নিবারণবাবু ওকে নিজে থেকেই কাগজের সম্পাদক করে নিয়েছেন। ওর প্রতি তাঁর বিশ্বাস এখনও অটুট।

কুঞ্জের সহায়ক হয়ে আছে প্রণতি। অনেকদিন একই সঙ্গে কাজ করে পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় এসে দাঁড়িয়েছে। তাই ছুটির দিনেও মাঝে-মাঝে কুঞ্জ আসে। খাবার নেমন্তন্ন একটা উপলক্ষ মাত্র। আজ প্রেস বন্ধ তাই কুঞ্জকে খেতে বলা হয়েছে দুপুরে। অবশ্য একটা জরুরি কাজের কিছু বাকি ছিল, সেটুকু সকালে সমাপ্ত করতে হয়েছে। তার আওয়াজই কানে গেছে খুশির।

একেই তো দেরি হয়ে গিয়েছিল প্রণতির বাড়ি আসতে। তাই আর অপেক্ষা না করেই সবাইকে ভেতরে যেতে ডাকলে।

কিন্তু, ভেতরে যাওয়ার পথে বাধা পড়ল। তিনজন অচেনা লোক অফিস ঘরে এসে ঢুকলেন।

তাঁদের মধ্যে একজন বেশ সুসজ্জিত। বড় চোখ, মোটা ভুরু, উঁচু নাক, মেজাজি নেতার মতো চোখের দৃষ্টি, শেরওয়ানীর ওপর ঝোলানো চাদর। দেখলেই চেনা যায় কোন জাতের লোক ইনি।—যে জাতের বিরুদ্ধে জেহাদ চালিয়ে চলেছে নতুন খবরের স্ফুলিঙ্গ। একটু নজর করতেই ভদ্রলোকের আসল পরিচিতি স্পষ্ট হয়ে আসে মেঘমুক্ত আকাশের মতো, প্রণতির মনে। আর কেউ নয়—ইনি যোগজীবন সমাদ্দার। গায়ের মোটা খদ্দর তার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতাকে মোটা করতে পারেনি আজও। রাজনীতিকে ভাঙিয়ে ব্যক্তিগত নীতির অভিযান চালিয়ে চলেছেন তিনি এখনও। এবারের আগামী নির্বাচনে তিনি তাই একজন বড় প্রার্থী। খুঁটির জোর আছে পিছনে, তাই এ পথে নেমেছেন তিনি। নতুবা অনর্থক এই সব দলাদলির মধ্যে তিনি মাথা দিতেন কিনা সন্দেহ।

সকলের মাঝামাঝি চোখ রেখে এবং সকলের মুখের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে যোগজীবন সমাদ্দার প্রশ্ন করেন, 'এইটেই তো নবজীবন প্রেসের অফিস?'

নিবারণবাবু বিনীত হয়ে বলেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু সে প্রেস আজ বন্ধ!'

একটু ইতস্তত করেন যোগজীবন সমাদ্দার। তারপর বলেন, 'তা হোক, সম্পাদক বা প্রেসের মালিকের সঙ্গে শুধু একটু আলাপ করতে চাই। আপনি—।'

'হ্যাঁ আমিই ম্যানেজার, আর ইনিই নতুন খবরের সম্পাদক কুঞ্জবাবু!'

'ও, নমস্কার নমস্কার।'—এতক্ষণে মৌখিক ভদ্রতাটুকু করেন যোগজীবন। 'আপনাদের সঙ্গে আলাপ করে অত্যন্ত খুশি হলাম। আমায় বোধ হয় চিনতে পারছেন না?—'

কুঞ্জ কথা বলে এইবার। বলে, 'তা আর পাবছি না। আপনি স্বনামধন্য যোগজীবন সমাদ্দার। আমাদের এই ওয়ার্ড থেকেই তো এবার ইলেকশনে দাঁড়াচ্ছেন।'

এই সুযোগে যোগজীবনও যেন বিগলিত হয়ে ওঠেন,—'আপনাদের পাঁচজনের অনুগ্রহ আর আশীর্বাদই আমার ভরসা।'

'অনুগ্রহ আর আশীর্বাদের দরকার কী মশাই! ভোট তো ভোট, ইচ্ছে করলে এ গোটা পাড়াটাই তো আপনি কি'নে নিতে পারেন, তা-কী আর জানিনা।'

প্রণতি চেয়ে ছিল কুঞ্জের মুখের দিকে। কুঞ্জের গলার স্বরে এই উচ্ছ্বাসের আতিশয্যটা তার ঠিক ভালো লাগে না। একটু যেন অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে।

যোগজীবন এক মুহূর্ত কী যেন দেখেন ওদের দিকে, তারপর কুঞ্জর কথা টেনে এনে জবাব দেন, 'ছি, ছি, ও-কী কথা বলছেন? ভোট কি কেনবার জিনিস! আপনারা স্বেচ্ছায় খুশি হয়ে যদি আপনাদের সেবা করবার সুযোগ আমায় দেন তাহলেই আমি ধন্য মনে করব।'

জবাবটা দিলেন নিবারণবাবু। কুঞ্জর মতো তাঁর মুখে কোনও প্রতিফলন নেই তাঁর মনের। শুধু বললেন, 'আমাদের সেবার সুযোগ তো আপনি আগেও পেয়েছেন যোগজীবনবাবু! গরিবদের টাকা নিয়ে ব্যাঙ্ক খুলেছিলেন, তাতে এখন লালবাতি জ্বলছে। হা-ঘরেদের জমি আর বাড়ি তৈরি করে দেওয়ার আশা দিয়ে বিরাট বিল্ডিং-ট্রাস্ট গড়েছিলেন। সে বিল্ডিং-ট্রাস্টের জমি এখনও শূন্যে মিলিয়ে আছে...এখন আবার ইলেকশনে দাঁড়িয়ে আমাদের—।'

কথাটা শেষ করতে দেওয়ার আগেই ধৈর্যচ্যুতি হল যোগজীবনের। তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন গলার স্বর আগের মতো ঠান্ডা রেখে—'আমার ওপর অবিচার করবেন না নিবারণবাবু, সমস্ত প্ল্যান তো এই যুদ্ধেই ভেস্তে গেল। কী দিন সব গেছে বলুন তো'।—যোগজীবনের চোখে যুদ্ধের দিনের অনিশ্চয়তার ছায়া পড়ল চকিতে।

আরও স্থিরভাবে বললেন নিবারণবাবু 'হ্যাঁ, যুদ্ধটা খুব একটা সুবিধার অজুহাত বটে!'

'ঠান্ডা বরফের জ্বালা আগুনের চেয়ে কম নয় বুঝি!'

একেবারেই কথার মোড় ফিরিয়ে দিলেন যোগজীবন সমাদ্দার।

'দেখুন, সে যা হওয়ার হয়ে গেছে, এবার কিন্তু আপনাদের সমর্থন পেলে আমি কী-যে করতে পারি এই দেখুন এই ইলেকশন ম্যানিফেস্টোতে আমি নিবেদন করেছি—।' পকেট থেকে একগোছা কাগজ বের করে পড়তে লাগলেন যোগজীবন দরদ দিয়ে—'ভারতবর্ষ স্বাধীনতার দ্বারে উপনীত। এই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আমরা বহু দুর্ভোগ, বহু নির্যাতন সহ্য করিয়াছি। বহু প্রাণ উৎসর্গ হইয়াছে। বহু গৃহ শ্মশান হইয়াছে। কিন্তু আমাদের এই আত্মত্যাগ বিফলে যায় নাই। আজ সত্য-সত্যই আমরা এক নূতন জীবনের সিংহদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। তবে, স্বাধীনতা শুধু অর্জন করিলেই হয় না, সেই স্বাধীনতাকে—প্রাণ অপেক্ষা মূল্যবান সম্পদকে রক্ষা করিবার উপযুক্ত ক্ষমতা সঞ্চয় করিতে হয়। আমরা যাহাতে আমাদের অগণিত জনগণের অভাব-অনটন মোচন করিতে পারি তাহার জন্য আমাদের সতর্ক দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে যাহাতে আমাদের প্রকৃত প্রতিনিধিগণের হস্তে, অকৃত্রিম সেবকদের ও পরীক্ষিত নেতাদের ওপর আমাদের শাসনভার অর্পিত হয়।—'

যোগজীবন আপনমনেই পড়ে চলেছিলেন। তাঁর বড় চোখ আরও বড় হয়ে উঠছিল। হঠাৎ মাঝপথে নিবারণবাবু বললেন, 'শুনেছি আপনার বক্তব্য, এখন আমাদের কী করতে হবে?'

'অ্যাঁ?' স্বপ্নভঙ্গের মতো শোনাল যোগজীবনের গলার স্বর। বললেন, 'এই নিবেদনটি দয়া করে ছেপে দিতে হবে!'

একটুও সঙ্কোচ করলেন না নিবারণবাবু। অনায়াসে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না...নিবেদন আমরা ছাপতে পারব না!'

'ছাপতে পারবেন না।' একাধারে বিস্ময় ও বিরক্তি ফুটল যোগজীবনের কুঞ্চিত মোটা ভুরুতে। 'ওঃ আপনি ভাবছেন বিনামূল্যে ছাপিয়ে নিতে চাই! না-না বাজার রেটের অনেক বেশি...পাঁচগুণ কি দশগুণ এর জন্যে পাবেন!'

'তা আমি জানি, কিন্তু এখানে বাজার রেটেব কথা হচ্ছে না যোগজীবনবাবু!'

'তাহলে, ছাপতে আপনার আপত্তি কিসের?' সত্যি-সত্যি এবার অবাক হন যোগজীবন।

'আপত্তিটা সত্যি শুনতে চান? খুব মুখরোচক কিন্তু হবে না!'

'তা হোক, আপনি বলুন!' যোগজীবন নিজেকে প্রস্তুত করে নিলেন শোনবার জন্যে।

নিবারণবাবু সোজাসুজি যোগজীবনের মুখের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট করে বললেন, 'আপত্তি এই জন্যে যে এই নিবেদনের একটি বর্ণও আমি বিশ্বাস করি না।'

মস্ত একটা বাজ পড়ার মতো শোনাল নিবারণবাবুর গলার স্বর। সকলে নিস্তব্ধ হয়ে গেল এক মুহূর্তে। সামনেই দাঁড়িয়ে যোগজীবন সমাদ্দার—গোটা ওয়ার্ডটা যাঁর মুঠোর মধ্যে।

কুঞ্জ যেন মনে-মনে অস্বস্তি বোধ করছিল। নিবেদন বিশ্বাস হোক আর না হোক ছাপতে ক্ষতি কী? বরং ছাপলে দু-পয়সা ঘরে আসবে। একটু বিরক্ত হয়েই বলে কুঞ্জ, 'আহা বিশ্বাস করুন না করুন তাতে কী আসে যায়? এ তো আপনার নিজের কথা নয়। পরে যা খুশি লিখুক না। ভালো দর পেয়ে আপনি ছাপছেন! এতে আপনার দায়টা কিসের?'

নিবারণবাবু কুঞ্জকেই জবাব দেন। 'দায় একটু আছে বইকী কুঞ্জবাবু! এ প্রেসে

যোগজীবনবাবুর এ নিবেদন ছাপলে ওর সঙ্গে নিজেদেরও খানিকটা জড়িয়ে ফেলতেই হয়!'

যোগজীবন একটু বাঁকা স্বরেই বলেন, 'জড়ালে আপনার লাভ, লোকসান নেই নিবারণবাবু! আপনার এই প্রেসের আর সাপ্তাহিক কাগজের চেহারাটাই তাতে ফিরে যেতে পারে—সেটা ভেবে দেখেছেন?'

নিবারণবাবু একটু হাসলেন। 'ভেবে দেখেছি বলেই তো এত আপত্তি। চেহারা বদলালে, চরিত্রটা বাঁচাতে পারব না তাই এত ভয়!'

যোগজীবন গম্ভীর হলেন আর একটু। বললেন, 'তবু আর একবার ভেবে দেখবেন নিবারণবাবু—অনেক বড়-বড় প্রেস শহরে আছে, কাগজও শুধু এই একটি নয়। নেহাত আপনি পাড়ার লোক তাই...।'

কথাটা শেষ করতে দিলেন না নিবারণবাবু যোগজীবনকে। নিজেই বলে উঠলেন—'তাই যত ক্ষীণই হোক নিজের পাড়া থেকে কোনও বেসুরো গলা যাতে না শোনা যায়...তার ব্যবস্থা করতে চান, কেমন! অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যোগজীবনবাবু যে আপনার সোনার ফাঁসে আমাদের গলাটা বাড়িয়ে দিতে পারলাম না!'

কথাটায় একেবারে ছেদ টেনে দিয়েছিলেন নিবারণবাবু চরম বাক্য দিয়ে। কিন্তু তার ওপর যোগজীবন জোর করেই আরও কতগুলো কথা যোগ করে দিলেন। বললেন, 'সোনার ফাঁস যারা হেলায় ঠেলে ফেলে, অনেক সময় দড়ির ফাঁসই তাদের কপালে জোটে, সেটা বোধহয় আপনার জানা নেই!'

যোগজীবনের মোটা ভুরু বিদ্যুতের মতোই এঁকেবেঁকে উঠল। গলায় ধ্বনিত হল তার শব্দ।

সঙ্গীদের নিয়ে প্রস্থান করলেন তিনি।

নিবারণবাবু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। মুখে ফুটে উঠল অল্প-অল্প হাসির রেখা।

কুঞ্জ যেন আর্তনাদ করে উঠল। বললে, 'বড় সুবিধের মনে হচ্ছে না নিবারণবাবু! একেবারে ভীমরুলের চাকে হাত দিয়েছেন। একা যোগজীবন সমাদ্দার হলে কথা ছিল, ওর পেছনে কে আছে জানেন? কত বড় ওর খুঁটির জোর? সাত-সাতটা কাগজ যার হাতে যোগজীবনকে সে-ই তো দাঁড় করিয়েছে। সমস্ত ছাপাখানার চুলোর টিকি যার হাতে বাঁধা!'

কুঞ্জ নিবারণবাবুর চোখে একটা আশঙ্কার ছায়া দোলাতে চেয়েছিল। কিন্তু শীতের আকাশের মতো নিবারণবাবুর মুখে কোনও পরিবর্তন দেখা গেল না।

তবে, মনে-মনে একটি নাম তিনি আবৃত্তি করছিলেন। সে নাম ধরণীধর চৌধুরী।

চার

মুখে অনুচ্চারিত রাখলেও মনে-মনে যোগজীবন এই একই নাম বোধহয় উচ্চারণ করেছিলেন নিবারণবাবুর সঙ্গে—সে নাম ধরণীধর চৌধুরী। বিদ্যুতের চকিত আলো খবর নিয়ে আসে ঝঞ্ঝার—দুর্যোগের, তাই নবজীবন প্রেস থেকে বেরিয়ে আসবার সময় যোগজীবনের মোটা ভুরু বিদ্যুতের মতোই এঁকেবেঁকে উঠেছিল। এবং সেই সঙ্গে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল একটি ইঙ্গিত নিবারণবাবুর মনের আকাশে। একটি নাম মনে-মনে আবৃত্তি করেছিলেন নিবারণবাবু! ধ-র-ণী-ধ-র চৌ-ধু-রী!

নবজীবন প্রেস থেকে বেরিয়ে যোগজীবন সমাদ্দার এসে উপস্থিত হলেন ধরণীবাবুর

বাড়িতে। স্যাঁতসেঁতে কানাগলির ভাঙা বাড়ির আবহাওয়া থেকে রাজপথের এই অট্টালিকা! রাজপথের এত আলো এই আলো দিয়ে ঝলসে দিতে পারা যায় কানাগলির স্ফুলিঙ্গকে? জল দিয়ে জল বাঁধে, আলো দিয়ে আলোকে বাঁধা যায় না? একফালি হাসি ফুটে উঠল যোগজীবনের মুখে! পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে গেলেন তিনি। ঠিক এমনি ধরনের ফিকে হাসি হেসেছিল না নিবারণ একটু আগে? আর কী যেন বলেছিল সেই সঙ্গে?— চেহারা বদলালে চরিত্রটা বাঁচাতে পারবে না তাই এত ভয়? আবার হাসলেন যোগজীবন! পিপীলিকার ডানা কেন ওঠে মনে আছে নিবারণের? বত্রিশ টাকা মাইনের সেই ঘুপসি ঘরের কম্পোজিটার নিবারণ মিস্তির!

বারান্দা পেরিয়ে ধরণীধরের বসবার ঘর। অবশ্য এই বসবার ঘরে ধরণীধর ছাড়া আর সকলে বসে। সেটা জানা আছে যোগজীবনের। এই দুপুরে হয়তো দেখা যাবে ধরণীধর বসে আছেন ঠিক বারান্দাটার ওপর। আশেপাশে বসে আছে সেক্রেটারি আর স্টেনোর দল। হাতের কাছে একটা টেলিফোন রিসিভার। রিসিভারটা মুঠোর মধ্যে নাড়াচাড়া করার মতোই হাজারটা কারবার মুঠোর মধ্যে নাড়াচাড়া করছেন ধরণীধর। অবলীলাক্রমে!

আন্দাজটা মিথ্যে হল না যোগজীবনের। বারান্দার একপাশে একটা তক্তপোষের ওপর বসে আছেন ধরণীধর। আদুড় গা, হাঁটু অবধি কাপড়! একজন চাকর এক বাটি তেল নিয়ে গা ডলছে। পাশে একজন স্টেনো—চেহারাতে ফিরিঙ্গি বলে মনে হয়। ফিটফাট কেতাদুরস্ত চেহারা এই পরিবেশে কেমন যেন বেমানান। আরও কয়েকজন যুবককে দেখা যাচ্ছে—ধরণীধরের একজিকিউটিভ!

ধরণীধরের বয়স হয়েছে বেশ কিন্তু এখনও শক্ত সমর্থ চেহারা। গায়ের চামড়া তেলের পিচ্ছিলতায় আলো ঠিকরানো। একঝলকের দৃষ্টিতে দেখে নিলেন যোগজীবন ধরণীধরকে।

শহরের সেরা-সেরা কাগজের একমাত্র কর্ণধার—জনমতের প্রতীক এই ধরণীধর চৌধুরী। তার ওপর এই কাগজ অনটনের দিনে, ফটকে বিভিন্ন জাতের কুকুর বাঁধার মতো আর সাতটা প্রেসের টিকি বাঁধা ওই হাতের মুঠোর কাছে রাখা টেলিফোন রিসিভারটার সঙ্গে!

ধরণীধর একটি ডিকটেশন দিচ্ছিলেন স্টেনোকে। যোগজীবন দূর থেকেই জোর গলায় হেঁকে উঠলেন, 'আচ্ছা ধরণী, তুমি কি কোনও কালে শোধরাবে না!'

'অ্যাঁ!' ধরণীধর চেয়ে দেখেন গলার স্বর শুনে। বলেন, 'আরে যোগজীবন যে! ব্যাপার কী হে!'

'বলছি কোনও কালে কি আদব কায়দাগুলো শিখবে না? এটা কীরকম অসভ্যতা বল তো!'

'কোনটা?' চোখটা আধবোজা রেখে তেলডলা উপভোগ করতে-করতে বলেন ধরণীধর!

'কোনটা আবার,—এই অসভ্যের মতো এলো গায়ে বসে তেলমাখা!' কাছেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসেন যোগজীবন!

'তেল তো এলো গায়েই মাখতে হয়! তুমি কি জামাজোড়া পরে শাল-দোশালা গায়ে দিয়ে তেল মাখ নাকি?' নিজের কথায় নিজেই হাসতে থাকেন ধরণীধর!

'আহা তা মাখব কেন! কিন্তু এমন সকলের সামনে বসে মাখাটা অভদ্রতা নয়!'

'হতে পারে! কিন্তু ভদ্র হব, এমন কোনও কড়ার তো কারুর কাছে করিনি!'

একটু যেন বিচলিত হন যোগজীবন! সেই সুযোগে ধরণীধর একবার তাকান তাঁর দিকে। যোগজীবন বলেন, 'তোমার মতো লোকের এটা কিন্তু মানায় না!'

'ও, মানায় না!'—আবার একটা তেলের থাবড়া পড়ে পিঠের ওপর! ধরণীধর একটু থামেন চোখ বুজিয়ে। তারপর বলেন, 'কেন, আমি ধরণীধর চৌধুরী কুলির ঠিকাদার থেকে আজ মস্ত বড়লোক হয়েছি বলে? দেখো যোগজীবন! বড় মানুষ হয়ে তুমি ঠিক যেন চোরদায়ে ধরা পড়েছ! তোমায় সাজতে হয় গুজতে হয়, ওই ভেড়ার পালের ফ্যাশন মাফিক চলতে হয়! তোমার মতো আহাম্মুক তো আমি নই। বড় যদি হয়ে থাকি সে কী ওদের আদব কায়দার কাছে দাসখত লিখে দেওয়ার জন্যে!' কথার শেষে অদ্ভুতভাবে হেসে ওঠেন ধরণীধর!

যোগজীবন চুপ করে যান বাধ্য হয়ে। মনে পড়ে যায় ধরণীধরের পূর্ব ইতিহাস। বিহারের কয়লাখনির কুলি-সাপ্লায়ের এজেন্ট ধরণীধর চোধুরীর বিচিত্র জীবনকাহিনি! প্রথম যৌবন তখন তাঁর! গায়ে তখন চর্বির বাহুল্য নেই, আছে প্রতিটি পেশির সুদৃঢ় কুঞ্চন। হাতের মুঠোয় একটি বেটন। পায়ে মিলিটারি বুটের মতো জুতো।...একটি অঙ্গুলি হেলনে দলে-দলে জোয়ান মদ্দ এগিয়ে চলেছে খাদের দিকে...চলেছে কালো-কালো পাথরের মতো মানুষের সারি....সাপুড়ের বাঁশি-শোনা বিষদাঁত ভাঙা সাপের মতো তাদের গতি।...কোনও প্রতিবাদ নেই। তবে হ্যাঁ, যাদের ঘরে আছে জোয়ান বউ...যোগজীবনের চিন্তায় ছেদ পড়ল। ধরণীধর বলে উঠলেন, 'বস হে যোগজীবন, আমি এই চিঠিটা শেষ করে দিই...!' তারপর স্টেনোর দিকে ফিরে বলেন, 'হ্যাঁ, লেখো, শালা বদমাস, তোমার মতো ছুঁচোকে কী করে সিধে কবতে হয় ভালো করেই আমি জানি...তিনদিনের ভেতর আমার মাল যদি পৌঁছে না দাও তো টুঁটি চেপে ধরে চোদ্দো পুরুষের নাম ভুলিয়ে ছেড়ে দেব!'

যোগজীবন সত্যি-সত্যিই চমকে ওঠেন এবার! বলেন .'এটা কী হচ্ছে! চিঠির ডিকটেশন?'

'তাছাড়া কী!' একটুও বিচলিত না হয়ে বলেন ধরণীধর!

'কিন্তু এটা কীরকম ভাষা।.

'ওটা আমার ভাষা!' আবার এক থাবড়া পড়ে তেলের! 'তোমাদের মতো স্কুল-কলেজকে ঘুস দেওয়ার পয়সা তো আমার ছিল না যে লেখাপড়া শিখব!'

'উনি ওই ভাষাতেই লিখবেন নাকি?' দারুণ অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন যোগজীবন মনে-মনে। নাঃ, ধরণীধরের কাণ্ড-কারখানাই আলাদা!

'পড়ুন তো কী লিখেছেন?' যোগজীবনকে শোনাবার জন্যেই বলেন ধরণীধর স্টেনোকে। স্টেনো পড়ে 'টু দি ম্যানেজার—ওরিয়েন্টাল ট্রেডিং কোম্পানি। ডিয়ার সার, আই বেগ টু ইনফর্ম ইউ দ্যাট, ইনস্পাইট অব বিপিটেড্ রিমাইন্ডারস্, দি মেশিন প্রমিজ্‌ড্ আস এ মান্থ এগো, হ্যাজ নট ইয়েট বিন ডেলিভারড্ টু আস। আনলেস দি টার্মস অব আওয়ার কনট্রাক্ট আর ফুলফিলড্ উইদিন থ্রি ডেজ্ ফ্রম ডেট্, উই উইল হ্যাভ নো-আদার অলটারনেটিভ বাট টু টেক লিগ্যাল স্টেপস্ টু রিয়েলাইজ...।'

শেষ হওয়ার আগে হো-হো করে হেসে উঠে যোগজীবন বলেন, 'ওঃ তাই বল! এটা হল অনুবাদ! কিন্তু এতগুলো প্রেসের কারবার তুমি চালাও কী করে তাই ভাবি।'

এই কথার উত্তরে ধরণীধর যে কী বলবেন তা জানা আছে যোগজীবনের। যখনই যোগজীবন বিস্ময় প্রকাশ করেন ধরণীধরের এই অমার্জিত ব্যবহারের এবং অল্প শিক্ষায়

তখনই যেন ভীষণ হয়ে ওঠেন ধরণীধর। সে ভীষণতা ভয়াবহ নয়, সে ভীষণতা তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ আর উপহাসে দুর্বার।

ধরণীধর প্রত্যাশিত ঢঙেই বলেন, 'কেন তোমাদের ওই কেতাবি বিদ্যে না থাকলে বুঝি আর কাগজ চালান যায় না। কাপড় পরতে নিজেকেই তাঁতি হতে হয় বুঝি!'—এই মুখরোচক উদাহরণটির উল্লেখ করতে একবারও ভুল হয় না ওঁর। 'এঁরা তাহলে আছেন কী করতে? বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সব অমূল্য রত্ন...এই আমাদের অবনীবাবু, শশধরবাবু—।'

যোগজীবন এবার অস্বস্তিবোধ করতে থাকেন। আর যাই হোক তিনি নিজে একদিন ছাত্র ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের। সে-কথা ভুলতে পারেন না। ডিগ্রি দিয়ে যে কিছু হয় না তা তিনি মানেন তাই বলে এভাবে লজ্জা দেওয়াটা বরদাস্ত করা যায় না ঠিক।

ধরণীধর ছাড়েন না তবুও। মুখের প্রতিটি পেশির কুঞ্চনে-কুঞ্চনে ফোটে এক কদর্য হাসি। বলেন, 'কই অবনীবাবু, কটা পাস করেছেন শুনিয়ে দিন তো!'

'আজ্ঞে...' ইতস্তত করতে থাকেন অবনীবাবু। কম করে বলবেন কি না ভেবে পান না। এক ঝলক তাকিয়ে দেখেন যোগজীবন ওঁর দিকে। লম্বা রোগা চেহারা। গায়ে একটা ময়লা শার্ট, ময়লা কাপড়, চোখে মোটা কাঁচের চশমা। শরীরে আর কোথাও থাকুক বা না থাকুক চশমার পিছনের চোখ দুটোয় দীপ্তি আছে।

'বলুন বলুন লজ্জা কী? পাশ করার চেয়ে অনেক খারাপ কাজ লোকে করে থাকে। বলে ফেলুন।' —অবলীলাক্রমে লজ্জা দিতে থাকেন ধরণীধর অবনীবাবুকে।

'আজ্ঞে এম.এ.টা পাশ করেছি।' ছোট বয়সের পড়া বলার ভঙ্গিতে কোনগতিকে কথাগুলো মুখ দিয়ে বের করে দেন অবনীবাবু!

হ্যাঁ, ভেবেচিন্তে কম করেই বলেছেন তিনি। জীবনে কোনও দিন সম্মান পাননি নিজের বিদ্যার। কিন্তু তাই বলে বিদ্যাকে অপমানিত করতে পারেন না কোনওদিন নিজে।

কমটুকু পূরণ করে দেন ধরণীধর। 'শুধু এম. এ. বলছেন কেন? বলুন যাকে বলে, একেবারে ফার্স্ট কেলাস ফার্স্ট। আর আপনি শশধরবাবু কী একটা ডাক্তারি না কী?'

'আজ্ঞে ডাক্তার নয়. ডি-লিট্...ডক্টর অব লিটারেচার।'

যোগজীবন চেয়ে দেখেন। উদ্ধত স্বর শশধরবাবুর। পরনে খদ্দরের ছেঁড়া পাঞ্জাবি, মাথায় একরাশ তেলহীন চুল। বড়-বড় চোখে সোজাসুজি তাকানো।

ধরণীধর আর কিছু বলেন না শশধরবাবুকে। যোগজীবনকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'শুনছ, বিদ্যের সব এক-একটি জাহাজ! কিন্তু হালগুলি সব ভাঙা। যেটুকু বা বুদ্ধি ছিল, কেতাবের চাপে তাও ওদের মগজ থেকে বেরিয়ে গেছে। হাতে কলম দিয়ে নেহাত এই চেয়ারে বসিয়ে রেখেছি তাই, নইলে খোলা মাঠে ছেড়ে দিলে চরে খেতে পর্যন্ত পারবে না।'

'এঁরাই তাহলে তোমার গ্রামোফোন—তোমার ভাষাটাকে শুধু একটু মেজে ঘষে শুদ্ধ করে বার করেন।' গাম্ভীর্যপূর্ণ হাসি হেসে মন্তব্য করেন যোগজীবন এতক্ষণে।

তেল মাখানো শেষ হয়েছে ওদিকে। স্টেনো আর স্টেক্রেটারিটা উঠে দাঁড়ালেন যাওয়ার জন্যে। এখানকার কাজ শেষ হয়েছে ওঁদের। বাকি কাজ যা আছে শেষ করতে হবে অফিসে। তাই স্থানত্যাগ করতে হয় ওঁদেরকে।

একটু ফাঁকা হতে ধরণীধর প্রশ্ন করেন, 'তারপর কিছু খবর-টবর আছে নাকি?'

'আছে বইকী? তা-না হলে কী আর শুধু-শুধু এলুম।' যোগজীবন এতক্ষণে আসল কথায় এসে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। 'আজ গিয়েছিলুম নবজীবন প্রেসে—তোমার সেই নিবারণ মিত্তিরের প্রেসে।'

'হ্যাঁ, বুঝেছি বল। অনেকগুলো টাকা পাওনা আছে ওর কাছে। আদায় করে নিতে হবে এই বেলা, দিনকাল যা খারাপ হয়ে আসছে! হুঁ...তা তোমার সঙ্গে আবার সম্পর্ক আছে নাকি?'

'সম্পর্ক ছিল না আজ নতুন হয়েছে—শত্রুতার সম্পর্ক...আজ সকালেই সেখান থেকে অপমান হয়ে এসেছি!'

'অপমান হয়ে এসেছ?' চোখ দুটো বড় হয়ে ওঠে ধরণীধরের।

'হ্যাঁ, আর সেইজন্যেই তো তোমায় বলতে এসেছি এ ইলেকশনে দাঁড়াতে পারব না আমি।'

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা মুখে ধরলেন যোগজীবন।

'কী বলছ কী? এত সব তোড়জোড়ের পর দাঁড়াবে না মানে? এটা কী ছেলেখেলা?'

'তোমার জন্যেই তো শুধু এতে মাথা গলালুম। কতগুলো টাকা গচ্ছা গেল...অপমান হওয়াটা আমার কাছে অন্তত ছেলেখেলা নয়।'

একটু যেন বিচলিত হন ধরণীধর। 'এ আবার কী ছেলেমানুষি আরম্ভ করলে যোগজীবন? ওই কানাগলির নিবারণ মিত্তির এমন কী করেছে? বলেন, কী হয়েছে কী, শুনি না?'

মুখের সিগারেট নামিয়ে নেন যোগজীবন মুখ থেকে। ধরানো আর হয় না। বলতে হয় আজকের সকালের অভিজ্ঞতার কথা। 'জানোই তো পাড়ার মধ্যে ওই প্রেস! ও-ই যদি বেসুরো আওয়াজ দিতে থাকে তাহলে কাজ চলে কী করে? ওই তো কানাগলির মধ্যে একটা চুনোপুঁটি কাগজ, ভাবলুম ও আর শক্ত কী? ইলেকশন ম্যানিফেস্টো ওইখান থেকে ছাপিয়ে নিলেই চলবে! না হয় রেটটা একটু বেশি করে'—বুড়ো আঙুলের নখের ওপর সিগারেটটা একবার ঠুকে নিয়ে একটু নীরব হলেন যোগজীবন। তারপর বললেন, 'আজ গিয়েছিলাম কথাটা পাড়তে...চাই কী একটু তোয়াজ করতে...কাজটা তো হাসিল করতে হবে! জলের মতোই তো পয়সা বেরিয়ে যাচ্ছে, না হয় আরও কিছু...সমুদ্রে পাদ্যার্ঘ...!' নখের ওপর সিগারেটের টোকা পড়ল আবার।—'কিন্তু তোমার ওই প্রেসের ম্যানেজার নিবারণ মিত্তির একেবারে জুতো মেরে ছেড়ে দিলে! সঙ্গে একটা ছোকরাকেও দেখলুম, কুঞ্জ না কী নাম...শুনলুম সে-ই নাকি সম্পাদক! সে ছোকরা মন্দ না...কিন্তু তোমাদের ওই নিবারণ মিত্তির! বলল কি না ছাপতে পারবে না আমার ওই ম্যানিফেস্টো...সব নাকি মিথ্যে ধাপ্পাবাজি!...'

যোগজীবনের ভুরু দুটো আবার বিদ্যুতের মতো চকিত হয়ে উঠল। পকেট থেকে দেশলাইয়ের বাক্সটা বের করে একটা কাঠি নিয়ে ঠুকলেন বারুদের গায়ে। কাঠিটা ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেল। আর একটা কাঠি বের করলেন যোগজীবন।

স্থির হয়ে রইলেন ধরণীধর। কী যেন ভেবে নিলেন মুহূর্তে। তারপর হঠাৎ বলে উঠলেন, 'আরে ওসব ভেবো না তুমি! জুতো মেরেছে মারুক! চাঁদির জুতো ফিরিয়ে মারলেই সব ঠান্ডা হয়ে যাবে। সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না।'

ততক্ষণে দেশলাইটা জ্বলে উঠেছে যোগজীবনের। সিগারেটটা ধরিয়ে নিয়ে বললেন, 'সে হওয়ার নয় যে! সে বড় কঠিন ঠাঁই।'

'আচ্ছা, কঠিনকে নরম করবারও ওষুধ আছে।'
ধরণীধরের মুখের হাসি ধারালো হয়ে উঠল।

পাঁচ

চিঠিখানা পড়তে-পড়তে একটুখানি ম্লান হাসি ফুটে উঠল নিবারণবাবুর মুখে। আজ সকালে লোক মারফত চিঠিটা পাঠিয়েছে ধরণীধর চৌধুরী।

পাশেই বসে ছিল প্রণতি। নিবারণবাবুর মুখের ম্লান হাসি দেখে প্রশ্ন করলে, 'ওটা কার চিঠি বাবা?'

'যে চিঠি আসবে বলে আশা করেছিলুম! সেই ধরণী চৌধুরীর চিঠি! যোগজীবন সমাদ্দারের সেদিনকার সেই চোখ রাঙানি কি ভুলে গেলি মা?'

'না বাবা! কীসের জোরে উনি যে দাঁড়িয়েছেন ইলেকশনে তা আর কে না জানে? দেখেছ, ধরণীবাবুর হাতের সবগুলো কাগজে যোগজীবন সমাদ্দারের নামে কীরকম প্রোপাগান্ডা চালিয়েছে!'

'হুঁ। এদের জন্যেই আমাদের দেশটার সর্বনাশ হয়ে গেল। এতখানি মিথ্যা, এতখানি জোচ্চুরি বোধহয় অন্য কোনও দেশের লোক বরদাস্ত করতে পারত না। পারে না। আমাদের এই পোড়া দেশে নেতারা যা বলবে তাই একেবারে মহাভারতের মতো মেনে নেবে। একটু বিচার করে দেখবে না এর মধ্যে কোনও সত্য বস্তু আছে কি না। যাদের মধ্যে সত্যিকারের সিনসিয়ারিটি আছে তাদের কোনও স্থান নেই এদেশে। অথচ কাজের সময়, প্রাণ দেওয়ার সময়, জেলে পচবার সময় তারাই আসে এগিয়ে।

'তাঁরা তো আর নামডাক চান না। তাঁরা কাজ করতে এসেছেন দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার তাঁদের কাছে পবিত্র কর্তব্য। লোকে মান্য করুক না করুক, ভোট দিক না-দিক, তাঁরা তাঁদের কাজ ঠিক করে যাবেনই!'—হাতের মুঠোর মধ্যে কাঁচের পেপার ওয়েটটা নাড়তে-নাড়তে বলল প্রণতি।

'সে কথা ঠিক! তবে কী জানিস, আজ যখন দেশ স্বাধীনতা পেতে চলেছে, তখন আর চুপ করে থাকলে চলে না। ইংরেজকে তাড়িয়ে তার জায়গায় যদি কতগুলো মুনাফাখোর জোচ্চোরদের দিই বসিয়ে, তাহলে দেশের প্রতি যে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়। যত ক্ষীণই হোক, নতুন খবর সেই আওয়াজ তুলে যাবে। টাকার লোভ দেখাল যোগজীবন। ডবল রেট, পাঁচগুণ নোট দেবে বলেছিল কিন্তু তবু ছাপতে পারলুম না ওর ওই মিথ্যায় ভরা ইলেকশন ম্যানিফেস্টো! ভেবেছিল টাকার লোভে আমার বিশ্বাসকে—আদর্শকে অন্তত সাময়িকভাবেও বিকিয়ে দেব আমি! কিন্তু ভুল করেছিল যোগজীবন...। নবজীবন প্রেসের অবস্থা হয়তো ভালো নয়, মূলধন কম...দেনা রয়েছে বাজারে...দেনা রয়েছে ধরণী চৌধুরীর কাছে...। কিন্তু যতদিন বেঁচে আছি ততদিন আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা তো করে যাব।...কুঞ্জবাবু পর্যন্ত মত বদলেছিল...দোষ নেই...অল্প বয়েস...।

'কিন্তু দেনার টাকাগুলোর কী ব্যবস্থা হবে বাবা!' প্রণতি জিজ্ঞাসু হয়ে তাকায়।

'একটা কিছু করতে হবে। হয়েও যাবে! তবে ভাবনা হয় বইকী! আদর্শের ওপর বিশ্বাস ছাড়া মূলধন তো কিছু নেই।...এই এতগুলো কম্পোজিটার সবাই মিলে টাকা জমিয়ে একটা প্রেস করা গেল। ছোট হলেও এর মূল্যও অনেক! একে রক্ষা করতে হবে বইকী!'—একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন নিবারণবাবু। চোখের ওপর একটা যেন পর্দা নেমে আসে

অনিশ্চয়তার।

প্রণতি নখ দিয়ে খুঁটতে থাকে পেপার-ওয়েটটা অর্থহীন ভাবে। খানিক পরে বলে, 'কিন্তু চিঠিটার কথা তো বললে না?'

'ও হ্যাঁ।' ভাবনার ঘুম থেকে উঠে নিবারণবাবু বললেন, 'লিখেছে ধরণী চৌধুরী। প্রেসের যন্ত্রপাতি টাইপ ইত্যাদির জন্য কত হাজার টাকা পাওনা আছে ওর, সেগুলো শোধ করে দিতে বলেছে তাড়াতাড়ি...তা না হলে ও নাকি প্রেস তুলে নিয়ে যাবে।'

'সে কী? খেয়াল মতো তুলে নিয়ে গেলেই হল। কিন্তু দেওয়ার একটা সময় তো আছে?' প্রণতি বিস্মিত ও রাগত স্বরে বলে!

'সেরকম কোনও লেখাপড়া তো নেই!'

কয়েক মুহূর্ত নীরব হয়ে রইল দুজনে।

খানিক পরে নিবারণবাবু বলে উঠলেন, 'আমাদের দেশে সবই অদ্ভুত বুঝলি মা। আমাদের দেশের নেতা হল জনকতক লক্ষপতি কাগজের মালিক। যখন তাদের যা ইচ্ছে তখন জনসাধারণকে দিয়ে তাই বলাচ্ছে! যে নেতাকে ইচ্ছে তুলছে, যাকে ইচ্ছে নামাচ্ছে। যাকে একদিন শ্রেষ্ঠ আসন দিচ্ছে তাকেই দ্বিতীয় দিনে জুতো মারতে বাকি রাখছে। আর আমাদের অজ্ঞ জনসাধারণ সবই মেনে নিচ্ছে নীরবে। ওদের মস্ত বড় বাড়ি, মস্ত বড় প্রেস, হাজার-হাজার কাগজ বিক্রি ওদের কথা সত্যি হোক, মিথ্যে হোক, লোকে চোখ বুজে মেনে নেবে। আর আমাদের এই কানাগলির ভাঙা বাড়ি, নড়বড়ে প্রেস...আমরা হাজার বললেও কানে নেবে না কেউ আমাদের কথা...। লোকে মানলেও কী হবে, ওরা তো আমাদের কণ্ঠরোধ করবার চেষ্টা করবে তখুনি। তা না হলে, যোগজীবনবাবুর ইলেকশন ম্যানিফেস্টো ছাপাই নি বলে দেখছ না ভেতরে-ভেতরে কীরকম ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুলেছে ওরা।'

'সবই তো বুঝি। কিন্তু ধরণী চৌধুরীর টাকাটা তো শোধ করে দিতে হবে। তাতে যদি আমাদের সর্বস্ব দিতে হয় তাও দিতে হবে। একটা কাগজ কলম দে তো জবাবটা লিখে দিই!'

'তাই দাও বাবা! বেশ কড়া করেই লিখে দাও নবজীবন প্রেস টাকার ভয়ে কাবু হয় না। ওরা যে মনে করে টাকা দিতে না পেরে নবজীবন প্রেস ওদের কাছে আত্মসমর্পণ করবে সেটা যে মস্ত ভুল, সেটা ভালো করে জানিয়ে দাও।'

পেপার-ওয়েটটা দুম করে বসিয়ে দিল প্রণতি টেবিলের ওপর!

'তাই দিচ্ছি। কিন্তু ধরণীধর কী তাতেও ছাড়বে! অনেকদিন ধরে সুযোগ খুঁজছে সে 'নতুন খবর'কে টিপে মারতে। এ-পথে সফল না হলে অন্য পথে আঘাত হানবে সে! সামনে বড় দুর্দিন আসছে আমাদের। ভাবছি তাই!'

এবার ম্লান হাসিও ফুটল না নিবারণবাবুর মুখে।

পিছনের টিনের চালা থেকে মেশিন চলে-ওঠার আওয়াজ ভেসে আসছিল। ঘটাঘট! ঘটাঘট! ঘটাঘট! ঘটাঘট!

টেবিল থেকে কলমটা তুলে নিলেন নিবারণবাবু হাত বাড়িয়ে।

এতখানি জীবনে প্রচণ্ডতম বিস্ময় অনুভব করলেন নিবারণবাবু পরের দিন সকালে। বেলা তখন আটটা। অন্যদিন এই সময় থেকে শুরু হয় প্রেসের কাজ। আসন্ন নির্বাচনের জন্য বেশি চাপ পড়েছে কাজের। এত সকাল থেকে কাজ করেও কুলিয়ে উঠতে পারা যায়

না। আরও লোক চাই। তাই দরজার গায়ে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে এক টুকরো টিনের সাইনবোর্ড—তাতে লেখা—কম্পোজিটার চাই।

রোজকার মতোই প্রেসঘরের দরজা খুলে নিবারণবাবু অপেক্ষা করছেন। মনটা অনেকটা শান্ত। গত কালই ধরণী চোধুরীকে জবাব দিয়েছেন। বেশ মিঠে কড়া করেই লিখে দিয়েছিলেন যে, টাকার হুমকিতে মাথা নিচু করবে না নবজীবন প্রেস কোনও দিন। সোনার ফাঁসে কণ্ঠরোধ করা যাবে না কোনও দিন নতুন খবরের। প্রয়োজন হয় সর্বস্ব পণ করেই সমস্ত দেনার টাকা শোধ করে দেওয়া হবে। টাকাশোধের ভয়ে প্রেস বিকিয়ে দেওয়া নবজীবন প্রেসের ধর্ম নয়! এই চিঠির জবাবে ধরণীধর অত্যন্ত সহজ সরল ও মোলায়েম করে গুটিকয়েক কথা লিখেছেন মাত্র। তাতে নেই কোনও উষ্মা, নেই কোনও দম্ভ, নেই কোনও চোখ রাঙানি, শুধু লিখেছেন ঃ আপনার ওপর আমাদের বিশ্বাস আছে। আশা করি আপনার সুবিধামতো টাকা পাঠাইয়া দিবেন।

চিঠিটা পেয়ে অনেকটা আশ্বস্ত হয়েছিলেন নিবারণবাবু। প্রণতিও তাই। কিন্তু একেবারে সকল উদ্বেগ দূর হয়নি তাঁর। এই চাল ব্যর্থ হয়েছে বলেই ধরণীধর ছাড়বার পাত্র নন। অন্যপথ, নানা আঁকাবাঁকা সর্পিল পথ জানা আছে ধরণীধরের! সে পথ হয়তো আরও চড়াই উতরাইয়ে বন্ধুর!

আজকের এই সকালের বিস্ময় এই উদ্বেগকে মিশিয়েই যেন প্রচণ্ডতর হয়ে দেখা দিল নিবারণবাবুব চোখের সামনে।...এতদিন ধরে এই কানাগলির এক প্রান্তে বসে বহু আশার, বহু স্বপ্নেব আভাস দেখে আসছেন তিনি। সকাল আটটায় মেশিন চলার প্রথম আওয়াজ বিচিত্র এক ধ্বনির তরঙ্গ তুলে আসছে তাঁব হৃদয়ে। আজ এই প্রথম তার ব্যতিক্রম ঘটল। আজ ওই কানাগলিকে মনে হল দুস্তর মরুর মতো ধু-ধু, মেশিনের নিস্তব্ধতা মস্ত এক ভারী পাথরের মতো চেপে বসল তার মনে! আজ নেই কোনও লোক, নেই কোনও মেশিনের শব্দ!

প্রণতিও স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল মেশিনেব আওয়াজ না শুনতে পেয়ে, ভেতর থেকে তাই ও ছুটে এল বাবাব কাছে, ম্যানেজারের ঘরে। আশ্চর্য, ঘরের মধ্যে একা বসে নিবারণবাবু, দৃষ্টি তাঁর শুধু সামনের পথটার দিকে। সে ঘরে আর কেউ নেই—নেই কুঞ্জ মজুমদার, নেই সাতকড়ি, মনোহর, বলাই...।

প্রেস ঘরে নেই একজনও মেশিনম্যান!

'ব্যাপার কী? কেউ আসেনি কাজে?'

'না।' প্রণতির দিকে না তাকিয়েই জবাব দিলেন নিবারণবাবু।

'সে কী? আজকে তো ছুটি নেই! অনেক কাজ যে বাকি!'

'ছুটি নেই, কিন্তু ছুটি ওরা করিয়ে নিয়েছে।'

'তুমি কী বলছ বাবা?' প্রণতি উত্তরোত্তর বিস্ময়ে অসহ্য বোধ করে।

নিবারণবাবু এতক্ষণে তাকিয়ে দেখলেন প্রণতির দিকে। বললেন, 'তোকে বলেছিলুম ধরণীধর চৌধুরী অত সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। অনেক দূরের পথ, অনেক বাঁকা পথ জানা আছে তার...। সে চায় আমাদের প্রেসকে, আমাদের কাগজকে অচল করে তুলতে—'

'তুমি বলতে চাও যে ধরণী চৌধুরী পেছন থেকে এই ধর্মঘট করিয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

দরজার বাইরে গলার আওয়াজ পেয়ে প্রণতি চেয়ে দেখল। প্রতিদিনের পরিচিত

কণ্ঠস্বর যেন শোনা যাচ্ছে বলে মনে হয়!...ঘর থেকে বেরিয়ে একেবারে গলির দরজায় এসে দাঁড়াল প্রণতি। বাইরে দাঁড়িয়ে প্রেসের ধর্মঘটী কর্মচারীরা। নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল ওরা, প্রণতিকে দেখে থেমে গেল।

ওরা আশা করছিল প্রণতি হয়তো কিছু বলবে ওদেরকে। কিন্তু আশ্চর্য, প্রণতি একটি কথাও বলল না। এক আজব দৃশ্য দেখছে যেন এমনি দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল নীরবে।

ওদের এই বিস্মিত ভিড়ের মধ্যেও আর একটি বিস্ময় ছিল লুকিয়ে প্রণতির দৃষ্টি সেটুকু এড়ায়নি। সে তাই চেয়ে-চেয়ে দেখছিল বহু পরিচিত লোকগুলোর মাঝে নতুন এক মানুষকে। কিছুক্ষণ আগে এই লোকটিকেই যেন বাইরের দরজার কাছে দেখেছিল। 'কম্পোজিটর আবশ্যক' লেখা বোর্ডটির দিকে লোকটি দেখছিল একমনে। কম্পোজিটরির উমেদার ভেবে লোকটিকে সে জানিয়ে এসেছিল যে কম্পোজিটর আর তাদের দরকার নেই। কে এ? কেন এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে এদের সঙ্গে? এ-ও কি ধরণীধরের কারসাজি?

প্রণতির নীরব দৃষ্টির মাঝখানে নিবারণবাবু কখন এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রণতি লক্ষ করেনি।

'এই যে নিবারণদা'—ভিড়ের মাঝ থেকে ডাক শুনে প্রণতি ঘুরে দেখল তার বাবা এসে দাঁড়িয়েছে।

মনোহর বলে উঠল, 'শোন নিবারণদা আমরা আজ থেকে ধর্মঘট করা ঠিক করেছি।'

'কারণ?'

'আমরা টাকা চাই, তোমার ওসব কো-অপারেটিভ স্কীমটিম আমরা বুঝি না।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার ওসব ফাঁকিবাজিতে আর আমরা ভুলছি না—টাকা চাই আমাদের—ওসব ভাঁওতা অনেক হয়েছে, এখন আর চলবে না।'

একসঙ্গে অনেকগুলো গলা কোলাহল করে উঠল।

ঠিক এই সময়েই দেখা গেল কুঞ্জ মজুমদার ছুটতে-ছুটতে আসছে—'ব্যাপার কী, ব্যাপার কী, এত গণ্ডগোল কিসের?'—বলতে-বলতে কুঞ্জ এসে দাঁড়ায় নিবারণবাবুর পাশে।

'আমরা কাজ করব না।'

'আমাদের দাবি মেটাও আগে।'

'ওসব ভাঁওতা চলবে না।'

আবার ঝড় উঠল একটা মিশ্রিত স্বরের।

রেগে যেন আগুন হয়ে উঠল কুঞ্জ। বললে, 'একেবারে মেছোহাটা বানিয়ে তুলেছ যে তোমরা! যা বলবার ভেতরে এসে ভালো করে বলা যায় তো!'

'না না আমরা যাব না।'

'আমরা কাজ করব না।'

'ভালো চাও তো আমাদের কথা শোন।'

আবার কোলাহলের ঝঞ্ঝা!

'আবার হট্টগোল হচ্ছে!' কুঞ্জ যেন মরিয়া হয়ে চেঁচিয়ে উঠল। তারপর নিবারণবাবুর দিকে ফিরে বললে, 'আপনি তাই সহ্য করছেন, আমি হলে'—উত্তেজনায় কথাটা শেষ করতেই পারল না কুঞ্জ।

'আপনি হলে কী করতেন আমরা তা জানতে চাইনি কুঞ্জবাবু, আমরা শুধু নিবারণদা কী করবেন তাই জিজ্ঞাসা করতে এসেছি!'

থতমত খেয়ে গেল যেন কুঞ্জ। অবাক হয়ে দেখল সেই বলাই ঘোষ। যে কুঞ্জের খোঁচায় আগুন জ্বলে সেই কুঞ্জের মুখের দিকে তাকিয়ে যে বলাই কথা বলতে পারত না—সেই বলাই।

কুঞ্জ একেবারে রাগে জ্বলে উঠল।

'বেশ নিবারণবাবুই তোমাদের কথার তাহলে জবাব দিন। আমি চললাম।'

কুঞ্জকে চলে যেতে দেখে ওরাও যেন চুপ হয়ে পড়েছিল। তারই মধ্যে নিবারণবাবুর গলা শোনা গেল—'কী তোমাদের নতুন প্রস্তাব তাহলে বল।'

কে বলবে কথাটা তাই নিয়ে একটু ইতস্তত ভাব দেখা যায় ওদের মধ্যে। শেষটা বলে মনোহর, 'প্রস্তাব আমাদের সোজা—ফেল কড়ি মাখো তেল, এই আমরা বুঝি!'

আর একজন বলে, 'ওসব মিনি মাগনা আমরা খাটতে পারব না।'

'মিনি মাগনা এতদিন তোমাদের খাটিয়েছি বলে কি তোমাদের ধারণা?' মন্থর ও গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করেন নিবারণবাবু!

'শোন নিবারণদা'—বলাই এগিয়ে এসে বেশ শান্ত সুরে বলে—'কথাটা আমি পরিষ্কার করে বলি। সবাই মিলে নিজেদের প্রেস গড়ে তুলবে, নিজেরা তার লাভলোকসানের অংশীদার হবে, এসব ওরা বোঝে না। তুমি যদি আর সবাইকার মতো মজুরি আর মাইনের ব্যবস্থা কর, ওরা ধর্মঘট ছেড়ে কাজ করতে রাজি।'

'তাই কর না দাদা, কাজ কী এসব ঝামেলায়!'—পেছন থেকে ফোড়ন দেয় সাতকড়ি।

'হ্যাঁ আমরা কাজ করব, মজুরি নেব, ব্যস! তোমার প্রেস তোমারই থাক।' বলে ষষ্ঠী।

ভালো করেই জট পাকিয়েছে ধরণী চৌধুরী। ঝুনো গাছের শিকড়ের মতো বিস্তার এর। তাই একটুখানি নীরব থেকে চিন্তা করেন নিবারণ। সামনে ওই কানাগলির দিকে চেয়ে থাকেন খানিকক্ষণ। আগে-আগে তাঁব দৃষ্টিপথে উজ্জ্বল হয়ে উঠত এক বিভিন্ন রূপের পৃথিবী। তাঁর স্বপ্নের গড়া দেশ...। ...আজ আর যেন কিছু দেখা যাচ্ছে না। শুধু ওই স্যাঁৎসেঁতে গলির দু-পাশ ঘিরে পুরোনো ইঁট বার করা দেওয়াল। আর তারই মাঝে উদ্ধত ঐ জনতা—বিভ্রান্ত, বিপথ চালিত।

নিবারণবাবু শুরু করলেন 'তোমাদের সব কথাই শুনলাম। নিজেই প্রেসের মালিক হয়ে বসে, মাইনে দিয়ে তোমাদের রাখতে পারলে যে সব ঝামেলা চুকে যায়, তা আমি জানি—কিন্তু তোমরাও জানো, আমার সারা জীবনের সঞ্চয় খুঁদ কুঁড়ো যা ছিল তা সবই ঢেলে দিয়ে তোমাদের সাহায্য নিয়ে কোনওরকমে ধার করে এ প্রেস আমি শুরু করেছি। বাজারে আমাদের এখনও অনেক দেনা। তোমাদের মাইনে এখুনি চুকিয়ে দিতে পারি এমন কোনও আলাদা সম্বল আমার নেই। তাছাড়া নিজে মালিক হব, নবজীবন প্রেস এ উদ্দেশ্য নিয়ে তো আমি শুরু করিনি ভাই! তোমরা সবাই জানো যে আমি নিজে তোমাদের মতো কম্পোজিটরই ছিলাম, এখনও আছি। অনেক দুঃখ পেয়েছি, অনেক অবিচার অত্যাচার সয়েছি; সম্মান দূরে থাক, নিজেদের ন্যায্য পাওনা থেকেও চিরকাল বঞ্চিত হয়ে এসেছি। তাই বড় সাধ ছিল যে, সত্যিই নিজেদের রক্ত জল করে যারা কাজ করে, তাদের নিজস্ব সকলের একটা প্রেস কোনও মতে গড়ে তুলবো...যেখানে নিজেদের কাজের ষোল আনা দাম সবাই পাবে। মাথা নিচু করে কাউকে থাকতে হবে না। এই স্বপ্ন নিয়েই নবজীবন প্রেস আর নতুন খবর কাগজ শুরু করেছিলাম। তোমাদেরও ডেকেছিলাম তার ভাগীদার হতে। আজ তোমরা

ছেড়ে চলে গেলে, নবজীবন প্রেস আপনিই বন্ধ হয়ে যাবে আমি জানি, তবু আমি নিরুপায়।—' কথার শেষে গলা তাঁর ভারী হয়ে উঠল।

বলাই, সাতকড়ি, ষষ্ঠী...ইত্যাদি প্রায় সকলেই মাথা নিচু করল কথা শুনে। কেবল মনোহর চেঁচিয়ে উঠল, 'উপায় আমাদেরই বা কি আছে শুনি। কবে গাছ বড় হয়ে ফলবে সেই আশায় কত দিন বেগার খেটে মরব। না হে না, বেকুবি যা করবার করেছি, আর নয়।' কে একজন বলল পেছন থেকে 'হ্যাঁ আমাদের সকলের এক কথা...মাইনে দিয়ে রাখতে পার থাকব, নইলে চললাম!'

মনোহর গলাটা আরও একটু উঁচু করে হাত নেড়ে বলে উঠল, 'চল হে চল...সোনা নয়, রুপো নয়, সীসে...সীসে যে চেনে তার আবার কাজের ভাবনা—!'

সত্যি-সত্যিই মনোহর হাত দিয়ে ঠেলে নিয়ে চলল সকলকে। এগিয়ে চলে গেল সকলে বাইরের দিকে। সবার শেষে গেল ষষ্ঠী, সাতকড়ি, বলাই।

ধীরে-ধীরে সকলে বেরিয়ে গেল গলি থেকে।

নিবারণবাবুও ফিরছিলেন ভেতর দিকে, প্রতিমা বিসর্জনের পর যে মন নিয়ে বাড়ি ফেরে লোকে। হঠাৎ গলির মধ্যে একটা নতুন মুখ দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। ভিড়ের মধ্যে এই মুখটিই আকর্ষণ করেছিল প্রণতিকে খানিক আগে। আর তার মনকে দুলিয়েছিল যথেষ্ট সন্দেহে।

'তুমি! তুমি কী চাও?' নিবারণবাবু প্রশ্ন করলেন।

'এখন ঠিক বুঝতে পারছি না।' একটু হাসি মেশানো জবাব এল।

'আমার যা বলবার ছিল সবই তো শুনেছ! এরপর আর কী জন্যে দাঁড়িয়ে আছ?'—একটু যেন শুকনো স্বরেই বললেন নিবারণবাবু!

'সব শুনেছি বলেই তো দাঁড়িয়ে আছি। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্যি এ প্রেস আপনি তুলে দেবেন?'

এই অদ্ভুত প্রশ্নে বক্তার চোখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলেন নিবারণবাবু! সারাদিনের মধ্যে এই বোধ হয় এতটুকু আলো দেখলেন তিনি! বললেন, 'না দিয়ে উপায় কী?'

'কেন! শহরে ওই ক'জন ছাড়া আর কি কম্পোজিটার নেই? যে আদর্শ নিয়ে আপনি প্রেস শুরু করেছিলেন, তাতে বিশ্বাস করবার মতো লোক কি একেবারে দুর্লভ?'

চমকে উঠলেন নিবারণবাবু! সকালের এক বিস্ময় আর এখনকার এই আর এক! সব চেয়ে কম চেনা এই মানুষটি এতদিনের সঙ্গী সাথীর চেয়েও আপন করে কথা বলে কেন? বললেন, 'তুমি বিশ্বাস কর?'

'নিশ্চয়ই করি।' দ্বিধাহীন কণ্ঠ শোনা গেল।

'কিন্তু একলা তোমায় নিয়ে তো প্রেস চলবে না?'

'কেন চলবে না! এই এক থেকেই সহস্র হয়ে দাঁড়াবে না, আপনি কেমন করে জানলেন! সত্যিকার যা বড় কাজ, তা কতজন মিলে শুরু করল তা তো বড় কথা নয়!'

'তোমার কথা শুনে বড় খুশি হলাম বাবা! কী নামটি তোমার?'

'জয়ন্ত!'

'তুমি কি সত্যি কাজ করতে চাও?'

'হ্যাঁ চাই, এখুনি করতে চাই!'

'কিন্তু কাজ যে অঢেল! কী কাজ যে তোমায় দেব বুঝতে পারছি না!' নিবারণবাবু কেমন যেন আচ্ছন্ন বোধ করতে থাকেন!

এতক্ষণ আর একজোড়া দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে ঘিরে রেখেছিল জয়ন্তকে। সে দৃষ্টি এতক্ষণে কথায় প্রাণ পেল। বললে প্রণতি, 'উনি প্রেসের কত দূর কাজ জানেন, জিজ্ঞাসা কর না বাবা!' কথা শেষ করে প্রণতি এক ঝলক তাকিয়ে নিল জয়ন্তর দিকে। তাকিয়ে যেন লজ্জা পেল। একেই না লোক চাই না বলে ফিরিয়ে দিয়েছিল সে!

'না, না সেসব কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না'—বলে চলল জয়ন্ত একবার প্রণতির দিকে তাকিয়ে নিয়ে—'জিজ্ঞাসা করবার কোনও দরকার নেই। কাজটা তো বড় নয়, বড় হল কাজের ইচ্ছা।'

এলোমেলো কথা হলেও তার মধ্যে প্রতীতি অসামান্য।

'তাহলে জয়ন্তকে একটু ওদিকের ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে আয় মা! আজকের জরুরি কাজটা কম্পোজ করুক। কপি তো ওখানেই আছে'—নিবারণবাবু এককথায় আদেশ করে বসলেন।

'কম্পোজ করতে হবে!'—গলার স্বরে ও চোখের দৃষ্টিতে আশঙ্কা ফুটল জয়ন্তের।

'হ্যাঁ, তুমি যে বললে এখুনি কাজ করতে চাও! আগে তো কম্পোজ করতে হবে!'

'হ্যাঁ, নিশ্চয় কাজ করতে চাই!' আবার উৎসাহিত হয়ে উঠল জয়ন্ত আগের মতো!

'তাহলে আসুন আমার সঙ্গে কম্পোজ ঘরে।' প্রণতি বেশ সপ্রতিভ হয়ে ডাক দিল ওকে।

'হ্যাঁ, এই যে যাই।' একটু যেন ত্রস্তপদে এগিয়ে গেল জয়ন্ত ওর পিছনে।

যেতে-যেতে মনে হল জয়ন্তর, যেন সে সেই অরণ্যে প্রবেশ করতে চলেছে, যার ভেতর থেকে মুক্তির পথ আজও রয়ে গেছে অনাবিষ্কৃত। এতখানি অনিশ্চয়তা তার মনের মধ্যে। লেখক সে নিজে। তাদের গ্রামের কাগজে কত লেখা বেরিয়েছে তার। কাগজের অফিসে বসে আওয়াজ শুনেছে ফ্ল্যাট মেশিনের। কিন্তু সেই মেশিনের খুঁটিনাটি কাজের যে অভ্যাস ও কুশলতার প্রয়োজন সেসব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামিয়ে দেখেনি কখনও। কাজেই উৎসাহ যেন নিভে যাচ্ছিল জয়ন্তের। অল্প কয়েক হাত পথ। সেটুকু পেরিয়েই প্রণতি ওকে কম্পোজ রুমে নিয়ে ঢুকল। ঘরের মধ্যে কেসের পর কেস সাজানো রয়েছে...কত রকমের টাইপ, লেড্ ইত্যাদি। ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছিল না। আলো জ্বালল প্রণতি। প্রণতিকেও লক্ষ করছিল জয়ন্ত। কী অবাধ সহজ সরল গতিভঙ্গি। মুক্ত বিহঙ্গের মতো!

'এই বুঝি আপনাদের কম্পোজ সেকশন। বাঃ, বেশ তো!' কথা বলাতে চাইল জয়ন্ত প্রণতিকে।

'হ্যাঁ। বেশ আর কই? এতে কাজ কুলিয়ে ওঠে না।...নিন্ আপনি যেটায় খুশি কাজ করতে পারেন।'

এত সহজে কাজের কথায় নেমে এল প্রণতি! জয়ন্ত যেন একটু অপ্রস্তুত হয়েই বললে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, যেটায় খুশি বসলেই হল! আমার সব সমান।' আলোর নিচের জায়গাটায় বসে পড়ল জয়ন্ত! 'আচ্ছা এখন আপনি যেতে পারেন। আর কিছু আমার দরকার হবে না।' কথায় আর অঙ্গহেলনে তৎপরতা ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করল জয়ন্ত।

'সে কী!' অবাক হয়ে বলল প্রণতি, 'কপিই যে আপনাকে দেওয়া হয়নি!'

'কপি! ও হ্যাঁ, তাও তো বটে। কপিই তো দেওয়া হয়নি! তবে কী জানেন, কপি

ছাড়াই আমার চলে যায়।' কথার মধ্যে সংলগ্নতা হারিয়ে ফেলল জয়ন্ত তাড়াতাড়িতে।

ক্রমশই বিস্ময় বাড়ছে প্রণতির! 'কপি ছাড়াই চলে যায়! কপি না হলে কী করে কম্পোজ করেন?'

'মানে ওই কপিই কম্পোজ করি, তবে কী বলে, মুখস্থ হয়ে যায় কিনা, তখন কপি আর দেখবার দরকার হয় না।' জয়ন্ত একটা মিথ্যে সামলাতে দশটার জালে জড়িয়ে পড়ে।

'ও তাই বলুন!' খানিকটা যেন আশ্বস্ত হয় প্রণতি। আপনার স্মরণশক্তি বুঝি খুব বেশি?

'দারুণ!' —চোখ বড় করে বড়াই জানায় জয়ন্ত।

'কিন্তু এ তো আপনার মুখস্থ জিনিস নয়—নতুন কপি! সুতরাং কপি ছাড়া চলবে না, তবে অনেকখানি আছে। এ বেলায় কি পারবেন'

'পারি কি না, দেখি না চেষ্টা করে। কই দেখি আপনার কপি'—জয়ন্ত হাত বাড়িয়ে দেয় প্রণতির দিকে।

'সাবধান'—শিরোনামা দেওয়া কুঞ্জ মজুমদারের লেখাটা হাতে করে এনেছিল প্রণতি। জয়ন্তের হাতে তুলে দেয়।

জয়ন্ত হাসে। 'বলে, গোড়াতেই সাবধান!'

প্রণতিও হাসে। প্রণতির এই প্রথম হাসি জয়ন্তর সামনে।

'আচ্ছা আমি এখন আসি। কম্পোজ করুন বসে-বসে। ষোল এম ডবল কলম হবে কিন্তু।'

'ষোল এম ডবল কলম!' কতগুলো দুর্বোধ্য শব্দের মতো উচ্চারণ করে জয়ন্ত কথাগুলো আবার যেন শুনতে চায়।

'হ্যাঁ, ষোল এম ডবল কলম!'—অনায়াস ভঙ্গিতে বলে প্রণতি

'ওঃ তাই বলুন, ষোল এম ডবল কলম! হ্যাঃ, ভারি তো ষোলো এম ডবল কলম! আপনি কিছু ভাববেন না। ষোল এম ডবল কলম একেবারে! ষোলোর জায়গায় পনের হবে না।'

লোকটা পাগল না কি? একটু বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকায় প্রণতি একবার জয়ন্তের দিকে। তারপর বেরিয়ে যায় ঘর ছেড়ে।

তার চোখের সামনে যেন এক সীসের জগত। এক একটা টাইপ তুলে নিয়ে দেখতে চেষ্টা করে জয়ন্ত। বার দুয়েক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পাঠোদ্ধার করে টাইপগুলোর। একা 'ক' নিয়েই কী বিপদ। ক আছে, কয়ে উ আছে, কয়ে ঋ'ফলা আছে, র'ফলা আছে...! কপালে ঘাম দেখা গেল জয়ন্তের। মাথার ওপর তাকিয়ে দেখল—নাঃ পাখার নামগন্ধ নেই সেখানে।— 'ষোল এম ডবল কলম!' মুখ দিয়ে আবার উচ্চারণ করে শুনল জয়ন্ত নিজের কানে, যদি তার কোনওরকম অর্থ স্পষ্ট হয়ে আসে তার কাছে। না, অসম্ভব! কম্পোজিটরির চাকরিটা নেহাত সইল না বরাতে!'

একটা হাই তুলে হাল ছেড়ে দিলে জয়ন্ত।

চেয়ে-চেয়ে দেখতে লাগল ও অক্ষরগুলোর দিকে। নিশ্চিন্তে এক একটি খোপে ঘুমিয়ে আছে তারা। যারা নতুন, তারা আলো পেয়ে ঝিলিক দিচ্ছে। কোন সে যাদুকর যার এই মন্ত্র—ষোল এম ডবল কলমের মন্ত্র জানা আছে, তার স্পর্শে এই অক্ষরগুলো হয়তো সজীব হয়ে উঠত। সার বেঁধে দাঁড়িয়ে যেত সৈনিকের মতো। তারপর? তারপর শুধু আগুন...বহ্নিকণা!

নিজের ছাপা লেখাগুলোর কথা মনে পড়ে গেল জয়ন্তের! এই ষোল এম ডবল কলমের মন্ত্র জানা যাদুকরের হাতেই তো সেগুলো প্রাণ পায়। না হলে, কে খবর রাখত জয়ন্তের একসারসাইজ-বুকে পার্কার কলমের আঁকিবুকি। নিজের লেখাগুলো যেন নতুন এক পরিচয় নিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠল ওর চোখের সামনে।...কত রচনা মনে আসতে লাগল ওর...উঃ লেখার কাজ পেল না কেন সে! সে যে সেনাপতি নয়—তাই তো এই ঘুমন্ত সৈনিকের দল চুপ করে আছে ঘুমিয়ে।...বড় অসহায় বোধ হতে লাগল ওর।

চোখের সামনে জ্বল-জ্বল করছে কুঞ্জ মজুমদারের হাতের লেখা 'সাবধান'! মনে-মনে পড়ে চলে খানিকটা। বেশ লেখা। জোরালো ভাষা, সংযত প্রয়োগ নৈপুণ্য। কার লেখা কে জানে? ওই নিবারণবাবুর কি? না কি ওই সহজ সরল-স্বচ্ছন্দ গতি মেয়ের?

ঘরের বদ্ধতায় হাঁপিয়ে উঠল জয়ন্ত। একটা টাইপও সাজাতে পারেনি ও এখনও। পারবেও না নিকট বা সুদূর ভবিষ্যতে।

কীভাবে যে জড়িয়ে পড়ল ও এই প্রেসের সঙ্গে! গোলমাল শুনে এসেছিল ব্যাপারটা কী তাই জানতে! এসে যা শুনল অবাক হয়ে গেল—অবাক হয়ে গেল নিবারণবাবুর কথার ঔজ্জ্বল্যে। এতবড় একটা আদর্শ, এত মহান একটা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে সহযোগিতার অভাবে। মনটা হঠাৎ নড়ে উঠেছিল জয়ন্তের।...তারপর ওই সহজ সরল মেয়ের পথ দেখানো এই অনাবিষ্কৃত পথ অরণ্য আর...আর এই ষোল এম ডবল কলম।

জয়ন্ত টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। পালিয়ে যাবে না কি সে? না পালিয়ে আর উপায় কী? কম্পোজ ছাড়া কি আর কোনও কাজ ছিল না প্রেসে?

নিঃশব্দে বেরিয়ে আসছিল জয়ন্ত কম্পোজ ঘর থেকে। সামনে প্রণতিকে দেখে প্রায় চমকে দাঁড়িয়ে গেল!

'জয়ন্তবাবু!' প্রণতি ছোট করে ডাকল। ডাকবে বলেই আসছিল প্রণতি, তাই ডাকল। কিন্তু তার আগে তারও চমক লেগেছিল। তারই জের টেনে বিস্ময় প্রকাশ করল সে, 'ও কি চলে যাচ্ছেন?'

'না, না যাচ্ছি না! মানে—এই বড্ড দেরি হয়ে গেছে কি না! তাই ভাবছিলাম এবেলা না হয় বাড়ি থেকে ঘুরে আসি!'

'বাড়ি থেকে ঘুরে আসবেন! কতক্ষণে?' একটু যেন বিরক্ত হয়েই বললে প্রণতি।

'কতক্ষণে আর! এই তো যাব আর আসব।'

'ও, বাড়ি আপনার কাছেই বুঝি!'

'কাছেই।'—সত্যি কথাটা বলতে গিয়ে কী ভেবে আবার জয়ন্ত এড়িয়ে গেল। বললে—'না, না কাছে ঠিক নয়...বেশ দূর মানে সেই বাদামতলা!'

'বাদামতলা!' চোখ বড় হল প্রণতির!

'হ্যাঁ, হাওড়ার বাদামতলা!'

'তবে যে বললেন, যাবেন আর আসবেন?'

জয়ন্তের হৃদয়ঙ্গম করতে দেরি হল না, যে বেশ শক্ত পাল্লায় পড়েছে সে! কিন্তু অপ্রতিভ হল না সে। বললে, 'হ্যাঁ, ঠিকই তো যাব আর আসব। তবে এবেলায় আর আসা হবে না বোধ হয়।'

'তাহলে ওবেলায় আসছেন ঠিক?' ব্যস্ততা ফুটে উঠল ওর স্বরে।

'হ্যাঁ সে আর বলতে। কাজ যখন নিয়েছি—আচ্ছা নমস্কার।'

'নমস্কার।'

পালিয়ে বাঁচল এমন ভাবে হন-হন করে চলে গেল জয়ন্ত।

নিবারণবাবু এসে পড়েছিলেন ঠিক ওইখানেই। জয়ন্তকে চলে যেতে আবছা দেখেছিলেন তিনি। তাই প্রশ্ন করলেন প্রণতিকে, 'জয়ন্তবাবু চলে গেলেন নাকি?'

'হ্যাঁ বাবা, বললেন ওবেলায় আসবেন!'—জয়ন্তের কথায় যে ওর বিশ্বাস আছে, সে কথা ওর স্বরে প্রকাশ পেল।

'ওবেলায় আসবেন।' ক্ষুণ্ণ হলেন নিবারণবাবু, 'তা তুই কোথায় যাচ্ছিস মা?'

'এই সামনের বাড়িতেই বাবা। কালকে বললুম না, যে, কারা নতুন এসেছে ও-বাড়িতে। একটা ছোট্ট মেয়ে আর তার দাদা। দাদাকে দেখিনি অবশ্য এখনও, মেয়েটি কিন্তু বেশ মজার। ছোট্ট মেয়ে আর কোনও বড় মেয়েমানুষ নেই বাড়িতে, ঝি-চাকর দিয়ে আর কত করবে বল? তাই একটু খাবার দিয়ে আসতে যাচ্ছি!'

ছোট মেয়ের প্রতি অদেখা স্নেহ জাগল নিবারণবাবুর চোখে।

প্রণতি আর দাঁড়াল না, ভেতর থেকে চট করে একটা টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে এসে বেরিয়ে গেল!

জয়ন্ত এসে দাঁড়িয়েছিল বাড়ির সামনে। ভেতরে যায়নি তখনও। হঠাৎ প্রণতিকে আসতে দেখে সত্যিই থতমত খেয়ে গেল।

প্রণতিও ছাড়ল না। মনে-মনে প্রশ্ন করল—এখানে এ কেন? মুখে বললে, 'এ কী আপনি বাড়ি যাননি? এখানে কী করছিলেন? '

'না এই মানে...এই একটু বাড়িটা দেখছিলুম!'

'না, না আর দেরি করবেন না। কমখানি তো পথ আপনাকে যেতে হবে না। সেই হাওড়ায় কোথায় যেন বললেন?'

কী বলেছিল সে? জয়ন্ত ভেবে দেখল এক মুহূর্ত। মনে এল কী একটা তলা যেন তখন বলেছিল। দেরি করলে চলে না। তাড়াতাড়ি বলে—'পঞ্চাননতলা!'

'আপনি যেন বললেন বাদামতলা!' ছাড়বার পাত্র নয় প্রণতি। স্মরণশক্তি ওর নিদারুণ।

'ওই মানে...তার মানেই তাই...যেখানে বাদামতলা সেখানে পঞ্চাননতলা। বাদাম গাছের নিচেই পঞ্চাননঠাকুর কি না!'

'ওঃ তাই বুঝি! কিন্তু একটু কাছাকাছি কোথাও চেষ্টা করলে কি বাসা পাওয়া যায় না?'

'চেষ্টা কি আর করিনি। কিন্তু জায়গা কি আর শহরে কোথাও আছে?' এতক্ষণে একটা জুৎসই আলোচনা পেয়ে আশ্বস্ত জয়ন্ত।

'তা সত্যি।'—চিন্তিত দেখাল প্রণতিকে। 'এদিকে লোকের মাথা গোঁজবার জায়গা নেই, অথচ দেখুন এই এত বড় বাড়িতে মানুষের অভাবে ঘরগুলো খাঁ-খাঁ করছে। থাকবার মধ্যে একটি ভাই আর একটি বোন! তা ভাইটির আবার এমন দায়িত্বজ্ঞান, যে, এতটুকু বোনকে একলা রেখে সারাদিন যে কোথায় থাকেন পাত্তাই নেই।' সেই ছোট্ট মেয়ের প্রতি স্নেহের আবেগে বলে চলল প্রণতি।

হাসি পেয়ে গেল জয়ন্তের। ইচ্ছে হল বলে, পাত্তা আর থাকবে কী করে, যে পাল্লায় পড়েছে সকাল থেকে, তাতে অস্তিত্ব নিয়েই টানাটানি! মনের ভাব সম্পূর্ণ গোপন রেখে

মুখে খুব দরদ দেখাল জয়ন্ত। বললে—'খুব...খুব অন্যায় তো!'

'নিশ্চয় অন্যায়।' সহানুভূতিতে আরও প্রগলভ হল প্রণতি। 'আমার সঙ্গে ভদ্রলোকের একবার দেখা হলে এমন শুনিয়ে দিতাম!'

'তা শুনিয়ে দেওয়াই উচিত কিন্তু আপনার হাতে ওটা কী?' ইচ্ছে করেই কথাটা ঘুরিয়ে দিল জয়ন্ত।

'কিছু নয়, সামান্য একটু খাবার। কী করি বলুন, ওইটুকু মেয়ে, ও কি আর একলা সব পারে? তাই একটু তরকারি নিয়ে যাচ্ছি!'

'তরকারি আবার কেন?' নিজের অজান্তেই বলে ফেলল জয়ন্ত। মুহূর্তের জন্যে সে বোধ হয় তার বর্তমান অবস্থার কথা ভুলে গিয়েছিল। পরমুহূর্তেই সচেতন হয়ে উঠল সে। বললে, 'আমি বলছিলুম কী, যে ওরকম দায়িত্বজ্ঞানহীন ভদ্রলোকের জন্যে কিছু না করাই উচিত।'

'তা কী করব বলুন। তার জন্যে তো নয়, তার ছোট বোনটির জন্যেই করি। কিন্তু আপনি আর দেরি করবেন না!'

মনে-মনে আরও খানিকটা হাসল জয়ন্ত। খানিকটা যেন বেদনাও খোঁচা দিল মনের আর একদিকে, অকারণে। কিন্তু আর দাঁড়াল না। বলল, 'আচ্ছা আসি।' বলেই চলেই গেল ওখান থেকে।

ছয়

খানিকটা এলোমেলো ঘুরে এল জয়ন্ত। ওই মেয়েটার কাছে পরাজিত হওয়ার চেয়েও সামান্য কম্পোজিটরির কাজ করতে না পেরে বেশি যেন পরাজিত মনে হচ্ছে তার নিজের কাছে নিজেকে। কোনও কাজ না পেরে পালিয়ে আসা এই বোধহয় তার কাছে প্রথম। কিন্তু পালাতে পারেনি জয়ন্ত। ধরা পড়ে গেছে, আর কেউ নয়, ওই প্রণতির কাছেই। অবশ্য তার হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে বেশি সময় লাগেনি ওর। অনর্গল বানানো কথা বলে চলেছে। বাদামতলা, পঞ্চাননতলা...আরও কত কী, এখন হয়তো সে নিজেই মনে আনতে পারবে না সেসব কথা। যখন বলেছিল তখনও মন ছিল না ঠিক। মনটা ছিল আর এক দিকে—ওই প্রণতিরই মনের দিকে, যে দিকটা এড়াতে পেরেছে কিনা সে, সে-বিষয়ে এখনও তার যথেষ্ট সন্দেহ। তাই পথে-পথে ঘুরে এলোমেলো পা চালিয়ে মনটা একটা কাঁটায় স্থির করবার চেষ্টা করছে জয়ন্ত। খুব জোরে দৌড় লাগানো মোটরের স্পিডমিটারের কাঁটার মতোই কাঁপছে সে কাঁটা। থর-থর করে কাঁপছে। ষোল এম ডবল কলম...ষোল এম ডবল কলম...। মাথার ভেতর ঝিঁ-ঝিঁ করছে জয়ন্তের। শির-শির করছে হাতের আঙুল। মনে হচ্ছে একটা কাগজ কলম নিয়ে বসে যায় এই মুহূর্তে...তারপর লিখে চলে তরতর করে। কী লিখবে সে? কিছু একটা নিশ্চয়...। তার ছন্দ যেন ঝমঝম করছে মাথার মধ্যে।...কিন্তু ষোল এম ডবল কলম? সেই সাদা-কালোর আঁচড়ের আগুন করে জ্বালিয়ে তোলার মন্ত্র? সে কী কেউ বলে দেওয়ার নেই?

অনেক ঘুরে-ঘুরে আর অনেক ভেবে-ভেবে শেষটা জয়ন্ত বাড়ি ফিরল। তখন আর প্রণতি নেই ওখানে। যাক আশ্বস্ত হল জয়ন্ত। কেন জানি না, গোড়া থেকেই নিজের পরিচয়টা গোপন রাখবার একটা নেশা যেন পেয়ে বসেছে জয়ন্তকে। সে এখন শুধু কম্পোজিটর—নিতান্তই প্রেসের কর্মচারী। তবু, সন্দেহ হয় জয়ন্তের। যেদিকটা এড়ানো যায়নি বাদামতলা

পঞ্চাননতলার কৃত্রিমতা দিয়ে সেই দিকটার কথা মনে সন্দেহ আনছে ওর!

ইচ্ছে করেই আবার ফিরে গেল জয়ন্ত নবজীবন প্রেসে। কেউ জানল না, সকালে পালিয়ে আসার সময় যে জেনেছিল সে-ও নয়।

কম্পোজ রুমে গিয়ে বসল ও আগের জায়গায়। ষোল এম ডবল কলম...ষোল এম ডবল কলম। কিছুতেই পনের হবে না। ষোলই হবে, ষোলই হবে। আর একবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে চেষ্টা শুরু করল জয়ন্ত।

ছুটিতে বাড়ি ফিরছিল ছোটেলাল—নবজীবন প্রেসের জমাদার। অদ্ভুত মানুষ এই ছোটেলাল। দেহাতি লোক, ভাঙা-ভাঙা বাংলা বলে কিন্তু সে-ই আবার চরম ভাঙনের দিনে নিবারণবাবুর পাশে এসে দাঁড়ায়। এই নবজীবন প্রেস যখন নিবারণবাবুর কল্পনারাজ্যে তখন থেকেই ছোটেলালের সঙ্গে যোগাযোগ। আজ তাই অকুণ্ঠচিত্তে স্মরণ করেন নিবারণবাবু, ছোটেলাল না থাকলে এ প্রেস হয়তো গড়েই উঠত না কোনওদিন।...একদিকে আছে কুঞ্জ তার চাবুকের মতো কলম নিয়ে আর অন্যদিকে ছোটেলাল। এরা যেন এক নদীর দুই পারের মতো। এই দুই পারের কোল দিয়ে বয়ে যায় নদী জোয়ার-ভাঁটায়। ছোটেলাল ছুটি নিয়েছে তাই বুঝি একদিকের জল প্রগলভ হয়ে উঠেছে—ভেঙে গেছে বাঁধ। সেই ভাঙা বাঁধের ফাটল দিয়ে সর্বগ্রাসী লোনা জল এসে ঢুকছে। সে জল প্লাবন জাগাবে। ধরণীধরের ইঙ্গিতে সে জল ডুবিয়ে দেবে সকল স্বপ্নের সবুজ খেত।

ঠিক সেই দিনই বাড়ি থেকে ফিরল ছোটেলাল। এসে অবাক হয়ে গেল। গলির মোড় থেকে প্রেস চলার ছন্দময় ধ্বনি তাকে আহ্বান জানাল না। কম্পোজিটার আর মেশিনম্যানদের কালি-লাগা কাপড় আর গ্রীজধরা জামার একটা নিশ্চিত ছবি দেখা গেল না। অবাক হয়ে গেল ছোটেলাল! আরও এগিয়ে গেল ভেতরের দিক। কম্পোজ রুমে কে যেন বসে কাজ করছে! অচেনা এক যুবক! ছোটেলাল পরম উৎসাহে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল ওর পিছনে।

আরও অবাক হতে হল। এ আবার কেমন ধারা কমম্পোজিটার! সমস্ত ড্রয়ারগুলো টেনে খালি টাইপগুলো হাতড়াচ্ছে আর নেড়ে-চেড়ে দেখছে! রকম-সকম দেখে ছোটেলাল হেসে ফেলল।

'কে?' জয়ন্ত হাসির দিকে তাকাল।

'এ ভেইয়া! এটা হচ্ছে কী?' এক মুখ হাসি নিয়ে প্রশ্ন করে ছোটেলাল।

'কম্পোজ করা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ না? কী চাই তোমার?' নিরিবিলি আবহাওয়াটা ভেঙে যাওয়ায় চোখদুটো বিরক্তিতে সিঁটকিয়ে ওঠে জয়ন্ত! উপহাসের হাসি হাসছে না তো লোকটা!

'কিছু না ভেইয়া! শুনলাম নবজীবন প্রেসে কেউ নাই, খালি এক ভারি কম্পোজিটার কাজ করছে। তাই দেখতে এলাম। কেতো দিন কাজ শিখেছ ভেইয়া!'

'শিখেছি অনেকদিন! তুমি তোমার কাজে যাও দেখি! বিরক্ত কোরো না কাজের সময়।' জয়ন্ত আরও একটু বিরক্ত হয়ে বলে ওঠে। লোকটা সামনে থাকলে একবর্ণও কম্পোজ করতে পারবে না সে। রাগের মাথায় নড়েচড়ে ওঠে জয়ন্ত। ফস করে গ্যালিটা পড়ে যায় মাটিতে। ছড়িয়ে পড়ে টাইপগুলো।

রাগে দুঃখে কেমন যেন হয়ে ওঠে জয়ন্ত। ছোটেলাল এবার সশব্দে হেসে ওঠে। হাসি আর তার থামতে চায় না।

হাসির শব্দ আর কথা শুনে প্রণতি উঠে আসে কম্পোজ রুমে। কথাগুলো তার চেনা, হাসিটাও তাই। তার মাঝে-মাঝে কেবল কতগুলো শব্দ!

প্রণতি বলতে-বলতে আসে, 'কী হল কী?—আরে ছোটেলাল যে, কখন এলে?'

হাসিটা চিনতে ভুল হয়নি তাহলে ওর। ছোটেলালকে দেখে প্রণতির মুখে ফোটে এক অনুচ্চারিত হাসি!

'এই তো এলাম দিদিমণি!' হাতদুটো জড়ো করে মাথা ঝুঁকিয়ে একটা প্রণাম করে ছোটেলাল। বলে, 'ছুটি থেকে ফিরে ভাবলাম প্রেসে না জানে কেতো কাম হচ্ছে; এসে দেখি কোই ভি নেই—সব ভোঁ-ভোঁ, খালি এই কম্পোজিটরবাবু!' তাও আবার কম্পোজিটর বাবুর যেরকম কাজের ঘটাটা সে দেখেছে সেটা কল্পনা করেই হেসে ওঠে ছোটেলাল।

প্রণতির মুখ গম্ভীর হয়ে আসে। ক'দিন থেকে যে-কাণ্ড ঘটেছে প্রেসে, ছোটেলাল যখন শুনবে তখন সে কি হাসতে পারবে এমন করে? কিন্তু, তবু কেন হাসে ও! প্রণতি একটু যেন অবাক হয়েই প্রশ্ন করে, 'কী ব্যাপার কী? হাসছ কেন ছোটেলাল!'

ছোটেলাল কিছু বলার আগেই জয়ন্ত জবাব দেয়। 'হাসছে আমার জন্যে!'

আরও অবাক হয় প্রণতি! জয়ন্তবাবুর মধ্যে হাসির কী পেল ছোটেলাল? জিজ্ঞাসু চোখ দুটো মেলে ধরে প্রণতি জয়ন্তের দিকে, আরও গভীর করে!

'শুনুন প্রণতি দেবী!' টুলটা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে স্থির হয়ে বলে জয়ন্ত, 'আমি আপনাদের মিথ্যে কথা বলেছি! কম্পোজিটরি আমি জানি না!'

'জানেন না?' এক মুহূর্তে পায়েব তলার মাটি যেন কেঁপে ওঠে প্রণতিব।

'না, বিন্দু-বিসর্গও নয়।' প্রণতির বিস্ময়াহত চোখের দিকে তাকিয়ে আরও নির্জলা স্বীকারোক্তি করে জয়ন্ত।

প্রণতির ঠোঁট দুটো কেঁপে ওঠে। গলার স্বরটাও। বলে, 'তাহলে কী জন্যে আপনি মিথ্যে কথা বলে কাজ নিয়েছেন? কেন এভাবে ঠকিয়েছেন বাবাকে? তিনি তো আপনার কোনও ক্ষতি করেননি।'

জয়ন্ত ঠকিয়েছে প্রণতির বাবাকে? হঠাৎ যেন পিছনের আচরণটা নিজের কাছে একটা কালো ছবির মতো ভেসে ওঠে জয়ন্তের সামনে। সমস্ত আস্থা, সমস্ত বিশ্বাস যেন হারিয়ে যাচ্ছে নিজের পায়ের তলার মাটির ওপর থেকে। জয়ন্ত বলে মাটিব দিকে চেয়ে 'এক হিসেবে আপনাদের সত্যিই আমি ঠকিয়েছি। কিন্তু উদ্দেশ্য আমার খারাপ ছিল না।' জয়ন্ত এবার তাকায় প্রণতির দিকে। তাকিয়ে আবার বলে, 'বিশ্বাস করুন!'

প্রণতি একটুখানি নরম করে গলার স্বরটা। বোধহয় হাসি দিয়ে ভেতরের ক্ষোভটা একটু ঢেকেও নেয়। বলে, 'ভালো উদ্দেশ্যে ঠকানো যে কী বস্তু সত্যিই বুঝতে পারলাম না জয়ন্তবাবু!'

প্রণতির হাসি কঠিন করে দেয় জয়ন্তের স্বর। 'একটু ধৈর্য ধরে যদি শোনেন তাহলে হয়তো বুঝতে পারবেন। নেহাত খেয়াল আর কৌতূহলের বশে আপনাদের এখানে প্রথমে আমি ঢুকেছিলাম। তারপর আপনার বাবার কথা শুনে, কী আশা, কী স্বপ্ন নিয়ে এ প্রেস তিনি গড়ে তুলতে চান জানতে পেরে, সত্যিই আমি মুগ্ধ হই। এরকম একটা আদর্শের জন্যে কাজ করার যথার্থই আমার লোভ হয়। একটি অন্যায় শুধু তখন করেছিলাম। আপনি গোড়াতেই আমাকে কম্পোজিটরির উমেদার ভেবে যে ভুল করেছিলেন, সে ভুলটা তখন শোধরাবার চেষ্টা করিনি।'

নীরবে অসীম ধৈর্যের সঙ্গেই শুনে যায় প্রণতি। জয়ন্ত থামবার পরও ঘরটা থমথম করতে থাকে খানিকক্ষণ।

এবার প্রণতির মৃদু স্বর শোনা যায়, 'এ ভুল এখন শুধরেও তো কোনও লাভ হচ্ছে না, কাজ করার লোভ আপনার যতই হোক শুধু তা দিয়ে তো চলে না। কাজ তো জানা চাই জয়ন্তবাবু!'

জয়ন্ত যেন নিজেই এবার কঠিন হয়ে ওঠে। ক্ষুব্ধ একটা প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় ওর কণ্ঠে—জয়ন্ত বলে, 'কম্পোজিটরি না জানলে, প্রেসের কোনও কাজই কী করা যায় না? আর কম্পোজিটরিও কী এমন একটা কাজ, যা শেখা অসম্ভব? আপনার বাবা যা গড়ে তুলতে চান তাতে সত্যিকার আগ্রহ আন্তরিকতার কোনও দাম নেই বলে যদি মনে করেন... তাহলে নমস্কার। আমি নিজেই চলে যাচ্ছি!'

জয়ন্ত যাওয়ার জন্যে এগিয়ে যায় দরজার দিকে। হাত দুটো তার ইতিমধ্যেই জড়ো হয়ে কপালে এসে ঠেকেছে।

প্রণতি কিছু না বলে যেন পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকে।

এগিয়ে আসে ছোটেলাল। মেশিন ঘাঁটা মোটা হাত বাড়িয়ে ছোটেলাল যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। 'আরে কাঁহা যাতে হো ভেইয়া হাত মিলাও!' ছোটেলাল জয়ন্তের ডান হাতটা ততক্ষণে চেপে ধরেছে তার দু-হাতের মুঠোর ভেতর। ছোটেলাল প্রণতিকে বলে, 'শুনো দিদিমণি। ভালো কম্পোজিটার বহুত মিলবে, লেকিন সাচ্চা আদমি থোড়াই আছে। হামি ছোটেলাল আদমি চিনে। জয়ন্ত ভেইয়া আজসে হমার দোস্ত আছে। হামি এনাকে কাম শিখিয়ে দেব।'

স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায় প্রণতি ছোটেলালের দিকে। ওর নীরবতা মুখর করেছে ছোটেলালকে। প্রণতি যেন আরও নীরব হয়ে আসে!

পিছন থেকে আর একটি স্বর ধ্বনিত হয়ে ওঠে। সে স্বর নিবারণবাবুর!

চমকে দেখে সকলে নিবারণবাবুর দিকে। পিছন থেকে তিনি তাহলে সবই শুনেছেন। নিবারণবাবু বলছিলেন 'তা তো দেবে বুঝলাম ছোটেলাল, কিন্তু তোমাদের মতো দুজন সাচ্চা আদমি নিয়ে তো প্রেস চলবে না। মাইনে ছাড়া কাজ করবে না বলে সবাই যে ছেড়ে গেছে তা বোধহয় জানো না!'

নিবারণবাবুকে দেখে মুখে হাসি ফুটতে-ফুটতে মিলিয়ে গেল ছোটেলালের। অবাক হয়ে বলে, 'সবাই ছেড়ে গেছে। এ তো তাদের নিজেদের প্রেস আছে!

'নিজেদের প্রেস তারা চায় না ছোটেলাল! তারা চায় মাইনে নিয়ে চাকরি করতে!'

'মাইনে নিয়ে চাকরি করতে!'

'হ্যাঁ ছোটেলাল। পৃথিবীতে এ-ও ঘটে। আজ যা ছিল—কাল যে তাই থাকবে এমন কোন কথা নেই!'

ছোটেলাল নিজের মধ্যে ডুব দেয় এক মিনিট। চুপ করে থাকেন নিবারণবাবু। চুপ করে থাকে প্রণতি। জয়ন্তও!

ছোটেলালের মুখরতা মিলিয়ে তো যাবেই।

কিন্তু, কথা বলে ছোটেলাল। কী এক গভীর থেকে যেন উত্তর দিয়ে ওঠে! বলে, 'আচ্ছা, আপনি কুচ্ছু ভাববেন না। সব শালাকে কাল দশ বাজে আমি এখানে হাজির করাব।'

'দশটায় হাজির করাবে? কেমন করে ছোটেলাল!' বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে প্রণতি।

'সে দেখে লিবেন। ঠিক দশ বাজে!'

কথাটা শেষ করেই হন-হন করে বেরিয়ে যায় ছোটেলাল ঘর থেকে প্রেস থেকে,...গলি থেকে।

ওদের বিস্ময় ওদের যেন আত্মীয় করে তোলে। নিবারণবাবু আর প্রণতির সঙ্গে জয়ন্তও আশা-আনন্দের চোখে তাকিয়ে থাকে ছোটেলালের নির্গমনের দিকে!

সারাদিন আর বিশ্রাম পেল না ছোটেলাল। সারা কলকাতা টহল দিয়ে বেড়াল।

খিদিরপুরে থাকে ষষ্ঠী। সেখানে গিয়ে হাজির হল সে। ছোটেলালকে পেয়ে বেশ খানিকটা স্ফূর্তিবাজ হয়ে উঠল।

'আরে, ছোটেলাল যে, কবে ফিরলে?'

'আজকে।'

'তারপর জমাদার সাহেব, প্রেসের দিকে গিয়েছিলে নাকি?'

'হ্যাঁ ওইখান থেকেই তো হামি আসছে। বহুৎ গড়বড় হয়ে গিয়েছে।'

'তা যা বলেছ। মাইনে দেবে না কিছু হবে না, কাঁহাতক সব কাজ করা যায়। মুখের কথায় তো পেট ভরে না।'

'হাঁ, হাঁ। ও বাত তো ঠিক আছে।'

'তুমিও কাজ ছেড়ে দাও ছোটেলাল। আমরা যখন সকলেই ছেড়েছি। তোমার আর ভাবনা কী? কাজের লোক তুমি। যেখানে যাবে কাজ পেয়ে যাবে।'

ছোটেলাল একটুখানি গর্বের হাসি হাসল। তারপর গম্ভীর হয়ে গেল।

'কী হে? অমন গম্ভীর হয়ে যাচ্ছ কেন?'

'একঠো বাত ছিল ভাই তুমার সঙ্গে!'

'কী কথা! বলই না!'

'কাল একবার যাবে প্রেসের দিকে?'

'সে কী হে? প্রেস তো আমরা ছেড়ে দিয়েছি। মাইনে না পেলে আমরা কাজ কবব না।'

'লেকিন মাইনে যদি দেয়?'

'মাইনে দিচ্ছেন নাকি নিবারণদা!'

'হাঁ, হামার সঙ্গে তো বাৎ চিৎ হয়ে গেল।'

'তাই নাকি? বাবুর সঙ্গে কথা হল তোমার?'

'জরুর। লেকিন ভারি চুপি-চুপি কথা হল।'

ষষ্ঠীও গলার স্বর নামিয়ে আনে। বলে, 'আমার কথা কিছু হল নাকি?'

'তুমার কথাই তো হল! বাবু বললেন কি কাল দশ বাজে হাজির হয়ে যাও তো মাইনের ব্যবস্থা সব হয়ে যাবে।'

'কাল দশটার সময়?'

ষষ্ঠীর মুখে চিন্তার ছাপ পড়ে। খানিকটা স্বস্তিও ফুটে ওঠে বোধহয়। ছোটেলাল আরও স্বর নামিয়ে আনে। 'হাঁ ঠিক দশ বাজে! লেকিন খুব হুঁসিয়ার ভাই। কাউকে কুচ্ছু বোলবে না। চুপি-চুপি একেলা গিয়ে লিয়ে আসবে। জানাজানি হলেই মুশকিল হয়ে যাবে!'

ষষ্ঠী কথা দেয় ছোটেলালকে।

খিদিরপুর থেকে বেহালা।

মনোহরের বাড়িতে গিয়ে হাঁক দেয় ছোটেলাল। 'এ মন্‌হর!' দেহাতি জমাদার ছোটেলাল মনোহর বলতে পারে না। বলে মন্‌হর।

মনোহর বেরিয়ে আসে। 'আরে ছোটেলাল যে!'

খুশি হতে পারে না মনোহর। এই ছোটেলাল এক অদ্ভুত মানুষ। মেশিনের সঙ্গে কারবার কিন্তু মনটা নরম মাটির মতো। ওর সঙ্গে মিশতে গেলেই দেখবে তোমার মনের একটা ছাপ ধরে গেছে ওর মাটিতে। মনোহর তাই চমকে ওঠে। এত বড় চালটা কি তাহলে ব্যর্থ হয়ে যাবে? একবার মাথা গলিয়েছে যখন ধরণীধরের কাছে তখন আর বেরুবার পথ নেই। কাজ তাকে হাসিল করতেই হবে! ছোটেলাল?

'আরে কী এতো ভাবছে মন্‌হর? অ্যাঁ?' ছোটেলাল ওর ঘরের মধ্যে ঢুকে চলে হন-হন করে।

'আর ভাই ভাবব না? রোজগারপাতি নেই! বসে তো কাজ করলেই চলবে না। বাবু আমাদের খাটিয়ে নেবে অথচ শালা মাইনের বেলা এই কাঁচকলা। আমাদের তাতে চলে কী করে—'

'ও তো ঠিক বাৎ। লেকিন তলব মাঙ্গায়ে লেও!'

'হুঁ।'—মনোহর উৎসাহিত হয়ে ওঠে, 'তুমি তো বললে মাঙ্গায়ে লেও। এখন চাইতে গেলে বাবু শুধু বড়-বড় কথা বলে। জানোই তো সব! শুধু কী আর কথা দিয়ে পেট ভরে!'

'প্রেস নাকি বন্ধ হয়ে গেল?'

'গেল বইকী! মুফত আর কে খাটতে চায় বল! নাও ছোটেলাল বিড়ি খাও একটা! তোমার আর কী? তুমি বাবুর পিয়ারের লোক!'

'আরে ও বাত তো ছোড় দেও। পিয়ারের লোকটোক হামি না আছি।'—বিড়ি ধরিয়ে নেয় ছোটেলাল মনোহরের কাছ থেকে। 'আরে ভাই একটা বাত তো শুনো।'

'কী বাৎ?'

'কাল দশ বাজে প্রেসকে হাজির হো যাও!'

'অ্যাঁ?'

'হাঁ।'

'না ভাই জমাদার সাহেব। ধর্মঘট যখন আমরা করেছি তখন আর তা হয় না।'

'হাঁ-হাঁ। লেকিন চুপি-চুপি যেতে হবে।'

'চুপি-চুপি!'

'হাঁ। বাবুর সাথে তো হামার বাত হোয়েই গেলো। বাবু বলল কী মন্‌হর কো বোলাও একদফে। তলব বি উসকো মিল্ যায়গা ঔর একঠো ফায়সালা ভি হো যায়গা।'

মনোহর ঘন-ঘন বিড়িতে টান দেয়। ছোটেলাল কথাটা মন্দ বলেনি। ধরণীধরের কাছ থেকে মোটা কিছু যখন পাওয়া গেছে তখন আর নিবারণবাবুর কাছ থেকেই বা বাদ যাবে কেন! নিবারণবাবুর পিয়ারের লোক ছোটেলাল। কাজেই কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

মনোহর বলে, 'ঠিক কাল দশ বাজে?'

'হাঁ, ভাই হাঁ, ঠিক দশ বাজে! লেকিন ভাই মন্‌হর, কিসিকো মত বোলনা।'

'পাগল! সে লোকই নয় এ শালা।'

গৌরবে নিজেকেই গাল দেয় মনোহর।

বেহালা থেকে সটান মাণিকতলা।

মাণিকতলায় থাকে সাতকড়ি।

সেখান থেকে বউবাজার। বউবাজারে থাকে বলাই। চাঁপাতলায় জীবন। বড়বাজারে প্রসাদ। ঝামাপুকুরে হরেকেষ্ট।...

এমনি করেই ঘুরে-ঘুরে চলে ছোটেলাল। মেশিনের কারবারি দেহাতি ছোটেলালের নরম মাটিতে ছাপ পড়ে, যেখানে যায় সেখানেই ছোটেলালের মুখে শুধু এককথা—'কাল ঠিক দশ বাজে ভাই। লেকিন কিসিকো মত বোলনা।'

পরের দিন আর এক বিস্ময়ের সকাল। এ বিস্ময় ঝড়ের মতো প্রচণ্ড নয়, ঝড়পোহানো ভোরের মতো শান্ত।

বেলা দশটা বাজে। একা ঘরে বসে আছেন নিবারণবাবু। কেউ কাজে আসেনি। প্রেস বন্ধ। তা হলে সত্যিই ওরা কাজ ছেড়ে দিয়েছে!

'নিবারণদা।'

ছোট একটি ডাক। গলাটাও খুব ভরসাপূর্ণ নয়।

'নিবারণদা?'

'কে?'

নিবারণবাবু বেরিয়ে আসেন ঘর থেকে। দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে হরেকেষ্ট।

'কী ব্যাপার?'

'আমি চুপি-চুপি চলে এসেছি কেউ জানতে পারেনি।'

কেউ জানতে পারেনি। মনে-মনে অবাক না হয়ে পারেন না নিবারণবাবু! হঠাৎ হরেকেষ্ট মত বদলালো কেন? আর দরজার পেছনেও কে একজন দাঁড়িয়ে না? প্রসাদ?

নিবারণবাবু বলেন 'তা চুপি-চুপি চলে আসার মানে?'

'মানে আবার বলতে হবে? ও শালারা জানতে পারলে একেবারে কাক চিলের মতো ছেঁকে ধরবে না তোমায়! তুমি বরং এই বেলা আমারটা চুকিয়ে দাও। আমি সরে পড়ি!'

'শুধু তোমারটাই চুকিয়ে দেব।' মনে-মনে আরও অবাক হন নিবারণবাবু!

দরজার পিছনের ছায়া নড়ে ওঠে এইবার! এগিয়ে আসে প্রসাদ। 'আজ্ঞে সেই সঙ্গে আমারটাও।'

হরেকেষ্ট প্রসাদকে দেখে যেন আঁতকে ওঠে। পরক্ষণেই ওঠে খিঁচিয়ে 'ও, গন্ধে-গন্ধে ঠিক এসে হাজির হয়েছে শালা শকুন। তা দাও দাদা আমাদের দুজনেরটাই দাও চুকিয়ে। আমরা টুঁ শব্দটি করব না।'

'আর আমি বানের জলে ভেসে যাই কেমন?'

কে? কে আবার? চমকে দেখে সকলে। ওদের পিছনে দাঁড়িয়ে জীবন।

প্রসাদ অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। 'তা দাও নিবারণদা আমাদের তিনজনেরটাই চুকিয়ে দাও আর কেউ জানতে পারবে না।'

কিন্তু জানাজানির আর বাকি নেই তখনও। দেখা যাচ্ছে জীবনের পিছনে এসে হাজির হয়েছে আরও অনেকে। সকলে দাঁড়িয়ে আছে একক হয়ে আর সকলকে এড়াবার চেষ্টায়। কিন্তু সবাইকে জড়িয়ে সে এক ভিড়। সকলের চুপি-চুপি কথায় সে এক গুঞ্জন।

নিবারণবাবু বলেন, 'আরে অনেকেই জানতে পেরেছে বলে মনে হচ্ছে।'

'তাই তো! এরকম কথা তো ছিল না। ব্যাপারটা তাহলে দেখতে হয়।'

নিবারণবাবুর বিস্ময়ের আর অন্ত নেই। শুধু জীবন হরেকেষ্ট প্রসাদ নয়। এসে হাজির হয়েছে সাতকড়ি, ষষ্ঠী, মনোহর...। ওরা সকলে ঘিরে ধরে নিবারণবাবুকে—'নিবারণদা, দাও বাবু আমাদের মাইনেটা চুকিয়ে দাও। আজ আর ছাড়ছিনে। জানাজানি যখন হয়েই গেছে ব্যাপারটা, তখন আর ঢাকঢাক করে লাভ কি?'

ওদের সমস্বর একটু থামতে নিবারণবাবু কথা বলেন। ওঁর বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি। 'কি ব্যাপার বল তো! তোমাদের সকলকে এমন দল বেঁধে ফিরে আসতে দেখে আমি খুশি হয়েছি সত্যি। কিন্তু কারণটা এখনও বুঝতে পারছি না। তোমরা কি তাহলে মত বদলেছ।'

মনোহর বলে, 'বাঃ মত তো তুমি বদলেছ আর ডেকে পাঠিয়েছ সেইজন্যে।'

'আমি ডেকে পাঠিয়েছি!' অবাক হয়ে বলেন নিবারণবাবু। যেন বলতে চান, এ আবার কোন চক্রান্ত?

ষষ্ঠী বলে, 'হ্যাঁ, আমাদের কজনকে চুপি-চুপি মাইনে দেওয়ার জন্যে ডেকে পাঠাওনি তুমি! এ শালারা যে কী করে খবর পেলে তা আমি বুঝতে পারছি না।'

পরস্পরেরই অবাক হওয়ার পালা চলে।

'কিন্তু আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না। মাইনে দিতে হলে চুপি-চুপি কেন ডাকবো ষষ্ঠী। মাইনে তো আর ঘুষ নয়, যে লুকিয়ে দিতে হবে!'

সাতকড়ি বলে, 'তবে...তবে যে ছোটেলাল গিয়ে বলে এল...বলে কাউকে না বলতে?'
'অ্যাঁ!—কোথায় ছোটেলাল?'

সমস্বরে খোঁজ উঠল 'কোথায় ছোটেলাল? কোথায় সেই শালা?'

'এই যে শালা ছোটেলাল, এই যে হামি খাড়া আছি।'—একটি বজ্রপাতে সকল ঝঞ্ঝাকে স্তব্ধ করার স্বর শোনা গেল। সকলে দেখল মেশিনের কারবারি ছোটেলাল মস্ত এক লাঠি নিয়ে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে।—'এই যে হামি খাড়া আছি। শালা বেইমান সব পাজি! ইয়ে প্রেস বানানে কে লিয়ে এক রোজ সামনে হাত মিলায়া থা কি নেহি। ঔর আজ পিছে ছোরি মারনে মাঙ্‌তা! চুপি-চুপি সব মাইনে নিতে এসেছে—মাইনে না হোলে কাম করবে না! দেখি কোন শালা কাম না করে! এই হামি খাড়া আছি!'—লাঠিটা দুম করে ঠুকে দেয় ছোটেলাল একবার।

আজ আর নরম মাটি নয়। মেশিনের মতো পাথর ছোটেলাল!

মনোহর আর স্থির থাকতে পারে না। ফেটে পড়তে চায় যেন—

'কাজ করি না করি আমাদের খুশি। তোমার জুলুম আমাদের মানতে হবে না কি?'

কিন্তু মনোহরের গলাবাজিতে ফল ফলে উলটো। এক কোণে একটা মুগুরের মতো কী পড়েছিল, সেটাকে খপ করে তুলে নিয়ে মাথার ওপর উদ্যত করে ধরে চেঁচিয়ে ওঠে বলাই—'ভালো কথায় ঘাড় সিধে না হলে জুলুমই মানতে হবে। তুমি ঠিক করেছ ছোটেলাল, শালাদের ভালো কথায় অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছি কিন্তু কোঁৎকা না দিলে ওদের মগজে কিছুই পৌঁছয় না। এই আমি রইলাম তোমার পাশে। দেখি কোন শালা এবার ঘাড় বেঁকায়।'

ছোটেলাল অল্প কথায় কাজ সারতে চেয়েছিল কিন্তু বলাই একেবারে শোরগোল

তুলে বসে।

'ভালো হবে না কিন্তু বলাই; ভালো হবে না ছোটেলাল'—চোখ দুটো যথাসম্ভব বড় করে আর গলার শিরাগুলো যথাসম্ভব ফুলিয়ে চিৎকার করতে থাকে মনোহর—'এখনও আমাদের রাস্তা ছেড়ে দাও নইলে...নইলে একটা খুনোখুনি হয়ে যাবে কিন্তু—'

সত্যিই যেন খুন হয়েছে এমন ভয়ার্ত মুখে কথাটা শেষ করে হাঁপাতে থাকে মনোহর।

ছোটেলাল যেন পাথর হয়ে গেছে। কেবল সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে হাতের লাঠিটার মতো। টলবে না। বলবে না।

বলাই কিন্তু রুখে ওঠে সঙ্গে-সঙ্গে—'হোক খুনোখুনি।'

একটা গন্ডগোল বাধল বুঝি! সকলের মুখ থমথম করছে—জয়ন্তও এসে পড়েছে ওদের মধ্যে।

নিবারণবাবু হঠাৎ এগিয়ে আসেন ছোটেলাল-বলাইয়ের দিকে। গলাটা তাঁর যেন ভেঙে গেছে এমন দুর্বল স্বর শোনা যায় তাঁর কণ্ঠে। 'এদের রাস্তা ছেড়ে দাও ছোটেলাল—সরে দাঁড়াও বলাই।'

আস্তে-আস্তে সরে যায় ছোটেলাল। জায়গা দেয় বলাই। মুহূর্তে যেন সব প্রাণ শুকিয়ে গেছে ওদের দেহ থেকে।...

নিবারণবাবু তখনও বলছিলেন, 'তোমাদের ব্যবহারে অত্যন্ত দুঃখিত, অত্যন্ত লজ্জিত। জুলুম সব সময়ই জুলুম। উদ্দেশ্য ভালো হলেই তার দোষ কেটে যায় না, বড় কাজ করবার জন্যেও মানুষের স্বাধীনতায় হাত দেওয়ার অধিকার কারও নেই।' এবার ফিরে দাঁড়ান নিবারণবাবু বাকি সকলের দিকে, 'যাও ভাই তোমরা! মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে তোমাদের এখানে আনবার জন্যে ছোটেলালের হয়ে আমি মাপ চাইছি।'

কিংকতর্ব্যবিমূঢ় হয়ে গেছে যেন সকলে। একদল মেঘ জল ঝরাতে এসে যেন এলোমেলো হাওয়ায় দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেল।

'যাওয়ার আগে একটু দাঁড়াবে ভাই, দুটো কথা আমার শুনে যাবে?' বলছে জয়ন্ত। ওদের কাছে সব চেয়ে অপরিচিত এই মানুষের কথায় ওরা যেন কান পাতে। অবাক হয়। জয়ন্ত বলে চলেছে, 'এ প্রেসের আমি কেউ নই। সত্যি কথা বলতে গেলে প্রেসের কাজে সবে আমার হাতেখড়ি হয়েছে। কিন্তু একটি মানুষের আশা আর স্বপ্নের কথা শুনে এই ভাঙাবাড়ির এই সামান্য এই ছাপাখানাটিকে প্রাণ দিয়ে আমি ভালোবেসে ফেলেছি। সে মানুষটি তোমাদেরই নিবারণদা...তাঁর সঙ্গে তোমরাও একদিন এই স্বপ্ন আর এই আশার ভাগ নিয়েছিলে। আজ তবু তোমরা তাঁকে ছেড়ে চলে যাচ্ছ; যাওয়ার আগে একটি কথা শুধু তোমাদের জিজ্ঞাসা করতে চাই...তোমাদের মধ্যে এমন একজনও কি নেই, এ প্রেসের ওপর সত্যিকার টান যার এখনো আছে—এ প্রেসকে এখনও যে আপনার মনে করে!'

অবাক হয়ে চেয়ে থাকে সকলে। অদ্ভুত এই লোক, একান্ত অপরিচিত, কিন্তু কী পরিচিত এর কথা! এলোমেলো হাওয়ার মধ্যে এতটুকু এক শীতল স্পর্শ, যে স্পর্শ উষ্ণ মেঘে জল ঝরাবে।

জয়ন্ত বলে চলেছে তখনও—'মাইনে নিয়ে মনিবের হুকুম তামিল করবার চাকরি তো তোমরা চিরকাল করে এসেছ! তোমাদের দুঃখ কি তাতে ঘুচেছে? নিজের হাতে কালি লাগিয়ে চিরকাল তোমরা পরের কথাই ছেপে এসেছ। একবার নিজেদের কথা নিজেরা ছাপাবার জন্যে, নিজেদের জিনিস নিজেরা গড়ে তোলবার জন্যে সব দুঃখ হেলায় তুচ্ছ

করে দাঁড়াবার সাহস কি তোমাদের একজনেরও নেই?'

একে-একে সকলের দিকে তাকায় জয়ন্ত। সকলের চোখে-চোখে যেন একটা অব্যক্ত আবেগ।

হঠাৎ কয়েকজন বলে ওঠে, 'আমাদের আছে। নবজীবন প্রেস আমরা ছাড়ব না।'

আর একদল বলে 'আমরাও না।'

তারপর সবার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে ওঠে 'আমরাও না।'

প্রথমে অল্প তারপর অবিশ্রান্ত জল ঝরে পড়ে প্রতীক্ষমান মেঘ থেকে।

খানিকক্ষণ কোলাহল চলতে থাকে ওদের মধ্যে। আর সেই কোলাহলের মধ্য দিয়ে সরে যায় একটি মূর্তি। সে মনোহর। মনোহর চলে যায় অন্য পথে আরও সূক্ষ্ম কিন্তু সূচ্যগ্র ছিদ্রপথে প্রবেশের পথ সন্ধানের উদ্দেশ্যে।

সাত

যে নতুন করে সুর বাঁধল ওদের মনে তাকে নিয়ে কাজ হয় শুরু। জয়ন্ত হয়ে ওঠে ওদেরই একজন। জয়ন্ত কাজ জানে না। কিন্তু সেইটেই যেন আজ তার ভূষণ হয়ে উঠেছে। সকলের কী অসীম আগ্রহ ওকে কাজ শেখাবার। সব কাজই যেন জানতে হবে ওকে, কাজ করতে হবে সকলের হয়ে।

আপাতত প্রুফ দেখছে জয়ন্ত। ষোল এম ডবল কলম সেই অজ্ঞাত মন্ত্রে ঝরঝরে ছাপা হয়ে এসে পড়েছে তার হাতে। সেই কুঞ্জ মজুমদারের লেখা 'সাবধান'। প্রুফ দেখে ছাপতে চালান দিয়ে দিয়েছে ও। ছাপা হচ্ছে ট্রেডল্ মেশিনটায়।

ষষ্ঠী বলে, 'কীরকম দেখছেন জয়ন্তবাবু? আমাদের এডিটর সাহেবের কলমে ধার কিন্তু খুব!'

মনে-মনে না হেসে পারে না জয়ন্ত। সে জয়ন্ত লেখক। সাদা কাগজে কালো আঁচড়ের আগুন জ্বালাবার মন্ত্র যার জানা আছে সেই জয়ন্ত হাসে মনে-মনে। পরিচয়টা সে নাই বা দিল!

সাতকড়ি জবাব দেয় ষষ্ঠীকে, 'হ্যাঁ ধার আছে, তবে দু-দিকেই। কখন যে কোনদিকে কাটেন বোঝবার যো নেই। ডাইনে না বাঁয়ে, কংগ্রেস না যোগজীবন সমাদ্দার, আমরা কোন পক্ষে বুঝলেন কিছু এ লেখা পড়ে?'

'না তা বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু শ্যাম আর কুল দুইই রাখব 'নতুন-খবরে'র নীতি কি এই? আমাদের নিজস্ব কিছু বলার কি নেই?' জয়ন্তের মনের হাসি জিজ্ঞাসু বাঁকা ভুরুতে যেন ধারালো হয়ে ওঠে।

কিন্তু জবাব দেওয়ার আগে কুঞ্জকে আসতে দেখে ওরা চুপ হয়ে যায়। কুঞ্জের চোখেমুখে বিরক্তি আর মেজাজ!—'ওহে এখানে এত জটলা কীসের? এত জটলা কীসের? এটা কী ছাপাখানা না তামাশার জায়গা! যাও, যে যার কাজে যাও!' সকলের দিকে কথাটা বললেও দৃষ্টিটা ওর তীক্ষ্ণ হয়ে বেঁধে জয়ন্তের ওপর। যে-কোনও কারণেই হোক প্রথম থেকেই কুঞ্জের দৃষ্টিটা বাঁকা হয়ে পড়েছে জয়ন্তের ওপর।

সাতকড়ি আর ষষ্ঠী কাজে লেগে যায়। জয়ন্ত বেরিয়ে চলে আসে কম্পোজ রুমের দিকে। জয়ন্তের মনের খুশি যেন আবার উপচে পড়ছে। হালকা করে শিস্ দিতে-দিতে এগোয় জয়ন্ত কম্পোজিটর অমূল্যর দিকে।—'কই, দিন-দিন অমূল্যবাবু, আর কী কাজ আছে। ওখানে

সব হাত খালি করে বসে আছে।'—কথা শেষ করে আবার শিস্ দিতে থাকে জয়ন্ত। অমূল্যবাবু কপির সঙ্গে মিলিয়ে দেন প্রুফ।

কুঞ্জ এসে ঢোকে ঘরে। এবার আর বিরক্তি নয়, রীতিমতো রাগ ফুটে উঠেছে ওর চোখে মুখে।—'কে হে! শিস্ দিচ্ছে কে? তুমি বুঝি।'

জয়ন্ত মাথাটা নিচু করে বলে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু কেন শিস্ দিচ্ছিলে শুনি? এটা কি তাড়িখানা না নাচের মজলিস! তুমি নতুন এসেছ না—?'

অমূল্য কী যেন বলতে যাচ্ছিল, 'আজ্ঞে উনি আমাদের—'

'থামো!' কুঞ্জ চুপ করিয়ে দেয় অমূল্যকে। তারপর জয়ন্তর দিকে ফিরে বলে, 'আমায় কাজ করতে হয়...মাথার কাজ, যাব জোবে এ কাগজ চলে, তোমাদের অন্ন জোটে, বুঝেছ, এ রকম বেয়াদবি আর কখনও যেন না হয়।'

একেবারে গোড়ায় আঘাত করে জয়ন্তকে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করে কুঞ্জ।

জয়ন্ত অপরাধীর মতো স্বীকার করে, 'না, আর হবে না।'

'মনে থাকে যেন!' আব একবার শাসিয়ে ওঠে কুঞ্জ। এবং পরক্ষণেই ঘুরে দাঁড়ায় যাওয়ার জন্যে।

কিন্তু যাওয়া হয় না কুঞ্জের। ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে নিবারণবাবু।

নিবারণবাবুকে দেখে কুঞ্জ ঠান্ডা হয়ে আসে। 'এই যে নিবারণবাবু, আপনাকেই খুঁজছিলুম—'

'আমাকে খুঁজছিলেন? আচ্ছা আসছি একটু পবে।'

'একটু পরে কেন? আসুন না এখুনি। প্রণতি—প্রণতি কোথায় গেল?'

'সে তাব ঘরেই আছে!'

'তাহলে চলুন, সেখানেই শুনবেন চলুন। এবারে ইলেকশান নিয়ে যা লিখেছি একখানা...একেবারে আগুন! আগুন!' আগুনের শিখার মতোই হাতের আঙুল নেড়ে বলতে থাকে কুঞ্জ—'নেহাত আপনার এই সস্তা সাপ্তাহিক, তাই লেখাটা একরকম মাঠেই মারা যাবে। নইলে হত একটা বড় দৈনিক...দেখতেন স্রেফ একটা অ্যাটম বোমা হয়ে ফেটে পড়ত। চলুন শুনিয়ে দি!

কুঞ্জ একরকম ঠেলে নিয়ে চলে যায় নিবারণবাবুকে।

ওদিককার কম্পোজ-টেবিল থেকে বলাই বলে, 'কীবকম চিজখানি দেখছেন জয়ন্তবাবু। আমাদের এডিটর সাব! নিবারণবাবুর হবু জামাই!'

'হবু জামাই!' বিস্মিত হয়ে পড়ে জয়ন্ত।

ষষ্ঠী বলে, 'হ্যাঁ, ভাবগতিক দেখে তাই তো মনে হয়। একসঙ্গে রাজ্য ও রাজকন্যা দুই-ই উনি তাক করে বসে আছেন। আপনি নতুন কিনা তাই প্রথমটায় একটু ভড়কে গেছেন। আমাদের ওসব গা-সওয়া হয়ে গেছে।'

বলাই রুখে ওঠে ষষ্ঠীকে, 'না, গা-সওয়া হল কই? নেহাত খুব সামলে-সামলে চলি! কোনদিন হঠাৎ হাত তুলে বসব এই ভয়। আমার আবার চড়া বায়ুর ধাত।'

'না, ওরকম কথা বলবেন না।' জয়ন্ত তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে ওঠে, তারপর একটু চিন্তিত মুখে বলে, 'ইনিই তাহলে আমাদের সম্পাদক, যাঁর মাথার জোরে আমাদের কাগজ চলে?'

বলাই মুখ বেঁকিয়ে বলে, 'হ্যাঁ, কত বড় মাথা তার আবার জোর। কী আছে ও মাথায়, ক'টা কথার প্যাঁচ ছাড়া? এরা হল ভাষার ভাড়াটে গুন্ডা বুঝেছেন। গুন্ডারা টাকা খেয়ে ছোরা চালায়, আর এঁরা চালান কলম—এইটুকু তফাত!'

জয়ন্ত অবাক হয়ে শোনে কম্পোজিটার বলাইয়ের কথার ধার!

ষষ্ঠী বলে, 'কেন যে নিবারণদা আর তাঁর মেয়ে কুঞ্জবাবু বলতে অজ্ঞান, বুঝি না!'

বলাই বলে, 'এবার আমরা সাফ্ বলে দেব, হয় কুঞ্জবাবুকে ছাড়ুন নয় আমাদের!'

জয়ন্ত বলে, 'একটু ধৈর্য ধরে দেখুন না। মানুষ যেমনই হোকনা কেন, লেখা তো ভালো হতে পারে! দেখাই যাক না কীরকম অ্যাটম বোমা উনি ছাড়েন!'

কথা শেষ করে কাজে মন দেয় জয়ন্ত।

কুঞ্জ মজুমদার তার অ্যাটম বোমের মতো লেখাটা শুনিয়ে মেজাজি হয়ে ফিরে আসছিল তাব নিজের ঘবে। পথে কম্পোজ-রুমের দরজা। দরজার গোড়ায় বসে সাতকড়ি। কুঞ্জ একটু দাঁড়িয়ে ডাকল—'ওহে!'

একমনে কাজ করছিল সাতকড়ি। শোনেনি বোধহয়, তাই সাড়া দেয় না।

ডাকটা আগেই কানে গেছে বলাইয়ের। বলাই ডেকে দেয় সাতকড়িকে 'ওহে সাতকড়ি শুনতে পাচ্ছ না? এডিটর সাহেব ডাকছেন!'

সাতকড়ি সচকিত হয়ে ওঠে, 'আমায় ডাকছেন?'

'হ্যাঁ ডাকছি! ডাকলে উঠে আসতে পারো না!' হুকুমের ভঙ্গিতে বলে কুঞ্জ।

সাতকড়ি তাড়াতাড়ি টুল ছেড়ে উঠে আসতে-আসতে বলে, 'আজ্ঞে কেন পারবো না! খুব পারি!'

'যাও, এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে এসো চট করে।' এত ডাকাডাকির পর সামান্য এক প্যাকেট সিগারেটের অর্ডার!

'চট করে আনতে হবে?' প্রশ্ন করে সাতকড়ি।

'হ্যাঁ, চট করে—এখুনি!' উত্তরোত্তর ভঙ্গিটা তীক্ষ্ণ করতে চায় কুঞ্জ।

হুকুম দিয়ে আপনার ঘরের দিকে ফিরে যেতে-যেতে কুঞ্জ একবার পিছনের দিকে ফিরে তাকায়। আশ্চর্য! মাথা থেকে পা পর্যন্ত চন-চন করে ওঠে কুঞ্জের রক্ত! সাতকড়ি আবার গিয়ে বসেছে ওর টুলে!

'কী গেলে না যে!' হুঙ্কার দিতে গিয়ে কুঞ্জের গলা বোধহয় কেঁপে উঠল একটু।

সাতকড়ি অনায়াসে বললে, 'হাতের কাজটা আগে সেরে নিই!'

কুঞ্জের বিস্ময়ের আর অন্ত নেই। 'কাজ আগে সারবে মানে? আমি বলছি আগে যাও!' অসম্ভবরকম চিৎকার করে ওঠে কুঞ্জ!

ষষ্ঠী কথা কয় এবার! 'অত চেঁচাচ্ছেন কেন স্যার। আমরা তো কেউ কালা নই!'

কুঞ্জের চোখে যেন আগুন জ্বলে ওঠে। একবার দূরে-বসা জয়ন্তের দিকে তাকিয়ে নিয়ে কুঞ্জ বলে ওঠে—'Shut up! তোমায় কেউ ফপরদালালি করতে ডাকেনি! কী সাতকড়ি তুমি যাবে কি না!'

'বললাম তো একটু পরে যাচ্ছি।' আগের মতোই ধীর কণ্ঠে বলে সাতকড়ি। হঠাৎ বলাই তার টুল ছেড়ে উঠে এসে দাঁড়ায় কুঞ্জর সামনে। হাতে তার একটা বিড়ি। বিড়িটা দেখিয়ে বলাই বলে—'ততক্ষণ না হয় এই বিড়ি একটা খান না। বেশ ভালো মিঠে-কড়া বিড়ি।'

'How dare you !'—দু-পা পিছিয়ে গিয়ে কুঞ্জ বলে 'বিড়ি দিতে এসেছ আমাকে! আমি তোমাদের ইয়ার?'

চেঁচামেচি শুনে ততক্ষণ বেরিয়ে এসেছেন নিবারণবাবু, এসেছে প্রণতি ও ছোটেলাল।

নিবারণবাবু ব্যস্ত হয়ে বলেন, 'কী হয়েছে কী?'

কুঞ্জ বলে, 'কী হয়েছে জিজ্ঞাসা করছেন? যত সব ছোটলোককে আস্কারা দিয়ে আপনি একেবারে মাথায় তুলেছেন জানেন না! এতবড় আস্পর্ধা ওদের আমার সঙ্গে ইয়ার্কি দিতে আসে।'

নিবারণবাবু যেন হতভম্ব হয়ে পড়েন। কোনও কথা বার হচ্ছে না তাঁর মুখ থেকে!

কথা বলে ছোটেলাল। বলাইকে ডেকে বলে, 'কিহে বোলাই! তুমি এডিটর সাবের সঙ্গে ইয়ার্কি দিতে গেছ?'

'ইয়ার্কি নয় ভাই, দিতে গিয়েছিলাম একটা বিড়ি তবে আমারই ভুল হয়েছে।'

'হাঁ। জরুর ভুল হোইয়েছে। আমরা সব মেশিন চালাই; কম্পোজিটরি করি, আমরা কুলি-মজুর ক্লাশ, ছোটলোক আছি আর উনি কলম দিয়ে লেখেন, ভদ্দরলোক আছেন! উনি তোমার বিড়ি খাবেন!'

'সেইটেই তো ভুল হয়েছে। তবে কী জানো ছোটেলাল, এই আমাদের ছোটলোকদের কথা কাগজে লিখতে, ওঁরা ভাবে গদ-গদ হয়ে ওঠেন। সভায় সমিতিতে, থিয়েটারে বায়োস্কোপে আমাদের হয়ে ঝুড়ি-ঝুড়ি বক্তৃতা দিয়ে হাততালি নেন, অথচ আমাদের সঙ্গে সত্যিকার একটু ছোঁয়াছুঁয়ি হলে ওঁদের জাত যায়, মান যায়। এইটে বুঝতে পারি না।'

আশ্চর্য! কারও মুখে কোনও কথা নেই। সকলে শুনছে বলাইকে।

কথা বলে কুঞ্জ। কেমন একটা অসহায় অস্বস্তি ফুটে ওঠে ওর স্বরে, 'শুনছেন...শুনছেন এদের কথার ধরন! এইসব আমায় সহ্য করতে হবে বলতে চান! এই সাতকড়িকে আমি এক প্যাকেট সিগারেট আনতে বলেছিলাম। And he refused!'

'যাবো না তো বলিনি কুঞ্জবাবু!' কুঞ্জের ইংরেজি অনুযোগের বাঙলায় জবাব দেয় সাতকড়ি। আগের মতোই শান্ত।

'কিন্তু তাই বলাই উচিত সাতকড়িবাবু!'

চমকে উঠে কুঞ্জ তাকায় কথাটার উৎসের দিকে। কথাটা বলছে প্রণতি, আর কেউ নয়।

প্রণতি কুঞ্জকে বলে 'এঁরা কম্পোজিটরি করেন কুঞ্জবাবু! আমাদের ফাইফরমাস খাটবার চাকর তো এঁরা নন!'

'ওঃ, তুমিও তাহলে ওদের দলে! আমার সিগারেট আনতে বলা অন্যায় হয়েছে!' পরাজিতের কণ্ঠস্বর শোনা যায় কুঞ্জের কথায়।

জয়ন্ত এগিয়ে আসে এইবার। বলে, 'না অন্যায় হবে কেন? আমিই আপনার সিগারেট এনে দিচ্ছি।'

'তুমি!' কুঞ্জ যেন বিশ্বাস করতে পারছে না নিজের চোখকে।

'হ্যাঁ আমিই যদি অনি, ক্ষতি কী?' বেশ হাসতে-হাসতেই বলে জয়ন্ত।

কুঞ্জ বাধা দিতে পর্যন্ত ভুলে যায়। বাধা দেন নিবারণবাবু, 'না না জয়ন্ত তোমায় যেতে হবে না!'

'গেলেই বা তাতে কী হয়েছে! এক প্যাকেট সিগারেট এনে দিলে যদি কুঞ্জবাবুর

মেজাজ ভালো থাকে তো একবার কেন একশোবার আমি এনে দিতে প্রস্তুত!' কথা শেষ করেই হন-হন করে বেরিয়ে যায় জয়ন্ত। সকলকে স্তম্ভিত করে দিয়ে।

আট

এদিকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে দুর্লভ ঠাকুর।

সকাল থেকে দুর্লভকে বাজার পাঠিয়ে বসে আছে খুশি। এতটুকু মেয়ে খুশি আর যে-সে নেই। কলকাতায় এসে রীতিমতো গিন্নি হয়ে পড়েছে সে দুদিনেই। মনের মতো করে সাজিয়ে নিয়েছে রান্নাঘর ভাঁড়ারঘর। দুর্লভকে এখন সে রীতিমতো হুকুম করে, রান্না শিখিয়ে দেয়। শিখিয়ে দেয় তরকারি কুটতে, মাছের আঁশ ছাড়াতে। তবে, দুর্লভের নির্বুদ্ধিতার আর অন্ত নেই। নেহাত খুশির সংসার তাই রক্ষে। তেমন মেজাজি গিন্নির কাছে পড়লে দুর্লভের যে কী অবস্থা হতো তা আর ভাবতে হয় না।

কিন্তু আজ খুশি রেগেছে সত্যিই। বুদ্ধি না থাক, একটা আক্কেল থাকা তো দরকার লোকটার! সেই যে সকাল থেকে বাজার গেছে এখনও কোনও পাত্তা নেই। অথচ উনুনটা পুড়ছে তো পুড়ছেই। খুশি যেন কোমর-বেঁধে রইল দুর্লভকে দুকথা বেশ করে শুনিয়ে দেবে বলে। খানিক পরেই উদয় হল দুর্লভ। হাতে তার বাজারের থলি। আনন্দের আতিশয্যে ওই রোগা চেহারা নিয়েই যেন হাঁসফাঁস করতে-করতে আসছে ও। ভাঁড়ার ঘরে একটা বঁটি নিয়ে বসে ছিল খুশি। দরজার সামনে দুর্লভকে আসতে দেখেই বঁটি সরিয়ে রেখে খুশি উঠে দাঁড়াল। পাকা গিন্নির ভঙ্গিতে বললে, 'না, তোমায় নিয়ে আর চলবে না ঠাকুর। একবেলা ধরে উনুন বয়ে গেল, তবু তোমার বাজার করা আর হল না!'

'তা কী করব দিদিমণি!' মুখটা যথাসম্ভব গম্ভীর করে বললে দুর্লভ, 'বাজার করা চারটিখানি কথা নয়। এবাজার-ওবাজার সব বাজার ঘুরতে হবে তো!'

'ওমা, এ-বাজার ও-বাজার ঘুরতে হবে কেন!' দুর্লভের চালাকি যে সে ধরতে পেরেছে এমন ভঙ্গি ফুটে ওঠে খুশির স্বরে।—বাজার তো লোকে এক জায়গাতেই করে।

দুর্লভ একেবারে বিগলিত হয়ে বলে, 'সে যারা করে তারা করে দিদিমণি, আমার কাছে ওই ফাঁকিটি পাবে না। যেমন মাইনে নেব পুরো, তেমনি গতর খাটিয়ে একেবারে গুঁড়ো করে দেব। শ্যামবাজার, রাধাবাজার, টেরেটিবাজার, মল্লিকবাজার, সব বাজার না ঘুরে একটি পাই পয়সার জিনিস কেনবার পাত্তরই আমি নই।'

তবু খুশির মেজাজ গলবে না। খুশি বলে, 'থাক, তোমায় আর আদিখ্যেতা করতে হবে না। এখন থেকে অত বাজার না ঘুরে এক বাজার থেকেই সব কিছু আনবে বুঝেছ!'

দুর্লভ যেন মুষড়ে পড়ে খুশির কথা শুনে। অনেক কষ্টে বলে, 'তা তুমি যদি বল তো তাই আনব। কিন্তু ঠকে এলে কিছু বলতে পারবে না—হুঁ।'

এবার খুশির মনটা যেন নরম হয়। বলে, 'আচ্ছা, কী রাজ্যি জিতে নিয়ে এসেছ দেখি—খোল দেখি তোমার থলি।'

দুর্লভ উৎসাহিত হয়ে ওঠে এইবার, ওর কৃতিত্ব দেখাবার জন্যে একরকম লাফিয়ে উঠেই দুর্লভ বাজারের থলিটা উপুড় করে ঢেলে দেয় খুশির সামনে।

বাজার দেখে খুশির চোখ দুটো বড় আর গোল হয়ে ওঠে। কিছু আধ-পচা মাছ আর সামান্য তরিতরকারি। এই বাজারে যে ওদের বাড়ির তিনটে লোকেরও চলবে না তা খুশির বুঝতে আর দেরি হয় না। খুশি যেন একেবারে আর্তনাদ করে ওঠে, 'ওমা, এতক্ষণে

তুমি এই বাজার করে এনেছ ঠাকুর! সমস্ত ঘুরে এই তোমার সওদা করা!'

উলটো বোঝে দুর্লভ। মনে করে খুশি বুঝি উৎসাহিত হয়ে উঠেছে! দুর্লভ বিগলিত হয়ে বলে, 'আমি তো আগেই বলেছি দিদিমণি ফাঁকিটি আমার কাছে পাবে না। বাজার পছন্দ হয়েছে তো!'

খুশি এবার রীতিমতো রেগে উঠেছে। গলাটা চড়িয়ে চিৎকার করে ওঠে খুশি, 'তোমার মাথা হয়েছে। যত রাজ্যের পচা, গলা, রোখো জিনিসগুলো কোথা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এসেছ! আর এই তোমার মাছ কেনা। তোমায় না বড় মাছ আনতে বলেছিলাম!'

দুর্লভের মুখ বিষণ্ণ হয়ে আসে। ভারী গলায় বলে, 'ওই দেখ দিদিমণি, তুমি খামোকা আমার ওপর গোঁসা হচ্ছ। বড় মাছ কি বাজারে আছে যে আনব!'

'কলকাতার বাজারে বড় মাছ নেই, তুমি বলছ কী ঠাকুর!' খুশি এবার আর রেগে নেই—বিস্মিত হয়ে গেছে।

'তবে আর কী বলছি। বড় গঙ্গায় পাহাড় প্রমাণ এক মানোয়ারী জাহাজ এসেছে না, সেই জাহাজের চাকায় যত বড় মাছ সব একেবারে কচুকাটা গো দিদিমণি, সব কচুকাটা হয়ে গেছে। চুনাপুঁটি দু-চারটে গলে টলে গিয়ে যা বেঁচেছে!'

খুশি এবার ধরে ফেলেছে ওর চালাকি। এই সব বাজে কথায় ভোলবার মেয়ে সে নয়।

খুশি বলে, 'তোমার একটা কথাও আমি বিশ্বাস করি না। আর এই পচা আলুগুলো কী জন্যে কিনে এনেছ শুনি!'

'ওমা, পচা কেন হতে যাবে গো! দিব্যি টাটকা-টসটসে দেখে কিনে আনলুম!'

'চোখে দেখতে পাচ্ছ না, পচা কি না!'

'তা হবে দিদিমণি।' একটা আলু তুলে নিয়ে টিপতে-টিপতে আর শুঁকতে-শুঁকতে দুর্লভ বলে,—'তা হতে পারে দিদিমণি। আনতে-আনতে রাস্তায় রোদ লেগে পচে গেছে। কমখানি রাস্তা তো নয়।'

অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে খুশি এবার। বলে, 'তুমি একটি মিথ্যের জানো।'

দুর্লভ কিছু না বলে এবার শুধু মাথা চুলকোয়!

খুশি একটু থেমে বলে, 'এখন হিসেবটা দাও দেখি।'

আবার মুষড়ে পড়ে দুর্লভ, 'ওই তো ফ্যাসাদ করলে দিদিমণি, ও হিসেব-টিসেব আমার মাথায় ঢোকে না। তবে ফাঁকিটি আমার কাছে পাবে না। তুমি পাঁচ টাকা দিয়েছিলে, এই নাও তার দুআনা ফেরত।'

খুশি যেন এবার পাগল হয়ে যাবে। 'এই বাজার করে পাঁচ টাকার শুধু দু-আনা ফেরত!'

'তাও কী ফেরত হত দিদিমণি। নেহাত হিসেবের গন্ডগোল হয়ে গেছে তাই। তা নাও তুমিই ফেরত নাও। হিসেব যখন জানি না, তখন যা লোকসান হয় আমারই হোক।'

নাঃ, লোকটার নির্লজ্জতার আর সীমা নেই। খুশি ঝাঁঝিয়ে ওঠে, 'না থাক। তোমার আর দু-আনা লোকসান করতে হবে না।

দুর্লভ কী যেন বলতে যাচ্ছিল এমনসময়ে বাইরে থেকে ডাক শোনা গেল, 'জয়ন্ত! জয়ন্ত!'

খুশির মনটা যেন নাড়া দিয়ে উঠল। এ কণ্ঠস্বর যেন তার বহুদিনের চেনা। সে গলায়

তখন আরও অনেক কিছু শোনা যাচ্ছে, 'কোথায় গেল সে হতভাগা! সারা বাড়িতে একটাও জনমনিষ্যি নেই! মেয়েটাই বা গেল কোথায়? খুশি! খুশি!—'

খুশি ততক্ষণে বেরিয়ে এসেছে ছুটে। 'কাকাবাবু এসেছে... কাকাবাবু'—খুশির আর হাসির অন্ত নেই। কণ্ঠস্বর চিনতে তার ভুল হয়নি একটুও। সামনেই দাঁড়িয়ে রায়বাহাদুর স্বয়ং।

খুশি এসেই জড়িয়ে ধরে কাকাবাবুকে। বলে, 'বাবা! এই এতদিনে বুঝি আসা হল!'

'হ্যাঁ, এতদিন বাদে আসা হল!' কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে বলেন রায়বাহাদুর, 'কেন, আমি আসব কেন শুনি? আমার দায় পড়েছে আসবার! আমি এসেছি শুধু সেই হতভাগাকে একটু শিক্ষা দিতে! কোথায়...কোথায় সে?'

'ওঃ, তুমি আমায় দেখবার জন্যে আসনি তাহলে।' খুশিও ঠোঁট ফুলিয়ে রাগ দেখায়।

'আসিনিই তো! কীসের জন্যে আসব? কী সম্পর্ক আমার তোদের সঙ্গে!'

খুশির চোখদুটো ছলছল করে এসেছে ততক্ষণে। কাকাবাবুর গলার স্বরও তাই বোধ হয় আর্দ্র হয়ে আসে। 'মানে, কোন সম্পর্ক রেখেছে সেই হতভাগা, তোর দাদা! একটা খবর পর্যন্ত আমায় দিয়েছে এতদিনে? শেষে আমায় নিজে কি না ছুটে আসতে হল! কিন্তু যখন এসেছি তখন তোকে নিয়ে তবে আমি যাব! দেখি সে হতভাগা কী করে।'

'তুমি আমায় নিয়ে যেতে এসেছ কাকাবাবু?'

'তা না হলে কী অমনি ছুটে এসেছি রে পাগলি! বাড়িটা আমার সেখানে খাঁ-খাঁ করছে মা। দিনে রাতে আমার যে সেখানে সোয়াস্তি নেই।'

'কিন্তু দাদা যে যেতে দেবেন না।' খুশি তার মনের কথা জানিয়ে ফেলে কাকাবাবুকে।

'যেতে দেবে না মানে? দেখি তার কত বড় আস্পর্ধা যেতে না দেয়!' সত্যিসত্যিই এবার যেন চটে উঠেছেন রায়বাহাদুর—'এখানে এই একরত্তি মেয়েটাকে এনে কী ব্যবস্থা সে হতভাগা করেছে! কোন আক্কেলে এই দৈত্যপুরীর মতো বাড়িতে এইটুকু মেয়েকে একলা ফেলে যায় সে হতভাগা! না কোনও কথা আমি শুনছি না! তুই এখুনি আমার সঙ্গে চল, দেখি সে কী করে!' কাকাবাবু খুশির একটা হাতের মুঠো রীতিমত চেপে ধরে টান দেন।

এ কী সঙ্কটে পড়ল খুশি। দাদাকে ফেলে সে কী করে চলে যাবে? দাদা এসে কী ভাববে? কী খাবে? কোথায় যাবে? কার সঙ্গে কথা বলবে? খুশির যেন মুহূর্তে কান্না পেয়ে গেল। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ও বলল, 'দাদা না এলে যে যেতে পারব না কাকাবাবু!'

'ওঃ যেতে পারবে না! যে ঝাড়ের বাঁশ সেই ঝাড়েরই কঞ্চি! ওই দাদাই তোমার সব হল! আর এই বুড়ো কিছু না! বেশ এই আমি চললাম; আর এই জন্মে যদি তোদের মুখদর্শন করি—।'

কাকাবাবু রাগে গটমট করে এগিয়ে গিয়েছিলেন দরজার দিকে। খুশি ছুটে গিয়ে দরজা আগলে দাঁড়াল—'কাকাবাবু!'

'না, আমি তোদের কাকাবাবু নই, কেউ নই! কোনও সম্পর্ক নেই আমার তোদের সঙ্গে। কিন্তু সেই হতভাগার সঙ্গে একবার দেখা হলে'—কাকাবাবুকে কথা শেষ করতে হল না। তার আগেই খুশি বলে উঠল—'ওইতো দাদা আসছে।' জয়ন্ত সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে শিস দিচ্ছিল। সেই আওয়াজ শুনেই ও-কথা বলতে পারল খুশি আন্দাজে। 'আসছে! আসছে! আচ্ছা আমি দেখছি!'

খুশির অনুমান মিথ্যে নয়। জয়ন্তই উঠে আসছে বটে সিঁড়ি দিয়ে। ঘর থেকে বেরিয়ে

সিঁড়ির ধারে এসে দাঁড়িয়ে দেখলেন রায়বাহাদুর।

জয়ন্ত থমকে গেল কাকাবাবুকে দেখে। 'এ কী কাকাবাবু কখন এলেন?'

কাকাবাবুর মুখে তখনও রাগের ভাব স্পষ্ট। একটুও গলার স্বর নরম না করে কাকাবাবু আগের রাগ টেনে এনে বললেন, 'কখন এলাম, জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা হয় না! খোঁজ নিয়েছ একবার? দিয়েছ একটা খবর? এ বুড়োকে একলা ফেলে এসে ভাইবোনে দিব্যি নিশ্চিন্ত হয়ে এখানে বসে আছ! আর আমি সেখানে হা-পিত্যেশ করে মরি!'

জয়ন্ত কাকাবাবুর রাগ দেখে কিন্তু টলল না। বলল, 'আপনিই তো ওখান থেকে চলে যেতে বলেছিলেন কাকাবাবু!'

'হ্যাঁ বলেছিলাম,...সে আমার ঘাট হয়েছে! অপরাধ হয়েছে! এখন জোড়হাতে বলছি এসব পাগলামি ছেড়ে ফিরে চল! ওখানে এবার যত খুশি স্বদেশি করো আমি কিছু বলব না।'

মনে-মনে হাসি পেল জয়ন্তের কাকাবাবুর এই ছেলেমানুষি দেখে। কিন্তু এত সহজে তার মন নরম হতে পারে না। এখানে রয়েছে মস্ত বড় দায়িত্ব—নতুন খবরের ভার নিয়েছে সে। সৈনিকের কর্তব্য তার সামনে, যেখানে এই ক্ষুদ্র স্নেহ-ভালোবাসাব কোনও স্থান নেই। তাই স্থির কণ্ঠেই বললে জয়ন্ত, 'তা তো হয় না কাকাবাবু!'

'হয় না! কেন হয় না শুনি?'

'বিদেশি আর স্বদেশি তো একসঙ্গে হওয়া যায় না কাকাবাবু। আপনি হোমরা-চোমরা সায়েব-সুবোর খোশামোদি করে কালোবাজারের কারবার করবেন আর আমি সেই বাড়িতে থেকে স্বদেশি করব এ তো হতে পারে না। তার চেয়ে আপনিই ওসব ছেড়ে এখানে চলে আসুন না!

দপ করে জ্বলে ওঠেন রায়বাহাদুর। এখন আর জয়ন্তের কাকাবাবু নন তিনি। এখন তিনি রীতিমতো রায়বাহাদুর। নেহাত নিজের ভায়েব ছেলে এই জয়ন্ত। না হলে...না হলে...! অসহায়ভাবে এদিক-ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ গর্জন করে ওঠেন রাযবাহাদুর—'কাজ কারবার ছেড়ে আমি এখানে চলে আসব! মান সম্ভ্রম সব জলাঞ্জলি দিয়ে তোমার সঙ্গে এসে স্বদেশি করব। না!'

'সেই আশাতেই এখনও আছি কাকাবাবু!' অল্প হেসে জয়ন্ত তাকাল কাকাবাবুর দিকে।

'সেই আশাতেই আছ!' ওর হাসি দেখে আরও যেন জ্বলে উঠলেন রায়বাহাদুর! 'আমি তো তোমার মতো আহাম্মক নই। কখনও কোনও জন্মে এখানে আসব না। এখন শুধু জানতে চাই, খুশিকে তুমি আমার সঙ্গে যেতে দেবে কি না!'

'না কাকাবাবু, তা আমি পারি না।'

'পার না! বেশ, তোমাদের সঙ্গে সব সম্পর্কে আজ আমার শেষ। আমার মুখে তোমাদের নাম পর্যন্ত কেউ আর শুনতে পাবে না।'

রায়বাহাদুর নেমে গেলেন সিঁড়ি দিয়ে।

জয়ন্ত কোনও কথা বলল না। শুধু চেয়ে রইল সেই দিকে সৈনিক জয়ন্ত।

খুশি এতক্ষণ নীরবে ছিল দাঁড়িয়ে। কাকাবাবু চলে যাচ্ছে অথচ দাদা কিছু বলছে না। খুশি যেন কেঁদে উঠল, 'কাকাবাবু সত্যি আর আসবে না দাদা!'

'আসবে রে আসবে। সময় হলে ঠিক আবার আসবে দেখিস।'

খুশিকে লক্ষ করে নিজেকেই সান্ত্বনা দিল কি না জয়ন্ত, কে জানে?

প্রেসে যখন ফিরল জয়ন্ত, তখনও মনটা বেশ ভারী। চিন্তার একটা ঝড় বইছে মনে, কিংবা মনে হচ্ছে একটা নিক্তির ওজন চলছে ভেতরে-ভেতরে। আর দুই পাল্লাই ভারী হয়ে উঠেছে দুদিক থেকে। মনটাও তাই ভারী।

একটা প্রুফ তুলতে হবে তাড়াতাড়ি। কুঞ্জবাবুর লেখা সম্পাদকীয় মন্তব্যের প্রুফ। জয়ন্ত তাড়াতাড়ি এসে প্রুফ তুলতে লেগে গেল।

ওর গম্ভীর মুখ ছোটেলালের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াল না। ছোটেলাল প্রশ্ন করলে, 'কী জয়ন্ত ভেইয়া, মেজাজ খোশ নেই মালুম হচ্ছে!'

বলাই মনে করেছে কুঞ্জবাবুর লেখা পড়েই জয়ন্তর মেজাজটা ওরকম বিগড়ে গেছে। বলাই তাই জয়ন্তকে কথা বলতে না দিয়েই মন্তব্য করে, 'এডিটর সাবের লেখা পড়ে বোধ হয়। যা গরম লেখা, ধরলে হাত পুড়ে যায়!'

বলাইয়ের রসিকতাটুকু ছোটেলাল যেন লুফে নেয়। বলে, 'হাঁ। এতো গরম! তবে তো হামার মেশিন গলে যাবে। ছাপতে পারবো না।'

ওদের রসিকতা জয়ন্তকে পীড়া দেয় যেন। একেই তো সকাল থেকে মনটা ভারী। তার ওপর কুঞ্জের লেখা দেখে সত্যি-ই মনটা খিঁচড়ে গেছে জয়ন্তের। বলাইয়ের অনুমান নেহাত মিথ্যে নয়।

ওদের হাস্য-মুখর মুখ কালো করে দিয়ে জয়ন্ত বলে, 'সত্যি এ লেখা ছাপা না হওয়াই উচিত ছোটেলাল। কুঞ্জবাবুর লেখায় আগুন যত না আছে, ধোঁয়া আছে তার অনেক বেশি। আর সেই কথার ধোঁয়ার আড়ালে ওঁর যেটুকু বক্তব্য উঁকি দিচ্ছে, সেটা আমাদের বিরুদ্ধে বলেই মনে হয়।'

বলাই, ছোটেলাল এরা চুপ করে যায় জয়ন্তের কথা শুনে। জয়ন্তর কথাগুলোও খুব স্পষ্ট নয়। কী বলতে চায় সে?

জয়ন্তও ওদের বুঝিয়ে দিতে চায় ব্যাপারটা স্পষ্ট করে। প্রুফ কপিটা তুলে নিয়ে বলে, 'এই শোনো না কুঞ্জবাবু কী লিখেছেন—।'

ওরা শোনে। তবে জয়ন্তের কণ্ঠস্বর শোনে না, ওরা, শুনতে পায় আরও এক প্রবলতর স্বর। সে স্বর কুঞ্জের।

কুঞ্জ হাঁক দেয়, 'কী হচ্ছে কী তোমাদের!' কাজের লোক কুঞ্জ কী আড্ডা, ইয়ার্কি বরদাস্ত করবার পাত্র সে নয়। জয়ন্তের দিকে এগিয়ে এসে বলে, 'তোমায় কখন বলেছি প্রুফ আনতে!'

জয়ন্তের স্বর স্থির হয়ে আসে। বলে, 'এই লেখাটা একটু পড়ে দেখছিলাম!'

কুঞ্জের স্বরে ফুটে ওঠে ব্যঙ্গ। 'পড়ে দেখছিলে? কী দেখলে পড়ে।'

'দেখলাম এ লেখা আমাদের কাগজে বার হওয়া উচিত নয়।' জয়ন্তের স্বর আগের মতোই স্থির।

কুঞ্জ দপ করে ওঠে। 'ও, কাগজে কী বার হবে না হবে, তার বিচার করবে তুমি! তোমার হুকুম মতো আমায় লিখতে হবে! get out! বেরিয়ে যাও এখুনি এ প্রেস থেকে...বেরিয়ে যাও।'

কুঞ্জর গলা তো নয়! সারা বাড়িটা যেন ঝনঝন করে ওঠে। প্রণতি ছুটে আসে। বলে, 'দাঁড়ান জয়ন্তবাবু, যাবেন না!'

জয়ন্ত এগিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু প্রণতির কথায় দাঁড়াল। কুঞ্জ বলল, 'যাবে না মানে!

জানো, ওর কত বড় আস্পর্ধা। আমার লেখা কাগজে যাবে কি না যাবে, তার বিচার করবে ও।'

প্রণতি অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে তাকাল কুঞ্জের দিকে। একটুও রাগ করল না। গলার স্বর করল না একটুও উচ্চ। বলল, 'উনিও যখন এ কাগজের একজন, সে অধিকার ওঁর আছে।'

'অধিকার আছে! তুমি বলছ অধিকার আছে!' থরথর করে কাঁপতে-কাঁপতে প্রশ্ন করলে কুঞ্জ।

'হ্যাঁ বললাম!'

কুঞ্জের চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল নিমেষে। খানিকটা সংযত হয়ে কুঞ্জ বললে, 'ও, আমিও তাহলে জানিয়ে দিচ্ছি, যে, উনি যদি প্রেসে থাকেন, আমি থাকবো না!'

কথাটা বলবার পর এক মিনিট স্তব্ধতা! কুঞ্জ সবার দিকে তাকিয়ে দেখল কেউ কিছু বলছে না। কেউ বিচলিত হয়নি পর্যন্ত।

কুঞ্জ আবার বললে, 'আমি আবার বলছি প্রণতি, এখানে ওকে যদি রাখতে চাও, আমায় তাহলে পাবে না!'

মাটির দিকে চাইল কুঞ্জ! 'ও, উনিই তাহলে থাকবেন...আমি তাহলে চলে যাচ্ছি।'

শুধু নীরবতা।

'আমি চলে যাচ্ছি। বুঝতে পারছ!' প্রণতির দিকে তাকিয়ে বলে কুঞ্জ।

জবাব দেয় ছোটেলাল। 'না গেলে কেমন করে বুঝব কুঞ্জবাবু! আপনি তো খালি খাড়া হয়ে যাচ্ছি, যাচ্ছি বলে চিল্‌লাচ্ছেন। যাচ্ছেন কই!'

অগ্নিময় দৃষ্টিতে একবার তাকায় কুঞ্জ ছোটেলালের দিকে, তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে যায় ঘর ছেড়ে। কুঞ্জ বুঝেছে কথা কইবার আর প্রয়োজন নেই।

বলাই বলে, 'আরে এডিটর সাব তোঁ সত্যি-সত্যি চলে গেলেন।' বলাইয়ের চোখে স্বস্তি আর বিস্ময় মাখানো।

চেঁচামেচি শুনে নিবারণবাবুও এসে পড়েছিলেন। জয়ন্ত নিবারণবাবুকে উদ্দেশ্য করেই বললে, 'সত্যি ব্যাপারটা খুব খারাপ হল। আমারই অন্যায় হয়েছে ওঁকে এমন করে সমালোচনা করা।'

'না, তোমার কোন দোষ নেই বাবা। কিন্তু আমি ভাবছি কাল থেকে আর কাগজ বার হবে না।'

জয়ন্ত চুপ করে গেল। নিবারণ বাবুর কথা তো নয়, যেন দীর্ঘশ্বাস!

ছোটেলাল বললে, 'কেন? কাগজ বার হবে না কেন? আমরা কী করতে আছি!'

'তোমরা আছ জানি, কিন্তু লেখবার লোক কই!'

এবার খটকা লাগে ছোটেলালের। একবার প্রণতি আর একবার জয়ন্তের দিকে তাকায়। দুজনেই মাটির দিকে চেয়ে। আরও অসহায় বোধ করে ছোটেলাল।

নিবারণবাবুও কম অসহায় বোধ করছেন না। মনে হচ্ছে একটা বিরাট ধস নেমেছে কোথায়। যে পাহাড়ের মাথায় ছিল স্তরের পর স্তর বরফ, যে মাথা ঝলসে উঠেছিল প্রথম রোদে, সেই বরফের স্তূপ ধসে পড়ছে এক সময়ে—ঝরে পড়ছে ভয়ঙ্কর স্রোতে দিকে-দিকে। তাকে রোধ করতে পারে না কেউ, কেবল সরে যেতে হয়, পথ ছেড়ে দিতে হয়, না হলে নিঃশেষ হয়ে যেতে হবে, মুছে যেতে হবে শীতল সঙ্ঘর্ষে।

নিবারণবাবু বসে আছেন নিঃসঙ্গ, নিঃশব্দ। সমস্ত চিন্তা যেন তাঁর ফুরিয়ে গেছে। মনটা ঘিরে যেন এক শূন্য রাত্রি।...অনেক ঝড় গেছে অনেক তুফান—তবু বাঁচিয়ে রেখেছিলেন তিনি নতুন খবরকে, বহু ঝড়ে বহু প্লাবনেও নতুন খবরের এতটুকু স্ফুলিঙ্গকে নিভতে দেননি তিনি।

কিন্তু আজ নিশ্চিতরূপে আয়ু শেষ হয়ে গেল তার। সব আয়োজন, সব উপকরণ ব্যর্থ হয়ে রইল। শেষে কুঞ্জ এই করলে! করতে পারলে!

শুধু নিবারণবাবুর মনে নয়, বাইরেও তখন রাত্রি নেমেছে। রাত্রি নেমে গভীর হতে চলেছে। নিবারণবাবুর হঠাৎ মনে হল প্রণতির ঘরে আলো জ্বলছে। কী করছে ও এত রাত্রে? হঠাৎ এই জিজ্ঞাসা যেন চিন্তার সমস্ত কুহেলী ছিঁড়ে আবিষ্কার করে ফেলল নিবারণবাবুকে।

নিবারণবাবু উঠে এসে দাঁড়ালেন প্রণতির ঘরে। 'প্রণতি! প্রণতি!'

'এখনও জেগে আছিস এত রাত্রি পর্যন্ত? কী করছিস? ঘুম আসছে না তোর?'

এতগুলো প্রশ্নে চমকে গেল প্রণতি। হাতের কাগজ-কলম সরিয়ে রেখে বললে, 'তুমিও তো ঘুমোওনি বাবা!' এক ফালি স্নিগ্ধ হাসি ফুটল প্রণতির ঠোঁটে।

'হ্যাঁ, তা ঘুমোইনি বটে।' একটু থামলেন নিবারণবাবু, তারপর আবার বললেন, 'কী জানিস মা? যত ভাবছি, ঘুম কিছুতে আসছে না—নিজেদের কাগজ চালানো বোধ হয় আর হল না!'

প্রণতি আর একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে এল বাবার কাছে। 'এত হতাশ হওয়ার কিছু হয়নি বাবা।'

'হয়েছে বইকী মা! কী করে আর কাগজ বার হবে! প্রেসের দেনা বাকি রাখতে পারি, কিন্তু লেখবার লোক না হলে কাগজ কী করে চলবে? কুঞ্জবাবুকে যেতে দেওয়াই আমাদের ভুল হয়েছে!'

'না বাবা ভুল হয়নি'—স্থির শান্ত প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়ে উঠল প্রণতির কণ্ঠে—'কুঞ্জবাবুকে ধরে রাখলে, যারা প্রাণ দিয়ে এ কাগজকে ভালোবাসে তাদের কাউকে যে রাখতে পারতে না!'

'কিন্তু শুধু তাদের দিয়ে তো কাগজ চলে না, লেখবার লোক তো চাই।' নিবারণবাবুর স্বর অপ্রত্যাশিত রকমের অসহায় শোনাল।

'কুঞ্জবাবু ছাড়া কি আর লেখবার লোক নেই!'

'থাকবে না কেন? অনেক আছে। কিন্তু এ গরিবদের কাগজে নামমাত্র পয়সায় তারা লিখতে আসবে কেন?'

'না যদি আসে তাহলে গরিবদের কথা নিজেদেরই লিখতে হবে। সে লেখায় পালিশ না থাক অন্তত ফাঁকির খাদ থাকবে না।'

'সব তো বুঝলাম! কিন্তু সেরকম লেখাও পাচ্ছি কোথায়?'

'আমি যদি লিখি?' কথা বলল না প্রণতি, যেন চ্যালেঞ্জ করল।

'তুই লিখবি?' পাশের চেয়ারটায় বসে পড়লেন নিবারণবাবু!

'কেন বাবা! মেয়েরা কী এসব লিখতে পারে না!'

'কেন পারে না, খুব পারে। কিন্তু তুই তো কখনও লিখিস নি মা। লেখাও যে শিখতে হয়!'

'তা আমি জানি বাবা। লিখতেও আমি শিখেছি।'

'লিখতে শিখেছিস? কার কাছে?' হঠাৎ যেন রাত্রি ভোর হয়ে গেছে বলে মনে হল নিবারণবাবুর।

'তোমার কাছে!'

'আমার কাছে! আমি আবার কবে শেখালাম। আমি কি ছাই নিজেই লিখতে পারি?'

'লিখতে হয়তো তুমি পার না বাবা! কিন্তু তোমার মতো খাঁটি লোকেরা যা ভাবে, যা কল্পনা করে, পেশাদারের কলমে একটু সাজানো-গোছানো ভাষায় তাই বড় সাহিত্য হয়ে ওঠে!'

প্রণতিকে দেখাচ্ছে জানলা দিয়ে দেখতে পাওয়া আকাশের উজ্জ্বল তারাটার মতো। একটু হেসে নিবারণবাবু বললেন, 'দূর পাগলি! নিজের বাবা বলে অতটা একচোখা হোসনি—।'

প্রণতিও হাসল। 'আমি ঠিক কথাই বলছি বাবা। কেমন করে লিখতে হয়, না লিখলেও, কী লিখতে হয় তা তোমার কাছেই শিখেছি।' একটু কী ভেবে নিল প্রণতি, তারপর বললে, 'দেখবে বাবা আমি লিখেছি?'

প্রণতি আবার সরে গেল টেবিলের দিকে। সেখান থেকে তুলে নিয়ে এল একগোছা কাগজ।—'এই নাও।'

নিবারণবাবু পড়তে শুরু করেন। তখনও স্নেহের হাসি লেগেছিল ওর মুখে। পড়া যখন শেষ হল তখন তাঁর মুখে গর্বের আলো। নিবারণবাবুর মনে হল, প্রণতিকে আজ নতুন করে চিনলেন তিনি। যাচাই করে নিলেন নিজের মেয়ে বলে।

'তুই এসব লিখেছিস! আমি যে বিশ্বাস করতে পারছি না!'

'ভালো হয়েছে বাবা?'

'ভালো হয়েছে মানে? এসব কথা এর চেয়ে ভালো করে কে লিখতে পারে? লিখুক দেখি কে আছে?'

প্রণতি আর দূর আকাশের তারা নয়, হাতের কাছের রাত্রির অপূর্ব শ্রীমণ্ডিতা পৃথিবীর মতো। যে রাত্রি আগামী ভোরের জন্ম দেয়।

প্রণতি কথায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। 'নিজের মেয়ে বলে অতটা এক চোখো হয়ো না বাবা। সত্যি করে বল, এ লেখা চলবে কী না!'

'চলবে রে চলবে। এমন চলবে যে, সকলের চোখে ধাঁধা লেগে যাবে।' আশীর্বাদের মতো করে বললেন নিবারণবাবু।

হঠাৎ এক শব্দে ওদের একান্ত আলাপ ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে গেল। সে শব্দ অতি-পরিচিত ওদের কাছে। যে শব্দের নীরবতা ওদের পীড়া দিচ্ছিল এতক্ষণ। হ্যাঁ, ওরা বিস্মিত হয়ে শুনল। এত রাত্রে মেশিন চলে উঠেছে। ঘটাঘট-ঘটাঘট! ঘটাঘট-ঘটাঘট!

নিবারণবাবু যেন চমকে উঠলেন,—এত রাত্রে মেশিন চালায় কে? তাড়াতাড়ি নিবারণবাবু ছুটে এলেন মেশিনঘরের দিকে। প্রণতিও এল। নিবারণবাবুর হাতে প্রণতির লেখা কাগজগুলো গোল করে পাকানো।

মেশিনঘরে আলো জ্বলছে। দেখা যাচ্ছে ছোটেলাল আর জয়ন্ত কী যেন ছেপে চলেছে।...

'কী ব্যাপার কী! এত রাত্রে মেশিন চালাবার মানে?'

জয়ন্ত আর ছোটেলাল চেয়ে দেখল নিবারণবাবুর দিকে। ছোটেলাল নির্বিকার হয়েই

বললে, 'মানে বুঝতে পারছেন না? নতুন খবর ছাপা হচ্ছে; রাত্রে না ছাপালে কাল কাগজ বাহার হোবে কী করে? '

'কাগজ তো কাল বার হবে, কিন্তু নতুন খবর ছাপছ কী নিয়ে? সম্পাদকের লেখা ছাড়াই নতুন খবর বেরুবে নাকি?' অসহিষ্ণু শোনাচ্ছে নিবারণবাবুর স্বর।

ছোটেলাল একটুখানি হাসল, 'তা কেনো হোবে? দেখেন না পড়ে!' ছোটেলাল একখানা কাগজ তুলে দেয় নিবারণবাবুর হাতে। প্রণতিও এক কপি গ্রহণ করে জয়ন্তের হাত থেকে। নিয়ে পড়তে শুরু করে।

নিবারণবাবু তখনও অসহিষ্ণু হয়ে রয়েছেন। কাগজ না পড়ে তিনি বলেন, 'পড়ে কী দেখব, কার লেখা তুমি ছেপেছ?'

ছোটেলাল একবার জয়ন্তের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায় তারপর বলে, 'আছে কোই বড়া লিখনেওলা!'

'না-না ছাপা তুমি বন্ধ কর ছোটেলাল। ওসব বাজে লেখা বাতিল করে, আবার নতুন করে সব ছাপতে হবে। এই নাও তোমার কপি। কে লিখেছে জানো ছোটেলাল? তোমার দিদিমণি! হাতের পাকানো কাগজগুলো এগিয়ে দিয়ে এতক্ষণে অল্প হাসেন নিবারণবাবু।'

'প্রণতি দেবী লিখেছেন! সত্যিই ছাপা বন্ধ কর ছোটেলাল! ফর্মা খুলে ফেল।' বলে উঠল জয়ন্ত।

'বেশ তাই ফেলছি।'

'না, না, দাঁড়াও ছোটেলাল, ফর্মা খুলতে হবে না।' বাধা দিয়ে ওঠে প্রণতি!

'খুলতে হবে না!' নিবারণবাবু বিস্মিত প্রশ্ন করেন।

'না বাবা। এ লেখা কার তা জানি না, কিন্তু তাঁকে সত্যি নমস্কার জানাচ্ছি। দেখি বাবা আমার লেখাটা,'—প্রণতি ফস্ করে নিবারণবাবুর হাত থেকে ওর লেখা কাগজগুলো নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দেয় মাটিতে।

'ও কী করছেন?' জয়ন্ত যেন হইহই করে ওঠে!

'ও কী করছিস মা?'

'ঠিকই করছি বাবা। এ লেখার কাছে আমাব লেখার এই ছেঁড়া কাগজের বেশি কোনও দাম নেই।'

'কিন্তু এ লেখা কোথায় পেলে ছোটেলাল? শুধু একবার এরকম লিখলে তো চলবে না! হপ্তায়-হপ্তায় এ লেখা আমরা পাব কোথায়?'

নিবারণবাবু যেন সমস্ত আস্থা হারিয়ে ফেলছেন—এমন করে বলেন।

'পাবেন এখান থেকেই। লিখনেওয়ালা আপনার সামনেই খাড়া আছে।'

'তুমি! জয়ন্ত!' নিবারণবাবুর যেন বিস্ময়ের আর অন্ত নেই!

'আপনি লিখেছেন!' প্রণতির চোখে বিস্ময়ের চেয়েও অন্য আর এক আলোয় যেন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

কাল কাগজ বেরোবে না ভেবে সাহস করে একবার লিখে ফেলেছি!

'একবার লিখে ফেলেছেন! কিন্তু একবার লিখেই শুকিয়ে যাওয়ার কলম তো আপনার নয়।'

জয়ন্ত প্রণতির কথা শুনে একবার ভালো করে তাকাল ওর দিকে। প্রণতি কি চিনতে পেরেছে লেখক জয়ন্তকে?

'যাক্, আমাদের সম্পাদকের ভাবনা তাহলে এখন থেকে ঘুচল।' আনন্দে যেন আত্মহারা হয়ে বলেন নিবারণবাবু।

প্রণতি একটু হাসে। বলে, 'তা ঘুচল তবে কাজ বাড়ল, প্রুফ রিডারের।'

জয়ন্ত আর নিবারণবাবুর কণ্ঠস্বর একসঙ্গে শোনা যায়—'প্রুফ রিডারের কাজ বাড়ল?'

প্রণতি আবার হাসে আর মাথা দোলায় 'হ্যাঁ, বেশ ভালো একজন প্রুফ রিডার আর তারই সঙ্গে একটি ডিকশনারি! যাক আপাতত আমিই প্রুফ দেখে দিচ্ছি।'

প্রণতি প্রুফ দেখার টেবিলে গিয়ে বসে জয়ন্তের লেখা নিয়ে।

খানিক পরে জয়ন্ত হাজির হয় প্রণতির কাছে।—কী, এখনও ওইটুকু প্রুফ দেখা হল না?

'যা গন্ডা-গন্ডা ভুল, হবে কী করে?' মাথা না তুলেই জবাব দেয় প্রণতি।

'খুব ভুল করেছে বুঝি। এরা কী যে কম্পোজ করে!' জয়ন্ত প্রণতির বিরক্তি নিজের কণ্ঠে মেলাতে চায়।

'কম্পোজ ঠিকই করেছে। যা বানান পেয়েছে তাই তো কম্পোজ করবে!'

'তার মানে আমি বানান ভুল করেছি?'

'তাই তো দেখা যাচ্ছে।' এতক্ষণে তাকিয়ে দেখে প্রণতি জয়ন্তের দিকে। প্রণতিব দুষ্টু দুষ্টু হাসিতে বুকের ভেতরটা কেমন করে ওঠে জয়ন্তের। বলে 'কখ্খনো নয়—দেখি!' জয়ন্ত হাত বাড়িয়ে দেয় প্রণতির দিকে। কিন্তু প্রণতি প্রুফটা আরও গুটিয়ে নেয় নিজের দিকে। বলে, 'উঁহু দেখে কী হবে। শুনুন...মানব সভ্যতার এই সংকটময় মুহূর্তে...বানান করুন তো মুহূর্ত?'

'মুহূর্ত বানান আমি জানি না—?' জয়ন্ত রাগের ভান করে।

'জানলে আর বানান করতে ভয় কী?'

নাঃ, প্রণতি আজ ঝগড়া করবে বলে কোমর বেঁধেছে। জয়ন্ত বলে 'ওঃ, আমি যেন সত্যি ভয় পেয়েছি! ভারি তো বানান—ম এ উ—হ্ এ উ।'

প্রণতি একটু কপাল সিঁটকোয় আর মাথা নাড়ে।

জয়ন্ত এবার সত্যি একটু ভয় পায়। তাড়াতাড়ি শুধরে নেয় 'না না হ্-এ-উ—।'

প্রণতি হাসে আর মাথা দোলায় 'তবু হল না।'

'হল না তো হল না—ভারি তো একটা বানান।'

'একটা নয়—অমন ঝুড়ি-ঝুড়ি ভুল আপনার কপিতে!'

'হতেই পারে না আমি দেখব।' জয়ন্ত আবার কেড়ে নিতে চায় কপি।

'উঁহু। আগে বানান করুন 'দ্বন্দ্ব'...বানান করুন 'সমীচীন'—।'

'না, আমি আগে দেখব কী লিখেছি'—জয়ন্ত টেবিলের গা ঘেঁষে এসে দাঁড়ায়।

'না। এই যে শুনুন না কী লিখেছেন—শান্তিপ্রিয়তার অর্থ নিষ্ক্রিয় জড়তা নয়। দানবদের হাতে সমস্ত সভ্যতা সংস্কৃতি যখন বিপন্ন তখন আত্মরক্ষার আয়োজনও যাঁরা সমীচীন নয় বলে মনে করেন। কই বানান করলেন না সমীচীন।'

'বলছি আগে দেখব।'

প্রণতি জয়ন্তকে এড়াতে গিয়ে কপি নিয়ে পালাতে চায়। কিন্তু জয়ন্ত জানলার ধারে

কোণঠাসা করে ধরে ওকে। বলে, 'কই দেখি এবার কী ভুল।'

হাসিতে উজ্জ্বল হয়েই আত্মসমর্পণ করে প্রণতি। বলে, 'এই নিন দেখুন। আপনি ভালো লেখেন মানি, কিন্তু বানান কিছু জানেন না।'

'কেন, এই তো স ম এ ই চ এ ই ন—সমিচিন...।'

'আজ্ঞে না মশাই দুটোই ঈ হবে আর দ্বন্দ্বে দুটোই 'ব' ফলা আছে।'

'আছে তো আছে! আমি তো আর দ্বিতীয় ভাগের পরীক্ষা দিতে বসিনি!' এবার জয়ন্তের হার মানার পালা।

'শোধরাবার লোক তো হয়েছে!' অম্লানবদনে বলে দেয় জয়ন্ত।

'কে? আমি? ও আমি বুঝি চিরকাল ধরে আপনার ভুল শোধরাবার জন্যে সঙ্গে-সঙ্গে থাকব।'

হঠাৎ জয়ন্তের মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে। কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা! 'হ্যাঁ চিরকালই যদি থাকো! সে আশা করাটা কি খুব অন্যায়!'

জয়ন্ত এক গভীরতর দৃষ্টিতে তাকায় প্রণতির চোখের দিকে। অনেকক্ষণ কোনও সাড়া দেয় না প্রণতি। নীরবতা তার যেন বেশি হয়ে উঠছে। খানিক পরে হঠাৎ বলে, 'কী রকম মেঘ করেছে দেখছেন—?'

বাইরের আকাশ কখন যেন অজস্র মেঘে ভরে গেছে।

জয়ন্ত মেঘের দিকে তাকিয়ে একটু হাসে। তারপর বলে, 'বাইরের মেঘ দেখে নষ্ট করবার মতো সময় আমার নেই!'

'নতুন খবর' অফিস থেকে রাগারাগি করে বেরিয়ে কুঞ্জ সোজা এসে হাজির হল ধরণীধরের অফিসে। হঠাৎ যে তার সঙ্গে নতুন খবরের সম্পর্কচ্ছেদ হয়ে যাবে, তা সে কল্পনাই করতে পারেনি। অনেকটা নিজের ব্যবহারে নিজেই যেন সে অবাক বোধ করতে লাগল। এত সহজে প্রণতিকে চটিয়ে দেওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি। তাছাড়া, প্রণতিও একবার তাকে বলল না, 'যাবেন না'। কোনওরকম হ্যাঁ-না কিছুই বেরুল না ওর মুখ দিয়ে। আর ওই নতুন ছোকরাটা!—জয়ন্ত? কুঞ্জ একবার হাত দুটো মুঠো করে যেন ঘুঁষি মারতে চাইল ওকে।

ধরণীধরের ঘরে মনোহর এসেছে। তাছাড়া রয়েছে ওঁর স্টেনো স্টেলা আর ওঁর কাগজের মহিলা-মহলটা যিনি দেখাশুনো করেন সেই বিচিত্ররূপিণী সবিতাদেবী।

ধরণীধর অবাক হলেন কুঞ্জের কথা শুনে। এতদিনের যার সম্পর্ক নতুন খবরের সঙ্গে, তাকে কী সব সর্ম্পক চুকিয়ে আসতে হল!

অবাক হলেও মনে-মনে বাঁকা হাসি হাসছিলেন ধরণীধর। বললেন, 'নতুন খবর তাহলে আপনি ছেড়ে দিয়ে এলেন।'

কুঞ্জকে জবাব দেওয়ার সুযোগ না দিয়ে মনোহর বলে উঠল, 'আজ্ঞে যা অপমান ওঁকে করেছে। তারপর আর উনি থাকতে পারেন?'

অপমান কথাটা শুনে কুঞ্জ আরও চটে গেল! কুঞ্জ অপমানিত হয়ে চলে এসেছে এ কথা শুনতে হবে আর পাঁচজনকে! বললে, 'অপমান! অপমানটা তুমি কোথায় দেখলে মনোহর?'

মনোহর চতুরতার সঙ্গে সামলে নিলে ব্যাপারটা। স্বরটা নরম করে বললে, 'না এই

মানে—আপনার মর্যাদা ওরা তো ঠিক বোঝে না।'

'হ্যাঁ।' অনেকটা আশ্বস্ত হয়ে বললে কুঞ্জ, 'হ্যাঁ, তাই নিজের খুশিতে ছেড়ে দিলাম! ভারি তো একটা রোখো সাপ্তাহিক! এতদিন যে ওখানে ছিলাম সেই ওদের ভাগ্যি!'

ধরণীধর বললেন, 'তা এতদিন যখন ছিলেন, আর কিছুদিন ওদের ওপর অনুগ্রহ করলেই তো পারতেন!'

সবিতাদেবী ধরণীধরের কথাটা আরও একটু বিশদ করে বলেন, 'হ্যাঁ, অন্তত এই ইলেকশনের সময়টা। কলমের মজুরি পুষিয়ে বেশ মোটা কিছু উপরি হয়ে যেতে পারত। এই তো লোটবার মরশুম।'

মেয়েলি কণ্ঠে ব্যবসাদারী কথাটা কেমন যেন শোনাল। হাঁ করে চেয়ে রইল কুঞ্জ ওর দিকে খানিকক্ষণ।

ধরণীধর সেই নীরবতার সুযোগ নিয়ে কথার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, ভালো কথা সবিতা, কী খবর তোমাদের মহলের, মেয়েদের মন গলছে একটু-আধটু?'

'আপনাদের আগুনের আঁচই নেই তা গলবে কী!' রীতিমতো কাব্য করে বলতে শুরু করলেন সবিতাদেবী—'যোগজীবন সমাদ্দার তো আর গোকুলের কানাই নয় যে নাম শুনেই মেয়েরা ঢলে পড়বে।'

'আহা, তাহলে তোমার মতো বৃন্দে দূতী লাগিয়েছি কী করতে! কানাকে কানাই করতে যদি না পারলে তো, কিসের তোমাদেব ছলাকলা!' ধরণীবাবুও বেশ সরস করে বলতে ছাড়েন না।

একটু যেন হতাশ হয়ে বললেন সবিতাদেবী, 'সেদিন আব নেই। মেয়েরাও আর শুধু কানে শুনে মূর্চ্ছা যায না, চোখে ভালো করে চেয়ে দেখে। এই যে কুঞ্জবাবু ছেড়ে দিলেন, এখন নতুন খবরের ছোবল সামলাবেন কী করে? ওই রোখো কাগজের বিষও কম মনে করবেন না।'

বাঁকা হাসি খেলে গেল ধরণীধরের মুখে। ধারাল হাসি। বললেন, 'বিষ দাঁত ভাঙবার অস্ত্রও আছে।' তারপর স্টেলার দিকে মুখ ফিরিয়ে ঘরোয়া প্রশ্ন করলেন, 'নবজীবন প্রেসের প্রায় সব কটা মেশিন আমাদের কাছে নেওয়া না?'

'হ্যাঁ।'

'এখনও কটা কিস্তি বাকি আছে দেখলে সেদিন?'

'এখনও তিনটে বাকি।'

চোখ দুটো চকচক করে উঠল ধরণীধরের। চোখ দিয়ে কী হাসছেন তিনি? বললেন, 'দু-দিন চুপ করে থাক। তারপর একটু বেচাল দেখলেই টুঁটি চেপে ধরব। তুলে আনবে সমস্ত মেশিন!'

কুঞ্জ হঠাৎ নিজের থেকেই বলে উঠল, 'ও মশা মারতে কামান দাগবার দরকার হবে না আর। ছেড়ে যখন এসেছি তখন নতুন খবরের বারোটা আপনিই বেজে গেছে। কুলি-মজুর দিয়ে শুধু মেশিন চালালেই তো হবে না, লিখবে কে শুনি, বলি কাগজ লিখে চালাবে কে?'

উত্তরোত্তর গলা চড়িয়ে আত্মপ্রসাদ উপভোগ করতে থাকে কুঞ্জ।

কুঞ্জের ধারণা ভুল। কুঞ্জ ছেড়ে আসায় এতটুকু ক্ষতি হয়নি নতুন খবরের। উপরন্তু

কাটতি বেড়ে গেছে কাগজের। জয়ন্তের কলম তরবারির মতো শাণিত আর উজ্জ্বল। বহুদিন পরে মনের মতো সুযোগ পেয়েছে সে। মনের মধ্যে যে আগুন জ্বলে সে আগুন লাভাস্রোতের মতো ছড়িয়ে পড়ছে কলমের সূক্ষ্ম সোনালি মুখ দিয়ে।

নিবারণবাবু উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। কথাটা বার-বার করে বলেন, 'আমাদের কাগজের কাটতি ভয়ানক বেড়ে গেছে—ভয়ানক বেড়ে গেছে।...' নিবারণবাবুর স্বপ্নও বুঝি সফল হতে চলল।

প্রণতির চোখেও খুশির আলো চমকায়। বলে, 'তাহলে সবাই খুব পড়ছে বল?'

'পড়ছে না শুধু, পোড়াচ্ছেও।' একটু যেন হেঁয়ালির মতো শোনায় নিবারণবাবুর কথা।

'পোড়াচ্ছেও!' জয়ন্ত অবাক হয়।

'হ্যাঁ, যোগজীবন সমাদ্দারের দল যেখানে আমাদের কাগজ পাচ্ছে, কিনে কেড়ে যেমন করে হোক নিয়ে পোড়াচ্ছে।'

জয়ন্ত এবার হাসে। বলে, 'তা পোড়াক ক্ষতি নেই। আমাদের কাগজ পড়লেও আগুন, পোড়ালেও আগুন।' কথাটা শেষ করে একটু যেন গম্ভীর হয়ে পড়ে ও। চোখের দৃষ্টিটা যেন সামনের থেকে সরে যায় দূরে-দূরে। একটু থেমে, মৃদুভাবে বলে জয়ন্ত, 'শুধু এটাকে যদি দৈনিক করে তোলা যেত!'

'আপনি এর মধ্যে দৈনিকের স্বপ্ন দেখছেন?' প্রণতিও স্বপ্ন-স্বপ্ন গলায় বলে।

'নিশ্চয়ই দেখছি, আজ যা স্বপ্ন কাল তাই সত্য হবে না কে বলতে পারে?' জয়ন্তর স্বরে কঠিন প্রতীতি।

হঠাৎ একটা কোলাহল শোনা যায় মেশিন ঘরের দিক থেকে: কারা যেন এদিকে আসছে কী বলতে-বলতে। আসছে বলাই আর মনোহর।

বলাই চিৎকার করে, 'নিবারণদা, নিবারণদা! এই যে নিবারণদা! তুমি একবার হুকুম দাও নিবারণদা, শালাদের একবার ঠান্ডা করে দি!'

'কী হয়েছে কী!' বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেন নিবারণবাবু।

'এতবড় আস্পর্ধা, শালারা বলে কি না মেশিন তুলে নিয়ে যাবে!' রাগে যেন হাঁপাতে থাকে বলাই।

'কে মেশিন তুলে নিয়ে যাবে?' জয়ন্ত প্রশ্ন করে এবার।

মনোহর বলে, 'ওই আপনাদের ধরণীবাবুর অফিসের লোক। প্রেসের কিস্তির টাকা বাকি আছে না!' একেবারে ভালোমানুষটির মতো বলে মনোহর। যে মনোহর গোপনে ধরণীবাবুর চর।

'বাকি আছে তো হয়েছে কী? থাক বাকি।...এ শুধু নতুন খবর বন্ধ করার ফন্দি। তা আর আমরা বুঝি না। তুমি শুধু একবার বলে দাও, মেশিন কে ছোঁয় একবার দেখি!' বলাই উত্তেজনায় একেবারে ছটফট করতে থাকে।

নিবারণবাবুর মুখে চিন্তার ছায়া নামে। শান্ত স্বরে বলেন, 'না না ওসব গোলমালে কাজ নেই বলাই। আমি বরং একবার ধরণীবাবুর সঙ্গে দেখা করে আসি।'

বলাই হতাশ হয়। বলে, 'তাহলে এস তাড়াতাড়ি, নইলে আমার আবার চড়া বায়ুর ধাত...হঠাৎ কী করে বসি বলতে পারি না।'

জয়ন্ত বলে, 'আপনার বদলে আমি একবার দেখা করতে যেতে পারি ধরণীবাবুর

সঙ্গে?' যে ধরণীধরের এত প্রতিপত্তি, এত প্যাঁচ, তাকে একবার দেখতে চায় জয়ন্ত। কী ধরনের মানুষ সে?

'তুমি যাবে?' নিবারণবাবু কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে তাকান জয়ন্তের দিকে।

'হ্যাঁ। এখানে এসে অবধি শুধু তাঁর নামই শুনছি, তাই একবার স্বচক্ষে মহাপুরুষকে দেখতে চাই।'

জয়ন্ত ধরণীধরের অফিসে পৌঁছবার আগেই মনোহর এসে পৌঁছয় খবরটা পৌঁছে দিতে।

মনোহর বেশ অঙ্গভঙ্গি করে খবরটা দেয় 'আজ্ঞে তেল একটু মরেছে বইকী স্যার! মেশিন তুলে আনার পরোয়ানা দেখেই তো জয়ন্তবাবু দেখা করতে আসছেন!'

কুঞ্জ উপস্থিত ছিল অফিসে। বলে, 'ওই জয়ন্ত ছোকরাটি আসলে একটি বিচ্ছু! ওই তো যত নষ্টের মূল।' বলতে-বলতে কুঞ্জের হাত দুটো আপনিই মুঠো হয়ে আসে—তারপর ধরণীধরের দিকে চেয়ে বলে, 'যতই হাতে পায়ে ধরুক, আপনি কিন্তু কিছুতেই নরম হবেন না।'

উপদেশ শোনবার কোনও প্রয়োজন নেই ধরণীধরের। কুঞ্জের কথায় কপালটা কুঁচকে ওঠে ওঁর। বললে, 'নরম না হয়ে গরম হব সেটাও কি আপনার কাছে শিখতে হবে কুঞ্জবাবু?'

কেমন যেন ভয় পেয়ে যায় কুঞ্জ। হাতে কচলে বলবার চেষ্টা করে, 'না, মানে আমি বলছিলুম—।'

কথাগুলো ঠিক গুছিয়ে বলবার আগেই থামতে হয় কুঞ্জকে। অবনীবাবু ঘরে এসে খবর দেন। 'নবজীবন প্রেস থেকে জয়ন্তবাবু দেখা করতে এসেছেন।'

'যান আপনারা ওঘরে, আর মনে থাকে যেন যা-যা বলে দিয়েছি।' মনোহর আর কুঞ্জের দিকে কথাগুলো বলে অবনীর দিকে চেয়ে ধরণীধর বলেন, 'পাঠিয়ে দিন।'

খানিক পরেই জয়ন্তের কণ্ঠস্বর শোনা যায় দরজার ওপাশ থেকে, 'আসতে পারি?'

'আসুন।'

জয়ন্ত ঘরে এসে বসে। বলে, 'আমি নবজীবন প্রেস থেকে আসছি।'

'নবজীবন প্রেস!—একটু যেন ভেবে নিয়ে ধরণীধর বলেন, 'ও সেখান থেকে নতুন খবর বেরোয়? আপনিই তাহলে নতুন খবরের সম্পাদক জয়ন্তবাবু!'

'হ্যাঁ।'

বাইরে থেকে একটা গোলমাল শোনা যাচ্ছিল। যেন একটা ভারী মাল নিয়ে কয়েকজন লোক ধস্তাধস্তি করছে।—

'এই ইধর লে-আও।'

'আরে নামা না একটু আস্তে—।'

'এই পাকড়ো ঠিকসে।'

'আরে ফেঁকো মাৎ।'

মিশ্রিত একটা গোলমাল শোনা যাচ্ছে এইরকম।

একটু থেমে ধরণীধর বললেন, 'মাপ করবেন, দেখে আসি একটু'—বলতে-বলতে উনি বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। জয়ন্তও বেরিয়ে এল বারান্দায়। দেখল একটা বড় প্যাকিং বাক্স নিয়ে চারজন কুলি টানাটানি করে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। নামাতে পারছে না ঠিকমতো।

আর কয়েকজন বাবু গোছের লোক কেবলই চেঁচাচ্ছে, হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে, মাতব্বরি করছে— আরে এদিকে একটু সরিয়ে...না না আরে পাকড়ো ঠিকসে...ইধার লে আও...একটু আস্তে।'

ধরণীধর পিছন থেকে এসে যেন হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন। 'কী ব্যাপার কী! একটা বাক্স নামাতে সমস্ত অফিস যে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে!'

ওদের মধ্য থেকে একজন বাবু বলে, 'আজ্ঞে, ভয়ানক ভারী কী না! কুলিরা সামলাতে পারছে না।'

'কুলিরা সামলাতে পারছে না তো আপনারা কী করছেন? ও আপনারা সব বড়বাবু যে! মোটে হাত দিলে আপনাদের মান যায়!' কথা শেষ করেই ধরণীধর এগিয়ে আসেন কুলিদের দিকে। সামনের কুলিকে বলেন, 'এই হটো, উধার যাও!' কুলিকে পিছনে পাঠিয়ে সামনের দিকটা নিজেই কাঁধ লাগিয়ে চাড়া দিয়ে ঠেলে ধরেন। তাঁর সুগঠিত দেহ, কুঞ্চিত পেশিতে যেন ঢেউয়ের মতো দেখায়।

তারপর, অতি সহজে নেমে আসে বাক্সটা। সকলের চোখে মুখে বিরাট বিস্ময়। উনি বলেন, 'ভয়ানক একটা শক্ত কাজ না?'

সকলের মাথা হেঁট হয়ে আসে। ধরণীবাবু ওখানে আর না দাঁড়িয়ে চলে আসেন ঘরের মধ্যে। জয়ন্ত বাইরে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ সব দেখছিল। এবার ওঁর সঙ্গে ঘরে গিয়ে ঢোকে। জয়ন্তের চোখে শুধু বিস্ময় নয়, কিছু যেন শ্রদ্ধাও!

জয়ন্তের চোখের ছাপ ধরণীধরের দৃষ্টি এড়ায় না। একটু হেসে বলেন, 'বড্ড হতাশ হলেন না জয়ন্তবাবু? ধরণীধর চৌধুরী এমন একটা মুটে-মজুর ক্লাশের লোক ভাবতে পারেননি, কেমন?'

'তা সত্যি পারিনি।'—কেমন যেন অভিভূত হয়ে বলে জয়ন্ত, 'আপনার সম্বন্ধে একেবারে অন্যরকম ধারণা ছিল আমার।'

খুব স্পষ্ট করেই হেসে ওঠেন ধরণীধর এবার। বলেন, 'তাই নাকি! আরে সে তো আপনার সম্বন্ধেও আমার ছিল। আপনাকে দেখলে কে বলবে যে ওই হাতে কলম দিলেই তা থেকে আগুনের ফুলকি ছোটে। আপনাদের নতুন খবরের আমি একজন মস্ত ভক্ত, তা জানেন?'

জয়ন্ত এবার হাসে না। স্বরটা একটু কঠিন করেই বলে, 'এত ভক্ত বলেই বুঝি তার গলা টিপে মারবার ব্যবস্থা করেছেন?'

'গলা টিপে মারবার ব্যবস্থা! আমি করেছি!'

'বাকি কিস্তির দায়ে মেশিন তুলে আনবার হুকুমটার সেই রকম অর্থ হয় না কি?'

'ও, মেশিন তুলে আনতে গিয়েছিল বুঝি! অবনীবাবু! অবনীবাবু!'

'আজ্ঞে আমায় ডাকছেন'—অবনীবাবু এসে ঢোকেন ঘরে।

'হ্যাঁ ডাকছি! ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে শিখেছেন কতদিন!' জয়ন্ত যেন চমকে ওঠে ধরণীধরের গলা শুনে।

অবনীবাবু বলেন, 'আজ্ঞে।'

আর কিছু বলা হয় না, তার আগে ধরণীবাবু বলেন, 'নবজীবন প্রেসে মেশিন তুলে আনতে লোক পাঠিয়েছিলেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কেন?'

'আজ্ঞে তিন-তিনটে কিস্তি ওদের বাকি পড়েছে তাই অফিসের যেমন নিয়ম সেই মতো—।'

'নিয়ম! বড় নিয়ম শিখেছেন না! নিয়মের আর নড়চড় হয় না? নতুন খবর কাউকে রেয়াত করে কথা বলে না। বড্ড কড়া-কড়া ঘা দেয়, তাই নিয়মটা একটু বেশি করে জারি করে, আমায় খুশি করবেন ভেবেছিলেন, কেমন?'

অবনীবাবু নীরবে দাঁড়িয়ে একবার মাথা চুলকোন, আর একবার হাত কচলান। কিছুই বলতে পারেন না তিনি।

ধরণীধরের স্বর একটু নরম হয়। বলেন 'যান, আমায় জিগ্যেস না করে কখনও যেন নবজীবন প্রেসে তাগাদা না হয়!'

অবনীবাবু তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান।

ধরণীধর প্রত্যাশী চোখ নিয়ে তাকান একবার জয়ন্তের দিকে। জয়ন্ত চোখ নামায়, তারপর ধীরে-ধীরে বলে, 'আমি কিন্তু অনুগ্রহ চাইতে আসিনি ধরণীবাবু, এসেছিলাম কিস্তি শোধ দেওয়ার আর একটু সময় চাইতে?'

ধরণীবাবু তবু হাসেন। বলেন, 'সময় সুযোগ সবই আপনাদের দিলাম, যান এইবার মনের সাধে যত খুশি আমাদের গাল দিন।'

জয়ন্ত তবু একটু খোঁটা দিয়ে বলে, 'তা হয়তো দেব! কিন্তু তবু সামান্য কাগজের আলপিনের খোঁচা আপনার গায়ে লাগে কি?'

হো-হো করে হেসে ওঠেন ধরণীধর! 'চামড়া অনেক মোটা বলছেন! তাহলে আলপিনকে তলোয়ার করে তুললেই তো পারেন!' হঠাৎ স্বরটা নামিয়ে আবার বলেন, 'শুনুন জয়ন্তবাবু, আসবেন আমাদের এখানে? নেবেন একটা কাগজের ভার?'

জয়ন্ত স্পষ্ট জবাব না দিয়ে আর একটা প্রশ্ন করে, 'আমায় কাগজের ভার দিতে চান, কিন্তু তাতে আপনার লাভ? আপনার সানাইয়ের দলে আমি তো পোঁ ধরতে পারব না।'

'পোঁ ধরবার দরকার হলে আপনাকে ডাকতাম না! তার যথেষ্ট লোক আছে।' জয়ন্তের মনে হল ধরণীধরের কথা যেন রীতিমতো খোসামোদের মতো শোনাচ্ছে—। ধরণীধর বলছিলেন, 'শুনুন, নতুন একটা কাগজের সমস্ত ব্যবস্থা ছকা আছে। আপনি সম্পাদক হয়ে সেটা শুরু করুন। শেতলা ঠাকরুণ সাধারণের ফাইলটা দিয়ে যাও দেখি!'—

শেতলা অর্থাৎ স্টেলা বসে ছিল ঘরের এক দিকে। বলে, 'সাধারণের ফাইল তো আপনার টেবিলের ওপরই আছে।'

টেবিলের ফাইলগুলো নাড়তে-নাড়তে ধরণীধর পেয়ে যান ফাইল—'হ্যাঁ এই তো! পেয়েছি।'—ফাইলটা জয়ন্তের সামনে খুলে ধরে ধরণীধর বলে ওঠেন, 'যাদের মাথায় হাত বুলিয়ে ধর্ম, রাজনীতি থেকে দুনিয়ার জালজুয়াচুরির কারবার চলছে, সেই সর্বসাধারণের হয়ে লড়বার একটা সত্যিকার কাগজ গড়ে তুলতে পারেন না। বলুন, নেবেন এর ভার? টাকার জন্যে ভাববেন না। সেদিকে কোনও অভাব আপনার রাখব না।'

কথা শুনতে-শুনতে যেন অভিভূত হয়ে পড়েছিল জয়ন্ত। হঠাৎ যেন চমক ভেঙে বলে উঠল, 'ভাবনাটা টাকার জন্যে নয় ধরণীবাবু—ভাবনাটা আলাদা। নতুন খবর আমি ছাড়তে পারি না।'

'ছাড়তে পারেন না?'—এক মিনিট কী চিন্তা করেন ধরণীধর। তারপর আবার বলেন

'বেশ। নতুন খবরকেই এই সাধারণের মতো বড় দৈনিক করে তুলুন। আপনাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে আমি তার সমস্ত দায় নিতে প্রস্তুত।'

জয়ন্তের মনটা সাড়া দিয়ে ওঠে। দৈনিক হবে নতুন খবর? এলোমেলো লাগছে যেন। সব যেন ওলোট-পালট হয়ে যাচ্ছে। জয়ন্ত ধরণীধরের কথাটা পুনরাবৃত্তি করে বলে, 'সমস্ত দায় নিতে প্রস্তুত?...' একটু থেমে আবার বলে, 'তবু কথাটা আমাদের আলোচনা করতে হবে। আমাদের ভেবে দেখবার সময় চাই।'

ধরণীধরের মুখটা হাসিতে আলোকিত হয়ে ওঠে। বলেন, 'বেশ, ভেবে দেখেই জবাব দেবেন। আমি অপেক্ষা করে রইলাম।'

'আচ্ছা নমস্কার।' কোনও গতিকে নমস্কারটা সেরে বেরিয়ে যায় জয়ন্ত ঘর থেকে। ঘরের হাওয়া বড় গরম। মনের ভেতরটাকে পর্যন্ত গরম করে দেবে।

জয়ন্ত বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ঝড়ের মতো কুঞ্জ এসে ঢোকে। আড়াল থেকে সব শুনেছে ও। তাই ঘরে ঢুকেই একেবারে চিৎকার করে ওঠে, কুঞ্জের চেহারা কেমন যেন উদভ্রান্ত। কথা বলতে ঠোঁটদুটো ওর কাঁপছে! 'ওই জয়ন্ত—ওই ভুঁইফোড়টাকে দিয়ে আপনি নতুন কাগজ বার করতে চান? ওর আস্পর্ধার এই হল সাজা!'

ধরণীধর আগেব মতোই হাসেন। বলেন, 'হ্যাঁ এই হল সাজা, গায়ে ফোড়া উঠলে তাকে পাকিয়ে তুলে তবে কাটতে হয়, বুঝেছেন কুঞ্জবাবু!'

কুঞ্জ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ধরণীধরের দিকে।

নয়

আকাশের মতো হালকা মন নিয়ে ফিরল জয়ন্ত প্রেসে। মুখে-মুখে শিস দিয়ে চলেছে সে। খুব খুশির লক্ষণ এটা। এই শিস দিতে গিয়েই রাগারাগি হয়েছিল কুঞ্জেব সঙ্গে। বারান্দার ধারে স্টোভে চা করছিল প্রণতি। জয়ন্তের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। প্রণতি জয়ন্তকে দেখে হেসে বলল, 'কী খবব! খুব যেন খুশি মনে হচ্ছে।'

ভারি অন্তরঙ্গ প্রণতির কণ্ঠ। জয়ন্ত কিন্তু জবাব দিল না ওর কথার। পথে কতগুলো কাগজ কিনেছিল সেগুলো প্রণতিব সামনে মেলে ধরে কাগজওয়ালার ভঙ্গিতে হেঁকে চলল— 'নতুন খবর বাবু নতুন খবর...চার-চার পয়সা, বড়া ভারি যুদ্ধু বাধল বাবু, তাজা খবর— নতুন খবর—চার-চার পয়সা।'

জয়ন্ত কাগজ নিয়ে প্রণতির চারপাশে ঘুরতে থাকে আপনার খেয়ালে।

'আঃ ছেলেমানুষি রাখুন...কী হয়েছে কী?'

জয়ন্ত তবু হেঁয়ালি করবে—'নতুন খবর চার-চার পয়সা—একঠো কিনে পড়ে দেখুন।'

প্রণতি বিরক্তির ভান করে কপালটা একটু কুঁচকোয়। 'আমার অত কিনে পড়বার গরজ নেই, ভারি তো নতুন খবর, তার আবার চার পয়সা দাম।'

'আচ্ছা-আচ্ছা, পয়সা না থাকে তার বদলি অন্য কিছু তো আছে।'

প্রণতি অবাক হয় আরও ওর কথায়।—অন্য কিছু আবার কী? সন্দেহ ঘনায় ওর স্বরে।

জয়ন্ত আরও এগিয়ে যায় ওর দিকে। টেবিলে রাখা টোস্টার থেকে উঠিয়ে নেয় টোস্ট। বলে, 'এই দু-পিস বেশ কড়া টোস্ট'—আর ছুরি দিয়ে মাখন লাগাতে-লাগাতে বলে—

'তাতে বেশ পুরু করে মাখন—তার ওপর একটু মরিচের গুঁড়ো—' বলতে-বলতে মরিচের শিশি নিয়ে ঝাড়তে শুরু করে রুটির ওপর—'আর তার সঙ্গে একটু জেলি—।'

জেলির শিশিটা তুলে নিয়ে যাবে এমনসময় প্রণতি ছিনিয়ে নেয় শিশিটা ওর হাত থেকে—বলে, 'কী হচ্ছে কী পাগলামি! ওরকম বিদঘুটে খাওয়া কেউ খায়?'

'খায় না! আলবত খায়। হঠাৎ সাপের পাঁচ পা যারা দেখে তারা খায়—রাস্তায় আলাদিনের প্রদীপ—।'

প্রণতি মাঝপথে থামাতে চায় ওকে—আঃ, 'থামুন তো!—'

কিন্তু জয়ন্ত থামবে না। সে বলেই চলেছে 'রাস্তায় আলাদিনের প্রদীপ যারা কুড়িয়ে পায়, তারা খায়। হঠাৎ লটারিতে যারা লাখ টাকা মুফতসে পেয়ে যায়, তারা খায়—আর খায় যাদের ফ্ল্যাট মেশিনের সাপ্তাহিক হঠাৎ রোটারি মেশিনের দৈনিক হয়ে বেরিয়ে আসে—তারা।'

ওর হেঁয়ালিকে আরও রহস্যময় করে থামে জয়ন্ত আর কামড় দেয় টোস্টে।

প্রণতির চোখ-মুখ এবার সত্যিই বিস্ময়ে ভরে ওঠে।—'তার মানে।'

'তার মানে তাই—দৈনিক!' জয়ন্ত পরম নিশ্চিন্তে টোস্ট চিবোতে-চিবোতে বলে।

'দৈনিক!'

'হ্যাঁ, দৈনিক নতুন খবর। বাংলা দেশের সবচেয়ে নতুন, সবচেয়ে সেরা খবরের কাগজ, সকালে উঠে যে কাগজ না দেখলে লোকের দিন খারাপ যাবে। হকাররা যে কাগজ নেওয়ার জন্যে মারামারি করবে—যে কাগজ—।'

জয়ন্ত আরও কিছু বলত। কিন্তু তার উচ্ছ্বাসের ফেনাকে প্রণতির কঠিন স্বর যেন ছিন্নভিন্ন করে দেয়। প্রণতি বলে, 'নতুন খবর সাপ্তাহিক থেকে দৈনিক হবে, ধরণীবাবুই নিশ্চয় এ পরামর্শ দিলেন।'

জয়ন্তের উৎসাহ তবু নেভে না যেন। জয়ন্ত বলে, 'শুধু পরামর্শ নয় প্রণতি, আরও অনেক কিছু তিনি দিতে প্রস্তুত। কিন্তু এখনও তুমি চুপ করে বসে আছ? তোমার খুশিতে গান গেয়ে উঠতে ইচ্ছে করছে না? ইচ্ছে করছে না সব কিছু ছড়িয়ে ছত্রাকার করে দিতে? এতবড় একটা খবর শুনে এই তোমার চেহারা!'

ছড়াবার কথা বলতে গিয়ে হাতের কাগজগুলো ছড়িয়ে দেয় জয়ন্ত পাশে। নিবারণবাবু আসছিলেন সেই সময়ে ওঁর গায়ে কাগজ গিয়ে লাগে।

আপন মনে আসছিলেন নিবারণবাবু, কাগজটা ভ্রুক্ষেপ করেন না তিনি। জয়ন্তের শেষ কথাটা ওঁর কানে লেগেছিল—'এই তোমার চেহারা!'

নিবারণবাবু উৎসাহের সঙ্গে বলে ওঠেন, 'বল তো বাবা, তুমিই বল, চেহারা খারাপ হচ্ছে কি না ওর। পই-পই করে আমি বলছি এত খাটিস নি মা, শরীরে সইবে না। প্রেসের কাজ, সংসারের কাজ, এ কি একসঙ্গে হয়! রান্নাবান্নার জন্যে একটা রাঁধুনি রাখি। তা কিছুতে শুনবে না, বলে রাঁধুনির রান্না খেলে নাকি আমার শরীর খারাপ হয়। আরে আমার দিন তো ঘনিয়ে আসছে। এখন গেলেই হয়। আমার শরীর ভালো রাখতে তোর শরীর যদি খারাপ হয়, তাহলে কী স্বর্গলাভটা আমার হবে! না, এবার আমি আর কোনও কথা শুনছি না—।'

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি সুযোগ নিয়ে বলে, 'না, কোনও কথা আপনাকে শুনতে হবে না। বসুন আপনি এইখানে—।' নিবারণবাবু একটু যেন অবাক হয়েই বসে পড়েন সামনের

চেয়ারটায় আর তাকিয়ে থাকেন জয়ন্তের মুখের দিকে। জয়ন্ত তখন বলছে, 'আচ্ছা এইবার রোটারি মেশিনের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন, ঠিক সমুদ্র গর্জনের মতো আওয়াজ, আর তার সঙ্গে বাইরে ডেলিভারি-ভ্যান আর সাইকেল-পিওনদের হট্টগোল—।'

নিবারণবাবু উত্তরোত্তর বিস্ময়ে একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়েন। সত্যিই যেন রোটারি মেশিনের আওয়াজ আসছে, অথচ শুনতে পাচ্ছেন না, এমনভাবে বলেন, 'কই না তো!'

'পাচ্ছেন না এখনও।'—হেসে ওঠে জয়ন্ত—'আচ্ছা ক'দিন বাদেই পাবেন। ঘণ্টায় হাজার হাজার নতুন খবর যখন প্রতিদিন আপনার প্রেস থেকে বেরুবে, নবজীবন প্রেসের নাম যখন দেশের এক প্রান্ত থেকে—।'

আর সহ্য করতে পারেন না নিবারণবাবু বিস্ময়ের পীড়ন। বাধা দিয়ে বলেন, 'তুমি কী বলছ জয়ন্ত, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না—।'

জয়ন্ত এতক্ষণে তার উচ্ছ্বাস আর হেঁয়ালি থামিয়ে স্পষ্ট করে বলতে শুরু করে। 'শুনুন তাহলে, শোন প্রণতি,' ছোটেলাল ইতিমধ্যে এসে হাজির হয়েছিল তাকেও শোনায় জয়ন্ত 'শোন, ছোটেলাল, আমি ধরণীবাবুর কাছ থেকে আসছি। নতুন খবর আর সাপ্তাহিক নয়, এখন থেকে দৈনিক হয়ে বেরুবে। সমস্ত plan complete।'

নিবারণবাবু উত্তেজিত হয়ে বলেন, 'নতুন খবর দৈনিক হবে—সে তো অনেক টাকার ব্যাপার!'

'টাকাব কথা আপনি ভাবছেন কেন? টাকার জন্যে ভাবনা নেই।' নিশ্চিন্ত হয়ে বলে জয়ন্ত।

প্রণতি কথা বলে এতক্ষণে। তার স্বর আগের মতোই কঠিন আর ধারাল। 'তার জন্যে ধরণীবাবু আছেন, না?'

'নিশ্চয়। তিনি আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন।' জোর দিয়ে বলে জয়ন্ত।

বিস্ময় আর উত্তেজনায় অধীর হয়ে নিবারণবাবু বলেন, 'ধরণীবাবু আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন! কিন্তু কেন?'

জবাব দেয় ছোটেলাল। 'কেন সমঝাতে পারছেন না! জোর—ওই আপনাদের বাঘ, বাঘ যে জন্যে বকরীর সাথে দোস্তি করে।'

ছোটেলালের কথার মধ্যে খোঁচাটুকু আর লুকিয়ে থাকে না। জয়ন্ত বলে, 'না না। তুমি ভুল করছ ছোটেলাল। বাঘ-ছাগলের সম্পর্ক এটা নয়।'

'কিন্তু সম্পর্কটা তাহলে কিসের?' প্রণতির কঠিন স্বর উঁচু পর্দায় ওঠে 'কী জন্যে ধরণীধরবাবু হঠাৎ এত উদার হয়ে উঠছেন, সেইটেই যে বুঝতে পারছি না!'

'অকারণে মানুষকে অত ছোট করে না ভাবলে হয়তো বুঝতে পারতে প্রণতি।' কেমন যেন আহত স্বরে বলতে থাকে জয়ন্ত—'নতুন খবর ধরণীবাবুর ভালো লেগেছে, আমাদের ওপর তাঁর বিশ্বাস আছে। এও তাঁর উদারতার কারণ তো হতে পারে।'

'আমাদের ওপর তাঁর বিশ্বাস আছে বুঝলাম, কিন্তু তাঁর ওপর আমাদের বিশ্বাস তো না থাকতে পারে।'

'না থাকবার কারণ তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না। আমরা তাঁকে অনেকভাবে ঘা দিয়েছি। কিন্তু তিনি আমাদের কোন ক্ষতি তো এখনও করেননি।'

প্রণতি চুপ হয়ে যায়। মনে-মনে ও যেন ভেঙে পড়ছে। সেই জয়ন্ত একদিনে এমন হয়ে গেল! ধরণীধরের স্বর্ণজালে পথ ভুলল?

প্রণতিকে চুপ থাকতে দেখে ছোটেলাল বলে উঠল, 'দেখো জয়ন্ত ভাইয়া, আমার এক বাত শুনো। ধরণীবাবুর মতলব খুব ভালো আছে জানলাম। কিন্তু সে হল সোনে কি গাগরি। আমাদের মাট্টিকে গাগরির সাথে তার মহব্বৎ হোলে আমাদেরই মুশকিল।'

জয়ন্ত অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। বলে, 'এসব কোনও কাজের কথা নয় ছোটেলাল। আমাদের কাগজ বড় হয়ে উঠুক তাও কি তোমরা চাও না?'

প্রণতি আবার কথা বলে, 'নিজের জোরে যদি বড় হতে না পারি তাহলে অন্যের ফুঁয়ে বেলুনের মত ফেঁপে উঠে কোনও লাভ নেই।'

'শুধু নিজের জোরে নতুন খবর কতদিনে দৈনিক হয়ে উঠতে পারবে তুমি আশা কর?'

হয়তো কোনও দিনই হবে না। তবু, দৈনিক হওয়ার জন্যে ধরণীবাবুর মতো লোকের কাছে নিজেদের বিকিয়ে দেওয়ায় আমি সায় দিতে পারব না।'

'আপনারও কি তাই মত নিবারণবাবু? পরাজিতের মতো প্রশ্ন করল জয়ন্ত।

'আমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না জয়ন্ত। আমার একটু ভাবতে সময় দরকার।' নিরুৎসাহ হয়ে বলেন নিবারণবাবু।

'থাক, আপনাদের আর ভাবতে হবে না। বিকিযে যদি দিতেই হয় আমি নিজেকেই দেব।' আপনাদের সে পাপের ভাগী করব না। হতাশায় আর বিমর্ষতায় ডুবে গিয়ে আচ্ছন্নের মতো বলে জয়ন্ত। আর কথা শেষ করেই ওদের সামনে থেকে চলে যায় বাইরে।

ছোটেলাল জয়ন্তের পিছন-পিছন বেরিয়ে যায়।

প্রণতি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে শুধু জয়ন্তেব যাওয়ার দিকে। ওর চোখ শুকনো, অসাধারণ রকমের শুকনো।

জয়ন্ত সোজা এসে অফিস-ঘরে ঢুকে একটা চেয়ারে গা এলিয়ে দেয়। মাথার ভেতরটা যেন দপ-দপ করে জ্বলছে। ঘরেব হাওয়াটা যেন বিষে ভর্তি। কোথাও এতটুকু নিশ্বাস নেওয়ার ফাঁক নেই।

ছোটেলাল পিছন থেকে এসে একটা হাত রাখে ওর পিঠে। বলে, সচমুচ্ গোস্সা হয়ে গেলে জয়ন্ত ভাইয়া।'

জয়ন্ত প্রথমটা চুপ করে থাকে। তারপর শুকনো গলায় বলে, 'রাগ করা আমার অন্যায় হয়েছে ছোটেলাল। তার জন্যে মাপ চাইছি। কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি যে, এখানে তোমাদের সঙ্গে থাকা আমার আর চলবে না।'

'কেয়া বলতে হো ভেইয়া? এহি তো গোস্সা কি বাত হ্যায়। আমাদের তুমি ছেড়ে চলে যাবে!'

'রাস্তা যদি আলাদা হয়ে যায় তাহলে বুক ভেঙে গেলেও ছেড়ে যেতেই যে হবে ছোটেলাল!'

নিঃশব্দে প্রণতি এসে ঘরে ঢোকে। কথাগুলো ওর কানে ঢুকেছে। নিজের থেকেই জবাব দেয় প্রণতি, 'এতদিন রাস্তা তো আলাদা ছিল না, হঠাৎ আজই ধরণীবাবুর কল্যাণে সেটা আলাদা বলে আবিষ্কার করলেন বুঝি?'

প্রণতির গলা শুনে একটু যেন চমকে, একটু যেন বিহ্বল হয়ে তাকায় জয়ন্ত। তারপর বলে, 'সত্যিই তাই করলাম প্রণতি, আর আমার কাছে সেইটেই সবচেয়ে বড় দুঃখের কথা।

আমার সঙ্গে তোমাদের মতে মিলবে না। জ্বালাতে যদি হয় তবে আমি মশালই জ্বালাতে চাই। মিটমিটে বাতি নয়। যদি সত্যি আমার কিছু জানাবার থাকে, লক্ষ-লক্ষ লোককে তা আমি জানাতে চাই, সামান্য দু-চার জনকে নয়!'

'কতজনে জানল শুধু তার সংখ্যা দিয়েই কি সত্যের দাম যাচাই হয়?' প্রণতির কথার জ্বালা যেন কমে আসছে।

জয়ন্ত বলে, 'সত্যের নিজস্ব দাম যাই হোক, অন্ধ গুহায সত্য বন্দী থাকলে কী তার সার্থকতা? ধরণীবাবু তোমাদের চোখে যত মন্দই হোক, আমি জানি তার হাতে সেই দরজাব চাবি, বাইরের বড় জগতে যেতে হলে যে দরজা আমাদের পার হতেই হবে!'

প্রণতি আরও এগিয়ে আসে জয়ন্তর দিকে। বলে, 'ওই একটা ছাড়া বড় জগতে বার হওয়ার আর কি দরজা নেই?'

জয়ন্ত উঠে দাঁড়ায় চেয়ার ছেড়ে। ওর স্বরে বিষণ্ণতার মেঘ যেন কেটে যাচ্ছে! নিজেকে আরও বেশি প্রকাশ করতে চাইছে ও। 'থাকবে না কেন? হয়তো থাকতে পারে। কিন্তু সামনে দবজা পেয়েও ছেড়ে দিয়ে হাতড়ে বেড়াবার কোনও মানে আমি পাই না।'

'ভাইয়া, সামনে দরওয়াজা তো ঠিক আছে, লেকিন কেইসে মালুম তা দিয়ে রাস্তা মিলবে, না গাঢ়ামে গির পড়বে।' ছোটেলাল বিচক্ষণের মতো ঘাড় নাড়ে আর বলে।

'তাছাড়া চাবি যার হাতে, দবজা সে তো অমনি খুলে দেবে না। কী দাম সে আদায় করে নেবে সেটা হিসেবেব মধ্যে ধবেছেন?'

'অত হিসেব-নিকেশেব আর কোনও দরকারই তো নেই প্রণতি। নতুন খবরকে সাপ্তাহিক থেকে দৈনিক কববাব কথা ভাবাই অন্যায় হয়েছে, স্বীকার করছি। নতুন খবর যে আমার নিজেব কাগজ নয়, এটা মনে বাখা উচিত ছিল।'

চোখ দুটো এক মুহূর্তের জন্য বন্ধ কবে প্রণতি। আঘাতটা সহ্য করতে একটু সময় লাগে। ছোটেলাল একবার তাকায় প্রণতির দিকে তারপর একটু চেঁচিয়েই বলে, 'কেয়া বোল রহ জয়ন্ত, কেয়া তুমরা দিমাক বিগড গয়া, কেয়া!'

ছোটেলালের কথার জবাব দেয় প্রণতি। সমস্ত দুর্বলতাকে জয কবে সে যেন জেগে উঠেছে এবার। জয়ন্ত শেষ আঘাত দিয়েই বুঝি জাগাল ওকে। প্রণতি বলে, 'না ছোটেলাল উনি ঠিকই বলেছেন। নতুন খবব ওঁর নিজেব কাগজ নয়, এটা বুঝতে যে ওঁর এত দেরি হয়েছে, এইটেই আশ্চর্য।'

কথাটা শেষ করে, কিন্তু আর দাঁড়াতে পারল না প্রণতি। তার গলাটাও কি কাঁপল একটু? কাঁপল চোখের পাতা? ফিবে দাঁড়াল ও দরজার দিকে। যাবে বলে।

বাধা পড়ল দরজায়! 'আসতে পারি কি?' গলা শোনা গেল কুঞ্জর।

অনুমতি না পেয়েই ঘরে ঢুকল কুঞ্জ। ওর ভাবভঙ্গিতে একটা প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ যেন উঁকি দিচ্ছে। একটু হেসে ঘাড় নাচিয়ে বলল, 'আরে খাওয়াদাওয়া, উৎসব, হৈ-হল্লোড় কিছু তো দেখছি নে। জয়ন্তবাবুর কেরামতিতে সাপ্তাহিক কাগজ দৈনিক হয়ে উঠছে খবর পেলাম। কিন্তু কই? কিছু না হোক, এ অভাগার বরাতে কি একটা চাকরিও জুটবে না। না কি ইতিমধ্যেই নো ভেকেন্সি?'

জয়ন্তও হাসল একটু। বোধ হয় ওর হাসিও ব্যঙ্গের। বললে, 'না, আপনি ঠিক সময়েই এসেছেন কুঞ্জবাবু। আপনার উপযুক্ত জায়গা আপনার জন্যেই খালি করে রেখে গেলাম।'

বেরিয়ে গেল জয়ন্ত ঘর ছেড়ে।

বাকি তিনজনে ঘরের মধ্যে এক মহাশূন্যতাকে চোখ মেলে দেখতে লাগল শুধু।

আরও কিছু বক্তব্য ছিল জয়ন্তের। নবজীবন প্রেসে নয়, ধরণীধরের অফিসে। তাই সেখানেই গেল জয়ন্ত। ভেবে দেখবার সময় নিয়েছিল ধরণীধরের কাছে, তার ফলাফলটা জানিয়ে দিতে গেল ও।

আশা দিয়ে এসেছিল জয়ন্ত, কিন্তু এবার গিয়ে নিরাশ করল। সোজা জানিয়ে দিল তার পক্ষে ধরণীধরের সঙ্গে যোগ দেওয়া সম্ভব নয়। অনেক ভেবে দেখেছে সে। হয়তো রাজি হতো সে শেষকালে। কিন্তু হঠাৎ কেন তার সিদ্ধান্ত বদলে গেছে। হঠাৎ মেঘ এসে হালকা আকাশকে করে তুলেছে ভারী!

ধরণীধরের মতো লোকও কম অবাক হননি। তবে কি তাঁর চালে ভুল হয়ে গেল?

ধরণীধর বললেন, 'আপনার কাছে এ জবাব আমি সত্যিই আশা করিনি জয়ন্তবাবু! নতুন খবর আমাদের সঙ্গে আসতে রাজি না হোক, আপনি তো আসতে পারেন! সেখানে কোনও দাসখত আপনার তো লেখা নেই?'

'দাসখত ছাড়া আর কিছুতে কি মানুষ বাঁধা থাকে না? না ধরণীবাবু নতুন খবর আমাকে ছাড়লেও আমি তাদের ছাড়তে পারি না।'

'আপনার কলমে আগুন ছিল বলেই এত করে ডাকছি। সমস্ত মাঠ যে আলো করে দিতে পারে সে মশাল বন্ধ ঘরে জ্বালিয়ে লাভ কি? আপনার নতুন খবরের লেখা কজনের কাছে পৌঁছয়?'

উঠে দাঁড়ায় জয়ন্ত। বলে, 'তা হয়তো পৌঁছয় না। তবে মাঠ আলো করার সৌভাগ্য তো সকলের হয় না!'

এ যেন জয়ন্তের কণ্ঠস্বর নয়। আর একজনে যেন বলে দিচ্ছে।

ধরণীধর শেষ চেষ্টা করে দেখেন। বলেন, 'তবু, আমার দরজা আপনার জন্য খোলা রইল জয়ন্তবাবু। কখনও যদি মত বদলান, তাহলে সাধারণ কাগজ আপনার জন্য তোলা আছে জানবেন।'

পাতলা হাসি ফুটে ওঠে জয়ন্তের মুখে। মৃদু মাথা দোলায় ও। তারপর নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। ধীরে।

এবারেও আসতে ভুল করেনি কুঞ্জ। জয়ন্তর পিছন-পিছন হাজির হয়েছে ধরণীধরের অফিসে। জয়ন্ত বেরিয়ে যেতে কুঞ্জ এসে ঢোকে ঘরে। মুখে তার অস্ফুট হাসি। সে হাসি শুধু ব্যঙ্গের নয়, গর্বেরও।

বাইরে থেকেই বলতে-বলতে আসছিল কুঞ্জ। 'রাজি হল না তো স্যার। হবে কোথা থেকে? সে মুরোদ ওর আছে! নবজীবন প্রেসের ওই ডোবাটুকুর মধ্যেই ফড়-ফড় করে, দৈনিক কাগজের সমুদ্রে হাবুডুবু খেয়ে মরবে। আপনার কোনও ভাবনা নেই স্যার। সাধারণ কাগজ কী করে তুলি দেখবেন। ভারটা শুধু আমার ওপর ছেড়ে দিন।'

'আপনার ওপর ছেড়ে দেব?' পরম বিস্ময়ে প্রশ্ন করেন ধরণীধর—'কেন আমি কি এখানে পিঁজরাপোল বানিয়েছি?'

'পিঁজরাপোল!'

'হ্যাঁ, যত কানা অথর্বদের পোষবার পিঁজরাপোল তো এটা নয়।'

'আজ্ঞে আমি কানা খোঁড়া অথর্ব! আমার লেখা তো আপনি পড়েছেন। আজ পনের বছর ধরে সম্পাদকী করছি!' অসহায়ের মতো বলতে থাকে কুঞ্জ।

'তবু এখনও পিঁজরাপোলে যাননি। সময় তো হয়ে গেছে।'

না, আর সহ্য করা যায় না। রসিকতারও একটা সীমা তো আছে। কুঞ্জ এবার গলা চড়িয়ে দেয়, 'কি বলছেন স্যার? আপনার ভরসাতেই নতুন খবরের কাজ ছাড়লুম—।'

'এখানের আশাটাও সেই সঙ্গে ছাড়ুন। যান সময় নষ্ট করবেন না—।'

আজকে যেন বিস্ময়ের আর সীমা নেই। কুঞ্জ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ভাববার শক্তিও যেন তার লোপ পাচ্ছে।

জয়ন্ত তখনও বেরিয়ে যায়নি অফিস থেকে। সিঁড়ির নিচে আটকেছেন সবিতাদেবী। জয়ন্ত নেমে আসতেই এগিয়ে এসে প্রশ্ন করেন সবিতাদেবী, 'মাপ করবেন, আপনিই জয়ন্তবাবু না? নতুন খবরের ভূতপূর্ব সম্পাদক?'

'হ্যাঁ তা বলতে পারেন।'

'আপনাকে একটু অভিনন্দন জানাতে পারি কি?'

'কেন?'

'এই আমাদের খাতায় নাম লেখাবার জন্যে। ছিলেন বুনো পাখি কেউ খোঁজও রাখত না। এখন দাঁড়ে বসে মজুদ ছোলা খাবেন আর শিস্ দেবেন। দেশসুদ্ধ ধন্য-ধন্য করবে। সাধারণ কাগজ তো এখন আপনারই হাতে।'

ইচ্ছে না থাকলেও ভদ্রতার খাতিরে জবাব দিয়েছে জয়ন্ত। হাসি মুখেই বলেছে, 'অত্যন্ত দুঃখিত যে আপনার অভিনন্দনটা বৃথাই নষ্ট হল। আপনাদের দাঁড়টা খালিই রেখে যাচ্ছি!'

কথা শেষ করে উত্তর পাওয়ার সুযোগ নেয়নি জয়ন্ত। চলে গেছে অফিস থেকে।

প্রেসে কাজ নেই। মনও নেই। তাই এই বাড়িজোড়া ফাঁকটাকে এড়াবার জন্যে প্রণতি খুশির কাছে এল। খুশি একাই আছে বসে। জয়ন্ত নেই। প্রণতি গল্প ফাঁদল খুশির কাছে। ছোটখাটো কথা থেকে মনের কথা। প্রাণখোলা হাসি।

জয়ন্ত বাড়ি ফিরেছিল এরমধ্যে, কিন্তু প্রণতিকে খুশির সঙ্গে কথা কইতে দেখে ফিরে গেছে, ঘরে ঢোকেনি। প্রণতির কাছে তার আসল পরিচয় দিতে সে রাজি নয়। রাজি হয়নি গোড়ায়, এখনও নয়।

দাদার গল্প খুশি খুব করে প্রণতির কাছে। কিন্তু দাদাকে দেখাতে পারে না এই তার দুঃখ। প্রণতিও দুঃখিত। অদ্ভুত মানুষ বটে, সারাদিনে একবারও দেখা পাওয়ার জো নেই।— 'সত্যি তোমার দাদা কীরকম লোক বল তো! এত বড়ো বাড়িতে তোমায় একলা রেখে বেশ নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়ায়?'

'দাদার যে অনেক কাজ!' বড় গলায় বলে খুশি।

'ছাই কাজ! কী কাজ করে তুমি জান?'

খুশি এবার একটু বিচলিত হয়। সত্যি সে জানে না তার দাদার কী এত কাজ। খুশি বলে, 'আমি কী করে জানব? আমায় তো বলে না!'

প্রণতি দুষ্টুমি করে হেসে বলে, 'সত্যি তোমার দাদা আছে কি না তাই আমার সন্দেহ হয়, জানো? নইলে এতদিন আসছি একদিন চেহারাটাও দেখতে পেতাম না।'

খুশিও হাসে। ওর চোখেও কীসের যেন আলো! খুশি বলে, 'সত্যি কথা বলব?—দাদা যে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায় না?'

'তাই নাকি? তা তো জানতাম না।' একটু চিন্তিত হয়ে প্রণতি বলে, 'তোমার দাদা খুব লাজুক বুঝি?'

'তা জানি না। তবে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায় না।'

'তাহলে আমায় ভয় করে বোধ হয়।' হাসতে-হাসতে বলে প্রণতি। 'তোমার দাদাকে বোলো যে আমায় দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আচ্ছা এখন আসি, কেমন?'

প্রণতি নেমে এসে সিঁড়ি পেরিয়ে যেতেই জয়ন্ত বেরিয়ে এসে ডাকে 'প্রণতি! একটু দাঁড়াও!'

জয়ন্তের গলা শুনে চমকে দাঁড়ায় প্রণতি। 'আপনি এখানে?'

'হ্যাঁ এইটেই আমার বাড়ি। আমি খুশির দাদা।' এতদিনে রহস্য বিনা ভূমিকাতেই প্রকাশ করে দেয় জয়ন্ত।

'আপনিই খুশির দাদা?—এই বাড়ি আপনার?' প্রণতির মুখ নিমেষে কালো হয়ে আসে।

'তোমাকে বলব ভেবেও এ কথাটা বলতে পারিনি। তাতে অবশ্য এখন বোধ হয় কিছু যায় আসে না।'

'না জয়ন্তবাবু তাতে অনেক কিছু আসে যায়। বড়লোক হয়েও শখ করে কম্পোজিটরি করা আপনার কাছে অবশ্য বাহাদুরি, কিন্তু আপনাকে আমাদেরই মতো সাধারণ লোক ভেবে নিজের করতে যাওয়া আমাদের মস্ত অপরাধ! আগে জানলে বোধ হয় এ অপরাধটা করতাম না।'

একটি তারা থেকে আর একটি তারায় ছুটে যাওয়া উল্কার মতো কথাগুলো লাগল জয়ন্তর গায়ে। প্রণতি ততক্ষণ এগিয়ে গেছে।

জয়ন্ত ডাকল, 'শোন প্রণতি, আমায় ভুল বুঝো না। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে যে।'

তারায় আলো দেয়। কিন্তু তাই বলে তার দেওযা উল্কা শুভকর নয়।

এক মিনিটের জন্য ঘুরে দাঁড়ায় প্রণতি। বলে, 'না কোনও কথা আর নেই। আমাদের সঙ্গে দু-দিনের পরিহাস করবার আপনার শখ হয়েছিল—সে শখ আপনার মিটে গেছে। আমাদের মতো নগণ্য লোকদের সঙ্গে চিরদিন আপনি নিজেকে জড়িয়ে রাখবেন, একথা ভাবাই আমাদের ধৃষ্টতা।

জয়ন্ত ডাকল, 'শোন প্রণতি, যেও না, শোন!'

আজ প্রণতির চলে যাওয়ার পালা। জয়ন্ত নিস্পন্দ হয়ে দেখল।

এর আগে অনেকগুলো কথা বলে জয়ন্ত বেরিয়ে এসেছিল প্রণতির বাড়ি থেকে।

নিজের ঠোঁটটা অজ্ঞাতেই কামড়ে ধরল জয়ন্ত।

দশ

শেষ পর্যন্ত মত বদলাল জয়ন্ত আর একবার। ভেবে দেখেছে সে গভীরভাবে। কী সম্পর্ক তার নতুন খবরের সঙ্গে? প্রণতি নিজের মুখে বলেছে, 'আমাদের মতো নগণ্য লোকদের সঙ্গে চিরদিন আপনি নিজেকে জড়িয়ে রাখবেন, একথা ভাবাই আমাদের ধৃষ্টতা!' জয়ন্ত

প্রণতির কথাগুলো বারবার আবৃত্তি করে। আর কী বলেছিল যেন সে? 'আমাদের সঙ্গে দু-দিন পরিহাস করবার আপনার শখ হয়েছিল। সে শখ আপনার মিটে গেছে!' চমৎকার! শখ হয়েছিল পরিহাস করবার! মাথাটা কেমন করে ওঠে জয়ন্তের। হ্যাঁ, শখ আছে তার পরিহাস করবার...পরিহাসই করবে সে। কী সম্পর্ক তার নতুন খবরের সঙ্গে? দৈনিকের সম্পাদক করে দিচ্ছে ধরণীধর তাকে।...কী আশ্চর্য লোক ওই ধরণীধর। ওরই নামে যত মিথ্যে বদনাম শুনেছিল জয়ন্ত। না, আর একবার ভেবে দেখতে হবে। ধরণীবাবু কথা দিয়েছেন সবরকম স্বাধীনতা তিনি দেবেন...তবে? বিছানায় শুয়ে-শুয়ে ছটফট করে জয়ন্ত। খোলা জানলা দিয়ে রাতের কালো আকাশ থেকে যেন রোটারি মেশিনের ঘট-ঘট শব্দ অজস্র ঢেউয়ের মতো এসে গ্রাস করে ওকে...আচ্ছন্ন করে ফেলে। স্বপ্ন দেখে জয়ন্ত। তার বহু জাগ্রত স্বপ্নের প্রতিচ্ছবি...!

ধরণীধর মিথ্যা বলেননি। সব ব্যবস্থাই তাঁর করা ছিল। কেবলমাত্র জয়ন্তের সম্মতির অপেক্ষা। জয়ন্ত কথা দিয়েছে। ধরণীধরের উৎসাহের তাই অন্ত নেই। অল্পদিনের মধ্যেই বেরিয়ে গেল 'সাধারণ'। কাগজওয়ালারা হেঁকে চলল আনন্দবাজার, বসুমতী, স্বরাজ, সাধারণ—নতুন বেরুল বাবু—সাধারণ, সাধারণ!

অনেকেই একখানা করে সাধারণ কিনে নিয়ে যায়। নতুন কাগজে কী লেখা হল তাই দেখবার জন্য। নতুন কাগজের সম্পাদকের নামটাও লোকে উৎসাহের সঙ্গে দেখে—জয়ন্ত চৌধুরীর নাম ছড়িয়ে পড়ে অতি সহজেই।

একখানা সাধারণ হাতে নিয়ে কুঞ্জের হোটেলের মালিক কুঞ্জকে গিয়ে আক্রমণ করেন—'বলি ও মশাই, জোচ্চুরির আর জায়গা পাননি? ডাহা তিনটে মাস স্রেফ ধাপ্পা দিয়ে আমায় ঠকিয়ে এলেন?'

কুঞ্জ বেরোবে বলে তৈরি হচ্ছিল, মালিকের এই হঠাৎ আক্রমণে একটু যেন বিব্রত বোধ করে। কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নিয়ে বলে, 'আমায় বলছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ আপনাকে। তিন-তিনটি মাস হোটেলে তো একটি পয়সা ঠেকাননি, চাইতে গেলে লম্বা চওড়া সব কথা শুনিয়েছেন।...এখন কী হল এটা? মালিক সাধারণ কাগজটা মেলে ধরেন কুঞ্জর সামনে। কাগজের ওপরেই বড়-বড় করে সম্পাদকের নাম লেখা—জয়ন্ত চৌধুরী।

কিছু অন্যায় বলেননি মালিক। ধরণীধরের উস্কানিতে নতুন খবর ছাড়বার পর থেকেই সাধারণের সম্পাদক হওয়ার স্বপ্ন দেখছে কুঞ্জ। সেই আশায় কিছু খরচা করে ফেলেছে ইতিমধ্যে—দেনা হয়ে গেছে বাজারে—বাকি পড়ে গেছে মেসের টাকা; অথচ সেই ধরণীধর কি না শেষে! কুঞ্জ হতাশায় আর রাগে যেন কাঁপতে থাকে। কিন্তু কিছু একটা বলতে হবে এখুনি। না হলে মালিকের কাছে রেহাই পাওয়া দায়। ঘরের আর দুজন রুম-মেটও অবজ্ঞার হাসি নিয়ে চেয়ে আছে ওর দিকে।...কুঞ্জ তাড়াতাড়ি বলে, 'কী হল এটা? এত ভড়কাচ্ছেন কেন? কী হয়েছে কী?'

'কী হয়েছে জানেন না? এই তো আপনার সাধারণ কাগজ বেরিয়েছে। কোথায়—কোথায় আপনার নাম?'

'আমার নাম? আমার নাম কাগজে থাকবে কেন? আমি চুরিডাকাতি করেছি না মিনিস্টার হয়েছি?'

'ইচ্ছে করে ন্যাকা সাজবেন না মশাই। আপনি না সাধারণের সম্পাদক হচ্ছেন? হাজার টাকা মাইনে পেয়ে আমাদের সব রাজা করে দিচ্ছেন! এই তো সম্পাদকের নাম জয়ন্ত চৌধুরী। বলুন ওটা ছাপার ভুল!'

এক মুহূর্ত আত্মরক্ষা করবার উপায় চিন্তা করে নেয় কুঞ্জ। তারপর মুখে একটা তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটিয়ে বলে, 'ছাপার ভুল হবে কেন ওই চোথা কাগজের কাজ আমি refuse করেছি।

'Refuse করেছেন।' —মুখভঙ্গি করে বলেন মালিক—'অথচ ওই হাজার টাকার ভাঁওতা দিয়ে তিন-তিনটি মাস দিব্যি তো হোটেলে জামাই আদরে কাটিয়ে দিলেন। আর আমি কিছু শুনছি না। হয় হোটেলের পাওনা দিন, নয় তল্পি-তল্পা নিয়ে এখুনি পথ দেখুন।'

'পথ দেখব কেন?' নরম সুরে বলতে থাকে কুঞ্জ, 'দেব, দেব, আপনার সব পাওনা চুকিয়ে দেব! আমার কি কাজের ভাবনা এই তো Statesman থেকে ডেকে পাঠিয়েছে। ফিরে এসেই সব পাওনা মিটিয়ে দেব।'

পাশের সিটে রুট-মেট বিপিনবাবু শুয়ে-শুয়ে সিগারেট টানছিলেন। আবহাওয়াটাকে হালকা করবার জন্যে, কুঞ্জ অন্তরঙ্গের মতো বলে বিপিনবাবুকে—'দেখি হে বিপিন একটা সিগারেট!' হাত বাড়িয়ে দেয় কুঞ্জ বিপিনবাবুর প্যাকেটটার দিকে।

এতটুকু আগ্রহ দেখা যায় না বিপিনবাবুর। নিশ্চিন্তে একটা টান দিয়ে বলেন, 'ওই দূর থেকেই দেখো দাদা, না হয় নিজের পকেট থেকেই বার করে একটা দেখাও। আমাদের চক্ষু সার্থক হোক!'

কানদুটো লাল হয়ে ওঠে কুঞ্জর। পকেট থেকে দেখাতে পারলে কি আর মুখ ফুটে চাইতে হয় ওকে? কুঞ্জ চেঁচিয়ে, বিরক্তির ভাব ফুটিয়ে বলে, 'আচ্ছা ছোটলোক তো! একটা সিগারেট ধার দিতে পার না?'

'সাধে ছোটলোক হয়েছি দাদা।' মালিকের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হেসে বলেন বিপিনবাবু—'গোটা ভার্জিনিয়াটা ধার দিয়েও যে তোমার কাছে কূল পাওয়া যায় না।'

'ছ্যাঃ, এ হোটেল আমি ছেড়েই দেব। কালই দেব।' মেজাজের সঙ্গে কথাগুলো বলে দুম-দুম করে বেরিয়ে যায় কুঞ্জ ঘর থেকে।

যেতে-যেতে শোনে মালিক বলছেন, 'তাই দয়া করে দিন, আমাদের হাড়ে বাতাস লাগুক।'

পথে বেরিয়ে খানিকটা নিশ্চিন্ত হয় কুঞ্জ। মনে-মনে যা-খুশি গাল দিতে থাকে ধরণীধরকে। কিন্তু গাল দিলেই তো শুধু চলবে না। অনেকগুলো টাকা দেনা হয়ে গেছে...কোথায় পাওয়া যাবে টাকা? মাথার ভেতর ঝিম-ঝিম করতে থাকে। এখন অন্তত একটা সিগারেট না হলে চলে না। কিন্তু পকেট শূন্য, একটা সিগারেট কেনবার মতো পয়সাও নেই আর!

হোটেলের নিচে পানের দোকানটায় গিয়ে দাঁড়াল কুঞ্জ। পানওলা লোক ভালো, মুখের কথায় বিশ্বাস করে ধারে জিনিস দেয়। ওর পাওনা নেহাত কম হয়নি। তা হোক, এক প্যাকেট সিগারেট না হলে চলবে না। মুখের সব ঝড়ের চিহ্ন মুছে দিয়ে স্বাভাবিক গাম্ভীর্য নিয়ে কুঞ্জ বলে, 'ওহে দেখি এক প্যাকেট সিগারেট!'

পানওলা জবাব দেয় না। পাশের আর এক ভদ্রলোককে পান দিতে থাকে।

'কই দেখি জলদি! দেরি হয়ে যাচ্ছে!'

'দেরি হয়ে যাচ্ছে তো করব কী! হাত তো আমার দুখানা চারখানা নয়! এই নিন সিগারেট!'

প্যাকেটটা হাতে নিয়েই কুঞ্জ এগোচ্ছিল। পানওলা চেঁচিয়ে ওঠে, 'কই দামটা?'

'দাম দেব'খন, হে, দেব'খন পরে।'

'ওসব দেব-টেব অনেক শুনেছি। দাম এখনি দিয়ে যান, নইলে দিন সিগারেট ফেরত।'

কুঞ্জ রাগ দেখায়। 'সিগারেট ফেরত দেব মানে? আমি কি দাম না দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি নাকি? দাম পাবে পরে।' কুঞ্জ এগিয়ে যায় আরও। হঠাৎ পানওলা লাফিয়ে নামে রাস্তার ওপর, আর কুঞ্জের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয় প্যাকেটটা। বলে, 'তাহলে সিগারেটও পরে পাবেন!'

একটু হতভম্ব হয়ে পড়ে কুঞ্জ। সকাল থেকে কী এক কুগ্রহের দৃষ্টি লেগেছে। পানওলা সুদ্ধ অপমান করতে চায় ওকে! ধরণীধর থেকে পানওলা পর্যন্ত! আহত হয়ে কুঞ্জ চিৎকার করে ওঠে, 'কী এতবড় তোমার আস্পর্ধা, আমার হাত থেকে সিগারেট তুমি ছিনিয়ে নাও। জানো, একটা কলমের খোঁচায় তোমার মতো ফুটপাথের দোকানিকে আমি দেশছাড়া করতে পারি? জানো কার সঙ্গে তুমি—।'

এতটুকুও ভড়কায় না পানওলা। কুঞ্জের মুখের ওপরই বলে ওঠে, 'হ্যাঁ, সব পারেন। আজ ছ-মাস ধরে আপনার অনেক বড়-বড় বুলি শুনেছি। শুধু পয়সার আওয়াজটাই পাইনি।' ওদের ঘিরে বেশ কয়জন লোক জড়ো হয়ে গেছে ততক্ষণে। তাদের দিকে তাকিয়ে পানওলা শোনাতে থাকে, 'আজ ছ-মাস ধরে মশাই ধার শোধ দেওয়ার নাম নেই, শুধু ধাপ্পা দিয়ে চালাচ্ছেন, তার ওপর আবার চোখ রাঙানি—।'

ভিড়ের মধ্য থেকে একজন এগিয়ে আসে। সে জয়ন্ত। পথ চলতে-চলতে গোলমাল শুনে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, বিশেষ যখন হাঙ্গামাটা কুঞ্জকে নিয়ে। জয়ন্ত পানওলাকে বলে, 'এঁর কাছে তোমার কত পাওনা হয়েছে?'

'পঁচিশ টাকা মশাই, পঁচিশ টাকা'—শ্রোতা পেয়ে পানওলা আরও উত্তেজিত হয়ে চেঁচায়, 'আজ দেব, কাল দেব, করে ছ'টি মাস আমার ফাঁকি দিয়েছেন!'

জয়ন্ত কোনও জবাব দেয় না। পকেট থেকে ব্যাগ বার করে পঁচিশ টাকা গুনে দেয় পানওলার হাতে। 'এই নাও তোমার পঁচিশ টাকা। সন্তুষ্ট হয়েছ?'

বিস্মিত দৃষ্টিতে টাকাগুলো গুনতে-গুনতে পানওলা হেসে-হেসে বলে, 'ন্যায্য টাকা পেলে আর সন্তুষ্ট হব না কেন!'

ভিড় পাতলা হয়ে যাচ্ছে। জয়ন্ত বেরিয়ে আসে ভিড় থেকে। পিছনে আসে কুঞ্জ। কুঞ্জ বলে, 'তুমি—মানে আপনি কেন দিতে গেলেন জয়ন্তবাবু? একটি পয়সা ওকে না দিয়ে এমন শিক্ষা দিতাম!'

চাপা হাসি নিয়ে জয়ন্ত বলে, 'সেটা শিক্ষার বাজে খরচ হতো না কি? তার চেয়ে পয়সা দেওয়া অনেক সোজা। শুনুন, আপনি কি এ পাড়ায় থাকেন?'

'তা না হলে কি বে-পাড়া থেকে এখানে সিগারেট খেতে আসি মশাই?'

'আপনার কি কাজকর্ম এখন নেই?'

'নেই মানে?' হাত মুখ নেড়ে বলে কুঞ্জ—'সাধাসাধি ঝুলোঝুলি বড় বড় সব কাগজ থেকে।' পকেট থেকে রুমালটা বের করে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলে, 'এখনও ঠিক করিনি কোথায় যাব।'

'কারা আপনাকে সাধাসাধি করছে?' এখনও চাপা হাসি জয়ন্তের ঠোঁটে অম্লান।

'এই যুগান্তর, বসুমতী, আনন্দবাজার যেখানেই যাব লুফে নেবে।' কাঁধ দুটোয় ঝাঁকানি দিয়ে সাহেবি কায়দা করে কুঞ্জ।

জয়ন্ত বলে, 'না, তা নেবে না। একটিবার সত্যি কথাটা স্বীকার করুন না।' জয়ন্ত কথা শেষ করে তাকায় কুঞ্জের দিকে।

কুঞ্জ তাকাতে পারে না ওর দিকে। তবু বলে, 'তার মানে? আপনি বলতে চান কী? আমার হয়ে পঁচিশ টাকা দেনা শোধ দিয়ে মাথা কিনে নিয়েছেন ভাবছেন? কাজ পেলেই দিয়ে দেব আপনার পঁচিশ টাকা।'

কুঞ্জ চলে যাচ্ছিল। জয়ন্তের কথা শুনে দাঁড়ায়। জয়ন্ত বলে, 'তা দেবেন জানি। কিন্তু তার আগে কাজ তো পাওয়া দরকার। করবেন একটা কাজ?'

'কোথায়?' মাথা নিচু করে বলে কুঞ্জ।

'যদি বলি সাধারণ কাগজে!'

'সাধারণ কাগজে? সে তো ধরণীধর চৌধুরীর—তার সঙ্গে আমার বনি-বনা হবে না মশাই।' রেগে ওঠে কুঞ্জ।

'তা না হোক। আমি আপনাকে নিচ্ছি।' জয়ন্ত পিঠে হাত রাখে কুঞ্জের।

'আপনি আমায় নিচ্ছেন। কেন বলুন তো?'

জয়ন্ত এবার জোর দিবেই হাসে। বলে, 'সত্যিই অ্যাটম বোম আপনার কলমে এখনও লুকোনো আছে এই আশায়। আসুন, আজ থেকেই আপনার কাজ শুরু।'

ঘেমে ওঠে কুঞ্জ। সকাল থেকে একটা কুগ্রহের দৃষ্টি পড়েছিল। এখন যেন মনে হচ্ছে গ্রহটা একেবারেই অশুভ নয়।

সম্মতি বা আপত্তি কোনটাই না জানিয়ে কুঞ্জ চুপ হয়ে যায়।

ইলেকশনের দিন এগিয়ে আসছে। যোগজীবনের অস্বস্তির আর শেষ নেই। ধরণীধরের উৎসাহে এতবড় একটা কাজে হাত দিয়েছেন যোগজীবন। অনেক টাকা ঢালতে হয়েছে। ঘোরাঘুরি ছুটোছুটির কোনও অন্ত নেই। এতটুকু যার আওয়াজ সেই নতুন খবরকেও সামলাতে হচ্ছে! সামলাতে হচ্ছে আরও অনেক দিক। ধরণীধর আশ্বাস দিয়েছেন নতুন খবরের বিষ দাঁত ভাঙবার ব্যবস্থা তিনি করেছেন। টাকার লোভে, নামের আশায় বিকিয়ে দিয়েছেন জয়ন্ত চৌধুরী নিজেকে। সাধারণ কাগজ উল্কার মতো আবির্ভূত হয়েছে সংবাদপত্র জগতে।

জয়ন্ত নিজেকে বিকিয়েছে বটে। কিন্তু কলম তার ভোঁতা হয়নি একটুও। কাগজ পড়লে তার আসল বক্তব্যটি যে কী তা জানতে অসুবিধে হয় না একটুও। যোগজীবন সাধারণ কাগজ নিয়ে ধরণীধরের অফিসে এসে হাজির হন। ধরণীধরের টেবিলের ওপর কাগজটা ফেলে বলেন, 'খুব ঘটা করে তো নতুন পুষ্যি নিয়েছিলে। দেখেছ তার কীর্তি? দেখছ কী লিখেছে সে?'

ধরণীধর হাসেন! বলেন, 'দেখেছি।'

হাসি দেখে আরও অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন যোগজীবন।—'দেখেও নির্বিকার হয়ে বসে আছ? তোমার কী বল না, আমায় সামনে ঠেলে দিয়ে দিব্যি আরামে পেছনে বসে মজা দেখছ! যত কাদামাটি, চুন, কালি আমার গায়েই লাগুক। তুমি তো তাই চাও!'

'চুন-কালির এই ভয়টা কবে থেকে হয়েছে বল তো যোগজীবন। যেদিন থেকে ট্যাঁকটা বেশি রকম ভারী হয়েছে! চুনকালি আমাদের কিছু কম ছিল কোনকালে? কোনওদিন তার

ভয়ে কোনও পেছপাও হয়েছি?' চোখ আর কপাল কুঞ্চিত করে প্রশ্ন করেন ধরণীধর! এ কুঞ্চনের একটা বিশেষ ইঙ্গিত আছে!

যোগজীবন অনেকটা সুস্থ বোধ করেন যেন। বলেন, 'কিন্তু তাই বলে সেধে অপমান ডেকে আনতে হবে! কী দরকার ছিল আমার ইলেকশনে দাঁড়াবার?'

'দরকার আরও ক্ষমতা নেওয়ার জন্যে'—টেবিলের ওপর একটা ঘুঁষি মেরে বলেন ধরণীধর—'সমস্ত কলকাঠি হাতে পাওয়ার জন্যে ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির তো আমরা নই। দু-চারটে গালাগালি শুনে মুষড়ে পড়বার মতো মেনিমুখোও নই!'

'তাই বলে নিজেদের ভাড়াটে গুন্ডাদের কাছে মার খেতে হবে? কী জন্যে এই সাধারণ কাগজটা তুমি এই জয়ন্তের ওপর ছেড়ে দিয়েছ?' সাধারণ কাগজের ব্যাপারটা কিছুতেই আয়ত্ত করতে পারেন না যোগজীবন।

ধরণীধর একটু উপমা দিয়ে ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দেন যোগজীবনের কাছে। সোজা কথার চেয়ে এই ঘোরালো কথার জোব বেশি। ধরণীধর বলেন, 'যে জন্যে বঁড়শিতে টোপ দিয়ে লোক ছিপের সুতো ছেড়ে দেয়। একেবারে গেঁথে তুলে আনবে বলে। একটু ধৈর্য ধর যোগজীবন—একটু খেলাতে দাও।'

আরও অনেকটা সুস্থবোধ করেন যোগজীবন। ধরণীধরের গভীর চালের খানিকটা হৃদয়ঙ্গম হয়েছে এতক্ষণে! কিন্তু এখনও অস্থিরতা রয়েছে যোগজীবনের। বলেন, 'আচ্ছা জয়ন্তকে না হয় টোপ দিয়ে খেলাচ্ছ, কিন্তু 'নতুন খবর'—ওই একটা চুনো-পুঁটিকেও তো সায়েস্তা করতে পারলে না এতদিনে! কী বিষটা আমাদেব বিরুদ্ধে ছড়াচ্ছে দেখতে পাচ্ছ? ওকেও কি খেলিয়ে তুলতে হবে?'

কালো হাসি হাসেন ধরণীধর। বলেন, 'না ওর জন্যে সোজা দাওয়াই আছে। ওর বিষ মেরে দেওয়ার ব্যবস্থা এখনি করছি!'—টেবিল থেকে রিসিভারটা তুলে নেন উনি।—'হ্যালো বড়াবাজার—নাইন সিক্স...হ্যালো কে? অরুণ কোম্পানি? কে রামপদ? বলি তোমাদের ওটা কী? কাগজের আড়ত না দানছত্র! নবজীবন প্রেসে নতুন খবরের জন্য কবে কাগজের ডেলিভারি নিয়েছে? নিতে আসবে আজ! বেশ ওই সমস্ত কাগজ আমার জন্যে মজুদ করা থাকবে।...একটি চিরকুটও ওরা যেন না পায়।—না বাকি টাকা চুকিয়ে দিলেও নয়—। আচ্ছা মনে থাকে যেন। আচ্ছা!'—রিসিভার নামিয়ে রেখে ধরণীধর তাকিয়ে দেখেন যোগজীবনের দিকে অর্থপূর্ণভাবে।

যোগজীবন বলেন, 'শুধু ওইটুকুতেই কাজ হবে? এই তোমার সোজা দাওয়াই।'

আবার হাসতে থাকেন ধরণীধর। বলেন, 'না ওটা শুধু দাওয়াই-এর ঝুটো লেবেল...আসল দাওয়াইয়ের ফলাফল পরে টের পাবে।'

ধরণীধরকে জবাব দিয়ে যোগজীবনের মুখেও এতক্ষণে অস্পষ্ট হাসির রেখা দেখা যায়।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারেন না আর যোগজীবন। আজ রাত্তিরে পার্টি দিচ্ছেন তিনি। সকাল থেকে তিনি বিশেষ ব্যস্ত।

তাই উঠতে হয় ওঁকে। ধরণীধরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় আর বিশ্বাসে মনটা তাঁর ছেয়ে গেছে ততক্ষণ!

অন্তত দশ রিম কাগজ চাই আজকে। তা না হলে এবারের সংখ্যা নতুন খবরের আর বার হবে না। জরুরি দরকার। অথচ কাগজের দোকানে অনেকগুলো টাকা দেনা পড়ে

আছে। নিজেই বেরিয়ে পড়েছেন কাগজের জন্যে। চিনাবাজারের ভিড় ঠেলে পৌঁছতে একটু দেরিই হয়ে গেল। বিকেল হয়ে আসছে। দোকান বন্ধ হয়ে আসবার সময় হয়ে এল। অরুণ কোম্পানির কর্মচারীরা তৈরি হয়েছে বাড়ি যাওয়ার জন্যে।

নিবারণবাবু রোজের মতোই এসে কাগজ চেয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্য কেউ কথা বলছে না। আগ্রহ দেখাচ্ছে না।

খানিক পরে জবাব এল, 'কাগজ নেই মশাই, হবে না!'

'কাগজ নেই?' অবাক হয়ে যান নিবারণবাবু। এখনকার বাজারে কাগজ নেই? বহু কাগজ তো চালান এসেছে এ মাসে। বেশি করে এসেছে অরুণ কোম্পানি যে মিলের এজেন্ট সেই মিল থেকে।

বিশ্বাস হয় না। এড়িয়ে যাচ্ছে বোধ হয়। বন্ধ করবার মুখে আর খাটতে চাইছে না কেউ। এমন হয়েই থাকে। কিন্তু কাগজ যে চাই নিবারণবাবুর। ফর্মা আটকে আছে প্রেসে। নিবারণবাবু আব একবার অনুরোধ কবেন 'দেখুন না মশাই।'

'কেন মিছিমিছি কথা বাড়াচ্ছেন মশাই! কাগজ নেই তো আপনাকে দেব কী?'

'আমাদের এই সামান্য সাপ্তাহিক ছাপবার মতো দশ বিম কাগজ আপনাদের আড়তে নেই? এই কথা আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন?'

'বিশ্বাস করা না করা আপনার ইচ্ছে। কাগজ আমরা দিতে পারব না।'

এবপর আব কথা চলে না। তবু বলতে হয় নিবারণবাবুকে, 'নগদ দাম দিলেও না!'

'না, না, না।'—খেঁকিয়ে ওঠে দোকানদার। 'ভারি নগদ দাম দেখাচ্ছেন, আগে যা বাকি পড়ে আছে তা শোধ করুন দেখি!'

মিথ্যে বলেনি দোকানদার! সেইটেই গোড়া থেকে সন্দেহ করে নিজে এসেছিলেন নিবাবণবাবু। জয়ন্তের লেখা পড়ে যেভাবে কাগজ চলেছিল সেই আশায় অনেকখানি কাগজ কিনে ফেলেছিলেন উনি। কিন্তু দামটা দেওযা হয়নি। আজকের কাগজটা পাওয়া গেলে, কিছু বিক্রি হত এ-সপ্তাহে, তাতে কাগজের সব দামটা উঠে আসত! সেই আশাতেই এসেছিলেন নিবারণবাবু নিজে। তাই শেষ বারের মতো চেষ্টা করেন নিবারণবাবু—বলেন, 'যেমন করে পারি তা শোধ করে দিচ্ছি। শুধু অন্তত পাঁচ রিম কাগজ আমাকে দিন—নইলে নতুন খবর এবারে আর বার হবে না।'

'তাহলে তো গোকুল আঁধার হয়ে যাবে। কত বড়-বড় কাগজ উঠে গেল আর ভারি তো আপনার একটা ছেঁড়া সাপ্তাহিক! ক'জন পড়ে ও কাগজ!'

অপমানের একটা সীমা আছে। নিবারণবাবুর সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়। একটু কড়া হয়েই বলেন তিনি, 'ক'জন পড়ে তাই দিয়ে তো কাগজের বিচার হয় না! বিচার হয় কী পড়ে তাই দিয়ে।'

দোকানদার এবার চোখ রাঙায়, 'কেন মিছে বাজে বকছেন মশাই! কাগজ নেই, আপনাকে দিতে পারব না! ব্যস, অত তত্ত্বকথার কী ধার ধারি!'

আর কোনও কথা বলেননি নিবারণবাবু। বেরিয়ে আসেন দোকান থেকে। দোকান থেকে বেরিয়ে সামনে একজন লোক। লোকটি বলে, 'নমস্কার নিবারণবাবু। আপনি কাগজের খোঁজে এসেছিলেন?'

'হ্যাঁ।' উৎসাহিত হয়ে ওঠেন নিবারণবাবু! কাগজ কি তাহলে পাওয়া যাবে? নতুন খবর বেরোবে ঠিক মতো?

'কাগজের ব্যবস্থা এখুনি হয়ে যাবে। একটু যদি এদিকে আসেন!'

বিহ্বল হয়ে এগিয়ে চলেন নিবারণবাবু ওর সঙ্গে। কাগজ তাঁকে পেতেই হবে। যে করে হোক!

পথের পাশেই একখানা মোটর গাড়ি দাঁড়িয়ে। লোকটি বলে, 'নিন, উঠুন এই গাড়িতে।'

'তার মানে?' মৃদু আপত্তি জানাতে চান নিবারণবাবু।

'উঠুন না। পরে বুঝতে পারবেন!'

যন্ত্রের মতো গাড়িতে প্রবেশ করেন নিবারণবাবু। গাড়ি চলতে থাকে।

অনেক রকম যন্ত্র আছে ধরণীধরের। অনেক কৌশল। ঝুটো লেবেল দেখে গিয়েছিলেন যোগজীবন। এবার দাওয়াই দেখছেন নিবারণবাবু নিজে! এ দাওয়াই রোগ সারায় না, একেবারেই সরিয়ে দেয়।

এগারো

যোগজীবনের পার্টি জমে উঠেছে বেশ। বিরাট হলে জমা হয়েছে ভোটাররা। গণ্যমান্য অতিথিরা আর যত কাগজের সম্পাদক। কাগজের সম্পাদকদের ইচ্ছে করেই নিমন্ত্রণ করেছেন যোগজীবন। কিছু মিষ্টিমুখ করিয়ে কলমটাকে মিষ্টি করতে চান ওদের। শহরের গণ্যমান্যরা এসেছেন যোগজীবন সমাদ্দারকে চিনে রাখবার জন্যে। যে লোক জলের মতো টাকা ঢেলে চলেছে সে লোকের নাম অতি সহজেই পৌঁছেছে এঁদের কানে। তাই, নিমন্ত্রণ পাওয়ার পর অবহেলা করতে পারেননি এঁরা। যোগজীবনের খুশির আর অন্ত নেই!

কেনই বা থাকবে? আয়োজনের কোনও ত্রুটি যখন হয়নি। নাচ, গান, জলযোগ। বসন্ত লাগা বনের মতো আলো করে রঙের মেলা বসেছে যেন। জয়ন্তও এসেছে এর মধ্যে নিমন্ত্রিত হয়ে। জয়ন্তকে বিশেষভাবে আপ্যায়িত করছেন যোগজীবন, করছেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ধরণীধর নিজে।

জয়ন্তের মুখ কিন্তু বিষণ্ণ, দৃষ্টি নিষ্প্রভ, শরীর নিস্তেজ। কোথায় যেন ত্রুটি, কোথায় যেন মস্ত একটা ফাঁক—চারিদিকে চেয়ে-চেয়ে শূন্য চোখে জয়ন্ত যেন তাই খুঁজে বেড়াচ্ছে।

ধরণীধর বলেন, 'কী জয়ন্তবাবু, একটু যেন অস্বস্তি বোধ করছেন?'

'তা একটু করছি।' স্বীকার করেছে জয়ন্ত ভূমিকা না করে। 'আমাকে এখানে নিমন্ত্রণ করবার কী প্রয়োজন ছিল বুঝতে পারছি না!'

জবাব দিয়েছে যোগজীবন।—'বাঃ ইলেকশনের জন্যে পার্টি, আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে হবে না!'

জয়ন্ত মুখর হয়ে উঠেছে। শাণিত শব্দ প্রয়োগ করছে ধীরে ধীরে, বাঁকা হাসি মিশিয়ে দিয়ে বলে, 'ও, ইলেকশনের জন্যে পার্টি! ওই নাচটাও তাহলে ইলেকশন ক্যামপেনের একটা অঙ্গ? নাচ দেখিয়েও ভোট পাওয়া যায়!'

বিব্রত বোধ করছেন যোগজীবন, ধরণীধরও। রাগ হওয়ারই কথা। কিন্তু রাগলে চলবে কেন? রাগের প্রতি বিরাগ দেখাবার সময় এখন! ভালোবাসার মতো রাজনীতিতেও ছলাকলাটাই বড়। মার্জিত হাসি দিয়ে উপভোগ করতে হচ্ছে জয়ন্তের কথাগুলো।

ওদের কথার মধ্যে হঠাৎ একজন বেয়ারা এসে খবর দেয় জয়ন্তকে, ফোনে কে ডাকছে।

'আমার ফোন? এখানে?' জয়ন্ত বিস্মিত হয়ে ওঠে। সামান্য একটু সময়ের মধ্যে এখানে ফোন করবে কে?

'আজ্ঞে হ্যাঁ, কোনও হাসপাতাল থেকে ডাকছে—বললে জয়ন্তবাবুকে চাই।'

ধরণীধর যোগজীবনের দিকে তাকান গভীর দৃষ্টি নিয়ে।

জয়ন্ত তাকায় ওদের দুজনের দিকে, বেয়ারার দিকে। অবাক হয়ে বলে, 'হাসপাতাল থেকে? আচ্ছা, চল যাচ্ছি।'

শুধু বিস্ময় নয় আশঙ্কা ঘনায় জয়ন্তের মনে, চোখে। হাসপাতাল কেন? অ্যাকসিডেন্ট? অসুখ? কোথায়?

নিজের মনের প্রশ্নের ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাঁটে জয়ন্ত।

'হ্যালো! হ্যাঁ আমি জয়ন্তবাবু, বলুন—অ্যাকসিডেন্ট! সিরিয়াস! পরিচয় পাওয়া যায়নি! অজ্ঞান অবস্থায় আমার নাম করছে! কিন্তু আমি তো এরকম কারুর কথা মনে করতে পারছি না!...কী বললেন? আইডেন্টিফিকেশনের জন্যে একবার গেলে হয়তো ভালো হয়! আচ্ছা যাচ্ছি!'

বিমূঢ়ের মতো ফোনটা নামিয়ে রাখে জয়ন্ত। কে এমন লোক! শুধু জয়ন্তের নাম করে?...তখনি বেরিয়ে পড়ল জয়ন্ত হাসপাতালের উদ্দেশ্যে।

হাসপাতালে রাত্রি। কালো-কালো অন্ধকার আর নিঃশব্দে ডুবে আছে সব। সাদা-পর্দা আর সাদা-কাচ লাগানো বাড়িগুলো মৃত্যুর মতো পাণ্ডুর। ঘরে-ঘরে মৃদু আলোর ঝিমুনি।

অন্ধকার ভরা মন নিয়ে হাজির হল জয়ন্ত এমারজেন্সি ওয়ার্ডে। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে পরিচয় হল। ডাক্তারবাবু বললেন, 'বিকেলের দিকে এক ভদ্রলোককে আহত অবস্থায় মাণিকতলার খাল পেরিয়ে পড়ে থাকতে দেখা গেছে রাস্তার ধারে। প্রৌঢ় ভদ্রলোক। স্বাস্থ্যবান, তবে কিছু যেন দুর্বল। শোনা গেছে কোনও চলন্ত গাড়ি থেকে কারা যেন ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় ভদ্রলোককে।'

শিউরে ওঠে জয়ন্ত। 'চলন্ত গাড়ি থেকে ফেলে দিয়েছে? গাড়ির নম্বর নিয়েছে কেউ?'

'না, গাড়ির নম্বর নিতে পারেনি কেউ। খুব জোরে চলেছিল গাড়ি। ততোধিক জোরে পালিয়েছে।...সাংঘাতিক জখম হয়েছেন ভদ্রলোক। একরকম অজ্ঞান হয়েই পড়ে আছেন, তবে মাঝে-মাঝে কাগজপত্রের কথা বলছেন—।'

'কাগজের কথা বলছেন!' আরও অবাক হয় জয়ন্ত? সন্দেহ ঘনায়।

'হ্যাঁ, আর মাঝে-মাঝে নাম করছেন জয়ন্তের!...পরিচয় এখনও পাওয়া যায়নি। তবে সাধারণ কাগজের নাম করছেন মাঝে-মাঝে।'

'আপনি বোধ হয় চিনতে পারেন! সেই জন্যেই আপনাকে কষ্ট দিলাম—'

'না এতে আর কষ্ট কী? কই কোথায়!'

লম্বা বারান্দার ডান দিকে বাঁকের মাথায় যে ঘর, সে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেন ডাক্তারবাবু।—'এই যে জয়ন্তবাবু।'

'এ কী, এ যে নিবারণবাবু!'

জয়ন্তর গা যেন ঝিম-ঝিম করতে থাকে। সারা গায়ে—মাথায় ব্যান্ডেজ বেঁধে শুয়ে আছেন নিবারণবাবু। চোখ বন্ধ। মাঝে-মাঝে কপালটা কুঁচকে উঠছে। বিড়-বিড় করে বলছেন, 'হার মানব না, কিছুতেই হার মানব না। জয়ন্তকে ডেকে পাঠাও প্রণতি, জয়ন্তকে।'

রঙ আর আলোর মেলা থেকে সুতীব্র শুচিতার মাঝে এসে জয়ন্তের পা টলে, মাথা

ঘোরে? কোথা থেকে কোথায় এল সে? কিন্তু নিবারণবাবুর এমন দশা হল কেন? কে ফেলে দিল গাড়ি থেকে? কারা? কেন?

হঠাৎ চাবুকের মতো একটা সমাধান ওর মাথার মধ্যে জ্বলে উঠল যেন।

নিবারণবাবু জয়ন্তর নাম উচ্চারণ করছেন শুধু—জয়ন্ত, জয়ন্তকে ডেকে পাঠা—

'এই যে আমি জয়ন্ত।' জয়ন্ত এগিয়ে যায় নিবারণবাবুর মুখের কাছে। প্রকাশ করতে চায় ওর উপস্থিতি।

'না, না, কাগজ আমি ছাড়ব না...কাগজ আমি ছাড়ব না...জয়ন্তকে বারণ করে দে প্রণতি, ওদের কাছে কলম যেন না বেচে দেয়'—নিবারণবাবু ঘোলাটে দৃষ্টিহীন চোখ দিয়ে তাকান জয়ন্তর মুখের দিকে।...

ডাক্তারবাবু বলেন, 'আপনি তাহলে চেনেন?'

'হ্যাঁ চিনি, ভালো করেই চিনি। সত্যি করে বলুন ডাক্তারবাবু কেসটা খুব সিরিয়স? কোনও আশা নেই?'

উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে আসে জয়ন্তের দৃষ্টি। এলোমেলো ওর চুল। ঠোঁট যেন কাঁপছে বলতে গিয়ে।

ডাক্তারবাবু শান্ত করেন ওকে। 'আমরা ডাক্তার জয়ন্তবাবু। শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত আশা আছে মনে করে চেষ্টাই করাই আমাদের ধর্ম। এইটুকু আমি আশা দিতে পারি যে, আজ রাত্রের মধ্যে জ্ঞান হলে হয়তো এ যাত্রা রক্ষা পেতেও পারেন। এঁর আত্মীয়-স্বজন কেউ—।'

'হ্যাঁ, আমি খবর দিয়ে দিচ্ছি।'

জয়ন্তের ফোন পেয়ে ছোটেলালকে সঙ্গে করে প্রণতি আসে।

নিবারণবাবুর কাছে এসে আর্তনাদ করে ওঠে প্রণতি, 'বাবা!'

নিবারণবাবু আগের মতো ঘোলাটে দৃষ্টিতে তাকান—আর বলেন, 'না, না ছাড়ব না...কাগজ আমরা ছাড়ব না!...' শুকনো মাটির দেশের মানুষ ছোটেলালের চোখে বুঝি জল! '...এ কাজ কে করিয়েছে জয়ন্ত ভাইয়া একবার হামায় বোলে দাও—।'

জয়ন্ত মাথা নিচু করে বসে আছে একপাশে। মাথা না তুলেই বলে, 'এ কাজ যারা করেছে তারা তো ভাড়াটে গুন্ডা মাত্র, ছোটেলাল। কিন্তু এর পেছনে যারা আছে তাদের মুখোশ খুলে সত্যকার চেহারা সকলকে চিনিয়ে দিতেই আমি যাচ্ছি।' কথা শেষ করেই উঠে দাঁড়ায় জয়ন্ত চেয়ার ছেড়ে। তার চোখের দিকে তখন বুঝি তাকান যায় না।—

প্রণতি বলে 'তুমি—আপনি এখন যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, আমায় এখনিই যেতে হবে প্রণতি। আমার যা করবার আছে তা এখানে নয়—সাধারণ অফিসে!' দু-পা এগিয়ে গিয়ে আবার থামে জয়ন্ত—। বলে, 'জ্ঞান হলে তোমার বাবাকে কালকের 'সাধারণ' একবার পড়ে শুনিও প্রণতি। জয়ন্ত যে কলম বেচে দেয়নি, এটুকু অন্তত তিনি জেনে শান্তি পাবেন।' কথা শেষ করেই চলে যায় জয়ন্ত।

প্রথম যেদিন জয়ন্ত এসেছিল সেদিন যে চোখ দেখেছিল তার প্রণতি আজ যেন আবার সেই চোখ দেখল জয়ন্তের। সেদিন কোন কথা বলেনি। আজও আর বলতে পারল না।

স্তব্ধ ঘরে, অনেক কথার চেয়ে এই নীরবতার দাম বুঝি খুব বেশি।

হাসপাতাল থেকে ছুটে এল জয়ন্ত সাধারণ কাগজের অফিসে, স্তব্ধতা আর গাম্ভীর্যের আবহাওয়া থেকে এল শব্দ আর বিশৃঙ্খলার রাজত্বে। শ্রান্তির ক্ষেত্র থেকে এল ক্লান্তিকর পরিবেশের মধ্যে। দ্রুতগতিতে ছাপার কাজ চলেছে। রোটারি মেশিনের একঘেয়ে ঘর্ষণ শব্দ।

কুঞ্জের নাইট-ডিউটি চলছে। একটা মেক আপ প্রুফের ওপর মাথা ডুবিয়ে বসে আছে আর দাগ মেরে চলেছে একমনে। এমনসময় জয়ন্ত তার বিস্রস্ত চুল, বিশৃঙ্খল দেহ নিয়ে এসে ঢুকল। সামনের চেয়ারটায় দিল গা এলিয়ে।

'কী ব্যাপার? এত রাত্রে ফিরে এলেন যে? পার্টিতে যাননি?'—একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন করে থামে কুঞ্জ। ভালো করে চেয়ে দেখে ক্লান্তিতে ম্লান জয়ন্তের চেহারার দিকে।

জয়ন্ত বলে, 'গেছলাম, শুধু পার্টিতে নয়, আরও অনেক জায়গায়।' টেবিলের ওপর কলিং-বেলটায় একটা চাঁটি বসিয়ে দেয় জয়ন্ত।

বেয়ারা আসে একজন ডাক পেয়ে।

'হেড প্রিন্টার অনাদিবাবুকে ডেকে দাও—।'

বেয়ারা চলে যায় অনাদিবাবুকে ডাকতে। জয়ন্ত কাগজ কলম নিয়ে বসে। লিখবে নাকি ও নতুন কিছু?

কুঞ্জের সেই রকমই মনে হয়।—'কী হল? নতুন কোনও খবব আছে নাকি?' প্রশ্ন করে ও।

'হ্যাঁ।' সংক্ষিপ্ত জবাব দেয় জয়ন্ত। তারপর চুপ করে থাকে।

অনাদিবাবু আসেন ঘরের মধ্যে।—'আমায় ডাকছেন?'

'হ্যাঁ।' এডিটোরিয়াল পেজ মেক-আপ হয়েছে?

'আজ্ঞে হ্যাঁ, এই তো মেশিনে চড়িয়ে এলাম।'

'এখুনি গিয়ে মেশিন থেকে নামান। তিনজন কম্পোজিটর রেডি রাখুন, যা দিয়েছিলাম তার বদলে নতুন সম্পাদকীয় যাবে আজ!'

'নতুন সম্পাদকীয়!' হতভম্ব হয়ে যান অনাদিবাবু!

জয়ন্ত কোনও জবাব দেয় না। কলম নিয়ে বসে গেছে সে ততক্ষণ। কুঞ্জই কথা বলে।—'যা বলা হচ্ছে তাই করুন না গিয়ে। আপনার অত ভাববাব তো কিছু নেই!'

অনাদিবাবু নীরবে বেরিয়ে যান ঘর থেকে। কুঞ্জ এবার প্রশ্ন করে জয়ন্তকে, 'কিছু তো বুঝতে পারছি না জয়ন্তবাবু। এখন আবার নতুন সম্পাদকীয় লিখবেন? আজকের লেখা তো বেশ ভালো হয়েছিল!'

জয়ন্ত যেন হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠে বলে, 'শুধু সাবধানী কলমের ভালো লেখায় আর চলবে না কুঞ্জবাবু, তলোয়ারের ফলা দিয়ে এবার লিখতে হবে। শয়তানদের সমস্ত মুখোশ কেটে কুটি-কুটি করে তাদের সত্যিকারের স্বরূপ যাতে ধরা পড়ে তার ব্যবস্থা করতে হবে।'

হাঁ করে চেয়ে থাকে কুঞ্জ জয়ন্তের দিকে। জয়ন্ত কি আবার বদলে যাচ্ছে! চোখের সামনে সাদা কাগজের ওপর জয়ন্তের লেখা ফুটে উঠেছে—। মোটা করে লিখেছে সম্পাদকীয়ের শিরোনামা—'শয়তানের মুখোশ'।

অনেকদিন পর আবার মন্ত্র প্রয়োগ করেছে জয়ন্ত। যে মন্ত্রে কালো-কালো কতগুলো আঁচড় আগুনের লাল নিয়ে জ্বলে।...সেনাপতির মতো শব্দের সৈনিকদের এগিয়ে নিয়ে চলে সে। আর কুঞ্জ স্তব্ধ হয়ে দেখে।

প্রায় এক ঘণ্টা পর লেখা শেষ করে উঠে দাঁড়ায় জয়ন্ত। কুঞ্জ বলে, 'হয়ে গেল!'

'হ্যাঁ। আমি এবার একটু গড়াতে যাচ্ছি কুঞ্জবাবু। আপনি রইলেন। একটু নিজে দেখে দেবেন। ঠিকমতো যাতে বেরোয়—।'

কুঞ্জ লেখাটা নিয়ে চোখ বোলাতে শুরু করেছে ততক্ষণে। খানিকটা দেখেই কুঞ্জ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে—এ তো অ্যাটম বোমা—কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে চিন্তার ছায়া পড়ে ওর মুখে, বলে—'কিন্তু লাইবেলও যে—। যোগজীবন-ধরণীধর কোম্পানি তো খেপে যাবে।

জয়ন্ত কুঞ্জের দুর্বলতা দেখে হাসে। বলে, 'বিষ-দাঁত ভাঙতে গেলে সাপও খেপে যায়, কিন্তু তা ভয় করলে চলে না। আচ্ছা চলি।'

অভিভূতের মতো তখন শুধু পড়ে চলেছে কুঞ্জ। কথা বলবার ফুরসত নেই। শুধু ঘাড় নেড়ে সাড়া দেয় জয়ন্তকে।

তন্ময় হয়ে পড়ছিল কুঞ্জ, কার পায়ের আওয়াজে মাথা তুলে তাকাল। তাকিয়েই চমকে গেল কুঞ্জ। ওর চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আর কেউ নয়, ধরণীধর চৌধুরী নিজে—দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণ, ভঙ্গিতে ক্রূর।

'এ কি আপনি এখানে?' তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে কুঞ্জ।

'এত রাত্রে জয়ন্তবাবু আবার কেন এসেছিলেন?' ধরণীধরের কণ্ঠস্বব গম্ভীর অথচ সংযত।

'সে তো তাঁকেই জিগ্যেস করতে পারতেন। এইমাত্র তো গেলেন উনি। আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি?'

'আমি দেখা দিইনি। কিন্তু জয়ন্তবাবু কেন এসেছিলেন?'

'নেহাতই জানতে চান? এসেছিলেন নতুন সম্পাদকীয় লেখবার জন্যে।'

কুঞ্জ জয়ন্তের লেখাটার দিকে ইঙ্গিত করে।

'দেখি!'

'কাল সকালে কাগজেই পড়ে দেখবেন। আশা করি খুশিই হবেন।'

'না। ও লেখা কাল বেরুবে না।'

হঠাৎ হো-হো করে হেসে ওঠে কুঞ্জ। বলে, 'কেন? কাগজের মালিকের হুকুম বলে? আপনি কাগজের মালিক হতে পারেন, কিন্তু এখানে আপনি কেউ নয়। এখানে সম্পাদকের ছাড়া কারও হুকুম আমরা মানি না। শুনুন, এই লেখাই কাল কাগজে বেরুবে।' হেসে বললেও কুঞ্জের স্বর সংযত অথচ গম্ভীর।

দপ করে জ্বলে ওঠেন ধরণীধর। জ্বলে ওঠে ওঁর চোখ। ফুলে ওঠে কপালের শিরা। গর্জে ওঠে কণ্ঠ, 'না বেরুবে না!'

অনাদিবাবু এসে ঢোকে কপি নেওয়ার জন্যে ঠিক এই মুহূর্তে। কুঞ্জ বলে, 'এই নিন।'

ধরণীধর বাধা দিয়ে বলেন, 'দাঁড়ান, আপনি একটু বাইরে যান!'

অনাদি বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

ধরণীধর আবার শুরু করেন, 'আমি হুকুম করতে আসিনি কুঞ্জবাবু।'

পকেট থেকে নোটের ব্যাগটা বের করে একখানা একশো টাকার নোট হাতের মুঠোয় চটকাতে-চটকাতে বলেন, 'আমি শুধু অনুরোধ করতে এসেছি যে আজকের সম্পাদকীয় আপনিই নতুন করে লিখুন।'

মাথা নিচু করে কুঞ্জ—দেখে—টেবিলের ওপর করকরে একখানা একশো টাকার

নোট রাজার মুকুটের চেয়ে বেশি জ্বলজ্বল করছে। ফরফর করছে একটা কোণ টেবিল-ফ্যানের হাওয়া লেগে।

'না, না, আমার দ্বারা তা হবে না। আপনি ভুল করছেন—।'

'ভুল আমি করিনি কুঞ্জবাবু আপনি একটু চেষ্টা করলেই পারবেন—এমন লেখা চাই যোগজীবনের জয়ধ্বজার মতো যা তার শত্রুদের লজ্জা দেবে—।'

কুঞ্জর বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে ভেসে ওঠে আর একখানা করকরে কাগজ—সেখানেও স্পষ্ট করে লেখা ওয়ান হান্ড্রেড—।

'না, না, আমি পারব না...এ আমি পারব না'—আর্তনাদ করে ওঠে কুঞ্জের স্বর—কিন্তু শেষবারের মতোই!

'পারবেন, পারবেন, একটু চেষ্টা করলেই পারবেন।'

আর একখণ্ড কাগজ এসে পড়ে টেবিলের ওপর!

কুঞ্জের স্নায়ুগুলো এক অব্যক্ত শব্দে যেন ঝনঝন করে ওঠে।

অনেক রাত্রি জেগে কাজ করে ক্লান্ত হয়ে, অকাতরে ঘুমিয়ে ছিল কুঞ্জ। জয়ন্ত এসে ঘুম ভাঙালো। বেলা হয়েছে খুব। পথে-পথে কাগজওয়ালারা হেঁকে চলেছে—। বেরিয়েছে 'সাধারণ'। কুঞ্জের বিক্রীত কলমের বিকৃত সম্পাদকীয় নিয়ে!

রাতে ভালো ঘুম হয়নি জয়ন্তের। মাথার মধ্যে বহু ভাবনার ভিড়। উত্তেজনার কোলাহল। প্রত্যাশার অস্থিরতা। শয়তানের মুখোশ খোলার যে মন্ত্র দিয়েছে সে কাল রাতে, সেই মন্ত্রবলের পরিণাম দর্শনের ব্যাকুলতা নিয়ে সে গুনেছে প্রহর। সকালে কাগজ দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল জয়ন্ত। কোথায় তার সেই মন্ত্রবলের নৈপুণ্য। শয়তানের মুখোশ উন্মোচিত না হয়ে আর এক মুখোশ খোলার স্পষ্ট ইঙ্গিতে কালো হয়ে আছে সম্পাদকীয় স্তম্ভ। কে লিখল? কুঞ্জ? কেন?

'সাধারণ'খানা হাতে নিয়ে জয়ন্ত এসে হাজির হল কুঞ্জের হোটেলে। ঘুম থেকে জাগাল ওকে। ঘুম ভেঙেই থতমত খেয়ে গেল কুঞ্জ। বেলা হয়ে গেছে বেশ। রোদ্দুর প্রবেশ করেছে ঘরের মধ্যে। রোদ্দুর লাগছে জয়ন্তের পকেটে আটকানো কলমটার সোনার ক্লিপে। ঝকঝক করে জ্বলছে ক্লিপটা তলোয়ারেরই মতো! কুঞ্জের সেই দিকে চোখ পড়তে কুঞ্জ আর একবার চমকাল।

'এ কী করেছেন কুঞ্জবাবু! কীসের জন্যে এ সর্বনাশ আপনি করলেন?'

'না, না আমি জানি না...আমি কিছু জানি না...।' কুঞ্জ আপত্তি করে কাঁপা গলায়।

'আপনি জানেন না তো জানে কে? আপনি তখন কেন দয়া করে একবার বলেননি কুঞ্জবাবু...তাহলে এ সর্বনাশ আমি হতে দিতাম না।...'

'এ লেখা কী করে বার হল আমি জানি না—এ লেখা আমি লিখিনি...সত্যি আমি লিখিনি।'

'লেখেননি?'—কুঞ্জের হাতদুটো চেপে ধরল জয়ন্ত দুই হাতে শক্ত করে—দুটো আগুনের মতো দৃষ্টি নিয়ে তাকাল ওর চোখের দিকে। বললে, 'এখনও মিথ্যে কথা বলতে আপনার মুখে বাধছে না কুঞ্জবাবু...? সমস্ত শত্রুতা ভুলে গিয়ে আপনাকে আমি আমার কাজের সঙ্গী করেছিলাম। তা না হলে কোথায় ভেসে যেতেন আপনি। কী অবস্থা হত আপনার...তার কি এই প্রতিফল? তার কি এই প্রত্যুত্তর? কীসের প্রলোভনে এতবড়

বিশ্বাসঘাতকতা করলেন আপনি? বলুন, কত টাকা তারা দিয়েছে?'

কুঞ্জের মাথা নিচু হয়ে এল। জয়ন্তের কলম থেকে ঠিকরনো আলো খোঁচার মতো বিঁধছে মাথা উঁচু করে তাকালে। ওর মুঠোর মধ্যেই কুঞ্জের হাত বুঝি কেঁপে উঠল একবার!...স্নায়ুগুলো গতরাত্রের মতো আবার ঝনঝন করে উঠছে!—'তিনশো টাকা জয়ন্তবাবু, তিনশো টাকা, আমার মতো গরীব সাংবাদিকের কাছে সে প্রায় রাজার ঐশ্বর্য! একসঙ্গে এত টাকার লোভ আমি সামলাতে পারিনি!'—প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে কুঞ্জের কণ্ঠ।

'সাংবাদিকের আত্মসম্মান, আপনার নিজের মনুষ্যত্ব—তার দাম মাত্র তিনশ টাকা!'

'আমায় ক্ষমা করুন জয়ন্তবাবু, আমায় ক্ষমা করুন। আপনি যা বলবেন তাই আমি করতে প্রস্তুত!'

একটু চিন্তা করে দেখে জয়ন্ত। তারপর বলে, 'প্রস্তুত! বেশ এখুনি আমার সঙ্গে সাধারণ অফিসে চলুন। যে কলম দিয়ে আপনি এতবড় অপরাধ করেছেন তাই দিয়েই আপনাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে!'

উঠে পড়ে কুঞ্জ বিছানা ছেড়ে। রাত্রির অবসাদ এখনও যেন কাটেনি। এখনি যেন সে ভেঙে পড়বে।

নীরবে ওরা বেরিয়ে এল পথে।

সাধারণ অফিসের লোহার ফটক বন্ধ। দরোয়ান বসে আছে তার সামনে। ওরা এসে ঢুকতে যাবে এমনসময় দরোয়ান বাধা দেয়—'মাপ কিজিয়ে হুজুব যানে কো হুকুম নেই।'

কুঞ্জ আগে ঢুকছিল। ফিরে দাঁড়িয়ে বলে, 'কী বলছ সিংজী? হুকুম নেই কী? এডিটর সাব যাচ্ছেন—।'

'হাঁ হাঁ, ও তো জানতা হ্যায়। আপকো তো মানা নেহি, লেকিন এডিটর সাবকো ছোড়নেকো হুকুম নেহি।'

'কার হুকুম নেই। কে হুকুম দিয়েছে?' প্রশ্ন করে জয়ন্ত।

সিংজীকে বলতে হয় না কিছু। জয়ন্তের চোখের সামনে গেটের অপর দিকে এসে দাঁড়িয়েছেন ধরণীধর নিজে। সঙ্গে তার আর একজন নেপালী অনুচর।

'হুকুম দিয়েছি আমি'—বজ্রগম্ভীর স্বর ধ্বনিত হয়ে ওঠে ধরণীধরের, 'সাধারণের সম্পাদক হয়ে সাপের পাঁচ-পা দেখেছিলেন না? ঘুড়ি যে ওপরে তুলতে পারে গুটিয়ে নেওয়ার সুতো-লাটাই যে তারই হাতে, সেটুকু ভুলে গিয়েছিলেন—কেমন?'

উপায় নেই। চোখের সামনে লৌহ-প্রাচীর। তার এদিকে বড় অসহায় জয়ন্ত। কিন্তু উপায়ের পথ তো শুধু একটা নয়। দৃঢ় হয়ে দাঁড়ায় জয়ন্ত—আরও কঠিন হয়ে ওঠে তার কণ্ঠ—। বলে, 'দরোয়ান দিয়ে প্রেসের দরজা আটকে কি আমার কলম বন্ধ করতে পারবেন ধরণীবাবু! সাধারণ ছাড়া কি আর কাগজ নেই?'

বাঁকা হাসি হেসে ওঠেন ধরণীধর। 'আছে বইকী, একবার নতুন খবরেই গিয়ে দেখুন না!' হাসিতে আরও কুটিল হয়ে ওঠে ওর মুখ। কুঞ্জের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'আসুন কুঞ্জবাবু।'

কুঞ্জ চিন্তিত হয়। আবার যাবে সে? জয়ন্তকে কথা দেওয়ার পরও সে নিজেকে বিকিয়ে দেবে আবার?...একটু ভেবে নিয়ে আপন মনেই মাথা নাড়ে কুঞ্জ। তারপর কোনও কথা না বলে প্রবেশ করে ভেতরে।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে জয়ন্ত। তারপর ধীরে নেমে পড়ে পথে।

চেনা পথ। উড়ে চলবার কথা, কিন্তু পথ জুড়ে অতি মন্থর হয়ে চলছে জয়ন্ত। অবসাদের শিথিলতা জড়িয়ে রয়েছে পায়ে-পায়ে। ক্লান্তিহর রাত্রি শেষের যে প্রভাত, সে যে এমনি করে আনবে বিস্ময়ের জ্বর, আর হতাশার ক্লেশ, কে জানতো?

গলিতে ঢুকল জয়ন্ত। বাড়ি থেকে বেরোবার সময় লক্ষ করেনি, এখন ঢোকবার সময় কান পেতে জানল গলিটা বোবা, নিতান্তই বোবা। কোনও শব্দ নেই, যে শব্দ খুশির মনে প্রশ্ন তুলেছিল একদিন। গতরাত্রের হাসপাতালের স্তব্ধতার কথা মনে পড়ল জয়ন্তের। জীবনে সেই ওর প্রথম হাসপাতালে যাওয়া, তাই ঘটনাটা মনে দাগ কেটেছে বেশি করে। আর ব্যান্ডেজ বাঁধা নিবারণবাবুর সেই নিঃসাড় দেহ! জয়ন্তের মনে হল শব্দহীন, কর্মহীন নতুন খবরের ভাঙা বাড়িটা একইভাবে আহত হয়ে পড়ে আছে গলির ঢিমে-আলোর নিঃশব্দ একধারে।

দরজার দেওয়ালে আদালতের নোটিস লটকানো। নিলামের নোটিস। জয়ন্তের ভুরুদুটো কেঁপে উঠল। একজন লোক দাঁড়িয়ে। অচেনা। বোধ হয় আদালতেরই লোক। জয়ন্ত প্রশ্ন করে অন্যমনস্ক হয়ে, 'কী ব্যাপার কী?'

'নিলেম মশাই, নিলেম। দেনার দায়ে প্রেস নিলেম হবে ৭ই অগস্ট তারিখে।' বলে লোকটি।

'প্রেস নিলেম হবে!' উচ্চারণ করে জয়ন্ত সমঝাতে চায় আরও।

'হ্যাঁ নিলেম হবে।' আর একটি স্বর শোনা যায় বারান্দা থেকে।

জয়ন্ত চোখ তুলে তাকালে একবার প্রণতির দিকে। প্রণতির হাতে একখানা কাগজ। বোধ হয় আজকের সাধারণ! বললে, 'খবরটায় আপনার এত অবাক হওয়ার তো কিছু নেই জয়ন্তবাবু!'

'তার মানে? কে প্রেস নিলেম করাচ্ছে—কে?'

'কে নিলেম করাচ্ছে আপনি ভালো করেই জানেন? তবু যদি খবরটা আমার মুখ থেকে শুনে উপভোগ করতে চান তো শুনুন—নিজের মনুষ্যত্ব যার কাছে বিকিয়ে দিয়ে এই লেখা আপনি লিখতে পেরেছেন, সেই ধরণীবাবুই প্রেস নিলেমে তুলেছেন!' হাতের কাগজখানা মেলে ধরেছে প্রণতি চোখের সামনে।

ইচ্ছে করেই তাকাল না জয়ন্ত কাগজের দিকে! সোজাসুজি তাকাল প্রণতির মুখের দিকে।—'সাধারণের আজকের লেখা পড়েই তোমার তাহলে এই ধারণা হয়েছে! কিন্তু আমায় বিশ্বাস কর প্রণতি—।'

কথাটা শেষ করবার সুযোগ না দিয়েই প্রণতি বলে উঠল, 'বিশ্বাস আপনাকে আর কত করব জয়ন্তবাবু! আগাগোড়া আমাদের বিশ্বাসের যা মর্যাদা রেখে আসছেন, তারপরও বিশ্বাস করতে বলেন!'

বিষণ্ণ প্রণতির স্বর, বিপন্ন তার দৃষ্টি! ওকে দেখাচ্ছে যেন জলহীন নদীরেখার মতো। চলে যাচ্ছিল ও ঘরের মধ্যে তবু জয়ন্ত আর একবার ডাকল, 'শোন প্রণতি—।'

প্রণতি দাঁড়াল। একেবারে প্রত্যাখান করল না জয়ন্তের অনুরোধ। উৎসাহিত হয়ে বলতে লাগল জয়ন্ত, 'এখন তুমি উত্তেজিত, আমার মুখের কথায় কিছুই তুমি বিশ্বাস করবে না আমি জানি, সে চেষ্টাও তাই করব না। হাসপাতালে খোঁজ নিয়ে জানলাম, তোমার বাবাকে তুমি বাড়িতে নিয়ে এসেছ, তাঁর সঙ্গে শুধু একটু দেখা করে যেতে চাই!'

'না, না, না! বাবার সঙ্গে দেখা করবার কোনও দরকার আর নেই'—ঝড় লেগে

এলোমেলো পাতা ঝরার মতো এলোমেলো বলে উঠল প্রণতি, চুলগুলো ওর ফুলে-ফেঁপে দুলে উঠল, 'কোনও দরকার নেই! এখনও আপনার সম্বন্ধে তাঁর খুব বড় ধারণা। সেই ভুল ধারণা নিয়েই তাঁকে থাকতে দিন। আমাদের অনেক উপকার আপনি করেছেন। আমাদের সঙ্গে সব সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিয়ে শেষ উপকারটুকু করুন!'

দ্বার রুদ্ধ! যেন ছায়াহীন খর-রোদের পথ। ক্লান্তিহীন চলা সেখানের ধর্ম।

জয়ন্ত চেয়ে রইল অবসন্ন চোখ নিয়ে।

বারো

মনটাকে ফেলে রেখে, শুধু হাত-পাগুলোকে টেনে-টেনে গলি পার করে জয়ন্ত বাড়িতে এসে পৌঁছল। কী এক দুঃসহ চিন্তার ঢেউ তাকে দোলা দিচ্ছে। সে ঢেউ তুফানের মতো আছড়ে ফেলে দেবে তাকে জীবনের কক্ষপথ থেকে! পড়ে থাকবে সে ভাঙা খেলনার মতো! প্রণতি তাকে কি ভুলই বুঝবে শুধু! বিশ্বাস ফিরে পাওয়ার বিশ্বাস আর কি পাওয়া যাবে না!...

যন্ত্রের মতো বাড়ি ঢুকল জয়ন্ত। বাড়ি ঢুকতেই জানতে পারল আর এক কতবড় বিপদ ওৎ পেতে আছে তার জন্যে!

দরজায় দাঁড়িয়েছিল দুর্লভ। ওকে দেখেই লাফিয়ে উঠল। চোখ উঠল কপালে।— 'এই যে দাদাবাবু, তুমি এসেছ! শিগগির করে যাও দাদাবাবু, দিদিমণির ভয়ানক অসুখ, ডাক্তারবাবু বসে আছে।'

জয়ন্ত চমকে ওঠে 'কী বলছিস কী?'

'কী বলছি ঘরে গিয়ে দেখ না! আমার আর দেরি করবার সময় নেই। বরফ আনতে যাচ্ছি।'

পর্দায় ছবি বদলাবার মতো এক নিমেষে সব বদলে ওলোট-পালোট হয়ে গেল জয়ন্তের মাথার মধ্যে! ত্রস্ত হয়ে ছুটে গেল খুশির কাছে।

সরকার মশাই বললেন, 'হঠাৎ খুশির জ্বর এসেছে কাল রাত্তিরে, আজ সকালে অত্যধিক বেড়ে যাওয়ায় ডাক্তার ডেকে এনেছেন তিনি। ডাক্তারবাবুও বিশেষ সুবিধের মনে করছেন না। এত জ্বর তার ওপর আবার বিকার, ভুল বকা।'

ডাক্তারবাবু বললেন জয়ন্তকে, 'এখন থেকেই সাবধান হওয়া দরকার। এখানে আপনাদের আর কে আছে?'

'আমি ছাড়া আর কেউ তো নেই! আর যা লোকজন—।'

'বাড়ির মেয়েরা কেউ নেই!'

'না, কেন বলুন তো?'

'প্রপার নার্সিংয়ের প্রয়োজন! সেটা তো মেয়েরাই ভালো পারেন, তাই বলছিলাম। সারারাত জেগে আইসব্যাগ দেওয়া—ঘণ্টায়-ঘণ্টায় ওষুধ খাওয়ান, টেমপারেচার নেওয়া, সব কিছু কি পারবেন? আপনারা?'

'কেউ যখন নেই তখন পারতেই হবে। মেয়েরা যা পারে, পুরুষ তা পারে না একথা মানতে আমি রাজি নই!'—স্বভাবসুলভ সঙ্কল্পের জোরে কথা বলে জয়ন্ত!

অভিজ্ঞতার হাসি হাসেন ডাক্তারবাবু। বলেন, 'দু-এক ক্ষেত্রে তা মানতেই হয়। যাইহোক যা-যা বলে দিয়েছি ঠিকমতো করবেন। আজ যদি টেমপারেচার নেমে যায় তবেই ভালো। কাল সকালে আবার আসব।'

ডাক্তারবাবুকে এগিয়ে দিয়ে এসে জয়ন্ত খুশির বিছানার ধারে এসে বসে। গায়ে-মাথায় হাত বুলোয়! প্রার্থনা করে খুশি ভালো হয়ে উঠুক। প্রার্থনা করে যে বড় দায়িত্ব এসে পড়েছে তার ঘাড়ে, তা বহন করবার মতো শক্তি যেন সে অর্জন করতে পারে; তবেই তো স্বর্গত বাবা-মায়ের আশীর্বাদের যোগ্য সে হবে!

সস্নেহে বলে, 'হ্যাঁরে খুশি, বড্ড কষ্ট হচ্ছে বুঝি!'

'হ্যাঁ।' শুকনো এতটুকু মুখ নিয়ে কষ্টস্বরে বলে খুশি, 'প্রণতিদিকে ডাক না দাদা।'

পর্দার ওপর দুটো ছবি একসঙ্গে এসে পড়েছে। দুটোই সমান উজ্জ্বল, সমান স্পষ্ট! আশ্চর্য!

জয়ন্ত বলে, 'প্রণতিদিকে কী দরকার? এই তো আমি রয়েছি।'

'না, না, তুমি পারবে না, তাকে ডাকো।'

জয়ন্ত চিন্তিত হয়। বলে, 'সে আসবে না।'

ভেবেছিল এতেই চুপ করবে খুশি। কিন্তু তা নয়, খুশি তখনও জেদ ধরে আছে। 'ঠিক আসবে দেখো। আমার অসুখ শুনলেই ঠিক ছুটে আসবে। একবারটি ডেকে পাঠাও না দাদা!'

জয়ন্তের স্বর কর্কশ হয় এবাব। 'না, না, কী হবে ডেকে পাঠিয়ে! সে আমাদের কে, যে এখানে আসবে!'

পর্দার ছবি দুটো কি আর স্পষ্ট নেই? তাদের ঔজ্জ্বল্য কি ধুয়ে যাচ্ছে?

আইসব্যাগ হাতে নিয়ে জয়ন্ত নিজেই রাত জাগবার জন্যে প্রস্তুত হল। সবই করবে সে নিজে হাতে। ইচ্ছে থাকলে কী না হয়? কী না পারা যায়? দুর্লভ বসে আছে ঘরের এককোণে, প্রয়োজনমতো সে-ও সাহায্য করবে।

ঘণ্টায়-ঘণ্টায় ওষুধ খাওয়াতে বলে গেছেন ডাক্তারবাবু! ন'টার সময় একবার খাওয়ান হয়েছিল। আবাব রাত দশটায় একবার দিতে হবে। সারাদিনে ক্লান্তিতে ঝিমিয়ে আসছিল জয়ন্ত। দশটা বেজে যাওয়ার কয়েক মিনিট পরে খেয়াল হল জয়ন্তের।

'এই দুর্লভ!'

'আজ্ঞে!'

'ক'টা বেজেছে খেয়াল আছে! দশটায় না ওষুধ দেওয়ার কথা! একটা ব্যাপারে যদি হুঁস থাকে!'

'আজ্ঞে আপনিও তো বলে যাওনি।' মাথা চুলকায় দুর্লভ!

'ভূত কোথাকার! অকর্মার ধাড়ি! ধর আইসব্যাগটা!'

আইসব্যাগটা হাতে দিয়ে জয়ন্ত নিজে ওষুধ খাওয়াতে বসে। খুশির মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে বলে, 'খুশি, এটা খেয়ে নে খুশি...খেয়ে নে...'

নিজে খাওয়ার মতো অবস্থা নয় ওর! খাইয়ে দিতে হয় জয়ন্তকে। অভ্যেস নেই কাজেই খানিকটা গড়িয়ে পড়ে বাইরে।

'যাঃ, পড়েই গেল।' নিজের অসম্পূর্ণতায় নিজের ওপর বিরক্ত হয় জয়ন্ত!

'আপনি যে ঠিক দিতে জান না!' খাতির না করেই মন্তব্য করে দুর্লভ।

'আমি জানি না তো কে জানে শুনি। তুমি?' বিরক্ত হয়ে ওঠে জয়ন্ত দুর্লভের ওপর! ভারি অসভ্য চাকর তো! নেহাত বিপদের সময় তাই—

দুর্লভ অম্লানবদনে বলে, 'যে জানে তাকে ডেকে আনব?'

কী বলতে চায় দুর্লভ জয়ন্ত বোঝে। তাই ওর কথায় কান না দিয়ে খুশির দিকে মন দেয় আবার, 'এটুকু খেয়ে নে খুশি।'

খুশি খাবে না। আপনমনে বকে চলেছে সে। কখনও ডাকছে কাকাবাবুকে, কখনও প্রণতিকে। 'না, না, কাকাবাবু, দাদা আমায় যেতে দেবে না,...প্রণতিদিকে ডেকে আন না কাকাবাবু! ডাকলেই ঠিক আসবে...।'

খুশির কথা শুনে উৎসাহ বাড়ে দুর্লভের। বলে, 'ও বাড়ির দিদিমণিকে ডেকে আনব দাদাবাবু!'

'ডেকে আনবে? ডাকলেই সে আসবে কেন শুনি? কী তার দায় পড়েছে?'

'আমার অসুখ করেছে শুনলেই আসবে...ডেকে আন না দাদা...' খুশিও বলতে থাকে জয়ন্তকে।

দুর্লভ বোঝে জয়ন্ত হয়তো আর না করতে পারবে না। কাজেই সে বেরিয়ে পড়ে তখুনি।

প্রণতিকে বলতে গিয়ে আরও বিপন্ন বোধ করে দুর্লভ। খুশির অসুখ শুনে বিচলিত হয় প্রণতি, কিন্তু তাকে যেতে হবে শুনে হয় স্থির। বলে, 'তোমার দাদাবাবু কি আমায় ডেকে পাঠিয়েছে?'

দুর্লভ বোকা নয়। তাই চতুরভাবে গুছিয়ে জবাব দেয়, 'মুখ ফুটে তেনায় কিছু বলে নি, তবে আপনার জন্যেই পথ চেয়ে বসে আছে...আপনি একবার চল দিদিমণি...।'

'না দুর্লভ, আমার যাওয়ার কোনও উপায় নেই। তোমরা ভালো করে সেবা কর, আমি বলছি খুশি ভালো হয়ে উঠবে!'

'কিন্তু আমরা যে কিছু জানি না দিদিমণি!' হতাশায় ভেঙে পড়ে বলে দুর্লভ, 'দাদাবাবুর মাথায় যে আকাশ ভেঙে পড়েছে!'

'আকাশ আমার মাথায়ও ভেঙে পড়েছে দুর্লভ। বিপদ আমারও বড় কম যাচ্ছে না। তবু কারও পথ চেয়ে আমি বসে নেই। যাও দুর্লভ তুমি যাও, ও বাড়িতে আমি যেতে পারব না।'

কী যেন সামলে নিল প্রণতি কণ্ঠে, আর চোখে। তারপর ঢুকে গেল ঘরের মধ্যে! তার মন জুড়ে যেন একটা বেদনার সুর বাজছে: ফুল-ঝরা বৃন্তের যে বেদনা তারই মতো করুণ সে সুর!

অনেক বড় মুখ নিয়ে ডাকতে গিয়েছিল দুর্লভ প্রণতিকে। কিন্তু ফিরল এতটুকু হয়ে। কাঁচুমাচু হয়ে বলে, 'ও বাড়ির দিদিমণির কাছে গেছলাম। দিদিমণি এল না দাদাবাবু! বললে তার বড় বিপদ আসতে পারবে না।'

আবার প্রত্যাখ্যান! রেগে গিয়ে হঠাৎ চিৎকার করে উঠল জয়ন্ত, 'পাজি আহাম্মুক কোথাকার! কে তোকে বলেছিল বাহাদুরি করে ও বাড়ি যেতে! কে বলেছিল তাকে সেধে গিয়ে ডাকতে! ওরা কি আমাদের আপনার জন, যে আমার বিপদে আসবে! কী সম্পর্ক আমার—।'

মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল জয়ন্তের। চোখের সামনে দাঁড়িয়ে প্রণতি। পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকছে। কোন নিভৃতে দেখা স্বপ্নের মতো দেখাচ্ছে ওকে।

'ধন্যবাদ। সম্পর্ক যে কিছু নেই সেটুকু মনে করলেই বাধিত হব। খুশির সেবা করা তাহলে আমার পক্ষে সহজ হবে!' জয়ন্তকে অতিক্রম করে প্রণতি খুশির বিছানায় গিয়ে

বসে। তুলে নেয় আইসব্যাগ—বলতে হয় না। 'ওই বলে, আপনি এখন গিয়ে বিশ্রাম করতে পারেন!'

'কিন্তু...তুমি একা...।'

'একাই আমি থাকতে চাই। দরকার হলে দুর্লভকে ডাকব। যান।'

প্রণতিকে আসতে বলেনি জয়ন্ত তবু ও এল। জয়ন্তকে যেতে বলল প্রণতি, জয়ন্ত বেরিয়ে গেল।

ভোরবেলা দেখা। শুকতারার মতো ক্লান্ত রাত-জাগা প্রণতির মুখ। কিন্তু ভোরের মতোই পরিচ্ছন্ন লাগল জয়ন্তর কাছে।

প্রণতি বললে, 'জ্বর একদম ছেড়ে গেছে! ডাক্তারবাবুকে তবু একবার ডেকে পাঠাবেন!'

'আচ্ছা। তুমি যা করলে তার জন্যে—।'

ইতস্তত করছিল জয়ন্ত, প্রণতিই কুড়িয়ে নিয়ে কথাটা শেষ করল, 'তার জন্যে ইচ্ছে করলে ধন্যবাদ দিতে পারেন। তার লোভেই তো এসেছিলাম।' একটু হেসে প্রণতি যেন কাঁদাতে চাইল জয়ন্তকে।

'তুমি কি কেবলই ভুল বুঝবে প্রণতি? আমার কৈফিয়তের অবকাশও দেবে না?'

'কৈফিয়তের দরকার নেই। আমি আপনার বিচারকও নই।'

'শোন প্রণতি, আমায় একবারটি বোঝবার চেষ্টা কর। তোমাদের প্রেস যে নিলেমে উঠেছে তার কিছুই আমি জানতাম না। কী করে এ নিলেম বন্ধ করা যায়, তাই শুধু এখন ভাবছি!'

'অত ভাববার কী দরকার? নিলেমে যখন উঠেছে, যে খুশি কিনে নেবে। এ প্রেসের ওপর লোভ আপনারও তো কম ছিল না; ইচ্ছে করলে আপনিও কিনে নিতে পারেন।'

কথা শেষ করে প্রণতি বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

আমিও কিনে নিতে পারি? হ্যাঁ, আমিও কিনে নিতে পারি, বার বার কথাটা উচ্চারণ করে স্বাদ নিতে চায় জয়ন্ত। আঘাত দিতে চেয়েছে প্রণতি, মোচড় দিয়েছে বুকের কাছটায়। তা দিক। তবেই তো যন্ত্র বাঁধা হবে। যে যন্ত্রে বাজবে মিলনের সুর! জয়ন্ত এই আঘাতকে ফুল বলে মানল।

তেরো

প্রণতি বুঝল না জয়ন্তকে। একটা সুযোগও দিল না। কিন্তু কোনও এক অসতর্ক মুহূর্তে পথ বলে দিয়েছে সে ওকে। যে পথে সুযোগের অন্ত থাকবে না প্রণতির কাছে নিজেকে সহজ করে মেলে ধরবার। হ্যাঁ, যে প্রণতি কথা রাখেনি, সেই প্রণতির উপহাসটুকুকেও অবহেলা করবে না সে। জয়ন্ত মনকে দৃঢ় করল।

কিন্তু কী করে তা হবে! টাকা আসবে কোথা থেকে? একটা প্রেসের দাম তো বড় কম নয়, তাও আবার নিলেমে ডাকতে হবে ধরণীধরকে পাল্লা দিয়ে। না, কোনও আশা নেই! কোনও সম্ভাবনা নেই! সমস্ত মন প্রাণ এক করে উপায় খোঁজে জয়ন্ত। হঠাৎ যেন সন্ধান মিলে যায়। যদিও বড় বিপদজনক সে পথ, অতিরিক্ত দায়িত্বপূর্ণ তার ভার,—তবু উপায়ান্তর না পেয়ে সেই পথই গ্রহণ করে জয়ন্ত। ওদের এই বাড়িটা বাঁধা দেয় এক অ্যাটর্নির অফিসে। বেশি টাকার ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা নেই ওর। মাত্র ত্রিশ হাজার টাকা—ওই স্বল্প

টাকার বিনিময়েই বাড়ির দলিলগুলো তুলে দেয় জয়ন্ত অ্যাটর্নির হাতে। অ্যাটর্নি পাকা লোক। লোভ দেখায় জয়ন্তকে। বলে, 'এত বড় বাড়ি মোটে ত্রিশ হাজার টাকা কেন, আরও অনেক বেশি পাওয়া যাবে একটু দেরি করলে।' কিন্তু জয়ন্ত কান দেয় না ও কথায়। দেরি করবার মতো সময় নেই তার। আর ত্রিশ হাজার টাকার বেশি টাকাই বেশি সে নেয় কোন সাহসে!

আগামী কাল নিলেমের দিন। সেদিন আবার ইলেকশন। ধরণীধরের দল ডবল জয়ের আশায় এখন থেকেই উৎফুল্ল হয়ে আছে। ইলেকশনের ফলাফলে জয়ন্তদের করবার কিছু নেই। কিন্তু প্রেসের নিলেমে যাতে ওরা জিততে না পারে তার ব্যবস্থাটা করছে জয়ন্ত। অবশ্য সে জানে এ চেষ্টাও হয়তো তার সফল হবে না। ত্রিশ হাজার টাকা টাকাই নয় ধরণীধরের কাছে। কিন্তু তবু, বিনা যুদ্ধে পরাজয় মেনে নেওয়ার মতো কাপুরুষতা সহ্য করতে পারবে না সে। যুদ্ধ করেই হারবে। যুদ্ধের আগে নয়।

এত হতাশার দিনেও বলাই, ছোটেলালের দল উৎসাহিত না হয়ে পারে না। এই ত্রিশ হাজার টাকা আজকে ওদের কাছে লাখ টাকার মতো। ধরণীধরের লোক একটু তো হতভম্ব হবে, এরা ডাকছে দেখে! উৎসাহিত হবেন নিবারণবাবু, যে এত বিপদের দিনেও জয়ন্ত এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে! এই দুঃসাহস ভুল হোক, ছেলেমানুষি হোক, কিন্তু কণ্টকসম ভুল বোঝার পালা তো শেষ হবে।

জয়ন্ত ঠিক করেছে নিজে সে ডাকবে না। ছোটেলালকে পাঠিয়ে দেবে! সকলকে স্তম্ভিত করে দিয়ে ছোটেলাল যখন পাল্লা দেবে ধরণীধরের লোকের সঙ্গে—তখন লোকে জানবে নতুন খবর এতদিন ধরে যে ছোটেলালদের নিজেদের সম্পত্তি বলে ঘোষিত হয়ে আসছে, সে কথা মিথ্যে নয়। যাদের প্রাণের জিনিস তারা মান বাঁচাতে এসেছে চরম দিনে।

সকাল থেকে নতুন খবরের অফিস যেন মরে গেছে। শব্দ নেই, ছন্দ নেই। গলি পর্যন্ত কেমন যেন থমথমে ভাব। লোক এসেছে কোর্ট থেকে। চেয়ার টেবিল পাতা হয়েছে একধারে। বেলা এগারোটা থেকে নিলাম ডাকা চলবে। তার আগেই বাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছেন নিবারণবাবু! চলে যাচ্ছে প্রণতি। যে স্বপ্নকে এতদিন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, জীবনের প্রতিটি রক্তবিন্দু দিয়ে, সেই স্বপ্নকে চোখের সামনে গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে ভেঙে পড়ে যেতে দেখবেন কী করে! অতীতের সব সাধনা এই নিষ্ঠুরতম বর্তমানের পাথরে মাথা কুটে মরবে—তা তিনি দেখবেন কী করে?...প্রণতিও যাবে! সে যাবে তার ভবিষ্যৎকে ফেলে রেখে, ধূলায় লুটিয়ে দিয়ে।

শেষ সময়ে বাধা দিতে এল ছোটেলাল। অবাক হয়ে গেলেন নিবারণবাবু! ছোটেলালের কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? না কিছু একটা গন্ডগোল করে বসবে সে নিলামের সময়। বলা যায় না, ছোটেলাল রেগে গেলে সব পারে! নিলামের বাঁকা পথ বুঝবে না ও। তবে ওর হাতের লাঠির সোজা পথটা বোঝে সহজেই!

নিবারণবাবু বলেন, 'চোখের সামনে এ-ব্যাপার কী করে দেখব ছোটেলাল!'

'না-না, একটু দাঁড়ান বাবু—।'

'কী করে আর দাঁড়াই। দুটি সন্তান আমার ছিল, প্রণতি আর এই প্রেস। তার একটিকে দুশমনে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, নিজের চোখে তাই তুমি দেখতে বল?'

'আমার একটা বাত শুনেন, একটু থাকেন নিবারণবাবু—।'

ছোটেলাল কিছুতেই ছাড়বে না। ওর কথায়, ওর হাসিতে যেন কীসের একটা খবর—

নতুনতর খবর উঁকি দিচ্ছে! কী যেন বলতে চায় ও! নিবারণবাবু এই মুহূর্তেও তাই আশা ছাড়তে পারেন না। ছাড়তে পারেন না প্রেস ঘরের মাটি!

মন্দ লোক হয়নি নিলামে। খবর পেয়ে অনেকে এসেছে। প্রেসের আজকাল যেরকম দর! ডাক শুরু হয়ে গেছে। ধরণীধরের তরফ থেকে এসেছে হরিহর। হরিহর প্রথম ডাক দিয়েছে—'পাঁচ হাজার।'

একজন—'সাত হাজার।'

আর একজন—'বারো হাজার!'

হরিহর—'তেরো হাজার!'

হঠাৎ ওদের মাঝখান থেকে ছোটেলাল হেঁকে ওঠে, 'পনের হাজার!'

নিলামদার একবার তাকিয়ে দেখে ছোটলালের দিকে। বিস্মিত না হয়ে পারে না। ছোটেলাল বলে, 'হাঁ হাঁ, পনের হাজার!'

নিবারণবাবু চিৎকার করে ওঠেন, 'কী করছ কী ছোটেলাল, তুমি কি পাগল হয়ে গেছ?'

'হাঁ, হাঁ, পাগল হয়ে গেছি।'

নিলামদার হাঁকছে 'পনের হাজার...'

হরিহর—'সতেরো হাজার!'

ছোটেলাল—'আঠারো হাজার!'

নিবারণবাবুর আবার চিৎকার—'ছোটেলাল।'

'হাঁ, হাঁ, আঠারো হাজার। কিছু ভাববেন না নিবারণবাবু!'

নিলামদার হাঁকছে—'আঠাবো হাজার—আঠারো হাজার...'

হবিহর আবার চড়িয়ে দেয়—'উনিশ হাজার...'

উত্তেজিত হয়ে ওঠে সকলে। রোক চেপে গেছে ওদের। তা না হলে এই প্রেসের দাম ওঠে উনিশ হাজার!

গলির ও-প্রান্তে চলেছে নিলামের ডাক আর এ-প্রান্তে জয়ন্তর বাড়িতে এসে রায়বাহাদুর ভবানীপ্রসাদ ডেকে-ডেকে সাড়া পাচ্ছেন না কারও। খুশির অসুখেব খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি চলে এসেছেন তিনি। থাকতে পারেননি। ওরা ওকে ছাড়লেও উনি কোন প্রাণে ছেড়ে থাকবেন ওদেরকে—খুশিকে?

কাকাবাবুকে দেখতে পেয়ে খুশি মহাখুশি হয়ে ওঠে—'ও মা, কাকাবাবু এসেছে!' কথাটা নিজের কাছেই নিজে ঘোষণা করে।

'হ্যাঁ এসেছি।' রাগে আর আনন্দে কাঁপতে-কাঁপতে কাকাবাবু বলেন, 'সেই হতভাগাকে জেলে দিতে এসেছি। তোর অসুখ করেছে। কিন্তু সে আমায় খবর দেয়নি। মেয়েটাকে মারবার বন্দোবস্ত করেছিল।'

খুশি কাকাবাবুকে শান্ত করবার জন্যে বলে, 'আমার অসুখ তো সেরে গেছে কাকাবাবু!

'সেরে গেছে! কিন্তু না সেরে যদি বাড়ত, যদি একটা কিছু হতো! কী করত সে! কোথায়? কোথায় সে হতভাগা?'

জয়ন্তকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন কাকাবাবু। ওকে আজ দুকথা শুনিয়ে দিয়ে তবে উনি

ছাড়বেন। কিন্তু জয়ন্ত তখন নিলামে গেছে তার দলবল নিয়ে। যদি উদ্ধার করতে পারে প্রেসটা। সে কি এখন ফিরবে?

ওঁর হাঁকডাক শুনে দুর্লভ ছুটে আসে। 'আজ্ঞে এই যে আমি এসেছি।'

'তুমি কে?' আরও রেগে ওঠেন কাকাবাবু—'তুমি কে? তোমায় আমি ডেকেছি!'

'আজ্ঞে, আপনি ওই যে হতভাগা বলে ডাকলে? আমায় আদর করে সবাই ওই নামে ডাকে কি না?'

বদ্ধ পাগল লোকটা। কাকাবাবু বিরক্ত হয়ে বলেন, 'তোমায় নয় হতভাগা। আমি জয়ন্তকে খুঁজছি।'

'দাদাবাবুকে খুঁজছ?' একগাল হেসে দুর্লভ বলে, 'দাদাবাবু তো নিলেম হয়ে গেছে!'

'নিলেম হয়ে গেছে!' কাকাবাবুর রাগ আর থামে না। আরও চিৎকার করেন তিনি।

'না, না, নিলেম হয়নি, নিলেম ডাকতে গেছে। এই গলির ওধারে প্রেস নিলেম হচ্ছে কি না—তাই ডাকতে গেছে!'

খুশি এবার বকুনি দেয়। জয়ন্ত বার-বার বলে গেছে এসব কথা কাউকে না বলতে, অথচ দুর্লভটা এমন যে, এককথায় সব বলে দিচ্ছে কাকাবাবুকে। খুশি তাই বকে ওঠে, 'এসব কথা তোমায় কে বলতে বলেছে ঠাকুর? দাদা না বারণ করে দিয়েছিল।'

'হ্যাঁ, তা করেছিল।' একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলে দুর্লভ, 'তা আমি কি আর সব বলেছি? দাদাবাবু যে এ বাড়ি বাঁধা দিয়ে নিলেম ডাকতে গেছে। তা কিন্তু এখনও বলিনি!'

খুশির গা জ্বলে ওঠে। আচ্ছা পাজি তো? বলব না বলব না করে সব বলে দিচ্ছে। বাড়ি বাঁধার কথা শুনে আঁতকে ওঠেন কাকাবাবু। 'বাড়ি বাঁধা দিয়ে নিলেম ডাকতে গেছে!'

'সে আমি বলবুনি, বারণ আছে বলতে। আমি চুপি-চুপি সব শুননু কি না! বাড়ি বাঁধা দিয়ে টাকা নিয়ে এল, ওই খোট্টাটাকে ডাকল—না বাবু আমি কিচ্ছু বলবুনি!...'

'আচ্ছা আর কিছু বলতে হবে না। নিলেম ডাকা তার আমি বার করছি!' আর কোনও কথা নয়। রায়বাহাদুর ভবানীপ্রসাদ দুম-দুম করে বেরিয়ে যান প্রেসের উদ্দেশ্যে!

এদিকে ডাক উঠেছে পঁচিশ হাজারের কোটায়। ঝিমিয়ে আসছে ছোটেলাল। আর ভরসা নেই! জয়ন্ত নিজে ডাকছে এবার, 'ছাব্বিশ—সাতাশ—।'

ঠিক এই সময়েই এসে ঢোকেন কাকাবাবু! না দুর্লভটা যতই হতভাগা হোক, মিথ্যে কথা সে তাহলে বলেনি। রায়বাহাদুর চিৎকার করে ওঠেন ক্ষিপ্ত হয়ে, 'হতভাগা তুমি বাড়ি বন্ধক দিয়ে এখানে নিলেম ডাকতে এসেছ—বাড়ি তোমার একলার?—খুশিকে তুমি ভাসিয়ে দিতে চাও!'

ঘরটা থমথম করতে থাকে, সকলের নির্বাক বিস্ময়ে। জয়ন্ত একবার ব্যথিত দৃষ্টি নিয়ে তাকায় কাকাবাবুর দিকে, তারপর ডেকে চলে, 'সাতাশ হাজার—সাতাশ হাজার—!'

'সাতাশ হাজার! তোমায় আমি জেলে দেব পাজি কোথাকার! টাকা তোমার খোলামকুচি!' সমস্ত পারিপার্শ্বিক ভুলে গিয়ে রায়বাহাদুর শাসন করতে থাকেন জয়ন্তকে।

স্তম্ভিত হয়ে দেখেন নিবারণবাবু! শোনে প্রণতি! তাহলে জয়ন্ত তার বাড়ি বাঁধা দিয়ে নিলেম ডাকতে এসেছে! এতবড় বাঁধন সে মেনে নিয়েছে নতুন খবরের জন্যে!

জয়ন্ত একটুও দমে না কাকাবাবুর চিৎকারে। বরং একটু মেজাজ দেখিয়েই বলে, 'আঃ, একটু থামুন না আপনি!'

হরিহর দর বাড়াচ্ছে ওদিকে, 'আটাশ হাজার!'

জয়ন্তের মনে হয় এখুনি সে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে...পাদুটো এমন টলছে। আটাশ হাজার! তারপর উনত্রিশ তারপর ত্রিশ—তারপর—তারপর মনে হয় মস্ত এক কালো মেঘের মতো ফাঁকা অন্ধকার ঘিরে ফেলছে তাকে চারপাশে—! কিন্তু তবু যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। জয়ন্ত উচ্চারণ করবার চেষ্টা করে—উনত্রিশ হাজার। কিন্তু তার আগেই কাকাবাবু ধমকে ওঠেন, 'খবরদার বলছি, আর একটি কথা নয়।'

ওই ধমকেই প্রেরণা পায় জয়ন্ত। তার এলানো স্নায়ু আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে। বলে, 'দোহাই আপনার কাকাবাবু এখন আব বাধা দেবেন মা—'

নিলামদার সময় গুণছে—'আটাশ হাজার এক—আটাশ হাজার...দুই।'

জয়ন্ত হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে, 'উনত্রিশ হাজাব!'

'উনত্রিশ হাজার! তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে!' কাকাবাবু যেন অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন!

'মাথা খারাপই হবে কাকাবাবু! ওদের কাছে হারলে জীবনে এ মুখ আব কাউকে দেখাতে পারব না।'

নিলামদার সময নিচ্ছে আবাব, 'উনত্রিশ হাজার এক...উনত্রিশ হাজার দুই. .।'

হরিহর বাজি মাত করার মতো চিৎকার করে ওঠে, 'বত্রিশ হাজার!'

দপ করে যেন মাথার ভেতরটা জ্বলে ওঠে জয়ন্তের। বজ্রাঘাত হয়ে গেল যেন। ছোটেলালের কাছ থেকে ত্রিশ হাজাব টাকার বান্ডিলটা নিয়ে কাকাবাবুর হাতে গুঁজে দিয়ে বলে, 'এই নিন কাকাবাবু বাড়ি বন্ধকের টাকা। আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হয়েছে, কিছুই খোয়া যায়নি!'

কোনও কথাই কানে যাচ্ছে না কাকাবাবুর। শুধু একটি কথা দাগ কেটে বসে গেছে তখন। কথাটা জয়ন্তের—ওদের কাছে হারলে জীবনে এ মুখ আর কাউকে দেখাতে পারব না!...চৌধুরী বংশেব অভিজাত রক্ত ধমনীতে-ধমনীতে উত্তাল হয়ে উঠছে। চোখের দৃষ্টি যাচ্ছে বদলে...যে দৃষ্টিতে ফোটে অনাবিষ্কৃত-পথ অরণ্যের মাঝে লক্ষ-সন্ধান করে নেওয়ার আলো!...অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে আছেন রায়বাহাদুর। জয়ন্তের কথা শুনছেন না। হঠাৎ একটি শব্দ উচ্চারিত হল তাঁর মুখ দিয়ে। ঝন ঝন করে উঠল সকলের স্নায়ু। জোর গলায় ডাক দিলেন রায় বাহাদুর, 'পঁয়ত্রিশ হাজাব!'

নিলামদারও চমকে ওঠে, 'পঁয়ত্রিশ হাজার!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, পঁয়ত্রিশ হাজার!'

হরিহর বলে, 'ছত্রিশ হাজার!'

রায়বাহাদুর হাঁকেন 'চল্লিশ হাজার, পঁয়তাল্লিশ হাজার, পঞ্চাশ হাজার!'

এবার জয়ন্ত কাকাবাবুর হাত দুটো চেপে ধরে 'কী করছেন কী কাকাবাবু!'

'বেশ করছি! আমার আগে নিলেম ডেকে নেবে? হারিয়ে দেবে ওরা?—পঞ্চান্ন হাজার!'

নিলামদার সময় গুণছে—পঞ্চান্ন হাজার...পঞ্চান্ন হাজার এক...পঞ্চান্ন হাজার দুই...

হরিহর যেন এবার আর্তনাদ করে ওঠে 'ষাট হাজার!' এইটেই ওর শেষ ডাক। ধরণীধর ষাট হাজার পর্যন্ত ডাকতে বলে দিয়েছেন। অবশ্য ধরণীধর জানতেন ওর অর্ধেক ডাকলেই কাজ হাসিল হয়ে যাবে।

একই সঙ্গে রায়বাহাদুর হাঁকেন, 'সত্তর হাজার—আশি হাজার...!'

টাকা যেন খোলামকুচি। ইচ্ছেমতো মুঠো-মুঠো ছড়িয়ে দিচ্ছেন তিনি!

নিলামদার তখনও সময় গুণছে, 'আশি হাজার এক...আশি হাজার দুই ..আশি হাজার তিন...।'

কোনও প্রত্যুত্তর নেই! ঘর নিঃশব্দ।

পরমুহূর্তেই বিজয়োল্লাসে কোলাহল করে ওঠে ছোটেলাল বলাইয়ের দল।

বাইরে থেকেও একটা কোলাহল ভেসে আসছে যেন। ঘন ঘন 'বন্দেমাতরম্' 'জয় হিন্দ্' শোনা যাচ্ছে।

কী ব্যাপার? বাইরে বেরিয়ে আসে সকলে। একদল লোক এসে ঢুকছে গলিতে। হাসিতে ফেটে পড়ছে তারা—যোগজীবন হেরে গেছে...যোগজীবন মুর্দাবাদ!

দলের মধ্যে কুঞ্জও ছিল। সকলকে পেরিয়ে কুঞ্জ এগিয়ে আসে।

জয়ন্ত ওকেই প্রশ্ন করে, 'কী খবর?'

'হেরে গেছে, গো-হারান হেরে গেছে যোগজীবন সমাদ্দার।'

এত আনন্দে জয়ন্ত যেন স্থির থাকতে পারছে না। বলতেও পারে না কিছু। কুঞ্জই বলে চলেছে—'হারবে না, যা একটা ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়া হয়েছে?'

'ব্রহ্মাস্ত্র!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, জয়ন্তবাবু আপনার সেই লেখা।'

'আমার সে লেখা আজ বেরিয়েছে?'

'হ্যাঁ, সেই, শয়তানের মুখোশ, আজ বের করেছি জয়ন্তবাবু। না বার করলে আমার প্রায়শ্চিত্ত যে হতো না। জয়ন্তব হাত দুটো চেপে ধরে কুঞ্জ আবেশের সঙ্গে।—'ধরণীধরের জন্যেই আপনার সঙ্গে যেদিন বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলাম, আজ তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছি। সে ভাবতে পারেনি এ লেখা আজ বেরিয়ে ওদের সমস্ত কীর্তি এমন করে ফাঁস হয়ে যাবে।'

জয়ন্ত জড়িয়ে ধরে কুঞ্জকে। সব অভিমান আজ তার দূর হয়ে গেছে। জয়ন্ত বলে, 'সত্যি আপনি এবার অ্যাটম বোমা ফাটিয়েছেন কুঞ্জবাবু।'

বিজয়ের উৎসব চলেছে। ঠিক এমনই সময় আর এক অমঙ্গলের খবর এল। শোনা যাচ্ছে ধরণীধর নাকি নিলামে হেরে গিয়ে আহত বাঘের মতো হয়ে উঠেছে। আজ রাত্রে গুন্ডা দিয়ে লুট করাবে নবজীবন প্রেস! আইন দিয়ে যা হয়নি, বে-আইনি উপায়ে তাকে হাসিল করবে। কিন্তু আশ্চর্য, খবরটা পৌঁছে দিয়ে গেল সবিতা দেবী নিজে। ধরণীধরের কাগজের মহিলা-বিভাগের সম্পাদিকা সবিতা দেবী।

আজ পর্যন্ত সবিতা দেবীকে চিনতে পারেনি জয়ন্ত। কী চায় ও? কী ওর পরিচয়? কেন ও বারবার আসে বিপদের সময়। ঠিক সময়ে সাবধান করে দেয় জয়ন্তকে। যে কথাগুলো বলে সেগুলোকে শোনায় সহজ, কিন্তু বিছিয়ে নিয়ে ভালোভাবে বিশ্লেষণ করলে অনেক দূর গড়ায়। ধরণীধরও কি ঠিকমতো চেনে সবিতা দেবীকে? কী জানি? জয়ন্তর সন্দেহ ঘোচে না।

খবরটা যথেষ্ট চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সন্দেহ নেই! রায়বাহাদুর ভবানীপ্রসাদ আগুন হয়ে ওঠেন। 'এতবড় আস্পর্ধা! মগের মুল্লুক নাকি? কলকাতা শহরে বসে এই রকম গুন্ডামি চল্‌বে? কেন, পুলিশ কি মরে গেছে নাকি? আইন নেই? শাসন নেই? বিচার নেই?'

রায়বাহাদুরের রক্ত আবার উষ্ণ হয়ে উঠেছে, শিরায়-শিরায় তাদের চাঞ্চল্য কোলাহলের মতো যেন শোনা যায়।

কিন্তু কলকাতার পুলিশকে ঠিক তখনও চেনেননি ভবানীপ্রসাদ। তাই পুলিশের ভরসা করেছিলেন। থানায় এসে কিন্তু অবাক হলেন। থানার ও.সি. রীতিমত মেজাজ দেখিয়েই বললেন, 'সবই তো বুঝলুম, কিন্তু কাকে কান নিয়ে গেছে শুনেই কাকের পেছনে তো দৌড়তে পারি না। আগে গুন্ডারা সত্যিই প্রেস লুট করতে আসুক, তখন দেখা যাবে।'—টেবিলের ওপর একটা ঘুঁষি মেরে বলেন অফিসার।

রায়বাহাদুর বিস্মিত হয়ে নিষ্ফল চিৎকার করেন, 'লুট করে নিয়ে গেলে তখন আর কী দেখবেন!'

'তাহলে আমরা এখন কী করতে পারি বলুন। আপনার গাঁজাখুরি গল্প শুনে ধরণীধর চৌধুরীকে গিয়ে গ্রেপ্তার করব, না আপনার প্রেসে কেল্লা থেকে মিলিটারি পাহারা বসাব!' ও.সি. না-রাগ না-উপহাসেব হাসি হেসে ওঠেন।

রায়বাহাদুর আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠেন, 'কী, আমি গাঁজাখুরি গল্প বলছি! রায়বাহাদুর ভবানীপ্রসাদ চৌধুরীর কথার কোনও দাম নেই।'

'আপনার কথার কী দাম আছে জানি না, তবে আমাদেব সময়ের যথেষ্ট দাম আছে রায়বাহাদুর। মাপ করবেন।'

একটু ভুল হয়েছিল রায়বাহাদুরের কলকাতার পুলিশকে চিনতে। ডান হাতের ঘুঁষিটা দেখেছিলেন টেবিলের ওপর, কিন্তু টেবিলের নিচের...বাঁ হাতখানা লক্ষ করেননি। সেইটেই তাঁর ভুল।

জয়ন্ত অনেকবার বারণ করেছিল কাকাবাবুকে পুলিশে যেতে। নিবারণবাবুও বলেছিলেন, পুলিশের কাছে কোনও সাহায্য পাওযাব নেই। তবু, অনেক আশা নিয়ে গিয়েছিলেন রায়বাহাদুর। ফিরলেন ভগ্ন মনোরথ হয়ে।

জয়ন্ত বলে, 'কী হল কাকাবাবু?'

চেয়ারে গা এলিয়ে দিতে-দিতে রায়বাহাদুর বললেন, 'না ওদের বিশ্বাসই করাতে পারলুম না—আমার কথা হেসেই উড়িয়ে দিলে!'

'তা যে দেবে আমরা জানতাম।' একটু হেসে-হেসেই বললেন নিবারণবাবু। 'মরুভূমির কাছে আপনি গিয়েছিলেন জল চাইতে!'

'তাই বলে এমনি নিরুপায় হয়ে মার খেতে হবে! রাত একটায় নাকি ওরা আসবে। ওদের হাতে অবাধ ক্ষমতা, অজস্র লোকজন, আর আমাদের সহায় সম্বল কিছুই যে নেই!'

ঘরটা থমথম করতে থাকে ফাঁকা নৈঃশব্দ্যে!

ছোটেলাল দাঁড়িয়েছিল এককোণে। দেহাতি ছোটেলাল। চুপ করে শুনছিল ওদের কথা। ওদের সবার মুখে যখন কথা গেল ফুরিয়ে আর তার বদলে নামল ছায়া, তখন ছোটেলাল বলে ওঠেন, 'আপনি তো বহুত কোশিশ্ করেছেন কাকাবাবু, এবার হামার হাতে সব ছেড়ে দিন।'

'তোমার হাতে ছেড়ে দেব! তুমি কী করবে!' বিরক্ত হয়ে বলে উঠেন রায়বাহাদুর। লোকটা সব ব্যাপারেই ওইরকম বাহাদুরি দেখাতে চায়! মনে-মনে বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠেন তিনি ছোটেলালের ওপর। এসে অবধি দেখছেন ওই খোট্টাটাকে ওরা বড় বেশি প্রশ্রয় দেয়!

ছোটেলাল অল্প-অল্প হাসে। বলে, 'দেখেন কী করতে পারি!'

নিবারণবাবুর মুখের ওপর থেকে কালো ছায়াটা যেন সরে যাচ্ছে এমনই ধরনের হেসেছিল ছোটেলাল প্রেস ধর্মঘটের দিন, আর সময় নিয়েছিল। কিন্তু এবারের বিপদ যে আরও ভয়ানক। এবারের শত্রু আরও শক্তিধর!

রাত একটার আর দেরি নেই। প্রায় মৃত কলকাতা শহর। রাজপথ। মোড়ে-মোড়ে গোটা কতক রিক্সা দাঁড়িয়ে, আর খান কয়েক ট্যাক্সি। মুমূর্ষু রুগীর মতো ওদের ম্লান আলো টিম-টিমে আর ঘোলাটে। সজাগ হয়েই ঢুলছে ওরা। শিকারির মতো ওদের কান। যাত্রী এলেই জেগে ওঠে। কে কোথায় মরল, কার ব্যথা ধরেছে, কার টলছে শরীর,...এদের জন্যে দাঁড়িয়ে আছে এরা। রাত্রি পাহারা দিয়ে।

রিক্সাওয়ালার দলের দিকে এগিয়ে আসে ছোটেলাল, 'ভাই সব—।'

'কেয়া হ্যায় ভাই! কাঁহা কেরায়া মাঙ্তা—' চঞ্চল হয়ে ওঠে ওদের কুঁকড়ে-যাওয়া শরীর।

'কেরায়া নেই ভাই সব, তুম লোগোসে দোসরা কুছ মাঙ্তা। দুশমন আয়া গুন্ডা লেকে, মেরে ছাবাখানা তোড়নে লিয়ে—লুট করনে লিয়ে। হ্যায় কোই জোয়ান তুমরা ভিতব, দুশমনকে রোখনেওয়ালা, জুলুমবাজসে লড়নেওয়ালা, গরিব সাচ্চা আদমিকে বাঁচানেওয়ালা—।

কালো রাত্রির ফাঁকে-ফাঁকে লাল হাতছানি শোনে রিক্সাওয়ালারা। মরা রক্ত চনচন কবে ওঠে...। 'হ্যায়, হ্যায়, হামলোগ সব কোই হ্যায়...!'

'কোন রোখেঙ্গে দুশমনকো, ইনসানিকে লিয়ে কৌন লড়েঙ্গে শয়তান জুলুমবাজকে সাথ—ছোটেলাল ডেকে-ডেকে চলেছে তখনও...রিক্সাওয়ালা থেকে ট্যাকসিওয়ালা, ট্যাকসিওয়ালা থেকে ফেরিওয়ালা...এত বাতে যারা পড়ে থাকে পথে, পথের ধারে, এমন সব জীবকে ডেকে চলেছে ছোটেলাল। রাত একটার আর বড় দেরি নেই!...

ধরণীধর ভদ্রলোক। এককথার মানুষ। সময়ের নড়চড় নেই। একটার সময় হাজির হয়েছেন দলবল নিয়ে। বাইরে সকলকে দাঁড় করিয়ে রেখে ভেতরে ঢোকেন তিনি জনদুয়েককে মাত্র সঙ্গে নিয়ে।

এত রাত্রেও দরজা খোলা। ঘরের সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন রায়বাহাদুর, নিবারণবাবু...জয়ন্ত...। ধরণীধর বিনা বাধায় ভেতরে গিয়ে ঢোকেন। 'কোথায়? নিবারণবাবু কোথায়?'

এগিয়ে আসেন রায়বাহাদুর। বলেন, 'নিবারণবাবুর শরীর ভালো নয়, আপনার যা বলবার আমায় বলতে পারেন।'

'আপনি কে জানতে পারি?'

নিবারণবাবু আড়াল থেকে প্রকাশ করেন নিজেকে। বলেন, 'উনি রায়বাহাদুর ভবানীপ্রসাদ চৌধুরী, এখন উনিই এ প্রেসের মালিক।'

ধরণীধর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে দেখেন রায়বাহাদুরকে। চোখ দুটো বারকতক কুঞ্চিত আর প্রসারিত হয়। তারপর বলেন, 'ও আপনিই নিলেমে এ প্রেস ডেকে নিয়েছেন! ভালো, ভালো, কিন্তু আপনার যে দমকা বড় লোকসান হয়ে যাবে দেখছি। কত...৭৫ না ৮০ হাজারে প্রেস ডেকে নিয়েছেন না?'

'হ্যাঁ।'

সকলেই অবাক হচ্ছে মনে-মনে। কোথায় লুট হয়ে সোরগোল উঠবে, তা নয় ধরণীধর ঠান্ডা মেজাজে এসব কী বলতে শুরু করলে?

বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে ধরণীধর বললেন, 'এখন এটা বিশ হাজারে বিক্রি করতে হলে লোকসান একটু হচ্ছে বইকী।'

'বিশ হাজারে আমি বিক্রি করব কেন?'

'আজ্ঞে তা করতে হবে বইকী!' ধরণীধর চৌধুরী একবার যখন দর দিয়েছে তখন তার কথার নড়চড় হয় না।

ওপর থেকে বোঝা যায় না। জলে নামলে বোঝা যায় ভেতর থেকে চোরা স্রোত ধসিয়ে দিচ্ছে তলায় মাটি!

রায়বাহাদুর সমান তাল রেখে বলেন, 'নড়চড় আমার কথারও হয় না। আমি কাউকে বিক্রি করব না। বিশ হাজার তো বিশ হাজার—লাখ টাকাতেও নয়।'

ধরণীধর বাঁকা হাসি হাসেন। বলেন, 'আস্তে রায়বাহাদুর, হঠাৎ অত গরম হয়ে উঠবেন না। বিক্রি আপনাকে বিশ হাজারেই করতে হবে—আর এক্ষুনি! এই সব কাগজপত্র ঠিক করা আছে, একটু দয়া করে সই করুন দেখি।' পকেট থেকে পিন আঁটা কয়েকখানা কাগজ বের করে মেলে ধরেন ধবণীধর।

রায়বাহাদুর চেয়েও দেখেন না কাগজগুলোর দিকে। অন্যদিকে চেয়ে বলেন, 'সই আমি করব না।'

'সই না করলে এই বিশ হাজার যা পাচ্ছেন তাও যে পাবেন না রায়বাহাদুর! আমার এই সঙ্গিদুটিকে দেখছেন তো! এইরকম অন্তত গুটি পঞ্চাশ বাইরে অপেক্ষা করে আছে। আজ রাত্রে বিক্রি না করলে কাল সকালে বিক্রি কববার মতো এরা বোধ হয় আর কিছু রাখবে না।'

রাত্রি গভীর। পাড়া নিঝুম। ধরণীধরের প্রত্যেকটি শব্দ যেন পাথরের গায়ে খোদাই করার মতো অন্ধকারের গায়ে গেঁথে-গেঁথে যাচ্ছে!

পরমুহূর্তেই রায়বাহাদুরের অনুরূপ কণ্ঠস্বর শোনা যায় 'গুন্ডার ভয় দেখিয়ে প্রেস কেড়ে নিতে চান? আপনি যা পারেন করুন। এ প্রেস বিক্রি হবে না!'

হঠাৎ বাইরে থেকে গন্ডগোল ভেসে আসে। গলির মধ্যে একদল লোক যেন চেঁচামেচি মাতামাতি শুরু করে দিয়েছে।

নিবারণবাবু অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন। 'কী ব্যাপার?'

ধরণীধর হাসেন। 'বোধ হয় আমার লোকেদের আর ধৈর্য সইছে না। নিন রায়বাহাদুর সইটা এবার তাড়াতাড়ি করে ফেলুন। বেশি দেরি হলে আমার লোকজনকে আর সামলে রাখা যাবে না মনে হচ্ছে।'

জয়ন্ত বলে ওঠে, 'দরকার নেই তাদের সামলে। কাকাবাবু, সই করবেন না!'

নিবারণবাবু বলেন, 'গুন্ডার জোরে যখন সব কিছুই নিতে এসেছেন তখন সামান্য সই-এ আপনার দরকারই বা কি ধরণীবাবু?'

'না, সই ওঁকে করতেই হবে, আপনি সই করবেন কি না?'

ঠিক এই মুহূর্তেই প্রবেশ করে ছোটেলাল। সহজ, সরল, দেহাতি মানুষ। অনেক রাত্রির ঘর্ষণে যেন আরও কালো দেখাচ্ছে ছোটেলালকে।

ছোটেলাল যেন খুশি হয়ে উঠছে এমন ওর কথার ভঙ্গি। বলে, 'হাঁ, হাঁ, কেনো

সই কোরবে না? জরুর কোরবে। লেন কাকাবাবু, একটা দস্তখস্ত কোরিয়ে দেন। ব্যস্।'

'তুমি, তুমিও তাই বলছ ছোটেলাল?' রায়বাহাদুর যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না!

'হাঁ, হাঁ, হামিও বোলছি দস্তখস্ত না কোরে উপায় কি আছে!'

'বেশ, তাই আমি করছি।' সকলের বিস্মিত ও নির্বাক দৃষ্টির মাঝখানে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করেন রায়বাহাদুর। সই করে দেন কাগজখানায়।

হাত বাড়িয়ে কাগজটা ফেরত নিচ্ছিলেন রায়বাহাদুর, মাঝপথে ছোটেলাল ছিনিয়ে নেয়। 'আরে, দাঁড়ান মোশাই দাঁড়ান!'

ধরণীধর কিছু বলবার আগেই ছোটেলাল কাগজটা কুচি-কুচি করে কুচিয়ে ছড়িয়ে দেয় ধরণীধরের মুখের ওপর। বলে, 'এই নিন আপনার দলিল!'

ধরণীধর যেন বলতে চেষ্টা করছিলেন—এত বড় আস্পর্ধা...কিন্তু বাইরেব এক তুমুল কোলাহলে তাঁর কথা শোনা গেল না। প্রেস বাড়ির উঠোন তখন মানুষে ভরে গেছে। রিক্সাওয়ালা...ফেরিওয়ালা...ট্যাকসিওয়ালা...প্রেস কর্মচারী—কেবল লোক আর লোক। নিরস্ত্র কিন্তু ধারালো তাদের দাবী—'ধরণীধর মুর্দাবাদ—ধরণীধরের মাথা চাই—।'

কয়েক পা পিছিয়ে আসেন ধরণীধর। 'এ সবের মানে!'

'মানে সমঝাতে পারছেন না?' হাসতে-হাসতে অমায়িকভাবে বলে ছোটেলাল, 'দুনিয়ামে গুন্ডা বদমাস ভি আছে, আউব সিধা ভালো আদমি ভি আছে। এই সিধা ভালা আদমি যেখোন খেপে যায়, তখন গুন্ডা বদমাস তুফানকে আগে শুখ্যা পত্তাকি মাফিক উড়ে যায়!'

'বাগে পেয়ে তোমরা আমার ওপব জুলুম করতে চাও?' হাঁপিয়ে-হাঁপিয়ে বলেন ধরণীধর।

'এ বিদ্যা তো আপনার কাছেই শেখা ধরণীবাবু।' জয়ন্ত বলে পিছন থেকে।

'তবে ভয় নেই।'—আশ্বাস দেন নিবারণবাবু। ছোটেলালকে ডেকে বলেন, 'একটা যাহোক ব্যবস্থা কর ছোটেলাল। ওরা যেরকম খেপে আছে, বলা তো যায় না, ভালোমন্দ একটা কিছু হয়ে গেলে আমাদেরই যে বদনাম!' নিবারণবাবু ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। কী করে যে সামলাবেন ওদেরকে।

ছোটেলাল আগের মতোই নির্বিকার হয়ে বলে, 'হাঁ, হাঁ, ওহি ভি তো শোচতে আছে। একটা শাড়ি আনিয়ে দেন তো দিদিমণি!'

'শাড়ি? শাড়ি?' সকলের বিস্মিত কণ্ঠ ধ্বনিত হয়ে ওঠে। 'শাড়ি দিয়ে কী হবে?'

'হাঁ, হাঁ, একটা ভালা শাড়ি! জলদি নিয়ে আসেন।'

প্রণতি শাড়ি আনলে বোঝা যায় ছোটেলালের মতলবটা কী। ওই শাড়ি ধরণীধরকে পরিয়ে বের করে দেবে ভিড়ের মধ্য দিয়ে। এছাড়া নাকি ধরণীধরের জান মান বাঁচাবার আর কোনও উপায় নেই!

অগত্যা শাড়ি পরেই বেরিয়ে এলেন ধরণীধর। আগে-আগে চলেছে ছোটেলাল।

ছোটেলালের দলের একজন সন্দেহ করে। বলে, 'আরে এ কোন হ্যায় ভেইয়া?'

'মেরা জরু হ্যায় ভাইয়া। আমার ইস্ত্রি আছে।' অম্লানবদনে বলে ছোটেলাল। ভিড় পেরিয়ে এনে ধরণীধরের কানে-কানে বলে, 'যাও, আজ হামার ইস্তিরি হোয়ে খুব বাঁচিয়ে গেলে। লেকিন এইসা লালচ্ কভি নেহি করনা! আর কোনওদিন এ রাস্তায় দেখি তো ইস্তিরি-ফিস্তিরি মানবে না! একেবারে ঠ্যাং খোঁড়া করে দেবে। যাও, তেরা ভালা হো!'

ধরণীধর কথাটি বলেন না। একান্ত বাধ্য স্ত্রীটির মতো ছোটেলালকে অনুসরণ করেন। তা না হলে জান মান বাঁচার কোনও উপায়ও নাকি নেই। গুন্ডার দলকে ইতিমধ্যেই এরা মারধোর করে পার করে দিয়েছে!

প্রশংসমান দৃষ্টিতে সকলে তাকিয়ে থাকে ছোটেলালের দিকে। হাতের লাঠিটার মতই সহজ সরল দেহাতি ছোটেলাল।

চৌদ্দ

ঝড় তুফান শেষে ভরা-নদী তার শীতল বিস্তার মেলে ধরেছে দূরে দূরে। এখন শুধু নিশ্চিন্তে, নির্বিঘ্নে তরী বেয়ে চলা। পালে নতুন হাওয়া লাগছে। জয়ন্ত দেখছে তার পাশে এমন এক শান্ত শীতল নদীর পরিবেশ। কিন্তু জলের বিস্তার এত বেশি যে এপার-ওপার দেখা যায় না। কূলের কোনও চিহ্ন নেই। ঠিক পারেব দিকে নিয়ে যাবে তবী—এমন নাবিক কই? এলোমেলো আর যে বাইবে না এমন নাবিক কই?...কতদিনের স্বপ্ন তার একটা প্রেস হবে, সেখান থেকে কাগজ বেরুবে। তার কলমেব ইশারায় যে সৈনিকরা ওঠে-বসে সেই কালো-কালো আঁচড়ের মতো অজস্র সৈনিক যে যন্ত্র বলে হাজারে-হাজাবে ছাপা হযে বেরিযে আসে, ছড়িয়ে পড়ে বহুলোকের হাতে, বহু দেশে, সেই যন্ত্র পাওয়ার একটা সাধ ছিল জযন্তের। সেই যন্ত্র আজ হাতে এসে গেছে। অত বড় নবজীবন প্রেস কিনে নিযেছেন, আর কেউ নয় তার কাকাবাবু স্বয়ং। কিন্তু এ প্রেসকে যেন আপন করতে পারছে না জযন্ত। কোথায় যেন ফাঁক রয়ে গেল। ঝড় থামতে হারিযে গেল কূল। তাই তো আজ নাবিকের খোঁজ পড়েছে, যে পথ-চিনিযে দেবে।

কতগুলো কাণ্ড ঘটে গেল এক সাথেই, মাত্র কযদিনেব মধ্যে এল জযন্ত। যে ছিল অজানা, অচেনা, সে নিতান্ত আপনার হযে উঠল, তাকে ভরসা কবে আব একবাব উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন নিবারণবাবু। কিন্তু সেই ভবসাস্থল ভাঙল, ধসে গেল চোরাবালির মতো। এল বান! সেই বানে দেখা গেল, যাকে চোরাবালি মনে হয়েছিল তাকেই আজ পাওয়া যাচ্ছে সবুজ চরের মতো। সেই তো কূল। নিবারণবাবু ভাবেন আব চোখ বোজেন। এতবড় বিস্ময়, যে চোখ মেলে চাইতে ভরসা হয় না। এই শেষ বযসে এ কী শুরু হল জীবনে? এ কী এল!

প্রণতি একটা স্বপ্ন দেখছে। অনেক দিনের পুরনো স্বপ্নটা, আজ নতুন করে দেখছে, একটু নতুন ঢঙে। স্বপ্ন দেখতো প্রণতি, একদিন তাব বাবা বৃদ্ধ হযে যাবে, কর্মক্ষমতা আসবে কমে, তখন প্রণতি একাই 'নতুন খবর'কে, নবজীবন প্রেসকে—গুরুভাব হলেও মাথায় তুলে নেবে। সেই গুরুভার বহনের বিহ্বলতায় রোমাঞ্চ হতো প্রণতির। ওর সেই নিঃসঙ্গ দায়িত্বের কথা ভাবতে ওর কেমন ভয়-মিশ্রিত গর্ববোধ জাগত। আজ আবার সেই স্বপ্ন দেখছে প্রণতি। দেখছে একটু নতুন ঢঙে! খুব একা মনে হচ্ছে না আজকে। কার যেন ছায়া পড়েছে একটা! কোথায় যেন আলো জ্বলে উঠেছে। তাই দেখা যাচ্ছে ছায়াকে। এ ছায়া কি তা নিজের নয়? অন্য কারও? সে ছায়া টানছে আজ বড় বেশি। ছায়াকে ধরবার পণ সে তো কখনও করেনি! এখন কী করবে? এমনই একটা দ্বন্দ্বের মধুর স্বপ্ন দেখছে প্রণতি!

প্রেসটা নিয়ে ভবিষ্যতে কী হবে, তাই নিয়ে একটা ঘরোয়া বৈঠক হচ্ছিল। রায়বাহাদুর বলে দিয়েছেন যে প্রেস তিনি কিনেছেন বটে। কিন্তু ও-সব দেখবার তাঁর সময় নেই। ওটা

নিবারণবাবুরই দেখা উচিত।

কিন্তু নিবারণবাবু স্থবির, বিশেষত, সেদিনকার আঘাতে পঙ্গু। নিবারণবাবু বলছেন, 'ওটা রায়বাহাদুরেরই প্ল্যাক।'

জয়ন্ত বলে, 'কাকাবাবুর একটু মুশকিল আছে। কাগজে কখন কী বেয়াড়া লেখা বেরিয়ে পড়বে, তখন কাকাবাবুর খেতাব নিয়ে টানাটানি।'

কাকাবাবু রেগে উঠেছেন। 'খেতাব! রায়বাহাদুর! ঝকমারি হয়েছে আমার এই খেতাব নিয়ে। কালই আমি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে এ খেতাব ছেড়ে দেব।...কিন্তু এ প্রেস টেসের ব্যাপারে আমি নেই বলে দিচ্ছি।'

জয়ন্ত বলে, 'আপনার প্রেস আপনি না থাকলে চলবে কেন?'

'আলবৎ চলবে। একশো বার চলবে। এ প্রেস আমি তোমার নামে আজই লিখে দিচ্ছি। তুমি দয়া করে আমায় রেহাই দাও। '

'সে আমি পারব না। নিজের প্রেস, নিজের কাগজ হলে আমার মেজাজই বিগড়ে যাবে। কখন কী হয়, ভেবে-ভেবে জোর করে লিখতে পারব না।'

কথাটা এলোমেলো শোনায় জয়ন্তের মুখে। যেন ওর মনের কথা নয়। তাই কথাটা শেষ করেই জয়ন্ত অন্যদিকে চেয়ে চুপ হয়ে যায় একেবারে। জল-ভরা নদীর বুকে কূল দেখা যায় না। নাবিক চাই।

ছোটেলাল বলে, 'ওটা প্রণতি দিদিমণিকেই দিয়ে দেওয়া ভালো।' প্রণতি দিদিমণির হাতে গড়া কাগজ অন্যের হাতে যাবে কেন? দেহাতি ছোটেলালের মাথায় ঢোকে না।

রায়বাহাদুর উৎসাহিত হয়ে ওঠেন, 'তুমি নেবে মা। সত্যি তুমি এ ভার নেবে?'

আশ্চর্য প্রণতিই যেন তাদের মধ্যে একজন, যে ভার নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। নিঃসঙ্গ দায়িত্বের স্বপ্ন দেখে আসছে প্রণতি। আজকের সামান্য নতুন ঢঙ তাকে খুব বেশি বিচলিত করেনি বোধহয়। প্রণতি বলে, 'কেন নেব না কাকাবাবু! আমাদের মেজাজ তো এত পল্‌কা নয় যে একটুতেই বিগড়ে যায়।'

চেষ্টা করেও জয়ন্ত প্রণতির দিকে না তাকিয়ে পারে না। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হচ্ছে ওর। প্রণতির কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে উঠে যায় জয়ন্ত। বলে যায়, 'বেশ তাহলে তা ব্যবস্থা হয়েই গেল! আমার আর এখানে থাকবার দরকার কী?'

প্রণতি হাসছিল কথাটা শেষ করে, আরও হাসছিল জয়ন্ত ওর দিকে ঠিক তাকিয়েছে বলে। কিন্তু জয়ন্ত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে, আর সকলের চেয়ে ও বেশি গম্ভীর হয়ে গেল।

জয়ন্ত চলে যাচ্ছে দেখে কাকাবাবুও উঠছিলেন, প্রণতি বললে, 'দাঁড়ান আপনি উঠবেন না কাকাবাবু, আমি দেখছি।'

প্রণতি উঠল দেখে ওঁরা যেন নিশ্চিন্ত হলেন।

লঘু পদে বেরিয়ে আসছিল জয়ন্ত, যেন চলেও সে চলছে না। দরজার কাছে এসে দেখল পথরোধ করতে আগেই এসেছে প্রণতি, হাতে একখানা নোটিস। এ নোটিস দেখেছিল জয়ন্ত যেদিন প্রথম ভিড় দেখে ঢুকেছিল এই প্রেসের জমিতে। সে নোটিসে লেখা 'কম্পোজিটর চাই'।

প্রথমটা গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল জয়ন্ত, তারপর হেসে ফেলল, 'কী ব্যাপার কী? আমি কি কম্পোজিটরের উমেদার নাকি?'

'একদিন তো ছিলেন।' মুখ ঢেকে হাসল প্রণতি।

জয়ন্ত আরও হাসল। 'সেবার যা শিক্ষা হয়েছে, তাতে আর ও-রাস্তা মাড়াই! ষোল এম ডবল কলম শুনলে এখনও বুক ধড়ফড় করে।'

'কম্পোজিটরি ছাড়া আমাদের প্রেসে অন্য চাকরি তো খালি আছে!'

'আছে না কি? কী চাকরি শুনি!' জয়ন্ত রীতিমতো উৎসুক হয়ে ওঠে। চলে না আর, দাঁড়ায়।

'এই যেমন ভালো একজন সম্পাদক আমাদের দরকার!'

জয়ন্ত হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়াতে বড় কাছে এসে গিয়েছিল প্রণতি। কিন্তু জয়ন্ত সে বিষয়ে সচেতন থেকেই বলে চলে, 'সম্পাদক! কিন্তু সম্পাদকের যদি বানান ভুল হয়?'

'তা না হয় শুধরে দেওয়া যাবে!'

'শুধরে দেবে! কিন্তু দু-চারদিন শোধরালে তো চলবে না। চিরকাল শোধরাতে পারবে! বল পারবে চিরকালের ভার নিতে।'

এক নিঃসঙ্গ দায়িত্বকে স্বপ্ন দিয়ে লালন করে এসেছে প্রণতি। আর এই ভার সে কি বইতে পারবে?

'চিরকালের ভার নিতে হবে।' চিন্তিত মুখে প্রশ্নটা করে প্রণতি, তারপরেই দুষ্টুমি করে বলে ওঠে, 'বয়ে গেছে!'

'ভার তাহলে নিতে পারবে না!'

'আচ্ছা নেব!' তাড়াতাড়ি স্বীকার করে নেয় প্রণতি। সময় তার বড় অল্প। একটু থেমে বলে, 'চিকিৎসা তাহলে আজ থেকেই শুরু!'

'চিকিৎসা!' রীতিমতো অবাক হয় জয়ন্ত।

'হ্যাঁ, ভুল শোধরাবার চিকিৎসা। বানান কর দেখি 'মুহূর্ত!'

এক মুহূর্তে জয়ন্তের কাছে সব যেন স্পষ্ট হয়ে আসে। দুষ্টুমির পালা এবার ওর। বলে, 'মুহূর্ত?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মুহূর্ত!' খুব একটা জব্দ করবে ওকে, এমন ভাব প্রণতির মুখে।

'প এ র ফলা মূর্ধণ—ত-এ হ্রস্বই! '

'অ্যাঁ? এই তোমার বানান হল?' চোখ মুখ লাল হয়ে ওঠে প্রণতির।

'হল তো! তা ছাড়া আর কোনও বানান যে মাথাই নেই!' মুখে-মুখে জবাবটা দিলেও সমস্ত মন দিয়ে জয়ন্ত শুধু দেখছিল প্রণতির রাঙা মুখ। জয়ন্তের মনে হল ওটা যেন কোনও রাঙা আলোর ছটা।

যে আলো নাবিকের হাতে, কূল-হারা ভরা-নদীর বুকে।

কালো ছায়া

জনাকীর্ণ ডালহৌসি স্কোয়ারের মোড়ে ট্রাম থেকে নামল অণিমা। এই সময়টাই ডালহৌসি স্কোয়ার সবচেয়ে বেশি কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠে। চারপাশে লোকজন এবং যানবাহনের ভিড়। হাতঘড়িটার পানে তাকিয়ে দেখল অণিমা—এগারোটা বাজতে মিনিট দশ বাকি আছে। ঠিক সময়ে এসেই পৌঁছেছে। বিজ্ঞাপনে দেখা-সাক্ষাতের সময় এগারোটা থেকেই লেখা ছিল। চারদিকের বিরাট অট্টালিকার দিকে চোখ মেলে ধরল অণিমা। তার মনে হল—এই বণিক-বিত্তের পরিবেশে সে কত ক্ষুদ্র—কর্মমুখর ডালহৌসি স্কোয়ারের জনস্রোতে সে কত অসহায়। কিন্তু দ্বিধা ও ভাবনার সময় আর নেই। তা ছাড়া শুধু সাহসকে সম্বল করেই তো সে এতদূর এগিয়ে এসেছে জীবনের পথে। সুতরাং তার দুর্জয় সাহসের কাছে কোনও বাধাই-বাধা নয়—কোনও বিঘ্নই দুরতিক্রম্য নয়।...ক্ষিপ্রপদে বড় রাস্তা অতিক্রম করল অণিমা। সামনেই ম্যাংগো লেন। এগারোটার মধ্যেই তাকে ডিটেকটিভ সুরজিৎ রায়ের অফিসে পৌঁছতে হবে। অণিমার কোনওদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই—এমন অসতর্কভাবে পথ চললে—যে-কোনও মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে—সে খেয়ালটুকুও অণিমার নেই। পথচারীদের অনেকেই এই তরুণীর দুঃসাহস নিয়ে দু-একটা খুচরো মন্তব্য করল। অণিমাকে সুন্দরীই বলা চলে। বলিষ্ঠ গঠন—রং ফরসা—দীর্ঘাঙ্গী—সারা দেহ জুড়ে যৌবনের স্পষ্ট উচ্চারণ। অণিমার রূপ প্রখর দীপ্তিতে ঝলমল করছে।

অণিমা ম্যাংগো লেনের বাড়ির নম্বরগুলির ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেল। চুলের গুচ্ছ অবিন্যস্তভাবে হাওয়ায় উড়ছে—ভঙ্গিতে নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছবার জন্যে দারুণ চাঞ্চল্য। বেলা এগারোটায় এই রূপসী তরুণীর ভাবভঙ্গি জনসমুদ্রের একাংশে বিচিত্র তরঙ্গের সৃষ্টি করল। অতিব্যস্ত পথচারীও একবার বাঁকা দৃষ্টিতে অণিমার দিকে তাকাল—ভবঘুরে দল সরস আলোচনার খোরাক পেয়ে মনে-মনে উৎফুল্ল হয়ে উঠল! সবাই মনে-মনে নিজেদের বিচার-বুদ্ধিমতো আঁচ করবার চেষ্টা করল—কে এই রহস্যময়ী, রূপসী নারী?...

অণিমা সেসব গুঞ্জন গ্রাহ্য করল না। কোনওদিকে না তাকিয়ে সে সোজা তেরো নম্বর বাড়িতে ঢুকল। বাঁ-পাশের সিঁড়ির কাছেই তির-চিহ্নিত সাইনবোর্ডে দোতলায় সুরজিৎ রায়ের অফিসকক্ষের নির্দেশ লেখা রয়েছে। লঘু পায়ে তর-তর করে উপরে উঠে গেল অণিমা।

দোতলায় ঢুকে বাঁ-দিকের প্রথম ঘরেই ডিটেকটিভ সুরজিৎ রায়ের অফিস। অণিমা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

সুরজিৎ রায়—'প্রাইভেট ডিটেকটিভ'—ছোট প্লেটে খোদিত উজ্জ্বল অক্ষরগুলি অণিমার মনে যেন ক্ষণেকের জন্যেও আশার আলো জ্বালিয়ে তুলল। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল অনিমা—পথ-শ্রমের সব ক্লান্তি সেমুহূর্তে ভুলে গেল।

সুরজিতের চাকর বলরাম সম্মার্জনী দিয়ে আসবাবপত্রের ধুলো ঝাড়ছিল। একটি সুন্দরী তরুণীকে দোতলার সিঁড়ি বেয়ে আসতে দেখে—বলরাম সম্মার্জনী ফেলে—ম্যাগনিফাইং গ্লাসটি চোখের কাছে তুলে ধরল। কে এই সুন্দরী তরুণী? তাদের অফিসের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে! গভীর মনোযোগের সঙ্গে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে একটা কাগজকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ শুরু করল বলরাম। সুরজিতের অফিসে এসে এই অভ্যাসটি রপ্ত করেছে বলরাম। তার ধারণা—কালে সেও একদিন সুরজিৎ রায়ের মতো স্বনামধন্য গোয়েন্দা হতে পারবে। সেই আশাতেই বলরাম পরম নিষ্ঠায় সুরজিতের শাগরেদি করছে। তাই কেউ তাকে সুরজিতের চাকর বললে—সে ভয়ানক চটে যায়।

গ্লাসটি হাতে নিয়ে কাগজটা দেখতে-দেখতে অণিমার মনের ভাব বুঝবার চেষ্টা

করছিল বলরাম। সুরজিতের খুচরো আলাপ থেকে সে ধারণা করে নিয়েছিল—ভালো গোয়েন্দা হতে হলে—দেখামাত্রই লোকের মুখ দেখে মনের ভাবটি বুঝতে পারা চাই।

'মেয়েটি—সুন্দরী। মুখে উদ্বেগের ছাপ—দামি গয়নাগাটি নিশ্চয়ই কিছু হারিয়েছে—নইলে মেয়েছেলে একা গোয়েন্দার অফিসে এসে হাজির হতো না।' মনে-মনে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছবার চেষ্টা করল বলরাম।

অণিমা খানিকক্ষণ ইতস্তত করে—বেয়ারাদের কাউকে না দেখতে পেয়ে—ফোল্ডিং দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল।

'এটাই তো সুরজিৎ রায়ের অফিস?' বলরামকে লক্ষ করে বলল অণিমা।

অণিমাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই গ্লাস রেখে টেবিলের কাগজপত্র সুবিন্যস্ত করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল বলরাম। যেন কাজের চাপে সে ভারি ব্যস্ত। কারও দিকে তাকাবার—কারও কথা শুনবার সময়টুকু পর্যন্ত তার নেই।

অণিমা আরও কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে জিগ্যেস করল, 'সুরজিৎবাবু আছেন?'

বলরাম যেন অণিমার কথা এই প্রথম শুনতে পেল—তেমনি বিস্ময়ের ভঙ্গিতে বলল, 'ওঃ, সুরজিৎবাবুকে খুঁজছেন? তা বলুন আপনার কী হয়েছে।' তারপর একটুখানি গোয়েন্দাসুলভ বিজ্ঞতার ভান করে জিগ্যেস করলে, 'হিরের নেকলেস চুরি, না রাজকুমারী গায়েব, না গুম-খুন! কীসের ডিকটেশন চাই?'

আগন্তুক তরুণীর উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনটা ঠিক ঠাহর করতে পেরেছে ভেবে মনে-মনে একটা অভূতপূর্ব আত্ম-গরিমার উল্লাস অনুভব করল বলরাম। হাজার হোক—এতবড় নামকরা ডিটেকটিভের শাগরেদ সে—ফেলনা লোক তো আর নয়।

ভুরু কুঁচকে অণিমা বলল, 'ডিকটেশন? কীসের ডিকটেশন?'

একটুও না দমে বলরাম জবাব দিলে, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ,—ওই গোয়েন্দাগিরি আর কী! ওকেই আমরা 'ডিকটেশন' বলি।'

অণিমার ঠোঁটে একটুখানি কৌতুকের মুচকি হাসি দেখা দিল। কিন্তু হাসি চেপে অণিমা বলল, 'ওঃ ডিটেকশন—কিন্তু সেটা করবে কে? সুরজিৎবাবু...'

কথা কেড়ে নিয়ে বলরাম জবাব দিলে, 'তিনি তো এখন নেই। তা আপনি আমায় সব বলতে পারেন। আমি তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট। আপনার কাজ আমি মাটি করব না...'

খুব একটা ভরসা নিয়ে সে অণিমার জবাবের অপেক্ষা করল। বলরামের দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অণিমা বলল, 'অ্যাসিস্ট্যান্ট...আচ্ছা থাক তা হলে...'

অণিমা বারান্দার দিকে পা বাড়াল। অণিমার এই সূক্ষ্ম তাচ্ছিল্যে বলরাম ক্ষুণ্ণ হল—কিন্তু এ অভিজ্ঞতা তার আজ নতুন নয়। তবু দমবার পাত্র নয় বলরাম—একদিন সে একজন নামকরা গোয়েন্দা হবে—এই আশায় বুক বেঁধেই সে এখানে দশজনের দশকথা শুনেও চুপ করে থাকে।

সেই মুহূর্তেই সুরজিতের সহকারী অভয় ভেতর থেকে বেরিয়ে এল।

'আপনি সুরজিৎবাবুকে খুঁজছেন—তিনি এক্ষুনি আসবেন।' অণিমাকে লক্ষ করে বলল অভয়।

অণিমা হাসি চেপে অভয়ের দিয়ে তাকিয়ে বলল, 'না, আর দরকার হবে না তাঁকে। তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্টকে যা দেখলাম...'

অণিমার কথা শেষ না হতেই হই-হই করে উঠল অভয়।

'আরে অ্যাসিস্ট্যান্ট কে? কার কথা আপনি বলছেন? ও তো তাঁর চাকর বলরাম।'

বলরাম অমনি ফোঁস করে উঠল, 'দেখুন অভয়বাবু, চাকর-চাকর করবেন না বলে দিচ্ছি। দস্তুরমতো গোয়েন্দাগিরি শিখবার জন্যে আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়েছি—কর্তা বলেছেন—পাঁচ বছর শাগরেদি করলে আমায় 'ভি.ডি.' টাইটেল দেবেন।'

অভয় মুখের ওপর জবাব দিলে, 'হ্যাঁ—তা তো দেবেনই। ভি.ডি. টাইটেলের মানে জানো মুখ্যু?' 'ভি.ডি.' মানে ভেটেরিনারি ডিটেকটিভ। যেমন ঘোড়ার ডাক্তার হয়, তুমি তেমনি গরুর গোয়েন্দা। গরু হারালে খুঁজে বার করবে...'

বলরাম এবার মারমুখো হয়ে উঠল।

'ভালো হবে না—ভালো হবে না বলে দিচ্ছি অভয়বাবু...'

অণিমা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে এদের বাকযুদ্ধ উপভোগ করছিল। এক্ষুনি হয়তো বলরাম রাগারাগি করে একটা কাণ্ড করে বসত। কিন্তু দরজার প্রান্তে সুরজিৎ রায়ের গম্ভীর গলার আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল।

'এত গোলমাল কীসের?'

এক মুহূর্তে বলরামের হম্বিতম্বি স্তব্ধ হয়ে গেল। তারা দুজনেই সসম্ভ্রমে দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। অণিমাকে নির্দেশ করে মোলায়েম সুরে অভয় বললে, 'আজ্ঞে ইনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।'

এক নিমেষে অণিমার আপাদমস্তক লক্ষ করে সুরজিৎ বলল, 'ও, আসুন আমার সঙ্গে।'

অণিমাকে সঙ্গে নিয়ে সুরজিৎ তার খাসকামরায় প্রবেশ করল। সামনের চেয়ার দেখিয়ে বলল, 'বসুন।' সুরজিৎ ও অণিমা দুজনে মুখোমুখি হয়ে আসন গ্রহণ করল।

'বলুন, কী করতে পারি আপনার জন্যে?' সুরজিৎ প্রশ্ন করল। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে অণিমা বলল, 'খবরের কাগজে আপনার বিজ্ঞাপন দেখে এসেছিলাম।' তারপর একটু থেমে—গলায় একটু আয়াসসাধ্য জোর টেনে বলল, 'কিন্তু এসে আপনার অফিসের যে নমুনা দেখলাম...'

বাকিটা চট করে লুফে নিল সুরজিৎ, 'তাতে খুব হতাশ হয়েছেন—এই তো? অর্থাৎ চুরি, ডাকাতি, খুন, জখম নিয়ে কারবার করি বলে অফিসটাও ভয়াবহ গোছের কিছু হবে ভেবেছিলেন? কিন্তু রোগ সারিয়ে যে বেড়ায়—সেই ডাক্তার বাড়িতে রুগি হয়ে থাকে না। যাই হোক—এখন বুঝে দেখুন, আমার মতো গোয়েন্দাকে বিশ্বাস করে কাজ দিতে পারবেন কি না।'

অণিমা পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে ধরল সুরজিতের পানে। চেহারায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছাপ—ঠোঁটের কোণে পরিহাসের বাঁকা রেখা।

অণিমা তাই কথাটা সোজাসুজি না বলে একটু ঘুরিয়ে প্রশ্ন করল, 'কাজ দিলে আপনি তা হাসিল করতে পারবেন তো? অবশ্য ন্যায্য পারিশ্রমিক আপনি পাবেন।'

এবার না হেসে পারল না সুরজিৎ। টাকা ফেললেই যেন দুনিয়ার সব কিছুকে করায়ত্ত করা যায়!

'ন্যায্য পারিশ্রমিক তো পাব—কিন্তু কাজটা ন্যায্য কি না—সেটাও জানা দরকার।'

'ধরুন কোনও এক জায়গায় আপনাকে কিছু দিনের জন্যে যেতে হবে।'

'কোথায় যেতে হবে?' গম্ভীরভাবে মাথা দুলিয়ে বলল সুরজিৎ।

'মুর্শিদাবাদের সুখচর বলে কোনও গ্রামে।'

'মুর্শিদাবাদের সুখচর'—বিলম্বিত টানে কথাটাকে নিজের মনে-মনেই যেন উচ্চারণ করল সুরজিৎ—যেন মনে-মনে স্থির করল জায়গাটা কেমন এবং কোথায়। তারপর অণিমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'শুধু সেখানে বেড়াতে যাওয়ার জন্যেই কি কষ্ট করে আমায় ন্যায্য পারিশ্রমিক দিতে এসেছেন?'

'না, কাজ আরও কিছু আছে—তবে সেটা পরে জানতে পারবেন।'

'মাপ করবেন। কাজ কী—তা আগে না জানলে নিতে পারব না।'

'নিতে পারবেন না?' ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বলল অণিমা।

'কিন্তু গোয়েন্দাদের এত বাছবিচার আছে বলে তো জানতাম না। কাজ এই ধরুন, চুরি। ধরুন, আমার জন্যে আপনাকে কিছু চুরি করতে হবে।'

সুরজিৎ এবার সশব্দে হেসে উঠল। সিগারেটের টিন থেকে একটা দামি সিগারেট তুলে নিল। যেন বৃথাই এতক্ষণ আলাপ-আলোচনায় সময় নষ্ট হল।

'এর জন্যে আপনাকে এতখানি রাস্তা কষ্ট করে আসতে হতো না। আমি খুবই দুঃখিত! আপনার কেসটা আমি নিতে পাবলাম না। গোয়েন্দাদের বাছবিচার অবশ্য বিশেষ কিছু নেই, তবে চুরি ধরা তাদের কাজ—চুরি করা নয়।' সুরজিতের কথাগুলো একটু অতিরিক্ত রুক্ষ শোনাল।

রাগে অণিমার সুন্দর মুখ লাল হয়ে উঠল। ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

'আপনি এ কাজ তা হলে নিতে পারবেন না?' আশাভঙ্গের বেদনায় চঞ্চল হয়ে উঠল অণিমা।

'আপনি বড় ভুল ঠিকানায় এসেছেন' ঈষৎ শ্লেষের সুরে বলল সুরজিৎ, 'এটা ডিটেকটিভের অফিস, দাগি চোর-জোচ্চোরদের কো-অপারেটিভ সিন্ডিকেট নয়। আচ্ছা, আর আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করব না। নমস্কার।'

অপমানে, রাগে তীক্ষ্ণ তিরের মতো ঋজু হয়ে দাঁড়াল অণিমা। তারপর এই দাম্ভিক লোকটার দিকে তীব্র কটাক্ষ হেনে দ্রুতপদে গটগট করে বেরিয়ে গেল। রাগের মাথায় একটা সৌজন্য-জ্ঞাপক নমস্কার জানাতে পর্যন্ত ভুলে গেল।

পরক্ষণেই টেলিগ্রাম হাতে নিয়ে প্রবেশ করল অভয়।

'এইমাত্র টেলিগ্রামটা এসেছে। জবাব পাঠাবার মাশুল আগাম দিয়ে দিয়েছে। এখুনি জবাব দরকার।'

'কোথাকার টেলিগ্রাম?' রাশি-রাশি টেলিগ্রাম তো রোজই আসছে। সুরজিৎ খুব আগ্রহ প্রকাশ করল না।

'সুখচর থেকে কে এক রাজীবলোচন চৌধুরি...'

মুহূর্তে একটা বিদ্যুৎ শিহরণ যেন স্পন্দিত হল সুরজিতের সারা দেহে। গভীর কৌতূহলে সে জিগ্যেস করল, 'কোথাকার বললে, সুখচর?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, সুখচর থেকে রাজীবলোচন জানাচ্ছেন যে তাঁর জীবন বিপন্ন। উপযুক্ত ফি দিলে আপনি মাস ছয়েক সুখচরে তাঁর সঙ্গী হয়ে থাকতে পারেন কি না? আপনি জানালে তিনি লোক পাঠাবেন, আপনাকে নিয়ে যেতে।'

সুরজিৎ দ্রুত পায়চারি শুরু করল।

অস্ফুট কণ্ঠে আপন মনেই উচ্চারণ করল, 'আশ্চর্য ব্যাপার। অদ্ভুত যোগাযোগ। কী নাম বললে, সুখচরের রাজীবলোচন চৌধুরী?'

অভয় জবাব দিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কিন্তু এই মাত্র যে ভদ্রমহিলাটি...'

সুরজিৎ চুপ করল। ভদ্রমহিলাটি ততক্ষণে তাদের সন্ধানের বাইরে।

খানিকক্ষণ নতমস্তকে কী ভেবে হঠাৎ বলে উঠল সুরজিৎ, 'তুমি জানিয়ে দাও অভয়—আমি যেতে প্রস্তুত।' সুখচরের রাজীবলোচন চৌধুরী বিপন্ন—আর সুখচরে একটা কিছু চুরি করবার জন্যে মেয়েটির অনুরোধ। আশ্চর্য ঠেকছে সুরজিতের। একটা রহস্যের আভাস যেন পেয়েছে সুরজিৎ—একটা ষড়যন্ত্রের সংকেত। হয়তো সে শুধু খণ্ড মেঘ, তবু তা থেকেই যে বিরাট ঝড় উঠবে না, তাই বা কে বলতে পারে?

দুই

রাজীবলোচন চৌধুরির বাবা যজ্ঞেশ্বর চৌধুরি রেশমের ব্যবসা করে প্রচুর ধনসম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন। সামান্য অবস্থা থেকে নিজের শক্তির জোরে তিনি ভাগ্যলক্ষ্মীর জয়মাল্য লাভ করেছিলেন বলে, সম্পত্তি ও টাকাকড়ির প্রতি তাঁর মমতাবোধও ছিল অসীম। মুর্শিদাবাদের সুখচরে তিনি জমিদারি ক্রয় করেছিলেন আর নবাব সিরাজদ্দৌলার আমলের পরিত্যক্ত এক প্রাসাদ খুব সুবিধে-দরে কিনে নিয়ে সেখানেই পুত্রপরিবার নিয়ে বাকি দিনগুলি কাটিয়ে গেছেন। এক জীবনে বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছিলেন তিনি—কিন্তু ছেলেদের হাতে এই সম্পত্তি অটুট থাকবে কিনা—এই দুশ্চিন্তায়, শেষের দিনগুলি খুব শান্তিময় ছিল না তাঁর। মেজছেলে রাজীবলোচন খুবই তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন—তাঁর বিষয়ী বুদ্ধির উপরই যা কিছু আস্থা ছিল যজ্ঞেশ্বরের। বড়ছেলে দীননাথ সারাদিন নেশায়ই বুঁদ হয়ে থাকতেন। তিনি দু-চোখ বুজলে দীননাথ যদি নিজের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য খোলা হাতে খরচ করতে শুরু করেন, তা হলে চৌধুরিদের জমিদারি তো কোন ছার—রাজার ভাণ্ডার শূন্য হতে কতক্ষণ? এই আশঙ্কা যজ্ঞেশ্বরকে প্রতি মুহূর্তে পীড়িত করছিল। দীননাথের অসংযত আচরণ এবং উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের জন্য যজ্ঞেশ্বর জীবিত থাকতেই তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন। যৌবনের নেশায় মদ ধরেছিলেন দীননাথ—শেষ পর্যন্ত মদই তাঁকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করল। প্রবৃত্তির স্রোতে ভেসে গেলেন দীননাথ—কোনও শাসন আর বাঁধনই তাকে ফেরাতে পারল না। শরীরের ওপর অত্যাচারের দরুন অকালেই তিনি বুড়ো হয়ে গেলেন, সঙ্গে-সঙ্গে নানা কুৎসিত ব্যাধি তাঁর দেহকে আক্রমণ করল। ঘৃণায়, লজ্জায়-ধিক্কারে-সকলের অভিশাপ মাথায় বহন করে দেশ ছেড়ে চলে গেলেন দীননাথ। পিতার ত্যাজ্যপুত্র তিনি—কপর্দকহীন, পথের ভিখিরি। পথকেই তিনি শেষ আশ্রয় হিসাবে বরণ করে নিলেন।

ছোট ছেলে পিতাম্বর ছিলেন একটু স্বাধীন প্রকৃতির। নিজে যা ভালো বুঝতেন, তাই আঁকড়ে ধরে থাকাই ছিল পিতাম্বরের বৈশিষ্ট্য। বাবার সঙ্গে এই মত-প্রাধান্য নিয়ে তাঁর প্রায়ই বিরোধ বাধত। শেষ পর্যন্ত শিশু-কন্যা আর স্ত্রীকে নিয়ে সুখচর ত্যাগ করে চলে গেলেন পিতাম্বর। স্বমতনির্ভর ছেলের এই হঠকারিতা চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখলেন যজ্ঞেশ্বর চৌধুরি। তিনি ছেলের এই স্পর্ধা ক্ষমা করতে পারলেন না। পিতাম্বরকে সম্বলহীন হয়েই অনিশ্চিতের পথে পা বাড়াতে হল। কর্তব্যকঠোর যজ্ঞেশ্বর চৌধুরির মন তাতে টলল না। উচ্ছৃঙ্খল আর একগুঁয়ে ছেলেদের ফিরিয়ে আনবার কোনও চেষ্টা তিনি করেননি। শেষ পর্যন্ত রাজীবলোচনই

বুড়ো বয়সে পিতার একমাত্র সান্ত্বনা হয়ে রইলেন। বিশ্বাস করে সবকিছুর ভার মেজছেলের হাতেই ছেড়ে দিলেন যজ্ঞেশ্বর। একটু শৌখিন আর খোলা হাত—তা সংসারের দায়িত্ব ঘাড়ে চাপলে রাজীবলোচন ঠিকই নিজেকে শুধরে নেবে—এ-বিশ্বাস ছিল যজ্ঞেশ্বরের। নিজের চাল-চলন আর তীক্ষ্ণবুদ্ধির জোরে বাবার স্নেহের সম্পূর্ণ অধিকারী হয়েছিলেন রাজীবলোচন। কিন্তু দুই ছেলের এই শোচনীয় পরিণতিতে সেই যে বুকের ব্যথায় শয্যা নিলেন যজ্ঞেশ্বর—আর উঠলেন না। রাজীবলোচনের কোলে মাথা রেখেই তিনি একদিন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

সুখচরের এক নিভৃত অঞ্চলে 'চৌধুরিগড়' সম্পর্কে অদ্ভুত সব জনশ্রুতি লোকের মুখে-মুখে প্রচারিত হয়েছিল। গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে খিলান-দেওয়া বিরাট অট্টালিকার নবাবি আমলের কত পরিবারের উত্থান-পতনের চাঞ্চল্যকর কাহিনি জড়িয়ে আছে। 'চৌধুরিগড়ে'র রহস্য-যবনিকা লোকের সামনে কোনওদিনই সম্পূর্ণভাবে উন্মোচিত হবে না, তাই এই 'গড়' নিয়ে এত জল্পনা-কল্পনা, এত জনরব আর কল্পকাহিনি।

রাজীবলোচনকেই যেন এই রহস্যময় 'চৌধুরিগড়ে' সবচেয়ে বেশি মানিয়েছিল, রহস্যাবৃত বাড়িতে একটি অদ্ভুত প্রকৃতির লোক, যাকে সম্পূর্ণ করে আজও কেউ জানতে পারেনি।

যজ্ঞেশ্বরের মৃত্যুর পর বহুদিন অতিবাহিত হয়েছে। রাজীবলোচন এখনও সেই 'গড়ে'ই বাস করছেন। দুনিয়ার দুষ্প্রাপ্য জিনিস সংগ্রহের শখ রাজীবলোচনের চিরকালের। সংসারে কেউ না থাকায় এই শখ আর শৌখিনতা নিয়েই মেতে থাকেন রাজীবলোচন। তাই চল্লিশের কোঠায় পা দিয়েও তিনি যৌবনের সাহস ও উদ্দীপনা হারাননি। বহুমূল্য আসবাবপত্রে সজ্জিত ঘরে বাঘ-সিংহ-মোষ আর হরিণের মূর্তি আর সেই সঙ্গে নানা দেশের দুষ্প্রাপ্য জিনিসের সংগ্রহ দেখলে গৃহস্বামীর মার্জিত রুচি ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ সম্পর্কে খুব উচ্চ ধারণাই জন্মায়। শৌখিন তিনি ছোটবেলা থেকেই। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে শৌখিনতার প্রতি ঝোঁকটা একটু বেড়েই চলেছে। কৃপণ তিনি কোনওদিনই ছিলেন না—কিন্তু ইদানীং মনটা যেন তাঁর আরও দরাজ হয়েছে। অনেকটা নিঃসঙ্গ জীবনে একজন সঙ্গীর প্রয়োজন হওয়ায় এবং কিছুটা অনুকম্পাবশতই একজন বিদেশের উচ্চ ডিগ্রিধারী ডাক্তারকে নিজের বাড়িতে স্থান দিয়েছেন রাজীবলোচন। ভদ্রলোক জার্মানিতে বহু বৎসর ছিলেন। গত মহাযুদ্ধের প্রারম্ভেই তিনি দেশে ফিরে আসেন। তাঁর অসমাপ্ত গবেষণাকার্য চালাবার জন্য তিনি একজন উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক খুঁজছিলেন। জার্মানিতে থাকতেই তিনি ডাক্তারি শাস্ত্রের উচ্চতম ডিগ্রি লাভ করে গবেষণা শুরু করেন। মানুষকে কী করে দীর্ঘায়ু করা যায়, এই ছিল তাঁর রিসার্চের বিষয়। এবিষয়ে তিনি অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিলেন। ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ করে রাজীবলোচন খুব প্রীত হলেন। আর সঙ্গে-সঙ্গে তাঁকে রিসার্চ করবার জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য দিতেও সম্মত হলেন। ডাক্তার এতটা আশা করেননি। তিনি যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। ডাক্তারকে গবেষণা করবার জন্য 'চৌধুরিগড়ে'র একটা ঘর ছেড়ে দিলেন রাজীবলোচন। সেইদিন থেকে ডাক্তারের পৃষ্ঠপোষক আর বন্ধু—দুই-ই হয়ে উঠলেন রাজীবলোচন।

ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে চায়ের টেবিলে বসেছেন রাজীবলোচন। সাধারণত বিকেলের দিকে এই সময়টাতেই ডাক্তারের ফুরসত হয় খোশগল্প করবার। বিদেশ-জীবনের অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতার কাহিনি বর্ণনা করেন ডাক্তার—রাজীবলোচন গভীর ঔৎসুক্যের সঙ্গে তার রস গ্রহণ করবার চেষ্টা করেন। ডাক্তার, রাজীবলোচনের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট—ছিপছিপে

গড়ন—ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি রেখেছেন—চোখে একটা সদাজাগ্রত সন্ধানী দৃষ্টি—যেন গবেষণার শেষ অধ্যায়ে এসে পৌঁছেছেন ডাক্তার—তাঁর নির্দিষ্ট লক্ষে পৌঁছতে আর দেরি নেই, সারা বিশ্বকে তাঁর অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারের কাহিনি শোনাবার দিন আগতপ্রায়। সামান্যমাত্র অসাবধানতার দরুন যেন তাঁর সকল প্রয়াস ব্যর্থ না হয়।

বয়স এবং চেহারার অসংগতি সত্ত্বেও ডাক্তার ও রাজীবলোচনকে পরস্পরের অন্তরঙ্গ হতে একটু দেরি হয়নি। নিঃসঙ্গ জীবনে এমনি একজন বন্ধুর প্রয়োজন ছিল বোধহয় রাজীবলোচনের। আর এমন একজন বিত্তশালী জমিদারের অর্থানুকূল্য ছাড়া ডাক্তারের সাধ্য ছিল না নিরুদ্বেগে চিকিৎসা জগতে যুগান্তর আনবার নেশায় মেতে থাকেন।

রাজীবলোচনের চিনদেশিয় পাচক ওয়া লাং সুগন্ধি চা পরিবেশন করে গেল। বিত্ত সম্পদ যতটুকু থাক আর না থাক, মেজাজ-মর্জি রাজীবলোচনের আমিরের মতোই ছিল। খাওয়াদাওয়া আর পোশাকপরিচ্ছদ সম্পর্কে তিনি খুবই খুঁতখুঁতে ছিলেন। চিনারা খুব ভালো চা তৈরি করতে পারে—রান্না করতে পারে—এইজন্য কলকাতায় চিনাদের এক রেস্টুরেন্ট থেকে ওয়া লাংকে জোগাড় করেছিলেন।

রাজীবলোচনের খেয়ালকে বাধা দেওয়ার কেউ ছিল না আর কারও সাধ্যও ছিল না। 'চৌধুরিগড়' সম্পর্কে লোকের মনে এমনই একটা আতঙ্ক-মিশ্রিত কৌতূহল ছিল যে রাজীবলোচনের অদ্ভুত সব খেয়ালের কথা শুনে তাবা টিপ্পনী কেটে বলত—'হবে না—যেমন 'গড়'—তেমনি তাব উজির হয়েছেন রাজীবলোচন চৌধুরি—একেবারে সোনায় সোহাগা।'

সেদিন বিকালবেলা রাজীবলোচন উত্তেজিত হয়ে কথা কইছিলেন। অবশ্য উত্তেজনার যথেষ্ট কারণও ছিল। বহুদিন পর বড়ভাই দীননাথ এসে হাজির হয়েছেন 'চৌধুরিগড়ে' ছোটভায়ের করুণাপ্রার্থী হয়ে। ডান হাত আর ডান-পা পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে গেছে। উচ্ছৃঙ্খলতার চরম সীমায় পৌঁছে দীননাথের হঠাৎ চৈতন্যোদয় হয়েছে—সবদিক থেকেই তিনি রিক্ত, সর্বস্বান্ত। নিজের উদ্দাম প্রবৃত্তির রসদ জোগাবার মতো ক্ষমতাও তাঁর অবশিষ্ট নেই। কঠিন ব্যাধি এসে তাঁর সর্বাঙ্গ আক্রমণ করেছে—আজ তিনি পঙ্গু। রোগ-জর্জর এই দেহ নিয়ে ছোট ভাই-এর দরজায় ভিখিরি হওয়া ছাড়া আর অন্যপথ খোলা নেই দীননাথের। কাতর কণ্ঠে দীননাথ বললেন—'তুমি ভেবে দ্যাখো রাজীব—তোমার কাছে হাত পাতা ছাড়া আর কোথাও আমার যাওয়ার জায়গা ছিল না।' ডাক্তার তাঁর পক্ষ হয়ে সুপারিশ করতে যাচ্ছিলেন—বাধা দিয়ে রাজীব উত্তেজিত সুরে জবাব দিলেন 'হ্যাঁ, হ্যাঁ—আমি জানি ডাক্তার, এতদিন বাদে একটা ভয়ঙ্কর কোনও মতলব না নিয়ে ও আসেনি। গভীর কোনও একটা ষড়যন্ত্র ও আমার বিরুদ্ধে যে পাকিয়ে তুলেছে তা আমি বেশ বুঝতে পারছি।'

দীননাথের চোখে-মুখে একটা অসহায় ক্ষোভের ভাব ফুটে উঠল।

'মতলব, ষড়যন্ত্র, এসব তুমি কী বলছ রাজীবলোচন'; ছোট ভাই-এর অভিযোগে দীননাথ খুবই মর্মাহত হয়েছেন অথচ তাঁকে বাধ্য হয়েই তাঁর কাছে সাহায্য-প্রার্থী হতে হয়েছে। বেদনায় তাঁর গলা কাঁপছিল। 'আমি তোমার দাদা—রোগে পঙ্গু হয়ে চরম অভাবে পড়ে তোমার কাছে ভিক্ষে চাইতে এসেছি—আর তুমি ছোট ভাই হয়ে এতসব কথা আমাকে শোনাচ্ছ!'

চা খাওয়া ততক্ষণে শেষ হয়ে গেছে। অন্যান্য দিন চা-পান করার সঙ্গে-সঙ্গে যে খোশগল্পের আবহাওয়াটুকু জমে ওঠে সেদিন দীননাথ আগেই তা মাটি করেছেন।

ডাক্তার বোধহয় একটুখানি বিব্রতবোধ করলেন। দু-ভায়ের এই পারিবারিক দ্বন্দ্বে তাঁর উপস্থিতিটা সত্যিই অস্বস্তিকর। কিন্তু এই সময়টা তাঁকে রাজীবলোচনের কাছে থাকতেই হয়। এসব বিষযে পান থেকে চুন খসলে রাজীবলোচন রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠেন। কিন্তু বড় ভাই-এর প্রতি এই নির্মম ব্যবহারে যেন ক্ষুব্ধ হলেন ডাক্তাব। এতদিনের মেলামেশার পরও রাজীবলোচনকে সম্পূর্ণ করে বুঝতে পারলেন না ডাক্তাব।

কর্কশ কণ্ঠে রাজীবলোচন বললেন,—'হ্যাঁ, এতসব কথা আমি শোনাচ্ছি। এর এক বর্ণও মিথ্যে নয়।'

'তাহলে আমি যে তোমার বড় ভাই—তোমার কাছে এসে সামান্য কিছু ভিক্ষে চাইছি—তার কি কোনও দাম নেই—আমার কথার ওপর কি তোমার এতটুকুও বিশ্বাস নেই? শুধু তোমার মনগড়া সন্দেহটাই সবচেয়ে বড়?'

দীননাথের এই অনুনয়-বিনয় আর পঙ্গু অবস্থা দেখে বোধহয় ডাক্তারের দয়া হল। তিনি রাজীবলোচনের মন ভেজাবার চেষ্টা করলেন। একটা অথর্ব লোককে দেখলে কার না দয়া হয। আর উনি তো এক মায়ের পেটের ভাই।

'সত্যি আর যাই হোক—দীননাথবাবু আপনার বড় ভাই তো বটে। ঝগড়াঝাটি যাই থাক, এখন বিপদে পড়ে যখন এসেছেন—'

'বড় ভাই বলে স্বীকার করতে আমাব লজ্জা হয় ডাক্তার,' ডাক্তারের মুখের কথা কেড়ে নিলেন রাজীবলোচন। তীব্র ঘৃণা আব আক্রোশে তার চোখ দুটি জ্বলে উঠল। বড় ভাই হয়ে, ভাই-এব কাজ কি উনি করেছেন, জিগ্যেস কব ডাক্তার—জিগ্যেস কর, বাবা কেন ওঁকে অনেক দুঃখে ত্যজ্যপুত্র করেছিলেন।'

ডাক্তারের আশ্বাস পেয়ে দীননাথ মনে-মনে বেশ জোর পেলেন। তাই ভরসা করে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বললেন, 'সে তো তোমারই কথায় রাজীবলোচন। দিনের পর দিন তাঁর কানে মন্ত্র দিয়ে শুধু আমার ওপর নয়—পিতাম্বরের ওপরও তাঁর মন তুমি বিষিয়ে দিয়েছিলে। রাগে, দুঃখে সে দেশত্যাগী হযে গেছে।'

নিজের পক্ষ সমর্থনে দীননাথকে সাফাই গাইতে দেখে রাজীবলোচনের মেজাজ আরও রুক্ষ হয়ে উঠল। উষ্মা ও বিদ্বেষের সুরে তিনি বললেন, 'শুনছ ডাক্তার, শুনছ। কি বিষ এখন ওর মনে আছে, বুঝতে পারছ?'

তাঁকে সালিশ মানায় ডাক্তার মনে-মনে বিব্রতবোধ করলেন। সম্পত্তি নিয়ে ভায়ে-ভায়ে ঝগড়াবিবাদ হয়েই থাকে। এর কোন পক্ষে রায় দেবেন ডাক্তার? এঁদের পারিবারিক দ্বন্দ্বের কতটুকু ইতিহাস তিনি জানেন, বলা যায় না। রাজীবলোচনের অনুকম্পায় 'চৌধুরিগড়ে' রিসার্চ করবার যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা তিনি লাভ করেছেন। তা ছাড়া রাজীবলোচন তাঁর সঙ্গে বন্ধুর মতোই ব্যবহার করে আসছেন—অনুগৃহীত বলে কোনওদিন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেননি। সুতরাং রাজীবলোচনের কথাকে সরাসরি উপেক্ষা করতে তাঁর বাধে।

দু-কূল রক্ষা করে একটা ভাসা-ভাসা জবাব দিলেন ডাক্তার। 'দীননাথবাবু অসুস্থ—ওঁর কথা আপনি নাই বা ধরলেন রাজীববাবু। রোগী মানুষের কি সবসময় মাথার ঠিক থাকে?'

'কিন্তু ওর নাড়িনক্ষত্র তো তুমি জানো না ডাক্তার, তাই ওর অভিসন্ধি ঠিক ধরতে পারনি। নিজের স্বার্থ আদায়ের বেলায় ওর একটুও ভুলচুক হয় না।'

তারপর দীননাথের প্রতি অনলবর্ষী দৃষ্টি-নিক্ষেপ করে রাজীবলোচন বললেন, 'কী

বললে? আমি বাবার কানে মন্ত্র দিয়েছি। তাঁর মুখে ঘৃণার রেখা ফুটে উঠল।' কিন্তু তোমার কীর্তিকলাপ জানতে কি তখন তাঁর বাকি ছিল? বারবার আমি নিজে সাবধান করিনি তোমায়?'

দীননাথ দেখলেন—রাজীবকে কড়া কথা বলে কোনও লাভ নেই। বরং এতে সাহায্য-লাভের ক্ষীণতম আশাও বিনষ্ট হবে। ডাক্তারের সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টাও বৃথা। সুতরাং আগের মতো অসহায় ভঙ্গিতে অনুতপ্ত কণ্ঠে বললেন দীননাথ, 'আমি আমার ভুল স্বীকার করছি। সত্যি, তোমার কাছে ভিক্ষে চাইতে এসে এসব কথা বলা আমার অন্যায় হয়েছে। আমায় ক্ষমা কর রাজীব, আমায় দয়া কর। আমি রুগ্ন, পক্ষাঘাতে পঙ্গু, আমার পা নেই, ডান হাতটা পর্যন্ত নেই।'

মনে হল দুঃখের চাপে এক্ষুনি কান্নায় ভেঙে পড়বেন পঙ্গু দীননাথ। সামর্থ্য হারালে—সম্বলহীন হলে—মানুষ যে কত অসহায় হতে পারে, দীননাথকে না দেখলে তা ধারণা করা যায় না।

রাজীবলোচন ভূয়োদর্শী লোক। সংসারের অনেক রূপই তিনি দেখেছেন—মানুষ যে কত মূর্তিতে—কতভাবে লোকের চোখে ধুলো দিতে পারে—রাজীবলোচনের তা অজ্ঞাত নয়। নইলে কি এত বড় সম্পত্তির ভার বাবা তাঁর উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন। দীননাথের কাতর ভঙ্গি আর অনুনয়ে রাজীবের মন একটুও ভিজল না। নির্মম, কর্কশ কণ্ঠেই তিনি তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলেন দীননাথের আবেদনকে।

'পা-নেই, হাত নেই, বিশ্বাস করি না আমি তোমার ওসব ছলনা। আমি জানি—সুবিধে পেলে তুমি আমায় খুন পর্যন্ত করতে পারো।'

'খুন পর্যন্ত করতে পারি?' একটা কঠিন আঘাত পেয়ে দীননাথ যেন মুষড়ে পড়লেন। তাঁর কণ্ঠে নিতান্ত অসহায়, করুণ সুর ফুটে উঠল।

'হা ভগবান' মানুষের করুণা আর মহত্বে দীননাথ সব বিশ্বাস হারিয়েছেন। একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া তাঁর এই অবর্ণনীয় দুঃখ-বেদনার কাহিনি জানাবার আর দ্বিতীয় পাত্র নেই। দীননাথ পঙ্গু, বিকলাঙ্গ। আজ ছোটভায়ের কাছে তিনি হিংস্র পশুর চেয়ে ভয়ঙ্কর! স্নেহ নেই, দয়া নেই, মমতা নেই, ক্ষমা নেই—শুধু অবিশ্বাস আর সন্দেহ, শুধু বিদ্বেষ আর বিদ্রুপ! নিজের পঙ্গু দেহটার প্রতি ডাক্তারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সহানুভূতি লাভের চেষ্টা করলেন দীননাথ।

'তুমি তো আমায় পরীক্ষা করেছ ডাক্তার, তুমি তো বলতে পারো, সত্যি হাত-পা পক্ষাঘাতে আমার পঙ্গু কি না?'

'চৌধুরিগড়ে' আসার পর ডাক্তার দীননাথকে পরীক্ষা করেছিলেন। এই ব্যাপারে দীননাথেরই আগ্রহ ছিল বেশি। কারণ—এখানে এসেই তিনি যখন শুনলেন ডাক্তারের প্রতি রাজীবলোচনের গভীর আস্থা—তখন নিজের পক্ষাঘাত সম্পর্কে ডাক্তারের কাছ থেকে পাকাপাকি সার্টিফিকেট জোগাড় করবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলেন দীননাথ। তা হলে অন্তত তাঁর অসুস্থতা সম্পর্কে রাজীবলোচনের মনে কোনও সন্দেহের অবকাশ থাকবে না। আর পক্ষাঘাতে পঙ্গু, রুগ্ন দেহটাই তো রাজীবলোচনের সহানুভূতি আকর্ষণের শেষ সম্বল। দীননাথের পক্ষাঘাত সম্পর্কে ডাক্তার নিঃসন্দেহ হয়েছিল। সুতরাং তিনি দীননাথের কথার উপর জোর দিয়েই বললেন—'হ্যাঁ রাজীববাবু, Paralysis-টা ওঁর অন্তত যে সত্যি, তা আমি পরীক্ষা করে দেখেছি।'

রাজীবলোচনের মুখে এক ঝলক বিদ্রুপের হাসি ফুটে উঠল। কথা কেড়ে নিয়ে তিনি

বললেন, 'শরীরটা শুধু পরীক্ষা করেছ ডাক্তার, মন পরীক্ষা করে তো দ্যাখনি। ওর মনে কী শয়তানি, তা তুমি ভাবতেও পারো না। ভালো করে আমাদের দুজনের দিকে চেয়ে দেখ দিকি।'

ডাক্তার দুজনের মুখের দিকেই তাকালেন। হ্যাঁ—মিল আছে বইকী। বয়সেব ছাপ আর একগাল দাড়ি সত্ত্বেও দীননাথ আর রাজীবলোচনের চেহারায় অদ্ভুত সাদৃশ্য বর্তমান।

রাজীবলোচন বাঁকা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, 'মিল কিছু পাও?'

রাজীবলোচনের মনে দীননাথ সম্পর্কে বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস এমনই বদ্ধমূল হয়েছে, যে দীননাথের সব কিছুকেই তিনি সন্দেহের চোখে দেখছেন।

ডাক্তার সহজভাবেই জবাব দিলেন 'মিল তো যথেষ্ট আছে বলে মনে হচ্ছে।'

ডাক্তার খুব সতর্কভাবে অভিমত দিলেন। তাঁর এমন কিছু মন্তব্য করা উচিত নয়—যা উপলক্ষ করে দীননাথের ওপর আরও নির্মম হতে পারেন রাজীবলোচন।

দীননাথেব শয়তানির মুখোশ ধীবে-ধীরে খুলে ধরবার চেষ্টা করছেন রাজীব। ডাক্তার বাইরের লোক—দীননাথের স্বরূপ তাঁর জানা নেই। এই জন্যেই রাজীব—দীননাথের শয়তানির মুখোশ খুলে ধববাব জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছেন। ভুল কবে দীননাথের সত্যিকার স্বভাব না জেনে—ডাক্তার যেন দীননাথের প্রতি অহেতুক সহানুভূতিসম্পন্ন না হয়ে ওঠে।

'জানো ডাক্তার—এই মিলের সুযোগ নিয়ে একদিন ও আমায় জেলে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিল? জানো—রাজীবলোচন সেজে এক জায়গা থেকে ঠকিযে ও টাকা ধার করে এনেছিল?'

দীননাথ মৃদু আপত্তি কবে বললেন, 'ওসব কথা আর কেন রাজীব?'

'কী, যা বলছি—তা সত্যি কি না বল।' বহুদিন পরে অপরাধীকে হাতেব নাগালের মধ্যে পেয়েছেন রাজীবলোচন। দীননাথ যেখানে বসেছিলেন—তাঁর সন্নিহিত হয়ে দাঁড়ালেন রাজীবলোচন। ডাক্তার কী একটা কাজেব অছিলায় পাশেব ঘবে গেলেন।

'কই, উত্তর দাও।'

দীননাথ জানেন—প্রতিবাদ করে লাভ নেই। বরং রাজীবলোচনের মন যদি একটুও করুণার্দ্র হয়ে থাকে—এতে তাও নিঃশেষে লুপ্ত হয়ে যাবে। তা ছাড়া অভিযোগ এক বিন্দুও মিথ্যে নয়। জীবনে বহু অপকীর্তিই করেছেন দীননাথ। আজ দুরারোগ্য ব্যাধির রূপ নিয়ে ভগবানের সে অভিশাপই নেমে এসেছে তার জীবনে। দুঃখ-বেদনায়-অনুতাপে মাটির সঙ্গে যেন মিশে যাচ্ছেন দীননাথ—তেমনিভাবে বললেন, 'উত্তর আর কী দেব। যা বলেছ, তা সবই সত্যি। অনেক অন্যায়ই সেদিন আমি করেছি, আজ তার শাস্তিও ভোগ করছি। আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে, যেকটা দিন বাঁচি, রাস্তায় দাঁড়িয়ে যেন ভিক্ষা করতে না হয়, শুধু এটুকু দয়া আমাকে কর।'

'দয়া করব?' বিদ্রুপ তীক্ষ্ণ হাসিতে বললেন রাজীবলোচন। 'না, আমার মনে তোমার প্রতি একবিন্দু দয়াও আর অবশিষ্ট নেই। তোমার ওই অভিনয়ে ভুলে—অর্ধেক সম্পত্তি তোমায় উড়িয়ে দিতে দেব যদি মনে করে থাকো—তা হলে গোড়াতেই তুমি ভুল করেছ। বাবার অন্তিম ইচ্ছার অপমান আমি করব না। তোমাদের হাতে পাছে সম্পত্তি নষ্ট হয়—এই ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় ভয়। তাঁরই সম্মান রাখবার জন্য সমস্ত সম্পত্তি আমি হাসপাতালের জন্য দান করে যাচ্ছি। আর ওই ডাক্তারই হবে আমার মৃত্যুর পর তার ট্রাস্টি।'

দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ল দীননাথের।

'হাসপাতালে তোমার গরিব-দুঃখী রুগিরাই তো থাকবে রাজীব। আমি কি তাদের চেয়েও অধম?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি তাদের চেয়েও অধম। আমারই কাছে ভিক্ষা করতে আসার ছলে— তারা অন্তত আমার সর্বনাশের চেষ্টা করবে না।'

দীননাথ আগের মতোই শান্ত এবং করুণ কণ্ঠে বললেন, 'বারবার ওকথা কেন বলছ রাজীব। আমি তোমার কী সর্বনাশের চেষ্টা করেছি? যাকে খুশি—তুমি তোমার সব সম্পত্তি দান করে দাও। আমি আপত্তি করব না। শুধু বড়-ভাই বলে—জীবনের শেষ কটা দিন আমায় কিছু ভিক্ষা দাও, এই আমার অনুরোধ।'

দীননাথের প্রতি ক্রূর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন রাজীবলোচন, 'ভিক্ষে দাও! ভিক্ষে চাইবার জন্যই কি তুমি এখানে এসেছ? না, আমি তোমায় একবিন্দু বিশ্বাস করি না।'

এই বলতে-বলতে রাজীবলোচন পাশের ঘরে ডাক্তারের উদ্দেশে বললেন, 'কাউকে আমি বিশ্বাস করি না ডাক্তাব। কাউকে না। সেই, সেই নার্স—সেই অণিমা কোথায়?'

ডাক্তার ভেতরে এসে বললেন, 'সে একদিনের ছুটি নিয়ে কলকাতায় গেছে—আজই আসবে।'

রাজীবলোচনের এই সন্দেহপ্রবণতায় ডাক্তার খুবই বিব্রতবোধ করলেন।

'ওকে মাইনে চুকিয়ে একেবারে বিদেয় দিতেই তো বলেছি। অসুখের সময় কাজ করেছিল ব্যস। এখন তার আর এ-বাড়িতে থাকার কী দরকার?'

'না কোনও দরকার নেই।' চটপট জবাব দিলেন ডাক্তার। 'কাল-পরশুর মধ্যেই মাইনে নিয়ে সে চলে যাবে।' তারপর রাজীবলোচনের অমূলক শঙ্কা ও সন্দেহ দূর করবার জন্য ডাক্তার পরম নিশ্চিন্ত ভাব টেনে বললেন, 'কিন্তু রাজীববাবু—আপনি অকারণে একটু বেশি বিচলিত হচ্ছেন না কি?

'অকারণে নয় ডাক্তার, অকারণে নয়।' ভীত, সন্ত্রস্ত কণ্ঠে রাজীব বললেন, 'যেন আসন্ন কোনও বিপদজালে তিনি ভীষণভাবে জড়িয়ে পড়বেন। আমি জানি ডাক্তার একটা ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র আমার চারধারে জট পাকিয়ে উঠেছে। তবে আমিও প্রস্তুত।'

একটা দেরাজ খুলে একটা পিস্তল ও ছুরি বাব করে তিনি বললেন, 'এই দেখ ডাক্তার—দেখতে পাচ্ছ—এদের আমি কাছ ছাড়া করি না। হ্যাঁ, আমিও তৈরি। তা ছাড়া, তা ছাড়া, কী করেছি জানো, কলকাতার সবচেয়ে নামজাদা প্রাইভেট ডিটেকটিভ—আমায় পাহারা দেওয়ার জন্য চৌধুরিগড়ে আসতে রাজি হয়ে তার করেছেন। তাঁকে আনবার জন্য আমি সরকারকে পাঠিয়েছি। সে আসছে ডাক্তার, সে আসছে।'

কল্পিত ষড়যন্ত্রের আশঙ্কায় উত্তেজিত রাজীবলোচনের চোখে-মুখে যেন নির্ভরতা ও স্বস্তির ভাব ফুটে উঠল! গুপ্তশত্রুদের বিরুদ্ধে সর্বতোভাবে নিজকে সুরক্ষিত করেছেন রাজীবলোচন। ভালোমানুষির মুখোশ পরে কেউ তাঁর চোখে ধুলো দিতে পারবে না, বুদ্ধির যুদ্ধে কেউ তাঁর ওপর টেক্কা দিতে পারবে না, শয়তানের কূট কৌশলকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্যই তাঁর এই কঠোর সতর্কতা, আত্মরক্ষার এমন নিখুঁত প্রস্তুতি।

কিন্তু ডাক্তার এসবের কোনও হদিস খুঁজে পাচ্ছিলেন না। দীননাথ আসার পর থেকেই রাজীবলোচন যেন আকাশে-বাতাসে ষড়যন্ত্রের আভাস পাচ্ছিলেন, কিন্তু বিকলাঙ্গ দীননাথ সত্যিই এমন ভয়ঙ্কর লোক, আর রুগ্ন, পঙ্গু দেহ নিয়ে কতটুকুই বা তাঁর অনিষ্ট করবার ক্ষমতা?

রাজীবলোচন রিভলবার আর ছুরি নিয়ে তৈরি হয়ে আছেন, গুপ্তশত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ করবার জন্য, তাঁকে পাহারা দেওয়ার জন্য কলকাতা থেকে আসছে নামকরা প্রাইভেট ডিটেকটিভ, সবই যেন ক্রমশ দুর্বোধ্য আর রহস্যময় হয়ে উঠেছে ডাক্তারের কাছে। সম্ভবত চৌধুরিগড়ের ইতিহাসই তাই।

তিন

সুরজিৎ রায়কে সুখচরে নিয়ে যাওয়ার জন্য সরকারমশাই যথাসময়েই এসে হাজির হয়েছেন। যজ্ঞেশ্বর চৌধুরি বেঁচে থাকতেই সরকার চাকরিতে বহাল হয়েছিলেন। এ-বাড়ির খুবই বিশ্বস্ত এবং কর্মঠ কর্মচারী সরকার। কাজে তাঁর একটুখানি খুঁত এই বুড়ো বয়সেও কেউ বার করতে পারেনি। তাই রাজীবলোচন সব গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব সরকারের ওপর চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারতেন। চৌধুরি-পরিবারের নিমক খেয়েছেন সরকার, নিজের কর্মদক্ষতার গুণে সে নিমক ষোলো আনাই হালাল করেছেন সরকার।

বলরাম সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জিনিসপত্র সব জড়ো করছিল। সুরজিৎ জিগ্যেস করলে, 'পৌঁছতে কি খুব দেরি হবে সরকারমশাই?'

সাদা চুলে আঙুল বুলিয়ে টেনে-টেনে বললেন সরকার, যেন সুরজিতের আসন্ন পথশ্রমে তাঁর নিজেরই কষ্ট হচ্ছে। 'আজ্ঞে, তা বেশ একটু রাত হয়ে যাবে। স্টেশন থেকে প্রায় মাইল চল্লিশ যেতে হবে। মোটর থাকলেও, রাস্তা বড় খারাপ। তাছাড়া কর্তাবাবু তো লোকালয়ের মধ্যে থাকেন না। থানাগঞ্জ সব ছাড়িয়ে, প্রায় তেপান্তরের মধ্যে এক সেকেলে গড়-এর মতো বাড়িতে থাকেন।'

সিগারেটে একটা দীর্ঘ টান দিয়ে মন্তব্য করল সুরজিৎ, 'হুঁ। বেশ একটু খেয়ালি লোক বলেই মনে হচ্ছে।'

সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন সরকার।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, তা বলতে পারেন। কিন্তু আর আলোচনা নয়। পৌঁছতে এমনি রাত্রি হবে।' বলরামকে তাড়া দিলেন সরকার, 'কই হে চল, চল...'

'এই যে সরকারমশাই, আমি তৈরি..'

সুরজিৎ আগে বেরিয়ে গেল। পিছনে সরকার এবং জিনিসপত্র হাতে নিয়ে বলরাম।

ট্রেন ছুটে চলেছে। সিগারেটের পর সিগারেট পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে, ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশের দিকে লয় হয়ে যাচ্ছে, সুরজিতের কোনওদিকে খেয়াল নেই। সেকেন্ড ক্লাসের জানালায় হেলান দিয়ে সে গভীর চিন্তায় ডুবে আছে। সমস্ত ঘটনাগুলো সে মনে-মনে সাজিয়ে একটা সুসম্বদ্ধ অর্থ বার করবার চেষ্টা করছিল। প্রাইভেট ডিটেকটিভের অফিসে হঠাৎ এসে হাজির হল এক অপরিচিতা, সুন্দরী তরুণী—ন্যায্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে চুরি করবার অনুরোধ নিয়ে। বাস্তবিক সে এই কয়বৎসরে বহু জটিল রহস্যেরই গ্রন্থিমোচন করেছে, কিন্তু এ ধরনের অদ্ভুত দাবি নিয়ে কেউ কোনওদিন তার কাছে আসেনি। খুন-খারাবির কিনারা নয়, চুরি-ডাকাতি কী গুম করার ব্যাপার নয়, একেবারে সুখচরে কী একটা কিছু চুরি করতে হবে। অথচ তার খানিকক্ষণ পরেই সেই সুখচরেরই এক রাজীবলোচন চৌধুরির তার এল, জীবন বিপন্ন। তাঁকে পাহারা দেওয়ার জন্য সুরজিতের সাহায্যের প্রয়োজন। এই দুই ব্যাপারের মধ্যে যে একটা যোগসূত্র রয়েছে, তা স্পষ্টই বুঝতে পারা যাচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, অণিমা কী চুরি করতে চায়, যার জন্য সে সুরজিতের সাহায্য প্রার্থনা করেছিল, আর সে চুরির

ব্যাপারে কীভাবে রাজীবলোচন চৌধুরির জীবন বিপন্ন হতে পারে? সকলের আগে তাকে জেনে নিতে হবে, অণিমার সঙ্গে রাজীবলোচনের কী সম্পর্ক? তা ছাড়া রাজীবলোচন কি সামান্য একজন মেয়ের ভয়ে নিজের জীবন বিপন্ন বোধ করছেন আর তার জন্য প্রচুর টাকা খরচ করে তাঁকে পাহারা দেওয়ার উদ্দেশে কলকাতা থেকে ডিটেকটিভ আনাচ্ছেন। তবে কি অজ্ঞাতপরিচয় সেই মেয়েটির চুরি করাবার প্রস্তাবের সঙ্গে এব্যাপারের কোনও সম্পর্ক নেই? সবই তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল। সুরজিৎ ঝানু গোয়েন্দা। অতি ক্ষীণ সূত্র ধরেও কীভাবে বিরাট রহস্যের সন্ধান পাওয়া যায়, এমন বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা তার জীবনে হয়েছে। সরকারের সঙ্গে আলাপ করে যতটুকু বুঝতে পেরেছে, তাতে সুরজিতের ধারণা হয়েছে, রাজীবলোচন চৌধুরি খুবই শৌখিন আর খেয়ালি লোক। এমন হতে পারে, পৃথিবীর কোনও দেশের কোনও দুষ্প্রাপ্য মহামূল্য রত্ন রাজীববাবুর কাছে আছে, শত্রুরা তা আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করছে, এবং এই ব্যাপার নিয়েই তিনি প্রতি মুহূর্তে বিপদের আশঙ্কা করছেন। কিন্তু এসবই তো সুরজিতের অনুমান। সুখচরে না পৌঁছনো পর্যন্ত কোনও অনুমানেরই প্রামাণ্য স্বীকৃতি পাচ্ছে না সুরজিৎ। তবে, ঘটনার যোগাযোগ দেখে মনে হয়, এর ভিতরে গভীর রহস্য আছে এবং শুধু এই কারণেই অন্যসব জরুরি কাজ বাদ দিয়ে সুখচরে যেতে রাজি হয়েছে সুরজিৎ।

সুখচরের সুন্দরী তরুণী—বিপদ থেকে রক্ষা করবার জন্য নয়, নিজের মানসম্ভ্রম বিপন্ন বলে নয়, এল কিনা চুরি করাবার মতলব নিয়ে! ইউরোপে বহু নারীদস্যু আর নারীতস্করের কাহিনি শুনেছে সুরজিৎ, কিন্তু এই বাংলাদেশে? সত্যিই, ব্যাপারটা বাস্তবিকই রহস্যজনক।

মাঝরাত্রে ট্রেন থেকে নেমে তারা মোটরে চাপল। পূর্ব-নির্দিষ্ট ব্যবস্থামতো সোফার মোটর নিয়ে তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। সুরজিৎ, সরকার, বলরাম, কারও মুখে কথা নেই। সবাই যত সত্বর সম্ভব 'চৌধুরিগড়ে' পৌঁছবার জন্য ব্যাকুল। তাদের নিয়ে দ্রুতবেগে মোটর ছুটল সুখচরের দিকে।

গ্রামের কাঁচা রাস্তা, মোটর বারবার ধাক্কা খেয়ে দুলে উঠছিল। অন্ধকার রাত্রি। হাত মেললে হাত দেখা যায় না। দুর্ঘটনা না ঘটলেই রক্ষা। সরকার মনে-মনে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন।

'খুব হুঁশিয়ার হয়ে গাড়ি চালিও ড্রাইভার, পথঘাট ভালো নয়।' সরকার সাবধান করলেন।

সুখচরের পথঘাট ড্রাইভারের নতুন নয়, আর রাজীবলোচনের মোটর চালাচ্ছে সে বহুদিন। ড্রাইভার কোনও জবাব দিল না। মোটর বারবার ঝাঁকুনি খেয়ে কেঁপে উঠছিল। শুধু পাকা ড্রাইভার বলেই বোধ হয় অঘটন কিছু ঘটল না। ভগবানের কৃপায় তাঁরা প্রায় পৌঁছে গেছেন। ওই চৌধুরিগড়ের অস্পষ্ট আলো দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু যেখানে রাত হয়, সেখানেই বাঘের ভয়। হঠাৎ বিকট শব্দ করে ইঞ্জিন থেমে গেল। ড্রাইভার চট করে নেমে গিয়ে ইঞ্জিনের ঢাকনি খুলে কলকব্জা পরীক্ষা করবার জন্যে ঝুঁকে পড়ল।

সুরজিৎ জিগ্যেস করলে, 'কী হে, একেবারেই বিগড়াল নাকি?'

মাথা না তুলে ড্রাইভার জবাব দিলে, 'আজ্ঞে, ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে একটু দেরি হবে, স্যার।'

সুরজিৎ ও সরকার মোটর থেকে নেমে পড়ল। 'চলুন, হেঁটেই যাই সরকারমশাই।

ওই তো আপনাদের বাড়ির আলো দেখা যাচ্ছে। বলরাম মালপত্র নিয়ে মোটরে আসবে।'

'হেঁটে যাবেন?' ইতস্তত করে বললেন সরকার, 'আচ্ছা, তাই চলুন।'

চৌধুরিগড়ের অস্পষ্ট আলোক-শিখাগুলি এতক্ষণ যেন নিষ্প্রভ হয়েছিল, এইবার ধীরে-ধীরে সে আলো স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা ফিরে পেল। সুরজিৎ জিগ্যেস করলে, 'আলোগুলো ওরকম হল কেন সরকারমশাই!'

সরকার নিজেও অবাক হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু সোজাসুজি সেকথা স্বীকার না করে ঘুরিয়ে শুধু বললেন, 'বুড়োকর্তা, বেঁচে থাকতে এই বাড়ি কিনেছিলেন। এর অর্ধেকটা গড়, অর্ধেকটা বাড়ি। কবে যে এ গড় তৈরি হয়েছিল, তা কেউ বলতে পারে না। সম্ভবত আমাদের জন্মের বহু আগে কোনও সেকালের রাজারাজড়া এ গড় তৈরি করিয়েছিলেন। এখন ভেবে দেখুন, কত বছরের পুরানো এই গড়। অ্যাদ্দিন ধরে আছি, তবু এর হাল-চাল সব বুঝতে পেরেছি, এমন বড়াই করিনে। এই গড় সম্পর্কে অনেকে অনেক কথাই বলে সুরজিৎবাবু। কিছুদিন সুখচরে থাকলে আপনি তা নিজেই শুনতে পাবেন।'

সুরজিৎ সংক্ষিপ্তভাবে বললে, 'হুঁ।'

আর কোনও কথা না বলে তারা নিঃশব্দে গড়ের দিকে এগিয়ে চলল।

গভীর রাত্রি। চারদিকে কেমন যেন একটা থমথমে আবহাওয়া। ফটক অতিক্রম করে সুরজিৎ ও সরকার বাড়ির ভিতর ঢুকল।

'এই দিকে আসুন, দোতলায় কর্তাবাবুর ঘর।' সরকার বললেন।

অন্ধকারে ভালো করে কিছুই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। সরকারকে অনুসরণ করলে সুরজিৎ।

'সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে হঠাৎ একটা অদ্ভুত চিৎকার শুনতে পেল সুরজিৎ ও সরকার। তারা দুজনেই চমকে উঠল।

সরকার চাপা গলায় বললেন, 'একটু পা চালিয়ে আসুন সুরজিৎবাবু, হয়তো একটা কিছু...' সরকার চুপ করলেন।

দোতলার বারান্দায় তাঁরা লোকজনেব দ্রুত পায়ের শব্দ শুনতে পেলেন। বাজীবলোচনের শয়নকক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে সবাই ভিড় করেছে। কীসের চিৎকার? এত রাত্রে কে এমন ভাবে চেঁচিয়ে উঠল? 'আলো—আলো কোথায়, সুইচটা টিপুন না...' সবাই একসঙ্গে কোলাহল শুরু করল। সরকার তৎপরতার সঙ্গে সুইচ টিপলেন। আলো জ্বলতেই ডাক্তার উদ্বিগ্নভাবে প্রশ্ন করলেন, 'কি ব্যাপার কী, চিৎকার করলে কে?'

সরকার বললেন, 'আজ্ঞে আমি তো এই আসছি, কিছুই জানি না।'

চিনা পাচককে লক্ষ করে জেরা করলেন ডাক্তার, 'তুমি, তুমি কিছু দেখেছ?

চিনা পাচক অসম্মতিসূচক মাথা নাড়লে।

'কেউ কিছু দেখেনি, অথচ এত রাত্রে হঠাৎ এমনভাবে বিকট চিৎকার করলে কে?' ডাক্তার বললেন বিস্মিত কণ্ঠে।

সুরজিৎ চুপ করে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ করছিল। এবার সে প্রথম কথা কইলে।

'এটা তো রাজীববাবুর ঘর মনে হচ্ছে,' রাজীবলোচনের শয়নকক্ষের দিকে সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল সুরজিৎ, 'কিন্তু তাঁকে তো দেখছিনে, তিনি কোথায়?'

ীবলোচনের ঘর অন্ধকারাচ্ছন্ন, শুধু সামনের বারান্দায় একটা কম জোরের আলো জ্বলছে। তাতে ঘরের দরজার খানিকটা অংশ আলোকিত হয়েছে মাত্র। সুরজিতের কথায় সবারই দৃষ্টি ওই ঘরের দিকে আকৃষ্ট হল।

এমনসময় পঙ্গু দীননাথ এসে হাজির হলেন।

'কী হয়েছে? রাজীবের চিৎকার শুনলাম যেন?' সবাই তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলেন। সুতরাং দীননাথের কথার জবাব কেউ দিলেন না।

কপাটের পেছনে কী একটা জিনিস পড়ে থাকতে দেখে ডাক্তার হঠাৎ দ্রুত এগিয়ে গেলেন। 'ওখানে ওটা কী...'

সবাই এগিয়ে গেল। ঘর যে অন্ধকার, একথা উত্তেজনার মুখে কারও মনেই ছিল না।

সরকার দ্রুত সুইচ টিপে আলো জ্বাললেন। সবাই আতঙ্কে, বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে দেখলে নতজানু হয়ে রাজীবলোচনের ভূলুণ্ঠিত দেহের ওপর ঝুঁকে পড়ে ডাক্তার তাঁকে পরীক্ষা করছেন। কারও মুখে টুঁ-শব্দটি পর্যন্ত নেই। সবাই ডাক্তারের অভিমতের অপেক্ষা করছে। ডাক্তার ক্ষিপ্রতার সঙ্গে রাজীবলোচনের নাড়ি ধরলেন, বুক পরীক্ষা করলেন, তারপর রক্তাক্ত ছুরিখানার দিকে একবার তাকালেন।

সবাই ঘরে প্রবেশ করে রাজীবলোচনের মৃতদেহকে ঘিরে দাঁড়াল। ডাক্তার বললেন, 'He is dead, murdered.'

দীননাথ প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন, 'খুন হয়েছে, রাজীব খুন হয়েছে!'

মনে দারুণ আঘাত পেয়ে অবসন্ন দেহে পাশের সোফায় হাত-পা ছেড়ে দিয়ে এলিয়ে পড়লেন দীননাথ। কোলাহল শুনে অণিমা ছুটে এল।

'কে খুন হয়েছে, রাজীববাবু?' অণিমা সামনে এগিয়ে এল। সুরজিৎ নীরবে অণিমার মুখের দিকে শুধু একবার তাকিয়ে রাজীবলোচনের মৃতদেহ পরীক্ষা করতে আরম্ভ করল।

'প্রাণ নেই বলেই মনে হচ্ছে, তবু একজন ডাক্তার ডাকতে পারলে ভালো হতো না কি?'

ডাক্তার ঈষৎ অবজ্ঞাভরে বললেন, 'আমিই একজন ডাক্তার। পরীক্ষা করবার আর কিছু নেই। He is absolutely dead. ছুরিটা একেবারে বুক ভেদ করে চলে গেছে।'

সুরজিৎ গম্ভীরভাবে বললে, 'তার মানে সামনে থেকেই ছুরি মারা হয়েছে, এবং খুন যে করেছে, সে একজন Strong person সবল লোক।'

'তাইতো মনে হয়। কিন্তু এগুলো বোধহয় পুলিশেরই আলোচনার বিষয়। তাদের একবার খবর পাঠানো এক্ষুনি দরকার।' ডাক্তার উঠে দাঁড়ালেন, সরকারকে লক্ষ করে বললেন, 'পুলিশকে এক্ষুণি খবর দেওয়ার ব্যবস্থা করুন সরকারমশাই—শুনতে পাচ্ছেন, পুলিশকে খবর পাঠান।'

এই আকস্মিক ঘটনায় সরকার হতভম্ব হয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন। কর্তাবাবু খুন হয়েছেন, চোখের সামনে মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেও সহসা বিশ্বাস করতে পারছেন না সরকার। ডাক্তারের তাগিদে সরকারের চেতনা ফিরে এল। নিজেকে সামলে তিনি বিহ্বলভাবে বললেন, 'আজ্ঞে, তা পাঠাচ্ছি, কিন্তু থানা তো সেই আর-এক রাজ্যে। তা ছাড়া, গাড়িটাও খারাপ হয়েছে। খবর নিয়ে থানায় পৌঁছোতেই সকাল হয়ে যাবে।'

সুরজিৎ জোর দিয়ে বললে, 'তা হলেও খবর এখুনি পাঠানো দরকার।' তারপর ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে সুরজিৎ বললে, 'আপনি শুধু দেখবেন ডাক্তারবাবু, এ ঘরের জিনিস যেমন আছে, তেমনই থাকবে, কেউ যেন না ছোঁয়। এখন কয়েকটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?'

ডাক্তার বাঁকাসুরে জবাব দিলেন, 'তার আগে, আপনার জিগ্যেস করবার অধিকারটা আমরা জানতে পারি?'

প্রশান্ত হাসিতে সুরজিৎ বলল, 'আমার অধিকার?' সরকার তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন,—'আজ্ঞে, উনিই সেই ডিটেকটিভ সুরজিৎবাবু। কর্তা ওঁকে আনতেই আমাকে কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন।'

সরকারের এই কথায় ডাক্তারের চোখে-মুখে বিরক্তির রেখা ফুটে উঠল। তিনি তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন, 'ওঃ তা বেশ করুন, কী জিগ্যেস করতে চান।'

ডাক্তারের বিরক্তি ও তাচ্ছিল্যের ভাব উপেক্ষা করে সুরজিৎ জিগ্যেস করলে, 'এখানে যাঁদের দেখছি, তাঁরা ছাড়া আর কেউ কি এ-বাড়িতে আছেন?'

ডাক্তার কথা কইবার আগেই সরকার জবাব দিলেন, 'আজ্ঞে না। জনকয়েক চাকর ছাড়া আর কেউ নেই। আর চাকররাও বার-বাড়িতে থাকে।'

সুবজিৎ বলল, 'তা হলে এই কজনই আপনারা এ বাড়িতে থাকেন। আচ্ছা, চাকরদের এখন যেতে বলতে পারেন।'

সরকারমশাই-এর ইঙ্গিতে চাকররা চলে গেল। ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল সুরজিৎ, 'আপনি তো ডাক্তার শুনলাম।'

ডাক্তার অতিরিক্ত তৎপরতার সঙ্গে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, গত এক বছর ধরে রাজীববাবুর Personal Physician হয়ে আমি এখানে আছি।' একটু থেমে শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠে ডাক্তার জিগ্যেস করলেন, 'আর কিছু জানতে চান?'

'না'—বলে সুরজিৎ অণিমাব দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনি রাজীববাবুর কে হন?'

অণিমা ভ্রুকুটি করে বলল, 'কেউ নই।'

অণিমা এমনভাবে জবাব দিলে যেন রাজীববাবুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের প্রশ্নটাই অবান্তর আর সুরজিতের যেন তা জানা উচিত। কিন্তু তার সংক্ষিপ্ত জবাবে সুরজিতের কাছে অণিমার এই বাড়িতে থাকার হেতু স্পষ্ট হল না। সুরজিতের ভ্রূ-কুঞ্চিত হল। কিন্তু আর কিছু জিগ্যেস করবার আগেই সরকারমশাই অবস্থাটা বুঝিয়ে বললেন, 'উনি কর্তার অসুখের সময় নার্সিং করতে এসেছিলেন, আজ-কালের মধ্যেই ওঁর চলে যাওয়ার কথা।'

সুরজিৎ চুপ করল। অনেকগুলো ভাবনার স্রোত এসে তার মনে তরঙ্গের সৃষ্টি করল। সে শুধু গম্ভীরভাবে বলল, 'হুঁ।' তারপর দীননাথকে লক্ষ করে জিগ্যেস করল, 'আর উনি?'

দীননাথ যেন এ-বাড়ির কোনও ব্যাপারেই সংশ্লিষ্ট নন, তেমনি নিরপেক্ষভাবে বললেন,—আমি রাজীবের দাদা, দিন সাতেক হল এখানে এসেছি।'

'ওঃ, আচ্ছা, রাজীববাবুর সঙ্গে শেষ আজ কার দেখা হয়েছে বলতে পারেন?' সকলের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাদের মনের ভাব বুঝবার চেষ্টা করল সুরজিৎ।

এই প্রশ্নে মুহূর্তের জন্যে সবাই নিশ্চুপ হয়ে রইলেন। মনে হল সবাই অস্বস্তিবোধ

করছেন। এ ধরনের প্রশ্নের জন্য কেউ প্রস্তুত ছিলেন না। সবাই পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন।

ডাক্তারই প্রথম কথা বললে, 'চুপ করে আছেন কেন দীননাথবাবু, বলুন সুরজিৎবাবুর প্রশ্নের জবাব দিন।'

দীননাথ তাঁর কম্পিত হাত তুলে বললেন, 'আমি, আমি কী বলব?' ডাক্তারের বেয়াড়া প্রশ্নে তিনি বড্ড বেকায়দায় পড়ে গেছেন বলে মনে হল।

ডাক্তারের দৃষ্টি ঈষৎ বাঁকা হল। বললেন, 'কী বলবেন জানেন না? কার সঙ্গে রাজীববাবুর শেষ দেখা হয়েছিল? এ-ঘটনার কিছুক্ষণ আগে আপনি এ-ঘরে এসেছিলেন কি না। আমি নিজে আপনাকে বেরিয়ে যেতে দেখেছি এখান থেকে।' ডাক্তারের তীক্ষ্ণ অথচ স্পষ্ট প্রশ্নের সামনে যেন খান-খান হয়ে ভেঙে পড়লেন বৃদ্ধ দীননাথ। অপ্রস্তুতভাবে বললেন, 'হ্যাঁ, এসেছিলাম বইকী। এসেছিলাম। রাজীব কিছু মাসোহারার কথা বলবার জন্য আমাকে একবার ডেকে পাঠিয়েছিল। কিন্তু ভগবান জানেন, তখনও কোনও কিছু হয়নি—কোনও কিছু হয়নি।' আত্মপক্ষ সমর্থনে শেষের কথাগুলো বিশেষ জোর দিয়ে বললেন দীননাথ।

সুরজিৎ এতক্ষণ দুজনের মনের ভাব বুঝবার চেষ্টা করছিল। এবার সে দীননাথকে জিগ্যেস করল, 'মাপ করবেন। একটা কথা। আপনার ডান হাতটা কি একটু Paralysed?'

দীননাথ যেন এতক্ষণে দাঁড়াবার একটু ঠাঁই পেলেন। 'হ্যাঁ, এই ডান হাত আর পা। আমি কিন্তু সত্যি এ-ব্যাপারে কিছু জানি না।

সকলের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে তারপর দীননাথকে লক্ষ করে সুরজিৎ বলল, 'অন্তত এ-খুন যে আপনার দ্বারা অসম্ভব, এটুকু বিশ্বাস করা যেতে পারে।' তারপর ডাক্তারকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'শুনুন ডাক্তারবাবু, এ-খুন যেই করে থাক, সে শুধু সবল লোক নয়, ডান হাতেই যে ছুরি চালিয়েছে, ক্ষতস্থান থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। সুতরাং দীননাথবাবুকে খুনের সন্দেহ থেকে অন্তত মুক্তি দিতে পারেন।'

সুরজিতের দৃষ্টি পড়ল চিনা পাচকের ওপর। অদ্ভুতবেশি লোকটা নির্বোধের মতো দাঁড়িয়ে তাদের কথা শুনছে। সুরজিৎ জিগ্যেস করল, 'এটি কে?'

কেউ জবাব দেওয়ার আগেই পাচকটি তার নিজস্ব ভঙ্গিতে কিচ-কিচ করে উঠল। 'চান চুং লিনা সাং' সে ভাষার মর্মোদ্ধার অসম্ভব।

সরকার পরিচয়টা সম্পূর্ণ করলেন, 'ও আমাদের চিনে রাঁধুনি। কর্তার কাছে অনেক বছর ধরে আছে।'

'অনেক বছর ধরে আছে?' কথাটা পুনরাবৃত্তি করল সুরজিৎ। সঙ্গে-সঙ্গে তার চিন্তাধারা একটা সিদ্ধান্তের রূপ নিল। সে বলল, 'সরকারমশাই, ওকে যেতে বলতে পারেন।'

ইঙ্গিত পেয়ে চিনা পাচক স্থান ত্যাগ করল। সুরজিৎ এবার মন্তব্য করল, 'এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায় থাকলেও, রাজীববাবু খুব শৌখিন লোক ছিলেন মনে হচ্ছে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, বিয়ে-থা করেননি, নিজের নানারকম শখ আর খেয়াল নিয়েই কাটাতেন।' সরকার জবাব দিলেন।

সুরজিৎ গম্ভীরভাবে বলল, 'আচ্ছা, এ ঘর আমি তালা দিয়ে যাচ্ছি। পুলিশ না আসা পর্যন্ত সে তালা আর খোলা হবে না। আর আমার অনুরোধ, আপনারা কেউ এ-বাড়ি থেকে যেন আজ বাইরে না যান।'

সুরজিৎ এই বলে সরকারের কাছ থেকে তালাচাবি নিয়ে নিজেই ঘর তালাবন্ধ করল। সমবেত সকলেই একটু অস্বস্তিবোধ করল। কিন্তু নিজের নির্দোষিতা প্রমাণের জন্য কেউ সুরজিতের প্রস্তাবে আপত্তি জানাল না। কিন্তু সকলের মনেই সন্দেহের কালো ছায়া। রাজীবলোচনকে এমন অতর্কিতভাবে খুন করলে কে? দীননাথ বৃদ্ধ আর পঙ্গু, সরকার পৈতৃক আমলের বিশ্বস্ত কর্মচারী। চিনে পাচক বহুদিন যাবৎ একাজে বহাল আছে, ডাক্তার অবশ্য এক বৎসর যাবৎ চিকিৎসা করছেন, কিন্তু খুন করে তাঁর কী লাভ? তবে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য কে দায়ী?

চার

সরকারমশাই খুবই করিতকর্মা লোক। এই বিপদের মধ্যেও অভ্যাগতদের খাওয়া-থাকার বন্দোবস্ত করতে তাঁর ভুল হয়নি। সুরজিৎ দেখে অবাক হয়ে গেল যে, তার জন্য সুসজ্জিত বিছানা পাতা রয়েছে। সরকারমশাই দরজার সামনে সুরজিতকে সঙ্গে নিয়ে এসে বিনীতভাবে বললেন, 'এই আপনার ঘর সুরজিৎবাবু, সব ব্যবস্থা ঠিক করা আছে, আপনার ব্যাগ, সুটকেসও পৌঁছে দিয়েছি। আশা করি কিছু অসুবিধে হবে না। অন্য কিছু যদি দরকার থাকে তো বলুন, আনিয়ে দেব।'

ঘরের ব্যবস্থাপত্র দেখে আর কিছু দরকার হবে বলে সুরজিতের মনে হল না। তা ছাড়া নিজের সুখ-সুবিধার কথা ভাববার এখন তার সময় নেই। সে বলল, 'কিছু না, কিছু দরকার হবে না। আপনি শুধু বাড়ির সমস্ত দরজা যাতে ভেতর থেকে বন্ধ থাকে, তার ব্যবস্থাটা করতে ভুলবেন না।'

সরকারমশাই তৎপরতার সঙ্গে জবাব দিলেন, 'যে আজ্ঞে, আমি নিজে সব তদারক করে, তবে শুতে যাব। বাড়ির চাকরেরা সব বার-মহলেই থাকে। শুধু ওই চিনে রাঁধুনি থাকে ভিতরে, আপনার চাকরের তার সঙ্গেই শোবার ব্যবস্থা করেছি।'

একটু হেসে সুরজিৎ বলল, 'বেশ করেছেন, কিন্তু খবরদার, বলরামের সামনে যেন চাকর বলবেন না। ও আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট, দস্তুরমতো একটা খুদে ডিকেটটিভ।' সরকারমশাই গম্ভীর প্রকৃতির লোক। ঠোঁটের কোণে হাসি চেপে বললেন, 'যে আজ্ঞে।'

সরকারমশাই চলে যাওয়ার পর সুরজিৎ ঘরের চারদিকে একবার তাকাল। নিখুঁত পারিপাট্যে ঘরখানি গুছানো। জামা-কাপড় ছেড়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে সটান গা এলিয়ে দিলে সুরজিৎ। নানা খাতে তার চিন্তাস্রোত বয়ে চলল। প্রথম থেকে খুনের প্রাথমিক তদন্ত পর্যন্ত সব ব্যাপারটা মনে-মনে পর্যালোচনা করল সুরজিৎ। সন্দেহ সবাইকে করা চলে, অথচ প্রকৃত অপরাধী কে, তা ঠিক অনুমান করা যাচ্ছে না।

অকস্মাৎ দুপুরবেলা তার অফিসে এক সুন্দরী তরুণীর আগমন কিছু একটা চুরি করে দেওয়ার দাবি, নিজেকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাজীবলোচনের তার, মোটর বেগড়ানো, তারপর অতর্কিতে এই খুন, সমস্ত বিষয়টাই চমকপ্রদ আর রহস্যময়।

সুরজিৎ ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। সে অল্প সময়ের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল।

মাঝরাত্রে হঠাৎ কী একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল সুরজিতের। কী একটা ধাতব জিনিস যেন কোথায় পড়ে গেছে মনে হল, সে চট করে বিছানায় বসে উৎকর্ণ হয়ে শব্দটা কোন দিক থেকে আসছে, তা স্থির করবার চেষ্টা করল। মিনিটকয়েক সব নিশ্চুপ। বাতাসে দরজা-জানলা বন্ধ করার শব্দ নয় তো? না, সুরজিতের ভুল হয়নি। সামনের বারান্দায় পায়ের

শব্দ শোনা যাচ্ছে। সুরজিৎ দরজার কাছে আসতেই দেখতে পেল, তার সম্মুখ দিয়ে একটি ছায়ামূর্তি দ্রুত চলে যাচ্ছে। সুরজিৎ তৎক্ষণাৎ পা কয়েক পিছিয়ে দরজার আড়ালে আত্মগোপন করল। তারপর নিঃশব্দে ছায়ামূর্তির অনুসরণ করল।

রাজীবলোচনের ঘরের সামনে এসে ছায়ামূর্তি থামল। সুরজিৎ প্রকাণ্ড থামের আড়ালে গা ঢাকা দিলে। ছায়ামূর্তি চারদিকে বারকয়েক চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে একটা চাবি দিয়ে তালা খুলে রাজীবলোচনের ঘরে ঢুকল। সুরজিৎও একটু অপেক্ষা করে সন্তর্পণে তার পিছনে ঘরে ঢুকল। টর্চের আলো জ্বালাতেই সুরজিৎ স্পষ্ট দেখতে পেল, ছায়ামূর্তি আর কেউ নয়, স্বয়ং অণিমা, কালো আবরণে সারা দেহ আবৃত বলে অন্ধকারে ছায়ামূর্তি বলেই মনে হচ্ছিল। অণিমা ইতস্তত না করে সোজা রাজীবলোচনের দেরাজ খুলল। মনে হল এসবই তার জানা। টর্চের আলোতে একটু খোঁজাখুঁজির পর সম্ভবত আরেকটা চাবিই বার করে অণিমা ঠিক মৃতদেহটা যেখানে পড়ে আছে তার পাশের সিন্দুকটা গিয়ে খুলল। টর্চ জ্বেলে কিছুক্ষণ ঘাঁটাঘাঁটির পর ভাঁজ করা কাগজের মতো কী একটা জিনিস সে বার করে নিল। অন্ধকারে অণিমার মনের ভাব বুঝতে পারা না গেলেও, কার্যসিদ্ধি যে হয়েছে, তা ওর ভঙ্গিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বাঁ-হাতের বগলে কাগজখানা চাপা দিয়ে সে পিছন ফিরবার আগেই সুরজিৎ ঘর থেকে অদৃশ্য হল। অণিমা পা টিপে-টিপে বারান্দায় এসে দরজায় তালা দিয়ে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

অণিমা মনে-মনে ভগবানকে অজস্র ধন্যবাদ জানাচ্ছিল। নিশ্চয় খুবই ভাগ্যের জোর বলতে হবে তার। একেবারে সিংহের বিবর থেকে শিকার কেড়ে এনেছে। নিজের ঘরের আলো জ্বেলে সিন্দুক থেকে নিয়ে আসা কাগজটা একটা দেরাজে রাখতে যাচ্ছে এমনসময় পিছন থেকে আদেশের সুরে কে বললে, 'কাগজটা আমায় দিন।'

চমকিত হয়ে পিছন ফিরে তাকাতেই অণিমা বিস্মিত হয়ে দেখল সুরজিৎ ঘরের মাঝখানে একটা সোফার ওপর বসে আছে। চোখে তার সকৌতুক গর্বের হাসি। এরচেয়ে অকস্মাৎ বজ্রপাত হলেও অণিমা বেশি স্তম্ভিত হতো না। সুরজিৎ ধীরে-সুস্থে সোফা থেকে উঠে অণিমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমায় চিনতে পারছেন না?'

অণিমা নিজেকে সামলে নিয়ে উষ্ণকণ্ঠে কৈফিয়ত চাইবার ভঙ্গিতে বলল, 'আপনি এ-ঘরে কেন?'

সুরজিৎ অতি সহজ গলায় বলল, 'কেন তা তো আগেই বলেছি। কাগজটা আমায় দিন।'

অণিমা যেন এবিষয়ে বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানে না, তেমনিভাবে জিগ্যেস করল, 'কোন কাগজ? কী বলছেন আপনি?'

সুরজিৎ মৃদু হেসে জবাব দিলে, 'যা বলেছি তা আপনি বেশ বুঝতে পেরেছেন। এইমাত্র রাজীববাবুর ঘর থেকে যে কাগজটা চুরি করে এনেছেন, সেটা আমায় দিতে হবে।'

সুরজিতের অভিযোগকে উড়িয়ে দেওয়ার জন্যই কঠোর স্বরে অণিমা বলল, 'ভেবে-চিন্তে কথা বলবেন সুরজিৎবাবু। গোয়েন্দা হলেই সাতখুন মাপ হয় না। গভীর রাত্রে মিথ্যে অছিলায় কোনও মেয়ের ঘরে ঢোকবার আগে সেকথা আপনার মনে রাখা উচিত ছিল। ভালো কথায় বলছি, বেরিয়ে যান এ-ঘর থেকে।'

'না গেলে কি চিৎকার করে লোক ডাকবেন?' শ্লেষের সুরে সুরজিৎ বললে, 'বেশ, তাই ডাকুন, আমার অছিলাটা মিথ্যে কী সত্যি, প্রমাণ হয়ে যাক।'

অণিমা চুপ করে রইল।

সুরজিৎ অনেকটা মোলায়েম সুরে বলল, 'তার চেয়ে কাগজটা আমায় দেওয়াই ভালো নয় কি? আমি কথা দিচ্ছি, কোনওরকম গোলমাল না করেই বিদায় হয়ে যাব।'

'আর যদি না দিই, জোর করে ছিনিয়ে নেবেন?'

'না, তার দরকার হবে না। আপনাকে যথেষ্ট বুদ্ধিমতী বলেই মনে হয়, অকারণে পুলিশের হাঙ্গামায় নিজেকে জড়াতে বোধহয় চাইবেন না।'

'ওঃ, পুলিশকে একথা জানাবেন, বেশ তাই জানান।' সুরজিতের প্রতি তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বললে অণিমা। যেন এসব সে গ্রাহ্যই করে না। 'এরজন্য পুলিশকে ভয় করবার আমার কিছু নেই সুরজিৎবাবু, সেরকম দামি জিনিস এটা নয়।'

'দামি নয় বলেই খুন করা লাশ যে ঘরে পড়ে আছে, গভীর রাত্রে সেখানে এটা বোধহয় চুরি করতে যেতে হয়েছিল।' বাঁকা দৃষ্টি হেনে সুরজিৎ অণিমাকে বিদ্রুপ করবার চেষ্টা করল।

অণিমা নীবব।

সুরজিৎ আর একটু কাছে সরে গিয়ে জিগ্যেস করল, 'আমায় দিয়ে এই কাজ করাবার জন্যই কি কলকাতা গিয়েছিলেন?'

এবাব কথা কইলে অণিমা, 'হ্যাঁ, তাই গিয়েছিলাম। তবে একটা কথা বিশ্বাস করতে পাবেন যে, রাজীববাবুর খুনের সঙ্গে এ-চুরির কোনও সম্পর্ক নেই।'

'বিশ্বাস করতে হলে চোরাই মালটা কী, তা আগে দেখা দরকার নয় কি?'

অণিমা এবার বিনা বাক্যব্যয়ে ভাঁজকরা কাগজের পুলিন্দাটি সুরজিতের হাতে তুলে দিল। 'বেশ, তাহলে দেখুন।'

সুরজিৎ কাগজের প্রথম পৃষ্ঠা পাঠ করে বলল, 'এ তো একটা উইল দেখছি।'

অণিমা কোনওপ্রকার চাঞ্চল্য প্রকাশ না করে বললে, 'হ্যাঁ, উইল, কিন্তু রাজীববাবুর নয়, তাঁর বাবা যজ্ঞেশ্বরবাবুর।'

উইলের পৃষ্ঠায় চোখ বুলিয়ে সুবজিৎ বলল, 'তাই তো দেখছি। কিন্তু রাজীববাবুর বাবার উইল চুরি করবার জন্য আপনার এমন মরিয়া হয়ে ওঠবার কারণটা এখনও বুঝতে পারছি না!'

'বুঝতে পারবেন। আগাগোড়া ব্যাপারটা তাহলে শুনুন, রাজীবলোচন খুন হয়েছেন বলে আপনাদের সমস্ত সহানুভূতি হয়তো তাঁর ওপর পড়েছে, কিন্তু তিনি তার যোগ্য নন। তাঁর মতো কপট, ভণ্ড, শয়তান খুব কমই জন্মেছে।' সুরজিৎ যেন অতিশয় নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি, তাঁর কাছে যেন সব কিছু অনায়াসে বলা চলে, তেমনি সহজ ও স্বাভাবিকভাবে অণিমা রাজীবলোচনের পারিবারিক ইতিহাস বলে যেতে লাগল, 'রাজীববাবুরা তিন ভাই, বড় দীননাথ, তারপর রাজীবলোচন ও পীতাম্বর। মানুষ এঁরা কেউই ভালো নন, কিন্তু রাজীবলোচন কূটবুদ্ধিতে সকলের ওপরে। ভাইদের বিরুদ্ধে বাপের মন বিষিয়ে দিয়ে এক সময়ে তিনি সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি নিজের নামে উইল করিয়ে নেন।

'উচ্ছৃঙ্খল, দুশ্চরিত্র দীননাথ তখন শহরে ফূর্তি করে কাটাচ্ছেন। ছোট পীতাম্বর পিতার সঙ্গে ঝগড়া করে স্ত্রীকে নিয়ে বিদেশে চলে গেছেন।

'পীতাম্বরের শরীরেও এই বংশেরই রক্ত। দুধের একটি মেয়ে ও স্ত্রীকে একদিন

অসহায়ভাবে ফেলে তিনি যে কোথায় উধাও হন, তা কেউ জানে না। পীতাম্বরের স্ত্রী মেয়েকে নিয়ে অকূল পাথারে পড়েন। কোনওরকমে দরিদ্র ভাই-এর বাড়িতে উঠে এসে, অসুখে পড়ে তিনি শ্বশুরকে খবর পাঠান।

'রাজীবলোচনের সমস্ত চক্রান্ত তাতে ভেস্তে যায়। পুত্রবধূকে দেখতে গিয়ে যজ্ঞেশ্বরবাবুর মনে অনুশোচনা জাগে। তিনি কথা দিয়ে যান যে আগের উইল বদলে, সব ছেলেকে সমানভাবে সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে যাবেন। তিনি যে তাঁর কথা রেখেছিলেন, এই উইলই তার প্রমাণ। কিন্তু এ-উইলের কথা তখনও জানা যায়নি। পুত্রবধূকে দেখে ফিরে আসবার কিছুদিন পরেই যজ্ঞেশ্বরবাবু হঠাৎ মারা যান। রাজীবলোচন এ-উইল গোপন করে আগের উইলের জোরেই সমস্ত সম্পত্তি দখল করেন। তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার কেউ ছিল না। পীতাম্বরের স্ত্রী অসহায়, নিঃসম্বল, তা ছাড়া কয়েকবছর বাদে তিনিও মারা যান।'

সুরজিৎ ধৈর্য সহকারে সব শুনলে। তারপর শুধু সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করলে, 'এত কথা আপনি জানলেন কোথা থেকে?'

অণিমা বলল, 'পীতাম্বরবাবুর স্ত্রীর কাছ থেকে। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তাঁর শ্বশুর নিশ্চয়ই নতুন উইল করে গেছেন।'

'পীতাম্বরবাবুর স্ত্রীর হয়েই কি আপনি তাহলে এই উইল চুরি করতে এসেছিলেন? এখানে নার্সের চাকরি নিয়েছিলেন, সেই উদ্দেশ্যেই?' সুরজিৎ প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ, মাস তিনেক আগে রাজীববাবু কঠিন অসুখে পড়েন। শুশ্রূষা করবার জন্য একজন নার্স চাই বলে কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। আমি সেই সুযোগে এখানে এসে ঢুকি। নিজে অনেক চেষ্টা করেও কিছু করতে না পেরে আমি আপনার কাছে গিয়েছিলাম।'

অণিমা অকপটে সব বর্ণনা করে গেল, যাতে সুরজিতের মনে তার বর্ণনার সত্যতা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহের সঞ্চার না হয়। আদ্যোপান্ত সব শোনার পরও, সুরজিতের সন্দেহ তবু দূর হল না। সে সংশয়াকুল মনে জিগ্যেস করলে, 'কিন্তু এ-উইল চুরি করায় আপনার স্বার্থ কী? পীতাম্বরের স্ত্রী তো মারা গেছেন, তাঁর মেয়ে কি...' কথা বলতে-বলতে হঠাৎ চমকে সুরজিৎ মুখ ফেরাল। পিছনের জানলায় কাচে কীরকম একটা যেন মানুষের ছায়া।

বিস্মিত কণ্ঠে সুরজিৎ প্রশ্ন করলে, 'কে? কে ওখানে?' কিন্তু সুরজিতের গলার আওয়াজ বেরুতে না বেরুতেই ছায়ামূর্তি জানলা থেকে সরে গেল। কাচের জানলা দিয়ে সুরজিৎ এবার দেখতে পেলে আপাদমস্তক কালো পোশাকে ঢাকা মুখোশ-পরা একটা মূর্তি পালিয়ে যাচ্ছে। মুহূর্তমাত্র দ্বিধা না করে সুরজিৎ উইলখানি অণিমার হাতে দিয়ে তার পশ্চাৎ অনুসরণ করলে। অন্ধকারাচ্ছন্ন বারান্দা দিয়ে কালো আবরণধারী লোকটি দ্রুতপদে ছুটে পালাচ্ছে। সুরজিৎ-ও ক্ষিপ্রপদে তার পিছু নিল। খানিকটা অগ্রসর হয়ে বারান্দার এক দিকের একটা জায়গায় এসে হঠাৎ ভোজবাজির মতো লোকটি অদৃশ্য হয়ে গেল। এ-বাড়ির সবই সুরজিতের অপরিচিত। সুতরাং তাকে একটু বেকায়দায় পড়তে হল। বারান্দায় এই কোণে এসে রাস্তাটা ডানদিকের করিডরের সঙ্গে মিলে গেছে। এখানের ছোট প্রবেশপথের মুখ থেকে সুরজিৎ তন্ন-তন্ন করে সারা করিডর খুঁজে দেখল, কেউ কোথাও নেই। কিন্তু একটা গোটা মানুষ চোখের নিমেষে কী করে অদৃশ্য হল!

অণিমা ইতিমধ্যে পিছনে এসে দাঁড়ালে। 'কী হল। ধরতে পারলেন না?'

করিডরে যাবার রাস্তাটা পুনরায় পরীক্ষা করতে-করতে সুরজিৎ জবাব দিলে, 'না,

ভারি আশ্চর্য। এইখানে এসে কোথায় যে মিলিয়ে গেল বুঝতে পারছি না।'

'এটা তো closed passage, অন্যকোনও দিকে যাওয়ার রাস্তা তো বন্ধ।' অবাক হয়ে বললে অণিমা।

'সেইটেই আশ্চর্য।' একটু থেমে সুরজিৎ বললে, 'শুনুন, আমি বাড়ির সকলের সঙ্গে এখুনি একবার দেখা করতে চাই। আপনি সকলের ঘর চেনেন তো?'

অণিমা সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে বললে, 'তা চিনি, আসুন।'

ডাক্তারের কামরার সামনে এসে দাঁড়াল সুরজিৎ ও অণিমা। দরজায় ধাক্কা দিতেই ভেতর থেকে ডাক্তারের কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া গেল, 'কে?'

'দরজাটা একটু দয়া করে খুলবেন?' সুরজিৎ বলল।

'কে আপনি?' ডাক্তার পাল্টা প্রশ্ন করল। বিষয়টা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য সুরজিৎ অণিমাকে ইঙ্গিত করল।

অণিমা বললে, 'সুরজিৎবাবু, আপনার সঙ্গে একটু দেখা করতে চান, আমি নিয়ে এসেছি।'

মিনিট কয়েক পরেই অসন্তুষ্ট মুখে ডাক্তার দরজা খুললেন। এত রাত্রে এদের দুজনকে দরজা ঠেলতে দেখে খুবই অবাক হয়ে গিয়েছেন ডাক্তার। তাঁর চোখে-মুখে বিরক্তির রেখা ফুটে উঠেছে। বললেন, 'আসুন।'

ডাক্তারের ঘরে প্রবেশ করে চারদিকে তাকিয়ে সুরজিৎ জিগ্যেস করলে, 'আপনি এখনও জেগে আছেন দেখছি।'

ডাক্তার এ-প্রশ্নে চটে উঠলেন। 'সেইটেই কি দেখতে এসেছিলেন? ঘরটাও খানাতল্লাশ করতে চান বোধহয়?'

সুরজিৎ তৎক্ষণাৎ কথার মোড় ঘুরিয়ে বললে, 'না-না, ভুল বুঝবেন না ডাক্তারবাবু। ট্রেন জার্নির জন্যই বোধ হয় মাথাটা ভয়ানক ধরেছে। তাই ভাবলাম আপনার কাছে যদি কোনও ওষুধ থাকে।'

ডাক্তার কৃত্রিম গাম্ভীর্যে বললেন, 'হুঁ, মাথা ধরা আর পেটের ব্যথা বড় অসুবিধের রোগ সুরজিৎবাবু। ডাক্তারের বাবারও সাধ্য নেই যে ওপর থেকে কিছু ধরে।'

ডাক্তার টেবিলের ওপর থেকে একটি ছোট প্যাকেট তুলে এনে সুরজিতের হাতে দিয়ে বললেন, 'এই নিন, এক গ্লাস জলের সঙ্গে খেয়ে ফেলুন গে যান। মাথা ধরা না থাকলেও কিছু ক্ষতি হবে না।' ডাক্তারের সুরে তীব্র শ্লেষ ফুটে উঠল। অণিমার দিকে তাকিয়ে ডাক্তার জিগ্যেস করলেন, 'তোমাকেও একটা বড়ি দেব নাকি অণিমা?'

অণিমা বিস্মিত হয়ে বললে, 'আমাকে, আমাকে কেন?'

'না। তোমারও মাথা ধরতে পারে তো। ব্যাপারটা Sympathetic কিনা। ওঁর মাথা ধরার খবর তোমার কাছেই আগে পৌঁছেছে।' ডাক্তার বাঁকা দৃষ্টিতে তাকালেন অণিমার পানে।

বিষয়টাকে সহজ করবার জন্য সুরজিৎ বললে, 'আপনি ভুল করছেন ডাক্তারবাবু। আপনার ঘরটা আমি চিনতাম না। উনি অনুগ্রহ করে দেখিয়ে দিতে এসেছিলেন, এই মাত্র।'

সুরজিতের প্রতি সন্দিগ্ধপূর্ণ বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ডাক্তার বললেন, 'ওঃ, বটে? কিন্তু explanation-এর কোনও দরকার ছিল না সুরজিৎবাবু। কোনও দরকার ছিল না। আচ্ছা, নমস্কার।'

ডাক্তার যে তাদের উপস্থিতিতে শুধু বিরক্ত হননি, বেশ অস্বস্তি বোধ করছেন, একথা স্পষ্ট বুঝতে পারল সুরজিৎ। সে প্রতিনমস্কার জানিয়ে অণিমাকে নিয়ে ডাক্তারের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তার পরবর্তী লক্ষ হলেন, দীননাথ।

অণিমাকে সঙ্গে নিয়ে সুরজিৎ দীননাথের ঘরে এল। কয়েকবার ধাক্কা দেওয়ার পর দীননাথ দরজা খুলে দাঁড়ালেন। ভাব-ভঙ্গি দেখে মনে হল, এইমাত্র গভীর ঘুম থেকে উঠে এলেন দীননাথ।

লজ্জিতভাবে সুরজিৎ বলল, 'এত রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটালাম বলে ক্ষমা করবেন দীননাথবাবু।'

'না-না, সে কী কথা। তবে এত রাত্রে...' দীননাথ কারণটা জানতে চাইলেন।

সুরজিৎ জবাব দিলে, 'খুন হওয়ার পর চব্বিশ ঘণ্টাও পার হয়নি। তার ওপর লাশ পড়ে আছে। আজ রাত্রেই যে একটা কিছু ঘটতে পারে, তা আমি আগেই আন্দাজ করেছিলাম।'

'তাই নাকি,' গভীর আগ্রহে বললেন দীননাথ। 'ব্যাপার কী বলুন তো?'

'আপনি শোনেননি কিছু?' সুরজিৎ টোকা দিয়ে বাজিয়ে নিতে চাইলে দীননাথকে।

'কই, না তো? এই সব ব্যাপারের পর শরীরটা খুব অবসন্ন বোধ হচ্ছিল, বিছানায় গা এলাতেই কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, তা টেরই পাইনি।'

'তবে শুনুন, খুনি আসামি এ-বাড়িতেই আত্মগোপন করে আমাদের ওপর কড়া নজর রেখেছে।'

'কীরকম?' রুদ্ধশ্বাসে জিগ্যেস করলেন বৃদ্ধ দীননাথ।

'হঠাৎ একটা অস্বাভাবিক শব্দ শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেল। বারান্দায় বেরিয়েই দেখলাম মুখোশধারী একটি ছায়ামূর্তি অণিমাদেবীর ঘরের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আমার সাড়া পেয়ে ছায়ামূর্তি দ্রুত পালাতে চেষ্টা করল। আমিও তার পিছনে-পিছনে ছুটলাম। কিন্তু বারান্দা যেখানে গিয়ে ডানদিকের করিডরের দিকে মিশে গেছে, তারই প্রবেশদ্বারে মুখোশধারী লোকটি হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।'

'বলেন কী? একটা জলজ্যান্ত মানুষ অদৃশ্য হয়ে গেল? কী সাংঘাতিক!' গভীর উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালেন দীননাথ। 'তাহলে তো এ-বাড়িতে কেউ-ই নিরাপদ নয় সুরজিৎবাবু। এর কী বিহিত করা যায় বলুন তো?'

'আপনি বসুন, এত ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। আমরা শুধু আপনাকে একটু সাবধান করে দিয়ে গেলাম।'

নিজের আসনে ফিরে গিয়ে দীননাথবাবু অনেকটা অসহায়ভাবে বললেন, 'সাবধান তো করে গেলেন, কিন্তু কার বিরুদ্ধে সাবধান হব, বলতে পারেন? এ তো সাধারণ চোর, ডাকাত, খুনে নয়, যে যেমন করে হোক ঠেকানো যাবে। যাকে ধরা-ছোঁয়া যায় না, চোখের সামনে যে হাওয়া হয়ে মিলিয়ে যায়, তাকে রুখব কেমন করে?'

সুরজিৎ দীননাথকে একটি সিগারেট দিলে। দীননাথের পঙ্গু হাত ভীষণভাবে কেঁপে উঠল। সুরজিৎ তখন সিগারেটটা দীননাথের মুখে চেপে দিয়ে নিজেই তা ধরিয়ে দিলে। তারপর সে নিজের জন্য আর একটা সিগরেট ধরাল।

এতক্ষণ সব শুনে যাচ্ছিল অণিমা। এবার সে কথা কইলে, 'এসব তা বলে ভৌতিক ব্যাপার তো হতে পারে না।'

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কা কাটিয়ে উঠে দীননাথ এইবার বেশ জোরের সঙ্গেই বললেন,

'পারে না-ই বা কী করে বলি। আমি তো জানি, আমাদের বংশের ওপর, এই চৌধুরিগড়ের ওপর দারুণ একটা অভিশাপ আছে। তাই মনে হয়, সেই অভিশাপই বুঝি উন্মাদ অপদেবতার রূপ নিয়ে এখানে হানা দিয়ে ফিরছে। তার হাত থেকে কেউ আমরা রক্ষা পাব না, কেউ না।' দারুণ আক্ষেপের সুরে কথা বললেন দীননাথ। তাঁর কথা বলার ভঙ্গিতে মনে হল এই অনিবার্য নিয়তির আশঙ্কা যেন অহরহ তাঁকে বিঁধছে।

সুরজিৎ তাঁকে অভয় দিল, 'অত হতাশ হবেন না দীননাথবাবু। ভূতের ওঝা আমি অবশ্য নই, সুতরাং এসব সত্যি কোনও অপদেবতার কাজ হলে আমি কিছু করতে পারব না। কিন্তু মানুষের শয়তানি যদি এ-ব্যাপারের পিছনে থাকে, তাহলে আশা করি তার উপযুক্ত ওষুধের ব্যবস্থা করতে খুব বেশি দেরি হবে না।'

'তা করতে পারলে তো আমাদের একটা মহৎ উপকার করবেন সুরজিৎবাবু।' ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন দীননাথ। মনে হল, সুরজিতের কথায় তিনি খুব ভরসা পেলেন না। অপদেবতার ভয় তাঁর মনে বদ্ধমূল হয়ে আছে।

'আচ্ছা, আপনি এখন বিশ্রাম করুন। দেখি আমি এর কতদূর কী করতে পারি।'

দীননাথবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সুরজিৎ ও অণিমা চাকরদের ঘরে এসে উপস্থিত হল। বলরাম ও চিনা পাচক ততক্ষণে ঘুম থেকে জেগে উঠেছে।

সুরজিৎ জিগ্যেস করল, 'ওপরের বারান্দায় কোনও শব্দ শুনতে পেয়েছিস বলরাম?'

বলরাম বললে, 'আজ্ঞে, না স্যার, কিছু শুনিনি। আর শুনব কী স্যার, নাকের যা চিনে ডাক!'

'নাকের চিনে ডাক মানে?' কৌতুক বোধ করল সুরজিৎ!

'আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার, যেমন চেহারা, তেমনি ভাষা থেকে নাক ডাকা পর্যন্ত, সব কিছুই বেয়াড়া।' চিনা পাচককে ইশারায় দেখিয়ে বললে বলরাম, 'মুখখানা দেখছেন, মনে-মনে কী জিলিপির প্যাঁচ আঁটছে, বোঝে কার সাধ্য...।'

বলরামের কথার বিন্দুবিসর্গ না বুঝতে পারলেও চিনে রাঁধুনি বলরামের আকার-ইঙ্গিতে ধরে নিল, তার সম্পর্কেই আলাপ হচ্ছে। তাই সে দুর্বোধ্য চিনা ভাষায় বললে, 'ইয়াং-ও-মাও তুং...'

বলরাম হই-হই করে উঠলে, 'শুনছেন, শুনছেন স্যার কিচির-মিচির করে কীসব গাল পাড়ছে।'

সুরজিৎ ও অণিমা একসঙ্গে শব্দ করে হেসে উঠল।

বলরামের কাছে বিশেষ কোনও সন্ধান না পেয়ে সরকারের ঘরে এল সুরজিৎ। সুরজিতের মুখে সব শুনে সরকারমশাই থ বনে গেলেন। এত রাত্রে মুখোশধারী কে এই ছায়ামূর্তি? অপদেবতা, না মানুষ?

সুরজিৎ জিগ্যেস করল, 'আচ্ছা, বাইরে থেকে কেউ বাড়িতে ঢুকেছে বলে কি আপনার মনে হয়?'

পক্ককেশে আঙুল চালিয়ে বিচক্ষণ সরকার বললেন, 'আজ্ঞে, বাইরে থেকে কারুর ঢোকা একেবারেই অসম্ভব। চৌধুরিগড়ের চারদিকের দেয়াল এত উঁচু আর তার ওপরে এমনই সব ভাঙা কাচের টুকরো বসানো যে কোনও মানুষ তা টপকে বাড়ির ভিতরে ঢুকতে পারবে না। তা ছাড়া বাড়ির ভিতরের সমস্ত দরজা তালা দিয়ে আমি নিজের হাতে বন্ধ করে এসেছি। চলুন, বরং দেখিয়ে দিচ্ছি।'

বাধা দিয়ে সুরজিৎ বললে, 'না-না, তার দরকার হবে না।' অণিমা চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। সে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা এ বাড়িতে অদ্ভুত কিছু আগে কখনও দেখেছেন সরকারমশাই?'

একটু ইতস্তত করে সরকার বললেন, 'হানাবাড়ি বলে এ-বাড়ির দুর্নাম অনেক দিন থেকেই আছে। তবে আমি এই পাঁচ বছরে একবার শুধু...' এই বলে হঠাৎ চুপ করে গেলেন সরকার।

সুরজিৎ আগ্রহে সামনের দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেল, 'বলুন, বলুন।'

'আজ্ঞে, মাসকয়েক আগে একবার কীরকম একটা মূর্তি যেন দেখেছিলাম। তবে একটু এগিয়ে যেতে না যেতেই দেয়ালের গায়ে মিলিয়ে গেল।'

'এখানে তখন কে-কে ছিলেন?' সুরজিতের ভঙ্গিতে তীক্ষ্ণতা ফুটে উঠল। অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর সরকারমশাই-এর কাছে একটা মূল্যবান খবর পাওয়া গেল।

সরকার বললেন, 'আজ্ঞে থাকবার মধ্যে আমি, কর্তাবাবু আর ডাক্তারবাবু। তখন দীননাথবাবু বা অণিমাদেবী, এঁরা কেউ আসেননি।'

'হুঁ।' সুরজিৎ চিন্তামগ্নভাবে বললে, 'আচ্ছা, আর আপনাকে বিরক্ত করব না। এবার আপনি ঘুমোতে যান। চলুন, অণিমাদেবী।'

সুরজিৎ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠল। বিভিন্নমুখী চিন্তার স্রোত তার মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলল। জীবনে বহু জটিল মামলার রহস্য সে উদ্ঘাটন করেছে, কিন্তু রাজীবলোচনের খুনের ব্যাপারটায় সে বাস্তবিকই বিব্রত বোধ করল। ঘটনাচক্রে সবাইকে সন্দেহ করা চলে, দীননাথ, ডাক্তার, অণিমা, সরকারমশাই, সবাইকে, অথচ ধীরভাবে বিশ্লেষণ করলে এঁদের কারও বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ দাঁড় করানো শক্ত। ছুরিকাঘাতে রাজীবলোচনের জীবনান্ত হয়েছে। দীননাথের ডানহাত বাতে পঙ্গু, তাঁর পক্ষে ছুরি মেরে কোনও লোককে হত্যা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ডাক্তারের ভাব-ভঙ্গি এবং পরিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায়, খুনের জন্য তাঁকেই আপাত দৃষ্টিতে দায়ী বলে মনে হয়। কিন্তু খুন করার পিছনে একটা উদ্দেশ্য থাকা চাই তো? রাজীবলোচনকে খুন করে ডাক্তারের কী লাভ? বরং রাজীবলোচনের অর্থানুকূল্যে ডাক্তার তাঁর গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার অবাধ সুযোগ পেয়েছিলেন। আর গত এক বৎসর যাবৎ ডাক্তারের আচরণ সন্দেহাতীত ছিল। অণিমার উইল চুরিটাই রহস্যজনক, খুনের ব্যাপারে তার ওপর সন্দেহটা স্বাভাবিক। কিন্তু অণিমার পক্ষে রাজীবলোচনকে খুন করাটা সম্ভব বলে মনে হয় না সুরজিতের। তবে সে এ-ব্যাপারের অনেক কিছু জানে বলেই মনে হয়। আর বাকি থাকেন সরকারমশাই। কিন্তু এ-বাড়ির পুরানো বিশ্বস্ত কর্মচারী। তাঁর পক্ষে খুন করা বা খুনের ব্যাপারে জড়ানো সম্পূর্ণ অসম্ভব। কিন্তু এই বিভ্রান্তির মধ্যে একটা মাত্র সূত্র ধরেই সুরজিৎকে এগোতে হবে। কিন্তু কে এই ছায়ামূর্তি? সুরজিৎকে সর্বপ্রথম এই রহস্য উদ্ঘাটন করতে হবে। নতুবা, এই খুনের কিনারা করা অসম্ভব।

ভাবনার গুরুভার মাথায় নিয়ে সুরজিৎ দোতলার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এল। অণিমা তাকে নিঃশব্দে অনুসরণ করল। মুখ দেখেই মনে হল সুরজিৎ খুনের বিষয় ভাবতে-ভাবতে কোনও অতল সমুদ্রে ডুবে গেছে।

নিজের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল সুরজিৎ। অণিমা এবার জিগ্যেস করল, 'এক-এক করে সকলের ঘরই তো দেখলেন। সন্দেহ করবার মতো কিছু পেলেন কোথাও?' অণিমার কথায় অনেকটা লঘু পরিহাসের সুর বেজে উঠল, ভাবটা এই, এত রাত্রে হন্তদন্ত হয়ে সকলের

ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়ে তদন্তের ফলে লাভ হল তো শুধু একটি অশ্বডিম্ব।

কৃত্রিম গাম্ভীর্যে সুরজিৎ বললে, 'তা পেলাম।'

অনিমা এই জবাব প্রত্যাশা করেনি। সে আশা করেছিল সুরজিতের মুখ হতাশায় কালো হয়ে উঠবে। পরিশ্রমটাই পণ্ডশ্রম হল বলে আক্ষেপ করবে সুরজিৎ, নয়তো সে গোয়েন্দাসুলভ চাতুর্যে বলবে, গোয়েন্দাদের এত শিগগির ধৈর্য-হারা হতে নেই। কিন্তু এ যে একেবারে স্পষ্ট স্বীকৃতি। গভীর রাত্রে জেরার ফলে সন্দেহ করবার মতো কারণ ঘটেছে। কার ওপর? হঠাৎ সারা শরীরে আকস্মিক উত্তেজনা অনুভব করল অনিমা। বললে, 'পেলেন? কোথায়?' নিস্তব্ধ রাত্রে তার কণ্ঠস্বর একটু অস্বাভাবিক উচ্চকিত শোনাল।

মৃদু হেসে সুরজিৎ বললে, 'কোথায় আর—সব জায়গাতেই।'

'তার মানে?' ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত হল অনিমার।

সুরজিতের ঠোঁটের অর্ধ-উচ্চারিত হাসি আরও স্পষ্ট হল। 'মানে খুব সহজ। প্রথমে সন্দেহটা থাকে অস্পষ্ট, ধোঁয়াটে। তাই সব জায়গাতে সকলের ওপরই তা ছড়িয়ে যায়। সেই ছড়ানো সন্দেহকে এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত করাই হল গোয়েন্দাগিরি। আচ্ছা, অনেক রাত হয়েছে, এবার আপনি শুতে যান অনিমাদেবী।' তারপর কৌতুকের সুরে সুরজিৎ বলল, 'ঘরে যেতে ভয় করছে না তো? তা হলে বলুন, বাইরে থেকে পাহারা দেব না হয়।'

অনিমা অবশ্য কৌতুকে উজ্জ্বল হতে পারল না। সুরজিৎ কাকে সন্দেহ করেছে, কী সূত্রে কতখানি সন্দেহ করেছে, এই ধরনের বহু চিন্তা তার মনকে পীড়িত করে তুলল। অথচ স্পষ্ট ভাষায় কিছু জিগ্যেস করতেও সে সংকোচ বোধ করল।

'তার দরকার হবে না,' অনেকটা জোর করে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করলে অনিমা। 'অত ভয় থাকলে এই প্রেতপুরীতে একা এসে ঢুকতাম না। কিন্তু আপনি কী করবেন? এই রাত্রেই আবার গোয়েন্দাগিরি শুরু করবেন নাকি?'

অনিমার চাপা আশঙ্কায় মনে-মনে হাসল সুরজিৎ। মুখে বলল, 'না পুলিশ না আসা পর্যন্ত আর কিছুই কবব না। কী কর্তব্য, তারপর ঠিক করা যাবে। যা শুনলাম, তাতে পুলিশের লোক কাল সকাল ন'টা-দশটার আগে আসতে পারবে বলে তো মনে হয় না। আচ্ছা, নমস্কার।'

অনিমা হাত তুলে প্রতিনমস্কার জানাল। তারপর নিঃশব্দে সে বারান্দা অতিক্রম করে তার ঘরের দিকে চলে গেল। খানিকটা এগিয়ে অনিমা পিছন ফিরে তাকাল। কিন্তু সুরজিৎ ততক্ষণে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করেছে। অনিমা আর বিলম্ব না করে দ্রুতপদে নিজের ঘরে চলে গেল।

বিছানায় শুয়েও স্বস্তি পেল না অনিমা। একটা অনিশ্চিত আশঙ্কা তার মনকে চঞ্চল করে তুলল। সুরজিৎ কাকে সন্দেহ করেছে, জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা খুন সম্পর্কে কী সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে, এই প্রশ্নই তার মনে এলোমেলো চিন্তার বুদবুদ সৃষ্টি করল।

পাঁচ

বলরাম ও চিনা রাঁধুনি নিশ্চিন্ত আরামে নিদ্রা যাচ্ছিল। রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটেছে, তাই ভোরের দিকে ঘুমটা খুব গাঢ় হয়ে এসেছিল। কিন্তু নিদ্রা-সুখ তাদের কপালে নেই। হাঁকডাকে হকচকিয়ে উঠল বলরাম। চিনা পাচক সুজনীতে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছিল। হাঁকডাকে সে সুজনীর ফাঁকে মুখ গলিয়ে যেই দেখতে পেলে, বলরাম উঠেছে, অমনি চটপট সুজনী মুড়ি দিয়ে পড়ে রইল, যেন সে গভীর ঘুমে অচেতন।

চোখ কচলাতে-কচলাতে মুখ বিকৃত করে বলরাম বলল, 'বাবারে বাবা, ভোর রাত্রে এ আবার কী ফ্যাসাদ। ডাকাত পড়ল নাকি?'

সে চিনা রাঁধুনিকে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে জাগাতে চাইলে। ব্যাটার যেন কুম্ভকর্ণের ঘুম, 'এই-এই শুনতে পাতা হ্যায়, ডাকাত পড়া হ্যায়...'

রাঁধুনি আরও শক্ত করে সুজনীর আচ্ছাদনে নিজেকে জড়িয়ে ভীত কণ্ঠে দুর্বোধ্য ভাষায় বিড়বিড় করে বললে, 'ও লুং, সিং সাং...'

বলরাম রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল। সে জোর করে চিনা পাচকের গায়ের সুজনীটা টেনে দূরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললে, 'আরে কী হয়েছে, একবার দেখে এস না হতভাগা।'

পাচকটি গাত্রাবরণ কুড়িয়ে এনে আবার গা-মুড়ি দিয়ে বললে, 'চাং টুং, সা-কা ইয়াং...'

বলরাম দেখলে মহা ফ্যাসাদ। এই জন্ম-কুঁড়ে, ভীতু লোকটাকে কিছুতেই বাইরে পাঠানো যাবে না। কে না কে এসে সদরে দরজা ঠেলছে, খুনখারাবি, রক্তারক্তির ব্যাপার, কাজ নেই বাবা আগে থেকে মাথা গলিয়ে।

এ যে নড়ে না গো, আমারও তা হলে কাজ কী বাবা ফ্যাসাদে, যার গরজ থাকে সে গিয়ে দরজা খুলুক। এই বলে বলরাম নিজের বিছানায় গা এলিয়ে চাদর মুড়ি দিলে।

সদর দরজায় লোকের হাঁকডাক আর অনবরত ধাক্কা দেওয়ার শব্দ শুনে সুরজিৎ দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। নিচে শব্দ শুনে অণিমা ও ডাক্তার এসে বারান্দায় দাঁড়িয়েছে।

ডাক্তার জিগ্যেস করলেন, 'কী ব্যাপার, এই ভোর রাত্রে দরজা ভাঙে কে?'

অণিমা জবাব দিলে, 'বুঝতে পারছি না তো?'

সুরজিৎ বললে, 'চলুন, নিচে গিয়েই দেখা যাক, কী ব্যাপার।'

তারা নিচে নেমে গেল।

সদর দরজায় প্রচণ্ড আঘাত করে বাইরে থেকে আগন্তুক অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল, 'দরজা খুলুন, দরজা খুলুন।'

সুরজিৎ জানতে চাইলে, 'কে আপনারা?'

জবাব এল, 'আমরা পুলিশের লোক দরজা খুলুন।'

সরকারমশাইও দরজা ঠেলার প্রচণ্ড শব্দে আকৃষ্ট হয়ে উঠে এসেছিলেন। 'পুলিশের লোক,' এই বলে তিনি এগিয়ে গিয়ে সদর দরজা খুলে দিলেন। বাইরে দলবলসহ পুলিশের বড় দারোগা দাঁড়িয়ে। 'ওঃ, আপনারা বুঝি খবর পেয়ে আসছেন?' বিনীতভাবে বললেন সরকারমশাই।

'খবর পেয়ে আসছি! খবর পাব কীসের? বরং খবর না দিয়ে আসছি বলুন। রাজীবলোচনবাবু কোথায়?' একটু কড়া সুরেই বললেন দারোগাবাবু। অনেকক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁর মেজাজ সম্ভবত বিগড়ে গিয়েছিল।

'রাজীবলোচনবাবুকে খুঁজতে এসেছেন?' সুরজিৎ দারোগাবাবুর সামনে এগিয়ে গেল।

'খুঁজতে নয়, এসেছি গ্রেপ্তার করতে...' দারোগাসুলভ ঔদ্ধত্যের সঙ্গে তিনি জবাব দিলেন সুরজিতের মুখের ওপর। কিন্তু সুরজিতের মুখের পানে তাকিয়ে তিনি বিস্মিত হয়ে গেলেন। 'আরে সুরজিৎবাবু যে! আপনি এখানে?' সুরজিতের সঙ্গে তাঁর অনেক দিনের পরিচয়। বহু জটিল মামলায় তাঁরা একসঙ্গে তদন্তও পরিচালনা করেছেন।

রহস্য করে সুরজিৎ বললে, 'খুব আশ্চর্যের কথা আর কী? বাঘের আগে ফেউ হয়ে এসেছি আর কী।'

স্থূলকায় দারোগা দাঁত বার করে হাসলেন, 'বাঃ, বলেছেন বেশ।'

ডাক্তার নিজের উৎকণ্ঠা আর চেপে রাখতে না পেরে জিগ্যেস কবলেন, 'কিন্তু রাজীবলোচনবাবুকে গ্রেপ্তার করতে কেন?'

দারোগাবাবু হাতের ছড়িটা চঞ্চলভাবে দোলাতে-দোলাতে বললেন, 'একটা Bank fraud case-এ মশাই সেই শহর থেকে এখানে আসছি। কোথায় তিনি?' যেন রাজীবলোচনকে সামনে পেলে হাতে মাথা কাটেন, এই ভাব দারোগার।

সুরজিৎ শান্ত কণ্ঠে বললে, 'আসুন আমার সঙ্গে।' দারোগাকে সঙ্গে নিয়ে সুরজিৎ দোতলায় রাজীববাবুর ঘরের দিকে রওনা হল।

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে-উঠতে দারোগা জিগ্যেস করলেন, 'আপনি কী সূত্রে এখানে এলেন?'

'তা দেখাতেই আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।' এই বলে একটু থেমে সুরজিৎ আবার বললে, 'আপিসে বসে আছি, হঠাৎ এক টেলিগ্রাম। রাজীবলোচন চৌধুরী জানাচ্ছেন তাঁর জীবন বিপন্ন, সেইসঙ্গে জিজ্ঞাসা কবেছেন আমি রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিতে প্রস্তুত আছি কি না। তক্ষুণি সম্মতি জানিয়ে তার করলাম। পরদিন রাজীববাবুর লোক এসে হাজির। কিন্তু রওয়ানা হওয়ার সময় পর্যন্ত ভাবতে পাবিনি, কত বড় ফ্যাসাদে আমাদের জড়াতে হবে। রাস্তায় মোটব বিগড়ে যাওয়ায় সুখচবে পৌঁছতে আমাদের অনেক রাত হয়ে গেল। যখন পায়ে হেঁটে বাড়ি পৌঁছলাম, তার আগেই সব শেষ।'

'তাব মানে?' আপনার অজ্ঞাতসারে চকিত হয়ে উঠলেন দারোগাবাবু।

'রাজীববাবু খুন হয়েছেন। ছুরি মেরে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। এই দেখবেন—আসুন, আপনাদের অপেক্ষায় লাশ আমি ঘরে বন্ধ করে রেখে দিয়েছি।'

সুরজিৎ পকেট থেকে চাবি বার করে রাজীববাবুর ঘরের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল।

মৃতদেহকে অনেকক্ষণ ধবে পরীক্ষা করে দারোগাবাবু যেন আরও বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন। সুরজিৎ এর পরের ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃতি করল। শুধু উইল চুরি আর তার আপিসে গিয়ে অণিমার অনুরোধেব কথা সে ইচ্ছে কবেই চেপে গেল।

দারোগাবাবু বললেন, 'আত্মহত্যা নয়, ছুরি চালিয়েই হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু যা শুনলাম তাতে সমস্ত ব্যাপার তো একেবারে ওলোট-পালোট হয়ে গেল দেখছি।' একজন কনস্টেবলকে মৃতদেহের পাহারায় রেখে তাঁরা ঘর থেকে বাইরে চলে এলেন।

এসেছিলাম Bank fraud case-এর আসামিকে গ্রেপ্তার করতে, এখন তো খুনের কেস নিয়ে পড়তে হল।' দারোগাবাবু যেন মহা সমস্যায় পড়েছেন—তেমনি বিব্রতভাবে বললেন।

সুরজিৎ জিগ্যেস করলে, 'Bank fraud-টা কি জাতীয়, জানতে পারি?'

'সেই মামুলি শয়তানি। Security জাল করে ভদ্রলোক বেশ মোটা কিছু Bank থেকে Over draft হিসেবে সরিয়ে ছিলেন। কিন্তু ভোগ করতে আর সময় পেলেন না। আচ্ছা, এ খুন সম্বন্ধে আপনার ধারণাটা কী?'

কোনও কিছু ধরা ছোঁয়া না দিয়ে ভাসা-ভাসা ভাবে সুরজিৎ বলল, 'এখনও কোনও খেই-ই ধরতে পারিনি, তো ধারণা করব কী? তা ছাড়া ধ্যান-ধারণা তো সবই আপনাদের

হাতে এখন। আমি শুধু পুলিশকে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।'

'তার মানে, আপনি চলে যাচ্ছেন নাকি?' দারোগাবাবু এমন একটি ভঙ্গি করলেন যেন সুরজিৎ চলে গেলে তাঁকে মহা অসুবিধায় পড়তে হবে।

'হ্যাঁ, যাঁর ডাকে এসেছিলাম, তিনিই যখন আর নেই, তখন এখানে থাকার কোনও মানে হয় না।' এ খুনের ব্যাপারে তার উপস্থিতি একেবারেই নিষ্প্রয়োজন, এই বিষয়ে যেন তার আর কোনও কর্তব্য নেই, তেমনি নিস্পৃহভাবে বললে সুরজিৎ।

সুরজিৎকে খুশি করবার জন্য মিষ্টি করে হাসলেন দারোগাবাবু। মোলায়েম গলায় বললেন, 'অবশ্য আপনারা কাজের লোক, জোর আপনার ওপর করতে পারি না, তবে এ-ব্যাপারে আপনি সঙ্গে থাকলে সত্যি খুশি হতাম। এখনও মতটা বদলানো যায় না কি?' অনুরোধপূর্ণ দৃষ্টিতে সুরজিতের পানে তাকালেন দারোগাবাবু।

সুরজিৎ খুব আগ্রহ প্রকাশ করল না। বলল, 'আশা খুব কম, আচ্ছা চলি...' সুরজিৎ অগ্রসর হতেই দেখতে পেলে চিনা পাচকটা এদিকে আসছে। 'ওই দেখুন, আপনার মক্কেল এসে হাজির দারোগাবাবু।'

'হ্যাঁ, বাড়ির সকলের একটা করে জবানবন্দি নিচ্ছি। তারপর Dead body-টা নিজেকেই Post Mortem-এর জন্য সদরে নিয়ে যেতে হবে দেখছি। অন্য কোনও ব্যবস্থা তো সম্ভব নয়।' দারোগাবাবু তদন্তের পদ্ধতিটা ব্যাখ্যা করে এ-ব্যাপারে সুরজিতের আগ্রহ উদ্দীপ্ত করতে চাইলেন।

সুরজিৎ তখন যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। সে দারোগাবাবুর কথায় কান না দিয়ে বললে, 'একটা কথা তাহলে বলি। এ-বাড়ির রহস্য ওই খুনেই শেষ হয়নি। যাওয়ার আগে সমস্ত বাড়িটা সাবাক্ষণ ভালো করে পাহারার ব্যবস্থা করে যাবেন।'

বিশাল-বপু দারোগাবাবু সুরজিতের কথার গূঢ় ইঙ্গিত ধরতে না পেরে পুলিশি বুদ্ধির বাহাদুরি ভঙ্গিতে বললেন, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। মাছিটি যাতে না গলতে পারে, সে ব্যবস্থা করে তবে আমি যাব।'

সস্মিত মুখে সুরজিৎ নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলে।

চিনা রাঁধুনি নির্বোধের মতো অদূরে দাঁড়িয়ে তাঁদের আলাপ শুনছিল।

দারোগাবাবু ডাকলেন, 'এই এদিকে এসে দাঁড়াও, কী নাম তোমার?'

চিনা পাচকটি এগিয়ে এসে দুর্বোধ্য কতকগুলো শব্দ উচ্চারণ করলে, 'আং, সাং, মুং, চাও তুং...'

দারোগাবাবু একে নিয়ে আর এক সমস্যায় পড়লেন। ভাষাই বুঝতে পারে না, সে আবার জবানবন্দি দেবে কি?

'আরে এ তো ভালো জ্বালা দেখছি! হিন্দি বোলনে সকতা?' তদন্ত করতে এসে এমন ঝামেলা এর আগে কখনও পোহাতে হয়নি দারোগাবাবুর।

চিনা পাচকটি আগের মতো অর্থহীন শব্দ করে উঠল, 'ইয়াং, কুং, চিং, ফুং...'

'না, পাগল করে দেবে দেখছি।' দারোগাবাবু এই অদ্ভুতভাষার লোকটিকে নিয়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। 'এই আর কে আছে ওখানে?'

বলরাম অদূরে দাঁড়িয়ে দারোগাবাবুর তদন্তের ধরন-ধারণটা লক্ষ করছিল। কারণ সেও ভবিষ্যতে একজন ডিটেকটিভ হওয়ার আশায় বুক বেঁধে সুরজিতের শাগরেদি করছে।

বলরাম জবাব দিলে, 'আজ্ঞে, আমি স্যার।'

'কে তুমি?' দারোগাবাবু চড়া সুরে জিগ্যেস করলেন।

থামের আড়াল থেকে সরে এসে দারোগাবাবুর সামনে দাঁড়াল বলরাম। বললে, 'আমি বলরাম সিকদার স্যার, সুরজিৎবাবুর অ্যাসিস্ট্যান্ট।' চিনা পাচকের দিকে আঙুল নির্দেশ করে বলল, 'একেবারে আঁকাড়া আরশুলাখেকো চিনে স্যার,—বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি, কিচ্ছু বোঝে না, আমি কতদিন testify করে দেখেছি।'

দারোগাবাবু হাসি চেপে জিগ্যেস করলেন, 'testify করে দেখেছ?'

বলরাম পরম উৎসাহে বলল, 'মানে আরশুলা খেতে এখনও দেখিনি, তবে...'

চিনে পাচকটা কিচ-কিচ করে উঠল, 'ওয়াং, চুং, নাং—'

বলরাম অঙ্গ-ভঙ্গি করে বললে, 'শুনছেন স্যার, শুনছেন, গালাগাল দিচ্ছে বোধহয়।' তারপর পাচককে শাসিয়ে বলল, 'এই চুং চাং—এই ভালো হবে না বলছি, ভালো হবে না...'

দারোগাবাবু দেখলেন, এ তো ভালো মজা! পাগল আর আহাম্মকে এক্ষুণি লড়াই বাধবে। তিনি বলরামকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'থাক, থাক, তোমাকে আর testify করতে হবে না। কোনও ভাষাই যে বুঝতে পারে না, তাকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে লাভ নেই।'

এই বলে তিনি বাড়ির অন্যান্যদের জবানবন্দি নেওয়ার জন্য ডেকে পাঠালেন।

ছয়

দারোগার ওপর খুনের তদন্তের ভার দিয়ে সুরজিৎ জিনিসপত্র গোছগাছ করতে শুরু করল। আজকেই তার কলকাতা ফিরে যাওয়া চাই। সেখানে বিস্তর কাজ জমে আছে। চৌধুরিগড়ে যে-কাজের জন্য এসেছিল, তা তো শুরু করবার আগেই খতম হয়ে গেল। এখন মিছিমিছি উপযাচক হয়ে খুনের তদন্তে জড়িয়ে লাভ কি? সুরজিৎ গোছগাছ প্রায় শেষ করে ফেলেছে এমনসময় দরজার প্রান্ত থেকে নারীকণ্ঠের ধ্বনি শুনতে পাওয়া গেল, 'আসতে পারি?' গলার স্বরেই সুরজিৎ চিনতে পারলে, দরজায় দাঁড়িয়ে অণিমা।

সুরজিৎ বলল, 'আসুন।'

অণিমা ঘরে ঢুকে দেখল, সুরজিৎ সুটকেসের স্ট্র্যাপ বাঁধছে। অণিমা আশা করেনি, সুরজিৎ এত শিগগির চলে যাবে। একটুখানি ক্ষোভের সঙ্গেই বলল, 'এ কি আপনি চলে যাচ্ছেন নাকি?'

সুটকেসে তালা দিয়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল সুরজিৎ। বলল, 'তা নয় তো কি? এখানেই মৌরসি পাট্টা নিয়ে বসবাস করব মনে করেছিলেন? এখন পুলিশ এসে সব ভার নিয়েছে, আর আমার থাকার দরকার তো নেই।' সুরজিৎ অকারণেই যেন একটু কর্কশ হয়ে উঠল।

অণিমা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বলল, 'দরকার নেই মানে! এ রহস্যের কিনারা না করেই আপনি চলে যাবেন?'

এবার সত্যিই হাসি পেল সুরজিতের। যেন খুনের কিনারা করা তার একটা মস্ত দায়, সেই শর্তেই যেন সুরজিৎ সুখচরে এসেছিল। তবু যথাসম্ভব সহজ অথচ দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিল, 'রহস্যের কিনারা করবার দায় তো আমার নয়, অণিমাদেবী। সে দায় পুলিশের। যাঁকে পাহারা দেওয়ার জন্যে আমি এসেছিলাম, তিনি মারা যাওয়ার সঙ্গে আমার এখানকার কাজ ফুরিয়েছে।'

তাই যদি মনে করেন, 'তাহলে কাল রাতে আমার পিছনে কেন গোয়েন্দাগিরি করেছিলেন বলতে পারেন? কোনও গরজ তখন তো আপনার থাকবার কথা নয়।' আশাভঙ্গের ক্ষোভে অণিমার গলার স্বর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

অণিমা যে এতখানি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে, সুরজিৎ তা ভাবতে পারেনি। তাই অণিমাকে শান্ত করবার জন্য বিষয়টাকে লঘু করবার চেষ্টা করে বলল, 'সত্যি সেটা স্বভাবের দোষ। তারজন্যে আজ মাপ চাইছি। আমি চলে গেলে—পর আপনি যত খুশি উইল চুরি করে বেড়াবেন, কেউ আশা করি বাধা দিতে আসবে না।' কথাটা বলে নিজেই হেসে উঠল সুরজিৎ।

অণিমা কিন্তু মোটেই পরিহাসে যোগ দিতে পারল না। বরং সুরজিৎ যাতে চলে না যায়, সেইজন্য তার উদ্বেগের সীমা রইল না। অনুনয়ের ভঙ্গিতে কাতর কণ্ঠে অণিমা বললে, 'না-না, সুরজিৎবাবু, এ ঠাট্টার সময় নয়। আমার একান্ত অনুরোধ, আপনাকে এখানে থাকতেই হবে, এ রহস্যের একটা কিনারা করতেই হবে। রাজীববাবু আপনাকে কত টাকা দেবেন বলেছিলেন জানি না, তাঁর মতো সামর্থ্যও আমার নেই, কিন্তু, তবু আমি কথা দিচ্ছি, আমার যথাসাধ্য ফি আপনাকে আমি দেব। আপনি শুধু আমাকে একটু সাহায্য করুন।'

অণিমার আগ্রহ সুরজিতের অন্তর স্পর্শ করল। কিন্তু শেষের দিকে ফি দিয়ে তাকে আটকে রাখবার প্রস্তাবে সে না হেসে পারলে না। যেন টাকার প্রশ্নেই সে খুনের তদারক করতে রাজি হয়নি। কিন্তু অণিমাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, পেশাদার ডিটেকটিভ সে, পারিশ্রমিক না পেলে বৃথা পরিশ্রমের দাবি তো তার ওপব কারও নেই। মৃদু হেসে সুবজিৎ বলল, 'আপাতত কী সাহায্য আপনাকে করতে পারি বলুন তো? কলকাতায় যে জন্যে আমার কাছে গিয়েছিলেন, সে উইল চুরি তো হয়ে গেছে।'

'সেই উইলটারই একটা ব্যবস্থা আপনাকে কবতে হবে সুরজিৎবাবু।' উইলটা বার করে সুরজিতের হাতে দিল অণিমা।

'পুলিশের কাছে এ উইল চুরির কথা আমি বলতে পারিনি, পারবও না।' সুরজিতের খুব কাছে সরে গিয়ে অন্তরঙ্গ সুরে অণিমা বলল, 'অথচ এটা আমার কাছে রাখতেও ভরসা পাচ্ছি না। তাই এটা আপনাকেই দিয়ে যাচ্ছি। আপনি যা করবার করুন।'

'আমি যা করবার করব?' পুনরুক্তি করল সুরজিৎ। তার ওপর অণিমার এই একান্ত নির্ভরতাকে সে সহসা উপেক্ষা করতে পারলে না। মুহূর্ত ইতস্তত করে সে মন স্থির করে ফেলল। না, এ-খুনের একটা হেস্তনেস্ত করে তবে সে কলকাতা যাবে। মুখে বলল, 'আমার ওপর বিশ্বাস করে সমস্ত ভার দিচ্ছেন তো অণিমাদেবী?'

মাথা নেড়ে অণিমা বলল, 'নিশ্চয় দিচ্ছি।' তার চোখে-মুখে একটা পরম স্বস্তিবোধের ভাব ফুটে উঠল।

তাহলে আমার কথা শুনুন, 'এ উইল আপনার কাছেই রেখে দিন গে।'

'আমার কাছেই রেখে দেব?' ঈষৎ বিস্মিত কণ্ঠে জিগ্যেস করলে অণিমা। 'কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর মূর্তি যদি আজ রাতে আবার আমার ঘরে হানা দেয়!'

এই প্রশ্নের জন্য যেন তৈরি হয়েছিল সুরজিৎ। অতি সহজভাবে জবাব দিল, 'হানা যাতে দেয়, সেই জন্যেই তো রাখতে বলছি। এই উইলটা হল, তাকে টেনে আনবার টোপ।'

যাক, অণিমা এবার নিশ্চিন্ত হল। সুরজিৎ তাহলে ব্যাপারটা নিয়ে সত্যি-সত্যি মাথা ঘামাচ্ছে। ডিটেকটিভদের ফন্দি-ফিকির বুঝে ওঠা সহজ নয়। কখন কোনদিক থেকে যে আসামিকে ফাঁদে ফেলবে, তা শুধু ওরাই বলতে পারে। সুতরাং সে নির্বিকারভাবে সুরজিতের

নির্দেশমতো কাজ করে যেতে পারে, আর তার কোনও দ্বিধা নেই, শঙ্কা নেই।

তবু রহস্য করে কৃত্রিম শঙ্কা মিশ্রিত কণ্ঠে বলল অণিমা, 'ওঃ, আপনি তো ভয়ঙ্কর লোক। উইলের সঙ্গে আমাকেও অনায়াসে শমনের মুখে টোপ করে ঠেলে দিচ্ছেন। যেন আমার প্রাণটার কোনও দামই নেই।'

সুরজিৎ তেমনি হাল্কা সুরে জবাব দিল, 'দাম যথেষ্টই আছে, কিন্তু দামি টোপ না ফেললে, বড় শিকার যে ধরা পড়ে না।' সুরজিৎ অণিমার দিকে তাকিয়ে হাসলে। তাব চোখ দুটি কৌতুকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বললে, 'আপনি শুধু দয়া করে আজ বাত্রে ঘর ছেড়ে কোথাও যাবেন না, এইটুকু অনুরোধ।'

দারোগাবাবু শহরে লাশ পাঠিয়ে তাঁর রুটিনমাফিক কর্তব্য শেষ করলেন। খুনের কোনও কিনারা হল না, আসামি ধরা পড়ল না, এ-সম্পর্কে চাকর-বাকরদের মধ্যে নানা জল্পনা-কল্পনা শুরু হল। সবচেয়ে বেশি ক্ষুব্ধ হলেন সরকারমশাই। যজ্ঞেশ্বর চৌধুরি বেঁচে থাকতে তিনি এ বাড়িতে চাকুরিতে বহাল হন, তারপর থেকে তিনি প্রাণপণে চৌধুরিদের বৈষয়িক উন্নতির জন্য কাজ করে গেছেন। এঁদের ওপর তাঁর কেমন যেন একটা মাযা পড়ে গেছে। তাই রাজীবলোচনের এই শোচনীয় পরিণতিতে তিনি স্বজনবিয়োগের চেয়েও বেশি আঘাত পেলেন। সরকারমশাই অভিজ্ঞ লোক, জীবনে বহু কাদাই তিনি ঘেঁটেছেন, কিন্তু এমন হতভম্বকর পরিস্থিতিতে এর আগে তাঁকে কখনও পড়তে হয়নি। সুরক্ষিত চৌধুরিগড়েব নিজের কক্ষে গৃহপতিকে খুন করে আসামি বেমালুম নিখোঁজ হয়ে গেল। কলকাতা থেকে এসে দু-দুটো অভিজ্ঞ মাথাও তার কোনও কিনারা করতে পারলেন না, এ বাস্তবিকই আশ্চর্য মনে হয় সরকারমশাই-এর। ভূত, অপদেবতা? কিন্তু এতদিন বাদে হঠাৎ এই জীবগুলির রাজীবলোচনের ওপর এমনভাবে কুপিত হয়ে ওঠবার কারণ কী? 'হানাবাড়ি' বলে চৌধুরিগড়ের দুর্নাম আছে—কাজে যোগ দেওয়া অবধি সরকারমশাই তা জানেন। কিন্তু গত পাঁচ বছরে এধরনের বিশ্রী কাণ্ড ঘটা তো দূরে থাক, কোনও উপদ্রবই তো তাদের সইতে হয়নি। না, সরকারমশাই অপদেবতার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। এ-খুনের পিছনে আরও কোনও গভীর রহস্য আছে। এখন প্রশ্নটা এই দাঁড়ায়, যে লোকটা রাজীবলোচনকে খুন করল, মুহূর্তে সে হাওয়া হয়ে কোথায় মিলিয়ে গেল? আর সুরজিৎবাবু যে মুখোশধারী ছায়ামূর্তি দেখেছিলেন, তাব সঙ্গে এই হত্যাকাণ্ডের কোনও সম্পর্ক আছে কি? সরকারমশাই আর ভাবতে পারেন না। তাঁর মাথায সব এলোমেলো' চিন্তা তালগোল পাকিয়ে উঠল। যাকগে, খুনের আসামি খুঁজে বার করা গোয়েন্দাদের কাজ। এ-নিয়ে তাঁর উদ্বিগ্ন না হলেও চলবে। তিনি যদি কোনওভাবে তদন্তে সাহায্যে করতে পারেন, তবেই চৌধুরিবাবুদের নিমকের মর্যাদা তিনি রাখতে পারবেন। চাকর-বাকরদের ডেকে তিনি বাজে গুজব আর জটলা করতে নিষেধ করে দিলেন। বেফাঁস আলোচনায় আসামি সতর্ক হতে পারে, এতে খুনের তদন্ত-কার্যও বিঘ্নিত হবে। কে জানে, সরকারের মনের কোণে এমনি একটা সন্দেহ দোলা দিচ্ছিল, আসামি হয়তো এ বাড়িতে আত্মগোপন করে আছে।

সাত

সেই রাত্রে শোবার আগে ঘরে ঢুকেই চিনা পাচকের আত্মারাম ভয়ে উড়ে গেল। ঘরের একদিকের দেয়ালে একটা বড় কুলুঙ্গি গোছের জায়গা। তার ভিতরে খুঁটিনাটি নানা জিনিস থাকে। কুলুঙ্গির সামনেটা একটা লম্বা পর্দায় ঢাকা। সেই পর্দাটা থেকে-থেকে কেমন আপনা

থেকে আন্দোলিত হচ্ছে। চিনা পাচকটি ভয়ে জড়সড় হয়ে হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইল। চিৎকার করে ডাকবার মতো সাহসও যেন তার নেই। এ-বাড়িতে অপদেবতার উৎপাত শুরু হয়েছে, তা সে সকালে শুনেছিল, কিন্তু আক্রমণটা যে প্রথমে তার ওপরে হবে, তা সে ধারণা করতে পারেনি। নিরীহ রাঁধুনি, শেষে কি চাকরি করতে এসে ভূতের হাতে পড়ে প্রাণ হারাবে। তার শরীরের সব রক্ত যেন ঠান্ডা হয়ে আসছে, সে যেন বাহ্যজ্ঞান পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে, কী সাংঘাতিক রে বাবা, মাত্র কয়েক হাত দূরে—সেই, সেই, ওরা আজ সকালে সবাই বলাবলি করছিল...অপদেবতা, ছায়ামূর্তি...ভূত।

সেই মুহূর্তে ঘরে ঢুকে বলরাম এক ধমক দিলে, 'আরে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? কী—হয়েছে কি?'

কম্পমান পর্দার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দুর্বোধ্য শব্দ উচ্চারণ করল চিনা পাচক 'ইং, লং, তুং, সোয়া, সো, ফু...' তার জিহ্বা পর্যন্ত ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে এসেছে।

পর্দার দিকে তাকিয়ে ভয়ে আঁতকে উঠল বলরাম, 'ওরে বাবারে, গেছিরে, এ যে আমাদেরই ঘরে সেই খুনে ভূত গো। ওগো কে কোথায় আছ গো।'

চেঁচামেচি শুনে সরকার হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। 'আরে হয়েছে কী? মরতে-পিটতে চেঁচাচ্ছ কেন?' কুলুঙ্গির পর্দা তখনও থেকে-থেকে কাঁপচে।

'ওই-ওই-ওই দেখুন, ওই পর্দার আড়ালে, ও বাবা গো, কী হবে গো...' বলরামের প্রায় ফিট হওয়ার অবস্থা আর কি।

সেই রাত্রে একটা কিছু ঘটনা ঘটবে—সেইজন্য সুরজিৎ আগে থেকেই সতর্ক ছিল। চিৎকার শুনে সে নিচে নেমে এল।

'এই, কী, হয়েছে কি?'

বলরাম শুষ্ক গলায় বললে, 'সেই মুখোশ-পরা ভূত।' ইতিমধ্যে অণিমাও এসে হাজির। অণিমা জিগ্যেস করল, 'মুখোশ-পরা ভূত? কোথায়?'

চিনা পাচকটি পর্দার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে অস্ফুট কণ্ঠে বলল, 'ইয়াং, তুং লুং।

কুলুঙ্গির কাছে গিয়ে সুরজিৎ সজোরে পর্দায় টান দিতেই একটি ছোট্ট বিড়ালছানা মেঝেতে লাফিয়ে পড়ল। একে নিয়েই এত কাণ্ড, দু-দুটো জোয়ান মরদ ভয়ে হিমসিম! সুরজিৎ ও অণিমা হাসি চেপে রাখতে পারল না। বলরাম ও চিনা পাচকটি নিজেদের বোকামি বুঝতে পেরে দাঁত বার করে হাসল।

সুরজিৎ খুব জোরে ধমক দিল বলরামকে, 'হতভাগা, ইডিয়ট কোথাকার। আবার হেসে গড়াগড়ি যাচ্ছে।' তারপর অণিমার দিকে তাকিয়ে ঈষৎ অনুযোগের সুরে বলল, 'আচ্ছা, আপনি এখানে এলেন কেন? আপনাকে না ঘরে থাকতে বলেছিলাম?'

'ঘর আমি বন্ধ করে এসেছি।' শান্ত কণ্ঠে অণিমা উত্তর দিল।

'তা হলেই তো সব করেছেন।' উদ্বেগে চঞ্চল হয়ে উঠল সুরজিৎ। 'এতক্ষণে বোধহয় যা হওয়ার হয়ে গেছে, আসুন শিগগির।'

সুরজিৎ দ্রুত ওপরে উঠে গেল।

অণিমা তাকে অনুসরণ করল। সুরজিতের মন আশঙ্কায় পরিপূর্ণ। অণিমার সামান্য একটু ভুলের জন্য হয়তো তার আজকের ফন্দিটুকু ব্যর্থ হবে, তার এখানে থাকার আসল উদ্দেশ্যটাই বিফল হবে। আসামিকে চিহ্নিত করবার এতবড় সুযোগ হারালে, হয়তো এ খুনের কিনারা কেউ কোনওদিন করতে পারবে না।

সুরজিৎ যা আশঙ্কা করেছিল, তাই হয়েছে। অণিমার সাময়িক অনুপস্থিতির সুযোগে কেউ তার ঘরে ঢুকেছে। সুরজিৎ ও অণিমার পায়ের শব্দ পেয়েই সে সাবধান হল এবং চট করে আলো নিভিয়ে দিয়ে এক কোণে ঘুপটি মেরে দাঁড়াল। রুদ্ধ আশঙ্কা বুকে নিয়ে দরজা ঠেলে সুরজিৎ ও অণিমা ঘরে ঢুকতেই, সেই ফাঁকে সে দ্রুতপদে বারান্দা দিয়ে ছুটে পালাল।

'ওই যে মুখোশধারী, পালিয়ে যাচ্ছে।' বলেই সুরজিৎ ও অণিমা তার পিছনে ধাওয়া করল। কিন্তু তাজ্জব ব্যাপার, বারান্দার ডান দিকের সেই করিডরে এসে গতদিনের মতো মুখোশধারী মূর্তিটি হঠাৎ যেন হাওয়া হয়ে মিলিয়ে গেল। সুরজিৎ টর্চের আলো জ্বেলে বারান্দার ডানদিকে অবস্থিত বিশেষ করিডরের প্রান্তে গিয়ে উপস্থিত হল। করিডর সেখানে শেষ হলেও সুরজিতের সন্দেহ হল এর শেষ প্রান্তে এমন কোনও গুপ্তপথ আছে যা দিয়ে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া যায়। সুরজিৎ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা শুরু করল—তার প্রথম থেকেই ধারণা হয়েছিল, এ মুখোশধারী অপদেবতা নয়, মানুষ-বেশি শয়তান বিশেষ। অণিমা পিছনে এসে দাঁড়াল, 'কী, আজকেও কি সেই ব্যাপার?'

'হ্যাঁ, আশ্চর্য,' মুখ না তুলেই জবাব দিল সুরজিৎ। 'আজ আর আমার কোনও সন্দেহ নেই যে এখান থেকেই সে পালিয়েছে।'

'কিন্তু এখান থেকে তো পালাবার কোনও রাস্তাই নেই। সব দিকই বন্ধ।'

'সে জন্যেই তো ভাবছি, এখানে কোথাও কোনও গোপন পথ নিশ্চয়ই আছে।'

পিছনে ডাক্তারের কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া গেল। 'কী গোপন পথ খুঁজছেন সুরজিৎবাবু?'

ডাক্তারের দিকে বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করে কঠিন স্বরে সুরজিৎ বলল, 'খুঁজছি, যে পথ দিয়ে নিশাচরেরা যাতায়াত করে।'

'তাহলে নিশাচরদেরই আগে ধরবার চেষ্টা করলে সুবিধে হয় নাকি? গোপন পথের রহস্য তা হলে আপনা থেকেই মীমাংসা হয়ে যাবে।' ঈষৎ শ্লেষের সুরে ডাক্তার বললেন।

'আপনার উপদেশের জন্য ধন্যবাদ,' অবজ্ঞার কণ্ঠে বললে সুরজিৎ। 'এই যে সরকারমশাই...'

সরকারমশাই এসে দাঁড়ালেন।

সুরজিৎ জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, এ-বাড়ির ভিতর লুকোনো রাস্তাটাস্তা কোথাও কিছু আছে কি না জানেন?'

'লুকোনো রাস্তাটাস্তা?' এধরনের প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না সরকার। তাই ইতস্তত করে বললেন, 'আজ্ঞে, আমি তো কিছু জানি না। এ-বাড়ির যা কিছু ব্যাপার, কর্তাবাবুরই জানা ছিল, তবে তিনি যদি ডাক্তারবাবুকে কিছু বলে গিয়ে থাকেন।'

সরকারের কথা শুনে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন ডাক্তার। উত্তেজিত কণ্ঠে শাসিয়ে বললেন, 'ডাক্তারবাবুকে বলে গিয়ে থাকেন, এ-কথার মানে? একটু সাবধান হয়ে কথা বলবেন সরকারমশাই। আপনি কী বোঝাতে চাইছেন? রাজীববাবু মারা যাওয়ার পর এ-বাড়ির সব রহস্য আমিই শুধু জানি। তার মানে আমিই সমস্ত ব্যাপারের মূলে আছি!'

দীননাথ ইতিমধ্যে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে সেখানে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'এত রাগারাগি কেন? কী হয়েছে কি?' সরকারমশাই নালিশ জানালেন, 'দেখুন দিকি, ডাক্তারবাবু মিছিমিছি আমার ওপর রাগ করছেন। আমি শুধু বলেছি যে, এ-বাড়ির

লুকোনো রাস্তাটাস্তা যদি কিছু থাকে, তাহলে কর্তাবাবুই শুধু তা জানতেন, আর ডাক্তারবাবুকে বিশ্বাস করে তিনি হয়তো কিছু বলে গিয়ে থাকতে পারেন।'

'আমাকে বিশ্বাস করে বলে থাকতে পারেন? আমি তো একবছর মাত্র এসেছি, আর আপনি এখানে পাঁচ বছর ধরে আছেন। বলে থাকলে, আপনাকেই সেসব কথা বলেননি, তার প্রমাণ কী?' সরকারমশাই-এর ওপর পালটা অভিযোগ আনলেন ডাক্তার।

দীননাথ উভয়কে শান্ত করে বললেন, 'কিন্তু আপনারা বোধ হয় মিছে ঝগড়া করছেন। এ-বাড়িতে লুকোনো রাস্তাটাস্তা যদি থাকে, তা হলে রাজীবই যে তা জানত, তাই বা কী করে বলা যায়। এ-বাড়ি তো আজকের নয়। বহু পুরানো কালের বাড়ি। বাবা এটা তাঁর সময়ে যখন কিনেছিলেন তখনই এটা অত্যন্ত প্রাচীন। তারপর রাজীব...'

সরকার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললেন, 'আজ্ঞে, তা হলেও কর্তাবাবু এর অনেক অদলবদল করেছিলেন। গোপনে কীসব তৈরিও করেছিলেন, কানাঘুষায় তাও শুনেছি।'

দীননাথ বেশ একটু অবাক হয়ে বললেন, 'ওঃ, শুনেছেন। তাহলে আমার অবশ্য কিছু বলবার নেই। কিন্তু লুকোনো রাস্তাটাস্তা কিছু থাকলে তা কি আর বার করা যাবে না!'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সুরজিৎ বলল, 'যাবে বলেই আশা করি—আচ্ছা, এখন আর মিছে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আসুন অণিমাদেবী।'

অণিমাকে নিয়ে সুরজিৎ চলে গেল। দীননাথও খোঁড়াতে-খোঁড়াতে অগ্রসর হলেন। শুধু সরকারের পানে তীব্র বিষ নিক্ষেপ করে রাগে গরগর করতে-করতে ডাক্তার সে স্থান ত্যাগ করলেন।

সুরজিতের সঙ্গে ক্ষিপ্রপদে ঘরে ঢুকল অণিমা। তার মন অজানা আশঙ্কায় ভরে উঠেছে। অণিমা চঞ্চলভাবে দেরাজ টেনে খুললে। কিন্তু দেরাজ শূন্য, উইল নেই। পাষাণমূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অণিমা।

সুরজিতের বুঝতে আর বাকি রইল না। সর্বনাশ যা হওয়ার, তা আগেই হয়ে গেছে। তবু জিগ্যেস করল, 'কী, নেই তো? আজ যে কাজ হাসিল না করে সে যায়নি, তা আগেই বুঝেছিলাম।' সুরজিৎ সহজ গলায়ই বলল। তার বিশেষ কোনও ভাবান্তর লক্ষ করল না অণিমা। যেন এ-ব্যাপারে বিশেষ ক্ষতি হয়নি, সুরজিতের তেমনি মনের ভাব।

অণিমা জিগ্যেস করল, 'আপনি যেন উইল চুরিতে বিশেষ দুঃখিত নন মনে হচ্ছে?'

হালকা সুরে সুরজিৎ জবাব দিল, 'চুরি নয়, চুরির ওপর বাটপাড়ি বলুন। তবে দুঃখিত সত্যিই খুব নয়। বলেছিলাম না, এ-উইল হল টোপ। মাছে টোপ গিললেই তখন তাকে খেলিয়ে তোলা যায়, তা ছাড়া কী টোপ খায় দেখে, মাছের জাতও চেনা যায়।' এই বলে হাসতে লাগল সুরজিৎ। অণিমার বুক থেকে একটা পাষাণভার নেমে গেল। তার অসতর্কতার জন্য আজ যে সুযোগ নষ্ট হচ্ছিল, ভাগ্যিস তা কোনও ক্ষতির কারণ হয়নি। সুরজিৎবাবু পাকা ডিটেকটিভ, তাঁর হাতে অত সহজে কাজ পণ্ড হয় না। উইল নেই দেখে অণিমার মুখের রং ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। সুরজিৎকে হাসতে দেখে সে অনেকটা সাহস পেলে। বলল, 'উইল যাতে চুরি না যায়, সেজন্যও সাবধানের মার নেই, আবার হারিয়ে গেলেও বলবেন, মাছে ঠিক টোপ গিলেছে। আপনাদের, গোয়েন্দাদের হালচাল বোঝা সত্যি কঠিন।'

সুরজিৎ হাসতে-হাসতে জবাব দিল, 'সব হালচাল বুঝতে পারলে, আপনিই তো

একজন ফার্স্টক্লাস গোয়েন্দা হয়ে যেতেন। যাক, আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমোন। আমি চললাম।'

অণিমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিঃশব্দে ডাক্তারের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালে সুরজিৎ। সারা বাড়ি নিস্তব্ধ, কেমন যেন থমথমে ভাব। চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখল, কেউ কোথাও নেই। তারপর পা টিপে-টিপে ডাক্তারের ঘরে ঢুকল। ডাক্তার তখনও ফেরেননি। একটার পর একটা দেরাজ খুলে.তন্ন-তন্ন করে তল্লাশি করে আবার বন্ধ করে রাখল। হঠাৎ একটা দেরাজে একজোড়া চশমা বেরিয়ে পড়ল। সুরজিতের চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি চশমাজোড়া পকেটে রেখে সে দরজা বন্ধ করে অদৃশ্য হল।

আট

জানলা থেকে খানিকটা দূরে চিনে পাচকের বিছানায় বলরাম শুয়েছিল। চিনে রাঁধুনি তাকে বিছানা থেকে তোলবার চেষ্টা করছিল। কারণ জানলার কাছের বিছানায় শুতে কেউ রাজি নয়, যদি আবার খুনে-ভূত জানলা দিয়ে গলা বাড়ায়!

চিনে পাচক বিকৃত মুখভঙ্গি করে বলল, 'ওযাং কিং নাং হুং..'

বলরাম মরিয়া হয়ে উঠেছে, 'উঁহু, যতই চিনে মন্তর পড়ো না কেন, আজ আমি এ বিছানা থেকে উঠছি না। বাড়ি থেকে জলজ্যান্ত লোক এক কথায় অক্কা পেযে যাচ্ছে, আব ওই জানলার ধারে আমি কখনও শুই?'

ভীষণ রেগে গিয়ে চিনা পাচক বলল, 'ইয়াং, তোং, লাং...ক্যা মুশকিল।'

চিনে পাচকের মুখে হিন্দি বুলি শুনে তড়াক করে বিছানায় উঠে বসল বলবাম, 'কী-কী বললে?'

পাচক তার মুহূর্তের ত্রুটি সংশোধনের জন্য আরও দুর্বোধ্য ভাষায বিকট উচ্চারণ করে বললে, 'তুং সাং, নি লাউ চু, কিং।'

বলবাম ছাড়বার পাত্র নয়। বললে, 'উঁহু, ওসব চালাকিতে আর আমি ভুলছি না। আমি নিজেব কানে শুনেছি, 'ক্যা মুশকিল'—না? চিনে ভাষা ছাড়া কিছু তুমি জানো না, কেমন? ক-দিন চিনে ভাষা বলে-বলে আমার কানের পোকা বার করে দিয়েছ!'

অনুনয়ের সুরে কাতরভাবে বলল চিনে রাঁধুনি, 'ওয়া সু তিং লু কাং।'

বলরাম আরও চেপে ধরল। 'ওঃ, সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না। আচ্ছা, আমি গিয়ে সবাইকে বলছি, দেখি তারা কী বলে।'

বলরাম যাওয়ার উদ্যোগ করলে।

গভীর হতাশায় চিনে পাচক শেষবারের মতো আবেদন জানালে, 'এই ভাই...'

'কেন, এখন ভাই কেন? "তুং সাং লাউ চুং" বলে কান ঝালাপালা করতে পারো না? দাঁড়াও, বার করছি তোমার সব বুজরুকি...'

চিনে পাচক বললে, 'হাত জোড় করছি, কাউকে বলিস না...'

'কেন, বলব না, কেন? আলবৎ বলব। ক-দিন চুংচাং করে তুই আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিস।'

'বড় মুশকিল আছে ভাই। বাড়িতে খুন হইয়েছে। দোসরা কিছু বললে পুলিশ জেরা করবে। জুলুম করবে। তাই খালি চিনে বুলি বলি, ঝামেলা নেই।'

'আচ্ছা, ঝামেলা আছে কি না দেখাচ্ছি,' বলরাম শাসালে।

'এই ভাই।' মিনতি করলে চিনে পাচক, 'কাউকে বলবে না। আমি, আমি তোকে

চণ্ডু খিলাবো।'

'কী খাওয়াবে, চণ্ডু! সে আবার কী?' চণ্ডুর নাম শুনে খুবই উৎসাহ বোধ করল বলরাম।

'ভারি মজাদার, একটান, আর সব ভোঁম।' চিনে পাচক মুখভঙ্গি করে এমন ভাব প্রকাশ করতে চাইলে যে চণ্ডু টানলে সারা দেহ-মন এক অদ্ভুত সুখ শিহরণে আবেশচঞ্চল হয়ে ওঠে।

বলরাম জিগ্যেস করলে, 'ভোঁম কিরে?'

'হ্যাঁ, ভোঁম।' এই বলে চিনে পাচক মহা উৎসাহে চণ্ডু তৈরি করলে। বলরাম জীবনে কখনও চণ্ডু টানেনি। প্রথম টানেই তার মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল, তারপর ক্রমশ সে চণ্ডুর নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। সারা ঘর ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে ভরে উঠেছে।

বলরাম নেশা জড়ানো সুরে বলল, 'ভোঁম।' চিনে পাচক পুনরুক্তি করলে, 'ভোঁম।'

মৌতাত খুব জমে উঠেছে। বলরাম জানলার কাচেব দিকে তাকিয়ে বললে, 'আরে দেখ, দেখ, পুলিশগুলোর মজা দেখ, জমে যাচ্ছে আর গলে যাচ্ছে।' বলরামের চোখের সামনে এমনি সব অদ্ভুত ছবি ভেসে উঠল, পুলিশগুলো জমে যাচ্ছে আবার পরক্ষণেই ঝাপসা হয়ে গলে যাচ্ছে। খানিক বাদে, বলরাম দেখতে পেল, তার চোখের সামনে পুলিশগুলো যেন সব মেয়ে হয়ে গেছে। খুবই কৌতুক বোধ করল। খুশির আতিশয্যে চেঁচিয়ে উঠল বলরাম, 'বাঃ, কী মজা দেখছিস? পুলিশগুলো সব মেয়েলোক হয়ে যাচ্ছে।' এই বলে সে নেশার ঘোরে উঠে দাঁড়াল।

চিনে পাচক পুরানো চণ্ডুখোর। নেশায় সে খেই হারায় না। সে বাধা দিয়ে বলল, 'আবে, আরে কাঁহা যাতা?' বলরামের তখন নেশার আমেজ। নেশার ঘোরে চোখের সামনে সব আজগুবি দৃশ্য দেখছে। বললে, 'আরে মজাটা দেখতে হবে না? সব পুলিশ মেয়ে হয়ে গেছে।' মনে তার ফূর্তির তুফান, তাকে রুখবে কে?

হঠাৎ বলরাম দেখতে পেল, একটি মেয়ে তরতর করে হেঁটে যাচ্ছে। বলরামের ভারি ফূর্তি হল মেয়েটিকে দেখে। জীবনে এমন মশগুল হয়ে আর কোনওদিন আনন্দ উপভোগ করেনি সে। চণ্ডুর নেশার এমনি মাহাত্ম্য! বলরাম হাসতে লাগল। প্রাণে খুশির জোয়ার উঠলেই, হাসিতে উপচে পড়ে সে উল্লাস। বলবাম যেন স্বপ্নের আকাশে পাখা মেলে উড়ছে। বাস্তব জীবনে যা তার কল্পনাতীত, নেশার ঘোরে তারই স্বপ্ন-ছবি দেখে আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠেছে বলরাম।

মেয়েটি সত্যিই সুশ্রী, যৌবন তার অঙ্গে উথলে উঠেছে, চলার ভঙ্গিটাও ভারি চমৎকার, যা দেখছে, তাই অপূর্ব, অপরূপ বলে মনে হচ্ছে বলরামের। কিন্তু হঠাৎ এ কী হল? সুন্দরী তরুণী রূপান্তরিত হল মুখোশধারী মূর্তিতে। আতঙ্কে শিউরে উঠল বলরাম। সেই খুনে-ভূত, এক্ষুনি তার ঘাড় মচকাতে লাফিয়ে পড়বে। সন্ত্রস্তভাবে ছুটে পালাল বলরাম।

বাইরের বারান্দায় বসে হিন্দুস্থানি কনস্টেবল পাহারা দিচ্ছিল। চারদিক নিরিবিলি দেখে খৈনি মুখে পুরে বেচারা এই ফাঁকে একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছিল। কিন্তু তারও কি জো আছে! হুড়মুড় করে প্রায় ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল বলরাম।

'এই সিপাইজি, সিপাইজি, আরে ওঠো না গো, কী পড়ে-পড়ে ঘুমাতা হ্যায়।'

সবে মাত্র দু-চোখ এক করেছে বেচারা, এরমধ্যে এই উৎপাত। বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে কনস্টেবল বললে, 'আরে কেয়া দিক করতা হ্যায়।'

বলরাম আরও ব্যস্ত হয়ে বলল, 'আরে সাধে করতা হ্যায়, এদিকে সর্বনাশ হ্যায়, সেই মুখোশ-পরা ভূত ফিরে আয়া হ্যায়।'

সিপাইজির ঘুম ততক্ষণে টুটে গেছে।

হাতের লাঠিটা শক্ত করে বাগিয়ে বললে, 'কেয়া বোলতে হো? মুখোশ কেয়া?'

'আরে মুখোশ, মুখোশ,' বলরাম বেকুব সিপাইটাকে নিয়ে উত্যক্ত হয়ে উঠল। 'এ তো ভালো জ্বালা হল, এই-সা করকে মু-মে দেকে ডর দেখাতা হ্যায়।' বলরাম অঙ্গভঙ্গি করে সিপাইকে বোঝাতে চাইলে। বললে, 'তুমি জলদি আও না, দেখিয়ে দেগা হ্যায়।'

সিপাই তাকে হটিয়ে দিলে। 'যাও—যাও, দিক মৎ করো। হাম হিঁয়া বৈঠা হ্যায়, কুছ ডর নেহি।' সিপাইজিকে কিছুতেই নড়ানো যাবে না ভেবে হতাশায় হাল ছেড়ে দিল বলরাম।

'না, হতভাগার মাথায় শুধু গোবর পোরা।' এখানে কোনও সাহায্য না পেয়ে বলরাম হাঁপাতে-হাঁপাতে সুরজিতের কামরায় গিয়ে হাজির হল। সুরজিৎ কিছু জিগ্যেস করবার আগেই বলরাম রুদ্ধশ্বাসে বললে, 'আমি একেবারে টেরিফিক স্যার।'

বলরামের ইংরেজি বকুনির সঙ্গে সুরজিতের পরিচয় ছিল। তাই সে ঈষৎ কৌতুকের স্বরে বললে, 'টেরিফিক?'

'হ্যাঁ, স্যার, ভয়ে সমস্ত বডি একেবারে আইসক্রিম।'

ততক্ষণে বলরামের নেশা কেটে গেছে। মুখোশধারী মূর্তির কথা মনে হতেই বার-বার তার শরীরটা ভয়ে কেঁপে উঠছে।

সুরজিৎ কথার সঠিক অর্থোদ্ধার করতে না পেরে জিগ্যেস করলে, 'আইসক্রিম, কী—বকছিস কী?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ভয়ে সমস্ত শরীর একেবারে হিম।'

এবার সত্যিই রাগ হল সুরজিতের। বললে, 'একেবারে হিম হলে তো বাঁচতাম। কী, হয়েছে কি, ঠিক করে বলবি, হতভাগা?'

ভীতি-বিহ্বল কণ্ঠে বলরাম বললে, 'আজ্ঞে, সেই মাসক্‌ড টেরর স্যার, আমায় ক্যাচ করে ফেলেছিল আর কী!' বলরাম যেন চোখেব সামনে সে আবরণধারী ছায়ামূর্তিকে দেখতে পাচ্ছে। মুহূর্তে সমস্ত ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হল সুরজিতের। গভীব আগ্রহে জিগ্যেস করলে, 'কোথায়, কোথায় দেখেছিস তাকে?'

'আজ্ঞে, ওই নিচে সরকারমশাই-এর ঘরের দিকে গেল। নিচে আর আমি যাচ্ছি না, স্যার, আমায়...' ভয়ে বুঝি এক্ষুনি কেঁদে ফেলবে বলরাম।

'থাম হতভাগা,' এই বলে বলরামকে পিছনে ঠেলে দ্রুত বেরিয়ে গেল সুরজিৎ। মুখোশধারী মূর্তি কি সুরজিতের পৌঁছবার আগেই কার্য সিদ্ধ করে অদৃশ্য হয়ে যাবে?...

নয়

সরকারমশাই অনেকক্ষণ থেকে ঘুমোবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু ঘুম কি সহজে আসে? রাজীবলোচনের আকস্মিক হত্যা, করিডরের প্রবেশমুখে মুখোশধারী মূর্তি অদৃশ্য হয়ে যাওয়া, এইসব নানা দুশ্চিন্তায় সরকারমশাই-এর মন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। চৌধুরিগড়ে এ কীসব লণ্ডভণ্ড কাণ্ড শুরু হল! গত পাঁচ বছরে এমন ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়নি তাঁকে। তবে এসব অপদেবতার দৌরাত্ম্য নয়, চৌধুরিগড়েরই কোনও শত্রুর শয়তানি, এ বিষয়ে

তাঁর ধারণা ক্রমশ বদ্ধমূল হচ্ছিল, আশ্চর্য ব্যাপার এই যে এ-বাড়িতেই লোকটি স্বচ্ছন্দে বিচরণ করছে! কিন্তু কে সেই ভদ্রবেশি শয়তান? অনেকের নামই তাঁর মনে উদিত হল, কিন্তু নিশ্চিত প্রমাণ না পেলে তো শুধু সন্দেহের বশে কাউকে ধরতে পারা যাবে না। সুরজিৎবাবু পাকা গোয়েন্দা তিনি কতদূর কী করতে পারেন, এই ভরসাতেই চুপ করে রইলেন সরকারমশাই। উপযাচক হয়ে কিছু বলতে গেলেই তো সবাই মারমুখো হয়ে ওঠেন। ডাক্তারের চোখ রাঙানিটা এত সহজেই ভুলে যাননি সরকারমশাই। তিনি তো এমন দোষের কথা কিছু বলেননি। কারও ওপর কোনও ইঙ্গিতও করেননি। শুধু বলেছিলেন কর্তাবাবুর বিশেষ সুনজরে ছিলেন ডাক্তার। তাঁদের মধ্যে অনেক গোপন আলোচনাই হতো। কর্তাবাবু এ-বাড়ির কী-কী ভেঙে নতুনভাবে তৈরি করিয়েছিলেন তা ডাক্তারের জানা খুবই সম্ভব। কিন্তু এই কথা বলামাত্র ডাক্তার যেভাবে তেড়ে উঠলেন, যেন মনে হল, সরকার এমন কোনও গোপন তথ্য ফাঁস করে দিচ্ছেন, যাতে ডাক্তার এক্ষুনি খুনের দায়ে ধরা পড়বেন। এতে শুধু ডাক্তারের দুর্বলতাই ফুটে উঠেছে। একমাত্র আঁতে ঘা না পড়লে লোক এমনভাবে বেসামাল হয় না। নিশ্চয়ই ডাক্তারের এমন কিছু জানা আছে...থাক, এ-নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করে লাভ নেই।

রাত কম হয়নি। বাড়িতে যেরকম উৎপাত শুরু হয়েছে, তাতে ক-রাত্রি যে এভাবে দুর্ভোগ পোহাতে হবে কে জানে। আলো নিভিয়ে ক্লান্ত দেহকে বিছানায় এলিয়ে দিলেন সরকারমশাই। বয়স হয়েছে, এত ধকল তাঁর শরীরে আর সহ্য হয় না। চারদিক নিস্তব্ধ, অথচ মনে হচ্ছে সবাই এখনও জেগে। তাদের গলার আওয়াজ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না, কারণ তারা হয়তো কথা কইছে খুব নিচু গলায়। মনে হচ্ছে এই সুযোগে আসামি যেন তার শয়তানি মতলব হাসিল করবার ফিকিরে আছে। এই স্তব্ধতা হয়তো একটা প্রচণ্ড ঝড়ের পূর্বাভাস।

হঠাৎ খুট করে কী একটা শব্দ হল। সরকারের একটু তন্দ্রার মতো হয়েছিল। তিনি চকিতে সজাগ হয়ে উঠলেন, কিন্তু অন্ধকারে চোখ মেলে কিছুই দেখতে পেলেন না। একটু চুপ করে থেকে সরকারমশাই হঠাৎ উঠে সুইচটা টিপে আলো জ্বাললেন। পর-মুহূর্তেই ভয়ে তাঁর সমস্ত শরীর কাঠ হয়ে গেল। অদূরে তাঁর সামনে সেই মুখোশ-পরা মূর্তি দাঁড়িয়ে। ঘরের সমস্ত দরজা-জানলা তিনি বন্ধ করে শুয়েছেন। এ-মূর্তি তাহলে কোথা থেকে উদয় হল! হঠাৎ পাশের শেলফের দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ল। এতদিন যা দেয়াল-আলমারি বলে জানতেন, সেইটেই এখন দরজার মতো আধখোলা হয়ে রয়েছে।

বোঝা গেল এইটেই গুপ্ত পথের দ্বার। কিন্তু এসব ভাববার তখন আর সময় নেই। মুখোশধারী ধীরে-ধীরে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। সরকারমশাই সাপের চোখে চোখ-পড়া শিকারের মতো মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। একেবারে সামনে এসে সে মূর্তি হঠাৎ মুখোশটা খুলে ফেললে। সরকারমশাই অস্ফুটকণ্ঠে ভয়বিস্ফারিতনেত্রে চিৎকার করে উঠলেন, 'আপনি!'

তারপর বজ্রমুষ্টির নিষ্পেষণে তাঁর আর্তনাদ রুদ্ধ হয়ে গেল।

বলরামেব কাছ থেকে "মাসক্‌ড টেররের" সংবাদ পেয়ে দ্রুতপদে মুখোশধারীর সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছিল সুরজিৎ। এর মধ্যেই যে এখানে আর একটা বীভৎস কাণ্ড ঘটবে এতটা সে ধারণা করতে পারেনি। আর্তনাদ শুনে দ্রুতবেগে সরকারের ঘরের দিকে সে ছুটে গেল।

চিৎকার শুনেই বোধহয় ডাক্তার আগেই এসে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিলেন, 'দরজা খুলুন, সরকারমশাই দরজা খুলুন আমি ডাক্তার...দরজা খুলুন।'

সুরজিৎ বললে, 'দরজা অমনিতে খুলবে না। ভেঙে ঢুকতে হবে। ভয়ানক বিপদে না পড়লে কেউ এমনভাবে চিৎকার করে ওঠে?'

অবশেষে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে যে দৃশ্য তাঁদের চোখে পড়ল তাতে তাঁরা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। সরকারের একটা কিছু বিপদ ঘটেছে, তা তাঁরা আঁচ করেছিলেন, কিন্তু তা বলে এমনই বীভৎস দৃশ্য...গলায় দড়ি বাঁধা অবস্থায় দেয়ালে সরকারমশাই-এর দেহ ঝুলছে। অণিমা এসে পিছনে দাঁড়িয়েছিল। সরকারমশাই-এর এই পরিণতি দেখে তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, তার মুখ দিয়ে কথা বের হল না।

সুরজিৎ ও ডাক্তার সরকারের দেহকে বন্ধনমুক্ত করে বিছানায় শোয়ালেন। নাড়ি অনুভব করে আর চোখের পাতা টেনে বার-দুই পরীক্ষার পর ডাক্তার বললেন, 'না, একেবারে শেষ হয়ে গেছে।'

'কিন্তু গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা মনে হয় কী?' সুরজিৎ ডাক্তারের মন বুঝবার চেষ্টা করলে।

সুকৌশলে প্রশ্নটি এড়িয়ে গেলেন ডাক্তার, 'আপনার কী মনে হয়?'

সুরজিৎ বললে, 'আমার মনে হয়, গলার দড়িটা শুধু চোখে ধুলো দেওয়ার চেষ্টা, তার আগে গলা টিপে ওঁকে মারা হয়েছে। গলায় আঙুলের স্পষ্ট দাগ রয়েছে।'

ডাক্তার সায় দিয়ে বললেন, 'আপনার বুদ্ধির তারিফ করছি সুরজিৎবাবু। খুনি ধরতে না পারেন, খুনের কৌশলটা ঠিকই ধরেছেন।'

কঠিন সুরে সুরজিৎ বললে, 'খুনের কৌশল থেকেই খুনিকে শেষ পর্যন্ত ধরা যায়। একথাটা বোধ হয় আপনার জানা নেই ডাক্তারবাবু। খুনির কৌশলের বাহাদুরিই শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যুবাণ হয়ে দাঁড়ায়।'

ইতিমধ্যে পাহারারত দুজন পুলিশ সরকারের ঘরে এসে উপস্থিত হয়েছিল। তাদের লক্ষ করে সুরজিৎ বললে, 'একজন তোমরা লাশের কাছে থাকো আর একজন থানায় দারোগা সাহেবকে খবর দাও...'

একজন পুলিশ তৎক্ষণাৎ সে আদেশ পালন করতে থানায় রওয়ানা হল। অণিমাও চলে যাচ্ছিল। ডাক্তার জিগ্যেস করলেন, 'তুমিও চলে যাচ্ছ নাকি অণিমা?'

'হ্যাঁ, আমি আর দেখতে পারছি না।' এই বলে অণিমা চলে গেল। তার ভারী গলার স্বরে মনে হল এই অমানুষিক হত্যাকাণ্ডে সে অত্যন্ত বিচলিত হয়েছে। কিন্তু দরজা অতিক্রম করবার আগেই দীননাথের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হল।

দীননাথ ব্যগ্র কণ্ঠে জিগ্যেস করলেন, 'কী, কি হয়েছে মা, সরকারমশাই নাকি আত্মহত্যা করেছেন?'

'না, আত্মহত্যা নয়। ওঁদের জিজ্ঞাসা করুন।' অনাবশ্যক প্রশ্নের জবাব এড়াবার জন্য সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করে অণিমা নিজের কামরার দিকে দ্রুত চলে গেল। এখানকার আবহাওয়া তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। খুনের পর খুন, আতঙ্কের পর আতঙ্ক, উঃ, কী ভীষণ শ্বাসরোধকারী অবস্থা। অণিমার মাথা ঝিমঝিম করছে।

দীননাথ ঘরে প্রবেশ করে ব্যাপারটা আঁচ করবার জন্য চারিদিকে একবার তাকালেন।

সুরজিৎ অনুযোগের সুরে বললে, 'আপনি আবার কেন এলেন দীননাথবাবু?'

'আমি না এসে পারলাম না যে।' দীননাথ কাতর কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'এ-ব্যাপার কেমন করে সম্ভব? ওই নিরীহ বেচারা সরকারকে...'

ডাক্তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জবাব দিলেন, 'আমাদের মধ্যেই কেউ নিঃশব্দে পৃথিবী থেকে সরিয়েছে!'

'আমাদের মধ্যে কেউ?' মুহূর্তের জন্য বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে সকলের দিকে তাকালেন দীননাথ। তারপর বললেন, 'আমাদের মধ্যে কেউ তো নিশ্চয়ই। বাইরের কারুর দ্বারা তো একাজ সম্ভব নয়। কিন্তু কেন? ওই নিরীহ বৃদ্ধ সরকারমশাই-এর মতো লোকের বিরুদ্ধে কার কী আক্রোশ থাকতে পারে? এই তো কাল ডাক্তারবাবু ওঁকে কী জন্য বকছিলেন, তা মুখ তুলে একটা প্রতিবাদ পর্যন্ত...'

কথা শেষ করতে দিলেন না ডাক্তার। ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, 'আপনার কথার ইঙ্গিত কী দীননাথবাবু?'

এরমধ্যে যে-কোনও ইঙ্গিত থাকতে পারে, তা ভেবেই পেলেন না দীননাথবাবু, সরল কণ্ঠে বললেন, 'ইঙ্গিত, না-না, ইঙ্গিত আমি করব কেন? সত্যি বলছি, কোনও ইঙ্গিত আমি করিনি।'

'না করে থাকেন ভালো।' ডাক্তার অনেকটা নিজের সাফাই গাইবার সুরে বললেন, 'তবু বলছি, আমি ডাক্তার, সরকাবকে খুন করতে হলে, এরচেয়ে অনেক সূক্ষ্ম উপায় আমার জানা ছিল।'

সুরজিৎ টিপ্পনী কেটে বললে, 'পরিচয় গোপন করবার জন্য বুদ্ধিমান খুনি তার কৌশল বদলেও দেয় ডাক্তারবাবু।'

ডাক্তার কোনও জবাব দেওয়ার আগেই সুরজিৎ বললে, 'আমার এখানের কাজ শেষ হয়েছে। দারোগাবাবু এলে পর, যা হয় তিনিই করবেন।' এই বলে সুরজিৎ চলে গেল।

দশ

অণিমা নিজের ঘরে গভীর হতাশায় চুপ করে বসেছিল। এসেছিল নার্সের চাকরি নিয়ে টাকা রোজগার করতে, কিন্তু কে জানত, তাকে এমনিভাবে পাকে-পাকে জড়িয়ে পড়তে হবে! কত আকাশ-পাতাল কল্পনা করছিল অণিমা। সরকারমশাইকে এমন নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করলে কে? সরকারমশাই-এর ওপর কার কী রাগ থাকতে পারে? তবে কি এসব ওই অপদেবতার কীর্তি? সাধারণ মানুষের পক্ষে এমন অনায়াসে একটার পর একটা খুন করে গা ঢাকা দেওয়া কি সম্ভব?

অণিমার চমক ভাঙল সুরজিতের ডাকে, 'শুনুন অণিমাদেবী, একটা কাজ আপনাকে করতে হবে। একি এমনভাবে বসে আছেন কেন, কী হয়েছে?' অণিমার চিন্তামগ্ন, বিমর্ষ মুখের পানে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে সুরজিৎ।

'না, সুরজিৎবাবু, আমি ঠিক করেছি, কালই এখান থেকে চলে যাব।' বেশ জোরের সঙ্গেই বললে অণিমা।

'চলে যাবেন?' সুরজিৎ যেন কথাটা সহসা বিশ্বাস করতে পারলে না।

'হ্যাঁ, আমি আর পারছি না। সারাক্ষণ এই ভয় আর উদ্বেগ। এই খুনের পর খুন, মনে হচ্ছে এখানে থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব।' অণিমার বিচলিত ভাব দেখে মনে হল, একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় সে ছটফট করছে।

সুরজিৎ দৃঢ় মনোভাব অবলম্বন করলে। বললে, 'কিন্তু তবু চলে যেতে তো আপনি পারেন না অণিমাদেবী।'

কাটা ঘায়ে যেন নুনের ছিটে পড়ল। অণিমার ধৈর্য আর বাঁধ মানল না। চড়া সুরে বললে, 'কেন পারি না? আমি তো থাকব বলে দাসখত লিখে দিইনি। চোর দায়েও ধরা পড়িনি!'

অচঞ্চল ভাবে সুরজিৎ বললে, 'তা পড়েছেন বইকী। এই খুনের ব্যাপারে যাদের ওপর সন্দেহ পড়েছে, আপনিও তাদের একজন, তা জানেন?'

অবাক হয়ে গেল অণিমা। এমন অসম্ভব অভিযোগ সুরজিতের কাছ থেকে সে আশা করেনি। খুন করা তার পক্ষে সম্ভব,—সুরজিতের তাই কি বিশ্বাস হল? বললে, 'আমার ওপর সন্দেহ?'

'হ্যাঁ, সন্দেহ হবে নাই বা কেন?' গম্ভীরভাবে বললে সুরজিৎ, যেন এ-কথাকে ঠাট্টা বলে ভুল না করে।

'আপনি কে? কী উদ্দেশ্যে এখানে আছেন, তা কে জানে? বিশেষ করে আপনার সত্যিকাব পবিচয় যখন প্রকাশ হয়ে পড়বে...'

'সত্যিকার পরিচয়?' বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলে অণিমা।

'হ্যাঁ, আপনি যে শুধু জাল নার্স নন, পীতাম্বরবাবুর মেয়ে, একথা পুলিশের কাছে কতদিন চাপা থাকবে বলে মনে কবেন?'

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল অণিমা। সুরজিতেব কাছে তাহলে কিছুই অজানা নয়। তারপর জিগ্যেস কবল, 'একথা আপনি কী করে জানলেন?'

'ঠিক জানতাম না, এখন পরীক্ষা করে জানলাম আমার অনুমান সত্যি। শুনুন, জলে যখন ঝাঁপ দিযেই পড়েছেন, তখন মাঝ-নদীতে এসে ভয়ে হাত-পা ছেড়ে দিলে একূল-ওকূল দুই-ই যাবে। তাব চেয়ে মনকে শক্ত করুন। এ-রহস্যের কিনারা না হওয়া পর্যন্ত, শান্তি বা নিষ্কৃতি কিছুই আপনার নেই। তারপর যা বলতে এসেছিলাম, আজ বাত্রেই বড় রকম একটা কিছু ঘটবে বলে আমার বিশ্বাস। আর কিছু নয়, একটু বেশি সজাগ থাকা দরকার। আচ্ছা আমি চলি, আমাকে আগে থেকেই তৈরি হতে হবে।' এই বলে সুরজিৎ চলে গেল।

অণিমা মিনিটকয়েক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। জালে যখন সে জড়িয়ে পড়েছে, তখন ইচ্ছায হোক, অনিচ্ছায হোক, এব শেষ পর্যন্ত তাকে দেখতেই হবে। আজ রাত্রেই এ-রহস্যের কিনারা করা চাই। সাহসে বুক বেঁধে অণিমা বারান্দা অতিক্রম করে সেই বিশেষ করিডরে এসে দাঁড়াল।

সুরজিৎ আগেই সেখানে এসে গুপ্তপথের সন্ধানে খোঁজাখুঁজি শুরু করেছে।

অণিমা বললে, 'আজ রাত কি তাহলে জেগেই কাটাতে হবে সুরজিৎবাবু?'

'জেগে কাটালেই ভালো। তাহলে আর ঘুম ভেঙে ওঠার বিরক্তি পোহাতে হয় না।'

অণিমা এ-কথার আর কোনও উত্তর দিলে না। সুরজিৎ এখানে কিছু আবিষ্কার করতে না পেরে অন্যদিকে চলে গেল। অণিমা একটু অন্যমনস্কভাবে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ তার নজরে পড়ল, দেয়ালের কোণে একটি ছোট্ট সুইচ। এমনভাবে লুকোনো যে চট করে নজরেই পড়ে না। আনন্দে সে প্রায় লাফিযে উঠল। সুরজিতকে ডাকবে নাকি! কিন্তু তার আগে যদি কেউ এসে পড়ে। এই ভেবে সে সুইচ টিপতেই গুপ্তদ্বার খুলে গেল। অণিমা আর দ্বিধা না করে গুপ্তদ্বার দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল। চারদিক অন্ধকার। খানিকটা এগিয়েই সে কার পায়ের শব্দ শুনতে পেলে। অণিমা নিঃশব্দে দেয়ালে হেলান দিয়ে জড়সড় হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু চোখের সামনে যা দেখলে তাতে আর বিস্ময়ের সীমা রইল না। মুখোশধারী লোকটি রিভলবার

হাতে নিয়ে গুপ্তদ্বারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ লোকটার সন্দেহ হল—গুপ্তপথ দিয়ে কেউ ভিতরে প্রবেশ করেছে। সে কয়েক পা পেছিয়ে তার গুপ্তকক্ষে ফিরে যাওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল। অণিমা তাকে অনুসরণ করল। পিছন থেকে কেউ তাকে অনুসরণ করেছে বুঝতে পেরে মুখোশধারী পদক্ষেপ দ্রুত করল। অনেক বাঁক ঘুরে অনেক এঁকেবেঁকে বহুদূরে চলে গেছে এই গুপ্তপথ। একটি বাঁকে এসে হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে তার অনুসরণকারীকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লে মুখোশধারী। গুলি দেয়ালের গায়ে লেগে লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। গুলির শব্দ শুনে সুরজিৎ ছুটে এল সেই বিশেষ করিডরে। অণিমা ভিতরে ঢুকে সুইচ টিপে গুপ্তদ্বার বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিল। সুরজিৎ সবিস্ময়ে দেখলে গুপ্তদ্বার খোলা রয়েছে। সে ত্বরিৎপদে ভিতরে প্রবেশ করল, অণিমাকে পিছনে ফেলে মুখোশধারীকে ধরবার জন্য ছুটে গেল। মুখোশধারী বেগতিক দেখে দৌড়োতে শুরু করল। গুপ্তপথের সিঁড়ি এসে শেষ হয়েছে একেবারে নিচুতলায়। সেখানে সিঁড়ির শেষ প্রান্তে এসে সুরজিৎ দুই হাত দিয়ে মুখোশধারীকে জড়িয়ে ধরলে। দুজনের ধস্তাধস্তি শুরু হল। কিন্তু মুখোশধারীর পেশিতে যে অসীম বল, একটু পরেই বুঝতে পারলে সুরজিৎ—মুখোশধারী যুযুৎসুতে পারদর্শী। তাকে কাবু করা সহজ নয়। হঠাৎ লোহার দস্তানা দিয়ে সুরজিতের মাথায় এমন দারুণ আঘাত করলে মুখোশধারী, যে অতর্কিত আঘাত সইতে না পেরে সুরজিৎ মেঝেতে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেল। সেই সুযোগে মুখোশধারী চম্পট দিল।

অণিমা সুড়ঙ্গ থেকে যখন বেরিয়ে এল তখন সুরজিৎ অজ্ঞান অবস্থায় মেঝের ওপর পড়ে আছে এবং ডাক্তার তার পাশে বসে তাকে পরীক্ষা করছেন। অণিমা ব্যাকুল কণ্ঠে হাঁপাতে-হাঁপাতে বললে, 'কী হল ডাক্তাবাবু? কী হয়েছে?'

মুখ না তুলে জবাব দিলেন ডাক্তার, 'Seriously wounded.'

'Seriously wounded?' অণিমা বিচলিত সুরে পুনরুক্তি করলে। তারপর একটু থেমে জিগ্যেস করলে, 'আপনি কোথায় ছিলেন?'

'গুলির শব্দ শুনে এই দিকেই আসছিলাম। এসে দেখি এই ব্যাপার।'

'আপনি আর কিছু দেখেননি? মুখোশপরা কোনও চেহারা?' অণিমা সমর্থনের আশায় বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে জিগ্যেস করল।

ডাক্তার অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে অণিমার মুখের দিকে তাকালেন। তাঁর চাহনির অর্থ, সুরজিতের এই জখম মুখোশধারীর কাজ বলে অণিমা সন্দেহ করে নাকি? মুখে শুধু বললেন, 'না, দেখিনি। কিন্তু সে আলোচনা এখন রেখে এঁকে ঘরে নিয়ে যাওয়া বোধহয় আগে দরকার।' এই বলে তিনি চাকর ও পুলিশ যারা প্রায় তাঁর সঙ্গে-সঙ্গেই সেখানে উপস্থিত হয়েছিল তাদের ইঙ্গিত করলেন। তারা সুরজিতের জ্ঞানহীন দেহকে ধরাধরি করে কাঁধে তুলে নিল।

'সাবধানে ধরে নিয়ে এস,' এই বলে তিনি সকলের আগে চললেন। অণিমাও সঙ্গে-সঙ্গে এল।

সুরজিতের কক্ষে এনে তাকে বিছানায় শুইয়ে বাহকরা চলে গেল। ডাক্তার যত্নসহকারে ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলেন।

অণিমা অদূরে দাঁড়িয়ে অপলক দৃষ্টিতে সব দেখছিল। নানা অশুভ চিন্তা আর আশঙ্কায় তার মন ভরে উঠল। মুখোশধারী তার পথের কাঁটাদের একে-একে এই পৃথিবীর বুক থেকে সরিয়ে দিয়েছে। এখন তার প্রধান শত্রু হচ্ছেন সুরজিৎ। একে সাবাড় করতে পারলেই মুখোশধারীর কাজ একেবারে সহজ হয়ে যায়। লোকটা যেই হোক, ভয়ানক চতুর আর সাহসী।

এতগুলো লোকের চোখে ধুলো দিয়ে সে অবাধে তার পৈশাচিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে যাচ্ছে, অথচ কেউ তার টিকিটি পর্যন্ত ধরতে পারছে না। কিন্তু আপাতত তার প্রধান ভাবনা হচ্ছে, সুরজিৎকে নিয়ে। তারই অনুরোধে সুরজিৎ এই খুনের কেসটা হাতে নিয়েছে। এখন যদি তাকেও সরকারমশাই-এর মতো... আতঙ্কে চোখ বুজলে অণিমা। সুরজিতের এ-পরিণতি ভাবতেও তার হৃদপিণ্ডের স্পন্দন যেন বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। কিন্তু কেন, সুরজিতের জন্য কেন তার এই অহেতুক দরদ? সুরজিৎ পেশাদার গোয়েন্দা, পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বিপজ্জনক কাজ হাতে নেওয়াই তাঁর পেশা। এতে যদি দুর্ঘটনা একটা কিছু ঘটে, সেজন্য অণিমার তো কোনও প্রত্যক্ষ দায়িত্ব নেই আর তার এত মুষড়ে পড়বারও কোনও কারণ নেই। গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে এধরনের অভিজ্ঞতা সুরজিতের সম্ভবত নতুন নয়। কিন্তু যুক্তির শত জাল বুনেও নিজের মনকে প্রবোধ দিতে পারলে না অণিমা। সুরজিতের ভালো-মন্দের সঙ্গে সে আপনার অজ্ঞাতসারেই এমন অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে গেছে! ব্যগ্র-কণ্ঠে জিগ্যেস করলে অণিমা, 'কী মনে হচ্ছে ডাক্তারবাবু? জখম কি খুব বেশি হয়েছেন? জ্ঞান হবে তো?'

ডাক্তার তাঁর ব্যাগ থেকে ইনজেকশনের সিরিঞ্জ বার করতে-করতে বললেন, 'হবে বলেই তো মনে হচ্ছে। একটা ইনজেকশন দিয়ে যাচ্ছি তবু।'

'ইনজেকশন? ইনজেকশন কেন?' রীতিমতো ঘাবড়ে গেল অণিমা। ডাক্তারের ওপর তার খুব ভরসা নেই। সুরজিতের মুখ চিরদিনের জন্যে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য এঁরা সবাই উদগ্রীব।

সিরিঞ্জ হাতে নিয়ে স্বাভাবিক সুরেই ডাক্তার জবাব দিলেন, 'সেটা নাই-বা জানলে? আমি ভালো বুঝছি তাই ইনজেকশন দিচ্ছি।' ডাক্তারের মর্যাদাবোধ ও অধিকার নিয়ে কথাগুলো বললেন তিনি। রোগীকে চিকিৎসা করবার সময় গায়ে পড়ে অনধিকার চর্চা করতে আসা অন্যলোকের পক্ষে ধৃষ্টতামাত্র, ভাবে-ভঙ্গিতে এ-কথাটা বুঝিয়ে দিতে চাইলেন ডাক্তার। সিরিঞ্জে ঔষধ ঢেলে তিনি ইনজেকশন দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন।

অণিমা ইতস্তত করছিল! কিন্তু আর সে স্থির থাকতে পারলে না। অনেকটা আপন মনেই বলে উঠল, 'না-না ইনজেকশন দেওয়ার দরকার নেই।' তার কণ্ঠে গভীর ব্যাকুলতা।

সিরিঞ্জ ঠিক আছে কি না পরীক্ষা করতে-করতে ডাক্তার বললেন, 'দরকার নেই? দরকার কী আছে না আছে, আমার চেয়ে তুমি ভালো বুঝবে? ছেলেমানুষি কোরো না।' যেন আগের মতো নার্সকে মৃদু তিরস্কার করছেন ডাক্তার।

অণিমার ভঙ্গি ও কণ্ঠস্বর কঠিন হয়ে উঠল। দৃঢ় কণ্ঠে বলল, না ডাক্তারবাবু, ইনজেকশন দিতে আমি দেব না।'

'দেবে না?' অণিমার এই দৃঢ় মনোভাবে অবাক হয়ে গেলেন ডাক্তার। 'ওঃ, আমায় তুমি বিশ্বাস করো না।' ডাক্তার মাথা নুইয়ে মিনিটকয়েক কী ভাবলেন, তারপর বললেন, 'সুরজিৎবাবুর ভার যে তোমার ওপরই আছে তা তো জানতাম না। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। যদি বিশ্বাস করতে পারো, তাহলে দরকার মনে করলে আমাকে ডেকে পাঠিও।' আর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে ডাক্তার ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। অণিমা তাঁর গতিপথের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। ডাক্তার মনে-মনে খুবই ক্ষুব্ধ হয়ে চলে গেলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু এখন আর কাউকে তার বিশ্বাস নেই। সুরজিৎ চোখ মেলে দেখলে, অণিমা বিছানার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু অণিমা তার দিকে চোখ ফেরাবার আগেই সে চোখ বুজলে।

বলরামকে এক কাপ দুধ আনতে বলে গভীর উদ্বেগ বুকে নিয়ে অণিমা সুরজিতের শয্যাপার্শ্বে এসে বসল এবং আস্তে-আস্তে তার কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। তারপর আলগোছে সুরজিতের হাতখানা কোলে টেনে নিয়ে নাড়ির গতি অনুভব করবার চেষ্টা করল।

সুরজিতের জ্ঞান ফিরে এসেছে অনেক আগেই। তবু অণিমার সঙ্গে একটু মজা করবার লোভে সে অসাড় হয়ে পড়েছিল। অণিমা যখনই অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিল, সেই সুযোগে দুষ্টুমি করে অণিমার দিকে চেয়ে নিচ্ছিল সুরজিৎ। তার জন্য একটি নারীর ভাবনার অন্ত নেই, একথা কল্পনা করতেও ভালো লাগছিল সুরজিতের। নাড়ি পরীক্ষার পর অণিমা সুরজিতের হাতটা নামিয়ে রাখতে গিয়ে পড়ল বিপদে। হাত যেন একেবারে শক্ত কাঠ। কিছুতেই নামানো যায় না। অণিমা রীতিমতো ভয় পেলে। শরীরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে কোনও রকমে হাতটা নামানো গেল। ডাক্তারবাবুকেই আবার ডাকবে নাকি? কিন্তু তাঁকে ডাকতে যেন সাহস হয় না অণিমার।

ইতিমধ্যে বলরাম ফিডিং কাপ নিয়ে এসে দরজার কাছে দাঁড়াল।

'কি, দুধ এনেছ?' জিজ্ঞাসা করলে অণিমা।

বলরাম জবাব দিলে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, ওইখানে রেখে যাও।' অণিমা টেবিল নির্দেশ করে বললে।

বলরাম নির্দিষ্ট স্থানে দুধের কাপ রেখে জিগ্যেস করলে, 'এখনও জ্ঞান হয়নি?'

'না, কিছু বুঝতে পারছি না। তুমি ঘরেই থেকো। হঠাৎ দরকার হতে পারে।' অণিমার সুরে গভীর উদ্বেগ।

'যে আজ্ঞে,' বলে বলরাম চলে গেল।

অণিমা সুরজিতের মুখে দুধ ঢেলে দেওয়ার চেষ্টা করলে। কিন্তু সে অসাড় হওয়ার ভান করে শুয়ে আছে। মুখ খুলল না। অণিমা ভাবলে, তাহলে জোর করে গলায় দুধ ঢেলে দিতে হবে, কিছু না খেলে রোগী ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়বে। সে দুধের কাপ টেবিলে রেখে বুকের ওপর দেওয়ার জন্য একখানি তোয়ালে আনতে উঠে গেল। দুধ ছিটকে পড়ে যাতে জামাকাপড় নোংরা না হয়, সেইজন্যই এই সতর্কতা।

অণিমা উঠে যেতেই এক চুমুকে দুধটুকু খেয়ে আবার চুপ করে শুয়ে পড়ল সুরজিৎ। তোয়ালে হাতে নিয়ে ফিরে এসে দেখলে, দুধের কাপ খালি। প্রথমটা সে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল, কিন্তু সুরজিৎ মুচকি হেসে তার দিকে চাইতেই, চালাকিটা তার কাছে আর গোপন রইল না। অণিমা রাগের ভান করে বললে, 'আচ্ছা, এটা কীরকম চালাকি হল? কী ভয়টা পাইয়ে দিয়েছিলেন বলুন তো?'

এক লাফে বিছানায় উঠে বসে সরস কণ্ঠে সুরজিৎ বললে, 'ভয় তাহলে সত্যি পেয়েছিলেন? সেইটুকুই আমার লাভ।'

'তার মানে? অতখানি জখম হয়েছেন, আর ভয় পাব না?'

'গোয়েন্দাদের জান কত কড়া, জানলে বোধহয় ভয় পেতেন না।'

হঠাৎ তারা বিস্মিত হয়ে দেখল, ঘরের আলো স্তিমিত হয়ে আসছে। সুরজিৎ তৎপরতার সঙ্গে উঠে দাঁড়াল।

'এ কি, উঠলেন যে?' অণিমা কিছু বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করলে।

ঠোঁটে আঙুল চেপে নীরব থাকবার সঙ্কেত করল সুরজিৎ। তারপর গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'চুপ। এরই জন্যে অপেক্ষা করছিলুম।'

এই বলে সে বাইরে যাওয়ার জন্যে পা বাড়ালে। অণিমার বুকটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় দুলে উঠল। বললে, 'কিন্তু এই অবস্থায়...'

'বাধা দেবেন না,' বলে সুরজিৎ মুহূর্তে অদৃশ্য হল। সুরজিতের ভাবভঙ্গি দেখে আর আপত্তি করবার সাহস হল না অণিমার। ব্যাপার যে কী, কিছুই বুঝতে না পেরে সে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

রাজীবলোচনের ঘরের সামনে গিয়ে সুরজিৎ দেখতে পেলে, পুলিশ সেখানে মোতায়েন আছে। সে দরজা খুলে ঘরের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলে, আসবাবপত্র যথাস্থানেই রয়েছে। জিনিসপত্রেও কেউ হাত দিয়েছে বলে মনে হয় না। পুলিশ-প্রহরীকে হুঁশিয়ার থাকবার জন্য নির্দেশ দিয়ে খুব সতর্কপদে নিচে নেমে গেল সুরজিৎ। যেকোনও মুহূর্তে একটা কিছু ঘটবে বলে সে আশঙ্কা করছে। আর যাতে অতর্কিতভাবে মুখোশধারী তাকে কাবু করতে না পারে, সেজন্য সুরজিতের সতর্কতার অন্ত নেই। শত্রুপক্ষ খুবই বাহাদুর খেলোয়াড়, একথা এই ক'দিনের কাণ্ডকারখানাতেই বুঝতে পেরেছে সুরজিৎ। যেমন তার বুদ্ধির কেরামতি, তেমনি তার কার্যোদ্ধারের অভিনব পন্থা। তবু আপন খেলার কৌশলই শত্রুপক্ষের চরম মৃত্যুবাণ হয়ে দাঁড়াবে! এই হয়তো শত্রুর শেষ খেলা, এই খেলায় সুরজিতের যেভাবেই হোক বাজিমাত করতে হবে।

চিন্তাকুল চিত্তে নামতে-নামতে সুরজিৎ ভাবছিল, কখন কীভাবে, কোন দিক থেকে আক্রমণ শুরু হবে! হঠাৎ খস-খস শব্দ হতেই সে থামের আড়ালে আত্মগোপন করলে। ওপরের বারান্দার আলোর স্তিমিতরেখা এসে পড়েছিল নিচের তলায়। সেই অস্পষ্ট আলোতে সে দেখতে পেলে দেয়ালের মাঝখান থেকে এক চোরা-দরজা ঠেলে বেরিয়ে এল মুখোশধারী। ভোজবাজি নয়, স্বপ্ন নয়, সম্পূর্ণ সজ্ঞানে দেখছে সুরজিৎ! আনন্দে তার চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! সে ঠিক সময়েই এসে পড়েছে! মুখোশধারী একমুহূর্ত ইতস্তত করে চারদিকে সতর্কদৃষ্টি নিক্ষেপ করে গুপ্ত-দরজা যথারীতি বন্ধ করে বেরিয়ে গেল। সুরজিৎ যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে মুখোশধারীকে ধরতে যাওয়ার চেষ্টা করা বৃথা। সেরূপ চেষ্টা সে করল না। একটু অপেক্ষা করে সেই চোরা-দরজা দিয়েই সে ভিতরে প্রবেশ করল। এই বাড়িতে যে অনেক গোপন রাস্তা আছে, তা সে আগেই সন্দেহ করেছিল। মুখোশধারী আপন অজ্ঞাতসারে চোরা-দরজার সন্ধান না দেখালে, এই চোরাপথ সহজে আবিষ্কার করতে পারত না সুরজিৎ। প্যান্টের পকেটে রিভলবার চেপে ধরে দৃঢ়পদে সামনের দিকে এগিয়ে চলল সুরজিৎ। খানিকটা গিয়েই সিঁড়ি, অন্ধকারে ভালো করে ধাপগুলোও দেখা যায় না। সন্তর্পণে পা টিপে-টিপে ওপরের দিকে উঠতে লাগল সুরজিৎ। কোথায় গিয়ে সেই চোরা পথ শেষ হয়েছে—কে জানে? তবু আজ এর হেস্তনেস্ত করে তবে সে ফিরবে। চোরাপথ দিয়ে চলতে-চলতে সে সিন্দুকের মতো একটা বিরাট বাক্সের নিচে এসে উপস্থিত হল। বাক্সের ডালাটা তুলে ওপরে উঠে অবাক হয়ে গেল সুরজিৎ, এ কি তাজ্জব ব্যাপার, এটা তো রাজীবলোচনের ঘর! ওপর থেকে যেটা বড় বাক্স মনে হয়, সেইটেই গুপ্তপথের দ্বার।

সুরজিৎ রাজীবলোচনের ঘরে ঢুকে অন্ধকারে একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে চোখদুটোকে অভ্যস্ত করে নিয়ে সোজা দেরাজের নিকট গেল। সেখান থেকে চাবি বার করে নিয়ে সিন্দুকটা খুলে কী যে পরীক্ষা করল তা সেই জানে। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর সিন্দুক বন্ধ করে যথাস্থানে চাবি রেখে সে আবার গুপ্তপথ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

এদিক-ওদিক একটু ঘোরা-ফেরার পরই হঠাৎ অণিমার সঙ্গে দেখা। সেও সুরজিতের

জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে তার খোঁজে বেরিয়ে ঘুরছিল। অনিমা বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'বাঃ—রে আপনি এখানে! কী, হল কি? হঠাৎ কোথায় গেলেন বুঝতেই তো পারলাম না।'

'একটু ধৈর্য ধরুন, কালই সব বুঝতে পারবেন।...' কথা শেষ হওয়ার আগেই করিডরের আরেক দিকে অনিমাকে টেনে নিয়ে গেল সুরজিৎ। দুজনে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। তারা বিস্মিত হয়ে দেখল, ডাক্তার করিডর দিয়ে চলে যাচ্ছেন। মুখ দেখেই মনে হল, ডাক্তারের মাথায় গভীর কোনও অভিসন্ধি দানা বেঁধে উঠেছে। নিজের চিন্তায় ডাক্তার এতই মগ্ন ছিল যে সুরজিৎ ও অনিমা তাঁর চোখের আড়ালেই রয়ে গেল।

ডাক্তার অদৃশ্য হলে, সুরজিৎ চাপা-গলায় বললে, 'আচ্ছা, আপনি এখন নিজের ঘরে যান আমার একটু কাজ আছে।' এই বলেই সুরজিৎ দ্রুত অদৃশ্য হল। চারদিকে একটা কিছু ঘোঁট পাকিয়ে উঠেছে, কখন যে কী ঘটবে, কিছুই বলা যায় না, একটা অজানা আশঙ্কায় অনিমার বুক দুরু-দুরু করে উঠল।

সুরজিতের মতি-গতি বোঝা অনিমার ক্ষমতার বাইরে, বেশি কিছু জিগ্যেস করলে অনধিকার চর্চা ভেবে সুরজিৎ হয়তো অসন্তুষ্ট হবে, তাই অনাবশ্যক কৌতূহল প্রকাশ না করে, চুপ করে থাকাই শ্রেয় মনে করল অনিমা।

সারা বাড়িটা থমথম করছে, বাতাসে যেন ভেসে আসছে একটা আতঙ্কের সুর, অনিমার গা ছম-ছম করে উঠল। বাড়িতে খুন হলে একটা অজ্ঞাত ভয়ের বিভীষিকা বাসিন্দাদের মনকে পীড়িত করে তোলে।...অনিমা আর সেখানে না দাঁড়িয়ে ত্রস্তভাবে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

সুরজিৎ সন্তর্পণে ডাক্তারের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। দরজা তালাবন্ধ। সুরজিৎ পকেট থেকে একগোছা চাবি বার করে তালা খুলবার চেষ্টা করল। ডাক্তার পাকা লোক, সাধারণ তালা দিয়ে তিনি দরজা বন্ধ করে যাননি। পরপর সবগুলো চাবি দিয়ে পরীক্ষা করেও তালা খুলতে পারল না সুরজিৎ।

ইত্যবসরে নিঃশব্দে সুরজিতের পিছনে এসে দাঁড়ালেন ডাক্তার। নকল চাবি দিয়ে তালা খুলবার প্রাণান্তকর প্রয়াসে কৌতুক বোধ করলেন। তারপর নিজের পকেট থেকে একটা চাবি সুরজিতের দিকে এগিয়ে দিয়ে ব্যঙ্গের কণ্ঠে বললেন, 'এই চাবিটা দিয়ে চেষ্টা করে দেখতে পারেন।'

ডাক্তারকে এ-সময়ে আশা করেনি সুরজিৎ। সে অপ্রস্তুত হয়ে চমকে উঠল। কিন্তু মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, 'ওঃ, আপনি। আপনাকেই যে খুঁজছিলাম।'

'হুঁ, সে তো আপনার তালা ভাঙার কায়দা দেখেই বুঝলাম।' তীব্র শ্লেষের সঙ্গে একটুখানি সামনের দিকে ঝুঁকে ডাক্তার বললেন, 'বাইরে থেকে তালাবন্ধ করে আবার ভিতরে গিয়ে লুকিয়েছিলাম মনে করেছিলেন বোধহয়।' ডাক্তারের চোখে-মুখে একটা হিংস্র বিদ্বেষের ভাব ফুটে উঠল।

'আপনাকে কেউ তালাবন্ধ করে রেখে গেছে, এও তো ভাবতে পারি।' আত্মপক্ষ সমর্থনে বললে সুরজিৎ।

'ওঃ, তাই বুঝি আমায় উদ্ধার করবার চেষ্টা করছিলেন? ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। আমার জন্য আপনার এত দরদ আছে জেনে সত্যিই কৃতজ্ঞ হলাম।' বিদ্রুপের সুরে এই বলে তালা খুলে ভিতরে ঢুকলেন ডাক্তার। সুরজিতের পানে পিছন ফিরে বললেন, 'আসুন, তালা ভেঙে চোরের মতো চুপি-চুপি না ঢুকলে গোয়েন্দাদের বোধ হয় জাত যায়, না?'

কটাক্ষ করে সুরজিৎ বলল, 'না, তা যায় না।' সুরজিৎ ডাক্তারের পিছনে-পিছনে ঘরে ঢুকে বললে, 'গোয়েন্দাদের কিছুতেই জাত যায় না ডাক্তারবাবু। কারণ গোয়েন্দাদের কোনও জাত নেই, তারা নেহাত বজ্জাত।'

'কিন্তু খানিক আগেই তো বেহুঁশ হয়েছিলেন দেখেছিলাম। জ্ঞান ফিরে আসতেই আমায় খোঁজার কী এমন প্রয়োজন হল?' ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন।

সুরজিৎ মুহূর্তের জন্য চুপ করে রইল। তারপর পকেট থেকে ডাক্তারের দেরাজে পাওয়া সেই চশমাটা বার করে ডাক্তারের সম্মুখে তুলে ধরে জিগ্যেস করলে, 'এ-চশমাটা চিনতে পারেন?'

ডাক্তারের মুখ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে উঠল। একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'পারি বললে আমায় খুনের দায়ে এক্ষুনি গ্রেপ্তার করবেন নাকি? চিনতে পারাটাই কি আমার বিরুদ্ধে একটা প্রমাণ?'

'বিরুদ্ধে, না স্বপক্ষে, তা পরে বোঝা যাবে। এখন এটা চিনতে পারেন কি না তাই বলুন।'

'পারি, এটা রাজীবলোচনের চশমা ছিল। এখন বুঝেছি, আমার টেবিলের ড্রয়ার থেকে সেদিন আপনিই এটা সরিয়েছিলেন।' ডাক্তারের গলার স্বর অপরাধীর মতো নয়, বরং তিনিই যেন সুরজিতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন।

সুরজিৎ বেশ একটু কঠিন স্বরেই জিজ্ঞাসা করলে, 'রাজীবলোচনের চশমা আপনার কাছে এল কোত্থেকে?'

'খুব সহজ ব্যাপার। তাঁর ঘর থেকে সেদিন এটা আমি কুড়িয়ে এনেছিলাম বলে।' ডাক্তার এমনভাবে বললেন যে, এটা যেন তাঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। এই ব্যাপার নিয়ে সন্দেহ করাটাও বাতুলতা মাত্র!

'কুড়িয়ে এনেছিলেন?' চেপে ধরল সুরজিৎ। 'রাজীবলোচনের চশমা তো তাঁর মৃতদেহেব কাছে ভাঙা অবস্থায় পাওয়া যায়।'

ডাক্তার কিন্তু তবু অবিচলিত স্বরে বললেন, 'এই চশমা তার ডুপ্লিকেট, টেবিলের একধারে সে রাত্রে পড়েছিল।'

'পড়ে থাকলেও কাউকে না জানিয়ে কিছু কুড়িয়ে আনবার অধিকার তো আপনার নেই।'

'আমাকে এত জেরা করবার কী অধিকার আপনার আছে, বলতে পারেন?' ডাক্তারের স্বর বেশ উষ্ণ। সুরজিৎ কিছু বলবার আগে ডাক্তার নিজেই আবার বললেন, 'আপনি বলবেন, আপনি গোয়েন্দা, কিন্তু আপনাকে বিশ্বাস তো আমি না-ও কবতে পারি।'

'বিশ্বাস করা-না-করা আপনার অভিরুচি।' গম্ভীরভাবে বলল সুরজিৎ।

'বিশ্বাস না করাই আমার অভিরুচি।' বহুদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ যেন ফেটে পড়ল ডাক্তারের তিক্ত কণ্ঠস্বরে। 'শুনুন, সুরজিৎবাবু, গত কয়েকদিনে এখানে দু-দুটো খুন আর কয়েকটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেছে। এ-সমস্ত ব্যাপারের মূলে কে আছে, তা কেউ এখনও জানে না, কিন্তু আপনি, আমি, এমনকী অনিমা ও খোঁড়া দীননাথ পর্যন্ত—এ-বাড়ির কেউ যে সন্দেহের অতীত নয়, তা বোধহয় স্বীকার করেন। আপনি বলবেন, দীননাথবাবু পক্ষাঘাতে পঙ্গু, মানলাম। কিন্তু আপনি যে তাঁর চর নন, তাই বা কে বলতে পারে? রাজীবলোচনকে পাহারা দেওয়ার নামে আপনি এসেছেন, কিন্তু আপনি পৌঁছবার আগেই রহস্যজনকভাবে

তাঁর মৃত্যু হয়েছে। কী করছেন আপনি তারপর এখানে বসে?'

সুরজিৎ কী বলতে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে ডাক্তার এক নিশ্বাসে বলে গেলেন, 'দাঁড়ান, তারপর অণিমা। বলবেন সে স্ত্রীলোক। কিন্তু, স্ত্রীলোকেও খুন করে এবং তার মতো শক্ত, সমর্থ জোয়ান মেয়ের এসব কাজ অসাধ্যও নয়। তা ছাড়া তারও সত্যিকার পরিচয় কেউ জানে না। নার্স বলে পরিচয় দিয়ে সে এখানে এসেছিল। কিন্তু পাশ করা নার্স সে যে নয়, দুদিনেই আমি তা বুঝেছিলাম।'

ডাক্তারের কথা শেষ হওয়ার পর সুরজিৎ শুধু হেসে বললে, 'আমার বদলে, আপনিই তো গোয়েন্দা হলে পারতেন দেখছি।'

'তা হয়তো পারতাম,' কথাটা লুফে নিলেন ডাক্তার। 'আর সেইজন্যেই আপনাকে একটা কথা ভেবে দেখতে বলছি, রাজীবলোচন আমাকেই তাঁর সমস্ত সম্পত্তির ট্রাস্টি করে গেছেন, জানেন নিশ্চয়। তাঁর মৃত্যুতে যদি বা আমার স্বার্থ থাকে, তাঁর মৃত্যুর পর কী স্বার্থে আমি নিশাচরের মতো এ-বাড়িতে হানা দিয়ে আরও খুনোখুনি করে বেড়াব বলতে পারেন?

সুরজিৎ নীরবে খানিকক্ষণ ডাক্তারকে লক্ষ করে বলল, 'মুখের গ্রাস পাছে ফসকে যায়, সেই ভয়ে পথের কাঁটা সরাবার জন্য।'

'কিন্তু ফসকে যাওয়ার ভয় তো আমার নেই সুরজিৎবাবু। এ তো গুপ্তধন নয়, দস্তুরমতো কাগজে কলমে লেখা 'উইল'। কাল সকালেই অ্যাটর্নি এসে সে 'উইল' সকলকে পড়ে শোনাবেন—বোধহয় জানেন।' ডাক্তার এবার বক্র-কটাক্ষে সুরজিতের দিকে তাকালেন।

কিন্তু সুরজিতের কোনও ভাবান্তর হল না। সে একটু দুর্বোধ্যভাবে হেসে বললে, 'হ্যাঁ, জানি, আর সেইজন্যে কাল সকাল পর্যন্ত একটু বেশি সজাগ থাকা দরকার মনে করি। সজাগ আপনারও থাকা উচিত। আচ্ছা, নমস্কার।' এই বলে সুরজিৎ বিদায় নিল।

ডাক্তার কিন্তু গম্ভীর হয়ে ঘরময় পায়চারি করে বেড়াতে লাগলেন। সুরজিতের সঙ্গে সামনে যে ব্যবহারই তিনি করুন, মনে-মনে তাকে সমীহ না করে তিনি পারেন না। সুরজিতের শেষ কথাগুলো তাই হেলায় উড়িয়ে দিতে পারলেন না। এ-কথার কী গূঢ় অর্থ থাকতে পারে? এভাবে সাবধান করবার মানে কী? তাকে সতর্ক থাকবার জন্য বলবার কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে? সুরজিৎ বিনা কারণে কাউকে কিছু বলে না, এ-ক'দিনে এটুকু ডাক্তার ভালো করেই বুঝতে পেরেছেন। না, আজ রাত্রের মতো তাঁর ঘুম বোধহয় আর আসবে না!

এগারো

পরের দিন সকালে রাজীবলোচনেরই খাস কামরায় সত্যিই অ্যাটর্নিকে 'উইল' পড়তে দেখা গেল। সুরজিৎ কী কারণে বলা যায় না—প্রথম দিকটায় উপস্থিত ছিল না। সে যখন ঘরে ঢুকল তখন উইল পড়া প্রায় শেষ হয়েছে। অ্যাটর্নি শেষের দিকে পড়ছেন—

> *"এই বিধান করিলাম যে আমার জীবনান্তে আমার যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি আমার তিনপুত্র দীননাথ, রাজীবলোচন ও পীতাম্বর সমান ভাগে ভাগ করিয়া পাইবে। ঈশ্বর না করুন, এই তিন জনের মধ্যে যদি কেহ তৎপূর্বে মারা যায়, তাহা হইলে তাহার বা তাহাদের প্রাপ্য অংশ, যথাযথভাবে তাহারা বা তাহাদের নিজ-নিজ সন্তানাদি প্রাপ্ত হইবে। নিঃসন্তান অবস্থায় কেহ মারা গেলে, তাহার বা তাহাদের অথবা তাহাদের সন্তানাদির ভাগে অর্শাইবে।*

এতদর্থে স্বইচ্ছায়, সুস্থ শরীরে, অন্যের বিনা অনুরোধে এই 'উইল' সম্পাদন করিয়া দিলাম।

ইতি ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯২৮,
শ্রীযজ্ঞেশ্বর ঘোষ চৌধুরি।"

অ্যাটর্নি 'উইল' বন্ধ করে সবার দিকে তাকালেন। ইন্সপেক্টর জিগ্যেস করলেন, 'ওসব অস্য-কস্য 'উইল' পত্রমিদং কার্যঞ্চাগে শুনে তো মাথা গুলিয়ে যায় মশাই। আসল বক্তব্যটা কী হল, সোজা করে বলুন দেখি!'

মৃদু হেসে অ্যাটর্নি বললেন, 'বক্তব্য হল এই যে, যজ্ঞেশ্বরবাবু তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তিন ছেলেকে সমানভাবে ভাগ করে দিয়ে গেছেন। এই তিনজনের কেউ যদি মারা যায় আর তার ছেলে-মেয়ে না থাকে, তাহলে তার অংশ বাকি যে বা যারা বেঁচে থাকবে, সে বা তারা পাবে।'

'উইল' পাঠ শুনে বিচলিত হয়ে উঠলেন ডাক্তার। এ-'উইল' তো পড়বার কথা ছিল না। বললেন, 'কিন্তু এ-'উইল' তো যজ্ঞেশ্বরবাবুর। রাজীবলোচনের 'উইল' কোথায় গেল?'

অ্যাটর্নি বললেন, 'রাজীবলোচনের 'উইল' এখানেই আছে, কিন্তু যজ্ঞেশ্বরবাবুর এই 'উইল' থাকার দরুন সে 'উইল' বাতিল হয়ে গেছে।'

'বাতিল হয়ে গেছে?' মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল ডাক্তারের, 'যজ্ঞেশ্বরবাবুর এ-'উইল' তাহলে এতদিন ছিল কোথায়? কোথায় পেলেন আপনি এ-'উইল'?'

'আমার ওপর গরম হয়ে কোনও লাভ নেই ডাক্তারবাবু।' ধীর কণ্ঠে বললেন অ্যাটর্নি। আমি আমার কর্তব্য করছি মাত্র। যজ্ঞেশ্বরবাবুর 'উইল' এতদিন কোথায় ছিল, তা আমার জানবার কথা নয়। আজ সকালে ইন্সপেক্টর সাহেবের হুকুমে, রাজীবলোচনের কাগজপত্র খুঁজে এ-'উইল' আমি পেয়েছি।'

অত্যন্ত সন্দিগ্ধভাবে ডাক্তার বললেন, 'কিন্তু এ-'উইল' যে জাল নয়, তার প্রমাণ কী?'

'প্রমাণ আপাতত আমার কথা,' দৃঢ়তার সঙ্গে জবাব দিলেন অ্যাটর্নি। এ-'উইল' আসল ও ঠিকমতো রেজেস্ট্রি করা বলেই আমার বিশ্বাস। আপনি অবশ্য ইচ্ছা করলে, আদালতে দীননাথবাবুর বিরুদ্ধে লড়তে পারেন।'

'ওঃ, দীননাথবাবুই এখন তাহলে সমস্ত সম্পত্তির মালিক!' ডাক্তারের কণ্ঠের তিক্ততা লুকোনো রইল না।

ইন্সপেক্টর তার জবাব দিলেন, 'যজ্ঞেশ্বরবাবুর 'উইল' অনুসারে তো তাই হয় ডাক্তারবাবু। রাজীবলোচন মারা গেছেন, পীতাম্বর নিখোঁজ, সুতরাং দীননাথবাবুরই সমস্ত এখন পাওয়ার কথা।'

সুরজিৎ এতক্ষণ চুপ করে সব শুনছিল। এবার সে কথা কইলে, 'কিন্তু পীতাম্বর নিখোঁজ হলেও তিনি নিঃসন্তান ছিলেন না। তাঁর একটি মেয়ে ছিল, বোধহয় জানেন। সে মেয়ে যদি বেঁচে থাকে?'

'পীতাম্বরের মেয়ে!' পীতাম্বরের সন্তান-সন্ততি যে বেঁচে আছে, তা ধারণাই করতে

পারেননি দীননাথ। 'পীতাম্বরের মেয়ে বেঁচে আছে; কোথায় আছে সে?' চঞ্চলভাবে সুরজিতের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন দীননাথ।

'এই আপনার পাশেই বসে আছে দীননাথবাবু,' বললে সুরজিৎ।

চমকে উঠলেন দীননাথ। অণিমার দিকে তাকিয়ে অভিভূত কণ্ঠে বললেন, 'কে অণিমা! এ যে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না মা।'

ডাক্তার আরও জোরের সঙ্গে বললেন, 'বিশ্বাস আমিও করি না। পীতাম্বরের মেয়ে বেঁচে থাকতে পারে না। এ-সমস্ত মিথ্যে ষড়যন্ত্র, সমস্ত জাল।'

ইন্সপেক্টর ডাক্তারের উৎসাহকে বেশি বাড়তে দিলেন না। বললেন, 'জাল কি না, সে প্রমাণ অণিমাদেবীকে অবশ্যই দিতে হবে। কিন্তু তা নিয়ে আপনার মাথা ঘামিয়ে বোধ হয় কোনও লাভ নেই ডাক্তারবাবু।' এই বলে তিনি দরজার প্রান্তে দণ্ডায়মান একজন সাব ইন্সপেক্টরকে ইঙ্গিত করলেন। উক্ত অফিসার ডাক্তারের পিছনে এসে দাঁড়ালেন।

ডাক্তার উষ্ণ কণ্ঠে বললেন, 'কী বলছেন আপনি?' হঠাৎ পিছনে দারোগাকে দেখে দু-চোখ তাঁর কপালে উঠল, 'এর মানে?'

ইন্সপেক্টর উঠে দাঁড়ালেন। 'মানে আর কিছু নয় ডাক্তারবাবু। এই দেখুন গ্রেপ্তারি পরোয়ানা। রাজীবলোচন ও সরকারকে খুন করার অভিযোগে আপনাকে গ্রেপ্তার করলাম।' এই বলে ডাক্তারের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিলেন ইন্সপেক্টর।

'আমাকে গ্রেপ্তার করলেন? এর ফল কী হতে পারে ভেবে দেখেছেন! কী প্রমাণ আছে আপনার, আমার বিরুদ্ধে...' ডাক্তার অপমানে, রাগে ফুলতে লাগলেন।

'এখন মিছে আস্ফালন করে কোনও লাভ হবে না ডাক্তারবাবু, আপনার যা বলবার, তা আদালতেই বলবেন। আমার প্রমাণও সেখানেই দাখিল করব।' ইন্সপেক্টর এই বলে আসামিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ইঙ্গিত করলেন।

সাব-ইন্সপেক্টর বললেন, 'চলুন, ডাক্তারবাবু, বাইরে গাড়ি অপেক্ষা করছে।'

এখানে তর্ক-বিতর্ক করা বৃথা ভেবে নীরবে পুলিশ কর্মচারীর অনুসরণ করলেন ডাক্তার।

অ্যাটর্নিও উঠলেন। 'আমিও চললাম দীননাথবাবু, যা-যা দরকার আমি করে রাখব। আমার সঙ্গে কলকাতার অফিসেই দেখা করবেন। আর অণিমাদেবী, যা শুনলাম, তাতে সাক্ষ্য-প্রমাণ সমেত আপনারও সেখানে যাওয়া দরকার হবে।'

ধন্যবাদ জানিয়ে দীননাথ বললেন, 'অণিমাকে নিয়ে শিগগিরই আপনার অফিসে গিয়ে দেখা করব মিঃ মুখার্জি।'

নমস্কার জানিয়ে অ্যাটর্নি বিদায় নিলেন।

আসামি ধরা পড়ায় দীননাথ আশানুরূপ খুশি হয়েছেন বলে মনে হল না। বিমর্ষভাবে তিনি সেই চেয়ারটাতেই বসে পড়লেন।

নীরবতা ভঙ্গ করে কথা কইলে সুরজিৎ, 'আপনাদের দুজনকে আমার অভিনন্দন জানানো উচিত বোধহয়।'

দীননাথ অভিভূত কণ্ঠে জবাব দিলেন, 'সুরজিৎবাবু মনে হচ্ছে, আমি যেন সত্যিই স্বপ্ন দেখছি। বাবা যে এইরকম একটা 'উইল' করে গিয়েছেন—আর সেটা এতদিন চাপা ছিল। পথের ভিখিরি থেকে হঠাৎ আমি বড়লোক হতে চলেছি; পীতাম্বরের মেয়ে, আমাদের একমাত্র বংশধর এখনও বেঁচে আছে,—এ-যেন সব রূপকথা! সবচেয়ে অবাক লাগছে,

ডাক্তারের কথা ভাবতে!'

অণিমা কথার জের টেনে বললে, 'সত্যি, উনিই যে সমস্ত ব্যাপারের মূলে ছিলেন, এখনও যেন বিশ্বাস করতে মন চায় না। একটা কথা শুধু বুঝতে পারছি না যে...'

বাধা দিয়ে সুরজিৎ বললে, 'বুঝতে এক্ষুনি সব পারবেন না অণিমাদেবী, শুধু একটা কথা জেনে রাখুন, আমাদের সমস্ত বিপদ এখনও কেটে যায়নি।'

'বলেন কী!' সুরজিতের কথায় ভীষণ অবাক হয়ে গেলেন দীননাথ, 'এখনও কেটে যায়নি?'

'না দীননাথবাবু,' গম্ভীর কণ্ঠে সুরজিৎ বললে, 'নিশ্চিন্ত হওয়ার সময় আপনার বা অণিমাদেবীর কারুর এখনও আসেনি। এখনও যথাসাধ্য সাবধান থাকা দরকার। আমি তাই ঠিক করেছি, অণিমাদেবীর সঙ্গে আজ রাতে অন্তত শোবার ঘর বদল করব।'

'খুব ভালো কথা।' উৎসাহ দিলেন দীননাথ। 'সাবধানের মার নেই। বেশ ভালো বুদ্ধি করেছেন। কিন্তু এই অথর্ব বুড়োর কথা কিছু ভেবেছেন কি? আমাকে পাহারা দেওয়ার বুঝি আর দরকার নেই?'

'খুব দরকার আছে।' আশ্বাস দিয়ে বললে সুরজিৎ।

'আমি সব ব্যবস্থা করেছি, আপনার কোনও ভাবনা নেই।' অণিমা বললে, 'এবার চলুন সুরজিৎবাবু, সকালে আপনার চা খাওয়া হয়নি।' দীননাথের দিকে তাকিয়ে বললে, 'জ্যাঠামশাই-এর চা কি এখানে পাঠিয়ে দেব?'

দীননাথ যে চা-পাঠানোর কথায় অণিমার প্রতি খুব খুশি হয়েছেন, এমনি ভাব প্রকাশ করে বললেন, 'না, মা, চা-টা আমার ধাতে সয় না। আমি যাই, কবরেজি তেলটা মালিশ করিগে। শরীরটাকে নিয়ে আর পারি না মা, আর পারি না!' এই বলে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে দীননাথ প্রস্থান করলেন।

অণিমাকে নিয়ে সুরজিৎ চায়ের টেবিলে এসে বসল।

চা ঢালতে-ঢালতে অণিমা বললে, 'পর্ব তো শেষ হল। এখন আজ রাতটা ভালোয়-ভালোয় কাটবে আশা করি। আসামি যখন ধরা পড়েছে তখন আর ভয় কীসের সুরজিৎবাবু?'

মৃদু হেসে সুরজিৎ জবাব দিলে, 'রাতটা আগে ভালোয়-ভালোয় কাটুক! যার শেষ ভালো, তারই সবটুকু ভালো, নয় কি?'

এমনসময় টেলিগ্রাম হাতে নিয়ে বলরাম এসে হাজির। 'আর্জেন্ট টেলিগ্রাম স্যার,' টেলিগ্রাম সুরজিতের হাতে দিয়ে বললে বলরাম।

খামে চোখ বুলিয়ে সুরজিৎ বললে, 'এ কি, এ তো ডাক্তারের দেখছি, তুই খুলেছিস কেন?'

বলরাম বিনীত ভঙ্গি করে বললে, 'আজ্ঞে, ভাবলাম, যদি সিগারেট কোট-টোট কিছু থাকে।'

কথার স্পষ্ট মানে বুঝতে না পেরে অণিমা জিগ্যেস করলে, 'টেলিগ্রামে সিগারেট কোট, সে আবার কী?'

'এটা হল Secret Code-এর Special বলরামী সংস্করণ।' সুরজিৎ হাসতে-হাসতে বলল।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ওই সিগারেট কোড,' বলরাম উৎসাহের সহিত বললে। 'তবে কিছু

পেলাম না। কোন হাসপাতাল থেকে এসেছে, খালি লেখা, 'yes—নো মিনিং'।' আপন মনেই মন্তব্য করল বলরাম।

'আচ্ছা খুব কাজ করেছ, শার্লক হোমস বাহাদুর।' টেলিগ্রাম পড়ে ভ্রূ কুঞ্চিত হল সুরজিতের। বললে, 'এক্ষুনি এই টেলিগ্রাম থানায় পাঠাবার ব্যবস্থা করোগে যাও। ডাক্তারবাবুকে সেখানেই হাজতে নিয়ে গেছে।'

বলরাম তক্ষুনি টেলিগ্রাম ডাক্তারের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে ছুটল।

সুরজিৎ নীরবে চায়ের কাপ তুলে নিল। তার গম্ভীর ভাব দেখে আর কোনও প্রশ্ন করতে ভরসা পেলে না অণিমা। যে দ্রুত তালে ঘটনা ঘটছে, আজ রাত্রে না জানি কী হয়, সে ভাবনাতেই অণিমার উৎকণ্ঠার সীমা রইল না।

বারো

থানার রুদ্ধদ্বার কক্ষে অসহিষ্ণুভাবে পায়চারি করছিলেন ডাক্তার। অযথা, এভাবে বন্দি হয়ে থাকা তাঁর পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছে। তাঁর এক্ষুনি চৌধুরিগড়ে যাওয়া বিশেষ দরকার। লোহার গরাদে বারবার আঘাত করে চেঁচিয়ে উঠলেন ডাক্তার, 'কে, কে আছ এখানে?'

আসামির ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মচারী বারান্দায় চেয়ারে বসে ঝিমোচ্ছিলেন, ডাক্তারের চেঁচামেচিতে মহা বিরক্তির সঙ্গে তিনি উঠে এলেন। কর্কশ কণ্ঠে ধমক দিয়ে বললেন, 'কেন মিছিমিছি ঝামেলা করছেন বারবার। কী চাই আপনার?'

'আমি জানতে চাই, পোস্ট মর্টেম-এর রিপোর্ট এখানে এসেছে কিনা?'

কাঁচা-ঘুম ভেঙে যাওয়ায় পুলিশ কর্মচারী খুবই বিরক্ত হয়েছিলেন। বিকৃত সুরে বললেন, 'আসুক-না-আসুক তাতে আপনার কী লাভ? মিছিমিছি বিরক্ত করবেন না।'

এমনসময় ডাক্তারের সব উৎকণ্ঠার নিরসন করে একটি লোক টেলিগ্রাম নিয়ে এল। পুলিশ কর্মচারী টেলিগ্রাম খুলে পড়লেন, তারপর ডাক্তারের হাতে দিয়ে বললেন, 'এই নিন আপনার টেলিগ্রাম। চৌধুরিগড় থেকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে।'

ডাক্তার প্রায় ছোঁ মেরে গরাদের ফাঁক দিয়ে হাত বাড়িয়ে টেলিগ্রাম কেড়ে নিলেন। এরজন্য তিনি এতক্ষণ স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। টেলিগ্রাম পড়ে ডাক্তার আরও উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। 'কোথায় দারোগাসাহেব কোথায়! আমার এক্ষুনি তাঁকে দরকার।'

পুলিশ কর্মচারী দাঁত খিঁচিয়ে বললেন, 'তিনি তো আপনার হুকুমের চাকর নন, যে দরকার বললেই এসে সেলাম জানাবেন! দারোগাসাহেব এখন তাঁর কোয়ার্টারে।'

'এখুনি তাঁকে কোয়ার্টারে খবর দাও, তাঁকে আমার না হলেই নয়, নইলে সর্বনাশ হয়ে যাবে বলে রাখছি।'

কর্মচারী তাচ্ছিল্যভরে বললেন, 'আপনিও বলে রাখলেন আমরাও শুনে রাখলাম। এখন দয়া করে আর হাঙ্গামা করবেন না মশাই। তাতে ভালো হবে না।' এই বলে আগন্তুকসহ পুলিশ কর্মচারী প্রস্থান করলেন।

ডাক্তার দেখলেন, কাতর আবেদন-নিবেদনে এরা কর্ণপাত করবে না। তিনি চঞ্চলভাবে পায়চারি শুরু করলেন। যেভাবেই হোক, চৌধুরিগড়ে আজ রাত্রেই তাঁর ফিরে যাওয়া চাই। চট করে ডাক্তারের মাথায় একটা ফন্দি গজাল। তিনি গরাদের কাছে এসে চেঁচিয়ে ডাকলেন, 'কে, কে আছে ওখানে, শুনুন।'

পুলিশ কর্মচারীটি বারান্দার কোণে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিলেন। তিনি এসে বললেন,

'আপনি তো বড় বেশি জ্বালাতন শুরু করলেন মশাই!'

'হ্যাঁ. করলাম। একটা আলো, একটা লণ্ঠন কি আমি পেতে পাবি না?' ডাক্তার উষ্ণ কণ্ঠে দাবি জানালেন।

'না, পেতে পারেন না।'—রুক্ষ স্বরে জবাব দিলেন পুলিশ কর্মচারী।

'ওঃ, পারি না! ভাবছেন তাহলে কিছু গণ্ডগোল করে বসব। আপনাদের ফাঁকি দেব? বেশ, সেই ফাঁকিই দিচ্ছি। দেখি, কী করে ঠেকান।' ডাক্তারের চোখে-মুখে দুষ্টুমি বুদ্ধির আভাস ঝিলিক দিয়ে উঠল।

বাঁ-হাতের আংটি দেখিয়ে ডাক্তাব বললেন, 'দেখছেন, এই আংটি। পুলিশের খানাতল্লাশিতে এটা ধরা পড়েনি। এর ভেতর বিষ আছে। ভয়ঙ্কর ডাক্তারি বিষ, এই বিষ মুখে দিতে না দিতেই...' চক্ষের নিমেষে আংটি চুম্বন করে মেঝেতে লুটিয়ে পড়লেন ডাক্তার।

পুলিশ কর্মচারী এই দৃশ্যের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি ব্যস্তভাবে লকআপের তালা খুলে ভিতবে ঢুকলেন। 'আরে, আরে করেছেন কী! জমাদাব। রামসেবক, জলদি ইধার আও, এ যে আমায় সুদ্ধু ফাঁসাবার ব্যবস্থা করেছে!'

কনস্টেবল ও জমাদার ছুটে এল। তারা ডাক্তারেব অচৈতন্য দেহের ওপর ঝুঁকে পড়ল, লোকটা এখনও বেঁচে আছে কি না পরীক্ষা করবার জন্য।

ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মচারী জমাদারকে বললেন, 'দারোগাবাবুকে শিগগির খবর দাও...'

সম্পূর্ণ অতর্কিতে হঠাৎ তড়াক করে এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে পুলিশ কর্মচারীদের বোকা বানিয়ে ছুটে পালালেন ডাক্তার। থানার বাইরে দারোগাসাহেবের মোটরবাইক আর একটা জিপ গাড়ি দাঁড়িয়ে। ডাক্তাব এক লাফে মোটব বাইকে উঠে সেটা চালিয়ে দিলেন।

আসামি গারদ থেকে পালানোর সঙ্গে-সঙ্গেই থানার পাগলাঘণ্টি বেজে উঠল। কয়েকজন পুলিশসহ গারদের ভাবপ্রাপ্ত অফিসাব থানার জিপ গাড়িতে এসে চাপলেন। ড্রাইভারকে বললেন, 'শিগগির স্টার্ট দাও, দারোগাবাবুকে কোয়ার্টার থেকে তুলে নিলেই চলবে। আসামি বেশি দূর যেতে পারে নি, জিপের সঙ্গে সে পাল্লা দিতে পারবে না, চালাও।'

তীব্রগতিতে জিপ ছুটে চলল।

তেরো

রাত্রি বারোটা। ঘড়িতে ঢং-ঢং করে বারোটা বাজবার সঙ্গে-সঙ্গেই অণিমার কামরার সামনের বারান্দায় এসে দাঁড়ালে সুরজিৎ। ঠিক সেইমুহূর্তে পূর্ব-নির্দিষ্ট ব্যবস্থামতো অণিমা অপর দিক থেকে এসে সুরজিতের সঙ্গে মিলিত হল। দুজনের মধ্যে ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টি-বিনিময় হল।

অণিমা প্রশ্ন করলে, 'আপনাব মুখ দেখে মনে হচ্ছে, আজ রাত্রে সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটবে!'

সুরজিৎ এক ঝলক স্নিগ্ধ হাসি হেসে বলল, 'নইলে সাধ করে কে শয্যা বদল করে বলুন?'

তিথিটা মনে নেই, তবে একটু বেশি রাত করেই যেন আকাশে খণ্ড চাঁদ উঠেছে, আধো ছায়া, আধো আলোতে, এই গভীর নিশিথে, অণিমার শঙ্কাবিহ্বল ভাবটি বেশ লাগল সুরজিতের চোখে। অদূরে উন্মুক্ত প্রান্তরে অস্পষ্ট চাঁদের আলো পড়ে এক রহস্যময় পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। এক দৃষ্টিতে সে দিকে তাকিয়ে একটু অন্যমনস্কভাবে অণিমা বলল, 'মানুষ কতভাবেই না মানুষের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলতে পারে! কোনও ভয় উদ্বেগ না থাকলে,

সারারাত্রি শুধু বাইরের জ্যোৎস্না ছড়ানো মাঠের দিকে তাকিয়েই কাটিয়ে দেওয়া যেত, নয় কি, সুরজিৎবাবু?'

অণিমার নারীসুলভ ভাবপ্রবণতায় হেসে উঠল সুরজিৎ, 'এ-জন্যেই বলে মেয়েদের মন! মাথার ওপর যখন বিপদের খড়্গ ঝুলছে, তখনও চাঁদের আলো আর খোলা মাঠ নিয়ে কবিত্ব! যান, শিগগির ঘুমোতে যান। গুড নাইট।'

'গুড নাইট,' বলে অণিমা সুরজিতের ঘরের দিকে প্রস্থান করল।

সুরজিৎ একটু পরেই পূর্ব নির্দিষ্ট ব্যবস্থামতো অণিমার ঘরে গিয়ে আলো নিভিয়ে দিলে।

চৌধুরিগড়ের বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত লোকটি দরজার সামনে টুলে বসে ঝিমোচ্ছিল। হঠাৎ সেখানে আবির্ভাব হল ছায়ামূর্তির। চারদিক নিস্তব্ধ, ছায়ামূর্তি মিনিট কয়েক দাঁড়িয়ে তন্দ্রাতুর লোকটির ভাবভঙ্গি লক্ষ করল। তারপর ডায়নামো ঘরে ঢুকে তৎপরতার সঙ্গে যন্ত্রটি বিকল করে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে সারা বাড়ি গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত হল। অভ্যস্ত শব্দ স্রোত বন্ধ হওয়ায় ডায়নামোর ভারপ্রাপ্ত লোকটি চমকে উঠল। তার মনে হল ভিতরে কেউ ঢুকেছে। এবং সেই মুহূর্তে একটা ছায়ামূর্তি ভিতর থেকে দরজার দিকে এগিয়ে আসছে লক্ষ করে সে সিঁড়ির গোড়ায় ঘাপটি মেরে লুকিয়ে রইল। আবরণধারী রহস্যময় মূর্তিটি বেরিয়ে আসতেই সে সিংহবিক্রমে তার ওপর লাফিয়ে পড়ল। কিন্তু ডায়নামোর ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিটি আক্রমণ করার সঙ্গে-সঙ্গে অপ্রত্যাশিতভাবে আঘাত পেয়ে ছিটকে পড়ল। আর ওঠবার ক্ষমতা তার রইল না।

সমগ্র চৌধুরিগড়ের ওপর অভিশাপের মতো নেমে এসেছে সূচীভেদ্য অন্ধকার। চারদিক নীরব নিস্তব্ধ, একটা সূচ পতনের শব্দ পর্যন্ত শোনা যায়। সুরজিতের ঘরের জানলার সামনে এসে দাঁড়াল ছায়ামূর্তি। গরাদের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দেখলে, অণিমা অকাতরে ঘুমোচ্ছে। অন্ধকারে স্পষ্ট অণিমার মুখ দেখতে না পেলেও, জ্যোৎস্নার ক্ষীণ আলোতে মনে হল, খুনি আসামি গ্রেপ্তার হওয়ার পর নিশ্চিন্তে অণিমা নিদ্রা যাচ্ছে। জানলায় লোহার গরাদ দেওয়া। কিন্তু দেখা গেল তার একটি গরাদ নকল মাত্র। মুখোশধারী সেটি হাত দিয়ে নাড়া দেওয়া মাত্র সেটি কাঠের ফ্রেমের নিচে নেমে গেল। সেই ফাঁক দিয়ে গলে মুখোশধারী সোজা অণিমার বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর মুহূর্তমাত্র দ্বিধা না করে অণিমার ঘুমন্ত মস্তক লক্ষ করে অনবরত রিভলবারের গুলি ছুড়তে লাগল।

সুরজিৎ এই ধরনের বিপত্তি প্রত্যাশা করেই অণিমার সঙ্গে ঘর বদল করেছিল। সে আগেই আশঙ্কা করেছিল, আজ রাত্রেই অণিমার ওপর অতর্কিত আক্রমণ হবে। আততায়ীর চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য বিছানার ওপর বালিশগুলো এমনভাবে আচ্ছাদন জড়িয়ে ঢেকে রেখেছিল সুরজিৎ, যে অস্পষ্ট আলোকে মনে হচ্ছিল, চাদর মুড়ি দিয়ে কেউ অকাতরে ঘুমোচ্ছে। চাদর জড়ানো বালিশকেই ঘুমন্ত অণিমা ভেবে অনবরত গুলি ছুড়ছিল নিশীথ রাত্রির কালো আবরণধারী আততায়ী। আলমারির পিছনে লুকিয়ে সবই লক্ষ করছিল সুরজিৎ। শেষ গুলিটি নিক্ষিপ্ত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে পিছন থেকে বেরিয়ে এসে ছায়ামূর্তির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, কিন্তু আততায়ী অসীম শক্তিতে তাকে বিছানার ওপর ধাক্কা দিয়ে ফেলে এক নিমেষে বাইরে চলে গেল। সুরজিৎ পা বাড়াবার আগেই সে বিদ্যুৎগতিতে দরজাটা বাইরে থেকে টেনে বন্ধ করে অদৃশ্য হয়ে গেল।

গুলির শব্দ শুনে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল অণিমা। কিন্তু, দরজায় যে ছিটকিনি দেওয়া রয়েছে! তাজ্জব কাণ্ড! তাড়াতাড়ি ছিটকিনি খুলে ঘরে ঢুকলে অণিমা।

'কী, হল কি। পালিয়ে গেল? আপনার লাগেনি তো?' উদগ্রীব কণ্ঠে জিগ্যেস করলে অণিমা।

এমনসময় তদন্তকারী পুলিশ অফিসার কনস্টেবলসহ এসে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেন।

'কার লেগেছে? গুলি করল কাকে? কেউ জখম হয়নি তো?' পুলিশ অফিসার প্রশ্ন করলেন।

গুলির আঘাতে ফুটো বিছানার চাদর আর বালিশ দেখিয়ে সুরজিৎ বললে, 'জখম শুধু এই বালিশ-বিছানাই হয়েছে, কিন্তু এত করেও ধরতে পারলাম না!'

পুলিশ অফিসাব সায় দিয়ে বললেন, 'এই রকম ভয় করেই আমি তার পিছনে—সেই থানা থেকেই ছুটে আসছি।'

'কার পিছনে?' অবাক হয়ে জিগ্যেস করলে সুরজিৎ।

'কার পেছনে আবার, ডাক্তারের। ডাক্তার যে গারদ ভেঙে পালিয়ে এসেছে, সেই খবর পেয়েই তো ছুটে আসছি।'

'ডাক্তার পালিয়েছে?' পুলিশ অফিসারের মুখে এই প্রথম খবরটা শুনলে সুরজিৎ। তার সর্বাঙ্গ দারুণ উত্তেজনায় কেঁপে উঠল। বললে, 'শিগগির-শিগগির তা হলে দীননাথবাবুর ঘরে চলুন। এক মুহূর্ত দেবি করলে সমূহ বিপদ কেউ রোধ করতে পারবে না।'

এই বলে সুরজিৎ উর্ধ্বশ্বাসে দীননাথবাবুর ঘরের দিকে ছুটল। তাঁর পিছনে-পিছনে পুলিশ অফিসার। কনস্টেবল পাহারার জন্য বারান্দায় মোতায়েন রইল।

না জানি, আবার কী নতুন বিপদ ঘটবে, দীননাথবাবুর ঘরে?

দীননাথবাবুর ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। কিন্তু মনে হচ্ছে ভিতরে যেন একটা খণ্ড প্রলয় চলেছে। সুবজিৎ ও পুলিশ অফিসার গভীর উৎকণ্ঠা বুকে নিয়ে রুদ্ধ-দরজায় আঘাত করলেন। কিন্তু ভিতর থেকে কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। উভয়েই চিৎকার করে বললেন, 'দরজা খুলুন, শিগগির দরজা খুলুন।'

কেউ দরজা খুলে দিলে না। পুলিশ অফিসার বললেন, 'আমরা বোধহয় too late—শুনতে পাচ্ছেন।'

দরজায় সজোরে ধাক্কা দিয়ে সুরজিৎ বললে, 'না, আর অপেক্ষা করা যায় না, দরজা ভাঙতে হবে।' পুলিশ অফিসারও দেহের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে দরজায় লাথি মারতে লাগলেন। তাদের সম্মিলিত পদাঘাতে কব্জা খুলে সশব্দে দরজার দুই পাল্লা ভেঙে পড়ল। ঘরে গিয়ে দুজনে দেখলেন ঘর শূন্য, জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই। অথচ মিনিট কয়েক আগেও বাইরে থেকে ধ্বস্তাধ্বস্তি ও মারামারির স্পষ্ট শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল। ভৌতিক কাণ্ড আর কী! কামরার আসবাবপত্র অবিন্যস্তভাবে ছড়ানো রয়েছে, সারা ঘরে ধ্বস্তাধ্বস্তির স্পষ্ট ছাপ বর্তমান। সুতরাং কামরায় ঢুকে সুরজিতের বুঝতে বাকি রইল না যে এখানে খানিকক্ষণ আগে আরও লোকজন ছিল। আর তারা নিশ্চয়ই হাওয়ায় মিলিয়ে যায়নি।

পুলিশ অফিসার অবশ্য একটু নিরাশ হয়েই জিগ্যেস করলেন, 'কই, কেউ তো নেই এখানে?'

নীরবে কক্ষের অবস্থানটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করছিল সুরজিৎ। বললে, 'আসুন।' বাঁ-কোণের ভেজানো দরজা ঠেলে তারা সন্নিহিত কামরায় প্রবেশ করল। না, সেখানেও কেউ

নেই। এবার সত্যি-সত্যিই হতাশ হয়ে পড়লেন পুলিশ অফিসার। সুরজিৎও মুহূর্তের জন্য একটু সংশয়ের মধ্যে পড়ল। এরা দুজনে তাহলে কী কৌশলে মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে!

পুলিশ অফিসার বললেন, 'এ তো ভোজবাজি দেখছি!'

সুরজিৎ পুলিশ অফিসারের কথার প্রতিধ্বনি করে বললে, 'ভোজবাজিই বটে।' গভীর চিন্তার রেখা তার কপালে ফুটে উঠেছে। হঠাৎ ছিন্ন পর্দার দিকে নজর পড়তেই চোখ দুটো তার উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

ক্ষিপ্র হস্তে ছিন্ন পর্দা সরাতেই লুকোনো ইলেকট্রিক বোতাম বেরিয়ে পড়ল। বোতামে মৃদু চাপ দিতেই সবাইকে বিস্মিত করে গুপ্তপথের কপাট খুলে গেল!

সুরজিৎ বললে, 'আসুন।'

পুলিশ অফিসার ও সুরজিৎ দ্রুতপদে সে চোরাপথ দিয়ে তর-তর করে নিচে নেমে গেলেন। দুজনেরই মন আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে আন্দোলিত হচ্ছে। কে জানে, আসামি এতক্ষণে নাগালের বাইরে চলে গেছে কি না! এ-বাড়ির চোরা পথগুলোর সন্ধান না জানলে মুখোশধারী আততায়ীর চুলের ডগাটি স্পর্শ করবার পর্যন্ত কারও সাধ্য ছিল না। তখন সমগ্র ব্যাপারটাই ভৌতিক বলে মনে হওয়া খুব স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু ছায়ামূর্তির অভিনব অদৃশ্য হওয়ার কৌশলই তার মৃত্যুবাণ রচনা করেছে।

গোপন-পথ অতিক্রম করে সর্বশেষ তলায় পৌঁছতেই তাঁরা দেখতে পেলেন, আবরণধারী একটি লোকের অচেতন দেহকে বহন করে বাইরে পুলিশ অফিসারের জিপ গাড়িতে তুলছে। পিছনে লোকজনের সাড়া পেয়ে আবরণধারী লোকটিকে গাড়িতে রেখে জিপ স্টার্ট দিয়ে উল্কার গতিতে ছুটে চলল।

সুরজিৎ তিনলাফে বাইরে বেরিয়ে এল। সেখানে মোটরবাইক একটা দাঁড় করানো রয়েছে। সুরজিৎ একলাফে তাতে চেপে দ্রুতগামী জিপের পিছনে ধাওয়া করল। পুলিশ অফিসার চৌধুরিগড়ের গাড়ি নিয়েই আসামিকে অনুসরণ করলেন।

জিপগাড়ি থেকে সুরজিতের মোটরসাইকেল লক্ষ্য করে কয়েকবার গুলি ছুড়লে আবরণধারী। সুরজিৎ জিপের টায়ার লক্ষ্য করে সে গুলির প্রত্যুত্তর দিলে। উভয় পক্ষেরই কয়েকটি গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। হঠাৎ শব্দ করে জিপ গাড়ি একটা নির্জন জঙ্গলের পাশে এসে থেমে পড়ল। সুরজিতের শেষ গুলিটা লক্ষ্যভেদ করেছে, টায়ার ফুটো হয়ে জিপ মাঝপথে বিকল হয়ে পড়েছে। মোটরসাইকেল থেকে নেমেই সুরজিৎ দ্রুত জিপের দিকে ছুটে গেল। কিন্তু এবার সত্যিই অবাক না হয়ে পারল না সুরজিৎ। জিপ শূন্য, মুখোশধারী আগেই পালিয়েছে। কিন্তু যে লোকটির জ্ঞানহীন দেহ বহন করে আনলে মুখোশধারী, মুহূর্তের মধ্যে সে তা কী করে অপসারিত করলে? এবার মহা সমস্যায় পড়ল সুরজিৎ।

টর্চের আলো জ্বেলে গাড়ি তন্ন-তন্ন করে খুঁজলে, এবার বাস্তবিকই ভোজবাজি দেখালে মুখোশধারী! টর্চের আলোতে কর্দমাক্ত ভূমির ওপর ভারী পায়ের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। টর্চ হাতে নিয়ে পদচিহ্ন অনুসরণ করে জঙ্গলের দিকে সুরজিৎ একাই এগিয়ে গেল। জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে পায়ের চিহ্ন লুপ্ত হয়েছে। প্রকাণ্ড একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে সুরজিৎ ভাবছিল, এবার কোন দিকে যাবে। শেষ পর্যন্ত মুখোশধারী তাদের বোকা বানিয়ে অদৃশ্য হল, হাতের মুঠোর মধ্যে এসে শিকার হাতছাড়া হয়ে গেল? হঠাৎ খস-খস শব্দ শুনে তড়িৎবেগে সুরজিৎ গাছের নিচ থেকে দূরে সরে গেল। অল্পের জন্য বেঁচে গেছে সুরজিৎ! আর একটু হলেই

তীক্ষ্ণ ছুরি আমূল বিদ্ধ হতো তার পৃষ্ঠদেশে। তৎপরতার সঙ্গে দূরে সরে যাওয়ায় ছুরি গাছের মূল কাণ্ডে বিদ্ধ হল। গাছের ওপর থেকে নিঃশব্দে সুরজিতের পিছন দিয়ে নিচে নামছিল মুখোশধারী। সুরজিতকে ঘায়েল করতে না পেরে হিংস্র আক্রোশে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল মুখোশধারী। তারপর শুরু হলো প্রচণ্ড হানাহানি। এবার দুজনই মরিয়া হয়ে উঠেছে। সুরজিৎ আগে থেকেই তৈরি ছিল। সুতরাং মুখোশধারী আগের বারের মতো সহজে সুরজিতকে কাবু করতে পারলে না। অনেকক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তির পর অকস্মাৎ সুরজিতের একটি মোক্ষম ঘুষিতে মুখোশধারী কাটা কলাগাছের মতো মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তা সত্ত্বেও সে ওঠবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু সুরজিতের দ্বিতীয় ঘুষি খেয়ে, তার আর সে ক্ষমতা রইল না। এমনসময় দলবলসহ পুলিশ অফিসার এসে উপস্থিত হলেন।

ইতিমধ্যে সুরজিৎবাবু একাই বাজিমাত করেছেন দেখে পুলিশ অফিসার আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। মুখোশধারীর হাতে হাতকড়া এঁটে দিয়ে বললেন, 'কনগ্র্যাচুলেশন সুরজিৎবাবু। আসামিকে ধরবার আশা আমি ছেড়েই দিয়েছিলুম। সেই সঙ্গে আপনারও...'

কৌতুক করে সুরজিৎ জবাব দিলে, 'আমার ওপর বিশ্বাস তাহলে আপনার খুব বেশি নেই!'

'না বিশ্বাস থাকবে না কেন। কিন্তু এরকম শয়তানের পাল্লায় তো আগে কখনও পড়েননি।'

'শয়তানের চেহারাটা তাহলে একবার দেখুন।' এই বলে সুরজিৎ আততায়ীর মুখোশ টেনে খুলে ফেলল। কালো আববণ আগেই ধ্বস্তাধ্বস্তিতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। এবার আততায়ীর স্বরূপ স্পষ্ট দেখতে পেলেন পুলিশ অফিসার। বিস্মিত হয়ে বললেন, 'এ কি, এ তো দীননাথবাবু!'

'তাই মনে হচ্ছে কি?' সুরজিৎ পুলিশ অফিসাবের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার ওপর ঠেস দিয়ে প্রশ্ন করল। পুলিশ অফিসার বিস্মিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিন্তু ডাক্তার, ডাক্তার, তাহলে কোথায় গেল?'

এমনসময় ব্যস্ত সমস্ত হয়ে সহকারী পুলিশ কর্মচারী এসে ডাক দিলে, 'স্যার।'

ক্রুদ্ধ-স্বরে পুলিশ অফিসার ধমক দিলেন, 'আঃ, স্যার, স্যার করবার আর সময় পেলেন না। কী, হয়েছে কি?' ধমক খেয়ে ভয়ে-ভয়ে পুলিশ কর্মচারী বলল, 'আজ্ঞে, ডাক্তারবাবুকে রাস্তার ধারে পাওয়া গেছে।'

'পাওয়া গেছে! Is he deed?' সুরজিৎ ব্যগ্র কণ্ঠে প্রশ্ন করল।

পুলিশ কর্মচারী বলল, 'আজ্ঞে না, তবে বেশ একটু জখম হয়েছেন। বোধহয় গাড়ি থেকে পড়ে গিয়ে...'

'যাক, খুব বেঁচে গেছেন। যান, ডাক্তারকে মোটরে নিয়ে আপনারা চৌধুরিগড়ে ফিরে যান। আসামিকে নিয়ে আমরা যাচ্ছি।'

সহকারী পুলিশ কর্মচারী নির্দেশ পালন করতে চলে গেল।

পুলিশ অফিসার প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু ব্যাপারটা তাহলে কীরকম হল। আমি তো ভেবেছিলাম...'

'যা, ভেবেছিলেন, তা ভুল,' সুরজিৎ বলল। ডাক্তারের ওপর সমস্ত সন্দেহ চাপিয়ে দেওয়া আসামির উদ্দেশ্য ছিল। ডাক্তার নিরুদ্দেশ মনে করে, আমরা সমস্ত দোষ তাহলে তার ঘাড়েই চাপিয়ে রাখতাম। নেহাত বেকায়দায় পড়েই আসামি শেষ পর্যন্ত মতলবটা হাসিল

করতে পারেনি।'

'কিন্তু দীননাথবাবুর এই সব কাজ! ওঁর তো আধখানা শরীর পক্ষাঘাতে পঙ্গু বলেই জানতাম।'

'ঠিকই জানতেন। মর্গের ময়না তদন্ত, মানে পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা পড়েছেন?'

পুলিশ অফিসার বললেন, 'না, এখনও সময় পাইনি। কিন্তু Post mortem-এর report-এর সঙ্গে এ-ব্যাপারের কী সম্বন্ধ?'

'সম্বন্ধ শুধু এই,' বলে সুরজিৎ মৃদু হেসে আসামির নকল দাড়ি আকর্ষণ করতেই পুলিশ অফিসার অবাক হয়ে বলে উঠলেন, 'এ কি, এ যে রাজীবলোচন! সব গুলিয়ে যাচ্ছে যে মশাই।'

'কিচ্ছু গুলিয়ে যাবে না। সব আমি পরে বুঝিয়ে দেব।' ঈষৎ অনুকম্পার সুরে বলল, সুরজিৎ। 'এবার চলুন. আসামিকে নিয়ে চৌধুরিগড়ে ফিরে যাই।'

রাজীবলোচনকে সঙ্গে নিয়ে পুলিশ অফিসাব গিয়ে জিপে বসলেন। সুরজিৎ নিজে ড্রাইভ করে সবাইকে নিয়ে ক্ষিপ্র গতিতে চৌধুরিগড়েব দিকে রওয়ানা হল।

চোদ্দো

আসামি ধরা পড়েছে শুনে চৌধুরিগড়ে একটা সোরগোল পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু সবাই যখন শুনল, আসামি স্বয়ং রাজীবলোচন—তখন বিষয়টা বুঝতে না পেবে সবাই হতবুদ্ধি হয়ে গেল। রাজীবলোচন স্বয়ং দুদিন আগে খুন হয়েছেন অথচ পুলিশের হাতে তিনি নিজে ধরা পড়লেন। ব্যাপারটা ভৌতিক বলেই মনে হওয়া স্বাভাবিক। সবাই এর পরিণতি দেখবার জন্য উদগ্রীব হয়ে রইল।

নিজের খাস কামরায় একখানি ইজিচেয়াবে হেলান দিয়ে বসে আছেন রাজীবলোচন। পুলিশের হাতে ধরা পড়েও অপ্রস্তুতের কোনও ভাবই তাঁর চেহাবায় প্রকাশ পায়নি। নিজের মনের ভাব গোপন করবার অসাধারণ ক্ষমতা রাজীবলোচনের। সামনে বসেছিলেন পুলিশ অফিসার, অণিমা ও ডাক্তার। ডাক্তারের কপালে তখনও পটি বাঁধা রয়েছে। অবশ্য জখম খুব মারাত্মক না হওয়ায় প্রাথমিক শুশ্রূষার পরই তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন। রাজীবলোচনের পাশে দাঁড়িয়ে সমস্ত ব্যাপারটাই গোড়া থেকে ব্যাখ্যা করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল সুরজিৎ। সে প্রথমে রাজীবলোচনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি রাজীববাবু, ব্যাপারটা আপনার মুখ থেকে শুনলেই ভালো হতো নাকি?'

দৃঢ় স্বরে রাজীবলোচন বললেন, 'না, আমার কিছু বলবার নেই।'

সুরজিৎ হেসে বলল, 'বেশ আমিই তাহলে বলছি শুনুন, নাটকের প্রথম দৃশ্য ধরুন, রাজীবলোচন খুন হয়েছেন। এই খুন হওয়াটাই রাজীবলোচনের অসামান্য কীর্তি।' এই বলে সে টেবিলের সামনে এগিয়ে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

'কেউ খুন হলে, সাধারণত আমরা যে খুন হয়েছে তাকে সন্দেহ করি না। সন্দেহ করি, আর পাঁচজনকে যারা খুন করতে পারে। রাজীবলোচন আমাদের এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তিরই সুযোগ নিয়েছেন। কিন্তু কেন, কী দরকার ছিল, তাঁর এই খুনের দৃশ্য সাজাবার, নিজেকে মৃত বলে প্রমাণ করবার?'

'যজ্ঞেশ্বরের 'উইল'টার কথা স্মরণ করলেই এ-প্রশ্নের উত্তর মিলবে। যজ্ঞেশ্বর জীবনের শেষ মুহূর্তে তিনি ছেলেকে সমানভাবে সব দিয়ে গিয়েছিলেন। রাজীবলোচন বহুদিন

এ-'উইল' চেপে রেখেছিলেন। কিন্তু যখন বুঝলেন, 'উইল' চেপে রাখা আর সম্ভব নয় তখনই এই শয়তানি ফন্দি তাঁর মাথায় আসে। বড় ভাই দীননাথ তাঁর কাছে সাহায্য ভিক্ষা করতে আসতেই তিনি নিজের ফন্দি কাজে লাগাবার সুযোগ পেলেন। দীননাথ আর রাজীবলোচনের চেহারার মিল প্রায় যমজের মতো। দীননাথ একদিন সেই মিল কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছিলেন, রাজীবলোচন সেজে টাকা ধার করতে গিয়ে। রাজীবলোচন কিন্তু চেহারার মিলের চরম সুযোগ নিলেন, দীননাথকে রাজীবলোচন সাজিয়ে হত্যা করে। তিনি নিজে নকল দাড়ি পরে দীননাথ সাজলেন আর দাড়ি কামিয়ে দিয়ে দীননাথকে সাজালেন রাজীবলোচন। দীননাথের হাত-পা পক্ষাঘাতে পঙ্গু, কিন্তু মৃতদেহ তো হেঁটে বেড়ায় না। সুতরাং তা ধরা পড়বার কোনও সম্ভাবনা নেই। কেমন, তাই না রাজীববাবু?' রাজীবলোচনের সন্নিহিত হয়ে প্রশ্ন করল সুরজিৎ।

তিক্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন রাজীবলোচন, 'হ্যাঁ, তাই। কি লাভ ওই অথর্ব পঙ্গু দীননাথের বেঁচে থেকে? দুর্বহ জীবন নিয়ে আত্মহত্যা করা যার উচিত ছিল, তাকে আমি দয়া করে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছি।'

'সেইসঙ্গে নিজেরও সুবিধে করে নিয়েছেন।' টিপ্পনি কাটলে সুরজিৎ। 'যজ্ঞেশ্বরের 'উইলে'র শর্ত ছিল যে, ছেলেদেব মধ্যে যিনি বেঁচে থাকবেন, তিনিই সমস্ত পাবেন। পীতাম্বর নিরুদ্দেশ—হয়তো মৃত, রাজীবলোচনও খুন হয়েছেন বলে প্রকাশ। সুতরাং সবই এখন নকল দীননাথের প্রাপ্য। কিন্তু সোনায় সোহাগা দেওয়ার জন্য রাজীবলোচন ইতিমধ্যে ব্যাঙ্ককে ঠকিয়ে আরও কিছু রসদ সংগ্রহ কবে নিলেন। মৃত রাজীবলোচন যখন ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, তখন নকল দীননাথের আর ভাবনা কী?'

পুলিশ অফিসাব প্রশ্ন করলেন, 'রাজীবলোচনই যে দীননাথ সেজে আছেন, এ-সন্দেহ কি আপনি গোড়া থেকেই করেছিলেন?'

সুরজিৎ বললে, 'সন্দেহ সামান্য ছিল, কিন্তু তা দৃঢ় হয় অ্যাটর্নি যেদিন যজ্ঞেশ্বরের 'উইল' পড়েন। এ-'উইল' চুরি গিযেছিল, আপনারা তা জানেন। সে উইল গোপনে কে যথাস্থানে রেখে আসতে পারে? অণিমাদেবী তো নয়ই, ডাক্তারেরও তা স্বার্থ-বিরোধী। একমাত্র দীননাথের তাতে ষোলো আনা লাভ। নকল দীননাথকে ফাঁদ পেতে ধরবার জন্যে অণিমার সঙ্গে ঘর বদলের কথা তাই সেদিন তাঁর সামনেই আমি বলি। নকল দীননাথ ছাড়া আর কেউ এ-ঘর বদলের কথা তখনও জানতে পারেনি। সুতরাং আমার শোয়াব ঘরে সে রাত্রে পিস্তল নিয়ে মুখোশধারীর আবির্ভাব হতেই আমি বুঝেছিলাম যে নকল দীননাথই সমস্ত শয়তানির মূল।'

পুলিশ অফিসার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললেন, 'কিন্তু ডাক্তার। ডাক্তার হঠাৎ কেন হাজত ভেঙে পালিয়েছিলেন?'

এ-প্রশ্নের জবাব দিলেন ডাক্তার। বললেন, 'পালিয়েছিলাম নকল দীননাথকেই ধরবার জন্যে। সন্দেহ আমারও তখন ওর ওপরই হয়েছে। রাজীব যদি দীননাথ সেজে থাকে তাহলে মৃতদেহ দীননাথের হতে বাধ্য। সেই জন্যেই সদরেব মর্গের এক পরিচিত ডাক্তারের কাছে আমি টেলিগ্রাম করি, মৃতদেহের কোনও অঙ্গে পক্ষাঘাতের চিহ্ন আছে কি না জানবার জন্যে। সেই টেলিগ্রামের উত্তর পেয়েই আমি মরিয়া হয়ে হাজত থেকে বেরিয়ে আসি।'

সুরজিৎ বললে, 'হাজত থেকে বেরিয়েও আপনার নিস্তার ছিল না। নিরীহ ভালোমানুষ পেয়ে আপনার গলায় যে ফাঁস রাজীববাবু জড়িয়ে দিয়েছিলেন, তা থেকে মুক্তি পাওয়া

আপনার শত্রু ছিল। হাসপাতালের জন্যে সব সম্পত্তি দান করবার ছুতোয় আপনাকে ট্রাস্টি করে সমস্ত সন্দেহ আপনার ওপরই উনি ফেলেছিলেন।'

রাজীবলোচন আর সহ্য করতে পারলেন না। ডাক্তারের দিকে অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে উষ্ণ কণ্ঠে বললেন, 'হ্যাঁ ফেলেছিলাম। কিন্তু কেন? এ-সমস্ত ব্যাপারের সূত্রপাত কে করেছে, জানেন? ওই আপনাদের নিরীহ ভালোমানুষ।' কথাগুলোকে তিনি গভীর ঘৃণায় চিবিয়ে-চিবিয়ে উচ্চারণ করলেন। 'জানেন, ও কে? জানেন, ও কী উদ্দেশ্যে এখানে এসেছিল? ও ভেবেছিল, আমি বুঝি ওকে চিনতে পারিনি, কিন্তু আমি গোড়া থেকেই চিনেছিলাম, শুধু ধৈর্য ধরেছিলাম, সময় বুঝে চরম আঘাত দেওয়ার জন্যে।' তারপর ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী পীতাম্বর, নিজের পরিচয়টা এবার দাও, বলো কী উদ্দেশ্যে এখানে এসেছিলে?'

সেই মুহূর্তে যদি সারা কক্ষ দুলতে-দুলতে শূন্যের দিকে উঠতে থাকত, তবুও বোধহয় এতখানি আশ্চর্য হতেন না সুরজিৎ আর পুলিশ অফিসার। তাঁরা একসঙ্গে অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'পীতাম্বর!' বিস্ময়ে তাঁদের মুখে আর কথা সরল না।

অভিভূত কণ্ঠে অণিমা ডাকল, 'বাবা!' বেদনায়, বিস্ময়ে তার কথা জড়িয়ে এল।

গাঢ় স্বরে ডাক্তার বললেন, 'হ্যাঁ, মা, আমি-ই তোমার অযোগ্য বাবা পীতাম্বর। একদিন দুরবস্থায় পড়ে স্বার্থপরের মতো তোমাদের ফেলে বিদেশে পালিয়েছিলাম। সেখানেই এক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে আমাকে হাসপাতালে থাকতে হয়। সেখানকার সার্জন জেনারেল আমার দেহে অস্ত্রোপচার করে আমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে তোলেন। সেই থেকে ডাক্তারি শিখবার প্রবল ঝোঁক আমার মাথায় চেপে বসে। বহু সংগ্রাম করে, অনেক বাধা-বিপত্তির ভিতর দিয়ে ডাক্তারি বিদ্যার অনেক নতুন তথ্য আয়ত্ত করে আমি যখন দেশে ফিরলাম, তখন তোমাদের আর কোনও সন্ধানই আমি পেলাম না। আমায় বিশ্বাস করো, বহুদিন বাদে ফিরে সত্যিই পাগলের মতো তোমাদের খোঁজ করেছি। খোঁজ কোথাও না পেয়ে, সমস্ত রাগ আমার রাজীবলোচনের ওপর গিয়ে পড়ে। আমাদের সমস্ত দুর্দশার সেই মূল জেনে তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার সংকল্প করেই এখানে ফিরে এসেছিলাম। কিন্তু কেন, জানি না, সুযোগ পেয়েও চরম প্রতিশোধ নিতে পারিনি আমি।'

অণিমা আচ্ছন্নের মতো পীতাম্বরের পায়ের কাছে গিয়ে বসল। পীতাম্বর সস্নেহে মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

রাজীবলোচন তীব্র বিদ্রূপ করে বললেন, 'বাঃ, চমৎকার! এই মিলনদৃশ্যের মধ্যে আমি একটা অনুরোধ জানাতে পারি? রাখবেন সে অনুরোধ?'

সন্দিগ্ধ কণ্ঠে পুলিশ অফিসার বললেন, 'বলুন, দেখি রাখা যায় কি না।'

'এতসব মধুর মিলনান্ত দৃশ্য দেখে গলাটা আমার শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। ওই আলমারিতে একটা ফ্লাস্কে খানিকটা ব্র্যান্ডি আছে বোধহয়। সামান্য এক পাত্র আমায় খেতে অনুমতি দেবেন? ফাঁসি দেওয়ার জন্যেও আমায় বাঁচিয়ে রাখা বোধহয় দরকার।' ক্ষোভ, শ্লেষ আর বিদ্রূপের সংমিশ্রণে অদ্ভুত শোনাল রাজীবের কণ্ঠস্বর।

একটু ইতস্তত করে পুলিশ অফিসার সুরজিৎকে সম্মতিসূচক ইঙ্গিত করলেন।

সুরজিৎ আলমারি খুলে ফ্লাস্ক থেকে একপাত্র ব্র্যান্ডি ঢেলে রাজীবের হাতে দিল।

'ধন্যবাদ'—পানপাত্র হাতে নিয়ে পৈশাচিক উল্লাসে বললেন রাজীবলোচন। যেন শেষ মুহূর্তে একটা বড় রকমের জয়লাভ করেছেন তিনি।

'আপনাকেই বিশেষ করে ধন্যবাদ সুরজিৎবাবু। উপযাচক হয়ে, টাকা দিয়ে, আপনাকে

আমি আনিয়েছিলাম। আপনি তার যথেষ্ট প্রতিদান দিয়েছেন। আমার সমস্ত চক্রান্ত আপনিই ব্যর্থ করেছেন। এখন আমায় ফাঁসিকাঠে ঝোলাবারও ব্যবস্থা করেছেন,' এই বলে একটা অবজ্ঞার হাসি হাসলেন রাজীবলোচন।

'আমায় ফাঁসিকাঠে ঝোলাবেন! একটা সাধারণ খুনে, ডাকাতের মতো রাজীবলোচনকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে বাহবা নেবেন।' হঠাৎ রাজীবলোচনের পৈশাচিক হাসিতে ঘরের সবাই চমকে উঠল। চিৎকার করে তিনি বললেন, 'কিন্তু বড় ভুল করেছেন আপনারা। হাতকড়া আর পুলিশ পাহারা দিয়ে, রাজীবলোচনকে ধরে রাখা যায় না।' এই বলে এক চুমুকেই পানপাত্র নিঃশেষ করলেন রাজীব। সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে তাঁর দিকে ছুটে গেল, কিন্তু তিনি তখন আরামকেদারায় ঢলে পড়েছেন।

'এ কী ব্যাপার!' অস্ফুট স্বরে বললে অণিমা।

ডাক্তার রাজীবলোচনের মুখের ওপর নত হয়ে কী পরীক্ষা করলেন, তারপর ব্র্যান্ডির গ্লাস নেড়েচেড়ে দেখে বললেন, 'না শেষ পর্যন্ত খুব ফাঁকি দিয়েছে। পটাশিয়াম সায়নাইড বলেই মনে হচ্ছে।' ডাক্তারের কথা শুনে সবাই মুহূর্তের জন্যে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

এমনসময় হঠাৎ বারান্দার কোণ থেকে ভয়ার্ত চিৎকার শোনা গেল। সবাই সে আর্তনাদ লক্ষ করে ছুটে গেলেন।

বারান্দার কোণে দাঁড়িয়ে বলরাম ভয়ে কাঁপছে। সুরজিৎ জিগ্যেস করলে, 'বাড়িতে ডাকাত, না বাঘ পড়েছে যে এত চেঁচামেচি করছিস?'

করিডরের দিকে আঙুল নির্দেশ করে বলরাম অস্ফুট কণ্ঠে বললে, 'ওই, ওই...' ভয়ে তার গলার স্বর পর্যন্ত বেরোচ্ছে না। সবাই বিস্মিত হয়ে দেখলেন, করিডর দিয়ে একটি রহস্যময়, আবরণধারী মূর্তি হেঁটে যাচ্ছে।

সুরজিৎ ও পুলিশ অফিসার করিডরের দিকে ছুটে গেলেন। মুখোশধারী মূর্তিটি তাদের সাড়া পেয়ে দ্রুত গা ঢাকা দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু পুলিশ অফিসার তার বিশাল বপু নিয়ে মুখোশধারীর পথরোধ করে দাঁড়ালেন। হঠাৎ হাত কষে চেপে ধরে বললেন, 'এই মুখোশ খোল।'

এভাবে ধরা পড়ে যাবে, মুখোশধারী তা ভাবেনি। সে বেগতিক দেখে মুখোশ খুলে নেহাত গোবেচারার মতো কিচির-মিচির করে বলল, 'চাং সুং লু তাং.. ' চিনে পাচকের মূর্তিটি বেরিয়ে পড়ল।

বলরামের বুকে এতক্ষণে বল এসেছে। সে সাহস করে এগিয়ে গিয়ে বললে, 'ও হতভাগা, তোমার এই কীর্তি।'

চিনে পাচক তার দুর্বোধ্য ভাষায় বললে, 'ইয়ং তুং লিং।'

বলরাম শাসানির ভঙ্গিতে বলল, 'ভালো হবে না কিন্তু ভালো হবে না, সব বলে দেব তাহলে।'

অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলরামকে কাছে টেনে নিয়ে চিনা পাচক বলল, 'ইয়াং—লাং, মাং—তু।' তার ভাবটা এই যে, ভাই বড্ড বেকায়দায় পড়ে গেছি—তুই আবার হাটে হাঁড়ি ভাঙিসনে। দয়া করে আমাকে এ-যাত্রার মতো বাঁচা।

চিনা পাচকের অদ্ভুত মুখভঙ্গি আর কাতর কণ্ঠের দুর্বোধ্য কচকচানি শুনে সবাই একসঙ্গে হেসে উঠল। পুলিশ অফিসার বললেন, 'দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে 'ইয়াং লাং তুং' শোনবার আর সময় নেই সুরজিৎবাবু। আমাকে আবার থানায় গিয়ে তদন্তের লম্বা রিপোর্ট লিখতে

হবে। আমি এবার চলি।'

'অনেক ধন্যবাদ। আসামিকে গ্রেপ্তার করার ব্যাপারে আপনার কৃতিত্বও কম নয়। ঠিক সময়ে আপনি হাজির না হলে আসামিকে নিয়ে বড্ড বেগ পেতে হতো।' সুরজিৎ কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বলল।

সুরজিতের প্রশংসায় পুলিশ অফিসারের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, 'আসল কৃতিত্ব সব কিছু আপনারই প্রাপ্য সুরজিৎবাবু। আমরা শুধু কর্তব্য পালন করেছি। আচ্ছা, নমস্কার। ভবিষ্যতে হয়তো আবার দেখা হবে।'

সুরজিৎ প্রতিনমস্কার জানাল।

রাজীবলোচন আত্মহত্যা করায় খুনের মামলার সেখানেই পরিসমাপ্তি ঘটল। দলবলসহ পুলিশ অফিসার বিদায় নিলেন। সুরজিৎও সেদিনই সন্ধ্যার গাড়িতে রওয়ানা হল। অণিমা তাকে আর একটা দিন থাকবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করেছিল। কিন্তু সুরজিৎ কিছুতেই রাজি হল না। তাকে আবার রাণাঘাটে এক বন্ধুর বাড়ি হয়ে তবে কলকাতা যেতে হবে। অণিমাকে কলকাতা যাওয়ার বিশেষ আমন্ত্রণ জানিয়ে সুরজিৎ বিদায় নিল। তাদের পরিচয় মাত্র দুদিনের তবু তা এত নাটকীয়, এত চমকপ্রদ যে, সম্ভবত এ-পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা সহজে ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়ার মতো নয়। যাত্রাকালে দুজনের চোখের নীরব ভাষা সম্ভবত এই অর্থই ব্যক্ত করতে চাইলে।

সুরজিৎ চলে যাওয়ার পরদিনই চৌধুরিগড়ের চাকরবাকর, মালি দারোয়ানদের বিদায় দিয়ে, ফটকে তালা দিয়ে লটবহর নিয়ে অণিমারা কলকাতা চলে এল। মেয়ে-বাপ কারও এই অভিশপ্ত বাড়িতে মন টিকছে না। জীবনে অনেক দুঃখ অনেক দাগা পেয়েছেন পীতাম্বর ওরফে ডাক্তার, এবার শেষের কটা দিন তিনি মেয়েকে নিয়েই শান্তিতে কাটাতে চান। এই ফিরে পাওয়া হারানো মেয়েই এখন তাঁর সব। প্রথমে চৌরঙ্গির একটা নামকরা হোটেলে গিয়ে উঠলেন পীতাম্বর। এরপর ধীরেসুস্থে নিজেই একটা বাড়ি কিনে উঠে যাবেন এই রকম অভিপ্রায়। দেশের সঙ্গে সম্পর্ক বহু আগেই ঘুচে গিয়েছিল। এত কাণ্ডের পর আর নতুন করে সে সম্পর্ক স্থাপনের কোনও ইচ্ছাই নেই পীতাম্বরের।

পনেরো

সুরজিতের কাছ থেকে কোনও সংবাদ না পেয়ে অভয়বাবু বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। প্রচুর কাজ জমা হয়ে উঠেছিল। অনবরত টেলিফোনে জবাব দিতে-দিতে তিনি বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। এমনসময় সুটকেস আর বিছানা নিয়ে মন্থরগতিতে বলরামকে ঢুকতে দেখে অভয়বাবুর বুক থেকে যেন একটা গুরুভার নেমে গেল। সুরজিৎ ঘরে ঢুকতেই অভয়বাবু বললেন, 'যাক আপনি এসে গেছেন, বাঁচলাম। এই কদিনে টেলিফোনে কৈফিয়ৎ দিতে-দিতে হয়রান হয়ে গেছি।' সঙ্গে-সঙ্গে টেলিফোনে ঘণ্টা বেজে উঠল।

'ওই দেখুন, আবার কে খোঁজ করছে।' এই বলে অভয়বাবু রিসিভার ধরতে এগিয়ে গেলেন।

বাধা দিয়ে সুরজিৎ সাবধান করে দিলে, 'শুনুন অভয়বাবু, যে কেউ খোঁজ করুক; আমি নেই, অফিসে নেই, কলকাতায় নেই, বাংলাদেশে নেই, আমার ঠিকানা কেউ জানে না, আমি নিরুদ্দেশ। মাসখানেক ছুটি না নিয়ে আমি কোনও কাজে আর হাত দিচ্ছি না, বুঝেছেন।'

অভয় ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন। সুরজিৎ জরুরি চিঠিপত্র দেখবার জন্য তার খাস কামরায় চলে গেল। ইতিমধ্যে টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিয়েছে বলরাম। অভয়বাবু তাকে নিরস্ত করতে চাইলেন। সে অগ্রাহ্যের ভঙ্গিতে বললে, 'আরে যাও—যাও...' অভয়বাবু হাল ছেড়ে দিয়েছেন। প্রশ্রয় পেয়ে বলরাম মাথায় উঠেছে। তাকে বাগ মানানো সত্যিই কঠিন।

ফোন ধরে বলরাম বলল, 'আজ্ঞে, তিনি তো এখানে নেই। কোথাও নেই—হ্যাঁ-হ্যাঁ আমি, আমি তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট—আমি জানব না তো জানবে কে? এই দেখো—নেই তা কি করে জানলাম? এইমাত্র আমায় বলে দিলেন যে। ওই তো খাসকামরায় বসে রয়েছেন। জিগ্যেস করে ডেকে দেব—এই যা...' সুরজিতের বারণ সত্ত্বেও তাঁব উপস্থিতির কথা জানিয়ে অন্যায় করেছে বলরাম, একথা মনে পড়তেই সে জিভ কাটলে। ছোঁ মেরে রিসিভার কেড়ে নিলেন অভয়বাবু। আহাম্মক কোথাকার, এই বলে বলরামকে সরিয়ে দিয়ে তিনি নিজেই ফোন ধরলেন। 'আজ্ঞে, ও জানে না, ও হল এখানকার চাকর।' অভয়বাবুর কথা শুনে বলরাম বিকট মুখভঙ্গি করে রীতিমতো শাসিয়ে বললে, 'দেখো—দেখো, ভালো হবে না

'এসব কী হচ্ছে শুনি?' বলরামকে লক্ষ করে বললে সুরজিৎ। এদের বাকবিতণ্ডা শুনে খাস কামরা ছেড়ে সে এসে তাদের পিছনে দাঁড়িয়েছে। সুরজিতকে দেখে গভীর হতাশায় অভয়বাবু বললেন, 'কী করব স্যার।'

সুরজিতের সহজে মেজাজ গরম হয় না, কিন্তু বলরামের বোকামি আর অভয়বাবুর ইতস্তত ভাব দেখে সুরজিৎ আর নিজেকে সামলাতে পারলে না। 'Hopeless,' বলে সুরজিৎ টেলিফোন তুলে নিল। 'হ্যালো, হ্যাঁ বলুন, আজ্ঞে না Sorry, আমি অফিসিয়ালি ছুটি নিয়েছি। কোথায় বললেন, ড্রিমল্যান্ড হোটেল, এখুনি যেতে হবে? অসম্ভব। ম'প করবেন। কোনও উপায় নেই। আপনি পুলিশে খবর দিন না।'

ড্রিমল্যান্ড হোটেলের এক কক্ষে ফোন হাতে নিয়ে বসে অণিমা। সুরজিতের অসহিষ্ণু জবাব শুনে তাব ঠোঁটে মধুর হাসি ফুটে উঠল। কণ্ঠস্বরে অনেকটা অসহায় অবস্থার ভাব টেনে বললে অণিমা, 'কী করব বলুন। থানায় ফোন পাচ্ছি না। বলছে engaged.'

'থানা engaged! পুলিশকে আগে জানাতেও চান না? তা আমি কী করব বলুন, আর কাউকে বরং ডাকুন।' সাফ জবাব দিলে সুরজিৎ।

তারে নারী-কণ্ঠের অনুনয় ভেসে এল, 'না-না, আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারব না সুরজিৎবাবু। আর কেউ হলে হবে না।'

সুরজিৎ ভাবলে, এ তো আচ্ছা জবরদস্ত মেয়ের পাল্লায় পড়া গেল। কেস হাতে নিতে না চাইলেও জোর করে গছিয়ে তবে ছাড়বে! বলল, 'আর কেউ হবে না? Very Sorry ম্যাডাম। এখন আমি dead tired, অন্য সময় বরং—কী বলছেন, যে-কোনও মুহূর্তে attacked হতে পারেন—ঘরে লাশ পড়ে আছে?'

পাশের বিড়ালটার গায়ে হাত বুলোতে-বুলোতে জবাব দিল অণিমা, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, লাশ আমার সামনে, সমস্ত ঘর রক্তে ভেসে যাচ্ছে! বাইরে পায়ের শব্দ পাচ্ছি, দোহাই সুরজিৎবাবু। অসহায়, অবলা একজন স্ত্রীলোককে বাঁচাবার জন্যে একটু কষ্ট কি করতে পারেন না? আপনি না এলে এ-বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব। ওই, ওই...' কৃত্রিম ভীতি-বিহ্বলতার রেশ টেনে অণিমা ইচ্ছা করেই থেমে গেল। যেন আতঙ্কে তার কথা না।

সুরজিৎ উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, 'শুননু, শুনুন—হ্যালো, হ্যাঁ—কী ঠিকানা বললেন? হ্যাঁ, হ্যাঁ আচ্ছা, যাচ্ছি, আপনি ভয় পেয়ে যা-তা কিছু করে বসবেন না। আমি যাচ্ছি।'

সুরজিৎ ফোন ছেড়ে দিয়ে বেয়ারাকে ডেকে বললে, 'জলদি কোট লাও।'

বেয়ারা কোট এনে দিল। অভয়বাবু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন।

'না, আমায় যেতেই হল অভয়বাবু।' এই বলে সুরজিৎ ড্রিমল্যান্ড হোটেলের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল।

ফোন ছেড়ে দিয়ে আপন মনেই হেসে উঠল অণিমা। লাশ খুঁজতে এসে তাদের দেখে কী অবাকই না হবে সুরজিৎ, একথা ভেবে অণিমা খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠল। আশ্চর্য, তার কৃত্রিম কণ্ঠস্বরে সুরজিৎবাবুর একটুও সন্দেহ হয়নি!

পীতাম্বর ওরফে ডাক্তার এই সময়ে ঘরে ঢুকে বললেন, 'সুরজিৎবাবুকে ফোন করেছিস মা? আজ এখানে খেতে বলেছিস তো?'

'বলেছি বাবা,' গম্ভীর হয়ে জবাব দিল অণিমা।

'কী বললেন, আসছেন তো?'

'না, বোধহয় আসতে পারবেন না।'

'আসবেন না?' পীতাম্বর ক্ষুণ্ন কণ্ঠে বললেন।

'না, কোথায় যেন খুনের তদন্ত আছে।'

নিচে গাড়ির শব্দ শোনা গেল। পীতাম্বব বললেন, 'দেখা করতে কেউ এলেন বোধহয়।'

তিনি বারান্দা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে অবাক হয়ে দেখলেন, সুরজিৎ গাড়ি থেকে নামছে। ভারি খুশি হলেন সুরজিৎকে দেখে। অণিমাকে ডাকতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তিনি বারান্দায় দাঁড়িয়েই দেখলেন, সুরজিতকে অভ্যর্থনা করবার জন্য যুক্তকরে এগিযে যাচ্ছে অণিমা। মুখে তার কৌতুকের মৃদু মধুর হাসি।

উপন্যাসরূপ দিয়েছেন

মন্মথ

হানাবাড়ি

এক

নির্জন পরিত্যক্ত যশোর রোড কৃষ্ণপক্ষের মরা চাঁদের আলোয় যেন বিশাল সুষুপ্ত এক অজগরের মতো পড়ে আছে।

যখনকার কথা বলছি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আলোড়নে কলকাতায় তখন মানুষের মাথা গোঁজবার ঠাঁই দুষ্প্রাপ্য হয়েছে বটে, কিন্তু দেশ তখনও অবিভক্ত, এবং দ্বিখণ্ডিত দেশের যারা প্রধান বলি সেই হতভাগ্যের দলকে শহরের উপান্ত থেকে সারা দেশে সামান্য একটু আশ্রয়ের আশায় তখনও হন্যে হয়ে ফিরতে হয়নি।

দমদম বিমান ঘাঁটি ছাড়িয়ে যশোর রোডের এই দিকের নির্জনতা তাই তখনও অটুট।

এই নির্জন স্তব্ধতা কিন্তু দিনের বেলাতেই শুধু বুঝি উপভোগ্য—রাত্রে নয়।

সেই স্তব্ধতা যদি দ্রুত ধাবমান কারুর পায়ের শব্দে হঠাৎ ভেঙে যায় তাহলে বুঝি আরও অস্বস্তি বোধ করার কথা।

সে-রাত্রে ওই নির্জন রাস্তার বিনিদ্র প্রহরী কেউ থাকলে সহসা ওইরকম একটি পদশব্দই শুনতে পেত। কেউ যেন সভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে কোথায় ছুটে পালাচ্ছে।

সে পদশব্দ অনুসরণ করলে শোনা যেত শ'তিনেক গজ দূরে একটি বেশ পরিচ্ছন্ন বাংলো প্যাটার্নের বাড়ির কাছে এসে তা থেমে গেছে।

রাস্তার ধারের এ-বাড়িটি একরকম নিঃসঙ্গ বলা যায়। এখান থেকে আরও প্রায় মাইল খানেক দূরে এ-অঞ্চলের প্রথম বসতিগুলি ছাড়া-ছাড়া ভাবে শুরু হয়েছে।

মরা চাঁদের আলোয় বাড়িটি ভালো করে দেখতে না পাওয়ারই কথা। তবে এতে রাত্রেও বাড়িটির ভেতর আলো জ্বলতে দেখা যায় এবং সেইসঙ্গে শোনা যায় সুমিষ্ট বেহালার সুর তার ভেতর থেকে ভেসে আসছে।

ঊর্ধ্বশ্বাসে যে লোকটি দৌড়ে এসেছিল সে সজোরে এবার বাড়িটির বাইরের দরজায় ধাক্কা দিলে।

কয়েকবার ধাক্কা দেওয়ার পর ভেতরের বেহালার আওয়াজ থেমে গেল। তার খানিক বাদে সবিস্ময়ে বাইরের দরজা যে এসে খুললে সে কিছু বলবার আগেই, রাস্তা দিয়ে যে ছুটে এসেছিল সে উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'মাপ করবেন! ভয়ানক বিপদে পড়ে এত রাত্রে আপনাকে কষ্ট দিলাম। না দিয়ে আমার উপায় ছিল না।'

কোনওরকমে ঝড়ের মতো এ কথাগুলি বলে ফেলে লোকটি আবার হাঁফাতে-হাঁফাতে অনুনয় করলে, 'আমায় একটু জল দিতে পারেন?'

দরজা যে এসে খুলেছিল সে প্রথমটা একটু বুঝি বিমূঢ়ই হয়ে গেছল। তারপর ঈষৎ হেসে সে বিমূঢ়তা গোপন করে বললে, 'নিশ্চয় পারি। আসুন, ভেতরে আসুন।'

'ভেতরে যাব?' নবাগত বেশ একটু সঙ্কোচের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে আবার।

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, আসবেন বইকী!' বাইরের দরজা বন্ধ করে নবাগতকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে-যেতে বাড়ির মালিক আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'আপনার সঙ্কোচের কোনও কারণ নেই, এখানে আমি একলাই থাকি।' বারান্দা পার হয়ে বেশ প্রশস্ত একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে নবাগতকে সামনের একটি সোফা দেখিয়ে দিয়ে সে বললে, 'বসুন।'

নবাগত ও বাড়ির মালিক, দুজনকে ঘরের উজ্জ্বল আলোয় এবার ভালো করে দেখা গেল। দুজনকে বয়সে যুবক বলা যায় এবং দীর্ঘ সুগঠিত চেহারার দিক দিয়েও দুজনের মিল আছে। কিন্তু সাদৃশ্য আবার ওইখানেই শেষ। চুল ও দাড়ি-গোঁফ নিয়ে বাড়ির মালিককে

বেশ একটু সৌম্য সাধকের মতো দেখায়, নবাগতর চেহারা সে তুলনায় কঠিন ও রুক্ষ।

বসতে অনুরুদ্ধ হলেও ঘরের সাজসজ্জা-আসবাব-ঐশ্বর্য দেখে অবাক হয়েই নবাগত বোধহয় প্রথমটা বসতে পারেনি। ঘরটি সত্যিই দেখবার মতো এবং সে ঘরের চেহারা দেখলেই মালিকের পরিচয় সম্বন্ধে আর কিছু জিজ্ঞাসা করবার থাকে না। তিনি একজন শিল্পী, সব কিছুই তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। ঘরটি আকারে বেশ এবং তার সবকটি দেওয়াল অসংখ্য ছবিতে একরকম ঢাকা পড়েছে বলা যায়। ঘরের মাঝখানেই একটি বড় স্ট্যান্ডের ওপর অর্ধসমাপ্ত একটি ছবি বসানো। তারই পাশে একটি টেবিলের ওপর খোলা সুদৃশ্য একটি বাক্সের ধারে একটি বেহালা ও ছড়ি পড়ে আছে। বাইরে থেকে এই বেহালার মুমিষ্ট বাজনাই বোঝা গেল! তাড়াতাড়িতে সেটি তুলে রেখে যাওয়ার সময়ও পাওয়া যায়নি।

বাড়ির মালিক ঘরের এক কোণের একটি সুদৃশ্য কুঁজো থেকে এক গ্রাস জল এনে তার হাতে দিতে নবাগতের যেন চমক ভাঙল। এক নিশ্বাসে জলটুকু খেয়ে নিয়ে একটু অপ্রস্তুত ভাবেই সোফার একধারে বসে সে বললে, 'আমার ব্যবহারে আপনি বিরক্ত না হন, অবাক নিশ্চয় হয়েছেন। এতরাত্রে অচেনা একজনের বাড়িব দরজায় এসে ধাক্কা দেওয়া ঠিক স্বাভাবিক ব্যাপার তো নয়। বাইরে থেকে আপনার জানলার আলো না দেখলে আর বেহালাব শব্দ না শুনলে হয়তো আমি সাহসও কবতাম না।'

বাড়ির মালিক এবার একটু হাসল। তারপর সোফার অপর প্রান্তে বসে বললে, 'আপনি মিছিমিছি অত কুণ্ঠিত হবেন না। এভাবে পরের দবজায় ধাক্কা দেওয়ার পেছনে একটা কোনও কারণ যে আছে তা বুঝতে পারছি। এখন ব্যাপারটা কী খুলে বলুন তো, অবশ্য যদি সুস্থ হয়ে থাকেন।'

'হ্যাঁ, সুস্থ অনেক হয়েছি।' বলে একটু যেন ইতস্তত করে নবাগত বললেন, 'এখান থেকে মাইলখানেক দূরে একটা প্রকাণ্ড পোড়োবাড়ি আছে জানেন বোধহয়?'

'এ-অঞ্চলেই থাকি, আর ও-বাড়িব কথা জানি না!' বাড়ির মালিকের স্বরে একটু কৌতুকের-ই আভাস পাওয়া গেল' তাবপর সত্যিই কৌতূহলী হয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনি ওই বাড়িতেই ঢুকেছিলেন নাকি!'

'হ্যাঁ, জরুরি একটা কাজে এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ বাড়িটার সামনেই গাড়িটা গেল খারাপ হয়ে। কিছুতেই সেটা ঠিক করতে না পেরে ভাবলাম রাতটা ওই বাড়িতেই কোনওরকমে কাটিয়ে দেব। বাড়িটার চেহারা অবশ্য সুবিধের নয় আবছা চাঁদের আলোতেও মনে হল বহুকাল ও-বাড়িতে কেউ বাস করেনি। তবু রাতটুকু থাকবার মতো একটা ঘর ওখানে পেতে পারি এই আশায় বাড়িটার ভেতরে গিয়ে ঢুকলাম।'

এপর্যন্ত বলে নবাগত একটু যেন দ্বিধা ভরেই বাড়ির মালিকের দিকে তাকাল।

বাড়ির মালিক উৎসাহ দিয়ে বললে, বলুন, থামলেন কেন?'

'না, বলছি, তবে এখন যা বলতে যাচ্ছি তা কতদূর আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন জানি না।' বলে একটু চুপ করে থেকে নবাগত যে কাহিনি বললে তা সত্যই অদ্ভুত।

বাড়িটি যেমন বিশাল তেমনি পুরোনো। একদিকের অংশ একটু মজবুত আছে মনে হওয়ায় সে সেদিকের সিঁড়ি দিয়ে কোনওরকমে দেশলাই-এর কাঠি জ্বেলে পথ দেখে ওপরে গিয়ে ওঠে। বাড়িটিতে বহুকাল কোনও মানুষের পদার্পণ যে হয়নি, তার আসার সঙ্গে ইঁদুর ও অসংখ্য চামচিকের সশব্দ প্রতিবাদ ও চঞ্চলতাতেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এতকাল ধরে ও-বাড়িতে তারাই অবাধে রাজত্ব করে এসেছে। ওরই মধ্যে অপেক্ষাকৃত ব্যবহারযোগ্য

একটি ঘর খুঁজে নিয়ে সে সেখানে বিশ্রামের উদ্যোগ করছে এমন সময়ে পেছনের দিকের একটি বারান্দায় অস্বাভাবিক একটা শব্দ শুনে সে চমকে ওঠে। শব্দটা যেন হিংস্র কোনও প্রাণীর চাপা গর্জনের মতো। কিন্তু এ-বাড়ি যতই নির্জন হোক ওরকম কোনও প্রাণী এখানে কী করে থাকতে পারে! তা ছাড়া হিংস্র প্রাণী বলতে যা বোঝায়, বাঘ-ভালুকের মতো সেরকম কোনও জানোয়ারের গর্জনও সেটা নয়। তাহলে কি অশরীরী কোনও কিছু!

কিছুক্ষণ বাদে তার কৌতূহল চাপতে না পেরে সে সন্তর্পণে সেই বারান্দার দিকটা অনুসন্ধান করতে যায়। বাড়ির সেই দিকটা ভেঙে প্রায় ধ্বসে পড়েছে। চারিদিকে গাছপালা ও লতাপাতার জঙ্গল। তার ওপরে আবার একেবারে গাঢ় অন্ধকার। প্রথমটা তাই সে কিছুই দেখতে পায়নি। আশ্চর্যের বিষয় শব্দটাও তখন থেমে গেছে। সে দিকে ফিরছে এমন সময়ে আতঙ্কে চমকে উঠে তার সমস্ত শরীর যেন অবশ হয়ে যায়। ঠিক তার ঘাড়ের ওপর কার নিশ্বাস পড়ছে! তার শরীরের সমস্ত শিরা-উপশিরার ভেতর দিয়ে একটা বিদ্যুতের শিহরণ যেন খেলে যায়। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে সে প্রথমটা সাহস করে ফিরে দেখতেও পারে না।

হঠাৎ পেছনে কীসের একটা প্রচণ্ড শব্দ হতেই এক ঝটকায় ফিরে দাঁড়িয়ে মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে দেখেই সে ভয়ে প্রায় জ্ঞানশূন্য হয়ে ওপরের বারান্দা থেকে ভাঙা রেলিং টপকে নিচে লাফিয়ে পড়ে। সেই এক মুহূর্তে সে যা দেখেছে স্বাভাবিক অবস্থায় সেরকম ভয়াবহ মূর্তি কল্পনা করাও বুঝি কঠিন। দৈত্যের মতো বিশাল লোমশ একটা দেহ তার ওপরে হিংস্র দংস্ট্রা-বিকশিত ভয়ঙ্কর মুখে জ্বলন্ত অঙ্গারেব মতো দুটি পৈশাচিক চোখ। শিকার ধরার উল্লাসে সেই বিকট প্রাণীটা সশব্দে দুই লোমশ হাতে বুক বাজিয়ে আস্ফালন করছে। দেখেই সে নিচে লাফ দিয়ে পড়ে।

নিচে পোড়ো বাড়ির ভাঙা ইটকাঠের স্তূপে পড়ে গিয়ে প্রথমটা তার উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতাই থাকে না। সেই বিকট বিভীষিকা সিঁড়ি দিয়ে হিংস্র লোলুপ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে ক্রমশই ধীরে-ধীরে অগ্রসর হচ্ছে দেখেও আচ্ছন্নের মতো আত্মরক্ষার চেষ্টা করবার কথাও সে যেন ভুলে যায়। শেষ মুহূর্তে প্রচণ্ড শক্তিতে নিজের চেতনা ফিরিয়ে এনে সে কোনওরকমে বিভীষিকার কবল থেকে বাইরে ছুটে পালিয়ে আসে।

এক নিশ্বাসে এ-কাহিনি বলে যাওয়ার পর একটু থেমে নবাগত আবার বলে, 'সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেও কোথায় যাব কিছুই ভেবে পাইনি। ও-বাড়ির ধারে কাছে আশ্রয় নেওয়ার মতো একটা জায়গা তারপর বহুদূরে আপনার বাড়ির এই আলো দেখতে পেলাম। ছুটতে-ছুটতে এসে আপনার বেহালার শব্দ শুনে ভরসা পেয়ে তখন দরজায় ধাক্কা দিলাম। আপনার এখানে আশ্রয় না পেলে আজ রাত্রে এই অচেনা জায়গায় কী যে করতাম জানি না। আপনার অবশ্য খুবই অসুবিধা করলাম।'

'না, অসুবিধা কীসের!' প্রসন্ন হাসিতে আশ্বাস দিয়ে বাড়ির মালিক বলে, 'কী বলে, আপনার নামটা কিন্তু এখনও জানি না!'

হঠাৎ এ-প্রশ্নের জন্যে নবাগত যেন প্রস্তুত ছিল না। একটু বুঝি চমকে উঠেই বলে, 'আমার নাম জয়ন্ত চৌধুরি।'

'আমার নাম শ্রীমন্ত সরকার। পেশা বা খেয়াল যাই বলুন এই!'—ঘরের ছবি ও মূর্তিগুলিব দিকে হাত নেড়ে দেখিয়ে শ্রীমন্ত বলে, 'আপনার কাছে যা শুনলাম তাতে কিন্তু খুব অবাক হচ্ছি। এ-অঞ্চলের অশিক্ষিত সাধারণ লোক ওটাকে ভুতুড়ে বাড়ি বলে; জানি,

কিন্তু সত্যিই ওখানে ভয় পাওয়ার মতো কিছু থাকতে পারে কখনও বিশ্বাস করিনি।'

একটু থেমে শ্রীমন্ত আবার জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা ব্যাপারটা আপনার চোখের ভুল নয় তো!

'না মশাই, চোখের ভুল নয়!' জয়ন্তর গলার স্বরে একটু অধৈর্য-ই প্রকাশ পায়। 'গায়ের ওপর তার নিশ্বাস টের পাওয়া যায় এত কাছে থেকে আমি তাকে দেখেছি। নইলে কি মনে করেন, আপনার এখানে ঢোকবার জন্যে মিথ্যে গল্প বানিয়ে বলছি!'

কথা বলবার ধরনে হেসে ফেলে শ্রীমন্ত সরকার বলে, 'আপনি এখনও উত্তেজিত হয়ে আছেন দেখছি। আমার কথাটা ভুল বুঝবেন না। আমি বলছি কী, যে ওরকম নির্জন পোড়ো বাড়িতে অন্ধকারে অনেক সময় মানুষের দৃষ্টি-বিভ্রম তো হয়।'

'হয়তো হয়, আমার তা হয়নি।' বোঝা গেল জয়ন্ত এখনও বেশ ক্ষুণ্ণ।

শ্রীমন্ত এবার গম্ভীর হয়ে বলে, 'তাহলে তো বেশ গুরুতর ব্যাপারই বলতে হবে। এখানকার পুলিশকে একবার তাহলে জানাতে হয়।'

পুলিশের কথায় জয়ন্ত তীব্র প্রতিবাদ করে ওঠে, 'না, না, পুলিশকে জানিয়ে কোনও লাভ নেই।'

শ্রীমন্ত একটু অবাক হয়েই জয়ন্তর মুখের দিকে তাকায়। তারপর হেসে বলে, 'লাভ না থাক, লোকসান তো কিছু নেই! এখানকার থানার অফিসার মিঃ সোম আমার চেনা। আজ রাতটা আপনি এখানেই বিশ্রাম করুন কাল সকালেই আপনাকে আমি তাঁর কাছে নিয়ে যাব।'

কথাটা জয়ন্তর খুব মনঃপূত হয় না। মৃদু আপত্তি জানিয়ে বলে, 'পুলিশকে জানাবার কিন্তু কোনও প্রয়োজন ছিল না।'

'বিনা প্রয়োজনেই না হয় গেলেন।' জয়ন্তর আপত্তিটা হেসে খণ্ডন করে শ্রীমন্ত উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'আসুন, আপনার বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিই গে!'

'না, না, আমার জন্যে ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই।' জয়ন্তর সঙ্কোচটা আন্তরিক। পাশের লম্বা সোফাটা দেখিয়ে সে বলে, 'আমি রাতটা এখানেই কাটিয়ে দেব।'

'অত কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন? আমি তো আগেই বলেছি এখানে আমি একলা থাকি!' বলে শ্রীমন্ত তার চাকরের নাম ধরে দুবার ডাক দেয়।

কোনও সাড়া না পেয়ে তারপর হেসে বলে, 'দুলাল বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। আর তার অপরাধই বা কী! রাত তো কম হয়নি। আসুন আপনি!'

জয়ন্তকে অগত্যা শ্রীমন্ত সরকারের সঙ্গে যেতেই হয়। ইচ্ছে করেই একটু পিছিয়ে থাকে কী না কে জানে। ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার মুখে ফিরে দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্যে সব কিছুর ওপর তার চোখ বুলিয়ে নেওয়ার ধরনটা দেখলে শ্রীমন্ত কিন্তু একটু অবাকই বোধহয় হতো।

বয়সে যুবক হলেও থানার অফিসার মিঃ সোম এ-অঞ্চলে অল্পদিনের মধ্যেই সৎ সুযোগ্য দারোগা হিসাবে যতখানি সম্ভব সুনাম অর্জন করেছেন।

শ্রীমন্ত সরকার সকাল বেলাতেই জয়ন্তকে নিয়ে থানায় এসে হাজির হয়েছিল। জয়ন্ত-র কাছে সমস্ত ব্যাপারটা শুনে মিঃ সোম একটু হাসলেন।

সে হাসিতে একটু বিরক্ত হয়েই জয়ন্ত তাঁর দিকে ভ্রূকুটি করে তাকাতে তিনি বললেন, 'আপনিও তাহলে ও-বাড়িতে ওইরকম ভয় পেয়েছেন? আশ্চর্য!'

'আশ্চর্যটা কী? আমার ভয় পাওয়া?' জয়ন্তর স্বর বেশ রুক্ষ।

সকৌতুক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে মিঃ সোম বললেন,—'না ভয় পাওয়া নয়। ভয় ও-বাড়িতে অনেকেই পেয়েছে। এ-অঞ্চলে হানাবাড়ি বলে, ওর ধারে কাছে কেউ ঘেঁসে না, অন্তত রাত্রে তো নয়ই। আশ্চর্য আজই আপনার থানায় একথা জানাতে আসা!'

'কেন বলুন তো?' জয়ন্ত সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে। মিঃ সোম কিছু বলবার আগেই শ্রীমন্ত হেসে বললে, 'উনি তো আসতেই চাইছিলেন না আমিই জোর করে ওঁকে ধরে নিয়ে এলাম!'

'তাই নাকি!'—মিঃ সোমের কণ্ঠস্বরে একটু বিস্ময় যেন প্রকাশ পেল।

শ্রীমন্ত হেসে বললে, 'হ্যাঁ থানায় আসতে ওঁর বেশ আপত্তি ছিল। তবে আমার নিজের এখনও কী ধারণা জানেন, ব্যাপারটা ওঁর চোখের ভুল ছাড়া আর কিছু নয়!'

'চোখের ভুল!' জয়ন্ত বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠল। 'যে বিকট প্রাণীকে আমি সুস্পষ্ট দেখলাম, তা আমার চোখের ভুল বলতে চান! তার চেয়ে বলুন না, আমি মিথ্যে গল্প বানিয়ে বলছি।'

জয়ন্ত হঠাৎ এতখানি ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হয়ে উঠবে শ্রীমন্ত ভাবতে পারেনি বোধ হয়। সে অপ্রস্তুত হয়ে কী বলতে যাচ্ছিল। মিঃ সোম গম্ভীর ভাবে তাকে বাধা দিয়ে বললেন, 'মিথ্যে কি সত্যি জানি না জয়ন্তবাবু, তবে এ-বাড়ির পুরোনো ইতিহাসের সঙ্গে আপনার গল্প আশ্চর্য রকম মিলে যাচ্ছে এইটুকু বলতে পারি।'

এবার শ্রীমন্ত অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে,—'পুরোনো ইতিহাস! এ-বাড়ির একটা ইতিহাস আছে নাকি?

জয়ন্তও সঙ্গে-সঙ্গে যোগ দিল, 'ইতিহাসটা কী জানতে পারি?' তার কণ্ঠস্বর এখনও রুক্ষ।

মিঃ সোম দুজনের দিকেই চেয়ে হেসে বললেন, 'তা পারেন। একটু বসুন আমি ফাইলটাই নিয়ে আসছি।'

মিঃ সোম আলমারি খুঁজে ফাইলটা নিয়ে এসে চেয়ার টেনে বসতে যাচ্ছেন, এমনসময় বাইরের দরজার কাছে কার সম্ভাষণ শোনা গেল, 'Good Morning ইন্সপেক্টার সাব।'

মিঃ সোম বিরক্তভাবে সেদিকে তাকালেন। দেখা গেল, ছেঁড়া ঝুলি কাঁধে অজস্র তালি দেওয়া বেঢপ কোট-প্যান্ট পরা, একমুখ দাড়ি-গোঁফ সমেত এক বাউণ্ডুলে ভিখিরি গোছের অদ্ভুত চেহারার লোক এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গে তার একজন কনস্টেবল।

মিঃ সোম তার দিকে তাকাতে সে আর দু-পা এগিয়ে এসে বেশ একটু গম্ভীর চালে বললে, 'May I have a word with you?'

যেমন তার চেহারা পোশাকের ছিরি তেমনি, বেয়াড়া তার কণ্ঠস্বর। শুনলেই মেজাজ বিগড়ে যায়।

মিঃ সোম যেন তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে সঙ্গের কনস্টেবলকে ধমক দিয়ে উঠলেন, 'একে আবার আসতে দিলে কেন?'

কনস্টেবল সে ধমকে কেঁপে ওঠে কাতর ভাবে কৈফিয়ত দেওয়ার চেষ্টা করলে, 'আজ্ঞে একেবারে নাছোড়বান্দা স্যার, কিছুতেই মানা শুনলে না। বলে, নালিশ আছে।'

'Yes, yes, I have a Complaint to make' ফিরিঙ্গি ভিখিরি সঙ্গে-সঙ্গে ভারিক্কি চালে সায় দিলে। ভাবটা যেন কনস্টেবলকে সে-ই অভয় দিচ্ছে।

ভ্রূকুটিভরে তার দিকে একবার তাকিয়ে মিঃ সোম বললেন, 'আচ্ছা-আচ্ছা! I am busy now, you will have to wait!'

'All right All right!' পরম সহিষ্ণুতার সঙ্গে মিঃ সোমকেই যেন ক্ষমা করে ভিখিরিসাহেব ঘরের আর এক কোণে ছোট দারোগা যে টেবিলে কাজ করছিলেন তার পেছনে একটি টুলে গিয়ে বসল।

মিঃ সোমও সাময়িক বিরক্তিটা দমন করে ফাইল খুলে বসে হানাবাড়ির ইতিহাস যা জানালেন তা সংক্ষেপে এই ঃ বহুদিন আগে শশীশেখরবাবু বলে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক ওই বাড়িটি কেনেন। অতবড় বাড়িতে তিনি একরকম একলাই থাকতেন। এ-অঞ্চলের লোকের সঙ্গে মেলামেশা দূরে থাক কারুর সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করতে চাইতেন না বলে তাঁর সম্বন্ধে অনেক রকম দুর্নাম ছিল বটে কিন্তু তাঁর সত্যিকার পরিচয় কেউই কিছু জানতো না। হঠাৎ একদিন ওই নির্জন বাড়িতে তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায়। তাঁকে যে কেউ খুন করেছে এটা বুঝলেও পুলিশ সে খুনের কোনও কিনারা করতে পারে না। শশীশেখরের কোনও আত্মীয়-স্বজন বা ওয়ারিসানের খোঁজ পাওয়া যায়নি। শেষ পর্যন্ত খাজনা ও দেনার দায়ে ও-বাড়ি তাই নিলামে ওঠে। নিলামে ও-বাড়ি যিনি কেনেন তিনিও বেশিদিন ও-বাড়ি ভোগ করতে পারেনি। পরপর কয়েকটা পারিবারিক দুর্ঘটনা ও অন্যান্য কারণে ভয় পেয়ে বাড়িটা অভিশপ্ত বলেই তাঁর ধারণা হয়। তিনি ছেড়ে চলে যাওয়ার পর থেকে ওখানে আর কেউ ঢোকেনি। বহুকাল পরিত্যক্ত হয়ে থেকে এখন ওটা সাধারণের কাছে হানাবাড়ি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মিঃ সোমের বিবরণ শেষ হওয়ার পর জয়ন্ত একটু বিদ্রূপের স্বরেই জিজ্ঞাসা করলে, 'খুনের কিনারা তো পুলিশ করতে পারেনি বুঝলাম, শশীশেখর সামন্ত কে ছিলেন সেটুকু কি তারা জানতে পেরেছে?'

'শশীশেখর সামন্ত কে ছিলেন?' স্থির দৃষ্টিতে জয়ন্তর দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে মিঃ সোম ধীরে-ধীরে কথাটা পুনরাবৃত্তি করে বললেন, 'শশীশেখর সামন্ত কে ছিলেন আমরা এখন জানি কিনা জিজ্ঞাসা করছেন?'

জয়ন্ত এ-কথায় কেমন যেন একটু বিচলিত হয়ে উঠল।

'হ্যাঁ—মানে শশীশেখরবাবুর কোনও পরিচয় তারপর পাওয়া গেছে কিনা তাই জিজ্ঞাসা করেছিলাম।'

'হ্যাঁ, পরিচয় পাওয়া গেছে!' মিঃ সোম গম্ভীর স্বরে বললেন, 'সেই জন্যেই তখন বলেছিলাম, আশ্চর্য। আজই আপনার থানায় এসব কথা জানাতে আসা! শশীশেখরবাবুর পরিচয় ও তাঁর মৃত্যুর রহস্যের সূত্র যার কাছে পাওয়া গেছে, ঘটনাচক্রে সেই লোকই আজ এখানে উপস্থিত।'

'কিন্তু এতক্ষণ আপনি যে ইতিহাস বললেন,' শ্রীমন্ত এবার একটু বিমূঢ়ভাবে জিজ্ঞাসা করলে, 'তার সঙ্গে জয়ন্তবাবুর ভয় পাওয়ার ব্যাপারের কোথায় কী মিল তা তো বুঝতে পারলাম না!'

'পারবেন, এখুনি পারবেন!' বলে মিঃ সোম তাঁর সহকারীকে বললেন, 'সুনীলবাবু, আমাদের নতুন মক্কেলটিকে একবার এখানে নিয়ে আসুন তো!'

'যে আজ্ঞে,' বলে সুনীলবাবু চলে যাওয়ার পর দেখা গেল তাঁর টেবিলের পেছনে ভিখিরিসাহেব এখনও তেমনি পরম ধৈর্যের প্রতিমূর্তির মতো নিভানো আধপোড়া একটি সিগারেট হাতে চোখ দুটি অর্ধনিমীলিত করে বসে আছে। এতক্ষণের এসব কোনও কথা

তার কানে গেছে বলে মনে হয় না।

মিঃ সোম সেদিকে একবার ভ্রূকুটিভরে চেয়ে আবার জয়ন্ত ও শ্রীমন্ত-র দিকে ফিরে বললেন, 'শশীশেখরের কী পরিচয় পেয়েছি আগে বলে নিই শুনুন। শশীশেখর ছিলেন একেবারে সেরা চোরাইমালের কারবারি। হীরে-জহরত-মণিমুক্তোর নিচে তিনি নামতেন না। তাঁর দলের লোকেরা যেখান থেকে যা কিছু লুট করে আনত, সব তাঁর কাছে এই নির্জন বাড়িতে গচ্ছিত থাকত। পরে গোপনে সেসব বিক্রির ব্যবস্থা করে তিনি যার যা প্রাপ্য ভাগ বাঁটোয়ারা করে দিতেন।'

ইতিমধ্যে ছোট দারোগা শুকনো রোগা চেহারার এক প্রৌঢ়কে সেখানে এনে হাজির করে। মিঃ সোম তাকে দেখিয়ে বললেন, 'এই ইনিই হলেন শশীশেখর বাবুর মৃত্যুর একমাত্র সাক্ষি। বাজার সরকার বলুন, মুহুরি বলুন, ইনি ছিলেন শশীশেখরের একমাত্র কর্মচারী ও সঙ্গী।' লোকটিকে উদ্দেশ্য করে মিঃ সোম এবার বললেন, 'বলুন বেহারীবাবু, মৃত্যু সম্বন্ধে যা আপনি জানেন বলুন।'

বেহারীবাবু এতক্ষণ নির্জীবভাবে যেন আচ্ছন্নের মতো দাঁড়িয়েছিলেন। মিঃ সোমের কথায় নির্বোধের মতো দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আজ্ঞে আমার যা বলবার তা তো আগেই বলেছি।'

'আগে যা বলেছেন, তাই আবার বলুন।'

মিঃ সোমের ধমক খেয়ে বেহারীবাবুর যেন একটু সাড়া ফিরে এল। তাড়াতাড়ি বললেন, 'আজ্ঞে বলছি।' তারপর দুবার ঢোক গিলে শুরু করলেন, 'বড় অদ্ভুত লোক ছিলেন আমার এই মনিব। দিনের বেলা ওর কাজকর্ম করতাম, কিন্তু রাত হলে আর ওখানে থাকতে দিতেন না।'

বেহারীবাবু এইটুকু বলেই থামাতে, মিঃ সোম যেন তাঁকে সাহায্য করবার জন্যেই বললেন, 'তাইতে আপনার মনে খুব কৌতূহল হয়। কেমন? একদিন তাই রাত্রে ও-বাড়িতে ফিরে আসেন। ফিরে এসে কী দেখেন বলুন।'

বেহারীবাবু ধীরে-ধীরে এবার বলতে থাকেন, 'আজ্ঞে ফিরে এসে প্রথমে কোথাও কাউকে দেখতে পাই না। তারপর মনে হয় একটা ঘরের ভেতর থেকে যেন কাদের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। দরজায় চাবি লাগাবার ফুটোয় তারপর চোখ লাগিয়ে দেখি আমার মনিবের আর দুজন অচেনা লোক ঘরের ভেতর বসে আছে। ঘরের ভেতরটায় তেমন আলো ছিল না। তার ওপর দরজার দিকে পেছন ফিরে বসার দরুন অচেনা দুজনের মুখ অবশ্য দেখতে পাইনি, কিন্তু আমার মনিবের সঙ্গে তাঁদের যে ঝগড়া হচ্ছিল তা সবই শুনতে পাচ্ছিলাম। ঝগড়া হচ্ছিল ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে। আমার মনিব রেগে বলছিলেন, "আর এক কানাকড়িও তোমরা কেউ পাবে না জেনে রেখো। তোমাদের যা ন্যায্য দেওয়ার আমি দিয়েছি।" তাঁর কথায় একজন বলে উঠল "ন্যায্য বখরা দিয়েছেন! দশ বছর ধরে আমরা যা জোগাড় করে এনেছি, কোথায় তার হিসেব? রতনচাঁদের দোকানের সমস্ত হীরে-জহরত, শুশুনিয়া রাজবাড়ির সমস্ত মণিমুক্তো জড়োয়া, এরকম কত নাম করব, সেসব কিছুর ন্যায্য ভাগ আমাদের চাই।" অন্য অচেনা লোকটিও একথায় যোগ দিয়ে বললেন, "ন্যায্য নয় বল সমান ভাগ। এখানে বসে আপনি তো শুধু ফন্দিই এঁটেছেন, আর ফাঁসির দড়ি মাথার ওপর ঝুলিয়ে আসল কাজ করেছি আমরা।" একথায় শশীবাবু চটে উঠে বললেন, "হাত চিরকালই কাজ করে কিন্তু তাকে চালায় মাথা। হাতের জায়গা তাই মাথার নিচে।" ঝগড়াটা এর পর আরও তুমুল

হয়ে উঠল। অচেনাদের একজন শশীবাবুর কাছে কোথায় সব জিনিস লুকোনো আছে জানতে চেয়ে বললেন, "আপনি হঠাৎ মারা যেতে পারেন। তখন কী হবে? এসব জিনিস কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন তা অন্তত আমাদের জানিয়ে দিতে হবে।" শশীবাবু তাতে মুখ বেঁকিয়ে বললেন, "জানিয়ে দিলে আমার মারা যাওয়াটা সত্যি হঠাৎ হয়ে যেতে পারে—না? অত আহাম্মক আমায় ভেবো না। কিছুই আমি জানাব না আর যেখানে আমি এসব লুকিয়ে রেখেছি আমি না বলে গেলে সারাজীবন খুঁজেও তা তোমরা পাবে না। দবকার বুঝলে বারুদে উড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করবার ব্যবস্থাও আমি করে রেখেছি জেনো।" আমার মনিবের এই কথার পর আর বেশিক্ষণ সেখানে থাকতে আমার সাহস হয় না। আমি ভয়ে-ভয়ে সেখান থেকে তারপর চলে যাই।'

বেহারীবাবু এতগুলো কথা একসঙ্গে বলে ক্লান্ত ভাবে চুপ করলেন। কিন্তু তখনও তাঁর নিষ্কৃতি নেই। মিঃ সোম তাঁকে যেন খেই ধরিয়ে দেওয়ার জন্যে বললেন, 'তারপর শশীশেখর বাবুর গোপন সম্পত্তি সম্বন্ধে আপনারও মনে লোভ জাগে, না বেহারীবাবু! কোথায় সেগুলো লুকোনো থাকে জানবার জন্যে আপনি একদিন ওত পেতে থাকেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' বেহারীবাবুকে আবার বলে যেতে হল, 'বাড়ির পেছনের মহলের একটা জায়গায় আমি লুকিয়েছিলাম, এমনসময় সিঁড়িতে শশীবাবুর পায়ের শব্দ শুনলাম। যেখানে লুকিয়েছিলাম সেই ভাঙা দেয়ালের আড়াল থেকে দেখি শশীবাবু একটা নক্সা কাটা মাঝারি গোছের কাঠের বাক্স হাতে নিয়ে নেমে আসছেন। সে বাক্সে সাধারণ সোনাদানার চেয়ে দামি হিরে মুক্তো গোছের যে কিছু ছিল তা আমি বুঝেছিলাম। আমার মতলব ছিল ও বাক্সের জিনিস কোথায় তিনি লুকিয়ে রাখতে যান, আড়াল থেকে তাই দেখা। কিন্তু সিঁড়ির নিচে তিনি নেমে আসা মাত্র একটা কাণ্ড ঘটে গেল যা ভাবলে এখনও আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। সিঁড়ির একধারে বড়-বড় খিলেন দেওয়া একটা ঘুলঘুলি বাড়ির ভাঙা মহলের দিকে চলে গেছে। হঠাৎ সেই ঘুলঘুলির অন্ধকার থেকে একটা বিকট দানবের মতো মূর্তি যেন ভোজবাজির মতো বেরিয়ে এল। সে ভূত না প্রেত, দৈত্যি না দানো আমি জানি না, কিন্তু অমন একটা ভয়ঙ্কর চেহারা অতি বড় দুঃস্বপ্নেও কখনও দেখিনি। ভালুকের মতো লোমে ঢাকা যেমন পাহাড়ের মতো বিশাল তার দেহ, তেমনি মুলোর মতো দাঁত-বার-কবা প্রকাণ্ড বিশ্রী মুখে সাক্ষাৎ শয়তানের মতো তার দুই জ্বলন্ত চোখের দৃষ্টি। তাকে দেখতে পেয়ে ভয়ে তো তখন শশীবাবুর গলা দিয়ে আওয়াজই বেরুচ্ছে না। পেছু হেঁটে পালাতে গিয়ে তিনি সেখানেই পড়ে গেলেন। দানোটাকে সেইদিকে এগিয়ে আসতে দেখে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে প্রায় বেহুঁশ অবস্থায় আমি সেখান থেকে ছুটে পালালাম। পরের দিনই পুলিশ ও-বাড়িতে শশীবাবুর লাশ পায়। সেকথা জানবার পর আমি এ-মুলুক ছেড়েই চলে গেছলাম।'

'তবু শেষ পর্যন্ত পুলিশ ওকে সন্ধান করে বার করেছে।' বলে, মিঃ সোম শ্রীমন্ত-র দিকে ফিরলেন। 'জয়ন্তবাবুর গল্পের সঙ্গে এ-বাড়ির পুরোনো ইতিহাসের কোথায় মিল এখন আশা করি বুঝতে পারছেন!'

শ্রীমন্ত হেসে বললে, 'তা পারছি। কিন্তু এতে জয়ন্তবাবুর গল্পই তো সত্য বলে প্রমাণ হচ্ছে।'

'হয়তো হচ্ছে।' মিঃ সোম হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠলেন—'কিন্তু এই ভয় পাওয়ার ব্যাপারে আমরা কী করতে পারি বলুন; বড়জোর বলতে পারি ওরকম হানাবাড়ির ত্রিসীমানায় আর যাবেন না...'

'Excuse me sir!' মিঃ সোমের কথার ওপরেই ভিখিরিসাহেবের গলা হঠাৎ শোনা গেল। টুল থেকে উঠে এসে মিঃ সোমের টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে বেশ একটু ক্ষুব্ধ স্বরেই সে জিজ্ঞাসা করলে, 'আভি মেরা নালিশ শুনেঙ্গে!'

'হ্যাঁ, কী তোমার নালিশ?' মিঃ সোম স্পষ্টই বিরক্ত।

ভিখিরিসাহেব গলাটাকে যতদূর সম্ভব করুণ করে এবার তার অভিযোগ জানালে, 'আপকা সিপাহি লোগ হামকো বড়া দিক করতা। I am a poor beggar, ভিখ মাঙকে খাতা। Why they always push me about? যাঁহা ঠারতা সব জাগাসে ভাগা দেতা!'

'ভাগা দেতা?' মিঃ সোম আপাদমস্তক তাকে ভালো করে লক্ষ করে জিজ্ঞাসা করলেন। ভিখিরিসাহেব সোৎসাহে ঘাড় নাড়লে।

প্রতিকারের আশায় ভিখিবিসাহেবের মুখ বুঝি একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এক দাবড়ানিতে তাকে একেবারে বসিয়ে দিয়ে মিঃ সোম আবার বললেন, 'They will put you in a lock up now!—এখন থেকে কোনও বেচাল দেখলে, হাজতে পুরে রাখবে, বুঝেছ?'

ভিখিরিসাহেবের চোখ দুটো মনে হল যেন জ্বলছে। একটুখানি চুপ করে থেকে ঝোলাটা কাঁধে তুলে বেরিয়ে যেতে-যেতে সে খেঁকিয়ে বলে গেল, 'Yes, Yes I understand. There is no Justice for a poor man in this work' গরিবকো বিচার কঁহি নেহি মিলতা।'

এরকম ঔদ্ধত্যে মিঃ সোম অভ্যস্ত নন। অত্যন্ত বিরক্ত হয়েই খানিকটা বোধহয় তিনি চুপ করে রইলেন। তারপব মেজাজটা যেন অতিকষ্টে সামলে শ্রীমন্ত ও জয়ন্তব দিকে ফিরে আগের কথার জের টেনে বললেন 'হ্যাঁ, যা বলছিলাম। দেখুন, চোর-ডাকাত ধরাই আমাদের কাজ। এসব আজগুবি ভুতুড়ে জানোয়ার ঠিক আমাদের এলাকার মধ্যে পড়ে না।'

'আপনারা যে কিছু করতে পারবেন না তা জানতাম।' জয়ন্ত অবজ্ঞার দৃষ্টিতে মিঃ সোমের দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর তাচ্ছিল্যভরে হাত দুটো একটু নমস্কারের ভঙ্গিতে তুলে বললে, 'আচ্ছা চলি। আসবেন শ্রীমন্তবাবু?'

'হ্যাঁ, যাব বইকী!' শ্রীমন্ত একটু হেসে উঠে দাঁড়াল। তারপর মিঃ সোমকে নমস্কার জানিয়ে সেও জয়ন্তর সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

বেহারীবাবু তখনও একভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর দিকে ফিরে মিঃ সোম অত্যন্ত গম্ভীরভাবে হঠাৎ যে প্রশ্ন করলেন তাতে একটু অবাক হওয়ারই কথা। 'এখানে যাঁরা বসেছিলেন তাঁদের দুজনকেই তো দেখলেন বেহারীবাবু,' মিঃ সোম জিজ্ঞাসা করলেন, 'এদের কাউকে আগে ওবাড়িতে দেখেছেন বলে মনে হয়?'

বেহারীবাবু খানিক চুপ করে থেকে বোধহয় ভাববার চেষ্টা করলেন, তারপর ক্লান্ত ভাবে বললেন, 'আজ্ঞে, ঠিক মনে করতে পারছি না।'

'পারছেন না? তবু ভালো করে চেষ্টা করে দেখুন গিয়ে, যান।' বলে মিঃ সোম বেহারীবাবুকে বিদায় করে দিলেন।

ছোট দারোগা সুনীল মিঃ সোমকে একলা পাওয়ার জন্যে বোধহয় অপেক্ষা করছিল। বেহারীবাবু চলে যেতেই মিঃ সোমের কাছে এসে তাঁর কানের কাছে মুখ নামিয়ে সে চাপা গলায় বললে, 'একটা মজার ব্যাপার লক্ষ করেছেন স্যার?'

মিঃ সোম মুখ না ফিরিয়েই গম্ভীর ভাবে বললেন, 'হ্যাঁ, লক্ষ করেছি বলেই তো ভাবছি!'

কে জানে লক্ষ করবার মতো কী মজার ব্যাপার এরমধ্যে ঘটেছে!

জয়ন্ত ওদিকে শ্রীমন্তর সঙ্গে যেতে-যেতে পথের মাঝে হঠাৎ দেখা গেল থেমে পড়েছে। একটু অবাক হলেও শ্রীমন্তকেও অগত্যা থামতে হল।

'আপনি বাড়ি যান শ্রীমন্তবাবু। একটা কথা আমি জেনে আসি।' বলে, শ্রীমন্তকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করবার অবসর না দিয়েই জয়ন্ত হন-হন করে থানার দিকেই আবার ফিরে গেল।

'কী আবার ফিরে এলেন যে!' মিঃ সোমও জয়ন্তকে ফিরে আসতে দেখে বেশ অবাক।

'হ্যাঁ, একটা কথা আপনাদের জিজ্ঞাসা করতে এলাম।' এক মুহূর্তের জন্যে একটু বুঝি দ্বিধা করে জয়ন্ত প্রশ্নটা করেই ফেলল, 'শ্রীমন্ত সরকার সম্বন্ধে আপনারা কতদূর কী জানেন?'

প্রশ্নটা সত্যই অপ্রত্যাশিত। মিঃ সোম প্রথম বিস্ময়টা সামলে একটু বিদ্রূপের সঙ্গেই হেসে বললেন, 'যা জানি তা আপনাকে বলব ভাবলেন কী করে!'

পরমুহূর্তেই তাঁর গলার স্বর বেশ কঠিন হয়ে উঠল। জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি ভয় পেয়ে কাল ওঁর আশ্রয়েই গিয়ে উঠেছিলেন, না?'

'হ্যাঁ, উঠেছিলাম।' জয়ন্ত বিশেষ লজ্জিত বলে মনে হল না। 'তবু ওঁর সম্বন্ধে ভালো করে খোঁজ নেওয়া দরকার বলে মনে করি।'

'আমাদের কর্তব্য আমাদের শিখিয়ে দিতে এসেছেন বলে ধন্যবাদ!' মিঃ সোমের কণ্ঠস্বব বেশ রূঢ়ই বলা যায়, 'এখন আপনার খোঁজ একটু নিতে পারি কি? আপনি কে এবং কাল হঠাৎ ওই পোড়ো বাড়িতে গিয়ে উঠেছিলেন কেন?'

শেষ কথাগুলো মিঃ সোম যেরকম ধীরে-ধীরে বিঁধিয়ে-বিঁধিয়ে বললেন, তাতে মুহূর্তের জন্যে জয়ন্তকে একটু বিচলিত মনে হল কি!

কিন্তু উত্তর সে তারপর বেশ সহজ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতেই দিলে, 'আমি একজন সাধারণ লোক, আর এমনি রাত্রে ওই বাস্তায় যেতে-যেতে হঠাৎ গাড়ি খারাপ হয়ে যাওয়ায় ওখানে আশ্রয় নিতে গিয়েছিলাম!'

'কিন্তু প্রথমে থানায় এ-ব্যাপাবটা জানাতে আসতে চাননি কেন?' মিঃ সোম তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জয়ন্তর দিকে তাকালেন।

জয়ন্ত তাতে অস্বস্তি বোধ করল কি না বলা যায় না কিন্তু উত্তবটা যেন তার তৈরিই ছিল মনে হল। 'এ-ব্যাপারে আপনাদেব কোনও সাহায্য পাওয়ার আশা যে নেই তা জানতাম বলে।'

'ওঃ!' মিঃ সোমকেই এবার যেন হার স্বীকার করতে হল।

জয়ন্ত আবার বললে, 'একটা সাহায্য অবশ্য এখনও করতে পারেন।'

'বলুন।'

'এ-বাড়ির শেষ মালিক তো ছেড়ে চলে গেছেন। বাড়িটা এখন কার জিম্মায় আছে বলতে পারেন?'

খানিক নীরবে কী যেন ভেবে নিয়ে মিঃ সোম বললেন, 'একটু অপেক্ষা করুন, আমাদের ফাইল দেখে বলছি।'

তিন

বৃটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রিটে প্রকাণ্ড এক অফিস বাড়ি। পাঁচতলা বাড়িটার নিচের প্রধান দরজার পাশে দেওয়ালের গায়ে বিভিন্ন কোম্পানির নামের ফলকগুলো পড়ে শেষ করতেই বোধহয় এক বেলা কেটে যায়। একটা নয় অসংখ্য কোম্পানি মৌচাকের মতো এই বিরাট বাড়িটার অসংখ্য খোপ জুড়ে বসে আছে।

'বাগ অ্যান্ড নাগ কোম্পানি, হাউস এজেন্টস,' তারই মধ্যে একটি। তেতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠে বাঁ-ধারে তাদের অফিস ঘর। বাড়ি-ঘর-জমি-জায়গা, কেনা-বেচা ও ভাড়া-ইজারা দেওয়ার বন্দোবস্ত করাই তাদের ব্যবসা। কোম্পানির কাজ কারবার ভালোই কিন্তু বাগ ও নাগ দুই অংশীদার দুটির অদ্ভুত চরিত্র। শ্যামলাল বাগ যেমন মোটাসোটা গোলগাল পিপে গোছের, নবদ্বীপচন্দ্র নাগ তেমন রোগা শুকনো ঢেঙা তালগাছ। এক ব্যবসার ব্যাপারে ছাড়া দুজনের মধ্যে কোনও বিষয়ে বনিবনাও নেই। খিটিমিটি লেগেই আছে।

সকাল সাড়ে দশটায় সেদিন বাগ-নাগের অফিসে লেডি টাইপিস্ট মিস গুপ্তা একলা বসে অফিসের কাজ করছেন, এমনসময় শ্যামলাল বাগকে প্রথম ঘরে এসে ঢুকতে দেখা যায়।

ঘরের দু-ধারে বাগ ও নাগের দুটি আলাদা টেবিল পাতা। নাগের টেবিলের দিকে একবার চেয়ে বাগ গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করে, 'নাগ এখনও আসেনি মিস গুপ্তা?'

'আজ্ঞে না।'

'হুঁ,' চাপা গর্জনের মতো একটা আওয়াজ করে বাগ টেবিলের ওপরকার ঘড়িটা তুলে নিয়ে কাঁটাটা মিনিট দশেক এগিয়ে দেয়, তারপর লাঠিটা টেবিলের ধারে রাখতে গিয়েই বাইরে পায়ের আওয়াজ পেয়ে দরজার এক পাশে গিয়ে লুকিয়ে দাঁড়ায়।

এবার ঘরে এসে ঢোকে বাগ অ্যান্ড নাগ কোম্পানির অন্যতম অংশীদার শ্রী নবদ্বীপচন্দ্র নাগ।

ঘরে ঢুকে তারও প্রথম দৃষ্টি অংশীদারের টেবিলের দিকে। টেবিলের ওপর ঘড়িটা দেখেই সে চমকে ওঠে। এগারোটা বাজতে আর দেরি নেই। ঘড়িটা তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে কাঁটা পিছনে ঘুরিয়ে দিতে-দিতে নাগ জিজ্ঞাসা করে, 'বাগ এখনও আসেনি?'

মিস গুপ্তা সম্ভবত দুই মনিবকেই ভালো করে চেনেন। টাইপরাইটার থেকে মুখ না তুলেই বলেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, এসেছেন তো!'

'এসেছেন!' নাগের মুখটা একটু বুঝি কেমন দেখায়। তাড়াতাড়ি ঘড়িটা টেবিলে নামিয়ে রাখতে যাবে, এমন সময় পিছনে বাগের বাজখাঁই আওয়াজ পাওয়া যায়।

'বলি ওটা কী হচ্ছে, নাগ?'

নাগ চমকে ফিরে তাকাতেই বাগ এগিয়ে এসে আবার বলে, 'দেরি করে এসে আবার ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে রাখা হচ্ছে।'

কোনও জবাব খুঁজে না পেয়েই বোধহয় নাগ প্রথমটা ভেংচে ওঠে, 'কাঁটা ঘুরিয়ে রাখা হচ্ছে! কাঁটা ঘুরিয়ে রেখেছে কে? আমি ঠিক সাড়ে দশটায় এসেছি।'

'সাড়ে দশটায় এসেছ!' কোনদিন সাড়ে দশটায় তুমি আস শুনি। You are always late !'

'Never !' বাগের সঙ্গে সমান তালে জবাব দিয়ে নাগ ঘড়িটা তার টেবিলে রাখতে যায়।

'ঘড়িটা ওখানে রাখছ যে বড়?' শ্যামলাল বাগ একেবারে ছোঁ মেরে ঘড়িটা কেড়ে নিয়ে নিজের টেবিলে রেখে বলে, 'ঘড়ি থাকবে এইখানে।'

নাগ প্রথমটা যেন নির্বিকার ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে বাগের গতিবিধি লক্ষ করে। তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে বাগের টেবিল থেকে ঘড়িটা তোলবার জন্যে এগিয়ে যায়।

বাগ কিন্তু তার আগেই ঘড়ি সরিয়ে নিয়েছে। নাগ হাত বাড়াতেই গম্ভীরভাবে সে বলে, 'ভালো হবে না বলছি, নাগ, ভালো হবে না। ঘড়ি এই টেবিলে থাকবে।'

'এ-টেবিলে থাকবে কেন?' নাগের একেবারে রণং দেহি ভাব।

বাগ তাকে ভেংচে বলে, 'কেন?' তারপর অকাট্য যুক্তির সঙ্গে অধিকার অনধিকারের প্রশ্নের সহজ মীমাংসা করে দেয়, 'কোম্পানির নামটা কি খেয়াল আছে! বাগ অ্যান্ড নাগ! আগে বাগ তারপরে নাগ। আমি হলুম সেই বাগ! সিনিয়র পার্টনার।'

যুক্তির সামনে একটু কাবু হয়ে নাগ এবার অনুপ্রাস ও বিদ্রূপের সাহায্য নেয়, 'সিনিয়র পার্টনার না স্লিপিং পার্টনার। এই নাগ না থাকলে কোম্পানি চলত?'

'তোমার মতো ভাঙা চাকা না থাকলে আরও গড়-গড় করে চলত।' বাগের জবাব যেন মুখস্থ।

'আমি গাড়ির ভাঙা চাকা!' এবার নাগ একেবারে হতভম্ব।

সজোরে মাথা নেড়ে বাগ বলে, 'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা!' নাগের ফিরে আসার ভঙ্গি দেখে মনে হয় নিরুপায় হয়ে সে যেন হার স্বীকার করে নিয়েছে।

বিপক্ষকে পরাস্ত করে বাগ তখন বিজয়দর্পে তার টেবিলে বসতে যাচ্ছে। কিন্তু বসা আব তার হয় না। হঠাৎ নাগ ঝড়ের বেগে ঘুরে দাঁড়ায় তারপর আচমকা তার জবাবের ব্রহ্মাস্ত্রটি ছাড়ে, 'তুমি, তুমি তাহলে গাড়ির খোঁড়া বলদ!'

এই অপ্রত্যাশিত আঘাতে বাগ একেবারে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। তার মুখে কোনও ভাবান্তর নেই। খানিক নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে সে শুধু সংক্ষেপে বলে, 'ব্যস।'

'কী?' বিমূঢ়ভাবে নাগকেই প্রশ্ন করতে হয়।

'ব্যস। মানে Partnership dissolved' শ্যামলাল ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেয়, আজ থেকে বাগ আর নাগ আলাদা কোম্পানি!'

ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করতে নাগের একটু সময় লাগে কিন্তু বোঝবার পর সেও বেপরোয়া ভাবে জানিয়ে দেয়, 'ভালো কথা। খুব ভালো কথা! আমি কি পরোয়া করি নাকি! আজ থেকে তোমার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই!'

দুই অংশীদার যেভাবে দুদিকে টেবিলে গিয়ে বসে তাতে মনে হয় জীবনে কেউ কারুর মুখদর্শনও করবে না।

মিনিট পাঁচেক বাদেই কিন্তু সব উলটে যায়।

দরজার কাছে একজনের গলা শোনা যায়, 'ভেতরে আসতে পারি?'

'আসুন! আসুন!' বলে বাগ ও নাগ দুদিক থেকে যেরকম ব্যগ্রভাবে উঠে গিয়ে আগন্তুককে সাদর সম্ভাষণ জানায় তাতে কে বলবে খানিক আগেই তাদের চরম ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।

সম্বর্ধনার আতিশয্যে আগন্তুক বুঝি প্রথমটা একটু হকচকিয়ে যায়।

আগন্তুক অবশ্য জয়ন্ত চৌধুরি। থানার অফিসার মিঃ সোমের কাছে ঠিকানা জোগাড়

করে সে এইমাত্র বাগ অ্যান্ড নাগ কোম্পানির অফিস খুঁজে বার করে ওপরে উঠে এসেছে। সিঁড়ি দিয়ে তার তেতলায় উঠে আসবার সময় উপস্থিত থাকলে একটা ভারি অদ্ভুত ব্যাপার কিন্তু চোখে পড়ত। বাগ অ্যান্ড নাগ কোম্পানির অফিসের দরজার বাইরে একটি লোক কিছুক্ষণ আগে থেকে দাঁড়িয়ে ছিল। জয়ন্ত চৌধুরিকে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে দেখেই সে যেভাবে তাড়াতাড়ি সরে যায় তা সত্যিই একটু সন্দেহজনক।

জয়ন্ত অবশ্য সে ব্যাপারের কিছুই সম্ভবত লক্ষ করেনি। আপাতত দুই অংশীদারের আপ্যায়নের ঘটায় একটু সংশয়ের সঙ্গেই সে জিজ্ঞাসা করে, 'মাপ করবেন, এটা বাগ অ্যান্ড নাগ কোম্পানির অফিস তো? House Agents?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ' বাগ অ্যান্ড নাগ দুজনেই সমস্বরে আশ্বাস দিয়ে, অনুরোধ জানায়, 'কই আপনি বসলেন না তো! বসুন!'

'বসব তো!' দ্বিধাভরে জয়ন্ত একবার এদিকে আর একবার ওদিকে তাকিয়ে বলে, 'কিন্তু কোন দিকে বসব বলুন তো?'

'এদিকে বাগ ওদিকে নাগ। বসুন না যেদিকে খুশি! কি বল নাগ?' বাগের গলায় যেন মধু ঝরে পড়ে।

'তা আর বলতে!'

দুজনে যেন হরিহরাত্মা এমনি গদ্গদ ভাবে নাগ আবার ব্যাখ্যা করে দেয়, 'ও বাগও যা নাগও তাই।'

'হ্যাঁ, একজন ঘাড় ভাঙে আর একজন ছোবলায়, এই যা তফাত।' জয়ন্ত পরিহাস না করে পারে না। তারপর গম্ভীর হয়ে বলে, 'আপনাদের স্বধর্ম ত্যাগ করতে বলছি না শুধু একটা খবর অনুগ্রহ করে আমায় দিলে বাধিত হব।'

জয়ন্তর কথা মুখ দিয়ে বেরুতে না বেরুতেই এমন কাণ্ড ঘটবে কে জানত। হঠাৎ দুই অংশীদারে যেন কবির লড়াই লেগে যায়।

বাগ জিজ্ঞাসা করে, 'বলুন, কী খবর চান?'

জবাবটা আর জয়ন্তকে কষ্ট করে দিতে হয় না। তার আগেই নাগ বলে ওঠে 'শহর না মফস্বল?'

'পাকা না কাঁচা?'

'কেনা না বিক্রি?'

'ভাড়াটে সমেত না খালি?'

প্রশ্নের তুবড়ি-বাজিতে জয়ন্ত একেবারে দিশাহারা।

'দোহাই! দোহাই আপনাদের। আমার কথাটা আগে দয়া করে শুনুন!' বলে দুজনকে থামিয়ে সে নিজের বক্তব্যটা জানাবার চেষ্টা করে, 'যশোর রোডের ওপর কলকাতা থেকে মাইল বারো দূরে একটা বাড়ি আছে জানেন? বাড়িটা পুরোনো কিন্তু খুব বড়।'

'ওঃ, গোয়ালভাঙার বাড়িটার কথা বলছেন?' বাগের মুখে অবজ্ঞা মিশ্রিত করুণা ফুটে ওঠে।

তারপরই আবার দুজনের নামতা পড়া শুরু হয়ে যায়।

'তেমহলা লোহার ফটক!'

'আমবাগান, পুকুর, বাঁধাঘাট!'

'মোট দু-বিঘে সাত ছটাক!'

জয়ন্ত হাত তুলে তাড়াতাড়ি দুজনকে থামিয়ে বলে, 'ঠিকই বুঝেছেন। এখন সে বাড়িটা কার এবং বিক্রি কিম্বা ভাড়া আছে কি না বলতে পারেন?'

'আরে ছ্যা-ছ্যা!' বাগ জয়ন্তকে একেবারে আহাম্মক বানিয়ে দেয়, 'আপনি সেই বাড়ি চান?'

নাগ সঙ্গে-সঙ্গে আশ্বাস দেয়, 'ঢের ভালো বাড়ি আপনাকে দিচ্ছি।'

'কোলকাতাব ওপর দোতলা—'

'দক্ষিণ খোলা!

'থাক-থাক হয়েছে!' নামতার ভয়ে জয়ন্ত বাধা দিয়ে বলে, 'আমি ওই বাড়িটাই চাই।'

'ওই বাড়িটাই চান?' বাগের গলার স্বর করুণ হয়ে ওঠে, 'শুনছ নাগ, উনি ওই বাড়িটাই চান!'

ব্যথার ব্যথীর মতো নাগ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'কিন্তু ও বাড়ি তো আর হয় না।'

'কেন?' জয়ন্ত বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করে।

'এই কালই একজনেরা নিয়ে নিয়েছেন কিনা!' বাগ অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানায়।

'কালই নিয়েছেন!' খবরটা সত্যিই অপ্রত্যাশিত। জয়ন্ত খানিক গুম হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে, নেহাত ভদ্রতার খাতিরে হাত তুলে একটা শুকনো নমস্কার জানিয়ে দ্রুতপদে বেরিয়ে যায়।

চার

এতদিনের পোড়ো বাড়িতে সত্যিই নতুন বাসিন্দার সমাগম যে হয়েছে বাড়ির ভেতরের ও বাইরের উঠোনে গাদাকরা মালপত্রের বহর দেখেই তা বোঝা গেল।

আধাবয়সী একজন ভদ্রলোক নিচে থেকে মালপত্র কুলিদের দিয়ে ওপরে পাঠাবার ব্যবস্থা করছিলেন। হঠাৎ কাংস্যবিনিন্দিত কণ্ঠস্বরে তাঁকে ফিরে তাকাতে হল।

'হ্যাঁ গো মামাবাবু! এ কীরকম বাড়ি নিয়েছ গো!'

কণ্ঠস্বরটি যার, বেশভুষা ও চেহারা দেখার পর পরিচারিকা বলে তাকে চিনিয়ে দেওয়ার দরকার হয় না, এবং সেইসঙ্গে তার কথার ধরনে এটুকুও বোঝা যায় যে মনিবই হোক আর যেই হোক, কাউকে সমীহ করার কোনও বালাই তার নেই।

সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে-নামতেই ঝি তার বক্তব্যটুকু শেষ করলে, 'যাই বলো বাপু, আমার ভালো লাগছে না। এ-বাড়িতে কোন-কালে যেন জনমনিষ্যি ছিল না। যেখানে যাই গা-ছম ছম করে।'

মাল যারা তুলছিল তাদের মধ্যে একজন কুলি এবার উৎসাহ পেয়ে জানালে, 'হাঁ বাবু। এ বড়ো খারাপ মোকান আছে। কোতো দিন হোয়ে গেল কোই এখানে আসে না। হামাদের তো লাখ রূপেয়া দিলে ভি সনঝার পর এ-বাড়িতে থাকবে না।'

'ওই শোনো!' ঝি এই সমর্থনটুকুর জন্যেই যেন অপেক্ষা করছিল।

মামাবাবু বলে যাঁকে ডাকা হয়েছিল, তিনি এবার ধমক দিয়ে উঠলেন, 'হ্যাঁ শুনেছি। পুরোনো বাড়ি, অনেককাল কেউ ছিল না। তাতেই বাড়িটা একেবারে ভূতুড়ে হয়ে গেছে, না?' এতখানি বলে নিজেকেই যেন তিনি সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলেন, 'আজকালকার বাজারে এরচেয়ে ভালো বাড়ি পেতাম কোথায়? বিদেশ থেকে এসে মেয়ে দুটোকে নিয়ে তো আর রাস্তায় দাঁড়াতে পারি না?'

মেয়ে দুটোর কথায় মামাবাবুর বোধহয় খেয়াল হল যে ধারে-কাছে কেউ তারা নেই। উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ললিতা নমিতা, এরা দুজনে গেল কোথায়?'

ধমক খেয়ে ঝির মেজাজ খারাপ হয়েছিল। বেশ একটু ঝঙ্কার দিয়েই বললে, 'কী জানি বাপু! ওপরেই তো ঘোরাঘুরি করছে দেখে এলাম।'

কুলিরা এতক্ষণ হাত গুটিয়ে এদের কথাবার্তাই শুনছিল। মামাবাবু তাদের বকুনি দিয়ে উঠলেন, 'তোমরা আবার হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? সন্ধের পর তো আবার থাকবে না। মালগুলো অন্তত তুলে দাও তার আগে।'

কুলিরা ব্যস্ত হয়ে কাজে লাগল।

'তুমি এইখানেই থাকো ভুতোর মা। দেখি আবার মেয়েদুটো কোথায় গেল!' বলে মামাবাবু সিঁড়ি দিয়ে ওপরে গেলেন।

ললিতা ও নমিতা দুজনের কেউই তখন ওপরে নেই। বাড়ির সামনের মহলটিই মজবুত আছে খানিকটা। সেদিকে কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করে তারা তখন পেছনের মহলের ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামছে।

নিচে নামবার আগ্রহটা ললিতার। দিদির পাল্লায় পড়ে নেহাত বাধ্য হয়েই নমিতাকে সঙ্গে থাকতে হয়েছে।

দুটি বোন বয়সে প্রায় পিঠোপিঠি। কিন্তু চেহারায় চরিত্রে অনেক তফাত। ললিতা এই বয়সেই স্থির-ধীর-গম্ভীর। তার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, সাহসও কম নয়। আর নমিতা এখনও নেহাত ছেলেমানুষ। যেমন চঞ্চল তেমনি ভীরু অসহায়। বাপ-মা-মরা মেয়ে দুটিকে মামাবাবু ছেলেবেলা থেকে পরম স্নেহে মানুষ করেছেন, কিন্তু তিনি পুরুষ মানুষ। সংসারের বাইরের দিকটাই সামলেছেন। বয়সে সামান্য বড় হওয়ার দরুন ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেই ললিতাকে অনেক কিছুর দায়িত্ব নিতে হয়েছে। নমিতার সঙ্গে তার সম্পর্কটা তাই একাধারে বন্ধুর ও অভিভাবকের।

দিদির পিছু-পিছু সভয়ে চারিদিকে তাকাতে-তাকাতে সিঁড়ির অর্ধেকটা পর্যন্ত নেমেই নমিতার আর সাহসে কুলোয় না। ললিতার আঁচল ধরে টান দিয়ে কম্পিত কণ্ঠে বলে, না দিদি আর গিয়ে কাজ নেই। আমার ভয় করছে।'

ভয় করা অন্যায় অবশ্য নয়। বাড়ির এই পেছনের মহলটা ভগ্নস্তূপ বললেই হয়। ঘর-দোর যেখানে যা ছিল তার অধিকাংশই ভেঙে ধ্বসে পড়েছে। কোথাও ভাঙা ইটকাঠের ঢিবি, কোথাও গুহার মতো খিলান দেওয়া অন্ধকার ঘুলঘুলি। এই ধ্বংসাবশেষ ভেদ করে জায়গায়-জায়গায় বিরাট সব গাছ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। দালান কোঠা এখনও যেখানে যেটুকু দাঁড়িয়ে আছে তাও বুনো লতা-পাতার জঙ্গলে প্রায় ঢাকা। দিনের বেলাতেই এদিকটা কেমন অন্ধকার রহস্যময় মনে হয়। ললিতার কাছে কিন্তু সেইটেই বড় আকর্ষণ।

নমিতাকে সাহস দিয়ে সে তাই বলে, 'আহা আয় না। দিনের বেলা, চারিদিকে লোকজন ঘুরছে। এখন আবার ভয় কী?'

সমস্ত জায়গাটার আবহাওয়াই কিন্তু এমন যে নমিতাকে ভরসা দিলেও একেবারে স্বচ্ছন্দে ললিতা নেমে যেতে পারে না। কতকটা ভাঙাচোরা সিঁড়ির ধাপের দরুন আর কতকটা অজানা কীসের একটা প্রভাবে তাকে বেশ সাবধানে সন্তর্পণেই নামতে হয়। নমিতার অবশ্য দিদির সঙ্গে-সঙ্গে যাওয়া ছাড়া উপায়ন্তর থাকে না।

নিচে নেমে এসে ললিতা ভালো করে চারিদিকটা একবার দেখে নেয়। এককালে এ-মহলটা যে বিরাট ছিল এখনকার ধ্বসে পড়া চেহারা থেকেও তার পরিচয় মেলে। ভাঙা মহল ছাড়িয়ে দক্ষিণে প্রকাণ্ড একটা দেওয়াল ঘেরা বাগান। ভাঙাচোরা হলেও এখনও সে দেওয়াল বেশিরভাগ খাড়া আছে। বাগানের মাঝামাঝি কপিকলের থাম সমেত একটি বিরাট ইঁদারা আগেকার দিনের এ-বাড়ির সুব্যবস্থার সাক্ষ্য দিচ্ছে। দক্ষিণ-পূর্ব কোণে চাইলে পাকা ছাউনি দেওয়া একটা চত্বর ও তা থেকেও বহুদূরে বিরাট নাট-মন্দিরের আর একটা ধ্বংসস্তূপ চোখে পড়ে।

যেখানটায় তারা নেমেছিল সেখানে চারিধারে শুধু ভাঙা ইট-কাঠের স্তূপ আর এদিকে ওদিকে পাহাড়ের গুহার মতো আগেকার সব ধ্বসে পড়া প্রকোষ্ঠের দরজা জানলাহীন গহ্বর।

দু-চার পা সেখানে অগ্রসর হওয়ার পরই নমিতা হঠাৎ শিউরে উঠে সভয়ে 'দিদি' বলে চিৎকার করে ললিতাকে জড়িয়ে ধরে।

চিৎকার না করলেও ব্যাপারটা দেখতে পেয়ে ললিতাও তখন নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

সিঁড়ির ঠিক বিপরীত দিকে একটি ভাঙা খিলানের পেছনের গহ্বরে কী যেন একটা নড়ছে মনে হয়।

ভয়ে দুজনেই একেবারে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে। ইচ্ছে থাকলেও এখান থেকে তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। রুদ্ধ নিশ্বাসে একদৃষ্টে সেই গহ্বরের দিকে তাই তারা তাকিয়ে থাকে।

গহ্বর থেকে ধীরে-ধীরে এবার যে বেরিয়ে আসে ঠিক ভয়াবহ না হলেও তার চেহারা পোশাক দেখে অকস্মাৎ তার এই আবির্ভাবে অবাক হওয়ারই কথা।

লোকটি আর কেউ নয়, থানায় পুলিশের দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে যে নালিশ জানাতে গিয়েছিল, সেই ভিখিরি সাহেব। এখনও তার সেই বিচিত্র তালিমারা পোশাক ও কাঁধে সেই সনাতন ঝুলিটি।

অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে সে প্রথম খানিক মিটমিট করে ললিতা নমিতার দিকে তাকিয়ে থাকে।

দিদির হাত ধরে টেনে নমিতা ভীত কণ্ঠে বলে, 'চলে এসো দিদি!' ললিতা তা-সত্ত্বেও নড়ে না।

দাড়ি গোঁফের জঙ্গল ভেদ করে ভিখিরিসাহেবের মুখে এবার অদ্ভুত একটি হাসি দেখা দেয়।

দুই বোনের দিকে এগিয়ে আসতে-আসতে গলাটিকে সাধ্যমতো মোলায়েম করার চেষ্টা করে সে বলে, Don't be Afraid little ladies ! Don't afraid of me !

লোকটা কাছে এসে দাঁড়াবার পর ললিতা তীক্ষ্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করে, 'কৌন হ্যায় তুম?'

'ম্যায় কৌন হ্যায়!' ভিখিরি সাহেব এমন মজার প্রশ্ন কখনও যেন শোনেননি এমনি ভাবে হেসে ওঠে। তারপর তার পরিচয় না জানাটা ললিতা, নমিতার অপরাধ, এইভাবে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করে, 'Don't you Know?'

ললিতা ভ্রুকুটির সঙ্গে মাথা নাড়ে।

একটা অতি গোপনীয় খবর যেন দিতে যাচ্ছে, এইভাবে সাবধানে চারিদিকে এবার

তাকিয়ে নিয়ে মুখটা ললিতার কাছে নামিয়ে এনে ভিখিরিসাহেব চাপা গলায় বলে, 'I am an ex-Major general of the army !'

এতবড় সংবাদটা দিয়ে একটু আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে ভিখিরিসাহেব প্রসন্ন মুখে আবার জিজ্ঞাসা করে, 'You are sisters—aren't you?'

'লোকটা পাগল না বদমায়েস!' নমিতা দিদিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।

ভিখারি সাহেব এবার তাকেই উদ্দেশ্য করে বলে, 'Don't be Afraid of me little lady. I am a poor beggar now.'

'ও ভিখিরি!' ললিতা বেশ কড়া গলায় জিজ্ঞাসা করে, 'তা এখানে এসে ঢুকেছ কেন?'

'Just for a night's shelter!' খালি রাতমে শোনে কে লিয়ে! ভিখিরিসাহেবের কণ্ঠ একেবারে করুণ হয়ে ওঠে। 'You must have pity on a poor beggar, no home, no friend, nobody to take care of me! দুনিয়ামে মেরা কোই নেহি হ্যায়।'

দুই বোনের মুখে বুঝি আপনা থেকেই একটু সহানুভূতির আভাস দেখা যায়। চট করে সেটুকু লক্ষ করে নিয়ে ভিখিরি সাহেব সুর পালটে বলে, 'Shall I tell your fortunes, little ladies?'

ভয় খানিকটা কেটে গিয়ে নমিতার এতক্ষণে একটু যেন উৎসাহ দেখা যায়, 'কী বলছে দিদি! হাত দেখতে পারে?'

'তাই তো বলছে।' ললিতার গলার স্বরে সন্দেহই প্রকাশ প্রায়।

ভিখিরিসাহেব কিন্তু নিজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে, 'হাঁ-হাঁ, খুব ভালো হাত দেখতে পারে। Come here, come here !'

খানিকটা মোহাচ্ছন্নের মতোই ললিতা ও নমিতা ভিখিরিসাহেবের ডাকে কিছু দূরের একটা ভাঙা চাতালের ওপর গিয়ে বসে।

ভিখিরিসাহেব প্রথম নমিতার হাতটাই দেখতে চায়। কিন্তু সম্পূর্ণ ভয় তার এখনও কাটেনি।

'না-না, আমার হাত দেখতে হবে না। দিদির আগে দেখো।' বলে সে তাড়াতাড়ি সরে বসে।

'এখনও ডর আছে! Still afraid of me !' বলে হেসে ভিখিরিসাহেব ললিতার হাতটাই এবার বেশ মনোযোগ দিয়ে দেখতে শুরু করে।

ভিখিরিসাহেবের ভাবভঙ্গি একেবারে পাকা জ্যোতিষীর মতো। খানিক হাতের রেখাগুলো লক্ষ করে সে বলে ওঠে, 'Ah! I see. You are a brave little lady! খুব সাহস আছে!'

পরমুহূর্তেই তার চোখ-মুখের চেহারা বদলে যায়। গম্ভীরভাবে বলে, 'But what's this? হাঁ, একটা বিপদ আছে দেখছি! a tall dark youngman, Beware of him.'

ভিখিরিসাহেবের বলার ভঙ্গিতে, ললিতার না হোক নমিতার চোখ দুটো ভয়ে বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। 'কার কথা বলছে দিদি?' সভয়ে সে জিজ্ঞাসা করে।

'কার কথা বলছে তা কী করে জানব!' ললিতা একটু বিরক্ত ভাবেই জবাব দেয়।

ভিখিরিসাহেব তৎক্ষণাৎ আশ্বাস দিয়ে বলে, 'জানবে, জানবে, জলদি জানতে পারবে। A handsome youngman. লেকিন আদমি আচ্ছা নেহি। ওর কাছে হুঁশিয়ার থাকবে।'

'লোকটা কে তাই জানলাম না, হুঁশিয়ার থাকব!' ললিতা এবার ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, 'তুমি তো ভারি হাত দেখতে জানো দেখছি! সত্যি কিছু জানো তো বলো!

ভিখিরিসাহেব এ-ভর্ৎসনা গ্রাহ্যই করে না। অবিচলিত ভাবে বলে, 'বলছে, বলছে, সব বলবে।' তারপর চারিদিকে একবার যেন সভয়ে চোখ বুলিয়ে গম্ভীর স্বরে বলে, 'এ-বাড়িতে আসা তোমাদের ঠিক হয়নি। Its a dangerous house! বহুত খারাপ বাড়ি আছে।'

ললিতা-নমিতা এক মনে ভিখিরি সাহেবের কথা শুনছিল। হঠাৎ ভিখিরি সাহেবের চোখের দৃষ্টি দেখে তারা বেশ একটু অস্বস্তি বোধ করে। সে দৃষ্টি যেন দূরে কোথায় পার্থিব জগৎ ছাড়িয়ে চলে গেছে। সেইভাবেই খানিক সামনে চেয়ে থেকে ভিখিরি সাহেব যেন ভবিষ্যৎদ্রষ্টার মতো বলে, 'I see a murder, no, no, two murders possibly.'

'কী বলছে দিদি। এখানে খুন হবে?' নমিতার মুখ একেবারে ভয়ে চুন।

নিজেও বেশ একটু ভয় পেলেও ললিতা তাকে সাহস দেওয়ার জন্যে রাগ দেখিয়ে বলে, 'ওসব যা-তা কথা শুনিস কেন?' তারপর হাতটা টেনে নিয়ে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, 'থাক তোমার আর হাত দেখতে হবে না! আমার হাতে শুধু এইসব কথাই লেখা আছে বুঝি!'

'নেহি-নেহি লিখা নেই, But I can see the future from your hands, এ-বাড়িতে কী হবে আমি দেখতে পাচ্ছি।'

ভিখিরি সাহেবের কথা আর শেষ হয় না। দূর থেকে মামাবাবুর গলা শোনা যায়, 'আরে তোরা এখানে! আর আমি সারা বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

কাছে এসে দুই বোনের সঙ্গে ভিখিরি সাহেবকে দেখে মামাবাবু অবাক হয়ে যান। ভ্রূকুঞ্চিত করে জিজ্ঞাসা করেন, 'আরে এটা আবার কে?'

'ও একটা সাহেব ভিখিরি মামাবাবু।' নমিতাই উৎসাহের সঙ্গে তাদের নতুন আবিষ্কারের পরিচয় দেয়, 'ও হাত দেখতে পারে।'

সাহেব ভিখিরি একগাল হেসে সগর্বে মাথা নেড়ে নমিতাকে সমর্থন করে, 'Yes sir, I am a poor beggar, but I can foretell the future...'

আরও কিছু হয়তো সে বলত, কিন্তু হঠাৎ মামাবাবুর ধমকে তাকে মুষড়ে পড়তে হয়।

'You can foretell the future! বদমায়েসির আর জায়গা পাওনি।' বলে তাকে থামিয়ে দিয়ে মামাবাবু আবার ক্রুদ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ-বাড়িতে ঢুকেছ কেন?'

'বাড়ি!' ভিখিরিসাহেব যেন আকাশ থেকে পড়ে, 'বাড়ি কাঁহা এ তো জঙ্গল আছে। Only the ruins of a house.' মুখখানা আবার করুণ করে সে বলতে যায়, 'খালি রাতমে শোনেকে লিয়ে...'

'না-না, ওসব না।' মামাবাবু ধমক দিয়ে ওঠেন। 'ফের যদি এ-বাড়িতে ঢোকো তো মজা টের পাবে। যাও।'

'All right!-যাতা হ্যায়!' ভিখিরিসাহেব হতাশ ভাবে ঝোলা নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সমস্ত বিশ্বসংসারকে শুনিয়ে যেন মন্তব্য করে, 'গরীব কো কোই নেই দেখতা।'

ক্লান্তির ভারে পা যেন চলে না, এমনিভাবে খানিকদূর নিজস্ব ভঙ্গিতে হেঁটে গিয়েই

কিন্তু সে ফিরে দাঁড়ায়। তারপর হঠাৎ তর্জনী তুলে গম্ভীর স্বরে বলে, 'But remember, I can see the future!'

'যাও বলছি।' মামাবাবুর আর এক ধমকে তার সব বাহাদুরি মাটি হয়ে যায়। চমকে উঠে ফণা ছেড়ে একেবারে কেঁচো হয়ে সে সুড়সুড় করে সরে পড়ে।

পাঁচ

সেইদিন রাত্রেই জয়ন্তকে শিল্পী শ্রীমন্ত সরকারের ঘরে আবার দেখা গেল।

উজ্জ্বল বাতির আলোয় ইজেল-এর ওপর রাখা একটি ছবিতে শ্রীমন্ত তখন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে রঙ লাগাচ্ছে, আর মাঝে-মাঝে সেদিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে জয়ন্ত ঘরের মধ্যে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে বেশ একটু চিন্তিত ও উত্তেজিত ভাবে।

তার দুশ্চিন্তা ও উত্তেজনার কারণটা শ্রীমন্তর কথাতেই খানিকটা বোঝা গেল।

রঙ লাগাতে-লাগাতে একটু থেমে শ্রীমন্ত বললে, 'ওই ভূতুড়ে পোড়ো বাড়িতেও তাহলে লোক এসেছে বলছেন। খুব সাহসী লোক বলতে হবে।'

'সাহসীর বদলে নিরুপায় তো হতে পারে।' জয়ন্ত পায়চারি করতে-করতে থামল। 'আজকাল বাড়ি পাওয়া তো সোজা নয়! বাধ্য হয়েই হয়তো অমন বাড়ি নিয়েছে।'

একটু চুপ করে থেকে শ্রীমন্তর কাছে এগিয়ে এসে জয়ন্ত আবার বললে, 'তবু আমাব একটা কর্তব্য আছে বলে মনে করি। সেইজন্যেই আপনার আতিথ্য আবার নিতে হল।'

শ্রীমন্ত একটু হেসে বললে, 'আতিথ্য নিয়েছেন বেশ করেছেন। কিন্তু কর্তব্য আর আপনার কি আছে? পুলিশকে ব্যাপারটা জানানো হয়েছে। এখন পুলিশ, আর যারা বাড়ি নিয়েছে দায় তাদেব।'

'না, দায় আমারও আছে।' জয়ন্ত প্রতিবাদ জানালে, 'নিজের চোখে ব্যাপারটা দেখার পব নিশ্চিন্ত মনে চলে যেতে আমি পারব না, তাই আজ রাত্রে লুকিয়ে বাড়িটা পাহাবা দেব ঠিক কবেছি।'

'সাবারাত ওই বাড়ি পাহারা দেবেন!' শ্রীমন্ত তুলি নামিয়ে সত্যিই অবাক হয়ে জয়ন্ত চৌধুরির দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করলে, 'তাতে লাভ?'

'দেখা যাক না লাভ-লোকসান কী হয়। যাবেন আমার সঙ্গে?' জয়ন্তর শেষ কথাটা যেন শ্রীমন্তর সাহসের প্রতি কটাক্ষ।

সকৌতুক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে শ্রীমন্ত বললে, 'না গেলে তো কাপুরুষ ভাববেন! সুতরাং যেতেই হবে। তা ছাড়া আপনাকে পাহারা দেওয়ার জন্যেও তো সঙ্গে থাকা দরকার!'

জয়ন্ত চমকে মুখ তুলে তাকাল। কিন্তু শ্রীমন্ত তখন নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে মাত করে দিচ্ছে।

পোড়োবাড়ির বাসিন্দাদের কোনওমতে ঘরদোর গুছোনো তখন একরকম সারা হয়েছে। শুতে যাওয়ার আগে মামাবাবু ললিতা ও নমিতার ঘরে একবার তদারক করতে আসেন।

বাড়ির মধ্যে এই ঘরটির গোছগাছই একরকম পুরোপুরি হয়েছে বলা যায়। চারিদিকে তাকিয়ে খুশি হয়ে মামাবাবু বলেন, 'বাঃ তোরা তো এরইমধ্যে দিব্যি গুছিয়ে ফেলেছিস। দেখছি।'

এ-প্রশংসাতেও ললিতাকে খুব খুশি মনে হয় না, বলে, 'তা গুছিয়ে ফেলেছি। কিন্তু ভাবছি মিছিমিছিই এত কষ্ট করা হল। দুদিন বাদেই তো আবার চলে যেতে হবে।'

ললিতার কথায় বোঝা গেল ইতিপূর্বে এরকম বাড়িতে ওঠার দুঃখে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে মামাবাবু ওইরকম কোনও আশ্বাস বোধহয় দিয়ে থাকবেন। এখন কিন্তু মিথ্যে স্তোক আর তিনি দিতে পারেন না, বিষণ্ণভাবে বলেন, 'সত্যিই কী দুদিন বাদে যাওয়া হবে মা, আজকাল বাড়ি পাওয়া কি অত সোজা!'

'ও বাবা! এ-বাড়িতে এখনও অনেকদিন থাকতে হবে নাকি?' নমিতা মামাবাবুর কথায় একেবারে আঁৎকে ওঠে। তারপর কাতব ভাবে জানায়, 'না মামাবাবু সে আমি পারব না।'

সস্নেহে মামাবাবু তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, 'না-রে পাগলি না। অনেকদিন থাকতে হবে না। বাড়ি একটা পেলেই এখান থেকে চলে যাব। আচ্ছা অনেক রাত হয়েছে, সারাদিন ধকলও কম যায়নি। এইবার ভালো করে দরজা-টরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়। আমি যাচ্ছি।'

মামাবাবু নিজের ঘরে যাওয়ার জন্যে পা-বাড়াতেই কিন্তু আবার নমিতার কাঁদ-কাঁদ স্বর শোনা যায়, 'মামাবাবু!'

ফিরে দাঁড়িয়ে তার পিঠে হাত বুলিয়ে মামাবাবু যথাসাধ্য ভরসা দিয়ে যান, 'কিছু ভয় নেই-রে পাগলি। আমি ওই ওদিকের ঘরেই আছি। ডাকলেই সাড়া দেব।'

নমিতা একথায় খুব বেশি সাহস বোধহয় পায় না। মামাবাবু চলে যাওয়ার পর সভয়ে চারিদিকে একবার তাকিয়ে দিদিকে কাতর ভাবে মিনতি জানায়, 'দরজা জানলাগুলো এবার বন্ধ করে দাও না দিদি।'

মনে ভয় থাকলেও ছোটবোনের কাছে ধরা দিতে ললিতা রাজি নয়। হেসে বলে, 'দিচ্ছিরে দিচ্ছি, অত ভয় কীসের!'

পরমুহূর্তেই দরজার কাছে কীসের একটা শব্দে চমকে উঠে তাকেও চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করতে হয়, 'কে?'

'আমি গো আমি!' ভয় পাওয়ার মতো কেউ নয়, দেখা যায় ভুতোর মা-ই মাদুর-বালিশ বগলে করে হন্তদন্ত হয়ে ঘরে এসে ঢুকছে।

তার আসার ধরনে হেসে ফেলে ললিতা বলে, 'তুমি যে বিছানাপত্র সব নিয়ে এসে হাজির করলে দেখছি।'

মাদুর ও বালিশটা মেঝের ওপর নামিয়ে ভুতোব মা একটু নিশ্চিন্ত হয়ে এবার নিজস্ব গলা বার করে, 'তা করবনি তো কী করব! আত্তির বেলা এ-বাড়িতে আমি একলা শুতে পারবনি। তা আমায় মেরেই ফেল আর কেটেই ফেল!'

অত্যন্ত গম্ভীর হওয়ার ভান করে ললিতা বলে, 'কেটে না ফেলে যদি শুধু মেরে ফেলি!'

রসিকতাটা বুঝতে ভুতোর মার একটু সময় লাগে কিন্তু বোঝবার পর সে রীতিমতো চটে যায়।

'কী হাসি তামাসা কর বাপু, ভালো লাগে না!' তার গলার ঝঙ্কার কিন্তু শেষ পর্দায় পৌঁছবার আগেই হঠাৎ সমস্ত দরজা-জানলা কাঁপিয়ে একটা উদ্দাম হাওয়া বাড়ির ওপর দিয়ে বয়ে যায়।

ভুতোর মা সভয়ে বলে, 'ওই, ওই দেখ!'

আচমকা এই দমকা হাওয়ায় ললিতাও নিজের অজান্তে একটু শিউরে ওঠেনি এমন নয়। নমিতা তো তখন একেবারে তার গায়ে ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে।

সকলকে সাহস দেওয়ার জন্যেই তাচ্ছিল্যের স্বরে ললিতা বলে, 'দেখব আবার কী! ও তো হাওয়া!

'হ্যাঁ হাওয়া। তুমি তো সব জানো!' ভুতোর মার বলার ভঙ্গিতেই দমকা হাওয়াটা নমিতার কাছে অন্তত একেবারে তার সত্যকার চেহারায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কাতর ভাবে সে মিনতি করে, 'এইবার দরজা-জানলাগুলো বন্ধ করে দাও দিদি, আমার বড় ভয় করছে!'

নমিতার অনুরোধ রাখতে ললিতার এখন আর খুব আলস্য দেখা যায় না।

ছয়

দরজা-জানলা বন্ধ করে শোওয়ার পরও অনেক রাত পর্যন্ত ললিতার চোখে ঘুম আসে না।

দুই বোনে তারা মশারি ফেলে একটি খাটের ওপর শুয়েছে। মেঝেতে তাদেরই কাছে বিছানা পেতে শুয়েছে ভুতোর মা।

নমিতা প্রথমটা ভয়ে একটু অস্থির হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দিদির গা ঘেঁষে সে বেশ গভীরভাবেই ঘুমোচ্ছে। মেঝে থেকে ভুতোর মার নাক ডাকার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। শুধু ললিতাই একলা জেগে।

রাত্রে পুরোনো ভাঙা বাড়ির নানাদিকে নানারকম শব্দ। কল্পনাকে প্রশ্রয় দিলে তার প্রত্যেকটি থেকেই অনেকরকম ভয়াবহ ব্যাপার গড়ে তোলা যায়। ললিতার মন কিন্তু অত দুর্বল নয়।

এ-বাড়িব ব্যাপাব মন থেকে ঠেলে বেখে অনেকক্ষণ ধরে সে অন্যকথাই ভাবে তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়ে নিজেও জানতে পারে না। হঠাৎ নমিতার ঠেলায় তার তন্দ্রা এক নিমেষে ভেঙে যায়।

সবলে তাকে ঠেলা দিতে-দিতে নমিতা চাপা কম্পিত গলায় ডাকছে, 'দিদি! দিদি!'

অসময়ে ঘুম ভাঙানোতে ললিতা একটু বিরক্ত হয়েই বলে, 'কী, হয়েছে কী?'

'একবারটি ওঠো। কীসের যেন একটা শব্দ হচ্ছে।' নমিতার গলা দিয়ে স্ববই বার হতে চাচ্ছে না।

ললিতাকে এবার উঠতেই হয। প্রকাণ্ড ঘর, তাদের বিছানা থেকে বেশ দূরের একটা জানলা, পাল্লা ভাঙা থাকার দরুন বন্ধ করা যায়নি। জানলায় অবশ্য লোহার মোটা শিব দেওয়া। রাতের আকাশের অস্পষ্ট আলো তাব ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু ওটা কী হঠাৎ জানলাটার আড়াল করে দাঁড়ায়!

মশারির প্রান্তটা তুলে ধরে সেই দিকে চেয়ে দুই বোনের সমস্ত শরীর যেন হিম হয়ে যায়।

বিশাল ভয়ঙ্কর একটা কালো মূর্তি জানলার গরাদগুলো যেন মোমের তৈরি এমনই ভাবে বেঁকিয়ে দিচ্ছে!

মামাবাবু ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসেন। ও কার কাতর আর্ত চিৎকার! ললিতা-নমিতার না?

টেবিলের ওপর কেরাসিন ল্যাম্পের আলোটা একটু কমানো ছিল। তাড়াতাড়ি সেটা

বাড়িয়ে দিয়ে হাতে তুলে নিয়ে তিনি দ্রুত পদে মাঝের দালানে বেরিয়ে আসেন।

পরের মুহূর্তেই 'মামাবাবু' বলে চিৎকার করে নমিতাই প্রথম পাশের করিডর দিয়ে ছুটে এসে সভয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে। তার ঠিক পিছু-পিছু আসে ললিতা ও ভুতোর মা।

মামাবাবু বিস্ময়-বিমূঢ়ভাবে জিজ্ঞাসা করেন, 'কী, হয়েছে কি?'

'কী একটা ভয়ঙ্কর জানোয়ার এইমাত্র আমাদের ঘরে ঢুকেছে।' নমিতাই এক নিশ্বাসে ঝড়ের মতো বলে যায়!

'ভয়ঙ্কর জানোয়ার!' মামাবাবু ব্যাপারটা বুঝতেই পারেন না। 'হ্যাঁ মামাবাবু!' এবার ললিতাই অনেকটা ধীর ভাবে বুঝিয়ে দেয়, 'অন্ধকারে ভালো দেখতে পাইনি। কিন্তু মনে হল বিরাট দৈত্যের মতো চেহারা। লোহার গরাদগুলো ঠিক কঞ্চির মতো বেঁকিয়ে দিয়ে ঘরে ঢুকল।'

'তারপর?' মামাবাবুর বিমূঢ়তা আরও বেড়ে গেছে।

'তারপর আর কি কিছু দেখেছি! ছুটে পালিয়ে এসেছি!' নমিতা এখনও কাঁপছে।

'আমি একবার ফিরে দেখেছি মামাবাবু।' ললিতা বলে, 'মনে হল ঘর থেকে পেছনের বাবান্দায় বেরিয়ে নিচে নেমে গেল।'

এবার মামাবাবু উপস্থিত বুদ্ধি যেন খুঁজে পান। ব্যস্ত হয়ে বলেন, 'তাই তো! বন্ধুকটা নিয়ে তাহলে তো একবার দেখতে হয়।'

মামাবাবু তাঁর ঘরেব দিকে ফেরার আগেই ভুতোর মাব কাংস্যকণ্ঠ বেজে ওঠে, 'বন্দুক নিয়ে কী করবে গা! ওকি রক্তমাংসেব দত্যি যে বন্দুক ছুড়বে! ও দানো ভূত!'

পরমুহূর্তেই তার বিলাপ শুরু হয়ে যায়, 'কেন মরতে আমি এখানে কাজ নিয়েছিলাম গো! শেষে আমার কপালে কি অপঘাতে মৃত্যু লেখা ছিল গো...'

'থামো দেখি!'

ভুতোর মা'র বিলাপ হয়তো আরও বেশ কিছুক্ষণ চলত। কিন্তু ললিতা ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, 'না, মামাবাবু। ওখানে তোমাব একলা যাওয়া এখন ঠিক হবে না, তার চেয়ে আশপাশ থেকে কিছু লোকজন ডাকতে পারলে ভালো হতো।'

'আশেপাশে লোকজন কোথায় যে ডাকব।' মামাবাবু হতাশ ভাবে বলেন, তারপর ক্ষীণ একটু আশার আলো যেন দেখতে পেয়ে আবার বলতে যান, 'তবে...'

তাঁর কথা শেষ করবার আগেই নমিতা বলে ওঠে, 'হ্যাঁ মামাবাবু! অনেক দূরে একটা বাড়ি আছে, ছাদ থেকে দেখেছি!'

মামাবাবু বোধহয় সেই কথাই ভাবছিলেন। কিন্তু মনেব খটকাটুকুও তিনি প্রকাশ না করে পারেন না, 'কিন্তু এত রাত্রে অতদূরে পরের বাড়ি গিয়ে...'

হঠাৎ কথার মাঝখানে থেমে গিয়ে তিনি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'নিচের দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে কে?'

সত্যি নিচের তলার বাইরের দরজায় সজোবে ধাক্কার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

ব্যস্ত হয়ে সবাই এবার নিচে নেমে যান।

সাত

মামাবাবুই প্রথম সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ান। তীক্ষ্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করেন, 'কে?'

দরজার ওধার থেকে কার কণ্ঠস্বর শোনা যায়, 'দরজা খুলুন, বলছি।'

মামাবাবু একটু দ্বিধাভরেই দরজা খোলেন, কিন্তু দরজা খোলার পর প্রথম যে ভেতরে ঢোকে তাকে দেখে তিনি অবাক হয়ে যান।

'একী তুমি!' আপনা থেকেই তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে যায়।

যাকে দেখে তাঁর এই বিস্ময়, সে জয়ন্ত ছাড়া আর কেউ নয়। শ্রীমন্ত সরকারবে সঙ্গে নিয়ে এসে সে-ই দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিল।

মামাবাবু পিছু-পিছু ললিতা-নমিতা ও ভুতোর মাও নিচে নেমে এসে কিছু দূরে তখন দাঁড়িয়েছে। সকলের দিকে চকিতে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে জয়ন্ত বলে, 'হ্যাঁ, আমিও আপনাদের এখানে দেখব, আশা করিনি। কিন্তু এখন সেকথা থাক। আমরা বাইরেই ছিলাম। হঠাৎ বাড়ির ভেতর থেকে একটা চিৎকার শুনে খোঁজ করতে এলাম। কী, হয়েছে কি?'

'যা হয়েছে তা বিশ্বাস করবার মতো নয়। ললিতা-নমিতা যে ঘরে শুয়েছিল, হঠাৎ তার একটা জানলার গরাদ ভেঙে...'

মামাবাবুর কথার মাঝখানেই বাধা দিয়ে জয়ন্ত বলে, 'থাক বুঝেছি; আর বলতে হবে না। এই ভয় করেই আমরা বাইরে পাহারায় ছিলাম। আচ্ছা আমি থানায় যাচ্ছি শ্রীমন্তবাবু ততক্ষণ এখানে থাকুন।'

শ্রীমন্ত যে এঁদের অপরিচিত, যেতে গিয়ে বোধহয় তার খেয়াল হয়। ফিরে দাঁড়িয়ে শ্রীমন্তকে দেখিয়ে বলে, 'এর পরিচয় বোধহয় পরে দিলেও চলবে। এর নাম শ্রীমন্তবাবু, আর্টিস্ট মানুষ, কাছেই থাকেন, আপাতত এইটুকুই বোধহয় যথেষ্ট।'

ঝড়ের মতো কথাগুলো বলে জয়ন্ত বেরিয়ে যাওয়ার পর কয়েকমুহূর্ত উপস্থিত. কেউই কোনও বলবার কথা খুঁজে পায় না। শ্রীমন্তই তারপর সঙ্কুচিত ভাবে শুরু করে, 'দেখুন, জয়ন্তবাবু তো ঝড়ের মতো শুধু নিজের কথা বলেই চলে গেলেন। আমার নিজের কৈফিয়তটা বোধহয় এখন দেওয়া দরকার।'

মামাবাবু তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলেন, 'না-না, কৈফিয়ৎ কী দেবেন। এই বিপদের সময়ে আপনারা না এসে পড়লে এদের নিয়ে কী যে আমি করতাম জানি না।'

শ্রীমন্তকে সঙ্গে করে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে মামাবাবু এবার সকলের পরিচয় করিয়ে দেন, 'এই দুটি আমার ভাগনি, ললিতা আর নমিতা।'

লৌকিকতার নমস্কার সারা হওয়ার পর মামাবাবু একটু কৌতূহলী হয়েই আবার জিজ্ঞাসা করেন, 'জয়ন্ত তাহলে আপনার বন্ধু?'

'বন্ধু,' 'শ্রীমন্ত প্রথমটা একটু বোধহয় মুশকিলেই পড়ে। তারপর একটু হেসে বলে, হ্যাঁ, তা বলতে পারেন। তবে কাল সবে আমাদের পরিচয় হয়েছে।'

'সবে কাল পরিচয় হয়েছে!' মামাবাবু সত্যিই বিস্মিত হন।

'আজ্ঞে হ্যাঁ!' শ্রীমন্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেয়, 'আমি এখান থেকে কিছু দূরে থাকি। কাল হঠাৎ এমনই মাঝরাত্রে উনি আমার দরজায় গিয়ে ধাক্কা দেন। উনিও আপনাদের মতোই এ-বাড়িতে কাল ভয় পেয়েছিলেন।'

'তাই নাকি! আশ্চর্য তো ! জয়ন্ত হঠাৎ এ-বাড়িতে এসেছিল কী করতে? তাকে এখানে দেখব আমি তো ভাবতেই পারিনি।' মামাবাবুর বিস্ময় বিমূঢ়তা তাঁর গলার স্বরে বেশ স্পষ্টই প্রকাশ পায়।

জয়ন্তকে ওদিকে থানায় গিয়ে মিঃ সোমকে জাগিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা বোঝাতে গোড়ায় বেশ একটু বেগ পেতে হয়। থানার সংলগ্ন কোয়ার্টারেই মিঃ সোম থাকেন। ইতিপূর্বে ভুতুড়ে

ব্যাপার সম্বন্ধে পুলিশের কোনও দায়িত্ব নেই, জানালেও ঘটনাটা শোনবার পর মিঃ সোমের খুব বেশি উদাসীনতা কিন্তু দেখা যায় না। সাজপোশাক বদলে তৈরি হয়ে এসে একজন কনস্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে বেরুবার সময় শুধু তিনি বলেন, 'চলুন জয়ন্তবাবু আমি তৈরি, আশা করি এত রাত্রে মিছিমিছি ঘুম ভাঙিয়ে কষ্ট দিচ্ছেন না।'

'মিথ্যে কী সত্যি, এখুনি তো জানতে পারবেন।' বলে জয়ন্ত এগিয়ে যায়।

সিঁড়ির নিচের হলঘরে জয়ন্তর ফেরার অপেক্ষায় বসে থেকে-থেকে শ্রীমন্তরই প্রথম ধৈর্যচ্যুতি ঘটে।

পরিচয় হয়ে গেলেও এ-পরিবারের কাছে সে একেবারে নতুন লোক। এই বিপদের মাঝখানে সাধারণ মামুলি আলাপও বেশিক্ষণ চালানো যায় না। কিছুক্ষণ থেকে একটা অস্বস্তিকর স্তব্ধতায় সকলেই তাই কেমন আড়ষ্ট বোধ করছিল।

শ্রীমন্তই প্রথম সে স্তব্ধতা ভেঙে বলে, 'জয়ন্তবাবুর ফিরতে এত দেরি হচ্ছে কেন, বুঝতে পারছি না তো!' তারপর ললিতার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা কবে, 'আচ্ছা সেই অদ্ভুত জানোয়ারটা বাড়ির পেছনের মহলেব দিকে নেমে গেছে, বলছিলেন না?'

'আমি তো সেইরকমই দেখেছি!' ললিতা জানায়।

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে শ্রীমন্ত বলে, 'আমি তাহলে একবার ওদিকটা দেখেই আসি।'

'শ্রীমন্তর কথায় সবাই একেবারে স্তম্ভিত।' মামাবাবু তো সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ান, 'কী, বলছেন কী শ্রীমন্তবাবু! না না, আপনার একলা ওদিকে যাওয়া কিছুতেই উচিত নয়।'

'কিছু ভাবনা নেই আপনাদের!' শ্রীমন্ত হেসে আশ্বাস দেয়, 'আমি খুব সাবধানেই যাব।' তারপর একটু সঙ্কোচের সঙ্গে নিজের কৈফিয়তটা জানায়, 'সত্যি কথাটা কী জানেন, গোড়া থেকে ব্যাপারটা আমি বিশ্বাসই করতে পারিনি। নিজের চোখে তাই সন্দেহটা ভঞ্জন করতে চাই।'

কাউকে আব কিছু বলবার অবসর না দিয়ে শ্রীমন্ত দ্রুতপদে পেছনেব মহলের দিকে চলে যায়।

কী করা উচিত বুঝতে না পেরে মামাবাবু তখন বিমূঢ়। ললিতা তার ওপর আবার ঘা দিয়ে বলে, 'ওঁকে কিন্তু একলা যেতে দেওয়া উচিত হল না মামাবাবু!'

মামাবাবু অসহায় ভাবে বলেন, 'বারণ তো করলাম, না শুনলে হাত ধরে তো টেনে রাখতে পারি না!'

'ও কি টেনে রাখা যায়!' এতক্ষণে ভুতোর মা'র সাড়া পাওয়া যায়। 'ও নিয়তিতে টেনেছে, বেঘোরে পেরাণটা যাবে বলে নিয়তিতে টেনেছে!'

এরপর মামাবাবু কী করতেন বলা যায় না; কিন্তু হঠাৎ বাইরে কাদের পদশব্দ শোনা যায়। সেইসঙ্গে জয়ন্তর গলা, 'এই যে এদিকে আসুন।'

মিঃ সোম ও একজন কনেস্টবলকে সঙ্গে নিয়ে জয়ন্ত ভেতরে এসে ঢোকে।

মামাবাবুদের কাছে এসে জয়ন্ত সংক্ষেপে প্রথম পরিচয়টা সেরে নেয়, উপস্থিত সকলকে দেখিয়ে বলে, 'এই এরাই এখন এ-বাড়ি নিয়েছেন। ঘটনাটা এঁদের কাছেই শুনুন।'

হঠাৎ তার খেয়াল হয় যে এঁদের ভরসা দেওয়ার জন্য যাকে রেখে গিয়েছিল সেই শ্রীমন্তই সেখানে নেই। অবাক হয়ে সে জিজ্ঞাসা করে, 'শ্রীমন্তবাবু গেলেন কোথায়?'

কথাটা ললিতার দিকে চেয়েই বলা হয়েছিল, কিন্তু তাকে মুখ ফিরিয়ে চুপ করে থাকতে দেখে নমিতাই জবাবটা দেয়, 'তিনি কারুর কথা না শুনে একলাই ওদিকটা দেখতে

গেলেন।'

'একলা গেলেন?' জয়ন্ত বিস্মিত না বিরক্ত ঠিক বোঝা যায় না।

পরমুহূর্তে সকলেই চমকে উঠে সভয়ে পেছনের মহলের দিকে কান পাতেন।

সেখান থেকে একটা চাপা আর্তনাদ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

মিঃ সোমই প্রথম বলে ওঠেন 'এ তো শ্রীমন্তবাবুর গলা!'

তৎক্ষণাৎ তিনি পেছনের মহলের দিকে ছুটে যান। তাঁর পিছু-পিছু আর সকলে।

শুধু জয়ন্ত তাদের অনুসরণ করে না। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে সে বাইরের দরজা দিয়েই দ্রুতপদে বেরিয়ে যায়।

আট

সামনের মহল থেকে পেছনের মহল একেবারে এক নিমেষে যাওয়া যায় না। নিচের তলা দিয়ে যেতে হলে মহলের মাঝখানে একটা সেকেলে সুড়ঙ্গের মতো বেশ লম্বা গলিপথ পার হতে হয়। গলি পথটির এখন নিতান্ত ভগ্নদশা তবে ব্যবহারের একেবারে অযোগ্য নয়।

মিঃ সোম সবার আগে সেই পথ দিয়ে পেছনের মহলে এসে পৌঁছান।

প্রথম যে আর্তচিৎকার শুনেছিলেন তা এখন থেমে গেছে, তার বদলে একটা অস্পষ্ট গোঙানি কোথা থেকে উঠেছে। অন্ধকার হলেও সে গোঙানির শব্দ অনুসরণ করে ব্যাপারটা কোথায় কী ঘটছে দেখতে পেতে খুব দেরি লাগে না। কিন্তু যে দৃশ্য সেখানে তাঁর চোখে পড়ে, তাতে ঝানু-সাহসী পুলিশ অফিসার হওয়া সত্ত্বেও মনের স্থৈর্য বজায় রাখা তাঁর পক্ষে একটু কঠিনই হয়।

দূরে পোড়োবাড়ির জঙ্গলের মাঝে বিরাট দৈত্যের মতো একটা মূর্তি, শ্রীমন্তবাবুকেই নিশ্চয়, বেড়ালের কাছে যেন ইঁদুরছানা, ঠিক এমনিভাবে, দু-হাতে গলা টিপে ধরে ঝাঁকুনি দিচ্ছে।

অন্ধকারে দুটি চেহারাই অস্পষ্ট ও একেবারে গায়ে-গায়ে লাগান। সোজা সেই দৈত্যাকার বিভীষিকাকে লক্ষ করে গুলি ছুড়তে তাই সোম সাহস পান না। রিভলভারটা বার করে তাদের মাথার ওপরে শূন্যে পর-পর কয়েকবার তিনি আওয়াজ করেন।

গুলির শব্দে কিছু ফল অন্তত পাওয়া যায়। দৈত্যাকার মূর্তিটা চমকে ফিরে তাকিয়ে তৎক্ষণাৎ তার শিকার ফেলে দিয়ে পেছনের গাছপালার দিকে লাফ দিয়ে পালিয়ে যায়।

সোম তৎক্ষণাৎ শ্রীমন্ত যেখানে পড়ে আছে সেখানে ছুটে গিয়ে মূর্তিটাকে লক্ষ করবার চেষ্টা করে গুলি ছোড়েন। কিন্তু তাতে ফল বিশেষ কিছু বোধহয় হয় না। অন্ধকারে সোম লক্ষ স্থির করবার আগেই প্রকাণ্ড একটা গাছের ঝুরি ধরে ঝুলে সোমের মাথার ওপর দিয়েই দোল খেয়ে প্রাণীটা পেছনের মহলের দোতলার ভাঙা বারান্দায় গিয়ে উঠে উধাও হয়ে যায়।

কনেস্টবল সমেত মামাবাবু ও অন্যান্য সকলে তখন সেখানে এসে পড়েছেন। এক নিশ্বাসে শ্রীমন্তকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ও বেঁচে থাকলে ডাক্তার দেখবার নির্দেশ দিয়ে সোম প্রাণীটাকে অনুসরণ করবার জন্যে ছুটে ওপরে উঠে যান।

কিন্তু বনমানুষের মতো শূন্যপথে যে অনায়াসে ঝুলে পার হয় তার নাগাল পাওয়া সহজ নয়। অনেক দূর পর্যন্ত বৃথাই তার অনুসরণ করবার চেষ্টা করে সোম ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসেন।

সিঁড়ির নিচের হলঘরে শ্রীমন্তকে ঘিরে সবাই তখন শুশ্রূষায় ব্যস্ত। মিঃ সোম যতখানি

আশঙ্কা করেছিলেন তারচেয়ে তার অবস্থা যথেষ্ট ভালো দেখে আশ্বস্ত হন। শ্রীমন্তর ভাগ্য অবশ্য অত্যন্ত ভালো যে মিঃ সোম ঠিক সময়ে উপস্থিত হয়ে সেই বিভীষিকাকে তাড়াতে পেরেছিলেন। সকলেই স্বীকার করেন যে আর একটু দেরি হলে কী যে হতে পারত কিছুই বলা যায় না। আপাতত দেখা যায় যে গলা টেপা ও শরীরের নানা জায়গায় আঘাতের দরুন কিছুটা দুর্বলতা ও আচ্ছন্ন ভাব থাকলে তেমন মারাত্মক কোনও ক্ষতি তার হয়নি।

তবু মিঃ সোম ভালো করে শ্রীমন্তকে একবার পরীক্ষা করে দেখেন। পরীক্ষা শেষ করে নিশ্চিন্ত হয়ে উঠে দাঁড়াতেই জয়ন্ত তাঁর দিকে চেয়ে হেসে বলে, 'পিস্তল নিয়ে ধাওয়া করেও কিছু করতে পারলেন না তাহলে!'

জয়ন্তর কথায় প্রচ্ছন্ন একটু বিদ্রুপ হয়তো ছিল, কিন্তু সোম সেটা গ্রাহ্য না করে সহজভাবেই বলেন, 'না তা পারলাম না।' তারপর মামাবাবুর দিকে ফিরে জানান, 'যে ঘরে জানোয়ারটা প্রথম ঢোকে সেইটে এখন একবার দেখতে চাই।'

'হ্যাঁ, সেটা আপনার দেখা দরকার। আসুন।' বলে মামাবাবু ললিতাকেও সঙ্গে যেতে ডাকেন।

ললিতাদের ঘরে গরাদ-ভাঙা জানলার কাছে যখন তাঁরা উপস্থিত হন তখন দেখা যায় জয়ন্তও তাঁদের সঙ্গে এসেছে।

বেঁকানো গরাদগুলো দেখিয়ে মামাবাবু বলেন, 'কী সাংঘাতিক ব্যাপার দেখেছেন। এবকম শক্ত লোহার গরাদগুলো অনায়াসে বেঁকিয়ে দিয়েছে।'

'এক গরিলা ছাড়া এরকম জোর আর কোনও প্রাণীর আছে বলে জানি না।' জয়ন্তই মন্তব্য করে, তারপর সোমকেই উদ্দেশ করে বলে, 'আমার সেদিনকার গল্প বানিয়ে বলেছিলাম কিনা, এখন আশা করি বুঝতে পারছেন।'

সেকথার কোনও উত্তর না দিয়ে সোম গরাদগুলোই খানিক পরীক্ষা করে বলেন, 'হুঁ, গরাদের গায়ে এখনও সব লোম লেগে আছে দেখছি।'

পকেট থেকে একটা খাম বার করে কিছু লোম তার ভেতর ভরে নিয়ে সোম আবার বলেন, 'এ জানলার পেছনে যে বারান্দা তার ওধারেই তো বাড়ির পোড়ো দিকটা। সেখানে কি আছে না আছে ভালো করে দিনের বেলা দেখেছেন?'

'এই তো সবে এসেছি,' মামাবাবু ক্ষুণ্ণস্বরে জানান, 'ভালো করে দেখবার সময় কোথায় পেলাম বলুন।'

'তুমি ভুলে যাচ্ছ মামাবাবু,' ললিতা মামাবাবুর কথার ওপরেই প্রতিবাদ করে বলে, 'আমার ছোটবোনের সঙ্গে দুপুরে একবার ওদিকে গেছলাম। ভিখিরি গোছের একটা অদ্ভুত লোক তখন ওখানে দেখেছি।'

'ভিখিরি গোছের অদ্ভুত লোক!' সোমকে অত্যন্ত বিস্মিত দেখায়।

'হ্যাঁ, ছেঁড়া কোট প্যান্ট পরা।' ললিতা বিস্তারিত বিবরণ দেয়, 'আবার ইংরিজিতে কথা বলে। মামাবাবু অবশ্য তাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।'

অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে 'হুঁ' বলে সোম বেশ গম্ভীর হয়ে যান।

'কিন্তু এখন আমরা কী করব বলুন তো!' মামাবাবু এবার তাঁর দুঃখের কথা পাড়েন। 'এরকম বাড়িতে একদণ্ড থাকতে তো সাহস হয় না। অথচ যাবই বা কোথায়।'

'যাওয়ার জায়গা যতদিন না পান ততদিন এখানেই থাকতে হবে। তবে আপনাদের বিশেষ কিছু ভয় নেই।' মিঃ সোম আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'এখন থেকে আমার লোকজন

সারাক্ষণ এ-বাড়ি নজরে রাখবে আর ভূতপ্রেত নয়, জ্যান্ত জানোয়ার বলে যখন জানা গেছে, তখন একটা কিছু ব্যবস্থা করা যাবেই বলে মনে হচ্ছে।'

জয়ন্ত এতক্ষণ বেশিরভাগ নীরব শ্রোতা হয়েই ছিল। এইবার মামাবাবুর দিকে ফিরে সে বলে, 'আপনার যদি আপত্তি না থাকে, তা হলে আমি নিচের একটা ঘরে এখন কয়েকদিন এসে থাকতে পারি।'

'আপত্তি কীসের? তাতে তো আমাদের সুবিধে!' বেশ উৎফুল্ল হয়েই কথাগুলো বলে মামাবাবু শেষে আবার একটু সন্দেহ প্রকাশ করেন 'তবে তুমি যা খেয়ালি ছেলে, কদিন ধৈর্য ধরে এখানে থাকবে তাই ভাবছি।'

এঁদের কথার মাঝখানে সোম সবিস্ময়ে এবার বলতে বাধ্য হন, 'জয়ন্তবাবুকে আপনারা তাহলে চেনেন!'

'চিনি মানে!' মামাবাবু সোৎসাহে বলে যান, 'বর্মায় যে জায়গায় আমরা থাকতাম, সেখানে ও তো আমাদের ঘরের ছেলের মতো ছিল। হঠাৎ কাউকে কিছু না বলে কোথায় যে একদিন উধাও হয়ে গেল, পাত্তাই পাওয়া গেল না। তারপর আমাদেরও অবশ্য এই যুদ্ধের গোলমালে বর্মা থেকে চলে আসতে হয়েছে।'

'হুঁ!' কী যেন একটা ভেবে নিয়ে সোম বলেন, 'আপনারা আগে এদেশে থাকতেন না?'

'থাকতাম না বলেই তো এই বিপদ!' মামাবাবু দুঃখের সঙ্গে জানান 'দেশের সঙ্গে বহুকাল সম্পর্ক নেই বলে, কিছুই এখানকার জানি না। না হলে এরকম একটা সর্বনেশে ভুতুড়ে বাড়ি, না বুঝে-শুঝে নিয়ে বসি! বাড়ি পাওয়া যা সমস্যা তাতে এখন কী উপায় হবে তাই ভাবছি।'

মামাবাবুকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো কিছু একটা সোম বোধহয় বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বলা আর তাঁর হয়ে ওঠে না। হঠাৎ পাশে তাকিয়ে তিনি বলেন, 'এই যে শ্রীমন্তবাবু! আপনি একটু সুস্থ হয়েছেন তাহলে?'

শ্রীমন্তই সত্যি ওপরে উঠে এসেছে। এইমাত্র যে বিপদ সে কাটিয়ে উঠেছে, ছেঁড়াখোঁড়া, দাগ লাগা জামাকাপড় ও নানা জায়গায় ক্ষত-বিক্ষত চেহারায় তার চিহ্ন এখনও সুস্পষ্ট, কিন্তু মনের জোর যে তার কম নয় তার কথার ধরনেই তা বোঝা যায়।

সোমের কথার জবাবে একটু হেসে সে বলে, 'হ্যাঁ শারীরিক খানিকটা সুস্থ হয়েছি, কিন্তু মাথাটা মশাই একেবারে গুলিয়ে গেছে। এরকম একটি আজগুবি ব্যাপার যে সম্ভব, আগে ভাবতেই পারিনি। জয়ন্তবাবুর কথা তখন অবিশ্বাস করেছিলাম বলেই বোধহয় এই শিক্ষাটা পেতে হল।'

'শিক্ষা আপনি নিজের দোষেই পেয়েছেন!' জয়ন্তর গলার স্বরে একটু রূঢ়তাই যেন প্রকাশ পায়, 'কী দরকার ছিল আপনার বাহাদুরি দেখাতে ওখানে যাওয়ার?'

'বাহাদুরি!' বোঝা যায় শ্রীমন্ত সত্যিই একটু আহত হয়েছে।

তার হয়ে ললিতাই হঠাৎ জবাব দেয়, 'আপনি কিছু মনে করবেন না শ্রীমন্তবাবু। সাহস আর বাহাদুরির তফাতটা অনেকের ঠিক জানা নেই।'

কথাটা জয়ন্তর দিকে অবজ্ঞাভরে যেন ছুঁড়ে দিয়ে ললিতা সেখান থেকে দ্রুতপদে বেরিয়ে চলে যায়।

ঘরের আবহাওয়াটা একমুহূর্তে কেমন অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে। আলাপটার এরকম মোড়

নেওয়ার জন্যে কেউ যেন প্রস্তুত ছিল না।

জয়ন্তই প্রথম ব্যাপারটা হাল্কা করে দেওয়ার চেষ্টা করে। হেসে বলে, 'শুনলেন মামাবাবু, আপনাদের এখানে অভ্যর্থনাটা কীরকম হবে এখনই তার নমুনা পাচ্ছি। তবু আমায় থাকতেই হবে।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, থাকবে বইকী!' মামাবাবু অস্বস্তিটা কাটিয়ে উঠে খুশি হয়ে বলেন, 'আমার ললিতা মাকে তো জানো। কখন যে কী মেজাজে থাকে হদিস পাওয়া যায় না। আর তোমাদের এ-ঝগড়া তো নতুন নয়।'

সকলের সঙ্গে নিচে নামতে-নামতে মামাবাবু জয়ন্তর পিঠটা সস্নেহে দুবার চাপড়ে দেন।

নয়

একটা দিন তারপর কেটে গেছে। বিশেষ কিছু ইতিমধ্যে ঘটেনি। শুধু জয়ন্ত এবাড়ির নিচের একটি ঘরে তার জিনিসপত্র নিয়ে এসে উঠেছে।

দ্বিতীয়দিন সকালবেলা ললিতা ওপর থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামছে এমনসময় সামনে সিঁড়ির তলায় জয়ন্তকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাকে থামতে হল একটু।

নিচেব হলের বাঁ-দিকের প্রথম ঘরটা জয়ন্তব। সেখান থেকে ললিতাকে নামতে দেখেই সে বেরিয়ে এসে সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়েছে।

একমুহূর্ত থমকে দাঁড়ালেও ললিতা তারপর জয়ন্তকে অগ্রাহ্য করেই নিচে নেমে গেল।

জয়ন্তকে পাশ কাটিয়েই সে চলে যাচ্ছিল কিন্তু এ-উপেক্ষা সত্ত্বেও জয়ন্ত পেছন থেকে ডেকে বললে, 'কী ললিতা! মনে হচ্ছে আমাকে যেন তুমি চেনই না!'

তার মুখে গোড়া থেকেই একটি কৌতুকের হাসি লেগে আছে।

পিছন ফিরে না তাকালেও জয়ন্তর গলার স্বরের এ-কৌতুক ললিতার বোধহয় অগোচর রইল না। কঠিন স্বরে সে জবাব দিলে, 'কথাটা খুব মিথ্যে হয়তো নয়।'

জয়ন্ত একটু এগিয়ে গিয়ে আবার হেসে বললে, 'এই ক'দিনেই এত অচেনা হয়ে গেলাম!' বিদ্রুপ নয়, এখনও তার গলায় সহজ পরিহাসের সুর।

ললিতা এবার ফিরে দাঁড়াল। তারপর অত্যন্ত তিক্তভাবে হেসে বললে, 'ক'দিনে হয়ে যাওনি। কোনও কালেই হয়তো তোমায় ঠিক চিনতাম না।'

কৌতুকের হাসি জয়ন্তর মুখ থেকে এবার মুছে গেল। খানিক চুপ করে থেকে সে বললে, 'আমায় তুমি ভুল বুঝেছ জানি। সে ভুল ভাঙাবার সুযোগ আমি কিন্তু এখনও পাইনি।' তার গলার স্বর বেশ ক্ষুণ্ণ।

কিন্তু ললিতার কাছে মনে হল সে ক্ষোভের কোনও দাম নেই।

'কোনও সুযোগেরই তোমার দরকার নেই।' এসব কথা আমি আলোচনা করতেই চাই না।' বলে ললিতা পেছনের মহলের দিকে দ্রুতপদে চলে গেল।

কিন্তু দেখা গেল, জয়ন্ত অমন এক কথায় এ-আলোচনা শেষ করতে প্রস্তুত নয়।

কয়েকমুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে সে ললিতাকে অনুসরণ করে পেছনের মহলে গিয়ে আবার ডাক দিলে, 'শোনো ললিতা, দাঁড়াও,'

অনুরোধ নয় আদেশের স্বর। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ললিতাকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল।

জয়ন্ত কাছে এসে উত্তেজিত ভাবে জিজ্ঞাসা করলে, 'একটুখানি ধৈর্য ধরে আমার

কথাগুলোও কি তুমি শুনতে পারো না। আমার যা বলবার আছে সব শুনে তারপর আমার বিচার কোরো।'

'তোমার বিচার আমি করতেই বা যাব কেন?' অবজ্ঞা ভরে ললিতা উত্তর দিলে। 'সেরকম কোনও উৎসাহ আমার নেই। তুমি যাই হও আর যা খুশি করো, আমার তাতে কিছু আসে যায় না।'

'কিছু আসে যায় না।'

'না,' ললিতার দ্বিধাহীন সুস্পষ্ট জবাব।

'ওঃ এক বছর আগে কিন্তু একথাটা বোধহয় বলতে পারতে না।' এবার জয়ন্তর কণ্ঠস্বরে বিদ্রুপের আভাস।

কিন্তু ললিতা আগের মতোই কঠিন স্বরে বললে, 'হয়তো পারতাম না। কিন্তু এক বছরে মানুষ অনেক কিছু শেখে, মানুষের অনেক কিছু বদলে যায়।'

'হ্যাঁ, সেটা ভালো করেই বুঝতে পারছি।' জয়ন্তর স্বর অত্যন্ত তিক্ত। 'আচ্ছা আর তোমায় বিরক্ত করব না। আপাতত তোমাদেব বাড়িতে যে আছি, তাতেও যদি তোমার আপত্তি থাকে তো বলো আমি আজই চলে যাচ্ছি।

'তাতে তোমার খুব অসুবিধে হবে না কি?' ললিতা বেশ একটু আঘাত দিয়েই বললে, 'আমার জন্যে তুমি এখানে আসনি এবং আমি বলা মাত্র চলে যেতেও বোধহয় পারবে না।'

'একথার মানে?' জয়ন্ত উষ্ণ হয়ে উঠল। 'এ-বাড়ির রহস্য সম্বন্ধে আমার কৌতূহল আছে সত্যি, কিন্তু সেই রহস্যের সন্ধান, আর তোমাদের একটু পাহারা দেওয়া, এ ছাড়া আমার এ-বাড়িতে থাকার অন্য কোনও উদ্দেশ্য আছে বলে মনে করো?'

'কী মনে করি, তা নাই শুনলে।' ললিতা অবিচলিত ভাবে জবাব দিলে। 'তবে তোমার ভাবনার কোনও কারণ নেই। তুমি এ-বাড়িতে মামাবাবুর অতিথি, সুতরাং আমার আপত্তি থাকলেও তোমার তা গ্রাহ্য কববার কোনও দরকার নেই। তোমার কাজ তুমি নির্বিঘ্নে করে যেতে পারো।'

'তোমার উপদেশের জন্যে ধন্যবাদ!' একমুহূর্ত আর সেখানে না দাঁড়িয়ে জয়ন্ত আরক্তমুখে হন-হন করে ভেতরের দিকে চলে গেল।

মুখ দেখে ললিতার মনের কথা বোঝা কঠিন। খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে সে আবার পেছনের বাগানটার দিকে ফিরল। কিন্তু কয়েক পা গিয়ে আবার তাকে থমকে দাঁড়াতে হল। পুরোনো ইঁদারাটার পেছনে কার যেন কাশির শব্দ।

কাশির শব্দে ললিতা চমকে গেছল, কিন্তু ইঁদারার পেছন থেকে অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে যে লোকটি এবার উঠে এল তাকে দেখে সে আরও অবাক।

লোকটি আর কেউ নয় শ্রীমন্ত। কাছে এসে অত্যন্ত লজ্জিত ভাবে সে বললে, 'মাপ করবেন। বড়ই মুশকিলে পড়েছিলাম। দিনেরবেলায় জায়গাটা ভালো করে পরীক্ষা করবার জন্যে সবে এসে এখানে বসেছি, এমনসময় আপনাদের কথা শুনতে পেলাম। তখন না পারি, হঠাৎ উঠে পড়তে, না পারি বসে থাকতে। লুকিয়ে বসে এসব কথা শোনা অন্যায়, অথচ পাছে আপনারা অপ্রস্তুত হন বলে উঠতেও পারছিলাম না।

একটু থেমে শ্রীমন্ত আবার অনুরোধ জানালে, 'নেহাত অনিচ্ছায় বাধ্য হয়ে যে অপরাধ করেছি তারজন্যে মাপ করবেন।'

'না-না, মাপ করবার কী আছে।' ললিতাই এখন অপ্রস্তুত। 'আর গোপন করার মতো কথাও ওসব নয়।'

প্রসঙ্গটা বদলাবার জন্যে ললিতা একটু হেসে আবার জিজ্ঞাসা করলে, 'জায়গাটা পরীক্ষা করে কিছু পেলেন?'

'না, দিনেরবেলা তো বিশ্বাসই হয় না, এখানে এমন একটা ব্যাপাব ঘটতে পারে। হঠাৎ কী একটা পড়ায় ইঁদারার ধার থেকে একটা ঝোলা কুড়িয়ে নিয়ে এসে শ্রীমন্ত আবার বললে, 'এই ঝোলাটা কিন্তু এখানে কোথা থেকে এল বুঝতে পারছি না।'

ঝোলাটা দেখেই ললিতা সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিল। শ্রীমন্তর কাছ থেকে সেটা হাতে নিতেই তার মনে পড়ে গেল। 'আরে এটা তো সেই—'

'Yes! sweet Lady!'

কথার মাঝখানেই চমকে দুজনকে ফিরে তাকাতে হল। সেই ভিখিরিসাহেবটা ইঁদারার ভেতর থেকে উঠে পাড়ের ওপর একটা পা ঝুলিয়ে তাদের দিকে সকৌতুক দৃষ্টিতে হাসিমুখে চেয়ে আছে।

তাদের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে ইঁদারা থেকে নেমে এসে ললিতার হাত থেকে ঝোলাটা তুলে নিয়ে কুর্নিশ করবার ভঙ্গিতে সে বললে 'You are quite right! It belongs to me, এঠো মেরা হ্যায়!'

শ্রীমন্ত অবাক হয়ে ললিতাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'একে চেনেন নাকি!'

ললিতা হেসে কী বলতে যাচ্ছিল তার আগে শ্রীমন্তই আবার বলে উঠল, 'দাঁড়ান, দাঁড়ান, সেদিন একে যেন থানায় দেখেছি, মনে হচ্ছে।'

ভিখিরিসাহেব একগাল হেসে জানালে, 'May be! সব জাগামে ভিখ মাঙকে খাতা!'

হঠাৎ ভিখিরির মতো ভঙ্গিতে শ্রীমন্তর সামনে ডানহাতটি সে কাতরভাবে বাড়িয়ে দিলে 'Give me something'

'Give you something!' সকৌতুক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে শ্রীমন্ত জিজ্ঞাসা করলে, 'এ-কুয়োর ভেতর ঢুকে কী করছিলে? ভিখ মাঙছিলে?'

'No, No, No!' ভিখিরিসাহেবের মুখ একেবারে করুণ হয়ে উঠল 'I just fell down the well, Sir, ইন্দারামে গির পড়া!'

'গির পড়া!' শ্রীমন্ত ও ললিতা দুজনেই হেসে উঠল।

শ্রীমন্ত আবার বললে, 'গির পড়েও তো কিছু হয়নি দেখছি। মাথাটা বেশ আস্তই আছে।'

এটাই যেন তার একটা বাহাদুরি এমনিভাবে নিজের মাথায় দুটো টোকা দিয়ে ভিখিরি সাহেব বুঝিয়ে দিলে 'Got a very strong head Sir স্যার বহুত মজবুত হ্যায়।'

কথাটা শেষ করবার আগেই পাশের দিকে চোখ পড়ায় ভিখিরি সাহেবের মুখটা হঠাৎ ভয়ে যেন শুকিয়ে গেল।

ভয় পাওয়ার কারণও ছিল। দেখা গেল পেছনের মহলের আর একদিক থেকে মামাবাবুর সঙ্গে ইন্সপেক্টর মিঃ সোম সেইদিকেই আসছেন।

'এই, ঠারো!'

তাড়াতাড়ি সরে পড়তে গিয়েও ভিখিরিসাহেব সুবিধে করতে পারলে না। শ্রীমন্তই হাতটা বাড়িয়ে তাকে আটকে দিলে।

কাছে এসে মামাবাবুর দিকে ফিরে সোম জিজ্ঞাসা করলে, 'এই লোকটার কথাই বলছিলেন না?'

'হ্যাঁ, সেদিন মানা করে দিয়েছিলাম, তবু আবার এসেছে দেখছি।'

এদের কথাবার্তার সুযোগে ভিখিরি সাহেব আর একবার পালাবার চেষ্টায় ছিল কিন্তু শ্রীমন্তই আবার তাকে ধরে ফেলে হেসে বললে, 'এই ভাগতা কাঁহা?'

'নেহি, ভাগতা নেহি।' ভিখিরিসাহেব কাঁদুনে সুর তুলে ছাড়া পাওয়ার জন্যে আকুল হয়ে উঠল। 'হাম চলা যাতা! আভি চলা যাতা! আউর হিঁয়া কভি নেহি আয়েগা।'

'নেহি আয়েগা।' সোম ধমক দিয়ে উঠলেন, 'যাতে না আসতে পারো সেই ব্যবস্থাই করছি। চলো আজ তোমায় হাজতে দেবই।'

সোম তার ঘাড়টা ধরতেই ভিখিরিসাহেব একেবারে যেন ককিয়ে উঠল 'Oh, please, please ইন্সপেক্টর সাব। I am a poor beggar!'

'থাকগে, আজকের মতো ছেড়ে দিন মিঃ সোম।' শ্রীমন্তর মনটাই এ-কাঁদুনিতে গলেছে দেখা গেল। 'লোকটা harmless tramp বলে মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ tramp কিন্তু harmless কিনা আমার সন্দেহ আছে।' ভিখিরি সাহেবকে একটা ঠেলা দিয়ে সোম বললেন, 'যাক আপনার কথায় আজকের মতো ছেড়ে দিলাম।'

বলাবাহুল্য, ভিখিরি সাহেব তৎক্ষণাৎ সে তল্লাট ছেড়ে উধাও।

'লোকটার চালচলন কিন্তু সত্যি কীরকম সন্দেহজনক।' ললিতাই প্রথম মন্তব্য করলে। 'জানেন, খানিক আগে ওই কুয়োটার ভেতর থেকে উঠে এল।'

'কুয়োটার ভেতর থেকে!' সোম অবাক হয়ে আরও কী জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই শ্রীমন্ত হেসে বললে, 'হ্যাঁ কুয়োটার ভেতর থেকে উঠে এসেছে সত্যি। তবে চালচলন সন্দেহজনক বলেই আড়াল থেকে নজর রাখবার জন্যে ছেড়ে রাখা দরকার। কেমন তাই নয় কি মিঃ সোম।'

'তা খুব ভুল বলেননি!' মিঃ সোম এবার না হেসে পারলেন না।

'আচ্ছা আমি তাহলে চলি।' বলে শ্রীমন্ত বিদায় নিয়ে যাওয়ার পর মামাবাবু নিজের দুঃখের কথা আবার পাড়লেন, 'দেখুন মিঃ সোম, আপনার ভরসা পেয়েও আমি কিন্তু খুব নিশ্চিন্ত হতে পারছি না।'

'নিশ্চিন্ত যাতে হতে পারেন সেই চেষ্টাই তো করছি।' মিঃ সোম আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'শুনুন যে কথা আজ আপনাকে বলতে এসেছি। আমার লোকজন তো এখানে পাহারায় আছেই, তাছাড়াও রাত্রে যদি কখনও কোনও বিপদ বোঝেন, আপনাদের চিল কুঠুরির জানলায় একটা আলো জ্বালিয়ে দেবেন। বুঝেছেন।'

মামাবাবু অবাক হয়ে তাকাতেই মিঃ সোম অবার হেসে বললেন, 'আশা করি অবশ্য আলো জ্বালবার দরকার কখনও হবে না।'

দশ

বাগ-নাগের অফিসে দুই অংশীদারে ঠোকাঠুকি লেগেই আছে।

সেদিন সকালেও তার ব্যতিক্রম ছিল না।

এমনিতেই নাগ একবার হাঁচলে, বাগ দুবার অন্তত কেশে তার প্রাধান্য জাহির করে, এবং নাগ আবার তার ওপর টেক্কা দেওয়ার অন্য ফিকির খোঁজে।

সেদিন রেষারেষিটা সুরু চিঠি লেখানো নিয়ে।

মিস গুপ্তা নিজের মনে কাজ করে যাচ্ছেন। নাগ-বাগ দুজনে মুখোমুখি দুই টেবিলে বসে খাতাপত্র দেখার মাঝে এক-একবার পরস্পরের দিকে সতর্ক দৃষ্টি হানছে।

এরই মধ্যে বাগ হঠাৎ উঠে পড়ে মিস গুপ্তার টেবিলের কাছে গিয়ে ডাক দিলে। মিস গুপ্তা!'

আর তারপর রক্ষে আছে। নাগও তৎক্ষণাৎ টেবিল থেকে উঠে এসে মিস গুপ্তার অন্যপাশে দাঁড়িয়ে হাঁকলে, 'মিস গুপ্তা!'

মিস গুপ্তা কার দিকে ফিরবেন!

তবু একবার এদিকে একবার ওদিকে মুখ ফিরিয়ে দুই মনিবের মর্যাদা রাখলেন।

নাগের দিকে এবার বিষদৃষ্টি হেনে বাগ হুকুম করলে, 'একটা চিঠির ডিক্টেশন নিন তো–

'To

Messrs. Roy & Roy,

solicitors.'

বাগকে আর এগুতে হল না। নাগ মিস গুপ্তার টেবিলে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে বললে, 'আমার চিঠিটা নিন তো—

To

Baker & Sons Limited.'

এ-বেয়াদবির উত্তরে বাগ জলদ-গম্ভীরস্বরে জানালে, 'আগে আমার চিঠি ধরুন ঃ

Dear Sirs,

We thank you heartily for the. satisfactory way...'

নাগও তখন শুরু করে দিয়েছে—

'Dear sirs,

We regret very much to inform you that your'

'মিস গুপ্তা!' বাগ হুঙ্কার দিয়ে উঠল, 'আপনাকে যদি কেউ বিরক্ত করে, তাহলে তাকে বলে দিন যে এটা কাজ করবার অফিস, ছেলেখেলার জায়গা নয়।'

নাগও ছেড়ে কথা বলবার পাত্র নয়। তাচ্ছিল্য-ভরে জানিয়ে দিল তৎক্ষণাৎ, 'মিস গুপ্তা! বাজে কথায় কান না দিয়ে নিজের কাজ করে যান। পড়ুন কী লিখেছেন,'

মিস গুপ্তা অগত্যা যা লিখেছেন, পড়লেন,

'To

Messrs Roy & Baker Limited.

Dears Sirs,

We regret to thank you heartily for...'

চিঠি শুনে বাগ-নাগ দুজনেরই চোখ কপালে উঠেছে তখন। বাগের সমস্ত রাগ এবার পড়ল নাগের ওপর। এতক্ষণ মধ্যস্থ মারফত কথা চলছিল, এবার একেবারে সরাসরি আক্রমণ।

'দেখো নাগ তোমায় আমি শেষ কথা বলে দিচ্ছি...'

নাগও তখন কোমর বেঁধে তৈরি, 'তুমি শেষ কথা বলবে কী আমি গোড়ার কথা বলছি...'

লড়াইটা কতদূর পর্যন্ত গড়াত বলা যায় না, কিন্তু একমুহূর্তে যেন ভোজবাজিতে দুজনের মুখের চেহারা একেবারে বদলে গেল।

ওধারের দরজা দিয়ে কে একজন নতুন মক্কেল ঢুকছেন। তাই এই আশ্চর্য রূপান্তর।

'আসুন, আসুন, বসুন।' দুজনে একেবারে আপ্যায়নে গদগদ হয়ে উঠল।

আগন্তুক ভদ্রলোকটি ধীরে-ধীরে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারিদিকে চাইতে-চাইতে চেয়ারে এসে বসলেন। সাদর সম্ভাষণে কোনও ত্রুটি না হলেও বাগ-নাগের মুখের গদগদ ভাবেব ওপর একটা কীসের ছায়া তখন পড়েছে।

অনেক মক্কেল, ব্যবসা করা অবধি তারা চরিয়েছে, কিন্তু এরকম একটা লোক তাদের মতো ঝানু-কারবারির চোখেও কখনও পড়েছে কিনা সন্দেহ।

ভদ্রলোকের চেহারা যে কুৎসিত ভয়াবহ কিছু, তা নয়। কিন্তু চেহারা-চালচলন-ভঙ্গি সবকিছু মিলে কেমন একটা অস্বস্তি জাগায়। কী একটা থমথমে আবহাওয়া তিনি যেন সঙ্গে করে নিয়ে ফিরেছেন।

ধীরে-ধীরে একবার বাগ ও একবার নাগকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যেন ওজন করে নিয়ে ভদ্রলোক গম্ভীর ভাবে ধীরে-ধীরে বললেন, 'খবরের কাগজে আপনাদের বিজ্ঞাপন দেখে এলাম। একটা বাড়ির খোঁজ আমায় দিতে পারেন?'

ভেতরে যত অস্বস্তিই হোক ব্যবসাদারীতে বাগ-নাগের কোন ত্রুটি নেই।

তৎক্ষণাৎ তাদের তরজা শুরু হয়ে গেল।

'একটা বাড়ির খোঁজ!' বাগ যেন দুঃখিত। 'একটা কী বলছেন, দশ-বিশ-পঞ্চাশ, একশোটা বাড়ির খোঁজ নিন না।'

'আর বাড়ি শুধু!' নাগ তার পালা শুরু করলে, 'পুকুর-বাগান, ক্ষেত-খামার, জলা-জঙ্গল কীসের খোঁজ না দিতে পারি!'

'ওসব দরকার হবে না।' ভদ্রলোক একটি কথায় তাদের থামিয়ে দিলেন। 'আমি শুধু একটি বিশেষ বাড়ির খোঁজ করতে এসেছি।'

পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে বাগের হাতে দিয়ে তিনি বললেন, 'এই হল তার বিবরণ আর ঠিকনা।'

ঠিকানাটা পড়ে বাগ-নাগের চোখ কপালে উঠল।

'আপনি এই বাড়িটার খোঁজ করছেন!' করুণ স্বরে বাগ জিজ্ঞাসা করলে।

'হ্যাঁ, বাড়িটা বিক্রি আছে কিনা আর কার কাছে কী দামে পাওয়া যেতে পারে জানতে পারলে সুখী হব।'

'পারবেন। পারবেন। সব জানতে পারবেন।' মক্কেল হাতছাড়া করতে নাগ রাজি নয়, 'শুধু একটা দিন আমাদের সময় দিতে হবে। সব খবর আপনাকে আমরা জানিয়ে দিচ্ছি তারপর।'

'বেশ একদিন বাদেই আসব।' ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কারটুকু পর্যন্ত না করে বেরিয়ে গেলেন।

বাগ-নাগ তারপরও খানিক থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ঘরের থমথমে আবহাওয়াটা যেন এখনও কাটেনি। নিজেদের একটু সামলে নেওয়ার পরই আবার তাদের নিজস্ব রূপ দেখা গেল।

মিস গুপ্তার টেবিলের কাছে ফিরে গিয়ে বাগ গম্ভীরভাবে আদেশ করলে, 'শুনুন,

মিস গুপ্তা! মিঃ নাগকে জানিয়ে দিন যে কাল সকালে এই বাড়ি দেখতে যাওয়ার জন্যে তিনি যেন প্রস্তুত থাকেন।'

মিস গুপ্তা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন।

কিন্তু শেষ কথা নাগের বলা চাই। বাগের দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টি হেনে মুখ ফিরিয়ে সেও জানিয়ে দিলে, 'মিস গুপ্তা, আপনি মিঃ বাগকেও বলে দিন যে একথা আমায় না জানালেও চলত। আমি অপ্রস্তুত নই।'

মিস গুপ্তা ক্লান্তভাবে বললেন, 'যে আজ্ঞে।'

এগারো

বাগ এবং নাগ তারপর দিন যশোর রোডের সেই পোড়ো বাড়িতে সকাল বেলা ঠিক গিয়ে হাজির।

মামাবাবুর অভ্যর্থনাটা কিন্তু খুব সাদর বলে মনে হয় না।

'আসুন! আসুন!' বলে তিনি ভেতরে দুজনকে ডেকে নিয়ে আসেন, কিন্তু সেইসঙ্গে যে কথাগুলি বলেন, তা বিশেষ মধুব নয়।

'আপনারা নিজে থেকে খোঁজ নিতে আসবেন, এ তো ভাবতেই পারিনি মশাই। যে বাড়ি গছিয়ে দিয়েছিলেন, তাতে এখনও টিকে আছি কিনা দেখতে এসেছেন বোধহয়!'

বাগ খোঁচাটা গায়েই মাখে না। ব্যাপারটা যেন মধুর পরিহাস এমনই ভাবে বলে, 'সে কি কথা! টিকে থাকবেন না কী!'

'এ তো চমৎকার বাড়ি!' নাগ তৎক্ষণাৎ ফোড়ন দেয়।

'হ্যাঁ, চমৎকার!' মামাবাবু ধমকে ওঠেন।

নমিতা সেইখান দিয়েই তখন যাচ্ছিল। হঠাৎ তাকে ডেকে মামাবাবু এমন একটা কথা বলে বসেন যে বাগ-নাগ সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে।

'যা তো মা নমিতা। বাড়ির ওই মহলটা এঁদের একবার দেখিয়ে নিয়ে আয় তো, সেদিন রাত্রে শ্রীমন্তবাবু যেখানে মরতে বসেছিলেন।'

'মরতে বসেছিলেন!' বাগ এবং নাগ পরস্পরের দিকে কাতর ভাবে একবার তাকায়।

'না না দেখবার আর কী আছে!' বাগ তাচ্ছিল্যের ভান করে কথাটা কাটাবার চেষ্টা করে।

'হ্যাঁ, আমাদের আর দেখবার দরকার হয় না।' নাগ যেন এসব ব্যাপারে উদাসীন।

'আর দেখবার সময় তো যথেষ্ট আছে!' বাগ বাইরের দরজার দিকেই পা বাড়ায়। কিন্তু মামাবাবুর ধমকে তাকে থমকে দাঁড়াতে হয়।

'যাচ্ছেন কোথায়! যান এখুনি একবার দেখে আসুন!'

মামাবাবুর গলার স্বরটা এমন, যে অমান্য করতে সাহসে কুলোয় না।

বাগ করুণ ভাবে জিজ্ঞাসা করে, 'এখুনি যেতে হবে, বলছেন?'

'হ্যাঁ, তাই বলছি।' মামাবাবু একেবারে অটল।

'বেশ যাচ্ছি। এসো হে নাগ।' এখন নাগকেই এগিয়ে দেওয়ার উৎসাহটা বাগের খুব বেশি।

'হ্যাঁ-হ্যাঁ চল না।' নাগ এ-সম্মানে কিন্তু রাজি নয়।

কে আগে যাবে তাই নিয়ে দু-চারবার গড়িমসি করে শেষ পর্যন্ত নমিতার সঙ্গে যাওয়া

ছাড়া তাদের উপায় থাকে না।

পেছনের মহলে ঢোকবার পর চারিদিকে একবার তাকিয়ে দুজনেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

নমিতা বলে, 'কই চলুন। এই তো সে জায়গা।'

এ যে কী জায়গা তা আর তাদের তখন বুঝতে বাকি নেই।

'যাও না নাগ। গিয়ে দেখে এসো না!' এসব ছোট কাজ যেন তার উপযুক্ত নয় বাগ এবার এইরকম একটা ভাব দেখায়।

কিন্তু নাগ তাতে ভোলবার পাত্র নয়।

'আমি দেখে আসব! কেন? তুমি যাও না! তুমি না Senior partner, সব কিছুতে তুমি আগে! যাও এবার Senior partner!'

এ-খোঁচা সহ্য করতে বাগ প্রস্তুত নয়। গম্ভীর হয়ে বলে, 'Senior partner তো নিশ্চয়ই! Senior হিসেবে আমি তোমায় order করছি। যাও দেখে এসো।'

জবাবটার জন্যে দু-সেকেন্ড নাগকে ভাবতে হয়। তারপর সে সগর্বে বলে, 'তোমার অর্ডার আমি Cancel করলাম।'

'Cancel করে দিলে!' বাগ একটু বিপদেই পড়ে। তারপর হঠাৎ রাস্তা খুঁজে পেয়ে সদম্ভে জানায়, 'আমি অর্ডার আবার Re-Issue করলাম। এইবার!'

'কী করলে?' নাগ ঠিক থই পায় না।

'Re-Issue করলাম!' বাগ অবজ্ঞা মিশ্রিত করুণার সঙ্গে নাগকে বুঝিয়ে দেয়, 'ও তুমি তো আবার ইংরেজি জানো না। Re-Issue করলাম মানে আমার হুকুম আবার চালু করলাম।'

এদের কাণ্ডকারখানা দেখে নমিতার পক্ষে হাসি চেপে রাখাই কঠিন। তবু সে বিরক্তির ভান করে বলে, 'আপনারা ঝগড়া করবেন, না জায়গাটা দেখবেন?'

'না না, দেখতে হবে বইকী!' লজ্জা পেয়ে বাগ এবার সাহস দেখায়, 'আমি কি ওই নাগের মতো ভয় কাতুরে নাকি?'

বীরবিক্রমে বাগ কয়েক পা এগিয়ে যায়। কিন্তু ওই পর্যন্তই।

'Good Morning!'

হঠাৎ কোথা থেকে যেন অশরীরী সম্ভাষণ শুনে বাগ একেবারে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। ঠিক তার পেছনেই বিস্ময়ে মুখব্যাদান করে নাগ।

'Good Morning বললে কে?' বাগ সভয়ে জিজ্ঞাসা করে।

নাগ শুষ্ক মুখে স্বীকার করে, 'আমি বলিনি।'

'তুমি বলোনি তা জানি। তুমি কী ইংরিজি জানো! কিন্তু বললে কে?' বাগ সতর্ক ভাবে চারিদিকে তাকাতে গিয়ে আবার চমকে ওঠে।

কিছুদূরের একটা খিলানের পেছন থেকে কীরকম একটা অদ্ভুত শব্দ শোনা যাচ্ছে।

এক মুহূর্তে হুলুস্থুল বেধে যায়।

'ও বাবা, আমি পালাই।' বলে নমিতা বাড়ির ভেতরে ছুট দেয়। তার পেছু নিতে গিয়ে, বোধহয় বেশি নিরাপদ বুঝে নাগ এসে দু-হাত দিয়ে বাগের বিপুল দেহটি জড়িয়ে ধরে।

'এসব কী!'

বাগ নিজেই তখন ভয়ে দিশেহারা। রেগে উঠে নাগের হাত দুটো সবলে ছাড়িয়ে দেয়।

খিলানের পেছন থেকে, সমস্ত গন্ডগোলের যে মূল, তাকে এবার বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। বলাবাহুল্য সে ভিখিরিসাহেব স্বয়ং।

খানিক আগে 'Good Morning!' বলে সম্ভাষণ করে সে একটু আরাম করে, আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলেছিল বলেই এত লন্ডভন্ড ব্যাপার।

ঝোলাটি কাঁধে নিয়ে গুহার মতো খিলানের তলা থেকে বেরিয়ে এসে ভাঙা দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সে আঙুল নেড়ে বাগ-নাগকে কাছে যেতে ইশারা করে।

বাগ-নাগের অবস্থা তখন কাহিল।

নাগকে ঠেলা দিয়ে বাগ বলে, 'যাও না, তোমায় ডাকছে।'

'আমায় ডাকছ কেন, তোমাকে ডাকছে!' বাগকে সম্মানটা দিতে নাগের আর বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই।

'Come here, both of you!' ভিখিরিসাহেব গোলযোগ মিটিয়ে দেয়।

কিন্তু সাহস পাওয়ার বদলে তাতে বুঝি হিতে বিপরীত হয়।

'ইংরিজি বলে যে!' বাগ সভয়ে নাগের কাছেই বিস্ময়টা প্রকাশ করে।

'বোধহয় সাহেব ভূত!' নাগ সিদ্ধান্তটা জানায়।

'No, No, I am no ghost!' ভিখিরিসাহেব নিজেই এবার তাদের কাছে এগিয়ে আসে।

ভয়ে-ভয়ে দু-পা পিছিয়ে গিয়ে বাগ এবার নাগকেই অনুরোধ করে, 'বলে দাও না আমাদের এখন আলাপ করবার সময় নেই।'

'আমি কী বলব। আমি কি ইংরিজি জানি। তুমি তো senior partner, এবার তুমি বলো।'

একথায় বাগের বুঝি আত্মসম্মানে ঘা লাগে। সাহস করে দাঁড়িয়ে পড়ে মরি কি বাঁচি করে সে বলে ফেলে, 'এই... মানে, Who are you?'

'Don't you know me!' ভিখিরিসাহেব যেন অবাক।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো বাগ-নাগের তখন আর নড়বার ক্ষমতা নেই। তাদের একেবারে কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ভিখিরিসাহেব প্রায় চুপি-চুপি বলে, 'I am a retired Major general!'

তারপর হঠাৎ ডান হাতটা বাড়িয়ে ভিক্ষে 'Give me something!'

নাগ হতভম্ব হয়ে বাগকে জিজ্ঞাসা করে, 'কী চায় কী?'

'পয়সা চায় বোধহয়।'

'নেহি, নেহি, পয়সা নেহি।' ভিখিরিসাহেব রীতিমতো চটে যায়। 'Give me a rupee!'

'হল আপনাদের বাড়ি দেখা!' দূর থেকে মামাবাবুর গলা শুনেই ভিখিরিসাহেব তাড়াতাড়ি হাত গুটিয়ে নেয়।

মামাবাবু কাছে এসে তাকে সেখানে দেখে একেবারে জ্বলে ওঠেন, 'এই, ফের তুমি এখানে এসেছ!'

ভিখিরিসাহেবের চেহারা তখন একেবারে বদলে গেছে। কাতরভাবে সে জানায়

'একঠো রূপয়া মাঙতা।'

'না, না, রূপয়া টুপয়া এখানে হবে না!' মামাবাবু ধমকে ওঠেন। 'দারোগাসাহেব না তোমাকে বারণ করে দিয়েছিলেন এখানে আসতে। যাও। আভি যাও। খবর দেব, দারোগা সাহেবকে!'

দারোগার নামে ভিখিরিসাহেব হঠাৎ যেন খাপ্পা হয়ে ওঠে, 'ওঃ বড়া দারোগাসাব আয়া!'

সকলের দিকে উদ্ধত দৃষ্টি হেনে সে চলে যাওয়ার পর মামাবাবু বাগ-নাগের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করেন, 'কী বাড়ি আমায় গছিয়েছেন দেখতে পাচ্ছেন!'

বাগ-নাগ তৎক্ষণাৎ আবার স্বমূর্তি ধারণ করে।

'পাচ্ছি না আবার! চমৎকার বাড়ি।' বাগ প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে।

'কী আলো!' নাগ শুরু করে।

'কী হাওয়া!' বাগ বাড়িয়ে যায়।

'কী অঢেল জায়গা!' নাগ একেবারে গদগদ।

'কী বড়-বড় ঘর!' বাগ মুগ্ধ।

'রাখুন মশাই।' মামাবাবু তাদের নামতা থামিয়ে উষ্ণস্বরে বলেন, 'এত ভালো যদি বাড়ি হয় তো খদ্দেরের ভাবনা না আপনাদের!'

'না, ভাবনা আবার কীসের? কী বলো নাগ?'

'হ্যাঁ, এ-বাড়ি বিক্রির আবার ভাবনা।' নাগের কথায় মনে হয় রাস্তায় এরই মধ্যে এ-বাড়ির খদ্দেররা যেন সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে।

আধ ঘণ্টাটাক বাদে সিঁড়ির নিচের হলের একটি টেবিলের দু-ধারে দুটি চেয়ারে, বাগ ও নাগকে অত্যন্ত মনমরা ভাবে বসে থাকতে দেখা যায়।

অনেকক্ষণ ধরে উসখুস করে নাগ শেষ পর্যন্ত বাগকেই প্রশ্নটা না করে পারে না, 'আচ্ছা আমাদের বসতে বলে গেল কেন, বল তো?'

'কেন বুঝতে পারলে না!' বাগ অবজ্ঞা ভরে তার দিকে তাকায়।

নাগ কিন্তু সেটা গ্রাহ্য না করে উৎসাহিত হয়ে ওঠে, 'বোধহয় না খাইয়ে দাইয়ে ছাড়বে না, না?'

'হ্যাঁ খাওয়ার ব্যবস্থাই হচ্ছে। বাড়ি পেয়ে যা খুশি হয়েছে একেবারে উত্তম-মধ্যম না খাইয়ে ছাড়বে না।'

'উত্তম-মধ্যম খাওয়াবে!' নাগ রীতিমতো উল্লসিত হয়ে ওঠে। তারপর লোভ যে তার বেশি নেই তার প্রমাণ দিয়ে বলে, 'আমার মধ্যম হলেই চলবে!'

'মধ্যম হলেই চলবে!' বাগ এবার খিঁচিয়ে ওঠে, 'আহাম্মক কোথাকার! উত্তম-মধ্যম মানে জানো? উত্তম-মধ্যম মানে, প্রহার...প্রহার, যাকে বলে মার!'

'অ্যাঁ!' নাগ একেবারে আঁৎকে ওঠে, 'মারধোর দেবে নাকি? আমি তাহলে নেই।'

তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে সে বাইরের দরজার দিকে পা বাড়ায়। বাগও তাকে অনুসরণ করাই যুক্তিযুক্ত মনে করে! কিন্তু পলায়নের সুযোগ তাদের মেলে না।

'ওকি চলে যাচ্ছেন যে!'

সিঁড়ির ওপর থেকে হাঁক দিয়ে মামাবাবু নিচে নেমে আসেন।

'না না, যাব কেন?' বাগ কথাটা উড়িয়েই দেয়।

নাগ তাকে সমর্থন করে জানায়, 'এই একটু পা-দুটো ছাড়িয়ে নিচ্ছি।'

'কে একজন বাবু বাইরে ডাকছে গো মামাবাবু, বলছে বাড়ি দেখতে এসেছে।' খবরটা দিয়ে সে বাড়ির ভেতর চলে যায়।

মামাবাবুকে আর খোঁজ নিতে বাইরে যেতে হয় না। বাড়ি দেখতে যিনি এসেছেন তিনি দরজাতেই এসে দাঁড়ান।

মামাবাবুর কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত হলেও বাগ-নাগ তাঁকে দেখেই চিনতে পারে। ইনিই সেদিন তাদের অফিসে এ-বাড়ির খোঁজ নিতে গিয়েছিলেন।

'আসুন! আসুন!' বলে অভ্যর্থনা করে বাগ-নাগ তাঁকে ভেতরে নিয়ে আসে।

'আপনাদের অফিসে গেছলাম!' ভদ্রলোক কৈফিয়ত স্বরূপ জানান, 'শুনলাম আপনারা এখানেই এসেছেন। তাই বাড়িটা একবার নিজেই দেখতে এলাম।'

'বেশ করেছেন। নিজের চোখে না দেখলে কী আর দেখা!' বাগ তাঁকে সমর্থন করে। তারপর মামাবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলে, 'এই ইনিই, বাড়িটা কেনবার জন্যে একবার দেখতে চান।'

মামাবাবু কিছু বলবার আগেই ভদ্রলোক নিজে থেকে বলেন, 'তার আগে অবশ্য বাড়িটা আপনি বেচতে রাজি আছেন কিনা জানা দরকার।'

'রাজি কি আব সহজে হতে চান।' বাগ মামাবাবুকে কথা বলাবই অবসর দেয় না।

'এ-বাড়ি পেলে কি কেউ ছাড়ে!' নাগ বাড়ির দর বাড়ায়।

'অনেক কষ্টে রাজি করিয়েছি।' অসাধ্যসাধন যেন করেছে বাগের ভাবটা এমনই।

ভদ্রলোক অবিচলিত ভাবে বলেন, 'তাহলে বাড়িটা আমি একটু ঘুরে দেখতে পারি বোধহয়।'

'পারেন বইকী!' মামাবাবু এতক্ষণে কথা বলবার সুযোগ পান। বাগ-নাগকে উদ্দেশ্য কবে বলেন, 'আপনারাই তাহলে যা দেখাবার দেখিয়ে দিন।'

'আমরা!' বাগ-নাগের খুব উৎসাহ আর দেখা যায় না, কিন্তু মামাবাবুর কথার ওপর কথা কইতে সাহস হয় না।

বাড়ির পোড়ো দিকটায় ধ্বসে পড়া একটা ঘরের ভাঙা খিলানের নিচে গুহার মতো একটা আধা অন্ধকার জায়গা।

মামাবাবু ও ইনস্পেক্টরের বারণ সত্ত্বেও দেখা যায় ভিখিরি সাহেব তার সেই আস্তানাটি ছাড়েনি।

ঝোলাটি একধারে সরিয়ে রেখে দেয়ালে হেলান দিয়ে অর্ধশায়িত অবস্থায় আপাতত সে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে একটি আধপোড়া সিগারেটের ধুম পানে মত্ত।

হঠাৎ কী একটা শব্দে সে কান খাড়া করে উঠে বসে। তারপর তাড়াতাড়ি সিগারেটটা নিভিয়ে ফেলে হাত নেড়ে ধোঁয়াটা উড়িয়ে দিয়ে সর্তকভাবে খিলানের পাশ দিয়ে বাইরে তাকায়।

শুনতে ভুল তার হয়নি।

যিনি বাড়ি কিনতে চেয়েছেন, সেই ভদ্রলোককেই পেছনের ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে সাবধানে নেমে আসতে দেখা যায়।

নিচে নেমে এসে এদিক-ওদিক সতর্কভাবে তাকিয়ে তিনি এবার যা করেন তা কিন্তু বেশ একটু অস্বাভাবিক।

পকেট থেকে একটা গোটানো ফিতে বার করে তিনি হঠাৎ সিঁড়ির নিচের একটি জায়গা মাপতে শুরু করেন।

খানিকটা মাপবার পরই কিন্তু তাড়াতাড়ি তাঁকে ফিতে গুটিয়ে নিতে দেখা যায়। ভেতর দিক থেকে আবার কাদের পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

পায়ের শব্দ অবশ্য বাগ-নাগ ও মামাবাবুর। তাঁরা কাছে এসে পৌঁছোবার আগেই ভদ্রলোক ফিতেটা গুটিয়ে পকেটে ভরে ফেলেন।

মামাবাবু কাছে এসে একটু বিস্মিতভাবেই জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি এদিকে এসেছেন! আর আমরা খুঁজে না পেয়ে ভাবছি হঠাৎ গেলেন কোথায়!'

মামাবাবুর কথায় বোঝা যায় ভদ্রলোক কোন সময়ে এদিকে চলে এসেছেন কেউ জানতে পারেনি।

ভদ্রলোক কিন্তু ব্যাপারটাকে অন্যভাবে বুঝিয়ে দেন। ববং উলটো অভিযোগ করে বলেন, 'আপনারা তো শুধু ভালো দিকটাই দেখাচ্ছিলেন, তাই ভাবলাম এদিকটাও একবার দেখা দরকার!'

'দেখবেন বইকী!' বাগ তাঁকে সোৎসাহে সমর্থন করে, 'বাড়ি কিনতে হলে সব দিকই দেখা দরকার।'

মামাবাবু জিজ্ঞাসা করেন, 'পছন্দ হল বাড়ি?'

ভদ্রলোককে আর মুখ খুলতে হয় না। বাগ-নাগের নামতা শুরু হয়ে যায়, 'হবে না পছন্দ!'

'কী মজবুত সেকেলে ভিত!'

'কী তখনকার খাঁটি মশলা!'

'একটু মেরামত করলে—'

একেবারে রাজপ্রাসাদ!'

'অথচ একেবারে জলের দর! জলের দর!'

দম নেওয়ার জন্যেই বাগ-নাগকে বোধহয় থামতে হয়। ভদ্রলোক এইবার বলেন, 'বাড়িটার কী একটু বদনাম আছে শুনেছি!'

'বদনাম!' বাগ একেবারে আকাশ থেকে পড়ে, 'বাড়ির আবার নামই বা কী, আর বদনামই বা কী?'

নাগও তার সঙ্গে যোগ দেয়, 'বাড়ি কি চুরি-চামারি করে না ঘুষ খায়!'

'তবু আমার আর একটু খোঁজ খবর নিতে হবে।' ভদ্রলোক জানান।

'বেশ তো নিন না, খোঁজ খবর।' ভেতরে ফিরে যেতে-যেতে মামাবাবু বলেন, 'পছন্দ না হলে বাড়ি আপনি নেবেন কেন?'

ভিখিরিসাহেব লুকিয়ে-লুকিয়ে এতক্ষণ সবকিছুই দেখেছে ও শুনেছে। সকলে চলে যাওয়ার পর খিলেনের তলা থেকে সন্তর্পণে বেরিয়ে এসে সে ভেতরে যাওয়ার গলিপথটার দিকে তাকিয়ে কী যেন মনে-মনে জল্পনা করে।

হঠাৎ কাঁধের ওপর একটা চাপড় পড়ায় সে চমকে ফিরে তাকিয়ে একেবারে যেন বেসামাল হয়ে পড়ে।

তার সামনে দাঁড়িয়ে সকৌতুক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে শ্রীমন্ত হাসছে।

'কী, দেখছ কী লুকিয়ে-লুকিয়ে?' শ্রীমন্ত হেসে জিজ্ঞাসা করে।

'কুছ নেহি কুছ নেহি। Just standing here' নির্বোধের মতো হেসে ভিখিরিসাহেব তার ধরা পড়ার অস্বস্তিটা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে।

'Just standing here' শ্রীমন্তও হাসতে-হাসতে ভয় দেখিয়ে বলে, 'ডাকব দারোগা সাহেবকে!'

দারোগার নামেই ভিখিরিসাহেবের মুখখানা একেবারে শুকিয়ে যায়।

'No, No, No, Please don't I am a poor beggar!' করুণ ভাবে মিনতি করে ভিখিরিসাহেব ডান হাতটা বাড়িয়ে দেয়, 'Give me something. কালসে কুছ খানে কো নেহি মিলা।'

শ্রীমন্তর মায়া হয় কিনা বলা যায় না, কিন্তু পকেট থেকে কিছু পয়সা বার করে তার হাতে দিয়ে হাসতে-হাসতে বলে, 'তুমি কিন্তু একটি আসল শয়তান!'

শ্রীমন্ত চলে যাওয়ার পর ভিখিরিসাহেব ডান হাতের পয়সাগুলো একটু নাড়াচাড়া করে। তারপর শ্রীমন্তর যাওয়ার পথের দিকে যেভাবে সে তাকায় তাকে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি অন্তত বলা চলে না।

ওদিকে বাগ-নাগের সঙ্গে নবাগত ভদ্রলোক তখন মামাবাবুর কাছে বিদায় নিচ্ছেন।

'আচ্ছা, আমরা তাহলে চলি।' বাগই সকলের হয়ে বলে, 'যা ঠিক হয় আপনাকে পরে জানাব নমস্কার।'

বাইরের দরজার দিকে যেতে-যেতে বাগ-নাগকে কিন্তু থমকে ফিরে তাকাতে হয়। ভদ্রলোক তাদের পিছনেই আসছিলেন। দেখা যায় তিনি হঠাৎ একটা চেয়ার ধরে দাঁড়িয়ে পড়ে কী যন্ত্রণায় একেবারে নুয়ে পড়েছেন।

সকলে তাড়াতাড়ি গিয়ে তাঁকে ধরে চেয়ারটায় বসিয়ে দেয়।

মামাবাবু উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করেন, 'কী হল কী!'

ভদ্রলোক একটু সামলে নিয়ে কুণ্ঠিতভাবে থেমে-থেমে বলেন, 'না, এমন কিছু নয়। আপনাদের বোধহয় আর একটু বিরক্ত করতে হল' মাঝে-মাঝে এরকম আমার হয়। তখন আর উঠতে পারি না।'

যন্ত্রণাটা আবার বোধহয় শুরু হওয়ায় ভদ্রলোক ধুঁকতে থাকেন।

'একটু শোওয়ার ব্যবস্থা করলে ভালো হতো না?' মামাবাবু ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।

'তা হতো!' ভদ্রলোকের সঙ্কোচের কিন্তু আর সীমা নেই, 'কিন্তু আপনাদের ওপর অত্যাচার হয়ে যাচ্ছে।'

'না, না, অত্যাচার কীসের!' মামাবাবু প্রবলভাবে প্রতিবাদ করেন।

ললিতা ওপর থেকে এই ব্যাপার দেখে তখন নেমে এসেছে। মামাবাবু তাকে জয়ন্তর ঘরে ভদ্রলোকের জন্য একটা বিছানার ব্যবস্থা করতে বলেন।

ভদ্রলোক কিন্তু তখনও কুণ্ঠিত। আপত্তি জানিয়ে বলেন, 'কেন মিছিমিছি এত হ্যাঙ্গামা করছেন। আমার কিন্তু বড় সঙ্কোচ হচ্ছে।'

'সঙ্কোচের কিছু নেই।' মামাবাবু আশ্বাস দেন, 'যতক্ষণ না সুস্থ হন আপনি অনায়াসে এখানে থাকতে পারেন।'

ভদ্রলোককে ধরাধরি করে জয়ন্তর ঘরের একটি বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আসবার পর

বাগ-নাগ এবার বেশ একটু হতভম্ব ভাবেই বিদায় নেয়।

বাড়ি বেচার উৎসাহ তাদের বিশেষ আর নেই।

বারো

এ-বাড়িতে প্রথম রাত্রে ভয় পাওয়া সত্ত্বেও প্রতিদিন দুপুরবেলা ললিতা পেছনের মহলের পোড়ো দিকটা একবার করে ঘুরে যায়। এখানকার একটি জায়গা আবার তার খুব পছন্দ। সেখানে একটা বড় ঝাঁকড়া গাছের তলায় খানিকক্ষণ তার বসা চাই-ই।

আজও সে সেখানে এসে বসেছিল। তবে আজ সে জোর করে নমিতাকে সঙ্গে করে এনেছে।

নমিতা খুব স্বচ্ছন্দে সেখানে বসতে কিন্তু পারেনি। খানিক উসখুস করে এদিক-ওদিক চেয়ে সে বললে, 'এ-জায়গাটা কী যে তোমার ভালো লাগে বাপু বুঝি না! ঘরে বুঝি বসবার জায়গা নেই!'

ললিতা একটু হেসে বললে, 'কেন ঘরের চেয়ে এ-জায়গাটা ভালো না? কেমন নিরিবিলি।'

'অত নিরিবিলিতে আমার দরকার নেই!' নমিতা সোজাসুজি স্বীকার করে ফেললে, 'দিনের বেলাতেও এখানে আমার কেমন ভয়-ভয় করে।'

একটু থেমে কী ভেবে নিয়ে সে আবার বললে, 'আচ্ছা তুমি রোজ-রোজ কেন এখানে আস, বলব?'

'কেন বলো তো!' ললিতার চোখে কৌতুকের হাসি।

'তোমার একটু গোয়েন্দা হওয়ার সখ হয়েছে।' নমিতা তার ধারণাটা গম্ভীরভাবে জানিয়ে দিলে, 'তুমি ভাবছ, এ-বাড়ির রহস্যটা তুমিই সবার আগে ধরে ফেলবে!'

'দূর বোকা মেয়ে!' ললিতা হেসে উঠল, 'মেয়েছেলে কখনও গোয়েন্দা হয়!'

'কেন হবে না,' নমিতা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ, 'বুদ্ধি থাকলেই হয়। আর খুব ডিটেকটিভ বই পড়তে হয়।'

গোয়েন্দা হওয়ার উপায়টা অনায়াসে বাতলে দিয়ে নমিতা এবার দিদিকে পরীক্ষা করবার চেষ্টা করলে, 'ডিটেকটিভ গল্পের বদমায়েশদের চেহারা কীরকম হয় বল তো?'

'কী করে জানব!' ললিতা আবার হাসল বদমায়েশদের চেহারা কি একরকম হয়!

'হয়, হয়, তুমি জানো না।' দিদির অজ্ঞতায় নমিতা একটু অসন্তুষ্ট, 'ডিটেকটিভ গল্পের সব বদমায়েশদের দাড়ি থাকে। এক মুখ দাড়ি-গোঁফ।'

ললিতা এবার অবাক হওয়ার ভান করে বললে, 'তাই নাকি!'

তারপর নিজেও যেন গভীর গবেষণায় মেতে উঠল। 'আচ্ছা আমাদের এখানে যারা আসে তাদের কার-কার দাড়ি আছে ভেবে দেখ দিকি!'

দিদির কাছে উৎসাহ পেলে নমিতাকে আর পায় কে।

'তাই তো ভাবছি।' বলে সে তখনই হিসেব করতে বসল, 'শ্রীমন্তবাবুর দাড়ি আছে, ওই সাহেব ভিখিরিটার, আর ওই নতুন যে লোকটি বাড়ি কিনতে এসেছে তার।'

'ওদের মধ্যেই একজন তাহলে নিশ্চয় বদমাস!' ললিতা গম্ভীর ভাবে মত প্রকাশ করে তাকে তারিফ করলে, 'তুই তো ডিটেকটিভ হয়েই গেছিস।'

এ-প্রশংসায় গর্ববোধ করবারই কথা। কিন্তু দিদির ঠোঁটের কোণের হাসিটা হঠাৎ

নমিতার চোখে পড়ে যাওয়ায় ব্যাপারটা সে ধরে ফেললে।

'যাঃ, ঠাট্টা হচ্ছে!' বলে দিদিকে ঠেলা দেওয়ার পর দুজনেই হেসে লুটোপুটি।

হঠাৎ হাসি থামিয়ে নমিতা বললে, 'চুপ করো, চুপ করো! কে যেন ডাকল, না?'

ললিতা অবাক, 'কই কে আবার ডাকল?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ডেকেছে তুমি শুনতে পাওনি।' নমিতা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারিদিকে তাকিয়ে খুঁজতে লাগল।

ললিতা এবার হেসে বললে, 'তাহলে তোকেই বোধহয় ডাকছে।'

'আমায় ডাকবে কেন? তোমাকেই ডাকছে।' নমিতাও দিদিকে ঠাট্টা করতে ছাড়লে না।

'আমায় অমন চুপি-চুপি ডাকবার কেউ নেই।' ললিতা গম্ভীর হওয়ার ভান করে জানালে।

'কেউ নেই? ঠিক করে বলো তো?' নমিতা এবার দিদিকে জ্বালাতন করবার সুবিধে পেয়েছে।

দিদি ধরবার চেষ্টা করতেই সে একটু নাগালের বাইরে পালিয়ে হাসতে লাগল। তার পর দূরে কী একটা লক্ষ করে কাছে এসে বললে, 'কে ডাকছিলেন বুঝেছ দিদি।'

ললিতা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন 'কে?'

'ওই শ্রীমন্তবাবু বোধহয়!'

সত্যিই শ্রীমন্ত পোড়োবাড়ির আর একদিকে এসে ঢুকে চারিদিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবছে। বোঝা গেল ললিতা-নমিতাকে সে এখনও দেখতে পায়নি।

ললিতা ভ্রুকুটি করে বললে, 'আহা শ্রীমন্তবাবু আমায় ডাকতে যাবেন কেন?'

'কেন ডাকতে নেই!' নমিতার মুখে দুষ্টুমির হাসি। হঠাৎ সে আবার বলে উঠল, 'ডাকব শ্রীমন্তবাবুকে?'

'না, না, কী পাগলামি হচ্ছে' ছোট বোনের ছেলেমানুষি থামাতে পারলে ললিতা বাঁচে।

'আহা ডাকি না।' দিদির অনুমতির অপেক্ষা না করেই নমিতা ডেকে বসল, 'শ্রীমন্তবাবু, শ্রীমন্তবাবু!'

সে ডাকে শ্রীমন্ত দূর থেকে এবার দুইবোনকে দেখতে পেল। তারপর কাছে এসে হেসে নমিতাকেই উদ্দেশ্য করে বললে, 'কী নমিতা আজকাল তোমারও সাহস বেড়েছে দেখছি। আগে তো এ-দিকেই আসতে না।'

'এখনও কি আসতে চাই। এই দিদিটার জন্যে আসতে হয়।' নমিতা দিদির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানালে। তারপর দিদির চোখের নীরব শাসন যেন দেখতেই পায়নি এমনিভাবে জিজ্ঞাসা করলে, 'আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করব শ্রীমন্তবাবু!'

'না, এই পাগল মেয়েটার কোনও কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নেই। এখুনি হয়তো শ্রীমন্তবাবু ডাকছিলেন কিনা জিজ্ঞাসা করে বসবে। দারুণ মুশকিলে পড়ে চাপা গলায় ললিতাকে তাই ধমক দিতে হল, 'নমিতা।'

কিন্তু সে ধমক গ্রাহ্য করে কে! নমিতা উঠে পড়ে শ্রীমন্তর কাছে গিয়ে তখন দাঁড়িয়েছে।

ললিতা একেবারে তটস্থ। কিন্তু যে প্রশ্ন নমিতা এবার করে বসল, তাতে ললিতার

পক্ষেও হাসি চাপা কঠিন।

'আচ্ছা আপনি... আপনি' দিদিকে খানিক দারুণ অস্বস্তির মধ্যে ঝুলিয়ে রেখে সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনি দাড়ি রাখেন কেন?'

এমন প্রশ্ন শ্রীমন্তরও বুঝি কল্পনার অতীত।

'তাইতো এ তো বড় কঠিন প্রশ্ন!' শ্রীমন্তকে রীতিমতো ভাবিত মনে হল। অনেক কষ্টে সে যেন উত্তর খুঁজে পেয়ে বললে, 'বোধহয় কামাবার সময় পাই না বলে। তা তোমার যদি আপত্তি থাকে, না হয় কামিয়েই ফেলব।'

'না, না, দাড়িতে আপনাকে বেশ ভালো দেখায়!' নমিতা দাড়ির স্বপক্ষে রায় দিয়ে ফেললে।

শ্রীমন্ত যেন একেবারে উৎফুল্ল।

'তাই নাকি! শুনে কী সাহসই যে পেলাম। হয়তো একদিন দাড়ির চ্যাম্পিয়নই হয়ে যাব।'

তিনজনেই এবার হেসে উঠল।

তেরো

সেই দিন বিকেলের দিকেই মিঃ সোম বাইরের মাঠ দিয়ে পেছনের মহলে ঢুকতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ অবাক হয়ে তিনি থমকে দাঁড়ান।

পোড়োবাড়ির একটা ভাঙা চাতালের কাছে জয়ন্ত গভীবভাবে কী যেন একটা ভাবিতে-ভাবতে পায়চারি করছে। তার চলা-ফেরা ও গভীর তন্ময়তাব ধরনে, ভাবনাটা মতলব আঁটা বলে সন্দেহ করাও খুব অস্বাভাবিক বোধহয় নয়।

খানিক নীরবে দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ করে মিঃ সোম কাছে এসে জয়ন্তকে চমকে দেন।

'কী ভাবছিলেন, জয়ন্তবাবু? কী একটা ব্যাপার যেন বুঝে উঠতে পারছেন না, মনে হচ্ছে!'

জয়ন্ত পায়চারি থামিয়ে চমকেই দাঁড়িয়ে পড়েছিল। এবার গম্ভীরভাবে বলে, 'না, বুঝতে পেরেছি বলেই ভাবছি!'

'বুঝতে পেরেছেন। সেটা কী জানতে পারি?'—মিঃ সোম একটু বিদ্রূপের স্বরেই জিজ্ঞাসা করেন।

'পারেন।' জয়ন্ত বিদ্রুপটা অগ্রাহ্য করে বলে, 'সত্যি কথা বলতে কী আপনারই আগে জানা দরকার।'

একটু থেমে জয়ন্ত গলা নামিয়ে আবার বলে, 'শুনুন মিঃ সোম, আজ রাত্রেই এখানে একটা গুরুতর কিছু ঘটবে বলে আমার বিশ্বাস।'

'আজ রাত্রেই ঘটবে আপনি আগে থাকতে নিশ্চিত করে জানলেন কী করে!' মিঃ সোমের কণ্ঠস্বরে বিদ্রুপের চেয়ে বিস্ময়টাই এবার বেশি।

'কী করে জানলাম তা না-ই এখন জিজ্ঞাসা করলেন। আমার কথাটা শুনে আগে থাকতে সাবধান হওয়াটা তো দোষের নয়!'

'না, তা দোষের নয়!' মিঃ সোম স্বীকার করেন। 'কিন্তু সাবধান হওয়া মানে তো আপনাদেরই ওপর নজর রাখা!' সোম একটু হাসেন।

'হ্যাঁ, আমাদের ওপর!' ভেতরে যাই হোক, বাইরে অবিচলিত থেকে জয়ন্ত জবাব

দেয়, 'কিন্তু আশা করি, শুধু আমার ওপর নয়।'

'আপনার ইঙ্গিতটা বুঝতে পারছি।' সোম খোঁচা দিয়ে বলেন, 'শ্রীমন্তবাবুর ওপর নজর রাখতে বলেছেন তো!'

'না, ঠিক তা বলিনি।' জয়ন্ত কঠিন স্বরে জানায়। 'তবু শ্রীমন্তবাবুর ওপর নজর রাখবেন না কেন? অন্তত আজ রাত্রে রাখা দরকার।'

উদ্ধতভাবে শেষ কথাগুলো বলে জয়ন্ত আর সেখানে দাঁড়ায় না।

মিঃ সোমকে কিন্তু অনেকক্ষণ সেখানে গভীরভাবে কী যেন ভাবতে দেখা যায়।

রাত তখনও খুব বেশি হয়নি। ভুতোর মার কাংস্যকণ্ঠে হঠাৎ বাড়ি সরগরম হয়ে ওঠে।

হাতে এক কাপ চা নিয়ে সে জয়ন্তর ঘরে গিয়েছিল। সেখানে কাউকে দেখতে না পেয়েই তার গজরানি শুরু হয়ে যায়।

যেমন ভুতুড়ে বাড়ি, মানুষজনও কি এখানে তেমনি আসে গা!'

মামাবাবু ব্যস্ত হয়ে ওপর থেকে নেমে এসে বিরক্ত হয়ে বলেন, 'চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করছ কেন? কী, হয়েছে কী!'

'হবে আবার কী: আমায় মিছিমিছি হায়রানি!' ভুতোর মার গজরানি থামে না, 'ওই যে তোমাদেব নতুন কে ভদ্দরনোক এসেছে গো বাড়ি কিনতে, এই রাত্তিরে তাঁর হুকুম হল এক কাপ চা চাই। চা নিয়ে এসে দেখি, ঘরেই নেই।'

'ঘরেই নেই।' মামাবাবু সত্যি অবাক হয়ে যান। 'ভদ্দরলোক যে অসুখ বলে আজ এখান থেকে যেতে পারলেন না! তাঁর তো ঘরে শুয়ে থাকবার কথা।'

'তবে আর বলছি কী!' ভুতোর মা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে।

'জয়ন্ত কোথায়! সে ঘরে নেই?' মামাবাবু জিজ্ঞাসা করেন।

'তিনি আবার ঘরে থাকে কখন!' ভুতোর মা খেঁকিয়ে ওঠে। 'সেই সন্ধের সময় বেরিয়ে গেছে।'

মামাবাবু অত্যন্ত চিন্তিত ভাবে বলেন, 'তাইতো। ভদ্রলোক গেলেন কোথায় এমন সময়ে!'

'মামাবাবু!' হঠাৎ ওপর থেকে ললিতার ডাক শোনা যায়।

দ্রুতপদে তার নামার ধরন দেখেই একটা গুরুতর কিছু ঘটেছে বলে মামাবাবু আশঙ্কা করেন।

মামাবাবুর আশঙ্কা যে অমূলক নয় ললিতার কথায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

কাছে এসে উত্তেজিতভাবে এক নিশ্বাসে সে বলে যায়, 'ওদিকের বারান্দা দিয়ে আসছিলাম, পেছনের দিকের বাগানে কাদের যেন কথা শুনলাম। কে একজন তারপর হঠাৎ চিৎকার করে উঠল। নমিতাও শুনেছে!'

মামাবাবু যেন দিশেহারা হয়ে পড়েন।

'এ তো বড় মুশকিলে পড়া গেল দেখছি। চল দেখি।' বলে ললিতাকে নিয়ে তিনি উপরে গেলেন।

কিন্তু যে বারান্দা থেকে ললিতারা পেছনের বাগানের কথাবার্তা ও চিৎকার শুনেছিল সেখান থেকে এমন কিছুই শোনা বা দেখা যায় না। নিস্তব্ধ অন্ধকারে সমস্ত জায়গাটা শুধু

থমথম করছে। মিঃ সোমের নির্দেশের কথাটা এবার মামাবাবুর মনে পড়ে যায়। ওপরের চিলকুঠুরিতে আলো জ্বালবার ব্যবস্থা করতে তিনি ললিতাকে সঙ্গে নিয়ে ভেতরে ফিরে আসেন।

জয়ন্তর ইঙ্গিতের কোনও মূল্য তাঁর কাছে থাক বা না থাক, মিঃ সোম তখন শ্রীমন্তর বাড়ির দিকেই আসছিলেন।

বাড়িতে ঢোকবার আগেই ভেতর থেকে সুমিষ্ট বেহালার আওয়াজ তিনি শুনতে পান। শ্রীমন্ত শুধু ছবি আঁকে না, বেহালার হাতও যে তার আশ্চর্য রকম মধুর, এ-বাজনা শুনে স্বীকার করতেই হয়।

শ্রীমন্তর বাড়ির দরজা পর্যন্ত এসেও ভেতরে ঢোকা সোমের আর হয় না। দরজায় ধাক্কা দিতে গিয়ে হঠাৎ পেছনে তাকিয়ে তিনি থমকে দাঁড়ান।

দূরে মামাবাবুদের বাড়ির চিলকুঠুরি থেকে উজ্জ্বল একটা আলো দেখা যাচ্ছে।

একমুহূর্ত অপেক্ষা না করে সোম সেদিকে ছুটতে শুরু করেন।

সোম যখন গিয়ে পৌঁছোন, মামাবাবু তখন নিচের হলে উদ্বিগ্নভাবে একটি বাতি নিয়ে অপেক্ষা করছেন।

সোমকে দেখে ব্যস্তভাবে তিনি এগিয়ে আসেন।

'আপনার চিলকুঠুরির আলো দেখে এলাম। কী, হয়েছে কী?' সোম উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করেন।

'ব্যাপার এখনও বুঝতে পারছি না।' মামাবাবুর দিশাহারা ভাব এখনও কাটেনি। বিমূঢ় ভাবে তিনি বলে যান 'এক ভদ্রলোক বাড়ি কিনতে এসে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে আজ রাতটা এখানে ছিলেন। তাঁকে ঘরে পাওয়া যাচ্ছে না। ওদিকে বাড়ির পেছনের মহলে আমার ভাগনিরা কাদের যেন কথাবার্তা আর একটা চিৎকার শুনেছে!'

মনোযোগ দিয়ে সব কথা শুনে সোম বলেন, 'জয়ন্তবাবুর কথাই তাহলে ঠিক হল মনে হচ্ছে। আচ্ছা আসুন।'

সোম পেছনের মহলের দিকে এগিয়ে যান। লন্ঠনটা তুলে নিয়ে মামাবাবু তাঁর অনুসরণ করেন।

পেছনের ধ্বসে যাওয়া মহল তো ছোটখাটো জায়গা নয়। তার ওপর একেবারে গাঢ় অন্ধকার। সামান্য লন্ঠনের আলোয় তার কতটুকু দেখা যায়।

খানিক এপাশে-ওপাশে একটু ঘুরে সোম এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'শব্দটা এই দিক থেকেই শোনা গেছল বলছেন!'

'হ্যাঁ, ললিতা-নমিতা তো তাই বললে।' নেহাত অকারণে যে ইন্সপেক্টরকে কষ্ট দিচ্ছেন না তা বোঝাবার জন্যেই মামাবাবু বলেন। 'সেই জন্যেই তো আপনার কথা মতো চিলকুঠুরিতে আলো জ্বাললাম!'

'বাড়ি কিনতে যিনি এসেছিলেন তাঁকে কতক্ষণ দেখতে পাচ্ছেন না?' সোম প্রশ্ন করেন।

'ঠিক বলতে পারছি না। তবে বেশ খানিকক্ষণ হবে। অসুস্থ হয়ে তিনি বিছানা থেকে উঠতে পারছিলেন না। এরই মধ্যে কাউকে কিছু না বলে কখন যে বেরিয়ে গেছেন কেউ জানে না।'

মামাবাবুর কথায় সোম খানিকটা কী যেন ভাবেন, তারপর পকেট থেকে টর্চটা বার করে জ্বেলে দূরের বাগানটার ওপর ফেলেন।

অন্ধকারে টর্চের জোরালো আলোটা এধারে-ওধারে ঘোরাতে-ঘোরাতে হঠাৎ দুজনেই চমকে ওঠেন। যে ভাঙা চাতালের কাছে বিকালে জয়ন্তর সঙ্গে মিঃ সোমের কথা হয়েছিল সেখানে কে যেন একজন বসে আছে।

দুজনে তাড়াতাড়ি সেদিকে এগিয়ে যান। কয়েক পা যেতেই লোকটিকে চেনা যায়। বাড়ি কিনতে যিনি এসেছিলেন সেই ভদ্রলোকই একটা ভাঙা থামে হেলান দিয়ে বসে আছেন।

মামাবাবু কাছে গিয়ে একটু বিরক্তির সঙ্গে বলেন, 'কী মশাই! আপনি এখানে এসে...'

তাঁর মুখের কথা মুখেই থেকে যায়।

সোম ভদ্রলোকের পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে তার পিঠটা একটু ছুঁয়েছিলেন মাত্র, ভদ্রলোকের দেহটা তাইতেই একটা ভারী পাথরের মতো সামনের মেঝের ওপর সশব্দে পড়ে যায়!

'ব্যাপার কী!' টর্চের আলো দেহটার ওপর ধরে সোম গম্ভীর স্বরে বলেন 'He is already dead! পিঠে কে ছুরি মেরেছে!'

পিঠের ওপর ছুরিটা এখনও গেঁথে রয়েছে। রক্ত যা গড়িয়ে পড়েছে তা এখনও ভালো করে জমাট বাঁধেনি। সোম বেশ একটু কষ্ট করে ছুরিটা টেনে বার করে আবার বলেন, 'যে ছুরি মেরেছে সে নিজেও একটু জখম হয়েছে, মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, এই তো রক্তের দাগ!' মামাবাবু লণ্ঠনটা নামিয়ে রক্তের দাগটা বাইরের দিকে যে চলে গেছে তা দেখিয়ে বলেন, 'এই দিক দিয়েই লোকটা পালিয়েছে!'

হঠাৎ মুখ তুলে তাকিয়ে তিনি অবাক হয়ে যান।

'একি জয়ন্ত তুমি!'

বাইরের দিক থেকে জয়ন্তই সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

'হ্যাঁ, আমি একটু বেরিয়েছিলাম। দূর থেকে চিলকোঠার জানলায় আলো দেখে ফিরে এলাম।' বলতে-বলতে কয়েক পা এগিয়ে এসে জয়ন্ত হঠাৎ নিচের দিকে চেয়ে চমকে ওঠে।

'একি!' স্তম্ভিত ভাবে খানিক সেদিকে চেয়ে থেকে সে গম্ভীর ভাবে খানিকটা যেন নিজের মনেই বলে, 'আমি অবশ্য এইরকম একটা ভয়ই করছিলাম।'

পর মুহূর্তে সে-ই মুখ ফিরিয়ে বলে ওঠে, 'আরে শ্রীমন্তবাবু যে!'

শ্রীমন্ত কাছে এসে দাঁড়াবার পর জয়ন্ত অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'আপনি হঠাৎ এখানে এসে হাজির হলেন কী করে!'

'আমি!' শ্রীমন্ত বিস্মিত ভাবে বলে, 'বাঃ আপনিই তো আমায় ডেকে এলেন!'

'আমি ডেকে এলাম! আমি আপনার বাড়ির ত্রিসীমানায় ছিলাম না!' জয়ন্ত তীব্র প্রতিবাদ জানায়।

'তাহলে তো ভারী আশ্চর্য ব্যাপার!' শ্রীমন্ত বিমূঢ় ভাবে বিবরণটা দেয়, 'বাইরে থেকে আমার দরজায় কে ধাক্কা দিলে। কে—জিজ্ঞাসা করাতে বললে, মিঃ সোম এখুনি একবার আমায় এখানে ডাকছেন। গলাটা তো আপনার বলেই আমার মনে হল। দরজা খুলে অবশ্য কাউকে দেখতে পাইনি।'

শ্রীমন্তর কথা শেষ হতে জয়ন্ত তার হাতের দিকে চেয়ে বলে, 'আপনার হাতটা কেটে গেছে দেখছি।'

শ্রীমন্তর ডান হাতে একটা আঙুলে সত্যিই পটি জড়ান। সেটা নিজেই তুলে ধরে সে বলে, 'হ্যাঁ, এইমাত্র দরজাটা তাড়াতাড়ি বন্ধ করতে গিয়ে চিপসে গেল।'

'একটু আগে তাহলে আপনি বাড়িতেই ছিলেন?' জয়ন্ত ঈষৎ অবিশ্বাসের সুরেই প্রশ্ন করে।

সুরটা ধরতে পারলেও শ্রীমন্ত হেসে বলে, 'আপনার কী মনে হয়!'

'এসব প্রশ্নগুলো আমাকেই করতে দিন জয়ন্তবাবু!' সোম এতক্ষণ খুনের ছুরিটা পকেট থেকে একটা রুমাল বার করে সাবধানে তাতে জড়িয়ে রাখছিলেন। সেটা পকেটে রেখে তিনি একটু বিরক্তভাবেই বলেন, 'উনি কোথায় ছিলেন, আমি জানি, কিন্তু আপনি ঠিক কোথায় ছিলেন বলুন তো?'

'আমি!' জয়ন্তকে সামান্য একটু বিব্রত মনে হয়। তারপর সে সহজভাবে বলে, 'বললাম তো একটু বেড়াতে বেরিয়েছিলাম।'

'এই এত রাত্রে!' সোম বিস্ময় প্রকাশ করেন, 'আপনার শখ তো মন্দ নয়।'

এ-প্রসঙ্গ আপাতত স্থগিত রেখে সোম আবাব বলেন, 'আচ্ছা এখন এই লাশটা একটু ভেতরে নিয়ে যেতে হবে। আমায় একটু সাহায্য করুন দেখি।'

জয়ন্ত ও শ্রীমন্ত দুজনেই সোমকে সাহায্য করবার জন্যে এগিয়ে আসে।

লাশটা তোলবার সুবিধের জন্যে ডান হাতের আস্তিনটা একটু গোটাতে গিয়েও জয়ন্ত আবার সেটা টেনে নামিয়ে দেয়। সেইটুকুর মধ্যে তার কব্জির ওপরকার ব্যান্ডেজটা কারুর চোখে পড়ে কিনা বলা যায় না।

চোদ্দো

বাড়ি কিনতে এসে যিনি খুন হয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যুর দু-দিন পরে সিঁড়ির নিচের হলঘরে সেদিন সকালবেলা শ্রীমন্ত, জয়ন্ত, মামাবাবু ও সোম চারজনকেই উপস্থিত দেখা গেল।

মিঃ সোমই সকলকে এখানে আজ ডাকিয়ে এনেছেন। টেবিলের চারিধারে সবাই বসবার পর মিঃ সোম শুরু করেন, 'কেন আপনাদের সকলকে আজ একসঙ্গে ডেকেছি তা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন। এ-বাড়ির রহস্য একটা ছিল, কিন্তু এই ক'দিনের মধ্যেই সত্যিকার একটা খুন হওয়ার পর ব্যাপারটা গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজেদের মধ্যে তাই একটা আলোচনা আমাদের মধ্যে হওয়া দরকার।'

'নিজেদের মধ্যে বলে আমাদের অযথা সম্মান দিচ্ছেন।' জয়ন্ত উদ্ধত ভাবে প্রতিবাদ করে, 'আসল কথা এ-ব্যাপারে যারা জড়িত বলে সন্দেহ করেন তাদের একটু বাজিয়ে দেখতে চান, এই তো?'

'তাই যদি মনে করেন, তাহলে আপনাকেই একটা কথা প্রথম জিজ্ঞাসা করি।' সোমের মুখ কঠিন হয়ে ওঠে। জয়ন্তর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তিনি প্রশ্ন করেন, 'আপনার হাতটা সেদিন কেটেছিল কী করে?'

'আমার হাত!' জয়ন্ত প্রথমটা এ-অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে বেশ একটু বিচলিত হয়েছে মনে হয়। তারপর কঠিন স্বরে বলে, 'না হাত আমার কাটেনি। একটু ছড়ে গিয়েছিল।'

সকলে তবু সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে দেখে সে বুঝিয়ে দিয়ে বলে, 'আগেই তো বলেছি, সেদিন একটা কিছু ঘটতে পারে সন্দেহ করে বাইরে পাহারায় ছিলাম। আপনাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার কিছু আগে একটা লোককে ও-বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে যেতে দেখি।

তাকে ধরবার চেষ্টা করতে গিয়ে পড়ে হাতটা ছড়ে যায়।'

'তাকে ধরতে তাহলে পারেননি!' সোমের মুখে যেন ঈষৎ হাসির আভাস।

'ধরব কী করে!' জয়ন্ত রেগে ওঠে, 'বললাম তো পড়ে গিয়েছিলাম।

প্রসঙ্গটা আপাতত চাপা দিয়ে সোম বলেন, 'যাই হোক, আমার আসল কথা যা ভেবেছেন ঠিক তা নয়। এ-বাড়ির রহস্য ভেদ করবার জন্যে আপনাদের সকলের সাহায্য আমার দরকার। তাই দুটো কথা আপনাদের জানিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। তার প্রথম হল এই যে, যে লোকটি এখানে সেদিন খুন হয়েছে সে এ-বাড়ির প্রথম মালিক শশীশেখরেরই একজন সাকরেদ ছিল বলে জানা গেছে।'

'তাহলে বাড়ি কিনতে আসাটা তার ভান!' মামাবাবু অবাক হয়ে যান।

'হ্যাঁ, আসলে এ-বাড়ির গুপ্তধনের সন্ধানেই সে এসেছিল মনে হচ্ছে।' শ্রীমন্ত তার সন্দেহটা প্রকাশ করায় মিঃ সোম তার কথায় সায় দিয়ে বলেন, 'এবং সেইজন্যেই অসুখের ছল করে রাতটা সে এখানে ছিল।'

'বুঝলাম, এখন দ্বিতীয় কথাটা কী!' অধৈর্যের সঙ্গে জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করে।

'দ্বিতীয় কথাটা এই যে, এ-বাড়ির বিভীষিকা সেই অদ্ভুত জানোয়ারের লোম আমি পরীক্ষা করে আনিয়েছি। তা গরিলা বা সেরকম কোনো প্রাণীর লোম নয়।'

'এ-সংবাদটা সত্যিই বিস্ময়কর।' মামাবাবু খানিকটা আশ্বস্তও বোধ হয় হন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'আমরা এখন কী সাহায্য আপনাকে করতে পারি বলুন।'

'সাহায্য আর কিছু নয়। এখন থেকে আর একটু বেশি সজাগ থাকা।' সোম মামাবাবুকে উদ্দেশ করে এবার একটু লজ্জিতভাবে বলেন, 'তবে আপনার কাছে আমার একটু ক্ষমা চাইবার আছে, আপনাকে নির্ভয় হওয়ার যে আশ্বাস দিয়েছিলাম, তা আমি রাখতে পারিনি। তাই বলছি সুবিধে থাকলে এ-বাড়ি এখন আপনাদের ছেড়ে দেওয়াই ভালো।'

'না, মিঃ সোম।' মামাবাবুর মত একেবারে বদলে গেছে দেখা যায়, 'আমারও এখন জেদ চেপে গেছে। এ-রহস্যের শেষ না দেখে এ-বাড়ি ছাড়ব না।'

নিজের সঙ্কল্পের দৃঢ়তাটা বোঝাবার জন্যেই মামাবাবু টেবিলের উপর সজোরে একটা চাপড় মেরে উঠে দাঁড়ান।

প্রথম রাত্রের সেই 'দানো ভূত' দেখা, আর তারপর সত্যিকার একটা খুনের কথা শোনার পর ভুতোর মা কী অবস্থায় এ-বাড়িতে যে কাজ করছে তা বোঝাবার বোধহয় প্রয়োজন নেই। মুখে যাই বলুক, অন্তরে ললিতা-নমিতার ওপর সত্যিকার একটা মায়া পড়েছে বলেই শুধু সে ছেড়ে যেতে পারে না।

সারাক্ষণ ভয়ে-ভয়েই সে কাটায়, আর এমনই তার কপাল যে, যত বিতিকিচ্ছি ব্যাপার কি সবার আগে তারই চোখে পড়ে!

সেদিন দুপুরবেলা রান্নাঘরের কাজ-টাজ সেরে ওপরে যেতে গিয়ে তাকে একেবারে থ হয়ে দাঁড়াতে হয়।

সেই হতভাগা ভিখিরি সাহেবটা এদিক-ওদিক চেয়ে ঠিক চোরের মতো দোতলা থেকে নামছে!

ভুতোর মা পারতপক্ষে এখনও পেছনের মহলের ধারে কাছে ঘেঁসেনি। তবু রাস্তাঘাটে

এই অদ্ভুত লোকটা তার চোখে পড়েছে। পেছনের পোড়োবাড়ির জঙ্গলে যে তার চোখে পড়েছে। পেছনের পোড়োবাড়ির জঙ্গলে যে তার আস্তানা ললিতার কাছে সেকথাও শুনেছে।

দিন-দুপুরবেলা সেই বিদঘুটে লোকটাকে একেবারে ভেতরের মহল থেকে নামতে দেখে ভুতোর মা প্রথমটা হতভম্ব হয়ে গেলেও পরের মুহূর্তে একেবারে ঝঙ্কার দিয়ে বাড়ি কাঁপিয়ে তোলে।

'ও মা এ কী কাণ্ড গো! এ-হতভাগা একেবারে বাড়ির ভেতর ঢুকেছিল যে। একি আস্পর্ধা গো।'

ভুতোর মার গলা শুনেই ভিখিরিসাহেব চমকে ফিরে দাঁড়ায়। তারপর তাড়াতাড়ি নেমে এসে মধুর হাসিতে ভুতোর মাকে একেবারে জল করে দেওয়ার চেষ্টা করে, 'আরে কাহে চিল্লাতা! আমি তো চলে যাচ্ছে!'

ভুতোর মার কাছ থেকে গোঁত্তা মেরে চলে যেতে গিয়ে কিন্তু হঠাৎ সে বাধা পায়।

'কোথায় চলে যাচ্ছ!' শ্রীমন্তই পেছন থেকে এসে তার পথ আটকে দাঁড়িয়েছে। কঠিন স্বরে সে জিজ্ঞাসা করে, 'বাড়ির ভেতর ঢুকেছিলে কেন?'

'নেহি নেহি,' কাতর ভাবে ভিখিরিসাহেব সাফাই গাইবার চেষ্টা করে, 'I was just passing!'

শ্রীমন্ত এতক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকে লক্ষ্য করছিল। আগের প্রসঙ্গ ছেড়ে দিয়ে সে জিজ্ঞাসা করে, 'হাতটা কাটল কী করে!'

ভিখিরিসাহেবের হাতের দুটো আঙুল সত্যি পটি বাঁধা। এ-প্রশ্নে সে অম্লান বদনে বলে, 'এই সি কট গয়া। Only a scratch! চাকুসে কট গয়া।'

নিচের গোলমাল মামাবাবুরও তখন কানে গেছে। ওপর থেকে নামতে-নামতে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'কী, ব্যাপার কী!'

শ্রীমন্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেয়, 'ব্যাপার গুরুতর! ইনি পিছনের মহল ছেড়ে একেবারে আপনাদের ওপরে গিয়ে হানা দিয়েছিলেন।' তারপর ভিখিরি সাহেবের দিকে ফিরে কড়া গলায় বলে, 'চলো আমিই আজ তোমায় থানায় নিয়ে যাব।'

ভিখিরিসাহেবের হাতটা ধরতেই সে হতভাগা অমন যন্ত্রণায় যে ককিয়ে উঠবে শ্রীমন্ত মোটেই তার জন্যে প্রস্তুত ছিল না। নিজের অজান্তেই সে চমকে উঠে হাতটা ছেড়ে দেয়।

ভিখিরিসাহেব শ্রীমন্তকে ভেংচে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে এক দৌড়ে উধাও।

'পালিয়ে গেল। ধরে রাখতে পারলেন না!' মামাবাবুর আফশোসটাই বেশি।

শ্রীমন্ত হেসে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, 'যাক, কতদিন আর পালিয়ে থাকবে!' তারপর নিজের আসার উদ্দেশ্যটা জানায়, 'শুনুন, আজ আপনাদের সকলকে আমাদের বাড়িতে একটু যেতে হবে। পরিচয় হওয়া অবধি একদিনও তো যাননি। জয়ন্তবাবুর দেখা পেলাম না, তাঁকেও একটু বলে দেবেন। কেমন আসবেন তো সবাই?'

'হ্যাঁ, যাব বইকী! আপনি নিমন্ত্রণ করছেন, আর যাব না।' মামাবাবু সানন্দে সম্মতি জানান।

ছবির সমঝদার সত্যিই কেউ নয়, তবু ললিতা ও জয়ন্তকে নিয়ে ঘুরে-ঘুরে সমস্ত ছবি দেখে মামাবাবু খুশি হলেন।

'বাঃ, চমৎকার!' ছবির তারিফ করে তিনি বললেন, 'কিন্তু এই বনগাঁয়ে আপনার

এই রঙের হাটের কদর কে বুঝবে তাই ভাবছি।'

কারুর প্রশংসার আশায় নয়, শুধু নির্জনে নিজের কাজের সুবিধের জন্যেই এখানে যে সে আছে, শ্রীমন্ত লজ্জিতভাবে সেই কথাটাই বোঝাবার চেষ্টা করছিল। তারই মধ্যে জয়ন্ত বাধা দিয়ে ফোড়ন কাটলে, 'বনগাঁয়ে উনি বোধহয় শেয়াল রাজা হতে চান।'

শ্রীমন্ত একটু হেসে পালটা জবাব দিলে, 'সিংহ হওয়া যাদের ভাগ্যে নেই তাদের শিয়াল রাজা হয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত না কি?'

জয়ন্ত কিছু বলবার আগেই ললিতার সমর্থনসূচক মন্তব্য শোনা গেল, 'হ্যাঁ, অন্যের চামড়া ধার করে সিংহ সাজার চেয়ে শিয়াল রাজা হওয়া বোধহয় ভালো।'

কথার পিঠে একথা ঠিক আসে না। এ যেন নেহাত গায়ে পড়ে গাল দেওয়া তা বুঝলেও জয়ন্ত উত্তর দেওয়ার সুযোগ পেল না। ললিতা খোঁচাটা দিয়েই তখন দূরে সরে গেছে।

'মাপ করবেন একটু।' বলে মামাবাবু ও জয়ন্তর কাছে ক্ষমা চেয়ে শ্রীমন্তও সেদিকে গেল।

ললিতা তখন ছোট বোনের কাছে গিয়ে বসেছে। নমিতা অনেকক্ষণ থেকেই সেখানে একলা একটি সোফায় উদাসীন ভাবে বসে ছিল। সকলের সঙ্গে সেও খানিক ঘুরে-ঘুরে ছবি দেখবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু বিশেষ কিছুই না বুঝে শেষপর্যন্ত দল ছেড়ে চলে এসেছে।

কী নমিতা, তুমি যে একলা চুপ করে বসে আছ!' শ্রীমন্ত নমিতাকেই হেসে জিজ্ঞাসা কবলে, 'তোমার ভালো লাগছে না বুঝি?'

'না বাবা, একসঙ্গে এত ছবি দেখলে আমার মাথা গুলিয়ে যায়।' নমিতা স্পষ্টই স্বীকাব করে ফেললে। শ্রীমন্ত ঠাট্টা কবে বললে, 'শাড়িব দোকানে এক সঙ্গে অনেক শাড়ি দেখলে যেমন হয় না? আচ্ছা তোমার যা ভালো লাগবে এমন জিনিস দেখাচ্ছি চল।'

'আসুন না ললিতাদেবী।' শ্রীমন্ত ললিতাকেও অনুরোধ করলে।

'না, ওকেই নিয়ে যান। আমি · খানেই একটু বসছি।' ললিতার বিশেষ উৎসাহ দেখা গেল না।

'আহা চল না দিদি,' নমিতাই এবার নাছোড়বান্দা। ওবই ভেতর আবার কথার চিমটি কেটে সে বললে, 'আমার ছুতো করে তোমাকেই দেখাতে চাইছেন তা বোঝ না!'

দিদির ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করে হাসতে-হাসতে নমিতা তাকে টেনে নিয়ে চলল।

ছবির ঘরটি পার হয়ে একটা লম্বা করিডর দিয়ে যে ঘবটিতে তারা গিয়ে পৌছল সেটিকে একটি বিরাট হলই বলা উচিত।

হলের চারিদিকে নানান দেশের নানান রকম পাথর ব্রোঞ্জ ও কাঠের মূর্তি নানান ভঙ্গিতে সাজানো।

'দেখ দিকি ছবির চেয়ে এসব ভালো লাগে কি না!' শ্রীমন্ত হেসে নমিতাকে জিজ্ঞাসা করলে।

জিজ্ঞাসা করবার অবশ্য দরকার ছিল না। রংচং-এর হিজিবিজির চেয়ে এসব মূর্তি নমিতার অনেক বেশি মনোমতো।

ঘুরে-ঘুরে এদিক-ওদিক খুশি হয়েই তখন সে দেখছে।

হঠাৎ একটি মূর্তি দেখতে-দেখতে মুখ·ফেরাতে গিয়ে সে যেন আঁতকে চিৎকার করে উঠল, 'কে! ওকে!'

শ্রীমন্ত চমকে তার কাছে ছুটে এল।

'কোথায় কে?' সবিস্ময়ে সে প্রশ্ন করলে।

'সত্যি ওই স্ক্রিনের পিছনে কে যেন সরে গেল মনে হল।' জবাবটা ললিতাই দিলে উত্তেজিত ভাবে। নমিতার সঙ্গে সেও ব্যাপারটা দেখেছে।

'আমি স্পষ্ট দেখেছি। কী ভয়ানক চেহারা!' নমিতা দিদিকে ভীত কণ্ঠে সমর্থন করলে।

'কী হয়েছে কী? কার ভয়ানক চেহারা?' মামাবাবু ও জয়ন্ত পর-পর প্রশ্ন করলেন। এদের পিছনে তাঁরাও এইদিকে আসতে গিয়ে নমিতার চিৎকারটা শুনেছেন।

'বুঝতে পারছি না।' বলে শ্রীমন্ত দূরের দেওয়ালের ধারে স্ক্রিনটার দিকে দ্রুতপদে ছুটে গেল।

স্ক্রিনের এধার থেকে কাউকেই দেখা যাচ্ছে না।

শ্রীমন্ত কড়া গলায় হাঁক দিলে, 'কে? কে ওখানে? বেরিয়ে এসো। বেরিয়ে এসো বলছি।'

কারুর কোনও সাড়াশব্দ কিন্তু পাওয়া গেল না।

এবার শ্রীমন্ত স্ক্রিনের পিছনে দেখতে যাওয়ার উপক্রম করতেই কিন্তু ফল ফলল।

যে লোকটি স্ক্রিনের পিছন থেকে এবার ক্রুদ্ধ মুখে বেবিযে এল তার চেহারা দেখে নমিতার ভয় পাওয়া অবশ্য অস্বাভাবিক নয়। যেমন দীর্ঘ বিশাল তার দেহ, তেমনি অসংখ্য গভীর রেখায় বিকৃত বীভৎস তার মুখের চেহারা।

এই লোকটিকেই এর আগে বাগ নাগের অফিসের সামনে একবার দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছল।

'তুমি।' লোকটিকে দেখে শ্রীমন্ত বিস্মিত শুধু নয়, রাগে একেবারে জ্বলে উঠল। 'কী করছিলে তুমি এখানে! তোমায় না এখানে আসতে আমি বারণ করে দিয়েছি।'

লোকটা তবুও চুপ। শুধু তার হিংস্র চোখগুলোব ভেতর দিয়ে যেন চাপা আগুন বেরুচ্ছে মনে হল।

মামাবাবু ও অন্যান্য সকলেও তখন কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

'আপনার চেনা নাকি?' মামাবাবুই অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ, আগে এ-বাড়ি পাহারা দেওয়ার জন্যে রেখেছিলাম।' শ্রীমন্ত বললে, 'তারপর বেচালের জন্যে তাড়িয়ে দিই।'

লোকটার দিকে ফিরে আবার ক্রুদ্ধ স্বরে সে প্রশ্ন করলে, 'বলো কী করছিলে এখানে?'

'আপনার সঙ্গে দরকার ছিল।' কথা নয় মনে হল যেন বাঘের গলার চাপা গর্জন।

শ্রীমন্ত কিন্তু সে গর্জনও ধমকে দাবিয়ে দিয়ে বললে, 'তাই তোমার এতবড় আস্পর্ধা যে একেবারে বাড়ির ভেতর ঢুকে বসেছিলে! কী দরকার তোমার আমার সঙ্গে?'

লোকটা চাপা রাগে ফুললেও কোনও জবাব দিলে না।

'মাইনে?' শ্রীমন্ত নিজেই তার বক্তব্য অনুমান করে জ্বলে উঠে বললে, 'সেসব আমি চুকিয়ে দিয়েছি।'

'না, এখনও বাকি আছে।' এবার লোকটা উদ্ধত ভাবেই জানালে।

'না, কিছু বাকি নেই।' শ্রীমন্ত আগুন হয়ে উঠল একেবারে। তারপর কঠিনস্বরে আদেশ করলে, 'এখন যাও এখান থেকে। কোনওদিন এখানে যেন আর তোমায় না দেখি। যাও...'

এ-আদেশ অমান্য করতে লোকটা বোধহয় আর সাহস করল না, তবু যাওয়ার সময়

সে জানিয়ে গেল, 'মাইনে কিন্তু আমার চাই।'

লোকটা চলে যেতে সবাই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। জয়ন্ত বিস্ফারিত দৃষ্টিতে হেসে বললে, 'এই লোককে আপনি পাহারায় রেখেছিলেন মশাই! ও তো কোনওদিন আপনাকে কেটে রেখে যেত!'

শ্রীমন্ত এবার হেসে বললে, 'সেই ভয়েই তো ছাড়িয়ে দিয়েছি!'

'নাঃ, এই অঞ্চলটাই সুবিধের নয়।' মামাবাবুর শেষ মন্তব্য শোনা গেল, 'সব জায়গাতেই একটা কিছু গন্ডগোল লেগেই আছে!'

মামাবাবুর মন্তব্য যে নেহাত ভুল নয়, সেদিন দুপুরেই তার আর একটি প্রমাণ পাওয়া গেল।

ললিতা কী একটা কাজে মামাবাবুর ঘরে এসে দেখে মামাবাবু অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে হাতুড়ি দিয়ে দেওয়ালে একটি পেরেক ঠুকছেন।

'কী করছেন মামাবাবু?' ললিতা হেসে জিজ্ঞাসা করে। মামাবাবুর নানারকম খেয়াল তার অজানা নয়।

'এই দেখো না মা!' মামাবাবু হাতুড়ি নামিয়ে ললিতাকে বোঝাতে লেগে যান, 'ভাড়াটে লোক দিয়ে কখনও ঘর সাজানো হয়! এই দেয়ালটা একেবারে খালিই রেখে দিয়েছে। ঘরটা কীরকম বেমানান দেখাচ্ছে বলো দেখি।'

ললিতাকে গম্ভীর হয়ে সায় দিতেই হয়। সমর্থন পেয়ে মামাবাবু উৎসাহিত হয়ে বলেন, 'তাই এখানে একটা ছবি টাঙাব ভাবছি।'

মামাবাবু আবার দেওয়ালে পেরেক ঠোকায় মন দেন।

হঠাৎ এমন একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে যায়, যা কেউ কল্পনাই করতে পারেনি।

একটা সুবিধে মতো জায়গা বুঝে জোরে ক-বার হাতুড়ির ঘা দিতেই দেওয়ালের খানিকটা চিড় খেয়ে উলটে গিয়ে একটা ফোকর বেরিয়ে পড়ে।

'এ কী ব্যাপার!' মামাবাবু চমকে এক-পা পিছিয়ে দাঁড়ান।

ললিতা কাছে এসে ভালো করে লক্ষ করে বলে, 'ভেতরে কী যেন একটা রয়েছে মনে হচ্ছে।'

মামাবাবুও এবার দেখতে পেয়ে হাত বাড়িয়ে সেটা বার করে আনেন।

চমৎকার নক্সাকাটা কাঠের বাক্স।

টেবিলের কাছে বাক্সটা নিয়ে এসে খোলবার পর দেখা যায় ভাঁজ করা বড় কাগজ তার মধ্যে রাখা।

মামাবাবু কাগজটার ভাঁজ খুলে অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখেও কিছু বুঝতে না পেরে ললিতার হাতে দিয়ে বলেন, 'কীসের কাগজ বল তো? লেখাটেখা তো কিছু নেই।'

ললিতা কিন্তু খানিক ভালো করে দেখে বলে, 'কীসের যেন একটা নক্সা বলে মনে হচ্ছে।'

নমিতাও ইতিমধ্যে ব্যাপারটা কী দেখবার জন্যে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

মামাবাবু তাকেই বলেন, 'ডাক তো নমিতা, জয়ন্তকে একবার নিচে থেকে ডেকে আন তো!'

'জয়ন্তদা তো সকালেই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেছে।' নমিতা জানায়।

'বেরিয়ে গেছে! আচ্ছা, থানায়...' বলে কী বুঝে থেমে মামাবাবু আবার বলেন, 'না, না, শ্রীমন্তকে একবার তাহলে খবর পাঠা দেখি!'

খবর পেয়ে শ্রীমন্ত যখন এসে পৌঁছয় তখন নিচে কেউ নেই। একটু দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতেই ললিতার সঙ্গে তার দেখা হয়ে যায়।

শ্রীমন্ত নমস্কার করে একটু কুণ্ঠিত ভাবে বলে, 'আপনার মামাবাবু আমায় ডাকছেন শুনে এলাম। অনুমতি না নিয়েই কিন্তু ওপবে উঠে এসেছি, কিছু মনে করবেন না।'

'মনে যথেষ্ট কবলাম!' ললিতা একটু পবিহাস কবে, 'অনুমতি নিয়েই আপনার আসা উচিত ছিল। যাই হোক আপনি বসুন, আমি মামাবাবুকে ডেকে আনছি।'

সামনের একটি টেবিলেব ধারে কয়েকটি চেযার পাতা। শ্রীমন্ত তার একটিতে গিয়ে বসে।

বেশিক্ষণ তাকে অপেক্ষা কবতে হয় না। তবে মামাবাবু নয় নমিতাই এসে প্রথম দেখা দেয়।

বেশ হাসিমুখে এগিয়ে এলেও শ্রীমন্তর কাছে এসেই দেখা যায় তার মুখ বেজায় গম্ভীর হয়ে উঠেছে।

শ্রীমন্ত এই অপ্রত্যাশিত গাম্ভীর্যের কাবণটা ঠিক অনুমান করতে না পেরে সকৌতুক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতেই নমিতা গম্ভীবভাবে জানিয়ে দেয়, 'আপনার সঙ্গে কথা কইব না জানেন তো!'

'কথা যে কইবে না তা তো দেখতেই পাচ্ছি।' শ্রীমন্তও গম্ভীব হওয়াব ভান কবে। 'শুধু কী অপরাধে আমাব এতবড় শাস্তি সেইটে ভেবে কূল পাচ্ছি না। চুপি-চুপি বলে ফেল তো।'

'চুপি-চুপি বলব কেন।' নমিতা দস্তুর মতো অপমান বোধ কবে জানায়, 'জোরেই বলব।'

তারপর ক্ষোভেব আসল কাবণটা সে ব্যক্ত কবে, 'আপনি না আমার একটা মূর্তি তৈরি করে দেবেন বলেছিলেন। কই দিয়েছেন?'

'ওঃ, এই কথা।' শ্রীমন্ত যেন আশ্বস্ত হয়।

কোনও দুর্বল মুহূর্তে এবকম একটা প্রতিশ্রুতি সে অবশ্য দিয়ে ফেলেছিল। এখন ক্রটিটা সাবাবাব চেষ্টা করে।

'কিন্তু ব্যাপার কী জানো, তোমাব মূর্তি তো যে-সে পাথরের তৈরি করলে চলবে না, একেবারে স্ফটিক পাথব চাই। সেই পাথবটাই পাওয়া যাচ্ছে না।'

শ্রীমন্তব কথার ধরনে নমিতাব প্রথম বুঝি একটু বিশ্বাসই হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঠাট্টাটা সে ধরতে পেরে চটে যায়।

'যত বাজে কথা!' সে রেগে বলে, 'তৈরি করবার ইচ্ছে নেই তাই বলুন। দিদি নেহাত রাজি নয় তাই, নইলে তাব বেলা এতদিনে ঠিক সব জোগাড় হয়ে যেত।' তার মুখে আবার একটু দুষ্টুমির হাসি দেখা দেয়।

'আরে তোমার দিদির জন্যে তো পাথর লাগে না।' শ্রীমন্ত প্রতিবাদ করে, 'শুধু মাটি। মাটি!'

'হ্যাঁ, মাটি! যান আর ঠাট্টা করতে হবে না।' বলে দূর থেকে মামাবাবু ও দিদিকে আসতে দেখে সে হেসে ছুটে পালায়।

'আজ বড় অদ্ভুত একটা ব্যাপার হয়েছে।' ললিতার সঙ্গে ঘরে ঢুকতে-ঢুকতেই মামাবাবু শুরু করেন। শ্রীমন্তর কাছে একটা চেয়ারে বসে পকেট থেকে সেই কাগজটা বার করে তিনি বলেন, 'আমার ঘরের দেওয়ালে একটা পেরেক ঠুকতে গিয়ে হঠাৎ একটা কুলুঙ্গি বেরিয়ে পড়ে। তার ভেতর একটা কাঠের বাক্সে এই কাগজটা পাই।'

শ্রীমন্তর হাতে দিয়ে মামাবাবু আবার বলেন, 'কাগজটা কীসের কিছু বুঝতে পারছি না। তাই আপনাকে একবার দেখাবার জন্যে ডাকলাম।'

শ্রীমন্ত কাগজটা নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে বোঝবার চেষ্টা করে। তারপর হতাশ ভাবে বলে, 'এ তো কী সব হিজিবিজি আঁকা দেখছি।'

'হ্যাঁ, হিজিবিজি, কিন্তু কোনওরকম একটা নক্সা বলে মনে হচ্ছে, হয় তো কোনও গুপ্ত জায়গার!' ললিতাই এবার বলে।

'গুপ্ত জায়গার নক্সা!' শ্রীমন্ত আর একবার কাগজটা পরীক্ষা করে। তারপর হাল ছেড়ে দিয়ে বলে, 'আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না।'

একটু হেসে সে আবার বলে, 'এই ভুতুড়ে বাড়িতে থেকে-থেকে আপনাদের কল্পনা একটু বেশি রঙিন হয়ে গেছে বোধহয়।'

'তা হতে পারে।' ললিতা স্বীকার করে। 'কিন্তু কাগজটা খুব দামি না হলে অত যত্ন করে লুকোনো থাকবে কেন?'

'সেটা একটা ভাববার কথা বটে!' শ্রীমন্তকে এ-যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করতেই হয়।

'এই যে জয়ন্ত!'

হঠাৎ মামাবাবু জয়ন্তকে দেখতে পান। সে যে কখন নিঃশব্দে দূরে এসে দাঁড়িয়েছে কেউ লক্ষই করেনি। মামাবাবু তাকে দেখে যেন অকূলে কূল পেয়ে বলেন, 'তুমি একবার দেখো তো কাগজটা।'

কিন্তু জয়ন্তর জবাবে শুধু তিনি নয়, সবাই অবাক হয়ে যায়।

'থাক, আমার দেখবার দরকার হবে না। যাকে দেখাবার জন্যে ডেকেছেন তিনি দেখলেই হবে।' বেশ রাগের সঙ্গে কথাগুলো বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

মামাবাবু খানিক চুপ করে থেকে বিমূঢ় ভাবে ললিতাকেই জিজ্ঞাসা করেন, 'জয়ন্তর হঠাৎ এত রাগ হল কেন?'

ললিতা চুপ করে থাকে। তার বদলে শ্রীমন্তই হেসে বলে, 'জয়ন্তবাবুর ও-সব ছেলেমানুষি একটু আছে। আমি তো ওঁর মেজাজের জন্যে আজকাল বেশ ভয়ে-ভয়ে থাকি।'

মামাবাবু জয়ন্তর ব্যবহারে বেশ ক্ষুণ্ণ হয়েছেন বোঝা যায়। ও-বিষয়ে কোনও কথা আর না বাড়িয়ে শ্রীমন্তকে তিনি অনুরোধ করেন, 'কাগজটা আপনিই তাহলে রাখুন। দেখুন এ-থেকে রহস্য কিছু উদ্ধার করা যায় কি না।'

শ্রীমন্তর খুব উৎসাহ দেখা যায় না। কুণ্ঠিতভাবে হেসে সে বলে, 'দিচ্ছেন দিন, কিন্তু রহস্য যদি কিছু থাকেও তা উদ্ধার করা আমার বুদ্ধিতে কুলোবে বলে মনে হচ্ছে না।'

ললিতা ও মামাবাবুর প্রসন্ন দৃষ্টি থেকে কিন্তু বোঝা যায় যে তাদের ধারণা ঠিক তার বিপরীত।

শ্রীমন্ত কাগজটা পকেটে নিয়ে সোজা তার নিজের বাড়িতেই যায়। অন্যমনস্ক না হলে বাড়িতে ঢোকবার পথে একটা আশ্চর্য ব্যাপার হয়তো তার চোখে পড়ত।

মামাবাবুদের বাড়ি থেকে বার হওয়ার পর থেকেই একটি লোক দূর থেকে তার পেছু নিয়েছে।

শ্রীমন্ত বাড়িতে ঢুকে দরজা বন্ধ করবার পর সে লোকটি সন্তর্পণে বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। তারপর এদিক-ওদিক চেয়ে সে একদিকের একটি জানলার কাছে গিয়ে লুকিয়ে পড়ে। সেখান থেকে জানলার ফাঁক দিয়ে তার উঁকি মারবার চেষ্টাটা আর যাই হোক খুব স্বাভাবিক নয়।

বলাবাহুল্য লোকটি ভিখিরিসাহেব।

জয়ন্ত সেই যে দুপুরবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল তারপর থেকে আর ফেরেনি। রাত্রে সেকথা জানবার পর মামাবাবু বেশ চিন্তিত হয়ে ওঠেন।

নমিতাকে নিচে তার খোঁজে পাঠিয়েছিলেন, সে জয়ন্তকে না পেয়ে ফিরে এসে খবর দেওয়ার পর মামাবাবু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'জয়ন্ত এত রাত পর্যন্ত বাড়িই ফেরেনি!'

'বোধহয় রাগ হয়েছে।' নমিতা না ফেরার কারণটা সম্বন্ধে তার অনুমান জানায়।

'রাগ করা তো তার অন্যায় বাপু!' মামাবাবু অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ স্বরে বলেন, 'ও-নক্সার কাগজ তো তাকেই আগে দেখবার জন্যে ডেকেছিলাম তখন ও বাড়ি ছিল না, তা আমি কী করব!'

'তোমার ও নিয়ে ভাবাবই দরকার নেই। সবকিছুই তাঁকেই আগে দেখাতে হবে এমন কী কথা আছে।' ললিতা জয়ন্তর বিরুদ্ধেই দাঁড়ায়।

কিন্তু মামাবাবু এবার জয়ন্তর দোষটাই স্খালন করবার চেষ্টায় বলেন, 'হাজার হলেও ছেলেমানুষ তো!'

তারপর যেসব কাগজপত্র নিয়ে কাজ করছিলেন সেগুলো তোলবার জন্যে আলমারির দিকে যেতে-যেতে বলে যান, 'আচ্ছা অনেক রাত হয়েছে, তোরা এখন শুতে যা!'

ললিতা-নমিতা মামাবাবুর কথা মতো ঘর থেকে চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ মামাবাবুর ব্যবহারে বিস্মিত হয়ে তারা দাঁড়িয়ে পড়ে।

কাঠের আলমারিতে কাগজপত্রগুলো রাখতে গিয়ে মামাবাবু জানলা থেকে কী একটা চোখে পড়ায় একাগ্র দৃষ্টিতে লক্ষ করছেন।

এ-জানলাটা থেকে বাইরের পোড়োবাড়ি ও বাগানের একটা অংশ দেখা যায় কিন্তু সেখানে কী এমন জিনিস মামাবাবুর অতখানি আগ্রহের সৃষ্টি করতে পারে!

জানলা থেকে ফিরে মামাবাবুকে একেবারে বাইরে বেরিয়ে যেতে দেখে তাদের বিস্ময় আরও বেড়ে যায়।

'কী হয়েছে মামাবাবু! কোথায় যাচ্ছেন?' ললিতা উদগ্রীব হয়ে প্রশ্ন করে।

'এখুনি আসছি।' অন্যমনস্কভাবে বেরিয়ে যেতে-যেতে মামাবাবু এরচেয়ে বেশি কিছু বলা প্রয়োজন মনে করেন না।

ঘর থেকে বেরিয়ে করিডর দিয়ে মামাবাবু প্রথম পেছনের মহলের বারান্দায় এসে দাঁড়ান। সেখান থেকে অন্ধকারে সামনের বাগান ও পোড়োবাড়ির কিছুই প্রায় দেখা যায় না। কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করবার পর আবার তাঁকে ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে দেখা যায়।

নিচে নেমে বাগানের ভেতর কিছুদূর গিয়েই আবার তিনি দাঁড়িয়ে পড়েন। সামনে নয়, এবার পেছন দিকে ফিরে তিনি কান পাতেন। তাঁর পেছনে কার পায়ের শব্দ যেন পাওয়া যাচ্ছে।

পায়ের শব্দ আরও কাছে এগিয়ে আসবার পর অন্ধকারেও মানুষটাকে খানিকটা চেনা যায়, ও বোঝা যায় যে মিঃ সোম তাঁদের মিথ্যে আশ্বাস দেননি। লোকটা একজন কনস্টেবল। রাত্রে বাড়ির চারিধারে পাহারা দিয়ে ঘোরাই তার কাজ।

কাছে এসে মামাবাবুকে অন্ধকারে অমন জায়গায় একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'কী হয়েছে স্যার?'

'চুপ!' মামাবাবু তাকে চাপা গলায় শব্দ করতে নিষেধ করে বলেন, 'এইখানে থাকো। আমি ডাকলেই আসবে।'

মামাবাবু সামনের দিকে এবার এগিয়ে যান।

ব্যাপারটা ঠিক না বুঝলেও মামাবাবুর আদেশ মতো কনস্টেবল সেইখানেই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে।

বাগানের শুকনো লতাপাতা মাড়িয়ে মামাবাবুর চলে যাওয়ার পদশব্দ অনেক দূর পর্যন্ত কানখাড়া করে সে শুনতে পায়।

তার কিছুক্ষণ বাদেই অন্ধকাবে মামাবাবুর কণ্ঠস্বর ভেসে আসে 'তুমি!'

বোঝা যায় মামাবাবু পরিচিত কোনও লোকেরই দেখা পেয়েছেন।

পবিচিত লোকটির কথা কিন্তু শোনা যায় না। তার বদলে মামাবাবুর কণ্ঠই আবার শোনা যায়, 'আমি প্রথমটা কিন্তু ভাবতেই পারিনি। তবু হাঁটাটা কেমন চেনা-চেনা মনে হচ্ছিল.. '

হঠাৎ কনস্টেবল চমকে শিউরে ওঠে।

মামাবাবুর কথার ওপরই দুবার কীসেব একটা আঘাতের শব্দ আর সেইসঙ্গে মামাবাবুব অস্ফুট আর্তনাদ।

কনস্টেবল তৎক্ষণাৎ সেই শব্দ লক্ষ কবে ছুটে যায়।

অন্ধকাবে দিক নির্ণয কবা খুব সহজ নয়। খানিক এদিক-ওদিক একটু ছোটাছুটির পব অন্ধকাবে আর একটি ডাক তার কানে এসে পৌঁছয:

'এই, কে আছে এখানে! কে আছে?'

ডাকটা যেদিক থেকে এসেছে সেইদিকে এবার ছুটে গিয়ে সে একেবারে অবাক হয়ে যায়।

পুরোনো মহলের বাগান ছাড়িয়ে ভাঙা নাটমন্দিরের ধ্বংসস্তূপের একধারে মামাবাবু মাটির ওপরে পড়ে আছেন, আর তার পাশে বসে জয়ন্ত তাঁর মাথাটা একহাতে তুলে ধরে আছে।

হাঁপাতে-হাঁপাতে ভীত উত্তেজিত কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করে, 'কী হয়েছে জয়ন্তবাবু? এঁকে মারলে কে?'

'জানি না। সে গবেষণা পরে করলেও চলবে।' গম্ভীরস্বরে কনস্টেবলের কৌতূহলকে শাসন করে জয়ন্ত বলে, 'এখন এঁকে ধরো দেখি। ভেতরে নিয়ে যেতে হবে।'

দুজনে ধরাধরি করে মামাবাবুর রক্তাক্ত অচৈতন্য দেহ ভেতরে নিয়ে যায়।

পনেরো

খবর পেয়ে মিঃ সোম পরের দিন সকালবেলাই শ্রীমন্তর সঙ্গে মামাবাবুকে দেখতে এলেন।

স্থানীয় ডাক্তারকে অবশ্য রাত্রেই ডাকা হয়েছিল। শহরের বড় ডাক্তারও সকালবেলা এসে দেখে যা ব্যবস্থা সম্ভব করে গেছলেন।

কোনও ব্যবস্থায় কিছু যে হবে মামাবাবুকে দেখে সে আশা কিন্তু করা গেল না। মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা রয়েছে বটে, তবু তখনও পর্যন্ত জ্ঞান তাঁর হয়নি।

জয়ন্তই মিঃ সোম ও শ্রীমন্তকে সমস্ত ব্যাপারটার বিবরণ দিচ্ছিল।

বিছানায় মামাবাবুর পাশে ললিতা ও নমিতা আচ্ছন্নের মতো মাথা নিচু করে বসেছিল। সমস্ত রাত কেঁদে-কেঁদে তাদের দুজনেরই চোখমুখ ফুলে গেছে।

সমস্ত বিবরণ শুনে শ্রীমন্ত উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করলে, 'ডাক্তার তাহলে জ্ঞান হওয়ার আশা খুব কম, বলে গেছেন?'

'হ্যাঁ! তবে জ্ঞান যদি হয় তাহলে এ-যাত্রা বেঁচেই যাবেন।' জয়ন্তর কাছে অন্ধকারের মধ্যে একটুখানি আশার আলোর আভাস পাওয়া গেল। কথাটা সে আরও ভালো করে বুঝিয়ে দিলে, 'কারণ এমনিতে জখম খুব বেশি হননি। মস্তিষ্কটা শুধু অসাড় হয়ে গেছে।'

'ওঁর জ্ঞান হওয়ার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে কিন্তু।' শ্রীমন্ত আশান্বিত হয়ে উঠেছে দেখা গেল। 'সমস্ত রহস্যের সূত্রই হয়তো ওঁর কাছে পাওয়া যাবে।'

একটু থেমে সে আবার জিজ্ঞাসা করলে, 'আচ্ছা জ্ঞান যদি হয় তো, কতদিনে হতে পারে, ডাক্তার কিছু বলেছেন?'

'না, তার কোনও ঠিক নেই।' জয়ন্ত আবার হতাশ করে দিলে, 'আর জ্ঞান যদি হয়ও তবু তারপর ওঁকে অত্যন্ত সাবধানে ঘুম পাড়িয়ে বাখা দরকার। মাথার সে অবস্থায় কোনওরকম উত্তেজনায় দারুণ ক্ষতি হতে পারে।'

কথা বলতে-বলতে জয়ন্তর সঙ্গে শ্রীমন্ত ও মিঃ সোম মামাবাবুর বিছানা থেকে খানিকটা দূরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। মিঃ সোমই এবার হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা জয়ন্তবাবু, আপনি ওঁর চিৎকার শুনে ওখানে ছুটে যান, না?'

জয়ন্তর মুখটা হঠাৎ এ-প্রশ্নে কঠিন হয়ে উঠল। ভুরু কুঁচকে মিঃ সোমের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে সে সংক্ষেপে শুধু বললে, 'হ্যাঁ।'

সে ভ্রুকুটি যেন দেখতেই পাননি এমনভাবে সোম আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাউকে পালাতে কিন্তু দেখতে পাননি?'

'না!' জয়ন্ত এবার তৎক্ষণাৎ জবাব দিলে, 'যেরকম অন্ধকার হয়তো কাছেই কোথাও সে লুকিয়ে পড়েছিল। কিন্তু মামাবাবুকে ওই অবস্থায় ফেলে তখন খোঁজবার সময় পাইনি।'

'চিৎকারটা যখন শোনেন, তখন আপনি কাছেই ছিলেন মনে হচ্ছে।' সোম প্রসঙ্গটা এখনও শেষ করতে দিলেন না।

'হ্যাঁ।' জয়ন্ত উত্যক্তভাবটা বিশেষ চাপবার চেষ্টা না করেই বললে, 'আপনি হয়তো জানেন না, প্রতি রাত্রেই আমি এ-বাড়ির চারিধারে টহল দিয়ে বেড়াই।'

'ও!' জয়ন্তর কথার ওপর এইটুকু মাত্র বিস্ময়সূচক ধ্বনি করে সোম শ্রীমন্তর দিকে ফিরে বললেন, 'আসুন শ্রীমন্তবাবু, আপনি তো বাড়িতেই ফিরবেন?'

'হ্যাঁ, চলুন এক সঙ্গেই যাওয়া যাক।' বলে শ্রীমন্ত সোমের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন।

শ্রীমন্তর সঙ্গে মামাবাবুর দুর্ঘটনার বিষয়েই আলোচনা করতে-করতে সোম কখন তার বাড়ির কাছে পৌঁছে গেছলেন বোধহয় টের পাননি।

আলোচনাটা আরো খানিক চালাবার জন্যে শ্রীমন্ত তাঁকে বাড়ির ভেতরে গিয়ে একটু বসবার অনুরোধ করতে তিনি আর না বলতে পারলেন না।

বাইরের গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকতে গিয়ে কিন্তু শ্রীমন্তর সঙ্গে তিনিও বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

শ্রীমন্তর বাংলো বাড়িটির সামনে ছোট্ট একটি দেয়াল ঘেরা বাগান। কাঠের গেট দিয়ে সে বাগানে ঢুকে কয়েকটা বাহারে ধাপ দিয়ে উঠে বাড়ির বাইরের দরজায় পৌঁছনো যায়।

সেই বাগানের ভেতর বাইরের দরজার কাছে দুটি লোক কী যেন গোপন পরামর্শ করছে দেখা গেল।

তাদের একটি ভিখিরিসাহেব এবং অপরটি, নমিতা যাকে দেখে আঁৎকে উঠেছিল, শ্রীমন্তর সেই বরখাস্ত করা লোক।

সোম ও শ্রীমন্তকে দূর থেকে দেখতে পেয়েই ভিখিরিসাহেব একেবারে যেন ভয়ে কেঁচো হয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে পড়ল। কিন্তু অপর লোকটি নড়ল না।

'কী করেছিলে তোমরা এখানে।' শ্রীমন্ত তার কাছে গিয়ে কড়া গলায় জিজ্ঞাসা করলে। রাগে সে তখন জ্বলছে।

'কী আবার করব। আপনার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি।' লোকটার ঔদ্ধত্য ও স্পর্ধা আজ যেন একটু বেশি মনে হল।

'আমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছ।' শ্রীমন্ত অতি কষ্টে রাগ সামলে তীক্ষ্ণ স্বরে বললে, 'তা ওই লোকটি সঙ্গে ছিল কেন? নতুন বন্ধু বুঝি!'

'বন্ধু আবাব কে! বন্ধু-টন্ধু আমার নেই।' লোকটা আগের মতোই উদ্ধতভাবে জানালে, 'আমার কাছে ভিক্ষে চাইছিল। আমি বললাম, হবে না।'

'বটে! তোমার কাছেও ভিক্ষে চাইছিল ভালো-ভালো!' শ্রীমন্তকেও এবার হাসতে হল। তারপর কঠিনস্বরে সে জিজ্ঞাসা করলে, 'তা আমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

'আমার সেই মাইনে।' লোকটার স্পর্ধা সত্যিই অসহ্য।

'আবার সেই বাজে ওজর!' শ্রীমন্ত গর্জন করে উঠল, 'তোমার সমস্ত মাইনে আমি হিসেব করে চুকিয়ে দিয়েছি।'

'আজ্ঞে না, সে হিসেবে ভুল আছে।' লোকটা অবিচলিত।

'ভুল আছে।' রাগে শ্রীমন্ত খানিকক্ষণ বুঝি কথাই বলতে পারলে না। বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে নিজেকে সামলে নিয়ে তারপর সে যথাসম্ভব শান্ত স্বরে বললে, 'বেশ, আজ ও-বেলায় এসো। সব হিসেব আমি তোমার সামনেই দেখব। পাওনা যদি কিছু তোমার থাকে তো পাবে। কিন্তু তারপর এ বাড়ির ধারে কাছে আর যেন তোমায় না দেখি।'

'পাওনা চুকিয়ে দিলে আর আমার আসবার কী দরকার।' শেষ কথাগুলোও অভদ্র ভাবে বলে লোকটা চলে গেল।

মিঃ সোম এতক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে লোকটাকে লক্ষ্য করছিলেন। এবার কাছে এসে বললেন, 'ওরকম লোক ছাড়িয়ে দিয়ে ভালোই করেছেন মশাই। চেহারা, ধরন-ধারণ যা দেখলাম তাতে শুধু বাকি মাইনের জন্যে এখানে ঘোরাঘুরি করছে বলে মনে হয় না।'

কথা বলতে-বলতে হঠাৎ শ্রীমন্তর দিকে চোখ পড়ায় সোম বুঝতে পারলেন শ্রীমন্ত তাঁর কোনও কথাই বোধহয় শোনেনি। অত্যন্ত তন্ময় হয়ে কী একটা যেন সে ভাবছে।

'কী ভাবছেন বলুন তো!' সোম সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

'যা ভাবছি তা যদি ঠিক হয়,' শ্রীমন্ত অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে সোমের দিকে তাকিয়ে

বললে, 'তাহলে হানাবাড়ির একটা রহস্য আজ রাত্রেই বোধহয় ভেদ করতে পারব। আপনাদের কিন্তু আমার সঙ্গে পাহারায় থাকতে হবে।'

'আজ রাত্রেই?' সোম অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

'হ্যাঁ, আজ রাত্রেই।' শ্রীমন্ত দৃঢ় স্বরে জানালে, 'আমার বিশ্বাস হানাবাড়ির সেই বিভীষিকাকে আজ রাতেই আবার দেখা যাবে।'

সেদিন গভীর রাত্রে পোড়োবাড়ির ভাঙা বারান্দার এককোণে অন্ধকারে একটি থামের আড়ালে তিনটি মানুষকে নিঃশব্দে পাহারায় থাকতে দেখা যায়। তারা মিঃ সোম শ্রীমন্ত ও জয়ন্ত। মিঃ সোমই জয়ন্তকে খবর দিয়ে এই পাহারায় থাকবার জন্যে ডাকিয়ে আনিয়েছেন। এই অস্বস্তিকর জায়গায় বহুক্ষণ অপেক্ষা করতে-করতে সকলেই প্রায় ধৈর্যচ্যুতি ঘটবার জোগাড় হয়। শ্রীমন্তর ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে সকলেই যখন একরকম হতাশ হয়ে উঠেছে এমনসময় সকলেরই কান হঠাৎ খাড়া হয়ে ওঠে।

অন্ধকারে দূরের বাগানের শুকনো লতা-পাতার ভেতর কীসের সুস্পষ্ট নড়াচড়ার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

তার অনুমান যে সত্যি এতক্ষণে তা বুঝি প্রমাণ হতে চলেছে। শ্রীমন্তই সবচেয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠে চুপি-চুপি বলে, 'মনে হচ্ছে এখুনি দেখতে পাওয়া যাবে।'

দেখতে পাওয়ার কথাটা অবশ্য একটু বাড়িয়ে বলা। বাগানের বেশিরভাগ জায়গাতেই একেবারে জমাট অন্ধকার। শুধু একটি জায়গায় গাছপালা হাল্কা হওয়ায় দূরের আঁকাশের পশ্চাৎপটে সামান্য কিছু দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

তিনজনে রুদ্ধ নিশ্বাসে সেদিকে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে অপেক্ষা করেন। লতা-পাতার শব্দটা ক্রমশ সেই দিকেই এগিয়ে আসছে।

শ্রীমন্ত তার পিস্তলটা সেই দিকে উঁচিয়ে ধরে।

একটা কালো ছায়ামূর্তির আভাস এবাব সেই অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গার একেবারে কিনারায় এসে পড়েছে।

রাতের আকাশের পশ্চাৎপটে মূর্তিটা আরও স্পষ্ট করে দেখা যাচ্ছে।

শ্রীমন্ত পিস্তলটার লক্ষ্য স্থির করে—

জয়ন্ত ও সোম দুজনেই হাত বাড়িয়ে তাকে বাধা দেয়।

'দাঁড়ান শ্রীমন্তবাবু।'

'এখন গুলি করবেন না।'

কিন্তু শ্রীমন্তর গুলি তখনই পর-পর দুবার সমস্ত জায়গা কাঁপিয়ে ছুটে গেছে।

প্রথম আওয়াজের সঙ্গে-সঙ্গে মুখ তুলে তাকিয়ে সেই কালো ছায়ামূর্তিটা বিদ্যুদ্বেগে একটা ডিগবাজি খেয়ে গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে যায়।

ওপর থেকে তিনজন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে সেই দিকে ছুটে যায়।

কিন্তু এ কী আশ্চর্য ব্যাপার!

সে মূর্তির কোথাও কোনও চিহ্ন নেই।

সে কি এরই মধ্যে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল নাকি!

হাওয়ায় যে মিলিয়ে যায়নি, টর্চ জ্বেলে খানিকটা খোঁজবার পরই তা বোঝা যায়।

টর্চের আলোয় যা দেখা গিয়েছিল মিঃ সোম সেটি হাতে তুলে নিয়ে অবাক হয়ে বলেন, 'আশ্চর্য এ তো শুধু খোলসটা পড়ে আছে!'

'খোলস ছেড়ে পালিয়েছে তাহলে!'

জয়ন্তের এই নির্লিপ্ত ধরনের মন্তব্যে শ্রীমন্ত একটু বিরক্ত হয়েই বলে, 'না, যে গুলি সে খেয়েছে, তাতে প্রাণে বাঁচলেও পালানো তার পক্ষে সম্ভব নয়!'

'আপনি তো আচ্ছা লোক মশাই।' জয়ন্ত উপহাসের সুরে বলে, 'স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে পালিয়েছে, তবু বলছেন পালানো সম্ভব নয়।'

'আমি বলছি কেউ সাহায্য না করলে এইটুকুর মধ্যে খোলস ছেড়ে তার পালানো সম্ভব নয়।' শ্রীমন্ত এবার উত্তেজিতভাবে জানায়।

মিঃ সোম এবার দুজনের তর্কে বাধা দিয়ে বলেন, 'সেইরকমই মনে হচ্ছে। আচ্ছা তবু একটু খুঁজে দেখি আসুন।'

তিনজনে পোড়োবাড়ির সমস্ত দিক তন্ন-তন্ন করে খুঁজেও কিন্তু কিছু পান না।

খোঁজাখুজির উৎসাহটা অবশ্য সোম ও শ্রীমন্তরই বেশি। জয়ন্ত তাঁদের সঙ্গে ঘুরলেও কেমন উদাসীন হয়েই থাকে।

শেষপর্যন্ত কোনও সন্ধান যখন পাওয়া যায় না, তখন সে-ই ঈষৎ বিদ্রুপের সঙ্গে বলে, 'ঘোরাঘুরিই সার হল তাহলে।'

'তাই তো দেখছি।' সোম চিন্তিত ভাবে বলেন, 'অথচ এরই মধ্যে কোথায় সে যেতে পারে তাও বুঝতে পারছি না।'

জয়ন্ত এবার মন্তব্য করে, 'খোলসটা যারই হোক, গুলি খেয়ে তেমন জখম হয়েছে বলে, মনে হচ্ছে না!'

'কেন বলুন তো?' শ্রীমন্ত জিজ্ঞাসা করে।

'কেন, বুঝতে পারলেন না?' জয়ন্ত বুঝিয়ে দেয়, 'সেরকম জখম হলে কারুর সাহায্য নিয়েও এত তাড়াতাড়ি পালিয়ে যেতে সে পারত না।'

শ্রীমন্তই এবার বিস্মিতভাবে বলে, 'পালিয়ে যাওয়ায় আপনি যেন খুশিই হয়েছেন মনে হচ্ছে!'

'খুশি না হই, দুঃখিত হওয়ারই বা কী আছে!' জয়ন্ত তাচ্ছিল্যের সুরে বলে, 'সব রহস্যের এত সহজে মীমাংসা হয়ে যাওয়া কি ভালো? আপনাদের সেই নক্সার রহস্যটাই ধরুন না। তার মীমাংসা কিছু হয়েছে?'

'নক্সা!' সোম ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেন না।

'ও, আপনি জানেন না বুঝি!' জয়ন্ত বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দেয়, 'জখম হওয়ার আগে, একটা চোরাকুলুঙ্গি থেকে মামাবাবু একটা পুরোনো কাগজ পেয়েছিলেন, তাতে কীসের নক্সা আঁকা। মামাবাবু সেটা ওঁকেই দিয়েছিলেন।'

শ্রীমন্তর দিকে ফিরে সে আবার জিজ্ঞাসা করে, 'কী, সে নক্সার মানে কিছু খুঁজে পেলেন?'

'না, এখনও পাইনি!' শ্রীমন্ত এবার একটু পালটা ঘা না দিয়ে পারে না, 'কিন্তু সে নক্সা সম্বন্ধে আপনার কোনও কৌতূহল ছিল না বলেই জানতাম।'

'কৌতূহল এখনও আছে ভাবছেন কেন?' জয়ন্ত বেশ রূঢ়ভাবেই জবাবটা দিয়ে সবার আগে সেখান থেকে বেরিয়ে যায়।

ষোলো

গোপন নক্সা সম্বন্ধে কোনও কৌতূহল নেই বলে বড় গলায় জানালেও পরেরদিন দুপুর বেলায় জয়ন্তর গতিবিধি দেখলে যে কেউ বেশ বিস্মিত হতো।

শ্রীমন্তর চাকর দুলাল দুপুরবেলা মনিবের অনুপস্থিতিতে একটু দিবানিদ্রা দেওয়ার আয়োজন করছে এমনসময় বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেল।

দুলাল উঠে গিয়ে দরজা খোলার পর জয়ন্ত একেবারে ভেতরেই ঢুকে পড়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'কী হে দুলাল! শ্রীমন্তবাবু বাড়ি নেই নাকি!'

'আজ্ঞে না, তিনি খানিক আগে বেরিয়ে গেলেন।'

একথা শুনেও জয়ন্তর কিন্তু চলে যাওয়ার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। ভেতরে এসে একটি সোফায় বসে পড়ে সে বললে, 'আচ্ছা, আমি একটু বসছি।'

তারপর পকেট থেকে কিছু পয়সা বার করে দুলালের হাতে দিয়ে বললে, 'তুমি...তুমি আমার জন্যে এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে এসো দেখি।'

দুলাল বড় মুশকিলে পড়ল। বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া তার উচিত নয়, অথচ মনিবের বিশেষ বন্ধু বলে যাঁকে জানে তাঁকে অসন্তুষ্ট করতেও তার সাহস হয় না।

একটু আমতা-আমতা করে সে বললে, 'আজ্ঞে একটু দেরি হবে কিন্তু। দোকান সেই থানার কাছে কিনা!'

'বেশ তো হোক না দেরি। আমি ততক্ষণ আছি!' জয়ন্ত সোফায় হেলান দিয়ে আরাম করে বসল।

দুলালকে অগত্যা সিগারেট আনতে যেতেই হল।

বাইরের দরজাটা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে জয়ন্তর ভাবগতিক একেবারে কিন্তু বদলে গেল।

লাফ দিয়ে উঠে পড়ে সে ঘরের টেবিল ও দেরাজের সমস্ত ড্রয়ারগুলো যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি খুলে পরীক্ষা করতে শুরু করলে।

একটির পর একটি ড্রয়ার খুলতে-খুলতে একেবারে তলার একটি ড্রয়ারের একটি ফাইলে সে যা খুঁজছিল তা বোধহয় পেলে। বলাবাহুল্য সেটি একটি নক্সা। তেমন দামি মনে করলে এরকম জায়গাতেও শ্রীমন্ত সেটি বোধহয় রাখত না।

পকেট থেকে একটি কাগজ বার করে টেবিলে বসে নক্সাটির নকল করে ফেলতে তার বেশিক্ষণ লাগল না। কিন্তু নকল করা যখন শেষ হয়েছে তখনই বাইরের দরজায় কার পায়ের শব্দ পাওয়া গেল।

তাড়াতাড়ি আসল নক্সার কাগজটির ফাইলে ভরে দেরাজ বন্ধ করে জয়ন্ত উঠে দাঁড়াবার পরই দেখা গেল শ্রীমন্ত ঘরে এসে ঢুকেছে।

জয়ন্তকে অপ্রত্যাশিতভাবে দেখে যদি কোনও সন্দেহ তার মনে জেগেও থাকে শ্রীমন্তর মুখে কিন্তু তা প্রকাশ পেল না। সহজভাবেই হেসে সে বললে, 'এই যে জয়ন্তবাবু! কতক্ষণ এসেছেন! আজকাল তো আর এখানে আসেন-ই না!'

শেষের কথাগুলোতে খোঁচা কিছু ছিল কি না বলা যায় না, কিন্তু জয়ন্ত হেসে পালটা জবাব দিলে, 'এলেও আপনার দেখা তো সব সময়ে পাওয়া যায় না। আপনিই বা বাড়িতে কতক্ষণ থাকেন!'

'তা ঠিক!' শ্রীমন্ত স্বীকার করলে, 'আজকেও হঠাৎ রাস্তা থেকে ফিরে না এলে

আর দেখা হতো না।'

হঠাৎ এদিক-ওদিক চেয়ে শ্রীমন্ত অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'আচ্ছা দুলাল গেল কোথায়?'

'তাকে এক প্যাকেট সিগারেট আনতে পাঠিয়েছি।' জয়ন্তর মুখে কোনও ভাবান্তর দেখা গেল না।

'ওঃ!' শ্রীমন্ত যেন আশ্বস্ত হল, কিন্তু পরমুহূর্তে অবাক হয়ে বললে, 'কিন্তু আপনাকে সিগারেট খেতে তো বড় একটা দেখি না।'

'না, মাঝে-মাঝে খেয়াল হলে খাই।' জয়ন্ত অবিচলিত।

'আপনি বেশ একটু খেয়ালি মানুষ দেখছি।' শ্রীমন্ত হেসে উঠল।

'তা বলতে পারেন। আচ্ছা আমি এখন চলি।' জয়ন্ত হঠাৎ যাওয়ার জন্যে পা বাড়ালে।

'সে কী!' শ্রীমন্ত সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'এই তো এলেন এরই মধ্যে যাবেন কী?'

জয়ন্ত দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, 'এও একটা খেয়াল মনে করুন।'

জয়ন্ত আবার যেতে উদ্যত হতেই শ্রীমন্ত বাধা দিয়ে বললে, 'কিন্তু দুলাল যে আপনার সিগারেট আনতে গেছে!'

'সে আমি রাস্তা থেকেই তার কাছে নিয়ে নেবখন।' জায়গাটা যেন তার অসহ্য, জয়ন্ত এমনইভাবে বেবিয়ে চলে গেল।

জযন্ত চলে যাওয়াব পর শ্রীমন্ত কয়েক সেকেন্ড গম্ভীরভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে দ্রুতপদে দেবাজেব কাছে গিয়ে নিচের ড্রয়ারটা খুলে নক্সার কাগজটা যে ফাইলে ছিল সেটা বাব করে দেখলে।

না, নক্সাটা ঠিক যথাস্থানেই আছে।

নক্সাটি বার করে দেখতে-দেখতে শ্রীমন্তর মুখে যে হাসি ফুটে উঠল তা দেখলে জয়ন্ত নিজেকে খুব বুদ্ধিমান বোধহয় ভাবতে পারত না।

জয়ন্ত যে কেন অকস্মাৎ তার অনুপস্থিতির সুযোগে তার বাড়িতে এসেছিল শ্রীমন্তর তা বুঝতে বাকি যে ছিল না, তা বলাই বাহুল্য। এতদিন ছোটখাটো নানা ব্যাপার উপেক্ষা করলেও একথাটা থানায় মিঃ সোমকে জানানো উচিত বলেই তার মনে হল।

সেই উদ্দেশ্যে খানিক বাদেই থানায় গিয়ে কিন্তু সে অবাক হয়ে গেল।

জয়ন্ত সোমের টেবিল থেকেই উঠে আসছে।

শ্রীমন্তকে দেখে অপ্রস্তুত হওয়ার দরুনই বোধহয় উলটো বাহাদুরি দেখিয়ে সে-ই নিজে থেকে প্রথম সম্ভাষণ করলে, 'এই যে শ্রীমন্তবাবু, এখানেও আপনি! আমাকে অনুসরণ করছেন নাকি!'

'করলে আপনার ভয়েব কিছু আছে?' শ্রীমন্তব গলাটা যত না হোক জয়ন্তর প্রতি দৃষ্টিটা বেশ তীক্ষ্ণ।

'ভয় না হোক, অস্বস্তি একটু হয় বইকী!' নেহাত তাচ্ছিল্যের স্বরে কথাগুলো বলে জয়ন্ত বেরিয়ে গেল।

শ্রীমন্ত মিঃ সোমের দিকে ফিরে এবার জিজ্ঞাসা করলে, 'জয়ন্তবাবু আজ আবার কী মনে করে এসেছিলেন?'

'As usual!' সোম হাসলেন, 'আপনার বিরুদ্ধে আমাদের সন্দিগ্ধ করে তোলবার চেষ্টায়।'

'হুঁ,' শ্রীমন্ত গম্ভীর হয়েই বললে, 'আজ আমিও কিন্তু জয়ন্তবাবুর বিরুদ্ধে একটু অভিযোগ করতে এসেছি। ওঁর ভাবগতিক ক্রমশই কেমন অদ্ভুত ঠেকছে। আজ উনি সেই নক্সাটি চুরি করে নকল করবার জন্যে ফন্দি করে আমার বাড়িতে ঢুকেছিলেন।'

'সেই চোরা কুলুঙ্গিতে পাওয়া নক্সা?' সোম সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

শ্রীমন্ত মাথা নেড়ে সায় দেওয়ায় সোম অবাক হয়ে আবার বললেন, 'জয়ন্তবাবু চুরি করে সেটা নকল করতে গেছলেন! আশ্চর্য তো! নক্সাটার কোনও মানেই তো বার করা যায় না বলছিলেন।

'না, তা যায়নি এখনও।' শ্রীমন্ত স্বীকার করলে।

'তবু, সেটা বেশ দামি জিনিস মনে হচ্ছে।' সোম চিন্তিত হলেন।

'হ্যাঁ, আগে জানলে আর একটু সাবধানেই লুকিয়ে রাখতাম,' শ্রীমন্ত আফশোস জানালে।

'যাই হোক!' সোম সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'যে খবরটা দিলেন, তা থেকেও একটা সূত্র বোধহয় আমরা পেতে পারি।'

'আমারও তাই মনে হয়!' বলে শ্রীমন্ত যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়াল।

'আপনাকে উপদেশ দেওয়ার দরকার নেই, তবু বলছি এখন থেকে চোখ-কান আরও একটু সজাগ রাখবেন।' বিশেষ একটু ইঙ্গিতেব সঙ্গে সোম এই শেষ কথাটি শুধু জানিয়ে দিলেন।

সোম যে মিথ্যে ইঙ্গিত করেননি পরেরদিন দুপুরবেলায় তার প্রমাণ পাওয়া গেল। বাড়ির পেছনের মহল এখন একেবারে নির্জন। মামাবাবুর এখনও জ্ঞান হয়নি, ললিতা ও নমিতা ভেতরের মহলে তাঁরই পরিচর্যায় ব্যস্ত, আর দারোগার ভয়েই বোধহয় ভিখিরিসাহেবকেও আজকাল আর এদিকে দেখাই যায় না।

সেই নির্জন ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দুপুরবেলা ঘুরতে-ঘুরতে একবার ঢুকে শ্রীমন্ত অবাক হয়ে গেল।

পোড়োবাড়ির বাগানের মাঝখানে যে পুরোনো ইঁদারাটি আছে, প্রকাণ্ড একটি দড়ি তার ভেতর নামিয়ে জয়ন্ত কী যেন করছে।

দড়িটি ধীরে-ধীরে গুটিয়ে তোলবার পর দেখা গেল তাতে কুয়ো থেকে ডোবা বালতি ঘড়া ইত্যাদি তোলবার একটি কাঁটা বাঁধা।

কাঁটা দিয়ে ইঁদারা থেকে কী তোলবার চেষ্টা করছিল জয়ন্ত?

শ্রীমন্ত কাছে গিয়ে সেই প্রশ্নই করলে, 'ব্যাপার কী জয়ন্তবাবু! কী, করছেন কী এটা?'

পেছনদিক থেকে আসার জন্যই বোধহয় জয়ন্ত এতক্ষণ শ্রীমন্তকে দেখতে পায়নি। দেখতে পেয়ে দড়ি থেকে কাঁটাটা খুলতে-খুলতে বেশ একটু কর্কশ স্বরেই বললে, 'কী করছি, বুঝতে পারছেন না?'

'না,' শ্রীমন্ত যতদূর সম্ভব পরিহাসের মতো করে কথাটাকে বলবার চেষ্টা করলে, 'তবে ক'দিন থেকেই আপনার গতিবিধি আমার কেমন সন্দেহজনক মনে হচ্ছে!'

'তাই নাকি!' তীক্ষ্নস্বরে কথাটা বলেই জয়ন্ত যা করে বসল শ্রীমন্ত তা বোধহয় কল্পনাও করতে পারেনি। দড়ি থেকে কাঁটাটা খোলা তার হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ প্যান্টের পকেট থেকে একটা পিস্তল বার করে সে তীব্র বিদ্রূপের সঙ্গে বললে, 'তাহলে, সন্দেহ যখন একবার হয়েছে,

তখন একেবারে সেটা মিটিয়ে দেওয়া যাক।'

শ্রীমন্ত চমকে উঠে বুঝি আপনা থেকে পিছিয়ে যাচ্ছিল। জয়ন্ত পিস্তলটা তার একেবারে বুকের উপর লক্ষ করে ধমকে উঠল, 'দাঁড়ান।'

'আরে মশাই, করছেন কী!' শ্রীমন্ত বিমূঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে পড়ে ব্যাপারটা হয়তো তামাসা হতে পারে এই ভরসায় বললে, 'এরকম ঠাট্টা ভালো নয়। পিস্তলে সত্যি গুলি-টুলি আছে নাকি?'

'এখনও ব্যাপারটা ঠাট্টা বলে আপনার মনে হচ্ছে!' উগ্রস্বরে জয়ন্ত হুকুম করলে, 'দাঁড়ান ফিরে দাঁড়ান।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে শ্রীমন্ত বললে, 'আপনার তো সত্যি মাথা খারাপ হয়ে গেছে দেখছি। কী করতে চান আমাকে?'

পিস্তলটা ইঁদারার পাড়ের উপর রেখে দড়িটা হাতে গুছিয়ে নিয়ে জয়ন্ত পেছন থেকে বললে, 'কিছু নয়। এইখানে একটু বেঁধে রাখতে চাই। হাত দুটো পেছনে দিন।'

অসহায়ভাবে হাত দুটো পেছনে দিয়ে শ্রীমন্ত হতাশভাবে বললে, 'এ তো ভালো জ্বালায় পড়লাম! আমায় সত্যি বেঁধে রাখবেন! কী করেছি আমি?'

'কী করেছেন?' বেশ জম্পেশ করে দড়ি দিয়ে হাত দুটো পেছন থেকে বাঁধতে-বাঁধতে জয়ন্ত বললে, 'আমায় সন্দেহ করতে শুরু করেছেন। আর সন্দেহ যখন একবার করেছেন, তখন আপনাকে ছেড়ে রাখতে পারি না।'

'কিন্তু বেঁধে তো রেখে যাচ্ছেন, তারপব?' এই বিপদের মধ্যেও শ্রীমন্তর গলার স্বরে এবার একটু কৌতুকেব আভাস।

'তারপর কী, তা যদি এখনও বুঝতে না পেরে থাকেন,' জয়ন্ত আগের মতোই কঠিন স্বরে বললে, 'তাহলে একটু ধৈর্য ধরে থাকুন! বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না।'

বাইরে কৌতুকের ভান করলেও শ্রীমন্ত একাগ্রভাবে একটুখানি সুযোগের অপেক্ষাই করছিল। পেছনে দড়ি বাঁধতে-বাঁধতে জয়ন্তর হাতের টান একটু আলগা বলে বোধ করতেই সে নিজের হাত দুটো টেনে নিয়ে বিদ্যুৎগতিতে ফিরে দাঁড়াল।

কিন্তু আর কিছু করবার সুযোগ সে পেল না। জয়ন্ত তার চেয়েও ক্ষিপ্রবেগে পিস্তলটা তখন ইঁদারার পাড় থেকে তুলে নিয়ে তার দিকে উঁচিয়ে ধরেছে।

'উঁহুঁ, কোনও চালাকি করবার চেষ্টা করবেন না। এ-পিস্তলটা যদি আপনার ঠাট্টা বলে ধারণা হয়ে থাকে, তাহলে ঠাট্টার নমুনাটা একটু দেখে রাখুন।' জয়ন্ত শ্রীমন্তর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে ডানহাতটা আকাশের দিকে তুলে দুবার পিস্তলের আওয়াজ করলে।

মামাবাবুর বিছানার পাশে বসে ললিতা ও নমিতা সে আওয়াজে চমকে উঠল। কিছুক্ষণ আগেই মামাবাবুর সামান্য একটু জ্ঞান হয়েছিল, তিনি জড়িত কণ্ঠে কী যেন বলতে চাইছিলেন। ডাক্তারের নির্দেশ মতো কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে ললিতা তৎক্ষণাৎ ওষুধ খাইয়ে তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে।

আওয়াজটা শুনেই ললিতা উঠে দাঁড়িয়েছিল। তাকে তারপর ঘর থেকে বেরুতে দেখে নমিতা সভয়ে বলে উঠল, 'ও কী দিদি, যাচ্ছ কোথায়! আমার ভয় করছে।'

'ছেলেমানুষি করিসনি। দিনেরবেলা আবার ভয় কীসের। আওয়াজটা কীসের দেখতে হবে না!' বলে ললিতা বেরিয়ে গেল।

নমিতাকে কিছু না বললেও আওয়াজটা সম্ভবত বন্দুকের ও পেছনের মহল থেকেই

হয়েছে বুঝে ললিতা যখন সেদিকে যাচ্ছে, শ্রীমন্তকে বাগ মানিয়ে পিছমোড়া করে তার হাত বাঁধা শেষ করে জয়ন্ত তখন ইঁদারার থামটার সঙ্গে তাকে ভালো করে বাঁধছে।

বাঁধা শেষ হওয়ার পর বাঁধনটা যথেষ্ট মজবুত কিনা জয়ন্তকে পরীক্ষা করতে দেখে শ্রীমন্তর মুখে এবার হাসি দেখা গেল।

'বাঁধা আপনার হল?' হেসে জিজ্ঞাসা করে সে বললে, 'দেখুন, আর্টিস্ট মানুষ, ম্যাজিসিয়ান নই। আপনার এ-বাঁধন কোনও মন্ত্রবলে খুলতে পারব না।'

শ্রীমন্তর কাঁধ থেকেই তার চাদরটা তুলে নিয়ে বাগিয়ে ধরে জয়ন্ত বললে, 'তবু সাবধানের মার নেই।'

'ওঃ, মুখটাও বেঁধে ফেলতে চান?' শ্রীমন্তর মুখে এখনও কৌতুকের হাসি। 'বেশ বাঁধুন। তবে তার আগে একটা কথা বলে নিই। সত্যিই আপনাকে আমি চিনতে ভুল করেছিলাম। তা না হলে...'

পাকানো চাদরটা চাপা দিয়ে কথা বন্ধ করে তার মুখটা থামের সঙ্গে বাঁধতে-বাঁধতে জয়ন্তই শ্রীমন্তর কথা শেষ করে দিলে, 'তা না হলে আজ এ-দুর্দশা আপনার হতো না।'

বাঁধা শেষ করে সবটার উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সে আবার নিষ্ঠুর বিদ্রুপের সঙ্গে বললে, 'আচ্ছা এখন আপনি পরমানন্দে ইষ্ট নাম জপ করতে পারেন। আপনার চাবিগুলো আমি শুধু একটু ধার নিচ্ছি।'

শ্রীমন্তর পকেট হাতড়ে একটা চাবির তোড়া বার করে নিয়ে জয়ন্ত যেভাবে হেসে চলে গেল সেই অবজ্ঞার হাসিটুকুই বুঝি অসহ্য।

জয়ন্ত দৃষ্টির বাইরে যেতে না যেতে পোড়ো বাড়ির কোনও গোপন জায়গা থেকে ভিখিরিসাহেব বেরিয়ে এল। সে যে এতক্ষণের সমস্ত ব্যাপার নীরবে গোপনে লক্ষ করেছে, এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

নিজস্ব ভঙ্গিতে শ্রীমন্তর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েও তার বাঁধন খোলবার কোনও চেষ্টা সে কিন্তু করলে না।

তার বদলে সে কী অদ্ভুত তার হাসি। শ্রীমন্ত জব্দ হওয়ায় সে যেন খুশিই হয়েছে।

এই হাসি অবশ্য বেশিক্ষণ তার চলল না। হঠাৎ দূরে পায়ের শব্দ পেয়েই সে চট করে সেখান থেকে সরে গেল।

এবারের পায়ের শব্দ ললিতার। কাছে এসে শ্রীমন্তকে ওই অবস্থায় দেখে সে তো অবাক।

'এ কী! আপনাকে বাঁধলে কে?'

জবাব দেবে কে? শ্রীমন্তর মুখই বাঁধা। ললিতা এবার বাঁধনগুলো খোলবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল। কিন্তু অত শক্ত বাঁধন খোলা কী তার সাধ্য।

'Excuse me !'

ললিতা চমকে ফিরে তাকাল। সেই ভিখিরিসাহেব অমায়িকভাবে হেসে তাদের কাছেই এসে দাঁড়িয়েছে।

ললিতার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল তার উপর, 'তুমি, তুমিই এঁকে বেঁধেছ? পাজি! বদমাশ!'

'Oh, No, No, No !' ভিখিরিসাহেবের গলায় যেন মধু 'I am a poor begger. I never do that.'

হঠাৎ ললিতাকে সাহায্য করবার জন্যে সে ব্যাকুল হয়ে উঠল, 'Want a knife? I have got a knife.'

ঝোলার ভেতর হাত ঢুকিয়ে মস্ত এক ছোরা বার করে ললিতার সামনে ধরে সে বললে, 'Here"s a nice little knife!'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ছোরাটা ললিতাকে নিতে হল। বাঁধন কেটে শ্রীমন্তকে মুক্ত করতে এবার বেশিক্ষণ লাগল না।

'কী ব্যাপার বলুন তো! আপনাকে এমন করে বাঁধল কে!' ললিতা প্রশ্নটা নতুন করে করলে।

'কে বাঁধল?' শ্রীমন্ত অত্যন্ত দুঃখের হাসি হাসল। 'নামটা করলে বিশ্বাসই করতে পারবেন না। আমারই এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'I know, I know.' বলে বাহাদুরি নিতে গিয়ে হঠাৎ ফিরে তাকিয়েই ভিখিরিসাহেব একেবারে অন্য সুর বার করে ফেললে, 'Good evening Inspector.'

সত্যিই মিঃ সোম যে কখন তাদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে, কেউ টেরই পায়নি।

দারোগাকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়েই ভিখিরিসাহেব সরে পড়বার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু সোম হাত বাড়িয়ে তার কাঁধের জামাটা ধরে ফেললে।

'কাঁহা যাতে হো৷ What do you know?'

বেড়ালের থাবায় যেন ইঁদুর এমনইভাবে ভিখিরিসাহেব নাকে কেঁদে উঠল। 'No, No I know nothing. I am a poor beggar. ভিখ মাঙকে খাতা।'

'ভিখ মাঙকে খাতা!' সোম কড়া ধমক দিয়ে উঠল, 'তোমার শয়তানি আমি একদিন সিধে করে দেব!'

সামনে গুরুতর ব্যাপার থাকার দরুনই বোধহয় ভিখিরিসাহেব এ-যাত্রায় রেহাই পেয়ে গেল। সজোরে ধাক্কা দিয়ে উপদ্রবটাকে সরিয়ে দিয়ে সোম আসল ব্যাপারে মনোযোগ দিলে।

'কী হয়েছে কী, বলুন তো? এ-দড়ি কীসের?'

'এই দড়ি দিয়ে কে ওঁকে বেঁধেছিল।' ললিতা উত্তেজিত ভাবে জানালে। 'একটা বন্দুকের আওয়াজ শুনে, খোঁজ করতে এসে দেখি এই অবস্থা।'

'বন্দুক নয়, পিস্তলের আওয়াজ।' সোম সংশোধন করে বললে, 'আমিও তাই শুনেই আসছি। কিন্তু শ্রীমন্তবাবুকে বাঁধলে কে?'

শ্রীমন্ত নিজেই এ-প্রশ্নের উত্তর দিলে, 'শুনলে অবাক হবেন। বেঁধেছেন জয়ন্তবাবু। তাঁর মাথাটা হঠাৎ খারাপই হয়ে গেছে মনে হচ্ছে।'

হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে সে আবার বলে উঠল, 'ওই যা ভুলেই গেছলাম। আমার ঘরের চাবিটাবি জয়ন্তবাবু নিয়ে গেছেন।'

'চাবি নিয়ে গেছেন।' সোম রীতিমতো চঞ্চল হয়ে উঠে বললেন, 'শিগগির আসুন, যেতে-যেতে সব কথা শুনব।'

সোম ও শ্রীমন্ত দ্রুতপদে বেরিয়ে যাওয়ার পর দেখা গেল ললিতাও তাদের পেছনে আছে।

সোমই প্রথম শ্রীমন্তর বাড়িতে গিয়ে ঢুকলেন। তাঁর পিছু-পিছু শ্রীমন্ত ও ললিতা। জয়ন্তকে বেশি খোঁজাখুঁজি অবশ্য তাদের করতে হল না।

চাবির রিংটা আঙুলে ঘোরাতে-ঘোরাতে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে যেন তাদেরই অপেক্ষা করছিল।

কেউ কিছু বলবার আগে সে-ই শ্রীমন্তকে উদ্দেশ করে বললে, 'ও, আপনি ছাড়া পেয়েছেন তাহলে।' তারপর সোম ও ললিতার দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে চেয়ে আবার টিপ্পনি কাটলে, 'আপনার বন্ধুভাগ্য ভালো দেখছি।'

'বন্ধু তো আপনাকেও মনে করতাম।' শ্রীমন্ত ক্ষুণ্ণ স্বরে জানালে।

'আশা করি সে ভুল আপনার ভেঙেছে!'

'মিছে কথা কাটাকাটি করে লাভ নেই জয়ন্তবাবু!' সোম কঠিন স্বরে জানালে, 'You are under arrest!'

'Under arrest!' জয়ন্তকে একটু বিচলিত মনে হল কি? কিন্তু সে শুধু এক মুহূর্তের জন্যে। তারপরই সে ব্যঙ্গের সুরে বললে, 'তা তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু কেন জানতে পারি?'

'এখনও কেন জিজ্ঞাসা করছেন?' সোম পালটা বিদ্রুপ করলেন, 'শ্রীমন্তবাবুকে বেঁধে রেখে চাবি চুরি করে তাঁর ঘরে ঢোকাই কী যথেষ্ট নয়!'

'এই অভিযোগেই তাহলে আমায় গ্রেপ্তার করছেন?'

'না, শুধু এই অভিযোগ নয়। অন্য অভিযোগ আছে।' সোমকে এত কঠিন হতে আগে কখনও দেখা যায়নি।

জয়ন্ত তবু তার বেপরোয়া ভাব বজায় রেখেই জিজ্ঞাসা করলে, 'যেমন?'

'যেমন নরহত্যা।' ধীরে-ধীরে সোম কথাগুলো উচ্চারণ করলেন।

হঠাৎ যেন ঘরে একটা বাজ পড়ে সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল।

'নরহত্যা!' জয়ন্তর গলা এইবার বুঝি কাঁপল একটু, 'আমার বিরুদ্ধে নরহত্যার অভিযোগও আছে তাহলে!'

'হ্যাঁ।' নির্মমভাবে সোম বলে গেলেন, 'বাড়ি কিনতে এসে যে লোকটি এখানে মারা যান তাকে আপনিই হত্যা করেছেন।'

সোমের কথার ওপরই হঠাৎ ললিতার কাতর স্বর শোনা গেল, 'না, না, এ আমি বিশ্বাস করি না।'

এক পাশে দাঁড়িয়ে সে এতক্ষণ নীরব শ্রোতা মাত্র হয়েছিল। কিন্তু নিজেকে এবার আর সম্বরণ করতে পারল না।

জয়ন্ত যেন ললিতার এই উচ্ছ্বাসে নিজের সাফাই গাইবার একটা সুযোগ পেয়ে গেল।

'বিশ্বাস কোরো না ললিতা, এ-সমস্তই মিথ্যে।' জোর গলায় ললিতাকে আশ্বাস দিয়ে সে সোমের দিকে ফিরে উদ্ধতভাবে জিজ্ঞাসা করলে, 'কী প্রমাণ তার আপনারা পেয়েছেন? তাকে হত্যা করে আমার লাভ কী?'

'লাভ পথের কাঁটা সরানো।' সোম শান্ত-দৃঢ় কণ্ঠে বলতে শুরু করলেন, 'আপনি কে, তা আমরা জানি জয়ন্তবাবু। শশীশেখরবাবুর পদবি যে সামন্ত ছিল, কেউ বলে দেওয়ার আগেই আপনি যখন থানায় প্রথম বলে ফেলেন, তখনই আমার সন্দেহ হয়। তারপর সন্ধান নিয়ে সবকিছুই আমরা জেনেছি। বলুন, আপনিই শশীশেখরবাবুর সব চেয়ে নিকট আত্মীয় কি না! বলুন, তাঁরই লুকোনো সম্পত্তির লোভে আপনি প্রথম ও-বাড়িতে গিয়েছিলেন কি না!

এই প্রবল জেরার সামনে জয়ন্ত এসব আর অস্বীকার করতে পারলে না। একেবারে অন্য সুর ধরে সে বললে, 'যদি গিয়ে থাকি তাতে দোষ কী! শশীশেখরবাবুর আত্মীয় হওয়াটাই একটা অপরাধ বোধহয় নয়। শশীশেখরবাবু আমার দূর সম্পর্কে কাকা হতেন, তাঁর চিঠি পেয়েই বর্মা থেকে এখানে আমি খোঁজ করতে আসি কিন্তু ঠিকানা ভুল থাকার দরুন তাঁর চিঠি অনেক দেরিতে আমার হাতে পড়েছিল। আমি যখন এখানে এসে পৌঁছই তার অনেক আগেই সব শেষ হয়ে গেছে।'

'বর্মা থেকে চলে আসবার সময় এসব কিছুই তো তুমি জানাওনি!' ললিতার ব্যথিত, বিস্মিত কণ্ঠ আবার শোনা গেল।

'উপায় ছিল না বলে জানাইনি।' জয়ন্ত ললিতার মারফত যেন সকলকে বোঝাতে চাইলে, 'কাকাবাবু তাঁর চিঠিতে কাউকে কিছু জানাতে বিশেষ ভাবে বারণ করে দিয়েছিলেন। তাঁর জীবন যে বিপন্ন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তাঁর যা কিছু ছিল আমায় বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যে লুকিয়ে আমায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন।'

'কিন্তু এখানে এসে সব জানবার পরও নিজের পরিচয় গোপন করেছিলেন কেন?' শ্রীমন্ত জিজ্ঞাসা করলে।

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি এ-কথার কোনও উত্তর দিতে পারল না।

সোমই তার বদলে তিক্ত স্বরে বললেন, 'তা না করলে ওঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধির সুবিধে হতো না যে। প্রথম রাত্রে ভয় পাওয়ার যে গল্প বলে উনি আপনাকে অভিভূত করে দেন, সেটাও আপনার এখানে আশ্রয় নেওয়ার একটা ফিকির কি না কে জানে! অথচ আপনার কাছে আশ্রয় নিয়ে উনি প্রথম থেকে আপনার বিরুদ্ধেই আমাদের সন্দিগ্ধ করে তোলবার চেষ্টা করে এসেছেন।'

'তাতে ওঁর লাভটা কী, তা তো বুঝতে পারছি না।' শ্রীমন্ত বেশ বিস্মিত।

'লাভ প্রথমত সন্দেহটা ভুল পথে চালিয়ে আত্মগোপন করার সুবিধে; আর দ্বিতীয়ত আপনার বিরুদ্ধে আক্রোশ মেটানো।'

'আমার বিরুদ্ধে আক্রোশ!' সোমের কথায় শ্রীমন্ত একেবারে অবাক, 'আমার বিরুদ্ধে ওঁর আক্রোশ হবে কেন?'

'মাপ করবেন। বাধ্য হয়েই তাহলে সত্য কথাটা আমায় বলতে হচ্ছে।' সোম একটু ইতস্তত করে ললিতাকে দেখিয়ে বললেন, 'আক্রোশের কারণ, ললিতাদেবী। আপনার সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা হওয়াটা বোধহয় জয়ন্তবাবুর পছন্দ নয়।'

শ্রীমন্ত ও ললিতা দুজনেই একথায় সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। কিন্তু জয়ন্ত একেবারে জ্বলে উঠল। উগ্র কর্কশ স্বরে বললে, 'আমাকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে এসব অবান্তর কথার বোধহয় কোনও প্রয়োজন নেই। কীসের জোরে আমায় গ্রেপ্তার করছেন, সে পরোয়ানাটা এখন দেখতে পারি?'

'পরোয়ানার দরকার হবে না।' সোম কঠিন স্বরে জবাব দিলেন। 'পরের বাড়ি চুরি করতে এসে হাতে-হাতে আপনি ধরা পড়েছেন। সেই অভিযোগেই আপাতত আপনাকে গ্রেপ্তার করছি।'

'না।' হঠাৎ পকেট থেকে পিস্তল বার করে জয়ন্ত হিংস্রভাবে গর্জন করে উঠল। 'সে সুযোগ আপনাকে দিচ্ছি না। কোনওরকম চালাকির চেষ্টা করবেন না। যান একদিকে সরে যান।'

জয়ন্তর এই চালের জন্যে কেউ প্রস্তুত ছিল না। পিস্তল উঁচিয়ে সকলকে একদিকে সরে যেতে বাধ্য করে ধীরে-ধীরে দরজার দিকে পিছিয়ে যেতে লাগল। একবার দরজা দিয়ে বেরুতে পারলে তাকে ধরা প্রায় অসম্ভব।

'জয়ন্ত!' ললিতাই হঠাৎ চিৎকার করে উঠল। বাইরে থেকে একজন কনস্টেবল দরজার দিকে আসছে।

ললিতার চিৎকারে জয়ন্ত চমকে পিছন ফিরে তাকাতেই শ্রীমন্ত ও সোম তার ওপর গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

তারপর ধস্তাধস্তি খানিকটা হলে পিস্তল কেড়ে নিয়ে জয়ন্তকে বেঁধে ফেলতে বেশিক্ষণ তাদের লাগল না।

'আশা করি এবার ভালোয়-ভালোয় থানায় যাবেন, জয়ন্তবাবু!' সোম বেশ বিদ্রুপের সঙ্গেই বললেন, 'আর গোলমাল করে কোনও লাভ নেই।'

জয়ন্তর হাত বাঁধা। চোখ দুটো শুধু তার জ্বলে উঠল। দাঁতে দাঁত চেপে সে বললে, 'সে উপদেশ না দিলেও চলবে। চলুন, কোথায় যেতে চান।'

সোম ও কনস্টেবল জয়ন্তকে নিয়ে চলে যাওয়ার পর শ্রীমন্ত একটু বিব্রতভাবে ললিতার পেছনে এসে দাঁড়াল।

'ব্যাপারটা আমি কিন্তু এখনও ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না, ললিতাদেবী। সান্ত্বনার স্বরে সে বললে, 'কোথায় যেন কী একটা খটকা লাগছে। তাই বলছি, আপনি এখন থেকেই হতাশ হবেন না।'

জয়ন্ত ধরা পড়ার পর থেকে ললিতা একটি জানলার ধারে দূরের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এবার মুখ ফিরিয়ে ম্লান একটু হেসে সে বললে, 'আমি হতাশ হব কেন? দোষী হয়েও জয়ন্তবাবু ছাড়া পান, এই আমি চাই বলে যদি মনে করে থাকেন, তাহলে আমায় ভুল বুঝেছেন।'

'না, ভুল আমি বুঝিনি।' শ্রীমন্তও বিষণ্ণভাবে একটু হেসে বললে, 'চলুন আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিই।'

সমস্ত রাস্তা দুজনেই প্রায় নীরব। মাঝে-মাঝে শ্রীমন্তকেই শুধু কুণ্ঠিতভাবে দু-একটা নিজের কথা বলতে শোনা গেল।

ললিতাদের বাড়ির কাছে এসে সে বিদায় নিয়ে বললে, 'আচ্ছা আমি এখন তাহলে যাই।'

ললিতা প্রতি নমস্কার করে বললে, 'ধন্যবাদ!'

শ্রীমন্ত যেতে গিয়েই ফিরে দাঁড়াল।

'ধন্যবাদ পাওয়ার মতো কিছুই এখনও করতে পারিনি, ললিতাদেবী।' আহত স্বরে সে জানালে, 'তবে আপনাকে এতক্ষণ যা বলেছি, সেকথা কটি মনে রাখবেন। আমি আপনাদের সত্যিকার একজন বন্ধু এই কথাটা বিশ্বাস করবেন, আর জানবেন, এ-বাড়ির শেষ রহস্যের মীমাংসা আমি করবই।'

'মীমাংসার কি এখনও কিছু বাকি আছে মনে করেন!' ললিতা ক্লান্তভাবে একটু হাসল।

'থাকতেও তো পারে!' শ্রীমন্ত নিজের সংশয়টা বেশ স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করলে, তারপর 'আজ রাত্রেই একবার শেষ চেষ্টা করে দেখব।' বলে দ্রুতপদে বেরিয়ে চলে গেল।

সতেরো

সন্ধে পর্যন্ত মামাবাবুর বিছানার ধারে কাটিয়ে ললিতা কিছুক্ষণের জন্যে নমিতাকে সেখানে বসিয়ে একটু মুখ-হাত ধুতে এসেছিল।

স্নানের ঘর থেকে জামাকাপড় ছেড়ে বেরুতে না বেরুতেই নমিতা সেখানে ব্যাকুল হয়ে ছুটে এল, 'দিদি, দিদি, শিগগির এসো।'

'কেন! কী, হয়েছে কী?' ললিতা সভয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

'মামাবাবুর আবার জ্ঞান হয়েছে। মিঃ সোমকে খুঁজছেন।' নমিতা হাঁপাতে-হাঁপাতে জানালে।

দুই বোন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মামাবাবুর ঘরে ছুটে গেল। সত্যিই তিনি বিছানার ওপর উঠে বসেছেন।

'ও কী মামাবাবু, তুমি উঠে বসেছ কেন?' ললিতা মামাবাবুকে গিয়ে ধরল।

ললিতাকে দেখে মামাবাবু অস্থির হয়ে উঠলেন, 'মিঃ সোমকে এখুনি একবার খবর দে তো ললিতা এক্ষুনি দেওয়া দরকার।'

'আচ্ছা খবর দিচ্ছি। কিন্তু তুমি অত কথা বোলো না ডাক্তারের বারণ আছে।' নমিতাকে মামাবাবুকে ধরতে ইঙ্গিত করে কাছেব টিপয়-এর ওপর থেকে ঘুমের ওষুধের একটা বড়ি নিয়ে ললিতা আবার বললে. 'আচ্ছা, এই ওষুধটা খেয়ে নাও তো।'

সামান্য দু-একবার যে জ্ঞান হয়েছে, তার ভেতর আচ্ছন্ন ভাবে ওষুধ খাওয়ার কথাটাই মামাবাবুর একটু মনে আছে। ঈষৎ বিরক্তিব সঙ্গে তিনি বললেন, 'ওষুধ তো খাচ্ছি কিন্তু...'

ললিতা কিন্তু ছাড়বার পাত্রী নয়। ওষুধ মামাবাবুকে খেতেই হল। তারপর আবার তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'মিঃ সোমকে এখুনি কিন্তু না ডাকলে নয়,'

'বলছি তো ডাকতে পাঠাচ্ছি তুমি এখন একটু চুপ করে শোও দেখি!' ললিতা একরকম জোর কবে মামাবাবুকে শুইয়ে দিয়ে বললে, 'তুমি যদি শান্ত হযে না ঘুমোও, আমি কিন্তু কোনও কথা শুনব না।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, আমি ঘুমোচ্ছি।' মামাবাবু অসহায়ভাবে অনুরোধ করলেন, 'তুই কিন্তু এখুনি খবর পাঠা।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, পাঠাচ্ছি।' বলে মামাবাবুকে সান্ত্বনা দেওয়াব জন্যেই সে বেরিয়ে গেল।

রাত তখন বেশ গভীর হয়েছে। ওষুধের দরুন মামাবাবু অনেকক্ষণ হল অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। নমিতাকে খাইয়ে-দাইয়ে শুতে পাঠালেও ললিতা কিন্তু মামাবাবুর বিছানা ছেড়ে যেতে আর সাহস করেনি। পাশের একটি চেয়ারে বসে সে একটা বই পড়বার চেষ্টা করছিল। এমনসময় ভুতোর মা এসে ইশারায় তাকে ডাকল।

ভয়ডরের ব্যাপার যে নয়, ভুতোর মার মুখ দেখেই তা বোঝা গেল। উঠে পড়ে বিছানা থেকে একটু দূরে গিয়ে ললিতা তাই একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'কী, হয়েছে কী!'

'সেই ছবি আঁকা বাবু এসেছেন! তোমায় একবার ডাকছেন!' ভুতোর মা চুপি-চুপি জানালে।

'কে ডাকছেন? শ্রীমন্তবাবু?' ললিতা জিজ্ঞাসা করলে।

ভুতোর মা প্রসন্ন মুখে মাথা নেড়ে জানালে, 'হ্যাঁ।' শ্রীমন্তবাবুর ওপর তার একটু

বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা আছে। না হলে আর কেউ এত রাত্রে বিরক্ত করতে এলে সে তার মুণ্ডুপাত না করে ছাড়ত না।

'এত রাত্রে!' নিজের মনেই একবার বলে ভুতোর মাকে মামাবাবুর কাছে বসিয়ে ললিতা বেরিয়ে গেল।

ওপরের বসবার ঘরেই শ্রীমন্ত ললিতার অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল।

ললিতা ঢোকবার পর সে একটু সঙ্কুচিত ভাবে বললে, 'আপনাকে এত রাত্রে একটু বিরক্ত করলাম, ললিতাদেবী। কিছু মনে করবেন না। আজই আপনাকে বলেছিলাম যে, এ-বাড়ির রহস্যের যা মূল তা নিজে আমি শেষ একবার খুঁজে দেখতে চাই। সেইজন্যেই এখন যাচ্ছি।'

'এই এত রাত্রে আপনি একলা ওদিকে যাবেন!' ললিতা বিস্ময় প্রকাশ করলে।

'হ্যাঁ, একলা ছাড়া আর কাকে সঙ্গে নেব!' শ্রীমন্ত একটু হাসল। তা ছাড়া এখন আর ভয়ের কিছু তো না থাকবারই কথা।'

একটু চুপ করে থেকে শ্রীমন্ত বললে, 'বিপদ যদি কিছু হয় আপনার আত্মরক্ষার জন্যে এই জিনিসটি দিয়ে যাচ্ছি।'

পকেট থেকে একটা ছোট পিস্তল বার করে সে ললিতার দিকে বাড়িয়ে ধরল।

পিস্তলটা নিতে একটু দ্বিধা করে ললিতা বললে, 'ও জিনিস কখনও ব্যবহার কবিনি, ওর কিছু দরকারও হবে না।'

'না হওয়ারই কথা! তবু কাছে রাখলে তো কোনও ক্ষতি নেই। দুপুরের মতো আমায় আবার সাহায্যও তো করতে পারেন।' বলে একটু হেসে পিস্তলটা ললিতার হাতে দিয়ে শ্রীমন্ত বেরিয়ে গেল।

পিস্তলটা হাতে নিয়ে ললিতা অনেকক্ষণ সেখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর নিজের ঘরে ফিরে এসে পিস্তলটা টেবিলেব ওপর রেখে জানলার ধাবে গিয়ে দাঁড়াল। বয়স তার এমন কিছু বেশি নয়। কিন্তু এবই মধ্যে সে যেন অত্যন্ত ক্লান্ত।

বাইরের বাগান ছাড়িয়ে পেছনের পোড়ো নাটমহলের জঙ্গলে শ্রীমন্ত তখন গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তার এক হাতে একটি লণ্ঠন আর এক হাতে একটি শাবল। শাবলটা মাটিতে রেখে সে লণ্ঠনটা জ্বেলে নিলে, তারপর শাবল ও লণ্ঠন নিয়ে ভাঙা ইট-পাথরের ঢিবির ওপর দিয়ে ভগ্নস্তূপের একটি জায়গায় গিয়ে বসল।

শ্যাওলাধরা ভাঙা ইটপাথর চারিদিকে ছড়ানো। তারই ভেতরে ছোট-ছোট গাছের ঝোপ। এরকম জায়গায় শ্রীমন্ত যে অকারণে বসেনি খানিক বাদেই তা বুঝতে পারা গেল। পকেট থেকে নক্সার কাগজটা বার করে সে লণ্ঠনের আলোয় ভালো করে একবার দেখে নিলে। তারপর সেটা পকেটে আবার ভরে রেখে সবলে শাবলটা দিয়ে ওপরের ইট-পাথরের রাবিশ ও জঙ্গল সাফ করতে লেগে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ পরিশ্রম করবার পর জায়গাটা পরিষ্কার হতে সত্যিই একটি অদ্ভুত জিনিস চোখে পড়ল। লোহার মতো মজবুত কাঠের দুটি বন্ধ করা দরজার পাল্লা। তার দুটি কড়াতে একটি মরচে তালা আঁটা।

মরচে ধরা হলেও শাবলের চাড় দিয়ে তালাটা ভাঙতে শ্রীমন্তকে বেশ একটু বেগ পেতে হল। কিন্তু তালা ভেঙে পাল্লা দুটো খোলবার পর মনে হল সমস্ত পরিশ্রম সার্থক।

সুড়ঙ্গের মতো একটি ধাপ-কাটা পথ নিচে নেমে গেছে।

লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে সে সন্তর্পণে সেই সিঁড়ি দিয়ে ধীরে-ধীরে নামতে লাগল। বিস্ময়ে উত্তেজনায় বুক তার তখন সবেগে আন্দোলিত হচ্ছে। বহু কালের বন্ধ করা জায়গা। একটা ভ্যাপসা দুর্গন্ধে প্রথমটা যেন দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়।

বেশ কিছুটা সেইভাবে নামবার পর নিচের গুপ্ত ঘরে সে গিয়ে পৌঁছল। গুপ্ত ঘরটি যাঁরই কীর্তি হোক, বেশ মজবুত করেই পাথর দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। ঘরটি নেহাত ছোটও নয়, দুটি মোটা পাথরের থাম ওপরের ছাদটিকে ধরে রেখেছে।

লণ্ঠনটা নিয়ে প্রায় রুদ্ধ নিশ্বাসে শ্রীমন্ত ঘরের সমস্ত ঐশ্বর্য এক-এক করে দেখে ফিরতে লাগল। বড়-ছোট নানা আকারের পুরোনো সিন্দুক ও বাক্স। কোনওটা লোহার, কোনওটা কাঠের। কতদিনের কত পাপের উপার্জন যে সেখানে সঞ্চিত হয়ে আছে, তা হিসেব করা কঠিন। ঘরের এককোণে রাখা কয়েক বাক্স ডিনামাইটও তার দৃষ্টি এড়াল না।

তন্ময় হয়ে সমস্ত খুলে-খুলে দেখতে-দেখতে হঠাৎ শ্রীমন্তর হৃদপিণ্ডটা যেন বুকের ভেতর লাফিয়ে উঠল। যে সুড়ঙ্গসোপান দিয়ে সে নেমেছিল, তার পিছন ফিরে লণ্ঠনটা কাছেই রেখে, একটা বাক্সের তালা সে খুলে দেখছিল। হঠাৎ মনে হল পেছনে সেই সিঁড়িতে কার যেন সতর্কভাবে নেমে আসার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

ডালাটা বন্ধ করে বিদ্যুৎগতিতে সে পকেট থেকে পিস্তলটা বার করে ফিরে দাঁড়াল।

সেই গরিলা-মূর্তিই সিঁড়ির শেষ ধাপে নেমে দাঁড়িয়েছে!

ভয়ে বিস্ময়ে শ্রীমন্তর সমস্ত শরীর বুঝি প্রথমটা অবশ হয়ে গেছল। কিন্তু সে শুধু একমুহূর্তের জন্যে। তারপর গরিলা-মূর্তি তার দিকে আবার এগিয়ে আসবার চেষ্টা করতেই সে গুলি ছুঁড়ল।

কিন্তু গরিলা-মূর্তি শ্রীমন্তর চেয়েও তৎপর। পিস্তলের গুলি ছোটবার আগেই এক লাফে সে একটা থামের আড়ালে গিয়ে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়েছে দেখা গেল।

শ্রীমন্ত পর-পর আরও দুবার গুলি ছুঁড়লে। কিন্তু সে গুলি থামে ও দেয়ালে লেগেই ব্যর্থ হল। প্রত্যেকবারই বিদুৎগতিতে থামের আড়ালে সরে গিয়ে আত্মরক্ষা করলেও গরিলা-মূর্তি এভাবে আর কতক্ষণ পালিয়ে বাঁচবে।

তাই অকারণে গুলি নষ্ট আর না করে, উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় থেকে শ্রীমন্ত শুধু দাঁতে-দাঁত চেপে বললে, 'এখানে ঢোকবার সাহস তোমার হবে, অবশ্য ভাবিনি। তবু আমি প্রস্তুত হয়েই ছিলাম।'

'Were you really!' হঠাৎ মেঝের ওপর ছড়ানো লম্বা কার্পেটটার ওপর বসে পড়ে গরিলা-মূর্তি তার মুখোশটা খুলে ফেলে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল।

'তুমি!' বিস্ময়ে শ্রীমন্তর মুখ দিয়ে আর কোনও কথাই বার হল না। বিস্মিত হওয়া তার পক্ষে স্বাভাবিক, কারণ মুখোশ খুলে সেই ভিখিরিসাহেবই সমস্ত ঘর কাঁপিয়ে তখন হাসছে।

চট করে হাসি থামিয়ে ভিখিরিসাহেব বললে, 'Oh, you seem to be suprised! ঈস লিয়ে তৈয়ার নেহি থে?'

'তবে রে শয়তান!' ভিখিরিসাহেবের বিদ্রুপের হাসিতে শ্রীমন্ত যেন একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। থামের আড়ালে নয়, শত্রু এখন একেবারে তার নাগালের মধ্যে।

'আজই তাহলে তোর শেষ!' বলে সে গুলি ছোঁড়বার জন্যে পিস্তল নামাল।

পিস্তলের গুলি ঠিকই ছুটল, কিন্তু ভিখিরিসাহেবের দিকে নয়, একেবারে শূন্যে ছাদের

গায়ে। শ্রীমন্ত পিস্তল নামাতেই ভিখিরিসাহেব মেঝের লম্বা কার্পেটটায় সবেগে টান দিয়েছে। শ্রীমন্ত সেই কার্পেটের ওপরই দাঁড়িয়ে ছিল। কার্পেটের টানে পা হড়কে সে মেঝের ওপর সজোরে চিৎ হয়ে পড়ে গেল। আর তার লক্ষভ্রষ্ট পিস্তলের গুলিটা আগেই ছুটে গেল ওপর দিকে। সেইমুহূর্তেই হিংস্র বাঘের মতো ভিখিরিসাহেব তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল!

জানলার ধারে দাঁড়িয়ে প্রথম গুলির শব্দেই ললিতা চমকে উঠেছিল। পরপর আরও গুলির শব্দে সে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।

শ্রীমন্তর একা পেছনের মহলে যাওয়াটা ঠিক পছন্দ না করলেও, সত্যিকার কোনও ভয় সেখানে এখনও আছে তার মনে হয়নি।

কিন্তু এ-গুলির শব্দ তাহলে কীসের? শ্রীমন্তবাবুকে কেউ কি সত্যিই আক্রমণ করেছে অতর্কিতে!

নিদারুণ অস্বস্তি ও উদ্বেগ নিয়ে সে জানলা থেকে ঘরের মাঝখানের টেবিলটার কাছে এসে দাঁড়াল। শ্রীমন্তর দেওয়া পিস্তলটা তারই ওপর পড়ে আছে।

দ্বিধা-দ্বন্দ্বেরও অন্ত নেই তার মনে। কী এখন তার করা উচিত? সামান্য একজন মেয়ে হয়ে ওই পিস্তল নিয়েও কোন সাহসে ওই অন্ধকার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে একলা যাবে! আর গিয়েও কী সাহায্য সে করতে পারে? সে তো জীবনে কখনও পিস্তল ছোড়েনি।

সেই মুহূর্তে আবার গুলির শব্দ হতেই তার মন তৎক্ষণাৎ স্থির হয়ে গেল। কিছু পারুক বা না পারুক তাকে যেতেই হবে। অসহায় মেয়ে হওয়াব অজুহাতে চুপ করে বসে থাকতে সে পারবে না। পিস্তলটা টেবিলের ওপর থেকে তুলে নিয়ে সে নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়ল।

গায়ে বেশ ভালো রকম ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও শ্রীমন্ত ভিখিরি সাহেবের কাছে তখন কাবু হয়ে এসেছে। প্রথম মেঝের ওপর ধস্তাধস্তিতে শ্রীমন্তরই সুবিধা ছিল বেশি। তখনও তার হাতেই পিস্তল। কিন্তু পিস্তল ঠিকমতো ছোড়ার সুবিধে সে পেল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভিখিরিসাহেব প্যাঁচে ফেলে শ্রীমন্তর হাত থেকে পিস্তলটা ছিনিয়ে নিয়ে দূরে ফেলে দিলে। ভিখিরিসাহেব তখন শ্রীমন্তর বুকের ওপর চেপে বসেছে। প্রাণপণ শক্তিতে তাকে ঠেলে ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে শ্রীমন্ত যে ঘুঁষিটা মারল আর কেউ হলে তাতেই বোধহয় কাবার হয়ে যেত। কিন্তু ভিখিরিসাহেবের শরীর যেন ইস্পাত দিয়ে তৈরি। একেবারে ঘরের প্রান্তে ছিটকে পড়েও সে যেন স্প্রিং দেওয়া যন্ত্রের মতো লাফিয়ে ফিরে এলে ঘুঁষির পালটা জবাব যা দিলে শ্রীমন্ত তাতেই কাতরে লুটিয়ে পড়ল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই এ-ধাক্কা হয়তো সে সামলে উঠত। কিন্তু ভিখিরিসাহেব তার আগেই ঘরের মেঝে থেকে একটা দড়ি তুলে নিয়ে তার হাত দুটো পিছ মোড়া করে বেঁধে ফেললে। এরপর শ্রীমন্তর সব আস্ফালনই বৃথা। কোনও আশা আর নেই জেনে শেষ পর্যন্ত সে হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। সামনের একটা সিন্দুকের ওপর এক পায়ের হাঁটু দিয়ে চেপে রেখে ভিখিরিসাহেব আষ্টেপৃষ্ঠে দড়ি দিয়ে তখন তাকে বাঁধছে।

'এই ছোড়ো! ছোড় দো বলছি!'

এবার ভিখিরিসাহেবের চমকে ফিরে তাকাবার পালা। তার দিকে কম্পিত হাতে পিস্তল তুলে ললিতা তীক্ষ্নস্বরে আবার বললে, 'হাত তুলে দাঁড়াও।'

ভিখিরিসাহেবের এতক্ষণের হিংস্র চেহারা এক মুহূর্তে বদলে গিয়ে একটা অদ্ভুত হাসি তার মুখে ছড়িয়ে পড়ল।

'Ah! The brave little lady to the rescue! লেকিন হামার একঠো বাত তো শুনিয়ে!'

'কোনও কথা শুনতে চাই না।' কোনও চালাকিতে ললিতা এখন ভুলবে না। কঠিন স্বরে সে আবার জিজ্ঞাসা করলে, 'হাত তুলে দাঁড়াবে কি না?'

উত্তেজনায় পিস্তলটা তার হাতে কাঁপছে দেখা গেল।

'আরে, আরে, সচমুচ গোলি মত করনা। এই আমি হাত তুলেছি।' ভিখিরিসাহেব হাত তুলে দাঁড়াল। তারপর শ্রীমন্তকে তারই নাকের ওপর দিয়ে সরে যেতে দেখে তিক্ত স্বরে বললে, 'আপনার হাত কাঁপতে আছে, যেমন-তেমন গোলি ছুটে গেলে সত্যনাশ হোয়ে যাবে। এ-ঘরে ডিনামাইট যা আছে, একটা গোলি লাগলে আর কেউ বাঁচবে না। বিশোয়াস না হয়, শ্রীমন্তবাবুকেই পুছে লিন।'

শ্রীমন্ত ততক্ষণে ভিখিরিসাহেবেব কবল থেকে ছাড়া পেয়ে তার বাঁধন খুলে ফেলেছে। ছুড়ে ফেলা পিস্তলটা মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিয়ে সে গর্জন করে উঠল, 'কেউ বাঁচুক না বাঁচুক তোমাব আর রক্ষা নেই। চলে এসো ললিতা।'

পিস্তল দেখিয়ে ভিখিরিসাহেবকে ঠেকিয়ে রেখে, দুজনে পেছু হেঁটে সিঁড়ি বেয়ে উঠবার পব শ্রীমন্ত সশব্দে ওপরের দরজার পাল্লা দুটো বন্ধ করে দিলে।

'ভেতব থেকে খুলতে পারবে না তো?' ললিতার ভয় তখনও যায়নি।

ভাবী একটা ভাঙা থাম ও কয়েকটা পাথর দরজাটাব ওপর চাপা দিয়ে শ্রীমন্ত বললে, 'না, সে ভয় নেই, কেউ এসে ওপব থেকে খুলে না দেওয়া পর্যন্ত বাছাধন ওইখানেই পচে মরবেন।'

'বেশিক্ষণ ওখানে বন্ধ থাকলে সত্যিই মারা পড়বে।' এবার ললিতার ভয়টা অন্য রকমের। 'এখুনি পুলিশ ডেকে এনে ওকে ধরিয়ে দেওয়া দরকার।'

এসময়ে ললিতার এ-মমতার হাসি পেলেও তার হাত থেকে পিস্তলটা নিয়ে শ্রীমন্ত গম্ভীরভাবে বললে, 'হ্যাঁ, থানাতেই তো যাচ্ছি।'

দুজনে নিচের হল ঘরে পৌঁছবাব পর সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে পড়ে ললিতা বললে, 'আপনি তো এখন থানাতেই যাবেন। আমি তাহলে ওপরে যাচ্ছি।'

'ওপরে যাচ্ছ।' শ্রীমন্তকে যেমন বিস্মিত তেমনি একটু অপ্রসন্ন মনে হল 'তোমাকেও যে আমার সঙ্গে যেতে হবে ললিতা!'

'আমাকে! আমাকে যেতে হবে কেন?' ললিতা আপত্তি জানাল, 'না, মামাবাবুকে ফেলে আর এখন আমি যেতে পারি না।'

'তবু যেতেই যে হবে ললিতা।' শ্রীমন্তর কণ্ঠস্বরটা কেমন অদ্ভুত শোনাল। 'মামাবাবুকে চিরকালের মতো ফেলে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে।'

'এসব আপনি কী বলছেন!' ললিতা সবিস্ময়ে শ্রীমন্তের দিকে তাকাল।

শ্রীমন্ত হঠাৎ চমকে ফিরে তাকাল। যে পথ দিয়ে পেছনের মহল থেকে তারা এসেছে, সেখানে কীসের যেন একটা শব্দ। ফিরে তাকাবার সঙ্গে-সঙ্গে একটা ছায়াও যেন সেখান থেকে সরে গেল মনে হল।

শ্রীমন্ত পিস্তল তুলে তৎক্ষণাৎ সেদিকে গুলি ছুঁড়লে।

সেই গুলির শব্দেই বুঝি মামাবাবুর ঘুম ভেঙে গেল। বিমূঢ়ভাবে তিনি উঠে বসলেন। কেউ কোথাও নেই। ললিতা-নমিতার নাম ধরে দুবার তিনি ডাকলেন। তবু কারুর সাড়া

নেই।

কতক্ষণ তিনি এ-অবস্থায় কাটিয়েছেন কিছুই জানেন না। মাথাটা অত্যন্ত ভারী মনে হচ্ছে। তবু তিনি ধীরে-ধীরে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ালেন। এরা সব গেল কোথায়? নিচে গুলির শব্দটা বা কীসের! হঠাৎ বুকটা তাঁর কেঁপে উঠল। ললিতা-নমিতার কোনও বিপদ হয়নি তো? না, শরীরের অবস্থা যেমনই হোক তাঁকে খোঁজ নিতে যেতেই হবে। শুধু মনের জোরে শক্ত হয়ে তিনি দেয়ালে টাঙানো বন্দুকটার কাছে গিয়ে সেটা হাতে তুলে নিলেন। ইতিমধ্যে নিচে আর একটা গুলির শব্দ শোনা গেছে।

অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে শ্রীমন্তই অবশ্য দ্বিতীয় গুলিটাও ছুঁড়েছিল।

'এখানে দাঁড়াও ললিতা। নড়বার চেষ্টা করো না।' বলে, তারপর সে দ্রুতপদে পেছনের মহলের রাস্তাটা দেখতে গেল। হঠাৎ কী যেন তার হয়েছে! ঠিক সুস্থ যে সে নয় এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

শ্রীমন্ত কোথাও কিছু দেখতে না পেয়ে ফিরে আসার পর ললিতা বিরক্তির সঙ্গে সেই কথাই বললে, 'আজকের সব ব্যাপারে আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে বোধহয়। এত উত্তেজিত হওয়ার কী হয়েছে?'

'কী হয়েছে!' শ্রীমন্তর সমস্ত মুখটা উত্তেজনাতেই বুঝি কেমন বিকৃত দেখাচ্ছে, 'সমস্ত জীবনের চেষ্টা আজ আমার সফল হতে চলেছে। সামান্য কোনও ভুলে আমি ভরাডুবি হতে দেব তুমি মনে করো। এসো!'

শ্রীমন্তের উত্তেজনার অতিশয্য খানিকটা হয়তো বোঝা যায়, কিন্তু তার কণ্ঠস্বরের রূঢ়তা ক্ষমা করা যায় না।

ললিতা কঠিন মুখে বললে, 'না, আমি যাবো না।'

'যাবে না!' শ্রীমন্তর মুখ এবার সত্যিই হিংস্র হয়ে উঠল। 'আমায় কি জয়ন্ত পেয়েছ যে তোমার ওই মেয়েলি ভ্রুকুটি দেখে পিছিয়ে যাব। তোমার মতো মেয়েকে দু-হাতে নিংড়ে শেষ করে দিতে আমার এতটুকু বাধবে না।'

সবলে ললিতার হাত ধরে টান দিয়ে সে আবার বললে, 'এসো আমার সঙ্গে।'

শ্রীমন্ত কি সত্যিই ক্ষিপ্ত হয়ে গেছে? ললিতা সিঁড়ির রেলিংটা ধরে প্রাণপণে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে। কিন্তু সে আসুরিক শক্তির কাছে সে পারবে কেন? শ্রীমন্ত তাকে সবলে হিঁচড়ে টেনে নির্মমভাবে বাইরের দরজার দিকে নিয়ে চলল।

'দাঁড়াও।'

শ্রীমন্তকে সবিস্ময়ে দাঁড়াতে হল এবার। এতো মামাবাবুর কণ্ঠস্বর!

মামাবাবুই সিঁড়ির ওপর ধাপে এসে দাঁড়িয়েছেন। মাথায় এখনও তাঁর ব্যান্ডেজ বাঁধা। হাতের বন্দুকের ভার তিনি বইতে পারছেন না।

তবু শ্রীমন্তর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে তিনি চিৎকার করে উঠলেন, 'তোমাকেই আমি খুঁজছিলাম। শয়তান! সেদিন বড় ফাঁকি আমায় দিয়েছিলে!'

উত্তর না দিয়ে শ্রীমন্ত শুধু তাঁকে লক্ষ করে পিস্তল তুললে।

'পিস্তল ফেলে দিন শ্রীমন্তবাবু!'

শ্রীমন্তর পিস্তল ছোড়া আর হল না। চমকে ফিরে তাকিয়ে সে দেখতে পেল, জয়ন্ত ও মিঃ সোম পেছনের মহলে যাওয়ার পথের মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। মিঃ সোমের রিভলভারের লক্ষ্য তারই ওপর নিবদ্ধ।

'ফেলে দিন পিস্তল!' জয়ন্ত আবার গর্জন করে উঠল। তারপর শ্রীমন্তকে তখনও দ্বিধা করতে দেখে সোমের সঙ্গে এগিয়ে এসে তার হাত থেকে পিস্তলটা সে কেড়ে নিলে।

মামাবাবু ততক্ষণে নিচে নেমে এসেছেন। শ্রীমন্তকে দেখিয়ে উত্তেজিত ভাবে তিনি বললেন, 'এই সেই শয়তান, সেদিন আমার সরল বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে আমায় খুন করতে চেয়েছিল।'

'মিথ্যে কথা!' বেকায়দায় পড়ে শ্রীমন্ত একেবারে মরিয়া হয়ে দিনকে রাত করবার চেষ্টা করে দেখলে। মামাবাবুর অভিযোগ একেবারে উড়িয়ে দিয়ে বললে, 'সাংঘাতিক আঘাতে ওঁর মাথার ঠিক নেই। মানুষ চিনতে উনি ভুল করেছেন।'

'Is that so'

সকলেই এবার অবাক হয়ে দেখলে, শ্রীমন্তর ঠিক পেছন দিকের হল ঘরের আর এক দরজায় ভিখিরিসাহেব শ্রীমন্তর সেই বরখাস্ত করা লোককে পাশে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ভিখিরিসাহেবের গলার স্বর শুধু নয়, তার চেহারা ধরনধারণই এখন আলাদা। শক্তি ও নেতৃত্ব তার দাঁড়াবার ভঙ্গিতে পর্যন্ত পরিস্ফুট।

দৃঢ় পদক্ষেপে শ্রীমন্তর দিকে এগিয়ে আসতে-আসতে কঠিনস্বরে সে বললে, 'ওর না হয় মাথার ঠিক নেই, তোমার তো আছে!'

তারপর পাশের লোকটিকে দেখিয়ে আবার অগ্রসর হতে-হতে বলতে শুরু করলে, 'দেখদিকি এই লোকটিকে চিনতে পার কি না? মনে করে দেখদিকি, এরই সাহায্যে ভয় দেখিয়ে এ-বাড়ি হানাবাড়ি করে তোলবার পর নিষ্কণ্টক হওয়ার জন্য একেই ফন্দি করে মারবার ব্যবস্থা করেছিলে কি না? মনে পড়ছে শ্রীমন্ত!'

শ্রীমন্তর সব শয়তানি এবার বুঝি শেষ। ভিখিরিসাহেব ও তার সঙ্গীর সামনে পেছুতে-পেছুতে সে তখন হলের মাঝখানে টেবিলটার কাছে এসে আটকে গেছে। পালাবার কোনও পথই আর তার নেই।

কিন্তু হঠাৎ অপ্রত্যাশিত এক চালাকিতে সে পাশা ঘুরিয়ে দিলে।

টেবিলের ওপরকার একটি উজ্জ্বল বড় বাতি থেকেই সমস্ত হলঘর আলোকিত।

আচমকা সেই বাতিটা সে পেছনে হাত বাড়িয়ে উলটে দিলে। বাতিটা মেঝেয় পড়ে ভেঙে চুরমার হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত হলঘর একেবারে অন্ধকার।

সে অন্ধকারে তারপর একটা হুলস্থুল বেধে গেল, কে কোথায় দেখাই যায় না। গুলি করতে গেলে নিজেদের গায়েই লাগে। এই বিশৃঙ্খলার সুযোগেই শ্রীমন্ত সকলকে ফাঁকি দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে একেবারে দোতলায় উঠে পালিয়ে গেল। যাওয়ার আগে দোতলা থেকে একবার পিস্তল ছুঁড়ে সে যেন তার বিদায় সম্ভাষণ পরিহাস করে জানিয়ে দিলে। তার নিজেরটা জয়ন্ত কেড়ে নিলেও ললিতার পিস্তলটা তখনও তার কাছে যে ছিল কারুর জানবার কথা নয়।

কিন্তু অত সহজে তাকে ছাড়বার পাত্র এরা কেউ নয়। ললিতা ও মামাবাবু ছাড়া আর সকলে তৎক্ষণাৎ সিঁড়ি দিয়ে উঠে তাকে অনুসরণ করলে।

পেছনের মহলের বিরাট ধ্বংসস্তূপ ও জঙ্গলের মধ্যে একটা লোকের বেমালুম কোথাও গা ঢাকা দিয়ে থাকা মোটেই কঠিন নয়। খানিকক্ষণ পর্যন্ত শ্রীমন্তর সন্ধান তাই পাওয়া গেল না। কিন্তু বিপদে পড়লে শয়তানেরও বুদ্ধিভ্রংশ হয়। দূরে ভিখিরিসাহেবের দলকে একটা

খিলানের তলা দিয়ে বেরুতে দেখে হঠাৎ বিপন্ন বোধ করে সে নিজেই আগে গুলি ছুঁড়ে বসল।

তারপর যা শুরু হল তাকে ছোটখাটো যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। একটা ঝোপে ঢাকা পাথুরে টিবির আড়ালে শ্রীমন্ত ও অন্যদিকে সেই খিলানের তলায় সোম, জয়ন্ত ও ভিখিরি সাহেবের দল। মুহুর্মুহু গুলির শব্দে রাত্রির অন্ধকার যেন বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

এভাবে অনেকক্ষণ চলতে পারত, কিন্তু শ্রীমন্তরই গুলি আগে গেল ফুরিয়ে। নিরুপায় হয়ে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে আবার সে একদিকে সরে পড়ল।

এবার বুঝি তাকে আর খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়।

যেদিকে সে গেছে মনে হয়েছিল, ভিখিরিসাহেব আর সকলের সঙ্গে সেদিকে অনেক দূর পর্যন্ত ছুটে গেল।

কিন্তু কোথাও তার কোনও চিহ্ন নেই।

'ওই, ওই যে!' জয়ন্ত হঠাৎ উত্তেজিতভাবে দূরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখা'লে। সত্যিই দূরে শ্রীমন্তকে ছুটে পালাতে দেখা গেল।

কিন্তু দোতলার যে ভাঙা বারান্দায় তারা দাঁড়িয়ে, সেখান থেকে নেমে তাকে ধরা এখন অসম্ভব।

শ্রীমন্তর ভাড়াটে গুন্ডাই এ-সমস্যার সমাধান করে দিলে। এতক্ষণ সে নীরবে সকলের পিছু-পিছু এসেছে। এবার এগিয়ে এসে ভাঙা দেয়ালে জড়ানো লম্বা একটা গাছের ঝুরি অমানুষিক শক্তিতে আলগা করে নিয়ে সে এক নিমেষে শূন্য পথে প্রচণ্ড এক দোল খেয়ে বেরিয়ে গেল।

উৎসাহিত হয়ে অন্য সকলেও নিচে নামবার পথে এবার ছুটল।

শ্রীমন্তর লোভই বুঝি তার কাল।

সকলের চোখে দ্বিতীয়বারও সে ধুলো দিতে পেরেছিল। কিন্তু নাট মহলের গুপ্তগৃহের ওপরই তখনও তার লক্ষ। সেখান থেকে সামান্য কিছু সরিয়ে নিয়ে পালাতে পারলেও তার যথেষ্ট লাভ।

কিন্তু সে আশা তার পূর্ণ হওয়ার নয়। হঠাৎ পেছনে একটা প্রবল শব্দ শুনে সে চমকে ফিরে দাঁড়াল। 'না, শ্রীমন্তবাবু!' শ্রীমন্তর সেই ভাড়াটে গুন্ডাই গাছের ঝুরিতে ঝুলে এসে তার সামনে লাফিয়ে পড়েছে; হিংস্র শ্বাপদের মতো অগ্রসর হতে-হতে সে গর্জন করে উঠল, 'সাক্ষাৎ যমের হাত থেকে তুমি পালাতে পারো, কিন্তু আমার হাত থেকে নয়। আজ আর তোমার নিস্তার নেই।'

সভয়ে পেছুতে-পেছুতে শ্রীমন্ত তখন গুপ্তগৃহের সুড়ঙ্গ মুখে গিয়ে পৌঁছেছে। সামনে তার যমদূত আর ওদিকে ভিখিরিসাহেবের সঙ্গে সোম ও জয়ন্ত ততক্ষণে অন্য পথ দিয়ে সেখানে উপস্থিত।

পিস্তলটা তাদের দিকে তুলে সে শেষবার ভয় দেখাবার চেষ্টা করলে। কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা।

'ও পিস্তল কী দেখাচ্ছ!' লোকটার পৈশাচিক অট্টহাসি শোনা গেল, 'ওতে আর গুলি নেই, তা জানি।'

'খবরদার বলছি!' শ্রীমন্ত যেন আতঙ্কে, উত্তেজনায় উন্মাদ হয়ে গেছে, 'আর এক পা কেউ এগিয়েছ কি, একটি প্রাণীও এখানে রক্ষা পাবে না।'

মরিয়া হয়ে সে সুড়ঙ্গ সোপান দিয়েই নিচে নেমে গেল।

'তার আগে তোমায় কে রক্ষা করে তাই দেখি!' বলে শ্রীমন্তর ভাড়াটে গুন্ডাও তাকে অনুসরণ করলে।

সোম তাদের পেছনে যাচ্ছিল। ভিখিরিসাহেব তাকে বাধা দিয়ে বললে, 'থাক, তোমায় আর যেতে হবে না। ওদের নিজেদের শয়তানির শোধবোধ ওরা নিজেরাই করুক।'

জয়ন্ত ও সোমকে নিয়ে ভিখিরিসাহেব দূরে সরে গেল।

নিচে গুপ্তগৃহে তখন দুই শয়তানের মরণ সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে।

নিরুপায় হয়ে শ্রীমন্ত তার দুষমনের দিকে গুলিহীন পিস্তলটাই ছুঁড়ে মেরেছিল। কিন্তু সে আঘাতে কপালটা গভীরভাবে কেটে লোকটার সমস্ত মুখ রক্তাক্ত হওয়ার সঙ্গে যেন আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ল। উন্মত্তের মতো ঝাঁপিয়ে এসে সে শ্রীমন্তর টুঁটি সবলে চেপে ধরলে। শ্রীমন্তর সত্যিই আর নিস্তার নেই। দমবন্ধ হয়ে তার সমস্ত মুখ নীল হয়ে যাচ্ছে। চোখ দুটো যেন কোটর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে যাবে। মরিয়া হয়ে প্রাণপণ শক্তিতে দুশমনের পেটে প্রচণ্ড একটা হাঁটুর গুঁতো দিয়ে সে নিজেকে কোনওরকমে শেষ মুহূর্তে মুক্ত করে নিলে।

দুশমন কাবু হয়ে তাকে ছেড়ে দিয়েছিল বটে, কিন্তু সে শুধু ক্ষণিকের জন্যে। পর মুহূর্তেই মূর্তিমান মৃত্যুর মতো সে দ্বিগুণ আক্রোশে আবার এগিয়ে গেল।

কিন্তু শ্রীমন্ত উন্মাদের মতো ঘরের লণ্ঠনটা দুহাতে তখন তুলে ধরেছে।

'সাবধান বিরিঞ্চি! এখনও বলছি সাবধান।' শ্রীমন্ত চিৎকার করে শাসিয়ে উঠল। 'মরতে হলে আমি একা মরব না। সত্যি-সত্যি এ ঘর আমি উড়িয়ে দেব।'

'হ্যাঁ, তাই দাও দেখি!' চরম আক্রোশে ও হিংসায় বিরিঞ্চিও উন্মাদ হয়ে গেছে।

দুহাতে বাতিটা তুলে ধরে বিরিঞ্চির সামনে পেছুতে-পেছুতে কাতর ভাবে যেন আর্তনাদ করে উঠে শ্রীমন্ত তার শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করলে, 'শোনো বিরিঞ্চি, আমার কথা শোনো! একটু থামো। এ-ঘরে যা কিছু আছে, সব কিছুর ভাগ আমি তোমায় দেব, এই সব হিরে, মুক্তো, টাকা, মোহর সব কিছুর বখরা..!'

'হ্যাঁ, বখরা আগেও দেবে বলেছিলে।' সমস্ত প্রলোভনের ওপরে বিরিঞ্চির এখন শুধু এক অটল সঙ্কল্প। আমোঘ নিয়তির মতো এগিয়ে যেতে-যেতে সে বললে, 'সেকথা আমি ভুলিনি। তারপর লুকিয়ে আমাকেই সাবাড় একবার ব্যবস্থা করেছিলে বেইমান!'

পেছুতে-পেছুতে শ্রীমন্ত একটা থামের গায়ে তখন বাধা পেয়ে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছে। চোখ-মুখের নিদারুণ আতঙ্কের সঙ্গে তার গলার করুণ কাকুতি এবার শোনা গেল, 'সত্যি বলছি, এবার আমি বেইমানি করব না। তুমি যা চাও তাই তোমায় দেব, শুধু আমায় বাঁচতে দাও, শুধু এদের হাত থেকে আমায় পালাতে দাও।'

শ্রীমন্তর কথা শেষ হল না।

'এবারে দুনিয়া থেকেই তোমার পালাবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।' বলে, ক্ষিপ্ত দানবের মতো বিরিঞ্চি তার কণ্ঠনালি দুই হাতে চেপে ধরলে।

শ্রীমন্ত সামান্য একটু যোঝবার চেষ্টা করলে, তারপর মরিয়া হয়ে প্রাণপণ চেষ্টায় হাতের লণ্ঠনটা সজোরে ডিনামাইটের বাক্স গুলোর ওপর ছুঁড়ে দিলে।

লণ্ঠন ভেঙে তেল ছড়িয়ে পড়ে কাঠের বাক্সগুলো প্রথম জ্বলে উঠল। তারপরই সমস্ত ঘর নিশ্চিহ্ন করে প্রচণ্ডবিস্ফোরণ!

ভূমিকম্পের মতো আশপাশের সমস্ত জায়গা সে বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল। ভাঙা

নাট মহলের সামান্য যে দু-একটা থাম ও দেয়াল খাড়া ছিল, সেগুলো সশব্দে তখন ধ্বসে পড়ছে। তারই সঙ্গে মাটিরতলা থেকে আগুনের হল্কা ও ধোঁয়ার কুণ্ডলী বেরিয়ে সমস্ত জায়গাটা ছোটখাটো আগ্নেয়গিরির মতো ভয়াবহ হয়ে উঠল।

শয়তানদের নিজেদের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ এ-ভয়ঙ্কর পরিণামের নীরব সাক্ষীরূপে ভিখিরিসাহেবের সঙ্গে সোম ও জয়ন্ত তখন দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

আঠেরো

ওই দুর্ঘটনার মধ্যে সারারাত্রি নমিতার কীভাবে যে কেটেছে তাব বর্ণনা বোধহয় নিষ্প্রয়োজন। গোলমাল ও-গুলি বারুদ বিস্ফোরণেব শব্দে ভয়ে প্রায় আধমরা হওয়ার পর দিদি ও মামাবাবু ফিরে এলে তাদের কাছে ছাড়া-ছাড়া ভাবে কয়েকটা কথা সে শুনেছে মাত্র। তাতে তার কৌতূহল মেটেনি।

সমস্ত রাত জাগবাব পব ঘুমিয়ে পড়ে সকালের দিকে উঠতে তার একটু বেলা হয়ে গেছল। উঠে জামাকাপড় ছেড়ে কার কাছে ব্যাপারটা ভালো কবে জানা যায় তারই সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে বেরুচ্ছে, এমনসময় নিচে হল ঘরে মিঃ সোমকে ঢুকতে দেখে সে যেন হাতে স্বর্গ পেল।

'শুনুন, শুনছেন!' সে ওপর থেকেই চিৎকার কবে উঠল।

সোম দাঁড়িয়ে পড়বার পব দ্রুত পদে নেমে এসে সে উত্তেজিতভাবে শুরু করলে, 'বাবা! কাল রাত্রে কী সব কাণ্ডই হল। দিদি-মামাবাবু কেউ ওপবে নেই। আমি আর ভুতোর মা তো ভয়ে একেবারে কাঠ।'

নিজেদের অবস্থাটা বুঝিয়ে দিয়েই সে আসল প্রশ্ন কবে বসল, 'আচ্ছা, শ্রীমন্তবাবু যে অমন ভয়ানক লোক, আগে বুঝতে পেরেছিলেন?'

'ঠিক কি আর পেরেছি!' সোম হেসে বললেন, 'তাহলে তো সব গোল চুকেই যেত!'

এ-উত্তরে নমিতা সন্তুষ্ট হল না। মুখটা করুণ কবে বললে, 'আমি কিন্তু কিছুই এখনও বুঝতে পারছি না!'

সোম আবার হেসে বললেন, 'আচ্ছা আমার সঙ্গে আসুন। মিঃ রুদ্রর কাছেই সব কথা শুনে বুঝতে পারবেন।'

'মিঃ রুদ্র আবার কে?' নমিতা অবাক।

'আসুন না আমার সঙ্গে' বলে, সোম নমিতাকে নিয়ে পাশের একটি ঘরে গিয়ে ঢুকল।

সে ঘরে মামাবাবু তখন একলা বসে আছেন। একটা কিছু বৈঠকের ব্যবস্থা যে সেখানে হয়েছে টেবিল-চেয়ার সাজাবার ধরনেই তা বোঝা গেল।

ওপর থেকে নেমে হল দিয়ে ললিতা সেই ঘরেই যাচ্ছিল। হঠাৎ পেছন থেকে জয়ন্ত তাকে ডাকল।

'একটু দাঁড়াও ললিতা!'

ললিতা দাঁড়াল বটে কিন্তু নেহাত যেন অনিচ্ছায়, জয়ন্তর দিকে মুখটা পর্যন্ত না ফিরিয়ে।

জয়ন্ত কাছে এসে কিন্তু হাসি মুখেই বললে, 'আমার সম্বন্ধে ধারণাটা এখন তোমার বদলেছে কি?'

'না, বদলাবে কেন?' ললিতার মুখ একেবারে গম্ভীর।

'এখনও বদলায়নি!' জয়ন্ত বেশ বিস্মিত ও বিচলিত।

ললিতা তবু যেন নির্বিকার ভাবেই জবাব দিলে, 'না বদলাবার কিছু তো হয়নি।'

জয়ন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠল, 'তার মানে তুমি বলতে চাও যে...'

হঠাৎ চাপা কাসির শব্দে কথার মাঝখানে থেমে গিয়ে জয়ন্ত পেছনে তাকাল। ফিটফাট সাহেবি পোশাক পরা একজন ভদ্রলোক সকৌতুক দৃষ্টিতে তাদের দিকে চেয়ে হাসছেন। চেহারা পোশাকের আশ্চর্য পরিবর্তনে প্রথমে একটু চমকে গেলেও দুজনেই ভদ্রলোককে চিনল। তিনি যে কখন এসে তাদের পেছনে দাঁড়িয়েছেন, তারা লক্ষই করেনি।

ভদ্রলোক এবার তাদের কাছে এগিয়ে এসে জয়ন্তকে উদ্দেশ্য করে আবার বললেন, 'মাপ করবেন, একটু অনধিকার চর্চা করছি। ললিতাদেবীর ধারণাটা কী, তা না জেনে বদলাবার জন্যে এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? ধারণাটা বরাবরই ভালো এমনও তো হতে পারে।'

এ-ব্যাখ্যাটা জয়ন্তর মাথায় আসেনি।

'তাই কি ললিতা?' সে তৎক্ষণাৎ উৎসুকভাবে প্রশ্ন করলে।

কিন্তু ললিতা অত সহজে ধরা দিতে প্রস্তুত নয়। সংক্ষেপে শুধু 'জানি না,' বলে সে চলে গেল।

'আমি কিন্তু ঠিক জানি।' ভদ্রলোক গম্ভীরভাবে জয়ন্তকে আশ্বাস দিলেন। 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। জানবেন, আমার এ-গোয়েন্দাগিরিও নির্ভুল।'

হেসে সস্নেহে জয়ন্তর কাঁধে হাত দিয়ে তিনি তাকে নিয়ে পাশের ঘরে ঢুকলেন।

পাশের ঘরে মামাবাবু ও মিঃ সোমের সঙ্গে ললিতা ও নমিতা তখন বসে আছে।

ভদ্রলোককে জয়ন্তর সঙ্গে ঢুকতে দেখেই মিঃ সোম চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সেলাম জানালেন।

নমিতা তাই দেখে একেবারে অবাক।

'ও কী! কাকে স্যালুট করছেন!' সে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে।

'কী যা তা বকছিস?' ললিতা তাড়াতাড়ি তাকে বুঝিয়ে দিলে। 'উনিই তো ডিটেকটিভ অফিসার মিঃ রুদ্র।'

'উনি!' নমিতা একেবারে হতভম্ব।

তার হতভম্ব হওয়া খুব অস্বাভাবিকও নয়। ভিখিরি সাহেবের আসল চেহারা যে এই, একথা বিশ্বাস করাই শক্ত।

মিঃ রুদ্র নমিতার দিকে চেয়ে হেসে বললেন, 'এ-ডিটেকটিভ নমিতার ঠিক পছন্দ নয় মনে হচ্ছে।'

নমিতা লজ্জা পেয়ে বললে, 'যাঃ তা কেন?

সকলে হেসে ওঠার পর মামাবাবু সঙ্কুচিত ভাবে বললেন, 'সত্যি, না জেনে আপনার সঙ্গে কত খারাপ ব্যবহার করেছি...'

'ভাগ্যিস করেছেন!' মিঃ রুদ্র মামাবাবুকে আর শেষ করতে দিলেন না। হেসে বললেন, 'আগে থাকতে জানতে পারলে তো আমার সমস্ত কাজই মাটি।'

'আচ্ছা, একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না।' নমিতা আর ধৈর্য ধরতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলে, 'গরিলা যে সাজত, শ্রীমন্তবাবুর লোক! তাহলে প্রথম দিন সে শ্রীমন্তবাবুকেই মারতে গেছল কেন?'

'সেটা একটা লোক দেখানো ফাঁকি, সকলকে ভুল বোঝাবার জন্য। নমিতাকে বুঝিয়ে দিয়ে মিঃ রুদ্র চেয়ারে বসে আবার শুরু করলেন, 'ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক এবাড়ির রহস্যের সঙ্গে আপনারা সকলেই জড়িত ছিলেন। তাই ব্যাপারটা সঠিকভাবে জানবার কৌতূহল আপনাদের পক্ষে স্বাভাবিক। এখানকার কাজ আমার শেষ হয়েছে, কিন্তু আপনাদের কাছে বিদায় নেওয়ার আগে এ-রহস্যের সমস্ত জট ছাড়িয়ে সব পরিষ্কার করে দেওয়া উচিত মনে করে আজকের এ-বৈঠকের ব্যবস্থা আমি আপনাদের করতে বলেছিলাম।'

একটু থেমে তিনি আবার বললেন, 'মোটামুটি ব্যাপারটা আপনারা সবাই এখন নিশ্চয় বুঝেছেন। এ-বাড়িতে চোরাই মণিমুক্তোর কারবার যিনি করতেন সেই শশীশেখরবাবুর দুটি প্রধান সহায় ছিল। তাব একজন এখানে খুন হয়েছে, আর দ্বিতীয় জন হল শ্রীমন্ত। গুপ্তধনের লোভে শ্রীমন্তই নিজে গরিলা সেজে প্রথম শশীশেখরকে হত্যা করে। কিন্তু গুপ্তধন খুঁজে বার করবার আগেই পুলিশের ভয়ে তাকে কিছুদিন গা ঢাকা দিতে হয়। এ-বাড়ি হাতছাড়া হলে কিন্তু তার সব আশায় ছাই পড়বে। তাই ভোল পালটে শিল্পী সেজে এখানে ফিরে এসে আস্তানা গাড়বার পর আরেক জনেব সাহায্যে ভয় দেখিয়ে সে এ-বাড়িকে হানাবাড়ি করে তোলবার ব্যবস্থা করে। তার ভাড়াটে গুন্ডা বিরিঞ্চিকে সে নিজের বাড়ি পাহারা দেওয়ার জন্যে রাখেনি। রেখেছিল, এ-বাড়ির ধাবে কাছে কেউ এলে ভয় দেখিয়ে তাড়াবার জন্যে, সে নিজে নির্বিঘ্নে গুপ্তধনের সন্ধান যাতে করতে পারে।

'জয়ন্ত ভয় পেয়ে তারই কাছে এসে ওঠায় আর তার ওপর মামাবাবুরা নিরুপায় হয়ে হঠাৎ এ-বাড়ি কিনে নেওয়ায় তার অবশ্য অত্যন্ত অসুবিধে হয়। তা-সত্ত্বেও মামাবাবুদের তাড়াবার ব্যবস্থা সে প্রায় করেই এনেছিল, এমন-সময় শশীশেখরের আর এক সাকরেদ এ-বাড়িতে এসে উদয় হওয়ায় সে দারুণ মুশকিলে পড়ে। আমরা না জানলেও দুজনেই তারা দুজনকে দেখে চিনেছিল। গোপনে আলাপ করবার ছুতোয় শ্রীমন্ত তারপর তার সঙ্গীকে বাগানে নিয়ে গিয়ে খুন করে। খুনের ছোরাটা সে টেনে খুলে নিয়ে যাওয়ারই চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাড়াতাড়িতে বেকায়দায় তার হাতের একটা আঙুল তাতে কেটে যায়। বাড়ি কিনতে যে এসেছিল তাকে দেখে জয়ন্ত ঠিকই সন্দেহ করেছিল যে লোকটার মতলব সম্পূর্ণ আলাদা। একটা বিশ্রী কিছু ঘটতে পারে অনুমান করে সে সত্যিই কাছাকাছি ঘোরাফেরা করছিল। তার পায়ের শব্দ পেয়ে শ্রীমন্ত ছোরাটা নেওয়ার চেষ্টা আর না করে তখন পালিয়ে যায়। অন্ধকারে তাকে ধরতে গিয়ে পড়ে যাওয়ায় জয়ন্তর ও শ্রীমন্ত তখন আমাদের সন্দেহের পাত্র। তাদের পরীক্ষা করবার জন্যে আমি নিজেও দুটো আঙুল কাটার ভান করে বেঁধে রাখি।'

'একটা ব্যাপার আমি কিন্তু এখনও বুঝতে পারিনি স্যার।' সোম নিজের সংশয়টা প্রকাশ না করে পারলেন না। 'খুনের ব্যাপারটা যখন ঘটে প্রায় সেসময়েই আমি শ্রীমন্তর বাড়িতে ঢুকতে যাচ্ছিলাম। তখন ভেতর থেকে তার বেহালার বাজনা আমি স্পষ্ট শুনেছি।'

জয়ন্ত সায় দিয়ে বলে, 'বেহালার বাজনা আমিও প্রথম দিন শুনেছিলাম। তার পরে বেহালা দেখেওছি।'

মিঃ রুদ্র হেসে বললেন, 'সেটাও তার একটা কারসাজি। যেমন তার ছবি আঁকা, তেমনি তার বেহালা বাজানো। দুটোর কোনওটাই সে জানে না। ভালো করে লক্ষ করলেই বুঝতেন যে ছবিগুলো সে নানা জায়গা থেকে সংগ্রহ করে রেখেছিল মাত্র। আর তার বেহালার বাজনা যা শুনেছেন তা তার ঘরে লুকোনো automatic গ্রামোফোন রেকর্ডর। ঠিক ধরতে

না পারলেও তার ওপর আমার গোড়া থেকে নজর ছিল। গোপনে তার বাড়ির সবকিছুর সন্ধান তাই নিয়ে রেখেছিলাম।'

'কিন্তু মামাবাবুকে তার ওভাবে হঠাৎ মারবার চেষ্টা করবার কারণ কী?' জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে।

'কারণ মামাবাবু নিজে! উনি দৈবাৎ সেই চোরা কুলুঙ্গি থেকে শশীশেখরের গোপন নক্সাটা না পেয়ে গেলে শ্রীমন্তর পক্ষেও গুপ্তধনের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব ছিল। মামাবাবু আবার ডাইনির কোলে-ই পো সমর্পণ করে বসলেন। সেই নক্সার জোরে রাত্রে সে যখন গুপ্তধনের জায়গায় গিয়ে হাজির। 'নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে মামাবাবুকে মারার কারণ না হয় বুঝলাম,' ললিতা এবার বললে, 'কিন্তু যাকে গরিলা সাজিয়ে সে সকলকে ভয় দেখাত সেই বিরিঞ্চি তো তার নিজের লোক। তাকেও সে মারবার ফন্দি করেছিল কেন?'

'শয়তানদের দস্তুরই ওই!' বলে, মি-রুদ্র একটু হাসলেন, 'কাউকে তারা শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করতে পারে না। বিরিঞ্চিকে দিয়ে কাজ যা করাবার তখন সে করিয়ে নিয়েছে। বিরিঞ্চি নিজেও আসলে যে এক খুনে-বদমাস, শ্রীমন্তর চেয়ে ভালো করে কেউ তা জানত না। কখন যে বিরিঞ্চি বিগড়ে গিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে এই তখন সদাই তার ভয়। সে ভয়ের কারণও ছিল।'

'শ্রীমন্তর বাড়িতে বিরিঞ্চিকে আমরা যেদিন দেখি সে দিনই তো তার শ্রীমন্তর ওপর চড়া মেজাজ দেখেছিলাম।' মামাবাবু ঘটনাটা স্মরণ করে বললেন!

'না,' মিঃ রুদ্র মামাবাবুর ভুলটা ভেঙ্গে দিয়ে বললেন, 'সেদিনকার চড়া মেজাজটা ভান। সেদিন সে তার নিয়ম মতো লুকিয়ে শ্রীমন্তর কাছে হুকুম নিতে গেছল। হঠাৎ নমিতা ও ললিতা তাকে দেখে ফেলবে সে বা শ্রীমন্ত ভাবতে পারেনি। ব্যাপারটা ঘটে যাওয়ার পর সকলের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্যে শ্রীমন্ত মিছিমিছি তাকে বরখাস্ত করা পাহারাদার হিসাবে ধমকাবার অভিনয় করে। মনে করে দেখলে বুঝতে পারবেন, বাকি মাইনের ছুতোটা শ্রীমন্ত নিজে থেকে বিরিঞ্চিকে ধরিয়ে দেয়। বিরিঞ্চি সত্যি করে বিগড়ে যেতে শুরু করে তারপর। অবশ্য আমার উস্কানিও তার পেছনে কিছু ছিল। শ্রীমন্ত গোড়া থেকেই আমায় একটু সন্দেহ করত। বিরিঞ্চির সঙ্গে গোপনে আমায় আলাপ করতে দেখে তার সন্দেহ আরও বেড়ে যায়। বিরিঞ্চিকে শেষ করে দেওয়ার মতলব তখনই তার মাথায় আসে। বিরিঞ্চিকে সে বিকেলে তার সঙ্গে দেখা করতে বলেছিল। সে সময়ে টাকার লোভ দেখিয়ে তাকে রাত্রে একবার এ-বাড়িতে হানা দিতে আসতে রাজি করাতে পারবে বুঝেই শ্রীমন্ত সোমকে তার সঙ্গে পাহারায় থাকবার জন্যে অনুরোধ করে। সোমের কাছে ব্যাপারটা শুনে আমি অবশ্য তখনই ওদের সাবধান করে দিই। সোম ও জয়ন্ত ঠিক সময়ে একটু বাধা দেওয়ার ব্যবস্থা না করলে শ্রীমন্তর লক্ষ সেদিন ব্যর্থ হতো না। লোকটা সে রাত্রে সত্যিই মারা পড়ত।'

মামাবাবু এবার বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'জয়ন্ত তাহলে আপনার পরিচয় তখন জানত।'

'হ্যাঁ,' মিঃ রুদ্র জয়ন্তর দিকে চেয়ে হাসলেন। 'এ-ব্যাপারের কিছু আগেই ওকে সব জানিয়েছিলাম। ওকে দলে না নিলে আমাদের আসল কাজই তো উদ্ধার হতো না।'

একবার জয়ন্ত আর একবার মিঃ রুদ্র-র দিকে অবাক হয়ে চেয়ে ললিতা এবার বলে উঠল, 'তাহলে সেদিনকার সেই...'

কথাটা তাকে শেষ করতে হল না। মিঃ রুদ্র হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, গ্রেপ্তারের ব্যাপারটা

একেবারে ফাঁকি। ইঁদারার ধারে শ্রীমন্তকে বেঁধে রাখা থেকে তার বাড়িতে গিয়ে জয়ন্তকে ধরা পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারটা শুধু সাজানো নাটক। যে পিস্তলের গুলি শুনে ললিতা শ্রীমন্তকে উদ্ধার করতে যায় সেটা আসলে সোমকে ডাকবার একটা সংকেত। জয়ন্তর ওপর যেকোন ছুতোয় পিস্তলটা ছুঁড়ে জানিয়ে দেওয়াব এই নির্দেশ ছিল।'

'কিন্তু জয়ন্তকে এভাবে গ্রেপ্তার করবার উদ্দেশ্য?' মামাবাবু অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন।

'উদ্দেশ্য, জয়ন্ত গ্রেপ্তার হলে নিজেকে নিশ্চিন্ত নিষ্কণ্টক মনে করে শ্রীমন্ত যাতে আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে। সে উদ্দেশ্য যে সফল হয়েছে, তা তো দেখতেই পাচ্ছেন।'

'আপনি কিন্তু একলা ওই গুপ্ত ভাঁড়ারে গিয়ে বড় বেশি বিপদ ঘাড়ে নিয়েছিলেন স্যার।' সশ্রদ্ধভাবে বললেও সোমের গলার স্বরে একটু বিক্ষোভই প্রকাশ পেল।

'তা নিয়েছিলাম বটে।' মিঃ রুদ্র সোমের কথাটা মেনে নিয়ে বললেন, 'কিন্তু সে শুধু শ্রীমন্ত যাতে নিজের আসল রূপ প্রকাশ করে ফেলে ধরা দেয় সেইজন্যে। ললিতাদেবী আচমকা ওখানে উদয় হয় আমাদের মতলব একটু ভেস্তে দেওয়ার জোগাড় করেছিলেন বটে, কিন্তু আমরা তখন সবকিছুর জন্যেই প্রস্তুত ছিলাম।'

একটু থেমে তিনি এবার হেসে জয়ন্ত ও সোমকে বললেন, 'তা ছাড়া তোমাদের তৈরি রেখেছিলাম কি অমনি! যেভাবে পাথর চাপা দিয়ে আমায় বন্ধ করে গেছ্‌ল তোমরা এসে তখুনি না উদ্ধার করলে তো দম বন্ধ হয়ে মারা যেতাম। শ্রীমন্তকে সন্দিগ্ধ করে ভয় পাইয়ে শেষ পর্যন্ত গ্রেপ্তাব করবার ব্যবস্থাটা ঠিকই ছকে রেখেছিলাম শুধু সমাপ্তিটা এমন হবে আগে ভাবিনি। যাক যা হয়েছে ভালোই বলতে হবে।'

'আমি তাহলে ঠিক ধরেছিলাম! নমিতা এবার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, 'কেমন দিদি, আমি বলেছিলাম কি না যে ডিটেকটিভ গল্পের সব বদমায়েশদের দাড়ি থাকে! আমার কথা ঠিক হল কি না!'

ললিতা হাসি চেপে মিঃ রুদ্র-র দিকে দেখিয়ে বললে, 'দাড়ি কিন্তু ওঁরও ছিল।'

'ওঁর তো নকল দাড়ি।' নমিতা হার মানতে প্রস্তুত নয়।

'তা বটে।' রুদ্র হেসে উঠলেন। তারপর অত্যন্ত গম্ভীর হওয়ার ভান করে বললেন, 'কিন্তু দাড়ির মতো আমাব সবটাই নকল নয়!'

সেই ভিখিরিসাহেবের ভঙ্গিতে হঠাৎ নমিতার দিকে আঙুল বাড়িয়ে তিনি বললেন, 'Remember, I can foretell the future! দাঁড়াও! What do I see !'

একবার ললিতা ও জয়ন্তর দিকে চেয়ে তিনি বললে, 'I see, a marriage ceremony. এ মোকান সে জরুর একঠো সাদি হোগা, জলদি হোগা!'

ললিতা জয়ন্ত সলজ্জ ভাবে মাথা নিচু করল।

'আচ্ছা চলি Good luck to you all' বলে, মিঃ রুদ্র হাসি মুখে নমস্কার করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ওরা থাকে ওধারে

এক

দীর্ঘদিনের প্রতিবেশী পাশাপাশি দুই ফ্ল্যাটে বাস করা যে আজ কতদিন হল কে জানে। গলাগলিও যত, গালাগালিও তত। এই এ বাড়ির ইস্ত্রি না হলে ও বাড়ির কাপড় জামা ইস্ত্রি হয় না, ও বাড়ির সেলাই কল না হলে এ বাড়ির জামা সেলাই হয় না, ও বাড়িতে নিরিবিলিতে গিয়ে না বসলে এ বাড়ির কর্তার খবরের কাগজই পড়া হয় না। অথচ লাগে যখন, শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ। পাড়ার লোক তো বটেই, বাড়ির বাচ্চারাও হাসাহাসি করে, অবশ্য গোপনে।

ডানদিকের ফ্ল্যাটটির কর্তা হরিমোহনবাবু। এদেশি লোক, খাস ঘটি যাকে বলে। পরিবারের সদস্যসংখ্যা খুব বেশি নয়—হরিমোহনবাবু নিজে, স্ত্রী মনোরমা আর দুটি ছেলে মেয়ে। ছেলেই বড়ো, চঞ্চল, কলেজে বি. এ পড়ে। তুলনায় বোন রিনি অনেকটাই ছোট, বছর আট-দশ হবে হয়তো বয়স। এ ছাড়াও আর একটি লোককে প্রায় সদস্যই বলা চলে এই পরিবারের—হরিমোহনবাবুর গ্রামসম্পর্কের এক ভাগনে, নাম কার্তিক। যাতায়াত তার এ বাড়িতে খুব ঘন-ঘনই।

বাঁদিকের ফ্ল্যাটের কর্তা শিবদাসবাবু যাকে বলে একেবারে কাঠ বাঙাল, নিজে শুধু বাঙাল, পরিবাবসুদ্ধ লোক কথায়বার্তায় নিজেদের পরিচয় একটুও চাপতে পারে না। এই পরিবারটিও বিশেষ বড় না—শিবদাসবাবুর স্ত্রী তরলা আর ন-দশ বছরের ছেলে নানু। বাড়িতে অবশ্য এ ছাড়াও পুষ্যি আছে আরও দুজন, পুষ্যি না বলে যাদের অবশ্য পরিবারের সব্বচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সদস্য বলতে হবে। একজন শিবদাসবাবুর শ্যালক নেপাল, এটাই সে তার ঘরবাড়ি করে ফেলেছে—তাকে নইলে শিবদাসবাবুরও চলে না, আর নেপালেরও এদের নইলে চলে না। অন্য জন হচ্ছে শিবদাসবাবুর আদুরে ভাগনি প্রমীলা, ওরফে মিলু। ছোটবেলায় বাপ-মা মরা মেয়ে, এ পরিবারে তার প্রতিপত্তি বরং একটু বেশিই।

দুটো ফ্ল্যাটের সামনে খানিকটা বাঁধানো চাতাল। ভাব-ভালোবাসা থাকলে ওখানে চেয়ার টেনে নিয়ে এসে গল্পটল্প চলে, আবার মেজাজ গরম থাকলে সেই চাতালই মোটামুটি রণক্ষেত্রে পরিণত হয়।

যেমন হয়েছে এখন। দুই ফ্ল্যাটের দরজা জানলা সব বন্ধ, তার মানেই পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ। হরিমোহনবাবুর দরজার কাছাকাছি একটা ছাতা পড়ে আছে, দেখা যায়। কিন্তু দুটি ফ্ল্যাটে এতগুলি যে মানুষ বাস করে, তার কোনও চিহ্নই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। দেখা যেটা গেল—একেবারে এক মুহূর্তের জন্যেই অবশ্য, ডানদিকের ফ্ল্যাটের দরজাটা একটু ফাঁক হল, একটা বেতের বোনা কুলো প্রায় মিসাইলের মতো এসে আছড়ে পড়ল শিবদাসবাবুর ঘরের দরজার সামনে। বাড়িতে যে মানুষজন কেউ থাকে, এবার সেটা বোঝা গেল। বোঝা গেল মানে যে দেখা গেল এমন কিন্তু নয়, গলা শোনা গেল শিবদাসবাবুর, ঘরের ভেতর থেকেই 'আমাগো কী ফ্যালাইল রে ন্যাপাল?'

কী করে দেখল কে জানে, কিন্তু অদৃশ্যচারী নেপালের কণ্ঠস্বরও ভেসে এল, 'আমাগো কুলা ফ্যালাইয়া দিয়া গেল জামাইবাবু!'

ডানদিকের বাড়িতেও যে মানুষ থাকে, বোঝা গেল সেটাও এবার। যে চাঁচাছোলা কণ্ঠস্বর সেদিক থেকে ভেসে এল তাতে সন্দেহ থাকে না সে স্বরের মালিক ভাগনে কার্তিক ছাড়া কেউ নয়। চাঁচালো কণ্ঠ বললে, 'ছাতাটা ফেলবার সময় মনে ছিল না!'

এবার আর মেঘের আড়াল থেকে নয়, যুদ্ধমান দুই মহাবীর ঘরের আড়াল থেকে

বেরিয়ে এল দরজা খুলে।

ভাগনে কার্তিক এবং শ্যালক নেপাল। খাস ঘটি এবং কাঠ বাঙাল। যেমন অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে একে অন্যের দিকে চাইছিল, মনে হচ্ছিল বাক্যবর্ষণের গোলাগুলি ঠিকরে বেরুতে আরম্ভ করবে এখুনি। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, ওই রকম স্টিল ছবির মতো দাঁড়িয়ে রইল দুজন মিনিটখানেক, টু শব্দটি নেই কারও মুখে। ইত্যবসরে দেখা যাচ্ছিল ডানদিকের দরজার আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছেন হরিমোহনবাবু। বাঁ-দিকে শিবদাসবাবু। দুজনের অবস্থাই থিয়েটারের প্রম্পটারের মতো। স্টেজে অভিনেতা দুজন নীরব অভিনয় করে চলেছে, উইংসের পাশে মদত জোগাতে প্রস্তুত দুই বয়স্ক মানুষ—সরাসরি মধ্যে অবতীর্ণ হতে সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে বোধহয়।

স্থির চিত্র সচল হয়ে ওঠে অচিরেই। দেখা গেল শিবদাসবাবু একটা করে জিনিস এগিয়ে দিচ্ছেন নেপালকে, নেপাল সেটা নিঃশব্দে রেখে দিয়ে আসছে হরিমোহনবাবুর দরজার সামনে। আবার হরিমোহনবাবু কোনও জিনিস এগিয়ে দিচ্ছেন কার্তিককে, কার্তিক সেটা রেখে আসছে শিবদাসবাবুর দরজায়। এমনি নির্বাক চলচ্চিত্রই চলছিল খানিকক্ষণ ধরে, হঠাৎ সেটা 'টকি' হয়ে ওঠে—নেপাল ঢাকনা দেওয়া একটা বস্তু নিয়ে ডানদিকে যাওয়ার সময়।

বেরিয়ে এলেন এবার হরিমোহন রঙ্গমঞ্চে, বললেন, 'একটু সামলে হে ছোকরা, বুঝেছ! এ তোমাদের ওই ডালাকুলো নয়, আস্ত একটা সেলাইয়ের কল।'

উত্তরটা নেপাল হরিমোহনকেও দিল না, কার্তিককেও নয়, ঘাড় ঘুরিয়ে অদৃশ্যচারী শিবদাসের উদ্দেশে বলল, 'এই কল দিয়া যাইতে আছি! দেইখা লইতে কন জামাইবাবু, গোটা কলখানি ফিরৎ পাইছে কিনা। হঃ, ভারি একখান ভাঙ্গা কল, তাই লইয়া ফুটানি মারে।'

সঙ্গে-সঙ্গে ফোঁস করে ওঠে কার্তিক, 'আলবৎ মারবে ফুটানি। কল আছে, তাই ফুটানি মারে। উঃ—ভাঙা কল! ওই ভাঙা কল ধার করে নেওয়ার সময় মনে ছিল না? লজ্জাও করে না।'

'অ্যাই-অ্যাই'—রুখে উঠল নেপালও এবার, 'বুইঝা শুইঝা কথা কইএন মশয়। লজ্জা পামু আমরা? ক্যান? কল দিছিলেন কি ওমনি? জামাটা, পিরানটা—বালিশের ওয়ারটা—এসব মাগনা সিলাই নয়তো অইতো ক্যামনে! কল ধার দিছেন না দরজির খরচ বাচাইছেন?'

দরজার সামনে শিবদাসবাবুর ভুরু কুঁচকে উঠছিল বিরক্তিতে, বললেন, 'আর চুপ যাও না ন্যাপাল—কলটা ফিরৎ দিছ, বাস। কাম চুইকা গেছে। এসব কথা কওনের কী দরকার!'

'ক্যান, কথা কমুনা ক্যান! একশো বার কমু। কলের খোটা দিয়া কথা কয়, তার একটা জবাব দিমু না?' কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে খানিকটা ডানদিকে এগিয়ে একটু হেলাফেলা করেই কলটা ঢক করে নামিয়ে দেয় মাটিতে। আওয়াজটা হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তার দিকে এক পা এগিয়ে আসেন হরিমোহন, বলেন, 'আস্তে হে ছোকরা—একটু আস্তে। জিনিসটা ভাঙলে কিন্তু তোমায় বিক্রি করেও এর দাম উঠবে না।'

কথা শুনেই তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে নেপাল, বলে, 'কী কইলেন?'

'দামি কথা আমি দুবার বলি না'—যেন নেপালকে একেবারে বেমালুম উড়িয়ে দিয়েই কার্তিকের দিকে তাকালেন হরিমোহনবাবু, বললেন, 'কলটা ঘরে নিয়ে যাও। নেপাল-টেপাল এসব জিনিস কখনও দেখেছে, যে এর মর্ম বুঝবে!'

তেরিয়া হয়ে কী একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল নেপাল, থামিয়ে দিয়ে এবার ঘর থেকে

বেরিয়ে এলেন শিবদাসবাবু, বললেন, 'দেখেন হরিমোহনবাবু, চুপচাপই ছিলাম, এতক্ষণ কোনও কথা আমি কই নাই—'

'কেন বলবেন বলুন। এমন একখানা সম্বন্ধী থাকতে কথা কইবার দরকার কী আপনার!'

'আপনেও এই কথা কইলেন। আপনে!! আপনারে আমি একখান বিজ্ঞ বুদ্ধিমান ব্যক্তি ভাবতাম।'

'বাধিত হলাম শুনে।'

'ও, বুঝছি। আপনে ঝগড়া করতেই চান তা হইলে!'

'আর আপনি এতক্ষণ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কী করছিলেন? যাত্রা শুনছিলেন?'

আর সহ্য হল না মনোরমার। পুরুষদের এই ঝগড়াঝাঁটির মধ্যে নিজেকে আর জড়াবে না ভেবেছিল। কিন্তু ঝগড়া যেরকম বেড়েই চলেছে, তাতে তো আর না বেরোলে চলে না। স্বামীর কাছে এসে বললে, 'আচ্ছা, এসব কী শুরু করেছ বলো তো!'

হরিমোহন বললেন, 'করিনি তো কিছু এখনও, দেখে যাচ্ছি শুধু।'

'করবেন!' শিবদাসবাবুর টিকি গরম হয়ে উঠল, বললেন, 'কী করবেনটা কী শুনি?'

নেপাল এতক্ষণ যেন একটু মিইয়ে পড়েছিল, এবার জামাইবাবুর সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলল, 'হ, কী করবেন করেন না অপনে!'

কার্তিক দেখল আসরে যখন নেপাল নেমে পড়েছে, তারও পিছিয়ে থাকা চলে না, বললে, 'কি করব তুমি দেখতে চাও?'

'হ! দেখি না!'

বাঁ দিকের গিন্নিও এবার মুহূর্তে বেরিয়ে পড়ে শিবদাসবাবুর সামনে এসে দাঁড়াল, বলল, 'তোমরা করতে আছ কী?'

মনোরমা বললে, 'ঠিকই তো, কী হচ্ছে কী তোমাদের!'

তরলা বললে, 'কল ফিরৎ দিয়া দিছ, বাস, চুইকা গেছে কাম।'

'শুধু কাম না, সম্পর্কও চুইকা গেছে'—শিবদাস বললেন, 'আর কোনও সম্পর্ক আমাগো দরকার নাই।'

'নেই তো নেই। আমাদেরও কিছু নেই।'

'হ! খ্যায়াল রাখবেন, এই খতম।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ ঠিক আছে, এই শেষ। চলো দিকি সব।'

দুম-দুম করে হরিমোহন ঢুকে গেলেন নিজের ঘরে, পেছন-পেছন মনোরমা এবং কার্তিক।

ঘটনার আকস্মিকতায় দু-এক সেকেন্ড কোনও কথা বলতে পারেনি তরলা। ঘোরটা একটু কাটতেই বলে উঠল, 'ছিঃ! কী কাণ্ড করলা কওতো তোমরা!'

নেপাল কিন্তু বিন্দুমাত্র দুঃখিত নয় এর জন্য, বলল, 'কও কি দিদি, করুম না! আমাগো অপমান কইরা যাইব, আর আমরা চুপ কইরা থাকুম! আবার কিনা ওই কল দেখায়!'

'ছাড়ান দ্যাও।' বিষণ্ণ মুখে বললেন শিবদাসবাবু, 'ব্যাঙ্কের ইয়ার-ক্লোজিং বইল্যা একটা দিন উপরি ছুটি পাইলাম—সেও মাটি হইয়া গেল।'

'মাটি তো নিজেরা করলা'—তরলা বললে, 'দোষ আর দিবা কারে?'

নেপালের এসব দিকে মন ছিল না, কী যেন একটা ভাবছিল আপন মনে, হঠাৎ ভুরু কুঁচকে বলল, 'আমাগো ইস্ত্রিটা কিন্তু অগো ওইখানে আছে।'

শিবদাস নিজেও ভুরু কুঁচকে বললে, 'ক্যান, ওইখানে ক্যান?'

'ক্যান আবার কী!' তরলা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল—'ইস্ত্রির প্লাগ তো অগো ওইখানেই! তোমাগো ইস্ত্রির প্লাগ আছে?'

'না থাউক! গোঁয়ারের মতো বলল নেপাল, 'ইস্ত্রি আমি ওইখানে রাখুম না।'

'নেপাল!' ধমকে উঠল তরলা।

'না গো দিদি, আমারে বুঝাইতে পারবা না'—ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে ডানদিকে এগিয়ে গেল নেপাল, বলল, 'ক্ষমা নাই গো দিদি, ক্ষমা নাই, রাগলে আমি পাষাণ।'

বাধা দেওয়ার আগেই নেপাল ঢুকে গেছে হরিমোহনের বাইরের ঘরে। হরিমোহন ছিলেন না, মনোরমা ছিল। কিন্তু সেদিকে নজর ছিল না নেপালের, সে দেখতে পেয়েছে ইস্ত্রিটা দিয়ে তখন কাজ চলছে। হরিমোহনবাবুদের কাজের লোক মধু মাটিতে শতরঞ্চি ভাঁজ করে তার ওপর কী যেন একটা ইস্ত্রি করছে।

মুহূর্তের মধ্যে ছুটে গিয়ে প্লাগ টেনে খুলে ফেলেছে ইস্ত্রিব। তারপর সেই গরম ইস্ত্রি নিয়ে বেরিয়ে এসেছে বাইরে।

প্রথমটা কিছু বুঝতে পারেনি মনোরমা। মধু ফ্যাল-ফ্যাল কবে চাইছিল! ঘরে একটা কিছু হয়েছে বুঝতে পেরে কার্তিকও ছুটে এসেছিল। মনোরমা বিহ্বল মধুকে জিগ্যেস করলে, 'কী হলটা কী?'

'নিয়ে গেল।'

'মানে? ওই গরম ইস্ত্রি।'

'ও! ওটা যে ওদের'—কার্তিক তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল, 'ঠিক আছে, আমিও এর যোগ্য জবাব দিচ্ছি।

'তুই আবার কী করবি?'

'দ্যাখো না কী করি! আমাদের বেশন ব্যাগটা ওদের বাড়ি আছে না?'

'হ্যাঁ, তাই তো। সেদিন তো কী একটা আনবে বলে'—কথা বলতে-বলতেই কার্তিক অদৃশ্য। সে তখন হুড়মুড় করে ঢুকে পড়েছে শিবদাসের ঘরে। ঘরের মধ্যে কে আছে না আছে দেখার কোনও অবকাশ ওর ছিল না, যেই দেখতে পেয়েছে হুক থেকে ঝুলছে সেই ব্যাগ, সঙ্গে-সঙ্গে নামিয়ে নিয়ে এসেছে সেটা। ব্যাগ খালি ছিল না, কিন্তু কী আছে সেটা দেখার ফুরসতও কার্তিকের ছিল না। ভেতরের জিনিস দুড়দাড় করে মেঝেয় নামিয়ে রেখে ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে।

ঠিক মধু আর মনোরমার অবস্থা এখন নেপালের। কিছু বোঝার আগেই সব কিছু হয়ে গেল। বোঝার পর নেপাল রাগে গবগর করতে-করতে বাইরে এল, বলল, 'ঠিক আছে, দেইখা লমু। এর শোধ যদি না লই—'

কিন্তু তক্ষুনি শোধ নেওয়ার মতো কিছু চোখে পড়ল না তার। চোখে যেটা পড়ল সেটা হচ্ছে, তাদের নানু আর ওদের রিনি একসঙ্গে গল্প করতে-করতে স্কুল থেকে ফিরছে। রোজই ফেরে, নতুন কিছু নয়। নতুন যেটা, সেটা আজই হয়ে গেল, নেপাল তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে খপ করে চেপে ধরল নানুর হাত, তারপর তাকে ধরে টানতে-টানতে নিয়ে চলল নিজেদের বাড়ির দিকে।

প্রথমটা ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিল রিনি, কিন্তু বাধা দেওয়ার বা কিছু বলবার আগেই আর এক কাণ্ড। কোথায় ছিল কার্তিক কে জানে, ঝপ করে বেরিয়ে এসে হাত চেপে ধরল

রিনির, তারপর সেও তাকে টানতে-টানতে নিয়ে চলল বাড়ির দিকে। রিনি হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে বললে, 'আঃ আমায় টেনে নিয়ে যাচ্ছো কেন। আমার যে দরকার আছে নানুদার কাছে।'

'না, কোনও দরকার নেই।' কার্তিক বললে, 'ইস্কুল থেকে আসতে না আসতেই নানুদার সঙ্গে দরকার। ও বাড়ি তুমি আর যেতেই পারবে না।'

'কেন? কী করেছি আমি শুনি?'

'অত কথা আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না'—কার্তিক বললে, 'ও বাড়ি তুমি আর যেতে পারবে না, বুঝেছ?'

'ঠিক আছে, তাহলে নানুদাকেই এ বাড়িতে ডাকছি আমি'—কার্তিকের টানের চোটে নিজের বাড়ির দরজায় পৌঁছে গিয়েছিল রিনি। মাকে দেখা যাচ্ছিল দরজায়, সেদিকে তাকিয়েই ও বলল, 'তাহলে তো আর আমার যাওয়া হবে না!'

'শুনলেন মামিমা, রিনির কথা'—কার্তিক ভুরু নাচিয়ে বলল, 'কী করে ওকে এখন আমি বোঝাই বলুন তো!'

'অত বোঝাবার তোমার দরকারই বা কী কার্তিক! বিরক্ত মুখে কার্তিকের দিকে কথাটা ছুঁড়ে দিয়ে মেয়ের দিকে চাইল মনোরমা, বলল, 'যাও রিনি, স্কুলের জামা কাপড় ছেড়ে আগে হাতমুখ ধুয়ে নাও দিকি।'

আপাতত আর কথা বাড়ানো যে ঠিক নয়, বাচ্চা মেয়ে হলেও সে কথা বুঝে রিনি চলে গেল মায়ের পেছন-পেছন বাড়িতে। নানু তো সেটা জানে না, একটু পরেই বাইরে বেরিয়ে এসে দেখে রিনি নেই। ভুরু কুঁচকে ওঠে নানুর, কিন্তু এরকম ব্যাপার যে নতুন নয় সেটা বোঝা যায়, কারণ এর পরেই বেরোয় তার পকেট থেকে একটা ফুটবল খেলার রেফারির মতো বাঁশি। এদিক-ওদিক একটু চেয়ে কেউ আছে কিনা দেখে নিয়ে নানু বাঁশিতে ফুঁ দেয়।

সঙ্গে-সঙ্গে অন্যদিকে বাঁশি বেজে ওঠে। বেশ বোঝা যায়, আর একজন এই বাঁশিরই অপেক্ষা করছিল। নানুর চোখ চলে যায় হরিমোহনের ছাদের দিকে। দেখা গেল প্রচণ্ড মূকাভিনয় করে রিনি তার অসহায় অবস্থাটা বোঝাবার চেষ্টা করছে।

'কী হল কী?' গলা না তুলে বলল নানু।

'যেতে দেবে না আমাকে তোমাদের বাড়ি'—চাপা গলাতেই বলল রিনি।

'সে তো আমাকেও না'—দুবার চোখ পিটপিট করে নানু বললে, 'দাঁড়া, টেলিফোন করছি।'

'শিগগির করো না! এক্ষুনি, এসে পড়বে কেউ।'

'দূর, কেউ নেই এখন। দাঁড়া'—পকেট থেকে টুকরো কাগজ বার করলে নানু, অর্থাৎ বিপদের সঙ্কেত বুঝে তৈরি হয়েই এসেছিল। একটা ইটের টুকরোয় কাগজটা জড়িয়ে পকেট থেকে সুতো নিয়ে বাঁধতে শুরু করলে।

কাজে নানুর এতই মন যে, দেখতেই পায়নি নেপাল বেরিয়ে এসেছে শিবদাসের বাড়ি থেকে। নানু না পেলেও রিনি তো পেয়েছে। দু-চারবার ইঙ্গিতে বোঝাবার চেষ্টা করলে, তারপর উপায় না দেখে কোঁচড় থেকে বাঁশি বার করে এক ফুঁ।

সচকিত হয়ে গিয়েছিল বাঁশির আওয়াজে, কিন্তু তার আগেই একেবারে মুখোমুখি নেপালের। চোখ পাকিয়ে নেপাল বললে, 'কীরে! কী কইছিলাম তরে?'

'কী কইছিলা? আমি গেছি নাকি অগো বাড়ি!' নানু হাতের ঢিলটা লুকোতে না পেরে বলল, 'আমি ঢিল মারতে ছিলাম অগো বাড়ি।'

'ঢিল মারতে ছিলাম!' ভেঙিয়ে উঠল নেপাল, 'তরে ঢিলাইতে আমি কইছি?'

'বারে অদের সাথে তো আমাগো ঝগড়া। ঢিল মারব না ক্যান?'

'না, মারবা না। ঢিলও মারতে অইবো না, অদের বাড়িতেও যাইতে অইবো না আর'—নেপাল তির্যক ভঙ্গিতে ওর দিকে চেয়ে বলল, 'কি, মনে থাকব? থাকব কি মনে?'

নানু আপনমনে গজগজ করছিল, বললে, 'ক্যামন করে থাকবে কও! খানিক বাদেই তো কইবে যা নানু—অদের খবরের কাগজটা লইয়া আয় ত। তখন কইলে আমি পারুম না, বাস!'

'পারতে অইবো না তর। তুই অগো বাড়ি যাবি না, ওদের সাথে কথাও কবি না। এইটা হইল কথা।'

'হুকুম তোমার যত আমার বেলা!' নানু না বলে আর পারল না, 'দিদিরে লইয়া কী করবা? দিদিরে চঞ্চলদা পড়াইতে আসবে না? তখন কী করবা শুনি!'

'অ—বড় দেখি তোর চিন্তা!' ধমকে উঠল নেপাল, 'আরে সে খবরে তর কী কাম রে পোলা! যা, বাড়ির ভিতরে যা!'

ভেতরেই যায় নানু। গজগজ করতে-করতে তার পেছন-পেছন বাড়িতে গিয়ে ঢোকে নেপাল। রা'গটা একটু বেশিই হয়েছিল, তা নইলে টের পেত রাস্তা দিয়ে, গল্প করতে-করতে প্রমীলা আর চঞ্চল এসেই পড়েছে বাড়ির সামনে।

হাসিতে গড়িয়ে পড়ছিল প্রমীলা, চঞ্চল কৌতুকের ভঙ্গিতে চেয়েছিল, বললে, 'বাবা, ব্যাপার কী বলো তো?'

'সেইটাই তো বলছি'—প্রমীলা হাসির দমক সামলাবার চেষ্টা করে বললে, 'কী হয়েছে জানেন আজকে?'

'কী হয়েছে বলো তো, পরীক্ষায় ফেল করেছ, এই তো?'

'আহা, ফেল করব কেন, শুনুন না'—প্রমীলা খানিকটা সামলে নিয়ে বলল, 'দারুণ মজা হয়েছে আজ। কাকে দেখেছি জানেন আজ?'

'প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্‌, না শাহ্‌ অব পারসিয়া?'

'আরে নারে বাবা, শচীন রায় গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল'—শচীন রায়ের নামটা উচ্চারণ করার সঙ্গে আবেগে কুঁচকে গেল প্রমীলার চোখ, বললে, 'আমাদের বাসের সামনে-সামনেই। হঠাৎ গাড়ির টায়ার ফেটে গিয়ে সে কী নাকাল!'

'কে শচীন রায় বলো তো'—চঞ্চলের মুখে ছদ্ম কৌতূহল, 'ট্যাক্সি ড্রাইভার?'

'ট্যাক্সি ড্রাইভার! শচীন রায়!' রাগে কথা বন্ধ হয়ে যায় প্রমীলার।

'আহা, জানি না তো—' সামলাবার জন্যে বলল চঞ্চল, 'গাড়ির টায়ার ফেটে গেল বললে—তাই ভাবলাম হয়তো ওটা তারই ট্যাক্সি হবে।'

'ট্যাক্সি কেন হবে! ওর নিজেরই গাড়ি।'

'বাবা! নিজের গাড়ি!' চঞ্চল বললে, 'কিন্তু লোকটা কে?'

'কে আপনি জানেন না!' বিস্ময়ে প্রমীলা কথা বলতে পারছিল না, 'আপনি জানেন না শচীন রায় কে!'

'সরি, ভেরি সরি'—চঞ্চল বললে, 'আমার এই পর্বতপ্রমাণ অজ্ঞতার জন্যে সত্যিই

আমি লজ্জিত। এমন মহান ব্যক্তির নাম কখনও শুনেছি বলে তো মনে হয় না। তা আমার অজ্ঞতার অন্ধকারটা দয়া করে দূর করে দাও এবার।'

প্রমীলা কৃত্রিম গাম্ভীর্য এনে বলল, 'ঠাট্টা আপনি যতই করুন, শচীন রায়ের নাম না জানাটা কিন্তু সত্যিই লজ্জার। এখনকার এত বড় একজন সিনেমা অভিনেতা তার আপনি নাম জানেন না?'

'সত্যিই হার স্বীকার করছি এখন'—চঞ্চল বললে, 'তা এ হেন শচীন রায়কে তুমি স্বচক্ষে দেখলে—তাও কিনা ওইরকম টায়ার-ফাটা অবস্থায়!'

'ওঃ বাসটা এলাকে তোলবার জন্যে একটু দাঁড়িয়েছে'—পুরনো হাসির মেজাজে ফিরে এসে প্রমীলা বললে, 'ঠিক সেই সময়ে গাড়িটা আমাদের বাসের সামনে এসেই—'

অনেকক্ষণই দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল নেপাল, হাসিঠাট্টার শব্দে মাথায় আগুন ধরে যাচ্ছিল, এবার আর থাকতে না পেরে বলল, 'মিলু! ভিতরে আয়।'

'যাচ্ছি'—একবার শুধু তাকাল প্রমীলা নেপালের দিকে, কিন্তু তাকে বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য না করে যেমন বলে চলেছিল তেমনি বলতে লাগল, 'তারপর কী হল জানেন?'

'তার তো টায়ার ফটাস! তোমাদের বুকগুলোও নিশ্চয়ই ধড়াস-ধড়াস!'

'আহা! ওরকম করে বলবেন না।'

'মিলু!' এবার আদেশের সুরে চিৎকার ভেসে এল নেপালের গলা থেকে।

তাতে কোনওরকম প্রতিক্রিয়াই হল না মিলুর, আর একবার 'যাচ্ছি' বলেই ফের চঞ্চলের দিকে ফিরে বলল, 'গাড়িটা তো কোনওরকমে ফুটপাতের ধারে রাখল, তারপর—'

কথা শেষ করার আগেই নেপালের আর একটা হুঙ্কার : হেই মিলু! কি কইতে আছি, শোনস না?'

মিলু ভুরু কুঁচকে তাকাল এবার নেপালের দিকে, বলল, 'হ, শুনছি তো। হইছেটা কী তায়?'

'যা হইছে সব ভিতরে গিয়া শুনলেই ত পারস।'

মিলু উত্তর দেওয়ার আগেই চঞ্চল হেসে ফেলল, বলল, 'যাও-যাও, ভেতরে যাও। এখনও বুঝতে পারছ না কি হয়েছে!'

'তা আর বুঝিনি!'

'বুঝলে আর খাড়াইয়া আছস ক্যান!' নেপাল বললে।

'আপনিই বা চুপ করে আছেন কেন নেপালবাবু! হাসতে-হাসতেই বলল চঞ্চল, 'এতক্ষণ তো ওকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে আপনার দরজা বন্ধ করে দেওয়ার কথা।'

কটমট করে একবার চঞ্চলের দিকে চেয়ে নেপাল বললে, 'তোমার লগে আমি কথা কই নাই।'

হরিমোহনের ঘরের দরজা খুলে গেল, কার্তিক বেরিয়ে এসে বলল, 'দূর-দূর, কার সঙ্গে কথা কইছ চঞ্চল! যেমন রসিকতা-জ্ঞান, তেমনি ভদ্রতা!'

'ভদ্রতা! আমাগো শিখাইবেন ভদ্রতা!' দপ করে জ্বলে উঠল এবার নেপাল—'দ্যাখেন মশয়, আপনাগো ভদ্রতাও সব জানা আছে আমার।'

ভাগনের বিপদে অচঞ্চল থাকতে পারেন না হরিমোহন, দরজা টেনে বেরিয়ে এলেন একেবারে নেপালের সামনে, বললেন, 'কথা বলব নাই ভেবেছিলাম, কিন্তু না বলেও তো

পারি না নেপালবাবু। ভদ্রতা কাকে বলে জানা থাকলে গায়ে পড়ে এখানে মেছোহাটার মতো ঝগড়া করতেন!'

শ্যালকের সহায় এবার জামাইবাবু অবতীর্ণ হলেন, হরিমোহনের সামনে এসে শিবদাস বললেন, 'আপনারেও তাইলে কই হরিমোহনবাবু, এই মেছোহাটায় আপনে লাগতে আইলেন ক্যান কন দেখি!'

'লাগতে এলাম মেছোহাটার এই কচকচানি আর সহ্য হচ্ছে না বলে!' হরিমোহন বিরক্ত মুখে বললেন, 'কী দরকার মশাই এত কচকচির। ভাগনিকে ঘরে ডেকে নিয়ে যান—ব্যাস! সব সম্পর্ক শেষ।'

'হ, শ্যাষ! আপনারেও কয়্যা দিই সেটা—আপনের পোলারে সাবধান কইরা দিবেন, আমাগো সাথে চুতরাপাতা আলাপ যেন না করতে আসে।'

'সাবধান করে দেব! এরপর যদি হতভাগা কোনওদিন আপনার চৌকাট মাড়ায়, ঠ্যাং দুটো ওর ভেঙে দেব আমি। হল!' চঞ্চলের দিকে ফিরে বললেন, 'যাও-যাও, ভেতরে যাও—আমার কথাগুলো সব শুনতে পেয়েছ বোধহয়?'

হাসি পেয়ে যাচ্ছিল, কোনওরকমে সামলে নিল চঞ্চল! নাকি সামলে নেওয়ার জন্যে বাড়িব ভেতব ঢুকে গেল কে জানে। চঞ্চলই যখন চলে গেল হরিমোহনেরও থাকবার কোনও দরকাব ছিল না, শিবদাসবাবুর দিকে একটা অগ্নিবর্ষী কটাক্ষ করে তিনিও সেঁধিয়ে যান ভেতরে। শিবদাসবাবুর সামনে কটাক্ষ হানার মানুষ ছিল না, তাই প্রমীলার হাত ধরেই হিড়হিড় কবে টানতে-টানতে নিয়ে যান।

দলে ভাবী ওরা, সেইজন্যেই একটু স্তিমিত ছিল বোধহয় কার্তিক, এখন নেপালকে একা পেয়ে যেন একহাত নেবে, এইভাবে চোখ রাঙিয়ে এগিয়ে যায়। মুখে কথা নেই, কিন্তু মারমুখী ভঙ্গি দেখে নেপালও আস্তিন গুটিয়ে তৈরি হয়। মনে হয় এক্ষুনি যেন শুরু হয়ে যাবে একটা কুরুক্ষেত্র। কিন্তু গর্জন বা বর্ষণ কিছুই হয় না, কার্তিক মুখে একটা অবজ্ঞাসূচক আওয়াজ করে চলে যায় নিজেদের ফ্ল্যাটের দিকে। দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দেয়। নেপাল প্রায় দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলে, 'অ—বাগ দেখায় সব ওই দরজার উপর।'

খুলে যায় দরজা, ধেয়ে আসে কার্তিক, বলে, 'কী বললেন?'

'কমু আবার কী! দরজাটা বাড়িওয়ালার! সেই কথাই কই।'

'দালালি মারতে হবে না, সেটা বাড়িওয়ালাই ভালো বুঝবে।'

আবার ভেতরে ঢুকে দড়াম করে শব্দ। নেপাল তেড়ে যাচ্ছিল ওদিকে, শিবদাসবাবুর স্ত্রী তরলা বেরিয়ে আসে, বলে, 'তরা ঝগড়াই কর। যত সব কুচুইট্যাপনা।'

তরলার গায়ে ভালো শাড়ি, যেন কোথাও যাওয়ার জন্যে তৈবি, এইরকম মনে হয়। শিবদাসবাবু বেরিয়ে এসে বললেন, 'তুমি আবার চললা কোথায়?'

'কী আর করি কও! ঝগড়া করলে তো আর খ্যায়াল কিছু থাকে না।' তরলা স্বামীর দিকে চেয়ে বলল, 'ইস্টিশনে যাইতে হইবো, সে খ্যায়াল আছে?'

'ইস্টিশন! হে তো বিকাল পাঁচটায়!'

'তার দেরি আছে কিছু? পাঁচটা তো বাজে!'

'বাজে নাকি! খাড়াও, জামাটা গলাইয়া আসি।' শিবদাসবাবু বাড়ির ভেতরে চলে যায়, তরলা বলে, 'আমার হইছে যত জ্বালা। তরে দিয়া তো কোনও ভরসা নাই, দাড়া, নানু আর মিলুকে রাইখা যাই।'

'না-না, ছাড়ান দাও'—নেপাল গোঁয়ারের মতো বললে, 'কাউকে রাইখা যাইতে অইব না।'

'থাম দেখি। ওদের লগে ত বাধাইছিস ক্যাচাল। অখন ঘরদুয়ার সামলায় কে শুনি!'

শিবদাসবাবু হাতে এক বিরাট তালা নিয়ে বেরোন, বলেন, 'কাউর সামলাইতে হইব না। দরজায় আমি তালা দিয়া যামু। যা তুই ভিতরে যা।'

'আমি একটা মানুষ থাকতে তুমি'—ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ হয় না নেপালের। কিন্তু কথা শেষ করার আগেই প্রচণ্ড দাবড়ানি দেয় তরলা, বলে, 'তুই যাবি কি না! মানুষ! তুই মানুষ হইলে আমার কপাল পুড়বো ক্যান। ভালো চাস তো—'

দিদির মেজাজকে চেনে নেপাল। মানে-মানে ঢুকে পড়ে ভেতরে। দরজায় তালা লাগিয়ে দুর্গা-দুর্গা করে বেরিয়ে পড়ে ওরা। আর ঠিক মিনিটদশেক পরেই দেখা যায় কুলির মাথায় বিশাল মাল চাপিয়ে যশোদা, মানে এক বর্ষীয়সী স্থূলাঙ্গিনী ভদ্রমহিলা এসে হাজির হরিমোহনবাবুর বাড়ির সামনে।

পাশাপাশি বাড়ি, একটু ধন্ধে পড়েছিলেন বোধহয়, কিন্তু বাঁদিকে ফ্ল্যাটে তালা দেখে প্রায় নিঃসন্দেহ হয়ে ডানদিকে হরিমোহনবাবুর দরজাতেই কড়া নাড়তে থাকেন।

একটু পরেই কাজের লোক মধু এসে দরজা খুলে দেয়, যশোদা একটু স্বস্তি পেয়ে বলেন, 'কাজের মানুষ তুমি এ বাড়ির? নাম কী তোমার বাছা?'

মধু নাম বলে। যশোদা বলেন, 'যাও, তোমার মারে বাবুরে গিয়া কও, আমি আইয়া পড়ছি।'

মধু বুঝতে না পেয়ে ফ্যাল-ফ্যাল করে চায়, বলে, 'আজ্ঞে—'

যশোদার স্বস্তি মুহূর্তে অন্তর্হিত হয়, ধমক দিয়ে বলেন, 'আরে! কইলকাতার কাজের মানুষ গুলা কি সব বলদা নাকি? খাড়াইয়া আছো ক্যান?'

হঠাৎ খেয়াল করেন মাল নামিয়ে কুলি দাঁড়িয়ে আছে। শাড়ির আঁচল থেকে একটা নোট বার করে সেটা কুলির হাতে দিয়ে দেন। অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে চায় কুলি, বলে, 'মাইজি, এতনা দূরসে আয়া—'

'বাস-বাস। ঠিকই দিছি। আমাগো নারায়ণগঞ্জ হইলে আরও কম দিতাম। কইলকাতা আইছি বইলা কী ঠকাইয়া লইবা! যাও-যাও, ঠিকই আছে।'

খুশি হয় না কুলি, কিন্তু বুঝতে পারে এর চেয়ে বেশি আর আদায় হবে না। সুতরাং বক-বক করতে-করতেই চলে যায়।

যশোদা হঠাৎ লক্ষ করে মধু তখনও দাঁড়িয়ে আছে। দেখে দপ করে রক্ত উঠে যায় মাথায়, বলেন, 'আরে! হেইটা কী কালা না বোবা রে! শুনতে পাও না কি কই আমি? অখনো খাড়াইয়া আছ এখানে?'

'আজ্ঞে, কী বলব?'

'কইবা আমার মাথা! আইচ্ছা আহাম্মক তো তুমি! শিবুরে কইয়া আজই তোমারে ছাড়াইয়া দিতে পারি তা জানো!'

হইচই শুনে ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছিল কার্তিক, বললে, 'কী হয়েছে কী রে মধু!'

'কী হয় নাই তাই কও!'

'আপনি!' কার্তিক বললে, 'কোথা থেকে আসছেন আপনি?'

'নারায়ণগঞ্জ থিক্যা। এই একটা কথা কতবার কইতে হইবো তাই কও।' বিরক্ত দৃষ্টিতে কার্তিকের দিকে চেয়ে যশোদা বললেন, 'বাড়ির হগ্‌গলে গেল কই? আসুম জাইনাও সব বাইর হইয়া গেল। তোমারেও তো ঠিক চিনলাম না।'

'চিনবেন কেমন করে, নারায়ণগঞ্জের সঙ্গে তো আমার কোনও সম্বন্ধই নেই।'

'কও কী!'

'ঠিকই বলি, আপনিই ভুল করছেন।'

'বুঝছি, তোমার সাথে কথা কওয়াই আমার ভুল। যা করনের আমি নিজেই করুম।' হঠাৎ দেখে মধু সঙের মতো তখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। তার দিকে চেয়ে যশোদা বললেন, 'এই বলদা! হা কইরা কথা গেলস কী! মোটগুলা লইয়া ভিতরে যা না! শোনো বাছা, তোমারে কই, তোমাগো কলঘরটা আমারে দেখাইয়া দ্যাও। র‍্যালে চড়ন মানে ত নরকবাস। নাইয়া ধুইয়া শুদ্ধ না হইলে—'

কথার মাঝখানেই মনোরমা আর হরিমোহনবাবু এসে উপস্থিত হন। নিজের ভুল এবার বুঝতে পারেন যশোদা। একটু অবাক হয়ে বলেন, 'সারসে। এ বাড়ি তা হইলে—'

'হ্যাঁ, সেই কথাই তো বলছিলাম আমি'—কার্তিক বললে, 'আপনি ভুল করেছেন।'

'না বাবা, ভুল আমি করি নাই'— হেসে বললেন যশোদা, 'একই তো বাড়ি। তোমরা এই ধারে থাকো, তাই তো? তোমাগো আমি চিনি!'

'চেনেন?'

'তা আর চিনুম না। চোখের দেখাডা হয় না, তাই কি আর কথা কিছু শুনি নাই তোমাগো!'

'আমরা কিন্তু আপনাকে চিনি না। আপনার সম্বন্ধে আমরা যখন কিছুই জানি না—'

'আর তুমি থামো তো কার্তিক'—হরিমোহন থামিয়ে দিলেন ওকে, 'কথাটা শুনবে তো ভদ্রমহিলার।'

'কও দেখি!' সমর্থন পেয়ে যশোদার জোর বাড়ল একটু, 'পোলাডার কথাবার্তা জানি ক্যামুন। কয় আমি ভুল করছি।'

হরিমোহন একবার তাকালেন মনোরমার দিকে, তারপর যশোদার দিকে ফিরে বললেন, 'দেখুন, ভুলই করুন আর ঠিকই করুন, আমাদের বাড়ি এসে পড়েছেন যখন, অসুবিধে আপনার কিছু হবে না। সেরকম লোক আমরা নই।'

'জানি তো। আমারে কইতে লাগব সেটা।' যশোদা হাসিমুখে বললেন, 'তোমাগো কথা শুনতে তো কিছু বাকি নাই আমার। এই ত আইঙ্‌ধার আগের দিনই কত শোনলাম। ফি-চিঠির অইর্ধেক ত তোমাগোই কথা। অ আমার শিবদাস যা তোমরাও তাই।'

মনোরমা চোখ কুঁচকে আন্দাজ করার চেষ্টা করছিল, বলল, 'ও, শিববাবুদের বাড়িতেই এসেছেন আপনি! কে এক দিদি আসার কথা ছিল—'

'শোনো কথা! আমিই তো সেই দিদি গো, যশোদিদি। অগো য্যামুন দিদি, তোমাগোও তাই। তোমার নাম না মনোরমা?'

'মনে আছে দেখছি। আসুন, ট্রেনের ধকল সয়ে এসেছেন—স্নান টান সেরে একটু জল খান।'

'সে আর কইতে হইবো না মা'—এতক্ষণে যেন বেশ গুছিয়ে নিতে পেরেছেন যশোদা, কার্তিকের দিকে চেয়ে বললেন, 'ডাকবাক্সের মত হা কইরা দেখো কী! মালগুলা হাতে কইরা ভিতরে যাইতে পারো না!'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওই বিরাট বোঝা কাঁধে নেয় কার্তিক, বাড়ির ভেতর যেতে-যেতে যশোদা বলেন, 'সাবধানে লও বাছা, ভিতরে অমির্তি আছে—' তারপর মনোরমার দিকে ফিরে বলেন, 'নারায়ণগঞ্জের অমির্তি আর আগের মত নাই। তবু কইলকাতার থিক্যা ভালো। যাও ভিতরের ঘরে যাও তুমি।'

কার্তিক ভেতরের ঘরেই চলে গেল। বাইরের ঘরে রিনি একটু অবাক হয়েই দেখছিল। নানুদাদের আত্মীয়কে ডেকে এ বাড়িতে নিয়ে এল বাবা, ওই ধুম ঝগড়ার পর, ব্যাপারটা ভালো মাথায় ঢুকছিল না তার। বাবাই বলছিল, 'আপনি মনোরমার সঙ্গে কলঘরে যান। একটু বিশ্রাম টিশ্রাম নিন, ওরা এসে যাবে ততক্ষণে।'

যশোদা গায়ের চাদর হাতে নিয়ে বললেন, 'আসুক না আসুক সে ভাবনা আমার নাই। অগো যখন হুশ নাই, আমি এ বাড়িতেই থাকুম।'

'বারে, সে আবার কী!' এবার আর না বলে থাকতে পারল না রিনি, 'ওদের সঙ্গে আমাদের তো ঝগড়া এখন।'

মনোরমা চোখ টিপছিল, দেখতে পেল না রিনি, মুখে বললই মনোরমা, 'রিনি! কী বলছ যা-তা। '

যশোদা একগাল হেসে বললেন, 'অরে মাইয়া, আমার লগে ঠাট্টা করুস?'

'বারে ঠাট্টা করবো কেন, আমি তো—'

'আসুন দিদি'—আর কথা বলতে দেয় না মনোরমা মেয়েকে, যশোদার হাত ধরে কলতলার দিকে নিয়ে যায় তাকে। সেই মুহূর্তেই বাইরে শিবদাসবাবুর গলা শোনা যায়, রিনি জানলার কাছে আসে।

সত্যিই তাই। মেসো আর মাসিমা ফিরছেন কোথা থেকে। শিবদাস বলছিলেন, 'আমি আর কী করুম কও। রোজই ত গাড়ি লেট থাকে, আইজ যে এ্যাক্কারে বিফোর টাইম আইবো—'

কথার মাঝখানেই রিনি জানলা থেকে চাপা গলায় ডাকে, 'মাসিমা—'

তরলা ঘুরে তাকায়, বলে, 'কী হইছে রে?'

'আমাদের বাড়িতে তোমাদের কে এসেছে গো!'

শিবদাস তালা খুলে দরজার হাঁসকল খুলছিলেন, সঙ্গে-সঙ্গে নেপাল ভেতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে বললে, 'জানি-জানি, কে আইছে। বাড়িতে তালা দিয়া রাখছো, বাইর হই কোন মুখে! তোমার যশোদিদি গো! অগো বাড়ি লইয়া গেছে।'

'অ্যাঁ! কস কী!' প্রায় আঁতকে ওঠেন শিবদাস, বলেন 'চল-চল ন্যাপাল—'

দরজা খোলাই ছিল, নেপাল এবং শিবদাস একেবারে সবেগে ঢুকে পড়েন হরিমোহনের বাইরের ঘরে। 'মেসোমশাই এসেছে বাবা'—বলে একটা হাঁক দিয়েই রিনি পগার পার, কারণ বাইরে নানুদাকে সে দেখতে পেয়েছে।

ঘরে কিন্তু হরিমোহন আসেন না। সবে চাদর টাদর রেখে কলঘরের দিকে যাচ্ছিলেন, শিবদাসের গলা শুনে তিনি নিজেই এসেছেন ব্যাপারটা দেখতে। ভাই আর ভায়ের গুণধর শালাকে একসঙ্গে দেখে বললেন, 'তগো আক্কেলটা কী আমারে ক দেখি।'

নেপাল তাতে ভ্রূক্ষেপ না করে বললে, 'আসেন আপনি। এইটা আমাগো ঘর না।'

শিবদাসও এবার একটু জোর পেয়ে বললেন, 'তুমি না জাইন্যা না শুইন্যা এখানে আইস্যা ঢুকলা ক্যান? ইস্টিশনে এট্টু ওয়েট করলেই পারতা।'

'হ। তাইলে তো কোনও ক্যাচালই হইতো না।' নেপালের সংযোজন।

শিবদাস বলেন, 'তোমার জিনিসগুলা কই, সেটা তো কইবা।'

উপর্যুপরি অভিযোগ এবং পালটা অভিযোগের আঘাতে একটু বেসামাল হয়ে গিয়েছিলেন যশোদা। এবারে সেটা সামলে নেওয়ার চেষ্টা করে বললেন, 'আরে বাবা! তোরা যে দেখি ঘোড়ায় জিন দিয়া আসছস! র, আমি চান টান সাইরা লই, তারপর সে না—'

'না! হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন শিবদাস, 'চান টান এখানে হইবো না।'

'হ! আমাগো বাড়ি কি জল নাই যে আদারে বাদারে আপনের চান করা লাগবো?'

'চলো তুমি। অহনই চলো।'

হরিমোহন গণ্ডগোল শুনেই ব্যাপারটা আন্দাজ করেছিলেন। ঝড়ের আগে বাঁশপাতার মতো কার্তিকও কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। থাকতে না পেয়ে বাইরের ঘরে ঢুকে পড়ে শিবদাসকে বললেন, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, এক্ষুনি নিয়ে যান। আদারে বাদারে কেন চান করতে দেবেন দিদিকে।'

কার্তিক অত ঠান্ডা গলায় কথা বলতে পারে না, বললে, 'আপনার দিদিকে ধরে বেঁধে ঢোকাইনি আমরা। বিপদে পড়েছিলেন, তাই দয়া করে জায়গা দিয়েছিলাম।'

টিকি জ্বলে গেল কথা শুনে, নেপাল বললে, 'দয়া করছেন! কে কইছিল আপনাগো দয়া করতে?'

'চমৎকার!' হরিমোহন বললেন, 'খাতির করে জায়গা দেওয়াটাই আমাদের অন্যায় হয়েছে।'

'বাড়ি থেকে বার করে দেওয়াই উচিত ছিল আমাদের! তাই করতেই যাচ্ছিলাম আমি'—চিৎকার করে কথাটা বলেই নিজেকে সামলে নিল কার্তিক। এতটা বলা বোধহয় ঠিক হয়নি, বুঝতে পেরে বলল, 'যাক্‌গে, ঝামেলা হটাও, আমি একটু বাইরে যাচ্ছি।'

হন-হন করে পাশ দিয়ে কার্তিক বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে শিবদাস বললেন, 'শুনলেন হরিমোহনবাবু! কথা শুনলেন ভাইগনার! এটা নাকি ঝামেলা! উনি বাইর কইরা দিতাছিলেন আমার দিদিরে। আস্পর্ধাটা দ্যাখেন।'

হয়তো নরম হয়েই কিছু বলতেন হরিমোহন, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে নেপাল ফোড়ন কেটেছে—'হইব না আস্পর্ধা। যেমন ফুঁ তেমনি ত পোঁ বাজে।'

গরম হয়ে গেল মেজাজ, হরিমোহন বললেন, 'হ্যাঁ, তাই বেজেছে। আমিই বলেছি আপনার দিদিকে বার করে দিতে। হল তো?'

'হ, চিনলাম আপনারে!' শিবদাস বলেছেন, 'ভালো কইর‍্যাই বোঝলাম সব।'

'কী বুঝলেন?'

'আরে মশয় ঘটিগো দস্তুরই হইল এই।'

'ও! ঘটিদের দস্তুর আপনি বুঝে গেছেন? চমৎকার'—হরিমোহন কটমট করে শিবদাসের দিকে চেয়ে বললেন, 'আপনাদের বাঙালদেরও জানতে আমার বাকি নেই।'

'বাকি নাই? ঠিক নাকি?'

'এই শিবু'—হালকা করে এবার একটা ধমক দিলেন যশোদা, 'তরা ঝগড়াই করবি, আর আমি এখানে খাড়াইয়া থাকব?'

'থাকব, থাকব।' হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন শিবদাস, 'আইজ একটা হেস্তনেস্ত না কইরা যামু না আমি। কয় কিনা বাঙালদের জানতে বাকি নাই। বাঙাল আপনার কী ক্ষতিটা করছে শুনি।'

গলাটা ঠিক সমান উচ্চতায় তুলে হরিমোহন বললেন, 'আর আপনিও ঘটিদের দস্তুরটা কী জেনেছেন শুনি।'

'হুঃ! ঘটিগো কথা আর কইবেন না! আমরা যে—'

কথা বন্ধ হয়ে গেল রিনির কান্নায়। ক্রন্দনরত রিনিকে নিয়ে প্রায় হিড়-হিড় করে টানতে-টানতে ঘরে ঢোকে কার্তিক, বলে, 'দেখুন ছোটমামা, দেখুন। ঢিল মেরে মাথাটা কীরকম ফাটিয়েছে একবার দেখুন।'

ঘরের পরিবেশই পালটে যায়। শিবদাস তাড়াতাড়ি ছুটে যান রিনির দিকে, নেপালও যায়। হরিমোহন ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কী করে ফাটল রে?'

নেপাল বললে, 'ঢিলাইছে কে?'

শিবদাস বললেন, 'হ। ফাটাইল কে রে মাথাটা?'

কার্তিক বললে, 'কে আবার! ওই গুণধর ছেলে নানু।'

শিবদাস আঁতকে উঠে বললেন, 'নানু! আমাদের নানু ঢিল মারছে?'

কার্তিক বলল, 'দেখতেই পাচ্ছেন মেরেছে কিনা!'

শিবদাসের রাগ একেবারে চণ্ডাল, সেটা জানেন হরিমোহন। তাই ওঁকে সামলাবার জন্যে তাড়াতাড়ি কার্তিকের দিকে চেয়ে বললেন, 'দাঁড়াও না, বুঝতে দাও ব্যাপারটা।' মেয়ের দিকে মুখ ঘুবিয়ে বললেন, 'এই, কী করেছিলি তুই? নানু এমনি-এমনি তোকে ঢিল মারল?'

সঙ্গে-সঙ্গে কার্তিকের ফোড়ন—'ওই তো! যেমন শিক্ষা পেয়েছে!'

'কী! বুইঝা শুইঝা কথা কইবেন মশয়'—আর রাখা গেল না শিবদাসকে, বললেন, 'পোলারে আমি ঢিল মারতে শিখাইছি! আইচ্ছা, দ্যাখতাছি আমি শয়তানটা গেল কোথায়! তার পিঠের চামড়া যদি আমি তুইল্যা না লই—'

'আরে শোন-শোন—' দেখা গেল যশোদাও শিবদাসের রাগের সঙ্গে বিলক্ষণ পবিচিত, বললেন, 'ওসব করনের আগে মাইয়াডার কপালে এট্টু টিংচার আইডিন লাগাইলে ভালো হইত না?'

'দ্যাখতাছি আমি'—কী মনে করে নেপাল বেরিয়ে যায় ছুটে। বোধহয় একটু প্রেস্টিজে লাগে হরিমোহনের, মনোরমাকে বলেন, 'আইডিন তো আমাদেরও আছে, নিয়ে এসো না।'

'খুঁজছিলাম তো'—মনোরমা বললে, 'শিশিটা যে কোথায় রাখলাম—'

'তা পাবে কেন! কাজের সময় কোন জিনিসটা হাতের কাছে পাওয়া যায়!'

শিবদাস বলেন, 'কইছেন ঠিক। কাজের সময় কিছু পাওনের উপায় নাই।'

'নেই বলে বসে থাকলেই হবে!' হরিমোহন চেঁচিয়ে বলেন, 'এই চঞ্চল'—ছুটে আসে চঞ্চল, 'বাবা!'

'আরে বাবা, দয়া করে কিনে নিয়ে এসো না একটা আইডিন। কী হল, যাও—'

চঞ্চল একটু ইতস্তত করছিল, বোধহয় বলতে চাইছিল তার আগে বাড়িতে আর একটু খোঁজার কথা। ইতিমধ্যেই নেপাল হাজির আইডিন নিয়ে। শিশিটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে, 'দ্যাখেন আবার বাঙালগো আইডিনে কাজ হইব কিনা।'

নিতে যাচ্ছিল কার্তিক, কথা শুনে হাত গুটিয়ে নেয়, বলে, 'থাক, ও আইডিনে আমাদের দরকার নেই।'

চঞ্চল বললে, 'নাও না কার্তিকদা, বাড়ি পালটালে আইডিনের কাজ পালটায় না।'

'হ্যাঁরে বাবা, টিঞ্চার আইডিন হলেই হল'—হরিমোহন মনোরমার দিকে চেয়ে বললেন, 'হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছো কেন? রক্তটা বন্ধ করতে হবে তো? ব্যান্ডেজ ট্যান্ডেজ আনো কিছু একটা!'

'আমি আনছি'—নেপাল পকেট থেকে ব্যান্ডেজ বার করে দেয়, 'এই লন।'

শিবদাস বলে, 'বুদ্ধি কইরা এট্টু তুলা আনতে পারো নাই?'

'করছি বুদ্ধি'—নেপাল পকেট থেকে তুলোও বার করে, 'ন্যাপালের কামে কোনও খুত নাই।'

'নাও-নাও, ব্যান্ডেজ করো'—বলেন হরিমোহন, কিন্তু দেখতে পান শিবদাস গজ-গজ করতে-করতে বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে। ছেলেটার কপালে দুঃখ আছে, বুঝতেই পারছেন, কিন্তু এখন আর কিছু করবার নেই।

করবার যে সত্যিই নেই, সেটা বোঝা গেল মিনিটখানেক পরেই। নানুকে কান ধরে টানতে-টানতে নিয়ে এলেন, বললেন, 'ঢিল মাইরা উনি লুকাইয়াছিলেন গিয়া খাটের তলায়। কম শয়তান নাকি?'

দু-চার ঘা পড়ার পর চঞ্চল ছুটে এল নানুর কাছে, বলল, 'আরে, এতে তো ওর মাথাটাও ফাটবে। তাতে আর লাভ কী হবে?'

'ফাটুক। পাজি বদমাস কোথাকাব। এ্যামুন সাহস ওর হয় ক্যামনে! তুমি কিনা ঢিল ছুঁইড়্যা—

'দাঁড়ান-দাঁড়ান, ওকে জিগ্যেস করেছেন?' চঞ্চল বললে, 'ঢিলটা ও ছুঁড়েছে কিনা সেটা তো অন্তত জানা দরকার।'

কার্তিক ভুরু কুঁচকে বললে, 'ওকে? ওকে আবার কী জিগ্যেস করবে! আমি নিজের চোখে দেখলাম ওকে ঢিল মারতে!'

শিবদাস বলে, 'আরে, উনি কী আর মিথ্যা কইছে নাকি? ঢিল না ছুঁড়লে কি আর—'

'না!' রিনি হঠাৎ ফুঁপিয়ে বলে ওঠে।

'না মানে?' হরিমোহনের জিজ্ঞাসা।

বিনি কাঁদতে-কাঁদতেই বলে, 'নানুদা আমাকে ঢিল মারেনি।'

নেপাল ভুরু কুঁচকে তাকায় শিবদাসের দিকে, 'কী কয়! নানু ঢিলায় নাই!'

শিবদাস কিছু বুঝতে পারেন না, কিন্তু নানুকে ছেড়ে দেন। নানু অবশ্য দাঁড়িয়েই থাকে। নেপাল কার্তিকের দিকে চেয়ে বলে, 'কী মশয়, আপনে না নিজের চোখে দ্যাখছেন?'

ব্যাপার বেগতিক দেখে কার্তিক চোখ বড়-বড় করে রিনির দিকে তাকায়; বলে, 'দেখেছিই তো! এই মিথ্যেবাদী মেয়ে, ঢিল তোকে মারেনি নানু?'

'না।' আরও জোরে কেঁদে ওঠে, কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে নানুও তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাঁদতে শুরু করে বলে, 'হ্যাঁ, ঢিল আমি মেরেছি।'

বিভ্রান্তির চরমে পৌঁছে নেপাল বলে, ''মারছস তুই ঢিল?'

আরও জোরে কাঁদতে-কাঁদতে নানু বলে, 'হ্যাঁ—'

এবারে আর থাকতে পারেন না যশোদা, বাচ্চা মেয়ের মতো হেসে ওঠেন, বলেন, 'ন্যাও, বিচার করো এবার। মাথা যার ফাটল, সে কয় না। আর যার শাস্তির ভয়, সে কয় হ।'

শিবদাস ভ্যাবাচাকা খেয়ে বলেন, 'তার অর্থটা হইল কী?'

'সেটা ওই পোলাপানরা বোঝে, তরা বুঝস না।' এগিয়ে গিয়ে রিনির চোখের জল মুছিয়ে দেন যশোদা, নানুর মাথা ধরে ঝাঁকিয়ে দেন, দিয়ে বলেন, 'যা, তোরা খেল গিয়া।'

ওরা হাসিমুখে বেরিয়ে গেলে যশোদা সব কটা বিভ্রান্ত মুখের দিকে চেয়ে বলেন, 'তোমাগো জ্বালায় আমার নাওন হইল না। ন্যাও, চলো—'

মনোরমা সঙ্গে-সঙ্গে বলল, 'সে কী দিদি, আপনি যে এখানে চান করবেন বললেন!'

'হ, কইছিলাম তো'—একটু বিভ্রান্ত ভাবে তাকালেন শিবদাসের দিকে। শিবদাস বললেন, 'আরে, আমি কী বারণ করছি নাকি?'

'আসুন দিদি, 'আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

মনোরমা চলে গেল যশোদাকে নিয়ে, ওদিকে শিবদাসবাবুর বাড়ি থেকে প্রমীলার গলা ভেসে এল, 'মামা, ও মামা—'

শিবদাসবাবু একটু বিরক্তভাবেই জানলার দিকে এগিয়ে আসেন, ওই জানলায় প্রমীলার মুখ দেখা যায়। কিন্তু চোখের দৃষ্টি চঞ্চলের দিকে না মামার দিকে, ভালো বোঝা যায় না, বলে, 'চা চাপাতে বললে যে! জল তো ফুটে গেছে। তোমার কি দেরি হবে আসতে?'

শিবদাস চঞ্চলের দিকে এক পলক চেয়ে বলেন, 'শোনো কথা। জল ফুইট্যা গ্যালে কী করতে হইবে তাও আমারে জিগায়।'

চঞ্চল হাসে, কথা বলে না, কথা বলেন হরিমোহন, বলেন—'মিলু-মার বুদ্ধি শুদ্ধি দিন-দিন যেন বাড়ছে। দেরি হবে কেন, চা-টা বুঝি এখানে পাঠানো যায় না! কি, শিবদাসবাবু?'

শিবদাস বলেন, 'বাঃ, শিবদাসবাবু আবার কেডা! আপনের হুকুমের উপর কার কথা!'

'রাইট।' হরিমোহন হঠাৎ ভেতরবাড়ির দিকে চেয়ে মিষ্টি করে হাঁক পাড়েন, 'হ্যাঁগো, উনুন টুনুন ধরল তোমাদের?'

মনোরমার গলা ভেতর থেকেই ভেসে আসে, 'ওঃ, দিদিকে আগে কলঘরে ঢুকতে দাও, তারপর তোমাদের পাঁপড় ভাজা যাচ্ছে।'

'এই দেখো, মনের কথা যে কী করে তুমি বুঝে ফেলো—'

নেপাল সঙ্গে-সঙ্গে চৌকিতে বসে বলে, 'অঃ! ওই জন্য কই দাদা, এ বাড়িতে বয়্যা চা না খাইলে তেমন জুতই হয় না।'

এতক্ষণ মুখ হাঁড়ি করে বসে ছিল কার্তিক। অপদস্ত তাকেই হতে হয়েছে সবচেয়ে বেশি। তার ওপর এখন আবার তোয়াজ করে শালা-জামাইবাবুকে আপ্যায়ন করা হচ্ছে। একেবারে হঠাৎই বলে, 'আমি তাহলে চলি ছোটমামা।'

'সে কী! দাঁড়াও, চা-টা খেয়ে যাও না।

'না-না, হ্যারিংটন স্ট্রিটে এখুনি না গেলে নয়। বড় সাহেব একেবারে অস্থির হয়ে উঠবেন।'

'তাও তো বটে। চঞ্চল, যা না ওর সঙ্গে।'

'আমি! মানে'—প্রমীলার আসন্ন আবির্ভাব চিন্তা করে চঞ্চল আমতা-আমতা করতে লাগল, 'মানে কার্তিকদা তো একাই একশো।'

'একশো একজনই না হয় হল'—শিবদাসের দিকে ফিরে হরিমোহন বললেন, 'মেজাজটা রাঙামামার দেখবার মতো। বিশ বছর বিলেতে থেকে মেজাজটাও একেবারে খাস মিলিটারি।'

নেপাল বলে, 'তা বিলাইত থনে উনি আইলেন ক্যান? ওখানেই থাকতে পারতেন।'

'যা বলেছেন। সেখানে ওঁকে বাঙালি বলে কেউ চিনতে পারত? সাহেব তো সাহেব, একেবারে পাক্কা সাহেব।' কার্তিকের দিকে চেয়ে হরিমোহন বললেন, 'যাও, তোমরা যাও।'

'এই হপ্তায় আপনি একবার যাবেন বলব তো?'

'নিশ্চয়ই, যেতে হবে বইকী।'

'চলো চঞ্চল'—নেপালের দিব্যি জমিয়ে-বসা ভঙ্গির প্রতি একটা কটাক্ষ করে কার্তিক চলে যায় চঞ্চলকে নিয়ে। হরিমোহন বলেন, 'মামার কাছে কেন যাই না জানেন? গেলেই পেড়াপিড়ি করেন এ বাসা তুলে ওখানে চলে যেতে। বিয়ে-থা করেননি, একলা মানুষ—অভাব তো কিছুই নেই। শুধু মানুষের অভাবেই অত বড় বাড়ি খাঁ-খাঁ করছে। ঘরগুলো কী মশাই, আমাদের ঘরের মতো বেশ ক-খানাকে ঢুকিয়েও তাতে জায়গা থাকবে।'

নেপাল হাঁ করে শুনছিল, হরিমোহন থামতে বলল, 'না-না, অত বড় ঘর ভালো না। আমার ত ঘুমই আসে না শুইলে।'

হরিমোহন আয়েসে চোখ বুজে ফেলে বললেন, 'আসে-আসে, সে রকম ঘর হলেই আসে। এয়ারকন্ডিশনড্ রুম, বুঝেছেন! গরমে দার্জিলিং, শীতে পুরী। সুইচ টিপলে হল। দেখি, যেরকম পেড়াপিড়ি করছেন—'

কথা শেষ হওয়ার আগেই প্রমীলা ধূমায়িত চা নিয়ে ঢোকে। হরিমোহন চা দেখেই গলা তুলতে যাচ্ছিলেন পাঁপড়ের জন্য, তার আগেই মনোরমার প্রবেশ। হাতে পাঁপড়ের থালা। উচ্ছ্বসিত হয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, সঙ্গে-সঙ্গেই নিজেকে সামলে নিয়ে, যেন পুরনো প্রসঙ্গই চলছে এইভাবে বললেন, 'আমি তো যেতে পারি, কিন্তু রাঙামামার বাড়িতে মুশকিল হবে ওঁকে নিয়ে—বাবুর্চি-খানসামার শ্রীক্ষেত্র দেখলেই বোধহয় অন্নজল ত্যাগ করবেন।'

প্রসঙ্গটা বুঝতে পেরে মনোরমা বললে, 'অন্নজল ত্যাগ করবো কোন দুঃখে, ঝেঁটিয়ে বিদেয় করবো সব ওখানে গেলে।'

'আরে হ্যাঁ, তবেই হয়েছে'—নিজের কথায় নিজেই হেসে কুটিপাটি হয়ে হরিমোহন বললেন, 'বড় সাহেবকে তোমার ওই পুঁই চচ্চড়ি আর কড়াইয়ের ডাল খাইয়ে রাখবে!'

'খেলে বর্তে যাবে!' থালা রেখে মনোরমা ডাকে প্রমীলাকে, 'এসো না, দিদির চান হয়ে গেছে।'

ওরা ভেতরে ঢোকে, হরিমোহন একটা পাঁপড় হাতে করে বলেন, 'খেলে নাকি বর্তে যাবে। ডার্টি নেটিভ ডিশেস বলে তক্ষুনি বিলেতের টিকিট কাটতে পাঠাবেন।'

'কেন, কার্তিকবাবুও সাহেব বুঝি?' নেপালের প্রশ্ন, একটু খোলসা করে বলে, 'মানে যেভাবে কথা কন মনে হয় ছোটসাহেব—ওঁরই কিছু হইব বুঝি।'

'কিচ্ছু না। ওই গাঁ সম্পর্কের ভাইপো। দেখাশোনা করে, মাইনে নেয়, এই পর্যন্ত—' হঠাৎ মধু কিছু কাচা জামাকাপড় বান্ডিল বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে দেখে হরিমোহন থামান, বলেন, 'আরে, ওগুলো নিয়ে যাচ্ছো কোথায়?'

'ইস্ত্রি করাতে।' অবাক হওয়াই স্বাভাবিক, বরাবরই শিবদাসের বাড়ির ইস্ত্রি দিয়ে ওগুলো ইস্ত্রি করা হয়। সে ইস্ত্রি নিয়ে ঝঞ্ঝাট এবং ইস্ত্রি যে এখন শিবদাসেরই বাড়ি, মনে

পড়ে যায়। গম্ভীর মুখে বলেন, 'ঠিক আছে, যাও।'

শিবদাস দেখছিলেন হরিমোহন কী করেন। বললেন, 'বাস? কইয়া দিলেন লইয়া যাও। ঠিক আছে, তাইলে আমরাও ওঠলাম। ওঠ নেপাল।'

নেপাল একটা পাঁপড় হাতে তুলেছিল, টুক করে সেটা নামিয়ে রেখে বলল, 'হ, আমাগো যাওনই ভালো।'

হরিমোহন অবাক হয়ে বললেন, 'তার মানে?'

'অতিসহজ। আপনে ইস্ত্রি করাইবেন লন্ড্রিতে, আর আমরা এখানে বইয়া চা খামু।'

কথাটা এতক্ষণে ঢোকে মাথায়, গম্ভীরভাবেই হরিমোহন বলেন, 'বেশ তো, খাবেন না। ধরে বেঁধে তো আর চা খাওয়াতে পারব না এখানে। অপরাধটাই শুধু বুঝতে পারলাম না।'

'অপরাধ আপনার কেন হইব, অপরাধ আমাগো'—শিবদাস বললেন, 'আপনাগো মত বড়লোকের সাথে আমরা গেছিলাম মেলামেশা করতে। আয় রে ন্যাপাল।'

শিবদাস সত্যিই উঠে পড়লেন দেখে হরিমোহন আর নিজেকে সংযত করতে পারলেন না, বললেন, 'দাঁড়ান-দাঁড়ান, আমার ঘরে দাঁড়িয়ে যা-তা শুনিয়ে যাবেন, আর আমি সহ্য করব! আজ একটা হেস্তনেস্ত করা চাই, হ্যাঁ যাকে বলে—'

'হ্যাস্তন্যাস্ত! তাই না?' যশোদা হঠাৎ ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, 'বড় বউয়ের থনে সব শুনছি আমি। হ্যাস্ত ন্যাস্ত আমি করত্যাছি।'

সামনে দাঁড়িয়েছিল মধু কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো, যশোদা তাকে ধমকেই বললেন, 'এই বলদা, ওগুলি রাখ।'

বিনা বাক্যব্যয়ে রাখল মধু।

'এবার যা, ওই বাড়ির থিক্যা ইস্ত্রিটা লইয়া আয়। যা, খাড়াইয়া আছস ক্যান?'

মধু পা বাড়াতে উদ্যত, এবাব হরিমোহনের ধমক, 'এই মধু! খালি হাতে গেলেই হবে?'

'আজ্ঞে?'

'আজ্ঞে! সেলাইয়ের কলটা নিয়ে যা ঘাড়ে করে, দিয়ে আসবি ও বাড়ি।'

শিবদাস বললে, 'তার মানে?'

'মানে আবার কী!' হরিমোহন বললেন, 'তেজ করে ফিরিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন না?'

নেপাল মুখ টিপে বলল, 'এই কথা?'

'হ্যাঁ, এই কথা!'

শিবদাস বললেন, 'মধু, খাড়া! আমাগো বাড়ি থিকা কুলা নিয়া আয় আগে—'

হরিমোহন গলা চড়িয়ে বললেন, 'আর র‍্যাশনের ব্যাগ। সেটার কী হবে!'

মধু একবার এদিক একবার ওদিক করে দুবার। তারপর মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে। যশোদা বললেন, 'কী রে বলদা! কথা বুঝি তর কানে যায় না!'

'কী করে যাবে! কান তো দুটো, আর কথা তো এতগুলো!' মধু বললে, 'দাঁড়ান আগে হিসেবটা করে নিই, ও বাড়িতে থেকে রাগের মাথায় কী-কী এ বাড়িতে এসেছে, আর এ বাড়ির কী-কী ও বাড়িতে গেছে। তারপর হিসেব মিলিয়ে এ বাড়ির জিনিস ও বাড়িতে এবং ও বাড়ির জিনিস এ বাড়িতে নিয়ে আসব!'

কথার ধরন শুনে সবাই হেসে ওঠে হো-হো করে।

দুই

অঙ্কের খাতা পাশে খোলা আছে বটে, কিন্তু প্রমীলা পড়ছে আসলে একটা সিনেমা সাপ্তাহিক। মনটা সেই ম্যাগাজিনে এতই বেশি যে, চঞ্চল যে বাড়িতে ঢুকেছে, ওর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে, সেটাও ওর খেয়াল হয়নি। চঞ্চল উঁকি মেরে ম্যাগাজিনটা একবার দেখে তারপর খুক-খুক করে গলা ঝাড়ে।

সঙ্গে-সঙ্গে নাটকীয় পরিবর্তন। ম্যাগাজিন চলে যায় খাতার তলায়। ভালো মানুষের মতো সামনে ফেরে প্রমীলা, বলে, 'আরে, আসুন––বসুন।'

'সে তো বসব, কিন্তু পড়াশুনোয় এত মন তো বড় একটা দেখি না।'

'কী করি বলুন, অঙ্কটা কিছুতেই বুঝতে পারছি না—'

কথা শেষ হওয়ার আগেই সাপ্তাহিক সমেত খাতাটা টেনে নেয় চঞ্চল, বলে, 'না বোঝবার তো দেখছি না কিছু। এ রকম অঙ্ক সেদিনও তো দেখিয়ে দিয়েছি।'

'দিন না কষে আর একবার।'

চঞ্চল অঙ্ক কষতে থাকে, কিন্তু প্রমীলার চোখ অন্যদিকে, ম্যাগাজিনটা ভেতর থেকে কেমন করে সরাবে সেই প্ল্যানটা যে কষছে, এটা বোঝা যায়। কিন্তু মুশকিল বাধায় নেপাল, কোথায় গিয়েছিল কে জানে, ঢুকে পড়ে একেবারে ঘরেব মধ্যে। বলে, 'কী হে চঞ্চল, পড়াইতে আছ তো অনেক দিন, কিছু উন্নতি টুন্নতি বোঝ নাকি?'

প্রমীলা বিরক্তি চাপতে পারে না, বলে, 'আচ্ছা নেপাল মামা, আপনাকে তো কেউ খবর নিতে ডাকেনি! দেখছেন পড়ছি––'

'আরে দেখি বলেই তো জিগাই। কী চঞ্চল, কিছু অইবো ওর পড়াশুনা?'

'না।'

'অ্যাঁ!' চঞ্চলের সোজা সাপটা উত্তবে নেপাল চমকে ওঠে, বলে, 'অইবো না কিছু! মিছামিছাই পড়তে আছে?'

চঞ্চল নিরুত্তাপ গলায় বলে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। এ মেয়েকে পড়ানো মানে ভস্মে ঘি ঢালা।

প্রমীলার মেজাজ এমনিতেই খাট্টা, তারপব এসব কথাবার্তা শুনে আরও ক্ষিপ্ত হয়, বলে, 'দেখুন, ভালো হচ্ছে না বলছি।'

'সেইজন্যেই তো বলছি! ওকে বরং সিনেমায় ঢুকিয়ে দিতে পারেন কিনা দেখুন।'

'ছিনেমা!'

'আজ্ঞে'—খাতার তলা থেকে ম্যাগাজিন বার করে দেখায়, 'এই হল ওঁর পড়ার বই।'

প্রমীলা গোঁজ হয়ে একটু দূরে সরে দাঁড়ায়। দেখে নেপাল বলে, 'তুমি কিন্তু মাস্টারও ভালো না চঞ্চল।'

'কেন?'

'ক্যান মানেডা কী! এইরকম মাস্টার দিয়া পড়ানোর কাম হয়। এমন ছাত্রীরে শাস্তি দিতে পার না? কান ধইরা ঘরের কোণে খাড়া করাইয়া রাখবা।'

কথা শুনে হেসে ফেলে চঞ্চল। সেই হাসির শব্দেই বোধহয় ভেতর বাড়ি থেকে তরলা চলে আসে। তরলাকে দেখেই প্রমীলা ভেতরে চলে যায় দুমদুম করে পা ফেলে। তরলা প্রমীলার রাগ দেখে একটু শঙ্কিত হয়েই তাকায় চঞ্চলের দিকে, বলে, 'ভিতর থনে একটু-আধটু কানে আসছিল কথা, সত্যিই কী পড়াশুনো করে না নাকি বাবা?'

'না, তা করে। তবে সিনেমার খবরে ঝোঁকটা একটু বেশি।'

নেপাল ব্যাপারটাকে একটু লঘু করার জন্য বলে, 'মিলু বলে না, আজকাল হক্কল পোলা মাইয়ারই যে কী হইছে—ছিনামা কইতে এ্যাক্কারে পাগল।'

'মাইয়াটার লাইগা বড়ো ভাবনা বাবা'—তরলা বলে, 'আটমাসের রাইখ্যা আমার কোলে দিয়া ছুড ননদ মারা যায়। আর বাপও নিরুদ্দেশ। অরে লিখাপড়া শিখাইয়া ভালো একখান ছেলে দেইখা বিয়া দিমু—এর থিকা বড়ো দায় আমার আর কিছু নাই।'

নেপাল বলে, 'আরে অইবো-অইবো, সবই অইবো। তুমি মিছামিছি অত ভাবো বিয়ের লগে। জামাইবাবু কোথায়? বাজার নাকি?'

'গেছে তো একবার, ভালো মাছ যদি পায়—'

'যদি না, যদি না—গেছি যখন, খালি হাতে ফিরুম না'—কথার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে ঢুকে পড়েন শিবদাস, ব্যাগ বেশ ভারীই মনে হয়। বাঁ হাতে ব্যাগ ধরে ডান হাতে দুটো মাছের লেজ ধরে একসঙ্গে তোলেন, 'কী রকম দেখতাছ ন্যাপাল?'

নেপাল উল্লসিত হয়ে বলে, 'আরে করছেন কী জামাইবাবু! জোড়া ইলিশ! বড় গঙ্গা কানা কইরা আনছেন যে।' তরলার মন প্রসন্ন হয় না, বলে, 'ইলিশ না সেদিনই খাইলাম, আইজ আবার ইলিশ আনলা। তাও এ্যাক্কারে দুইটা!'

'আরে দুইটা না হইলে এ-বাড়ি ও-বাড়ি হয়! আর এ্যামুন ইলিশ দেইখ্যা শুধু হাতে কী ফিরন যায়!'

'তা ত যায় না বুঝলাম'—তরলা বলে, 'কিন্তু আইজ জোড়া ইলিশ খাইলেই অইব? কাইল পরশু বাজার করতে অইব না?'

'আরে রাইখা দাও তোমার কাইল পরশুর কথা! আইজ ত খাইয়া লই, কাইলকার কথা কাইল ভাবুম'—স্ত্রীর কাছে সমর্থন না পেয়ে শিবদাস চঞ্চলেব দিকে তাকান, বলেন, 'কী কও বাবা চঞ্চল! বাঙালগোর দোষই ওই।'

চঞ্চল হেসে বলে, 'দোষ না হয়ে গুণও হতে পারে।'

'অ্যাই! হেইডা বোঝাও তো তোমার মাসিমারে।' উৎসাহ পেয়ে এবার রান্নার তরিবৎ শেখাতে থাকেন তরলাকে, 'শোনো, সরষে বাটা আর কাচা মবিচ দিয়া বেশ কইর‍্যা ভাতে দাও দেখি। হরিবাবুর বড় পছন্দ। আর চায়ের সাথে ভাজা কয়েকখান—'

কথার মাঝখানেই দরজার কড়া নড়ে ওঠে। মুখে এক রাশ বিরক্তি নিয়ে নেপাল বলে, 'আঃ, সাতসকালে আবার আইল কেডা!'

চঞ্চল বলে, 'আমি দেখছি। পড়া এখন আর হবে না, ওবেলা আসব আমি।'

চঞ্চল চলে যাওয়ার পরেই উঁকি দিয়ে নেপাল আঁতকে ওঠে, বলে, 'সারসে! বাড়িওয়ালা আইসা হাজির।'

বাড়িওয়ালাকে দেখে খুশি হওয়ার কথা নয় শিবদাসেরও, দু-মাসের ভাড়া বাকি। তার ওপর এই বকম একটা রান্নার ফর্দ বলার সময় যদি বিঘ্ন ঘটে। তরলা বিপদের আশঙ্কা করেই ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল। বাড়িওয়ালা কিন্তু এসেই শুরু করে দিলেন, 'এই যে শিবদাসবাবু, খুব তো ইলিশ মাছ খাচ্ছেন দেখছি! আমার ঘর থেকে গন্ধ তো প্রায়ই পাই। আজ একেবারে স্বচক্ষে দেখলাম।'

নেপাল বলে, 'দেখেন না। দেইখা চক্ষু সার্থক করেন।'

বাড়িওয়ালা কঠিন গলায় বলেন, 'চক্ষু সার্থক হলে তো আমার পেট ভরবে না।'

'তাহলে সবুর করেন একটু। দুইটা মাছ ভাজা খান বরং।'

'ব্যস? মাছ ভাজা খেলেই সব দুঃখ ঘুচে যাবে আমার? কী শিবদাসবাবু, ওই মাছ ভাজা খাইয়েই বিদায় করতে চান নাকি?'

'ইচ্ছা না থাকলে এমনিই যান।'

'না-না, অত সহজে আমি যাচ্ছি না শিবদাসবাবু, ভাড়া আমার চাই।'

'ভাড়া চাই? এডা আবার কী কথা? ভাড়া না দিয়া আমি থাকুম ক্যান আপনার বাড়ি?'

'তাইতো আছেন! আজ দুমাস ধরে একটি পয়সাও ছোঁয়ান না। এদিকে তো দেখছি মশাই জোড়া ইলিশ কিনছেন!'

নেপাল আর সহ্য করতে পারল না, বলল, 'দ্যাখেন মশয়, ভাড়া নিতে আসছেন, সেই কথা কন। বাজে কথা কইবেন না, বোঝলেন কিছু?'

'ও বাবা, এ যে দেখি গরম দেখায় আবার!'

'হ, এখন শুধু গরম দেখতাছেন, জইল্যা উঠলে ট্যার পাইবেন। ভাড়া নিতে আইয়া ইলিশ তুইলা কথা কন ক্যান! জোড়া ইলিশ আপনের পয়সায় কিনছি? যান, অখনই বাইর হইয়া যান, ভাড়া আপনে কালই পাইবেন।'

বাড়িওয়ালা আর থাকতে সাহস পান না, পেছন ফেরেন, যেতে-যেতে বললেন, 'লম্বা-চওড়া কথা তো খুব বলছেন! ভাড়াটা কিন্তু কালই চাই—'

যাওয়ার পর নেপাল গজগজ করতে থাকে, 'ইয়ার পর এইখানে আর ঢুকতেই দিমু না।'

তরলা ভেতর থেকে ঘরে এসে ঢোকে, বলে, 'তা তো দিবা না, কিন্তু কাল ভাড়াটা কোথা থিকা দিবা, সেটা ভাবছ নি?'

নেপাল বলে, 'কথা যখন দিছি তখন দিতেই অইব যা কইরা হোক। আইজ একটা রেডিয়োর অর্ডার পাইছি। দামটা কাইল দিলে মোটা কমিশন পামু। দিমু তখন টাকাটা নাকের উপর ধইরা। আপনে অত ভাবেন ক্যান জামাইবাবু, চুপ মাইরা গ্যাছেন।'

'গেছি কি আর সাধে! তোমার ওই রেডিয়োর দোকানের কমিশন আমি জানি!' রাগে মাছের থলি মাটিতে ছুঁড়ে ফেলেন শিবদাস, 'দূর তোর মাছের নিকুচি করছে। পয়সার অভাবে মান-ইজ্জত যায়, তাগো আবার খাওনের সখ!'

'আরে-আরে করেন কী! ইলিশ দুইটা কী অপরাধ করছে! ওই দুটা ব্যাচলেও তো অখন ভাড়ার টাকা উঠব না।'

নেপাল ব্যাগটা নিয়ে রান্নাঘরে রাখতে যায়, তরলা বলে, 'কোথাও কর্জ করা যায় না?'

শিবদাস বলে, 'কর্জ আর পামু কই? টিকিটা পর্যন্ত বাধা পড়ছে ওই কর্জ কইরা। কর্জ এখন শুধু তুমিই দিতে পারো।'

'আমি!' তরলা মুখ ভ্যাটকায়, 'আমি কী লুকাইয়া টাকা জমাইছি, নাকি দুটা গয়না আছে আমার গড়ানো?'

'আহা সে তো নাই আমি জানি'— একটু তরলার প্রতিক্রিয়া মাপতে-মাপতে শিবদাস বলেন, 'কই কি, মিলুর সেই টাকা থিকা তো দিতে পারো—, মাইনা পাইলেই দিয়া দিমু।'

তরলা কোনও কথা বলে না, গম্ভীর হয়ে যায়। দেখে শিবদাস বলেন, 'কথা কও না যে! শুইনাই মুখ হাড়ি এ্যাক্কারে?'

'হাড়ি হইব না তো কী। খাইতে পাই না পাই, ভিক্ষা করি—তবু মিলুর ওই টাকার একটা আধলাও আমি ছুইতে দিমু না'—যেন নিজেকেই নিজে বলছে এইভাবে তরলা বলছিল, 'ঠাকুরঝিরে মরণের সময় যে কথা দিছি, তার খেলাপ আমি করুম না, কোনও দিন না।'

সাতসকালে কোথায় গিয়েছিলেন কে জানে, হন-হন করে ফিবছিলেন হরিমোহনবাবু। বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছেন, একেবারে কাবুলিওয়ালার মুখোমুখি।

কোনওরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে হরিমোহন বললেন, 'অঃ, এই অফিস যাওয়ার সময়ে হাজির হতে তোমায় কে বলেছে?'

'দুসরা টাইমসে তো ভেট নাহি হোতা।'

'ভেট করবার দরকার কী শুনি?'

'মতলব? দো মাইনা হো গয়া—'

'ঠিক আছে ঠিক আছে, চেঁচিয়ো না!' বিরক্ত হয়ে হরিমোহন বললেন, 'অফিসের দেরি হয়ে গিয়েছে, মেজাজ ঠিক নেই।'

'তব অফিস মে ভেট করে গা?'

'তোমার মুণ্ডু করে গা!' আপন মনে গজগজ করে হরিমোহন বললে, 'রাস্তায় কোথাও দাঁড়াও। হাম খাকে আতা হ্যায়। অফিস যাওয়ার পথে কথা বলব তোমার সঙ্গে।'

বাড়ি ঢুকেই একেবারে মনোরমার মুখোমুখি, বললে, 'ছিলে কোথায় তুমি? কার্তিক বসে ছিল এতক্ষণ—'

'কেন?'

'কার্তিককে কথা দিয়েও একবার দেখা করতে গেলে না। কী ভাববেন বলো তো ঘোষসাহেব? নিশ্চয়ই রাগ করবেন।'

'গেলে আরও রাগ করতেন।'

'কী বলছ।' মনোরমা অবাক, 'এই না শুনি ঘোষসাহেব আমাদের সবাইকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ঝুলোঝুলি করছেন—'

'আহা হা, সেটা কথা নয়—' হরিমোহন বাধা দিলেন, 'এইরকম পোশাক আশাকে যাওয়া যায় তাঁর কাছে? জুতোটার অবস্থা দেখছ! হ্যারিংটন স্ট্রিটের বেয়ারাই ঢুকতে দেবে না এই জুতো দেখলে।'

'জুতো তো একজোড়া সেই কবে থেকে কিনতে বলছি।'

'তা বলছ, কিন্তু জুতোর দোকানের মালিক তো আর আমার বেয়াই নয় যে বললেই জুতোজোড়া অমনি দিয়ে ফেলবে। তার জন্যে পয়সা লাগে, বুঝছ!' আপন মনেই গজগজ করছিলেন হরিমোহন, 'এখনও চঞ্চলের কলেজের মাইনেটা জোগাড় করতে পারিনি, আবার জুতো কিনব। যাই, চানটা সেরে আসি, অফিসের আজ বারোটা বেজে গেল—'

সেই মুহূর্তে শিবদাসের ডাক। যেন ডাকবার অন্য কোনও সময় ছিল না। একেই বলে, যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধে হয়। মনোরমা ভেতরে ঢুকল। মুখে হাসি টেনে এনে ডাকতে হল শিবদাসকে। শিবদাস বললেন, 'এই জুতার কথা কী একটা হইতেছিল—'

'হ্যাঁ, জুতোই তো। পছন্দই হয় না তো কিনব কী!' হরিমোহন সুর পালটে নিলেন, 'আগেকার জুতো কী আর এখন আছে! চামড়া তো নয়, যেন মখমল। টেরটি পাবেন না মশাই। আর এখন? পায়ে দিয়েছেন কী ফোস্কা।'

'হ, তাই তো ক্যাম্বিশই পরি আমি, চামড়ার ধারও ধারি না। ছাড়েন সে কথা। জুতা ছাইড়া এখন গুঁতা সামলানোর একটা উপায় কন দেখি।'

'কী হল কী?'

'হয় নাই, হইব। কয় মাসের ভাড়া দিয়া উঠতে পারি নাই, কাইল না দিলে আর মান থাকবো না। শ-দুয়েক টাকা হইতে পারে? আমার ত ধারকর্জের জানাশোনা সব সোর্স বন্ধ!'

'মাত্র শ-দুয়েক! ইস, একটু আগে বলবেন তো!'

'আগে আর কী কমু! বাড়িওয়ালা বাড়ির ভিতরে ঢুইক্যা অপমান করার পরই না আইছি আপনার কাছে। হইবো নাকি?'

'ঠিক আছে, অত ভাবছেন কেন। টাকাটা কাল সকালে পেলেই চলবে তো?'

'খুব চলব।'

'আজ অফিস যাওয়ার পথেই ব্যাঙ্ক থেকে তুলে রাখব তাহলে!' বলার সময়ই বোধহয় মনে পড়ে গেল, ব্যাঙ্ক দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায়! গলাটা একটু কেঁপে গেল কী!

'কী যে কমু আপনারে—'

'আহা বলবেন আবার কী! ঠিক আছে—'

'আমি যামু আপনার লগে? ব্যাঙ্কে!'

'না-না-না'—প্রায় আঁতকে উঠলেন হরিমোহন, 'কিচ্ছু দরকার নেই, আমি কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব। আসলে কোন ব্যাঙ্ক থেকে তুলি ঠিক নেই তো। যাক, সে যে-কোনও একটা ব্যাঙ্ক থেকে তুললেই হবে, ও নিয়ে আপনি ভাববেন না।'

'গিন্নিরে আমি দুইডা কথা শুনাইয়া দিয়া আসি। কয় কী টাকার জোগাড় হইবো না। আরে এ্যামুন মানুষ পাশে থাকতে হইব না কইলেই হইল! যাই আমি—'

যেতে যেটুকু অপেক্ষা, ছুটে এসেছে মনোরমা বলেছে, 'বলিহারি আক্কেল তোমার। কথা দিয়ে দিলে? তারপর?'

'তারপর আবার কী! দিতে হবে যা হোক করে।'

'যা হোকটা কী, সেটাই তো জানতে চাইছি। কথা দেওয়ার আগে সেটা তো ভাবতে হবে।'

'না, হবে না। বন্ধুলোকে বিপদে পড়ে চাইলে আমি না বলতে পারি না, পারব না।'

'কিন্তু দেবে কোথা থেকে?'

'আছে-আছে—তারও উপায় আছে। ব্যাঙ্ক কী আমার একটা!'

'আছে তো নেই-নেই করো কেন? তোমাদের কথার একটি বর্ণও আমি বুঝি না।'

'বুঝতে হবে না তোমায়! ভাতটা রেডি করো তো, আমি দু-ঘটি জল মাথায় ঢেলে নিই—'

হরিমোহন এখন চলন্ত ব্যাঙ্কের সামনে। তাগাদায় এসে ফ্যাস্তাকলে পড়ে গেছে কাবুলিওয়ালা, হরিমোহন বলছেন, 'না খাঁ সাহেব, শ-দুয়েক টাকা আমাকে এক্ষুনি দিতে হবে, উপায় নেই না দিলে।'

'এ আপনি ক্যা বলছেন হরিবাবু! কোতো লিয়েছেন আপনি তার হিসাব আছে?

সুদ ভি নেহি মিলা দো মাইনা কা। ফির দো শো রুপ্য়া কেমন করে দিবে? না না, হোবে না।'

'যেমন করে হোক দিতেই হবে আগা সাহেব। মান থাকবে না নাহলে।'

'আরে মান, মান।' কাবুলির মুখে বিরক্তির রেখা, 'আপনাদের বাঙালিদের খালি মান। আর পৈসার থিকে কি মান বড়িয়া হল?'

'অত তোমায় বোঝাবার সময় নেই আমার। এই দুশো টাকা আমার চাই-ই। তার জন্যে যা লিখে দিতে হয় বলো, দিচ্ছি।'

'কী লিখে দিবেন। লিয়ে যান দোশো রুপ্য়া। লেকিন আগাড়ি রুপ্য়াকে সুদ মিলবে কবে?'

'সোমবার পাবে। দাও-দাও'—তাড়াতাড়ি করতে চান হরিমোহন। বাড়ির সামনে। কাবলের কাছে টাকা নিচ্ছেন দেখলে লজ্জায় মাথা কাটা যাবে। টাকাটা চট করে পকেটে ঢুকিয়ে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, চঞ্চলের দিকে চোখ পড়ে গেল।

দেখে ফেলেছে? মনে হয় না। পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্যে নিজেই এগিয়ে গেলেন হরিমোহন, বললেন, 'তোমায় দেখেই দাঁড়ালাম। এই টাকাটা এখুনি দিয়ে আসতে পারো শিবদাসবাবুকে?'

টাকাটা হাত পেতে নিয়ে চলে গেল চঞ্চল। বাঁচা গেল। দেখে-টেখেনি কিছু তাহলে, বোঝা গেল। দুর্গা-দুর্গা বলে এগোচ্ছেন, আবার পেছন থেকে ডাক—'হরিমোহনবাবু, ও হরিমোহনবাবু!'

অফিসের সহকর্মী যতীন। কিন্তু সে বাড়ির দিকে কেন? অবাক চোখে তাকালেন, যতীন এগিয়ে এসে বললে, 'সত্যি! এখন যাচ্ছেন অফিসে!'

'কেন গো, সাহেব খোঁজ করেছে নাকি!'

'খোঁজ! এর মধ্যে বারতিনেক ডাক পাঠিয়েছেন। সাড়ে দশটার মধ্যে জি. আর. কোম্পানিকে দেড়শ টন মাল ডেলিভারি দেওয়ার কথা ছিল। গোডাউন বন্ধ দেখে পার্টি সরাসরি সাহেবের কাছে গিয়ে অর্ডার ক্যানসেল করে দিয়েছে।'

'এ হে-হে-হে, ক্যানসেল করে দিল! সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছে?'

'তবে আর বলছি কী! সাহেব চটে লাল! গোডাউনের চাবি নিয়ে এক্ষুনি আপনাকে দেখা করতে বলেছেন।'

'কী মুশকিল বলো তো ভাই! একটা ফ্যাসাদে আটকে পড়ে—'

'আরে ফ্যাসাদ সামলাতে গিয়ে আর-একটা ফ্যাসাদ বাধালেন যে।' যতীন বললে, 'আপনার তো ব্যাপার, এলেনই না হয়তো। তাই আমিই একটু ম্যানেজ করে ছুটে আসছি।'

'কিন্তু এ যা হয়ে গেল—'

'হয়নি কিছু, কিন্তু হতে অনেক কিছুই পারে। অফিসে যা টালমাটাল চলছে এখন!' যতীন চিন্তিত মুখে বলল, 'সাহেবের মতলব তো জানেন। ছাঁটাইয়ের একটা ছুতো পেলেই—'

'মরে যাব ভাই!' হাত চেপে ধরলেন যতীনের, 'এই মাগগি গণ্ডার বাজারে—একটা বুদ্ধিশুদ্ধি দাও তো ভাই।'

'আসুন তো, ভাবি যেতে-যেতে'—যতীন বললে, 'অসুখ বিসুখ চলবে না, পুরনো হয়ে গেছে।'

'বাড়িওয়ালার কথা বলব?' জুলুম করছে, কোর্টে টাকা জমা দিতে হয়েছিল?

'অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা হবে। আসুন-আসুন—'

দুপুর গড়িয়ে বিকেল। দু-বাড়ির সামনে ফাঁকা জায়গায় রিনি আর নানু খেলনা টেলিফোন দিয়ে কথা বলার চেষ্টা করছে। একটা মুখ নানুর কাছে, অন্যটা রিনির কাছে। ইস্কুল থেকে এসে এখনও জামাকাপড় ছাড়েনি। রিনি বলছিল, 'হ্যালো! শুনতে পাচ্ছ, নানুদা?

নানু বললে, 'দুর, অত চিল্লাস কেন! ফোনে বুঝি অত চেঁচিয়ে কথা বলে? এমনিই তো শুনতে পাই। নে, বল।'

রিনি এবার গলা অনেক নামিয়ে বললে, 'আচ্ছা হ্যালো, এবার কী বলব?'

'বাঃ, আমায় জিগ্যেস করে কথা বলবি নাকি! যা মনে হয় বল।'

'আচ্ছা হ্যালো! তুমি—তুমি কেমন আছ?

'দূর! ফোনে কথা বলতেও জানিস না!' বিরক্ত হয়ে নানু ওর মুখভঙ্গি নকল করে ভেংচায়— 'তুমি কেমন আছ''

রিনি রেগে গিয়ে ফোন সরিয়ে ফেলে কান থেকে, বলে, 'পারব না আমি ফোন করতে।'

'ধ্যাৎ, চটছিস কেন! শোন না, এইরকম করে বল—হ্যালো!'

'হ্যালো!'

'এটা বড়বাজার ডবল থ্রি ফোর।'

'কী?'

'কিছু নয়, শোন। হ্যালো। রাগিনী দেবী আছেন?'

হেসে ফেলে রিনি, বলে, 'রাগিনী দেবী? আমি তো রিনি। আমিই তো কথা বলছি।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, জানি। ওইরকম বলতে হয়'—নানু গভীর আগ্রহের সঙ্গে শেখাতে থাকে, 'শোন, হ্যালো—আপনি আমাদের বাড়ি এখন একবার আসতে পারবেন?'

'না বাবা, গেলেই বকবে। দাদা ওখানে গেল না!'

'দুর বোকা! বলবি সরি, আজ আমার একটা এনগেজমেন্ট আছে কিনা।'

'ও বুঝেছি। হ্যালো, সরি, এখন তো যেতে পারব না। দাদা তিনটে অঙ্ক কষতে দিয়ে গেছে তো!'

'হয়নি অঙ্ক কষা?'

'এই তো দিয়ে গেল। দাদা কী কবছে নানুদা? মিলুদিকে পড়াতে বসেছে!'

'দাঁড়া, দেখে নিই। হ্যাঁ, বসেছে, কিন্তু পড়াচ্ছে না।'

'কী করছে তাহলে?'

'দুজনে গম্ভীর মুখে বসে আছে। না-না, হাসছে। আমি এখন ফোন রেখে দিলাম। চঞ্চলদা তাকাচ্ছে এদিকে, দেখে ফেললেই মুশকিল—ধরে দুটো অঙ্ক দিয়ে দেবে।'

অবশ্য দেখে ফেলার কোনও সম্ভাবনা তেমন ছিল না। চঞ্চল মোটামুটি নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত ছিল, প্রমীলাকে বলছিল, 'কী শুরু করলে বলো তো! কী ভাববেন ওঁরা! আমি কী তোমায় পড়াতে এসেছি, না আড্ডা দিয়ে হাসাহাসি করতে এসেছি!'

'তা বলে হাসির কথা হলে হাসব না?'

'হাসির কথাটা কী হল?'

'হল না। আপনি বললেন না, নার্গিস একটা ফুল।'

'এখনও তো তাই বলছি'—চঞ্চল একটু গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করে বলল, 'দেখো, তোমার কাছে আমি সিনেমার পরীক্ষা দিতে তো আসিনি। থাক, এভাবে নষ্ট করার মতো সময় আমার নেই। আমার নিজের পড়াশুনো আছে, পরীক্ষা আছে।'

'বিলেত যাওয়া আছে—তাই না? আচ্ছা, বিলেত গিয়ে আপনি মেম বিয়ে করে আসবেন?'

'এ দেশের মেয়েদের যা নমুনা দেখছি তাতে সেই চেষ্টাই করতে হবে দেখছি। সত্যি, কী বাজে বকতে তুমি পারো! মাথায় কী আছে বলো তো তোমার?'

'গোবর।'

'নাঃ তোমায় পড়ানো আমার কাজ নয়'—হতাশ ভাবে চঞ্চল বললে, 'কেন যে আমি রাজি হয়েছিলাম ভেবে পাই না।'

'সত্যি! কেন হয়েছিলেন বলুন তো?'

'তখন দেখে মনে হয়েছিল, বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু আছে তোমার ঘটে।'

'মেয়েদের কিন্তু বেশি বুদ্ধিশুদ্ধি থাকা ভালো নয়।'

'তাই নাকি? কেন বলো তো?'

প্রমীলার মুখে দুষ্টুমির হাসি, বলে, 'পুরুষদের দৌড় যে তাহলে ধরা পড়ে যায়।'

'হোপলেস। তোমাকে দিয়ে সত্যি—' কথার মাঝখানেই হন-হন করে নেপালের প্রবেশ। কাণ্ডজ্ঞান তার বরাবরই একটু কম। কিন্তু চঞ্চলের হঠাৎ মনে পড়ে যায় সকালের কথাটা। জিভ কেটে বলে, 'শুনুন, বাবা এই টাকাটা অফিস যাওয়ার সময় আমার হাতে দিয়ে ছিলেন।'

'কার টাকা? কীসের টাকা?'

'কীসের জানি না, শিবদাসবাবুকে দেওয়ার জন্যে দিয়েছিলেন।'

'বুঝছি।' নেপাল হাত বাড়িয়ে দুশো টাকা নেয়—'হরিবাবু আমাগো বাচাইছেন। আমি এহনি ধইরা দিয়া আসি বাড়িওয়ালার নাকের উপর।'

গলা চড়েছিল, ফলে সেটা তরলারও কানে পৌঁছেছিল, ভেতর থেকে ডাকল, 'নেপাল—'

'আঃ, একটা শুভ কাজে যাইতে আছি—'

তরলা ঘরে ঢুকে বলে, 'শুভ কাজে তোমাকে যাইতে হইব না। উনি নিজে গিয়া দিব কইছে।'

'নিজে গিয়া দিলে আর মজাটা হইল কই!'

'মজা মানে তো খালি ঝগড়া-ঝাঁটি! ও মজায় কাজ নাই আমার।'

'অ, আমরা বুঝি খালি ঝগড়াই করি!' নেপালের চোখমুখ অন্যরকম হচ্ছিল,—বললে, 'খোচায় ক্যান আমাগো? সেটা বল। না খোচাইলে আমরা মধু, খোচাইলে হুল। একবার হুলের ত্যাজটা বুঝাইয়া আসি—'

তরলাকে কথা বলার কোনও অবকাশ না দিয়েই বেরিয়ে যায় নেপাল। তরলা অসহায় ভাবে চঞ্চলের দিকে চেয়ে বলে, 'একবার যাও না বাবা, যদি একটু সামলাইতে পারো—যে রগচটা মানুষ—'

'আমার দ্বারা কী হবে?' উঠে পড়ে চঞ্চল প্রমীলার দিকে অলক্ষে একটা ভ্রূভঙ্গি

করে, যার অর্থ পড়াশুনা এখন গয়া। তারপর যেতে-যেতে বলে, 'ওঁকে সামলাতে এখন ফায়ার ব্রিগেড দরকার।'

প্রমীলাও বিরক্ত ভাবে উঠে দাঁড়ায়। বাড়ির ভেতরে যেতে-যেতে বলে, 'যত ঝঞ্ঝাট আমার পড়ার সময়।'

তরলা কিছু বোঝাতে যাবে প্রমীলাকে, তার আগেই বিধ্বস্ত চেহারায় হাতে পুজোর প্রসাদী চাঙাড়ি নিয়ে যশোদার প্রবেশ, বলেন, 'কালীঘাটে পূজা দিয়া আইলাম ছোটবউ।'

তরলা হতবাক হয়ে বলে, 'হা আমার কপাল! সারাটা দিন প্যাটে অন্ন নাই জল নাই—'

'তা হউক। একদিন না খাইলে কী হয়!'

'আইস্যা থিকা তো ক্যাবল পূজাই দ্যান আপনি। কোথাও তো বাকি রাখলেন না!'

'হইব না দিতে! নতুন কোথাও আইলে মানুষজন যেমন, ঠাউর-দ্যাবতার লগেও পরিচয় করতে হয়।' হাসিমুখে বলেন যশোদা, 'এক গণক ঠাকুরের কাছেও গেছিলাম ছোটবউ।'

'গণকঠাকুর! ক্যান?'

'তোমাদের লাইগাই তো যাওন। ভাবনা কইরো না, আগামী বৈশাখেই মিলুর বিয়া।'

'বলেন কী! পাত্রও কী তিনি ঠিক কইরা দিছেন?'

'এসব ঠাট্টার জিনিস না ছোটবউ, ঠাট্টা কইরো না'— যশোদার মুখে ভক্তির ভাব ফুটে ওঠে, 'বিয়া কী কেউ ঠিক কইরা দিতে পারে? জন্ম, মৃত্যু, বিয়া—ও জন্মের আগেই বিধাতা পুরুষ ঠিক কইরা দ্যান। কিন্তু তেমন গণক হইলে কইতেও পারে। গণক ঠাকুর কী কইল জান?'

'কী?'

'কইল ঘরের পাশেই তো সে বইস্যা আছে, শুধু দুই হাত এক করতেই যা বাকি। বাধা যেটুকু আছে, এই বৈশাখেই সব কাইট্যা যাইব। মিলু গেল কোথায়?'

'ছিল তো এখানেই। কে জানে গেল কোথায়!'

'না-না, এইটা ভালো হইত্যাছে না ছোটবউ। আস্কারা দিয়া মাইয়াটারে তুমি ধিঙ্গি কইরা তুলছ। সোমত্ত মাইয়ার হুট হাট কইর‍্যা যেইখান সেইখানে যাওন কী ঠিক! ওরা যদি কিছু ভাবে!'

'ওরা?' তরলা অবাক হয়ে বললে, 'কাগো কথা কইতাছেন?'

'কাগো আবার, ওধারের গো'—অর্থপূর্ণ হাসি হাসলেন যশোদা, 'এদেশি লোক তো ওরা। এসব যদি পছন্দ না করে?'

তরলা হাসি চাপতে পারল না এবার, হাসতে-হাসতেই বলল, 'সম্বন্ধটা তাইলে এ্যাক্কারে পাকা কইর‍্যা ফ্যালছেন! কিন্তু অগো লগে আমাগো কী ঠিক বনবো?'

'বনবো না মানে! বলি না বনার পাইলাটা কী!' ব্যাপারটা প্রকাশ্য হয়ে যাওয়ার পর দ্বিগুণ উৎসাহে যশোদা বললেন, 'আরে বনাইতে জানলেই বনে। কোন লঙ্কা কিষ্কিন্ধ্যার থিকা আইছ যে বনবো না! ওসব কথা মনেও নিয়ো না ছোটবউ—'

কথা বলতে-বলতেই প্রমীলাকে দেখতে পান, ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে, বললেন, 'যাস কই এই সন্ধ্যাবেলা?'

'সামনের দোকানে।'

'দোকানে যাওয়ার কী দরকার তোর? ধিঙ্গি মাইয়ার মত নাইচা বেড়াও!' যশোদা প্রায় ধমকের সুরেই বললেন, 'অখন থিকা পড়াশুনা ছাড়া তোমার বাইর হওন বারণ।'

প্রমীলা কিছুই বুঝতে পারছিল না ব্যাপারটা, অবাক হয়ে বলল, 'কেন, কী করেছি আমি?'

'কী করছ? বড় হইছ। দুইদিন পর বিয়া হইব। অখন থিকা অভ্যাস করতে লাগব, বুঝছ?'

প্রতিবাদ না হোক, কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল প্রমীলা, হঠাৎ মনোরমা ঢুকে প্রমীলাকে দেখে বলল, 'যাক গে, তুই আছিস। চঞ্চলটাকে পাচ্ছি না, একটা কাজ করবি মা?'

'বলো না।'

'অফিস থেকে এখনও তো মেসোমশাই বেরোননি, তুই এই নম্বরে একটা ফোন করে দে'—হাত বাড়িয়ে একটা চিরকুট দিল মনোরমা, 'বলবি ফেরার পথে দর্জির কাছে আর যেতে হবে না, জামা তারা দিয়ে গেছে।'

'আমি এক্ষুনি যাচ্ছি মাসিমা'—পাছে কেউ বলে দেয় চঞ্চল বাড়িওয়ালার কাছে আছে, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল প্রমীলা, যাওয়ার আগে শুধু যশোদার মুখের দিকে চেয়ে একটা বিজয়িনীর হাসি হেসে গেল।

মনোরমা বললে, 'ছেলেতে আর মেয়েতে এখন তফাত কিছু নেই দিদি, মানুষ হলে সবই সমান।'

'সমান তো কইছ'—যশোদা বলল, 'কিন্তু মাইয়া তো ঘরের বউ হইব, তখনী? ধরো তোমারই ঘরে যদি যায়!'

'সে তো আমাব সৌভাগ্য দিদি। অমন বউ পেলে তো বর্তে যাই।'

এবাব বিজয়িনীর হাসি যশোদাব মুখে। তরলার দিকে চেয়ে কী বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই ঝড়ের মতো নেপাল ও চঞ্চলের প্রবেশ। মনোরমা অবাক হয়ে বললে, 'ওমা, তুই এখানেই ছিলি!'

সেই বিস্ময়ের দিকে দৃক্‌পাত না কবে নেপাল বললে, 'কামের মত কাম কইরা আইছি একটা। তাগাদা দিতে ও আর জিন্দেগিতে আইবো না।'

তরলা শঙ্কিত হয়ে চঞ্চলের দিকে চেয়ে বলল, 'কী সর্বনাশ! মাইরপিট হয় নাই তো বাবা চঞ্চল?'

চঞ্চল উত্তর দেওয়ার আগেই নেপাল বললে, 'মাইরই কইতে পারো হেই মারটা অর ভুলতে সময় লাগবো।'

মনোরমা বলে, 'কী করেছেন তাই বলুন না।'

বলতো হয়তো, তার আগেই বাড়িওয়ালা নিজে এসে হাজির। অথচ আশ্চর্য, রাগত চেহারা নয়, হাসি-হাসি মুখ। হাতে একটা বাটি, ডিশ দিয়ে ঢাকা। সেটা নেপালের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'বাটিটা কিন্তু ফেরত দেবেন।'

নেপাল হেসে বললে, 'তয় কী ভাবছেন বাটিসুদ্ধই খামু?'

তরলা ভুরু কুঁচকে বললে, 'কিন্তু বাটির মধ্যে আছে কী? হারে ন্যাপাল—'

'আরে শোনো না কথাডা'—নেপাল বললে, 'যাইয়া দেখি কী ভুর-ভুর করতাছে ইলিশের গন্ধ। জিগায় কি, ইলিশভাতে দেয় ক্যামনে কইতে পারেন?'

বাড়িওয়ালা বললেন, 'আরে মশাই আমি হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাই, রান্নার আমি কী

জানি। রোজ এখানে ইলিশের গন্ধ পাই—ভাবলাম ইলিশ ভাতে না জানি কী আহামরি জিনিস—'

'তাই করছে কি, ইলিশমাছটারে এ্যাক্কারে গোটা ঢুকাইছে হাড়ির ভিতর। কয় কিনা ভাতের সাথে সিদ্ধ হইব। ভাতে আর ইলিশে যে কী ঘ্যাট হইতেছিল'—খ্যাক-খ্যাক করে হেসে নেপাল বললে, 'যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, তাই গিয়া আমি শিখাইয়া আইলাম।'

চঞ্চল সুযোগ পেয়ে বলল, 'এটা গুরুদক্ষিণা।'

'আর রসিকতা করো না চঞ্চল'—বাড়িওয়ালা বললেন, 'আমি চলি।'

মনোরমা ফিরছিল ঘরে, ঢোকার মুখেই হরিমোহনের সঙ্গে দেখা। বললে, 'ইস তুমি কি দর্জির দোকান হয়ে এলে?'

'এই দেখো, ভুলে গিয়েছিলাম তো একেবারে।'

'বেশ করেছ'—মনোরমা চঞ্চলের দিকে চেয়ে বলল, 'মিলুটাকে ফোন করতে পাঠালাম বাইরে। দেখ তো বাবা, যদি না করা হয়ে থাকে, বারণ করে দিস।'

কাজের দায়িত্বটা পেয়ে চঞ্চলকে খুব একটা অখুশি মনে হল না।

বাস থেকে নেমে মিনিট সাত-আট হাঁটতে হয়। প্রমীলা সবে বাস থেকে নেমেছে, প্রায় মুখোমুখি কার্তিক। একমুখ হেসে এগিয়ে এসে বললে, 'বাড়িতেই ফিরছেন তো!'

'হ্যাঁ, আর যাব কোথায়!' অপ্রসন্ন মুখেই বলল প্রমীলা।

'একটা কথা জিগ্যেস করছি, 'কিছু মনে করবেন না।'

'বাবা, জিগ্যেস করার আগেই কড়ার করিয়ে নিচ্ছেন?'

'কথায় পারব না আপনার সঙ্গে'—কার্তিক বললে, 'আমাকে আপনি শত্রুপক্ষের লোক বলেই ভাবেন বোধহয়?'

'না, তা ঠিক ভাবি না।'

'শুনে খুশি হলাম। দেখুন, ও বাড়িতে যাই, তাই ঝগড়া-ঝাটির মধ্যেও জড়িয়ে পড়তে হয় বাধ্য হয়ে। তা থেকে কিন্তু আমাকে আপনি বিচার করবেন না।'

'না-না, তা করবো কেন'—হাসি চেপে প্রমীলা বলল, 'আপনি তার মানে ওদের দলে নন!'

'ওদের দলে! ওদের সঙ্গে আমার সম্পর্কই নেই বলতে গেলে।'

'তাই বুঝি! কিন্তু ও বাড়িতে যেরকম যাওয়া-আসা করেন তাতে তো—'

'সে তো ওদের গরজে। নইলে আমার কী দায়! তবে হ্যাঁ, আসবার কারণ যে একেবারে নেই তা নয়।'

প্রমীলা ভাজা মাছ উলটে খেতে না পারার মতো মুখ করে বলল, 'কী কারণ?'

'সেটা এখন আর'—হঠাৎ প্রসঙ্গ পালটে কার্তিক বলল, 'আচ্ছা, চঞ্চল আপনাকে পড়ায়, তাই না?'

'হ্যাঁ, অবশ্য যদি সেটাকে পড়ানো বলে!'

'পারে না বুঝি কিছু পড়াতে!' প্রবল উৎসাহে কার্তিক বলতে শুরু করল, 'আরে পারবে কী! ওর বিদ্যের দৌড় তো আমি জানি। নিজেই পাশ করুক আগে, তবে তো অন্যকে পড়াবে!'

প্রমীলা নিতান্ত নিরীহ মুখ করে বলল, 'পাশ করবে না বুঝি?'

'দেখতেই পাবেন।'

'সে কী! তাহলে বিলেত যাওয়াও হবে না বলছেন?'

'বিলেত!' তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে কার্তিক বললে, 'ওইসব চাল আপনার কাছে মারে বুঝি?'

'হ্যাঁ, কথায়-কথায়।'

'বাড়ির দস্তুর। খাবে পান্তা তো বলবে পোলাও। কিন্তু আপনার দেরি করিয়ে দিচ্ছি না তো?'

'বাড়িই তো যাচ্ছি'—প্রমীলা আর একটু উস্কে দেওয়ার জন্য বলল, 'তাছাড়া, আপনার সঙ্গে দেখা না হলে এসব তো জানতেও পারতাম না।'

'আরও অনেক কিছু বলবার ছিল আপনাকে! কিন্তু মুশকিল হচ্ছে—'

'বাড়িতে আসুন না।'

'না-না, বাড়ি না! ধরুন কলেজ থেকে ফেরার পথে এইরকম রাস্তায় যদি ধরি?'

'রাস্তা! তা—' প্রমীলা ইতস্তত করে বললে, 'সেটাও হতে পারে।'

স্ফূর্তিতে টগবগ করতে-করতে কার্তিক বললে, 'তাহলে কোথায় সুবিধে হয় বলুন তো?'

'যে কোনও জায়গায়। আমাদের কলেজ বাস যেখান দিয়ে আসে সেখানে দাঁড়ালেই দেখতে পাবেন।'

'হ্যাঁ, কিন্তু আপনি নামতে পারবেন বাস থেকে?'

'পারবো তবে—' চিন্তিত মুখে প্রমীলা বললে, 'একটা দরখাস্ত করতে হবে আপনাকে প্রিন্সিপালের কাছে।'

'দরখাস্ত! প্রিন্সিপাল! কেন?'

'তাঁর পারমিশন ছাড়া বাস থেকে নামার হুকুম নেই তো।'

'না, মানে দরখাস্ত—'

'তাহলে একটা কাজ করুন। আমার নামার দরকার নেই, আপনিই বরং উঠুন বাসে।'

'আমি! উঠতে দেবে আমাকে! মানে মেয়েদের বাসে—'

'ক্লিনারের কাজ করবেন! ক্লিনার তো ছেলেই! তাহলে বোধহয়—'

প্রথমটা ঠিক ধরতে পারেনি কার্তিক। পরক্ষণেই ঠাট্টাটা বুঝতে পেরে রোষকষায়িত নয়নে প্রমীলার দিকে চায়। সে তখন দৃষ্টি পথের বাইরে।

হরিমোহনের বাড়ি এসে দেখে কার্তিক সেখানে হই-হই কাণ্ড। বলতে গেলে দুটো পরিবারই এখন হরিমোহনের বাইরের ঘরে। ছেলেরা অবশ্য, মেয়েদের মধ্যে শুধু রিনি। চঞ্চল তো বিরাট পড়ুয়া মানুষ সেও নেই।

আসলে আজ ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের খেলা আছে। ওদের নেপালমামা কোথা থেকে একটা পুরোনো রেডিও নিয়ে এসেছে, তাতে রিলে শোনা হবে। কার্তিককে দেখে রিনি বললে, 'এসো কার্তিকদা, খেলা শুরু হবে এক্ষুনি'—তারপর নানুর দিকে চেয়ে বললে, 'কী হবে নানুদা, আমার ভারি ভয় করছে।'

নানু বললে, 'কীসের ভয়?'

'ইস্টবেঙ্গল যদি জিতে যায়?'

'জিতবেই তো। নইলে কে জিতবে।'

'ইস!' রিনি মুখ ভেটকে বললে, 'কিছুতেই জিতবে না।'

'তুই থাম!' নানু চিৎকার করে ডাকে দল ভারী করবার জন্যে, 'শিগগির এসো দিদি! ও দিদি'—রিনিও চেঁচাতে শুরু করে, 'দাদা শিগ্‌গির! এক্ষুনি আরম্ভ হয়ে যাবে কিন্তু—'

প্রায় একসঙ্গেই এসে পড়ে দুজন—ভেতর থেকে চঞ্চল আর পাশের বাড়ি থেকে প্রমীলা। কার্তিক দুজনকে একসঙ্গে দেখে মুখটা হাঁড়ি করে বসে পড়ে। চঞ্চল বলে, 'কী ব্যাপার, রেডিও?'

'রেডিওতে গান হবে নাকি? ডাকছিলি কেন?' প্রমীলার জিজ্ঞাসা।

'না-না, গান কেন—আজ কী হচ্ছে জানো না বুঝি?'

নানু বলে, 'দিদিটা কিচ্ছু জানে না। আজ মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলা না? সেইজন্যেই তো নেপালমামা রেডিও এনেছে।'

প্রমীলা বলে, 'ধুস! খেলা! ও তোরাই শোন।'

এরকম কথা শুনেও কিন্তু দমে না রিনি, বলে, 'তুমি কার দলে দিদি? আমাদের তো?'

সঙ্গে-সঙ্গে নানু চিৎকাব করে ওঠে, 'ইঃ, তোদের হবে কেন! দিদি আমাদের! না দিদি? তুমি ইস্টবেঙ্গল তো!'

দিদি বেহাত হয় দেখে রিনি ওকে জাপটে ধরে বললে, 'না, তুমি মোহনবাগান। বলো তুমি মোহনবাগান।'

চঞ্চল হাসছিল ওর দিকে তাকিয়ে প্রমীলা মুখ ঘুরিয়ে বলে, 'দাঁড়া, ভেবে দেখি আমি কার দলে। ঠিক আছে, যে জিতবে আমি তার দলে।'

নানু বলে, 'ধ্যাৎ! তাই বুঝি হয়?'

রিনি প্রমীলাকে ছাড়ে না, বলে, 'সে হবে না, তুমি আমাদের দলে।'

গতিক খারাপ দেখে নানু ধরে চঞ্চলকে, বলে, 'তুমি কাব দলে চঞ্চলদা?'

রিনি চেঁচিয়ে ওঠে—'দাদা, তুমি আমার দলে।'

চঞ্চল বলে, 'দলাদলিটা কী নিয়ে সেটা শুনি আগে!'

প্রমীলা বলে, 'আহা, কী নিয়ে আবাব! ইস্টবেঙ্গল আর মোহনবাগান নিয়ে!'

নানু বলে, 'দিদি বলছে, যে জিতবে দিদি তার দলে।'

চঞ্চল বলে, 'তাহলে যে হারবে আমি তার দলে।'

নানু আর রিনি দুজনেই বিরক্ত হয়ে বলে, 'যাও-যাও, তোমাদের খেলা শুনতে হবে না।'

বেঁচে যায় ওরা, বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। চঞ্চল প্রমীলার দিকে চেয়ে বলে, 'লক্ষণ কিন্তু ভালো না। আবার একটা দুর্যোগ ঘনিয়ে আসছে মনে হচ্ছে।' ভেতর থেকে হরিমোহনের হাঁক শোনা যায়—'আরে, রেডিও ঠিক হল?'

শিবদাস অপেক্ষা না করে চলেই আসেন, নেপালকে বলেন, 'শুরু যে হয় না দেখি।'

নেপাল প্লাগ দেয়। রেডিও ভট-ভট আওয়াজ করে, কিন্তু শোনা কিছু যায় না। নেপাল অবশ্য তাতে বিচলিত না হয়ে বলে, 'অইব-অইব, অপেক্ষা করেন।'

রিনি বলে, 'তাড়াতাড়ি করো না নেপালমামা!'

হরিমোহন ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে বলে, 'চাবি ঘোরাতে-ঘোরাতে খেলা যে শেষ হয়ে এলো নেপাল!'

শিবদাস আরও অধৈর্য হয়ে বলেন, 'কোথা থনে একটা ভাঙা রেডিও আনছে আজকার দিনে!'

'আরে ধৈর্য ধরেন না একটু।' টিউনিং করতে-করতেই বলে, 'নতুন জায়গায় আইলে মাইন্‌ষেরই দুইদিন লাগে মানাইয়া লইতে। এ তো শুধু কল! একটু সবুর করেন।'

'আর সবুর!' হরিমোহন বলেন, 'রেডিও শুনব বলে জামাকাপড়টাও ছাড়িনি অফিস থেকে এসে।'

'গেছেনও তো আজ আমার লিগ্যা তাড়াহুড়া কইরা!' শিবদাস বলেন, 'দেরি টেরি হয় নাই তো?'

'একটু তো হয়েছিল! ব্যাঙ্কগুলো যা হয়েছে—এক ঘণ্টার আগে কোনও চেক ক্যাশ করা যায় না।'

'তা হইলে? অফিসে গোলমাল টোলমাল কিছু?'

'কীসের গোলমাল! দু-ঘণ্টা যেতে দেরি হয়েছে বলে গোলমাল! ওরকম অফিসে আমি—' থেমে যান হঠাৎ রেডিও চলতে আরম্ভ করে বলে। ধারাভাষ্যকার বলে চলেছেন ঃ 'মাঠে আর তিল ধারণের জায়গা নেই, কেল্লার রামপার্টে শুধু কালো-কালো সব মাথা—' ভট্! বন্ধ হয়ে যায় রেডিও। নেপাল চিৎকার করে বলে, 'তোমার মাথা! মাথা গণতে গেছো না খেলার কথা কইতে!'

চ্যাঁ চু করতে-করতে রেডিও আবার শুরু হয় ঃ 'এগুচ্ছে—ঝড়ের মতো এগুচ্ছে। মাখনের ভেতর দিয়ে যেন ছুরির মতো এগুচ্ছে—'

আবার ভট্। অধৈর্য হয়ে হরিমোহন বলেন! 'আরে বাবা এগুচ্ছেটা কে!'

নেপাল বলে, 'কে আর আগাইব, ইস্টব্যাঙ্গল নিচ্চয়।'

হরিমোহন ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলেন, 'অ! এগুলেই অমনি ইস্টবেঙ্গল!' আরও কিছু বলতেন বোধহয়, কিন্তু ক্যাঁক করে রেডিও আবার শুরু হয় ঃ 'বল একেবারে পেনাল্টি এরিয়ায়—না, গোলকিপারের হাতে। উঁহু, সেন্টার ফরোয়ার্ডের মাথায়—না-না, বারে লেগে ফিরে এল বল—এই ব্যাকের পায়ে—ওই কেড়ে নিল, ওই আবার শট। গো—ওঃ ছো, হল না—হল না—'

ভট্! শিবদাস বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, 'আচ্ছা আহাম্মক তো! গোলটা দিতাছে কে?'

কার্তিক এতক্ষণ গোঁজ হয়েই ছিল, এবারে বলল, 'মোহনবাগানই নিশ্চয়।'

নেপাল গর্জন করে ওঠে—'আরে রাখেন মশয়, মোহনবাগান দিব গোল! ঠেলাটা অহন সামলাউক আগে।'

কান মোচড়াতে থাকে রেডিওর, হঠাৎ শোনা যায় ঃ 'মাঠে গণ্ডগোল, ভীষণ গণ্ডগোল। রেফারি পেনাল্টি দিয়েছে। একদল হাততালি দিচ্ছে আর একদল চেঁচাচ্ছে। বল বসানো হয়েছে। কে মারবে কে জানে। এই তো দেখছি এগিয়ে আসছে—'

ভট্!

ধৈর্যহারা হয়ে চিৎকার করে ওঠেন হরিমোহন, 'আরে নিকুচি করেছে তোমার পচা রেডিওর। কোন দলের কী হচ্ছে বুঝতেই পারলাম না এখনো।'

'বোঝবার আর আছেটা কী'—নেপাল মৃদু হেসে বলে, হাত অবশ্য রেডিওতে, বলে, 'খাইছে গোল এবার মোহনবাগান। হাত দিয়া বল ঠেকান বাইর অইব এখনি।'

রেডিও চালু হয় সহসা ঃ 'সাবাস গোলকিপার সাবাস। মাঠে তীব্র হই-হুই। পেনাল্টি সট ধরে ফেলেছে ইস্টবেঙ্গলের গোলকিপার, একেবারে মোয়ার মতো। তারপর—'

রেডিও চুপ, কিন্তু হরিমোহন চুপ নন, বলেন—'কেমন! কী বলেছিলাম! কে পেনাল্টি পেয়েছিল—ইস্টবেঙ্গল না মোহনবাগান?'

'পাইয়া হইলটা কী মশয়, অ্যাঁ! অইতো মোহনবাগানের দৌড়!' শিবদাস তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন, 'পেনাল্টি শট, তাও গোল করতে পারে না। ছ্যা!'

'ছ্যা!' ভেঙিয়ে উঠল কার্তিক, 'ছ্যা বলুন ইস্টবেঙ্গলকে। মোহনবাগানকে আটকাবার জন্যে এগারোটা প্লেয়ারকেই গোলকিপার হয়ে হাতে বল ধরতে হয়। ছ্যা!'

'দেখেন মশয়'—বন্ধ রেডিও ভুলে নেপাল কার্তিকের দিকে এগিয়ে আসে, 'মোহনবাগানের লগে খেলনের লইগ্যা আমাগো এগারোটা প্লেয়ার লাগে না। পাচটা—বুঝছেন, ওই পাচটা প্লেয়ার হইলেই হয়। পেনাল্টি পাইয়া গোল দিতে পারে না, আবার কথা!'

'দেয় না'—কার্তিক, মুখিয়ে ওঠে, 'পেনাল্টিতে গোল মোহনবাগান দেয় না। পেনাল্টিতে গোল দেয় ইস্টবেঙ্গল। ছ্যা!'

'ছ্যা!!' আরও জোরে ভেঙিয়ে ওঠে নেপাল। দেখে নানু বলে, 'ও নেপালমামা, রেডিওটা যে বন্ধ হয়ে আছে। চালাও না!'

সম্বিৎ ফেরে নেপালের। মারতে থাকে চড়-চাপড় রেডিওর গায়ে। মার খেয়ে শায়েস্তা হয় রেডিও, আবার ধারাভাষ্যকারের গলা শোনা যায় ঃ

'পাঁচটা ফরোয়ার্ড চলেছে ইস্টবেঙ্গলের। আহা যেন পঞ্চপাণ্ডব। বল মাটি ছুঁচ্ছে না, পা থেকে মাথায়, মাথা থেকে পায়ে। কোথায় মোহনবাগান! মোহনবাগান যেন মাঠে নেই।'

চলছিল কমেন্ট্রি, তার মধ্যেই কার্তিকের দিকে চেয়ে ব্যঙ্গের হাসি হাসে নেপাল! রেডিওতে তখন চলছে ঃ 'স্রোতের সামনে কুটোর মতো ভেসে যাচ্ছে, নাজেহাল হয়ে যাচ্ছে, খাবি খাচ্ছে সব। রাইট আউট থেকে সেন্টার—আহা সেন্টার নয়, যেন রসমালাই! সাবাস ইস্টবেঙ্গল। বল সেন্টার ফরোয়ার্ডের পায়ে, মোহনবাগানের তিন-তিনটে হাফব্যাক বল কাড়তে গিয়ে চরকিবাজি খাচ্ছে। চোখে অন্ধকার দেখছে। সামনে সবাই কাত—শুধু সেন্টার ফরোয়ার্ড আর গোলকিপার। ওই বাঁ পায়ের বল 'দান পায়ে—এই উঠল পা—গো—না না! সব গণ্ডগোল! ভোজবাজিতে পাহাড়ের মতো কে দাঁড়াল এসে সামনে! মোহনবাগানের রাইট ব্যাক। ব্যাক না বৃকোদর! বিশাল বুকে বল ধরে এক ড্রপ-কিক। কোথায় বল, কোন শূন্যে গেল হারিয়ে! দূরবীন লাগাতে হবে নাকি! না, বল পড়েছে ইস্টবেঙ্গলের গোলের সামনে। ইস্টবেঙ্গল হল নাকি কাত? মোহনবাগানের সব কটা প্লেয়াব ইস্টবেঙ্গলের গোলে এসে ছেঁকে ধরেছে, ঠেলে ধরেছে, পিষে গুঁড়ো করে দিচ্ছে সব বাধা। সমস্ত মাঠ ফাঁকা, গোলের সামনে শুধু মানুষের তাল। বাহাদুর গোলন্দাজ মোহনবাগান। বল নয়, পলকে-পলকে যেন গোলা দাগছে ইস্টবেঙ্গলের গোলে। ভাঙে বুঝি গোলপোস্ট, দুর্গ বুঝি যায়। আর রক্ষে নেই! দুর্গানাম জপছে ইস্টবেঙ্গল। এই গো—না! হল না! রেফারির হুইসল্। হাফটাইম।'

রেডিও বন্ধ। সঙ্গে-সঙ্গে কার্তিকের চিৎকার—'জোচ্চুরি, ডাহা জোচ্চরি! গোল হতে যাচ্ছে—নির্ঘাত গোল, সেই সময়ে হাফটাইমের হুইসিল।'

'না, দিব না—' নেপাল তেড়িয়া হয়ে উঠল, বলল, 'রেফারি আছে কিয়ের লাইগা। টাইম হইছে, তাই হুইসিল দিছে।'

হরিমোহনবাবু উত্তেজিত কণ্ঠে বলেন, 'টাইম হয়েছে! টাইম হয়েছে! ঠিক গোল হওয়ার সময়েই টাইম হয়ে গেল। একেবারে সেকেন্ডধরা টাইম?'

শিবদাস বিস্ময়ের ভঙ্গিতে বলে, 'কইতাছেন কী হরিমোহনবাবু, সেকেন্ডটারে বুঝি টাইম কয় না! গোল হইতাছে বইল্যা টাইম বাড়াইয়া দিব রেফারি। আপনাগোর আবদার তো ভালো!'

কার্তিক অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই বলে বসল, 'আমাদের আবদার, না আপনাদের ঘুষ? কত টাকা খাইয়েছেন রেফারিকে?'

'টাকা খাওয়াইছি আমরা!' নেপাল তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বলল, 'শোনেন হরিমোহনবাবু, কী কথা কয় আপনার এই সোহাগের ভাইগন্যা!'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, শুনেছি যা বলেছে। আপনিই বা অত খেপে উঠছেন কেন কথা শুনে?'

'উঠুম না খেইপ্যা! ক্যান খেইপ্যা উঠছি আপনি আবার জিগান?'

'হ্যাঁ, জিগ্যেস করছি! ভারি এক ইস্টবেঙ্গল টিম, তাই নিয়ে আবার ফুটুনি। কোথায় ছিল আপনার ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান যখন শিল্ড নিয়েছিল?'

'অ্যা! কবে ঘি খাইছে, আঙুলে এখন গন্ধ শুকায়'—নেপাল হাত নেড়ে বললে, 'শিল্ডে অখন শেওলা ধইরা গেছে, দেখেন গিয়া।'

'টিনের শিল্ড তো আর নয় যে শেওলা পড়বে! সে হল আসল রূপোর—বুঝলেন, খেলে নিতে হত।'

শিবদাস ভুরু কুঁচকে বললেন, 'তয়? এখন কী শিল্ড না খেইলা পায়?'

কার্তিক বললে, 'খেলবে না কেন, ওই বারোজনে খেলে! রেফারি হুইস্‌ল্ দিয়ে গোল আটকায়।'

নেপাল এবার মারমুখী হয়ে বলল, 'কী বার-বার রেফারির হুইসিলের কথা কন মশয়। ইস্টবেঙ্গলরে গোল দিব সে মুবদ আছে মোহনবাগানের? কয়টা গোল দিছে আর কয়টা খাইছে একবার হিসাব কইরা দ্যাখেন।'

'ওঃ, আপনি যে একেবারে মারতে উঠেছেন! কী হিসেব করব কী?'

'হিসাব করবেন গোলের! এর মধ্যে মারার কথা ওঠে ক্যান! দ্যাখছেন ঝগড়া বাধানোর ছুতাটা!' হরিমোহন না বলে পারলেন না, 'ঝগড়া তো আপনিই বাধাচ্ছেন!

শিবদাস বললেন, 'আপনিও কন হরিমোহনবাবু?'

জামাইবাবুর সমর্থন পেয়ে চিৎকার করে নেপাল বললে, 'ঝগড়া বাধাইলাম কিনা আমি!'

'অতো চেঁচাচ্ছেন কেন?'

'ওইটাই আমার স্বভাব। তাই বইলা কইবে আমি মারতে উঠি?'

'ওকেই তো মারতে ওঠা বলে।'

'বাস-বাস! তাইলে এখানে আর থাকার কাম নাই আমার। আমি যাইতে আছি।'

'যাচ্ছেন তো আপনার ওই চোতা রেডিওটাও নিয়ে যান।'

'রেডিও আমি শুধু আমার জন্য আনছিলাম? ঠিক আছে, তাই যাইতে আছি।'

শিবদাসও উঠে পড়ে বললেন, 'অদের সেলাইয়ের কলও তাইলে লইয়া আসো।

হন-হন করে দুজনেই উঠে যায়। এবার অনিবার্যভাবে সব জিনিসেরই আদান-প্রদান হবে, এবং সেইসঙ্গে চিৎকার। অর্থাৎ অত্যন্ত পরিচিত নাটক। তবু নানু আর রিনি ভয়ে-ভয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

তিন

হয়ে গেছে বেশ কয়েকদিন, কিন্তু থমথমে আবহাওয়াটা কাটেনি। ঝগড়া মেটার কোনও লক্ষণই দেখা যায়নি।

বিষণ্ণ হরিমোহন মনোরমাকে বলছিলেন, 'কতবার বলেছি এ বাড়ি ছেড়ে অন্য জায়গায় চল। এরকম জায়গায় মানুষ থাকতে পাবে নাকি!'

মনোরমার মুখেও বিরক্তি, বললে, 'হ্যাঁ, যা তোমাদের সব মেজাজ! অন্য জায়গাই ভালো। কিন্তু জায়গা তো একটা চাই!'

'জায়গার অভাব! রাঙামামা, মানে ওই ঘোষসাহেবের ওখানে গিয়ে উঠলেই তো হল।'

'তাই বুঝি?'

'তাই না? সাধাসাধি করছেন তো বলতে গেলে।'

'তা তো করছেন! কিন্তু তাঁর সঙ্গে একবার দেখাটাও তো করতে গেলে না। একেবারেই বাড়িতে গিয়ে উঠবে?'

'হ্যাঁ তাই উঠব। তাতে হয়েছে কী?'

'বেশ তাই উঠো'—মনোরমা বললে, 'কিন্তু চল বললেই তো আর যাওয়া যায় না।'

'কেন! যায় না কেন? আমি যাবো আমার খুশি। ওদের মত নিয়ে যেতে হবে নাকি?'

'না-না, ওদের মত নিতে হবে কেন? এখন আর ওরা কে!'

'সোজাসুজি বলো। যেতে আমাদের বাধাটা কোথায়?'

'না। বাধা আর তেমন—'

'না-না, কীসে আটকাচ্ছে সেটা শুনি। এ বাড়িতে কী তোমার সুখ-সৌভাগ্য উথলে উঠছে?'

'সে কথা নয়—' মনোরমা গলা নামিয়ে বলল, 'যেতে গেলে এখানকার সব দেনাপত্তর তো মিটিয়ে যেতে হবে!'

'হ্যাঁ, তাই যাবো!' বলে ফেলেই মনে হল কথাটা ঠিক বলা হল না, বললেন, 'দেনাটেনা আর কী এমন আছে! আর থাকেও যদি, লুকিয়ে পালিয়ে যাব নাকি! বলি চাকরি তো আমার একটা আছে, নাকি! মাসে-মাসে মাইনে তো পাই!'

দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ শুনে বিরক্ত মুখে কী বলতে যাচ্ছিলেন, দরজা খুলে বললেন, 'আরে যতীন যে, এসো-এসো। অসময়ে যে? অফিস যাবে না?'

'হ্যাঁ, মানে এদিকে একটু এসেছিলাম, তাই'—যতীন বললে, 'ভাবলাম দেখা করেই যাই।'

'বেশ করেছ—' মনোরমার দিকে চাইলেন হরিমোহন, 'ওগো, যতীনের জন্যে একটু চা—' মানোরমা ভেতরে চলে যায়, যতীনের আপত্তিতে কান দেয় না। হরিমোহন বললেন, 'কী ব্যাপার বলো তো। নতুন খবর-টবর কিছু আছে নাকি? শনিবার যখন চলে আসি, সাহেব তো তখনও তোমায় আটকে রেখেছে দেখলাম।'

'না-না, নতুন খবর মানে, সেরকম কিছু—'

'আমার কথা কিছু হল নাকি?'

'হ্যাঁ, না—মানে কথা আর কী হবে—' যতীন খুব অস্বস্তি বোধ করছে বোঝা যাচ্ছিল,

বললে, 'সাহেব আপনার ওপর, মানে—মেজাজটা তো খুব খারাপ। তার ওপর ওই দশহাজার টাকার অর্ডারটা ক্যানসেল হওয়ায়—'

হরিমোহন শঙ্কিত হয়ে বলল, 'সে সব কথা আবার তুলেছিল নাকি? আরে ওই তখনই তো একটা মীমাংসা হয়ে গেল!'

'তা তো বটেই'—কথা ঘোরাবার জন্যে যতীন বললে, 'এ ফ্ল্যাটে তো অনেকদিন কাটল, তাই না? আপনার ছেলে এবার বি. এস-সি. দিচ্ছে তো!'

'হ্যাঁ, কিন্তু তোমার কী হয়েছে বলো তো'— হরিমোহন বললেন, 'ঠিক যেন সুস্থির হতে পারছ না। দাঁড়াও তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে—'

'আরে না-না, ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই।'

'ব্যস্ত তো তুমিই হচ্ছ মনে হচ্ছে!' গলা তুলে ডাকলেন হরিমোহন, 'ওগো শুনছ—'

'হয়ে গেছে'—ভেতর থেকে মনোরমার গলা শোনা গেল, 'নিয়ে যাবে নাকি একটু?

হরিমোহন বাড়ির ভেতরে যাওয়ার যা অপেক্ষা, পকেট থেকে একটা খাম বার করে টেবিলের ওপর রাখে যতীন, তারপর তিলমাত্র অপেক্ষা না করেই বেরিয়ে যায় বাড়ি থেকে।

চায়ের কাপ নিয়ে ঘরে ঢুকে হরিমোহন অবাক, বললেন, 'এ কী গো—'

'কী হল'—মনোরমা কী হয়েছে দেখতে ঢুকল, বলল, 'তোমার অফিসের বন্ধু গেলেন কোথায়!'

'সেইটেই তো বুঝতে পারছি না'—চা টেবিলে রেখে চিঠিটা তুলে নিলেন হাতে। খাম ছিঁড়ে চিঠি পড়তে-পড়তে মুখ গম্ভীর।

মনোরমা কিছু বুঝতে পারছিল না, ক্রমাগত প্রশ্ন করে যাচ্ছিল—'কী চিঠি গো? অফিসের নাকি? কী হয়েছে কী! কথা বলবে তো!'

'অ্যাঁ, না। হ্যাঁ'—হরিমোহন সামলে নিয়ে বললেন, 'অফিসের একটা জরুরি কাজ, যেতে লিখেছে আমায় তাড়াতাড়ি।'

'সে যাও, ভাত তো হয়ে গেছে'—মনোরমা বললে! 'কিন্তু ভদ্রলোক হঠাৎ চলে গেলেন—'

'যাক গে, দেখা তো হবেই অফিসে গিয়ে। চা-টা নিয়ে এখন কী করি—'

কথার মাঝখানেই কার্তিকের প্রবেশ। দরজা খোলা দেখে ঢুকে পড়েছে, ওর তো আর সাড়াটাড়া দেওয়ার দরকার হয় না। মনোরমা বললে, 'বুঝতে পেরেছি, ওর কপালেই নাচছিল চা-টা। নাও, ধরো—আমি চললাম।'

চায়ের কাপ হাতে তুলে নিয়ে, কার্তিক বললে, 'ব্যাপার কী! ও চিঠি কীসের!'

'অফিসের ঝামেলা—বুঝেছ কার্তিক, বাড়িতে এসেও শান্তি নেই'—হরিমোহন বললেন, 'এক একসময় কী মনে হয় জানো, এ চুলোর চাকরি ছেড়েই দিই। আচ্ছা, রাঙামামা—মানে বড়োসাহেবকে বললে কিছু টাকা ধার দিতে পারে না?'

'ধার?'

'হ্যাঁ, মানে একটা ব্যাবসা ট্যাবসা করি তাহলে কিছু!'

'অমন কাজও করবেন না। দুটো পাতা ছিঁড়তে গিয়ে আসল গাছটাই তাহলে—'

কার্তিকের কথা থেমে যায় যশোদার গলা বাইরে থেকে শুনতে পেয়ে, যশোদা খোঁজ নিচ্ছিলেন, 'বড়বউ ভিতরে নাকি?'

ভেতরে ঢুকেই পড়েছিলেন, হরিমোহনকে দেখে বললেন, 'তোমার লগে একটা কথা আছিল।'

'বলুন'!

'কইতাছি। তার আগে জিগাই তোমাগো এইসব পোলাপাইন্যা স্বভাবের অর্থডা কী! মাঠের খেলা লইয়া হইল ঝগড়া বুড়ায়-বুড়ায়—আরে তোমরা কি নানু-রিনির সমান?'

হরিমোহন গম্ভীর হয়ে যান, বলেন, 'কথাটা আপনার ভাইকে জিজ্ঞাসা করলেই তো পারতেন।'

'ভাইরেই তো জিগাইত্যাছি'—যশোদা বললেন, 'তা ঝগড়া কইরা তোমাগো সুখ হয় হউক। কিন্তু তার আগে অইন্য একটা কথার নিষ্পত্তি করো দেখি।'

কার্তিক আগ বাড়িয়ে বলল, 'কী বলতে চাইছেন কী আপনি?'

যশোদা হঠাৎই যেন খেয়াল করেন ওকে, বলেন, 'তোমারে তো কিছু কই নাই বাছা। তুমি এইখান থিকা যাও তো।'

হরিমোহন আরও গম্ভীর হয়ে বলেন, 'আমাদের নিজেদের লোক।'

যশোদার ভুরু কুঁচকে যায়। বললেন, 'না বাপু, তোমাগো এই নিজেদের লোকটি সুবিধার না। গ্রাম দ্যাশে থাকি, কিন্তু আমি মানুষ চিনি।'

'মাপ করবেন। গায়ে পড়ে এসব উপদেশ দিতে আসাটা আপনার বোধহয় ঠিক হচ্ছে না। কী বলতে চান বলুন আপনি।'

'কইত্যাছি ক্যাচাল যদি করতেই হয়, কুটুমে-কুটুমে করলেই ভালো হয় না?'

'মানে?'

হরিমোহন বোঝে না, কিন্তু কার্তিকের গা-পিত্তি জ্বলে যায়, কথাটা বুঝিয়ে দেয় হরিমোহনকে—'বুঝলেন না? আমাদেব চঞ্চলের সঙ্গে ওদের প্রমীলাব বিয়ের কথা বলছেন।'

'তাই বলছেন আপনি?'

'তা ছাড়া কী! আমি কই কি পোলা-মাইয়া দুইটার চাইর হাত এক কইরা দাও। তারপর যত পারো বিয়াইয়ে-বিয়াইয়ে ক্যাচাল পাড়ো।'

'তার মানে আপনি বলতে চান ওই বাড়িতে আমি ছেলের বিয়ে দেব? ওই বাড়িতে! কেন, আমার ছেলে কী বানের জলে ভেসে এসেছে! ছেলেটাকে এমনি করে বাগিয়ে নেবেন ফন্দি এঁটেছেন বুঝি! বলে দেবেন ওই শিবদাসবাবু আর নেপালবাবুকে, সাতগাঁয়ের চৌধুরীরা অমন যার-তার সঙ্গে সম্বন্ধ করে না। বুঝলেন!'

'হরি! কী কও!' যশোদার চোখের কোন চিক-চিক করে, 'তোমারে বাই কইলাম, আর—'

'যাই বলুন। পায়ে ধরে সাধাসাধি করলেও কিছু হবে না। যান, ওসব কথা আর কখনো এখানে বলতে আসবেন না।'

বলার উৎসাহও যশোদার ছিল না, কিন্তু তিনি চলে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে মনোরমা এসে ঢোকে ঘরে, বলে, 'ছি-ছি, কী হয়েছে আজ তোমার বলো তো! ভদ্রতাও ভুলে গেলে নাকি। গুরুজন বলে নাই মানো, ভালো করে কথাও তো বলা যায়।'

'যেরকম কথা শুনব সেরকম তো বলব। বলে কিনা ওদের মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে দিতে।'

'খুব অন্যায় কথা বলেছে! তোমার ছেলের জন্যে রাজকন্যেরা তো সব হত্যে দিয়ে বসে আছে!'

'রাজকন্যা না থাক, তাই বলে—যাক গে, আমায় জ্বালিয়ো না, আপিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

'চিঠিটা পকেটে পোরো—ওটা তো ফেলে যাচ্ছো!'

'ওঃ!' পকেটে পুরে নেয় চিঠি। মনোরমা কাছে এসে বলে, 'সত্যি করে বলো তো, চিঠিতে খারাপ খবর কিছু নেই তো? অফিসে কী কিছু হয়েছে?'

'অফিসে! কী হবে অফিসে!' হরিমোহন বোকার মতো হাসেন, 'দেখেছিস কার্তিক! অফিসে নাকি—'

'দাড়ি কামালে না তো এখনও?'

'কামাচ্ছি। তাড়া কীসের!'

'নিজেই তো বললে তাড়া! কখন স্নান করবে, কখন খাবে—'

'হবে-হবে, সব হবে।' হরিমোহন ব্যস্তভাবে ভেতরে ঢোকে। কার্তিক ও মনোরমা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

যশোদার কাছে সব শোনার পরই বাড়িসুদ্ধ গুম হয়ে ছিল সব। সেটা কাটাবার জন্য নেপাল বলল, 'অতো ভাব ক্যান দিদি। এব শোধ আমরাও লইতে পারি কিনা দেখামু অদের।'

'চুপ কর, চুপ কর—শুনতে পাবে।' যশোদা থামান।

'শুনল! কী তাতে। চুপ করুম ক্যান!' নেপালের গলা আরও চড়ে, 'আর কী-কী কইছে ঠিক কইরা কন দেখি।'

'কিছু না।'

'কিছু না? আপনেব তো লজ্জাশবম নাই—যাইচা যান অপমান হইতে।'

'তোগো আমি বুঝাইতে পারুম না। তবা শুধু ঝগড়াই কব।' যশোদা ঢুকে যান ঘরের মধ্যে। নেপাল আবও চটে যায়। বেগে মেগে চিৎকাব কবে বলে, 'হ, তাই করুম। অগো বাড়িভাড়ার টাকাটা আগে ফিরত দিয়া লই, তারপব দ্যাখেন কী করি।'

হুড়মুড় করে বাইরে বেরিয়ে আসছিল, প্রায় ঘাড়ে গিযে পড়ে কাবলিওয়ালার। বলে, 'বাপরে। কারে খুজতে আছ যমদূত?'

'হরিবাবু হ্যায়?'

'দ্যাখছো কাণ্ড!' উৎফুল্ল মুখে বলে, 'কীসের লাইগ্যা? কাছে?'

'দোরকার আছে।'

খুঁটিয়ে দরকারটা জেনে নিতে যাচ্ছিল, তাব আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসে প্রমীলা, বলে, 'কী হয়েছে কী?'

'হরিবাবুরে তালাস করতে আছে।'

প্রমীলার মুখ পাংশুবর্ণ হয়ে যায়, কিন্তু তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বলে, 'মেসোমশাই তো বাড়ি নেই।'

'কেয়া? হরিবাবু বাড়ি নেহি? কাঁহা ভাগলো!'

প্রমীলা বলে, 'এই তো বাজারে গেল। ওই দিক দিয়ে।'

কাবুলি পাগড়িতে হাত রাখে, 'বাজার গেলো! ঠিক হ্যায়, হঁয়াই পাকড়াবে হাম'।

কাবুলির চলে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে নেপাল বলে, 'কী-কস! হরিবাবুকে বাজার যাইতে দেখছস তুই?'

'বারে দেখিনি!'

'ক্যামনে দেখলি!' নেপালের মুখে সংশয়, 'ছিলি তো বাড়ির ভিতর। তাইলে—' তাকিয়ে দেখে প্রমীলা চলে গেছে। ভ্যাবাচাকা মুখে দাঁড়িয়ে থাকে সেখানে।

চার

দুপুরে ঘুম হয় না মনোরমার. একটু আবুলি মতো এসেছিল, চঞ্চল এসে হাজির। মনোরমা উঠে পড়ে বললে, 'সে কীরে, কলেজ ছুটি হয়ে গেল এর মধ্যে?'

'না, ছুটি নয়—ক্লাস ছিল আর একটা পরে।' চঞ্চল বললে, 'থাকতে ভালো লাগলো না আব।'

'কেন রে, শরীর-টরির ঠিক আছে তো?'

'না-না, শরীর ঠিক আছে'— চঞ্চল বললে, 'আচ্ছা মা, বাবা—বাবা আজ অফিসে গেছে তো?'

'হ্যাঁ, অফিসেই তো গেলেন। কেন বল তো?'

'না, এমনি জিগ্যেস করছি, মানে—'

'আমায় লুকোসনি বাবা'—মনোরমা বললে, 'কী হয়েছে স্পষ্ট করে বল।'

'স্পষ্ট আর কী বলব মা! আমিই তো জিগ্যেস করছি। বাবা কিছু কী বলেছেন তোমাকে?'

'না-না। কাউকে কিছু বলাব লোকই বটে তোর বাবা।' মনোরমা কিছু ভাবতে-ভাবতে বলল, 'তবে'—

'তবে কী মা?'

'বুঝতে পারছি না বে ঠিক, কী যেন একটা হয়েছে ওঁর। অফিসের তাড়া বললেন, অথচ তাড়ার কোনও লক্ষণই নেই—দাড়িটা পর্যন্ত কামিয়ে গেলেন না। তুই কিছু জানিস?'

'জানলে আর তোমাকে জিগ্যেস করব কেন?'

'মিথ্যে কথা বলিসনি বাবা। মনটা বড়ই অস্থির হযে আছে।'

'অস্থির হলে তো চলবে না মা'—চঞ্চল বললে, 'মনে হচ্ছে আরও অনেক দুর্ভাবনার জন্যে তৈরি থাকতে হবে।'

'কী হয়েছে চঞ্চল?'

'বাবাকে দেখলাম পার্কের এক কোণে চুপ করে বসে থাকতে। বাবার চাকরিটা বোধহয়—'

'খোকা!'

'হ্যাঁ মা, চাকরিটা বোধহয় নেই। আমি দেখি যদি কোনও ঠিক খবর পাই—'

রাস্তায় বেরিয়েই প্রমীলার মুখোমুখি। কৃত্রিম কোপে প্রমীলা বললে, 'দুদিন কিন্তু পড়াতে যাননি আপনি।'

'না প্রমীলা। পড়াতে তোমাকে আর যাবো না আমি।'

'কেন?'

'কেন? আমার সময় নেই বলে। পড়িয়ে তোমায় লাভ নেই বলে'— চঞ্চল দেখতে পাচ্ছিল প্রমীলা হাসছে, নিশ্চয়ই ঠাট্টা ভেবেছে, তাই একটু গম্ভীর ভাবেই বলল, 'সেদিন ঠাট্টা করে বলেছিলাম, তোমার দ্বারা পড়াশোনা হবে না। আজ বুঝতে পারছি ঠাট্টার ছলে সত্যি কথাই বেরিয়েছিল আমার মুখ দিয়ে। আমার পড়াতে যাওয়ার ওই তামাসার আর দরকার নেই।'

প্রমীলা একটু থিতিয়ে গিয়ে বলল, 'পড়াশুনো কী আমি করি না?'

আগের চেয়ে আরও গম্ভীর হয়ে চঞ্চল বললে, 'না করলে বলার কিছু ছিল না, কিন্তু পড়াশুনোর ভান তার চেয়ে খারাপ। তোমার অবশ্য ভাবনার কিছু নেই। মামা-মামিমা আদর দিয়ে মাথায় করে রেখেছেন। শুনেছি তোমার বিয়ের পণ পর্যন্ত মামিমা যা জমিয়ে রেখেছেন তাতে অনায়াসে বড়লোকের ঘরে তোমার বিয়ে হবে। অতএব জীবনটাকে তুমি অনায়াসে তামাসা মনে করতে পারো। কিন্তু আমি গরিব মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আমাকে খেটে মরতে হবে। তোমার তামাসার জন্যে নষ্ট করবার মতো সময় আমার নেই। সে সময়টা অন্য কাউকে পড়ালে হয়তো আমাদের সংসারে সাশ্রয় হবে। কাজেই আমি তোমায় জানিয়ে যাচ্ছি প্রমীলা, আজ থেকে আমি আর যাচ্ছি না তোমার কাছে।'

একটানা নিজের কথাগুলোই বলে যাচ্ছিল চঞ্চল, বলেই চলে গেল যে কাজে যাচ্ছিল সেদিকে। কোনওদিকে তাকাবার ফুরসৎ ওর ছিল না। তাকালে দেখতে পেত প্রমীলার দুচোখে টলটল করছে অশ্রু।

নেপাল ছটফট করছিল। ও মাথা গরম করতে পারে, চেঁচামেচি করতে পারে, কিন্তু লোকের চোখের জল সহ্য করতে পারে না।

এতো আবার যে সে লোক নয়, স্বয়ং মিলু। কথা নেই বার্তা নেই, কেঁদে চলেছে তখন থেকে, দেখতে-দেখতে মাথা খারাপ হয়ে গেল তার, বললে, 'এ তো ভালো মজা দেখতে আছি। জিগাইলে জবাবই দেয় না কিছু। আরে ও মিলু, কানতে আছো ক্যান? হ, বুঝছি আমি। খানিক আগে চঞ্চলের গলার আওয়াজ জানি শোনলাম। নিচ্চই কইছে কিছু। ও জামাইবাবু, কন না! আমাদের মাইয়ারে ক্যান ও কথা শুনাইয়া যাইব?'

শিবদাস কিছু না বুঝেই বলেন, 'কে কুথা শুনায়ে গেল?'

'কে আর। ও বাড়ির চঞ্চল। কী কইছে মিলুরে, সে তো কানতে আছে।'

'চঞ্চল! মিলুরে যা তা কইছে! এত বড় আস্পর্ধা!' শিবদাসের মেজাজ গরম হয়ে যায়, বলে, 'এ বাড়িতে অখন হইতে আর ঢুকতেই দিমু না অরে।'

'হ, সেই ভালো। ঢুকতেই দিবা না!' তরলা গজগজ করছে, 'যেমুন শ্যালক তেমনি তার জামাইবাবু। দ্যাও-দ্যাও, সব সম্পর্ক চুকাইয়া দ্যাও তোমরা!'

'তুমি ওরে লইয়া ভিতরে যাও'—নেপাল হঠাৎ বাইরে কার্তিককে দেখতে পেয়ে, বলে, 'অ কার্তিকবাবু, খাড়ান।'

বাইরে এসে দুশো টাকা বার করে হাতে গুঁজে দিয়ে বলে, 'এই লন টাকা। হরিবাবুকে দেন গিয়া। কইবেন সুদ যদি লাগে তাও দিমু, যান।'

টাকা নিয়ে কী করবে কার্তিক ভালো বুঝতে পারছিল না, দূরে হঠাৎ মিস্টার ঘোষকে দেখতে পেয়ে ভূত দেখার মতো করে অন্য রাস্তা দিয়ে পালায়।

মিঃ ঘোষের পরনের কোটটি দামি, কিন্তু জীর্ণ। বোঝা যায়, এককালে মানুষটি অবস্থাপন্ন ছিলেন। নেপাল যাওয়ার সময় রাগ দেখিয়ে সদর দরজা দড়াম করে বন্ধ করে গিয়েছিল। মিঃ ঘোষ সে বাড়িতেই কড়া নাড়েন, নানু এসে দরজা খোলে, বলে, 'কাকে চান?'

'হরিমোহনবাবু থাকেন না এ বাড়িতে?'

'পাশের বাড়ি।'

'ও, তাই? তুমি একটু ডেকে দেবে বাবা?'

নানু একটু ফাঁপরে পড়ে বলে, 'আমাদের সাথে যে ঝগড়া।'

কথার ভঙ্গিতে হেসে ফেলেন মিঃ ঘোষ, বলেন, 'ঝগড়া? কী নিয়ে?'

'ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের খেলা নিয়ে।'

'তাই নাকি!' হাসির মাত্রা বাড়ে তাঁর, বলেন, 'বেশ-বেশ, ডাকতে হবে না। আমি নিজেই যাচ্ছি।'

হরিমোহন দেখেই চমকে ওঠেন, বলেন, 'আরে, রাঙামামা! আসুন-আসুন, বসুন।'

'শোনো, তোমার চিঠি পেয়েছি'—মিঃ ঘোষ বললেন, 'আর মিনিট পনেরো অপেক্ষা করলেই আমার দেখা পেতে তুমি।'

'অফিসের তাড়া ছিল একটু তো। রোজই আপনার ওখানে যাব-যাব মনে করি—'

'মনে করো! এ দেশে ফেরবাব পর বছর পাঁচেক আগে হোটেলে একবার দেখা করেছিলে, মনে পড়ে? তারপর এতদিন যে ও বাড়িতে আছি, ভুলেও কী একবার যেতে নেই?'

'আজ্ঞে, যখন-তখন আপনাকে বিরক্ত করতে সাহস হয় না।'

'বিরক্ত করতে সাহস হয় না? চমৎকার excuse! বুড়ো বয়সে নিজের দেশে পরবাসী হয়ে আছি। তোমরা কেউ দেখা করতে এলে বিরক্ত হব? না হরিমোহন, তোমাদেব আসল কথা আমি জানি—you all hate this old man.'

'ছি ছি, এ আপনি—'

'ঠিকই বলছি। আমার অনেক টাকা থাকলে আত্মীয় স্বজন তবু হয়তো খোঁজ টোজ করতো, কিন্তু—'

'শুনুন, এস কিন্তু—'

'বড় দুঃখে বলছি হরিমোহন! সত্যি কথাই বলছি। বিলেত-ফেরত সাহেব হয়ে যে জীবন কাটিয়েছে, বুড়ো বয়সে তার যদি অর্থ না থাকে, তার মতো অভাগা আর কেউ নেই। ঘরে পরে সবাই তাকে এড়িয়ে যায়।'

'এ ধারণা আপনার ঠিক নয়।'

'ভুল হলে আমি খুশি হতাম হরিমোহন। ভুল প্রমাণ করবার জন্যে নিজেও কম চেষ্টা করিনি। যখন যেটুকু পেরেছি, আত্মীয়স্বজনকে সাহায্য করেছি। তার বদলে কিন্তু এই তোমারই মতো, কেউ একবার একটু দেখতে যাওয়ারও প্রয়োজন মনে করেনি।'

'কিন্তু আমি তো—'

'তোমার দোষ আমি দিচ্ছি না হরিমোহন। সামান্য যা কিছু তোমার বিপদে-আপদে কার্তিকের হাতে পাঠিয়েছি, তা ফেরতও চাইছি না। কিন্তু আমার তো এখন পেনশনটুকুই সম্বল।'

কথাটা বুকের মধ্যে গিয়ে লাগে। হরিমোহন বললেন, 'কার্তিককে দিয়েছেন! কত টাকা আপনি দিয়েছেন ওকে?'

'সে হিসেব করে লাভ কী হরিমোহন! বললাম তো, সে টাকা আমি ফেরত চাই না, I want to be left alone now, to die in peace. চিঠিতে তুমি যে সাহায্য চেয়েছ, তা আমার দেওয়ার উপায় নেই। তুমি আশায় থাকবে, অথচ দিতে পারব না, সেই জন্যেই কষ্ট করে কথাটা আমার জানাতে আসা।'

'আমি খুবই লজ্জিত ঘোষ সাহেব।'

'লজ্জিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। আমার থাকলে নিশ্চয়ই আগে যেরকম পেয়েছ সেরকমই দিতাম। আমি আজ উঠি তাহলে—'

'সে কী! একটু চা-মিষ্টি না খেয়ে—'

'না-না, রাতে ভালো দেখি না চোখে, দেরি করব না। বউমাকে সঙ্গে করে এসো একদিন।'

মনোরমা টের পেয়েছিল, আসেনি। হরিমোহন যে অনেক দেরি করে চোখমুখ শুকিয়ে ঘরে এসে বসেছিলেন, তাও দেখেছিল। একটু একা থাকতে দিচ্ছিল তাঁকে। গোটা ব্যাপারটা আন্দাজ করতে তার অসুবিধা হয়নি। ঘোষসাহেব চলে যেতে ঘরে ঢুকল, বলল, 'কখন এলে!'

'এই তো!'

'শোনো, এত রাতে আর চানটান করে কাজ নেই, আমি খাবার দিচ্ছি, হাত মুখ ধুয়ে এসো তুমি।'

'যাচ্ছি, কিন্তু'—হরিমোহন বললেন, 'তুমি যে কিছু জিগ্যেস করলে না?'

'কী জিগ্যেস করব?'

'কেন! এত রাত হল কেন জিগ্যেস করবে না। জিগ্যেস করবে না এতক্ষণ কোথায় ছিলাম?'

'কোনওদিন তো হয় না এত রাত, আজ যখন হয়েছে—নিশ্চয়ই কারণ ছিল কোনও'।

'ওই টুকু জেনেই খুশি? ভালো'—হরিমোহন অসংলগ্ন বকতে শুরু করলেন, 'কিছু জানতে চেয়ো না, কিচ্ছু না। আজ মাইনের দিন ছিল, মনে আছে নিশ্চয়ই, কেন মাইনে আনিনি তাও জানতে চাও না বোধহয়? তবু বলছি শোনো, জুয়া খেলে সব টাকা উড়িয়ে দিয়ে এসেছি। হ্যাঁগো, জুয়া খেলে। কাল পাওনাদার যখন আসবে, হাটে বাজারে পাঠাতে হবে, এই কথাই বলে পাঠিও। বাড়িওয়ালাকেও এই কথা শুনিও। ভাড়া আর তাহলে চাইবে না বোধহয়।'

'আজ এসব কথা থাক। তুমি খেতে এসো।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, যাচ্ছি। খেতে ডাকলে নিশ্চয়ই যাবো! কিন্তু খেতেই ডেকো, বাজারের পয়সা আর চেয়ো না, বুঝেছ? আমি দেব না।'

'বেশ তো দিও না। যা জোটে তাই দিয়েই চালাবার চেষ্টা করব। এসো তুমি।'

চলে গেল মনোরমা। হরিমোহন উদ্‌ভ্রান্তের মতো ওর দিকে চেয়ে আপন মনেই বলতে লাগল, 'কাল নয়, পরশু নয়, দিনের পর দিন তাই চালাতে হবে গো—দিনের পর দিন।'

পাঁচ

নেপাল আছে অথচ চেঁচামেচি নেই, এটা বড় একটা হয় না। তরলা শুনতে পাচ্ছিল অনেকক্ষণ থেকে নেপাল 'দিদি' 'দিদি' করে ডাক পাড়ছিল, হাতের কাজ সেরে আসতে পারছিল না। এবার সময় পেয়ে বাইরের ঘরে এসে বলল, 'কী রে, রাস্তার থিকা চিক্কুর পাড়তাছস ক্যান?'

'পাড়ুম না?' মধুকে সঙ্গে করে নেপাল ঢুকে পড়ে, বলে, 'আয়-আয়, চলে আয়। এই নাও দিদি। কাজের লোক তালাস করছিলা না? তাই তোমার লাইগ্যা আনছি।'

যশোদা ঘরেই ছিলেন, বললেন, 'সে কী! ও তো মধু! ওগো বাড়িতে কাম করে।'

'হ! কাম করে! মাইনা দিতে পারে না আবার কাজের লোক রাখার ফুটানি! মধু ওগো কাম ছাইড়া দিছে। অগো চোখের উপরেই ওরে রাখমু, দেখাইয়া দিমু ওদের।'

'থাম তো তুমি।' ওকে থামিয়ে দিয়ে মধুর দিকে ফেরে তরলা, বলে, 'সত্য? কাম ছাইরা দিছ, মধু?'

মধু হাত কচলে বললে, 'কী করব মা! মাইনেও পাব না, তার ওপর আধপেটা খাওয়া—'

যশোদা হাত দিয়ে থামিয়ে দিলেন ওকে, বললেন, 'বাস-বাস! মনিবের নিন্দা কইরো না মধু! বিনা মাইনায় আধপেটা খাইয়াই কী কাজ করছো এত কাল?'

'তা কেন বলব মা! মনিবের নিন্দে কি এতদিন করেছি! কিন্তু এখন নিজেদেরই জোটে না, আমাকে কোত্থেকে দেবেন?'

নেপালের মাথা গরম, বললে, 'কী কস তুই! ওগো জোটে না আবার কী। ওসব তরে ফাঁকি দিবার বাহানা।'

'না, মামাবাবু, কী ওঁদের হয়েছে জানি না, কিন্তু এমন দশা কখনও দেখিনি। সেলাই কল থেকে কত কিছুই তো বিক্রি হয়ে গেল এই ক-দিনে।'

শিবদাস বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন বোধহয়, ঘরে ঢুকে বললেন, 'হ, কিছু একটা হইছে বোধহয়।'

নেপাল বললে, 'ঘরের জিনিস বিক্রি করতে আছে! ক্যান! ভীমরতি ধরছে হরিমোহনবাবুর?'

শিবদাস বললে, 'মনে তো হয় সেইরকমই। কাইল অফিস থিকা বাইরের কাজে যাইতে হইছিল, ট্রামে যাইতে-যাইতে দেখি রাস্তাব এক ল্যাম্পপোস্টের কাছে ঠায় খাড়াইয়া আছে। খ্যায়ালই নাই।'

নেপাল ভুরু কুঁচকে বললে, 'অফিস না গিয়া রাস্তায় খাড়াইয়া আছে? মাথাডা গেছে বোধহয়। এতো ভাল কথা না।'

যশোদার মুখে চিন্তার ছাপ, বললেন, 'সত্যই ভাবনের কথা শিবু, তোমরা খোজ লও।'

নেপাল আবার তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বললে, 'খোজ আবার নিমু কী? আমাগো খোজ লয় কেডা! অগো যা হয় তাই হউক, আমাগো তাতে কী!'

নেপাল জানত তার গলাটাই সবচেয়ে উঁচু, এখন সে গলাও ছাপিয়ে কাবলিওয়ালার গলা গমগম করে উঠল। প্রমীলা ভেতর ঘর থেকে এসে এ ঘরের জানলায় একবার দেখে নিয়ে বলল, 'ও পিসিমা, কাবলিওয়ালা! ওদের বাড়ি।'

শিবদাস বললেন, 'স্বাভাবিক। ধার কইরা টাকা না দিলে কে ছাড়ে! বেশ হইছে, কাবলে আসছে—আমি খুশি হইছি।'

'তা তো হইবাই'—যশোদা ধমকের সুরে কথাটা বলে প্রমীলার দিকে চাইলেন, বললেন, 'যা তো মিলু হরিমোহনের অফিসে একটা ফোন কইরা আয়, ক যে দরজায় কাবুলি বইস্যা আছে—'

প্রমীলা বেরিয়ে গেল। নেপাল জানলায় গিয়ে দেখল, রিনি বেরিয়ে কথা বলছে কাবলিওয়ালার সঙ্গে, বলছে, 'বাবা তো বাড়ি নেই।'

কাবলিওয়ালা হুঙ্কার দিয়ে বলল, 'জরুর ঘরমে আছে। হামি অফিস গিয়েছি, সেখানে ভি নেই, বাড়িতে ভি নেই, তব যাবে কোথা! হামি ইখানে বৈঠে থাকবে দিনভর। দেখে বাহার হোয় কিনা। রুপয়া না নিয়ে আজ হাম যাবে না।'

নেপাল দাঁত কড়মড় করে বলল, 'আমাগো সাথে ঝগড়া, তাই। না হইলে ওই দরজায়

খাড়াইয়া ওর ফুটানি বাহির কইরা দিতাম।'

'দে না সেটা।' যশোদা বললেন, 'বাড়িতে মাইয়াটা বউটা ভয়ে মরতাছে। ঝগড়া বইল্যা এই সময়েও তোরা চুপ কইরা থাকবি?'

'থাকুমই তো! কিয়ের খাতির আমাগো লগে!'

শিবদাস বললেন, 'তোমারে যখন অপমান করছিল তখন মনে আছিল না?'

'থাউক তবে। তগো যা ভালো মনে হয় কর। মিলুরে তো পাঠাইছি, দেখি কী হয়!'

'ও মাইয়াপোলার ব্যবস্থায় কাবুলি বিদায় হয় না। উপযুক্ত ঔষধ চাই।'

তরলা ঝঙ্কার দিয়ে বলল, 'তোমরা যখন কিছু পারবা না তখন মিলু যা পারে সেটাই করতে দাও না, তারপব না হয়—'

প্রমীলা চুপি-চুপি ঢুকে পড়ল দরজা ঠেলে। হাঁফাচ্ছিল, বলল, 'ফোন করলাম পিসিমা, মেসোমশাই অফিসে নাই।'

শিবদাস অবাক হয়ে বললেন, 'অফিসে নাই?'

'না, অফিসের লোক কইল, তিনি নাকি অনেক দিন থিকা অফিসে আসেন না। চাকরিই নাকি নাই তাঁর।'

'চাকরি নাই!!' দুজনে এক সঙ্গে বলে।

কারও মুখে কোনও কথা নেই। একটু পরে ধরা-ধরা গলায় যশোদা বললেন, 'তাই এমনি কইরা অগো দিন চলতাছে। কতদিন ধইরা জিনিস বেইচা আধপেটা খাইয়া চালায়, কে জানে।'

শিবদাস বললেন, 'চাকরি যে নাই, আমাগো তা কইছে কোনও দিন!'

'জানুম ক্যামনে আমরা!' নেপাল বলে উঠল, 'নিকুচি করছে ঘটির দ্যামাকের। উপায় একটা কিছু করন লাগে।'

'চল, দেখি গিয়া।'

দুজনেই বেরিয়ে আসে বাইরে। কাবুলিওয়ালা তখন আসন বিছিয়ে বসবার উপক্রম করছে সেখানে। শিবদাস সোজা এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'এই! ক্যা মাঙতা হিঁয়া?'

নেপাল গলা চড়িয়ে বলল, 'খাড়াইয়া আছো ক্যান এখানে? যাও।'

কাবুলিওয়ালা কঠিন দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, 'রুপ্য়া মাংতা, রুপিয়া। টাকা ধার লিয়ে ঘরে বৈঠে আছে—তাই হামি খাড়া আছে।'

নেপাল বললে, 'তাই সঙের মত খাড়াইয়া আছ?'

শিবদাস বললেন, 'জুলুমের আর জায়গা পাও নাই!'

নেপাল চিৎকার করে বললে, 'যাও। যাও এহান হইতে। ঘরে কেউ নাই অহন।'

'দরজায় দাঁড়াইয়া শাসানি তোমার বাইর কইরা দিব!'

'তাজ্জব কি বাত!' কাবুলিওয়ালা একটু থমকে গেলেও সামলে নিল, বলল, 'টাকা ধার লিয়ে ফাঁকি দিয়ে ভাগবে, আর আমি কুছু করবো না?'

নেপাল বললে, 'করবা আবার কী! নালিশ কর গিয়া—যাও।'

শিবদাস বললে, 'দরজায় দাঁড়াইয়া জুলুম করবা নাকি তাই?'

নেপাল হালকা করে বলার চেষ্টা করল, 'টাকা লইয়া কেউ ভাগবো না তোমার।'

'কত টাকা ধার শুনি!'

'পাঁচশ রুপিয়া। নেহিতো ঝুটমুট হাম খাড়া রহেগা কাহে?'

'বেশ-বেশ' শিবদাস বললে, 'তোমার টাকা তুমি পাইবা।'

'হ, টাকা না দিয়া কেউ পলাইব না'—নেপাল বললে, 'কইয়া দিলাম আমি, যাও।'

শিবদাস বললেন, 'ঠিকানা কী তোমার?'

'ঠিকানা কী হোবে! কুলুটোলামে থাকে হামি। পুছবে আগা সাহেবের গদি, দেখিয়ে দিবে। লেকিন টাকা মিলবে কৈসে?'

নেপাল চোখ নাচিয়ে বললে, 'মিলবে ঝনঝন কইরা।'

শিবদাস বললেন, 'এখন কাইট্যা পড় দেখি ভালয়-ভালয়।'

কাবুলিওয়ালা বললে, 'ঠিক হ্যায়, অব হামি চলছি। লেকিন এ হপ্তামে রুপিয়া না মিললে রাস্তায় হামি কাপড়া ছোড়াকে—'

'তবে রে ব্যাটা'—নেপাল ধেয়ে যায় ওর দিকে। কাবুলিওয়ালা ভয় পেয়েই চলে গেল তাড়াতাড়ি। শিবদাস বললেন, 'দ্যাখছো কাণ্ডখানা। এদিকে চাকরি নাই, তার ওপর, কর্জ পাঁচশো টাকা।'

'কইয়া তো দিলাম টাকা মিলবো'—নেপাল বললে, 'অখন করবেনটা কী কন দেখি।'

'একটু শলা করতে লাগবো। চল দেখি কোথাও।'

চিন্তিত মনেই ওরা এগোয় সামনে।

হন-হন করে চলে যাচ্ছিল চঞ্চল, সামনে এসে দাঁড়াল প্রমীলা, বলল, 'দাঁড়ান। আমার সঙ্গে দুটো কথা কইতেও কী আপত্তি আপনার?'

চঞ্চলের চেহারা উদ্‌ভ্রান্ত, বললে, 'কথা আর না কওয়াই ভালো।'

'কেন? সে সম্পর্কটুকু কী আর নেই?'

'সম্পর্ক!' চঞ্চল বিষণ্ণভাবে হাসল, 'সম্পর্ক তো সত্যিই কিছু নেই।'

'ও, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক শুধু দরকারের তাই না?' প্রমীলা বললে, 'মুখের একটা কথাতেই তা বাতিল হয়ে যায়?

'আমাদের এই সম্পর্ক থাকলেই বা কী, না থাকলেই বা কী বলো!'

'আপনি তা মনে করতে পারেন, আমি করি • :'—প্রমীলা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'শুনুন, আজ আমি সব জানতে পেরেছি। আপনার বাবার চাকরি নেই। পাওনাদার বাড়ি বয়ে এসে আপনাদের অপমান করে যাচ্ছে।'

'বাবার চাকরি নেই—পাওনাদার অপমান করে যাচ্ছে—কথাগুলো শোনাতে বেশ লাগছে, না?'

'একদম চুপ করে থাকবে তুমি। এটা কী কথা দিয়ে মানুষকে বেঁধার সময়? মন বলে কী কিছুই নেই তোমার! আমি তোমার কেউ না হতে পারি, কিন্তু তোমার মা-বাবাকে আমি ভক্তি করি, ভালোবাসি। তোমাদের বাড়িকে আমি নিজের থেকে আলাদা ভাবি না। তুমি অপমান করতে চাইলেও এ বিপদে আমার যা করবার আমি না করে পারব না—' গলা থেকে নিজের দামি নেকলেস খুলে ফেলল প্রমীলা, বলল, 'এটা নিয়ে গিয়ে যেখানে হোক বিক্রি করে তোমার বাবার দেনা এখুনি মিটিয়ে এসো।'

চঞ্চলের মুখে কথা জোগাচ্ছিল না, বললে, 'তোমার গয়না বিক্রি করে পাওনাদারের দেনা মেটাব?'

'কেন মেটাবে না? বাবার সম্মানের চেয়ে এ গয়নার দাম কী আমার কাছে বেশি!'

'কিন্তু বাড়িতে কী কৈফিয়ৎ দেবে?'

'দেওয়ার দরকার হবে না'—প্রমীলা বললে, 'যদি হয়, আমি মিথ্যে বলব না।'

'শোনো প্রমীলা'—চঞ্চল একটু দৃঢ় হওয়ার চেষ্টা করল, 'তোমার গয়না আমি নেব কোন অধিকারে?'

'কোনও অধিকারই কি নেই?'

'না, নেই। তোমার দেওয়ারও নেই, আমার নেওয়ারও নেই'—চঞ্চল নিজেকে সামলাতে-সামলাতে বলল, 'তবু তুমি দিতে চেয়েছ—সে জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ।'

চলে যাচ্ছিল, প্রমীলা দৃপ্তকণ্ঠে বলল, 'দাঁড়াও। একটা কথা শুনে যাও। এত অহংকার তোমার কীসের? জেনে রাখো, অধিকাব থাকলেও তা নেওয়ার ক্ষমতা চাই। আজ বুঝলাম সে ক্ষমতাও তোমার নেই।'

চঞ্চল কথা বলতে পারে না। যখন নিজেকে সামলে নেয়, প্রমীলা তখন চলে গেছে।

বাইরের ঘরেই ফিস-ফিস কথাবার্তা হচ্ছিল শিবদাস এবং নেপালের। শিবদাস বলছিলেন, 'দু-পাচ টাকা তো নয়, পাচশো টাকা, চাইলেই আমাগো কে দিব?

নেপাল বললে, 'তার মানে যা কইলা সেইটা ছাড়া উপায় নাই।'

ঘরে ঢুকে পড়ে হঠাৎ তরলা, বলে, 'ব্যাপার কী কও তো। শালা-ভগ্নীপতিতে কী শলা করতে আছ তোমরা?'

'শলা! কী যে কও'—তরলা চলে যাওয়ার পর শিবদাস বলেন, 'যা করনের আইজই কইরা ফেলতে অইবো, অখনই। নয়তো একবার সন্দেহ করতে শুরু করলেই চিত্তির।'

'অখনই?'

'অখনই'—শিবদাস বলেন, 'তুমিই যাও নেপাল।'

'আমি! না-না, আমি পারুম না। আপনে যান।'

'আমি যামু! কিন্তু নানুর মা যদি হঠাৎ আইসা পড়ে?'

'আরে আইলে আমি সামলামু খনে।'

'কিন্তু এমন অসময়ে আমি—ঘরে যাইত্যাছি—'

'কী করবেন! মাথা ধরছে না আপনার? তার লগেই তো—'

তরলার পুনঃপ্রবেশ, বলল, 'মাথা ধরছে? কার মাথা ধরল?'

'ওই তো জামাইবাবুর। দ্যাখতাছ না কী অবস্থা!'

'বেশ তো আছিল। হঠাৎ মাথা ধরল কেমনে?

'তাই তো ভাবতাছি'—শিবদাস বললেন, 'হঠাৎ কেমনে যে ধরল মাথাটা—'

'শুইয়া পড়েন না একটু'—নেপাল দরদ দিয়ে বলল।

'শুইয়া পড়ুম? কইতাছ?'

'হ। দেখেন একটু অন্ধকার ঘরে শুইয়া। না কী কও দিদি?'

'অ্যামুন মাথা ধরা? শুইয়া পড়তে হইব?' তরলা বললে, 'তার থিকা অ্যাসপিরিন খাও না একটা।'

'না-না, হার্ট খারাপ হইব'—নেপাল দিদিকে বুঝিয়ে শিবদাসের দিকে ফিরল, 'শুইয়াই পড়েন আপনি।'

'দ্যাখ, ন্যাপাল যা কয়'—তরলা চলে যায়, সঙ্গে-সঙ্গে নেপাল তৎপর হয়ে ওঠে,

'দেরি করেন ক্যান? যান।'

'কিন্তু কোথায় রাখে, সেটাই তো জানি না।'

'আরে রাখব আর কই! ঘরে লোহার সিন্দুক আর কয়টা আছে? আপনি দ্যাখেন গিয়া, আমি এই দিক সামলাইতে আছি।'

শিবদাসকে শোবার ঘরে পাঠাবার দু-তিন মিনিটের মধ্যে দেখা যায় এক গ্লাস লেবুর জল নিয়ে তরলা হন-হন করে শোবার ঘরের দিকেই যাচ্ছে। নেপাল একেবারে সামনে এসে দাঁড়ায়। তরলা বলে, 'শুইতে গেছেন? যাই, লেবুর জলটা দিয়া আসি।'

'আরে তুমি আমারে দ্যাও না'—হাত থেকে গ্লাসটা প্রায় ছিনিয়ে নেয় নেপাল, 'তুমি যাও, আমি দিতাছি।'

শোবার ঘরের জানলার কাছে এসে নেপাল চাপা গলায় ডাকে, 'জামাইবাবু, একটু এদিক আসেন।'

শিবদাস জানলার কাছে এগিয়ে এসে বলে, 'কী! ডাকো ক্যান?'

'লেবুর জল। খাইয়া ফ্যালান।'

'আমি এখন এই এক গ্লাস লেবুর জল গিলুম!' শিবদাস হাত বাড়িয়েও হাত সরিয়ে নেন, 'না-না, আমি পাবুম না, ও তুমিই খাও।'

'আমি! আমারে খাইতে হইব?' নেপাল অকুতোভয়, বলে, 'ঠিক আছে, আমিই খাইতাছি।'

শিবদাস আবার ভেতরে ঢুকে যান। নেপাল মুখচোখ বিকৃত করে গ্লাসভর্তি লেবুর জল খেয়ে সবে গ্লাস রেখেছে নামিয়ে, তরলা আবার আসে—'তোমার জামাইবাবুর মাথা ধরা কী রকম? খাইছে তো লেবুর জল?'

নেপাল তাড়াতাড়ি খালি গ্লাসটা হাতে ধরিয়ে দেয় তরলার, কথা বলে না। নিয়ে যাওয়ার সময় তরলা বলে যায়, 'চুপ কইরা শুইয়া থাকতে কও কিছুক্ষণ। না সারলে পরে সে না আর এক গ্লাস দিমু।'

ভেতর থেকে ব্যঙ্গের সুরে শিবদাস বলেন, 'নেপাল, আরও এক গ্লাস।'

'হ! আপনের কী! সে অমৃত তো খামু আমি। আপনি তাড়াতাড়ি কাম সাইরা ফেলেন—শুভ কাজে বিঘ্ন অনেক।'

সেটা প্রমাণ করার জন্যেই যেন নানু হঠাৎ বাইরে থেকে এসে হাজির হয়, নেপাল তাড়াতাড়ি জানলা বন্ধ করছে দেখে বলে, 'ওকী জানলা বন্ধ কর কেন?'

'চুপ। জামাইবাবুর মাথা ধরছে, গোল করিস না। এ্যাক্কারে চুপ।'

নানু ছেলেমানুষ, ভয় পেয়ে চলে যায়। জানলার দিকে সরে এসে চাপা গলায় বলে নেপাল, 'কাজ সারেন তাড়াতাড়ি।'

সন্দেহ হয়েছে কী না কে জানে, যশোদা এসে ঢোকেন এবার ঘরে, পেছন-পেছন তরলাকেও দেখা যায়। যশোদা নেপালের ভাবভঙ্গি দেখে বলেন, 'ওকী! চোরের মতো কী করতাসিস ওখানে?'

'এই—জামাইবাবু ঘুমায় কিনা!'

'ঘুমায়! এই বৈকাল পাচটায় ঘুমায় কী রে! কী হইছে শিবুর?'

তরলা বলে, 'না দিদি, হঠাৎ মাথা ধরছে। আইচ্ছা, আমরা একটু ঠাকুরবাড়ি থিকা আইতাছি, তুমি বাড়ি আছো তো?'

'আছি না? আমি তো বাড়িতেই আছি'—খুশি হয় নেপাল, 'তোমাগো যত খুশি

দেরি কইরা আস না।'

যশোদা আর তরলা বাড়ির বার হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে চাপা গলায় নেপাল জিগ্যেস করে, 'কাজ শুরু করেছেন?'

আপদের মতো এসে হাজির হয় নানু, বলে, 'কী করছ নেপাল মামা?'

'তর তাতে কী কাম? যা, যা দেখি।'

ধমক খেয়ে ভয় পেয়ে নানু বাইরে চলে যায়, কিন্তু বিপদ তো আর একা আসে না, যশোদারা ফের এসে ঢোকে বাড়িতে। নেপাল বিরক্তি চাপা দিয়ে বলে, 'কী! ফিরা আইলা যে?'

তরলা বলে, 'একটা জিনিস নিতে ভুইল্যা গেছি।'

তরলা কোথায় যায় ঠিক বোঝা যায় না, কিন্তু শোবার ঘরে কেলেঙ্কারি বাধান শিবদাস। ট্রাঙ্কখোলার শব্দ, কী একটা পড়ে যাওয়ার শব্দ! নেপাল সমস্ত শব্দ ঢাকার জন্য প্রাণপণে গান ধরে—'ওই আসে ওই আসে আসে ওই—'

চিৎকারের চোটে বাইরে থেকে নানু ফিরে আসে, বলে, 'কী হল মামা! তুমি না বললে বাবার মাথা ধরেছে? এত জোরে গান গাইছ যে?'

নেপাল দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলে, 'গাইছি তো তোর কী! ফাজিল পোলা কোথাকার।'

ধমক খেয়ে নানু আবার পালায়। কিন্তু মাটি করেন শিবদাস, শোবাব ঘরের ভেতর থেকে করুণ কণ্ঠ ভেসে আসে—'অ নেপাল, পাই না যে!'

এবার যশোদা এগিয়ে আসেন একেবারে নেপালের সামনে, বলেন, 'ব্যাপার কী! শিবুর মাথা খারাপ হইছে নাকি?'

'না-না'—নেপাল ঘাবড়ে গিয়ে বলে 'মাথা ধবছে।'

'মাথা ধরছে তো বাক্স উলটাইয়া কী করতাছে!' বলেই যশোদা হাঁক মারতে থাকেন, 'অ শিবু—শিবু—বাইর হইয়া আয়। বাইর হ শিগ্‌গির।'

শিবদাস বেরিয়ে আসে। প্রায় ভূতের মতো দেখায় ওঁকে। মাথাভর্তি ময়লা-ঝুল। তরলা বুঝতে না পেরে বলে, 'ওষুধ খুজতাছিলেন বোধহয়।'

নেপাল লাফিয়ে উঠে বলে, 'হ-হ! তাই খুজতে আছিল।

তরলা বলে, 'কিন্তু যা খুজতে আছিল তা তো ওইখানে নাই'— একটা পুঁটলি বার করে বলে, 'দেখো দিদি, এইটা কিনা!'

শিবদাস হতভম্ব হয়ে বলেন, 'এটা? কয় কী!'

যশোদা বলেন, 'ঠিকই কয়। পাচশ টাকা আছে। পাচশই দরকার না শুনছিলাম!'

শিবদাস আরও ঘাবড়ে গিয়ে বলে, 'কিন্তু তুমি নিজে থেকে—'

যশোদা চলে যান তরলাকে নিয়ে। শিবদাস পুঁটলি হাতে নিয়ে বোকার মতো ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে থাকেন নেপালের দিকে। নেপালও তথৈবচ।

ছয়

রাত্রি নেমেছে বেশ খানিকক্ষণ, কিন্তু হরিমোহনের বাড়িতে আলো নেই। আলো না থাকলেও লোক যে আছে সেটা বোঝা যাচ্ছে ওঁদের ফিস-ফিস কথাবার্তায়। সম্ভবত হরিমোহন আর মনোরমাই কথা বলছিলেন। হরিমোহন বলছিলেন, 'দেখো, কিছু ফেলে যাচ্ছো না তো ভুলে?'

মনোরমা বলল, 'না, চঞ্চল সব দেখেশুনেই নিয়ে গেছে। কিন্তু কোথায় যাচ্ছি সেটা

তুমি এখনও বলোনি।'

'কোথায়?' হরিমোহনের কণ্ঠে যেন একটু বিষণ্ণ হাসি, বললেন, 'কলকাতা যে কত বড় জায়গা তা তো তুমি জানো না। গড়াতে-গড়াতে নেমে যাওয়াব অঢেল জায়গা এখানে আছে। এমন জায়গায় অন্তত যাবো, কার্তিকের মতো নিজের লোক যার খোঁজ পাবে না। ওদের মতো পড়শির মুখ যেখানে দেখতে হবে না।'

'এসব তুমি কী বলছ! ভগবান আমাদের ওপর বিরূপ হয়েছে, তাতে কার্তিকেরই বা দোষ কী, আর ওরাই বা কী করেছে!'

এতদিন বলেননি, এবার হরিমোহন বলে ফেললেন, 'কী করেছে? আমার নাম করে কার্তিক কতবার রাঙামামার কাছে টাকা চেয়ে এনেছে জানো? আর পড়শি! আমি নিজে ধাব কবে ওদের বিপদে সাহায্য করেছি, আমার এই সময়ে ওরা চুপ করে থাকতে পাবল?'

মনোরমা বললে, 'কিন্তু ওরা জানবে কেমন করে? তুমি তো ওদের কাছে চাওনি?'

'চাইব? ধার দিয়ে আমি টাকা চাইব? চৌধুরী বংশের কেউ টাকা চায় না, বুঝেছ! আমাদেব কুষ্ঠিতে তা নেই। যাও-যাও, মেয়েটাকে তোলো—'

বোঝা যায় রিনি ঘুমোচ্ছে। মনোরমা গিয়ে তাঁকে তোলার চেষ্টা করে, 'রিনি, ওঠ মা, উঠে পড়।'

হরিমোহনও যোগ দেন, 'উঠে পড় রিনি, আমাদের যে যেতে হবে এখুনি।'

এবার আবছা আলোয় দেখা যায়, চোখ ডলতে-ডলতে বিনি উঠে দাঁড়িয়েছে কিন্তু সে থাকতে পারে না, মনোরমার শাড়িতে মুখ গুঁজে ডুকরে কেঁদে ওঠে।

মনোরমা ওকে ভোলাবার চেষ্টা করে বলেন, 'ওকী রে, কাঁদছিস কেন রিনি! কাঁদবার কী হয়েছে? কত ভালো জায়গায় যাচ্ছি আমরা—'

থামে না রিনি। কাঁদতেই থাকে। হরিমোহন নিজেকে সামলাবার জন্য অন্য কথা বলতে শুরু কবেন, বলেন, 'মাল তো সব তোলা হয়েছে—চঞ্চল এতক্ষণ করছে কী!'

একবার অস্থিরভাবে বাইরেটা দেখে আসেন হরিমোহন, তারপর অধৈর্য হয়ে বলেন, 'বাঃ-বাঃ! মা-বেটিতে কাঁদবার আর সময় পেলে না! এদিকে কী যে হয়েছে, কিছুই বুঝতে পারছি না। চঞ্চল এখনও আসছে না কেন! চঞ্চলটা—'

কথা শেষ হল না, চঞ্চল দৌড়তে-দৌড়তে এসে বলল, 'বাবা, সর্বনাশ হয়েছে।'

'অ্যাঁ! কী হয়েছে?'

'যে লরিতে সমস্ত মাল তুলেছি সেটাকে খুঁজে পাচ্ছি না কোথাও।'

'সে কী!'

'সব মাল তুলে দিয়ে আমি এসেছিলাম দুটো পুঁটলি নিতে। সে দুটো নিয়ে গিয়ে দেখি লরিটা নেই। এতক্ষণ ধরে কেবল খুঁজছিলাম বাবা, কিন্তু কোথাও না পেয়ে—'

'সর্বনাশ। এখন উপায়?'

'থানায় খবর দিতে হবে বাবা, এক্ষুনি।'

'খেপেছিস! কী খবর দেব থানায়? পাওনাদারের ভয়ে রাত্রে লুকিয়ে আমরা পালাচ্ছিলাম? মুখে চুনকালির যে কিছু বাকি থাকবে না তাহলে। চল-চল, আমিও একবার দেখি—'

দেখা অবশ্য হল না, তার আগেই বাড়িওয়ালা এসে হাজির, বললেন, 'এ কী! ঘর টর সব অন্ধকার—এত রাতে যাচ্ছেনই বা কোথায়! আরে! ঘর যে খালি! জিনিসপত্র সব

গেল কোথায় আপনাদের?'

লুকোবার আর চেষ্টা করলেন না হরিমোহন, বুঝতে পারছিলেন করেও কিছু লাভ নেই। বললেন, 'দেখতেই তো পাচ্ছেন, জিনিসপত্র সব সরিয়ে ফেলেছি।'

'সরিয়ে ফেলেছেন! কেন?'

'এখানে থাকব না বলে! আমরা চলে যাচ্ছিলাম।'

'সেকী! আমাদের কিছু না বলে কয়ে? এটা কী ভালো হরিবাবু?'

'না, ভালো নয়, কিন্তু খবরটা আপনাকে দিলে কে?'

কথা শেষ হওয়ার আগেই ঝড়ের মতো কার্তিকের প্রবেশ, বললে, 'ব্যাপার কী ছোটমামা? এত রাতে আমাকে এমনি করে খবর পাঠানোর মানে?'

হরিমোহন অবাক হয়ে বললেন, 'আমি তোমায় খবর পাঠিয়েছি।'

'পাঠাননি! আপনার নাকি ভয়ানক জরুরি দরকার—রাত্রে না এলেই নয়। বড়সাহেবকে কে একথা বলে এসেছে জানি না, আমি বাড়ি ফিরতেই তিনি জোর করে আমায় পাঠিয়ে দিলেন।'

'কী জানি, আমার মাথায় তো কিছুই ঢুকছে না।'

'তাহলে! বড়সাহেব কী আমার সঙ্গে রসিকতা করলেন!'

'না করাই সম্ভব। কিন্তু তাঁর অনেক কথার মানে খুঁজতে না যাওয়াই ভালো। আমি অন্তত সেদিন যা শুনেছি—'

'ও, আপনিও শুনেছেন! বড়সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়েছে তাহলে?' কার্তিক ঠোঁট উলটে বললে, 'ওই এক রোগ হয়েছে বড়সাহেবের। একটু আবোল তাবোল বকেন। ওঁর ধারণা আপনাকে দেওয়ার নাম করে ওঁর কাছ থেকে আমি টাকা নিয়েছি। কী আজগুবি কথা ভাবুন তো!'

বিস্ময়ের পর বিস্ময়, যেন মাটি ফুঁড়ে হাজির হন শিবদাস আব নেপাল। নেপাল বলে, 'হ, বড়সাহেবের কথা তো আজগুবি! কিন্তু আমাগো দেওয়া টাকাটাও কী তাই? দুইশো টাকা যে হরিবাবুর জন্য আপনারে দিছি, সেটাও কি আমাগো ভুল ধারণা?

কার্তিক থতমত খেয়ে বললে, 'এ-এসব, মানে—আপনাবা—'

থামিয়ে দিয়ে হরিমোহন বললেন, 'আপনারা কার্তিককে দুশো টাকা দিয়েছেন?'

'কবে দিছি!'

'এসব আমাকে অপমান করার ষড়যন্ত্র'—কার্তিক সামলাবার উপায় না পেয়ে গলাবাজি শুরু করে দিল, 'এই জন্যেই মিথ্যে করে আমায় ডাকা হয়েছে! আমি বুঝেছি।'

চঞ্চল বললে, 'বুঝে থাকলে তোমার আর এখানে না দাঁড়ানো বুদ্ধিমানের কাজ কার্তিকদা। আর কোনওদিন এদিকে আসাটাও বোধহয় নিরাপদ হবে না।'

'যাচ্ছি, এখুনি বেরিয়ে যাচ্ছি আমি'—কার্তিক দ্রুত পায়ে চলে যেতে থাকে। নেপাল পথ আটকে বললে, 'আরে যান কোথায়। দুইশো টাকার কী হইবো?'

হরিমোহন হাত দিয়ে নেপালকে আটকান, বলেন, 'যেতে দিন নেপালবাবু, দুশো টাকা আমার আক্কেল সেলামি।'

নেপাল ওর ঘাড়ে হাত দিয়ে একটা জোর ধাক্কা দিয়ে বললে, 'চলেন, বাইর হওনের রাস্তাটা আপনারে দেখাইয়া দিই।'

হরিমোহন এবার ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন, বললেন, 'কার্তিককে আপনারাই ডেকে আনিয়েছিলেন। তার মানে—'

শিবদাস বললেন, 'হ, মানেটা ধরছেন ঠিক। কার্তিককে আমরা ডাকছি, মালের লরিও আমরাই সরাইছি।'

নেপাল বললে, 'আর বাড়িওয়ালা মশয়রেও আমরাই ডাইক্যা দিছি।'

বাড়িওয়ালা বলার চেষ্টা করছিলেন, 'আমার কিন্তু কোনও দোষ নেই মশাই।' তাঁকে থামিয়ে দিয়ে হরিমোহন বললেন, 'আপনারা এইসব কাণ্ড করেছেন! আবার বাহাদুরি করে বলতে এসেছেন এসব আপনারা করেছেন!'

শিবদাস বললেন, 'হ, করছি তো। আপনারে যাইতে দিমু না বইল্যা এসব করছি। বুঝলেন?'

'না, কিছুই বুঝলাম না।'

নেপাল বললে, 'বুঝবেন কেমনে! খালি নিজের মানটুকু ছাড়া অন্য কিছু বোঝেন? আপনি কেমন লোক মশয়! ঝগড়াই না হয় হইছিল, তাই বইল্যা কাউরে কিছু না কইয়া আপনি চইল্যা যাইবেন এ্যক্কেরে!'

শিবদাস বললেন, 'যামু কইলেই আমরা যাইতে দিমু? আপনার অহংকার আছে, আমাগো নাই? আমরা বিপদের দিনে আপনার কাছে হাত পাততে পাবি, আর আমাগো কিছু জানাইতে আপনার মাথা কাটা যায়। সুখ দুঃখ বিপদ-আপদের ভাগ দিবার জন্যই তো মানুষ মানুষের লগে থাকে। নাইলে বনবাসে থাকলেই পারত। এখান থিকা আপনার যাওয়া হইব না, বাস।'

'কিছুতেই না!' নেপাল হুঙ্কার দিয়ে উঠল।

এতক্ষণ স্তব্ধ হয়েই ছিলেন, এবার হরিমোহন বললেন, 'বলে তো দিলেন যাওয়া হবে না। কেন এমন ভাবে যাচ্ছিলাম সেটা জানেন? জানেন, আমার চাকরি নেই। জানেন, দু-মাস আমার বাড়িভাড়া বাকি!'

শিবদাস বললেন, 'সব জানি। বিপদ কী মানুষের হয় না! এক লগে পাশাপাশি আছি এতদিন। এক লগে থাইক্যাই দেখুম—তারপর যা হয় তা হইব।'

'হবে নয়, হয়েছে। এ বাড়িতে থাকলে কাল সকালে আর অপমানের শেষ থাকবে না। সে অপমানের পর বাঁচা-মরা সমান।'

নেপাল বললে, 'সেই আগাসাহেবের কথা ভাবতে আছেন? কাইল সকালে সে আর আইবো না।'

'আসবে না?'

'না।'

'আপনারা জানলেন কী করে?'

শিবদাস বললেন, 'যেইখান থিকা জাননের সেখান থিকাই জানছি। কার্তিক আপনারে টাকা দেয় নাই নইলে বুঝলাম কী কইর‍্যা?'

'আগাসাহেব আসবে না! তার মানে, তা হলে আপনারা—'

যশোদা ঢোকেন তরলাকে নিয়ে, তার পেছনে প্রমীলা। যশোদা বলেন, 'এসব কথা তোমাগো পরে ভাবলেও চলব। অহন মালপত্র আবার তুইল্যা থুইতে সময় লাগবো তো! ততক্ষণ শিবুর বাড়িতে বসবা চল, খাড়াইয়া থাকবা কতক্ষণ!'

হরিমোহন বললে, 'তার মানে আপনিও এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছেন?'

'আছে মানে!' নেপাল বললে, 'মালের লরি সরাইবার পরামর্শ দিছে কেডা!'

'দাঁড়ান, দিদি দাঁড়ান'—হরিমোহনের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছিল, বললেন, 'মনে-মনে

বজ্জো [illegible] ছিল, কারো কাছে মাথা নোয়াইনি, কিন্তু আজ আপনাকে একটা প্রণাম করব—'

'না না—সে কী কথা—'

'আর কিছু নাই হন, বয়সে তো বড় আপনি'—হরিমোহন নিচু হয়ে প্রণাম করে।

যশোদা বললেন, 'কী আশীর্বাদ করুম ভাই! তোমার উঁচু মাথা চিরকাল যেন উঁচুই থাকে, এই আশীর্বাদই করি। অখন চল দেখি, রান্নাবান্না সব হইয়া গেছে।'

মনোরমা একেবারে নির্বাক হয়ে গিয়েছিল, এবার মুখ ফুটল ওর, বললে, 'রান্না!'

'হ, রান্না। লুকাইয়া যাওনের তাড়ায় সন্ধ্যা থিকা যে তোমাগোর চুলায় আচ পড়ে নাই, সে খবর কী আর রাখি না মনে কর? আসো।'

এ সময়ে, কথা বলা যায় না, সকলেই যেতে থাকে, চঞ্চল নড়ে না। নেপাল বললে, 'কি চঞ্চল, তুমি আইবা না?'

'নাঃ অন্তত একজন তো থাকা দরকার।'

'কিয়ের লাইগ্যা? বাড়ি তো খালি। পাহারা দিবাটা কী? আসো-আসো—'

যশোদা আর একবার হাঁক দিলেন, 'আসো তোমরা সকলে।'

তরলা, মনোরমা, যশোদা ওবাড়ি চলে যান। রিনি আর নানু পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে, দেখা যায়। যেতে-যেতে নেপাল বললে, 'খাইতে তো ডাকে, রান্না আইজ খাইতে পারলে হয়। রানছে কে সেটা জান কী?'

প্রমীলা বললে, 'ভালো হচ্ছে না নেপাল মামা।'

নেপাল বলল, 'আহা, রাগ করস ক্যান! রান্না একবার খাইয়াই দেখুক না।'

প্রমীলা চঞ্চলের দিকে চেয়ে ছিল, বললে, 'কী খাবেন, চিংড়ি না ইলিশ?'

মাঝখানেই নেপালের চিৎকার, 'চিংড়ি ইলিশ দুইই রানছস্ নাকি? খাইছে!'

বাড়িওয়ালা একটু অন্যমনস্ক ছিলেন, বললেন, 'ইলিশের কথা কী বলছিলেন নেপালবাবু?'

'কওনের কিছু নাই, ভিতরে পাতা বিছানই আছে—বয়্যা পড়েন।'

বাড়িওয়ালা কাল বিলম্ব করেন না। প্রমীলা চঞ্চলকে বললে, 'কথার জবাব কিন্তু পেলাম না, কী খাবেন?'

চঞ্চলের মনের ভার একেবারেই কেটে যাচ্ছিল, চোখে চোখ রেখে বলল, 'ইলিশ।'

নেপাল বললে, 'তুমি ইলিশ; খাইছে! আমি তাইলে চিংড়ি!'

সকলে হেসে ওঠে, রিনি বলে, 'নেপালমামা, কাল কিন্তু রেডিও আনতে হবে।'

'ক্যান।'

'কাল আবার খেলা যে—ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের!'

'আবার ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান!' নেপাল মুখখানা সার্কাসের জোকারের মতো করে বলল, 'খাইছে!'

ডাকিনীর চর

অলকা থিয়েটারের সাজঘরে মেক-আপ নিচ্ছিল ইলা। ঠোঁটে আর ভুরুতে রঙের তুলি বুলোতে-বুলোতে নিজের কথা, পরিবারের অভাব-অনটন, এমনি কত শত কথাই না ভিড় করে আসছিল তার মনে। শৌখিন দলের অভিনয়ে আজ স্টেজে নামবে ইলা। টাকা চাই তার—জীবনধারণের জন্যে রসদ। বাঁচতে হবে তাকে—নিজের পায়ে ভর করে।

অতুল তার দাদার বন্ধু। সে বলে, 'জাত খুইয়েছ অথচ পেটও ভরছে না। কী পাচ্ছ ওই অ্যামেচার ক্লাবে যোগ দিয়ে?'

দ্বিজেনও অতুলের সঙ্গে এ-বিষয়ে এক মত। মেক-আপ রুমে বসে সে-কথাই ভাবছে ইলা। বড়লোক অতুল অনবরত করুণা দেখিয়ে আসছে ইলাদের আর তার দাদা হাত পেতে নিচ্ছে বন্ধুর করুণার দান। কিন্তু অন্যের করুণায় বেঁচে থাকার মধ্যে যে লজ্জা ও গ্লানি লুকিয়ে আছে—এই সাদা কথাটা বুঝতে চান না তার দাদা।

সুন্দর, পাতলা ঠোঁটে রং মাখতে-মাখতে ভাবছে ইলা। একটু পরেই ঘণ্টা বাজবে। পরদা উঠবে মন্থর ছন্দে। শুরু হবে বিচিত্র রঙের আলোর খেলা। প্রথমেই তার নাচ দিয়ে অভিনয় শুরু। দেহ-ভঙ্গির বিচিত্র লীলায় সে চেষ্টা করবে দর্শকদের মন হরণ করতে। একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাসও বেরিয়ে আসে ইলার বুক থেকে।

এদিকে অতুল এসে হাজির হয়েছে সাজঘরেব কাছে। সে এদিক-ওদিক চেয়ে দেখছিল। বুঝতে চেষ্টা করছিল এখানকার পরিবেশটা।

লোকজন যাতায়াত করছিল—দলের লোকজন। একজন—হযতো শৌখিন অভিনয়-দলের কোনও কর্তা ব্যক্তি, অতুলের দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তাবপর জিগ্যেস কঁবলেন, 'আপনার—মানে আপনি.. ?'

অতুল একটুখানি প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গেব সুরে জবাব দিল, 'হ্যাঁ আমি। তবে আপনাদেব দলেব লোক নই।'

'কাউকে খুঁজছেন কি?'

'তা না হলে কি শখ করে আপনাদের এখানে এসেছি মনে করেন? আপনাদেব প্রধান নায়িকা—মানে ইলা দেবীব সাজের ঘর কোনটা বলতে পাবেন?'

ভদ্রলোক ইলার সাজঘরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, 'ওই যে সাজঘর। কিন্তু এখন তো তিনি মেক-আপ নিচ্ছেন।'

'বটে! তার কোনটা মেক-আপ আর কোনটা আসল চেহারা সেটাই দেখতে চাই।' এই বলেই অতুল হনহন করে সাজঘরের দিকে এগিয়ে গেল। ভদ্রলোক হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। কী চোখা-চোখা কথা এই দর্শনার্থী ভদ্রপুঙ্গবের—ইলা দেবীর সঙ্গে ওব কী এমন নিগূঢ় সম্পর্ক যে তাকে নিয়ে এমন ভাবে কথা বলেন? আসল আর নকল!

ইলা অবশ্য এতটা আশা করেনি যে অতুল এখান পর্যন্ত ধাওয়া করবে। শৌখিন থিয়েটারে নেমে জীবিকা অর্জনের চেষ্টাকে কোনওদিনই সুনজরে দেখেনি অতুল। সে বার-বার নানাভাবে ইলাকে বুঝিয়েছে, দ্বিজেনকে বলেছে। বেশ তো—ইলারা একদিন বড়লোক ছিল—আজ অবস্থা-বিপর্যয় ঘটেছে, সংসার চালাতে কষ্ট হচ্ছে। কুছ পরোয়া নেই। অতুল তো রয়েছে—এই পরিবারের অকৃত্রিম শুভানুধ্যায়ী—দ্বিজেনের অকপট বন্ধু।

পায়ের শব্দ শুনে অতুলকে দেখে বিস্মিত না হয়ে পারে না ইলা। ভাবটা যেন এই—*এখানে এসেও তোমার উপদেশ থেকে নিস্তার নেই হে প্রভু।*

মনের ভাব গোপন করে বললে, 'কে? ও, আপনি!'

অতুল বললে, 'খুব অবাক হলে নাকি?'

'না, জানতাম আপনি আসতে পারেন।'

'হাঁ, তোমার এমন নাচ দেখবার প্রলোভন জয় করব এমন মনের জোর আমার নেই।'

'বিদ্রুপ আপনি করতে পারেন। কিন্তু আমাব মত তাতে বদলাবে না।'

'মত তোমার কিছুতেই বদলাবে না জানি। কিন্তু কেন তোমার এ জেদ বলতে পারো? আমার আপত্তি, অনুরোধ কিছুরই কি তোমার কাছে কোনও দাম নেই?'

'নেই কে বলছে? কিন্তু আমার আত্মসম্মানের দাম এর চেয়ে ঢের বেশি।'

'আত্মসম্মান! এই নাচেব দলে নামলেও সে আত্মসম্মান থাকে?'

'থাকে। কারোর অনুগ্রহের ভরসায় থাকার চেয়ে এ ঢের সম্মানের।'

'এ যুক্তি তোমার অনেকবার শুনেছি। কিন্তু তুমি অনুগ্রহ বলছ কাকে? বিপদের সময়ে তোমার দাদাকে আমি কিছু ধার দিয়েছি, তার নাম অনুগ্রহ?'

'যা শোধ করবার ক্ষমতা নেই, অনুগ্রহের চেয়েও খারাপ নাম তার আছে।'

মঞ্চের ঘণ্টা বেজে উঠল। এবার শিল্পীদের নিয়ে মঞ্চে দাঁড়াতে হবে। আর কথা বলবার সময় নেই ইলার। আব এ ব্যাপারে অতুলের সঙ্গে কথা কাটাকাটির প্রবৃত্তিও নেই তার। ধনীর দুলাল অতুল বুঝবে না দরিদ্রের কাছে পরানুগ্রহেব কী জ্বালা! অথবা বুঝেও বুঝতে চাইবে না। অনুগ্রহ করা ওই শ্রেণীর লোকদের একটা বিলাস, তাতে তারা প্রচুর আত্মপ্রসাদ অনুভব করে।

ঘণ্টা শুনেই ইলা বলল, 'মাপ করবেন, আমার আর সময় নেই।'

কিছুটা আঘাত পেল অতুল। তার কণ্ঠে তীব্রতা। সে বলল, 'তোমার সময় আমি আর নষ্ট করব না। ভয় নেই। শুধু একটা শেষ কথা বলে যাই। শুনেছি এককালে তোমরা বড়লোক ছিলে। সেদিন যা মানাত আজ যে মানায় না, শুধু এইটুকু বোধহয় তুমি জানো না।'

'ভালো করেই জানি। কিন্তু অবস্থায় ছোট হয়েছি বলে মনেও ছোট হব—এইটাই কি আপনি চান?'

ক্রোধে আরক্ত হয়ে উঠল অতুলের মুখখানি। সে বলল, 'বেশ, বড় হয়েই থাকো তুমি। আমার আর কিছু বলবার নেই।'

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল অতুল। তার গমন-পথের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল ইলা। দাম্ভিক সম্পদশালী অতুল উপদেশ দিয়ে গেল। এই নাচের দলে নামলেও আত্মসম্মান থাকে। চরম উপহাস করে গেল সে অহঙ্কারের কথা নিয়ে।

কিন্তু? ওদিকে আহ্বান আসছে রঙ্গমঞ্চ থেকে। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে দর্শক জনতা। এদিকে? সত্যই কি এ-বৃত্তি তার পক্ষে খুব আত্মসম্মানের? শিল্পী সে। শিল্পের সম্মান আছে, আদর আছে, থাকা উচিত। কিন্তু আমাদের বর্তমান দর্শক সমাজে শিল্পরসবোধ নিয়ে ক'জন আসে নৃত্যের আসরে? অগণিত চোখ কি রূপসী নারীর অপরূপ ভঙ্গির দিকে শুধু কামনার দৃষ্টি নিয়েই তাকিয়ে থাকে না?

বাইরে অতুলের জন্যে অপেক্ষা করছিল দ্বিজেন। অতুলের গম্ভীর আরক্ত মুখের দিকে চেয়েই বুঝতে পারল, সে ব্যর্থ হয়েই ফিরে এসেছে ইলার কাছ থেকে। একথা জানত দ্বিজেন। নিজের বোনকে সে অন্যের চেয়ে অনেক বেশি জানে।

দ্বিজেন বলল, 'ইলার কাছে গেছলে? কিছুতেই কথা শুনলে না তো?'

'না, আমি নাকি তোমাদের অনুগ্রহ করেছি। সে-অনুগ্রহ ইলা নিতে চায় না। তার জন্যে নাচের দলে নামতে তার আপত্তি নেই।'

'কী বলব বল? আমি অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছি। ছেলেবেলায় আদর দিয়ে ওর মাথাটি খাওয়া হয়েছে। এখন তাই যেমনি অবুঝ তেমনি জেদি। যা ধরবে, তা থেকে নড়ায় কার সাধ্য!'

'নড়াবার দরকার কী? তার মতো অন্য লোকেরও জেদ থাকতে পারে?'

'আমার ওপর কিন্তু রাগ কোরো না ভাই। আমাকে ভুল বুঝো না।'

অতুল তার গম্ভীর মুখে এবার হাসি ফুটিয়ে তুলল। প্রীতিভরে বন্ধু দ্বিজেনের পিঠে হাতের মৃদু আঘাত করে বলল, 'আরে না, তোমায় ভুল বুঝব কেন? বন্ধুত্ব আমার কাছে এত ঠুনকো জিনিস নয় দ্বিজেন।'

অতুল পা বাড়াল এবার। দ্বিজেন প্রশ্ন করল, 'তুমি কি চলে যাচ্ছ?'

অতুল আবার হাসল, 'না, যাব কোথায়? টিকিট কিনে ঢুকেছি, পুরোপুরিই সব দেখে যাব। এস—'

দুজনে হাত ধরাধরি করে গিয়ে প্রবেশ করল রঙ্গালয়ে।

দুই

সেদিন রঙ্গালয়ের দর্শকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল একটা আকস্মিক উত্তেজনা। ইলা দেবী মঞ্চে অবতরণ করবেন না। শেষ মুহূর্তে ইলার এই সিদ্ধান্তে বিস্মিত হতভম্ব হয়ে পড়লেন প্রযোজক।

আর অসময়েই নিজের মেক-আপ ব্যাগ হাতে নিয়ে ইলাব প্রত্যাবর্তন বিস্মিত করে দিল তাদের ঝি মোক্ষদাকে। মোক্ষদা একটুখানি আয়াস করছিল। জানত ইলা আসবে অন্তত আবও ঘণ্টা দুই পরে। দ্বিজেনেরও ফিরতে দেবি হবে। নিজেই এখন কিছু সময়ের জন্যে সে নিজের কর্ত্রী। কারও আদেশ পালন কবতে হবে না। মন জোগাবাব জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকতে হবে না। কিন্তু তা হওয়াব নয়। অপ্রত্যাশিত ভাবেই এসে ঝড়ের বেগে উপস্থিত হল ইলা।

ছোড়দিদিমণিকে প্রশ্ন করল মোক্ষদা, 'এরই মধ্যে থ্যাটার শেষ হয়ে গেল ছোড়দিদিমণি?' অথবা ছোড়দিদিমণির শরীব-টরিব খারাপ হয়েছে? নইলে এমন ভাবে এখনই ফিরে আসা? অল্প কথায়ই নিরস্ত করল ইলা মোক্ষদাকে। অসুখ বিসুখ কিছুই হয়নি তার, ভালো লাগেনি তাই সে চলে এসেছে। মোক্ষদারও কৌতূহল আছে। কেন এভাবে চলে আসা? অসুখ নয়, বিসুখ নয়, ভালো লাগল না শুধু? কিন্তু আর প্রশ্ন করবার সাহস কোথায় মোক্ষদার! প্রশ্ন করলেও হয়তো উত্তরই দেবে না ইলা।

দ্বিজেন ফিরে এল কিছুক্ষণের মধ্যেই। সে বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল ইলাকে, 'কী, ব্যাপার কী ইলা? হঠাৎ নাচে না নেমে চলে এলি যে?'

ইলা একটুখানি ব্যঙ্গমিশ্রিত কৌতুকের সুরে জবাব দিল, 'তোমাদের তো তাতে খুশি হওয়াই উচিত। তুমি আর তোমার বন্ধু যা চেয়েছিলে তাই তো করেছি।'

'এটা তো রাগের কথা মনে হচ্ছে। কিন্তু আমরা সত্যিই অন্যায় কি বলেছি কিছু?'

'অন্যায় হয়তো বলোনি। কিন্তু নাচের দলে না নামলেও একটা কিছু করতে হবে তো! বন্ধুর কাছে ধার করে চিরদিন তো সংসার চলবে না।'

কিছুটা ক্ষুব্ধ হল দ্বিজেন। বারবারই ইলা তাকে ওই ধারের কথা শোনাচ্ছে। এর মধ্যে তার অকর্মণ্যতার প্রতিও একটা ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন রয়েছে। সে নিজে উপার্জন করে দুজনের সংসারটাও চালাতে পারে না। আহত কণ্ঠে বললে দ্বিজেন, 'অতুলের কাছে সামান্য ক'টা টাকা ধরে করেছি বলে তুই অনবরত এই খোঁচাই দিস। কিন্তু বন্ধু থাকলে দরকারের সময় মানুষ ধার নেয়। কোনও দিকে কোনও উপায় যদি থাকত।'

'একটা উপায় তো অন্তত আমাদের হাতে আছে?'

'সেটা কী?'

'এখন না হয় নাই জানলে। ভয় নেই দাদা, নাচের দলে আর আমি নামব না।'

'বেশ তোর যা মনে হয় কর। আমার আর কিছুই বলবার নেই।'

বলবার নেই বলল সত্য, কিন্তু তারপর নিজের আর্থিক সমস্যার সাময়িক সমাধানের জন্যে ইলা যা করল তা দ্বিজেন সমর্থনও করতে পারল না। এককালে সম্পদশালী অভিজাত ছিল তারা। কত বিচিত্র পুরোনো জিনিসে সজ্জিত ছিল তাদের বাড়ি। লোকে দেখত, প্রশ্ন করত কোথা থেকে সংগৃহীত হল এসব জিনিস! সবাই কৌতূহলী মন নিয়ে খুঁটিয়ে দেখত সব, প্রশংসা করত। আজও রয়েছে সেগুলো এবাড়ির এখানে-ওখানে ছড়িয়ে। অনাদরে পড়ে থাকলেও ও-জিনিসকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয় দ্বিজেনের পক্ষে। অভিজাত বংশের উত্তরাধিকারী দ্বিজেন। আজ সেসব পুরোনো জিনিসগুলোই বিক্রি করে দিচ্ছে ইলা। শুধু কিছু অর্থের বিনিময়ে সেগুলোকে বিদায় করে দিচ্ছে।

কিন্তু ইলাকে কিছু বলে লাভ নেই। কারণ তা সে শুনবে না। এমনি একগুঁয়ে জেদি ইলা। অভিমানভরে দ্বিজেন ভাবে ইলা একদিন না একদিন এ ঘরের মায়া কাটিয়ে চলে যাবেই। সে নতুন ঘর বাঁধবে, নিজের ঘর। সেদিন পৈত্রিক সম্পদের কথা হয়তো মনেই থাকবে না তার। তবু দ্বিজেন এমন করে ইলার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সেকথা বলতে পারে না। সে সাহস নেই দ্বিজেনের।

গম্ভীর কালো মুখে ড্রয়িংরুমে বসেছিল দ্বিজেন। ইলা এসে প্রবেশ করল সেখানে। দাদাকে গম্ভীর দেখে প্রশ্ন করল, 'কী দাদা, এখনও রাগ করে আছ?'

'না, রাগ আর কী করব! তুমি এখন বড় হয়েছ। আমার মতেই তোমাকে চলতে হবে এমন তো কোন কথা নেই।'

'এটা তো রাগেরই কথা হল দাদা। কিন্তু সত্যি আমি অন্যায় কি কিছু করেছি? ক'টা বাজে পুরোনো জিনিস বাড়িতে পচছিল সেগুলো বিক্রি করবার ব্যবস্থা করেছি মাত্র। সেটা কি এমন অন্যায়!'

'বিক্রি করা অন্যায় তো আমি বলছি না। কিন্তু তাতে লাভটা কী? ওই ক'টা জিনিস বিক্রি করে কি আমাদের সমস্যা মিটবে? এক-এক করে তো বাড়ির সব আসবাবপত্রও তাহলে বিক্রি করতে হবে।'

'তা হয় হবে। অন্য কোনও উপায় যদি না জোটে তাহলে অন্তত এইভাবেই যতদিন চলে চলুক।'

'আমার তাতে বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি নেই। ভাবনা শুধু তোর জন্যে। এ দুঃখ কষ্ট মিছিমিছি তোর সইবার দরকার কী?'

'না সয়ে কী করব বল? চাকরি-বাকরি তো চাইলেই পাওয়া যায় না? যা-ও একটা কাজ করতে গেলাম, তোমাদের জ্বালায় তাও ছাড়তে হল। এখন আমি কী করতে পারি

বলো?'

'সব মেয়েই খুশি মনে যা করে তাই।'

'ও, বিয়ে।'

ইলার কণ্ঠস্বর দৃঢ় কঠোর হয়ে এল। সে বলল, 'কিন্তু তুমি যা ভাবছ, তা হয় না দাদা। অতুলবাবু অনেক টাকা তোমাকে ধার দিয়েছেন জানি। কিন্তু সেই ঋণের দায়ে নিলেম হতে পারব না আমি।'

রাগ হল দ্বিজেনের। তাকে কী ভাবে ইলা? সে উত্তর দিল, 'আমি কি এতই নীচ যে নিজের দায়ে তোকে নিলেম করে দিতে চাইছি? এই তাহলে তোর ধারণা? অতুল একান্তই অপাত্র, এই কি তুই বলতে চাস?'

'রাগ কোরো না দাদা। কথাটা আমার এভাবে বলা হয়তো অন্যায় হয়েছে। কিন্তু যত সুপাত্রই হোন, অতুলবাবুর মতো বড়লোকের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কখনও সম্মানের হতে পারে না।'

'কেন পারে না? ওদের টাকাই না হয় বেশি আছে। কিন্তু আমরাই বা ছোট কীসে? বংশমর্যাদার কোনও দামই কি নেই?'

ইলা এবার হাসল, 'পয়সা না থাকলে বংশমর্যাদা আজকের দিনে উপহাসের জিনিস।'

দ্বিজেনকে স্বীকার করে নিতে হচ্ছে এ উক্তি। অর্থই আধুনিক জগতের প্রধান মর্যাদা। পদে-পদেই এ অভিজ্ঞতা অর্জন করছে সে। দ্বিজেন তাই গম্ভীরকণ্ঠে বলল, 'হুঁ, তা ঠিক বলেছিস। কিন্তু চিরকালই কি এমনি যাবে মনে করিস? সেই উপহাসের জবাব কি একদিন না একদিন দিতে পারব না?'

তরল কণ্ঠে বলল ইলা, 'পারবে নাই বা কেন? শুধু রাস্তাটা পেলেই হয়।'

'রাস্তা তো তুই বার করেই ফেলেছিস। বাড়িতে যা কিছু আছে এক-এক করে বিক্রি করা। আচ্ছা, প্রথম কিস্তিটাই দেখি, কত কী লাভ করে আসিস।'

'বেশ তো তাই দেখে তারপর যা বলার বল।'

অবশেষে ভাইবোনের বিরোধটা আর রইল না। দুজনেরই মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠল।

তিন

ক্যালকাটা মার্ট। সেখানে সস্তা দরে নানারকম জিনিসপত্র কেনা হয়। আবার নীলামে বিক্রি করে তারা। পুরোনো জিনিস নিয়ে এসে ভিড় করে বিক্রেতারা ক্যালকাটা মার্টে। আবার ক্রেতাদেরও ভিড় কম নয়। হোক না পুরোনো, অনেক সময় সস্তাদরে ভালো জিনিসও পাওয়া যায়। অভাবগ্রস্ত মানুষ সেখানে আসে জিনিস বিক্রি করতে আবার তেমনি অভাবগ্রস্তরাই আসে প্রধানত সস্তা দরে যে করেই হোক নিজেদের চাহিদা মেটাবার তাগিদে। আবার একদল পুরোনো ঐতিহাসিক জিনিসপত্র সংগ্রহের বাতিকগ্রস্ত লোকও আসেন সেখানে। তাঁরা খুঁজে দুষ্প্রাপ্য দুর্মূল্য সব জিনিস সংগ্রহ করে নিজেদের কিউরিও সাজাতে চান।

ক্যালকাটা মার্টের মালিক হরিসাধন মান্না কাউন্টারের কাছে নিজের চেয়ারখানি দখল করে বসে আছে। দৃষ্টি তার চশমার ফাঁক দিয়ে সম্মুখে প্রসারিত। ওদিকে কান দুটো সজাগ হয়ে আছে পশ্চাৎদিকে। হল জুড়ে যেমন জিনিসপত্রের ছড়াছড়ি তেমনি ক্রেতাদেরও হট্টগোল। দাম হাঁকছে হরিসাধনের লোক। ক্রেতারা প্রতিযোগিতা করছে। হরিসাধন একা দুদিক সামলাচ্ছে। ক্রেতা-বিক্রেতা দু-দলকে কথায়, হাসিতে তার সন্তুষ্ট করতে হবে। অভিজ্ঞ

ব্যবসায়ী হরিসাধন মান্না। এ ব্যবসায়ে সে চুল পাকিয়েছে। এখানে বসে-বসেই সে দেখেছে কত ঐশ্বর্যের উবে যাওয়া, কত নতুন বিলাসী অভিজাতের জন্ম।

একজন ক্রেতাকে বিদায় করছিল তখন হরিসাধন মান্না। ইলা এসে উপস্থিত হল সেখানে। বাঁকা দৃষ্টিতে চাইল একবার হরিসাধন। তারপর সে রসিদ লেখায় মনোযোগ দিল। রসিদ শেষ করে সে ক্রেতার হাতে তুলে দিল।

ক্রেতাটি বলল, 'মালগুলো তাহলে আজ বিকেলেই পৌঁছাবে তো?'

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল হরিসাধন, 'নিশ্চয়।'

ক্রেতাটি সেখান থেকে সরে যেতেই কাউন্টারের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াল ইলা। জিজ্ঞাসা করল, 'আমার জিনিসগুলো দেখে দাম কষে রেখেছেন?'

হরিসাধন একখানি তালিকা ইলার হাতে দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, এই আপনার লিস্ট। আমরা যে দামে যে জিনিস নিতে পারি সবই লেখা আছে।'

ইলা বলল তালিকার ওপর চোখ বুলিয়ে, 'দাম তো খুব কমই ধরেছেন।'

যেন আকাশ থেকে পড়ল হরিসাধন মান্না, 'কম? এর চেয়ে বেশি কোথাও পেলে চেষ্টা করে দেখতে পারেন।'

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ইলা। তারপর বলল, 'হুঁ, আমার গরজটা ঠিকই বুঝেছেন। কিন্তু আসল জিনিসটাই বাদ দিয়েছেন যে?'

হরিসাধন একটা কাগজে মোড়া জিনিস ইলার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'আপনার কাছে আসল বলে আমাদের কাছেও হবে তার কি কিছু মানে আছে?'

'But don't you deal in curios and things of historical interest- এ বস্তুটার ঐতিহাসিক মূল্য যে অনেকখানি।' ইলা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললে।

'Of course, we do. কিন্তু এ জিনিসটার ঐতিহাসিক মূল্যটা কী বুঝিয়ে দিতে পারেন?'

'ঠিক হয়তো পারি না। কিন্তু এটা আমাদের পরিবারে অন্তত চারশো বছর ধরে আছে। শুনেছি হার্মাদ মানে পর্তুগিজ জলদস্যুরা যখন এদেশে হানা দিয়ে ফিরত, এ তখনকার জিনিস। আমাদের এক পূর্বপুরুষ লড়াইয়ে হার্মাদকে মেরে নাকি এটা পেয়েছিলেন।'

'হতে পারে আপনি যা বলেছেন সবই ঠিক। কিন্তু আপাতত এই চামড়ার দামটুকুও কেউ দেবে কী না সন্দেহ।'

হঠাৎ অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরাল হরিসাধন মান্না। ওইদিকে চেয়ে বলে উঠল, 'হ্যালো, হ্যালো প্রফেসার, এরই মধ্যে চলে যাচ্ছেন যে।'

প্রফেসারটি বেরিয়ে এলেন হলঘর থেকে। বিচিত্র চেহারার লোক তিনি। মাথার টুপিটা হাতে নিলেই দেখা যায়, গোটা মাথাটা জুড়ে প্রকাণ্ড একটা টাক। অতি যত্নে যেন মাথার চুলগুলো উজাড় করে তুলে নেওয়া হয়েছে। মুখখানি এমনই, সবসময়েই যেন দুনিয়াটাকে নস্যাৎ করবার জন্যে নাক উঁচিয়ে আছে। গাল দুটো ভাঙা, চোখ দুটো অবিরাম মিটমিট করে জ্বলছে চোখের পুরু পাতা দুখানির নিচে। গায়ে তাঁর ধূসর রঙের লঙকোট, পরনে প্যান্ট, হাতে লাঠি। সবদিক দিয়েই অদ্ভুত মনে হল লোকটিকে ইলার।

হরিসাধনের প্রশ্নের উত্তরে প্রফেসার বললেন, 'না গিয়ে করব কী! আলমারি-টেবিল খুঁজতে তো এখানে আসিনি।' থেমে-থেমে জোর দিয়ে কথাগুলো বললেন প্রফেসার। এই-ই তার কথা বলার ধরন।

হরিসাধন বিনয়ে গলে পড়ে বলল, 'না, না, তা আসবেন কেন? কিন্তু আপনার পছন্দ হওয়ার মতো কতকগুলো Rare collections তো আছে স্যার।'

'হ্যাঁ, আছে। বাজে মেকি সব মাল। এখানে এখনও ওসব ফাঁকি চলে। আমি যাদের সঙ্গে কারবার করি তারা এত সস্তা-নকলে ভোলে না।'

লাঠি ঠুকে-ঠুকে চলে যাচ্ছিলেন প্রফেসার।

হরিসাধন ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলল, 'দাঁড়ান প্রফেসার। আপনাকে পেয়ে ভালোই হল। এ জিনিসটা অনুগ্রহ করে একটু দেখে দেবেন?'

হরিসাধন ইলার সেই কাগজের প্যাকেটটা খুলে ধরল প্রফেসারের সম্মুখে। সেটা একটা চামড়ার কবজিবন্ধ।

ইলা রুষ্ট হয়ে বলল, 'আপনি নিতে না চান নেবেন না। দুনিয়াসুদ্ধ লোককে দেখাবার তো কোনও দরকার নেই।'

ততক্ষণে প্রফেসার তাঁর অদ্ভুত ভঙ্গিতে নাড়াচাড়া করে একটা গভীর তাচ্ছিল্যের মুখভঙ্গি করে কবজিবন্ধটাকে খুঁটিয়ে দেখছিলেন। হঠাৎ ক্ষণেকের জন্যে তাঁর দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

হরিসাধন ইলার মন্তব্যের প্রতিবাদে বলছিল, 'কাকে দেখাচ্ছি জানলে একথা বোধহয় বলতেন না। ইনি শুধু যে এই কারবারই করেন তা নয়, এসব বিষয়ে এঁর চেয়ে পণ্ডিত আর ক'জন আছেন আমার অন্তত জানা নেই। কিছু মনে করবেন না প্রফেসার। সত্যি জিনিসটার কোনও দাম হতে পারে কী না দেখুন তো?'

প্রফেসারের চোখে যে ক্ষণিক বিস্ময়ের আভাস ফুটে উঠেছিল, তা কখন অন্তর্হিত হয়ে গেছে। তিনি আবার অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভবে কবজিবন্ধটাকে উলটে-পালটে দেখছেন। একটা অনুকম্পা যেন অনুভব করছেন তিনি। এই এঁকটুকরো চামড়াকে খুব দামি জিনিস মনে করে বিক্রি করতে নিযে এসেছে মেয়েটা। ইলার দিকেও মিটমিট করে দু-একবার চেয়ে নিয়েছেন। এবার তিনি কবজিবন্ধটা টেবিলের ওপর রেখে দিলেন।

প্রফেসার তাঁর স্বাভাবিক ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলেন ইলাকে, 'এ জিনিস আপনি বিক্রি করছেন কেন?'

ইলা অমনি রেগে আছে প্রফেসারের ওপব। যেমন অদ্ভুত তাঁর চেহারা ছবি, তেমনি বিচিত্র তাঁর কথা বলার ভঙ্গি। সে বলল, 'কেন করছি তাতে আপনার কী দরকার? জিনিসটা আপনি কী বোঝেন তাই বলুন।'

প্রফেসার বললেন, 'A very spirited reply, I must say. কিন্তু আপনাকে নিরাশ করতে হচ্ছে বলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। এ জিনিসের কোনও মূল্য আছে বলে আমার মনে হয় না।'

সারা মুখে হেসে উঠল হরিসাধন মান্না, 'কেমন, আমিও তাই বলেছিলাম কি না। তবু আপনার খাতিরে সামান্য পাঁচ-দশটাকা না হয় দিতে পারি।'

প্রফেসার ঠোঁট বাঁকিয়ে বললেন, 'সেটাও মিথ্যে অপব্যয় হবে। তবে যদি অনুগ্রহ করতে চান'...তাকালেন প্রফেসার ইলার দিকে।

ঝঙ্কার দিয়ে উঠল ইলা, 'অনুগ্রহে আমার দরকার নেই।'

সে কবজিবন্ধটা আবার কাগজে মুড়ে নিতে-নিতে বলল, 'লিস্টে যা আছে সেগুলোর দাম দেবেন, না, ফিরিয়ে নিয়ে যাব?'

হরিসাধন বলল, 'না, না সেগুলো নিয়ে যাবেন কেন? এই যে এক্ষুনি দাম চুকিয়ে দিচ্ছি।' সে ড্রয়ার টেনে চেক বুক বের করল।

প্রফেসার বললেন, 'আচ্ছা, আমি এখন আসি। নমস্কার।'

হরিসাধনও দুহাত কপালে ঠেকিয়ে বলল, 'নমস্কার।' সে চেক লিখতে আরম্ভ করল।

ইলা লাঠি ঠুকে-ঠুকে চলা প্রফেসারের দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। সত্যি চেয়ে থাকবার মতো লোকই বটে! এরকম লোক সহজে চোখে পড়ে না।

ক্যালকাটা মার্ট থেকে বেরিয়ে এসে প্রফেসার হঠাৎ রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়লেন। পেছনে ফিরে তাকিয়ে একবার কী যেন চিন্তা করলেন তিনি। তারপরই কাছে একটি পুরোনো বইয়ের দোকানে গিয়ে দাঁড়ালেন। দোকানদার তখন আর বইগুলো সাজিয়ে তাক করে রাখছে। প্রফেসার সে দোকানের কাছে গিয়ে পুরোনো বইয়ের স্তূপ থেকে এটা-ওটা বেছে নিয়ে পাতা ওলটাতে লাগলেন। দোকানদার শশাঙ্ক দাস বারবার চাইছিল প্রফেসারের দিকে। তার মনে ধারণা হল, হয়তো বা ইনি একজন ভালো খদ্দেরই হবেন।

শশাঙ্ক জিজ্ঞাসা করল, 'ভালো ডাক্তারি বই আছে। দেখাব স্যার?'

প্রফেসারের সদাক্লিষ্ট মুখে একটুখানি হাসি ফুটে উঠল, 'ডাক্তারি বই দরকার কী করে বুঝলে?'

আপ্যায়নের বিগলিত ভঙ্গিতে বলল শশাঙ্ক, 'আজ্ঞে তা আর বুঝব না? ও চেহারা দেখেই চিনতে পাবি। এমনি লোক চিনতে না পারলে ব্যবসা চলে?'

প্রফেসার উত্তরে কৌতুকভরে কী বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু বগলে আর হাতে কয়েকখানি বই নিয়ে ষন্ডাগুন্ডা ধরনের একটি লোক এসে সেখানে উপস্থিত হতে দেখে তিনি আর কিছু না বলে তার দিকেই চেয়ে রইলেন। শশাঙ্কর খুবই পরিচিত লোকটি। নাম তার গোকুল। প্রফেসার দেখছেন আব মনে-মনে ভাবছেন, কোন গোকুলে থেকে এই গোকুল-চন্দ্রটি বেড়ে উঠছেন, কে জানে। কৌতূহলী হয়ে উঠলেন তিনি।

গোকুল বই নিয়ে এসেছে, তক্ষুনি শশাঙ্ককে দশটা টাকা দিতে হবে। দাম দস্তুর নয়, উপরোধ-অনুরোধ নয়, কড়া হুকুম গোকুলের। কিন্তু শশাঙ্ক পুরোনো বই বেচে খায়, এমনই যা-তা বই নিয়ে এসে টাকা দাবি করলে দিতে সে যাবে কেন? ওদিকে গোকুলের দাবি, এমন সব ভালো-ভালো বই সে নিয়ে এসেছে তাতে শশাঙ্ক টাকা দেবে না মানে? তার দাবি শশাঙ্ককে মানতেই হবে। শশাঙ্কেরও সহ্যের একটা সীমা আছে। আজই প্রথম তো এ দাবি নিয়ে আসেনি গোকুল? এ তার রোজকার দাবি। শোষণ করছে সে শশাঙ্ক দাসকে। কোথা থেকে কীভাবে না জানি সংগ্রহ করে নিয়ে আসে গোকুল যতসব ছাইপাঁশ বই। শশাঙ্ককে বিনা প্রতিবাদে সেগুলো রাখতেই হবে; আর দিতে হবে টাকা। বিক্রি হয় হোক, না হয় ফেলেই দিক শশাঙ্ক দাস ডাস্টবিনে। গোকুলের তা দেখবার কথা নয়, ভাববার বিষয় নয়। আজ শশাঙ্ক মুখ বুজে টাকা বের করতে রাজি নয় দেখে কিছুটা বিস্মিতই হল গোকুল। চোখ দুটি তার বুজে এল, মুখে ফুটে উঠল একটা ক্রূর হাসি।

কঠোর কণ্ঠে বলল গোকুল, 'টাকা দিতে পারবি না? আলবাত পারবি। না পারলে ব্যবসা এখানে চালাবি কী করে?' ডান হাতখানি বাড়িয়ে দিল গোকুল শশাঙ্কর দিকে। বলল, 'কী, দিবি টাকা? না—'

শশাঙ্ক নিরুপায়। অগত্যা সে পাঁচ টাকার একখানা নোট গোকুলের হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'এই নাও, যাও।'

প্রফেসার এতক্ষণ মনোযোগের সঙ্গে গোকুলকেই দেখছিলেন। এবার ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে চাইলেন শশাঙ্কের দিকে।

গোকুল পাঁচ টাকার নোটখানি হাতে নিয়ে বলল, 'এই পাঁচ টাকা! আচ্ছা যা আজকের মতো পাঁচ টাকাই নিলাম। বাকিটা তোর কাছে পাওনাই রইল।' সে নোটখানি চোখের কাছাকাছি তুলে ধরল। না, ঠিকই আছে। তারপরই শিস দিতে-দিতে চলে গেল সেখান থেকে।

এবার শশাঙ্ক দাস প্রফেসারকে লক্ষ করে বলল, 'দেখলেন স্যার কী জুলুম! কী অন্যায়!'

প্রফেসার বললেন 'হ্যাঁ, অন্যায় নিশ্চয়। তবে কার?'

তিনি হাসলেন আর সঙ্গে-সঙ্গে ফিরে চাইলেন রাস্তার দিকে। ইলা আসছে এপথ দিয়েই ক্যালকাটা মার্ট থেকে বেরিয়ে। ইলার মুখ বিষণ্ণ, আরও বিষণ্ণ হয়ে উঠল প্রফেসারকে দেখে। লোকটা এখনও রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছে! সে বলেছে, এ নিয়ে দশ-পাঁচটাকা দেওয়া অপব্যয়। ইলা আর প্রফেসারের দিকে না গিয়েই চলে যাচ্ছিল। প্রফেসারই লাঠিতে ভর করে এগিয়ে গেলেন।

প্রফেসার বললেন, 'মাপ করবেন।'

থমকে দাঁড়াল ইলা।

প্রফেসার বললেন কণ্ঠে একটা সহানুভূতির সুর ফুটিয়ে, 'জিনিসটা তাহলে ফিরিয়েই নিয়ে যাচ্ছেন?' যেন ইলার ব্যর্থতা তাকেও ব্যথা দিয়েছে।'

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চাইল ইলা প্রফেসারের দিকে। বলল, 'হ্যাঁ।'

ইলা চলে যাচ্ছিল, তার পেছনে এগিয়ে গেলেন প্রফেসার, 'আর একবার ওটা দেখতে পারি?'

'লাভ কী তাতে? যা দেখবার তা তো দেখেছেন।

'তবু আর একবার দেখতে ক্ষতি কী?'

সংশয় ও সন্দেহের দৃষ্টিতে চাইল ইলা প্রফেসারের দিকে। তথাপি সে কবজিবন্ধের মোড়কটা তুলে দিল প্রফেসারের হাতে। প্রফেসার আবার মোড়ক খুলে জিনিসটা উলটে-পালটে দেখতে লাগলেন। ইলা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তাঁর ভাব-ভঙ্গি লক্ষ করছিল।

দ্বিতীয় বারের পরিদর্শন শেষ করে প্রফেসার বললেন, 'এটা সত্যিই বিক্রি করতে চান?'

ইলা তীব্র কণ্ঠে বলে উঠল, 'তা না হলে কি তামাশা দেখতে নিয়ে এসেছিলাম?'

প্রফেসার এবার তাঁর মানিব্যাগ খুলে তার ভেতর থেকে একখানা একশো টাকার নোট বের করলেন। নোটখানা ইলার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'আশা করি দামটা নিতে তাহলে আপত্তি করবেন না।'

বিস্মিত হল ইলা। এই লোকই বলেছিল জিনিসটা মূল্যহীন। সে নোটখানা প্রত্যাখ্যান করল না।

'কিন্তু খানিক আগেই তো এটার কোনও দাম নেই বলেছিলেন?'

'হয়তো ঠিকই বলেছিলাম। কিন্তু এক জায়গায় দাম আর এক জায়গায় বদলেও তো যেতে পারে!'

পকেট থেকে একখানি নাম ঠিকানার কার্ড বের করে ইলার হাতে দিলেন প্রফেসার। 'এই কার্ডটা রাখুন। নাম-ঠিকানা দুই-ই পাবেন। এরকম পুরোনো জিনিস আর থাকলে

অন্য কোথাও যাওয়ার আগে আমায় দেখালে বাধিত হব।'

কবজিবন্ধের প্যাকেটটা নিয়ে লাঠি ঠুকে-ঠুকে পথ চলতে লাগলেন প্রফেসার। ইলা কার্ডখানি দেখছিল। নাম-ঠিকানা পড়ে আবার তাকাল প্রফেসারের দিকে। তার মুখে তখন একটা আশ্বাসের আভাস ফুটে উঠেছে। যা হোক, ক'দিনের জন্যে নিশ্চিত হয়ে চাকরি-বাকরির সন্ধান করতে পারবে সে। অতুলের কাছে আর এখন হাত পাততে হবে না দ্বিজেনকে।

ইলাও এবার অনেকটা হালকা পায়ে পথ চলতে লাগল।

চার

ইলা খুশি হয়েছে, খুশি হয়েছে দ্বিজেন। দ্বিজেনেব বিস্ময় অল্প নয়। ওই একটা কবজিবন্ধের দাম একশো টাকা! একশো টাকারই একখানা নোট সে বের করে দেখাল দ্বিজেনকে। ক্যালকাটা মার্ট দাম দিয়েছে চেকে—কিন্তু প্রফেসাব দিয়েছে নগদ টাকা, একখানি করকরে নোট। একটা পুরোনো চামড়ার দাম একশো টাকা! দ্বিজেন ভাবতেই পারে না। ওই প্রফেসার লোকটার মাথার একটুখানি ছিট আছে নিশ্চয়। চেহারা ছবি কথাবার্তা ও চলা ফেরার যে বর্ণনা দিয়েছে ইলা তাতে ছিট থাকাই সম্ভব। কিন্তু অতুল যখন শুনল ব্যাপারটা তখন তার চোখে-মুখে একটা উত্তেজনা দেখা দিল।

অতুল মন্তব্য করল, 'না ছিট নয়। আচ্ছা, চামড়ার জিনিসটা কীরকম একটু বলতে পারো?'

দ্বিজেন বলল, 'কী রকম আবার! হাতের কবজিতে পববার একরকম wrist guard- তরোয়ালই যখন প্রধান অস্ত্র ছিল তখন যোদ্ধারা—বিদেশি হার্মাদরা কেউ কেউ এসব পরত।'

আরও উত্তেজিত হয়ে উঠল অতুল, 'বিদেশি হার্মাদরা পরত, আচ্ছা, তাতে কোথাও কিছু আঁকা বা লেখা আছে?'

এবার উত্তর দিল ইলা, 'হ্যাঁ ভেতরের দিকে হিজিবিজি কী দাগ কাটা। আর দু-চারটে কী সব অদ্ভুত অক্ষর লেখা। বোঝা যায় না।'

অতুল বলে উঠল, 'এই জিনিস তোমাদের কাছে ছিল, কোথায় পেয়েছিলে?'

দ্বিজেন বলল, 'পাব আবার কোথায়? এ আমাদের পরিবারের বহু পুরোনো জিনিস।'

অতুল পায়চারী করতে আরম্ভ করল ঘর জুড়ে, সে অধীর হয়ে উঠেছে : 'কিছু মনে করো না। তোমাদের বংশের আদিবাস কোথায় জানতে পারি কি?'

ইলা কৌতূহলী হয়ে উঠল : 'কেন, আপনার কি সন্দেহ হচ্ছে এটা আমরা কোনও জায়গা থেকে চুরি করেছি?'

অতুল বলল, 'মিথ্যা রাগারাগি কোরো না ইলা। যা জানতে চাচ্ছি বল, ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুতর।

ইলা হাসল। মনে-মনে বলল, তুমি অন্তত হাবে-ভাবে কথায় এটাকে গুরুতর করেই তুলছ। প্রকাশ্যে বলল, 'আমাদের আদিবাস কমলমীর।'

থমকে দাঁড়াল অতুল। উচ্চকণ্ঠে সে বলে উঠল, 'কমলমীর!'

দ্বিজেন বলল, 'হ্যাঁ, এককালে আমাদের বংশই কমলমীরে রাজা ছিলেন বলে শুনেছি।'

'আশ্চর্য!' অতুল যেন আপনমনেই উচ্চারণ করল।

ইলা প্রশ্ন করল, 'আশ্চর্য কী?'

'আমরাও তো এককালে কমলমীরের রাজা ছিলাম বলে জানি।' গম্ভীর কণ্ঠে বলল

অতুল। চিন্তাভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে সে।

দ্বিজেন বলল, 'তাই নাকি? কিন্তু তা কী করে হতে পারে?'

ইলার অভিমত হল তা হতে পারুক আর না পারুক তার সঙ্গে এ ব্যাপারের কী সম্পর্ক থাকতে পারে? অতুল বিস্মিত হয় কথাটা শুনে। সম্বন্ধ একটু আছে বইকী? তা নইলে কি বৃথাই আদিবাসের সন্ধান নিচ্ছিল সে? তাদের পরিবারেও যে এমনই চামড়ার কবজিবন্ধ রয়েছে প্রায় পাঁচশো বছর ধরে। সম্বন্ধে কি অস্বীকার করা যায়? ইলা তবু বুঝতে পারে না। এতে আশ্চর্যের কী আছে! থাকলই বা তাদেরও একটা পুরোনো কবজিবন্ধ। আরও লোকের থাকতে পারে। মূল্য তো শুধু তার পুরোনো জিনিস বলে?

অতুল তপ্তকণ্ঠে বলে, 'এ ব্যাপারটা যে আশ্চর্য—তা ইলার পক্ষে বুঝতে না পারবারই কথা। বুঝতে পারলে ওই জিনিস একশো টাকায় বিক্রি করে এসে অত উল্লসিত হতো না ইলা।'

ইলা প্রশ্ন করল, 'তার মানে?'

অতুল উত্তর দিল, 'মানে এই যে, ও জিনিস তোমাদের কাছে ছিল জানতে পারলে যে কোনও দামে আমিই কিনে নিতাম।'

বিস্মিত হল দ্বিজেন, 'যে-কোনও দামে কিনে নিতে?'

অতুল বলল, 'হ্যাঁ, বাবা সারা জীবন এরই খোঁজ করে কাটিয়েছেন। তাঁর পরে আমিও চেষ্টা করে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছি।'

'জিনিসটা সেকেলে ও দুষ্প্রাপ্য তা আমি জানি।' বলল ইলা জিজ্ঞাসার সুরে, 'কিন্তু কিউরিও হিসেবেও এর দাম কি এত বেশি হবে?'

ম্লান হাসি হাসল অতুল, 'ওর দাম যে কী, তোমাকে যিনি ঠকিয়ে নিয়েছেন সেই প্রফেসারই ঠিক বুঝেছেন। কিউরিও হিসেবে নয়, ওর আসল দাম গুপ্ত সঙ্কেতের ম্যাপ হিসেবে। হার্মাদ জলদস্যুরা সেকালে তাদের লুট করা ঐশ্বর্য লুকোনো জায়গায় পুতে রাখত। এটাতে রয়েছে সেই লুকোনো স্থান খুঁজে বের করবার সঙ্কেত।'

দ্বিজেন প্রশ্ন করল, 'তুমি এত কথা জানলে কী করে?'

অতুল উত্তর দিল, 'জেনেছি আমার বাবার কাছ থেকে। তিনিই প্রথম ওর পুরোনো লেখা পড়ে নকশাটা কী ও কোথাকার বুঝতে পারেন। কিন্তু ওটা নকশার আধখানা মাত্র। ওর জোড়া খুঁজে বের করবার জন্যে চেষ্টার কোনও ত্রুটি তিনি তাই করেননি। কিন্তু কোনও ফল হয়নি। এতদিনে জোড়ার সন্ধান যখন পাওয়া গেল তখন তা আমাদের নাগালের বাইরে।'

হতাশ হয়ে বসে পড়ল অতুল। এবার ইলার মনেও ভাবান্তর এসেছে, তাই তো প্রফেসার ফাঁকি দিয়ে ঠকিয়ে নিয়ে গেল এত বড় মূল্যবান জিনিসটা! দ্বিজেন কিন্তু নিরাশ হতে চায় না। কেন, এখনও তো নাগালের একেবারে বাইরে চলে যায়নি কবজিবন্ধটা? অতুল আশার ক্ষীণ আলোরেখা দেখতে পায়। ওই প্রফেসারের নাম-ঠিকানা তো রয়েছে কার্ডে? ইলাকে উপযাচক হয়েই ঠিকানা দিয়েছেন প্রফেসার সামন্ত! হয়তো বা তাঁর ভরসা আছে, আরও কোনও-কোনও দুষ্প্রাপ্য জিনিস রয়েছে ইলাদের ভাণ্ডারে, আর একদিন বিক্রি করবার জন্যে নিয়ে আসবে ইলা। অভাবগ্রস্ত ইলা, আবার ওসব জিনিসের মূল্যও বোঝে না। ধারণাই নেই তার এ কী জিনিস! সেই প্রফেসার, তিনি ওইসব জিনিসেরই কারবার করেন। কারবার যখন করেন, তখন নিশ্চয়ই খরিদ-বিক্রয় দুইই করে থাকেন। সুতরাং...

আশা হল অতুলের। অর্থের তার অভাব নেই। যে-কোনও মূল্যে সে কিনে নেবে

ওই কবজিবন্ধ প্রফেসারের কাছ থেকে?

অতুল দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'তাহলে প্রফেসারের নিজের প্যাঁচেই তাকে কাবু করতে হবে। শোন দ্বিজেন, না-না, তোমার মতো নার্ভাস লোকের কাজ নয়। দরকার এখন পাকা একজন অভিনেতা। ঠিক আছে, সমীরকে দিয়েই চলবে।'

দ্বিজেন বলল, 'সমীর! সে কী করবে? সে তো কিছুই জানে না।'

অতুল উত্তর দিল, 'যা জানাবার তাকে জানিয়ে দিচ্ছি আগে। তারপর ধবলগড় স্টেটের ম্যানেজার আর তার বন্ধু গিয়ে উদয় হবেন প্রফেসারের আস্তানায়।'

ইলা লক্ষ করে দেখল, অতুলের মুখে চোখে হাসির ঝলক। এ হাসি সম্ভাব্য জয়ের, এ হাসি সার্থকতার। অতুলের যেন নিজের সাফল্য সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ নেই। ধবলগড় স্টেটের মহারাজের জন্যে তাঁর ম্যানেজার আর বন্ধু যেন প্রফেসারের কাছ থেকে কবজিবন্ধটা উদ্ধার করেই ফেলেছেন।

কিন্তু যা কল্পনা করা যায়, তাই কি সত্য হয়, সার্থক হয়?

প্রফেসারের বাড়িতে গিয়ে সেদিন উপস্থিত হল ধবলগড় স্টেটের ম্যানেজাররূপী সমীর আর তার বন্ধুরূপী অতুল।

বেশ বড় বাড়ি প্রফেসারের। কিন্তু আশ্চর্য, লোকজনের সাড়া নেই! বাইরে থেকে মনে হয় যেন নির্জন পাষাণপুরী, গম্ভীর শান্ত ভাব ভেতরের পরিবেশ। কোথাও পদশব্দের চঞ্চলতা নেই, কথার মুখরতা নেই। এরকম পরিবেশ স্বাভাবিক মানুষের মনে কেমন একটা শঙ্কা ও দুর্ভাবনার সৃষ্টি করে। নীরবতা! অথচ এতবড় বাড়ি!

অতুল আর সমীর সেই পাষাণ পুরীতে প্রবেশ করে বিস্মিত হয়ে দাঁড়াল। তবে কি প্রফেসার সত্যিই একজন রহস্যময় মানুষ? এই তার রহস্যঘেরা আবাস? তারা চারদিকে তাকিয়ে পরিবেশ উপলব্ধি করবার চেষ্টা করছে, এমনসময় প্রফেসারের চাকর এসে প্রবেশ করল। তার হাতে নামের কার্ড দিয়ে অতুল জানাল তারা প্রফেসারের সঙ্গে দেখা করতে চায়। বসবার জন্যে চেয়ার দেখিয়ে চাকর কার্ড নিয়ে ভেতরে চলে গেল।

প্রফেসার তখন তাঁর আপিস-কামরায় বড় এক সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সম্মুখে বসে। নীরবতা সে ঘরেও। শুধু দেয়াল ঘড়িটা টিক-টিক করে বাজছে। প্রফেসার সম্মুখে প্রসারিত একখানি কাগজের ওপর ঝুঁকে পড়েছেন। হাতে তাঁর একখানি ম্যাগনিফাইং গ্লাস। কাগজের ওপর কী লেখা পড়বার চেষ্টা করছেন তিনি গ্লাসের সাহায্যে। এমনসময় কার্ড নিয়ে ভৃত্য কাঙালি এসে প্রবেশ করল। কাঙালি নিঃশব্দ নির্বাক—শুধু এগিয়ে গিয়ে টেবিলের সম্মুখে দাঁড়াল। বিরক্তিতে কুঞ্চিত মুখ তুলে চাইলেন মিট মিট করে প্রফেসার কাঙালির দিকে। কাঙালি মাথা নুইয়ে কার্ডখানা তাঁর সম্মুখে রাখল। চোখের কাছে তুলে ধরলেন প্রফেসার কার্ডখানা। তার পরেই, টেবিলের ওপর প্রসারিত কাগজ ও ম্যাপখানা গুটিয়ে ড্রয়ারে বন্ধ করতে-করতে বললেন, 'নিয়ে এস।'

আগন্তুকেরা যখন এসে প্রবেশ করল তখন প্রফেসার চোখ বুজে বসেছিলেন। হঠাৎ চোখ খুলে বিনীত সুরে বললেন, 'বসুন।'

অতুল আর সমীর এক একখানি চেয়ারে উপবেশন করলে প্রফেসার আবার কার্ডখানি হাতে নিয়ে পড়তে লাগলেন, 'ম্যানেজার, ধবলগড় স্টেট।' তারপরই আগন্তুকদের লক্ষ করে বললেন, 'কার্ডটা কার?'

অতুলই উত্তর দিল, 'এঁরই।'

প্রফেসার বললেন, 'ও। বলুন কী করতে পারি আপনাদের জন্যে?'

অতুল বলল, 'ওঁর হয়ে আমিই বলছি। বাংলা বলতে ওঁর একটু...'

সমীর অবাঙালির সুরের ব্যর্থ অনুকরণ করে বলল, 'হ্যাঁ, বাংলা হমি অচ্ছি তরফসে সমঝে লেকিন বলতে নেহি সেকে।'

প্রফেসার নিবিষ্ট দৃষ্টিতে নবাগত দুজনকে লক্ষ করছিলেন। অতুলের দিকে চেয়ে বললেন, 'বেশ আপনিই বলুন।'

অতুল উৎসাহভরে বলতে লাগল, 'ধবলগড়ের মহারাজার একটা বাতিক আছে। তিনি জীবনভর শুধু পুরাতাত্ত্বিক আর ঐতিহাসিক দুষ্প্রাপ্য জিনিসই সংগ্রহ করে চলেছেন। মহারাজার সেক্রেটারি এসেছেন প্রফেসারের কাছে সেরকম কোনও জিনিস আছে কি না তারই সন্ধানে। প্রফেসার বললেন, 'এ তো খুব ভালো কথা। তা আপনারা পুরাতাত্ত্বিক না ঐতিহাসিক বস্তু দেখতে চান?

সমীর বলল, 'বেঙ্গল হিস্টারিক্যাল কুছ আছে তো দেখাইয়ে।'

প্রফেসার মিট মিট করে চাইতে লাগলেন অতুল আর সমীরের দিকে। মুখে কোনও ভাবান্তর নেই। কণ্ঠও নির্বিকাব। বললেন, 'হার্মাদ মানে ফিবিঙ্গি জলদস্যুদের অত্যাচারের সময়ের কোনও নিদর্শন হলে কেমন হয়?'

উৎসাহিত হয়ে উঠল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব ভালো হয়। যত দাম লাগে? We are ready to pay any price for it.'

প্রফেসারেব মুখে একটুখানি হাসি ফুটে উঠল। তিনি বললেন, 'I thought as much. কিন্তু একটা কথা তার আগে জিজ্ঞাসা করি। আমার খোঁজ আপনারা পেলেন কী করে?'

অতুল বলতে আরম্ভ করল মরিয়া হয়ে, 'খোঁজ মানে, কে যেন বলল। তাছাড়া আপনার মতো এসব জিনিসের এতবড় learned collector-এর নাম-ঠিকানা কে না জানে!'

প্রফেসার মন্তব্য কবলেন, 'জানে বুঝি, বড় আশ্চর্য ব্যাপার বলতে হবে।'

অতুল আর সমীর দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকাল। একই সঙ্গে তাদের দুজনের কণ্ঠে উচ্চারিত হল, 'আশ্চর্য!'

প্রফেসার বললেন, 'হ্যাঁ, কলকাতার এ বাড়ি আমি নিয়েছি দুমাস। তাছাড়া আমার যা কাজ কারবার তা এদেশের কারও সঙ্গে নয়। সবই ইউরোপ আমেরিকায়।'

সমীর বলে উঠল, 'তা হলে...মানে সেইরকম কেউ...'

প্রফেসার আশ্বস্ত করলেন ওদের, 'থাক, ওর জন্যে আপনাদের বিচলিত হতে হবে না। শুধু আপনাদের ওই ধবলগড় স্টেটটা কোথায় বলুন তো?'

অতুল অধিকতর বিব্রত বোধ করছে, কিন্তু উপায়ান্তর নেই। সে উত্তর দিল, 'কেন, সি, পি মানে মধ্যপ্রদেশের ওই যে—'

সমীর লুফে নিল অতুলের কথা, 'ওই রায়পুর আছে না? হিঁয়াসে ইনটিরিয়ারে যেতে হোয়। বহুৎ দূর আছে।'

'হুঁ,' বলে প্রফেসার একখানা ম্যাপ খুলে ওদের সম্মুখে ধরলেন, 'ভারতবর্ষের ছোট বড় সমস্ত স্টেটই এ ম্যাপে দেওয়া আছে। আপনাদের ধবলগড়টা দয়া করে দেখিয়ে দেবেন?'

প্রফেসারের কথায় আর তার অদ্ভুত কৌতুক ভরা দৃষ্টিতে চঞ্চল হয়ে উঠল অতুল আর সমীর। নার্ভাস হয়ে পড়েছে তারা। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে কিন্তু কারও মুখেই

কোনও আশ্বাসের আভাস নেই।

প্রফেসার আবার বললেন, 'কই দেখান!'

অতুল রাগের ভান করে বলল, 'ধবলগড় স্টেট কোথাও নেই।'

প্রফেসার এবার দুই ভুরু ওপরে তুলে বললেন, 'নেই। তাহলে আর কী।'

অতুল শেষ চেষ্টা করে দেখবে। আর লুকোচুরি নয়। বলল, 'ধরেই যখন ফেলেছেন, তখন সত্যকথা শুনুন। ইলা দেবীর কাছ থেকে যা বাগিয়ে নিয়েছেন, তা আপনাকে ফিরিয়ে দিতেই হবে। সে জন্যেই আমরা এসেছি।

প্রফেসার বললেন, 'বটে। কিন্তু এই সামান্য জিনিসের জন্য এতখানি ফিকির-চালাকির কী দরকার ছিল?'

অতুল বলে উঠল, 'সামান্য জিনিস যদি হয় তাহলে ফেরত দিয়ে দিতে আপনার আপত্তি কি। যা দাম আপনি দিয়েছেন আমরা দিয়ে দিচ্ছি। তার চেয়ে অনেক বেশি দিতেও আমরা প্রস্তুত আছি।'

মাথা নাড়ালেন প্রফেসার, 'নাঃ। জিনিসটা তাহলে সামান্য নয় বলে সন্দেহ হচ্ছে।'

এবাব সমীর সোজা বাংলায়ই কথা বলল, আর কেন, ধবা যখন পড়েই গেছে, 'ইলা দেবীব কাছে অন্তত নয়। ওদের পরিবারের স্মৃতি এর সঙ্গে জড়ানো।'

ব্যঙ্গেব সুরে বললেন প্রফেসার, 'বিক্রি করতে যেদিন নিয়ে গেছলেন, সেদিন পুরোনো স্মৃতির কথাটা বুঝি মনে ছিল না?'

অতুল জানালো যে সেদিন উনি ভুল করেছিলেন, ঠিক বুঝতে পারেননি। প্রফেসার মাথা নাড়লেন আর বলতে আবম্ভ করলেন, 'তাই বলুন, এ জিনিসের আসল দাম যে কী হতে পারে তা তখনও উনি জানতেন না। জানতেন না যে, আলাদিনের প্রদীপের মতো এই সামান্য জিনিসটার সাহায্যে কুবেরের ভাণ্ডাবেরও সন্ধান পাওয়া সম্ভব। কিন্তু এখন উপায় কী বলুন! না-জানাব যে ক্ষতি তা মেনে নিতেই হবে। ও জিনিস যে আলাদিনের প্রদীপ তা আমারই আবিষ্কার। এ আবিষ্কার হাতে পেয়েও ছেড়ে দেওয়ার মতো মহানুভব কি আমায় দেখে মনে হয়?'

ক্রোধরুদ্ধ কণ্ঠে বলল অতুল, 'ফেরত আপনি তাহলে দেবেন না?'

নির্লিপ্ত কণ্ঠ প্রফেসারের, 'ইচ্ছা তো এখনও নেই।'

'নেই।' তীব্র ঝাঁঝের সঙ্গে বলল অতুল, 'কিন্তু ও জিনিসের ওপর আপনার সত্যিকার কোনও অধিকার নেই।'

'অধিকার! অধিকাবের বিচার করবে কে?' বললেন প্রফেসার, 'দখল যার, অধিকার তার। যে হার্মাদ জলদস্যু লুট করা ধনরত্ন পুতে রেখে তার এই নকশা তৈরি করেছিল, অধিকার কি তারই ছিল—না যারা এ জিনিস কবে কোথায় কুড়িয়ে পেয়েছিল তাদের আছে?'

বিদ্রুপপূর্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করে অতুল, 'কিন্তু ওই নকশা দিয়ে কোনও জায়গা আপনি খুঁজে পাবেন আশা করেন?'

'আশা করতে দোষ কী!' উত্তর দেন প্রফেসার।

অতুল বলল, 'আশা আপনার বৃথা। জানেন ও-জিনিসের একটা জোড়া আছে। জানেন সে জোড়া না পেলে ওর কোনও অর্থই বোঝা যাবে না।'

'জানি। কিন্তু একটা যখন পেয়েছি তখন আর একটাও পেতে পারি।' চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন প্রফেসার।

অতুল আর সমীরও উঠে পড়ল। বুঝেছে তারা ওর সঙ্গে বাক্যব্যয় নিরর্থক। শক্ত জায়গা। কথায় ভবি ভোলাবার নয়। অতুল শেষ কথা বলে দিয়ে যাবে—প্রফেসারকে, 'কোনও দিন তা পাবেন না, কোনও দিন না।'

বেরিয়ে আসতে-আসতে অতুল ছুঁড়ে মারল তার প্রতিজ্ঞার কথাটা, 'আচ্ছা, দেখা যাবে।...'

দেখা যাবে কিন্তু কীসে দেখবে! ইলা হাসল, অতুলের জব্দ হয়ে ফিরে আসায়। সে যেন জানত অতুলের কারসাজি ধরা পড়ে যাবে। অতুল ইলার এ হাসিতে রাগ করতে পারে না, কোন মুখে রাগ করবে। সত্যি! প্রফেসারটা পাকা শয়তান। সে অতুলকে এক হাটে কিনে আর এক হাটে বেচতে পারে। অতুলের একমাত্র সান্ত্বনা আধখানা নকশা দিয়ে শয়তানটা কিছুই করতে পারবে না। কিন্তু শয়তানের পক্ষে অসম্ভব কী? আধখানা হাতে পেয়ে বাকি আধখানা পাওয়ার চেষ্টা কি সে ছেড়ে দেবে? দ্বিজেন সাবধানবাণী উচ্চারণ করে। অতুলকে সাবধান হতে হবে, সাবধান।

অতুলও ভাবে, সাবধান হতেই হবে। সাবধান অতুল! দেখেছ তো প্রফেসার মানে ডাঃ সামন্তকে? ওই লোকটার অসাধ্য কিছু নেই। সাবধান!

পাঁচ

ক্যালকাটা মার্টের পাশে সেই পুরোনো বইয়ের দোকান। দোকানের মালিক শশাঙ্ক দাস উপস্থিত নেই। তারই সহকারী যুবকটি বইপত্র গুছাচ্ছে। ধীরে-ধীরে লাঠি ঠুকে-ঠুকে এসে উপস্থিত হলেন প্রফেসার ডাঃ সামন্ত। তিনি নতুন লোক দেখে তাকে ভালো করে লক্ষ করছিলেন। কাছে এসে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'ওহে, এ দোকান কি এখন তোমার নাকি?'

সহকারী প্রফেসারের দিকে ফিরে তাকাল। উত্তর দিল, 'না স্যার, ওই যে মালিক আসছেন।'

সত্যি মালিক শশাঙ্ক দাস এদিকে আসছে। প্রফেসারকে দেখেই সে যুক্তকরে নমস্কার করল। দেখেই সে বুঝে ফেলেছে আজ উনি আইনের বই চান। খরিদ্দার দেখলেই নাকি সে বুঝতে পারে। পাকা দোকানদার শশাঙ্ক দাস।

শশাঙ্ক বলল, 'এই যে স্যার! আইনের বই দেব স্যার? সব Rare law journals বাঁধাই আছে স্যার।'

প্রফেসার বললেন, 'আমাকে উকিল বলে ঠিক চিনে ফেলেছ তাহলে?'

বিনয়ে বিগলিত হয়ে বলল শশাঙ্ক দাস; একটু গর্বের হাসিও ফুটে উঠেছে তার মুখে, 'তা আর চিনব না? ও চেহারা দেখলেই চিনতে পারি।'

প্রফেসার মাথা দোলালেন, হুঁ, সূক্ষ্ম দৃষ্টি আছে বটে। বললেন, 'কিন্তু বই-টই আমি চাই না। একটা লোকের খোঁজ দিতে পারো?'

ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল শশাঙ্ক দাস, 'বইয়ের নয়, লোকের খোঁজে এসেছেন? কার স্যার?'

প্রফেসার বললেন, 'যাকে খাজনা দিয়ে এখানে টিকে আছ?' শশাঙ্কর বিব্রত বিস্মিত কণ্ঠে উচ্চারিত হল, 'আজ্ঞে!'

প্রফেসার বললেন, 'বুঝলে না? যার বইয়ের দাম একটু চড়া, দরকার না হলেও কিনতে হয়। কি, বুঝলে এবার?'

'আজ্ঞে বুঝেছি।' সত্যি শশাঙ্ক এবার বুঝতে পেরেছে, 'কিন্তু তার খোঁজ আমি কী

করে জানব?'

প্রফেসার বললেন, 'জানো বইকী, নিশ্চয়ই জানো। ভয় নেই, নিঃসংকোচে আমাকে বলতে পারো।'

শশাঙ্ক ভয় পায়! এমন ভঙ্গি করল শশাঙ্ক দাস যে, ভয়ের কোনও কারণ নেই, ভয় সে পাবে কেন? কিন্তু তার ঠিকানা তো জানা নেই শশাঙ্ক দাসের। কে জানে কোথায় থাকে ওই গোকুল। শশাঙ্ক দাস না জানলে কী হবে, তার সহকারীটি জানে দয়ালশার চায়ের দোকানে, সেখানেই গোকুলের আস্তানা। আর কোথাও তার চালচুলো আছে নাকি? সবাই জানে যে, রোজ রাত্তিরে গোকুল গিয়ে ওই দয়ালশার চায়ের দোকানে আড্ডা গাড়ে। সেখানেই তার আহার চলে। শয়ন-মন্দিরের তার কোনও ঠিকানা নেই। দয়ালশার ওই বিখ্যাত চায়ের দোকানটি সম্পর্কে প্রফেসারের প্রচণ্ড কৌতূহল। তাও নিবৃত্ত করতে পারে শশাঙ্ক দাসের সহকারী। সে আর বেশি দূরে নয়, এই কাছেই তো। অঙ্গুলি নির্দেশ করে বাতলে দিতে চেষ্টা করে সে। সেটা তো একটুখানি এগিয়ে ডানদিকে কালি মিস্ত্রীর গলি। কালি মিস্ত্রীর গলিটা বিখ্যাত গলি, তারই বিখ্যাত চায়ের দোকান দয়ালশার 'পরম পরিতোষ কেবিন।' সেইখানেই অধিষ্ঠান করেন বিখ্যাত পুরাতন বই সরবরাহকারী গোকুলচন্দ্র। প্রফেসার পরিতুষ্ট হলেন খবরটা জেনে। মনে-মনে আওড়ালেন, সেইখানেই তাহলে রাত্তিরের আস্তানা!

প্রফেসার আবার চলতে লাগলেন। শশাঙ্ক দাস চেয়ে দেখল ওই অদ্ভুত লোকটি ক্রমশ পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর তাঁর লাঠির ঠুক-ঠুক শব্দটা আর শোনা গেল না। পথচলা লোকজনের আর যানবাহনের মুখরতার মাঝে ডুবে গেল।

...কিন্তু আবার সেদিনই মাঝ রাতে কালি মিস্ত্রীর গলির জনহীন স্তব্ধতায় ডাঃ সামন্তের লাঠির আওয়াজ পাওয়া গেল, দেখা গেল তাঁর বিচিত্র মূর্তিটিকে।

দয়ালশার চায়ের দোকান 'পরম পরিতোষ কেবিন' তখন দোর বন্ধ করছে। দূরে কোথায় বারোটার ঘণ্টা বেজে গেছে কোনও কারখানার গেটে। চায়ের দোকানের দোরটা সামান্য একটুখানি খোলা। সম্ভবত শেষ খদ্দের তখনও বিদায় নেয়নি। কাছেই একটা উড়ে পানওলার দোকান বন্ধ হয়ে গেছে এইমাত্র। গলিপথ স্তব্ধ নিঃসাড়। শুধু চায়ের দোকানের মধ্যেই মালিক পরিচালকদের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। একটি গুন্ডা আকৃতির লোকই তখনও দোকানের একমাত্র খদ্দের, বেঞ্চে বসে বিড়ি টানছে। দু-একবার তাকাল দয়ালশা লোকটির দিকে, না, তার ওঠবার কোন লক্ষণ নেই। সে এগিয়ে গেল তার দিকে।

দয়ালশা বলল, 'ওঠো হে ওঠো, দোকান বন্ধ করতে হবে।'

গুন্ডা আকৃতির লোকটি বলল ঠাট্টার সুরে, 'এ কি আবগারি দোকান নাকি বাবাজি, যে ঘড়ি ধরে খুলছ আর বন্ধ করছ?'

দয়ালশা উত্তর দিল, 'না, বন্ধ করবে না! তোমার মতো ফুটো পকেটের খদ্দেরের জন্যে সারারাত খুলে রাখবে। নাও, ওঠ, ঝামেলা করো না।'

গুন্ডা আকৃতির লোকটা আর কেউ নয়, আমাদের পূর্বপরিচিত সেই গোকুল। নিত্যই দয়ালশা বলে 'ভাগো,' পথ দেখিয়ে দেয়, তবু সে রাত্রে রোজই এখানে এসে আড্ডা গাড়ে।

গোকুল বলল, 'রসো দয়াল, তোমার পাড়ার বড় ক্যাপ্টেনই আসছে।'

বাইরে কার আসবার শব্দ শোনা গেল। প্রফেসার ঘরে প্রবেশ করে একখানি চেয়ার দখল করে বসলেন। দয়ালশা গোকুলের কাছ থেকে এসে তাঁর কাছে দাঁড়াল। প্রফেসার বসেই এক কাপ চায়ের ফরমাস করলেন।

দয়ালশা একবার আড় চোখে চাইল প্রফেসারের দিকে। বলল, 'চা এখন আর হবে না।'

প্রফেসার যেন বিস্মিত হয়েছেন। বললেন, 'হবে না! এটা তো চায়ের দোকানই মনে হচ্ছে।'

দয়ালশা উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, চায়ের দোকান, কিন্তু রাত ক'টা হয়েছে জানেন?'

'বেশি রাত হলে চা কি বারণ নাকি?'

'অত কথা জানি না। চা এখন হবে না। ব্যস।'

'দাঁড়ান দাঁড়ান, শুনুন। এমনি চা না হতে পারে। স্পেশাল চা-ও তো হতে পারে স্পেশাল দাম দিলে?'

প্রফেসার তাঁর পকেট থেকে টাকার ব্যাগটি খুলে এক গোছা নোট বের করলেন। সেই নোটের গোছাটি হেলাভরে টেবিলের ওপর রাখলেন।

'কী হবে?'

'এককড়ি, এখানে এক কাপ চা দিয়ে যা।'

প্রফেসার নোটের গোছা থেকে একখানি নোট রেখে বাকিটা ব্যাগে পুরে আবার পকেটে রাখলেন। তিনি ইঙ্গিতে দয়ালশাকে কাছে ডেকে নোটখানি তার হাতে দিলেন, চায়ের অগ্রিম দাম। দয়ালশা নোটখানি নিয়ে তার টেবিলের কাছে চলে গেল। এবার গোকুলও উঠে দাঁড়াল। এতক্ষণ সে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়েছিল প্রফেসারের মোটর গাড়ির দিকে। তার চোখ দুটি জ্বলে উঠছিল। সে উঠে আর একবার প্রফেসারের দিকে তাকিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল। প্রফেসারও লক্ষ করছিলেন গোকুলকে, সে যে দোকান থেকে বেবিয়ে গেল তাও তাঁর দৃষ্টি এড়াল না। গোকুল! এই গোকুলেরই খোঁজ নিতে গিয়েছিলেন তিনি শশাঙ্ক দাসের পুরোনো বইয়ের দোকানে। তিনি চেয়ে রইলেন গোকুলের গমন পথেব দিকে।

এদিকে চা এসে গেছে প্রফেসারের টেবিলে। গরম ধোঁয়া উঠছে চা থেকে। তিনি চেয়ে আছেন। দয়ালশা নোটের চেঞ্জ নিয়ে এসে উপস্থিত হল। প্রফেসার হাত বাড়িয়ে চেঞ্জটা নিয়ে দয়ালশার দিকে চেয়ে বললেন, 'একি! সবই যে ফেরত দিলে মনে হচ্ছে?'

দয়ালশা বলল, 'না, চায়ের যা দাম তাই কেটে রেখেছি।'

চার কাপে চুমুক দিতে-দিতে প্রফেসার বললে, 'বটে। দুনিয়ায় ইমানদার লোক তাহলে এখনও আছে?'

চা পান শেষ করে সেই গভীর রাতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন প্রফেসার। আবার তিনি পায়ে হেঁটে চলেছেন কালি মিস্ত্রীর গলি দিয়ে। এক গলি থেকে অন্য গলিতে। চলেছেন তো চলেছেনই। চলার তাঁর বিরাম নেই।

একটা মোড়। একটুখানি আঁধার ঘিরে আছে জায়গাটাকে। রাস্তার আলো এখানে এসে পৌঁছবার পথ খুঁজে পায়নি। সে জায়গায় আসতেই কে একজন এগিয়ে আসতে-আসতে কর্কশকণ্ঠে বলল, 'থামুন।' প্রফেসার থেমে পড়ে চেয়ে দেখলেন তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে গোকুল। আঁধারেও তিনি চিনতে পারলেন তাকে।

গোকুল বলল আদেশের ভঙ্গিতে, 'দেখি, ব্যাগটা বার করুন।'

কৌতুক-ভরা কণ্ঠে বললেন প্রফেসার, 'কেন বল তো?'

গোকুলও ঠাট্টার সুরে বলল, 'কেন জানেন না? এদিকের রাস্তাঘাট একটু খারাপ কিনা। তার ওপর রাতও অনেক হয়েছে। ব্যাগে অত টাকা নিয়ে বিপদে পড়তে পারেন।

টাকাগুলো তাই সাবধানে রেখে দিচ্ছি। কই বার করুন।'

প্রফেসার ব্যাগটা বের করলেন পকেট থেকে। নোটগুলো গুণতে আরম্ভ করলেন তিনি। অত্যন্ত করুণ কণ্ঠে বললেন, 'এই সবই দিতে হবে।'

গোকুল বলল, 'হ্যাঁ, দেরি করবেন না।'

প্রফেসার একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'সাবধানে যখন রাখবে তখন ব্যাগটিই রাখো।' তিনি ব্যাগটাই তুলে দিলেন গোকুলের হাতে। গোকুল আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠল। একটুখানি বিস্মিতও যে না-হল এমন নয়। বিনা বাধায় গোটা ব্যাগটাই দিয়ে দিলেন ভদ্রলোক? তাহলে, আরও যা কিছু সঙ্গে আছে তাই বা নিয়ে যেতে দেবে কেন?

গোকুল প্রশ্ন কবল, 'এ ছাড়া আর কী আছে?'

প্রফেসাব বললেন, 'আব কিছু নেই।'

গোকুল হুঙ্কার দিয়ে উঠল, 'আলবাত আছে, বাব করুন।'

এগিযে আসতে লাগল গোকুল প্রফেসারেব দিকে। এবাব জোর করেই সে কেড়ে নেবে সব। প্রফেসাব হাসলেন। মন্দ দুঃসাহসী নয় লোকটা। তিনি হাতেব লাঠিটা দিয়ে এমন কৌশলে গোকুলেব পাযে আঘাত করলেন যে, সে একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে তিন হাত পিছিয়ে গেল। এবাব এগিযে গেলেন প্রফেসাব। আহত গোকুলেব হাত থেকে তিনি টাকার ব্যাগটা অতর্কিতে কেড়ে নিযে পকেটে পুবলেন। যা পেযেছিল, তাও গেল গোকুলের। সে ওই আঘাতের বেদনা ভুলে প্রফেসাবেব ওপব ঝাঁপিযে পডবাব জন্য সরোষে এগিয়ে গেল।

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন প্রফেসাব, 'থেমে, একটু থেমে।'

কণ্ঠ শুনেই থমকে দাঁড়াল গোকুল।

প্রফেসার বললেন, 'তোমাব মতো ইঁদুর বেড়ালেব জন্যে তৈরি হয়েই আমি এ রাস্তায় এসেছি। এমনকী তোমার খোঁজেই এসেছি বলতে পাবো।'

ক্রুদ্ধস্ববে জবাব দিল গোকুল, 'আমার খোঁজে?'

'হ্যাঁ, তোমাব খোঁজে।' বললেন প্রফেসাব, 'যাতে এই সামান্য ক'খানা নোটের জন্য এত পরিশ্রম কবতে না হয় তোমাকে। এর বদলে পাঁচ হাজার নিলে কীরকম হয়?'

'ঠাট্টা করবাব আর লোক পাননি।' আবার এগিয়ে আসতে লাগল গোকুল। প্রফেসার হাত তুলে তাকে নিবস্ত করলেন।

বললেন, 'উহুঁ, উহুঁ। মিছিমিছি উত্তেজিত হয়ে কোনও লাভ নেই। শুধু-শুধু হাত-পা গুলো খোঁড়া হবে।'

তিনি ব্যাগ খুলে পাঁচখানি নোট বাব করে গোকুলেব হাতে দিয়ে বললেন, 'পঞ্চাশ টাকা তোমায় অমনি দিচ্ছি। কিন্তু পাঁচ হাজারের লোভ যদি থাকে...' তিনি থামলেন— তারপর আবার বললেন, 'আমার সঙ্গে এস।' বলেই তিনি চলতে আরম্ভ করলেন।

গোকুল ভাবে, কী অদ্ভুত লোকটা! কিন্তু বলে, 'আপনাব সঙ্গে যাব? যাতে ধরিয়ে দিতে পারেন!'

প্রফেসাব মাথা নাড়লেন, 'ধরিয়ে তোমাকে এমনি দিতে পারি। তার জন্যে পঞ্চাশ টাকা বায়না দেওয়ার দরকার হয় না। নিজের ভালো যদি তুমি না বোঝ, এস না।'

একবার চাইলেন তিনি গোকুলের দিকে, তারপর পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

বাড়ি এসে পৌঁছলেন ডাঃ সামন্ত। তাঁর পাষাণপুরী তখন রাতের অন্ধকারে নিঃসাড়ে দাঁড়িয়ে ঘুমুচ্ছে। তিনি দোরে দাঁড়িয়ে ইলেকট্রিক বেল টিপলেন। ভেতরে জেগে বসে আছে

ভৃত্য কাঙালি। সে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল। কাঙালিকে হাতের ইঙ্গিতে ভেতরে পাঠিয়ে দিয়ে প্রফেসার দ্বার প্রান্তে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, একবার পেছনে ফিরে রাস্তার দিকে চেয়েও নিলেন। ততক্ষণে তাঁর সংকল্প ঠিক হয়ে গেছে। সদর দরজাটা খোলা রেখেই তিনি ভেতরে প্রবেশ করলেন। ভেতরে প্রবেশ করে আবার মুক্ত দ্বার-পথে দৃষ্টি প্রসারিত করে প্রফেসার দেখলেন, হ্যাঁ গোকুলই পেছনে-পেছনে এসেছিল আর এখনও পা টিপে-টিপে বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। তাহলে গোকুল ফাঁদে ধরা দিচ্ছে। হ্যাঁ, সে একেবারে দ্বার প্রান্তে উপস্থিত হয়েছে। তাই ভালো, তাই ভালো। প্রফেসার ঘরের ভেতর গিয়ে প্রবেশ করলেন, সে ঘরের দ্বারও খোলাই রইল। ধরা দিতে আসছে গোকুল, অবাধেই এসে ধরা দিক। পাঁচ হাজার টাকার লোভ, গোকুলের মতো লোক ছাড়তে পারে না। প্রফেসার অন্ধকার ক্ষুদ্র-হলঘরটির এক প্রান্তে গিয়ে সুইচবোর্ডের কাছে দাঁড়িয়ে বইলেন।

গোকুল এসে পা টিপে-টিপে সেই ঘরেই উপস্থিত হল। দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছিল, এবার কোনদিকে এগোবে। উদভ্রান্তের মতো এখানে ছুটে এসেছে গোকুল, এবার যেন একটু বিচলিত হয়ে পড়েছে সে। হঠাৎ ঘরে আলো জ্বলে উঠল, উজ্জ্বল আলো। সে হকচকিয়ে গেল। পালাবে! এবার পালাতে হবে গোকুলকে। বাইরের দিকে মুখ ফেরাল সে। কিন্তু প্রফেসারের হাত আর কী করে এড়াবে? প্রফেসারের গম্ভীর স্বব শুনে থমকে দাঁড়াতে হল তাকে।

'দাঁড়াও। সাহস করে যখন ঢুকতেই পেরেছ, তখন আর পালাতে অত ব্যস্ত কেন? তাহলে শেষ পর্যন্ত তোমার সুবুদ্ধি হয়েছে?'

'আমি...আমি...যা আপনি তখন বললেন, তাব মানেটা ভালো করে বুঝতে চাই।'

'তা তো চাইতেই পার। কিন্তু তাব আগে আমার পবিচয়টা বোঝবার চেষ্টা করছিলে, কেমন? বাড়িটা না দেখা পর্যন্ত সারা রাস্তা তাই পেছনেই ছিলে। কিন্তু ভেতরে ঢোকবার সাহসটা হল কী করে?'

'তাতে আপনার যদি আপত্তি থাকে চলে যাচ্ছি।'

'আপত্তি থাকলে কি দরজা এমন কবে খুলে রাখি? তাছাড়া চলে যাওয়া এখন তোমার ক্ষমতার বাইরে। এস।'

প্রফেসার সে-কক্ষ থেকে আব এক কক্ষে গিয়ে প্রবেশ করলেন। গোকুল নিরুপায়। লোকটির ক্ষমতার যথেষ্ট পরিচয় সে ইতিমধ্যেই পেয়েছে। সত্যি, পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা এখন বৃথা। সে প্রফেসারকে অনুসরণ করল। প্রফেসার কক্ষেব আলো জ্বেলে টেবিলেব কাছে নিজের চেয়ারটিতে বসলেন মাথার টুপিটা খুলে রেখে। সম্মুখের দিকের একখানি আসন দেখিয়ে গোকুলকে আদেশ করলেন, 'বস।' আদেশ অমান্য করা গোকুলের পক্ষে সম্ভব নয়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বসল সে আসনে। প্রফেসার আবার মুখ খুললেন।

'কী নাম তোমার?'

'গোকুল।'

'কী করে চলে? এইরকম রাহাজানি?'

'না, রাহাজানি আপনি প্রথম করাচ্ছিলেন'

'আমি!'

'হ্যাঁ, সব রাস্তা যার কাছে বন্ধ, তাকে শয়তানের মতো অমন লোভ দেখালে সে কী করতে পারে?'

'পারে অনেক কিছু। তবু তোমার কথাই মেনে নিলাম। আর শয়তানের বদলে দেবদূতই তোমার নতুন রাস্তা খুলে দিচ্ছে—এও তো হতে পাবে?'

'আসল কথাটা কী আগে বলুন।'

'পাঁচ হাজারের জন্যে বড় বেশি অধীব হয়ে উঠেছ, না? সত্যিই পাঁচ হাজার তুমি পাবে।'

'পাব তো অনেকবাব শুনলাম, তার জন্যে কবতে হবে কী?'

প্রফেসার ড্রয়াব খুলে একখানি খাম নিযে তাব মধ্যে থেকে একখানি ফটো বের কবে গোকুলের সম্মুখে রাখলেন।

'ভালো কবে দেখ। এ ছবি যাব, তাকে আগে কোনওদিন দেখেছ?'

'না।'

'না দেখবাবই কথা। ঠিকানা ছবিব তলাতেই লেখা আছে। আমি যা-যা জানতে চাই, তাও। এই সমস্ত যত তাডাতাডি সম্ভব আমাকে এনে দিতে হবে।'

'এই আমাব কাজ?'

'আপাতত।'

'কিন্তু পাঁচ হাজাব যে আপনি দেবেন, তাতে বিশ্বাস কী?'

'বিশ্বাস না কবলে কিছুই নেই। টাকাব বদলে তোমায আমি জেলেও পাঠাতে পাবি। তবে বিশ্বাস কবাটাই বোধহয নিবাপদ। এখন যাও।'

শেষেব কথাটি উচ্চাবণ কবলেন প্রফেসাব দৃঢ আদেশেব সুবে। গোকুল উঠে দাঁড়াল। কিছুই স্থিব কবতে পাবছে না সে। অথচ পাঁচ হাজাব টাকাব লোভ। সে কিছু বলবাব জন্যে মুখ খুলল, বলল, 'দেখুন '

প্রফেসাব গম্ভীব কণ্ঠে বললেন ঃ 'কোনও কথা নয। শুধু কাজ।'

ছয়

আশ্চর্য ব্যাপাব। অতুল বিব্রত হয়ে পড়েছে। সে যখনই বাস্তায বেরোয় তখনই তাব মনে হয়, কে যেন তাকে অনুসবণ কবছে। বাড়িব কাছেও একজন লোক ঘুরে বেড়ায়, হয়তো কোনও মন্দ মতলব নিয়েই। এমনি একটা গভীর নৈবাশ্য এসেছে তাব জীবনে। বাবা যে সম্পদের আশায়-আশায় জীবনপাত করে গেলেন, সে সম্পদেব চাবিকাঠি যদি বা একদিন আবিষ্কৃত হল তাও বেহাত হয়ে গেল। ইলাকে পাওযাব তার যৌবনেব একান্ত অভিলাষ, তারই বা সম্ভাবনা কোথায? ইলা ঘৃণা কবে তাব ঐশ্বর্যকে। ধনীর দুলাল সে। এই তার অপরাধ। এরই জন্যে বিরূপ ইলা? আবাব এখন গুপ্তচব অতিষ্ঠ করে তুলেছে জীবনকে।

শুনে দ্বিজেনও বিস্মিত হয়েছিল। সে বলল, 'বল কী অতুল, তোমার পেছনে এর মধ্যেই লোক লেগেছে? তোমায় লুকিয়ে ফলো কবছে? কে সে?'

চিন্তাভারাক্রান্ত মুখে উত্তর দিল অতুল, 'চিনি না। যেই হোক, সে যে প্রফেসারের মানে ডাঃ সামন্তেরই লোক, এ বিষযে সন্দেহ নেই। ওই সামন্তের ওপর টেক্কা দিতে না পারলে আমার রাগ যাবে না।'

ইলা বলল, 'আপনাদের তো যা চেষ্টা করবার করেছেন; এবার আমি একবার দেখতে চাই।' অতুলের ওপর টেক্কা দিতে চায় ইলা।

অতুল বলে উঠল, 'তুমি? না, না, সে হতে পারে না। সে যে কী সাংঘাতিক লোক

তুমি ভাবতেও পারবে না। তুমি মেয়ে...'

ইলা কৌতুকে একটুখানি উচ্ছল হয়ে ওঠে, 'পুরুষের দৌড় তো দেখা গেছে, এবার মেয়েদের একটা চান্স দিয়ে দেখুন না। তুমি বেরিয়ে যেও না দাদা, তোমার সঙ্গে কথা আছে।' এই বলে ইলা বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

অতুল বলল দ্বিজেনকে উদ্দেশ্য করে, 'এটা কিন্তু খুব অন্যায় হচ্ছে দ্বিজেন।'

দ্বিজেন হতাশার সুরে বলল, 'কী করব বল ভাই। ও জেদি মেয়ে কি কারও বারণ শোনে।'

সত্যি জেদি মেয়ে ইলা, কারও বারণ মানে না। সে একবার চেষ্টা করে দেখবেই। পুরুষেরা যা পারেনি, সে মেয়ে হয়ে তাই করবে। প্রফেসারের কবল থেকে কবজিবন্ধটা উদ্ধার করতেই হবে।

ইলা একসময়ে গিয়ে উপস্থিত হল প্রফেসারের বাড়িতে। সে জানত প্রফেসার তখন বাড়ি নেই। কিছুক্ষণ আগে তিনি বেরিয়ে যাওয়ার পরই ইলা এসে উপস্থিত হয়েছে। ঘণ্টা বাজাতেই ভৃত্য কাঙালি এসে সদর দরজা খুলে দিল। ইলার মুখের দিকে চেয়ে সে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

ইলা জিজ্ঞাসা করল, 'ডাঃ সামন্ত বাড়িতে আছেন?'

কাঙালি মাথা নেড়ে জানাল, 'না, বাড়ি নেই।'

'কোথায় গেছেন?'

'জানি না।'

'কখন ফিরবেন?'

'জানি না।'

'কিন্তু তিনি যে আমাকে এই সময় আসতে বলেছিলেন।'

'কিন্তু তিনি যে খানিক আগেই বেরিয়ে গেছেন।'

'ভারি আশ্চর্য তো। আমার বিশেষ দরকার আছে। আমি ভেতরে গিয়ে একটু বসতে পারি?'

'আপনার ইচ্ছে।'

কাঙালি ইলাকে নিয়ে গিয়ে ভেতরে বসাল।

ইলা জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, কতক্ষণে তিনি ফিরবেন যেন মনে হয়?'

'ঠিক নেই।'

'ঠিক নেই? এ বাড়িতে তিনি ছাড়া আর থাকে কে?'

'কেউ না।'

'তুমি, তুমি কোথায় থাকো?'

'তাঁর না ফেরা পর্যন্ত এখানেই থাকি। তিনি এলে চলে যাই।'

'ও! আচ্ছা ডাঃ সামন্তর—কী বলে, বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন কেউ নেই?'

'জানি না!'

'কী যে তুমি জানো, সেটা একটা গভীর গবেষণার বিষয় সন্দেহ নেই।'

'কী বলছেন?'

'না বলছিলাম, কথা যখন দিয়েছেন, আমার মনে হয় নিশ্চয় তিনি আজ তাড়াতাড়ি ফিরবেন। আমি একটু অপেক্ষা করব।'

'যা আপনি ভালো বোঝেন।'

কাঙালি নিজের কাজে ব্যস্ত হল এবার। সে মনে-মনে ভাবছিল, মেয়েটা তো বড় অদ্ভুত। ওর মতলবটা কী—কে জানে? থাক, কাঙালি শুধু কাজই করে যাবে, এ নিয়ে যার মাথা ঘামাবার কথা তিনিই ঘামাবেন। ইলাও ভাবছিল। আর ফিরে-ফিরে চাইছিল কর্মরত কাঙালির দিকে। সে কাঙালিকে কাছে ডাকল। সত্যি, তার বলতে ভারি খারাপ লাগছে। বাড়িতে সে একলা আছে, কিন্তু না বলে উপায় তো নেই ইলার। কাঙালি যদি তার একটা কাজ করে দেয়, তাহলে সে বেঁচে যায়। কাঙালি কাছে এসে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইল ইলার দিকে। কত যে লজ্জা হচ্ছে ইলার বলতে কথাটা! কথাটা হল কাঙালিদের এই রাস্তা থেকে বেরিয়ে মোড়ের মাথায় যে ডাক্তারখানাটা রয়েছে, কাঙালি তা নিশ্চয় চেনে। হ্যাঁ চেনে বইকী কাঙালি। ইলা সেই দোকানেই সম্ভবত তার চশমাটা ফেলে এসেছে। একটা ওষুধ কিনতে গিয়েছিল ইলা। ভুলে সেখানেই চশমাটা ফেলে এসেছে নিশ্চয়। তাড়াতাড়ি কেউ গেলে এখনও পাওয়া যেতে পারে। একটু গিয়ে দেখে আসতে পারে কাঙালি? ইলা বকশিস দেবে কাঙালিকে, একখানা পাঁচ টাকার নোটই দেবে। দামি চশমা। খোয়া গেলে অনেক লোকসান হবে।

কাঙালি বলল, 'এখুনি যাওয়া দরকার?'

ইলা বলল, 'হ্যাঁ, বেশি দেরি হলে হয়তো পাওযাই যাবে না।'

'আচ্ছা।' বলে বেরিয়ে গেল কাঙালি।

ইলার পরিকল্পনা মতোই সব এগিয়ে যাচ্ছে এখনও। ভেবেছিল এই লোকটিকে নিয়ে বেগ পেতে হবে। কিন্তু না, বেশ বশংবদ ভৃত্যটি ডাঃ সামন্তর। যাকে বলে গুডবয়। কেমন নির্বিবাদে চশমার খোঁজ করতে ডাক্তারখানায় চলে গেল। ইলা তার হাতের ব্যাগ খুলে হাতে লেখা একখানা চিঠি খুলল। সেখানা টেবিলে এমন ভাবে খুলে চাপা দিয়ে রাখল যাতে যে-কোনও লোক সেখানে এলেই তা তার চোখে পড়বে। চিঠিখানা লিখেছে সে ডাঃ সামন্তকে।

মাননীয় ডাঃ সামন্ত,

আপনার সঙ্গে বিশেষ একটা বিষয়ে আলোচনা করবার জন্য এসেছিলাম। দুঃখের বিষয় আপনাকে বাড়িতে পেলাম না, আপনার ফেরার কোনও ঠিক নেই শুনেও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বাধ্য হয়ে চলে যাচ্ছি। পবে আবার দেখা করবার চেষ্টা কবব নমস্কাব জানবেন।

ইতি
ইলা সিংহ

চিঠিখানা রেখেই ইলা নিঃশব্দে পাশের ঘরে অন্তর্হিত হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরই বাইরের দরজা দিয়ে এসে প্রবেশ করল কাঙালি। কই, মেয়েটি তো নেই সে ঘরে? টেবিলে রাখা চিঠিখানা কাঙালির দৃষ্টি আকর্ষণ করল, সে হাতে নিয়ে পড়তে লাগল সে-চিঠি। তারপর আবার সেখানা যথাস্থানে রেখে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। মেয়েটিকে বেরিয়ে যেতে দেখেনি সে, তাহলে কি সে বাড়িতেই আছে? কাঙালি এঘর ওঘর খুঁজে দেখল তাকে, না কোথাও নেই।...

ওদিকে অতুল তার নিজের বাড়িতে পড়বার ঘরে টেবিলের ওপর হার্মাদ দস্যুর

কবজিবন্ধটা রেখে অভিনিবেশ সহকারে পরীক্ষা করছে। আরও কিছু কাগজপত্র ছড়ানো রয়েছে টেবিলের ওপর, কিছুক্ষণ পর এসে উপস্থিত হলেন সেখানে মুখুজ্জেমশাই। অতুলদের এস্টেটের নায়েব। আজকালকার লোক নয় তিনি, অতুলের বাবার আমল থেকেই তিনি রয়েছেন। অতুলের বাবা যখন সম্পত্তি হাতে পেয়েছেন, তখন থেকেই দেখছেন তিনি মুখুজ্জেমশাইকে। মুখুজ্জেমশাই এসে জিজ্ঞাসা করলেন অতুলকে, 'আমাকে ডাকছিলে?' তারপর তিনি একবার টেবিলের কবজিবন্ধ আর কাগজপত্রের দিকে চেয়ে আবার বললেন, 'ওগুলো আবার বের করেছ কেন? কর্তাবাবু তো ওই নিয়েই জীবনপাত করে গেলেন। আবার তোমাকেও ওই রোগে ধরল নাকি?'

অতুল হাসল। মুখুজ্জেমশাই-এর দিকে ফিরে চেয়ে বলল, 'ধরলে দোষ কী মুখুজ্জেমশাই? এ তো রোগ নয়, নেশা।'

মুখুজ্জেমশাই বললেন, 'নেশা! ও নেশা যে রোগের চেয়েও সাংঘাতিক। এ নেশা না ধরলে কর্তাবাবু বোধহয় আরও দিনকতক বাঁচতেন।'

কিছুক্ষণ নীবব রইল অতুল, দৃষ্টি তার জানলার ফাঁক দিয়ে সুদূরে নিবদ্ধ। তারপর মুখুজ্জেমশাইকে উদ্দেশ করে ধীর কণ্ঠে সে বলতে লাগল, 'আচ্ছা মুখুজ্জেমশাই, আপনি তো সেই থেকে আমাদের নায়েবি করছেন, এ জিনিস আমাদের বংশে কী করে প্রথম পাওয়া যায় নিশ্চয় জানেন?'

মুখুজ্জেমশাই বললেন, 'জানি আর কী করে বলি! তবে শোনা কথা কিছু বলতে পারি। কমলমীরের কথা জানো তো, যেখান থেকে তোমাদের রায়বংশের উন্নতির শুরু। ছোটখাটো রাজ্য হিসেবে সেই কমলমীরের তখন খুব নামডাক। হার্মাদবা সেই কমলমীরে একদিন হঠাৎ হানা দিয়ে সেখানকার রাজকুমারীকে ধরে নিয়ে যায়। কমলমীরের রাজা লোকলস্কর নিয়ে তাদের পেছনে ধাওয়া করেন। হার্মাদদের ধরতে না পারলেও জনমানবহীন এক জঙ্গলঘেবা চরে তাদের সর্দারের লাশ দেখতে পান রাজা। বুকে ছুরি বসিয়ে কে তাকে হত্যা করে পালিয়ে গেছে। সেখানেই পান তিনি কবজিবন্ধটাও। কিন্তু রাজকুমারীর কোনও সন্ধান মেলে না।

শুনতে-শুনতে যেন সেই সুদূর অতীতে চলে গেছে অতুল। কণ্ঠে তার যে স্বর ফুটে উঠল, তাও যেন দূরাগত, 'রাজকুমারীকে পাওয়া গেল না, কোথায় গেলেন তিনি?'

মুখুজ্জেমশাই বলতে লাগলেন, 'এ নিয়ে একটা কাহিনি মুখে-মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল কমলমীরে। চমকপ্রদ, চাঞ্চল্যকর কাহিনি সত্য বলেই জানত সবাই—অন্তত স্বীকার করে নিয়েছিল সত্য বলে।'

মুখুজ্জেমশাই বলে যান কাহিনি—রাজকুমারী আর হার্মাদ দস্যুর কাহিনি। অতুলের মনে হয় তার চোখের সম্মুখে যেন ভেসে উঠেছে সে দৃশ্য।

বসতিহীন একটা চর, ক্ষুদ্র একটা দ্বীপ যেন। তাকে বেষ্টন করে আছে অবাধ জলরাশি। চরে এসে অবিরাম আঘাত করে উত্তাল তরঙ্গ। বাতাস আর ঢেউ-এর শব্দ মিশে একটা হাহাকার ছড়িয়ে দেয় দিকদিগন্তে। চরে আছে বালিয়াড়ি আর রয়েছে ঘন অরণ্যানী। সে চরেই হার্মাদ দস্যুর আড্ডা। সেখানেই একদিন নিয়ে এল তারা রাজকুমারীকে। সঙ্গে প্রচুর ধনরত্নও তারা লুণ্ঠন করে নিয়ে এসেছে। অতুল সে ঐশ্বর্য। সম্রাটের ভাণ্ডার যেন!

সেদিন রাজকুমারীকে এক জায়গায় বেঁধে রেখে হার্মাদ-সর্দার অনুচরদের দিয়ে লুণ্ঠিত ধনরত্ন একটি গুপ্ত ধনাগারে গোপনে সরিয়ে রাখছিল। সে চরের মধ্যেই একটি স্থান বেছে

নিয়েছিল সর্দার। অনুচরেরা কাঁধেতে করে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে সেখানে ধনরত্নের পেটিকাগুলো। একে-একে যাচ্ছে তারা আবার ফিরে আসছে। সর্দার তাদের নির্দেশ দিচ্ছে একখানি পাথরে বসে আর কবজিবন্ধের ওপর নকশা আঁকছে সেই গুপ্তস্থানের। নইলে একদিন সে নিজেই হয়তো খুঁজে পাবে না সে সম্পদ কোথায় রাখা হয়েছে।

সমস্ত ধনরত্ন যথাস্থানে রেখে একে-একে ফিরে এল অনুচররা। সর্দার জিজ্ঞাসা করল, 'কী, ঠিক জায়গায় সব রাখা হয়েছে?'

প্রথম অনুচরটি উত্তর করল, 'হ্যাঁ, সর্দার, যমও এখন খুঁজে পাবে না।'

আর একটি অনুচর বলল, 'কিন্তু আমাদের সকলের এতে ভাগ রইল। বেইমানি যেন কেউ না করে।'

সর্দার উঠে দাঁড়াল, 'না, বেইমানি কেউ কবতে পারবে না। তা করতে আমি দেব না।'

সর্দার হঠাৎ পিস্তলটা টেনে নিল, গুলিভরা পিস্তল। অতর্কিতে সে অনুচরদের গুলি করতে আরম্ভ করল। নিরস্ত্র ছিল অনুচরেরা। তারা কী করে আত্মরক্ষা করবে? তারা সর্দারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার চেষ্টা করল। কিন্তু সর্দারের হাতে অনলবর্ষী হাতিয়ার। লক্ষ তার অব্যর্থ। কেউ আর আত্মরক্ষা করতে পারল না, কেউ বেঁচে বইল না। সর্দার অট্টহাস্যে ফেটে পড়ল। বলল, 'বেইমানি কাউকে করতে দেব না। হাঃ হাঃ।'

হার্মাদ সর্দার এবাব নিশ্চিন্ত! ধন-সম্পদে কেউ ভাগ বসাতে আসবে না আর। যারা জানত কোথায় তা রাখা হয়েছে, তাদের সবাইকে সে নিঃশেষ করে দিয়েছে। এখন আছে শুধু সে, তার ধনবত্ন আর তাব নারীরত্ন রাজকুমারী। সে এগিয়ে গেল এবার হস্তপদ আবদ্ধ রাজকুমারীর কাছে।

সে রাজকুমারীকে বলল, 'এবার কত দৌলত এই চরে! সব লুকিয়ে বেখেছি। আমার কথায় যদি রাজি হও তো সব তোমার।'

ঘৃণা আর ক্রোধে কুঞ্চিত হয়ে উঠল রাজকুমাবীর মুখ। রাজকুমারী দস্যু-সর্দারের ওপর থুথু ফেললেন। এই তার প্রস্তাবের উপযুক্ত উত্তর।

হেসে উঠল হার্মাদ সর্দার। সে কবজিবন্ধ দেখিয়ে বলল, 'লুকানো দৌলতের নকশা দেখেছ? এ নকশা না পেলে কেউ এ দৌলত খুঁজে পাবে না। আমি এ কবজিবন্ধ তোমাকে দেব। কি, রাজি?'

এবার মুখ ফেবালেন রাজকুমারী।

দস্যু সর্দার হাসতে-হাসতে গিয়ে আবাব নকশা নিয়ে বসল। সে জানত না, লক্ষও করেনি যে রাজকুমারী দীর্ঘকালের অবিরাম চেষ্টায় তাঁব হাত পায়ের বন্ধন অনেকটা শিথিল করে এনেছেন এখন সে বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবেন তিনি। কিন্তু বাঁধন কাটাই কি মুক্তি। এই জনহীন চর থেকে পালিয়ে যাবেন কোথায়? তাঁর মনে হল, কেন, ওই সমুদ্রের অগাধ জলে ঢেউ এর তলায়? সেখানেই তো তিনি আশ্রয় খুঁজে পেতে পারেন। তাই করবেন, তাই করবেন রাজকুমারী।

বন্ধন মুক্ত হয়েই সমুদ্রের দিকে ছুটে চললেন রাজকুমারী। হার্মাদ-সর্দার মুখ তুলে চেয়ে দেখল, রাজকুমারী পালাচ্ছেন। ছুটে গিয়ে তাঁর হাত ধরল। রাজকুমারী প্রাণপণে কামড়ে দিলেন সর্দারের হাত। মরিয়া হয়ে উঠেছেন তিনি—মুক্তি, মুক্তি তাঁর চাই। দু-পা পিছিয়ে গেল হার্মাদ সর্দার, হাত ছেড়ে দিয়ে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার সে এগিয়ে গেল তাঁকে ধরতে।

ততক্ষণে রাজকুমারী কুড়িয়ে হাতে নিয়েছেন সর্দারেরই তীক্ষ্ণ-ধার ছুরিখানি। উচ্চ হাসিতে ফেটে পড়ছিল দস্যু সর্দার। এ তার কাছে খেলা। একটি তরুণী নারী তার লৌহ-কঠোর হাতখানি কামড়ে দেয়, ছোরা হাতে নেয় তার সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে। সাহস মন্দ নয়! খেলা, শুধু খেলা। আবার এগিয়ে যায় দস্যু সর্দার রাজকুমারীকে সাপটে ধরতে। ধরতে কিন্তু সে পারে না। রাজকুমারী ততক্ষণে আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় তার হাতের ছোরা সর্দারের বুকে বসিয়ে দিয়েছেন। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সে। বুক থেকে ছোরাখানি সে টেনে বের করে, কিন্তু মৃত্যুকে রোধ করতে পারে না।

আর রাজকুমারী! কেউ বলে, তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন বুকে ছোরা বসিয়ে, আবার কেউ বলে, জলেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তিনি।

মুখুজ্জেমশাই বলেন, 'তোমাদের পূর্বপুরুষ সেই চরেই কবজিবন্ধটা কুড়িয়ে পান।'

আত্মস্থ হয় অতুল, বাস্তব জগতে সে ফিরে আসে। প্রশ্ন করে, 'আমাদের পূর্বপুরুষ মানে কমলমীরের তখনকার রাজা?'

'না।'

'না মানে? আমরা কমলমীরের রাজা ছিলাম না? কী বলছেন আপনি?'

'যা জানি, তাই বলছি। তোমাদের পূর্বপুরুষ তখন কমলমীরের দেওয়ান। পরে অবশ্য তোমাদের বংশ কমলমীরের রাজা হন।'

'আগের রাজবংশের কী হল তাহলে?'

'সেসব শুনে আর কী হবে? গল্পকথা কতরকমেরই আছে।'

'কী আছে তাই বলুন।'

'কেউ বলে রাজা নাকি মেয়ের শোকে দেওয়ানকে রাজ্য দিয়ে সপরিবারে রাজ্য ছেড়ে চলে যান। কেউ আবার বলে দেওয়ানই নাকি ফাঁকি দিয়ে সব কেড়ে নিয়ে রাজাকে তাড়িয়ে দেন।'

'ও, কমলমীরের অন্য একটি রাজবংশ তাহলে সত্যিই ছিল?'

'থাক আর না থাক এখন আর তাতে কী এসে যায়? কিন্তু ওই জিনিস নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করো না ছোটবাবু। ওই অভিশপ্ত জিনিস ছুঁলেও অকল্যাণ হয়।'

'হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হচ্ছে।'

বাসন্তীর কালো ছায়ায় গম্ভীর হয়ে উঠল অতুলের মুখ।

সাত

ডাঃ সামন্তের পাষাণপুরীতে প্রবেশ করে হারিয়ে গিয়েছিল ইলা। ইচ্ছা করেই হারিয়েছিল। আত্মগোপন করে বসেছিল সে। ক্রমশ রাত হয়ে এল, গভীর রাত। দ্বিজেনকে বলে এসেছিল ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে এখানে আসবার জন্যে। তার আসার সময় হয়ে এসেছে।

বাইরে রাতের আঁধারটা গাঢ় নয়। কারণ রাস্তায় আলো জ্বলছে আর আকাশে জ্বলছে তারা। কিন্তু পাষাণপুরী আঁধার, গাঢ় আঁধারে পরিপূর্ণ। সেখানে কেউ আলো জ্বালছে না। সেই আঁধার পুরীতেই এসে প্রবেশ করলেন প্রফেসার। হাতে তার একখানা কাগজ। তিনি নিজে বসবার ঘরে ঢুকে টেবিল ল্যাম্পটি জ্বেলে হাতের কাগজখানি পড়তে আরম্ভ করলেন। হঠাৎ সে আলোটা নিবিয়ে দিলেন তিনি। দূর থেকে একটা কাচের জিনিস ভাঙার শব্দ ভেসে এসেছে তাঁর কানে। তাঁরই বাড়ির ভেতরে কোথাও ভেঙেছে জিনিসটা। আঁধারের মাঝেই

একটা টর্চ হাতে নিয়ে এগিয়ে গেলেন প্রফেসার। তিনি শব্দ লক্ষ করে একটি ঘরে গিয়ে টর্চ জ্বাললেন। হ্যাঁ, ভগ্ন কাচের টুকরো আছে মেঝেতে। শুধু তাই নয়, কে একজন যেন লঘুপায়ে লুকিয়ে পড়ল। টর্চটা নিবিয়ে প্রফেসার একটুখানি সরে গিয়ে আত্মগোপন করে রইলেন। একটি মেয়ে বেরিয়ে এল ঘরের কোণ থেকে, তারপর পা টিপে-টিপে এগিয়ে চলল বাইরের দিকে। প্রফেসারও নিঃশব্দে এগিয়ে যেতে লাগলেন তাঁর পিছু-পিছু। সদর দরজা খুলে মেয়েটি বাইরে বেরিয়ে গেল, প্রফেসার স্পষ্ট দেখতে পেলেন। তিনি দরজার আড়ালে গিয়ে আত্মগোপন করলেন। বাইরে কে একজন দাঁড়িয়েছিল—তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল সেই মেয়ে, পেছনে দোরটা খোলাই রেখে এল। লোকটাকে চেনা যাচ্ছে না। গায়ে তার একটা কালো ওভারকোট, মাথার ফেল্ট হ্যাটটা মুখের ওপর টেনে দেওয়া। ওরা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল, প্রফেসারও দূর থেকে তাদের অনুসরণ করতে লাগলেন।

নবাগত লোকটি দ্বিজেন আর মেয়েটি ইলা। দুঃসাহসিক দুরন্ত ইলা। শেষ না দেখে সে ছাড়বে না। হ্যাঁ, অতুল যেখানে ব্যর্থ হয়েছে সেখানে তাকে সফল হতেই হবে।

একটি ঘরে প্রবেশ করে ইলা বলল, 'দাঁড়াও দাদা, শোন।'

দ্বিজেন ত্রস্ত কণ্ঠে চাপাসুরে বলল, 'দাঁড়া, দাঁড়া, এখনও আমার বুকেব কাঁপুনি থামছে না।'

'বেটা ছেলে হয়ে তোমার এত ভয়! আর আমি এত রাত পর্যন্ত এই বাড়িতে একলা বসে আছি। তাও কী ফন্দি করে এখানে ঢুকতে হয়েছে।'

'সেই জন্যেই তো তোর সাহস দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি।'

'আচ্ছা, প্রশংসা করবার অনেক সময় পাবে। এখন কাজটা আগে সারো। আমি বেশির ভাগ জায়গা খুঁজে দেখেছি, শুধু ওই আলমারিটা খুলতে পারিনি।'

'আচ্ছা চল দেখি।'

এগিয়ে গেল তারা আলমারির দিকে। ইলা দ্বিজেনের কানে-কানে বলল, 'যা-যা বলেছিলাম, এনেছ তো?' উত্তর দিল দ্বিজেন, 'হ্যাঁ, তা তো এনেছি।' সে পকেট থেকে চাবি বের করে আলমারি খুলতে গেল। প্রফেসার এগিয়ে এলেন কাছে, সেখানকার আলো হঠাৎ জ্বলে উঠল। তারা দুজন হকচকিয়ে উঠল, বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকাল প্রফেসারের দিকে।

প্রফেসার বললেন, 'উহুঁ চাবির আর দরকার হবে না। আলমারি খোলাই আছে।'

প্রফেসার গিয়ে আলমারির ডালা খুলে ধরলেন। তাঁর মুখে একটা কঠোর উপহাসের হাসি ফুটে উঠল। তিনি বললেন, 'যা খুঁজছ, তা এখানে কিন্তু নেই।' একটু থেমে আবার বললেন তিনি, 'এখন তোমাদের সম্বন্ধে কী আমার করা উচিত মনে হয়? পরের বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ ও চুরির চেষ্টা আইনে একটা অপরাধ বলেই বোধহয় গণ্য...'

দ্বিজেন এবার কথা বলল, 'দেখুন আমরা—'

ইলা বাধা দিল, 'চুপ কর দাদা!' কণ্ঠস্বর তার উগ্র; 'অপরাধ যখন আমরা করেছি, যা আপনার খুশি তাই আপনি করতে পারেন।'

প্রফেসার হাসিমুখে ইলার দিকে চাইলেন, 'বাঃ, যেমন দুঃসাহস তেমনি তোমার তেজও আছে স্বীকার করতেই হবে। তাই জিজ্ঞাসা করছি, যে জিনিস হেলায় একদিন প্রায় ফেলেই দিয়েছিলে হঠাৎ সেটা মরিয়া হয়ে খোঁজবার মতন দামি হয়ে উঠল কী করে।'

ইলা উত্তর দিল, 'কেন হল, আপনি নিজেই ভালো করে জানেন। ফাঁকি দিয়ে ঠকিয়ে যদি আপনি না সেটা...'

'ফাঁকি দিয়ে ঠকিয়ে?' বললেন প্রফেসার, 'দস্তুর মতো দাম যেন দিয়েছিলাম বলে আমার মনে হচ্ছে।'

দ্বিজেন বলল, 'দাম! দাম যা দিয়েছিলেন তা আমরা ফেরত দিতে চেয়েছি।'

প্রফেসার বললেন, 'দাম দিলেই বেচা জিনিস ফেরত পাওয়া যায়? কেনাবেচার এরকম নিয়ম তো আমার জানা নেই।'

দ্বিজেন মন্তব্য করল, 'ফেরত যে দেবেন না তা আমরা জানতাম।'

মাথা নাড়লেন প্রফেসার, 'সুতরাং চুরির মতলব করেছিলে।'

প্রতিবাদ করল ইলা, 'না, চুরি করতে আমরা আসিনি। শুধু ফাঁকি দিয়ে যা আমাদের কাছ থেকে নিয়েছেন সেই নকশাটা নকল করে নিতে এসেছিলাম।'

'অতি সাধু উদ্দেশ্য।' বললেন প্রফেসার নির্বিকার কণ্ঠে, 'এই যদি উদ্দেশ্য হয় তাহলে নকলের দরকার কী? আসল জিনিসটাই নিয়ে যেতে পার।'

প্রফেসার পকেট থেকে কবজিবন্ধটা বের করে তাদের একজনের হাতে দিলেন। দ্বিজেন ও ইলা বিস্ময়ে কিছুক্ষণের জন্য কোনও কথা খুঁজে পেল না। বলল, 'আপনি আমাদের দিচ্ছেন?'

দিচ্ছেনই তো। উদারহৃদয় আজ ডাঃ সামন্ত। ওদের সন্দেহের কোনও কারণ নেই, এটা আসল জিনিসই। কেন তিনি দিচ্ছেন, এর মানেও একটা নিশ্চয় আছে। বুঝিয়ে বলতে বাধা নেই প্রফেসারের। মুক্তকণ্ঠ সত্যসন্ধ প্রফেসার। 'এ নকশা তো আধখানা মাত্র। এর জুড়ি না পাওয়া পর্যন্ত এ নকশার কোনও দামই নেই।' শুনে ইলা আর দ্বিজেন পরস্পরের মুখের দিকে চাইল।

প্রফেসার বললেন, 'এখন চল, বাইরের দরজাটা খোলা আছে।'

সদর দরজার কাছ পর্যন্ত প্রফেসার তাদের এগিয়ে দিলেন। তখন কোথা থেকে এসে কাঙালিও তাঁর পেছনে দাঁড়িয়েছে। ওরা যখন বেরিয়ে যাবে, তখনই আবার ডাকলেন ওদের প্রফেসার, 'একটু দাঁড়াও।' তিনি কাঙালির হাত থেকে নিয়ে ইলার ব্যাগটা এগিয়ে ধরলেন তার দিকে, বললেন, 'এই ব্যাগটা বোধহয় তোমারই। চশমাটাও এরই মধ্যে আছে।' ইলা হাত বাড়িয়ে ব্যাগটি নিল।

প্রফেসার এবার গুড নাইট বলে, সদরটা বন্ধ করে দিলেন।

বন্ধ দরজার দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ইলা আর দ্বিজেন।...

বিধাতা বুঝিবা পরিহাস করতে আরম্ভ করেছেন ইলাদের সঙ্গে। যে করেই হোক ইলা যদিবা হাতছাড়া নকশাটার আধখানি উদ্ধার করল, তো অতুল বাকি আধখানা হারিয়ে বসে আছে। এ কী করল অতুল। কী বিপদের ঝুঁকি নিয়েছিল ইলা। প্রফেসার ইচ্ছা করলে তাকে পুলিশে দিতে পারতেন। কেলেঙ্কারীর অন্ত থাকত না। তা ছাড়া, কী চোখা-চোখা কথাই না শুনতে হয়েছে সেখানে! তবু সব ভালো হতো, যার শেষ ভালো। কিন্তু শেষ ভালো হয়েও হল না।

ইলা বলল অতুলকে, 'ছিঃ-ছিঃ, কী করেছেন বলুন তো! যেমন করে হোক একটা যদিবা জোগাড় হল, তার আগেই আপনি আরেকটা ফেলে দিলেন। ফেলবার কী দরকার ছিল?

কী দরকার ছিল! রেখেই বা লাভ হচ্ছিল কী। অধিকন্তু অভিশপ্ত ওই কবজিবন্ধ। ওটা কাছে রাখাও অকল্যাণকর। সত্যি বলেছেন মুখুজ্জেমশাই। এরই জন্যে আবার গুপ্তচর

লেগেছে পেছনে। জীবন অসহ্য হয়ে উঠেছে। ভয়? না ভয় তেমন করে না অতুল কিন্তু ঝঞ্ঝাটাই কম কী? ঝঞ্ঝাটের মূলটাই তাই সে বিদায় করে দিয়েছে।

হতাশ হয়ে পড়ল দ্বিজেন ও ইলা দুজনেই।

কিন্তু অতুল আশ্বাস দেয় তাদের, 'এত হতাশ হচ্ছ কেন তোমরা? জিনিসটা ফেলে দেওয়া হয়েছে বলে কি সব রাস্তাই বন্ধ হয়ে গেছে? কাল সমীরের বাড়িতে যখন আমাদের চারজনের বৈঠক বসবে, তখন আমি সব বুঝিয়ে বলব। ওই গুপ্তধনের পিছু ছাড়তে রাজি নই আমি। পথ একটা পাওয়া যাবেই।'

সমীরের বাড়িতে বৈঠক বসল তাদের। অতুল, দ্বিজেন, সমীর আর ইলা। টেবিলের ওপর একখানা ম্যাপ খোলা রয়েছে। তারই কাছে একখানি কবজিবন্ধ। অতুল সমীর আর দ্বিজেন ঝুঁকে পড়েছে ম্যাপখানার ওপর। কিন্তু ইলা বসে আছে একটু দূরে। তার শুধু মনে হচ্ছে, এ ব্যর্থ চেষ্টা।

ম্যাপের মধ্যে একটা স্থানের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলল অতুল, 'জায়গাটা যে এখানেই কোথাও হবে এ-বিষয়ে কোনও ভুল নেই বলেই আমার বিশ্বাস। এখন কথা হচ্ছে আমাদের আসল অভিযানের আগে জায়গাটার শুলুক সন্ধান কে নিয়ে আসবে?'

সমীর তৎক্ষণাৎ বলে উঠল, 'আমার নামটা কিন্তু আগেই কেটে রাখ।' অতুলের প্রশ্নের উত্তরে সমীর আরও জানাল, 'তোমাদের সঙ্গে শখের গুপ্তধনের সন্ধানে যেতে রাজি হয়েছি বটে, কিন্তু একা-একা ওইসব তদন্ত তল্লাস এ আমার পোষাবে না।'

দ্বিজেন বলে, 'বেশ কথা। শখের সন্ধান যখন, তখন গুপ্তধন পেলেও বখরা নেবে না বোধহয়।'

হেসে উঠল সমীর, 'আরে গুপ্তধন পেলে তবে তো বখরা।'

সমীর ভাবে ওরকম গুপ্তধন কি কখনো সত্যি পাওয়া যায়? মজাটুকুই শুধু সার! তার বন্ধুরা বলে যে তাহলে মজাই শুধু পড়ুক সমীরের ভাগে। কিন্তু ইলা নীরবতা ভঙ্গ করে এবার সরব হতে বাধ্য হয়। কী আশ্চর্য! এরা একবারে বখরার কথা নিয়েই মেতে উঠেছে। গাছে না উঠতেই এক কাঁদি! কবজিবন্ধ ফেলে দিয়েছে অতুল। হাতে আছে মাত্র একটি। নকশার আধখানা নিয়ে তারা খুঁজে বার করবে, কবজিবন্ধটা ফেলে দিলেও নকশাটা তো টুকেও রাখা যায়? এতে করে বিপদের হাতও এড়ানো গেছে, আবার কাজ হাসিলের উপায়টাও হাতে রয়েছে। তাই—অতুলের এত উৎসাহ, এত বৈঠক এত তোড়জোড়। কিন্তু হায়রে, সবাই আনন্দে উন্মাদ হয়ে উঠেছে। কিন্তু সেই ঘুঘু প্রফেসারটি তাহলে কবজিবন্ধের নকশার নকল রেখে তবে তা উদারতার সঙ্গে ভালোমানুষের মতো তাদের হাতে তুলে দিয়েছে। এতক্ষণে হয়তো সে আরও কত কী ফন্দি এঁটে ফেলেছে। সুতরাং নির্বিঘ্নে গিয়ে গুপ্তভাণ্ডারে পৌঁছবার সম্ভাবনা কোথায়? কিন্তু তারা—অতুলরা কি বুঝতে পারছে না পরিস্থিতিটা কী দাঁড়াতে পারে?

অতুল আশ্বস্ত করল ইলাকে। মনে-মনে সে ভাবল, ইলা মনে করে সেই বুঝি সমস্ত বুদ্ধির অধিকারিণী হয়ে বসে আছে, প্রকাশ্যে বলল, 'অবস্থাটা বুঝতে পারছি বলেই আমাদের আর এতটুকু সময় নষ্ট করবার উপায় নেই। আমার এখানে কিছু কাজ আছে। তোমাকে তাই তদন্ত তল্লাসের কাজটা নিতে হচ্ছে দ্বিজেন।'

দ্বিজেন বলল, 'আমাকে?'

অতুল উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, তোমাকেই, এই যে ম্যাপে দেখছ জায়গাটা—এই শহরটা

একটা ছোটখাট বন্দর। এখান থেকেই নৌকা ভাড়া করে আসল জায়গাটার খবর তোমাকে নিয়ে আসতে হবে।'

দ্বিজেন বলল, 'অগত্যা!'

যাত্রা করল দ্বিজেন সেই বন্দরের দিকে। অভিযানের পথঘাট দেখে নিয়ে জায়গা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে দ্বিজেনকে। সে অভিযানের অগ্রগামী সৈনিক। অচেনা অজানা পথে যাত্রা তার। সাফল্য দেবে সম্পদ; কিন্তু অসাফল্য? অসাফল্যের কল্পনা করে পিছিয়ে পড়লে সাফল্য কখনও আসেনা। কমলমীরের রাজবংশের সন্তান দ্বিজেন। আজ রাজ্য নেই, সম্পদ নেই। নেই কিছুই বলতে গেলে। বিধাতা যদি বা গুপ্তভাণ্ডারের পথটা ঘটনাক্রমে দেখিয়ে দিয়েছেন, এখন তাকে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে চলবে না। এগিয়ে যেতেই হবে তাকে। যারা মজা উপভোগ করতে চায় করুক, দ্বিজেন চায় ঐশ্বর্য! মজা নয়, রাজা হতে চায় সে। কমলমীরের রাজবংশে জন্ম তার।

আট

ম্যাপে চিহ্নিত সেই শহর। শহরে করালীচরণের হোটেল। করালীচরণ হোটেলের নামকরণ করেছে তার বাবার নামে—'বাঞ্ছারাম পান্থ-নিবাস।' পরিচালনা করে করালীচরণ নিজে—হিসেবি করালীচরণ। টাকাপয়সা হিসেব নিকাশের বেলা দুর্মুখ সে। বেশ চালিয়ে যাচ্ছিল সে হোটেলটা কিন্তু ইদানিং সেখানে এসে একদল ভবঘুরে বেকার আশ্রয় নিয়েছে। মাসের পর মাস কাটিয়ে দিচ্ছে, টাকাপয়সা দেওয়ার নাম নেই, অথচ দল বেঁধে তারা হোটেলে হট্টগোল করে বেড়ায়। তারা হৈ হল্লা করে, তাড়িয়ে দিলেও হোটেল ত্যাগ করে না। তারা গান বাঁধে, সবাই মিলে কোরাস গায় লোক হাসায় আর নিজেদের হাসায়। করালী কিন্তু হাসে না, যা তা বলে তাদের। কিন্তু ওরা বলে, পেটে খেলে পিঠে সয়। অবশেষে খাবারও বন্ধ করে দিয়েছে, হোটেল পরিভাষায় মিল বন্ধ। কিন্তু তাতেও কিছু ফল হয় না। ওরা সেই হোটেলের ঘরেই হাঁড়ি কুড়ি উনুনের আমদানি করেছে। রান্না করেই খায় তারা। কয়লা নিয়ে আসে হোটেলের ভাণ্ডার থেকে, যেদিন জোটে না সে দিন চাল-ডালের দিকেও হাত বাড়ায়, বলে ধার নিচ্ছি বই তো নয়। ধারেই দুনিয়াটা চলছে। এমন যে ইংরেজ রাজ, ধার ছাড়া তাঁরও চলে না। ইংলন্ডও আমেরিকার কাছে ধার করে তবে খাচ্ছে। করালী মাথায় হাত দিয়ে বসে আর ভাবে, এদের হাত থেকে কী করে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়!

কিন্তু সম্প্রতি করালী সত্যি-সত্যি কঠোর হয়ে উঠেছে। কড়া নির্দেশ দিয়েছে। ওইসব না-দেনেওয়ালা অধিবাসীরা যদি রান্না করে খায় এখানে, তাহলে সেসব জিনিসপত্র বাইরে ফেলে দেবে অথবা পুলিশ ডাকবে। এসব আর সে সইবে না।

সেদিন করালী গেছে নতুন পান্থ সংগ্রহে, এদিকে ততক্ষণে বাঞ্ছারাম পান্থ-নিবাসের বারান্দায় বেকার বাউন্ডুলে পান্থরা চায়ের আসর বসিয়েছে। স্টোভে জল গরম হচ্ছে, সাজ সরঞ্জাম সব পাশে রাখা। টগবগ করছে জল, এইবার—কিন্তু বিপদ! দলের একজন রাতুল দৌড়ে এসে সতর্ক করে দিল সবাইকে করালী আসছে তার করাল বদন ব্যাদন করে। সাবধান! সবাই সব কিছু লুকিয়ে ফেলল, স্টোভও নিভাতে হল।

করালী সত্যি নতুন পান্থ নিয়ে এসেছে স্টেশন থেকে। কুলির মাথায় মালপত্র—পেছনে বাবুটি। বাবুটি আমাদের দ্বিজেন।

তারা সব বসে গেছে তখন গোল হয়ে, তাস খেলছে। ন্যাড়া বসে আছে তাদের

পাশে, মনোযোগ দিয়ে খেলা দেখছে। একেবারে অখণ্ড মনোযোগ।

করালী অভ্যাগতকে একখানি চেয়ারে বসিয়ে কুলির আনা মালপত্র সামনে রাখল। কাছে এগিয়ে এল রাতুল। সে খেলার দলে ছিল না।

রাতুল অতি বিনয়ের ভঙ্গি করে বলল, 'নতুন বোর্ডার এল বুঝি বাবু?'

করালী বলে উঠল মুখ খিঁচিয়ে, 'হ্যাঁ, এল। কিন্তু আপনি? আপনাকে না সাতদিন আগে নোটিশ দিয়েছি, আপনি এখনও এখানে আছেন যে?'

'না থেকে পারি দাদা?' বলল রাতুল, 'একটু মায়া পড়ে গেছে যে। কী বল ভাই!'

ওরা সবাই এক সুরে বলে উঠল, 'ঠিক ঠিক। মায়া পড়বারই কথা। হোটেল তো নয় এ যেন নিজের ঘর!'

করালী হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠল, 'নিজের ঘর। পাঁচমাস ধরে আপনার হোটেলের টাকা বাকি! বলছেন কী না নিজের ঘর! আজই এখুনি আপনাকে সিট ছেড়ে দিতে হবে।'

রাতুল হাসল, 'কী যে বলেন! এ সিট ছেড়ে যাওয়া যায়, এ যে রক্তের টান।'

করালী দু-চোখ কপালে তুলল, 'রক্তের টান!'

স্বীকৃতির ভঙ্গিতে মাথা দুলিয়ে বলল রাতুল, 'হ্যাঁ রক্তের টান! আমি গুণে দেখেছি ঠিক এগারোশো একান্নটি আমার Blood relation যাকে বলে রক্তের সম্পর্কে পরমাত্মীয় দিবারাত্র কিলবিল করছেন সিটখানিতে। তাঁদের ছেড়ে কী চাই বলুন?'

ন্যাড়া গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'গেলে অধর্ম হবে।'

তার দিকে চেয়ে করালী বলল তীক্ষ্ণ কণ্ঠে, 'খুব যে ফোড়ন কাটছেন! নিজের মামলা আগে সামলান তো? পাঁচ-পাঁচ মাস হোটেলে একটা পয়সা দেননি সে হুঁস আছে?'

ন্যাড়া বলল, 'তা আর নেই! কিন্তু তেমনি আপনার নতুন একটি বোর্ডারকে ভুজুং ভাজুং দিয়ে আনল কে? এ হোটেলে শমন জারি না করলে কেউ আসে?'

'কী! এত বড় কথা?' রাগে কাঁপতে লাগল করালী, 'এখুনি চুকিয়ে দিন আমাব সব টাকা। নইলে সিট ছেড়ে দিতে হবে আপনাকে আজই।'

দ্বিজেন উঠল তখন। ওই দলটির কাছে এসে দাঁড়াল!

ন্যাড়া তখন বলছে, 'আজই! বললেই হল? পাঁজি দেখেছেন?' করালী অবাক হল, 'পাঁজি! পাঁজি দেখতে যাব কেন?'

ন্যাড়া বলল, 'বা, পাঁজি দেখতে হবে না? দিনক্ষণ না দেখে কি যাওয়া যায়? পাঁজি খুলে দেখুন, পরপর তিনটে মাস হল মল মাস। কুত্রাপি যাত্রা নাস্তি। তাছাড়া আপনার তো কোনও ক্ষতি হচ্ছে না। মিল তো আমাদের বন্ধই করে দিয়েছেন।'

'দেব না তো করব কী?' খিঁচিয়ে উঠল করালী, 'এটা হোটেল না অতিথিশালা? এগুলো কী? বলি এসব এখানে কী?' করালী তাদের চায়ের সরঞ্জাম, উনুন, হাঁড়িকুড়ি আবিষ্কার করেছে।

রাতুল বলল, 'কী দেখতেই তো পাচ্ছেন। উনুন, কেটলি, হাঁড়িকুড়ি'...

হাবুল বলল, 'আপনি মিল বন্ধ করেছেন বলে আমরা রেঁধেই খাচ্ছি।'

গর্জে উঠল করালী, 'নিজেরাই রেঁধে খাচ্ছেন। আমারই হোটেলে মিনি মাগনায় থেকে আবার সেখানেই নিজেরা রেঁধে খাচ্ছেন। না, আর কোনও কথা শুনব না। যান, বেরিয়ে যান। সকলে এখান থেকে বেরিয়ে যান এক্ষুনি, নইলে পুলিশ ডাকব।'

ন্যাড়া বলে উঠল অদ্ভুত এক ভঙ্গিতে, 'ছিঃ।'

রাতুল বলল, 'ছিঃ।' অন্যান্যরা প্রতিধ্বনি তুলল, 'ছিঃ।'

কিন্তু করালীর এক কথা, 'ছিঃ মানে? আপনারা না গেলে পুলিশ আমি ডাকবই।'

রাতুল উত্তর দিল, 'আহা, ডাকুন না, কিন্তু তার আগে আমাদের একটা উপায় বাতলে দিন। কোথায় এখন যাই বলুন।'

করালী বলল, 'তার আমি কী জানি। যেখানে খুশি যান। হাটে মাঠে, ঘাটে, জঙ্গলে।'

ওরা সবাই বলে উঠল, 'জঙ্গলে!'

রাতুল করুণ কণ্ঠে বলল, 'জঙ্গলে? জঙ্গলে যাব? তাহলে যাই—সেই যে গানটা, কী বলিস ন্যাড়া? আমাদের করালীবাবুকে শুনিয়ে দিয়ে যাই, যাবার আগে। সবাই শুনুক।'

ওরা সমবেত কণ্ঠে সেখানে দাঁড়িয়েই গান ধরল। দ্বিজেন কৌতুকভরে দাঁড়িয়েই আছে। কী বিচিত্র মানুষরাই আছে দুনিয়ায়। অভাব, অনটন অপমান, লাঞ্ছনার মাঝেও ওরা সান্ত্বনা খুঁজছে এই গানের মধ্যে!

ওরা গাইতে লাগল ঃ

যাই যাই যাই যাই, যাই যাই যাই যাই
বনেই চলে যাই।
দুনিয়াটা তো দেখলাম চেয়ে কোন সোয়াদ নাই।
যাই যাই যাই যাই।

খেতে হলেই খাটতে
(আর) কোথাও যেতে হলেই হাঁটতে
উঠতে গেলে পড়তে
(আর) বাঁচতে হলেই মরতে হয় যে ছাই।
যাই যাই যাই যাই।
যতই কেন দেখ নাকো তুলসি পাতা ধোয়া।
কোনখানে পাবে না ভাই ছেলের হাতের মোয়া।
ভাবছ যেটা মিছরি সেটা অতি বিশ্রী পাথরকুচি।
হায়রে দাদা জীবনখানা তাই
যাই যাই যাই যাই।
বনে চলে যাই।

করালী রাগে গজ-গজ করতে-করতে সেখান থেকে চলে গেল। ওদের নিয়ে পারবার উপায় নেই। হোটেলটাকে একটা পাগলা গারদ করে তুলেছে। দ্বিজেন কিন্তু খুব উপভোগ করছিল ওদের ওই গানটা। সে এগিয়ে এসে বলল, 'দেখুন, আমি এসে আপনাদের কিছু অসুবিধা করলাম মনে হচ্ছে।'

ন্যাড়া হাসতে-হাসতে বলল, 'না, না, মোটেই না। কী যে বলেন।'

রাতুল প্রশ্ন করল, 'কিন্তু আপনি স্থাবর না অস্থাবর? মানে পার্মানেন্ট না টেম্পরারি?'

হাসতে-হাসতে উত্তর দিল দ্বিজেন, 'টেম্পরারি। একটা জায়গা খুঁজে কালই এখান থেকে চলে যাব।'

ওদেরই দলের আর একজন বলল, 'জায়গার খোঁজে যাবেন? তা আমাদেরই নিয়ে যান না মশাই। ম্যানেজারের দাঁত খিঁচুনি আর সহ্য হয় না।'

দ্বিজেন অরাজি নয়, 'বেশ তো চলুন না। কাউকে সঙ্গী পেলে তো ভালোই হয়।'

রাতুল প্রশ্ন করে, 'জায়গাটার নাম কী মশায়?'

দ্বিজেন বলে, 'নাম তো এখনও ঠিক জানি না। তবে যতটুকু লোকে জানে—ওটাকে নাকি ডাকিনীর চর বলা হয়।'

সবাই সমবেত কণ্ঠে বলে উঠল, 'কী বললেন, ডাকিনীর চর! আপনি সাধ করে সেখানে যাচ্ছেন?'

তারা সকলে হতাশভাবে মেঝেতে বসে পড়ল। তাদের হাবভাব দেখে হেসে উঠল দ্বিজেন।

ডাকিনীর চরে যাত্রা করল দ্বিজেন একখানি নৌকা করে। হোটেলের বাউন্ডুলে দলের ন্যাড়াকে সঙ্গী করল সে।

সে যত চরের কাছাকাছি এগোতে লাগল, ততই মনে হতে লাগল সত্যিই সেখানে শুধু ভূতেরাই বাস করে। ওই বিশাল দিগন্তহীন জলধির একপাশে যে চরটি মাথা তুলে আছে তার বালুকারাশি আর ঘন বনের পাহাড় নিয়ে—তাতে কোনও জনবসতির চিহ্ন চোখে পড়ে না। দূর থেকে দূরবীণ নিয়ে দেখতে চেষ্টা করে দ্বিজেন চরটাকে। না, কোথাও কোনও ঘরবাড়ির চিহ্ন নেই। এমনি একটি নির্জন চরেই হার্মাদ দস্যুর পক্ষে ধনসম্পদ লুকিয়ে রাখা সম্ভব। কেউ দেখবে না, কেউ জানবে না। জানত সে, চাষি চাষ করতে আসবে না সেই চরে। বুঝেছিল এখানে কেউ এসে কারখানা বসাবে না। এর মাটিতে ফসল ফলবে না, এর পাহাড়ে কেউ ঘর বাঁধবে না।এখানে শুধু বাস করবে অশরীরী আত্মা। তারাই পাহারা দেবে তার ধনরত্ন, তারাই মানুষদের বাধা দেবে ভয় দেখিয়ে এখানে আসতে। কিন্তু আজকার যুগের কোনও শিক্ষিত মানুষ কি বিশ্বাস করতে পারে যে, মানুষজন নেই বলেই, চরে ভূতের মেলা বসে? তারা হাসে, কাঁদে, কলহ-বিবাদ করে শরীরী মানুষদের দূরে ঠেকিয়ে রাখে? হার্মাদ দস্যুও কি এতটুকু বিশ্বাস করত? করলে সেখানেই বা তার সর্বস্ব পুতে রাখল কেন?

সাহসে বুক বাঁধল দ্বিজেন। দূরে থেকে, দৃশ্যত যতই ভয়াবহ মনে হোক না কেন চরটাকে, আসলে তা তেমন ভয়াবহ হবে না। আর যদি হয়ও তথাপি চেষ্টা করে দেখতে হবে তাদের। একদিন তাদেরই পূর্বপুরুষ রাজকুমারীর খোঁজে এই চরে এসে হানা দিয়েছিলেন।

দিনের বেলাই দ্বিজেনদের নৌকা এসে চরের কাছে ভিড়ল।

আশ্চর্যের ব্যাপার! একেবারে জনহীন নয় চরটা? জনহীন নয়, একটি তরুণী নারী রয়েছে সেখানে। কিছু দূরে একটি ঝোপের পাশে বসে তরুণীটি জলরাশির দিকে চেয়ে আছে। তরুণীর দৃষ্টি আগে হয়তো পড়েনি নৌকার দিকে। তীরে ভিড়বার পর তার দৃষ্টি সেদিকে পড়ল। সে উঠে দাঁড়াল না, চঞ্চলা হরিণীর মতো দ্রুত চলে যেতে লাগল একদিক লক্ষ করে। নির্জন দ্বীপে তরুণী! তরুণী সুন্দরী। দেহের সাজসজ্জা, গলার মালা, পরনের শাড়ি বিচিত্র ধরনের। তথাপি বেশ লাগে তাকে। দ্বিজেন ভাবে, তবে কি এও আর এক রাজকুমারী! কেউ হরণ করে নিয়ে এসেছে? সে কী করে হয়! কোথাই বা এখন রাজকুমারীর দল, আর কোথাই বা হার্মাদ দস্যুরা? তবে দস্যুরা আজও রয়েছে চরে। আর আছে নারী-লোলুপতা।

দ্বিজেন নৌকা থেকে নেমে দ্রুতপদে অনুসরণ করতে লাগল তরুণীকে। তরুণী বার বার ভীত দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছিল পেছনদিকে।

তাই তো! ঘনবনের আড়ালে একখানি কুটির রয়েছে। গাছপালা আর পাতা দিয়ে

তৈরি। চঞ্চলা ভীতা তরুণী গিয়ে সেই কুটিরে প্রবেশ করল। দ্বিজেন তরুণীর পশ্চাতে এসে সেই কুটিরের সামনে দাঁড়াল। তরুণী তখন কুটিরের দোরের অন্তরালে হারিয়ে গেছে। বিস্মিত হল দ্বিজেন।

আরও বিস্ময় আর রোমাঞ্চ অপেক্ষা করেছিল দ্বিজেনের জন্যে। সে দোরের বাইরে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছিল, এবার কী করবে—হঠাৎ কুটিরের মধ্যে থেকে দোরের মধ্য দিয়ে প্রচণ্ড বেগে একটা বর্শা এসে তার কাছে মাটিতে পড়ল। তার ভাগ্যই বলতে হবে বর্শাটা তাকে বিঁধল না, বিঁধল সেখানকার মাটি। এক মুহূর্ত চিন্তা করল দ্বিজেন, তারপর সে এমন ভাবে পা দিয়ে শব্দ করতে লাগল যেন সে দৌড়ে পালাচ্ছে। কিছু দূর গেলেও আবার ফিরে দোরের এক পাশে দাঁড়াল। এমনভাবে দাঁড়াল, যাতে কেউ দোর খুললেও সে দোরের আড়ালে পড়ে যায়।

ভেতর থেকে বেরিয়ে এল তরুণী নয়, একটি বৃদ্ধ, হাতে তার ক্ষুদ্রাকৃতি ধারাল ফলার মতো একটি অস্ত্র। বৃদ্ধের চোখ দুটি জ্বলছে, মুখ আতঙ্কে ও ঘৃণায় বিকৃত হয়ে উঠেছে। চরে লোক এসেছে, কেন এসেছে? অন্য কোনও লোককে সে সইবে না এখানে। বৃদ্ধ হলেও ঝড়ু মাঝির বিশাল বুকে এখনও সাহস আছে, দেহের শক্তি নিঃশেষিত হয়ে যায়নি এখনও।

দ্বিজেন প্রস্তুত হয়েই ছিল। বৃদ্ধ বেরিয়ে এসে যখন দূরের দিকে চাইছিল, তখনই পেছন থেকে অতর্কিতে সে ঝড়ু মাঝির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দুজনে রীতিমতো লড়াই শুরু হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর দ্বিজেন কাবু করে ফেলল বুড়োকে, তার হাত থেকে অস্ত্রখানি কেড়ে নিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। বর্শাটিও দ্বিজেন হস্তগত করেছে।

ধুলো ঝাড়তে-ঝাড়তে ঝড়ু মাঝিও উঠে দাঁড়াল।

দ্বিজেন হাসতে-হাসতে বলল, 'কী বুড়ো! এটা কীরকম খাতির! আর একটুখানি হলেই একেবারে সাবাড় করে ফেলেছিলে যে?'

ঝড়ু মাঝি বলল ক্রুদ্ধকণ্ঠে ঃ 'করতামই তো সাবাড়। বুড়ো হয়েছি তাই! আর থাকত আমার দুই বেটা, তাহলে দেখতাম কেমন দাঁত বের করে আজ হাস তুমি!'

'এই তোমাদের এখানকার রেওয়াজ নাকি! অতিথি সজ্জন ভালো মানুষ তোমাদের চরে এলে কোথায় খাতির যত্ন করবে, না একেবারেই এফোঁড়-ওফোঁড়। শোন, আমি নতুন মানুষ। এখানকার কিছু জানি না। তাই তোমার সঙ্গে একটু আলাপ করতে এলাম।'

'না, না, আলাপ আমি কারও সঙ্গে করি না। অতিথি সজ্জন ভালোমানুষ! ভালোমানুষ হলে কেউ এই চরে শখ করে আসে? তুমি বদমাশ, তুমি শয়তান। আমি তোমাকে দেখেই চিনেছি। ভালোয়-ভালোয় এ চর ছেড়ে যাবে তো যাও, নইলে—'

'নইলে আমায় মেরেই তাড়িয়ে দেবে? কেমন? কিন্তু বুড়ো মানুষ, সে ক্ষমতা তোমার কি আর আছে? আমি যদি জোর করে থাকি, কী করতে পারো তুমি?'

'আমি না পারলে পারবার কেউ নেই ভেবেছ? ভেবেছ জোর করে এখানে থাকবে? তোমার চেয়ে অনেক জোরালো মরদ এখানে এসেছে, তাদের আজ চিহ্নও খুঁজে পাবে না। কেন এ চরে জনমনিষ্যি নেই জানো? কেন আকাশের পাখি-পাখালি পর্যন্ত এখানে নামতে ভয় পায়! জলে ঝড়েও কোনও ডিঙি পানসী কেন এখানে ভেড়ে না?'

'তা এমন জায়গায় তুমি তাহলে আছ কোন সাহসে? তুমি আর তোমার ওই—কে হয় মেয়েটি তোমার?'

'নাতনি। হ্যাঁ, রাধা আর আমি —আমরা দুজনে এখনও এখানে আছি। আর আমরা

থাকব না তো থাকবে কে? দিয়েছে কেউ আমার মতো নজরানা? আমার পাহাড়ের মতো জোয়ান দুই বেটা, আমার বেটার বউ, সব—সব নিয়েছে ওই ডাকিনী।'

'ডাকিনী নিয়েছে মানে?'

'মানে বুঝলে না? ডাইনীর শাপ দেওয়া এই চর যক্ষীর মতো কে আগলে আছে জানো না? জানবে, বুঝবে। জলজ্যান্ত মানুষ যখন আমার বেটাদের মতো সকালে ঘর থেকে বেরিয়ে বিকেলে আর ফিরবে না—তখন বুঝবে। যাও, যাও, এখনও বলছি, জানের মায়া থাকে তো পালাও। নইলে কারোর রেহাই নেই—কারোর না।'

ঝড়ু মাঝি শেষ সতর্কবাণী উচ্চারণ করে সেখান থেকে চলে গেল। দ্বিজেন চিন্তিতভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সেখানে।

সেদিন রাত গভীর হয়ে এসেছে। নৌকায় শুয়ে আছে দ্বিজেন, ন্যাড়া আর মাঝিরা।

অনেকক্ষণ ঘুম আসেনি কারও চোখে। ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে চরের গায়ে। বাতাস থেকে-থেকে হুহু শব্দ করে এদিক-ওদিকে বয়ে যাচ্ছে। চরের স্তব্ধতাও যেন শব্দশীল। নীরব ওই শব্দের আঘাত এসে বুকে কম্পন ধরিয়ে দেয়, দেহে আনে আতঙ্কের শিহরণ। দ্বিজেন দিনের বেলা চরটি দেখে এসেছে। অভিজ্ঞতা তার অল্প হয়নি। সে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছায়। ঝড়ু মাঝি আর রাধা যদি এই চরে বাস করতে পারে, তাহলে তাদেরই বা মুসড়ে পড়বার কারণ কী? প্রকৃতিই চরটাকে ভয়াবহ করে রেখেছে। আসলে এটা অন্য কোনও দিক দিয়ে ভয়াবহ নয়। তথাপি ঘুম আসে না তার।

ন্যাড়া ছটফট করে, মাঝিরা মৃদুকণ্ঠে শুধু গল্পই করে যায়।

কিন্তু এক সময়ে সবারই চোখে আসে তন্দ্রা।

ওদিকে তখনই চরে জেগেছে একটা আর্তস্বর। কঁকিয়ে-কঁকিয়ে কাঁদছে কে একজন। আবার খিল-খিল করে হেসেও উঠছে। নারী কণ্ঠের উচ্চ কলরব আর হাসি। বাতাস সেটাকে ছড়িয়ে দিচ্ছে দিকবিদিকে। ঢেউয়ে-ঢেউয়ে যে কান্না ছুটে চলেছে সমুদ্রের দিকে আবার এসে আছড়ে পড়ছে চরের গায়ে। দ্বিজেনের নৌকার সব কজনের তন্দ্রা টুটে গেছে। ঢেউয়ে নৌকা দুলছে আর সেই আর্তনাদে কাঁপছেও যেন। সব কিছু কাঁপছে। আকাশ বাতাস, কাঁপছে মাঝিরা। কাঁপছে ন্যাড়া। দ্বিজেনও শুনছে কান পেতে। বুকে তারও একটা শীতল শিহরণ। তথাপি সে চোখ বুজে পড়ে রয়েছে।

প্রধান মাঝি ডাকল দ্বিজেনকে, 'শুনছেন বাবু, শুনছেন তো।'

দ্বিজেন উত্তর দিল, 'শুনলাম তো হয়েছে কী?'

মাঝি কপালে হাত দিয়ে বলল, 'হায় খোদা! কেন যে টাকার লোভে এখানে এলাম!'

চোখ বুজেই বলল দ্বিজেন, 'এখন তো কেঁদে লাভ নেই।'

আবার সেই কান্না, আরও উৎকট সে সুর।

মাঝিরা ডাকতে লাগল খোদাকে, ন্যাড়া ডাকছিল, কালি, দুর্গা রাম সবাইকে। কিন্তু কী আশ্চর্য দ্বিজেন যে এখনও পড়েই আছে।

ন্যাড়া দেখল স্বর্গের দেবতাকে ডাকলেই শুধু চলবে না, মর্ত্যের মানুষের আশ্বাসেরও প্রয়োজন আছে। সে দ্বিজেনের গায়ে ধাক্কা দিতে লাগল, 'শুনছেন মশাই, শুনতে পেলেন? ওকী মানুষের গলা হতে পারে কখনও?'

দ্বিজেন এবার উঠে বসল, 'তাহলে কী ও...'

ন্যাড়া বলল, 'বুঝতে পারছেন না? সকালে ওই বুড়ো জেলের কাছে সবই তো

আপনি শুনেছিলেন বললেন। তবু কেন যে রাতটা এখানে থেকে গেলেন। না, ক'টা টাকার লোভে আপনার সঙ্গে আমার আসাই ঝকমারি হয়েছে।'

দ্বিজেন তাকে প্রবোধ দিয়ে বলল 'অত অস্থির হবেন না। ভয় তো আপনার একলার নয়। রাতটা কোনওরকম কাটলেই রওনা হব।'

ন্যাড়া যেন ডুকরে উঠল, 'হ্যাঁ, রাত আর আমাদের কেটেছে। ওই—ওই—'

আবার সেই কান্না। ভীত ন্যাড়া দু-হাতে জড়িয়ে ধরল দ্বিজেনকে।

নয়

দ্বিজেন যখন ডাকিনীর চরে অভিযানে গেছে, তখনই একদিন গোকুল গিয়ে উপস্থিত হল ডাঃ সামন্তের প্রাসাদপুরীতে। সদর দরজা খুলেই কাঙালি দেখল গোকুলকে। কিন্তু প্রফেসারের হুকুম না নিয়ে কাউকেই সে ঢুকতে দেবে না বাড়িতে। গোকুল কোনও বাধা, কারও বাধা মানবে না আজ। কাঙালিকে এক পাশে ঠেলে দিয়ে সে এগিয়ে গিয়ে প্রফেসারের বসবার ঘরে প্রবেশ করতে চাইল। আবার সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াল কাঙালি।

কাঙালি বলল, 'না, না এঘরে ঢুকতে তুমি পাবে না। এখনি বলছি ভালো চাও তো চলে যাও।'

ব্যঙ্গভরে তাকাল গোকুল কাঙালির দিকে। তাকে এক পা ঠেলে দিয়ে বলল, 'যাব, যাব, কাজ শেষ করেই যাব।'

ঘরে প্রবেশ করেই গোকুল এদিকে-ওদিকে খুঁজতে আরম্ভ করল। কাঙালি তীব্র কণ্ঠে বলল, 'খবরদার বলছি, ছুঁয়োনা এ ঘরের কিছু।' সাহেব বাড়ি নেই, তাই—নইলে—'

'নইলে—মজাটা আমায় টের পাইয়ে দিতে, কেমন?' বলল গোকুল, 'আহা! এখনও সেই আশাই তো করছি।'

ইতিমধ্যে প্রফেসার এসে ঘরে ঢুকছেন। তিনি এগিয়ে এসে বললেন, 'কী আশা করছ গোকুল? একটু যেন বেশি অধৈর্য হয়ে পড়েছ?'

গোকুল তাঁর দিকে ফিরে বলল, 'এই যে আপনি এসেছেন।'

'হ্যাঁ, এসেছি এবং মনে হচ্ছে যথা সময়েই এসেছি। কী চাও তুমি?'

'হয় আমায় টাকা দিন, নয় যে জিনিস আমি এনে দিয়েছি আমি ফেরত নিয়ে যাব।'

'বটে! এত বড় প্রতিজ্ঞা! কিন্তু হঠাৎ ফেরত নিয়ে যাওয়ার জন্যে এত ব্যস্ত কেন? টাকা কি তুমি পাওনি?'

'যা পেয়েছি তা কিছুই নয়। পাঁচ হাজার টাকা আপনি দেবেন বলেছিলেন।'

'বলেছিলাম বুঝি। যদি বলে থাকি, তাহলে তাই দিতে হবে। কিন্তু তার আগে তোমার দেওয়া জিনিসটা আসল কি নকল যাচাই হয়ে আগে কাজে লাগুক। এখন তো ওটা চামড়ার টুকরো মাত্র।'

'দরকার নেই যাচাই-এর। এই চামড়ার টুকরোই আমি নিয়ে যাব।'

চাপা গলায় ক্রুদ্ধ হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন প্রফেসার, 'নিয়ে যাবে জোর করে? গেট আউট! গেট আউট!'

গোকুল প্রথমে একটুখানি চমকে উঠলেও বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল, 'না, ধমকে আর ভয় দেখাতে পারবেন না। আমি তৈরি হয়েই এসেছি।'

প্রফেসার ব্যঙ্গভরে বললেন, 'এসেছ নাকি?'

তিনি হাতের লাঠিটা উদ্যত করলেন। গোকুল তৎপরতার সঙ্গে সেটা ধরে ফেলল। সত্যিই সে তৈরি হয়েই এসেছে। আজ লড়বে সে প্রফেসারের সঙ্গে। গোকুল লাঠিটা কেড়ে নিতে চেষ্টা করছিল। লাঠিটা তার হাতেই চলে গেল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে বিস্মিত হয়ে চেয়ে দেখল লাঠির মাথার দিকের একটা অংশ প্রফেসারের হাতেই রয়ে গেছে আর তাতে সংযুক্ত রয়েছে ক্ষুদ্র একটি আগ্নেয়াস্ত্র। প্রফেসার উদ্যত করে রয়েছেন সে অস্ত্রটি আর হাসছেন। গোকুল পিছিয়ে পড়েছে পায়ে-পায়ে।

প্রফেসার বললেন, 'এইবার কতখানি তুমি তৈরি, তার পরীক্ষা। এ বড় মজার খেলনা। শুনে খুশি হবে, একেবারে চুপি-চুপি এ কাজ সারে। বুকে তোমার যখন গুলি বিঁধবে, তার শব্দটা কেউ শুনতে পাবে না। কী, মনে হচ্ছে যেন ঠিক তৈরি নও?'

গোকুল পিছাতে-পিছাতে বলল, 'আমি! এ শয়তানীর শোধ আমি নেবই।'

গোকুল বেরিয়ে যাচ্ছিল। প্রফেসার ডাকলেন, 'দাঁড়াও, সত্যি তৈরি না হয়ে আর কখনও এস না।'

গোকুল শুনে গেল কথাগুলো। রাগে, ক্ষোভে, অপমানে উন্মাদের মতো সে বেরিয়ে গেল।...

প্রফেসারের বাড়ি থেকে সোজা গিয়ে উপস্থিত হল গোকুল অতুলের বাড়িতে। গিয়ে ধরে বসল সে মুখুজ্জেমশাইকে, অতুলবাবুর সঙ্গে তাকে দেখা করিয়ে দিতেই হবে। অতুল তখন নির্জনে বসে তাদের অভিযানের পরিকল্পনা করছে। সময় কোথায় তার, কারও সঙ্গে দেখা করবার? মুখুজ্জেমশাই জানেন অতুলকে, যাতে সে মেতে উঠবে, তাতেই সে মেতে থাকবে। মুখুজ্জেমশাই বারবার প্রত্যাখ্যান করলেন গোকুলকে। কিন্তু গোকুল নাছোড়বান্দা। সে দেখা করবেই। এমনি না হয়, সে হত্যা দিয়ে পড়ে থাকবে বাড়ির দোরে। বাবু কি একবারও জানবেন না ওপর থেকে? বাড়ি থেকে বেরুবেন না কখনও? অগত্যা ভালো মানুষ মুখুজ্জেমশাই গোকুলকে নিয়ে উপস্থিত হলেন অতুলের দরবারে।

অতুল দেখেই চিনতে পারল গোকুলকে। এই তো সেই লোক, বহুদিন ছায়ার মতো যে তার পেছনে ফিরেছে। ডাঃ সামন্তর, নিশ্চয়ই আর কারও নয়, ডাঃ সামন্তরই গুপ্তচর সে। দুঃসাহস তার কম নয়। আজ প্রকাশ্যেই এসে উপস্থিত হয়েছে, তার বাড়িতে তারই ঘরে, তারই সম্মুখে। উদ্দেশ্য কী? অতুল একবার তাকাল মুখুজ্জেমশাই-এর দিকে আবার গোকুলের দিকে। মুখুজ্জেমশাই জানালেন, তিনি নিরুপায়, লোকটা নাছোড়বান্দা, দেখা না করে কিছুতেই ছাড়বে না। অগত্যা যথাস্থানে তাকে এনে তিনি হাজির করেছেন, এখন অতুলই যা ব্যবস্থা করবার হয় করুক। ইচ্ছা হয় কথা বলুক, না হয়—

অতুল কৌতুকভরা দৃষ্টিতে চাইল গোকুলের দিকে। বলল, 'ওঃ আপনি। কী দরকার আমার সঙ্গে আপনার?'

গোকুল মুখুজ্জেমশাই-এর দিকে ফিরে চাইল। ভাবটা এই যে, উনি যদি সেখান থেকে চলে যান, তাহলে তার কথা বলার সুবিধে হয়। ভাবটা বুঝেই বলল অতুল, 'মুখুজ্জেমশায়। আপনার সামনে কিছু বলতে ওর বোধহয় লজ্জা হচ্ছে।'

লজ্জা! গোকুলের লজ্জার কী আছে এতে! গোকুল বলল, 'লজ্জার আমার কিছু নেই। অন্য কারোর সামনে বললে আপনারই অসুবিধা হতে পারে।'

'বটে!' বলল অতুল। 'আচ্ছা মুখুজ্জেমশাই, তাহলে আপনার যাওয়াই ভালো।'

মুখুজ্জেমশাই চলে যাওয়ার পর অতুল জিজ্ঞাসা করল, 'এবার বলুন কী বলবার

আছে আপনার।'

'আমি আপনার খুব বড়রকম উপকার করতে পারি।' বলল গোকুল।

'তাই নাকি! বসুন। বাড়ি বয়ে গায়ে পড়ে এরকম উপকার করবার লোক তো একালে দেখা যায় না। উপকার করবার লোভেই আমার পিছনে ছায়ার মতো ক'দিন লেগেছিলেন, কী?'

'আমি!'

'হ্যাঁ আপনি। আপনাকে দেখা মাত্র আমি চিনেছি। পুলিশে খবরটা এখুনি দেব না কী!'

'তা দিতে পারেন। কিন্তু আমি চুরিও করিনি, ডাকাতিও না। শহরের রাস্তাগুলো আপনার বোধহয় কেনা নয়; সেখানে আপনার সঙ্গে হাঁটতে দেখলেই পুলিশ আমায় পাকড়াও করবে। তাছাড়া আমাকে পুলিশে দিলে আসল কথা কোনও দিনই জানতে পারবেন না।'

'আসল কথাটা কী? কী মতলবে এখন এখানে এসেছেন?'

'মতলব খুব ভালো। একটা খুব দামি জিনিসের খোঁজ আমি আপনাকে দিতে পারি।'

'কী দামি জিনিস?'

'যা আপনি একদিন ফেলে দিয়েছিলেন। সেই চামড়ার কবজিবন্ধ।'

'ওঃ, তারই খোঁজ দিয়ে আমার উপকার করতে এসেছেন? সেটার কোনও দাম থাকলে কি আমি ফেলে দিই?'

'তার দাম যে কী আপনার জানা নেই।'

'আপনি জানেন তাহলে?'

'অন্তত আন্দাজ করতে পারি। যে সে জিনিস হলে জোগাড় করবার জন্যে পাঁচহাজার টাকার লোভ কেউ দেখায় না।'

'কে, লোভ দেখিয়েছে কে? সেই প্রফেসার মানে, সামন্ত?'

'হ্যাঁ, প্রফেসার ডাঃ সামন্ত।'

'তা হলে আমার কাছে এসেছেন কেন? যা ফেলে দিয়েছি তার জন্যে আরও বেশি দেব ভেবেছেন? পাঁচহাজার নিয়ে তাকেই দিনগে যান।'

'তাঁকেই দিয়েছি।'

'ও, সেখানে পাঁচ হাজার বাগিয়ে আবার আমার কাছে দাঁও মারতে এসেছেন! বেইমানি!'

'না, বেইমানি নয়। বেইমানির প্রতিশোধ।'

'তার মানে?'

'কবুল করেও ওই ডাঃ সামন্ত আমায় যা দেওয়ার তা দেয়নি। সেই জিনিস আমি যেমন করে পারি, আবার আপনাকে এনে দেব। খুশি হয় কিছু দেবেন, না দিলেও কিছু বলব না।'

'হুঁ, রাগটা বেশিই দেখছি। দেখুন, ও জিনিস ফিরিয়ে আনতে হবে না। আমাদের একজনকে যে খোঁজে পাঠিয়েছি তা পেলেই আপনাকে যা বলব তাই করতে হবে। রাজি?'

'সেই শয়তান যদি সায়েস্তা হয় তাহলে যা বলবেন, তাতেই রাজি।'

গোকুল ভাবল এ করেও যদি প্রতিশোধ নেওয়া হয়! *অতুল ভাবছে একজন লোককে কাজে লাগান যাবে।...*

দ্বিজেন ডাকিনীর চর পরিদর্শন করে ফিরে এল একদিন অকস্মাৎ। ইলা ভাবতেই পারেনি, দ্বিজেন এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে। সে বিস্মিত হল, দাদাকে দেখে কিছুটা উত্তেজিতও হয়ে উঠল। দাদা তাহলে জায়গাটা আবিষ্কার করেই ফিরে এসেছে। গুপ্ত ভাণ্ডার যেখানে রয়েছে সেই জায়গাটা। ইলা বিস্ময় প্রকাশ করল দ্বিজেনের এই তাড়াতাড়ি ফিরে আসায়। সত্যি ভাবতেই পারেনি সে যে তা সম্ভব। উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন তার, তাহলে জায়গাটার খোঁজ পেয়েছে দ্বিজেন? কিন্তু দ্বিজেনের মুখে কোনও আবিষ্কারের উত্তেজনা নেই, সার্থকতার উল্লাস নেই। সে গম্ভীর চিন্তাক্লিষ্ট। জায়গাটার খোঁজ পেয়েছে সে সত্য, কিন্তু পাওয়া না পাওয়া একই কথা। দ্বিজেন এই অভিমত নিয়েই ফিরে এসেছে, যেখানে যাওয়া তাদের হবে না। গুপ্তধনের কথাটা কি তাহলে মিথ্যে? সত্য মিথ্যে দ্বিজেন জানেনা, কিন্তু সেখানে যাওয়া —যাওয়া নয়, নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনা। মৃত্যুর গহ্বরে গিয়ে ঝাঁপিয়ে যে পড়া। দ্বিজেন যেতে চায় না আর ওই চরে। যা সে নিজের চোখে দেখেছে, কানে শুনেছে—বলে হয়তো কাউকে বিশ্বাস করাতে পারবে না। কিন্তু এখনও তো তার বুকে লেগে আছে সেই শিহরণ। কান পাতলে শুনতে পায় সেই মর্মভেদী কান্না। স্থির করেছে কাউকে না জানিয়েই কিছুদিনের জন্য নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে। প্রয়োজন নেই তার হার্মাদ দস্যুর গুপ্তধনে।

কিন্তু ইলা? সে যে প্রস্তুত হয়েই অপেক্ষা করছে। সব শুনে সংকল্পে সে অটল।

'না দাদা! তা কিছুতেই হয় না। জায়গার খোঁজ যখন পেয়েছ তখন যেতে আমাদের হবেই।'

'যেতেই হবে? সেখানে গেলে আর হয়তো ফেরবার আশা নেই জেনেও যেতে হবে?'

'এত ভয় পাওয়ার কী আছে আমি এখনও জানি না। কিন্তু যত বিপদই থাক, এখন পিছিয়ে যাওয়া আর চলে না। তোমাদেব সঙ্গে আমিও তাই যাব ঠিক করলাম।'

'তুই যাবি সেখানে?'

'হ্যাঁ, দাদা! এ গুপ্তধনে সত্যি যদি কারুর অধিকার থাকে তো সে আমাদের। মিথ্যে হোক, সত্যি হোক কোনও কিছুর ভয়ে তো খোঁজবার চেষ্টা আমরা ছাড়ব না। অতুলবাবুকে তুমি যা জানাবার তা জানিয়ে এস। ওঁরা যদি না যেতে চান, তবু তুমি আর আমি যাবই।'

'কিন্তু—'

'এর মধ্যে কিন্তু আর কিছু নেই দাদা। খোঁজ যখন পেয়েছ তখন ওদের তা জানাতেই হবে। আর যেতেও আমাদের হবেই।'

দ্বিজেন স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ইলার দিকে। অদ্ভুত মেয়ে ইলা। সাহস, এত দুর্দমনীয় রোখ, এত তেজ সে পেল কোথায়? কমলমীরের রাজকুমারীর কথা তার মনে পড়ে যায়।...

'বাঞ্ছারাম পান্থনিবাসে'ই এসে উঠল অতুলরা। একটি দিন বিশ্রাম করে যাবে সেখানে। দ্বিজেন তাই ওই চমৎকার পান্থনিবাসটির কথা গল্প করছে অতুলদের কাছে। এমনটি সচরাচর দেখা যায় না। যেমন পান্থনিবাসের মালিক, তেমনি তার বোর্ডাবরা। মালিক করালী, পাই পয়সা এদিক-ওদিক হলে যে কুরুক্ষেত্র বাঁধায়, হোটেল মাথায় করে, সেই করালী আজ দিনের পর দিন সয়ে যাচ্ছে প্রায় আধডজন বেকার লোককে, তারা ক'মাস যাবত একটি পয়সা না দিয়েও হোটেলবাস করছে, কখনও খাচ্ছে কখনও খাচ্ছে না, কি যা খাচ্ছে তাই বা কম কী? ওদের তাড়িয়ে দেয়, মুখের ওপর হোটেলের হল বন্ধ করে রাখে, কিন্তু আশ্চর্য রাত হলে দেখে হোটেলের হল জুড়ে ওরা পড়ে নাক ডাকাচ্ছে। এল কী করে, কোন পথে প্রবেশ করল? কোন ফাঁকে গুটি-গুটি এসে ঢুকে পড়েছে কিনা কে বলতে পারে? অথবা দেয়াল

বেয়ে ওপরে উঠে আসতেও পারে।

ওদের নিয়ে বিব্রত করালী। দ্বিজেন যখন চলে আসে তখন বলেছিল, 'ওঁদের নিয়ে কী করি আপনি একটা পরামর্শ দিন তো?'

পরামর্শ? হাসল দ্বিজেন, 'এসব ব্যাপারে কোনও পরামর্শ দেওয়া যায় না। ওরা সব কী করে কোথায় চারটি খেয়ে প্রাণ বাঁচাবে খুঁজে পাচ্ছে না। আর আপনি ব্যবসায়ী, দিনের পরদিন লোকসান দিয়ে নিজে টিকে থাকতে পারেন না। কাজেই এক্ষেত্রে—'

ন্যাড়া আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনছিল ওদের কথা। সে এগিয়ে এসে বলল, 'লোকসান দিয়েও উনি অনেককাল টিকে থাকতে পারবেন স্যার।'

'পারব?' হুঙ্কার দিয়ে উঠল করালী, 'লোকসান দিয়ে টিকে থাকব?'

ন্যাড়া বিজ্ঞের ভঙ্গিতে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'পারবেনই তো।'

রাতুল এগিয়ে এসেছিল তখন, 'কী করে পারবেন আমি বুঝিয়ে বলছি। আপনার ব্যবসার প্যাঁচটা তো আমাদের জানা হয়ে গেছে। ভাত থেকে শুরু করা যাক। ক'রকম ভাত হয় আপনার হোটেলে? সাদা, লাল, কালো, কাঁকরমণি, আকাড়ামণি।'

'চুপ করুন, বলছি চুপ করুন—' মারমুখী হয়ে ওঠে করালী।

দ্বিজেন বাধা দিয়ে বলল, 'শুনুনই না ওঁরা কী বলেন। যাই বললেন, তাই যে আমি বিশ্বাস করব, এমনি কী কথা আছে?'

রাতুল ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বলল, 'অবিচার করবেন না স্যার। আমরা যাই করি মিথ্যে কথা বলি না। এই ধরুন করালীবাবুর কাল রাতের এক হাঁড়ি ভাত—আজকার ভাতে জারণ হয়ে বোর্ডারদের পাতে-পাতে পড়বার জন্যে জমা হয়েছিল, সেগুলো হাঁড়িতে নেই তো গেল কোথায়? আমাদের যদি প্রশ্ন করেন করালী তাহলে আমরা দেখিয়ে দেব কোথায় গেল?'

পেটে হাত বুলোতে লাগল রাতুল। ন্যাড়া টেনে-টেনে হাসতে লাগল।

করালীর দু-চোখ তখন কপালে। কী সর্বনাশ! এক হাঁড়ি ভাত চুরি করে ওরা লোপাট করে দিয়েছে।

ন্যাড়া হাসতে-হাসতে বলেছিল, 'আপনারই খাতায় পুণ্যের ঘরে জমা হয়ে রইল করালীবাবু। কতকগুলো উপোসী আত্মা। মাথা চাপড়িয়ে বলল করালী, 'আমার মাথা।'

রাতুল ওদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বলতে লাগল, 'বলছিলাম ভাতের কথা। ভাতের বর্ণ ছাড়াও স্যার নানা শ্রেণী আছে। রাঁধা ভাত, বাসি ভাত, পাতের ভাত।'

আর সইতে পারে না করালী ঃ 'আমার বুকে চড়ে বসে আমারই দাড়ি ওপড়াবে? আমার খাবে আর আমারই ক্ষতি করবে? পুলিশে দেব, আমি পুলিশে দেব সব কটাকে।'

ন্যাড়া বলল, 'এত নিষ্ঠুর আপনি হবেন না। তাছাড়া পুলিশ এসে ধরলে আপনাকেও হয়তো রেখে যাবে না।'

কী ভয়ানক! করালী যেন কথা খুঁজে পাচ্ছে না।

রাতুল বলল, 'কিছু ভয় নাই করালীবাবু, আমরা কি আপনার পর? পুলিশ আপনাকে ধরবে? কখনই নয়। দ্বিজেনবাবুকে কানে-কানে আপনার বিজনেস সিক্রেটটা একটুখানি বলছি। উনিও তো ব্যবসার সন্ধানে এদিকে এসেছেন। যদি ভালো মনে করেন, তা হলে কোথাও গিয়ে হোটেলের ব্যবসায়েও লেগে যেতে পারেন। তারপর দ্বিজেনবাবু! ডাল, তাতে যত ডাল তার আটগুণ জল তো থাকবেই, ফিফটি পার্সেন্ট আবার ভাতের ফেন। করালীবাবুর রাজ্যে কিছু অপচয় হওয়ার উপায় নেই। এমনি তরিতরকারি মাছ—'

করালী আর শুনতে পারে না। লাফাতে থাকে আর বলতে থাকে, 'আমি খুন করব, খুন করব—'

ন্যাড়া বলে, 'মরেও দুঃখ পাব, আপনাকে ফাঁসিতে লটকাতে দেখলে।'

অগত্যা এক সময়ে পরাজয় মানে করালী। দ্বিজেন ন্যাড়াকে বলে, 'আমি তো কিছু টাকা দিয়েছি আপনাকে, দিয়ে দিন না হোটেলে।'

ন্যাড়া বলে, 'সে তো কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে জমা হয়ে গেছে।'

প্রশ্ন করে দ্বিজেন, 'কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক?'

ন্যাড়া বলে, 'হ্যাঁ স্যার। আমাদের যৌথ ভাণ্ডার। যেদিন করালীবাবু মিল বন্ধ করবেন, হেঁসেল হাতড়িয়েও কিছু মিলবে না, সেদিন আমাদের কিছু একটা উপায় করতে হবে তো?'

দ্বিজেন বলছিল ওদের কথা—ওইসব বেকারদের কথা, আর অতুল, ইলা আর সমীর শুনছিল। মুখ দেখে মনে হচ্ছিল ইলার, অতুল যেন ওই কাহিনি খুব উপভোগ করছে। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠল ইলা। প্রচুর সম্পদশালী অতুল, সে ওই অসহায়, দরিদ্র বেকারদের করুণ অবস্থাটা উপভোগ করবেই তো। সে ওদের দেখে হাসবে। কৌতুক অনুভব করবে, একসময়ে হয়তো অনুকম্পা ভরে কয়টা টাকা তাদের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। লোককে দেখাবে, দেখ, কত মহৎ দরদি প্রাণ আমার! এই তো হয়। এই তো করে ওরা। ভিখারিকে মুষ্টি ভিক্ষা দিয়ে ভাবে, কত পুণ্যের কাজই না করলাম। এরাই যখন তীর্থস্থানে যায়, দুপাশের ভিখারির ভিড়ে পয়সা ছড়িয়ে যায়, যেন কত দয়া তাদের।

অতুল লক্ষ করছিল ইলাকে মাঝে-মাঝে আড়চোখে। প্রথম দিকে বাঞ্ছারাম পান্থনিবাসের কাহিনি শুনে ইলাও হেসেছে। মাঝে-মাঝে তার হাসি উচ্ছ্বসিত হয়েও উঠেছিল। কেন, অতুল এমন করে হেসেছে কেন? দরিদ্রের কাহিনি শুনে খুব কৌতুক অনুভব করছে ধনীর দুলাল অতুল!

অতুল একবার ইলার দিকে তাকিয়ে দ্বিজেনকে বলল, 'তাহলে বাঞ্ছারাম পান্থনিবাসে কিছু সময় কাটিয়ে যেতেই হবে, কী বল?'

দ্বিজেন বলল, 'আমার ওই ডাকিনীর চরে যেতেই মন সরছে না অতুল।'

অতুল বলল, 'তুমি কি একটা কাওয়ার্ড?'

'কাওয়ার্ড?' বাঁকা হাসি হাসল দ্বিজেন, 'তাহলে কি আর ওই ডাকিনীর চরে রাত কাটিয়ে আসতে পারি? যাক, যখন যেতেই হবে, তখন বাঞ্ছারাম পান্থনিবাসে কিছু সময় কাটিয়ে গেলে মন্দ হয় না।'

ইলা এবার গম্ভীর ধারাল কণ্ঠে বলল, 'হ্যাঁ, কাটিয়ে যাওয়াই উচিত। ওইখানে ওইসব হতভাগ্যদের যদি পাওয়া যায়, তাহলে তাদের নিয়ে অতুলবাবু অনেকখানি আনন্দ আর কৌতুক উপভোগ করতে পারবেন।'

অতুল কোনও কথা বলবার আগেই ইলা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল?

সমীর অতুলের দিকে চেয়ে বলল, 'ব্যাপার কী অতুল? উনি রাগ করলেন কার ওপর?'

অতুল হাসল। মন্তব্য করল, 'নারী চরিত্র! দেবতাই বুঝতে পারেন না, আমি তো একটি সামান্য মানুষ।'

কিন্তু একসময় একা পেয়ে প্রশ্ন করল অতুল ইলাকে, 'ব্যাপার কী, আমাকে একটুখানি

বুঝিয়ে বলবে ইলা?'

ইলা তাদের গুছিয়ে নেওয়া জিনিসপত্র আবার মিলিয়ে দেখছিল। বলল মুখ না ফিরিয়েই, 'কীসের ব্যাপার? আর বুঝিয়ে বলবই বা কী?'

অতুল বলল, 'আমার দিকে ফিরেই তাকাও একবার।' সজল হয়ে উঠল ইলার কণ্ঠ ঃ 'অনেক দেখেছেন আমার মুখ। ভালোও না কী বেসে ফেলেছেন। তাই একদিন অবাঞ্ছিত অনুগ্রহ উজাড়ও করে দিতে চেয়েছিলেন বন্ধুর মারফত। আরও দেখবার বাকি আছে?'

'ছিঃ ইলা! তুমি আমাকে কী ভাবো জানি না।' ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বলল অতুল, 'কিন্তু মনে রেখ, আমি শিক্ষা পেয়েছি, আমার একটা ঐতিহ্য রয়েছে—সংস্কৃত মনের অধিকারী আমি, অন্তত তাই আমার ধারণা।'

'কিন্তু?' ইলা এবার মুখ ফিরিয়ে ঋজু হয়ে দাঁড়াল, 'সবই জানি, আমাকে আর মনে করিয়ে দিতে হবে না। এও জানি আপনার ওই আভিজাত্যই নেই, শুধু অর্থের আভিজাত্য রয়েছে। আর সেই আভিজাত্যের দেমাকে দরিদ্রের আপনি কৃপা করেন, তাদের দুঃখের কাহিনি শুনে মুখ টিপে হাসেনও।'

'ভুল করো না ইলা, আমাকে তুমি ভুল বুঝো না।' বলে অতুল।

'ভুল আমি কাকেও বুঝি না।' বলে ইলা! 'আমারও একটা ঐতিহ্য রয়েছে বলে শুনেছি আর শিক্ষাও আমি পেয়েছি। আমার এই বা মন্দ কি, কলকাতার একজন অভিজাত আমাকে তাঁর জীবনসঙ্গিনী করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন, সুতরাং একথা ভাবতে পারি আমারও একটা আভিজাত্য রয়েছে। আমি মানুষের মনের কথা বুঝতে পারি বলে যদি দাবী করি তাহলে কি ভুল করি?'

'তোমার কমপ্লেক্স তোমাকে ভুল করায়।' উত্তর দেয় অতুল, 'দোহাই তোমার ইলা। তুমি কী মনে কর জানি না। আমার অর্থসম্পদকে তুমি ঘৃণার চক্ষে দেখ। তাই তখন বাঞ্ছারাম পান্থনিবাসের কথায় হেসেছিলাম বলে ভেবেছ, আমার হাসি অর্থশালীর হাসি। দুঃখের মাঝেও কৌতুক থাকে ইলা, আর থাকে বলেই তুমিও শুনে হাসতে পেরেছিলে। আমার হাসি আর তোমার হাসিতে তফাৎ কিছু ছিল না। তোমার কমপ্লেক্স সে তফাত খুঁজে বের করছে।'

'আমার কমপ্লেক্স?' বলে ইলা, 'আপনারা সাজিয়ে কথা বলতেও জানেন। কিন্তু মনে রাখবেন অতুলবাবু, এ বয়েসেই অভিজ্ঞতা আমার অল্প হয়নি। মানুষ অনেক দেখেছি। দুঃখের, অভাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটেছে বার বার।'

'কিন্তু অর্থশালী একটি লোকেরই ঘনিষ্ঠ পরিচয় পেয়েছ শুধু? নয় কী?' প্রশ্ন করে অতুল। আর সঙ্গে-সঙ্গে উত্তরও দেয়, 'আর একটি পরিচয়েই গোটা সমাজটাকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছ। যাক, অভিমানে বেরোবার আগে একটা কথা তোমাকে জানিয়ে রাখি ইলা, এ আমার সত্যি কথা, ডাকিনীর চরে যে যাচ্ছি, সে একটা নেশার ঘোরে, তোমাকে লাভ করবার জন্য নয়। আমিও মানুষ, যে মেয়ে মনে প্রাণে আমাকে চাইবে না, তার পেছনে পেছনে হ্যাংলার মতো ছুটে বেড়ানোর লজ্জা ও দীনতা আমি স্বীকার করতে রাজি নই।'

অতুল আর দাঁড়াল না সেখানে। সে দ্রুত বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ইলা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ সেখানে। সে মনে-মনে আওড়াতে লাগল, যে মেয়ে মনে প্রাণে আমাকে চাইবে না, তার পেছনে-পেছনে হ্যাংলার মতো ছুটে বেড়ানোর লজ্জা ও দীনতা আমি স্বীকার করতে রাজি নই। কী বলতে চায় অতুল? শেষ কথা কি জানিয়ে দিয়ে গেল? ইলা তাকে চায় না, তাই সেও ইলাকে চায় না। এই কি তার বক্তব্য?

কিন্তু ইলা কখনই বা বলেছে যে সে তাকে চায়?

নিজেকেই নিজে এবার প্রশ্ন করে ইলা, সে কি অতুলকে আজও চায়? কই... কিন্তু, ইলার এবার মনে হয় অতুল একটা প্রচণ্ড আঘাত করে গেল তাকে। দম্ভ ভরে বলে গেল, সে হ্যাংলা নয়, যে তাকে চায় না, সে তাকেও চায় না। দম্ভ! নিছক দম্ভ। অর্থ সম্পদ, রূপ গুণ আছে বলে এ দম্ভ। আজ এইক্ষণে মনে হল ইলার, সে যেন হেরে যাচ্ছে অতুলের কাছে। অতুল তাকে লাভ করতে চায়, প্রতিক্ষণে একথা মনে করে তার মনের অজ্ঞাত কোণে বোধ করি একটা আনন্দ অনুভব করত সে। এখন সেখানে একটা বেদনার আভাস পাচ্ছে। কেন? হায়রে! এ কেনর উত্তর কি ইলা জানে। হ্যাঁ, জানে—আর এই বোধহয় প্রথম সে জানল।

দ্বিজেনের ব্যস্ততা বেড়ে গেল। সে নানাস্থানে একাকী ঘুরে বেড়াতে লাগল।

সমীর প্রশ্ন করল অতুলকে, 'দ্বিজেন কি সেখান থেকে ভয় পেয়ে এসেছে?'

অতুল উত্তর দিল হাসিমুখে, 'না দ্বিজেন ভয় পাওয়ার ছেলে নয়।'

দ্বিজেন ঘুরে বেড়াচ্ছে তথাপি। সে যেন কী একটা সমস্যায় পড়েছে। কিন্তু তার কাছে মস্ত বড় সমস্যা হয়েছে ইলা। অদ্ভুত জেদি মেয়ে। সে যাবেই আর ডাকিনী চরে কী আছে, হার্মাদ দস্যুরা সেখানে কী লুকিয়ে রেখেছে না দেখে সে নিরস্ত হবে না। মেয়ে হয়ে কেন যে জন্মাল ইলা? কিন্তু সেই রাজকুমারী? আর সে বংশেরই কি কুমারী নয় ইলা? সেই রাজ্য নেই, পরিবেশ নেই, কিন্তু দেহে সেই রক্ত রয়েছে।

দ্বিজেন ভাবতে-ভাবতে চলছিল পথ দিয়ে। দৃষ্টি তার সম্মুখে। কলকাতার পথ—জনতার ভিড় নেই তখন। রাত হয়েছে—ফুটপাথগুলো ক্রমশ পাতলা হয়ে এসেছে। শুধু যারা রাতটা কাটায় ওই ফুটপাথে পড়ে, সেখানেই হাঁড়িতে যারা রান্না করে খায়, ফুটপাথেই যাদের সংসার, তারাই ক্রমশঃ এসে নিজেদের জায়গা দখল করে বসছে। কোথাও বা অধিকার নিয়ে ঝগড়াও বেঁধে গেছে। এক জায়গায় একটি শীর্ণদেহ ভিখারির পাশের জায়গাটা নিয়ে একজন খোঁড়ার সঙ্গে আর একজন খোঁড়ার তুমুল ঝগড়া। কদিন যাবত যে জায়গাটা দখল করে আছে, সেখানকার সত্ত্ব নতুন-আসা খোঁড়াটিকে ছেড়ে দিতে রাজি নয়। ভিখারিটি এ ঝগড়ায় নির্বিকার! সে ভিখারি ঝুলি আর ছেঁড়া ন্যাকড়ার পোঁটলা-পুঁটলি নিয়েই ব্যস্ত আছে। আজ আর সে রান্না করবে না। কী সব কোথা থেকে কুড়িয়ে অথবা চেয়ে নিয়ে এসেছে তাতেই আজকার রাতটা চলে যাবে। সে ওদের ঝগড়া থামিয়ে দিতে পারত, কিন্তু দেয় না।

সে ঝগড়ার দিকেও লক্ষ নেই দ্বিজেনের।

রাস্তা দিয়ে বাস চলেছে মাঝে-মাঝে। কন্ডাকটরের হাঁক শোনা যাচ্ছে। কখনও ট্যাক্সির হর্ন বাজছে। দূরে একটা ছোট্ট ত্রিকোণ পার্কে বসে কতকগুলো হিন্দুস্থানী ভজন গাইছে।

দ্বিজেন চলছে তো চলছেই।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হল দ্বিজেনকে। কে যেন অদ্ভুত গম্ভীর গলায় তাকে ডাকছে, 'দ্বিজেনবাবু, ও দ্বিজেনবাবু।'

পেছন ফিরে চাইল দ্বিজেন। কোথায়, কাউকে তো দেখতে পাচ্ছে না? হন, হন করে চলতে লাগল দ্বিজেন।

আবার সেই ডাক, 'দ্বিজেনবাবু।'

এবার যে কী-একটা আওয়াজও শোনা যাচ্ছে পেছনে। ঠক-ঠক আওয়াজ। কে এগিয়ে

আসছে? ডাকছে তাকে?

যে জায়গাটিতে দ্বিজেন দাঁড়িয়েছিল সেখানে একরকম গাঢ় অন্ধকার। ফুটপাথের ওপর বাড়ির ঝুলান বারান্দার নিচের কয়েকটি থামের আড়াল। পাশের ঘরগুলো বন্ধ, আবার রাস্তার আলোটাও দূরে। সেই অন্ধকারে শুধু দেখা যায় একটু দূরে জোনাকীর মতো একটা বিড়ির আলো। ফুটপাথে যারা রাত কাটায় তাদেরই একজন হয়তো একটি আধপোড়া বিড়িতে আগুন ধরিয়েছে।

'কে ডাকে?'

লাঠি আর জুতোর শব্দটা কাছে এসে থমকে দাঁড়াল।

'দ্বিজেনবাবু!' একটা কালো পোশাকপরা মূর্তি ডাকল।

দ্বিজেন প্রশ্ন করল, 'কে আপনি?'

ওই মূর্তি বলল, 'চিনতে পারলেন না? ডাক শুনেই চেনা উচিত ছিল। চিনতে যখন পারলেনই না, তখন শ্রীমুখটা দর্শন করুন, চিনতে পারবেন।'

লোকটা ছোট্ট একটা টর্চ জ্বেলে নিজের মুখের ওপর ধরল। তাই তো!

দ্বিজেন প্রথম দর্শনে কেমন যে একটুখানি শিউরে উঠল। অথচ এমুখ তার অপরিচিত নয়। কয়েকবারই দেখেছে। তথাপি হঠাৎ দেখলে কেমন যেন মুহূর্তের জন্যে আঁতকে উঠতে হয়।

দ্বিজেন বলল, 'ওঃ আপনি সেই, কী বলে—'

'যা খুশি একটা বলতে পারেন, চিনলেই হল।'

'ডাঃ সামন্ত! কিন্তু আমাকে?—'

'আমাব কোনও প্রয়োজন নেই, তবে আপনার প্রয়োজনেই ডেকেছি।'

'আমার প্রয়োজনে?'

'হ্যাঁ, আপনারই, আপনাদেবও বলতে পারেন। একটু এগিয়ে চলুন, বলছি।'

'বলুন।'

'ছোট্ট একটি কথা, অথচ খুব প্রয়োজনীয় কথা। যাবেন না।'

'যাব না? কোথায় যাব না?'

'যেখান থেকে ঘুরে এলেন আর যেখানে আবার যাওয়ার জন্যে বাঁধা ছাদা করে প্রস্তুত হয়ে আছেন?'

'আপনি কী করে জানলেন যে আমি কোথাও থেকে ঘুরে এলাম?'

'কী করে, নাইবা জানলেন। তবে আমি জানি।'

'অনুমান? আমি কোথাও যাইনি।'

'আপনি যা খুশি বলতে পারেন। কিন্তু তবু আমি বলব, যাবেন না।'

'আপনি নিজে যাবেন সেখানে?'

'সে কথা বলতে পারি না এখনই। তবে আমার কথাটা ভেবে দেখবেন। না যাওয়াই ভালো।'

'হার্মাদদের লুকিয়ে রাখা সম্পদ আপনিই লুট করে আনতে গিয়েছিলেন?'

'ধনের আমার অভাব নেই। অভিশপ্ত পরের ডাকাতি করে আনা ধনের ওপর আমার লোভ নেই।'

'ধর্মকথা শোনাচ্ছেন যে এবার?'

'শোনাতে বাকি ছিল। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।'

এবার কোনও উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করে ঠক-ঠক করে লাঠি বাজিয়ে এগিয়ে চললেন ডাঃ সামন্ত। কিছুক্ষণ পরই যেন আঁধারে উবে গেলেন। শুধু অনেক দূরে তার লাঠি আর জুতোর শব্দটা শোনা গেল, তারপর সে শব্দও মিলিয়ে গেল। সমস্ত ব্যাপারটাই যেন ভৌতিক বলে মনে হল দ্বিজেনের।

দ্বিজেন যখন চলতে যাবে, তখন তার পাশ কাটিয়ে আর একটা লোক দ্রুত চলে গেল ডাঃ সামন্ত যে পথে গিয়েছেন, সেই পথে লোকটা সামন্তেরই চর অথবা তাঁরই পেছন নিয়েছে?

ডাকল দ্বিজেন, 'ও মশায়! শুনুন।'

লোকটা সে ডাক কানেই তুলল না। হন-হন করে চলে গেল।

বাড়ি ফিরে আর একবার নির্জনে বলল দ্বিজেন ইলাকে, 'নাই বা গেলাম ইলা আমরা—গুপ্তধন উদ্ধারে।'

'মানে?' ইলা বলে উঠল, 'এখন আর পেছনো যায় না। শেষ দেখতেই হবে।'

শেষ দেখতে হবে, আপন মনে উচ্চারণ করল দ্বিজেন।

আবার সেই বাঞ্ছারাম পান্থনিবাস।

করালী এবার হাসিমুখে সম্বর্ধনা করল দ্বিজেনদের।

দ্বিজেন জিজ্ঞাসা করল, 'এবার যেন খুব হাসিখুশি মনে হচ্ছে করালীবাবু! ওরা কি বিদায় নিয়েছে?'

'হ্যাঁ স্যার আপদ বিদেয় হয়েছে।' করালী বললে, 'সে কি সহজে? তবে হ্যাঁ, আমি পারিনি কিছুতেই! বিদেয় করল আমার ঠাকুর। তা —ওরে বাবুবাম, এঁদের ওই বড় ঘরখানাতে সব গুছিয়ে দে।'

অতুল বলল, 'আমাদের জন্যে ব্যস্ত হতে হবে না আপনাকে। আমরা আজ রাতের বেলাই পাড়ি দেব। রাত্তিবাস যখন করব না, তখন আর ব্যস্ততার কী আছে; কিন্তু ওই যে বিদেয় করেছেন বললেন, তারা গেল কোথায়?'

'গেল? স্যার!' করালী বলল, 'যাবার কি আর ঘর আছে? ঘর এই একখানিই এ শহরে, এই বাঞ্ছারাম হোটেল। এখান থেকে বেরোলে তো যাও গাছতলায়।'

'একেবারে গাছতলায়?' বিস্ময় প্রশ্ন করে অতুল।

'হ্যাঁ স্যার, আর জায়গা কোথায়? শহরের লোক তাদের চিনে ফেলেছে।' করালী অনায়াসে মন্তব্য করে।

ইলার কিন্তু ভালো লাগছিল না। না, এরকম লোকের হোটেলে বাস করা তার ইচ্ছা নয়। লোকটা কজন অসহায় লোককে একেবারে পথে বের করে দিলে? হয়তো ওদের বসিয়ে খাওয়াবার দান খয়রাত করবার মতো অবস্থা করালীর নয়, তা বলে একেবারে নিরাশ্রয় করে তাদের পথে ঠেলে দেওয়া?

ইলা বলে, 'বল দাদা, আমরা যাই।'

এতক্ষণে যেন করালীর দৃষ্টি পড়ে ইলার দিকে। সে বলে, 'কোথায় যাবে মা লক্ষ্মী। এসেই যাবে—'

দ্বিজেন বলে, 'না, না, যাব কোথায়? তা করালীবাবু আমাদের কী খাওয়াবেন বলুন

আজ। মাছ না মাংস।'

করালী বলে ওঠে, 'যা বলেন। এতে আর অসুবিধেটা কী?'

ইলা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে, 'আমি কিছুই এখানে খেতে পারব না, তোমাকে বলে রাখলাম দাদা।'

দ্বিজেন, অতুল আর সমীর তিনজনেই চেয়ে দেখল ইলা ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। অতুল ইঙ্গিত করল দ্বিজেনকে, দ্বিজেনও বেরিয়ে গেল। করালী কী বলতে যাচ্ছিল, হাতের ইঙ্গিতে তাকেও থামিয়ে দিল অতুল। তারপর একখানি চেয়ারে বেশ জাঁকিয়ে বসে একটা সিগারেট ধরাল সে।

সিগারেটে টান দিতে-দিতে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা করালীবাবু, আপনার ঠাকুর তাদের তাড়াবার জন্যে কী ব্যবস্থা করেছিল, জানতে পারি কি?'

করালি উত্তর দিল, 'আমার মাথায় সেটা মোটেই আসেনি স্যার। ঠাকুর এসে বলল, বাবু ওদের মিল-বন্ধ উঠিয়ে দিন, দুপুরবেলা খাওয়ার ব্যবস্থা হবে। হলও তাই। খাওয়ার কিছুক্ষণ পরই—সে কী অবস্থা! পালাতে আর পথ পায় না ওরা।'

প্রশ্ন করে অতুল, 'ফুড পয়জনিং?'

হাসিমুখে বলে করালী, 'ছিঃ ছিঃ ধর্ম জ্ঞান কি নেই আমার? পয়জনিং নয় পারগেটিভ।'

ওঃ, গম্ভীর হয়ে পড়ে অতুল। তারপর বলে, 'এ বেলা অন্তত দশ-বারোজনের খাওয়ার ব্যবস্থা করবেন আমাদের জন্যে।'

ভ্রূকুঞ্চিত হয়ে এল করালীর, 'দশ বারো জনের?'

'হ্যাঁ।' হাসতে-হাসতে বলল অতুল, 'এই আমিই একা প্রায় দু-পাঁচজনের সাবাড় করে দেব, কী যে খিধে পেটে! আর এই যে আমার বন্ধু সমীর, সেও দু-তিনজনের খাবার উদরস্থ করবে?'

সমীর বলল, 'ভাবছেন, এ কী রাক্ষসদের পাল্লায় পড়লাম রে বাবা। নয় কী করালীবাবু?'

করালী হা-হা করে উঠল, 'কী যে বলছেন আপনারা। হেঁ-হেঁ-হেঁ—আমার ছোটবেলায় দেখেছি আমাদের সেই নবা ঠাকুর, কী খাওয়া! একাই যেন একশ। ধরুন নেমন্তন্ন বাড়িতে ভাত তরকারি মাংস পোলাও একাই খেলে দশজনের, তারপর সের পাঁচ দই, এক গামলা পায়েস আর এক হাঁড়ি পানতোয়া—'

'ওরকম অনেক গল্প শুনেছি'—করালীকে থামিয়ে দিল অতুল, 'কিন্তু দেখুন করালীবাবু, ঠাকুরকে সাবধান করে দেবেন, সে যেন আবার পারগেটিভের—'

'কী যে বলেন!' জোড়হাত করে নুয়ে পড়ে করালী, 'সাধ্যি আছে তার! তাহলে আমি তাকে মেরে-মেরে একেবারে—এই কী বলে—ওরা গেছে গাছতলায়, তাকে পাঠাব যমের বাড়িতে।'

...সত্যি-সত্যি একটি গাছের তলায়ই রাতুল ও ন্যাড়ারা গিয়ে আস্তানা নিয়েছে। নদীর তীর-ঘেঁসে গাছটা। প্রকাণ্ড বটগাছ। কবে থেকে আছে সেটা সেখানে কে জানে। বার্ধক্য তার বোঝা যায় কিন্তু বিশালত্ব এখনও রয়েছে। বিস্তার তার রুদ্ধ হয়নি। কত পাখি এসে যে বাসা বেঁধেছে সে গাছের ডালে আবার একদিন কত উড়ে গেছে, মরেছে, তার হিসাব কে রাখে? কত লোক তার শীতল ছায়ায় এসে আশ্রয় নিয়েছে। কত সন্ন্যাসী সাধু এই

বটগাছেরই তলায় ধুনি জ্বালিয়ে বসে কত বিনিদ্র রজনী যাপন করেছে, কত ভক্তের দল সেখানে গিয়ে রাত কাটিয়েছে আর বাবার করুণা ভিক্ষা করেছে, ইতিহাসের পাতায় কেউ তা লিখে রাখেনি। কিন্তু বটগাছটার গায়ে অস্পষ্ট অক্ষরে সেসব কাহিনি লেখা হয়ে আছে। সাক্ষী তার মহাকাল।

সেই বটগাছের তলায়ই আস্তানা গেড়েছে ন্যাড়াদের দল।

অতুল আর সমীর ওদের খুঁজতে-খুঁজতে সেই গাছের তলায় এসে উপস্থিত হল। লটবহর স্তূপীকৃত হয়ে আছে গাছের গা ঘেঁষে—কিন্তু লোকজন তো কেউ নেই। আরও কাছে এগিয়ে গেল অতুলরা। মালপত্রের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, ওইসব হতভাগ্যরাই ওগুলোর মালিক। কিন্তু তারা কোথায়?

ওই যে একজন লোক দিব্যি ঘুমিয়ে আছে সেই লটবহরের আড়ালে। সেই হয়তো পাহারাদার হয়ে আছে সেখানে। সে আর কেউ নয়, ওই বেকার দলের হাবুল।

অতুল ডাকল, 'ও মশায়, কী নাম আপনার! বেশ তো ঘুমুচ্ছেন দেখছি।'

চোখ বুজেই হাবুল উত্তর দিল, 'আমি পাহারা দিচ্ছি।'

অতুল হাসল, 'ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে পাহারা? মন্দ নয় তো।'

হাবুল বলল, 'চোখ আমার ঘুমিয়েছে, কিন্তু কান জেগে আছে।'

অতুল বলল, 'বেশ! তা আর আপনাদের দলবল গেল কোথায়?'

এবার উঠে বসে চোখ খুলল হাবুল, 'আপনি, আপনারা আমাদের জানেন?'

'জানি বইকী?' বলে অতুল, 'রাতুল বাবু, ন্যাড়া বাবু, হাবুল বাবু।'

'আমিই হাবুল।' নিজের বুকে হাত রাখে হাবুল, 'কিন্তু আমাদের জানলেন কী করে? আর এই বটগাছের তলায় এসে আশ্রয় নিয়েছি, তাই বা কী করে অনুমান করলেন।'

অতুল বলল, 'কলকাতায় বসে-বসেই আপনাদের জানতাম।'

'তাই নাকি?' উৎসাহিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে হাবুল, 'কিন্তু আপনাদের বসতে দিই কোথায় বলুন তো! আমাদের না হয় 'সব ঠাঁই মোরে ঘর আছে, আমি সেই ঘর নেব খুঁজিয়া' কিন্তু আপনারা কলকাতার লোক, এই স্যাঁৎসেঁতে মাটিতে বসতে বলি কী করে? তা এক কাজ করি আসুন—ওই যে বড় ডালটা দেখছেন, তাতে যদি চড়ে বসি, দিব্যি আরামে বসা যাবে—পেছনের ডালটাতে হেলান দিয়ে—'

'রক্ষে করুন' হাসতে থাকে অতুল, 'পড়ে যাব। তার চেয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই কথা বলুন। আর কথাও তেমন কী বলবার আছে? আমরা এসেছি আপনাদের নেমন্তন্ন করতে।'

'নেমন্তন্ন?' যেন আঁতকে উঠল হাবুল।

অতুল বলল, 'আজ বাঞ্ছারাম পান্থনিবাসে আপনাদের নেমন্তন্ন। আমরা সেখানেই আছি কিনা।'

গম্ভীর হয়ে পড়ল হাবুল, 'নেমন্তন্ন সে তো খুশির কথাই, কিন্তু ওই বাঞ্ছারাম পান্থনিবাস. সেখানে যে ক্যাস্টর অয়েল দিয়ে ডাল রাঁধে মশাই।'

'সে আর হবে না।' উত্তর দেয় অতুল, 'তা হলে সঙ্গে-সঙ্গে পুলিশ ডেকে আনব না? রাজত্বটা অরাজক নয়।'

হাবুল বলে, 'পুলিশ আমরাও ডাকতে পারতাম। কিন্তু কী জানেন, করালী লোকটা হাজার হোক শুধু গালাগালই দেয়নি, খাইয়েছেও অনেক। ন্যাড়া বলে, কৃতজ্ঞতা বলে একটা কথা আছে তো। তাই আর পুলিশ ডাকতে পারিনি। যাক, তাহলে ওরা এলেই বলব কথাটা।

যদি কাউন্সিলে পাশ হয়ে যায়?'

হাবুল আরও বলে, 'আমাদের কাউন্সিল আছে, কোনও কাজ করতে হলেই আগে প্রস্তাব পাশ করে নিই। এই যে বাঞ্ছারাম পান্থনিবাস ছেড়ে এলাম তাও প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর তবে ছেড়েছি। ন্যাড়া আমাদের কাউন্সিলের সভাপতি।'

'ন্যাড়া বাবুকে আমার নমস্কার জানিয়ে বলবেন, নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলে আমরা কৃতার্থ হব। তাছাড়া শুধু খাওয়া-দাওয়াই নয়, কথাবার্তাও হবে।' বলে বিদায় নিল অতুল ও সমীর।

অতুল নাম দিয়েছে 'ন্যাড়া-সংঘ।' কারণ বটগাছের তলায় সে জেনে এসেছে ন্যাড়াই ওদের সভাপতি।

খাওয়া-দাওয়ার সময় এসে যাচ্ছে, কিন্তু ন্যাড়া-সংঘের দেখা নেই। অতুল বলল যে, তাহলে তারা কি আসবে না?

ইলা তাদের নেমন্তন্ন করায় সুখী হয়েছে। আরও, অতুল বলেছে, ফেরার পথে ওদের কলকাতায় নিয়ে যাবে। সেখানে কোনও একটা কাজে তাদের লাগিয়ে দেওয়া যাবেই, একটু বেগ পেতে হবে আর কী।

ইলা খুব খুশি। তাহলে অতুলের মনে অপরের দুঃখে বেদনাবোধ রয়েছে? আবার ইলার মনে হয়, অতুল কি তাকে খুশি করবার জন্যেই ওদের—না, না, এত ছোট আর ভাবতে যাবে না অতুলকে।

ওরা অপেক্ষা করছে, দ্বিজেন বলছে, 'আর কোনও দিন বাঞ্ছারাম পান্থনিবাসের ধার ঘেঁষবে না তারা।'

সংশয়ের সুরে বলে করালী, 'আসবে না? নেমন্তন্ন পেয়েছে'—করালীর মনে দুঃখও জাগে। লোকগুলো হাজার হোক অনেককাল এখানে কাটিয়েছে। কাল থেকে হয়তো উপোস করে আছে। যদি বা আজ খাবার নেমন্তন্ন পেল, নিখরচায় পেট পুরে খেয়ে যাবে—তারা তাতে সাড়া দেবে না?

করালী বলল, 'আমি কি একবার দেখে আসব?'

'আপনি যাবেন?' বিস্মিত হয় অতুল, 'একটা মারামারি হয়তো বেঁধে যাবে।'

হাসতে থাকে করালী, 'না, না, মারামারি হবে না। ওরা লোক খারাপ নয় স্যার। শুধু বেকার—'

ইলা মন্তব্য করল, 'বেকার হলেই লোক ভালো হয় না।'

সিঁড়িতে অনেক জোড়া পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। ওই তো তারা এসে গেছে। আগে আগে ন্যাড়া, তার পেছনে রাতুল, তার পেছনে হাবুল এবং অন্যান্য।

ন্যাড়া বলল, 'আমরা এসেছি স্যার।'

'এসেছেন তো!' কিন্তু তারা লোকগুলোই শুধু আসেনি, তাদের কাঁধে মাথায় চড়ে বিছানাপত্র বাসনকোসন সব কিছুই এসে গেছে।

অতুল সম্বর্ধনা জানিয়ে বলল, 'আসুন, আসুন, আমরা আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছি।'

ন্যাড়া বলল, 'প্রস্তাবের আলোচনার সময়টা একটুখানি বেশি লাগল। যাব কি যাব না, গেলে কী ভাবে যাব?'

করালী ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। হতভাগারা তাদের লটবহর নিয়ে এখানে এসে

আবার উপস্থিত? সে বলল, 'এলেন তো, কিন্তু এসব কী?'

রাতুল কথা বলল, 'ওঃ, আমাদের লটবহরগুলোর কথা বলছেন? না নিয়ে এসে উপায় ছিল না। খেতে তো আসব, সেখানে বসে-বসে এগুলো পাহারা দেবে কে? খিদে তো আমাদের সবার পেটেই সমান! তাই—এগুলো সঙ্গে নিয়েই এলাম। যাওয়ার সময় আবার নিয়েই যাব।'

ন্যাড়া এবার গম্ভীর গলায় বলল, 'তাছাড়া করালীবাবু, ভয়ের আর কিছু নেই। আমরা এবার ঠিক করছি আর চাকরির খোঁজ করব না। সোজা বিজনেস, সে হল আমাদের সিক্রেট। একদিন যখন ওপেনিং সেরিমনি হবে, সেদিন জানবেন। আপানাকেও নেমন্তন্ন করব। বুঝলেন? রাতুল বলেছিল, একটা হোটেল বা পান্থনিবাসই করা ভালো। দেখনি করালীবাবুর কেমন লাভ। আমরা বাধা দিলাম, কেন দিলাম জানেন? আপনার সঙ্গে কম্পিটিশন আমরা করব না। যে করেই হোক দু-পয়সা করে খাচ্ছেন?'

'অ্যাঁ? যে করেই হোক।' বলল করালী, 'কিন্তু বিজনেস-এর টাকাটা যোগাচ্ছে কে শুনি?'

রাতুল সুর করে বলল, 'বল না, বল না, ওকথা বল না—'

'কিছুতেই বলব না।' মাথা নাড়ে ন্যাড়া, 'বিজনেস সিক্রেট। তবে এই মাত্র বলতে পারি...'

রাতুল প্রশ্ন করে, 'কী, বলতে পার?'

ন্যাড়া বলে, 'এখনও তাঁহারে চোখে দেখিনি—'

কথা কেড়ে নেয় রাতুল, 'শুধু চিঠি পেয়েছি।'

হাবুল বলল, 'আজ রাতে তাঁকে দেখব।'

'হাবুল!' ধমকে উঠল ন্যাড়া, 'মনে রাখিস, আমি তোদের সভাপতি, যা বলবার আমি বলব।'

অতুল এবার কথা বলল। 'খাওয়ার দেরি হয়ে যাচ্ছে। পাতে বসে ব্যবসার কথা হবে।' করালী আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

বেশ রাত হয়েছে, গভীর রাত। জলের দেশের শহর, তাতে আবার রাতের আঁধারে যখন শহরটা মুখ লুকিয়ে থাকে তখন মনে হয় সেটা পাড়াগাঁ। এখানে-ওখানে ঝোপ-ঝাড় রয়েছে। সে কলকাতার উপকণ্ঠেও আছে। শেয়াল ডাকে মাঝে-মাঝে। আরও সব অজানিত পাখির ডাক শোনা যায়। কখনও ডাকে হুস-হুস, কখনও বা কু-কু। খুব শ্রুতিমধুর নয় ওই সব পাখির ডাক। শুনে যারা অভ্যস্ত নয়, তাদের প্রাণে আতঙ্ক জাগায়। শহরের রাতের রূপটাও বিচিত্র। ইলেকট্রিক নেই সে শহরে, গ্যাস কোম্পানিও নেই। মাঝে-মাঝে বড় রাস্তাগুলোর মোড়ে-মোড়ে প্যাট্রোম্যাক্স জ্বলছে আর পোলের মাথায়-মাথায় কেরোসিনের আলো।

অপরাহ্নের দিকে কিন্তু খুব ভালো লাগে শহরটাকে। দূরে দেখা যায় অগাধ জলরাশি, রাতে যেটা আঁধারের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে পড়ে। মাঝে-মাঝে তারার মতো আলো জ্বলছে সেখানে। নৌকোর আলো। কখনও-কখনও স্টিমার ও লঞ্চের আলোই শুধু বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। সার্চ লাইট চারদিকে ঘুরে ফিরে দেখে, তখন সেই তীব্র আলোতে দেখতে পাওয়া যায় জলের আভাস, মনে হয় প্রবলবেগে স্রোত বয়ে চলেছে। নীলাভ আলোগুলোতে যখন বিন্দু-বিন্দু মানুষের আভাস পাওয়া যায় তখন মনে হয় ওরা এই রাতেই কোন সুদূরে পাড়ি

জমাল কে জানে।

অতুল বেরিয়ে পড়েছিল শহর দেখতে। সমীর সঙ্গী হয়েছিল দ্বিজেনের। ইলাকে জিজ্ঞাসা করেছিল অতুল, 'তুমি বেরুবে না?'

ইলা উত্তর দিয়েছিল, 'বেরোব নিশ্চয়। তবে আপনি কী ভেবেছেন, আপনার পাহারায় শহর দেখে বেড়াব?'

অতুল বলেছিল, 'না, সেকথা ভাবিনি। আমি কারও পাহারাদার নইতো। তবে এটুকু ভেবেছিলাম, দ্বিজেনের সঙ্গে বেরোলেই ভালো হতো।'

'আপনার মতো পাহারাদার পাওয়া!' হেসে বলল ইলা, 'সে কথা ভাবার ধৃষ্টতাও নেই আমার। শহরে মানুষের মাঝে ঘুরে বেড়াব, তাতে ভয়ের কী আছে?'

অতুল মন্তব্য করল, 'ভয় তো মানুষদেরই বেশি। কলকাতায় থাকেন, সংবাদপত্র পড়েন, আর একথাটা আপনি জানেন না ভাবব কী করে?'

'তাই তো! ভয় ধরিয়ে দিলেন।' আবার হাসল ইলা। অতুল একবার তার মুখের দিকে তাকিয়ে চলে গেল। ইলাও বেরোল শহর ভ্রমণে—একেবারে একাকী।

ঘুরতে-ঘুরতে কখন যে রাত হয়ে গেছে, রাস্তার পেট্রোম্যাক্স আর কেরোসিনের আলোগুলো মিউনিসিপ্যালিটির লোক জ্বেলে দিয়ে গেছে, লক্ষই ছিল না ইলার। যখন সে বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল, তখন একটি ল্যাম্পপোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে হাতঘড়িতে সময় দেখল, নটা কখন বেজে গেছে।

রাত কম হয়নি। দ্রুত পা চালাল ইলা। ঘুরতে-ঘুরতে ও নদীর কিনারে এসে পড়েছে। অপরাহ্নে যারা নদীতীরে বেড়াতে আসে, তারা কখন ফিরে গেছে। জ্যোছনা রাতে অনেকে অনেকক্ষণ কাটায় সেখানে।

এগিয়ে চলেছে ইলা। প্রকাণ্ড বটগাছটা তার বিশাল দেহ বিস্তৃত করে নদীর তীর ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। দলে-দলে পাখি এসে আশ্রয় নিয়েছে বটগাছে। মাঝে-মাঝে তাদের সামান্য কিচির-মিচির শোনা যায়। কারণ রাতটাই তাদের ঘুমিয়ে পড়ার সময়।

এই তো সেই বটগাছ, যে গাছের তলায় এসে ন্যাড়া আশ্রয় নিয়েছিল। আজ রাতে তারা করালীর বাঞ্ছারাম পান্থনিবাসেই থাকবে। বিজনেস করবে তারা, করালী মনে-মনে খুশি হয়ে উঠেছে। তাহলে আর তার পাওনাটা মাঠে মারা নাও যেতে পারে। সে রাতেই মিলবে ন্যাড়ারা তাদের ফাইন্যান্সিয়ারের সঙ্গে। কোথায় কে জানে? কিন্তু কে সেই অদৃশ্য লোকটি? এমন উদার, এমন পরহিতব্রতী, দুঃখকাতর লোক কে? যেই হন, তাঁর অনুগ্রহে এই হতভাগ্য লোকগুলো বাঁচুক, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হোক।

কিন্তু কোন পথে যাবে এবার ইলা? তিনটি পথ এসে মিলছে এই বটগাছের তলায়। থমকে দাঁড়াল ইলা। সব দিকেই শহরের আলো দেখা যাচ্ছে। পান্থনিবাসে ফিরে যাওয়ার পথ কোনটা?

বটগাছ তলার আঁধার থেকে একটি কণ্ঠ শোনা গেল, 'কে?' কান পাতল ইলা, কিন্তু কোনও উত্তর দিল না।

আবার সেই প্রশ্ন, 'কে? উত্তর দাও।'

দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সাহস সঞ্চয় করল ইলা। না, এ যেই হোক, এর প্রশ্নে যদি ভয় পায় ইলা তাহলে অতুলের অজ্ঞাতেই তার কাছে হেরে যাবে। হারা তার পক্ষে চলবে না।

ইলা সাড়া দিল, 'আমি যেই হয়ে থাকি, আপনার জানার প্রয়োজন কী?'

'হুঁ—' ওই কণ্ঠ বলল, 'আমি প্রশ্নের উত্তর এখনও পাইনি।'

ইলা উত্তর দিল, 'জানতে পারি কি উত্তর না পেলে কী করবেন?'

'কী করব?' —সেই লোকটা বেরিয়ে এল আঁধার থেকে। সে আর কেউ নয়, অতুল। অতুল বেরিয়ে এসে বলল, 'এত রাতে এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছেন যে?'

'আপনিই বা কেন ওই গাছের তলায় লুকিয়ে থেকে আমাকে ভূতের মতো ভয় দেখাতে আরম্ভ করেছিলেন?'

'আমি ভূত?'

'অন্তত অদ্ভুত তো বটেই।'

'ভূত অদ্ভুত যাই হই, আমি এখানে অপেক্ষা করে ছিলাম, জানতাম একজন এখানে এসে দিশেহারা হয়ে দাঁড়াবে?'

'আমি দিশেহারা হয়ে পড়েছি? আর আমাকে পথ দেখাবার জন্যে আপনি এখানে ঘাপটি মেরে বসে আছেন? কী করে জানলেন আমি এখানে এসে দিশেহারা হয়ে পড়ব?'

'জানতাম আমি পুরুষ বলে। পুরুষদের ইনটুইসনই আলাদা। মেয়েদের বিপদের বেলা—'

'চুপ করুন, আর বাহাদুরি দেখাতে হবে না। মেয়েদের ইনটুইসন কী বলে জানেন, পুরুষরা নানা অজুহাতে মেয়েদের সঙ্গে দুটো কথা বলার সুযোগ খুঁজে বেড়ায়।'

'ভুল করলেন। কথা বলার সুযোগের অভাব কোথায়? অন্তত মেয়েদের রাগিয়ে দিলে ঘণ্টা দুয়েক দাঁড়িয়ে তো ঝগড়া কবা যায।'

'আমরা, আমি ঝগড়াটে?'

'থাক, এ মীমাংসা পরে হবে। এবার হোটেলে ফেরা যাক। রাতেই তো আবার বেরিয়ে পড়তে হবে?'

'ফিরব আমি এখনই আর ফেরার পথে কারও সাহায্যে আমার দরকার হবে না। আমি একাই যেতে পারব।'

'বেশ, তাই ভালো।'

ইলা এগিয়ে যেতে লাগল একটা পথ ধরে। হন-হন করেই এগিয়ে যাচ্ছিল। অতুল সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে অন্য একটি পথ ধরল। ইলাও দেখেছিল, অতুল যাচ্ছে অন্য পথ দিয়ে। তাহলে কি অতুলই ঠিক পথে যাচ্ছে আর ইলা ভুল পথে? কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে ইলার মনে হয়, হয়তো সে বিপথে গিয়ে ঘুরে মরবে। লোককে জিজ্ঞেস করে পথ খুঁজে নিতে হবে। তাই কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে ইলা আবার ফিরে এল, আর দূরে থাকতেই ডাকতে লাগল, 'ও অতুলবাবু, অতুলবাবু।'

অতুল উত্তর দিল, 'আমাকে ডাকছেন? কেন বলুন তো?'

ইলা বলল, 'আপনিই কি ঠিক পথে যাচ্ছেন?'

অতুল বলল, 'আপনি কি ভুল পথে যাচ্ছিলেন?'

ইলার রাগ হল; তবু বলল, 'কোনও ভদ্রলোককে পথ জিজ্ঞাসা করলে, তারা পথ দেখিয়ে দেয়।'

অতুল হাসি গোপন করে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'আমি তো তোমাকে পথ দেখাবার জন্যে বহুকাল থেকেই প্রস্তুত!'

ইলা ততক্ষণে অতুলের কাছে এসে পৌঁছেচে। নিশ্চয়ই অতুল ঠিক পথে যাচ্ছে।

এসে তার পেছনে-পেছনে দু-একপা এগিয়েও চলল। এবার অতুল হো-হো করে হেসে উঠল।

ইলা তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'হাসছেন যে বড়?'

অতুল উত্তর দিল, 'হাসছি এই ভেবে যে তুমি যে পথে এগিয়ে যাচ্ছিলে সেটাই ছিল ঠিক পথ। এবার চল।'

ইলা গম্ভীর মুখে আবার ফিরে সে পথেই যাচ্ছিল। অতুলও এবার তার সঙ্গে যায়।

কিছুক্ষণ পর অতুল বলল, 'হেরে গেলেন তো? আমি পথে না থাকলে হারিয়েও যেতেন হয়তো।'

ইলা বলল, 'আমি হারি না। আর একথাও জেনে রাখুন আমি কোনওদিন হারিয়েও যাব না।'

অতুলরা যখন বাঞ্ছারাম পান্থনিবাসে ফিরে আসছে তখন একটা অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটে গেল। অতুল এবং ইলা কেউই তা ভাবতে পারেনি।

তারা তখন পান্থনিবাস থেকে খুব দূরে নেই। রাস্তার পাশে একটা গলি! গলিটা আঁধার—ঘিঞ্জি গলি। আলো নেই, লোক চলাচল নেই সেই গলিতে।

গলির পাশে আসতেই একটা গম্ভীর কণ্ঠ আড়াল থেকে ভেসে এল, 'না গেলেই ভালো করতেন অতুল বাবু।'

অতুল থমকে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে বলল, 'কে, কে কথা বলছ?'

একথার কোনও উত্তর নেই, কিন্তু সেই কণ্ঠ আবার বলল, 'ভালোয়-ভালোয় ফিরে যান।'

ইলাকে সেখানে দাঁড় করিয়ে রেখে অতুল দৌড়ে গিয়ে সেই গলিতে প্রবেশ করল। কিন্তু কোথায় কে?

অতুল যখন নিরাশ হৃদয়ে গলি থেকে ফিরে আসছে তখন গলির প্রায় মুখের কাছে একটা লোকের গায়ে ধাক্কা লাগল তার। লোকটি দ্রুত ছুটে আসছিল গলির দিকে। অতুল লোকটিকে ধরে আটকাল—সার্টের কলার ধরে।

অতুল কঠোর কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'কে তুমি?'

লোকটা জোরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করছিল। অতুল তার মুখখানা দেখবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু আঁধারে কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না।

কিন্তু ইলা তখন টর্চটা জ্বালিয়ে ওর মুখের ওপর ধরে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। এবার মুখখানি স্পষ্ট দেখা যায়। চিনতে পারল অতুল লোকটিকে। এ সেই গোকুল!

ততক্ষণে গোকুল অতুলের হাত ছাড়িয়ে দ্রুত গলিতে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

অতুল বলল, 'তবে কি গোকুলই আমাদের ভয় দেখাচ্ছিল?'

ইলা বলল, 'না, ওই কণ্ঠস্বর আমি চিনি, আপনিও চেনেন।'

হোটেলে ফিরে এসে তারা দেখল দ্বিজেন গম্ভীর মুখে বসে আছে। সমীর বিছানা নিয়েছে।

আর কিছুক্ষণ পর ন্যাড়া উল্লসিত হয়ে দলবল সহ শোভাযাত্রা করে হোটেলে এসে প্রবেশ করল। বলল, 'কেল্লা মার দিয়া। কাল থেকে আমরা মার্চেন্ট অফ উড। কাঠের ব্যবসা আর কি।...'

একদিন স্টিমলঞ্চ ভাসাল অতুলরা সেই শহর থেকে ডাকিনীর চরের দিকে। অতুল দ্বিজেন, সমীর আর ইলা। গোকুলকেও সঙ্গে নিয়েছে অতুল। আর সঙ্গে আছে একটি

পরিচারিকা। মোক্ষদা। ইলা সঙ্গে যাচ্ছে, তরুণী মেয়ে মানুষ।

ডাকিনীর চর। দ্বিজেন ওই চরে শুনে এসেছে ডাকিনীর ভয়াবহ আর্তনাদ, তার কঁকিয়ে কঁকিয়ে কান্না। যেখানে ওই ডাকিনীই কি পাহারা দিচ্ছে হার্মাদদের লুকিয়ে রাখা ধনরত্ন? ওই ডাকিনীর চরেই একদিন হার্মাদ দস্যু-সর্দারকে হত্যা করেছিল কমলমীরের রাজকুমারী। সেখানেই হারিয়ে গিয়েছিল রাজকুমারী নিজে। কত হত্যা, কত রক্তস্রোত বয়ে গেছে সেই চরে। কত আত্মাই হয়তো আজও ঘুরে বেড়ায় সেখানে। গভীর রাতে তাদের মেলা বসে? তারা জটলা করে আর ডাকিনীটা কাঁদে।

সেই চরের দিকে এগিয়ে চলেছে অতুলদের স্টিমলঞ্চ।

আয়োজনের কোনও ত্রুটিই রাখেনি অতুল। সেই চরে ভিড়ে তারা চরের ওপরই তাঁবু খাটাবে। সাজ সরঞ্জাম সব সঙ্গেই আছে। আছে, ক্যাম্পখাট, বিছানাপত্র, খাবার জিনিস। আছে ভালো রাইফেল, পিস্তল। দড়ি দাড়া মই, আলো টর্চ কিছুই বাকি থাকেনি।

ইলা বলে, একটা ছোটখাট যুদ্ধের আয়োজন। অতুল হাসে, 'যুদ্ধ বইকী? অশরীরী অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ। সে যুদ্ধ আরও কঠিন আরও ভয়াবহ।'

শুধু অশরীরী কেন, দেহধারী শত্রুও কি পাড়ি জমায়নি? দেহধারী শত্রু ডাঃ সামন্ত।

ঢেউ কেটে-কেটে চলেছে স্টিমলঞ্চ। দুলছে তালে-তালে, ঢেউ-এর সঙ্গে নাচছে যেন।

ইলার মন দুলছে এই সঙ্গে। একটা চাঞ্চল্য সে অনুভব করছে। সম্মুখে চেয়ে আছে সীমাহীন জলরাশির দিকে। দূরে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে মনে হয় চরটি যেন একটা বিন্দু।

ক্রমশ সে বিন্দু বড় হয়ে আসে। চর দেখা যায়। দেখা যায় তার বালিয়াড়ি। একটি অঞ্চল ঘন বনে পূর্ণ। মরুভূমি আর অরণ্য যেন পাশাপাশি বাস করছে।

ডাকিনীর চর। স্টিমলঞ্চ এসে একসময়ে ভেড়ে তীরের পাশে। তাঁবু ফেলার তোড়জোড় আরম্ভ হয়ে যায়।

পরদিন।

সেখানকার বনের মাঝে একটা পুকুর আবিষ্কার করেছে তারা। নীলজল টল-টল করছে সে পুকুরে। সত্যি লোভনীয়। অবগাহন করতে ইচ্ছা হয়। ইলা গিয়ে নামে পুকুরে। কারও বাধা সে মানে না। পুকুর থাকতে তোলা জলে স্নান করবে?

জলে সাঁতার কাটছে ইলা। কী স্নিগ্ধ শীতল জল! তাহলে ডাকিনীর চরেও আরামের উপাদান রয়েছে! অথবা এও ডাকিনীর মায়া? জলে থেকেই অবিশ্বাসের হাসিই হাসে ইলা। ডাকিনী, প্রেতিনী আর ভূত, এ তো ভীরুচিত্তের কল্পনা। যুক্তি? যুক্তির অভাব হয় না কিছুরই— মানুষ মিথ্যাকেও সত্যের পোশাক পরায়।

কিন্তু হঠাৎ চমকে উঠল ইলা। কে যেন মৃদুকণ্ঠে গান গাইছে ওই গাছপালাগুলোর আড়াল থেকে। নারী কণ্ঠের গান। আর গানের লক্ষ্য যেন সে-ই।

টুপ টুপ টুপ
নিরালায় নীলজলে কে দেয় ডুব
চুপ চুপ চুপ।
ওকী পানকৌটি, না না কার বউটি
কে বুঝি কোথায় দেখে,
চুপ চুপ চুপ
ধরতে কে চায় যেন জড়িয়ে

ঢেউ হয়ে যায় তবু ছড়িয়ে
আড়ি পাতে গাছেরা ভেবে সারা মাছেরা
বইতে ভুলেছে হাওয়া দেখে তার রূপ।
চুপ চুপ চুপ।

আশ্চর্য! একটি মেয়ে ওই গাছগুলোর আড়াল থেকে উঁকি ঝুকি মারছে আর গান গাইছে। ইলা উঠে পড়ে পুকুর থেকে। সেও একটি গাছের আড়ালে গিয়ে ভিজে কাপড় ছাড়ে। তারপর এগিয়ে যায় ওই মেয়েটির দিকে।

ওই মেয়েও দেখছে কৌতূহলের দৃষ্টিতে ইলাকে। সে মেয়ে আর কেউ নয়—রাধা। চোখে তার বিস্ময় তো কম নয়! সাহসী মেয়ে—এসেছে এই ডাকিনীর চরে। আবার সে মেয়ে স্নান করতে এসে নেমেছে পুকুরে।

রাধাই প্রথম কথা বলে, 'তোমরা কাল সবাই এসেছ না?'

ইলা উত্তর দেয়, 'হ্যাঁ, তুমি কী করে জানলে?'

'এই চরে এসেছ আর আমি জানব না? কিন্তু ওই পুকুরে যে চান করছিলে? যদি কুমিরে ধরত?'

'কুমির আছে নাকি এখানে?'

'থাকতে তো পারে? সাপ, বাঘ, কুমির কী এখানে নেই? তার চেয়ে ভয়ানক কিছুও আছে।'

'সে আবার কী?'

'থাকলেই জানতে পারবে।'

'তাই নাকি! কিন্তু এত যে ভয়ের জায়গা, তোমরা আছ কী করে? তুমি আর তোমার দাদু তো এখানে থাক শুনেছি।'

'ঠিকই শুনেছ! কিন্তু আমরা থাকব না তো যাব কোথায়? আমরা এইখানকারই মানুষ। তোমাদের মতো শখ করে তো আর বেড়াতে আসিনি।'

'আমরা আসায় তুমি যেন খুশি নও মনে হচ্ছে?'

'আমার অখুশি হওয়ার কী হয়েছে? তোমরা কদিন আর থাকবে! কেউ এখানে থাকতে পারে না।'

'কেন বল তো!'

'সে আমার দাদুকেই জিজ্ঞাসা কর।'

রাধা ইলার দিকে একটা দৃষ্টি হেনে চলে যেতে লাগল বনের ভেতর দিয়ে। ইলা চেয়ে রইল তার গমন পথের দিকে। কী স্বচ্ছন্দ গতি রাধার। সে লঘুপদে গিয়ে এক সময়ে বনান্তরালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ইলা যখন স্নানে, তখন অতুল সমীর আর দ্বিজেন গিয়ে উপস্থিত হয়েছে ঝড়ু মাঝির আস্তানায়। আজ আর অস্ত্র হাতে সম্বর্ধনা জানাতে বেরিয়ে আসেনি ঝড়ু মাঝি। কিন্তু তার চোখ দুটি কোটর থেকে আজও জ্বলছে। সন্দেহ আর অবিশ্বাস তার মুখে ছায়া ফেলেছে, কালো ছায়া। নির্জন ঘরের শান্তিভঙ্গ করতে এসেছে ওই শহরের ধনী বাবুরা। এসেছে তারা ধনের সন্ধানে।

ঝড়ু মাঝি বলল ওই বাবুদের উদ্দেশ্য করে, 'আমি তখনই বলেছিলাম, মানা করে গিয়েছিলাম তোমাদের এই বাবুকে। তবু তোমরা এসেছ। গায়ের জোরে চর দখল করে

বসেছ। বেশ, তাই করেই দেখ। আমিও দেখি কত বড় তোমাদের ক্ষমতা।'

অতুল বলল, 'আহা, তুমি রাগ করছ কেন বুড়োকর্তা। তোমার চর কি আমরা কেড়ে নিতে এসেছি?'

দ্বিজেনও যোগ দিল, 'তোমায় তো বলেছি, আমরা শুধু দুদিন একটু বেড়িয়ে চলে যাব।'

'বেড়িয়ে চলে যাবে?' একটা অদ্ভুত হাসি হেসে বলল ঝড়ু মাঝি, 'আমি মুখ্য চরের মানুষ বলে কিছু আর বুঝি না।'

সমীর প্রবোধ দিতে চেষ্টা করল তাকে, 'শোন-শোন! এতে বোঝবার এত কী আছে? তোমাদের চরে শিকার করতেও কি কারুর আসতে নেই?'

'শিকার!' ব্যঙ্গের সুরে বলল মাঝি, 'শিকার করতে চাও তোমরা? কী শিকার শুনি? এ চরে শিকার করবার আছেটা কী?'

সমীর প্রশ্ন করে, 'কিছুই নেই নাকি?'

মাথা নেড়ে বলে ঝড়ু মাঝি, 'হ্যাঁ, আছে।'

রাধা ফিরে এসে নবাগতদের দিকে চঞ্চল দৃষ্টিপাত করে কুটিরে ঢুকছিল তখন। ঝড়ু মাঝি কাছে ডাকল তাকে, 'এদিকে শুনে যা তো রাধা!' রাধা এসে কাছে দাঁড়াতেই ঝড়ু মাঝি তার গলার একছড়া মালা হাতে নিয়ে তাতে গাঁথা একটি মোহর দেখিয়ে বলল কর্কশ কণ্ঠে, 'এই তো তোমাদের শিকার? কেমন এই না?'

সবাই বিস্মিত উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়েছিল ওই মোহরটির দিকে। প্রাচীন যুগের খাঁটি সোনার মোহর। অতুল উত্তেজনা অনুভব করছে এটাকে দেখে, 'এ জিনিস তুমি পেলে কোথায়?'

কঠোর কণ্ঠে প্রশ্ন করল ঝড়ু মাঝি, 'যেখানেই পাইনা কেন, এই তোমাদের শিকার কিনা বল?'

সমীর উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, তাই না হয় মানলাম। কিন্তু এ জিনিস কী তা তুমি জান? জান এ জিনিসের দাম?'

ঝড়ু মাঝি বলল, 'জানি জানি। তিন দিন ডিঙি বেয়ে সদরে গিয়েছিলাম তাই জানতে, চোর বলে গারদে পুরে রাখতে শুধু বাকি রেখিছিল। বরাত জোরে জান নিয়ে ফিরেছি।'

অতুল আশ্বাস দিল ঝড়ু মাঝিকে, 'যাকগে, তোমার কোনও ভয় নেই। আমাদের সঙ্গে থাকলে কেউ চোর বলে তোমায় ধরবে না। তোমার—তোমারই ওই নাতনির দুঃখ অভাব আর থাকবে না। শুধু কোথায় এ জিনিস পেয়েছ আমাদের দেখিয়ে দাও।'

'আমি দেখিয়ে দেব?' বলল মাঝি, 'ডাকিনী যা আদ্যিকাল থেকে আগলে রেখেছে তার সন্ধান জানব আমি! একটা দুটো অমন জিনিস আমি শুধু কুড়িয়ে পেয়েছি। তাই কুড়িয়ে নিয়েই আমার এই সর্বনাশ। তোমাদের তাই হবে। এখনও সাবধান করে দিচ্ছি, ভালো চাও তো, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। নইলে কার শিকার কে করে জান দিয়ে বুঝতে হবে। কাউকে সে রেহাই দেবে না, কাউকে না।'

সবাইকে স্তব্ধ করে দিয়ে ঝড়ু মাঝি ছুটে চলে গেল।

'ভালো চাও তো, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও।'

কিন্তু খালিহাতে ফিরে যেতেই কি তারা এসেছে?

বালির স্তূপ পাহাড়ের মতো হয়ে উঠেছে চরের স্থানে-স্থানে। এমনি ছোট-ছোট

অগণিত বালির পাহাড় দেখা যায় একটি স্তূপের ওপর দাঁড়ালে। কোথায় যে তার শেষ ঠিক বোঝা যায় না। মনে হয় এ বালির সমুদ্রও বুঝি বা অসীম। কিন্তু আসলে শেষ তার বেশি দূরে নয়। অপর প্রান্ত গিয়ে আকাশে মেশেনি, মিশেছে জলরাশিতে। অমনি একটা বালুর উচ্চ স্তূপ বা পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে রাধা। বাতাসে উড়ছে তার রুক্ষ সুন্দর চুলের রাশি, উড়ছে তার শাড়ির আঁচল। রোদ চিক-চিক করছে বালির ওপর। রাধা সেখান থেকে দূরে দৃষ্টি প্রসারিত করে কী যেন দেখছে।

কিছুক্ষণ পর রাধা লক্ষ করল, ইলা আসছে সেদিকেই। ইলাও দেখেছে রাধাকে। রাধা ইলাকে আসতে দেখেও আবার দৃষ্টি সে আগেরই মতো দূরের দিকে নিবদ্ধ করল। ইলা এসে দাঁড়াল রাধার কাছে। ডাকল, 'রাধা! কী, দেখছিলে কী?'

হাসল রাধা : 'কী আর দেখব! দেখছিলাম এখনও তোমরা আছ কি না!'

ইলা বলল, 'থাকব না কেন? দুদিনেই চলে যাব বলে তো আসিনি।'

'কিন্তু চলে গেলেই ভালো হত।' রাধার কণ্ঠ গম্ভীর, 'যে জন্যে এসেছ তা কক্ষনো পাবে না, কেউ পায় না।'

কী আশ্চর্য! ইলা ভাবে, বুড়ো দাদু তাদের চলে যেতে বলে। রাধাও তাই বলে! কেন?

ইলা রাধার কথার উত্তরে বলে, 'না পাই পাব না। এই এত কষ্ট করে খোঁজার মজাটা তো আছে?'

রাধা এবার কৌতুকে উচ্ছল হয়ে উঠল, 'বুঝেছি, তুমি কী জন্যে এসেছ আমি জানি।'

হাসিমুখে প্রশ্ন করল ইলা, 'কেন বল তো?'

'তেমন কেউ সঙ্গে এসেছে বলে।'

'তাই নাকি? সে কে—আমি তো জানি না। তুমি চিনে ফেললে কী করে?'

'যতই লুকোও—ও ঠিক চেনা যায়। দূর থেকে দেখেও আমি সব বুঝতে পারি।'

'তুমি তাহলে লুকিয়ে আমাদের ওপর নজর রাখো? চল, তোমাদের বাড়ি তাহলে আজ সামনাসামনিই দেখে আসব।'

'না, না, আমাদের বাড়ি গিয়ে কাজ নেই!' রাধার কণ্ঠে কেমন যেন ভীতির সুর।

'কেন গেলে দোষ কী?'

'দোষ? দোষ কিছু নেই, কিন্তু দাদু রাগ করবে।'

'আমি তোমাদের বাড়ি গেলেও দাদু রাগ করবে?'

'হ্যাঁ, তোমরা আসার পর এ কদিনে দাদু যেন কেমন হয়ে গেছে।'

হঠাৎ মুখ ফেরাল রাধা। চোখে ফুটে উঠল তার একটা বিস্ময় ও চাপা আতঙ্ক। সে বলল : 'ওমা! এ আবার কে?'

ইলা ঠিক তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। হ্যাঁ, নতুন লোক বটে। কিন্তু ইলার কাছে লোকটা কিছুতেই নতুন নয়।

রাধা বলল, 'এঁকে তো আগে দেখিনি। তোমাদের কেউ নিশ্চয়। বাব্বা। তোমাদের আর কতজন আসতে বাকি আছে বল তো?'

ইলা অন্যমনস্কের মতো বলল, 'তাই ভাবছি।' রাধার দিকে ফিরে চাইল ইলা, 'আচ্ছা আমি এখন চলি রাধা।' রাধাদের কুটিরে যাওয়ার কথাটা কী মনে নেই তার?...

ডাঃ সামন্ত এসে পৌঁছে গেছেন ডাকিনীর চরে। অপ্রত্যাশিত নয় এটা। কিন্তু কোন

পথ দিয়ে এসে পৌঁছলেন তিনি। নিশ্চয়ই স্টিমলঞ্চ ছাড়া আসেননি। সেটা কোন দিকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন? বিচিত্র মানুষ, রহস্যময় তাঁর চলা-ফেরা।

গোকুলও খুঁজছিল এই চরে প্রফেসার সামন্তকে। আবিষ্কারও করেছে সে। এই তার কাজ। সে প্রতিশোধ নেবে। অতুলরা গোকুলের গতিবিধির সন্ধান পায় না বড় একটা।

ইলা রাধাদের কুটিরে যাওয়ার সংকল্প ত্যাগ করেছে। প্রফেসারের আসার সংবাদটা অতুলদের দিতেই হবে।...

খবরটা শুনেই অতুল বলল, 'ডাঃ সামন্তই তো ঠিক? দেখতে ভুল হয়নি তো ইলা?'

ইলার ভুল, ডাঃ সামন্ত সম্পর্কে? সে বলল, 'না, না কোনও ভুল হয়নি। প্রফেসার ছাড়া কেউ হতেই পারে না। একবার দেখলে আর ও চেহারা ভোলা যায় না।'

সমীর বলল, 'প্রফেসার তাহলে এখানেও আমাদের ওপর টেক্কা দেওয়ার চেষ্টায় এসেছে।'

দৃঢ়কণ্ঠে বলল অতুল, 'কিন্তু এবার তা আর হবে না। চরের এক একদিকে আমরা এক্ষুনি বেরুব। চল।'

দ্বিজেন গম্ভীর হয়ে শুনছিল ওদের কথাবার্তা। এবার সংশয়ের সুরে বলল, 'কিন্তু—'

প্রশ্ন করে সমীর, 'কিন্তুটা কী?'

দ্বিজেন বলে, 'আমার মনে হচ্ছে এ শুধু পণ্ডশ্রমই হবে। যদি এবার সত্যিই কিছু থাকে, তাহলে প্রফেসারের আগে তার সন্ধান আমরা পাব বলে মনে হয় না।'

সমীর বাধা দিল, 'থাম। নিজেদের ওপর তোমার মতো অবিশ্বাস আমাদের নেই। নাও অতুল, কোন দিকে যাবে ঠিক কবে নাও।'

ইতিমধ্যে চরটার একটা মোটামুটি ম্যাপ তৈরি করেছে অতুল। ক্যাম্পে বসে সেই ম্যাপ খুলে বসল তারা।

এগারো

সবাই বেরিয়ে গেছে। অতুল এসেছে ঝড়ু মাঝির কুটিরের দিকে। ঝড়ু মাঝির সঙ্গে একবার দেখা করা প্রয়োজন। তাছাড়া রাধাই প্রথম আবিষ্কার করেছে সামন্তকে। আর কিছু সংবাদ যদি থাকে তার কাছে। ঝড়ু মাঝির কুটিরেব কাছে এসেই বুঝতে পারে অতুল কারা যেন কথা বলছে ভেতরে। কী কথা, কী বলছে, স্বরটা পরিচিত কিনা কিছুই বোঝা যায় না। কান পেতে দাঁড়িয়ে রইল কুটির-দ্বারে। তারপর উচ্চকণ্ঠে ডাকল, 'কে আছ, কে আছ, এখানে?'

রাধা বেরিয়ে এল কুটির থেকে, 'কেউ নেই এখানে।'

অতুল হাসি মুখে বলল, 'কেউ নেই, তুমি তো আছ। শোন, কোনও ভয় নেই তোমার।'

'ভয় আমি কাউকে করি না। কী চাও তুমি?'

'সেই বুড়ো মাঝি, তোমার দাদু কোথায়?'

'বাড়ি নেই।'

'বাড়ি নেই। কোথায়, গেছে কোথায়?'

'কোথায় গেছে তা আমি জানব কেমন করে? আমি তো ঘরেই আছি দেখছ।'

'কিন্তু ঘরে কথা বলছিলে কার সঙ্গে?'

'ওমা, কথা আবার কার সঙ্গে বলব!' মুখ ফিরিয়ে হাসি গোপন করল রাধা।

'হ্যাঁ, আমি তোমার কথা শুনেছি।'

'তাহলে—এই পাখিটার সঙ্গে বলছিলাম বোধ হয়।'

'পাখি—কী পাখি?'

'কী পাখি আবার, আমার গাছের পাখি!'

'তামাসা হচ্ছে আমার সঙ্গে? গাছের পাখির সঙ্গে কেউ কথা বলে?'

'তা বলবে না কেন? মানুষের সঙ্গ না পেলেই বলে!' হাসিতে ফেটে পড়তে গিয়ে থেমে গেল রাধা।

অতুল রাগ করে এগিয়ে গেল দোরের দিকে, 'কী, হাসছ কী? সরে যাও, কে আছে ভেতরে আমি দেখব। সর বলছি?'

রাধা দোর আগলে দাঁড়াল। অতুল তার সংকল্পে অটল। রাধাকে ঠেলে সরিয়েই সে ভেতরে ঢুকবে।

রাধা বিস্মিত দৃষ্টি মেলে বলল, 'ও বাবা, ভেতরে জোর করে ঢুকবে নাকি গো?'

আরও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে অতুল, 'হ্যাঁ, তাই ঢুকব।'

অতুলের অগ্রগতিতে বাধা পড়ল, কুটিরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন প্রফেসার।

প্রফেসার বললেন, 'থাক থাক অতুলবাবু, আর বীরত্ব দেখাবার প্রয়োজন নেই।'

অতুল বিমূঢ়ের মতো চেয়ে রইল কিছুক্ষণ প্রফেসারের দিকে। তারপর বলল, 'আপনি?' এবার কণ্ঠে তার ফিরে এল দৃঢ়তা, 'আপনি এখানে কী করতে এসেছিলেন?'

'আপনার মতোই কৌতূহলী হয়ে।'

'কিন্তু, ভেতরে ঢুকলেন কী করে?'

'খুব সহজে। কোনরকম বীরত্ব না দেখিয়ে শুধু কথার মিষ্টতায়।'

'ওর দাদু, সেই বুড়ো কি ভেতরে আছে?'

'দেখিনি তো?'

'কী তাহলে দেখলেন?'

'যা দেখব ভেবেছিলাম।'

'যা ভেবেছিলেন! সেইটে কী জানতে পারি?'

'পারবেন, যথাসময়ে সবই জানতে পারবেন। আপাতত এখান থেকে যাওয়া উচিত নয় কী? এদের ওপর যথেষ্ট জুলুম হয়েছে। আসুন।'

না গিয়ে উপায় নেই অতুলের। এই ডাঃ সামন্ত। সে যে শুধু একটি মস্তবড় ফন্দিবাজ তাই নয়, তার ব্যক্তিত্বটাও এমন যে তাকে উপেক্ষা করা সহজ নয়। তার কথা অমান্য করা অনেক সময়েই অসাধ্য। কী দুর্দান্ত ক্ষমতা তার। অনেক সময় তার উপস্থিতি যেন আড়ষ্ট শীতল করে আনে বুদ্ধি-বৃত্তি, মনের জোর হারিয়ে ফেলা যায়।

কিন্তু ডাঃ সামন্ত! তোমার সঙ্গে লড়াই করবেই অতুল।

ওদের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে হাসছিল রাধা।

প্রফেসারের পেছনে-পেছনে আসছিল অতুল। কুটিরের সামনে থেকে চলে আসবার সময়ে রাধার মুখে সে কৌতুকের হাসি দেখেছে; তাতে সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরে গেছে অতুলের। কী, ভেবেছে কী রাধা? প্রফেসারকে সে ভয় পায়? কেন ভয় পাবে? না, না, সে কাউকেই

ভয় পায় না। ভয় পেলে ডাকিনীর চরে সে আসত না। রাতের ওই বীভৎস আর্তনাদ কি তাকে ভয় দেখাতে পেরেছিল? আর প্রফেসার! তার সেই শূন্যকেশ মড়ার মাথার মতো মাথাটা, তার সেই অদ্ভুত মুখভঙ্গি, তার কথার ওই ভয় জাগানো ধরন, কিছুই দমাতে পারবে না অতুলকে। সে সাহস সঞ্চয় করছে মনে-মনে। নিজেকে নিজে বলছে, ওই ডাঃ সামন্তকে ভয় করবার কিছু নেই অতুল। তুমি যে শুধু ডাকিনীর চরের কল্পিত ডাকিনী প্রেতিনীর সঙ্গেই লড়াই করতে আসনি, এই জীবন্ত শরীরী প্রেত-মূর্তির সঙ্গেও লড়াই করবার জন্যেও প্রস্তুত হয়ে এসেছ।

অতুল বলতে যাচ্ছিল প্রফেসারকে, কেন, এসেছেন আপনি এখানে? কিন্তু প্রফেসারই হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে প্রথম কথা বললেন, 'আমাকে এখানেও দেখবেন ভাবতে পারেননি, কেমন? কিন্তু আপনাদের জন্যেই আমায় আসতে হল।'

কী বলে লোকটা? ধৃষ্টতার তার সীমা নেই। তিনি এসেছেন অতুলদেরই কৃতার্থ করতে অথবা রক্ষা করতে? অতুল বিদ্রূপের সঙ্গে বলল, 'আমাদের জন্যেই এসেছেন। গুপ্তধন আগে সরিয়ে, আমাদের উপকার করতে বোধহয়?'

প্রফেসার মিটমিট করে তাকালেন অতুলের দিকে, 'সে ভাবেও কথাটা ভাবতে পারেন। তবে তার আগে আর একটা উপদেশ দেওয়ার আছে।'

অতুল প্রশ্ন করল, 'সেটা কী?'

প্রফেসার বললেন, 'সেটা আপনাদের সাবধান করে দেওয়া। এখনও বলছি এ চরে আর একদিনও থাকবেন না। থাকার বিপদ যে কী তা কল্পনাও করতে পারবেন না আপনারা।'

সবাই যে অতুলদের বাঁচাবার জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছে। ঝড়ু মাঝি বার-বার সাবধান করে বলে, চলে যাও এখান থেকে, নইলে কেউ বাঁচবে না। রাধা বলে, কেন এলে, আর থেক না। প্রফেসার বলে যে থাকার বিপদ যে কী ভাবাই যায় না। সকলেরই দরদ উথলে উঠেছে। কিন্তু ওরা আছে এখানে, ঝড়ু মাঝি আর তার নাতনি, সব বিপদকে অগ্রাহ্য করে। প্রফেসারও এসেছেন, কই নিজের চলে যাওয়ার কথা তো তিনি বলেন না? তাঁর বুঝি কোনও বিপদই কোথাও ঘটতে পারে না? ওদিকে আবার দ্বিজেন ডাকিনীর চর থেকে ফিরে গিয়েই কেমন যেন ঘাবড়ে গেছে। বলে. 'প্রয়োজন নেই গুপ্তধনে।'

অতুল বলে প্রফেসারের কথার উত্তরে, 'ভয় দেখাচ্ছেন? আমরাও চরের সন্ধান করে আসব ভাবতে পারেননি। তাই একটু অসুবিধা হচ্ছে, না?'

প্রফেসার বললেন নিঃসঙ্কোচে, 'তা একটু হচ্ছে বইকী?'

'কিন্তু'—বলল অতুল, 'ভয় দেখিয়ে আমাদের তাড়াতে পারবেন ভেবেছিলেন?'

প্রফেসার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন, 'তাই ভেবেছিলাম। ভুল যদি ভেবে থাকি, সেটা দুর্ভাগ্য—তবে আমার নয়।'

এবার প্রফেসার লাঠি ঠুকে-ঠুকে পেছন দিকে একবারও ফিরে না তাকিয়ে চলে গেলেন। অতুল দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আপন মনে বলল, 'সেটা দুর্ভাগ্য? তবে আমার নয়! কার?'

সমীর ঘুরতে-ঘুরতে এমন একটি জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, যেখানে একটা অতি উচ্চ বালুস্তূপ, তার একদিকে খাদের মতো নেমে গেছে অনেকখানি নিচে। আশেপাশেও তার রয়েছে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বালিয়াড়ি। নিচের দিকে চেয়ে রইল সমীর। বালির আড়ালে দেখা যাচ্ছে আর একটা ঘরের সামনে ইট পাথরের স্তূপ। তাহলে এখানে হয়তো কখনও কোনও বাড়ি ছিল, অথবা আর কিছু। আজ তা বালিস্তূপের মাঝে চাপা পড়েছে। উৎসাহিত হয়ে

উঠল সমীর। জায়গাটিতে নামতেই হবে। কোনও দিকে কী কোনও পথ রয়েছে? চারদিকে খুঁজছিল সমীর, আর আস্তে-আস্তে সে একটু করে এগোচ্ছিল, ওই খাদটির একধার বেয়ে। হঠাৎ পায়ের তলার বালুস্তূপ তার ধসে পড়ল আর তাকে নিয়ে একেবারে গড়িয়ে নেমে গেল নিচে। হুমড়ি খেয়ে পড়ল গিয়ে সমীর একটা শক্ত জায়গায়। সারা শরীর তার বালিতে ঢেকে যাচ্ছে। অবিরাম নেমে এসে তাকে চাপা দিতে চেষ্টা করছে যেন। মাথা তুলে দাঁড়াতে চেষ্টা করতে লাগল সমীর। দুহাতে বালি ঠেলতে আরম্ভ করল। কিন্তু দাঁড়াতে তো পারছে না সে। একখানি পা বোধ করি ভেঙে গেছে। ভেঙে না গেলেও মচকে যে গেছে তাতে সন্দেহ নেই। আতঙ্কিত হয়ে উঠল এবার সমীর। তাহলে কি সে এই বালির তলায়ই অসহায়ের মতো সমাধি লাভ করবে? সে চিৎকার করে ডাকতে লাগল, 'অতুল! দ্বিজেন! কে আছ, কে আছ এখানে?' না, কোনও দিক থেকে কোনও উত্তর এল না, কোন আশ্বাসই পেল না বিপন্ন সমীর। তা হলে? মরতে হবে এখানেই। নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে থেকে বালির তলায় চাপা পড়ে মরবে? না, তা হয় না। কিন্তু উঠেও সে দাঁড়াতে পারছে কোথায়? মরিয়া হয়ে খোঁড়া পা-খানি টেনে নিয়ে দু-হাতে ভর করে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগল সমীর। কোনও পথ নেই কি এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার?

এগিয়ে যেতে লাগল সমীর। পথ খুঁজে বের করতে হবে।

কিন্তু এ কী! হাতে কী ঠেকল তার? একটি নয়, কয়েকটি। হাত দিয়ে একটি তুলে ধরল সে। দেখেই ছুঁড়ে ফেলল দূরে। মানুষের মাথার খুলি। কী ভীষণ! দাঁত বের করে যেন হাসছে তারা। বলছে, 'তুমি এসেছ বন্ধু? বেশ আমাদের সঙ্গী বাড়ল।' শিউরে উঠল সমীর। এরাও তাহলে তার মতোই কি এখানে এসে পড়েছিল, আর বেরুবার পথ খুঁজে পায়নি।

আরও কিছুদূর। এবার যা হাতে ঠেকল, তা বীভৎস কিছু নয়। মণি-মুক্তা। হ্যাঁ, মণি-মুক্তাই। তাহলে এখানেই রয়েছে গুপ্তধনের ভাণ্ডার। দুর্ঘটনা এখানে টেনে এনেছে তাকে এই ধনভাণ্ডার আবিষ্কার করতে।

কিন্তু পথ! পথ কোথায়?

আরও একস্তূপ বালি ধসে পড়ল ওপর থেকে। পাহারাদার যক্ষরাই বালির তলায় কি চেপে মারতে চায় তাকে? আতঙ্কে আবার চিৎকার করে উঠল সমীর, 'অতুল! দ্বিজেন! কে আছ, কে আছ—'

এবার ওই আর্তনাদ এসে পৌঁছেচে দ্বিজেনের কানে। দ্বিজেন বাইরে একটা বালুস্তূপের ওপর থেকে ওর আহ্বান শুনলে। হ্যাঁ, সমীরেরই এ আহ্বান। নিচে থেকে ডাকছে সে। দ্বিজেন ওই দিকার লক্ষ করে নিচে নামতে লাগল।

নিচে নামবার—সে জায়গায় পৌঁছাবার আগেই দ্বিজেন উচ্চকণ্ঠে সাড়া দিল, 'কে, কে এখানে?'

তা হলে বাঁচার আশ্বাস এসেছে, বন্ধুরা সাড়া পেয়েছে। আনন্দে অধীর হয়ে এগিয়ে যেতে লাগল সমীর, 'দ্বিজেন! দ্বিজেন! আমি সমীর।'

বালু-রাশি সরাতে-সরাতে পথ করে এসে নামল দ্বিজেন। সমীরকে এই অবস্থায় সেখানে দেখে বলল, 'এ কি সমীর। কী হয়েছে তোমার? এখানে কেমন করে এলে?'

উত্তেজিত সমীর গভীরভাবে শ্বাস নিতে-নিতে বলল, 'কেমন করে এলাম! এখানে শখ করে কেউ হাওয়া খেতে আসে? দেখতে পাচ্ছ না পড়ে গেছি।'

দ্বিজেন বলে, 'পড়ে গেছ!'

'হ্যাঁ, ওপরের ঢিবিগুলো কিসের তাই একটু দেখছিলাম। হঠাৎ বালি ধসে নিচে পড়ে গেলাম। ডান পা-টা বেশ জখম হয়েছে, নাড়তে যন্ত্রণা হচ্ছে। তুমি না এলে এখানেই আমার কবর হত। এ জায়গার সন্ধানও অবশ্য তাহলে তোমরা পেতে না।'

'জায়গায় সন্ধান? কী এ জায়গা!'

'যা খোঁজবার জন্যে এত রেষারেষি, মারামারি। সেই জায়গাই মনে হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছ এই জিনিসটা?

দ্বিজেন যেন হকচকিয়ে উঠে ওদিকে এগিয়ে গেল, জিনিসটা সে হাতে তুলে নিল। মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে রইল সে ওই রত্নালঙ্কারটির দিকে, 'সত্যিই সেই জায়গা বলে মনে হচ্ছে।'

'আর একটু এগিয়ে যাওনা। আরও কিছু দেখতে পাবে।'

দ্বিজেন থমকে দাঁড়াল। উৎসাহহীন কণ্ঠে বলল, 'আর দরকার নেই ভাই।' সে সমীরকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরল, 'চল আমরা বাইরে যাই।'

বিস্মিত হল সমীর, 'বাইবে তো যাবেই কিন্তু তার আগে একটু দেখতে ক্ষতি কী?'

দ্বিজেন মুখ কালো করল, 'না ভাই। দেখতেও আমার ভয় হয়। তখনই আমি তোমাদের বাধা দিয়েছিলাম। এখানে আসার পর থেকে আরও বেশি করে আমার মনে হচ্ছে ওই অভিশপ্ত গুপ্তধনের সন্ধানে না এলেই ভালো করতাম। মনে হচ্ছে, এ জিনিস ছুঁলেও দারুণ কোনও একটা সর্বনাশ হবে।'

সমীর বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বলল, 'কী যা তা বলছ? সর্বনাশ যা হওয়ার তা তো আমার পাটার ওপর দিয়েই হয়েছে। কিন্তু তবু তোমার মতো অন্ধ কুসংস্কার আমার নেই। আমি তো ভয় পাচ্ছি না।'

দ্বিজেন বলল, 'না, না, তুমি বুঝতে পারছ না সমীর, এ কুসংস্কার নয়। আমার কথা তুমি হয়তো শুনবে না। নইলে তোমায় আমি অনুবোধ করতাম, এ জায়গার সন্ধান যে পাওয়া গেছে, কাউকে যেন না বল। আমরা দুজনে না বললে কেউ কিছু জানতে পারবে না। শুধু হাতে হলেও ভালোয়-ভালোয় হয়তো তাহলে এখান থেকে ফিরতে পারব।'

'থাম,'—বাধা দিল সমীর, 'তুমি এত ভীতু তা জানতাম না। এত করে যে জায়গার সন্ধান পেলাম, আমার পা-ভাঙার দামটাও তা থেকে উশুল করব না। এ খবর চেপে যাওয়ার কোন মানে হয়? ধর আমাকে।'

দ্বিজেন ধরে নিয়ে চলল সমীরকে। বলল, 'আমার যা বলবার বললাম। এখন তোমার যা ইচ্ছে তা করতে পারো।'

সমীরের কাছে খবরটা শুনেই উৎসাহে লাফিয়ে উঠল অতুল।

কিন্তু সমীরটা যে খোঁড়া হয়ে এল।

সমীরও উত্তেজিত। পা-ভাঙার জন্যে কোনও দুঃখ নেই তার। প্রথমে যে যন্ত্রণাবোধ করছিল, আবিষ্কারের আনন্দে কখন তা মিলিয়ে গেছে। সে বলল, 'তোমরা অকারণে ব্যস্ত হয়ো না। পা ভাঙার জন্যে আমার কোনও দুঃখ নেই। পা না ভাঙলে ও জায়গার সন্ধান কি পেতাম? কিন্তু তোমরা আর দেরি কোরো না।'

অতুল তখনই প্রস্তুত, 'চল দ্বিজেন। যা-যা দরকারি সব নিয়ে আমরা এক্ষুনি বেরুব।'

দ্বিজেন প্রশ্ন করল, 'এক্ষুনি?'

সমীর বলল, 'এখন নয় তো কী? প্রফেসার সামন্তর কথা কী সবাই ভুলে গেছ?'

কিন্তু দ্বিজেনের এখনই বেরিয়ে পড়তে আপত্তি, 'ভুলিনি বলেই এখন যেতে চাইছি না। সে শয়তানের সজাগ দৃষ্টি কোথায় যে নেই জানি না। তার দৃষ্টি এড়াবার জন্যেই রাত্রে লুকিয়ে ছাড়া আমাদের যাওয়া উচিত নয়।'

ইলার তাই মত। রাত্রে যাওয়া ঠিক।

অগত্যা অতুলও তাতে সায় দিল, 'বেশ, তাহলে রাত্রে যাওয়ার জন্যেই প্রস্তুত থেক।'

বারো

রাত্রির বুক চিরে সেই বীভৎস কান্না ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। ডাকিনী কাঁদছে। সে কান্নার সুর ছড়িয়ে পড়েছে বালুবেলায়। ঢেউয়ের আছাড়ি-পিছাড়ি। বাতাসও যেন ওই সুরে সুর মিলিয়ে হু-হু করে কাঁদছে। রাত্রির স্তব্ধতা ভেঙে গিয়েছে।

অতুল আর দ্বিজেন চলেছে একসঙ্গে নৈশ অভিযানে। তারা অস্ত্রসজ্জিত। সঙ্গে তাদের নানা জিনিস। দড়ি-মশাল আর অন্যান্য টুকিটাকি জিনিসে ভরা ব্যাগে।

ওই কান্না শুনে পথে থমকে দাঁড়াল তারা।

অতুলকে জড়িয়ে ধরে বলল দ্বিজেন, 'শুনলে, শুনলে অতুল?'

অতুল উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, শুনলাম।'

কণ্ঠে আকুলতা এনে বলল দ্বিজেন, 'ফিরে চল অতুল। কাজ নেই আর এগিয়ে, হয়তো ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটবে।'

অতুল দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'ঘটে যদি ঘটুক। তবু আমাদের যেতেই হবে।'

অনিচ্ছুক দ্বিজেনকে সে একরকম টেনে নিয়েই চলল।

কিন্তু কিছুক্ষণ যাওয়ার পরই আবার থমকে দাঁড়াল দ্বিজেন।

অতুল প্রশ্ন করল, 'ওকী, আবার থামলে কেন?'

দ্বিজেন বলল, 'তাড়াতাড়িতে টর্চটা ভুলে ফেলে এসেছি।'

ক্ষুব্ধ হল অতুল, 'টর্চটাই ভুলে এলে? যাকগে, দরকার নেই টর্চের।'

দ্বিজেন মাথা নেড়ে বলল, 'না, না, তুমি জাননা। দিনের বেলাতেই সেখানটা অন্ধকার। রাত্রে আলো ছাড়া এক পাও এগোতে পারবে না।'

'কী মুশকিল! আচ্ছা তুমি দাঁড়াও। আমি টর্চটা আনছি।' অতুল বলল।

দ্বিজেন যেন ঘাবড়ে গেছে, 'আমি এখানে একা থাকব?'

তখনও থেমে-থেমে ডাকিনীর কান্না চলছে।

অতুল রেগে গেল, 'থাকবে না তো কী করবে? এই সব লটবহর নিয়ে দুজনেই আবার ফিরে যাওয়ার কোনও মানে হয়!' বন্দুকটা দ্বিজেনের হাতে দিয়ে বলল, 'নাও, বন্দুকটা রাখ।'

দ্বিজেন বন্দুক হাতে নিল। অতুল এগিয়ে যেতে লাগল শিবিরের দিকে। দ্বিজেন ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকল; 'অতুল।'

বিরক্তির আর সীমা নেই অতুলের, 'কী, আবার কী?'

'বলছিলাম কী।' ঢোক গিলল দ্বিজেন, 'তুমি বরং এখানে থাকো। আমিই টর্চটা আনছি।'

অতুল রাজি আছে, 'বেশ। তাতে যদি ভয় কম হয়, তাই কর। তুমি যে কেন পুরুষমানুষ হয়ে জন্মেছিলে, তাই ভাবি। তোমার বোনের সাহস তোমার চেয়ে অনেক বেশি।'

গায়ে মাখল না দ্বিজেন এ-কথাগুলো। বন্দুক হাতে নিয়ে সে এগিয়ে গেল।

অতুল দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভাবছে। দ্বিজেন এত ভীত হয়ে পড়েছে কেন? ডাকিনী যেন এবার কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আর তেমন করে কাঁদছে না। এখন যেন মাঝে-মাঝে শুধু গোঙাচ্ছে। এমন সময় একটা আকুল আবেদন এসে পৌঁছল তার কানে। অতুল! অতুল! কে এমন করে ডাকছে? ডাকা নয়। যেন আতঙ্কগ্রস্ত মানুষের সাহায্যের জন্য চিৎকার। সঙ্গে-সঙ্গেই অতুল শুনতে পেল বন্দুকের গুলি ছোঁড়ার একটা আওয়াজ। দ্বিজেন। দ্বিজেনই তাকে ডাকছিল মনে হল অতুলের। সত্যি কি কিছু বিপদ ঘটল দ্বিজেনের? সে দ্রুত ছুটে গেল সেই শব্দ লক্ষ করে। কিন্তু কেউ কোথাও নেই। শুধু পড়ে আছে বন্দুকটা। দ্বিজেন নেই। চারদিকে খুঁজতে লাগল উন্মাদের মতো অতুল, ডাকতে লাগল, 'দ্বিজেন, দ্বিজেন!' না নেই দ্বিজেন। কোনও সাড়াও নেই তার। হতভাগ্য—ভীত সন্ত্রস্ত দ্বিজেন। আরও কিছুদূর গিয়ে অতুল দেখল বালির ওপর দিয়ে একটি দেহ যেন টেনে নেওয়া হয়েছে। কিছু রক্তও লেগে আছে বলে মনে হয়।...

ওদিকে তাঁবু থেকে ইলাও শুনতে পেয়েছে বন্দুকের শব্দ। বন্দুক! কে চালাল গুলি, কেন চালাল গুলি! ইলা প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে পড়ল তাঁবু থেকে।

পরিচারিকা মোক্ষদা এগিয়ে এসে বাধা দিল, 'কোথায় যাচ্ছ তুমি দিদিমণি?'

ইলা ত্রস্ত কণ্ঠে বলল, 'আসছি এক্ষুনি! তোমার কোনও ভয় নেই।'

সমীরও বেরিয়েও এসেছে তাঁবু থেকে। সে দাঁড়িয়ে দূরে বালির স্তূপগুলির দিকে চেয়েছিল। ইলা কাছে এসে বলল, 'শুনলেন?'

সমীর বলল, 'হঠাৎ বন্দুক ছোঁড়বার কারণটা বুঝতে পারছি না। কী করা যায় বলুন তো!'

ইলা বলল, 'আপনি খোঁড়া পা নিয়ে কী করবেন? আমি যাচ্ছি।'

'না, না আপনি যাবেন কী?' বাধা দিল সমীর।

ইলার অটুট সংকল্প, 'বাধা দেবেন না। যেতে আমায় হবেই।'

ইলা দ্রুত চলে গেল। সমীর অধীর হয়ে উঠল। তাদেরই কারও হয়তো কোনও বিপদ ঘটেছে। সে তখন কী করবে? তার খোঁড়া পা! সে এগোতে চেষ্টা করল, কিন্তু পা চলতে মোটেই সমর্থ নয়, রাজি নয়। একটা পদশব্দে চমকে উঠল সমীর, 'কে?' সে চেয়ে দেখল সম্মুখে দাঁড়িয়ে প্রফেসার। তীব্রকণ্ঠে বলল সমীর, 'আপনি? কী চান আপনি এখানে?'

প্রফেসার উত্তর দিলেন, 'কিছু না। শুধু আপনাকে একটু সাবধান করতে এলাম।'

'সাবধান। কিসের সাবধান?'

'আপনার নিজের জন্যেই সাবধান। যা আপনি জেনেছেন, তা না জানলেই ভালো ছিল, কিন্তু যখন জেনেই ফেলেছেন, তখন তার বিপদটা সম্বন্ধে সজাগ থাকা দরকার। সাবধান!' প্রফেসার চলে গেলেন।

পেছন থেকে ডাকল সমীর, 'দাঁড়ান!' কিন্তু প্রফেসার দাঁড়ালেন না।

প্রফেসার যেতে না যেতেই দ্রুতপদে ছুটতে-ছুটতে এসে উপস্থিত হল অতুল। সে সমীরকে বাইরে দেখে বিস্মিত হল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'সমীর? এ কী, তুমি এখানে?'

'হ্যাঁ, বলছি। কী তোমাদের কী হল, বন্দুক ছুঁড়ল কে?'

'জানি না। কিন্তু দ্বিজেনের বোধহয় ভয়ানক একটা কিছু হয়েছে। বন্দুক নিয়ে তাঁবুতে

ফিরছিল। হঠাৎ দূরে থেকে আওয়াজ শুনে গিয়ে শুধু খানিকটা রক্তের দাগ আর বন্দুকটা পেলাম।'

'কী, বলছ কী! এইমাত্র প্রফেসার সামন্ত কি সে জন্যেই এখানেই এসেছিল?'

'প্রফেসার সামন্ত! এখানে?'

'হ্যাঁ বন্দুকের আওয়াজ শুনে বাইরে এসেছিলাম, হঠাৎ কোথা থেকে এসে আমায় শাসিয়ে গেল।'

'শাসিয়ে যাওয়ার মানে?'

'ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'আশ্চর্য তো! ইলা কোথায়?'

'ইলা তো তোমাদের খোঁজ করতেই বেরিয়ে গেল।'

'ইলা বেরিয়ে গেল! এই রাত্রে! তুমি তাকে যেতে দিলে?'

'বাঃ, বারণ তো করলাম, সে যে কিছুতেই শুনল না।'

'শুনল না! অপদার্থ কোথাকার।'

অতুল দ্রুত চলে গেল। সমীর সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল তাঁবুর সম্মুখে। সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে একটুখানি এদিকে-ওদিকে পায়চারি করবার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ সমীরের দৃষ্টি পড়ল তাঁবুরই গা ঘেঁষে কে যেন বাইরের অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে চিৎকার করে উঠল ঃ কে, কে? উত্তর দিল না ওই ছায়ামূর্তি। কিন্তু তার একখানি হাত প্রসারিত হল, সমীর দেখল হাতে আগ্নেয়াস্ত্র। সমীর ক্রুদ্ধ কণ্ঠে গর্জে উঠল, 'শয়তান!' ওই হাত পরপর দুটো গুলি ছুঁড়ল। লুটিয়ে পড়ল সমীর। বুঝল কে তাকে হত্যা করল কাপুরুষের মতো। কিন্তু বলবার বা কাউকে জানাবার আর কোন সুযোগই সে পেল না।...

ঝড়ু মাঝির কুটিরের কাছে গিয়ে সাড়া পেল ইলা, কে যেন কুটির থেকে বেরিয়ে আসছে। সে গিয়ে একটি অন্ধকার কোণে আত্মগোপন করে রইল। কুটির থেকে বেরিয়ে এল ঝড়ু মাঝি, হাতে একখানি শাবল নিয়ে। সে দ্রুত বাইরের আঁধারে মিলিয়ে গেল। ইলা এবার এগিয়ে এসে কুটিরের মধ্যে কী আছে—কারা আছে, চুপি-চুপি দেখতে লাগল। ক্রমশ সে কুটিরের উঠোনে গিয়ে দাঁড়াল। ঘরের ভেতর থেকে সাড়া দিল রাধা, 'কে!' ইলা কোনও উত্তর দিল না। রাধা ঘর থেকে চঞ্চল পদে উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে বেরিয়ে এল।

ইলাকে চিনতে পেরে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল রাধা, 'তুমি! তুমি আবার এসেছ! তোমায় না বারণ করেছিলাম?'

'হ্যাঁ; করেছিলে। কিন্তু কেন বারণ করেছিলে, তাই দেখতে এলাম। এই মাত্র বাড়ি থেকে কে বেরিয়ে গেল?'

'কে আবার? আমার দাদু।'

'তোমার দাদু! এত রাত্রে অমন চোরের মতো গা-ঢাকা দিয়ে গেল কোথায়?'

'তা আমি কী করে জানব? দোহাই তোমার, তুমি এখন যাও।'

'কেন, আমি থাকলে ভয়টা কী? বাড়িতে তো তুমি একাই আছ।'

'হ্যাঁ, একা ছাড়া আর কে থাকবে? দিনরাত আমি একাই থাকি।'

'দিনরাত তুমি একাই থাক। কেন তোমার দাদু?'

'দাদু! দাদু আজকাল এখানে থাকে না।'

'তোমায় একলা রেখে তাহলে সে যায় কোথায়?'

'জানি না।'

'জানবার চেষ্টাও করনি?'

'আমার জেনে কী দরকার?'

'খুব দরকার আছে, এস।'

'কোথায়?'

'তোমার দাদু কোথায় গেছে তাই দেখতে।'

'না, না, সে আমি পারব না।'

'কেন, তোমার এত ভয় কীসের? তুমি না এই চরেরই মেয়ে! তুমি না কিছুকে ভয় কর না?'

'ভয় তো করিই না। কিন্তু দাদু যে আজকাল কেমন হয়ে গেছে ঠিক বুঝতে পারি না।' ইলা রাধার হাত ধবে বলল, 'তা তোমাকে বুঝতেই হবে। এস।'

আর বাধা দিতে পারল না রাধা, ইলার সঙ্গিনী তাকে হতেই হল। সত্যি ইলার সন্দেহ হয়েছে রাধার ওই দাদুর ওপব। অমন চোরের মতো চারদিকে চেয়ে-চেয়ে শাবল হাতে ছুটে গেল সে। নিশ্চয় আজ রাতে সেও অভিযান করেছে ওই গুপ্তধন-ভাণ্ডারের দিকে। তারা আছে, আছেন প্রফেসার ডাঃ সামন্ত আর এই বুড়ো, রাধার দাদু।

ইলা আর রাধা গিয়ে দাঁড়াল এক বালুস্তূপের ওপর। সেখান থেকেই নিচে সেই ধনভাণ্ডার। পুবোনো দিনের একটি মন্দির, তা চাপা পড়েছে অনেকাংশই বালির তলায়। ওই বালুর ঢিবির ওপবে দাঁড়িয়ে ইলা আর রাধা নিচের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত কবল। মনে হল কে যেন পাথরে বাঁধন সিঁড়ির ওপর থেকে বালি সরাচ্ছে, অথবা আর কিছু। শাবলই হযতো চালাচ্ছে সে। ওই কি রাধার দাদু? রাধা বলে, 'ঠিক বুঝতে পারছি না।' বুঝতে পাবা যাক আর না যাক, লোকটা যেই হোক, এগিয়ে দেখতেই হবে। নিচে নেমে যাবে ইলা। ওইখানে একটা সংগ্রাম চলছে আজ, ইলা এটা বুঝতে পারছে মনে-মনে। তার অন্তর বার-বার বলছে। কাজেই সে দূরে সরে থাকবে না। ইলা হাত দিয়ে দেখাল রাধাকে, 'ওইখানে পথ নেমে গেছে মনে হচ্ছে। চল।' রাধা করুণ কণ্ঠে বলল, 'ওইখানে যাব?'

'হ্যাঁ যেতেই হবে।' আদেশের সুরে বলে ইলা। রাধার হাত ধরে সে নামতে লাগল।

ওই বুড়ো লোকটি এবাব শাবল চালাতে-চালাতে এগোচ্ছে। শাবলের চাপে হঠাৎ একটা বড় ধস নেমে এল সশব্দে। লোকটা একবার চেয়ে নিল চারদিকে আর কেউ কি আসছে সেদিকে? তার দৃষ্টিব সম্মুখে কেউ নেই দেখে মশাল জ্বালিয়ে সন্তর্পণে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ইলা ও রাধা চুপি-চুপি নিচে নেমে এসেছে ওই বুড়োকে অনুসরণ করে। বুড়ো যে পথ দিয়ে গেল সেখানে তারা গিয়ে একটা স্তূপের পেছনে আত্মগোপন করে দাঁড়াল। বুড়ো মশালের আলোতে পায়ের কয়েকটি দাগ দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়ল। তখন সে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছে সেই প্রাচীন ভাঙা মন্দিরটির ভূগর্ভস্থ মহলে। সেখানে পায়ের দাগ! তাহলে তার আগেই কেউ এসে এখানে প্রবেশ করেছে! কে সে? স্তম্ভিত হয়ে পড়েছে বুড়ো। তাহলে কি আরও কোনও পথ রয়েছে এখানে আসবার? বুড়ো চারদিকে অনুসন্ধান করতে লাগল।

সে সময়েই গোকুল একটা পিস্তল হাতে নিয়ে সন্তর্পণে নিচে নেমে এল। নিঃশব্দ তার পদক্ষেপ। শিকারি বিড়ালের মতো দৃষ্টি। সে এগিয়ে যেতে লাগল পিস্তল হাতে বুড়োর দিকে। তাকেও দেখেছে ইলা আর রাধা। রাধা এবার আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠল, 'দাদু!'

গোকুল পিস্তল হাতেই ঘুরে দাঁড়াল। কী বিপদ! এখানে আবার মেয়েছেলে। বুড়োও রাধার চিৎকারে ফিরে দাঁড়াল।

ইলারা যেখানে আত্মগোপন করে ছিল—গোকুল সেদিকে চেয়ে উগ্র কণ্ঠে বলল, 'কে, কে আছ ওখানে? বেরিয়ে এস। নইলে রেহাই নেই। বেরিয়ে এস।'

ভীত সন্ত্রস্ত ভাবে ইলা ও রাধা বেরিয়ে এল। গোকুল তাদের দিকে পিস্তল আন্দোলিত করে বলল, 'ওঃ আপনারাও আছেন এর মধ্যে? যান ওই দিকে সরে যান।'

বুড়ো ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসছিল গোকুলের দিকে, গোকুল চিৎকার করে বলে উঠল, 'খরবদার।'

গোকুল পিস্তলটা হাতে ধরে আছে। সতর্ক দৃষ্টিতে সে চেয়ে আছে বুড়োর দিকে। তাই বুড়ো নিজের অস্ত্র হাতে নেওয়ারও সুযোগ পাচ্ছে না। তথাপি সে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। আবার উচ্চকণ্ঠে সাবধানবাণী উচ্চারণ করে গোকুল, 'সাবধান।'

গোকুল মেয়েদের লক্ষ করে বলে, 'যান-যান, একেবারে ওই পেছনে গিয়ে দাঁড়ান।'

এবার গোকুল ধীরে-ধীরে ঝড়ু মাঝির কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'কী বুড়ো কর্তা, একাই চুপি-চুপি সব কাজ করবে ভেবেছিলে। সেটা কি ধর্ম হয়?'

বুড়ো ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'তুমি! তুমি কোথা থেকে এলে? কে তুমি?'

'আমি! আমায় চিনতে পারছ না? আর আমিই তো এখানকার সব, এতকাল ধরে এইসব আগলে বসে আছি। তাই আমায় ফাঁকি দেওয়া কি এতই সোজা?'

'বদমাশ! এর মজা তুমিও টের পাবে।'

'আহা অত খেপে যাচ্ছ কেন বুড়ো কর্তা। মজার জন্যেই তো এসেছি। তুমিও তার ভাগ পাবে।'

বুড়োর দিকে পিস্তল উঁচিয়ে আদেশ করল গোকুল, 'যা বলছি শোন।'

গোকুল আর বুড়ো দুজনে এগিয়ে গিয়ে একটা সিন্দুকের সম্মুখে দাঁড়াল। গোকুল আদেশ করল ঃ 'নাও নিজের হাতেই অন্তত খোলার সুখটা করে নাও।'

বুড়ো ইতস্তত করতে লাগল। গোকুল গর্জে উঠল, 'খোল।'

বুড়ো সিন্দুকের ডালাটা অনেক কষ্টে তুলে ধরল। ভেতরে তাকিয়েই আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠল, 'একী! একী!'

গোকুল ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'কী! হল কী!'

বুড়ো কম্পিত কণ্ঠে বলল, 'নিজেই দেখ না, কী!'

এগিয়ে গেল গোকুল, আর সিন্দুকের ভেতর চেয়েই আঁতকে উঠল। একী! কোনও ধনসম্পদ, কোনও কিছুই নেই সেখানে, শুধু রয়েছে একটা কালো প্রকাণ্ড বিষধর সাপ কুণ্ডলি পাকিয়ে। আস্তে-আস্তে তখন ফণা তুলছে সেই সাপ। গোকুল চট করে সেই সিন্দুকের ডালাটি বন্ধ করে দিল। বলল, 'এ হতেই পারে না। এ নিশ্চয়ই কোনও শয়তানের কারসাজি।'

শোনা গেল প্রফেসার ডাঃ সামন্তর উচ্চ হাসি। তিনি সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন। সবাই বিস্মিত হয়ে ঘুরে দাঁড়াল। বুড়ো, গোকুল, ইলা, রাধা সবাই।

প্রফেসার বলতে-বলতে আসছিলেন, 'কী, বড় আশায় তোমাদের ছাই পড়ে গেল না।'

গোকুল দেখল প্রফেসার সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন। সে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'আপনি! আপনিই তাহলে এ জিনিস সরিয়েছেন?'

'আমি? বল কী!' প্রফেসার বললেন বিদ্রূপপূর্ণ কণ্ঠে, 'ওই ডাকিনীর আগলানো জিনিসে আমি হাত দিতে পারি?'

'চালাকি রাখুন।' গর্জে উঠল গোকুল, 'এখান থেকে যা কিছু নিয়েছেন, সব আমার চাই। নইলে আজ আপনার নিস্তার নেই।'

প্রফেসার বললেন, 'বটে! বড় বিপদেই তো পড়েছি দেখছি তাহলে।'

তিনি থমকে দাঁড়িয়েছিলেন সিঁড়িতে। আবার হাতে লাঠি ঠুকে-ঠুকে নামতে লাগলেন। শেষ ধাপে যখন তিনি এসে দাঁড়িয়েছেন তখন তাঁর হাতের লাঠিটা হঠাৎ হাত থেকে নিচে পড়ে গেল। তিনি ত্বরিৎপদে এগিয়ে এলেন সেটা কুড়িয়ে নিতে।

গোকুল পিস্তল হাতে নিয়ে দাঁড়াল, 'খবরদার, উঠে দাঁড়ান, উঠে দাঁড়ান বলছি। বিপদটা আশা করি এবার বুঝতে পারছেন। বলুন এখন, এসব জিনিস কোথায় সরিয়েছেন?'

প্রফেসার লাঠিটা কুড়িয়ে না নিয়েই উঠে দাঁড়িয়েছেন সত্য কিন্তু তিনি মোটেই বিচলিত হননি। উত্তর দিলেন গোকুলকে, 'যদি না বলতে পারি?'

গোকুল বলল, 'তাহলে এখান থেকে আর ফিরে যেতে হবে না।'

'ও, তুমি গুলি করবে?' হঠাৎ প্রফেসার ইলা আর রাধাকে টেনে নিয়ে এসে তাঁর সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দিলেন। বললেন, 'কর! কর গুলি!'

বিদ্রুপে ধারালো হয়ে উঠল গোকুল, 'ওঃ, মেয়েছেলের আড়ালে লুকোতে আপনার লজ্জা করে না?'

প্রফেসার বললেন, 'মেয়েছেলের পেছনে লুকোন লজ্জার বুঝি! বেশ আর তাহলে লুকোব না। কর তুমি, গুলিই কর।' সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন প্রফেসার। গোকুল উত্তেজিত, কিন্তু গুলি করতে পারছে না সে। সে উচ্চ কণ্ঠে তথাপি বলল, 'কোথায় রেখেছেন আপনি বলবেন না তাহলে!'

হতাশা-ভরা কণ্ঠে বললেন প্রফেসার, 'বলতে যখন পারছি না তখন গুলিই কর। কী, হল কী?'

গোকুল পিস্তল ধরে আছে, কিন্তু গুলি করতে পারছে না কেন, সেই জানে।

প্রফেসার বললেন, 'না, তোমার শুধু হম্বিতম্বিই সার। যত বড় বদমাশ তোমায় ভেবেছিলাম তা তুমি নও। কিন্তু সকলকে ফাঁকি দিয়ে, সকলের চোখে ধুলো দিয়ে যে নিজের কাজ হাসিল করতে এসেছে সেই আসল শয়তান ওই তোমার পাশে। ছেড়ো না ওকে।'

গোকুল ফিরে দাঁড়িয়েছে ঝড়ু মাঝির দিকে। বুড়ো অমনি ঝাঁপিয়ে পড়ে তার হাতের পিস্তলটা কেড়ে নিল। এবার সেটাই সে বাগিয়ে ধরে বলল, 'হ্যাঁ, আমিই আসল শয়তান, কিন্তু আমায় ধরা অত সোজা নয়। হাত তোল। আপনিও তুলুন প্রফেসার। আমি গোকুলের মতো আহাম্মক নই যে পিস্তল হাতে নিয়েও ঠুঁটো হয়ে থাকব। কোনও চালাকির চেষ্টা কেউ করেছে কি ইঁদুরের মতো আমি গুলি করে মারব।'

সেখান থেকে এবার পালিয়ে যাবে বুড়ো, তাকে আত্মরক্ষা করতে হবে। এদিকে ভাণ্ডার শূন্য। ধনরত্নের স্থানে পড়ে আছে বিষধর সাপ। পালাতে হবে, তাকে পালাতে হবে। পিস্তলটা বাগিয়ে ধরে সে আস্তে-আস্তে পিছিয়ে পড়ছে। এক পাশে পড়ে আছে তার শাবল, আর একটা থলে। থলের মধ্যে ছিল তার অস্ত্র-শস্ত্র, যন্ত্রপাতি। থাক সেগুলো সেখানে পড়ে। তাকে একাই এখন পালাতে হবে। কিন্তু—

পেছন থেকে পায়ে-পায়ে এগিয়ে এল অতুল। অতুল এসে 'তবে রে বদমাস' বলে

তাকে জড়িয়ে ধরল, বুড়োর হাতের পিস্তলটা কেড়ে নিল। বুড়ো তার দৃঢ় বেষ্টনীর মধ্যে ছটফট করতে লাগল।

প্রফেসার বললেন, 'তোমায় ধরা সত্যিই সোজা নয়। গোড়া থেকেই চমৎকার ফন্দি এটেঁছিলে বলে আমার চোখকে পর্যন্ত তুমি ফাঁকি দিয়েছ। কী-যে তোমার আসল পরিচয় তাই এবার সকলে দেখুক।'

প্রফেসার গিয়ে তার ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে দিলেন। সবাই বিস্মিত হয়ে দেখল, এ দ্বিজেন, ঝড়ু মাঝির ছদ্মবেশ ধরে এসেছিল! ইলা দেখেই আর্তনাদ করে উঠল। তার বুকটা ফেটে যাচ্ছিল। তারই দাদা, প্রতারক।

প্রফেসার বললেন ঃ 'দেখুক সকলে, শুধু অর্থের লোভে একটা সুস্থ সহজ মানুষ বিচার-বিবেক-মনুষ্যত্ব সব বিসর্জন দিয়ে কেমন পিশাচ হয়ে যেতে পারে।'

মাথা হেঁট করে এবার দাঁড়িয়ে আছে দ্বিজেন।

ঠিক তখনই আসল ঝড়ু মাঝি এসে প্রবেশ করল সেখানে উন্মাদের মতো, 'বাবু! একী রাধা! তুই এখানে?'

সবাই তার দিকে ফিরে চাইল। সে শঙ্কিত কণ্ঠে বলল, 'বাবুরা পালাও পালাও। ডাকিনীর সাপে সমুদ্দর খেপে উঠেছে। এ চরের আর কিছু থাকবে না।'

সবাই হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমুদ্র খেপে গেছে। এই সুযোগে দ্বিজেন ছিনিয়ে নিয়েছে পিস্তলটা। সে নিজেকেও অতুলের ক্ষণিক-শিথিল মুঠি থেকে মুক্ত করে নিয়েছে। সে গুলি করতে আরম্ভ করল এলোপাতাড়ি। পালাচ্ছে দ্বিজেন। ঝড়ু মাঝি চিৎকার করছে 'পালাও।' ঠিক তখনই দুলে উঠল পায়ের তলার মাটি আর পাথর। গোটা চরটাই যেন দুলছে।

তেরো

পালাও, পালাও। সমুদ্র গর্জাচ্ছে, পৃথিবী কাঁপছে। সেই পুরানো মন্দিরটি কত কাল পরে না জানি আজ একেবারে ভেঙে পড়ছে। ধসে পড়ছে বালুর স্তূপ, পড়ছে কাঠ পাথর। সমুদ্রের উত্তাল জল স্রোত এসে প্রবেশ করছে সেখানে। পালাও, পালাও। দ্বিজেন যে পথ দিয়ে পালাতে যাচ্ছিল, সে পথ রুদ্ধ। থমকে দাঁড়াল সে। ওপর থেকে একটা প্রকাণ্ড কড়ি এসে পড়ল তার ওপর। একটা নয়, আর একটা, তারপর আর একটা। শুধু কড়িই নয়, ইট পাথর ও স্তূপ হয়ে পড়ে চাপা দিল দ্বিজেনকে।

প্রফেসার চেঁচিয়ে বললেন, 'শিগগির, শিগগির এই দিক দিয়ে।' বিপদেও প্রফেসার অবিচলিত, আতঙ্কে তিনি কেঁপে ওঠেন না। তিনি স্থির, ধীর, দৃঢ়।

ইলা দেখল দাদা তার জীবন্ত সমাধিস্থ হল। অসম্ভব, অসম্ভব তাকে রক্ষা করা। সে এগিয়ে যেতে লাগল প্রফেসারেরই নির্দেশে। রাধা ও অতুল গেল, গেল গোকুল। ইলা এগিয়ে গিয়ে অতুলের পাশে দাঁড়াল। অতুল হাত ধরল ইলার।

অবিরাম ভেঙে পড়ছে কড়ি বরগা। ধসে পড়ছে ইট-পাথর, বাইরে থেকে এসে প্রবেশ করছে সমুদ্রের জল।

ঝড়ের দাপাদাপি আর সঙ্গে-সঙ্গে ভূমিকম্প। উন্মাদ হয়ে উঠছে সমুদ্র, প্রলয়ে মেতেছে পৃথিবী।

ওরা সবাই গিয়ে এক সময়ে উঠল স্টিমলঞ্চে। ভাগ্য ভালো, স্টিমলঞ্চ ঝড়ের মুখে

নোঙর ছিঁড়ে সমুদ্রে ভেসে যায়নি।

গোকুল ধরে নিয়ে যাচ্ছিল ঝড়ু মাঝিকে। ঝড়ু মাঝি স্টিমলঞ্চের রেলিং ধরে দাঁড়াল। গোকুলের মনে হল সে বুঝি জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে। সমুদ্র যদিবা কিছুটা শান্ত, কিন্তু ওদিকে চর তখনও ভেঙে পড়ছে। গোটা চরটাই বুঝি এবার ধ্বংস হয়ে যাবে, তাকে গ্রাস করবে দুরন্ত উত্তাল জলরাশি।

গোকুল চিৎকার করে বলল, 'কী, করছ কী বুড়ো? পাগল হয়েছ নাকি!'

ঝড়ু মাঝি উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, হয়েছি, হয়েছি পাগল। কোথায় আমায় এরা নিয়ে যাচ্ছে? কোথায়?'

গোকুল বলল, 'কোথায় জাননা! যেখানে গেলে বাঁচবে সেখানে?'

'না, না,' গর্জে উঠল ঝড়ু মাঝি, 'আমি যাব না। আমার চর ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।'

গোকুল তাকে দু-হাত সাপটে ধরল, 'যাবে না, থাকবে কোথায়? তোমার চর কি আর আছে? লঞ্চে যে সময় মতো উঠতে পেরেছ এই তোমার ভাগ্যি। এস।'

ঝড়ু মাঝি বিপুল বিক্রমে নিজেকে মুক্ত করে নিল, 'না, না, ছেড়ে দাও। তোমাদের সব কথা মিথ্যে। আমার চর ডোবেনি, ডুবতে পারে না। রাধাকে তোমরা দেখ। আমি চরে ফিরে যাব। ফিরে যাবই।'

গোকুল আবার ঝড়ু মাঝিকে জড়িয়ে ধরল। কিন্তু আটকে রাখতে পারল না। সে রেলিং ডিঙিয়ে জলে ঝাঁপ দিল। একটা ঘূর্ণির টানে সে কোথায় তলিয়ে গেল, হারিয়ে গেল কে জানে!

গোকুল আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল, 'অতুলবাবু, সামন্ত সাহেব, শিগগির আসুন। বুড়ো সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছে।'

প্রফেসার এগিয়ে এসে বললেন, 'না, আর কিছু করবার নেই।'

অতুল বলল, 'কী বলছেন? কিছুই কি করা যায় না?'

'না, এখন মানুষের অসাধ্য।' বললেন প্রফেসার, 'তাছাড়া বোধহয় ভালোই হল।'

বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল অতুল, 'ভালোই হল। একটা নিরপরাধ অসহায় বুড়ো মানুষ জলে ডুবে মরল আর আপনি বললেন ভালোই হল।'

বিধাতার বিচার! অতুল স্তব্ধ হয়ে পড়ে।

রাধা ইলার সঙ্গে এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে। দু-চোখ তার বিস্ফারিত, সে কাঁদতেও পারছে না দাদুর এই ভয়াবহ পরিণতিতে। ইলার দাদা গেছে, এবার গেল রাধার দাদু। সত্যি, ডাকিনী তার চরের ওপর মানুষের উপদ্রবের মাশুল গ্রহণ করেছে।

অতুল ধীরে-ধীরে প্রশ্ন করল প্রফেসারকে, 'আপনার ও কথাটা বুঝতে পারছি না প্রফেসার। ঝড়ু মাঝির আবার কিসের বিচার? গুপ্তধনের লোভ যদি অপরাধ হয় তাহলে আমরা তো সবাই অপরাধী?'

প্রফেসার বললেন, 'তাতে কোনও ভুল নেই। কিন্তু তার অপরাধ আরও অনেক বেশি। দ্বিজেনের সঙ্গে ষড়যন্ত্র না করলে ওই অভিশপ্ত চরে নতুন করে রক্তের ছাপ লাগত না। দুটো জীবন অমন করে নষ্ট হতো না।'

গোকুল প্রশ্ন করল, 'কিন্তু বুড়ো মাঝির সঙ্গে দ্বিজেনবাবু ষড়যন্ত্র করলেন কখন?'

প্রফেসার বলতে লাগলেন, 'করেছিল সেই প্রথম বার চর খুঁজতে এসেই। ফিরে

গিয়ে প্রথমে সে চেষ্টা করেছিল নানা ভাবে ভয় দেখিয়ে তোমাদের এখানে আসা বন্ধ করতে। তা না পারলেও ঝড়ু মাঝির সাহায্যে এখান থেকে তোমাদের তাড়াবার জন্যে সে চেষ্টার ত্রুটি করেনি আর সে চেষ্টায়—'

প্রফেসার বেগে পেছন ফিরে তাকালেন রাধার দিকে, তারপর গিয়ে তার একখানি হাত চেপে ধরলেন। সে আঁতকে উঠল। সে আর্তকণ্ঠে বলতে লাগল, 'না, না, আমি কিছু জানি না। ছেড়ে দাও, আমায় ছেড়ে দাও।'

প্রফেসার রাধার হাতখানি ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'কী! ডাকিনীর আওয়াজের সঙ্গে কিছু মিল কি খুঁজে পাচ্ছ কেউ? বল রাধা, কার কথায় অমন চিৎকার করে তুমি ভয় দেখাতে?'

চোখে তখন আঁচল চাপা দিয়েছে রাধা। ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে সে কাঁদছে। ক্রন্দন-ব্যাকুল কণ্ঠে সে বলল, 'দাদু, দাদুর কথায়। কিন্তু আমার কোনও দোষ নেই! অমন করে ভয় না দেখালে দাদু মেরে ফেলবে বলেছিল। বলেছিল, যারা চরে এসেছে, তারা আমাদের শত্তুর। তাদের যেমন করে হোক তাড়াতে হবে।'

ইলা অশ্রুসজল চোখে এসে রাধাকে আবার কাছে টেনে নিয়ে বলল, 'শান্ত হও রাধা, তোমার কোনও ভয় নেই। এই অসহায় অনাথ মেয়েটাকে কেন আপনি মিছিমিছি উৎপীড়ন করছেন? না বুঝে ও যা করেছে, তার জন্যে শাস্তি দিলে যা হয়ে গেছে তা কি আর ফিরবে?'

প্রফেসারের মুখে হাসি ফুটে উঠল। তিনি বললেন, 'বড় খুশি হলাম ইলা। সত্যি, বড় খুশি হলাম। শুধু যে এই অভাগা মেয়েটার ভবিষ্যৎ আশ্রয় সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হলাম তা নয়। এত বড় আঘাতটা তুমি যে ঠিকভাবে বুঝে সামলে উঠেছ তাতেও স্বস্তি পেলাম।'

ইলার কপোল বেয়ে প্রবল বেগে জলের ধারা নামল। সে বলতে লাগল, 'না, না, কিছুই আমি বুঝিনি। এখনও কিছুই আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। রাধার দাদুর সঙ্গে দাদা ষড়যন্ত্র করেছিল ঠিক, কিন্তু সমীরবাবুকে কে মেরেছে?'

ইলা জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল গোকুলের দিকে।

গোকুল বলে উঠল, 'আমি। না, না আমি নয়।'

প্রফেসার বললেন, 'কিছু বলতে হবে না, আমি জানি তুমি নয়। তুমি অতুলের সঙ্গে চুক্তি করে আমার ওপর নজর রেখেছ। আমার এক খালাসীকে ঘুষ দিয়ে আমার স্টিমার লুকিয়ে দেখে গেছ। গুপ্তধনের আস্তানার খোঁজও আমার পিছু নিয়ে পেয়েছ, আমি জানি। কিন্তু সমীরকে দ্বিজেনই মেরেছে।'

অতুল প্রশ্ন করল, 'সমীরকে হত্যা করার কি তার দরকার ছিল?'

দরকার ছিল নিষ্কণ্টক হওয়ার জন্যে।' প্রফেসার বলতে লাগলেন, 'গুপ্তধনের আস্তানার হদিশ সে আর সমীর ছাড়া আর কেউ জানতে পারেনি বলে তখনও তার বিশ্বাস। তাই সে মনে করেছিল সমীরকে সরিয়ে দিলেই সে-ই সমস্ত ধনরত্ন একা ভোগ করতে পারবে। ছক সে সাজিয়েছিল চমৎকার। ডাকিনীর আওয়াজের ওই বিভীষিকা, তারপর নিজেই যেন কোনও অজানা শত্রুর হাতে লোপাট হওয়া, সেখান থেকে লুকিয়ে এসে সমীরকে শেষ করে দিয়ে ঝড়ু মাঝির ছদ্মবেশে গুপ্তধন উদ্ধারে যাওয়া। এত সজাগ থেকে সমীরকে সাবধান করে দিয়েও ওই সর্বনাশটা আমি ঠেকাতে পারলাম না, এই আমার আপশোস।

বিদ্রূপে ধারাল হয়ে উঠল অতুল, 'যদি বলি সমস্ত আপনার ভণ্ডামি! গুপ্তধনের

লোভ ছাড়া আপনি নিজে কী জন্যে এখানে এসেছিলেন? আর তা উদ্ধার করতে পারেননি সেই আপনার আসল আপশোস।'

প্রফেসার বললেন, 'না, সে আপশোস আমার নেই, তবে এখানে তোমাদেরই জন্যে আমাকে আসতে হয়েছে।'

বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল অতুল, 'আমাদেরই জন্যে?'

'হ্যাঁ,' উত্তর দিলেন প্রফেসার, 'এই লোভে সহজ মানুষকেও যে কি পিশাচ করে দিতো তা আমি জানতাম। তাই ভেবেছিলাম, গুপ্তধন আগে এসে সরিয়ে ফেলতে পারলে হতাশ হলে পর এ রোগ হয়তো তোমাদের সারবে। যাক, সব দুঃখের মধ্যে একটা সান্ত্বনা তবু বোধহয় আমার থাকবে।'

অতুল বলল, 'সেটা কী?'

প্রফেসার গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'যে অহঙ্কার, যে অভিমান তোমাদের দুজনকে এতদিন তফাত করে রেখেছিল এই বিপদের ভেতর দিয়ে তা যদি দূর হয়ে যায় তাহলেই আমি সুখী হব।'

এবার প্রফেসার কেবিনে গিয়ে একটি বাক্স হাতে নিয়ে ফিরে এলেন। বললেন, 'এই নাও। তোমাদেরই দুই বংশের প্রাপ্য এ-জিনিস আমি তোমাদের হাতে তুলে দিচ্ছি।'

ইলা উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'এই, এই সেই গুপ্তধন?'

প্রফেসার বললেন, 'হ্যাঁ, তারই একটা অংশ, সব নয়। এরই জন্যে এত দিনের এত মারামারি, কাটাকাটি, খুনোখুনি।'

ইলা বিমর্ষ ভাবে বলল, 'না, ওতে আমাদের দরকার নেই।'

অতুলও বলল, 'ওই অভিশপ্ত জিনিস আমবা ছুঁতেও আর চাই না।'

প্রফেসার বললেন, 'শুনে অত্যন্ত সুখী হলাম। বেশ, পাপে এর উৎপত্তি, কোনও পুণ্য কাজেই তা দান করবাব ভার তোমাদের দুজনের ওপরই দিলাম।'

ডাঃ সামন্ত বাক্সটা ইলার হাতে তুলে দিয়ে সেখান থেকে চলে যাওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়ালেন।

অতুল এগিয়ে গিয়ে বলল, 'শুনুন।'

প্রফেসার থমকে দাঁড়ালেন।

অতুল প্রশ্ন করল, 'কী আপনার সত্যকার পরিচয়?'

ইলাও তার সঙ্গে যোগ দিল, 'আপনি সত্যি কে বলুন তো?'

প্রফেসার হাসলেন, 'আমি? আমি সেকেলে পুরনো জিনিসের একজন কারবারি। দুনিয়ায় যখন যেখানে মন চায় সে জায়গা দেখে বেড়াই।'

চলে গেলেন প্রফেসার। তাঁর গমন-পথের দিকে চেয়ে রইল বিস্মিত দৃষ্টিতে অতুল, ইলা, রাধা আর গোকুল।

সত্যি! এক বিচিত্র রহস্যময় মানুষ।

সব কিছু তখন শান্ত। প্রভাত হয়েছে। সমুদ্রের জলের তলা থেকে সূর্যদেব এখনই ভেসে উঠবেন। পুব আকাশের সঙ্গে যেখানে সমুদ্র গিয়ে মিশেছে সেখানে লালের আভাস জেগে উঠেছে।

ডাকিনীর চর ত্যাগ করে অনেকখানি এগিয়ে এসেছে অতুলদের স্টিমলঞ্চ। অগাধ জলরাশি চারদিকে। লঞ্চখানা ঢেউ-এ দুলছে।

অতুল পড়েছিল একটা কেবিনে তার আহত পা-খানি নিয়ে আর ইলা বাইরে স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়েছিল। তার নিষ্পলক দৃষ্টি যেন ওই ডাকিনীর চরেরই দিকে। অশ্রু নেই চোখে। দৃষ্টি যেন ভাবলেশহীন।

হঠাৎ যেন মনে হল ইলার, অতুল অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠেছে। আহত পায়ের দিকে চোখই পড়েনি তার।

ইলা গিয়ে অতুলের কেবিনে প্রবেশ করল। অতুল পাশ ফিরে চাইল। ডাকল, 'ইলা!'

ইলা স্তব্ধভাবে অতুলের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

অতুল বলল, 'পায়ে বড় যন্ত্রণা। আর—'

ইলা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

কিছুক্ষণ পরই সে ফিরে এল এক কাপ গরম হরলিকস আর একটা মগে করে গরম জল নিয়ে। সঙ্গে তুলো ইত্যাদিও রয়েছে।

ইলা বলল, 'এই হরলিকসটুকু খেয়ে নাও, আমি পাটা ধুয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিচ্ছি।'

ইলা পায়ের ক্ষতস্থান ধুয়ে পরিষ্কার করছে আর অতুল হরলিকসের কাপে চুমুক দিতে-দিতে তাকাচ্ছে ইলার দিকে।

ব্যান্ডেজ বাঁধা শেষ হয়ে গেলে ইলা বেরিয়ে গেল বাইরে। অতুল ভেবেছিল ইলা বুঝি আবার ফিরে আসবে। কিন্তু এল না। তবে কি সে এখন রাধার কাছে গেছে? পাটা টেনে-টেনে বেরিয়ে এল অতুল।

না, ইলা রাধার কাছে নেই, আবার সে রেলিং ধরে দূরের পানে তাকিয়ে আছে। হাওয়ায় তার চুল উড়ছে, আঁচল উড়ছে।

অতুল এসে তার কাছে দাঁড়াল।

ইলা বলল, 'এ পা নিয়ে বেরিয়ে আসা কিন্তু উচিত হয়নি।'

অতুল দুষ্টুমি করে প্রশ্ন করল, 'কাকে বলছ?'

ইলা বলল, 'তোমাকে।'

এবার হাসল অতুল, 'পায়ে আমার মারাত্মক এমন কিছু হয়নি ইলা।'

ইলা বলল, 'কী যে কুক্ষণে আমরা যাত্রা করেছিলাম, বারবার সে কথাই ভাবছি।'

'জানি ইলা।' বলল অতুল, 'আমিও তাই ভাবি। কিন্তু সমস্ত অকল্যাণের মাঝেও কল্যাণের স্পর্শ থাকে, একথা একেবারে মিথ্যা নয়।'

ইলা আবেগবদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'সংসারে ভাই বোন আমরা দুজন ছিলাম, এখন আমি শুধু একা রইলাম—একা।'

'কেন, একা কেন?' বলল অতুল, 'এখনও কী ভাবতে পারছ না যে আমি আছি।'

ইলা ফিরে দাঁড়াল। তারপর হঠাৎ দুই হাতে মুখ ঢেকে অতুলের বুকে মুখ রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

অতুল তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

চুপিচুপি আসে

ছোট্ট একটি বীজের মধ্যে মহীরুহ লুকিয়ে থাকে। মহীরুহই বা কেন, একটি ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকর বীজ থেকে এক বিশাল অরণ্যের জন্ম হতে পারে।

শুধু অনুকূল আবহাওয়া আর পরিবেশ চাই।

বীজ থেকে অরণ্য কী মহীরুহ হতে দেখার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অবশ্যই নেই। সে অতি দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।

কিন্তু ছোট্ট একটি কয়েক লাইনের খবর আর সাধারণ একটি বিজ্ঞাপন কীভাবে অঙ্কুর থেকে বেড়ে ডালপালা মেলে পল্লবিত পুষ্পিত হয়ে উঠেছে, এই সেদিন সবিস্ময়ে নিজেই তা দেখেছি।

ছোট্ট খবরটা আমারই চোখে পড়েছিল কয়েকদিন আগেকার সংবাদপত্রের এক কোণে। আর বিজ্ঞাপনটা আমায় কৌতুকভরে দেখিয়েছিল আমার বন্ধু প্রিয়তোষ।

খবরের কাগজের এক কোণে যে ছোট খবরটা আমি দেখেছিলাম, সাধারণভাবে তার সংবাদমূল্য এমন বিশেষ কিছু নিশ্চয়ই নয়। ওরকম খবর হামেশাই কাগজে বার হচ্ছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেরকম খবরের ওপর চোখ বুলিয়েই আমরা ভিন্ন খবরে চলে যাই। মনে আমাদের তা কোনও দাগই কাটে না। সে খবরের এমন কিছু গুরুত্ব বোধ করলে সামনের কী সম্পাদকীয় পাতার বদলে অন্য একটা নগণ্য পাতার তলার দিকে এক কলমের কটি মাত্র লাইনে খুদে শিরোনামায় কি তা প্রকাশ করা হত!

অন্য কাউকে না হোক, আমাকে কিন্তু ওই ছোট্ট খবরটা হঠাৎ যেন একটু চমকে দিয়েছে। সে খবরটুকুর ওপর চোখ বুলিয়ে পরের কলমে অনায়াসে চলে যেতে পারিনি। মনটা সেইখানেই গিয়েছে থেমে।

থেমে গিয়েছে বলাও ভুল। মনটা এই বর্তমানকাল আর কলকাতার শহর ছেড়ে বেশ কিছু অতীতে ভারতবর্ষের আর-এক প্রান্তে চলে গিয়েছে এক মুহূর্তে।

সামান্য সংবাদটুকু যেন দেখতে-দেখতে চোখের ওপর বিস্ফোরিত বিস্ময়ে এক অদ্ভুত সুদীর্ঘ কাহিনিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

সংবাদটুকু প্রথমেই জানাতে পারছি না। তা জানাবার আগে এ সংবাদে যার মুখ সর্বাগ্রে স্মৃতির পটে ঝলসিত হয়ে উঠেছিল তার কথাই বলতে হয়।

কিন্তু তা বলতে গেলেও ছোট একটি খবর থেকে আমার বেলা যেমন, তেমনি তুচ্ছ একটি বিজ্ঞাপন থেকে বন্ধু প্রিয়তোষ কীভাবে একটি রহস্যগভীর কাহিনি বুনে তুলেছিল, তার বিবরণও ভূমিকা হিসেবে একটু দেওয়া দরকার।

একটি নামকরা দৈনিকের পাতায় অবজ্ঞাত একটি সংবাদ স্মৃতির হারিয়ে যাওয়া তারে ঘা দিয়ে আমার কল্পনাকে আলোড়িত করে তুলেছিল, প্রিয়তোষকে তার বিচিত্র কাহিনিটি গড়ে তোলার উপাদান জুগিয়েছিল সেই দৈনিকেরই একটি ছোট বিজ্ঞাপন।

দৈনিকের খবরটি দেখে যেদিন আমি স্মৃতির রোমন্থনের সঙ্গে কল্পনার রাশ কিছুক্ষণের জন্যে ছেড়ে দিয়েছিলাম, সেইদিনই সন্ধ্যায় প্রিয়তোষ হঠাৎ আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।

নিরিবিলিতে বন্ধুকে কাছে পেয়ে সারাদিন যা আমাকে তন্ময় করে রেখেছে, দৈনিকের সেই ছোট খবরটা তাকে দেখিয়েছিলাম।

খবরটা দেখে প্রথমে প্রিয়তোষ বিশেষ কিছু বুঝতে পারেনি। আমার দিকে একটু

সন্দিগ্ধভাবে চেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তোমার মতলবটা কী! এ খবরটা থেকে ফেনিয়ে একটা উপন্যাস-গোছের কিছু ফাঁদবার ফন্দি আঁটছ নাকি!'

'না, তা আঁটছি না।' একটু আহত স্বরেই বলেছিলাম, 'কারণ ও খবরটাকে ফেনিয়ে কাহিনি করবার দরকার নেই। আমার ধারণা, কোনও একটা অদ্ভুত কাহিনি সত্যিই ওর ভেতর লুকোন আছে।'

'বলো কী!' প্রিয়তোষের গলায় পরিহাসের সুর তখনও একটু ছিল।

সেটাকে অগ্রাহ্য করেই বলেছিলাম, 'হ্যাঁ, যথার্থই বলছি, ওই খবরে যে নামটি পাচ্ছ তা আমার অজানা নয়। কয়েক বছর আগে...'

আমি আরও যা বলতে যাচ্ছিলাম প্রিয়তোষ তা বলতে দেয়নি। কথার মাঝখানেই বাধা দিয়ে বলেছিল, 'দাঁড়াও-দাঁড়াও। তোমার ওই খবর থেকে তুমি গল্প না হোক একটি স্মৃতিকথা সাজিয়ে তুলবে বুঝতে পারছি। হাতে আমার এখন সময়ের অভাব নেই সুতরাং তোমার সে ব্যাখ্যান আমি খুশি-মনেই শুনব। কিন্তু তার আগে আমি যা দেখাচ্ছি তার ওপর একটু নজর দাও দেখি।'

এতখানি ভণিতা করে প্রিয়তোষ যা দেখিয়েছে তা ওই সেদিনকার দৈনিকেরই অন্য এক পৃষ্ঠার একটি ছোট্ট বিজ্ঞাপন।

সে বিজ্ঞাপন পড়ে প্রথমটা একটু বিরক্তই হয়েছি। বলেছি, 'এ সময়ে তোমার রসিকতাটা ঠিক উপভোগ করতে পারলাম না। ওটা তো একটা স্বাস্থ্যনিবাসের বিজ্ঞাপন। বাংলাদেশের মধ্যবিত্তদের স্বল্পব্যয়ে কিছুদিন স্বাস্থ্যকর নির্জনতায় থাকার সুবিধে করে দেওয়ার জন্যে প্রতিষ্ঠিত বলে জানিয়েছে। আমি যা বলতে যাচ্ছিলাম তা থামিয়ে এ বিজ্ঞাপনটা দেখাবার কী মানে?'

'মানে না থাক মজা একটু আছে!' আমার বিরক্তিটা হেসেই উড়িয়ে দিয়ে বলেছে প্রিয়তোষ।

'কী মজা!' আমি তখনও অপ্রসন্ন।

'মজা এই যে, বিজ্ঞাপনে স্বাস্থ্যনিবাসের ঠিকানা যা দেওয়া হয়েছে সে জায়গাটা এখন জলে জলময়। পাহাড়ি নদের আচমকা বন্যায় ও অঞ্চলটা একেবারে ভেসে গেছে!'

'তাতেই বা হয়েছে কী'? এবার আমি একটু বিমূঢ় হয়েই বলেছি, 'ওখানে বন্যা হওয়াটা দুঃখের ব্যাপার! কিন্তু তার সঙ্গে আমি যে ঘটনার খবর তোমায় পড়ালাম বা সে বিষয়ে যা তোমায় বলতে যাচ্ছিলাম তাব সম্পর্ক কী?'

'সম্পর্ক শুধু এই যে...।' প্রিয়তোষ গম্ভীর হওয়ার ভান করে বলেছে, 'তোমার পড়া খবর আর আমার দেখা বিজ্ঞাপন দুটিই ভিন্ন দিক দিয়ে হলেও একই কাজ করেছে। কাহিনির রাজ্যের দুটি গুপ্তদ্বার যেন তারা খুলে দিয়েছে। তোমার বেলা শুধু কল্পনা। তফাত শুধু ওইটুকুতে।'

তার আজগুবি দার্শনিক বিশ্লেষণে এবার কৌতুক বোধ না করে পারিনি। হাসিমুখেই বলেছি, 'তার মানে ওই বিজ্ঞাপন থেকে তুমি একটা কাহিনি ইতিমধ্যে বুনে ফেলেছ? শোনাও তাহলে সেটা!'

'না, না, নিছক কল্পনার চেয়ে বেশি কিছু যার মধ্যে আছে বলে মনে হচ্ছে, তোমার সেই আখ্যানটাই আগে শুনতে চাই।' প্রিয়তোষের গলায় আন্তরিক আগ্রহের সুরই শোনা গেছে।

দুবার অনুরোধ তারপর আমায় করতে হয়নি। সত্যিই সারাদিন ধরে যা আমার মনকে আন্দোলিত করেছে, কারুর কাছে, বিশেষ করে প্রিয়তোষের মতো বন্ধুর কাছে তা আমি প্রকাশ করবার জন্যে ব্যাকুল।

খবরের কাগজটার বিশেষ জায়গাটায় আঙুল দিয়ে দেখিয়ে তাকে বলেছি,—'এ খবরে যে নামটা পাচ্ছ তা লক্ষ করেছ নিশ্চয়!'

'হ্যাঁ করেছি।' প্রিয়তোষ একটু তাচ্ছিল্যভরেই বলেছে, 'কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষ করবার মতো কী আছে ওতে? ভারতবর্ষের মতো দেশে নামের বৈচিত্র্যের কিছু অভাব আছে? ওই তোমার....'

খবরের মধ্যে ছাপা নামটা উচ্চারণ করতেই প্রিয়তোষকে বাধা দিয়ে বলেছি,—'থাক-থাক, ও নামটা আর বলতে হবে না। তার বদলে ধরা যাক নামটা ম্যানুয়েল পেরেরা।'

প্রিয়তোষ একটু ভুরু কুঁচকেছে।

তার উদ্যত প্রশ্নটা অনুমান করে তৎক্ষণাৎ বলেছি, 'না, তুমি যা ভাবছ তা নয়। ম্যানুয়েল পেরেরা আমার কোনও গল্পে নেই।'

না, ম্যানুয়েল পেরেরা আমার কোনও গল্পে নেই।

ম্যানুয়েল পেরেরা অবশ্য তার আসল নাম নয়। কিন্তু যথার্থ বা ছদ্ম কোনও নামেই আমার কোনও কল্পিত কাহিনির মধ্যে সে নেই।

অথচ তাকে নিয়ে গল্প লেখার কোনও বাধাই ছিল না। গল্পের ছক একেবারে সাজানো ছিল বললেই হয়। সে ছক মামুলি তো নয়ই, তার ওপর কয়েকটা বিশেষ চমকও ছিল তার মধ্যে।

প্রথমত, চরিত্রটাই ধরা যাক না।

ম্যানুয়েল পেরেরা নামটা বানানো হলেও নেহাত অধরচন্দ্র পাকড়াশী কী হারান চাকলাদার গোছের নামের বদলে তো আর ব্যবহার করা হয়নি।

ম্যানুয়েল পেরেরা নামটা ঠিক ওই জাতেরই আর-একটা নামের জায়গায় নেওয়া।

শুধু নাম নয়, মানুষটার পরিচয়ও গল্পের জগতের পক্ষে একটু অসাধারণ।

বাংলাদেশের নয়, ভারতের অন্য এক প্রদেশের বিখ্যাত এক বন্দর-নগরে আমাদের কাছে নাতিপরিচিত এক সমাজের মানুষ। তার জীবনের ধারাই বেশ একটু ভিন্ন।

এহেন লোককে নিয়ে তবু যে এখনও পর্যন্ত কোনও গল্প রচনার চেষ্টা করিনি তার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে নিজেই একটু ধাঁধায় পড়েছি।

যতদূর সম্ভব নিজের মন বিচার-বিশ্লেষণ করে শেষপর্যন্ত এই সন্দেহই হচ্ছে যে ম্যানুয়েলের কথা গল্প করে সাজাতে একটু ভয়ই পেয়েছিলাম।

ভয়টা এই যে, গল্প করে সাজাতে গেলে ম্যানুয়েলের জীবনের কথাকে যেন বেশ একটু ক্ষুণ্ণ করা হবে। সে চেষ্টা জোর করে করলে যা দাঁড়াবে তাতে না থাকবে গল্পের পরিপূর্ণ স্বাদ, না জীবনের যথার্থ প্রতিফলন।

তখন যদি সাহস না করে থাকি তাহলে এতদিন বাদে আবার সেই ম্যানুয়েলের কথাই লিখতে যাচ্ছি কেন!

আমার মত পরিবর্তনের মূলে যা আছে তা ছোট একটি খবর। সে খবরটা এখনই প্রকাশ করতে পারবও না, তা উচিত হবে না এই কাহিনির খাতিরেই।

খবরটা পাওয়ার পর থেকেই পেরেরার কথা ভাবতে শুরু করেছিলাম।

কবে কোথায় তার সঙ্গে দেখা, মনে করতে গিয়ে বেশ একটু অবাক হতে হলও।

তার কথা ভাবতে গেলে প্রথমেই মনের পটে যা ভেসে ওঠে তা কিন্তু তার মুখ নয়।

কোনও মানুষের মুখই তা নয়, নেহাত একটা জড়বস্তু।

ভেসে ওঠে একটা এরোপ্লেনের ছবি। হলদে রঙের প্লেন, কর্কশ শব্দে আকাশ কাঁপিয়ে পশ্চিম আকাশের সূর্যাস্তের রাঙা আকাশ বেয়ে নামছে।

প্লেনটার ক্ষমতার চেয়ে আস্ফালন বেশি বলা যায়।

এ-যুগের 'জেট'-দেখা চোখ না হলেও সেই পনেরো বছর আগেও তার মৃদু মন্থর গতিতে একটু করুণামিশ্রিত অবজ্ঞা জাগা অস্বাভাবিক নয়। জেট না দেখা গেলেও 'টার্বোপ্রপ' তখন আকছার চোখে পড়ে।

হলদে রঙের এই মন্থর মামুলি প্লেনটার ছবি মনের পর্দায় ফুটে ওঠার কারণ তার অসাধারণত্ব কিন্তু নয়।

এ প্লেন বোম্বাইয়ের আকাশে তখন নিত্য দুবেলা দেখা যায়। বিশেষ করে সান্তাক্রুজ ও ভিলে পার্লের মধ্যে—ঘোড়বন্দর রোডের কাছে যারা থাকে পশ্চিম সমুদ্রের কোলে, সেখানকার ফ্লাইং ক্লাবেব এই ট্রেনিং-প্লেন তাদের ভালো রকমই চেনা। এই হলদে রঙের প্লেনগুলো নতুন বৈমানিকদের শিক্ষা দেওয়ার জন্যে যে ব্যবহৃত হয় তা কারুর অজানা নয়।

ম্যানুয়েল পেরেরার সঙ্গে এই হলদে প্লেনের ছবির স্মৃতি জড়িয়ে যাওয়ার কারণ অবশ্য অদ্ভুত। মনস্তত্ত্ববিদেরা হয়তো তা বিশ্লেষণ করে বার করতে পারেন। আমার নিজের কাছে ব্যাপারটা দুর্বোধ্য।

পেরেরার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সময়ে এমনকী তার সঙ্গে তার পবের জানা-শোনার মধ্যে ওই প্লেনের কোনও সংস্রবই ঘটেনি।

পেবেরাকে প্রথম কোথায় দে৷ : একটু জোর করেই মনোযোগ দিয়ে ভাবতে হয়।

গোরে-গাঁওর সেই স্টুডিওতে।

হ্যাঁ, সেই স্টুডিওতেই তার সঙ্গে প্রথম যথার্থ পরিচয় বটে।

স্টুডিও ক্যান্টিনের ম্যানেজার দিভেচা, তিনিই আমাদের পরিচয করিয়ে দেন।

টিফিন-ব্রেকের বেশ একটু আগেই আমি ক্যান্টিনের সেই নির্দিষ্ট কোণের জায়গাটিতে গিয়ে বসেছি যেখান থেকে নিজে একটু আড়ালে থেকেও আর সকলকে লক্ষ করা যায়।

নিজের জায়গায় গিয়ে বসবার আগেই নির্জন ক্যান্টিনের একটিমাত্র খদ্দের আমার চোখে পড়েছিল।

লোকটিকে আগে কখনও এ স্টুডিওতে দেখিনি, তাছাড়া চোখে পড়বার মতোই চেহারা।

মাথায় একটু বেশি খাটো না হলে একেবারে আদর্শ ফিল্ম-হিরোর চেহারা বোধহয় বলা যেত। চেহারাটায় ঠিক ভারতীয় ভাবটা কিন্তু নেই। রংটা যেমন একটু বেশি রকম ক্যাঁটকেটে ফর্সা, চোখের তারাতে তেমনি একটু সবজে আভা তখনই লক্ষ্য করেছিলাম।

ফিল্ম-স্টুডিওতে নতুন মুখ দেখা এমন কিছু আশ্চর্য ব্যাপার নয়। বিশেষ করে এই ধরনের চেহারা, পোশাকের মানুষ যে কারণে এসব জায়গায় আসে, এ লোকটিও সেই ছবিতে সুযোগ পাওয়ার আশাতেই এসেছে বুঝে নিয়ে হয়তো অগ্রাহ্য করতে পারতাম।

কিন্তু তা পারিনি। তার কারণ মানুষটাকে তখনই কেমন যেন সম্পূর্ণ অচেনা মনে হয়নি।

সম্পূর্ণ আলাদা পরিবেশে ভিন্ন সাজ-পোশাকে আগেই কোথাও যে তাকে দেখেছি এ বিষয়ে মনে কোনও সন্দেহ তখন নেই। শুধু স্থান-কালটা কিছুতেই স্মরণ করতে পারিনি।

এরই মধ্যে খুদে হিরোটিকে ম্যানেজারের টেবিলের দিকে উঠে যেতে দেখেছি। সেখানে বেশ একটু উত্তেজিতভাবে দিভেচাকে কী যেন সে বলছে।

তারপর সত্যি অবাক হয়েছি দিভেচাকে তার আসন ছেড়ে উঠে আসতে দেখে।

দিভেচাকে তার কোটর ছেড়ে কোনওদিন বেরুতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। এ স্টুডিওতে প্রায় বছর খানেকের যাতায়াতের মধ্যে যখনই ক্যান্টিনে এসেছি, তখনই ঘোরানো দেয়ালের একটি খাঁজে তার ছোট স্টিলের টেবিলে আর তার ওপরকার বাঁধানো মোটা খাতাটার মতো সে যেন এই ক্যান্টিনের স্থাবর সরঞ্জাম।

দিভেচার সঙ্গে খুদে নায়কটিও যে এসেছিল তা বলা বাহুল্য।

আমার কাছে এসে দাঁড়াতেই আমি মুখ তুলে তাকিয়ে ছিলাম।

আমার এই মুখ তোলার ধরনে বা চোখের দৃষ্টিতে যা ফুটে উঠেছিল তাতে অসন্তোষ গোছের কিছু ছিল কি না জানি না, কিন্তু দিভেচা কেমন একটু সঙ্কুচিত হয়ে বলেছিল, 'আপনাকে একটু বিরক্ত করছি মিত্তরজি।'

আমার নামটা বোম্বাই জিহ্বায় বিকৃত হয়ে ওই দাঁড়িয়েছে। সেটা অবশ্য সহ্য হয়ে গেছে। আপাতত বিরক্ত না হয়ে সম্বোধনটা শুনে একটু শঙ্কিত হয়েছিলাম সত্যিই।

মুখে অবশ্য আপ্যায়নের হাসির সঙ্গে বলতে হয়েছিল, 'না, না, বিরক্ত কীসের, বসুন।'

পাশে বসবার খালি চেয়ার ছিল। কিন্তু তাতে বসেনি।

দিভেচা সৌজন্যের সুরে বলেছিল,—'না, আমার বসবার সময় নেই। তবে আমার বন্ধু এই ম্যানুয়েল পেরেরা আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চান।'

ম্যানুয়েল পেরেরা, নামটা শুনে একটু চমক লেগেছিল সত্যিই। যা অনুমান করে ঈষৎ শঙ্কা বোধ করছিলাম তার সঙ্গে এ ধরনের নামটা ঠিক খাপ খায় না।

বোম্বাইয়ের ফিল্মমহলে রাতারাতি তারকায়িত হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে যারা ঘোরাফেরা করে, ভারতের যে অঞ্চল থেকেই আমদানি হয়ে থাক, চেহারা পোশাক ভাষা ইত্যাদির সমস্ত পার্থক্য নিয়েও একটি বিষয়ে তারা এক। তাদের কৌমার্য প্রশ্নাতীতভাবে নামের পেছনে ঘোষিত।

নাম যেমনই হোক, আমার সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্য যে একটি ছাড়া আর কিছু হতে পারে না, তা বুঝে নিয়ে আগে থাকতেই বিপদটা কাটাবার ব্যবস্থা করবার জন্যে একটু অভদ্রভাবেই বলেছিলাম, 'আমার সঙ্গে কথা বলে কিন্তু কোনও লাভ নেই। এ স্টুডিওর সঙ্গে আমার যেটুকু সংস্রব তার মধ্যে নায়ক বাছাইয়ের কোনও ভূমিকা নেই। আপনি বরং কোনও পরিচালকের সঙ্গে দেখা করুন।'

দিভেচা ম্যানুয়েল পেরেরাকে পরিচিত করে দিয়েই তার কোটরে ফিরে গিয়েছিল। আমার কথাগুলো তার কানে যায়নি।

ম্যানুয়েল পেরেরা তখন একা আমার টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে। এ কথায় তার মুখে যে একটা অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠেছিল, তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন মৃদু বিদ্রুপ আর অবজ্ঞার আভাসই আমি পেয়েছিলাম। এক মুহূর্তে মেজাজটা গরম হয়ে গিয়েছিল তাতেই। এসব হবু নায়কদের

নিজেদের চেহারা আর ক্ষমতা সম্বন্ধে কী দম্ভ যে থাকে, তা আমার অজানা নয়। পেরেরার উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করবার তর সয়নি। বেশ একটু আঁতে ঘা দিয়ে তার দুরাশার ফানুসটা চুপসে দেওয়ার জন্যে অপ্রিয় সত্যটা রূঢ়ভাবে বলেছিলাম সঙ্গে-সঙ্গে।

বলেছিলাম, 'তাছাড়া আপনাকে একটা সত্য কথা বলি। আপনি যা মনে করেন, ছবির পর্দায় তেমন লুফে নেওয়ার মতো চেহারা আপনার নয়। আপনার গড়ন পেটন চেহারা যে খারাপ তা বলছি না, কিন্তু তার সঙ্গে একটু লম্বা হওয়াও দরকার ছিল। নায়িকার চেয়ে মাথায় খাটো হিরোর কদর এখনও এদেশে হয়নি।'

গায়ের জ্বালাতেই এতখানি বেশি বলে ফেলার পর তার মুখের দিকে চেয়ে একেবারে সঙ্কুচিত হয়ে গেছি।

তার মুখে তখনও সেই হাসি। কিন্তু নিজের মনের বদ্ধমূল ধারণাতেই তা আমার চোখে অত বিকৃত হয়ে উঠেছে।

সে হাসিতে ঔদ্ধত্য, দম্ভ কোথায়?

দীনতা তার মধ্যে অবশ্য নেই, কিন্তু যা আছে তা যেন ধৈর্য আর সহনশীলতার সঙ্গে একটু বিমূঢ় বেদনায় মেশানো।

মুখে সেই হাসিটি রেখেই প্রতিবাদের উত্তাপহীন সহজ শান্ত গলায় পেরেরা বলেছিল, 'আমি ছবিতে নামতে চাই না। আপনার সঙ্গে অন্য বিষয়ে দুটো কথা বলতে চাই।'

পেরেরার বলার ধরনটা এমন যে, আমাকে ভুল বোঝবার সুযোগ দেওয়ার জন্যে সে নিজেই যেন দোষী।

লজ্জা পেয়ে কণ্ঠস্বরে সেটা একেবারে গোপন করতে পারিনি।

তার দিকে একবার চেয়েই মুখটা বাইরের ক্যান্টিনের দরজার দিকে যেন নতুন আগন্তুকদের আসা দেখতেই ফিরিয়ে বলেছি, 'আপনি তাহলে কী বলতে চান বলুন। কিন্তু দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন না।'

পেরেরা একটু যেন দ্বিধাগ্রস্তভাবে টেবিলের অন্য ধারের চেয়ারটায় বসেছে।

অন্তরঙ্গতার সুরে এবার বলেছি, 'বলুন কী বিষয়ে আপনাকে সাহায্য করতে পারি।'

এবার আমার আর-এক অপ্রত্যাশিত এবং কিছুটা অপ্রীতিকর চমকের পালা।

'সাহায্য!' পেরেরা আমার দিকে এই প্রথম যেন একটু ক্ষুব্ধভাবে চেয়েছে। আর আহত স্বরে বলেছে,—'কোনও সাহায্য তো আমার চাই না।'

'তাহলে?' আমি সত্যিই তখন বিমূঢ়।

'আমি'—বলে একটু থেমে পেরেরা যেন নিজের মনে সঙ্কল্পটা আর একবার বিচার করে নিয়েছে।

তারপর ধীরে-ধীরে বলেছে, 'আমি আপনাকে একটা গল্প শোনাতে চাই।'

আমার মুখে সত্যিই আর কথা নেই। ম্যানুয়েল পেরেরার মুখের দিকে আমি শুধু হতভম্ব হয়ে চেয়ে থেকেছি। আর যাই করে থাকি, এরকম একটা প্রস্তাব আমি সত্যিই কল্পনা করিনি।

'আমাকে গল্প শোনাতে চান' বিমূঢ় অস্ফুট স্বরে কোনওমতে বলেছি।

'হ্যাঁ, আপনি তো এ স্টুডিওতে ছবির গল্প-টল্প লেখার জন্যে আছেন, আমি দিভেচার কাছে জেনেছি। দিভেচা আমার পরিচিত। এই সময়টায় ক্যান্টিনে আসেন শুনে আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।'

'আমাকে গল্প শোনাতে চান? কেন?' কিছুটা সামলে এবার একটু বিদ্রুপের স্বরেই জিজ্ঞাসা করেছি, 'ছবিতে বেচবার জন্যে?'

ম্যানুয়েল খানিকটা চুপ করে থেকেছে। আমার এ প্রশ্নটার জন্যে যেন সে তৈরি ছিল না বলে মনে হয়েছে। তাতে একটু অবাকই হয়েছি।

তার পরের কথায় কিন্তু মেজাজ বিগড়ে গেছে।

ম্যানুয়েল নির্লিপ্তভাবে বলেছে, 'ইচ্ছে করলে তা বেচতে পারেন।'

বিরক্তিটা আর চাপতে পারিনি। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের স্বরে বলেছি,—'আপনার অনুগ্রহের জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু গল্পের দিক দিয়ে এখনও এমন দেউলে হয়েছি বলে তো মনে হচ্ছে না যে অন্যের গল্প ধার করে চালাতে হবে। আপনার অমূল্য গল্প অন্য কোথাও গিয়ে বেচুন।'

বিদ্রুপের খোঁচাটা নিজের কানেই একটু মাত্রা-ছাড়া ঠেকলেও তার জন্যে লজ্জিত হইনি। এরকম আত্মম্ভরি আহাম্মকের উচিত শিক্ষা হওয়া দরকার।

ম্যানুয়েলকে এবার অপদস্থ লজ্জিত দেখাবে বলেই ভেবেছিলাম। তার বদলে সে কিন্তু এই প্রথম বেশ—একটু যেন তপ্ত হয়ে উঠেছে। আহত ও ঈষৎ রুক্ষকণ্ঠে বলেছে, 'আপনি আমার কথাটা সম্পূর্ণ ভুল বুঝছেন। আমার নিজের গল্প বেচার কোনও গরজ নেই। তবে আপনি শুনে ছবির গল্প হিসেবে বেচতে চাইলে তাতে আপত্তি করব না, ভাগও চাইব না তার দামের।'

'তাই যদি হয় তাহলে আমাকেই গল্প শুনিয়ে তা বেচবার সুযোগ দিয়ে কৃতার্থ করা কেন?'—আমার কথাগুলো তখনও বিদ্রুপে বাঁকা।

এবার ম্যানুয়েলের মুখের চেহারা অন্যরকম হয়ে গেল। কেমন একটা বিহ্বলতার ছাপ পড়েছে তার ওপর।

'আমি শুধু গল্পটা আপনার মতো কাউকে শোনাতে চাই।'—বলেছে ধীরে-ধীরে ম্যানুয়েল। যে স্বরে কথাগুলো বলেছে তা ঠিক স্বাভাবিক নয়।

একটু গোলমালে পড়ে এবার সরল কৌতূহলেই জিজ্ঞাসা করেছি, 'শোনাতে চান কি গল্পটার সাহিত্যমূল্য জানতে?'

একটু থেমে থেকে ম্যানুয়েল যেন অনিচ্ছাসত্ত্বে স্বীকার করে বলেছে,—'হ্যাঁ তাই ধরুন।'

এ বিবরণের ভূমিকাটাই বড়, আর সেটাই আসল। ম্যানুয়েল পেরেরার সঙ্গে কী করে প্রথম আলাপ হয়েছিল, কীভাবে সে তার গল্প শোনাবার প্রস্তাব করেছিল তা জানা একান্ত প্রয়োজন, প্রয়োজন ম্যানুয়েল পেরেরার এই বিবরণ—তাকে কাহিনি বলি বা না বলি—তা বোঝবার জন্যে।

ম্যানুয়েলের সঙ্গে প্রথম আলাপের পরদিনই সে একটি বাঁধানো খাতা আমায় দিয়ে গিয়েছিল।

বাঁধানো খাতাটি আসলে কয়েক বছর আগেকার একটি অব্যবহৃত ডায়েরি। তার সাদা পাতাগুলোই কাহিনি লেখবার জন্যে ম্যানুয়েল ব্যবহার করেছে।

লেখাটি বেশ দীর্ঘ। ডায়েরিটিতে এক-একটি তারিখের জন্যে এক-একটি পাতা বরাদ্দ। এমনি একবার চোখ বুলোতে গিয়ে দেখেছি জানুয়ারির দু-একটা পাতা বাদ দিয়ে চার তারিখের পাতা থেকে সেই সেপ্টেম্বর মাসের সতেরো তারিখ পর্যন্ত কাহিনিটি বিস্তৃত।

শুধু দীর্ঘ বলেই নয়, হাতের লেখাটাও কেমন জড়ানো অপরিচ্ছন্ন বলে হাতে পেয়েই পড়ে ফেলবার খুব উৎসাহ বোধ করিনি। নিজের স্বভাবগত আলস্যে অবসরমতো পড়ব বলে ফেলে রেখেছি ড্রয়ারের এক কোণে। সেখানে কতদিন ও ডায়েরি অপঠিত পড়ে থাকত বলতে পারি না, কিন্তু ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন পেরেরার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় একটু অপ্রস্তুত হয়েছি।

সে সময়টায় আমি পালি হিলসের কাছে একটি বাসায় থাকি। সেখান থেকে সময় পেলে ছুটি-ছাটায় বান্দ্রার মাউন্ট মেরিতে যাওয়া আমার একটা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

মাউন্ট মেরি ক্যাথলিকদের অতি পবিত্র একটি মন্দির। মেরির মাতৃমূর্তি সেখানে মাউন্ট মেরি নামে পরিচিত।

এ-মূর্তিটি প্রথম দেখেই আমি মুগ্ধ হই। সত্যিই স্নেহে বিগলিত বিশ্বমাতৃত্বের সে পবিত্র মধুর রূপ দেখবামাত্র সমস্ত মন করুণা-স্নিগ্ধ করে দেয়।

এ মূর্তিটি সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তি আছে। বোম্বাইয়ের এই পার্বত্য উপকূলে এককালে শুধু সামুদ্রিক ধীবরদেরই বাস ছিল। পর্তুগিজরা প্রথম এই পাহাড়ঘেরা সমুদ্রের খাঁড়িটার পোতাশ্রয় হিসেবে মূল্য বোঝবার পর এখানে তাদের একটি ছোট বসতি হয়। ধীবর সম্প্রদায় তাদের কাছেই দীক্ষিত হয় খ্রিস্টধর্মে। সেই ধীবরদের কেউ স্বপ্নাদেশ পেয়ে এই পাহাড়ের কোলের সমুদ্রগর্ভ থেকে মাতৃমূর্তিটি উদ্ধার করে। সে অন্তত সাড়ে তিনশো বছর আগের কথা। মাউন্ট মেরির খ্যাতি তারপর থেকে দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে যায়। শুধু ক্যাথলিক খ্রিস্টান নয়, নানা জাতি নানা ধর্মের মানুষ এখন মাউন্ট মেরি দর্শনে ভিড় করে প্রতিদিন। মাউন্ট মেরি পরম করুণাময়ী। তাঁর মূর্তির বেদিতলে শুধু একটি মোমবাতি জ্বেলে দিয়ে নিজের মনস্কামনা নীরবে জানিয়ে আসতে হয়। দেবী সে কামনা পূরণ করেন।

মনস্কামনা পূরণের জন্যে মোমবাতি জ্বালাতে নয়, শুধু অপূর্ব মাতৃমূর্তিটি দেখতে আর সমুদ্রের কোলে ওখানকার শান্ত পার্বত্য নির্জনতাটুকু উপভোগ করতে প্রায়ই ওখানে আমি তখন যাই।

সেদিন সন্ধ্যায় ওইখানেই মন্দিরের সামনের রাস্তায় গাড়ি থেকে নামবার পরই থমকে দাঁড়ালাম। ম্যানুয়েল পেরেরা একটি মেয়েকে সঙ্গে করে মন্দির থেকে বার হচ্ছে। মেয়েটিকে দেখেই চমকে—কেন ম্যানুয়েলকে ক্যান্টিনে প্রথম দেখবার পর একেবারে অচেনা মনে হয়নি, বুঝতে পারলাম। মেয়েটির সূত্রেই ম্যানুয়েলকে আগে দেখার স্মৃতিটা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

হ্যাঁ, ম্যানুয়েলকে এই মাউন্ট মেরির মন্দিরেই আগে দেখেছি। দেখেছি ওই মেয়েটির সঙ্গেই। ম্যানুয়েলকে তখন খুব খুঁটিয়ে লক্ষ করিনি, সঙ্গের মেয়েটির সঙ্গে তার চেহারার বৈসাদৃশ্যটিই তখন বিশেষভাবে চোখে পড়ে ঘটনাটা স্মৃতিতে দাগ কেটে গেছে।

ম্যানুয়েল চেহারায় যে সুপুরুষ তা আগেই জানিয়েছি। ইউরেশিয় হলেও তার রং একেবারে ইয়োরোপের উত্তরাঞ্চলের শ্বেতাঙ্গদের মতো ফর্সা। চোখের তারাও নীল, শুধু কোনও পর্তুগিজ বা স্প্যানিশ পূর্বপুরুষের দরুন মাথার চুল একেবারে কালো। এহেন পুরুষ ম্যানুয়েলের একটি খুঁত বড় বেশি চোখে লাগে। ম্যানুয়েল বড় বেশি খর্বকায়। তাই অত সুন্দর চেহারা নিয়েও তাকে যেন প্রমাণ মানুষের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বলে মনে হয়।

তার এই সূক্ষ্ম বাটালিতে-কাটা সুন্দর অথচ অস্বাভাবিক খর্ব চেহারার সঙ্গে তার সঙ্গিনীর পার্থক্যটা এমন বেমানান যে লক্ষ না করে উপায় নেই।

সঙ্গিনীটি শুধু মাথায় তার চেয়ে আঙুল চারেক লম্বা নয়, রংটি তার বেশ মসৃণ

কালো এবং দেহের বাঁধুনি যৌবনোদ্ধত হলেও ঝোঁকটা তার স্থূলতার দিকেই। রং বেশ ময়লা ও নাক-মুখ-চোখের গড়নে কোনও সূক্ষ্মতা না থাকলেও বেশ ফ্যাশনদুরস্ত আঁটসাট ইয়োরোপিয় পোশাকে মেয়েটির চেহারায়, হাবভাব, চলনে একটা প্রাণোচ্ছল মাদকতার তরঙ্গ যেন আছে।

এই বিষয়েও ম্যানুয়েলের সঙ্গে তার পার্থক্যটা একেবারে যেন মৌলিক। ম্যানুয়েলের শান্ত ধীর সংযত কাঠিন্যের পাশে উদ্ধত উচ্ছল তরলতা বিসদৃশ।

এরকম বেমানান জুটি চোখে না পড়ে পারে না। সেই কারণেই ম্যানুয়েল মনের মধ্যে একটা অস্পষ্ট ছাপ রেখে গেছল।

ট্যাক্সি থেকে নামবার পর দূর থেকে ম্যানুয়েল ও তার সঙ্গিনীকে দেখে সেদিন তাদের একটু এড়াতেই চেয়েছিলাম। কিন্তু তা সম্ভব হল না।

আমার ভাড়া চুকিয়ে ছেড়ে দেওয়া ট্যাক্সিটাই নেওয়ার জন্যে দূর থেকে ম্যানুয়েল তখন হাত তুলেছে আর তার সঙ্গিনী সমস্ত শরীরে হিল্লোল তুলে চারিদিকের স্তব্ধতা সচকিত করে তীক্ষ্ণ সুরেলা চিৎকার তুলেছে,—'ট্যাক্সি!'

দূর থেকে শুধু ট্যাক্সিটা নয়, আমাকেও যে ম্যানুয়েল দেখতে পেয়েছিল সন্দেহ নেই। ট্যাক্সিটা দাঁড় করিয়ে সে প্রথমে আমার কাছে এসেই সৌজন্য-সম্ভাষণ জানালে। তার সঙ্গিনী তখন ট্যাক্সির দরজাটা খুলে একটু ভ্রুকুটি-ভরেই আমাদের দিকে চেয়ে আছে।

ভেবেছিলাম ম্যানুয়েল ভদ্রতার খাতিরে তার সঙ্গিনীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে। কিন্তু তা সে করলও না। তার বদলে একটু বিস্মিতভাবেই বললে,—'আপনাকে এখানে দেখতে পাব ভাবিনি।'

'কেন?' ঠাট্টা করে বললাম, 'আমাদের মতো পাপী-তাপীর এখানে আসা বারণ নাকি!'

একটু লজ্জিতভাবে হেসেও ম্যানুয়েল পালটা রসিকতা করলে,—'বারণ কেন! এ তো শুধু পাপী-তাপীদেরই জন্যে।'

'তোমাদের অন্তত সে দলে ফেলতে পারছি না যে!'

তোমাদের বলে তার সঙ্গিনী সম্বন্ধে স্পষ্ট ইঙ্গিত করা সত্ত্বেও ম্যানুয়েল সেদিক দিয়েই গেল না।

যেন একটু গম্ভীর হয়ে বললে,—'কার ভেতর কী পাপ-তাপ আছে ওপর থেকে কেউ বিচার করতে পারে!'

হঠাৎ তারপরই অসংলগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করলে,—'পড়েছেন আমার লেখাটা?'

"ইতি গজ" ভাবে বললাম, 'না, পুরোটা এখনও পড়া হয়নি, একটু উলটে-পালটে দেখেছি।'

'এবার পড়বেন কিন্তু!' অন্য প্রসঙ্গ আসার ভয়ে কথাটা যেন ছুড়ে দিয়ে হাত তুলেই বিদায় জানিয়ে ম্যানুয়েল সঙ্গিনীর পেছনে ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠল।

ট্যাক্সিটা মুখ ঘুরিয়ে মাউন্ট মেরির ঘোরালো উতরাই দিয়ে নেমে যাওয়ার সময় দেখলাম ম্যানুয়েল নয়, তার সঙ্গিনীই কৌতুক ও অবজ্ঞা মেশানো মুখভঙ্গিতে পেছনের কাচের জানলা দিয়ে আমায় বেশ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ করছে।

কষ্ট করে ম্যানুয়েলের লেখা তারপর দিন সাতেক ধরে পড়লাম।

কষ্ট যা হয়েছে তা শুধু জড়ানো হাতের লেখাটা পড়তে। নইলে কাহিনিটার নিজস্ব একটা আকর্ষণ খুব সামান্য নয়। কৌতূহল জাগিয়ে রাখা কাহিনি বলা যায়।

ম্যানুয়েলের কথা মনে হতে একটা হলদে প্লেনের ছবি কেন প্রথম স্মৃতিতে ভেসে ওঠে তার কারণ ওই রচনার মধ্যে পাওয়া যায়।

রচনাটি ওই রকম হলদে প্লেনের এক অসামরিক ট্রেনার-চালককে নিয়ে।

দীর্ঘ গল্পটিতে ওই হলদে রঙের প্লেনটিকে একটা প্রতীক হিসেবে খাড়া করবার চেষ্টা হয়েছে।

প্লেনটি যেন ট্রেনার রাজিন্দর কাউলের এক দুশ্ছেদ্য নাগপাশ থেকে মুক্তির চেষ্টার প্রতীক।

কাউলের এই নাগপাশ হল একটি অসামান্য প্রচণ্ড আসক্তি, যা তার সমস্ত সত্তাকে ধীরে-ধীরে এক দুঃসহ ক্লেদাক্ত তামসিকতায় আচ্ছন্ন করে দিতে চায়। কাউল এ নাগপাশ থেকে প্রাণপণে চেষ্টা করে মুক্তি পেতে। মুক্তির বাহন আর প্রতীক তার ওই হলদে ট্রেনিং প্লেন। সে-প্লেনে উঠে আকাশে বিচরণের সময়ে নিজেকে তার বন্ধনহীন সর্বগ্লানিমুক্ত মনে হয়, মনে হয় তার বাহনের মতোই সে ভারহীন গতিবেগে তার ঘৃণ্য আবেষ্টনের উর্ধ্বে উঠে যেতে পারে।

কিন্তু তা হয় না। আবার প্লেন নামাতে হয় মাটিতে। তাকে ফিরে আসতে হয় তার আসক্তির ক্লেদাক্ত পরিবেশে।

আসক্তি কার প্রতি? একটি নারীর প্রতি নিশ্চয়ই।

কিন্তু অবিশ্বাস্য একটি চরিত্র। ভালো-মন্দ সৎ-অসৎ সমস্ত সংজ্ঞার বাইরে।

সে নারী তার জীবন একদিন মধুময় করে তোলে, আবার পরের দিন সেখানে আদিম পাশবিক লালসা হিংসা ক্রূরতার বিষাক্ত আলোড়ন জাগিয়ে সমস্ত ছারখার করে দেয়।

কে এ নারী?

তার বিবাহিতা পত্নী? না, তা নয়।

তার রক্ষিতা? না, তাও নয়।

তার নাম সোফিয়া।

সোফিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন। নিজের জীবিকা সে নিজেই অর্জন করে। সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর।

একদিন সে সত্যিই ছিল রাজিন্দর কাউলের স্ত্রী। তারপর সে বিবাহ-বিচ্ছেদ করে মুক্ত হয়েছে।

বিবাহ-বিচ্ছেদ কি হয়েছে সংঘর্ষ-সংঘাতের ফলে? হয়েছে ঘৃণায় বিদ্বেষে দাম্পত্য সম্পর্ক দুঃসহ তিক্ত হয়ে ওঠার পর?

না, একেবারেই ব্যাপারটা সেরকম নয়। বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়েছে দুজনেরই পরস্পর বোঝাপড়ায়। অন্তত সোফিয়াই কাউলকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করিয়েছে এ বিবাহ-বিচ্ছেদে।

কী যুক্তিতে রাজি করিয়েছে তা কাউল সব ঠিক স্মরণ করতেও পারে না।

একটা যুক্তি অবশ্য এই যে, উভয়েই মুক্ত স্বাধীন না হলে স্ত্রী-পুরুষের মিলন তার পরম দীপ্ত সার্থকতায় পৌঁছয় না।

তবে যুক্তি দিয়ে যতটা—তার চেয়ে ঢের বেশি টলিয়েছে কাউলকে অন্য কিছু দিয়ে। সে অন্য কিছুকে সোফিয়ার মোহিনীমায়া ছাড়া আর কী বলা যায় কাউল জানে না।

বিবাহ-বিচ্ছেদের পর সোফিয়া কি কাউলকে ত্যাগ করেছে?

না, মোটেই না। আরও যেন নিবিড় করে তাকে জড়িয়ে ধরেছে।

সে আলিঙ্গনে কিন্তু যেমন কখনও অনির্বচনীয় মাধুর্যের তীব্রতা, তেমনি কখনও

আবার শ্বাসরোধকারী মাদকতার যন্ত্রণা।

কাউলের কাছে সোফিয়া নিজেকে একান্তভাবেই সমর্পণ করে। সে আত্মসমর্পণের সঙ্গে দেহনিষ্ঠার কোনও সম্পর্ক কিন্তু নেই। এ বিষয়ে সোফিয়ার দৃষ্টিকোণই আলাদা। দৈহিক আনুগত্যের কোনও মূল্য তার কাছে নেই।

সোফিয়ার চরিত্রের এই অবিশ্বাস্য দিকটি কাউল আবিষ্কার করেছে অবশ্য অনেক পরে। বিবাহ-বিচ্ছেদের পর বহুদিন তখন কেটে গেছে।

বিবাহিত জীবনে ও বিচ্ছেদের পর কিছুদিন পর্যন্ত সোফিয়ার ভাবভঙ্গি ও আচরণে একটা কী দুর্জ্ঞেয় রহস্য তাকে মাঝে-মাঝে বিচলিত করেছে সত্য, কিন্তু কোনও সংশয়ের বীজকে সে মনে শেকড় গাড়তে দেয়নি জোর করেই।

সোফিয়া তার সঙ্গে যে তখন লুকোচুরি করেছে তাও নয়। কোনও আচরণে অপরাধীসুলভ গোপনতা তখনও ছিল না সোফিয়ার। তার সবকিছুই অসঙ্কোচে সামনে মেলে ধরা।

নিজের দৃষ্টির সাক্ষ্য কাউলই বিশ্বাস করেনি বা করতে চায়নি।

সোফিয়ার বন্ধু ও বান্ধবীর সংখ্যা কোনওকালেই বেশি ছিল না। কিন্তু এ বিষয়ে তার নির্বাচন বড় অদ্ভুত। বিশেষ কোনও শ্রেণী বা স্তরে সে নির্বাচন আবদ্ধ নয়।

সত্য-সত্যই শ্রমিক থেকে শিল্পপতি, বিদেশি বিদুষী থেকে সাধারণ পথের গায়িকা, যে কাউকে সাহচর্য দিতে তাকে দেখলে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই।

তার বন্ধুত্ব দীর্ঘস্থায়ীও নয়। কিছুকাল বাদে একে-একে সবাইকেই সে কোনও অনায়াস কৌশলে বিদায় দিতে জানে।

এই বন্ধুত্বের মধ্যে সোফিয়ার চরিত্রের অবিশ্বাস্য দিকটি কাউল সহসা একদিন আবিষ্কার করেছিল।

আবিষ্কার করেছিল বলা অবশ্য ভুল। বরং বলা যায় যা তার সামনে অবারিত ছিল সে বিষয়ে প্রথম সে সচেতন হয়েছিল। সচেতন হয়ে সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল গোড়ায়। একটা হিংস্র আক্রোশে সে সাংঘাতিক একটা কিছু করতে চেয়েছিল।

কিন্তু সোফিয়াকে ধিক্কার দিতে যাওয়ার পর সমস্ত সঙ্কল্প তার শিথিল হয়ে গিয়েছিল মোহাবেশে।

সোফিয়া তার পৌরুষের আদিম অহংসর্বস্ব অধিকারবোধ যেন হাস্যকর করে তুলেছিল বিদ্রুপে।

না, কাউল ভয়ঙ্কর কিছু করেনি, সোফিয়ার সঙ্গে সম্পর্কও তার অবিচ্ছিন্ন, কিন্তু তারই গ্লানিতে কাউলের সমস্ত হৃদয়মন জর্জর।

সোফিয়ার বিরুদ্ধে তীব্র জ্বালা নিয়েও তার প্রতি আকর্ষণের বন্ধন সে ছিন্ন করতে পারছে না।

তার চেয়েও যা তাকে ক্রমশ বিরল-হয়ে-আসা এক-এক মুহূর্তে শঙ্কাতুর করে তোলে তা হল এই যে, ধীরে-ধীরে বহুবল্লভা সোফিয়ার দৃষ্টিকোণের প্রতি ঘৃণাও যেন তার ক্ষীণ হয়ে আসছে।

একটা ক্লেদ-পঙ্কিল মোহাবেশের মধ্যে নিজেকে ধীরে-ধীরে নিমজ্জিত হতে দিচ্ছে এই তার অনুভূতি।

নিজেকে প্রাণপণে সংহত করে সে এক-এক সময়ে বিদ্রোহ করতে চায় এই ক্লীবত্বের

বিরুদ্ধে। কল্পনা করতে চেষ্টা করে অসম্ভব সব মুক্তির উপায়।

সে কল্পনা-বিলাসে একটা হলদে রঙের প্লেন সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে বারবার দেখা দেয়।

পাইলট ট্রেনিং ক্লাবের নিয়ম ভঙ্গ করে একদিন সোফিয়াকে গোপনে সে তার প্লেনে তুলে নিয়ে যাবে উর্ধ্বাকাশে।

নীল শূন্যের সেই নির্জনতায় সোফিয়ার যথার্থ রূপ হয়তো সে দেখতে পাবে।

গল্প ওইখানেই শেষ।

বলা বাহুল্য, এ কাহিনি পড়ে মোটেই খুশি হতে পারিনি।

কয়েকদিন বাদেই ম্যানুয়েল এসেছিল তার রচনা সম্বন্ধে আমার মতামত জানতে। তাকে অপ্রিয় সত্যটাই জানিয়েছিলাম।

বলেছিলাম, 'কাহিনিতে কল্পনার বং নিশ্চয়ই থাকবে, কিন্তু বাস্তব সত্যের একটু ভিত না থাকলে সমস্তই নিরর্থক হয়ে যায়। আপনার কল্পনা আছে, লেখবার ক্ষমতাও নেই তা নয়, কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতা আর-একটু গভীর হলে শুধু চমক দেওয়ার জন্যে এরকম উদ্ভট একটা বিষয় বোধহয় বেছে নিতেন না।'

ম্যানুয়েল পেরেরা বেশ একটু ক্ষুণ্ণ হবে ভেবেছিলাম। তা সে কিন্তু হয়নি। অন্তত তার মুখে একটু কুণ্ঠিত হাসিই দেখেছিলাম। যেন একটু লজ্জিতভাবেই বলেছিল, 'আপনাকে বেশ একটু কষ্ট দিলাম।'

'না, কষ্ট এমন আর কী!'—বিনয় করেছিলাম, 'গল্পটা পড়তে কোনও কষ্টই হয়নি। শুধু...'

'শুধু অতটা উদ্ভট কল্পনা না থাকলে খুশি হতেন।'—ম্যানুয়েল আমার কথার পাদপূরণ করে বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে তখনই চলে গিয়েছিল।

আর কোনওদিন সে আসেনি. মাউন্ট মেরিতে বা বোম্বাইয়ের আর কোথাও তাকে বোম্বাই থেকে চলে আসার আগে পর্যন্ত কোনওদিন দেখিনি।

তার পর থেকে ম্যানুয়েল পেরেরার সম্বন্ধে কোনও খোঁজ নেওয়ার কথাও আর আমার মনে হয়নি।

তার বিষয়ে এই বিবরণ কোনওদিন লিখতাম না। শুধু কয়েক দিন আগে খবরের কাগজের এক কোণের একটি ছোট খবরে বড় বিচলিত হয়েছি।

বোম্বাই নয়, আর একটি শহরের একটি অসামরিক বৈমানিক শিক্ষণ-কেন্দ্রের একটি ট্রেনিং-প্লেন এখনও পর্যন্ত নিরুদ্দেশ। প্লেনটিতে ট্রেনার-চালক ছাড়া আর কেউ ছিল না। প্লেনটি কোনও আকস্মিক দুর্ঘটনায় ধ্বংস হয়েছে বলে সন্দেহ হয়। ধ্বংস হওয়ার বিবরণ বা ধ্বংসাবশেষ এখনও পাওয়া যায়নি।

ম্যানুয়েল পেরেরাকে যে নামে আমি জেনেছিলাম, ট্রেনার চালকের নাম তাই দেওয়া হয়েছে।

ব্যাপারটা হয়তো কাকতালীয় ঘটনা-সন্নিবেশ মাত্র। ম্যানুয়েল পেরেরার বোম্বাইয়ে কী পেশা ছিল তাই জানবার সুযোগ আমার হয়নি।

তবু মনে কেমন একটা খটকা লাগে।

আজগুবি বলে যা আমি অবজ্ঞা করেছি, ম্যানুয়েল নিজেই যদি সে কাহিনির নায়ক

হয় তাহলে আমার মতো বাইরের লোকের কাছে সে কাহিনি অত আগ্রহভরে শোনাতে নিয়ে আসার কারণ কী?

এ কি যন্ত্রণা-জর্জর নিঃসঙ্গ একটি হতভাগ্য মানুষের নিজের মনের গহন গোপন সত্য কোনও একজনের কাছে প্রকাশ করার অদম্য ব্যাকুলতা?

ম্যানুয়েল যে ক্যাথলিক ছিল তা তার নামেই বোঝা যায়। ক্যাথলিকরা তাঁদের ফাদার কনফেসরের কাছে মনের গহন গোপন পাপ-গ্লানি প্রকাশ করে নিজেদের পবিত্র নির্মল করেন।

ম্যানুয়েল তাই করেছিল কি না জানি না। কিন্তু অন্য কারুর কাছে নিজের মনের যে আঁধার কন্দর সে অনাবৃত করতে পারেনি, গল্পের আকাঙ্খে তাই আমার মতো একজনকে শুনিয়ে সে কি আংশিক শান্তি খুঁজেছে?

আমার কাহিনি শেষ হওয়ার পর প্রিয়তোষ ও আমি কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে বসে থেকেছি।

প্রিয়তোষকে তারপর বলেছি, 'নাও, এবার তোমারটা শুরু করো।'

মাথা নেড়ে প্রিয়তোষ বলেছে, 'না, এখন কিছু বলা উচিত হবে না। যাই বলি না কেন, সুরে মিলবে না। স্মৃতিচারণ বা কাহিনি যা-ই বলো, ম্যানুয়েল পেরেরার বৃত্তান্তটায় তুমি যে ব্যঞ্জনা দিয়েছ আমার কাহিনিতে তার কোনও অবকাশ নেই। আমি যা বলতে চেয়েছি তা সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের।'

'তা হোক।' আমি জেদ ধরে বলেছি,—'তবু বলতে তোমায় হবেই। সুরের আর জাতের ছুতো করে কোনওমতে ফাঁকি দেওয়া চলবে না।'

'না, ফাঁকি আমি দেব না।'—এ আশ্বস্ত করেছে প্রিয়তোষ, 'তবে মুখে না বলে আমি লিখে তোমায় জানাব।'

সন্দিগ্ধ হয়ে বলেছি, 'কবে?'

'এই এক হপ্তার ভেতরই।'

প্রিয়তোষ সত্যিই তার কথা রেখেছে তারপর। এক হপ্তার মধ্যে তুচ্ছ বিজ্ঞাপনটিকে ভাঙিয়ে যে কাহিনিটি সে সাজিয়ে তুলেছে তা যথাযথই নিচে প্রকাশ করলাম।

প্রিয়তোষের কাহিনির কী সুর বা জাত কী—সে বিচার আমি করব না। একটি সামান্য খবর ও একটি তুচ্ছ বিজ্ঞাপনকে হাতে হাত মিলিয়ে কাহিনি রচনার এমন জোট বাঁধতে দেখেই আমি মুগ্ধ।

মাত্র কয়েক বছর আগের কথা।

সুতরাং অনেকেরই সে বছরের দুর্দান্ত দুর্যোগের কথা মনে থাকা উচিত। বর্ষাকালে বৃষ্টি হবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, নেই উত্ত্যক্ত হওয়ারও।

কিন্তু সেবারের বৃষ্টি যেন মনে হয়েছিল আকাশের দেবতার আক্রোশ। সমস্ত কিছু ভাসিয়ে না দিতে পারলে বুঝি সে আক্রোশ মিটবে না।

কাগজ খুললেই তো দেখা যেত বন্যার খবর। এখানে রাস্তাঘাট ডুবে গেছে, সেখানে গ্রাম ভেসে গেছে। অনেক জায়গায় মানুষের তো এমন অবস্থা যে জলচর না হলে আর বাঁচবার উপায় নেই।

বরাকর নদীর ধারে একটি বিরাট বাড়ির কটি বাসিন্দার সেই অবস্থাই হয়েছিল।

চারিদিকে থই-থই জলের মধ্যে বাড়িটি পার্বত্য দ্বীপের মতোই কোনওমতে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

একতলার ঘরগুলোর মেঝে বেশ উঁচু হলেও জল তার প্রায় কানায়-কানায়।

দরজা খুললেই জলে নামা যায়।

আর ওপরতলার ঘরগুলোর জানলা থেকে যেদিকেই দৃষ্টি ফেরানো যাক না কেন শুধু জল আর জল। মাঝে-মাঝে দু-চারটে উঁচু গাছের মাথা না জেগে থাকলে মনে হতো বুঝি সৃষ্টির সেই আদিম জলময় পৃথিবীই আবার জেগে উঠেছে।

বন্যায় চারিদিক ডুবে যাওয়ার দরুন সমস্ত লোকালয় থেকে বিচ্ছিন্ন একটি বাড়িতে অবিরাম দুর্যোগের মধ্যে নিরুপায়ভাবে দিনরাত্রি কাটানোই তো এক যন্ত্রণা—তার ওপর ওই বাড়িটির কটি বাসিন্দার জীবন আর-এক অজানা আতঙ্কে তখন দুর্বিষহ।

নামহীন এক বিভীষিকার অদৃশ্য পদসঞ্চার ক্রমশই সেই অভিশপ্ত বাড়িটার দিকে যেন এগিয়ে আসছে বলে প্রত্যেকে অনুভব করেছে।

কিন্তু কোনও উপায় নেই তাকে ঠেকাবার, তাকে এড়িয়ে পালাবারও কোনও পথ নেই।

এই অভিশপ্ত বাড়িটির মধ্যে নিরুপায়ভাবে বন্দি কটি বাসিন্দার নিদারুণ অভিজ্ঞতার কথা বলবার জন্যেই এ কাহিনির অবতারণা।

সে কাহিনি কিন্তু, এ বাড়িতে যাঁবা স্বেচ্ছায় বা ভাগ্যের নির্দেশে একত্র হয়েছেন, বন্যায় জগৎ-সংসার থেকে তাঁদের বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বার কিছু আগে-থাকতেই শুরু করতে হবে।

শুধু বাড়িটির একটা পরিচয় বোধহয় পূর্বেই দেওযা যেতে পারে।

বাড়িটি একটি হোটেল, কল্যাণেশ্বরী স্বাস্থ্যনিবাস হিসেবে যার বিজ্ঞাপন তখনকার কাগজে দেখেছেন বলে কারুর-কারুর হয়তো মনে পড়তে পারে। মনে পড়ার আর একটা কারণ এই যে স্বাস্থ্যনিবাসের বিজ্ঞাপিত বিবরণে এমন একটু অভিনবত্ব ছিল সাধারণত যা চোখে পড়ে না।

সেই অভিনবত্বটুকুই কল্যাণেশ্বরী স্বাস্থ্যনিবাসের অভিশপ্ত হয়ে ওঠার মূল, এমনও হতে পারে।

কল্যাণেশ্বরী স্বাস্থ্যনিবাস পুরানো নামকরা কোনও হোটেল নয়। এ কাহিনির যখন সূত্রপাত তার মাত্র কিছুদিন আগে তার পবিকল্পনা বাস্তব রূপ নেয়।

যতদূর জানি এ কাহিনি শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে স্বাস্থ্যনিবাসটিরও অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে। খবরের কাগজে অন্তত তার অভিনব বিজ্ঞাপন আর চোখে পড়ে না।

অসাধারণ এক প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে লোমহর্ষণ একটি বিভীষিকাময় রহস্য-নাট্যের সাময়িক মঞ্চ হওয়ার জন্যেই যেন স্বাস্থ্যনিবাসটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই ক্ষণ-পরমায়ু নিয়ে।

রোমাঞ্চকর রহস্য-নাট্যের পরিসমাপ্তির সঙ্গে কল্যাণেশ্বরী স্বাস্থ্যনিবাসের ওপরও শেষ যবনিকা পড়েছে।

কল্যাণেশ্বরী স্বাস্থ্যনিবাসে যে নাটক কেন্দ্রীভূত তার প্রথম দৃশ্য উন্মোচন করতে বরাকরের নদীতীর থেকে বহুদূরে কলকাতার এক নোংরা শহরতলির একটি জনবিরল রাস্তায় যেতে হবে।

রাস্তাটি এমনিতেই নির্জন, তার ওপর ক'দিনের অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে নালা-নর্দমা বন্ধ

হওয়ার দরুন জলে জলাকার হয়ে এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, পারতপক্ষে কেউ আর ঘর ছেড়ে সেখানে বেরোয় না। বাদলার স্তিমিত আলোয় সমস্ত অঞ্চলটা যেন পরিত্যক্ত শ্মশানপুরী বলে মনে হয়।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। বৃষ্টির কিন্তু এখনও বিরাম নেই। কখনও মুষলধারে কখনও ঝিরি-ঝিরি তা পড়ছে তো পড়ছেই।

এই বৃষ্টির মধ্যে রাস্তায় জল *ঠেলতে-ঠেলতে* একটিমাত্র লোককে দৃঢ় মন্থর পদে যেতে দেখা গেল।

লোকটির চেহারা কীরকম বোঝবার উপায় নেই। পোশাক এই বৃষ্টি-বাদলার উপযুক্ত হলেও একটু অদ্ভুত, চোখের কালো গগলসটা অন্তত। এই বাদলার ঝিমোনো আলোয় কাউকে চোখ ঢাকা গগলস পরে থাকতে দেখলে বিস্মিতই হতে হয়।

কালো রঙের মিলিটারি গোছের বর্ষাতিতে লোকটির সর্বাঙ্গ ঢাকা। মাথার গাল ঢাকা টুপিটা তার ওপর যেভাবে গগলস পরা চোখ পর্যন্ত নামানো তাতে বর্ষাতির তোলা কলারের ওপর দিয়ে লোকটির মুখের কিছু দেখাই যায় না। এই আবছা আলোয় তো নয়ই, উজ্জ্বল দিবালোকেও ওই পোশাকের ভেতর দিয়ে মানুষটিকে চেনা অসম্ভব।

আকারেও মানুষটি সাধারণ। বেশি লম্বা বা বেঁটে নয়। ওই মাঝারি রকম গড়ন যে-কোনও বয়সের লোকের হতে পারে। মন্থর হলেও শুধু চলার দৃঢ় পদক্ষেপে লোকটি যে বেশ শক্ত-সমর্থ তা বোঝা যায়।

একটা রাস্তার মোড় ঘুরে লোকটি একটি সঙ্কীর্ণতর গলিতে ঢুকল। ঢোকবার মুখেই টিনের প্লেটে গলির নামটা লেখা। গিরি মাঝি লেন।

গিরি মাঝি লেনও এই বৃষ্টির সন্ধ্যায় একেবারে নির্জন।

কয়েকটি বাড়ি ছাড়িয়ে লোকটি একটি বাড়ির দরজায় গিয়ে যেরকম বিনা দ্বিধায় কড়া নাড়ল তাতে মনে হল বাড়িটা তার অচেনা নয়।

গিরি মাঝি লেন কলিকাতার একটি অতি পুরাতন আমলের পাড়া। অধিকাংশ বাড়িরই অত্যন্ত জীর্ণ দশা। লোকটি যে বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ছিল তার অবস্থা অন্যগুলির তুলনায় বুঝি বেশি শোচনীয়।

কিছুক্ষণ কড়া নাড়বার পর প্রৌঢ়-গোছের এক ভদ্রলোক একটা আধখোলা ভাঙা ছাতা মাথায় দরজা খুলে দাঁড়িয়ে বিরক্তমুখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাকে চান মশাই?'

বর্ষাতি পরা লোকটির চেহারা শক্তসমর্থ হলেও গলাটি তার তুলনায় অত্যন্ত ক্ষীণ।

সে ধরাগলায় প্রায় ফিস-ফিস করে জিজ্ঞাসা করলে, 'মোক্ষদা দেবী কি বাড়িতে আছেন?'

'আছে না আছে দেখুন না গিয়ে ওপরে!' প্রৌঢ় ফিরে যেতে-যেতে ঝাঁঝালো গলায় আরও খানিকটা বকবক করে গেলেন, 'মোক্ষদা দেবী যেন দারোয়ান রেখেছেন আমায় তাঁর খবরদারি করতে!'

বৃষ্টির মধ্যে দরজা খুলতে আসার জন্যে অত বিরক্ত এবং ফিরে যাওয়ার জন্যে ব্যস্ত না হলে প্রৌঢ় ভদ্রলোক হয়তো বর্ষাতি পরা লোকটিকে আর একটু ভালো করে লক্ষ করতেন। বাদলার আলোয় চোখের কালো চশমা আর ধরা-গলায় কথা বলার ধরনটা অন্তত তাঁর কৌতূহল উদ্রেক করতে পারত।

কিন্তু সে সময় বিগড়ে যাওয়া মেজাজে এসব কিছু তিনি খেয়ালই করেননি।

শুধু ছাতা মুড়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢোকবার সময় কানটা আপনা-থেকেই একবার বুঝি সজাগ না হয়ে উঠে পারেনি।

ওপরে ওঠবার সিঁড়িতে কীরকম যেন একটা শিস শোনা যাচ্ছে। যে লোকটাকে এইমাত্র দরজা খুলে দিলেন সে-ই ওপরে উঠতে-উঠতে শিস দিচ্ছে নাকি?

এই বিদঘুটে বাদলায় বদ্ধপাগল ছাড়া আর কার শিস দেওয়ার শখ হয়, ভাবতে-ভাবতেই প্রৌঢ় নিজের নিচের ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

এই শিস সেদিন আরও দুজন শুনেছিল।

একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রি আর তার শাকরেদ।

তখন বাদলার বিকেল সন্ধেয় গড়িয়ে গেছে। একটা কারখানার সুইচ বোর্ডের কাজ শেষ করে দুজনে তখন বাড়ি ফেরার জন্যে যন্ত্রপাতি গুছচ্ছে। বড় মিস্ত্রি মুখে একটা বিড়ি গুঁজে দেশলাই বার করে দেখেছে তাতে কাঠি আর নেই।

শাকরেদের কাছে কাঠি চাইতে সে প্রথমে লজ্জায় মাথা চুলকে শেষে ওস্তাদের ধমকে পকেট থেকে দেশলাইয়ের বাক্সটা বার করে দিয়েছে। সে বাক্সেও কাঠি মাত্র একটা। সে কাঠিও বাদলায় স্যাঁতসেতে হয়ে অনেক ঘষাঘষিতেও আর জ্বলেনি।

সে কাঠি সেদিন জ্বললে দিগন্তব্যাপী জলের পাথারে নিঃসঙ্গ একটি অভিশপ্ত বাড়ির রোমাঞ্চকর রহস্যভেদের কোনও সূত্রই বোধহয় কেউ পেত না।

হতাশ হয়ে অচল কাঠিটা ফেলে দেওয়ার সঙ্গে বড় মিস্ত্রি আর শাকরেদ রাস্তায় একটা শিসের শব্দ শুনে একটু চমকেই উঠেছিল।

এই বাদলার সাঁঝে শিস দিয়ে রাস্তা হাঁটে আবার কে?

পর মুহূর্তে কারখানার আধখোলা গেটের ফাঁকে বাইরের রাস্তায় ওয়াটারপ্রুফে ঢাকা সেই অদ্ভুত মূর্তিকে পায়ে হেঁটে যেতে দেখা গিয়েছিল।

বড় মিস্ত্রি আর তার শাকরেদ দুজনেই বিনা বাক্যব্যয়ে বাইরে ছুটে বেরিয়েছিল।

অন্য কিছুর জন্যে নয়, শুধু একটা দেশলাইয়ের কাঠি পাওয়ার আশায়।

পরের দিন সেই পাড়ার থানায় বড় মিস্ত্রি আর তার শাকরেদকেই বসে থাকতে দেখা গেল। কথাবার্তায় বোঝা গেল পুলিশের তলবে নয়, তাঁরা নিজে থেকেই পুলিশের কাছে একটা বিশেষ সংবাদ দিতে এসেছেন। সকালবেলা খবরের কাগজে গিরি মাঝি লেনের খুনের কথা পড়েই বড় মিস্ত্রি পঞ্চুবাবুর টনক নড়েছে। শাকরেদ বাধেশকে নিয়ে তাই কর্তব্যের খাতিরে পুলিশকে তাঁদের সন্দেহের কথাটা জানাতে এসেছেন।

থানার ইনস্পেক্টর মিঃ চৌধুরী খানিকক্ষণ বড় মিস্ত্রি পঞ্চুবাবু ও তাঁর শাকরেদের এলোমেলো বিবরণ শুনে বুঝলেন যে নিজে থেকে সাহায্য না করলে, সে বিবরণের জট ছাড়িয়ে আসল খবর কিছু পাওয়া যাবে না। বিবরণ শুনতেই ঘণ্টা কাবার হয়ে যাবে।

সাক্ষাৎকারটা তাই তিনি সংক্ষিপ্ত করবার চেষ্টায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'লোকটার চেহারার একটু বিবরণ দিতে পারেন?'

'চেহারার বিবরণ?' পঞ্চুবাবুকে বিব্রত মনে হল।

ইনস্পেক্টর সাহেবের চেয়ারের পাশে সার্জেন্ট গুপ্তও দাঁড়িয়ে সমস্ত বিরবণ শুনছিলেন। তিনি আরও একটু বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যে বললেন, 'মানে—আপনারা যা লক্ষ

করেছেন তাই একটু বলুন।'

এ ব্যাখ্যাতেও কোনও ফল হল না।

পঞ্চুবাবুর মাথায় টাক ও কাঁচা-পাকা গোঁফ দেখলে বেশ ভারিক্কি গম্ভীর বলেই মনে হয়। কিন্তু কথাবার্তা একেবারে ছেলেমানুষের মতো যেমন এলোমেলো তেমনি কমা-দাঁড়ি বিহীন।

'লক্ষ করব কী করে মশাই?' পঞ্চুবাবু যেন পুলিশের অন্যায় আবদারে ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন, 'চেষ্টা করলেও কিছু দেখতে পেতাম নাকি? একে বৃষ্টি পড়ছে ঝুপ-ঝুপ করে, তার ওপর লোকটার সর্বাঙ্গ ওয়াটার-প্রুফে আর বর্ষাতি টুপিতে ঢাকা। চোখের গগলসটাই যা অদ্ভুত লেগেছিল। না রাধেশ?'

রাধেশের বয়স অল্প। রোগা পাকানো চেহারা। তার পরনে খাকি হাফ প্যান্ট আর শার্ট কিন্তু এমন ঝলঝলে যে মনে হয় যেন কারুর কাছে ধার করে আনা। থানায় এসে যে একটু ঘাবড়ে গেছে তা তার ঘন-ঘন ঢোঁক গেলা থেকেই বোঝা যায়।

প্রশ্নটায় চট করে সে জবাব দিতে পারে না। 'আজ্ঞে হ্যাঁ,' শব্দটা বার করতেই ঢোঁক গেলার সঙ্গে তার কণ্ঠার ঠেলে ওঠা ডেলাটা বার-দুই-তিন নামা-ওঠা করে।

মিঃ চৌধুরী একটু অধৈর্যের সঙ্গেই সমস্ত ব্যাপারটা সংক্ষেপ করবার জন্যে বললেন, 'আচ্ছা ব্যাপারটা তাহলে এই—আপনারা বিনয় সরকার স্ট্রিট আর গিরি মাঝি লেনের মোড়ে ইলেকট্রিক লাইনটা মেরামত করছিলেন। সিগারেট ধরাতে গিয়ে দেখলেন যে দেশলাইয়ের কাঠি নেই...'

মিঃ চৌধুরীর বিবরণ সংক্ষেপ করা আর হয়ে উঠল না।

পঞ্চুবাবু বাধা দিয়ে বললেন, 'রাধেশের কাছে দেশলাই চেয়ে নিয়ে দেখি তারও একটি কাঠি মাত্র সম্বল। বৃষ্টিতে এমন স্যাঁতসেঁতে হয়ে গিয়েছে যে ধরানোই গেল না। ঠিক তখন বর্ষাতি-কোট-ঢাকা এক ভদ্রলোক গিরি মাঝি লেন থেকে বেরিয়ে আসছেন। গায়ে যখন ওরকম দামি বর্ষাতি-কোট তখন তাঁর পকেটে একটা দেশলাই থাকবে না এমন কি আর হতে পারে! আমাদের সামনে দিয়েই ভদ্রলোক শিস দিতে-দিতে যাচ্ছেন, আমি তখন...'

মিঃ চৌধুরী এবার বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই বাধা দিয়ে বললেন, 'থামুন-থামুন! ঘটনাটা সবই আমাদের জানা আছে। আপনি দেশলাই চাইতে তিনি দেশলাই বার করে দিলেন। আপনি সিগারেট ধরিয়ে ফেরত দিতে গিয়ে দেখেন, দেশলাই না নিয়েই তিনি চলে গেছেন। বৃষ্টি আর সন্ধ্যার অন্ধকারের দরুন আপনারা তাঁর গায়ের বর্ষাতি-কোট, মাথা-ঢাকা টুপি আর চোখের গগলস ছাড়া কিছু লক্ষ করেননি...'

'লক্ষ করবার কথা যে মনেই হয়নি ছাই!' টাক-মাথা ভদ্রলোককে আর বুঝি থামানো যাবে না। 'দেশলাই পেয়েই তখন বর্তে গেছি। সিগারেট ধরাতে গিয়ে নজর তো আর তাঁর দিকে নেই। তিনি যে দেশলাইটা ফেলেই চলে যাবেন ভাবতেই পারিনি। তখন এই রাধেশটাও যদি একবার বলে...'

মিঃ চৌধুরী একটু হেসে বললেন, 'রাধেশই বা জানবে কী করে বলুন যে লোকটির চেহারাটা লক্ষ করা দরকার! শুনুন—চেহারা আপনারা লক্ষ করেননি যখন তখন তার আর চারা নেই। কিন্তু লোকটি কী করে শিস দিতে-দিতে যাচ্ছিল কিছু মনে আছে? কোনও সুর-টুর কি...?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, দাঁড়ান-দাঁড়ান!' টাক-মাথা চুলকে ভদ্রলোক বললেন, 'খুব একটা চেনা সুর! কী বলে—একটা ফিল্মের গানই হবে যেন। কি হে রাধেশ, মনে পড়ছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' রাধেশ যেন অত্যন্ত লজ্জিতভাবে স্বীকার করলে।

মিঃ চৌধুরী ও সার্জেন্ট গুপ্ত উদগ্রীব হয়ে উঠলেন।

টাক-মাথা ভদ্রলোক আবার কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন। তাঁকে প্রায় ধমক দিয়ে থামিয়ে মিঃ চৌধুরী রাধেশকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী সুর আপনার মনে আছে?'

রাধেশ বেশ কয়েকবার ঢোঁক গিলে হঠাৎ এক নিশ্বাসে বলে ফেললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, সে সুর সবাই জানে।'

'সবাই জানে মানে!' মিঃ চৌধুরী অবাক।

'আজ্ঞে, মনের মানুষ ছবির গানের সুর কিনা! ও গান কে না শুনেছে!' রাধেশ এতক্ষণে একটু সহজভাবেই কথা বললে।

মিঃ চৌধুরী নিজের অজ্ঞতায় লজ্জিত হলেন মনে হল। গান শোনা দূরে থাক, মনের মানুষ ছবিটার নামটাও তাঁর জানা নেই। সার্জেন্ট গুপ্তর দিকে চেয়ে কিন্তু তাঁর কেমন সন্দেহ হল, এ ছবি তাঁর অদেখা নয়। গম্ভীর হয়েই জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হে গুপ্ত, মনের মানুষ না বনের মানুষ গোছের কোনও ছবি দেখেছ নাকি?'

সার্জেন্ট গুপ্ত যথাসম্ভব বিরাগের ভান করে বললেন, 'হ্যাঁ স্যার, একটা ছবি যেন দেখেছিলাম মনে হচ্ছে। কিন্তু তাতে তো আগাগোড়াই গান।'

মিঃ চৌধুরী আবার রাধেশের দিকে ফিরলেন, 'কোন গান কিছু বলতে পারেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ওই হিরোইনের মুখের থার্ড গানটা!' রাধেশের সাহস অনেকখানি বেড়েছে বোঝা গেল, 'ওই যে গানটার ফার্স্ট লাইন হল, কাছে থাকে তবু চিনি না।'

'কাছে থাকে তবু চিনি না! মিঃ চৌধুরী ক-সেকেন্ড কী যেন ভেবে নিয়ে বললেন, 'আচ্ছা আপনাদের অনেক ধন্যবাদ। খবরের কাগজে গিরি মাঝি লেনের খবর পড়ে আপনারা নিজে থেকে এই ব্যাপারটুকু যে জানাতে এসেছেন তার জন্যে সত্যিই আমরা কৃতজ্ঞ।'

টাক-মাথা ভদ্রলোক এতক্ষণ রাধেশের একটু পেছনে পড়ে গেছলেন, এবার সুযোগ পেয়ে তিনি নিজেকে আবার একটু জাহির করলেন, 'আজ্ঞে রাধেশ তো ভয়ে আসতেই চায় না। আমি জোর করে নিয়ে এলাম। যেমন-তেমন ব্যাপার তো নয়, যাকে বলে খুন! তাই আমি...'

মিঃ চৌধুরী ব্যস্ত হয়ে উঠে বললেন, 'তাই আপনি ঠিক উচিত কাজ করেছেন। আচ্ছা নমস্কার।'

টাক-মাথাকে নমস্কার করে এবার উঠে দাঁড়াতে হল। কিন্তু শেষ বাহাদুরিটা তিনি না নিয়ে ছাড়লেন না।

পকেট থেকে কাগজে মোড়া একটি জিনিস বার করে টেবিলের ওপর রেখে বললেন, 'এটিও আপনাদের কাজে লাগতে পারে বলে নিয়ে এসেছি!'

মিঃ চৌধুরী সবিস্ময়ে বললেন, 'কী ওটা?'

'আজ্ঞে সেই দেশলাইয়ের বাক্সটা! অপরাধ নেবেন না, না জেনে ওর কটা কাঠি কিন্তু খরচ করে ফেলেছি।'

মিঃ চৌধুরী হাসি চেপে বললেন, 'না-না, তাতে কী হয়েছে। কিন্তু কাগজে মোড়া কেন?'

'আজ্ঞে, আপনাদের ওই যে কী বলে ফিঙ্গার-প্রিন্ট-ট্রিন্ট যদি কিছু থাকে। তাই ওই কাগজটাতেই মুড়ে নিয়ে এলাম। কাগজটাও সে লোকটার পকেট থেকে পড়েছিল কিনা।'

'কোন কাগজটা!' মিঃ চৌধুরী সত্যিই একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। এক মুহূর্তে তিনি টান হয়ে বসলেন।

'আজ্ঞে ওই যে কাগজটায় মুড়ে এনেছি। দেশলাই বার করতে গিয়ে সে লোকটার পকেট থেকে পড়ে যায়। আমি দেখিনি। রাধেশ সিনেমার বিজ্ঞাপন-টিজ্ঞাপন ভেবে কুড়িয়ে নিয়েছিল।'

মিঃ চৌধুরী ততক্ষণে কাগজের মোড়কটা খুলে ফেলেছেন। খুলে তাঁকে আবার হতাশই হতে হল বোধহয়। ভেতরে একটা টেক্কা মার্কা দেশলাইয়ের বাক্স আর কাগজটা একটা সাধারণ হ্যান্ডবিল।

তবু রাধেশকেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাগজটা সেই লোকটার পকেট থেকে পড়েছিল ঠিক দেখেছিলেন?

'আজ্ঞে হ্যাঁ, দেশলাই বার করতে গিয়ে কাগজটা পড়ে গেল। পঞ্চুদা তখন সিগারেট ধরাচ্ছেন আর আমি যন্ত্রপাতিগুলো ব্যাগে ভরছি। লোকটা অমন হঠাৎ চলে যাওয়ার পর...'

টাক-মাথা পঞ্চুদা মূল গায়েনের পদ আর রাধেশকে ছেড়ে দিতে রাজি নন। তিনিই আবার শুরু করলেন, 'আমি বললাম আরে, দেশলাইটা না নিয়ে চলে গেল যে! রাধেশ তখন কাগজটা কুড়িয়ে নিয়ে দেখছে। বললাম, দে-দে। পকেটটা তো ভিজে গেছে। শুকনো কাগজটায় মুড়ে রাখি। ভাগ্যিস রেখেছিলাম।'

পঞ্চুদার আগেকার সঙ্গে এখনকার বিবরণের তফাতটুকু মিঃ চৌধুরী আর ধরিয়ে না দিয়ে, কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, বুদ্ধি করে যে রেখেছিলেন তাঁর জন্যে যথেষ্ট ধন্যবাদ। আচ্ছা নমস্কার।'

নমস্কার করে পঞ্চুদা ও তার শাকরেদ বিদায় নেওয়ার পর চেয়ারে একটু ক্লান্তভাবে হেলান দিয়ে মিঃ চৌধুরী বললেন, 'যাই হোক, একটা জিনিস কিন্তু জানা গেল। শিসের সুরটা। গিরি মাঝি লেনের সেই বাড়ির বুড়ো ভদ্রলোকও ওই শিস শোনার কথা বলেছেন। পোশাকটা যে-ভাবে মিলে যাচ্ছে দুজনের বর্ণনায়, তাতে একই লোককে যে এরা দেখেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমি শুধু আশ্চর্য হচ্ছি এই শিস দিয়ে গানের সুর ভাঁজায়। সবেমাত্র ওই রকম একটা পৈশাচিক খুন করে এসে শিস দিয়ে কেউ গানের সুর ভাঁজতে পারে? তাও একটা সস্তা ফিল্মের গানের সুর।'

'ভেবে দেখুন স্যার, সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন আজগুবি!' সার্জেন্ট গুপ্ত মাথা চুলকে বললেন, 'মোক্ষদা-ঠাকরুণ বলে যাঁকে গলায় ওয়াটারপ্রুফের বেল্টের ফাঁস দিয়ে হত্যা করা হয়েছে তাঁর সমস্ত খবরই নেওয়া হয়েছে। কোনও শত্রু কোথাও তাঁর ছিল বলে কেউ অন্তত জানে না। ভদ্রমহিলা সেকালের শিক্ষিত পরিবারে জন্ম। যতদূর জানা গিয়েছে, তাঁর স্বামী এককালে একটি অনাথ আশ্রম চালাতেন। স্বামীর মৃত্যুর পর সে কাজ বহুদিন ছেড়ে দিয়ে এই বাড়িটি লিজ দিয়ে দিনের বেলা একটি সেলাই-টেলাইয়ের স্কুল চালান। স্বামী যা রেখে গেছেন, তার সঙ্গে এই আয়ে তাঁর একরকম চলে যায়। নেহাত উন্মাদ না হলে কেউ এভাবে তাঁকে মারতে পারে—এটা কল্পনা করা যায় না।'

মিঃ চৌধুরী খানিকক্ষণ চুপ করে কী যেন ভাবছেন মনে হল। তারপর তিনি মাথা নেড়ে বললেন, 'না, উন্মাদ হলেও সাধারণ উন্মাদ নয়। সমস্ত ব্যাপারটা বেশ ভেবেচিন্তে করা হয়েছে বলেই মনে হয়। মোক্ষদা দেবী যে সন্ধের পর কিছুক্ষণ ওপরে একেবারে একা থাকেন, নিচে ঝি ছাড়া আর তেমন কেউ যে তখন বাড়িতে থাকে না, এসব মনে হয়

খুনি আগে থাকতেই খবর নিয়েছে। তার পোশাক ও চালচলন থেকে যেটুকু জানা গেছে তাতে পাগলামির কোনও সন্দেহ সহজে করা যায় না। তাছাড়া বদ্ধ উন্মাদ হলেও তার একটা হদিশ এ দুদিনে নিশ্চয়ই পাওয়া যেত। কোনও উন্মাদ আশ্রম থেকে ওরকম কেউ পালিয়েছে বলে এখনও তো জানা যায়নি।'

'আমি সেরকম উন্মাদের কথা বলছি না স্যার। সাধারণ স্বাভাবিক চেহারার মানুষের ভেতরেই কখনও-কখনও ওরকম উন্মাদের লক্ষণ তো প্রকাশ পায়।' সার্জেন্ট গুপ্ত একটু সঙ্কুচিতভাবে নিজের মতটা জানালেন, 'অকারণে যাকে-তাকে খুন করা তখন নেশার মতো হয়ে দাঁড়ায়।'

মিঃ চৌধুরী একটু হেসে বললেন, 'ওরকম খুন বানানো গল্পেই দেখা যায়। তাছাড়া আগেই যা বললাম, খুনি মাত্রেই একরকম পাগল হলেও দেয়ার ইজ মেথড ইন হিজ ম্যাডনেস—বেশ প্ল্যান করা ব্যাপার। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটার কোনও খেই যে পাওয়া যাচ্ছে না!'

হঠাৎ কী ভেবে তিনি যেন একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেন, 'দাঁড়াও-দাঁড়াও। দেশলাই মোড়বার কাগজটা লোকটার পকেট থেকে পড়ে গেছল বললে না?'

'হ্যাঁ স্যার। কিন্তু ওটা তো একটা সাধারণ হ্যান্ডবিল!'

'হ্যাঁ, সাধারণ হ্যান্ডবিলই বুঝলাম, কিন্তু এটা সে যত্ন করে পকেটে রেখেছিল কেন?'

'যত্ন করে যে রেখেছে তাই বা কী করে বুঝছি।' সার্জেন্ট গুপ্ত সবিনয়ে হলেও প্রতিবাদ না করে পারেন না, 'হয়তো আমরা সবাই যেমন করি তেমনি রাস্তায় কারুর কাছে পেয়ে অন্যমনস্কভাবে পকেটে রেখে দিয়েছে।'

যুক্তিটা অগ্রাহ্য করবার নয়। তবু মিঃ চৌধুরী কাগজটা আর একবার ভালো করে পড়ে বলেন, 'বিজ্ঞাপনটা কীসের দেখেছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, একটা হোটেলের হ্যান্ডবিল। কোথায় বাইরে কোন স্বাস্থ্যনিবাসের বিজ্ঞাপন।'

মিঃ চৌধুরী চিন্তিতভাবে বলেন, 'সেইজনেই ওই লোকের পকেটে থাকাটা একটু অদ্ভুত লাগছে না?'

বিজ্ঞাপনটা তিনি জোরে-জোরে পড়েন এবার—'কল্যাণেশ্বরী স্বাস্থ্যনিবাস। মনোরম পরিবেশে বরাকর নদীর তীরে অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর স্থানে বৈদ্যুতিক আলো, টেলিফোন ইত্যাদি সমস্ত নাগরিক সুখ-সুবিধা সমেত আধুনিক হোটেল। মধ্যবিত্তের সুবর্ণ সুযোগ। স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য বাংলাদেশের বাহিরে যাইবার প্রয়োজন নাই। নিজস্ব গাড়িতে স্টেশন হইতে হোটেলে আসা-যাওয়ার ব্যবস্থা।'

বিজ্ঞাপনটা পড়ে মিঃ চৌধুরী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সার্জেন্ট গুপ্তর দিকে তাকান।

'এ হ্যান্ডবিলের কোনও তাৎপর্য নেই বলছ?'

'কিছু হয়তো থাকতে পারে!' সার্জেন্ট গুপ্তকেও একটু ভেবে বলতে হয়, 'হয়তো কোনওদিন এই লোকটি সেখানে ছিল, কিংবা হয়তো এ খুনের পর গা-ঢাকা দেওয়ার জন্যে এই বিজ্ঞাপন দেখে জায়গাটার কথা ভেবেছে। কিন্তু সেখানেই যে সে যাবে বা কখনও গিয়েছিল তার ঠিক কি? এ বিজ্ঞাপন থেকে কোনও সুবিধে এখন আমাদের কি হচ্ছে?'

'না, তা হচ্ছে না।' বলে কাগজটা আবার টেবিলের ওপর রাখতে গিয়ে হঠাৎ চৌধুরী চমকে উঠলেন। বিজ্ঞাপনের উলটো দিকের সাদা পিঠটা চোখের কাছে এনে অত্যন্ত মনোযোগ

দিয়ে খানিকটা দেখে হঠাৎ ব্যস্তভাবে বললেন, 'শিগগির বরাকর পুলিশ স্টেশনকে ফোনে ধরো। আর দেখো ডি-সি ইসমাইল সাহেবকে কোথাও পাও কি না!'

সার্জেন্ট গুপ্ত হঠাৎ এই আদেশে একটু হতভম্ব হয়ে বললেন, 'কেন, কী হল স্যার?'

চৌধুরী অধৈর্যের সঙ্গে বলেন, 'আগে তুমি ফোনটা লাগাও তো, পরে বলছি।'

বিজ্ঞাপনে অতিশয়োক্তি বোধহয় খানিকটা মার্জনীয়।

বিজ্ঞাপনের বিশেষণের সঙ্গে আসল জিনিসের পরিচয় অনেক সময়েই মেলে না এটা আমরা ধরেই নিই। কিন্তু কল্যাণেশ্বরী স্বাস্থ্যনিবাসের বেলা এই সাধারণ নিয়মের সত্যিই একটু ব্যতিক্রম বোধহয় দেখা যায়।

বিজ্ঞাপন যে-ই লিখে থাকুক, স্বাস্থ্যনিবাসটির পরিচয় দিতে বাড়াবাড়ি অন্তত কোথাও করেনি।

বরাকর নদীর ধারেই সত্যিই অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে প্রথম ইংরেজ আমলের থামওয়ালা বেশ বড় একটি বাড়ি।

ঢেউ-খেলানো রাঙামাটির দেশ। দূরে ছোটখাটো পাহাড়ও দেখা যায়। জায়গাটির সবচেয়ে বড় আকর্ষণ তার নির্জনতা। ধারে-কাছে সাত-আট মাইলের মধ্যে একটা-দুটো চাষিদের কুঁড়ে ছাড়া কোনও বসতি নেই।

স্বাস্থ্যনিবাসটির মনোরম পরিবেশ আপাতত অবশ্য আবিষ্কার করা একটু শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পাঁচ-দিন ধরে নাগাড়ে ঝড়-বৃষ্টি চলেছে। মাঠঘাট জলে জলময়। অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে চারিদিক এমন ঝাপসা যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত।

একটিমাত্র যে পাকা রাস্তা দূরের বরাকর শহর থেকে স্বাস্থ্যনিবাসটির সংযোগ রক্ষা করে, তা ইতিমধ্যেই নানা জায়গায় বর্ষার জলের স্রোতে প্রায় অচল হয়ে দাঁড়িয়েছে। বরাকর নদীর জল তার ওপর যেরকম বেড়ে কূল ছাপাবার উপক্রম হয়েছে, তাতে বন্যা হলেই সর্বনাশ।

বরাকর থেকে ভাড়া-করা মোটরে স্বাস্থ্যনিবাসে আসতে-আসতে কণিকা সেই কথাই ভাবছিল।

রাস্তায় এর মধ্যেই দু-জায়গায় আটকে যেতে হয়েছে। মাঠের জল নদীর স্রোতের মতো রাস্তার ওপর দিয়ে বইছে। মোটরের ভেতর পর্যন্ত জল উঠে ইঞ্জিন গেছে বন্ধ হয়ে।

কোনওরকমে ঠেলে-ঠুলে মোটরটাকে সেই জলের স্রোত পার করে নিয়ে গিয়ে আবার চালাতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে ড্রাইভারকে। নেহাত মেয়েছেলে সওয়ারি বলেই সশব্দে সে নিজের বিরক্তি বোধহয় প্রকাশ করেনি। কিন্তু রামসেবকের সঙ্গে বৃষ্টিতে ভিজে সপসপে হয়ে এককোমর জলে মোটর ঠেলবার সময় মনে-মনে ভাগ্যকে অভিসম্পাত দিয়েছে নিশ্চয়ই, এমন দিনে এ রকম ভাড়া জুটিয়ে দেওয়ার জন্যে।

হোটেলে এতক্ষণ কী হচ্ছে তাই বা কে জানে!

ভোরবেলাতেই স্বামী স্টেশন-ওয়াগন নিয়ে কুলটি চলে গেছেন স্টেশন থেকে গোটাকতক পার্সেল খালাস করে আনবার জন্যে।

দশটার ট্রেনে একজন বোর্ডারের আসবার কথা। তাঁকেও সেই সঙ্গে নিয়ে আসবে।

বেলা দুটো পর্যন্ত স্বামীর জন্যে অপেক্ষা করে কণিকা নিজেই ফোন করে বরাকর

থেকে ভাড়াটে গাড়ি আনিয়ে বরাকর গিয়েছিল কয়েকটা অত্যন্ত দরকারি জিনিস কেনার সঙ্গে বাজারটাও সেরে আসবার জন্যে।

তখন বৃষ্টিটা যেন একটু ধরবার আশা দেখা দিয়েছিল। বাইরের পথ-ঘাটের চেহারা যে কী হয়েছে তাও ঠিক আন্দাজ করতে পারেনি।

বেরুবার পর থেকে ঝড় ও বৃষ্টি দুই-ই প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে। বরাকরে কী কষ্টে যে বাজার সেরেছে সে-ই জানে!

দূরে নির্জনে স্বাস্থ্যনিবাস খোলার সুবিধে যেমন, দায়ও তো তেমনি দারুণ। এখন হোটেলের প্রত্যেকটি জিনিস বয়ে এনে মজুত না রাখলে নয়।

খরা-শুকনোর সময় তেমন কোনও ঝামেলা নেই। ফোন করে দিলেও দু-একটা বড় দোকান সব জিনিসপত্র গাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে উপরি ভাড়া ধরে নেয়। কিন্তু এই দুর্যোগে সে দায়িত্ব নিতে কেউ রাজি নয়। কণিকাকে তাই নিজেকেই আসতে হয়েছে।

নিজেকে আর কোন কাজটা না দেখতে হয়!

স্বামী অলস কি অনিচ্ছুক নয়, কিন্তু কেমন একটু অগোছালো অন্যমনস্ক। কাজের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যায় না।

এই আজকেই স্টেশন-ওয়াগন নিয়ে বেরিয়ে কী গোল বাধিয়েছেন কে জানে!

কিন্তু এ দুর্যোগ এইভাবে চলতে থাকলে তাদের ব্যবসার যে দফা রফা।

পুজোর পর এই সময়টাই এধরনের স্বাস্থ্যনিবাসের মরশুম।

এখনও পর্যন্ত মাত্র তিনজন বোর্ডার এসেছেন। আর জন-কয়েকের আজকের মধ্যে আসবার কথা, তাঁরা কেউ এসে পৌঁছাতে পারবেন বলে তো ভরসা হয় না।

যে তিনজন ইতিমধ্যে এসেছেন তাঁদের যত্নের ত্রুটি অবশ্য যাতে না হয় তার ব্যবস্থা সে প্রাণপণে করতে প্রস্তুত।

এই ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করে নইলে বরাকরে বাজার করতে আজ সে বেরুত না।

কিন্তু তাতেই কি তাঁদের সন্তুষ্ট করা যাবে?

প্রথম নতুন স্বাস্থ্যনিবাসে এসে তাঁরা খুব ভালো ধারণা নিয়ে যাবেন বলে মনে হয় না।

অথচ বাইরের বিজ্ঞাপনের চেয়ে যাঁরা নিজেরা থেকে গেছেন তাঁদের মতামতের দামই যে এ ব্যবসাতে বেশি তা কণিকা ভালো করেই বোঝে।

এখানে স্বাস্থ্যনিবাস করবার পরিকল্পনাটা তারই।

লাহিড়ী প্রথমে তো কথাটাকে আমলই দিতে চায়নি।

'তুমি পাগল হয়েছ কণিকা! স্বাস্থ্যনিবাস—মানে হোটেল করা কি চাট্টিখানি কথা! বিশেষ করে বাংলার ভেতরে ওই বেপোট জায়গায় লোকে পয়সা খরচ করে থাকতে যাবে কেন? রাঁচি, হাজারিবাগ, পুরী না যাক, তারা অন্তত মধুপুর, যশিডি যাবে।'

'তেমন স্বাস্থ্যনিবাস করলে এখানেও যাবে। আর বাংলার ভেতরে বলেই তো আরও যাওয়া উচিত।' কণিকা যুক্তি দেখিয়েছে, 'বাংলার ভেতরে ভালো স্বাস্থ্যনিবাস কেউ কোথাও করেছে! আছে তো যাওয়ার জায়গা ওই এক দীঘা। সেখানেও আমাদের মতো সুবিধে পাবে কোথায়?'

কণিকা যে সুবিধের কথা বলেছে সেটা এরকম জায়গায় একটু দুর্লভ সন্দেহ নেই। আগেকার এক বিদেশি কয়লার খনির ইংরেজ ম্যানেজারের প্রাণে একটু কবিত্ব ছিল

বোধহয়। এই নির্জন জায়গায় ছোটখাটো একটি বিলিতি ধরনের বাড়ি তিনি কোম্পানির পয়সাতেই বানিয়েছিলেন, কোম্পানির যারা ম্যানেজার হবে তাদের থাকবার জন্যে।

তখন কয়লার খনিতে ধুলোমুঠো সোনা হচ্ছে। শৌখিন ম্যানেজার বাড়িটিতে বিজলি-বাতি টেলিফোনের বন্দোবস্ত তো করেইছিলেন, তার ওপর বড় রাস্তা থেকে বাড়িতে আসবার একটা নিজস্ব রাস্তা তৈরি করিয়ে নিয়েছিলেন।

কিছুকাল আগে নানা অবস্থা-বিপর্যয়ে সে কোম্পানি লাটে উঠেছে। সে কোম্পানির পাততাড়ি গুটোবার ভার যাদের হাতে, তারা কোম্পানির অন্যান্য সম্পত্তির সঙ্গে বাড়িটি বিক্রির চেষ্টা করেছে। কিন্তু ব্যবসার হালচাল ও-অঞ্চলে তখন বদলে গেছে। শুধু কবিত্বের খাতিরে অত দূরের অতবড় বাড়ি কেনবার গরজ কারুর হয়নি।

নতুন মুরুব্বিদের বাধ্য হয়েই তারপর বাড়িটি ভাড়া দেওয়ার জন্যে বিজ্ঞাপন দিতে হয়েছে। সে বিজ্ঞাপনে তেমন কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি। বাড়িভাড়ার পরিমাণও তাই ক্রমশ কমে এসেছে। এই সময়ে কণিকার স্বামী প্রবীর লাহিড়ীর-ই একদিন বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়ে।

'দেখেছ কণিকা, দুটো ঘরের জন্যে আমরা হা-পিত্যেশ করে মরছি, আর বড়-বড় দশখানা শোয়ার ঘর হল-বৈঠকখানা, রান্নাঘর নিয়ে গোটা একটা বাড়ি খালি পড়ে আছে!'

'কোথায়, কোথায়?' বলে কণিকা উদগ্রীব হয়ে স্বামীর হাতেব কাগজটার দিকে হাত বাড়িয়েছে।

একটু মজা করবার জন্যেই প্রবীর কথাটা বলেছিল। কণিকার করুণ ব্যাকুলতা দেখে কিন্তু মায়া হয়েছে তার। তাড়াতাড়ি হেসে বলেছে, 'আরে না, ঠাট্টা করছিলাম। এ-বাড়ি হল জনমানবহীন তেপান্তরে। নইলে অতবড় বাড়ি মাসে একশো টাকা ভাড়া হিসেবে লিজ দিতে চায়!'

কণিকার আগ্রহ কিন্তু তাতেও কমেনি। প্রবীরের হাত থেকে কাগজটা কেড়ে নিয়ে বিজ্ঞাপনটার ওপর চোখ বুলিয়ে সে খানিকক্ষণ গম্ভীরভাবে কী ভেবেছে, তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলেছে, 'তুমি চিঠি লেখো এখুনি। ওবাড়ি আমরাই ইজারা নেব।'

'মানে?' কলকাতা শহরে বাসার খোঁজে হয়রান হয়ে স্ত্রীর মাথা খারাপ হয়েছে বলেই প্রবীরের সন্দেহ হয়েছে।

'মানে ওই বাড়িতেই আমরা থাকব—আর, আর—' কণিকা যেন একটু দ্বিধা করে, তারপর অতিরিক্ত জোরের সঙ্গেই বলেছে, 'ওখানে একটা হোটেল—মানে একটা স্বাস্থ্যনিবাস করব নতুন ধরনের।'

তারপর যে তর্ক হয়েছে তার আভাস আগেই কিছুটা দেওয়া হয়েছে। শেষ পর্যন্ত কণিকা কিন্তু প্রবীরকে এ পরিকল্পনায় সায় দিতে বাধ্য করেছে নানান যুক্তিতে।

যুক্তিগুলো তাদের তখনকার অবস্থার দরুনই অকাট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রবীরের পক্ষে।

প্রথমত, প্রায় দেড় বছর আগে আকস্মিকভাবে বোম্বাই শহরে বিয়ে হওয়ার পর থেকে তারা দুজনে দেশে ফিরে এতদিনেও একটা মনের মতো বাসা সংগ্রহ করতে পারেনি।

কোনও একটি হোটেলেই তারা সেই কারণে একটা কামরা নিয়ে আছে।

দ্বিতীয়ত, বিয়ের পর কণিকার কথায় মার্চেন্টনেভির চাকরি ছাড়া অবধি দেশে প্রবীর কোনও কাজ জোগাড় করতে পারেনি।

প্রবীরের অবস্থা এমনিতে অবশ্য ভালো। বাপ-মায়ের একমাত্র ছেলে। মা ছেলেবেলায়

মারা গেছেন। কিছুদিন আগে সওদাগরি জাহাজে অস্ট্রেলিয়ায় থাকার সময়ই পিতার মৃত্যুর খবর সে পেয়েছে। অন্য কিছু না রেখে যান প্রবীরের বাবা, মোটা একটা ইনসিওরেন্সের টাকা ছেলের নামে লিখে গেছেন। চাকরি না থাকলে সুতরাং তার আর্থিক দুর্ভাবনার কোনও কারণ নেই।

এর ওপর অপ্রত্যাশিতভাবে ধনী এক মাতামহের উইলে সম্প্রতি কণিকার বেশ ভালোরকম একটা মাসোহারার ব্যবস্থা হওয়ায় এদিক দিয়ে দুজনেই নিশ্চিন্ত।

কিন্তু কাজ না করে চুপ করে বসে থাকা যে পুরুষের পক্ষে ক্ষতিকর এটা কণিকা কিছুদিন ধরে ভালো করেই বুঝতে পারছে।

বরাকরের ধারে গিয়ে একটা স্বাস্থ্যনিবাস-গোছের গড়ে তুললে তাদের রথ-দেখা কলা-বেচা দুই-ই হয়ে অনেক সমস্যাই এক সঙ্গে মিটে যায়।

নিজেদের চমৎকার থাকবার জায়গা তো মেলেই, সেই সঙ্গে প্রবীরও করবার মতো কাজ পায়, আর একা-একা অত দূরে থাকা যাতে একঘেয়ে না হয় সেই জন্যেই এমন কিছু সঙ্গীর ব্যবস্থা হয়, যারা নিজেব পয়সা খরচ কবে সঙ্গ দিতে আসবে।

না, সমস্ত সমস্যার এর চেয়ে ভালো সমাধান আব হতে পারে না। কণিকার আগ্রহে মাস-ছয়েকের মধ্যে বাড়ি লিজ নেওয়া থেকে স্বাস্থ্যনিবাসের অন্য সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে গিয়ে, বিজ্ঞাপন হ্যান্ডবিল পর্যন্ত ছাড়া হয়ে গেছে।

তারপব কণিকাকে পরীক্ষা করবাব জন্যেই যেন স্বাস্থ্যনিবাস ঠিক খোলার দিন থেকেই এই দুর্যোগ।

কল্যাণেশ্বরী স্বাস্থ্যনিবাসেব একটি বিশেষ নিযম কণিকা এই করেছিল যে, সাধারণ হোটেলের মতো আজ এসে কাল সেখান থেকে চলে যাওয়া যাবে না। অন্তত সাতদিনের কম কোনও বোর্ডারের সেখানে থাকবার নিয়ম নেই। মোট বোর্ডারের সংখ্যাও পরিমিত। তিনটি সিঙ্গল-সিটেড ও ছটি ডবল-সিটেড ঘরে সবসুদ্ধ পনেরোজনের বেশি বোর্ডার কখনও নেওয়া হবে না। এই কণিকার ব্যবস্থা।

কণিকার পরিকল্পনা যে খুব আজগুবি নয়, বিজ্ঞাপন ও হ্যান্ডবিল ছাড়বার কিছুদিন বাদেই তা টের পাওয়া গেছে।

তিনজন চিঠি লিখে বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়েছেন, চাবজন শেষপর্যন্ত আসছেন বলে জানিয়েছেন।

প্রথম বোর্ডার এসেছেন গত পরশুদিন।

বয়স্কা মহিলা। এককালে বুঝি স্কুল-ইন্সপেকট্রেস ছিলেন। বিয়ে-থা করেননি, কিন্তু সাজ-পোশাকে এখনও একটু বাড়াবাড়ি আছে। কথাবার্তা চালচলনে দুনিয়ায় কেউই যেন তাঁর সমকক্ষ নয় এমনি একটা অহঙ্কাবের আভাস।

বৃষ্টি তখন দুদিন ধরে পড়ছে। স্টেশন-ওযাগনে অত্যন্ত সমাদর করে নিয়ে আসা সত্ত্বেও বাড়ির গেটের ভেতর ঢুকেই তিনি কটু সমালোচনা শুরু করেছেন, 'ছিঃ-ছিঃ, এমন জানলে আমি আগাম টাকা পাঠিয়ে এখানে আসি! শুনেছিলাম নদীর ধারে বাড়ি। সারা রাস্তাই তো দেখলাম নদী আর নালা!'

কণিকা কোনওরকমে তাঁকে ঠান্ডা করে তাঁর জন্যে বরাদ্দ ঘরে নিয়ে গেছে। ঘরের চেহারা দেখে খুঁত ধরবার মতো তখুনি কিছু না পেয়ে তিনি বলেছেন, 'দেখুন একটা কথা

আপনাদের আগেই জানিয়ে দিই। খাবার-দাবার যা খাওয়াবেন তা তো এই তেপান্তরের মাঝখানে জেলখানা দেখেই বুঝতে পারছি, কিন্তু প্রত্যেকদিন চারবার করে আমায় চা দিতে যেন ভুল না হয়। একবার ভোর পাঁচটায়, তারপর সকাল সাতটায়, তারপর বিকেল তিনটেয়, আবার সন্ধে ছটায়। যান, টুকে রাখুন গিয়ে পাঁচটা-সাতটা-তিনটে-ছটায়।'

'আচ্ছা তাই হবে।' বলে কণিকা চলে আসবার জন্যে ফিরতেই আবার পেছন থেকে ডাক পড়েছে, 'শোনো।'

কণিকা একটু বিরক্ত মুখেই ফিরে দাঁড়ালেও সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ভদ্রমহিলা বলেছেন, 'তোমার মতো ওই বয়সের মেয়েকে আপনি আজ্ঞে আমি বলতে পারব না। তবে তোমাদের পরিচয়টা একটু জানা দরকার। তোমার নামটা কী?'

'কণিকা।'

'গাড়িতে যিনি নিয়ে এলেন তিনি তোমার কে হন?' বিরক্তির সঙ্গে হাসিও পেয়েছে এবার কণিকার এই জেরার ধরনে। একবার ইচ্ছে হয়েছে বলে, কেউ নয়, বন্ধু আর এই হোটেলের অংশীদার।

তারপর অস্থানে রসিকতার লোভ সংবরণ করে বলেছে, 'আমি ওঁর স্ত্রী।'

'ও!' ভদ্রমহিলা যেন অন্য কিছু আশা করেছিলেন, এইভাবে বললেন, 'কতদিন বিয়ে হয়েছে?'

'বেশিদিন নয়।' বলে কথাটা এড়াবার জন্যেই কণিকা বলেছে, 'আপনাব স্নানেব গরম জল যদি লাগে তো বলুন, আমি গিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

কিন্তু তবুও তখুনি নিষ্কৃতি মেলেনি।

'কী শীত, কী গ্রীষ্ম আমি ঠান্ডা জলে স্নান করি।' বলে কণিকাকে যেন স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষা দিয়ে ভদ্রমহিলা বলেছেন, 'আমার নামটাও তোমাদের জানা দরকাব। আমি মিস ধর, এক্স স্কুল-ইনস্পেকট্রেস, মজঃফরপুর। আমায় মিস ধর বলেই ডাকবে।'

'যে আজ্ঞে!' বলে কণিকা সিঁড়ি দিয়ে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি নেমে আসতে-আসতে স্বাস্থ্যনিবাস চালানোর প্রথম অভিজ্ঞতায় বেশ একটু চিন্তিতই হয়েছে।

মিস ধরের পর সন্ধেবেলা নিজেই ট্যাক্সি ভাড়া করে এসেছেন ডাঃ জনার্দন বাজপেয়ী।

বয়সে চল্লিশের চেয়ে পঞ্চাশের কাছাকাছি হলেও বেশ শক্তসমর্থ জোয়ান পুরুষ। একটু বেশি গম্ভীর। কথাবার্তা মনে হয় নেহাত দরকার ছাড়া বলেন না। আর যখন বলেন তখন একটু অদ্ভুতই শোনায়।

প্রবীরই তাঁকে তাঁর ঘরে নিয়ে গেছে। কিছু চাই কি না জিজ্ঞাসা করায় মুখের পাইপটা নামিয়ে যা বলেছেন, তাতে প্রবীর প্রথমটা চমকেই গেছে।

ডাঃ বাজপেয়ী এক গ্লাস জল চাওয়ার মতো বলেছেন, 'একটু শান্তি।'

প্রবীর একটু বিমূঢ়ভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে তারপর হেসে ফেলেছে। বলেছে, 'আশা করি তা এখানে পাবেন।'

ডাঃ বাজপেয়ীর মুখে কিন্তু হাসির কোনও আভাস দেখা যায়নি। গম্ভীরভাবে বলেছেন, 'আপনার কথাই সত্য হোক।'

প্রবীর নেমে এসে কণিকাকে সবিস্তারে সব শুনিয়ে বলেছে, 'স্বাস্থ্যনিবাসের বদলে উন্মাদ আশ্রম নাম দেওয়াই বোধহয় উচিত ছিল আমাদের। যা সব নমুনার আমদানি হচ্ছে।'

কিন্তু আরও এক নমুনা তখনও দেখতে বাকি।

তিনি এলেন রাত প্রায় নটার পর। তখনও সমানে বৃষ্টি পড়ছে।

মিস ধরের শরীর খারাপ বলে তাঁর খাবার তাঁর ঘরেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ডাঃ বাজপেয়ী, প্রবীর ও কণিকা তিনজনে নিচের খাওয়ার ঘরে একসঙ্গে বসে খেয়েছেন।

খাওয়া নামেই একসঙ্গে, নইলে প্রত্যেকেই যেন নিজের-নিজের খোলসের মধ্যে ঢাকা। কারুর সঙ্গে কারুর কোনও কথা হয়নি।

নিজেরা থাকলে কণিকা ও প্রবীর অবশ্য এভাবে চুপ করে নিশ্চয়ই থাকত না, কিন্তু ডাঃ বাজপেয়ীর গম্ভীর নীরবতার মর্যাদা রাখবার জন্যেই তাদেরও মুখ বন্ধ করে থাকতে হয়েছে তাঁর শাস্তির বায়না মেটাতে।

খাওয়া-দাওয়ার পর ডাঃ বাজপেয়ী বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁর ঘরে উঠে গেছেন। রামসেবককে টেবিল পরিষ্কার করবার হুকুম দিয়ে কণিকা ও প্রবীর তাদের নিজের ঘরে গিয়ে বসেছে।

এ ঘরটা নিচের তলায় তারা ইচ্ছে করেই রেখেছে নিজেদের জন্য। রান্না ও ভাঁড়ার ঘর কাছে হওয়ার দরুন শুধু কাজের সুবিধে হয় বলেই নয়, এখান থেকে গেট পার হয়ে বাইরের রাস্তা অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায় বলে।

এই বর্ষার রাত্রে অবশ্য সেখানে দেখবার কিছু নেই।

কাচের শার্সি বৃষ্টির জলের ছিটেতে ঝাপসা। গাড়ি-বারান্দার বাতিটার আলোয় ঝিকমিক করে বাইরে নিরবচ্ছিন্ন বৃষ্টির একটা পর্দা যেন শুধু দুলে-দুলে নেমে যাচ্ছে মনে হচ্ছে।

আরাম-কেদারাটায় গা এলিয়ে সিগারেটটায় টান দিয়ে প্রবীর কী যেন বলতে যাচ্ছিল। হঠাৎ চমকে উঠে বসে সে বলেছে, 'কে যেন আসছে না?'

ঝাপসা শার্সির ভেতর দিয়ে যেটুকু দেখা গেছে তাতে বাইরের বৃষ্টির ঝিকমিকে পরদার ওপর দিয়ে কিছু একটা সরে গেল বলেই মনে হয়েছে।

কণিকা তাড়াতাড়ি উঠে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে কিন্তু সেখান থেকে আর কিছু দেখা যায়নি।

পরক্ষণেই বাইরের দরজার ভারী কড়া সজোরে নাড়ার শব্দ পাওয়া গেছে।

সত্যিই কেউ তাহলে এই দুর্যোগের মধ্যে এত রাত্রে এসে হাজির হয়েছে।

কণিকা জানলার কাছে যাওয়ার আগেই গাড়ি-বারান্দার তলায় সে পৌঁছে গেছে বলে বোধহয় কিছু দেখা যায়নি।

কিন্তু গাড়ি-টাড়ির কোনও শব্দ তো পাওয়া যায়নি। মানুষটা এই অন্ধকার ঝড়-বৃষ্টির রাত্রে এরকম দুর্গম পথে এল কী করে?

এই কথাই ভাবতে-ভাবতে প্রবীরের সঙ্গে বাইরের হলে গিয়ে দাঁড়িয়েছে কণিকা।

প্রবীর ভারী লোহার খিলটা নামিয়ে দরজা খোলার সঙ্গে-সঙ্গে বাইরের ঝোড়ো হাওয়ার একটা দমক বৃষ্টির ছাটে ভেতরের হলের অনেকখানি পর্যন্ত ভিজিয়ে দিয়েছে।

আগন্তুক ভেতরে পা দিয়ে হাতের সুটকেসটা নামিয়েই প্রবীরের সঙ্গে দরজা বন্ধ করবার দুঃসাধ্য ব্যাপারে নিজে থেকে যোগ দিয়েছে।

প্রবল ঝোড়ো হাওয়ার বিরুদ্ধে দরজা বন্ধ করা সোজা ব্যাপার নয়। দুজন জোয়ান পুরুষকে বেশ নাজেহাল হতে হয় সেটা বন্ধ করে খিলটা লাগাতে।

কণিকা লোকটিকে এতক্ষণ ধরে লক্ষ করেছে। দোহারা চেহারা, মাঝারি গোছের

লম্বা। প্রায় প্রবীরেরই সমান। মাথায় কানঢাকা বর্ষাতি-টুপি, গায়ে বেশ দামি-লম্বা ওয়াটারপ্রুফ, পায়ে গামবুটস।

দরজা বন্ধ হওয়ার পর মাথার টুপিটা খুলতেই একরাশ এলোমেলো ঈষৎ কটা চুল-যেন ছাড়া পেয়ে লাফিয়ে ওঠে। নাটকীয় ভঙ্গিতে সেই টুপিটা এক হাতে দুলিয়ে আগন্তুক বলেছে, 'আপনাদের এই অসময়ে জ্বালাতন করবার জন্যে মাপ চাইছি। অধীনের নাম হল মধুসূদন দত্ত।'

শুধু বলার ধরনে নয়, নামটা শুনেও কণিকার হাসি পেয়েছে। শুধু ভঙ্গিতেই নয়, চেহারায় ও গলাতেও মধুসূদনের ছেলেমানুষিটা এখন ধরা পড়ে যায়। মুখটা টুপিতে ঢাকা থাকার দরুনই গোড়ায় বোধহয় কেমন একটু অদ্ভুত লেগেছিল।

কেউ কিছু বলবার আগেই মধুসূদন একগাল হেসে বলেছে, 'নামটা শুনে মেঘনাদবধ কাব্য যদি আপনাদের মনে পড়ে গিয়ে থাকে তাহলে আমি নাচার। বাপ-মার নামকরণের ভুলে সব জায়গায় এই লজ্জাই আমায় পেতে হয়। তাঁরা অনেক আশা করে হয়তো ও-নাম রেখেছিলেন, কিন্তু তাঁদের পুত্রটি যে একটা ছড়া কাটতেও শিখবে না তা তাঁরা কী করে জানবেন। হ্যাঁ, আসল কথাই ভুলে গেছি জিজ্ঞাসা করতে। আমি ঠিক জায়গায় এসেছি তো? এইটিই তো কল্যাণেশ্বরী স্বাস্থ্যনিবাস—স্বাস্থ্যোদ্ধার বাংলাদেশেই করুন—যার ধুয়া! ঝড় বৃষ্টি অন্ধকারে সাইনবোর্ড-টোর্ড কিছু দেখতে পাইনি কিনা!'

'না দেখতে পেলেও ভুল জায়গায় আসা বোধহয় সম্ভব ছিল না।' কণিকা হেসে বলেছে, 'কারণ এ তল্লাটে দশ মাইলের মধ্যে আর কোঠাবাড়িই নেই।'

'তার মানে চোখ বুজেও চলে আসতে পারতাম বলছেন? তা একরকম তাই এসেছি।' বলে মধুসূদন হেসেছে।

প্রবীর এতক্ষণ কোনও কথা বলেনি। এবার যেন একটু অপ্রসন্নভাবেই জিজ্ঞাসা করেছে, 'কিন্তু আপনি এলেন কী করে?'

'একরকম উড়েই এসেছি ভেবে নিতে পারেন।' বলে নিজের রসিকতায় নিজেই সজোরে হেসেছে মধুসূদন।

রসিকতাটা ঠিক উপভোগ না করে প্রবীর আবার গম্ভীরভাবে বলেছে, 'আপনার গাড়ি-টাড়ির আওয়াজ পাইনি কিনা, তাই জিজ্ঞাসা করছি।'

'না, আপনাদের আর রহস্যের মধ্যে রাখা উচিত নয়। গাড়িতেই আমি এসেছি। তবে মাইলখানেক দূরে গাড়িটা হঠাৎ বেঁকে বসল কিনা তাই সুটকেসটা নিয়ে হেঁটে আসা ছাড়া আর উপায় রইল না।'

'আপনার আর সব জিনিস কি গাড়িতেই পড়ে রইল!'

'আর সব জিনিস!' প্রবীরের প্রশ্নে যেন একটু অবাক হয়েই মধুসূদন বলেছে, 'আর সব জিনিস আমার কোথা থেকে আসবে! আমার যা কিছু সব এই সুটকেসে।'

অবাক হয়ে প্রবীর কিছু বলবার আগেই কণিকা বলেছে, 'কিন্তু এই দরজায় দাঁড়িয়ে কতক্ষণ এমন আলাপ করবেন! আসুন, আপনাকে আপনার ঘর দেখিয়ে দিই।'

'ধন্যবাদ।' বলে সুটকেসটা তুলে নিয়ে মধুসূদন কণিকার পিছু-পিছু সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে গিয়ে হঠাৎ থেমে প্রবীরের দিকে চেয়ে হেসে বলেছে, 'এক্ষুনি যেন ঘুমোতে যাবেন না। সুটকেসটা রেখেই আপনাদের আবার বিরক্ত করতে আসছি।'

প্রবীর কিছু উত্তর দেয়নি, কিন্তু হঠাৎ লোকটার প্রতি কেন বলা যায় না, কেমন একটা বিদ্বেষই যেন অনুভব করেছে।

মধুসূদন তারপর সে রাত্রে কিন্তু বিরক্ত করতে আর আসেনি। কণিকা খানিক বাদে নেমে আসবার পর প্রবীর তার অপ্রসন্নতাটুকু না লুকিয়েই জিজ্ঞাসা করেছে, 'কি, তোমার সিনেমা-হিরোটি কীরকম মনে হচ্ছে?'

'আমার সিনেমা-হিরো!' কণিকা ভুরু কুঁচকে প্রবীরের দিকে তাকিয়েছে, তারপর হেসে ফেলে বলেছে, 'ও! মুধুসূদনের কথা বলছ! বলো মহাকবি, সিনেমা-হিবো বলছ কেন?'

'সিনেমা-হিরোর চার্মিং পার্সোনালিটি দেখে বলছি। তা তিনি বিরক্ত করতে বেরুলেন না যে বড়?'

'না, আমিই বারণ করলাম। বললাম, এই ঝড়-বৃষ্টিতে এতখানি হেঁটে এসেছেন। আজ রাতটা বিশ্রাম করুন। আপনার খাবার ওপরে দিয়ে যাচ্ছি।'

হাতের সিগারেটটায় শেষ টান দিয়ে সেটা অ্যাশট্রেতে ঘষে নেভাতে-নেভাতে একটু যেন তিক্তস্বরে প্রবীর বলেছে, 'তুমি আবার ওপরে যাবে খাবার দিতে। এটা অতিথি-সৎকারের একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?'

'উপায় কি বলো! চাকর-বাকরদের তো ছুটি দিয়ে দিয়েছি। তারা খাওয়া-দাওয়া সেরে চলে গেছে। এখন এই বৃষ্টিতে বাগান দিয়ে তাদের কোয়ার্টারে ডাকতে যাওয়ার চেয়ে নিজে দিয়ে আসাই সুবিধের নয় কি!'

'কিন্তু তিনি নিজে নেমে এসে খেয়ে গেলেই বা দোষ কী ছিল!' প্রবীর কণিকার যুক্তি মানতে না পেরে বলেছে।

'দোষ ছিল এই যে এখন এসে বকবক করে আমাদের কতক্ষণ জাগিয়ে রাখত কে জানে! কী বকবক করতে পারে দেখেছ তো!'

'হুঁ'—বলে প্রবীর এবার চুপ করেছে।

কণিকা নিজে থেকেই বলেছে, 'ছেলেটা কিন্তু ভারি আমুদে ভালোমানুষ, বাপু। নিজে থেকেই বললে, এত রাত্রে আমার খাওয়ার জন্যে যেন ব্যস্ত হবেন না, কালিয়া-পোলাও যা হোক দুটো দিয়ে যান, তাতেই আমার চলবে। বললাম,—অত সস্তা জিনিস আমরা রাখি না, তার বদলে খানিকটা রুটি, মাখন আর জ্যাম দিয়ে যাচ্ছি, হবে তো? বললে খুব হবে।'

হঠাৎ একটু সন্দিগ্ধ হয়ে কণিকা থেমে জিজ্ঞাসা করেছে, 'কি গো, ঘুমিয়ে পড়লে এরই মধ্যে!...'

পরের দিন মধুসূদনের আরও নতুন পরিচয় পাওয়া গেছে। সকালবেলাই একটা পাজামা-পাঞ্জাবি পরে নিচে নেমে একেবারে রান্নাঘরে এসে হাজির। 'কী রাঁধছেন কণিকা দেবী, আমি একটু সাহায্য করতে পারি?'

প্রবীর স্টেশন-ওয়াগন নিয়ে বেরুবার আগে তখন কণিকার কাছে কুলটি থেকে আরও কিছু আনবার আছে কি না জানতে এসেছে।

বিরক্তিটা গোপন না করেই সে বলেছে, 'সাহায্য করবার যদি অত আগ্রহ থাকে তাহলে আমার সঙ্গে আসুন না। কুলটি পর্যন্ত যাচ্ছি। সারা রাস্তা অনেক কিছু সাহায্য করতে পারবেন।'

মধুসূদন প্রবীরের শ্লেষ যেন টেরই পায়নি। হাসিমুখে বলেছে, 'ওরে বাবা, এই বৃষ্টিতে সেই কুলটি!' গাড়ি হয়তো মাঝপথেই কোথাও বিগড়ে আটকে থাকবে। আমি ওসব বীরত্বের মধ্যে নেই। আর আমি শুধু রান্নায় সাহায্য করতেই ভালোবাসি।'

'বুঝেছি!' প্রবীর বেশ একটু বিদ্রুপের সুরেই বলেছে, 'আপনার বীরত্ব শুধু হেঁসেলেই আপনি দেখাতে পারেন! আচ্ছা, আমি চললাম কণা, তোমার হেঁসেলের কাজে তো মস্ত সহায় পেয়েছ। রান্নাবান্নাগুলো আজ ভালোই হবে আশা করি।'

প্রবীর বেরিয়ে যেতে মধুসূদন হেসে বলেছে, 'আপনার স্বামীর আজ বেরুবার ইচ্ছা ছিল না বলে মনে হয়!'

কথাটা কণিকার কেমন যেন অবান্তর মনে হয়েছে।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার সময় পর্যন্ত প্রবীর ফেরেনি।

কণিকাকে আর সকলের সঙ্গে খেতে বসতে হয়েছে। টেবিলে তারা চার জন। মিস ধর আজ অনুগ্রহ করে সকলের সঙ্গে খেতে রাজি হয়েছেন।

খাওয়ার টেবিল একাই মাত করে রেখেছে মধুসূদন। সেসময়ে এমনিতে তার আমুদে স্বভাব ভালোই লেগেছে কণিকার, কিন্তু এক-একবার যেন মাত্রা ছাড়িয়ে যায় বলে মনে হয়েছে।

খাওয়ার টেবিলে সেই ভূতের ভয়ের ব্যাপারটা নিয়ে মধুসূদন যে ধরনের রসিকতা করেছে কণিকার তা ভালো লাগেনি।

কথাটা মিস ধরই তুলেছেন, 'এ রকম ভূতুড়ে বাড়িতে হোটেল খোলার কোনও মানে হয় না।'

'ভূতুড়ে বাড়ি!' কণিকা অবাক হয়ে বলেছে।

চিরনীরব ডাঃ বাজপেয়ীও প্লেট থেকে মুখ তুলে তাকিয়েছেন।

মধুসূদন গম্ভীর হওয়ার ভান করে করে জিজ্ঞাসা করেছে, 'ভূত-টুত কিছু দেখেছেন নাকি সত্যি! আমি জানতাম এ বাড়িতে ভূত না থেকেই পারে না। আপনার ভাগ্যি ভালো আগেই দেখে ফেললেন। যাক, তাহলে তো এ বাড়ির তুলনা নেই।'

মধুসূদনের দিকে ভ্রূকুটি করে মিস ধর বললেন, 'না, ভূত-টুত এখনও দেখিনি। কিন্তু সারারাত অদ্ভুত সব আওয়াজ শুনেছি। একবার তো মনে হল কে যেন আমার দরজাটা খোলবার চেষ্টা করছে।'

কণিকা একটু হেসে বলেছে, 'ঝড়-বৃষ্টিতে ওরকম আওয়াজ তো স্বাভাবিক। আর এ-বাড়ির যা সব মজবুত দরজা, ভূতের হাতে কুড়ুল না থাকলে খোলা সম্ভব নয়।'

'কিন্তু কুড়ুল দিয়েই যদি কেউ খোলে।' মিস ধর তর্কে হারতে রাজি হননি, 'যা জন-মনিষ্যিহীন জায়গা, এখানে একদল ডাকাত এসে আমাদের খুন করে রেখে গেলেই বা রুখবে কে!'

'আমি তো অন্তত নয়।'

মধুসূদনের কথার ধরনে আর মুখ-চোখের মজার ভঙ্গিতে কণিকা হেসে ফেলেছে।

মিস ধর আরও বিরক্ত হয়ে বলেছেন, 'এ হাসি-ঠাট্টার ব্যাপার নয়। এখানে ডাকাত পড়া কি এমন অসম্ভব? এই তো কলকাতা শহরেই কদিন আগে সন্ধেবেলা কীভাবে একজনকে খুন করেছে, পড়েছ।'

কণিকা আগের দিন কাগজে খবরটা পড়েছিল, বললে, 'সে তো কোনও পাগলের কাজ। নইলে ওই নিরীহ প্রৌঢ়াকে অমন গলায় ফাঁস দিয়ে কেউ অকারণে মারতে পারে?'

'অকারণে কেন বলছেন!' মধুসূদন বলেছে, 'হয়তো বুড়ির ঘরে মোহরের ঘড়া লুকোনো ছিল।'

'না, পুলিশ সেরকম প্রমাণ পায়নি।' ডাঃ বাজপেয়ী তাঁর নীরবতা ভেঙে মন্তব্য করায় সবাই অবাক হয়েছে।

'পুলিশ কী পেয়েছে তা কি সবাইকে জানায়?' মধুসূদন হালকা সুরে বলেছে, 'নির্ঘাত বুড়ির লুকোনো পয়সাকড়ি ছিল, আর নয় বুড়ি কোনও চোরাই ব্যবসার মালিক, নাম ভাঁড়িয়ে ওই গিরি মাঝি লেনে ছিল। শত্রুপক্ষের কেউ এসে দিয়েছে সাবাড় করে। যাক, বুড়ি বেশ আরামেই গেছে।'

মিস ধর চটে উঠে বলেছেন, 'গলায় ফাঁস দিয়ে তাকে মারল, আর বলছ আরামে গেছে!'

'হ্যাঁ, ফাঁস দিয়ে মরার মজা জানেন না বুঝি। ভারি আরাম!' বলে মধুসূদন যেভাবে হাসতে-হাসতে গলায় ফাঁস লেগে মৃত্যুর বৈজ্ঞানিক ডাক্তারির বিবরণ যা দিয়েছে কণিকার কাছে তা অত্যন্ত বিসদৃশই লেগেছে।

মিস ধর বিরক্ত হয়ে টেবিল ছেড়ে উঠে গেছেন।

ডাঃ বাজপেয়ী পর্যন্ত সবিস্ময়ে মধুসূদনের দিকে তাকিয়েছেন।

ঝড়জলের ভেতর নানা জায়গায় মোটর প্রায় নৌকোর মতো চালিয়ে ড্রাইভার কণিকাকে যখন স্বাস্থ্যনিবাসে পৌঁছে দিল তখন প্রায় সন্ধ্যা।

তখনও প্রবীর ফেরেনি দেখে কণিকা বেশ একটু চিন্তিতই হয়ে পড়ল।

কোনও কারণে আটকে গেলে প্রবীরের তো ফোন করাও উচিত ছিল। কেন যে সে তা করেনি কে জানে!

উদ্বিগ্ন হয়ে কণিকা কুলটির একটি বড় দোকানে নিজেই ফোন করে খোঁজ নিলে।

কিন্তু সেখানেও কোনও হদিশ পাওয়া গেল না। প্রবীর সেখানে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু বেলা এগারোটাতেই দোকান থেকে জিনিসপত্র নিয়ে সে বেরিয়ে গেছে।

বোর্ডারদের চা খাওয়া হয়ে গেছে। মিস ধর ও ডাঃ বাজপেয়ী নিজের-নিজের ঘরে চলে গেছেন। মধুসূদনও আশ্চর্যভাবে কোথায় যেন আত্মগোপন করেছে।

মধুসূদনের পক্ষে সেটা একটু অস্বাভাবিকই বটে।

কণিকা রাত্রে রান্নাবান্নার ব্যবস্থা রামসেবককে বলে দিযে নিজের ঘরে গিয়ে পুরোনো খবরের কাগজটা নিয়েই বসল।

পড়ায় কিন্তু মন বসতে চায় না।

ঝড়বৃষ্টি যেন ক্রমে আরও তুমুল হয়ে উঠছে।

শেষপর্যন্ত সত্যিই বন্যা হবে নাকি!

রামসেবক এ অঞ্চলেরই লোক, তার কাছে বছর-পঁচিশ আগের ভয়ঙ্কর এক বন্যার গল্প সে শুনেছে।

বরাকর নদীর জল কূল ছাপিয়ে এসে সমস্ত এলাকাটাই নাকি ভাসিয়ে দিয়েছিল। সেই সমুদ্রের মধ্যে এই বাড়িটিই নাকি ছিল একা দাঁড়িয়ে।

তাই যদি হয় আবার!

অন্য কোনও ভয় না থাক, এতগুলো মানুষের খাওয়ার ব্যবস্থার কথাও ভাবতে হবে। কতদিনে যে জল নেমে পথ-ঘাট খুলবে কে জানে।

তার ভাঁড়ার অবশ্য সে ভর্তি করেই রাখবার ব্যবস্থা করেছে। আর কিছু না হোক, চালে-ডালে খিচুড়ি করে দিতে পারবে।

কিন্তু স্বাস্থ্যনিবাসের তো তাহলে ভবিষ্যৎ ঝাঁঝরা। শুরুতেই যে তাহলে বদনাম রটবে, সে কি আর কখনও কাটানো যাবে?

হঠাৎ চমকে কণিকা কান খাড়া করে রাখল।

যেন একটা গাড়ির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না!

ঝড়-বৃষ্টির শব্দ যা বেড়েছে তাতে অবশ্য বোঝা শক্ত। কিন্তু স্টেশন-ওয়াগন এলে তো তার আলো দেখা যেত দূর থেকেই।

কণিকা আবার তার হাতের কাগজটায় মন দেওয়ার চেষ্টা করল। খবরগুলো সবই প্রায় পড়া হয়ে গেছে।

কলকাতার সেই খুনের খবরটাই আর একবার পড়ে দেখলে। সত্যিই অদ্ভুত ব্যাপার। অকারণে এরকম খুন কি কেউ করে!

লোকটার যা বর্ণনা দিয়েছে তাতে তো অল্পবয়সি ভদ্রলোক বলেই মনে হয়। মাথায় বর্ষাতি-টুপি গায়ে ওয়াটারপ্রুফ, বর্ষার দিনে যে কোনও ভদ্রলোকেরই তো এই পোশাক। সেই পোশাকের তলায় উন্মাদ এক খুনি চলাফেরা করছে কে ভাবতে পারে!

নাঃ, কী রকম অস্বস্তি লাগছে। মধুসূদন এ সময়টায় থাকলেও দুটো গল্প করে সময় কাটানো যেত। মানুষটা বকবক করে বেশি, রসিকতাগুলোও বেয়াড়া, তবু বেশ হাসিখুশি বলে সঙ্গী হিসেবে ভালোই লাগে।

'কে?' আপনা থেকেই কণিকার গলা দিয়ে চিৎকারটা বেরিয়ে গেল।

বৃষ্টির ঝাপটা অন্যদিকে বলে জানলার শার্সি দিয়ে গাড়ি-বারান্দার দিকের রাস্তাটা খানিকটা ভালোই দেখা যাচ্ছে। আগাগোড়া ঢাকা একটা মূর্তি যেন সেখান দিয়ে চলে গেল।

পরমুহূর্তে বাইরের দরজায় কড়া নড়ে উঠতে কণিকার হাসি পেল নিজের আকস্মিক ভয়ে। খবরের কাগজের কাহিনিটা পড়েই মনটা অমন হয়েছিল।

এ তো স্পষ্ট প্রবীরের কড়া-নাড়া। তার কড়া-নাড়ার ধরনই আলাদা।

কিন্তু প্রবীর এল কীসে! তার গাড়ির শব্দ বা আলো কিছুই তো দেখতে পায়নি।

তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলতে-খুলতে সে সেই কথাই ভাবছিল।

দরজা খুলতে প্রবীর ভেতরে না ঢুকেই ব্যস্ত হয়ে বললে, 'শিগগির কণা, ছাতাটা নিয়ে এসো শিগগির।'

'ছাতা।' কণিকা বেশ অবাক! প্রবীরের তো মাথায় বর্ষাতি-টুপি, গায়ে ম্যাকিন্টস। মাথার ছাতা কী হবে!

'হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? যাও, ছাতাটা নিয়ে এসো। অতিথিদের গাড়ি থেকে নামিয়ে আনতে হবে তো!'

কণিকা একটু বিমূঢ়ভাবেই ছুটে গিয়ে ঘর থেকে ছাতাটা নিয়ে এসে প্রবীরের হাতে দিলে। প্রশ্নটা কিন্তু সেই সঙ্গে না করে পারলে না, 'অতিথি নিয়ে তুমি এলে কীসে?'

'এলাম গাড়িতে, আবার কীসে? ঠিক বাড়ির কাছে এসেই মোটরটা একেবারে গেল বিগড়ে। আর তার এমন অপরাধই বা কি! একরকম অন্ধের মতো ভাসতে-ভাসতেই তো এসেছি। হেডলাইট পর্যন্ত গিয়েছে নিভে।'

প্রবীর ছাতা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

অতিথিদের আনবার কথা বলেছে যখন, তখন একজনের বেশি নিশ্চয়ই এসেছেন। এই দুর্যোগেও তাহলে তাঁরা এলেন!

হেডলাইট নিভে গেছে বলেই কণিকা গাড়ির আসা টের পায়নি।
কিন্তু এত দেরিতে ভাসতে-ভাসতে আসার মানে কী?
বন্যা কি সত্যিই তাহলে শুরু হয়েছে?

অতিথিরা এসে যে-যার ঘরে যাওয়ার পর জানা গেল কণিকার আশঙ্কা সম্পূর্ণভাবে সত্য।

প্রবীরের কাছে খবর পাওয়া গেল যে, বন্যার জল ইতিমধ্যেই চারিদিক ডুবিযে দিতে শুরু করেছে। আবহাওয়ার যা গতিক, তাতে সে-জল আরও বাড়বে মনে হয়।

'সেইজন্যেই কি তোমাব এত দেরি হল?' জিজ্ঞাসা করলে কণিকা।

'শুধু সেইজন্যে নয়। প্রথমত, ট্রেন প্রায় তিনঘণ্টা লেট বলে স্টেশনেই বাধ্য হয়ে থাকতে হল বিকেল অবধি। বেণীবাবু এই ট্রেনে আসবেন লিখেছিলেন। তাঁকে ছেড়ে তো আর আসা যায় না। তারপর রাস্তায় আবার মিঃ বীরস্বামীকে উদ্ধার করতে বেশ খানিকটা সময় গেল।'

'উদ্ধার করতে কীরকম? নামটাও বলছ বীরস্বামী। উনি বাঙালি নন?'

'না, দেশ দক্ষিণ ভারতে কোথাও ছিল, তবে শুনলাম বাংলাদেশেই বহুকাল ধরে আছেন বলে বাংলাটা মাতৃভাষার মতোই হয়ে গেছে।'

'কিন্তু ওঁকে উদ্ধার করতে হল কেন?' ব্যাপারটা কণিকার কাছে যেন কেমন আজগুবি মনে হচ্ছিল।

'উদ্ধার করতে হল—ওঁর গাড়ি বানের জলে অচল হয়ে যাওয়াব দরুন উনি একেবারে তেপান্তরের মাঝখানে সত্যিই কূল পাচ্ছিলেন না বলে। অন্ধকারে ঝড়-বৃষ্টির মাঝে দূরে একটা আলো জ্বলতে-নিভতে দেখেই আমাদের প্রথম কেমন অদ্ভুত লাগে। তারপর মোটরের হর্ন শুনে সেদিকে গিয়ে দেখি ভদ্রলোকের ওই অবস্থা। ওঁকে তুলতে গিয়ে আমাদের গাড়িই তো খানায় পড়ে প্রায় উলটে গেছল আর কী!'

'কিন্তু ভদ্রলোক ঝড়-বৃষ্টিতে এদিকে যাচ্ছিলেন কোথায়?' কণিকা প্রশ্ন না করে পারল না।

'অত কথা জিজ্ঞাসা করিনি।' প্রবীর একটু অসহিষ্ণুভাবেই বললে, 'কেউ বিপদে পড়লে কি অত জেরা করে তবে তাকে সাহায্য করতে হয়!'

'না, তা হয় না। তবে কোথায় দেশ, বাংলাভাষায় কী করে এত দখল, এত কথা যখন জেনেছ, তখন ওই কথাটাও জিজ্ঞাসা করতে পাবা যেত না!'

'তোমার কি কিছু সন্দেহ হচ্ছে নাকি?' অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে প্রবীর।

'জানি না, কিন্তু আমার কেমন ভালোও লাগছে না। একে এই দুর্যোগ—ঠিক হোটেল খোলার পরই, তার ওপর আমাদের বোর্ডাররাও কেমন যেন সব অদ্ভুত জুটেছে মনে হচ্ছে।'

প্রবীর হেসে ফেলে বললে, 'বোর্ডার তো আর নিজেরা বাছাই করে নেওয়া যায় না। তা যদি যেত তোমার ওই সিনেমা-হিরো, থুড়ি মহাকবিকে আগেই বিদেয় করতাম।'

এবার কণিকা হেসে ফেলেছে, 'তোমাদের সত্যি কুক্ষণে দেখা হয়েছে। নইলে মধুসূদ ছেলেটা সত্যি খারাপ নয়। একটু মাত্রাজ্ঞান কম, এই যা।'

প্রবীর কী বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল।

'এখন আবার ফোন করে কে!' বলে কণিকাই গিয়ে ফোনটা ধরলে।

'হ্যালো!' একটু অস্পষ্টভাবে শোনা গেল, 'কল্যাণেশ্বরী স্বাস্থ্যনিবাস?'

কণিকা হ্যাঁ বলবার আগেই ওধার থেকে আবার প্রশ্ন হল, 'ম্যানেজারের সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?' উচ্চারণে একটু রাঢ় দেশের টান।

'যা বলতে চান আমাকেই বলতে পারেন!' কণিকা জানালে।

'কে আপনি?' আবার প্রশ্ন হল।

'আমি—মানে—এ স্বাস্থ্যনিবাস আমরাই খুলেছি। আমি মিসেস লাহিড়ী।'

'ও, আপনি মিসেস লাহিড়ী! আচ্ছা শুনুন,' আওয়াজটা এবার বেশ গম্ভীর হয়ে এল, 'আমি বরাকর থানা থেকে ইসমাইল সাহেব বলছি।'

নিজের অজান্তেই কণিকা বুঝি একটু চমকে উঠল, 'ও, থানা থেকে বলছেন! কী ব্যাপার বলুন তো!'

'দেখুন একটা বিশেষ দরকারে সি-আই-ডি ইনস্পেক্টর ঘোষালকে আপনাদের ওখানে পাঠিয়েছি। ফোনে বেশিকিছু আর বলতে চাই না। যা বলবার তিনিই গিয়ে বলবেন। তাঁর পৌঁছতে বিশেষ দেরি হবে না।'

'কিন্তু—কিন্তু এখানে আসবার তো কোনও উপায় নেই। রাস্তাঘাট সব বন্যার জলে ডুবে গেছে যে। বন্যা ক্রমশই বাড়ছে।' কণিকার আশঙ্কাটা যেন আশার মতোই শোনাল।

ওধার থেকে একটু যেন কড়া গলাতেই শোনা গেল, 'প্রলয় হলেও তিনি ঠিকই পৌঁছবেন। আপনাদের ভাবনা নেই। আর শুনুন, আপনার স্বামী মিঃ লাহিড়ীকে তাঁর সব কথা ভালো করে শুনে তাঁর নির্দেশমতো সবকিছু করতে বলবেন। কোনও ত্রুটি যেন না হয়।'

'কিন্তু ইসমাইল সাহেব!...' কণিকা যেন আরও কিছু জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল, কিন্তু ওধারে লাইন কেটে দেওয়ার আওয়াজ পাওয়া গেল।

কণিকার দিকের একতরফা কথা শুনেই চিন্তিতমুখে প্রবীর তখন কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। উদ্বিগ্নভাবে সে জিজ্ঞাসা করলে, 'কী, ব্যাপার কী? কী বলছে, বরাকর থানা থেকে?'

কণিকা তখনও নিজেকে ভালো করে সামলাতে পারেনি। ধরাগলায় বললে, 'কে একজন সি-আই-ডি অফিসার না ইনস্পেক্টরকে এখানে পাঠাচ্ছে।'

'সি-আই-ডি ইনস্পেক্টর।' প্রবীরের চোখ বড় হয়ে উঠল, 'কেন?'

'জানি না। ইনস্পেক্টর এসে আমাদের জানাবে বললে।' কণিকা অসহায়ভাবে প্রবীরের দিকে তাকাল।

'কিন্তু, পুলিশ আসবার একটা কারণ তো চাই।' প্রবীর যেন নিজেকেই প্রশ্ন করলে, 'এখানে তো কিছু হয়নি।'

'কী করে তা জানছ! কণিকা কাতরভাবে বললে,' আমরা—আমরা কোনও অন্যায় কি করেছি? কোনও আইন ভেঙেছি কি ভুলে? সেদিন ওপার থেকে গরুরগাড়িতে চাল আসছিল। একটু সস্তা বলে তাই কয়েক বস্তা কিনেছিলাম। কিন্তু তা তো বে-আইনি নয় আজকাল।'

'কী বাজে বকছ!' প্রবীর একটু বিরক্ত হয়েই বললে, 'বে-আইনিও যদি হয়, যদি চোরাই মালও কিনে থাকো, তার জন্যে এই বন্যার মধ্যে সি-আই-ডি ইনস্পেক্টর আসে নাকি?'

'তাহলে? তাহলে?' কণিকা উদ্বেগের সঙ্গে বললে, 'আমাদের এখানে এমন কোনও লোক কি এসেছে পুলিশ যাকে খুঁজছে। আমরা কিন্তু তা কী করে বুঝব?'

'নিশ্চয়ই, আমাদের কী দোষ! তুমি মিছিমিছি ভেব না!' বলে প্রবীর কণিকাকে কাছে টেনে একটু আদর করে শান্ত করবার চেষ্টা করলে।

কিন্তু কণিকার মন এত সহজে শান্ত হওয়ার নয়। স্বামীর বাহুবন্ধন ছাড়িয়ে সে অনুশোচনার সঙ্গে বললে, 'এখন মনে হচ্ছে এ স্বাস্থ্যনিবাস না খুললেই হত। গোড়াতেই এই দুর্যোগ, তার ওপর কী হাঙ্গামা এখন হবে কে জানে!'

হাঙ্গামা যে তাদের কল্পনাকেও ছাড়িয়ে যাবে কে জানত। পরের দিন সকালেই জানা গেল বন্যার জল দ্বীপের মতো তাদের বাড়িটাকে ঘিরে প্রায় নিচের তলার ঘরগুলোতে ঢোকবার উপক্রম করছে। ভিত নেহাত উঁচু বলেই এখনও তারা রক্ষা পেয়েছে। এ জল কতদিনে নামবে কে জানে!

ভোরে উঠে বোর্ডারদের ঘরে চা পাঠাবার ব্যবস্থা করে নিজেদের ঘরে বসে প্রবীর ও কণিকা এই সমস্যারই আলোচনা করছিল, এমন সময় ঘরের আধভেজানো দরজাটায় এবার টোকা শোনা গেল।

কণিকা 'আসুন' বলার আগেই মিস ধর বেশ একটু অপ্রসন্নমুখে ঘরে ঢুকেই গলা ছাড়লেন, 'এই যে তোমরা এখানে। বলি পয়সাকড়ি তো কিছু কম নেবে না, কিন্তু সাধারণ সুবিধেগুলোও না দিয়ে কি ডাহা ফাঁকি দেবে এমন করে?'

'কী হয়েছে?' প্রবীর একটু রূঢভাবেই জিজ্ঞাসা করলে।

'কী হয়েছে! ওপরের বাথরুমে একফোঁটা জল নেই। ওপরে ঘর নিয়ে জলের জন্যে কি নিচ-ওপর করব নাকি রাতদিন।'

প্রবীরের বলতে ইচ্ছে হল, জলের অভাব কী? বাইরে বানের জলে তো ডুবে মরতেও পারেন! কিন্তু নিজেকে সামলে সে গম্ভীরভাবে বললে, 'আচ্ছা আমি দেখছি।'

প্রবীর বেরিয়ে যাওয়ার পর মিস ধর কণিকাকে নিয়ে পড়লেন, 'দেখো বাপু, কিছু মনে না করো তো বলি। ওই ছোকরার রকমসকম আমার ভালো লাগছে না!'

ছোকরা বলতে যে মধুসূদনের কথাই বলছেন, তা বুঝেও কণিকা জিজ্ঞাসা করলে ঈষৎ হাসবার চেষ্টা করে, 'কার কথা বলছেন?'

'ওই যে তোমার ফাজিল অসভ্য ছোকরা, চুলগুলো যার কাকের বাসা হয়ে আছে। চুলগুলোও আঁচড়াতে পারে না?'

চুল না আঁচড়ানোটা কতবড় অপরাধ বুঝতে না পেরেই বোধহয় কণিকা চুপ করে রইল।

মিস ধর আবার বললেন, 'ওর নামটাও আমার যেন ভাঁড়ানো মনে হয়। কোথায় মহাকবি মধুসূদন দত্ত, আর কোথায় এই বখাটে একটা বাউন্ডুলে!'

মনে-মনে চটলেও বাইরে হালকাভাবে কণিকা ঠান্ডা করবার চেষ্টা করলে মিস ধরকে, 'কানা ছেলের নামও পদ্মলোচন হয় তো!'

'হয়, কিন্তু এ ছোকরাকে দেখেই মনে হয় ওর ভেতর গন্ডগোল আছে। কিছু জানো তুমি ওর সম্বন্ধে?'

এবার আর কণিকা বিরক্তিটা চাপতে পারলে না, একটু কঠিন স্বরেই বললে, 'এই আপনার সম্বন্ধেও যতটুকু জানি, ততটুকুই। আপনি একমাসের জন্যে আর মধুসূদন সাতদিনের জন্যে স্বাস্থ্যনিবাসে থাকতে এসেছেন। আপনারা যা নাম দিয়েছেন তা-ই আমাদের খাতায়

লেখা হয়েছে। তার জন্যে তো পুলিশে খবর নিতে যাইনি। আপনারা এখানে কে কী, তাও তো আমার জানবার দরকার নেই। আমার ন্যায্য পাওনা শুধু চুকিয়ে দিয়ে এখানে অন্য গোলমাল না করে যে যার খুশি আপনারা থাকুন না! আপনাদের ঠিকুজি-কুষ্ঠিতে কী দরকার আমার!'

মিস ধর যেন একটু জব্দ হলেন, কিন্তু গলার ঝাঁঝ তাতে কমল না, 'তোমাদের বয়স কম' দুনিয়ার কিছুই জানো না, তাই ভালো দুটো পরামর্শই দিতে এসেছিলাম। পছন্দ না হয় নিও না। এই যে কোত্থেকে উটকো একজন লোক না বলে-কয়ে কাল রাত্রে এসে উঠেছে এখানে। বাঙালিও নয়। কী মতলবে কে অমন এসেছে তাই বা কে জানে?'

এই ধরনের প্রশ্ন নিজেই কাল রাত্রে করেছে মনে পড়বে কণিকার গলায় বিরক্তিটা এবার আর প্রকাশ পেল না।

স্বাভাবিক গলায় প্রবীরের কথাগুলোই সে বললে, 'কিন্তু কী উপায় বলুন আমাদের। বন্যার জলে মোটর খারাপ হয়ে ভদ্রলোক বিপদে পড়েছিলেন। তাঁকে কি আশ্রয় না দিয়ে ফেলে আসা যায়?'

'কিন্তু যাই বলো, ওই বীরস্বামী না কী নাম নিয়ে যে এসেছে—আমার তো মনে হয়...'

'বলে ফেলুন, যা মনে হয় বলে ফেলুন।' আসামীর নাম করতেই সে হাজির।

মিস ধর ও কণিকা দুজনেই চমকে সেদিকে তাকাল। মিঃ বীরস্বামী কখন নিঃশব্দে যে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন টেরও পায়নি তারা।

'ওঃ, একেবারে চমকে গেছলাম!' মিস ধর ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে বীরস্বামীর দিকে তাকালেন, 'কখন এসেছেন টেরও পাইনি!'

'হ্যাঁ, আমি একেবারে চুপি-চুপি আসি—এমনি করে পা টিপে-টিপে!' বীরস্বামী একটু হেঁটে চুপি-চুপি আসাটা দেখিয়েও দিলেন, 'কেউ কিছু টের পায় না বলে কত মজার কথা শুনতে পাই। আর যা শুনি, আমি কখনও ভুলি না।'

মিস ধর কেমন যেন একটু ভড়কে গেছেন মনে হলো। 'যাই, বাথরুমের কী হল আবার দেখি।' বলে আর সেখানে দাঁড়ালেন না তিনি।

বীরস্বামী তার পেছনে হো-হো করে হেসে উঠলেন, তারপর কণিকার দিকে ফিরে একটু সকৌতুক স্নেহের সুরেই বললেন, 'মনে হচ্ছে আমাদের গৃহিণী দেবী একটু যেন ভাবনায় পড়েছেন!'

চেহারা ভারিক্কি এবং মাথার চুল পাকা হলেও কী হয়, বীরস্বামীর ধরন-ধারণ কেমন একটু ভাঁড়ের মতো।

চলন-বলনও ঠিক বয়সের উপযোগী নয়, যেন বুড়ো-খোকা ধরনের।

প্রবীরের যেমন মধুসূদনকে, কণিকার তেমনি লোকটাকে প্রথম দৃষ্টিতেই ভালো লাগেনি।

তবু জবাব একটা না দিলে নয়, কণিকা তাই একটু হেসে বললে, 'ভাবনার আর অপরাধ কী বলুন! এই বন্যায় কী যে হবে কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'তা ভালোও হতে পারে, মন্দও হতে পারে!' বলে বীরস্বামী আবার হো-হো করে হাসলেন।

বিমূঢ়ভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে কণিকা বললে, 'বুঝতে পারলাম না আপনার কথা!'

'পারলেন না বুঝি।' বীরস্বামীর চোখে যেন দুষ্টুমির হাসি, 'এখন না পারুন পরে হয়তো পারবেন। তবে অনেক কিছুই যে আপনি বোঝেন না তা দেখতেই পাচ্ছি।'

'যেমন?' কণিকা এবার একটু উষ্ণ।

'যেমন, অতি সরল হওয়া ভালো নয়।'

'আমি যে অতি সরল তা এর মধ্যেই বুঝে ফেলেছেন?' কণিকা বিদ্রুপের স্বরে বলবার চেষ্টা করলে।

'তা আর বুঝিনি? এই ভারতবর্ষের সাতঘাটের জল এই বয়স পর্যন্ত কি খেয়ে বেড়াচ্ছি মিছিমিছি?'

'আপনি সারা ভারতবর্ষই ঘুরে বেড়ান বুঝি?'

'দরকার হলেই বেড়াই, আবার ঘাপটি মেরেও থাকি কখনও কখনও।' বলে বীরস্বামী আবার হাসলেন।

বীরস্বামীর যাওয়ার কোনও নাম নেই। তাই নেহাত আলাপ চালাবার জন্যেই কণিকা বললে, 'বাংলাটা বেশ ভালো বলতে পারেন দেখছি?'

'আপনি তারিফ করছেন তাহলে! কিন্তু আমার মাতৃভাষা নয়।'

'তা তো নাম শুনেই বুঝেছি।' মুখে বললেও কণিকার কেমন হঠাৎ সন্দেহ হল, হয়তো বীরস্বামী নামটাই মিথ্যে।

তাব সন্দেহটা যেন বুঝতে পেরেই বীরস্বামী বললেন, 'অবশ্য আমি বলছি বলেই যেন সব কথা বিশ্বাস করে বসবেন না। বিশ্বাস কাউকেই করবেন না, অতি আপনজনকেও না।'

'আপনার উপদেশের জন্যে ধন্যবাদ।' কণিকার গলাটা কিন্তু অপ্রসন্ন শোনাল।

'কথাটা আপনার ভালো লাগল না বুঝতে পারছি।' বীরস্বামী তার দিকে কেমন অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে হাসলেন, 'কিন্তু দুনিয়ায় এর চেয়ে খাঁটি কথা নেই।'

একটা জানলার ছিটকিনি বুঝি আলগা ছিল। হঠাৎ ঝোড়ো হাওয়ায় পাল্লাদুটো সশব্দে খুলে গিয়ে বৃষ্টির ছাটে ঘর ভিজে গেল।

কণিকা বন্ধ করতে যাচ্ছিল। তার আগেই বীরস্বামী 'থাক, আমি বন্ধ করছি,' বলে সেদিকে এগিয়ে গেলেন।

এবারেও কণিকা লক্ষ করলে যে বয়সের তুলনায় বীরস্বামীর চলাফেরা বেশ চটপটে যুবকের মতো।

জানলাটা বন্ধ করে বীরস্বামী পাশের টেবিলের একটা বই হাতে নিয়ে দেখছিলেন, এমন সময় যিনি ঘরে ঢুকলেন তাঁকে দেখে কণিকা সত্যিই অবাক! দুবেলা খাওয়ার সময়টিতে ছাড়া নিজের ঘর থেকে যিনি বেরোন না, সেই ডাঃ বাজপেয়ী নিজে থেকে যে এঘরে নেমে আসবেন, কণিকা ভাবতেই পারেনি।

ডাঃ বাজপেয়ীর সদা গম্ভীর মুখে সাধারণত কোনও ভাবটাব ফোটে বলে মনে হয় না।

এখনও তিনি ঘরে ঢুকে সেই কাঠের মূর্তির মতো চেহারা নিয়েই উচ্ছ্বাসহীন ভারী গলায় বললেন, 'মাফ করবেন। মিঃ লাহিড়ীকে দেখতে পেলাম না। ওপরের ইলেকট্রিক লাইন খারাপ হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। আমার ঘরে আলো জ্বলছে না।'

দিনের বেলায় আলো নিয়ে কী করবেন! কণিকা হয়তো বলতে পারত।

কিন্তু দিনের পর রাত আসবে। কোনও মিস্ত্রি পাওয়ার যখন আশা নেই, তখন ইলেকট্রিক লাইন খারাপ হলে অবস্থা কী হবে কল্পনা করে সে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল।

'কী বিপদ দেখুন তো! এদিকে বন্যা, ওদিকে পুলিশ আসছে, তার ওপর আবার এই ইলেকট্রিক লাইন খারাপ হওয়া।' তার মুখ দিয়ে আপনা থেকেই বেরিয়ে গেল।

কারুর কাছে কোনও সহানুভূতি পাওয়ার আশায় কণিকা কথাটা বলেনি, কিন্তু ওই কটা কথায় অমন ফল হবে সে জানত না।

বীরস্বামীর হাতের বইটা সশব্দে পড়ে গেল। ডাঃ বাজপেয়ীর ভাবলেশহীন মুখখানাতেও কেমন যেন একটা বিমূঢ়তার চেহারাই ফুটে উঠল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি প্রায় ধরাগলায় বললেন, 'কী বললেন? পুলিশ আসছে?'

ডাঃ বাজপেয়ীর মুখোশের মতো মুখের পেছনেও একটা কিছু আবেগের আলোড়ন যে চলছে তা কণিকার অগোচর রইল না।

সেটা সন্দেহ, না ভয়, না উত্তেজনা তা ঠিক বোঝা শক্ত।

কণিকার হঠাৎ মনে হল এই নিরীহ চেহারার গম্ভীর লোকটির ভেতরে কোনও গভীর রহস্য নিশ্চয়ই আছে।

কণিকাকে চুপ করে থাকতে দেখে ডাঃ বাজপেয়ী প্রায় স্বাভাবিক গলাতেই আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'পুলিশ আসছে বললেন না? কী ব্যাপার?'

'হ্যাঁ, বরাকর থানা থেকে কাল রাত্রে ফোন করেছিল। কে একজন সি-আই-ডি অফিসারকে ওঁরা এখানে পাঠিয়েছেন বললেন।' জানলার ভেতর দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে কণিকা একটু আশার সুরেই বললে, 'এখনও পর্যন্ত যখন আসেননি, তখন এই বন্যায় আর আসতে পারবেন বলে মনে হয় না।'

'কিন্তু পুলিশ আসছে কেন?' ডাঃ বাজপেয়ী কণিকাকেই যেন জেরা করলেন। কণিকা কিছু বলবার আগেই 'ঝকমারি হয়েছে হোটেল খোলা' বলে প্রবীর ঘরে ঢুকল। তারপর বোর্ডার দুজনকে ঘরে দেখে ও তাদের মুখের ভাব লক্ষ করে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'কী হয়েছে কী?'

ডাঃ বাজপেয়ীই তার দিকে এগিয়ে গেলেন, 'শুনলাম সি-আই-ডি পুলিশ এখানে আসছে। কেন বলুন তো?'

'কে জানে কেন!' প্রবীর বিরক্তির সঙ্গে বললে, 'কিন্তু আসছে বললেই তো হয় না। ওপর থেকে যা দেখলাম, চারধার একেবারে সমুদ্র হয়ে গেছে। দিগ্বিদিক চেনবার উপায় নেই। পুলিশ কেন, মিলিটারি হলেও আজ আর আসবার উপায় নেই।'

হঠাৎ জানলায় সজোরে শক্ত-কিছুর দুবার ঘা দেওয়ার শব্দ শুনে চারজনই চমকে সেদিকে ফিরে তাকিয়ে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল। শার্সিটা বৃষ্টির ছাটে প্রায় ঝাপসা। কিন্তু তারই ভেতর অস্পষ্ট একটা মূর্তি যেন শূন্যে কে এঁকে দিয়েছে। হাতে তার একটা যেন মুগুর বলেই মনে হল।

কয়েক মুহূর্ত হতভম্ব হয়ে থেকে ডাঃ বাজপেয়ীই প্রথমে জানলার দিকে ছুটে গেলেন, ক্ষিপ্র হাতে জানলা খুলতেই শূন্যে আঁকা মূর্তির রহস্য খানিকটা পরিষ্কার হয়ে গেল। ওধারে একটি লোক ফাঁপানো রবারের ভেলার ওপর দাঁড়িয়ে জানলার একটা গরাদ ধরে আছে। তার অন্য হাতে ছোট একটা বৈঠা। বন্যার জল প্রায় জানলার তলা পর্যন্ত পৌঁছবার দরুনই নৌকোর ওপর দাঁড়ানো অবস্থায় তাকে ঠিক শূন্যে ভাসছে বলে মনে হচ্ছিল।

ডাঃ বাজপেয়ী জানলা খুলতেই সে একটু মাথা নুইয়ে হেসে বললে, 'ধন্যবাদ! আপনাদের দরজাটা একটু যদি খুলে দেন। আমি ইনস্পেক্টর ঘোষাল।'

'ইনস্পেক্টর ঘোষাল!' ডাঃ বাজপেয়ী সবিস্ময়ে আপনা থেকেই বলে উঠলেন।

অন্য সবাইও তখন জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রবীর নিজেই এবার এগিয়ে গিয়ে বললে, 'বাইরের দরজা তো ওদিকে। অতদূর ঘুরে আপনাকে যেতে হবে না। এর পরেরটা ফ্রেঞ্চ-উইনডো। আমি খুলে দিচ্ছি, দাঁড়ান।'

ফ্রেঞ্চ-উইনডোটা খোলবার পর ঘোষাল নৌকো নিয়ে সেখান দিয়েই ভেতরে ঢুকলেন।

রবারেব ভেলার ভালভটা তারপর খুলে দিয়ে বললেন, 'দরজাটা এখন বন্ধ করে দিতে পারেন। আর আমার এই কাণ্ডারীটিকে রাখবার একটা জায়গা যদি দেখিয়ে দেন।'

ফ্রেঞ্চ-উইনডোর পাল্লাদুটো বন্ধ করে প্রবীর বললে, 'আসুন আমার সঙ্গে!'

হাওয়া বেরিয়ে ভেলাটা তখন চুপসে এতটুকু হয়ে গেছে। একহাতে সেটা তুলে নিয়ে ঘোষাল প্রবীরের পেছনে যাচ্ছিলেন।

কিন্তু যাওয়ার আগে একটু বাধা পড়ল। মিস ধর ইতিমধ্যে সেখানে এসে হাজির হয়েছেন। তিনি বেশ একটু উত্তেজিতভাবেই বললেন, 'আপনি ইনস্পেক্টর ঘোষাল? রবারের নৌকো বেয়ে এই দুর্যোগের মধ্যে আসতে হয়, এমন কী ব্যাপার এখানে হয়েছে?'

ঘোষাল একটু হেসে বললেন, 'একটু সবুর করলেই সব জানতে পারবেন।'

'আচ্ছা, কী জানান দেখি! পুলিশেব সবকিছুতেই বাড়াবাড়ি। হেলে ধরতে পারে না। কেউটে ধরতে যায়। আর পাঠিয়েছে কিনা আপনার মতো এক ছোকরাকে! এই বয়সে ইনস্পেক্টর! কোনও খুঁটির জোরে প্রমোশন পেয়েছেন!'

'তা হয়তো পেয়েছি!' ঘোষাল আবাব হাসলেন, 'কিন্তু আমার বয়স যত কম ভাবছেন তত নয়।'

ঘোষাল প্রবীরের সঙ্গে বেরিয়ে যাওয়ার পর বীরস্বামীই প্রথম কণিকার কাছে এসে তীব্রস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'পুলিশ কেন ডাকিয়েছেন মিসেস লাহিড়ী?'

এ যেন আরেক বীরস্বামী। চোখ দেখলে ভয় করে।

কণিকা তাড়াতাড়ি বললে, 'আমবা ডাকিনি—বিশ্বাস করুন। ওই তো শুনলেন কী জন্যে এসেছে—খানিক বাদে জানবেন।'

হঠাৎ দমকা হাওয়ার মতো মধুসূদন এসে ঘবে ঢুকল যেন দারুণ মজার ব্যাপার, এইভাবে সোল্লাসে সে বলে উঠল, 'আরে নবক তো একেবারে গুলজার! শুনলাম, শুনলাম কেন দেখলাম, পুলিশ এসেছে রবারের ভেলায় ভেসে। দারুণ একটা কিছু তাহলে ঘটছেই। একেবারে রোমাঞ্চকর উপন্যাস।'

তার স্ফূর্তিতে কিন্তু আর কারুর সায় দেখা গেল না।

ডাঃ বাজপেয়ী তার দিকে একবাব ভ্রূকুটি করে বললেন, 'আপনার ফোনটা একটু ব্যবহার করতে পারি মিসেস লাহিড়ী?'

'নিশ্চয়ই পারেন।'

ডাঃ বাজপেয়ী ফোন করতে যাওয়ার পর মধুসূদন আর একবার স্ফূর্তির সুরটা ধরবার চেষ্টা করলে, 'ইনস্পেক্টর কিন্তু বেশ দেখতে। আজকাল বাঙালি পুলিশ অফিসারদের মধ্যে বেশ ভালো-ভালো চেহারা দেখা যাচ্ছে। আমার ছেলেবেলায় পুলিশ সার্জেন্ট হওয়ার খুব শখ ছিল...'

তার কথার মাঝখানে ডাঃ বাজপেয়ীর উদ্বিগ্ন স্বর শোনা গেল, 'ফোনে যে কোনও আওয়াজ নেই মিসেস লাহিড়ী! একেবারে খারাপ হয়ে গেছে।'

'সে কী!' কণিকা ছুটে গেল ডাঃ বাজপেয়ীর কাছে, 'এই খানিক আগেই তো ঠিক ছিল, উনি বরাকরের একটা দোকানে ফোন করে বন্যার খবর নিলেন।'

হঠাৎ মধুসূদনের উচ্চহাসিতে সবাই চমকে উঠলো।

'ফোনটাও গেছে তাহলে! ব্যস, দুনিয়ার সব সম্পর্ক খতম। এই থই-থই জল, এই বাড়ি আর আমরা কজন। তার মধ্যে আবার একজন টিকিটিকি অফিসার। বাঃ, নাটক যা জমবে।' মধুসূদনের হাসি আর থামতে চায় না।

'থামুন! নাটক না কী হল আগে দেখুন। বিয়োগান্ত হলে এত খুশি থাকবে কি?' বীরস্বামীই ধমক দিলেন, 'এটা হাসির ব্যাপার নয়।'

মিস ধর সন্দিগ্ধভাবে এদিক-ওদিক চেয়ে বললেন, 'ফোনের লাইন কেউ নিশ্চয়, ইচ্ছে করে কেটে দিয়েছে। তুমি, তুমি মধুসূদন কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'

'আমায় সন্দেহ করছেন!' মধুসূদন আবার হেসে উঠল, 'কাটতে চাইলেও আমার দ্বারা ও-কাজটি হত না। ও ইলেকট্রিক-টিলেকট্রিকে আমার বড্ড ভয়। কখন কোথায় শক খেয়ে মরি আর কী! কিন্তু আপনি?' হঠাৎ গম্ভীরমুখে মধুসূদন বললে, 'আপনাকে পেছনেব দিক দিয়ে ভেজা কাপড়ে যেন আসতে দেখেছিলাম নিচে থেকে। আমি চিলের ছাদ থেকে বন্যার দৃশ্য দেখছিলাম কিনা।'

'আমি!' মিস ধর একেবারে আগুন, 'আমি তো আমার—আমি একটা জিনিস আনতে গেছলাম। ওপর থেকে জানলা দিয়ে পড়ে গেছল।'

'কী পড়ে গেছল?' বীরস্বামীই জিজ্ঞাসা করলেন।

'তাতে আপনাদের কী দরকার?' মিস ধর রেগে ঘর থেকেই বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রবীর ও ইনস্পেক্টর ঘোষালকে ফিরতে দেখে তাঁকে থামতে হল।

ঘোষাল মিস ধরের মুখ দেখেই কিছু একটা হয়েছে অনুমান করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাপার কী, কী বলে...?'

'আমার নাম মিস ধর।' মিস ধর নিজেই ঝাঁঝালো গলায় জানালেন।

'তা মিস ধর হঠাৎ এত চটেছেন কেন?' একটু মধুরভাবেই ঘোষাল জিজ্ঞাসা করলেন।

'চটব না! এতবড় আস্পর্ধা! বলে কিনা আমি ফোনের তার কেটেছি!'

'তা তো বলিনি মিস ধর...' মধুসূদন আরও কী বলতে যাচ্ছিল, ঘোষাল বাধা দিয়ে বললেন, 'ফোনের তার কি কাটা নাকি!'

'কাটা কি না জানি না।' ডাঃ বাজপেয়ী বুঝিয়ে দিলেন, 'কিন্তু কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।'

'আশ্চর্য!' ঘোষাল এগিয়ে গিয়ে ফোনের রিসিভারটা তুলে নিলেন। খানিক নাড়াচাড়ার পর হতাশমুখে ফিরে এসে বললেন, 'নাঃ, একদম 'ডেড'। বন্যার দরুন অবশ্য খারাপ হতে পারে। কিন্তু তা নয় বলেই সন্দেহ হচ্ছে।'

একটু চুপ করে কী যেন ভেবে নিয়ে ঘোষাল পকেট থেকে একটা নোটবই বার করলেন। তারপর সকলের মুখের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে বললেন, 'চাকর-বাকর বাদে এখানে তো আপনারা সবাই উপস্থিত?'

কণিকা জানালে, 'না বেণীবাবু বলে আর একজন আছেন। তিনি বৃদ্ধ লোক। কাল

এই দুর্যোগের মধ্যে এসে অসুস্থ হয়ে ঘরেই আছেন।'

'আচ্ছা, তিনি ছাড়া আপনারা সবাই এখানে আছেন। মিঃ লাহিড়ী ও কণিকা দেবীর কাছে কয়েকটা কথা আমার জানবার আছে, সেটা সেরেই আমি আসছি। আপনারা ততক্ষণ অনুগ্রহ করে এখানে থাকলে ভালো হয়।'

ইনস্পেক্টর ঘোষালের অনুরোধে প্রবীর ও কণিকা পাশের ছোট লাইব্রেরি-গোছের ঘরটিতে গিয়ে বসল।

ঘোষাল দরজাটা ভালো করে বন্ধ করার পর কণিকা আকুলভাবে জিজ্ঞাসা করলে, 'কী ব্যাপার বলুন মিঃ ঘোষাল। কিছু অন্যায় কি আমরা করেছি?

'অন্যায় করেছেন!' ঘোষাল সবিস্ময়ে খানিক কণিকাঁর দিকে তাকিয়ে ঈষৎ হেসে বললেন, 'না-না, সেসব কিছু নয়। আপনারা ভুল বুঝেছেন বলে আমি দুঃখিত। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা, আপনাদের বিরুদ্ধে কোনও আভিযোগ নিয়ে আমি আসিনি, বিপদ যাতে আপনাদের না হয় সেইজন্যেই আমাকে পাঠানো হয়েছে।'

'বিপদ? আমাদের কী বিপদ?' প্রবীর অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

'বিপদ মোক্ষদা দেবীর খুন হওয়ার ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত। কলকাতায় গিরি মাঝি লেনের সে ঘটনার কথা পড়েছেন নিশ্চয় কাগজে?' ঘোষাল দুজনের দিকেই চাইলেন।

'হ্যাঁ পড়েছি।' স্বীকার করল কণিকা—'কে না পড়েছে?'

'প্রথমে আমি জানতে চাই যে সেই মোক্ষদা দেবীর সঙ্গে আপনাদের কারুর পরিচয় ছিল কি না?'

'নামও কখনও শুনিনি!' বললে প্রবীর। কণিকাও সায় দিল।

'আমিও তাই ভাবছিলাম।' ঘোষাল একটু থেমে বললেন, 'কারণ গিরি মাঝি লেনে আসবার আগে মোক্ষদা ঠাকরুণ নামে তিনি পরিচিত ছিলেন না। তখন সবাই তাঁকে মিসেস এম-ডি বলেই জানত। ওইটেই তাঁর চলতি নাম হয়ে গিয়েছিল। তাঁর আসল নাম যে মোক্ষদামণি দাস, তা অনেকে জানতই না! তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে একটা অনাথ আশ্রমের ম্যানেজারি করতেন! চাঁপাখোলা অনাথ আশ্রমের কথা শুনেছেন বোধহয়? অনাথাশ্রমের কেসটা নিয়ে কাগজে তখন খুব হইচই হয়েছিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় যারা অনাথ হয়েছিল, এমন অনেকগুলি ছেলেমেয়ে সেখানে থাকত। তার মধ্যে তিনটি ভাই-বোন ছিল। অনাথ আশ্রমের ছেলেমেয়েদের ওপর ম্যানেজার ও তাঁর স্ত্রী মিসেস এম-ডি অত্যন্ত অত্যাচার করতেন। তিন ভাই-বোন সেই অত্যাচারে একদিন পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে। ম্যানেজার ও তাঁর স্ত্রী তাদের অত্যন্ত মারধোর করেন। একটি ভাই তাতেই জখম হয়ে শেষপর্যন্ত মারা পড়ে। মিসেস এম-ডির কথা সাধারণে জানতে পারেনি, কিন্তু তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে সেই ব্যাপার নিয়ে পুলিশ কেস করে। বিচারের সময়েই মিসেস এম-ডির স্বামী কেমন করে পালিয়ে যান। কিন্তু মানুষের বিচারকে এড়িয়েও বিধাতার বিচারকে ফাঁকি দিতে পারেননি। তার কয়েকদিন বাদেই মোটর-অ্যাক্সিডেন্টে তিনি মারা যান। কেসটা তাতে চাপা পড়ে যায়। মিসেস এম-ডি অনাথ আশ্রম ছেড়ে দিয়ে একটু ভোল পালটে ওই গিরি মাঝি লেনে এসে ওঠেন।'

বিবরণ শেষ করে ঘোষাল একটু থামলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই মিসেস এম-ডিকে কেউ আপনারা চিনতেন, বা এই অনাথ আশ্রমের সঙ্গে কোনও সংস্রব আপনাদের ছিল?'

প্রবীর ও কণিকা দুজনেই দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়ল।

কণিকা তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু আমাদের এসব কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন?'

'করছি আপনারা বিপন্ন বলে।'

'আমরা! আমরা কেন বিপন্ন হব?' কণিকা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

'বিপন্ন তো হয়েই আছেন, শুধু কেন হয়েছেন সেইটেই বোঝাবার চেষ্টা করছি।' ঘোষাল একটু হেসে আবার বললেন, 'জানেন বোধহয় যে খুনির পকেটের একটা হ্যান্ডবিল পুলিশ পেয়েছে? সে হ্যান্ডবিল আপনাদের এই স্বাস্থ্যনিবাসেরই বিজ্ঞাপন।'

'শুধু সেই হ্যান্ডবিল খুনির পকেটে ছিল বলেই ঠিক এই স্বাস্থ্যনিবাসেই সে হানা দেবে, বুঝতে হবে?' প্রবীরের স্বরটা অবিশ্বাসের।

'না, শুধু তাই জন্যে নয়। সে হ্যান্ডবিলের পেছনে পেন্সিলে কয়েকটা কথাও লেখা ছিল। পুলিশের পক্ষে সে লেখা অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়।'

'কী লেখা ছিল? কারুর নাম?' উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞাসা করলে কণিকা।

'না নাম নয়। লেখা ছিল গিরি মাঝি লেনে শুরু, স্বাস্থ্যনিবাসে শেষ। সেইজন্যেই জানতে চাইছি মিসেস এম-ডি'র বা তাঁর সেই চাঁপাখোলা অনাথ আশ্রমের সঙ্গে আপনাদের কোনও সংস্রব ছিল কি না। আপনাদের না থাক, বোর্ডারদের আর কারুর ছিল নিশ্চয়। নইলে খুনির ও লেখার কোনও মানে হয়!'

'মানে হয়তো সত্যিই নেই!' প্রবীর তার সন্দেহটা জানালে।

ঘোষাল হেসে বললে, 'অত সহজে পুলিশ তো আর ব্যাপারটা উড়িয়ে দিতে পারে না!'

'তার মানে এখানেও কেউ খুন হবে বলতে চান?' কণিকা সভয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

একটু চুপ করে থেকে ঘোষাল ধীরে-ধীরে বললেন, 'আপনাদের আমি ভয় পাওয়াতে চাইনি, কিন্তু আমাদের অনুমান তাই। খুনির অভিসন্ধি যাতে ব্যর্থ করা যায়, সেইজন্যেই আমাকে পাঠানো হয়েছে। আপনাদের আন্তরিক সাহায্য পেলে আশা করি আমি বিফল হব না।' ঘোষালের গলার স্বরে একটু আবেদনের সুরই পাওয়া গেল।

'কিন্তু এই দুর্যোগে খুনির পক্ষে এখানে আর আসা সম্ভব?' প্রবীর তার মনের সন্দেহটা ব্যক্ত করলে।

ইনস্পেক্টর ঘোষাল একটু যেন অনুকম্পাভরে বললেন, 'আপনি তাই ভেবে আনন্দে আছেন বুঝি? কিন্তু খুনির আর আসবার দরকার নেই, এমনও তো হতে পারে।'

'তার মানে?' কণিকা অবাক হয়ে ঘোষালের দিকে তাকাল।

'তার মানে, সে হয়তো আগেই এখানে এসে বসে আছে।'

'তা কী করে হতে পারে! এক বীরস্বামী ছাড়া বোর্ডাররা সবাই আগে থাকতে চিঠি দিয়ে ঘর রিজার্ভ করে এসেছেন।'

'আগে থাকতে চিঠি দেওয়ার মতো এই খুনের ব্যাপারও সব আগে থাকতে প্ল্যান করা। তাছাড়া আর একটা কথা ভুলবেন না। গত শুক্রবার গিরি মাঝি লেনে মোক্ষদা দেবী খুন হয়েছেন। আপনার সমস্ত বোর্ডারই এসেছেন তার পরে।'

'তাহলে কী বলতে চান, চাঁপাখোলা অনাথ আশ্রমের সেই তিনটি ভাই-বোনেরই কেউ এই ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত? তারা তো নেহাত বাচ্চা!'

'বাচ্চা তখন ছিল। কিন্তু আজ এত বছর বাদে কি আর তাই আছে?'

'তাদের তো একজন মারা গেছে।'

'হ্যাঁ, যে মারা গেছে সে ছিল সবচেয়ে ছোট। বয়স তখন তার মাত্র দশ। তার বড় ভাইয়ের বয়স তখন পনেরো-ষোলো, আর বোনের বারো। বড় ভাই কিছুকাল বাদে কোথায় একটা চাকরি নিয়ে চলে যায়। বোনটি কোনও একটি ভালো পরিবারে জায়গা পায়। কিন্তু সে পরিবারে কর্তা গিন্নি দুজনেই হঠাৎ পর-পর মারা গেলে কোথায় যে যায় কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি।'

'সেই বড় ভাই-ই এসবের মূলে আছে সন্দেহ করছেন? কিন্তু বয়সের দিক দিয়ে তাহলে ও একমাত্র—'এই পর্যন্ত বলেই কণিকা চুপ করে গেল।

কী যেন একটা কথা কণিকা চেপে গেল বুঝেও তা জানবার চেষ্টা করলেন না ঘোষাল। শুধু তার দিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'বয়স তো ভাঁড়ানো যায় মিসেস লাহিড়ী!'

'হ্যাঁ, তা যায়।' বলে কেমন যেন একটু বিব্রতভাবে কণিকা রান্নাবান্নার ব্যাপারটা একটু তদারক করবার জন্যে একবার রান্নাঘরে যাওয়ার অনুমতি চাইলে।

'না, না এর আবার অনুমতি চাইবার কী আছে।' বলে কণিকাকে ছেড়ে দিয়ে ঘোষাল প্রবীরকে প্রত্যেক বোর্ডারের কাছে গিয়ে তাদের কয়েকটা করে বিবরণ একটা কাগজে টুকে রাখতে বললেন।

'আপনি এই সাধারণ খবরগুলো নিয়ে রাখুন। আমি খানিক বাদেই যাচ্ছি।' বলে ঘোষাল ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ঘোষাল ওপরের তলাটা একবাব ঘুরে এসে প্রথমে রান্নাঘরেই গেলেন। সেকেলে বিলিতি কায়দার রান্নাঘর। জায়গা প্রচুর।

'আপনার কাজ কি হয়ে গেছে মিসেস লাহিড়ী?' একটু সঙ্কুচিতভাবেই জিজ্ঞাসা করলেন ঘোষাল।

'হ্যাঁ, এই হয়ে গেল বলে! রামসেবককে একটু মশলা বাটতে পাঠিয়েছি, চাকরটাও ওপরে সব পরিষ্কার করতে গেছে। এই ডালটা না দেখলে পুড়ে যাবে।' একটু লজ্জিতভাবে কণিকা বললে, 'যা খাওয়া আজ খাওয়াব, গোয়েন্দাগিরি ভুলে যাবেন।'

'আমায় খেতে দেবেন বলছেন, এই তো আমার ভাগ্য!' বলে ঘোষাল হাসলেন।

ডালটা নাড়তে-নাড়তে কণিকা বললে, 'কিন্তু দেখুন যত ভাবছি, আমার কেমন সব আজগুবি মনে হচ্ছে।'

'আজগুবি নয় মিসেস লাহিড়ী, একেবারে খাঁটি সত্যি।' ঘোষাল রান্নাঘরে পাতা একটা ছোট চৌকিতে গিয়ে বসলেন, 'কাগজে খুনির পোশাকের বর্ণনা তো পড়েছেন। আপনাদের এখানে তিনটি ঘরেই তো সে রকম ওয়াটারপ্রুফ আর বর্ষাতি-টুপি টাঙানো রয়েছে দেখলাম। তিনজনের যে কেউ হয়তো সেদিন কলকাতায় ছিলেন।'

'কিন্তু যাঁদের ওয়াটারপ্রুফ দেখেছেন, তাঁদের কেউই কলকাতার লোক নন। একটা বীরস্বামীর। তিনি তো পরেই এসেছেন। আর দুটো মধুসূদন আর আমার স্বামীর। আমার স্বামী তো এখানেই থাকেন, আর মধুসূদন পাটনা থেকে এসেছে।'

ঘোষাল একটু হেসে বললেন, 'তবু এখানকার কেউ যে খুনের দিন গত শুক্রবারে কলকাতায় গেছলেন, তার তো স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে।'

'প্রমাণ! কী প্রমাণ?' কণিকার ডাল নাড়া থেমে গেল।

মেঝে থেকে খবরের কাগজের একটা পাতা তুলে নিয়ে ঘোষাল বললেন, 'এই কাগজটা।'

'কিন্তু ওটা তো আনন্দবাজার। আমরা ওর গ্রাহক।' কণিকা ডালের হাঁড়িটা নামিয়ে কাছে এসে দাঁড়াল।

কাগজের পাতার মাথার দিকটা দেখিয়ে ঘোষাল বললেন, 'হ্যাঁ, আপনারা গ্রাহক হিসেবে যে কাগজ পান সেটা ডাক এডিশন মানে মফঃস্বল সংস্করণ। কিন্তু এ কাগজটা কলকাতার। সেখানেই কেনা হয়েছে।'

'কিন্তু ও কাগজ—ও কাগজ কোথা থেকে এল!' কণিকা ভাববার চেষ্টা করলে, 'পুরোনো কাগজ বলে আমি হল থেকে ওটা রান্নাঘরের কাজে লাগাতে নিয়ে এসেছিলাম।'

'মনে করতে চেষ্টা করুন, কে কাগজটা এনেছিল?' ঘোষাল কণিকাকে উৎসাহ দিলেন।

'না, মনে পড়েও পড়ছে না।' বলে কণিকা হতাশভাবে ঘোষালের দিকে চাইল।

'চেষ্টা করুন। এক সময়ে ঠিক মনে পড়ে যাবে।'

'তাহলে?' কণিকা সভয়ে প্রশ্নটা আর শেষ করতে পাবল না।

'হ্যাঁ, তাহলে একটা সূত্র অন্তত পাওয়া যেতে পারে এ রহস্যের।' ঘোষাল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এখন বুঝতেই পারছেন কল্যাণেশ্বরী স্বাস্থ্যনিবাস খুব নিরাপদ জায়গা আর নয়। আচ্ছা আপনারা তো সবে এটা খুলেছেন। এ বিষয়ে কোনও অভিজ্ঞতা আছে?'

'হোটেলে থাকবার অভিজ্ঞতা আছে, চালাবার নয়। বিয়ের পর বাসার অভাবে হোটেলেই বেশিরভাগ কাটিয়েছি কিনা।'

'বিয়ে আপনাদের কতদিন হয়েছে? কিছু যদি মনে না করেন অবশ্য,' ঘোষাল একটু কুণ্ঠিত।

'এই দেড় বছর মাত্র।'

একবার যেন ইতস্তত করে ঘোষাল জিজ্ঞাসা করলেন, 'জানাশোনা অনেক দিনের?'

কণিকা লজ্জিতভাবে বললে, 'না, একরকম হঠাৎ। উনি তখন সদাগরি জাহাজে কাজ নিয়ে ঘুরে বেড়ান, আমি এয়ার-হোস্টেসের কাজ করি। বোম্বেতে কদিনের দেখা। তারপরই বিয়ে। আমি এক দাদুর কিছু টাকা পেয়ে চাকরি ছেড়ে দিলাম, ওঁকে ছাড়ালাম। তারপর দেশে ফিরে হা-ঘর জো-ঘর করে দেড় বছর কাটিয়ে এই স্বাস্থ্যনিবাস খোলা!'

'আপনার স্বামী কি কলকাতার লোক?'

'না, ওঁরা প্রবাসী বাঙালি। আগ্রাতে বুঝি দু-তিন পুরুষ কেটেছে।' বলতে-বলতে কণিকার মনে হল স্বামীর আগের জীবনের কথা কতটুকুই বা সে জানে। প্রবীর সে বিষয়ে কখনও বিশেষ কিছু বলেনি। সে-ও আগ্রহ প্রকাশ করেনি। অতীত নিয়ে মাথা-ঘামাবার দরকারই বা কি বর্তমান যদি মধুর হয়।

'কিছু যদি মনে না করেন তো বলি।' ঘোষাল একটু হাসলেন, 'হোটেল চালাবার মতো বয়স আপনাদের হয়নি। আপনি তো বলতে গেলে—'

কণিকা হাসল—'তা বয়স কম কী? এই তো তেইশ হল আমার, আর—'

কণিকার কথা শেষ হওয়ার আগেই প্রবীর ঘরে ঢুকল।

'যা-যা বলেছেন ওঁদের বুঝিয়ে দিয়ে মোটামুটি খবর নিয়েছি। এবার চলুন।'

হ্যাঁ, আসুন মিসেস লাহিড়ী।' বলে ঘোষাল এগিয়ে গেলেন।

প্রবীর ও কণিকার সঙ্গে ঘোষাল ঘরে ঢুকতেই সেখানকার গুঞ্জন থেমে গেল।

তারপর প্রথমেই শোনা গেল মিস ধরের ঝাঁঝালো গলা, 'যা জানতে চান চটপট জিজ্ঞাসা করুন। ভালো হোটেলেই এসেছিলাম। এসে অবধি একদণ্ড স্বস্তি পেলাম না। দোষ পুলিশের! কোথায় কলকাতায় কী হয়েছে তার খোঁজ নিতে এসেছে এখানে! সব অকর্মার ধাড়ি। নইলে এতদিনে একটা খুনের কিনারা হয় না!'...

মিস ধরের মুখের তোড় বোধহয় সমানে চলত, কিন্তু ঘোষাল হাত তুলে তাঁকে থামালেন।

'আপনারা ব্যাপারটা মোটামুটি শুনেছেন। এখন শুধু একটি প্রশ্ন আমার করবার আছে।' ঘোষাল সকলের মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে বললে, 'চাঁপাখোলা অনাথ আশ্রমেব সঙ্গে আপনারা কে-কে জড়িত ছিলেন?'

ঘর একেবারে নিস্তব্ধ। সবাই একদৃষ্টে ঘোষালের দিকে তাকিয়ে।

'আমার কথাটার মানে ভালো করে নিশ্চয় বুঝেছেন।' ঘোষাল আবার বললেন, 'আপনাদের একজনের বিপদ একেবারে আসন্ন। কাব মাথায় সেই খাঁড়া ঝুলছে আমি জানতে চাই।'

তবু কারুর মুখে কোনও কথা নেই।

ঘোষালেব গলার স্ববে এবার একটু অধৈর্য প্রকাশ পেল, 'আচ্ছা আমি এক-একজন করে সকলকে জিজ্ঞাসা করছি। আপনি. .' ঘোষাল প্রবীরের দেওয়া কাগজটা একবার দেখে বললেন, 'আপনি বলুন মিঃ বীরস্বামী।'

'আমি!' বীরস্বামীর মুখে একটু হাসির আভাস খেলে গেল, 'আমি তো এদিকের লোক নই। নানা জায়গা ঘুরে বেড়াই। কলকাতার ওই ব্যাপারের কথা শুনিনি পর্যন্ত।'

ঘোষাল ফিরলেন মিস ধরের দিকে, 'আপনি?'

'আমি—আমি?' মিস ধর একটু যেন থতমত খেয়ে বললেন, 'এসব প্রশ্নের কোনও মানেই হয় না। আমার কোনও সম্পর্কই নেই ও ব্যাপারের সঙ্গে।'

'মধুসূদনবাবু!'

'আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন?'

'হ্যাঁ, আপনাকে ছাড়া আর কাকে?' ঘোষাল একটু হেসে বললেন, 'আপনার নামই তো মধুসূদন দত্ত।'

'হ্যাঁ, তবে আমি তো তখন নেহাত ছোট।' মধুসূদন যেন অনুশোচনার সঙ্গে বললে, 'এমন একটা দারুণ ব্যাপার জানবার বয়সই হয়নি। তা যদি—'

'ডাঃ বাজপেয়ী!' মধুসূদনকে কথা বাড়াতে না দিয়ে ঘোষাল ডাঃ বাজপেয়ীর দিকে ফিরলেন।

ডাঃ বাজপেয়ীর উত্তর দিতে একটু যেন দেরি হল, 'আমি, দাঁড়ান মনে করি—হ্যাঁ, আমি তখন বাঙ্গালোরে একটা ল্যাবরেটরিতে কাজ করি।'

'তাহলে কেউই আপনারা অনাথ আশ্রমের সঙ্গে সম্বন্ধ স্বীকার করছেন না?' ঘোষাল হতাশভাবে নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'তাহলে কেউ যদি আপনারা খুন হন, তার জন্যে নিজেই দায়ী হবেন।'

কথাটা বলে ঘোষাল ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কয়েক মুহূর্ত সবাই চুপ। তারপর মধুসূদন হেসে উঠে বললে, 'ব্যাপারটা খুব রোমাঞ্চকর কিন্তু। এই আমরা ক'জন। এর মধ্যে একজন মারা পড়বেন।'

'চুপ করো ফাজিল ছোকরা!' মিস ধর ধমকে উঠলেন।

কিন্তু মধুসূদন অত সহজে থামবার ছেলে নয়। মিস ধরের দিকে ফিরে সে বললে, 'ধরুন চুপিচুপি ঠিক আপনার পেছনে গিয়ে আমি হাজির হয়েছি। আপনি ফিরতে না ফিরতেই গলায় একটি ফাঁস। ব্যস।'

'থামুন মধুসূদনবাবু!' প্রবীর সরোষে যেন গর্জন করে উঠল, 'রসিকতার একটা সীমা আছে।'

'কিন্তু এটা যে সীমা-ছাড়ানো রসিকতা। আর রসিক সেই খুনে, যে আমাদের মধ্যেই লুকিয়ে আছে।' হঠাৎ সজোরে হেসে উঠে সে সকলের দিকে চেয়ে বললে, 'নিজেদের মুখগুলো যদি আপনারা দেখতে পেতেন!

হাসতে-হাসতেই মধুসূদন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

'অসভ্য বেয়াড়া মর্কট!' মিস ধর তিক্তস্বরে বললেন, 'পাগলাগারদে রেখে ওর চিকিৎসা করা দরকার।'

'চিকিৎসা হয়তো আমাদের অনেকেরই দরকার মিস ধর।' কণিকা মধুসূদনের পক্ষ নিয়েই বললে, 'মধুসূদনের একটু মাত্রাজ্ঞান কম। কিন্তু তার কারণও আছে। শুনলাম একবার ট্রেন অ্যাকসিডেন্টে পড়ে ও নাকি বারো ঘণ্টা গাড়ির তলায় চাপা পড়ে ছিল। নেহাত ভাগ্যের জোরে উদ্ধার পায়। তাতেই একটু কেমন হয়ে গেছে।'

'বিপদে পড়লেই যদি মাথা খারাপ হয়, অমন ননীর পুতুলের তাহলে দুনিয়ায় বাস করাই উচিত নয়। দাঙ্গার মধ্যে যে অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে...'

হঠাৎ মিস ধরকে থামিয়ে ডাঃ বাজপেয়ী সন্দিগ্ধভাবে বললেন, 'আপনি? দাঁড়ান। ঠিক দাঙ্গার সময় আমিও কলকাতায় এসেছিলাম, আপনার ছবি যেন তখন খবরের কাগজে দেখেছি। গোড়া থেকেই তাই আমি ভাবছিলাম কেমন আপনাকে চেনা-চেনা লাগছে।'

'আপনার স্মৃতিশক্তি তো খুব!' বীরস্বামী একটু বিদ্রুপের সুরে বললেন, 'খবরের কাগজের ছবি এতদিন আপনি মনে করে রেখেছেন।'

'মনে রাখবার একটু কারণও যে আছে।' ডাঃ বাজপেয়ী নিজের সাফাই দিলেন, 'ওঁর বিবৃতি যে বড় করে ছবিসুদ্ধ কাগজে বেরিয়ে ছিল, আর সে বিবৃতি একটু অসাধারণ। ওঁকেই জিজ্ঞাসা করুন না।'

'হ্যাঁ!' মিস ধর একটু গর্বভরেই স্বীকার করলেন, 'আমি তিনদিন মড়ার গাদায় একটা চৌবাচ্চার মধ্যে পড়েছিলাম। তিনদিন বাদে উদ্ধার যখন হই, তখন যে বাড়িতে ভাড়া ছিলাম, তাদের...'

হঠাৎ মিস ধর থেমে গেলেন।

'থামলেন কেন? বলুন মিস ধর!' ডাঃ বাজপেয়ীর স্বর বেশ রূঢ়।

'না, বলছিলাম—তিনদিন বাদে উদ্ধার পেয়ে আমায় একটা জায়গায় নিয়ে যায়।'

'সাধারণ জায়গা নয়, সেটা চাঁপাখোলা আশ্রম।' ডাঃ বাজপেয়ী কাছে এসে দাঁড়ালেন।

'হ্যাঁ, চাঁপাখোলা অনাথ আশ্রমই হল। তাতে হয়েছে কী?' মিস ধরের ঝাঁঝটা যেন এখন করুণ প্রতিবাদ হয়ে উঠেছে।

'হয়েছে এই যে, ওই তিনটি ভাইবোন আপনার বাড়িওয়ালারই ছেলেমেয়ে। আপনার সঙ্গেই তারা ওই আশ্রমে আশ্রয় পায়। তাদের আপনি চিনতেন।'

'হ্যাঁ, চিনতাম, কিন্তু তাই বলে তাদের ভার নিতে বললে আমি নেব কোথা থেকে।

আমি একলা মানুষ। ওসব ঝামেলা আমার পোষায়!' মিস ধর যেন কাতরভাবে কৈফিয়ত দেওয়ার চেষ্টা করলেন।

'তাহলে ওই ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আপনারও সংস্রব ছিল? আপনাকে অনুরোধ করা সত্ত্বেও আপনি ওদের ভার নেননি?' প্রবীরই এবার জিজ্ঞাসা করলে।

'না, নিইনি, নিইনি!' মিস ধরের গলা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল—'তখন কী করে জানব যে ওই অবস্থা তাদের ওখানে হবে? আমি তো জেনেশুনে তাদের ক্ষতি করিনি।'

'কিন্তু ইনস্পেক্টর ঘোষালকে একথা তাহলে জানালেন না কেন?' ডাঃ বাজপেয়ী জিজ্ঞাসা করলেন।

মিস ধর এবারে নিজেকে খানিকটা সামলে নিলেন, 'জানাতে যাবই বা কেন? যত সব বাজে প্রশ্ন! পুলিশ কী-ই বা করতে পারে! তাদের সাহায্য না হলেও আমার চলবে।'

'কিন্তু তবু কথাটা জানালে ভালো করতেন।' বলে ডাঃ বাজপেয়ী চলে যাচ্ছিলেন। বীরস্বামীর কথায় তাঁকে থামতে হল।

'আপনি কিন্তু এত কথা জানলেন কী করে ডাঃ বাজপেয়ী? শুধু খবরের কাগজের ছবি দেখে আর বিবৃতি পড়ে তো এত জানবার, বোঝবার কথা নয়।'

'আমি—মানে—' ডাঃ বাজপেয়ীকে এই প্রথম একটু অপ্রস্তুত দেখা গেল, 'আমার জানা—বোঝাটা খানিকটা স্মরণশক্তি, খানিকটা অনুমান থেকে বলে ধরে নিতে পারেন।'

ডাঃ বাজপেয়ী আর সেখানে দাঁড়ালেন না।

কণিকা এতক্ষণ মিস ধরকে একটু বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ করছিল। এবার সে বললে, 'হ্যাঁ, আমারও মনে পড়ছে। আপনি চাঁপাখোলা অনাথ আশ্রমে অনেকদিন ছিলেন।'

'তুমি—তুমি কী করে জানলে কণিকা?' প্রবীর তীক্ষ্ণস্বরে জিজ্ঞাসা করল।

কণিকা কিছু বলবার আগেই বীরস্বামীর হাসি শুনে সবাই চমকে উঠল। বীরস্বামী নিজের মনেই খুকখুক করে হাসছেন। তাঁর দিকে সকলকে চাইতে দেখে তিনি অপরাধীর মতো বললেন, 'আমায় মাফ করবেন। মধুসূদনবাবুর মতো আমারও মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে গেছে। সমস্ত ব্যাপারটা যত ভয়ঙ্কর, তত মজার লাগছে আমাব।'

'ও! আপনার মজার লাগছে বুঝি!' ঘোষাল তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের সুরে বলতে-বলতে ঘরে ঢুকলেন।

'মাফ করবেন, ইনস্পেক্টরসাহেব, মাফ করবেন। আমি অত্যন্ত দুঃখিত ও লজ্জিত। নাক-কান-মলা খেয়ে আমি চলে যাচ্ছি।'

বীরস্বামী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, কিন্তু যাওয়ার ধরনে মোটেই লজ্জা পাওয়ার লক্ষণ দেখা গেল না। যেন ভেতরে-ভেতরে একটা মজা উপভোগ করছেন, আর সে কাজটা কাউকে জানতে দিতে চান না, এমনি তাঁর মুখের ভাব। এবারও কণিকার মনে হল চটপটে চলার ভঙ্গিটা মোটেই পাকা চুলের সঙ্গে খাপ খায় না।

'এক কিম্ভূতকিমাকার!' মন্তব্য করলে প্রবীর।

'ভেতরে গন্ডগোল আছে নিশ্চয়ই। চেহারাটাই কেমন শয়তানের মতো।' ঘোষালও মনের কথাটা প্রকাশ করে ফেললেন, 'ওরকম লোককে এক চুল বিশ্বাস করতে নেই।'

কণিকা হঠাৎ বলে উঠল, 'আপনারও তাই মনে হয়েছে তাহলে। কিন্তু ওঁর বয়স তো অনেক বেশি। তবে সত্যিই কি তাই? ভদ্রলোক যেন ঠিক বুড়ো সেজে থাকেন মনে হয়। হাঁটেন কিন্তু বেশ জোয়ান পুরুষের মতো। হয়তো বুড়োর ছদ্মবেশেই থাকেন। আপনার

কি মনে হয় মিঃ ঘোষাল?'

ঘোষাল একটু যেন রূঢ়ভাবেই কণিকাকে দমিয়ে দিলেন, 'আজেবাজে জল্পনা করে কোনও লাভ আছে কণিকা দেবী? অনুমান নয়, আমাদের প্রমাণ দরকার। আপাতত ফোনটা মেরামত করবার ব্যবস্থা না করলেই নয়। আসুন মিঃ লাহিড়ী, দেখি কী করা যায়।' প্রবীরকে নিয়ে ঘোষাল বেরিয়ে গেলেন।

নিস্তব্ধ দুপুর থই-থই বন্যার জলের মাঝখানে কল্যাণেশ্বরী স্বাস্থ্যনিবাসের বাড়িটা বাইরে থেকে দেখলে সেখানে অতবড় একটা উদ্বেগ, আশঙ্কাময় নাটকের রহস্য-নাটিকার ভূমিকা চলছে কেউ তা ভাবতে পারত না। বন্যার অস্থির তরঙ্গের মাঝখানে বাড়িটা যেন শান্ত, স্থির, সমাহিত।

সে বাড়ির গোনা-গুনতি বাসিন্দার প্রত্যেকে তখন কিন্তু নিজের-নিজের গোপন উদ্বেগ ও ভাবনায় অস্থির। এক-এক করে তাদের গতিবিধি একটু লক্ষ করা যেতে পারে।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর ঘোষাল টেলিফোনের তারটা বাড়ির যেখান দিয়ে গেছে দেখতে-দেখতে যাচ্ছিলেন। সঙ্গে প্রবীর।

'ওপরে এক্সটেনশন লাইন গেছে না?' প্রবীরকে জিজ্ঞাসা করলেন ঘোষাল।

'হ্যাঁ, ওপরের হলেও একটা টেলিফোন আছে।' প্রবীর উত্তর দিলে।

'আচ্ছা, আমি একবার দেখে আসি।' বলে ঘোষাল সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলেন।

সেই সময়টাতে বীরস্বামীকে এদিক-ওদিক একটু ঘুরে ওপরের হলঘরে ঢুকতে দেখা গেল।

হলঘরের এক কোণে বড় একটা অর্গ্যান আগেকার দিনের চিহ্নস্বরূপ পড়ে আছে।

ওপরের ঢাকনাটা সরিয়ে বীরস্বামী এক আঙুলে ক'টা চাবি টিপে একটু বাজাবার চেষ্টা করলেন।

না, অর্গ্যানটা একেবারে খারাপ হয়ে যায়নি। একটু বেসুরো হলেও এখনও আওয়াজ বেরোয়।

বীরস্বামী বাজাবার চরকি-টুলটায় বসে পড়ে এক আঙুলে একটা গানের সুর বাজাতে লাগলেন।

গানটা যার জানা সে বুঝতে পারত সেটা হালফিল হুজুগ-তোলা একটা ফিল্মের গান।

মধুসূদন তার নিজের শোয়ার ঘরে শিস দিতে-দিতে পায়চারি করছিল। হঠাৎ শিস থামিয়ে সে বিছানার ধারে বসে দু-হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে হতাশভাবে যেন অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল, 'পারব না, আমি পারব না।'

তারপর নিজেকে বুঝি সে সামলে নিলে। উঠে দাঁড়িয়ে সে নিজেকেই যেন উৎসাহ দিলে, 'না—শক্ত আমায় হতেই হবে।'

প্রবীর নিচের ঘরে টেলিফোনটা পরীক্ষা করছিল। হঠাৎ টেবিলের ঢাকনার নিচে

একটা আধখানা বেরিয়ে আসা কাগজ তার নজরে পড়ল। কাগজটা বার করে দেখেই তার মুখের চেহারা একেবারে বদলে গেল।

কাগজটা কলকাতার কোনও এক নামকরা স্টেশনারি দোকানের রসিদ।

রসিদের তারিখ ৬ই নভেম্বর।

৬ই নভেম্বর তো সেই শুক্রবার। সেদিন নিজে সে স্বাস্থ্যনিবাসে ছিল না।

সকালে বেরিয়ে রাত্রে ফিরেছিল।

কণিকা তাহলে কলকাতাতেই গেছল তারই মধ্যে!

কণিকা রান্নাঘরে বিকেলের জলখাবারের ব্যবস্থা করছিল। ভাগ্যে সেদিন বরাকরে গিয়ে গাড়ি-ভর্তি জিনিসপত্র এনেছিল তাই। নইলে এতগুলো মানুষকে তো উপোস করে মরতে হত। কিন্তু জলখাবারের কিছু অদল-বদল করা তো অসম্ভব।

যা জিনিসপত্র ভাঁড়ারে আছে তা দিয়ে জলখাবারের কী নতুন কিছু করা যায়—ভাবতে-ভাবতে প্রথমে খবরের কাগজে নতুন রান্নার নির্দেশ, এবং তা থেকে সেদিনের সেই আনন্দবাজার পত্রিকার কথা মনে পড়ল।

কার হাতে কাগজটা সেদিন যেন দেখেছিল, কিছুতেই তা মনে পড়ছে না। হলঘরে ডাঃ বাজপেয়ী কি? না-না, বাজপেয়ী নন। কাগজটা কে যেন এনে এক কোণে ফেলে—

হঠাৎ কণিকার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়ে মনে হল যে, যেন নিশ্বাসটা বন্ধ হয়ে যাবে।

না-না এ হতে পারে না! কখনও হতে পারে না।

বেশ কিছুক্ষণ অসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে সে ধীরে-ধীরে রান্নাঘর থেকে বেরুল।

সমস্ত বাড়িটা নিস্তব্ধ। না, নিস্তব্ধ ঠিক নয়। কোথা থেকে অস্পষ্টভাবে শিস শোনা যাচ্ছে। সেই হতচ্ছাড়া ফিল্মের গানটার সুর।

না, আপাতত তার আবার রান্নাঘরেই ফিরে যাওয়াই ভালো। সেখানে অন্তত খানিকটা একা-একা সমস্ত ব্যাপারটা ভাবা যাবে।

ডাঃ বাজপেয়ী ওপরে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে আর একটি ঘরে ঢুকলেন।

'কেমন আছেন বেণীবাবু?'

বিছানায় গলা পর্যন্ত সাদা চাদর ঢাকা দিয়ে বৃদ্ধ বেণীবাবু শুয়ে-শুয়ে একটা বই পড়ছেন। বইটা মুড়ে রেখে হাসিমুখে বললেন, 'ভালো, বেশ ভালো।'

বাঁধানো দাঁতগুলো খোলা থাকার দরুন কথাগুলো তাঁর অত্যন্ত অস্পষ্ট।

'তা ভালো হয়েও বিছানায় শুয়ে-শুয়েই কাটাবেন? একটু উঠে হেঁটে বেড়াবেন না?'

বেণীবাবু ফোকলা মুখে বললেন, 'বেড়াবার জায়গা কি কোথাও রেখেছেন?' তারপর নিজেই আবার বললেন, 'আমার এই শুয়ে-শুয়েই বিশ্রাম করবার জন্যে আসা। আমার জন্যে ভাববেন না।'

'আচ্ছা, তাহলে বিশ্রাম করুন।' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এদিক-ওদিক চেয়ে ডাঃ বাজপেয়ী হঠাৎ মেথরদের সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেলেন।

নিচে নেমে আবার তাঁকে সতর্কভাবে এদিক-ওদিক চাইতে দেখা গেল।

না, কেউ নেই এদিকে।

এবার তিনি সন্তর্পণে পেছনের দিকের একটা বড় ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। ঘরের দরজাটা বন্ধ, তবে তালা দেওয়া নয়। একটা দড়ি দিয়ে কড়াদুটো বাঁধা। যা করতে চান, এই তার ঠিক সময়!

ডাঃ বাজপেয়ী ক্ষিপ্র নিপুণ হাতে দড়ির বাঁধন খুলে ঘরটার ভেতরে ঢুকলেন।

মিস ধর নিজের ঘরে বসে রেডিওটা চালিয়ে দিলেন। নিচের হলঘর থেকে জেদ করে এটা তিনি নিজের ঘরে আনিয়েছেন।

রেডিও শোনবার জন্যে নিচ-ওপর তিনি করতে পারবেন না, আর অন্য কারুর যখন আগ্রহ নেই তখন তাঁর ঘরে এটা থাকলে দোষ কি!

ওপরের ইলেকট্রিক লাইনের নতুন ফিউজটা লাগাবার সময়ে প্রবীরকে দিয়েই তিনি এ কাজটা করিয়ে নিয়েছেন।

প্রথম চাবি ঘোরাতেই কী একটা বকবকানি শোনা গেল। বিরক্ত হয়ে চাবিটা আর একটু ঘোরাতেই একটা গান ভেসে এল।

কী ছাই গান! যেমন গানের কথা, তেমনি সুর!

গানটাও বন্ধ করে দিতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ পেছনের দরজাটা খোলার শব্দে চমকে ফিরে তাকালেন, 'আরে, আমি ভাবলাম...'

কী ভাবলেন তা আর না-বলে মিস ধর রেডিও নিয়ে পড়লেন, 'কী সব আজে-বাজে গান যে দেয় ছাই, শুনলে গা জ্বালা করে!'

'শুনে আর কী হবে!'

'কিন্তু না-শুনে কী করি? আগে জানলে এমন জেলখানায় আসতাম! চারিদিকে জল, আর তার মাঝখানে ঠুঁটো হয়ে কোন এক খুনে বদমাশের সঙ্গে দিন কাটানো! আমার অবশ্য ওসব আজগুবি কথায় বিশ্বাস নেই।'

'সত্যি বিশ্বাস নেই?'

'তার মানে? কী—কী ব্যাপাব—' মিস ধর চিৎকার করে উঠলেন।

মিস ধরের চিৎকার মাঝখানে থেমে গেল। ওয়াটারপ্রুফের বেল্টটা নিপুণ হাতে ছিঁড়ে গলায় লাগিয়ে তখন ফাঁস টেনে শেষ করে দেওয়া হয়েছে।

রেডিওর চাবিটা আর একটু ঘুরিয়ে দিতেই, ফিল্মের সস্তা গানটা গাঁক-গাঁক করে বেজে উঠল।

অন্য কোনও আওয়াজ আর বিশেষ শোনা গেল না।

খুনি আনাড়ি নয়।

নিচের হলঘরে একটা দুঃসহ থমথমে আবহাওয়া। বৃদ্ধ বেণীবাবুও তাঁর বিছানা ছেড়ে নেমে এসেছেন।

কণিকার মুখ এখনও একেবারে ছাইয়ের মতো সাদা। প্রবীর তাকে কয়েক ফোঁটা ব্র্যান্ডি খেতে দিয়েছে। কিন্তু সমস্ত শরীর তার যেন থেকে-থেকে কেঁপে উঠছে।

মিস ধরকে চা দিতে গিয়ে সে-ই প্রথম তাঁর মৃতদেহ আবিষ্কার করে।

'আচ্ছা, আপনি ভালো করে আর একবার ভেবে দেখুন, মিস ধরের ঘরে যাওয়ার সময় আপনি কাউকে দেখতে বা কিছু শুনতে পাননি?' ঘোষাল যতখানি সম্ভব স্বাভাবিক গলায় জিজ্ঞাসা করলেন।

'হ্যাঁ, একটা শিসের শব্দ। না-না, সেটা অনেক আগে। আমি যেন দরজা বন্ধ করার একটা শব্দ শুনলাম।'

'কোথায়?'

কণিকা একটু ভেবে বললে, 'যেন বাড়ির পেছনে মনে হয়েছিল।'

'ভালো করে মনে করবার চেষ্টা করুন মিসেস লাহিড়ী, আপনার মনে করার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে।'

'না-না, আমি কিছু মনে করতে পারছি না!' কণিকা কাতরভাবে মাথা নাড়ল।

'কেন ওকে মিছিমিছি কষ্ট দিচ্ছেন?' প্রবীর তীব্র প্রতিবাদ জানাল।

ঘোষাল একটু হেসে বললেন, 'কষ্ট আমি ইচ্ছে করে দিচ্ছি না মিঃ লাহিড়ী। কিন্তু খুনের তদন্ত কি খুব মধুর হয়?'

একটু চুপ করে থেকে ঘোষাল আবার বললেন, 'ব্যাপারটা মনে হচ্ছে এখনও কত গুরুতর, আপনারা সবাই বুঝতে পারেননি। মিস ধর আমার কাছে সত্য কথা বলেননি। তার ফল কী হয়েছে তা আপনারা জানেন। এখনও সব কথা যদি জানা না-যায়, তাহলে আর-কাউকে হয়তো জীবন দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।'

'কেন?' বৃদ্ধ বেণীবাবুই জিজ্ঞাসা করলেন। বাঁধানো দাঁত পরে তাঁর কথাগুলো এখন অন্তত স্পষ্ট।

'কেন তা আমি ঠিক জানি না, তবে মনে হয় তিন ভাইবোনের নামে তিনজনের প্রাণ নেওয়াই খুনির উদ্দেশ্য। তাছাড়া হ্যান্ডবিলের পেছনে যে কথাটা পেন্সিলে লেখা ছিল সেটাও মনে রাখা দরকার— গিরি মাঝি লেনে শুরু স্বাস্থ্যনিবাসে শেষ। সে শেষ হয়ে গিয়ে থাকলে আমরা খুশিই হব, কিন্তু তবু সাবধান হওয়া উচিত।'

'সাবধান কীভাবে হবেন? বাইরে থেকে কারুর আসবার উপায় নেই। সুতরাং আমাদেরই একজন যে খুনি এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেই একজন যে কে তা বোঝবার উপায় আছে কি?' বীরস্বামীর গলার স্বরে পুলিশের ক্ষমতায় অশ্রদ্ধাই প্রকাশ পেল।

ঘোষাল একটু ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, 'সেই উপায়ও বার করতে হবে। আচ্ছা, আপনারা প্রত্যেকে যে বিবরণ আমায় দিয়েছেন, আমি আর একবার তা পড়ে শোনাচ্ছি।'

নোট-বইটা বের করে ঘোষাল এক-এক করে পড়ে শোনালেন।

'মধুসূদনবাবু! আপনি বলছেন যে ঘর থেকে বেরোননি?'

'না।' মধুসূদন যেন কেমন বদলে গিয়েছে। তার সে স্ফূর্তির উচ্ছ্বাস কোথায় গিয়েছে উবে।

'বেণীবাবু!... না, আপনি তো বিছানা থেকে ওঠেননি জানি।...প্রবীরবাবু! আপনি টেলিফোনটা পরীক্ষা করছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'বীরস্বামী ওপরের হলঘরে অর্গ্যান বাজাচ্ছিলেন?'

'তাকে বাজানো বলে না।' শুধু বীরস্বামীই যেন এই ঘটনার পরও সমান তাজা আছেন—'এক আঙুলে একটা গান বাজাবার চেষ্টা করছিলাম।'

'কী গান?'

'আপনাদের বাংলাদেশের এখনকার সবচেয়ে চালু গান। বিড়িওয়ালা থেকে গরুর গাড়ির গাড়োয়ানরাও যে গান গায়।'

'কী সে গান?' ঘোষাল যেন একটু অধৈর্যের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন।

'আপনি জানেন না বুঝি? সেই একটা ফিল্মের গান। পাশের ঘরে মধুসূদনবাবুও তো এই গানের সুরেই শিস দিচ্ছিলেন।'

ঘোষাল ভুরু কুঁচকে মধুসূদনের দিকে তাকাতে সে যেন একটু বিব্রত হয়ে বললে, 'ঠিক জেনেশুনে ও সুর ভাঁজিনি, নিজের অজান্তেই এসে গেছল।'

ডাঃ বাজপেয়ী এর মাঝে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা টেলিফোনের লাইন কি আপনা থেকেই খারাপ হয়ে গেছে, না কেটে দিয়েছে কেউ? কিছু জানতে পারলেন?'

'পেরেছি। নিচের খাওয়ার ঘরের বাইরের দেওয়ালেই তারটা কাটা। আমি সেই কাটা জায়গাটা তখন সবে খুঁজে বার করেছি, এমন সময় চিৎকার শুনলাম। কিন্তু চিৎকারটা যেন মাঝপথেই থেমে গেল মনে হল। কিন্তু আপনি ডাঃ বাজপেয়ী! আপনি বলছেন বেণীবাবুর ঘরে গেছলেন?'

'হ্যাঁ—মানে—তাঁর ঘরেই থাকিনি।' ডাঃ বাজপেয়ী বেণীবাবুর দিকে চেয়েই যেন একটু বেশি বিব্রত হয়ে পড়ে বললেন, 'আমি আবার নিজের ঘরে ফিরে গিয়েছিলাম।'

'তাহলে মিস ধরের চিৎকার তো আপনার শোনবার কথা। চিৎকারটা হঠাৎ মাঝপথে বন্ধ হয়ে গেছল কি?' ঘোষাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ডাঃ বাজপেয়ীর দিকে তাকালেন।

'হ্যাঁ—মানে, সেই রকমই যেন মনে পড়ছে।'

'এ তো যেন-যদির কথা নয় ডাঃ বাজপেয়ী!' ঘোষালের স্বর বেশ কঠিন, 'স্মৃতিশক্তি তো আপনার ভালোই বলে শুনেছি।'

'আপনি মিছিমিছি সময় নষ্ট করছেন মিঃ ঘোষাল।' শুধু ঘোষাল নয়, আর সকলেও প্রবীরের আচমকা এই কথায় একেবারে চমকে উঠল।

ঘোষালের মুখ-চোখ আত্মসংযমের চেষ্টা সত্ত্বেও লাল হয়ে উঠেছে তখন।

'কোনটা মিছিমিছি করেছি বলুন?' ভদ্রভাবে বলার চেষ্টা করেও ঘোষালের গলার স্বর একটু অস্বাভাবিকই শোনাল।

'আসল কাজ না করে আর যাই করুন, তাতে মিছিমিছি সময় নষ্ট।' প্রবীর দৃঢ়ভাবে জানাল।

'আসল কাজটা কী?' এতক্ষণে ঘোষালের মুখ দিয়ে হাসি ফুটে উঠল।

'আসল কাজ, সবকিছু প্রমাণ যাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, তাকে এখুনি গ্রেপ্তার করে সমস্ত ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করা।'

'কে সে?' ঘোষালের মুখ আবার কঠিন হয়ে গেল।

প্রবীর নাটকীয়ভাবে আঙুল দিয়ে দেখাতেই মধুসূদন কাতরভাবে চিৎকার করে উঠল, 'না-না, আমি কিছু জানি না, এসব আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র—আমি জানি...'

'শান্ত হোন মধুসূদনবাবু!' বৃদ্ধ বেণীবাবুই বলে উঠলেন।

'কিছু ভয় নেই মধু!' কণিকা তার কাছে এসে তার হাতটা ধরে দাঁড়াল, 'কেউ তোমার বিরুদ্ধে নয়, কোনও ভয় নেই।'

ঘোষালের দিকে ফিরে কণিকা ব্যাকুলভাবে বললে, 'বলুন মিঃ ঘোষাল, বলুন ওকে গ্রেপ্তার করবেন না!'

ঘোষাল নিজেই একটু বিমূঢ় হয়ে গেছলেন হঠাৎ এই নাটকীয় ব্যাপারে। তিনি হেসে বললেন, 'আমি কাউকেই গ্রেপ্তার করছি না। গ্রেপ্তার করার জন্যে প্রমাণ দরকার। এমন কোনও প্রমাণ আমি এখনও পাইনি।'

'যথেষ্ট পেয়েছেন।' প্রবীর তীব্রস্বরে বললে, 'কণিকার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, আর আপনাদেরও বোধহয় সকলের। সেই তিন ভাই-বোনের একজন যদি এখানে সত্যিই আছে মনে করেন, তাহলে সে মধুসূদন ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। ওর বয়স দেখুন, ওর ছেলেবেলার কথা জিজ্ঞাসা করুন—'

'তুমি একটু থামবে!' কণিকার চোখে এমন একটা দীপ্তি যে প্রবীরকে থামতে হল।

কণিকা ঘোষালের দিকে ফিরে শান্তস্বরে বললে, 'আপনার সঙ্গে আমার গোপনে একটা কথা আলোচনা করবার আছে।'

'বেশ তো!' বলে ঘোষাল সকলের দিকে চাইলেন।

'আমরা যাচ্ছি।' বলে আর সবাই বেরিয়ে গেলেও প্রবীর কিন্তু দাঁড়িয়ে রইল।

'তোমাকেও যেতে হবে।' কণিকা দৃঢ়স্বরে বললে।

কণিকার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে প্রবীর এবার বেরিয়ে গেল।

'কী বলতে চান বলুন।' ঘোষাল উৎসুক দৃষ্টিতে কণিকার দিকে চাইলেন।

'শুনুন মিঃ ঘোষাল, আপনারা সবাই ধরে নিয়েছেন যে সেই তিন ভাই-বোনের যে বড়, সে-ই এসব ব্যাপারের মূলে আছে।'

'সেই রকম অনেকগুলো প্রমাণ যে পাওয়া গেছে।'

'কী পাওয়া গেছে!' কণিকা উত্তেজিতভাবে বললে, 'গিরি মাঝি লেনের খুনির মুখ কেউ দেখেনি। ওয়াটারপ্রুফের তলায় কে কমবয়সি কে বুড়ো কিছু বোঝা যায় না, নেহাত বেণীবাবুর মতো অথর্ব যদি না হয়। এখানে মিস ধরকে যে খুন করেছে, সে যুবক না প্রৌঢ় কে বলতে পারে!'

'কিন্তু প্রৌঢ় হলে তার এসব খুন করার একটা কারণ তো চাই!' ঘোষাল বললেন।

'কারণ কি কিছু থাকতে পারে না? আপনারা সেই তিনটি ছেলেমেয়ের কথাই জানেন। তাদের কোনও কাকা কী মামা কি থাকতে পারে না, যে হয়তো সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ নয়—সে-ই অনাথ আশ্রমের অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করছে?'

'কাকা-মামা কেউ ছিল কি না ঠিক জানি না। কিন্তু এরকম সন্দেহ আপনার হল কেন?'

'হল ডাঃ বাজপেয়ীকে দেখে। তাঁর অনেকগুলো চালচলন কেমন অদ্ভুত। তাছাড়া পুলিশ আসছে শুনে তাঁর মুখের ভাব কীরকম বদলে গিয়েছিল, আমি স্পষ্ট লক্ষ করেছি।'

ঘোষাল এতক্ষণে বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠলেন, 'পুলিশ আসছে শুনে মুখের ভাব বদলে গিয়েছিল সত্যি!'

'হ্যাঁ, আমি স্পষ্ট দেখেছি। ওই মুখোশের মতো মুখ দেখছেন তো। সেই মুখের চেহারাও অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল।'

'হুঁ!' ঘোষাল একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'এটা ভাববার কথা। ব্যাপার কী জানেন মিসেস লাহিড়ী, এসব ব্যাপারে অত্যন্ত সাবধানে অনেক দিক বিচার করে আমাদের কাজ করতে হয়। কার ভেতর যে কী আছে আমরা বাইরে থেকে কিছুই জানি না। অত্যন্ত আপনার লোকের বেলাতেও না।'

কথাটা বলে যেন একটু অস্বস্তি বোধ করেই ঘোষাল চলে গেলেন। কণিকার মুখ-চোখ তখন লাল হয়ে উঠেছে। যে কথাটা মনের ভেতর সে চেপে রাখতে চাইছে, ঘোষাল সেই কথাটাই তাকে স্পষ্ট করে শুনিয়ে দিয়েছেন বলেই কি তার এই অসহ্য অস্বস্তি?

'অত্যন্ত আপনার লোকের বেলাতেও না!' কথাটা গানের ধুয়ার মতো কেবলই যেন তার কানে বাজছে।

বন্যা, ভূমিকম্প, মৃত্যু, হত্যা যা-ই ঘটুক না কেন, মানুষকে তবু আহারের চিন্তা করতে হয়। আর তার দায়িত্ব শুধু মেয়েদের।

চাকর-বাকররাও এইসব ব্যাপারে কেমন যেন ভ্যাবাচাকা হয়ে গেছে। তাই কণিকাকে রান্নাঘরের কাজ নিজেকেই দেখতে হয়।

রান্নাঘরে উনুনে ভাতের হাঁড়ি চাপিয়ে দিয়ে সে একাই তখন তরকারির মশলা বাটছিল, এমন সময় হাঁফাতে-হাঁফাতে মধুসূদন সেখানে ঢুকল।

'শুনেছেন কণিকা দেবী, শুনেছেন!'

কণিকা চমকে উঠে দাঁড়াল, 'আবার কী হয়েছে?'

'ইনস্পেক্টর সাহেবের রবারের ভেলাটা চুরি গেছে। ইনস্পেক্টরের কী রাগ, যদি দেখতেন!'

'কিন্তু সে রবাবের ভেলা চুরি যাবে কেন? তাতে কার কী লাভ?' কণিকা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

'আমিও তো তাই ভাবছি। ইনস্পেক্টর যদি হার মেনে ববারের ভেলা করে চলেই যান, তাহলে তো খুনিরই সুবিধে। ইনস্পেক্টব যাতে যেতে না পারেন সে-ব্যবস্থা সে করবে কেন? সত্যি যেন মানে হয় না কোনও কিছুর।'

কণিকাকে চুপ করে থাকতে দেখে মধুসূদন আবাব জিজ্ঞাসা করলে, 'কী ভাবছেন বলুন তো?'

'ভাবছি, মানে হয।'

'কী মানে?'

'খুনি ওই রবারের ভেলা লুকিয়েছে নিজে পালাবার জন্যে। আজ রাত্রের মধ্যেই যদি সে ধরা না পড়ে, তাহলে তাকে আর পাওযা যাবে না।'

'বাহবা রে বাহবা! শেষপর্যন্ত খুনি ধরাই পড়বে না!' মধুসূদন হতাশাব মুখভঙ্গি করে বললে, 'কিন্তু তাহলে তো ডিটেকটিভ গল্প হল না?'

'জীবনটা ডিটেকটিভ গল্প নয় মধু!' কণিকা গম্ভীবভাবে বললে, 'এখানে অনেক গল্পই মাঝপথে ছিঁড়ে যায।'

কণিকাব দিকে খানিক একটু অবাক হয়ে চেয়ে থেকে মধুসূদন বললে, 'না, আপনি বড় গম্ভীর হয়ে উঠছেন, আমি পালাই।'

'না, যেও না।' কণিকা বাধা দিলে।

মধুসূদন সত্যিই যেন বিমূঢ়, 'আপনি চান না যে আমি যাই। সত্যি বলছেন?'

'হ্যাঁ, একা থাকতে আমার ভালো লাগছে না।'

'কিন্তু আমার সঙ্গে একা থাকতে ভয় করছে না? আমি যদি—আমি যদি সেই খুনে হই?' মধুসূদন স্থির দৃষ্টিতে কণিকার দিকে তাকাল।

'তাহলে আমার ভুল বিশ্বাসের প্রায়শ্চিত্ত করব প্রাণ দিয়েই।' বলে কণিকা হাসল। তারপর অকারণেই চোখদুটো মুছে বললে, 'না, শোনো, তোমায় অত্যন্ত জরুরি কথা আমার বলবার আছে।'

'কী?' মধুসূদন একটু অস্বস্তির সঙ্গে চোখটা ফিরিয়ে নিলে।

'তোমার নাম সত্যি মধুসূদন দত্ত নয়।'

অনেকক্ষণ মধুসূদনের মুখে কথা নেই। তারপর ধীরে-ধীরে প্রায় অস্পষ্ট স্বরে সে বললে, 'না, কিন্তু আপনি কী করে জানলেন।'

'জানিনি, কিন্তু সন্দেহ হয়েছে। কী তোমার আসল নাম?'

'বলে কী হবে?' বলে মধুসূদন কাতরভাবে কণিকার দিকে তাকাল।

'তবু একজনকে বিশ্বাস করে তুমি শান্তি পাবে! বলো।' কণিকার স্বরে কোমল অনুনয়।

'না, আমার নাম মধুসূদন সত্যি নয়।' ধীরে-ধীরে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললে মধুসূদন, 'আমার আসল নাম পবিত্র রায়। আমি—আমি পাটনা থেকেও আসিনি, এসেছি কলকাতা থেকেই পালিয়ে। আমাব চিঠির খামটা আপনারা লক্ষ করেননি নিশ্চয়, তার পোস্ট অফিসের ছাপ দেখলেই বুঝতে পারতেন। ভুল বোঝাবার জন্যে আমি মিথ্যে করে পাটনার ঠিকানা চিঠির ওপর দিয়েছিলাম।'

'কিন্তু কেন এসব করে দিলে!'

এখানে কিছুদিন লুকিয়ে থেকে বিদেশে কোথাও পালাব বলে। ভেবেছিলাম এই নির্জন স্বাস্থ্যনিবাসে কেউ আমার খোঁজ পাবে না, খোঁজ কববাব কথা ভাববেও না। গোলমাল ঠান্ডা হয়ে গেলে আমি নিঃশব্দে সরে পড়তে পারব।'

'কীসের গোলমাল সেইটেই তো বুঝতে পারছি না!' কণিকা বললে।

'এখুনি বুঝতে পারবেন। আমি শুধু একটা সুটকেস নিয়েই এসেছি, কিন্তু ওই সুটকেস নোটের তাড়ায় ভর্তি।'

'তুমি! তুমি চুরি করেছ!' কণিকা স্তম্ভিত।

'হ্যাঁ, চুবিই বলতে পাবেন। অবশ্য আমাব বাবাব টাকাই চুরি করেছি। আমাদের বড়লোক বোধহয় বলা যায়। বাবার অনেকরকম ব্যবসা আছে। তিনি আমাকে সেই ব্যবসাতে বসাতে চান, কিন্তু আমার ভালো লাগে না। বিশ্বাস করুন, আমার কাছে সেসব বিষ। আমি পড়তে চাই, বৈজ্ঞানিক হতে চাই, ক্ষমতা আমার কতদূর আমি জানি না, কিন্তু সে-ই আমার স্বপ্ন। বাবা অত্যন্ত রাশভারী জেদি লোক, শুধু নিজের মতেই চলেন। আর কারুর ইচ্ছে-অনিচ্ছে গ্রাহ্যই করেন না। একবার-দুবার বলতে গিয়ে ধমক খেয়ে আমি ভয়ে চুপ করে গেছি। কিন্তু অসহ্য লেগেছে আমার ওই ব্যবসাদারির কাজ! তাই শেষপর্যন্ত অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে পরিকল্পনা করে আগে থাকতে এখানে চিঠি দিয়ে একদিন একটি ব্যবসার সিন্দুকের সমস্ত নগদ টাকা নিয়ে পালিয়ে এসেছি। এই বন্যায় সব বন্ধ না হলে হয়তো খবরের কাগজে আমার ছবিসুদ্ধ বিজ্ঞাপন দেখতে পেতেন। বাবা নিজেব চেষ্টায় বড় হয়েছেন, তাঁর কাছে এরকম অপরাধের মার্জনা নেই।' মধুসূদন এক নিশ্বাসে এত কথা বলে একেবারে যেন ভেঙে পড়ল। একটা চৌকির ওপর বসে পড়ে দুহাতের মধ্যে মাথা গুঁজে আবার বললে, 'এখন আপনার ঘৃণা হচ্ছে? বলুন, সত্যি করে বলুন।'

'না মধু! এতটুকুও ঘৃণা হচ্ছে না।' কণিকার স্বর অত্যন্ত স্নিগ্ধ, 'কিন্তু তোমাকে ফিরে যেতে হবে। পালিয়ে যাওয়ার চেয়ে কাপুরুষতা কিছু নেই। তুমি তোমার বাবাকে শেষবার গিয়ে বলো, বলো, তাঁর ব্যবসার কাজ তোমাব দ্বারা হবে না। তাতে তোমার নিজের ইচ্ছেমতো কাজ যদি তিনি না করতে দেন, সব ছেড়ে তুমি চলে এসো। জীবনে যদি তারপর বিফলও হও তবু মাথা তোমার উঁচু থাকবে। বলো, যাবে?'

'যাব কণিকা দেবী!'

'কণিকা দেবী ভারি বিশ্রী শোনায়।' কণিকা হাসল, 'ওটা বোলো না।'

'কী বলব তাহলে?'

'কী বলবে জানো না!' কণিকা কপট রাগ দেখালে।

একটু বিমূঢ় হয়ে থেকে মধুসূদন হেসে ফেললে, 'না, এখন হঠাৎ লজ্জা করছে।'

'একটু রসভঙ্গ করছি বোধহয়।'

দুজনেই চমকে ফিরে তাকাল। প্রবীর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার মুখের চেহারা তার গলার স্বরের মতোই কঠিন।

পরমুহূর্তেই সে রাগে ফেটে পড়ল, 'এ-ঘরে কী জন্যে তুমি এসেছ? আর আমার স্ত্রীর সঙ্গেই বা গোপনে কী এত তোমার দরকার?'

মধুসূদন প্রথমটায় সত্যিই হকচকিয়ে গেছল। এবার নিজেকে সামলে হেসে বললে, 'আমি রান্না শিখছিলাম।'

'বেরিয়ে যাও এখান থেকে!' প্রবীর গর্জন করে উঠল, 'এখুনি এই মুহূর্তে!'

কণিকা এতক্ষণ কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এবার শান্ত দৃঢ় স্বরে বললে, 'যাও মধু।'

'আচ্ছা, যাচ্ছি তাহলে!' একটু হেসে দরজা পর্যন্ত গিয়ে মধুসূদন আবার ফিরল, 'আমি কিন্তু কাছাকাছিই থাকব।'

'বেরিয়ে যাও বলছি!' প্রবীরের এ মূর্তি কণিকা কখনও দেখেনি।

'যাচ্ছি! যাচ্ছি!' বলে মধুসূদন চলে যাওয়ার পরই প্রবীর ঘৃণাভরে কণিকার দিকে ফিরল 'মধু! লজ্জা না থাক, তোমার ভয়ও করে না ওই উন্মাদ খুনেটার সঙ্গে একঘরে থাকতে! ওকে তুমি এখনও চিনতে পারনি?'

কণিকা অদ্ভুতভাবে প্রবীরের দিকে চেয়ে থেকে বললে, 'না পারিনি। কাকে কতটুকু আমরা চিনি! চিনি মনে করাই ভুল।'

'কী তুমি বলতে চাচ্ছ!'

'কিছু না।' বলে কণিকা মুখ ফিরিয়ে নিলে।

হঠাৎ বেশ একটু সবলেই তাকে হাত ধরে নিজের দিকে ফিরিয়ে প্রবীর বললে, 'আমি তোমার দু-চক্ষের বিষ হয়ে উঠেছি হঠাৎ, না? এই মধুসূদনের সঙ্গে দেখা হওয়াব পরেই, কেমন?'

কণিকা কোনও উত্তর দিলে না। তার চোখদুটো তখন জ্বলছে!

প্রবীর আবার বললে, 'কিন্তু মধুসূদনের সঙ্গে নতুন আলাপ তো মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে, পুরোনো প্রেম আবার হঠাৎ দেখা হয়ে উথলে উঠেছে। কোথায় প্রথম দেখা হয়েছিল? কলকাতায়?'

কণিকার চোখের দৃষ্টি হঠাৎ বদলে গেল। জ্বালার বদলে সেখানে কেমন যেন একটা ভয় আর বিমূঢ়তা!

অস্পষ্টস্বরে সে বললে, 'কলকাতায়!'

'হ্যাঁ, কলকাতায় তুমি যাওনি শুক্রবারে, সারাদিন আমি যখন বাড়ি ছিলাম না সেই সুযোগে? কি, চুপ করে আছো কেন? গেছলে কি না বলো!' পকেট থেকে হঠাৎ দোকানের রসিদটা বার করে প্রবীর তার সামনে ধরলে, 'মনে যদি না থাকে তো তারিখটা পড়ে দেখো রসিদের।'

কণিকার মুখ আবার কঠিন হয়ে উঠল। ধীরে-ধীরে বললে, 'হ্যাঁ গেছলাম। হয়তো তোমার সঙ্গেও সেখানে দেখা হয়ে যেতে পারত।'

'আমার সঙ্গে!' প্রবীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কণিকার দিকে তাকাল।

'হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে।' কণিকা চৌকির ওপর থেকে খবরের কাগজটা তুলে প্রবীরের সামনে ধরে বললে, 'অতিবড় চালাক সাবধানিরও একটু ভুল হয়ে যায় মাঝে-মাঝে। এই কাগজটা যে কলকাতা থেকে কিনেছিলে সেটা ভুলে গিয়েই সঙ্গে করে এনেছিলে। কাগজটা যে তুমি এনেছ সেটাই আগে আমি মনে করতে পারছিলাম না। মিঃ ঘোষাল কাগজটা দেখিয়ে না দিলে জানতেও পারতাম না বা মনে করবার চেষ্টা করতাম না!'

'মিঃ ঘোষালের সঙ্গে এই নিয়ে তুমি আলোচনা করেছ?' প্রবীর উত্তেজিতভাবে কণিকার দিকে এগিয়ে এল।

'দাম্পত্য আলাপ বড় মধুর।' চাপাগলাব একটু হাসির সঙ্গে কথাগুলো শুনে দুজনেই ফিরে তাকাল।

বীরস্বামী যে কখন নিঃশব্দে এসে ঘরে ঢুকেছেন, তারা টেরই পায়নি।

'কিন্তু গরজের বড় বালাই।' বীরস্বামী আবার বললেন, 'ইনস্পেক্টর সাহেব একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছেন। আমাদের সকলকে এক্ষুনি তাঁর কাছে দোতলায় যেতে হবে।'

'কেন?' প্রবীর অপ্রসন্ন স্বরে জিজ্ঞাসা কবলে।

'কেন, সেইটেই তো মজা! পুলিশ যে আজকাল আবাব নাটুকে হয়ে উঠেছে তা জানতাম না। মিস ধর খুন হওয়ার সময় আমরা যে যেখানে যেভাবে ছিলাম তিনি তারই আবার কী বলে, পুনবাভিনয় চান। তাই থেকেই নাকি খুনিকে তিনি ধরে ফেলবেন।'

'এসব পাগলামির কোনও মানে হয় না!' প্রবীর তিক্তস্বরে বলে উঠল, 'আসল খুনিকে ছেড়ে রেখে দিয়ে উনি অভিনয়ের ছেলেখেলা কবছেন! এই অভিনয় করতে গিয়েই দেখবেন সাংঘাতিক কিছু একটা হবে।'

'সেটা আমারও ধারণা।' বীরস্বামী অদ্ভুত মুখভঙ্গি করলেন, 'কিন্তু আসল খুনিটা কে? ওই মধুসূদন?'

'তাছাড়া কে? চলুন।' বলে প্রবীর এগিয়ে গেল।

কণিকা কিন্তু আপত্তি জানিয়ে বললে, 'আমি কিন্তু যাচ্ছি না, আমার রান্নাবান্না আছে। আমি না গেলেও মিঃ ঘোষাল কিছু মনে করবেন না।'

'আমিও তাহলে থাকি আপনাকে সাহায্য কবতে?' বলে বীরস্বামী দাঁড়িয়ে পড়লেন।

'না-না, চলুন, সবাইকে যেতে হবে।' প্রবীর ফিরে দাঁড়িয়ে কঠিন স্বরে বললে।

বীরস্বামী আবার সেই অদ্ভুতভাবে খুকখুক করে হেসে বললেন, 'দেখছেন মিসেস লাহিড়ী, আপনার সঙ্গে মিঃ লাহিড়ী আমায় একা থাকতে দিতে চান না। আমাকে ওর ঠিক বিশ্বাস নেই।'

নিজের রসিকতায় নিজেই তিনি শুধু হাসলেন।

ওপরে যাওয়ার পর আর একবার সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে ঘোষাল বললেন, 'আগে যেখানে যেরকম যা হয়েছিল তাই আবার সকলকে করতে হবে বটে, কিন্তু একটু অন্যভাবে। প্রত্যেকের জায়গা এবার বদল হয়ে যাবে। যেমন নিচের ঘরে টেলিফোনের কাছে থাকবেন এবার ডাঃ বাজপেয়ী, আর তাঁর ঘরে আসবেন মিঃ লাহিড়ী। বীরস্বামী যাবেন রান্নাঘরে, আর তাঁর জায়গায় অর্গ্যান বাজাবেন মিসেস লাহিড়ী।'

'এ অদল-বদল কেন?' ডাঃ বাজপেয়ী বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন।

'কারণ, তাহলে আমাদের মধ্যে যিনি সত্য কথা বলেননি তাঁর ফাঁকি ধরা পড়বে।'

'কেমন করে আমি তো বুঝতে পারি না।' বৃদ্ধ বেণীবাবু বললেন।

ঘোষাল হেসে বললেন, 'বোঝার ভারটা আমার ওপরই ছেড়ে দিন না, আর তাছাড়া আপনাকে বদলি কোথাও যেতে হবে না। আপনি নিজের ঘরে যেমন শুয়েছিলেন তাই থাকবেন।'

'তাহলে আর দেরি কেন? শুভস্য শীঘ্রম।' বলে বীরস্বামী উঠে পড়লেন।

'দাঁড়ান বীরস্বামী!' ঘোষাল তাঁকে থামালেন, 'আপনি শুধু মিসেস লাহিড়ীকে একবার দেখিয়ে দিয়ে যান, কীভাবে বসে আপনি কী বাজিয়েছিলেন।'

'তাও দেখাতে হবে! বেশ।' বীরস্বামী কোণের অর্গ্যানটার কাছে গিয়ে টুলের ওপর বসলেন, তারপর বড় বাজিয়ের মতো সকলকে একবার মাথা নুইয়ে নমস্কার জানিয়ে গম্ভীরভাবে ঘোষণার সুরে বললেন, 'এইবার—এইবার আপনারা সুবিখ্যাত অর্গ্যানবাদক শ্রীরামানুজ বীরস্বামীর আশ্চর্য অর্গ্যান-বাদন শুনতে পাবেন।'

প্রবীর চাপাগলায় ঘোষালকে বললে, 'অসহ্য ভাঁড়ামি!'

'ওই ভাঁড়ামিটাও একটা মুখোশ, মিঃ লাহিড়ী!' বলে ঘোষাল হাসলেন, 'ওই মুখোশগুলোই ভেদ করতে হবে।'

বীরস্বামী তখন এক আঙুলে তাঁর বাজনা শুরু করেছেন। সে বাজনার সুরে কণিকার বুকের ভেতরটা পর্যন্ত কেমন শিউরে উঠল।

ঘোষাল তার দিকেই চেয়েছিলেন, জিজ্ঞাসা করলেন, 'পারবেন মিসেস লাহিড়ী এইভাবে বাজাতে?'

দাঁতে দাঁত চেপে কণিকা বললে, 'পাবব!' অদ্ভুত একটা অনুভূতি তার মধ্যে জাগছে। জাঁতাকলের মতো একটা ফাঁদ যেন ধীরে-ধীরে তাকে চেপে ধরছে। মুক্তি নেই, কিছুতেই মুক্তি নেই!

'তাহলে আপনি গিয়ে যথাস্থানে বসুন। আপনারাও চলুন যে যার নতুন জায়গায়।' বলে ঘোষাল আর সকলের সঙ্গে বেবিয়ে যেতে গিয়ে দরজায় একটু থেমে আবাব নির্দেশ দিলেন—'ঠিক পাঁচ মিনিট। সামনে হাতের ঘডিটা রেখে সময দেখে নিতে পারেন।'

ঘোষাল চলে গেলেন।

এক—দুই—তিন—চাব...

পাঁচ মিনিট হওয়ার আগেই শরীরটা আপনা থেকে কেমন শিউবে উঠল, কীরকম হঠাৎ যেন তার ভয়-ভয় করছে। এ বাড়িতে সে তো একলাও থেকেছে কতদিন। এরকম তো কখনও মনে হয়নি।

হঠাৎ দূর থেকে শিসের শব্দ সে শুনতে পেল। কে শিস দিচ্ছে মধুসূদনের জায়গায়? ডাঃ বাজপেয়ী নাকি? ডাঃ বাজপেয়ী শিস দিয়ে গানের সুর তুলতে পারেন তাহলে!

না, সময় তো হয়ে গিয়েছে। সে এক আঙুলে সুরটা বাজাতে লাগল। চাবিতে আঙুল লেগে সুর ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে তার সমস্ত শরীরের ভেতরটায় যেন একটা ভয়ের শিহরণ উঠেছে।

ওই তো মিস ধরের ঘরে রেডিওটা বেজে উঠল। মিঃ ঘোষালই নিশ্চয়ই চালিয়ে দিয়েছেন।

ঘাড়ে যেন জোলো হাওয়ার স্পর্শ পেয়ে কণিকা চমকে ফিরে তাকাল। ওদিকে কেউ দরজা খুলেছে নিশ্চয়ই। ঘরের পরদার দরুন ওদিকটা ভালো দেখা যায় না। সন্ধে হয়ে এসেছে। কিন্তু কই না, কেউ তো ঘরে আসেনি!

হঠাৎ কণিকার বুকটা কীরকম কেঁপে উঠল। যদি বীরস্বামীই নিঃশব্দে পরদা সরিয়ে

কাছে এসে দাঁড়ান! চুপিচুপি বলেন, 'কী বাজাচ্ছেন মিসেস লাহিড়ী, আপনার—কী বলে অন্ত্যেষ্টি-সঙ্গীত?'

জোর করে মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে কণিকা এই বিশ্রী মনের ভাবটা কাটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে।

কিন্তু—কিন্তু—একটা কথা হঠাৎ তার মনে হল। বীরস্বামী যে অর্গ্যান বাজিয়েছেন তা তো কেউ শুনেছে বলেনি! অর্গ্যান বাজাবার গল্পটাই কি বানানো?

তিনি কি অর্গ্যান না বাজিয়ে মিস ধরের ঘরেই গেছলেন?

ঘোষাল কি এইভাবেই তাঁর ফাঁকিটা ধরতে চেয়েছেন!

অর্গ্যান অবশ্য খুব আস্তে-আস্তে বাজাতে বলা হয়েছে। কিন্তু তবু এবারে যদি বাইরে সে আওয়াজ শোনা যায় তাহলেই বোঝা যাবে বীরস্বামীর কথা মিথ্যে।

ঘরের দরজাটা খুলে গেল। বীরস্বামীই এসেছেন ভেবে কণিকা চিৎকার করতে যাচ্ছিল। কী ভাগ্য সময়মতো সামলে নিতে পেরেছে নিজেকে। ঘোষাল কী ভাবতেন তাহলে!

ঘোষালই ঘরে ঢুকেছেন। কাছে এসে বললেন, 'ধন্যবাদ মিসেস লাহিড়ী!'

ঘোষালকে এত খুশি কণিকা এ পর্যন্ত দেখেনি।

'যা চাইছিলেন তা পেয়েছেন তাহলে?' কণিকা হেসে জিজ্ঞাসা করলে বাজনা থামিয়ে।

'হ্যাঁ!' ঘোষালের মুখে বেশ একটু গর্বের আনন্দ, 'ঠিক যা আশা করেছিলাম তাই।'

'কে মিঃ ঘোষাল?' কণিকা অধীর আগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে।

'বাঃ' কে আপনি জানেন না! এখনও বুঝতে পারেননি?' ঘোষাল হাসলেন, 'আপনার মতো বুদ্ধিমতী মেয়ের এতক্ষণে বোঝা উচিত ছিল।'

'কিন্তু আমি তো ঠিক...' কণিকা মনে-মনে ভেবে নিলে যে, বীরস্বামীর কথাটা নিজে থেকে বলা ঠিক হবে না।

'না, যত বুদ্ধিমতী আপনাকে ভেবেছিলাম, আপনি তা নন! হ্যাঁ, তা বলতে গেলে আপনি বেশ বোকামির পরিচয় দিয়েছেন আগেই।'

'কীসে?' কণিকা ক্ষুণ্ণস্বরে জিজ্ঞাসা করলে।

খুনির তৃতীয় শিকার কে হতে পারে তা আমায় বুঝতে দেননি। সেইজন্যে আপনার বিপদও বেড়েছে।'

'কিন্তু আমি তো আপনার কথা বুঝতে পারছি না!' কণিকা সত্যিই বিমূঢ়।

'বুঝতে পারছেন না? তবে শুনুন। আপনি আমার কাছে কথা লুকিয়েছিলেন মিস ধরের মতো।'

'আমি এখনও বুঝতে পারছি না, আপনি কী বলছেন।'

'খুব পারছেন!' ঘোষাল একটু যেন রূঢ় হলেন, চাঁপাখোলা অনাথ আশ্রমের সঙ্গে আপনার সংস্রব যে ছিল তা আপনি প্রথমে আমার কাছে স্বীকার করেননি। কিন্তু শেষপর্যন্ত ধরা পড়লেন। মিস ধরকে আপনি চিনতেন। চাঁপাখোলা অনাথ আশ্রমও আপনার জানা। তবে কেন আমার কাছে মিথ্যে বলেছিলেন?'

ছোট একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলে কণিকা বললে, 'তা আপনাকে বোঝাতে পারব না। আমি মন থেকে ও জায়গার স্মৃতি সত্যি মুছে ফেলতে চেয়েছিলাম।'

'হ্যাঁ, জানি কেন? আপনার নাম তখন কণিকা ছিল না।'

'হ্যাঁ, আমার নাম ছিল তপতী।'

'জানি, আপনার বয়স যা বলেছেন তাও সত্য নয়। তখনই আপনার বয়স উনিশ-কুড়ি, আপনি ওই অনাথ আশ্রমে মিসেস এম-ডির তাঁবেদারিতে হেঁসেলের কাজ করতেন।'

'না।'

'আমি বলছি হ্যাঁ।'

'না, না—বিশ্বাস করুন আমায়।'

'বিশ্বাসের যোগ্য আপনি নন। যে ভাইবোন তিনটি অনাথ আশ্রম থেকে পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে তারা শুধু আপানাকেই বিশ্বাস করে তাদের পালাবার কথা জানিয়েছিল, আর আপনি ম্যানেজার ও মিসেস এম. ডি.-কে তা জানিয়ে দেন।'

'এসব মিথ্যে! সব মিথ্যে!' কণিকা কাতরভাবে বলে উঠল, 'হেঁসেলে কাজ করতাম আমি নয়, করতেন আমার দিদি। আমরাও দাঙ্গায় নিরাশ্রয় হয়ে ওখানে জায়গা পেয়েছিলাম। ম্যানেজার মিঃ দাস আর তাঁর স্ত্রী ছিলেন পিশাচের মতো নির্মম। তাঁরা ছেলেমেয়েদের খেতে পর্যন্ত দিতেন না। দিদি তখন বড় বলে তাকে হেঁসেলে কাজ করতে হত সেখানে। ছেলেমেয়েদের দুঃখ দেখতে না পেরে দিদি ও আমি চুরি করে মাঝে-মাঝে তাদের খাবার এনে দিতাম। তার জন্যে ধরা পড়ে মার খেয়ে পিঠের চামড়াও উঠে গেছে। ছেলেমেয়ে তিনটি পালাবার সময় দিদি তাদের বুঝিয়ে প্রথমে বারণ করবার চেষ্টা করেছিল, তারা কিছুতেই না শোনায় তাদের সাহায্যও করেছিল খাবার আর পয়সা দিয়ে। কিন্তু দিদি নয়, হেঁসেলের আরেকজন চাকরানি তাদের পালাবার কথা জেনে ফেলে মিসেস এম-ডিকে খুশি করবার আশায় বলে দেয়। সেই ছেলেমেয়ে তিনটি তো ধরা পড়েই, দিদিরও শাস্তির শেষ থাকে না। শুধু সেই ছেলেটির মারা যাওয়ার কথাই সবাই জানে, আমার দিদিও সেই নির্যাতনের পর ধীরে-ধীরে বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে গিয়ে মারা যায়...।'

কণিকা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। তারপর মুখ তুলে বললে, 'সেসব দিনের কথা আমি সত্যি ভুলে যেতে চাই। আমি এই ক'বছরের জীবনে অনেক সয়েছি, দেখেছি, অনেক পেয়েছিও। তাই আগেকার সে সব দুঃস্বপ্নের দিন আমি একেবারে মুছে ফেলে একটু শান্তি চাই।'

'শান্তিই এবার পাবেন।' ঘোষাল কেমন যেন অদ্ভুতভাবে হেসে উঠলেন, 'তাহলে আপনার দিদিই হেঁসেলে কাজ করতেন, আপনি নন? ঠিক আপনার মতোই অনেকটা চেহারা। আপনি হয়তো কিছু করেননি, কিন্তু সেই অনাথ আশ্রমের সঙ্গে তো জড়িত। সে আশ্রমের সব কিছু নোংরা কুৎসিত অপবিত্র। পৃথিবী থেকে সেই আশ্রমের সমস্তই শেষ করে দেওয়া দরকার।'

'ও কী! ও কী করছেন মিঃ ঘোষাল?' কণিকা কাতরে উঠল।

ঘোষাল পকেট থেকে পাকানো দড়িটা বার করে সামনে দোলাতে-দোলাতে বললেন, 'আমি ঘোষাল নই, ইনস্পেক্টর নই, কিছু নই—আমি চাঁপাখোলা অনাথ আশ্রমের সেই পানু, যে আজ বড় হয়ে সমস্ত অত্যাচার অবিচার নির্যাতনের শোধ নিতে এসেছে। পুলিশ আমায় ধরবার জন্যে জাল পেতেছে, আর আমি পুলিশ হয়েই তাদের ওপর কী টেক্কা দিয়েছি দেখতেই পাচ্ছেন। সি. আই. ডি. ইনস্পেক্টর ঘোষাল আসছে বলে নিজে ফোন করেছি। তারপর রবারের ভেলায় এসে আগে নিজেই টেলিফোনের লাইন কেটেছি। মিসেস এম. ডি.-কে যেমন, মিস ধরকে তেমনি এই ফাঁস দিয়ে শেষ করেছি। কেউ কিছু সন্দেহ করেনি, করতে পারেনি। আমার ভেলাটা কে চুরি করেছে, নইলে আপনাকে এখুনি শেষ করেই পালাতাম। তবু আমি পালাবই, আর যদি ধরাও পড়ি দুঃখ নেই, ভারি মজা পেয়েছি। আমায় পাগল বলে পাগলা-

গারদে ধরে রেখেছিল। সেইখানেই বসে-বসে আমি সব ফন্দি করেছি, তারপর একদিন পালিয়েছি। এখন পাগলা-গারদের ডাক্তাররা দেখুক, পাগলের বুদ্ধি কত!' ঘোষাল একটু থেমে বললে, 'ভয় পাবেন না, এই ফাঁস লাগাবার আগেই যা ভয়, নইলে টেরও পাবেন না।' ঘোষাল ফাঁসটা তুলল।

হঠাৎ পেছনদিকে একটু চমকে ফিরতেই একটি সোফার পেছন থেকে ডাঃ বাজপেয়ী ঝাঁপিয়ে পড়লেন মিঃ ঘোষালের ওপর। কখন যে নিঃশব্দে তিনি সোফার পেছনে এসে লুকিয়েছেন কণিকা টেরও পায়নি।

ঘোষালবেশী পানু জোয়ান ছোকরা, কিন্তু ডাঃ বাজপেয়ী যেন লোহা দিয়ে তৈরি।

একটু ধস্তাধস্তির পরই দেখা গেল তাকে পিছমোড়া করে ডাঃ বাজপেয়ী তারই ফাঁসের দড়িতে বেঁধে ফেলেছেন।

চারিদিক থেকে অন্য সবাইও তখন ঘরে ছুটে এসেছে। তার মধ্যে বৃদ্ধ বেণীবাবুও।

কিন্তু এ কীরকম তাঁর চেহারা। কোথায় সেই অথর্ব পঙ্গু বৃদ্ধ, তার জায়গায় সোজা শক্ত-সমর্থ পুরুষ।

বেণীবাবু ঘরে ঢুকতেই ডাঃ বাজপেয়ী উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম করে বললেন, 'ঠিক সময়েই ধরা গেছে স্যার। আমি গোড়া থেকেই নজর রেখেছিলাম, পুলিশ আসছে বলে ফোন আসার কথা শোনার পর থেকেই আমি সজাগ আছি। ওই রবারের ভেলাটা চুরি করে আগেই পালাবার পথ বন্ধ করেছি তাই। তবে আপনি নিজেও আসবেন, আশা করিনি।'

'কিন্তু এসেও তো আর মিস ধরের মৃত্যুটা ঠেকাতে পারলাম না।'

'আচ্ছা, আজকেই বোধহয় আমাদের খোঁজে দুটো নৌকো আসবে। না আসা পর্যন্ত ওকে একটা ঘরে বেঁধে রাখো।'

বীরস্বামী দুজনের দিকে চেয়ে সেই অদ্ভুত মুখভঙ্গি করে বললেন, 'কিন্তু আপনারাই আসল পুলিশের লোক! কেয়া তাজ্জব, কেয়া তাজ্জব! আপনার নাম নিশ্চয়ই বাজপেয়ী নয়?'

ডাঃ বাজপেয়ী বলে পরিচিত পুলিশের লোকটি হেসে বললে, 'না, আমি দাশরথি ঘোষ। ইনস্পেক্টর ঘোষ বলতে পারেন।'

'আর উনি?'

'উনি ইসমাইল সাহেব, এখানকার আইডি-সি।'

বীরস্বামী খুকখুক করে হেসে উঠলেন, 'এখানে সবাই তাহলে একরকম নাম ভাঁড়িয়েছে দেখা যাচ্ছে, শুধু আমি বাদে।'

'আমিও নয়। আমার নাম প্রবীর লাহিড়ী। আগ্রায় মিউনিসিপ্যালিটি অফিসে গিয়ে বার্থ-রেজিস্টারে নাম আছে দেখে আসতে পারেন।'

'আমি একটা অনুরোধ করতে পারি?' এতক্ষণে মধুসূদনের গলা শোনা গেল, 'আমার এই সুটকেসটার সঙ্গে আপনাদের নৌকোয় আমায় একটু জায়গা দেবেন? আমার কলকাতায় ফেরা অত্যন্ত জরুরি।'

ইসমাইল সাহেব ঠাট্টা করে বললেন, 'শুধু সুটকেসটাকে জায়গা দিলে হবে না?'

'না, বিশ্বাস করে আপনাদের পুলিশের হাতেও এটা ছাড়তে পারব না।' মধুসূদন-রূপী পবিত্র হেসে বললে, 'সুটকেস ভর্তি নোটের তাড়া কিনা!'

ঠাট্টা ভেবে সবাই হেসে উঠল।

পবিত্র তারপর এদিক-ওদিক চেয়ে বললে, 'হোটেলের মালিক গেলেন কোথায়?'

'বোঝাপড়া করতে নিশ্চয়ই! বন্যার জলে সব ঘুলিয়ে দিয়েছে কিনা!' বলে বীরস্বামী হেসে উঠলেন।

মধুসূদন-রূপী পবিত্র তখন আর সেখানে নেই।

নিচে নিজের ঘরে স্বামী-স্ত্রীর সত্যিই তখন বোঝাপড়া চলছিল। কণিকা অত্যন্ত অপরাধীর মতো বললে, 'আমায় ক্ষমা করো, আমি তোমাকে পর্যন্ত সন্দেহ করেছিলাম। সত্যি, সেদিন তুমি যে কলকাতায় গেছলে আমায় জানাওনি কেন?'

'জানাইনি তোমায় একটু অবাক করে দেব বলে। আমাদের বিয়ের তারিখে তোমার একটা উপহার কিনতে গেছলাম লুকিয়ে। কিন্তু তুমিও তো আমায় কলকাতা যাওয়ার কথা লুকিয়েছ!'

কণিকা হেসে বললে, 'তুমি অত রেগে না থাকলে রসিদটা পড়লেই আমার যাওয়ার কারণ বুঝতে পারতে। রসিদটা একটা ফাউন্টেন পেনের, বুঝেছ? তোমারই জন্যে কেনা।'

হঠাৎ দরজাটা খুলেই মধুসূদন ওরফে পবিত্র বললে, 'সরি, আমার ঠিকানা আপনাবে দিতে এলাম কণিকাদি। বাবার সঙ্গে যদি বনিবনাও হয়, তাহলে আমি চিঠি দিলে যেন উত্তর পাই।'

'তা তো বুঝলাম। কিন্তু হঠাৎ কণিকাদি এল কোথা থেকে?' প্রবীর এখনও মধুসূদনের ওপর খুব প্রসন্ন হতে পেরেছে বলে মনে হল না।

কিন্তু মধুসূদন-রূপী পবিত্রর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। একটু হেসে সে বললে, 'আগেই উনি বলবার অনুমতি দিয়েছিলেন, কিন্তু আমার কেমন লজ্জা করছিল।'

কিছুদিন বাদেই লাহিড়ীদের নামে স্বাস্থ্যনিবাসে একসঙ্গে একটি চিঠি ও একটি পার্শেল এল।

চিঠিটা মধুসূদন ওরফে পবিত্রর। লিখেছে ঃ বাবা মত পালটেছেন, পালটেছেন বোধহয় সুটকেশ ভর্তি নোটের তাড়া ফেরত পেয়ে অবাক হয়ে। আমি ইউরোপ যাচ্ছি শিগগিরই পড়তে। যাওয়ার আগে দেখা করব নিশ্চয়ই।

আর প্যাকেটটি পাঠিয়েছেন বীরস্বামী।

ভেতরে একটা অত্যন্ত দামি ও দুষ্প্রাপ্য বিদেশি ফাউন্টেন পেন ও পেন্সিলের ডেস্ক-সেট আর তার চেয়েও দুর্লভ, দামি মেয়েদের একটা হাতঘড়ি। তারই সঙ্গে ছোট একটি কার্ডে লেখা বীরস্বামীর ঋণশোধ।

জিনিসগুলো দেখে প্রবীর ও কণিকা হতভম্ব। এসব জিনিস তো আজকাল পয়সা দিলেও পাওয়া যায় না।

'বীরস্বামী কি চোরাই মালের কারবারি নাকি?' প্রবীর বলে ওঠে বিমূঢ়ভাবে।

কণিকা আঙুল তুলে তাকে শাসিয়ে বলে, 'দ্যাখো, যা শিক্ষা আমাদের হয়েছে, তারপর কাউকে সন্দেহ করবে না, বিশ্বাসও না।'

হাত বাড়ালেই বন্ধু

এক

কলকাতা শহরে খুঁজলে নাকি এখন দু-একটা ভাড়াটে বাড়ি পাওয়া যায়। খবরের কাগজে অন্তত 'টু লেট' মার্কা সারিতে দু-চারটে ভাড়া বাড়ির খবর থাকে।

কিন্তু বছর কয়েক আগের কথা ভাবুন। খবরের কাগজ তো খবরের কাগজ, সারা শহর চষে ফেললেও একটা 'টু লেট' লেখা বোর্ড কোথাও বার করা সাপের পাঁচ পা দেখার চেয়েও অবিশ্বাস্য মনে হতো। সেসব বোর্ড তখন চেলাকাঠ হয়ে চুলোয় গেছে।

সেই বাড়ির আকালের দিনে ডালহৌসি স্কোয়ার অঞ্চলের একটি মান্ধাতার আমলের পুরোনো চারতলা মোকানের নড়বড়ে ক্ষয়ে যাওয়া কাঠের সিঁড়ি দিয়ে তেতলায় উঠে লম্বা করিডরে দু-পা বাড়ালে কিন্তু একটু তাজ্জবই হতেন।

সমস্ত বাড়িটাই পায়রার খোপের মতো ছোট-বড় অফিস ঘরে ঠাসা। সমস্ত কুঠুরির সামনে যেসব নতুন পুরোনো ঝকঝকে কি ধুলোয় ধোঁয়ায় মলিন পেতল কি কাঠের নেমপ্লেট কি সাইনবোর্ড আঁটা তা পড়লে মনে হবে বিশ্বের সমস্ত কারবার যেন এই বাড়িটি থেকেই চালানো হচ্ছে। সেখানে চামড়ার ব্যাপারী যেমন আছে তেমনি আছে পুরোহিতদর্পণ পাঁজি থেকে শুরু করে যাবতীয় শাস্ত্রগ্রন্থের প্রকাশক, তুলোর পাইকার থেকে অডিটর এটর্নির অফিস, শেয়ার মার্কেটের দালাল থেকে দাঁতের মাজন, মাথায় তেলের জোগানদার সবাই সেই মোকানের কোথাও না কোথাও ঘাপটি মেরে আছে।

এ বাড়ির চার-চারটি তলা টহল দিয়ে দুনিয়ার ব্যবসাদারীর রকমফের সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় হোক বা না হোক তেতলার করিডরে নানা কুঠুরির মধ্যে মুখোমুখি দুটি ঘরের সাইনবোর্ড দেখে দুবার ঢোক গিলে একটু চোখ কচলাতে হবেই।

সিঁড়ি ছেড়ে করিডরে দু-পা এগুলেই সামনা-সামনি দুটি কামরা। একটি কামরার সামনে ঝকঝকে কাঠের সাইনবোর্ড লেখা,—'যা চাই পাবেন।' অন্যদিকের কামরায় পুরোনো রংচটা টিনের পাতের ওপর ইংরেজি ও বাংলায় লেখা, সিটি হাউস এজেন্টস।

দুটি প্রতিষ্ঠান যে একটি ব্যবসায়ে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী তা বুঝতে দেরি হওয়াব কথা নয়।

সরবে সে প্রতিযোগিতা অহরহ ঘোষিত হয়।

সেদিন বেলা এগারোটা নাগাদ অন্তত হচ্ছিল।

'যা চাই পাবেন'—অফিস ঘরের বাইরে কোটপ্যান্ট পরা এক ভদ্রলোক আড়ি পাতার ধরনে দাঁড়িয়ে আছেন।

আড়ি পাতবার অবশ্য তাঁর দরকার ছিল না। ভেতরে যে বচসা চলেছে সমস্ত করিডর তার নিনাদে প্রায় মুখরিত।

ঝকঝকে সাইনবোর্ডে ঘোষিত হলেও যা চাই তা পাওয়ার ব্যাপারে বোধহয় কোথাও একটু খিচ বেধেছে। মক্কেল মুখের রাশ ছেড়ে দিয়ে তাঁর বিক্ষোভটা বেশ একটু জ্বলন্ত ভাষাতেই তাই প্রকাশ করছেন।

'চালাকি করবার আর জায়গা পাননি মশায়! তিন-তিন মাস ধরে টাকা গুনছি, এখনও বাড়ির চেহারা পর্যন্ত দেখতে পেলাম না!'

'যা চাই পাবেন'-এর কামরাটি তেমন প্রশস্ত নয়। একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিলেই তার অর্ধেকটা জুড়ে গেছে। সেই টেবিলের ওপারে ধোপদস্ত গিলেকরা পাঞ্জাবি-ধুতি পরে যিনি বসে আছেন তাঁকে ঠিক তিনি বলতে একটু খটকা লাগে। বয়সে নেহাতই তরুণ। তবে

বেশ একটু ভারিক্কি চাল রাখবার চেষ্টা আছে। 'যা চাই পাবেন'-এর কর্তা হিসেবে কথাবার্তাও বেশ গোছানো ও মোলায়েম। নাম সুরেশ ঘোষ দস্তিদার। ঘোষটা উহ্য রেখে এখন শুধু দস্তিদারই লেখেন কেন তা পরে জ্ঞাতব্য।

সুরেশ দস্তিদার কাঁচা বয়সেই যে ব্যবসার চালে পাকা তা তার কথাতেই বোঝা গেল।

মক্কেলের অমন অভিযোগেও একটু বিচলিত হওয়ার লক্ষণ নেই। হেসে বললে, 'আহা অত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন ভূতনাথবাবু। বুঝেছেন কিনা বাড়ি দেখানো ওই যাকে বলে মেয়ে দেখাবার মতো। একটু না সাজিয়ে গুজিয়ে দেখানো যায়! বাড়িটা মেরামত হচ্ছে যে!'

'মেরামত হচ্ছে!' মক্কেল ভূতনাথবাবু ফেটে পড়লেন, 'মেরামত হচ্ছে শুনছি তো আজ তিনমাস ধরে! ওসব কোনও বাজে ওজর আর শুনতে চাই না। বাড়ি যেমন আছে তেমনি দেখতে চাই।'

সুরেশ বেশ একটু যেন ক্ষুণ্ণ হয়ে ভূতনাথবাবুর দিকে তাকাল। মক্কেলের এরকম অবিশ্বাস তার কাছে যেন কল্পনাতীত।

বাইরে আড়িপাতার ভঙ্গিতে যিনি দাঁড়িয়েছিলেন সেই সাহেবি পোশাক পরা ভদ্রলোক ধীর গম্ভীরভাবে এবার ঘরের ভেতরেই ঢুকে পড়লেন। চোখে-মুখে তাঁর বিদ্রুপের হাসি।

সুরেশ তখন মক্কেলের ইচ্ছাই যেন শিরোধার্য এই ভঙ্গিতে বলছে, 'বেশ তাই যদি আপনার ইচ্ছে হয় দেখবেন।'

টেবিলের ওপর থেকে একটা বাঁধানো খাতা তুলে খস-খস করে ক'টা পাতা উলটে কী যেন দেখে সুরেশ আবার বললে, 'পরশু বিকেল পাঁচটায় আসুন, বাড়ি দেখিয়ে দেব।'

'পরশু! পরশু কেন?' ভূতনাথবাবু জবরদস্ত, 'আজ এখুনি দেখাবেন চলুন।'

সুরেশের মুখে আবার সেই মোলায়েম হাসি। বললে, 'এখন কী করে যাই বলুন! কিছু মনে করবেন না। কিন্তু শুধু আপনাব মতো একটি মক্কেল নিয়েই তো আমাদের কারবার চলে না। এই বাড়ির ব্যাপারে এখুনি আরেকজন আসছেন দেখা করতে। নেপালের রাজপরিবারের একজন।'

সুরেশের কথার সমর্থনেই যেন অফিসের বেয়ারা এসে টেবিলের ওপর একটা ফিতে বাঁধা ফাইল রেখে গেল।

ভূতনাথবাবু বেশ কড়া লোক বোঝা গেল। নেপালের রাজপরিবার শুনে ভয়-ভক্তি-সম্ভ্রমের কোনও লক্ষণ তাঁর দেখা গেল না।

'নেপাল-ভূপাল কী দেখাচ্ছেন মশাই আমাকে!' ভূতনাথবাবু গর্জে উঠলেন, 'ইথিওপিয়ার সম্রাটই আপনার কাছে আসুন না, তাতে আমার কী? ওসব কোনও কথা শুনতে চাই না। হয় বাড়ি এখুনি দেখাতে চলুন নয় আমার টাকা ফেরত দিন। তিন-তিন মাস ধরে পঁচাত্তর টাকা শুধু কমিশনই দিয়েছি।'

সাহেবি পোশাক পরা ভদ্রলোকের বিদ্রুপাত্মক একটু নাসিকাধ্বনি এবার শোনা গেল।

সুরেশ এতক্ষণে যেন তাঁকে প্রথম লক্ষ করে ভুরু কুঁচকে ঝাঁজালো গলায় বললে, 'আপনি এখানে কী করতে এসেছেন?'

অনধিকার প্রবেশের জন্যে সাহেবি পোশাক পরা ভদ্রলোককে বিন্দুমাত্র বিচলিত হতে দেখা গেল না। তাচ্ছিল্যভরে, 'এই একটু দেখতে' বলে তিনি মক্কেল ভূতনাথবাবুর দিকেই

ফিরলেন।

গলায় বেশ একটু ব্যঙ্গের সুর দিয়ে বললেন, 'আপনি বাড়ি খুঁজছেন বুঝি? তা ভালো মুরুব্বিই ধরেছেন। টাউন হল কি মিউজিয়ম যা হোক একটা পেয়ে যাবেন।'

এরকম সমর্থন পেয়ে ভূতনাথবাবু উৎসাহিত। সোচ্ছ্বাসে বললেন, 'ঠিক বলেছেন মশাই! ঠিক বলেছেন! স্রেফ ধাপ্পার ভুলে তিন মাসের কমিশন দিয়েছি, আবার সাইনবোর্ডের বাহার দেখেছেন, যা চাই পাবেন! তিন মাসে অথচ বাড়ির একটা ইটের চেহারা দেখতে পেলাম না।'

'তিন মাস!' আগন্তুক ভদ্রলোকের চোখে কপট বিস্ময়, 'তা আপনার ধৈর্য আছে বলতে হবে।'

'যা চাই পাবেন'-এর কর্তা সুরেশের আর নীরব দর্শক ও শ্রোতা হয়ে থাকা সম্ভব নয়। মক্কেলের জন্যে যে মোলায়েম কণ্ঠ বরাদ্দ তা বিসর্জন দিয়ে সুরেশও ঝাঁজালো হয়ে উঠল নবাগতর উদ্দেশেই।

'খুব তো টিটকিরি দিচ্ছেন! হাতে ক'টা বাড়ি আছে, জানতে পারি? দিতে পারেন একটা? সিটি হাউস এজেন্টসের কেরামতিটা তাহলে বুঝি!'

কেরামতি আর কত বোঝাব হে!—আগন্তুক একটু অবজ্ঞার হাসি হেসে মক্কেল ভূতনাথের দিকে ফিরে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না। নিজের পরিচয়টা নিজেকেই বাধ্য হয়ে দিতে হচ্ছে। অধীনের নাম টি. কে. রায়। করিডরের ওধারে যে অফিসটি দেখছেন সেটি আমার। সিটি হাউস এজেন্টস বলেই ওটির খ্যাতি। আপনার সত্যিই কি বাড়ির দরকার?'

'সত্যি দরকার মানে!' ভূতনাথবাবু ক্ষুব্ধ, 'বাড়ির জন্যে যে হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছি মশাই। তা না হলে এই ধাপ্পায় পড়ে করকরে পঁচাত্তর টাকা খসাই। সত্যি দিতে পারেন একটা বাসা!'

টি. কে. রায় গর্বভরে একটু হেসে বললেন, 'ত্রিশ বছর ধরে সি. এইচ. এ. মানে সিটি হাউস এজেন্টস কি মিথ্যের ওপর টিকে আছে মনে করেন? একি আর দুদিনের ভুঁইফোঁড় 'যা চাই পাবেন'! আসুন।'

ভূতনাথবাবু কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে যেতে গিয়ে আবার থামলেন। সুরেশের দিকে ফিরে কড়া গলায় বললেন, 'কই মশাই! টাকাটা ফেরত দেবেন, না গোলমাল করতে চান!'

সুরেশের মুখে এবার অবজ্ঞামিশ্রিত হাসি, 'যা চাই পাবেন' মক্কেলের সঙ্গে গোলমাল করে না। বুঝেছেন! তা না হলে এক বছরে—মাত্র এক বছরে বাজারের সব ভাড়া বাড়ি দেনেওয়ালাকে কানা করে সকলের চক্ষুশূল হয়ে উঠত না।'

কথা বলতে-বলতেই ড্রয়ার খুলে পঁচাত্তর টাকা গুনে বার করে ভূতনাথবাবুর হাতে দিয়ে সুরেশ আবার ব্যঙ্গের সুরে বললে, 'নিন, নিয়ে যান টাকা এই খাতাটায় একটা সই করে। দেখি সিটি হাউস এজেন্টস আপনাকে কি বাড়ি দেয়।'

ভূতনাথবাবুর খাতায় সই শেষ হতেই তাকে সাদরে সঙ্গে নিয়ে যেতে-যেতে টি. কে. রায় বলে গেলেন, 'তাই দেখ হে ছোকরা দেখ। গৃহপ্রবেশে চাও তো একটা নেমন্তন্নও পেতে পারো।'

'নেমন্তন্নটা হবে কোথায়!' সুরেশই শেষ বাণটা ছাড়ল, 'গড়ের মাঠের কোনও তাঁবু-টাবুতে বোধহয়। তখন আমার কাছে আবার আসতে হবে বুঝেছেন!'

শেষ কথাটা যাঁর উদ্দেশ্যে বলা সেই ভূতনাথবাবুর কানে বোধহয় পৌঁছল না। তিনি তখন করিডরের ওধারে সিটি হাউস এজেন্টস-এর অফিসে ঢুকেছেন।

'যা চাই পাবেন'-এর অফিস ঘরের তুলনায় সিটি হাউস এজেন্টস-এর কামরা একটু প্রশস্ত। পুরোনো হলেও আসবাবপত্র বনেদি দামি ধরনের। ঘরের সাজসরঞ্জাম দেখেও সমীহ একটু হওয়া উচিত। দেওয়ালময় কলকাতার নানা অঞ্চলের ফটো। সেই সঙ্গে ইংরেজি-বাংলায় নানা নীতিকথা বড়-বড় অক্ষরে লিখে বাঁধিয়ে টাঙানো। নীতিকথাগুলো অবশ্য একটু অদ্ভুত।

ভূতনাথবাবু টি. কে. রায়ের সাদর অভ্যর্থনায় একটি চেয়ারে বসে সেইগুলিকে বিমূঢ়ভাবে লক্ষ করছিলেন বোধহয়। রায়ের কথায় তাঁর চমক ভাঙল।

প্রশস্ত টেবিলের ওপর রায় তখন একটি লম্বা গুটোনো মানচিত্র খুলে ধরেছেন। লাল-নীল রঙে তার ওপর কলকাতার রাস্তা ও বাড়ির নকশা আঁকা।

সেটির ওপর কোণে-কোণে ক'টা পেপার ওয়েট চাপা দিয়ে রায় বললে, 'হ্যাঁ এইবার কী ধরনের বাড়ি চাই বলুন। ক'টা ঘর, furnished না Unfurnished, শহরের মাঝখানে না বাইরে, গ্যারাজ চাই কি না?'

ভূতনাথবাবু এরকম প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না বোধহয়। একটু হকচকিয়ে গিয়ে বললেন, 'দেখুন, মানে আমি একটা ছোটখাট বাসা চাইছি। বাড়ি বা ফ্ল্যাট যা হোক সে রকম হয় না?'

'হবে না কেন? খুব হয়!' টি কে. রায় যেন একেবারে কল্পতরু। ম্যাপটাব ওপর আঙুল রেখে বললেন, 'দক্ষিণ কলকাতার এই দুটো ব্লক দেখছেন? এখানেও পেতে পারেন। আর তিনটে ব্লক এই উত্তর কলকাতায়। আলিপুব কি বালিগঞ্জে চান তাও দেখাতে পারি। আর যদি কলকাতার বাইরে চান..'

রায়কে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই ভূতনাথবাবু হাঁ-হাঁ করে উঠলেন, 'না, না কলকাতার ভেতরেই চাই।'

'তাই হবে', টি. কে. রায়ের কাছে যেন সব সমান, 'এখন মাপটা বলুন?'

'মাপ!' ভূতনাথবাবু হতভম্ব!

'হ্যাঁ মাপ।' রায় ব্যাখ্যা করলেন, 'কী মাপেব কখানা ঘর চান বলুন। স্কোয়ার ফুট ধরে হিসেব হবে কি না। দশ বাই দশ থেকে শুরু করে হরেক মাপের ঘর আছে তো!'

সিটি হাউস এজেন্টস সম্বন্ধে শ্রদ্ধা এবপব না বেড়ে পারে! ভূতনাথবাবু যেন জহুরির দোকানে নরুন চাইতে আসায় লজ্জায় পড়ে কুণ্ঠিতভাবে বললেন, 'মানে, কী বলে আমার মাঝারি গোছের গোটা তিনেক ঘর হলেই চলে যায়।'

'হুঁ মাঝারি!' রায় ম্যাপটার ওপর দুবার আঙুল ঠুকে টোকা দিয়ে কী যেন হিসেব করে নিয়ে বললেন, 'তাহলে ধরুন চোদ্দ বাই বারো। তার মানে তিনটে বেড রুম হচ্ছে এক হাজার আট ফুট, অর্থাৎ তেষট্টি টাকা।'

ভূতনাথবাবু এবারে হাঁ। অনেক কষ্টে শুধোলেন, 'ভাড়া!'

'না কমিশন!' টি. কে. রায় প্রসন্ন হেসে ভুল সংশোধন করলেন, 'দু-আনা স্কোয়ার ফুট হিসেবে ওই তেষট্টি টাকা হয়। আর ভাড়া চার আনা হিসেবে একশো ছাব্বিশ টাকা। ক্যালকাটা সারচার্জ দশ টাকা, মোট একশো ছত্রিশ!'

ভূতনাথবাবুর মাথাটা যদি ইতিমধ্যে ঘুরতে শুরু করে থাকে তাঁকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। বিস্ময় বিমূঢ় কণ্ঠে তিনি বললেন, 'এরকম বাড়ি দিতে পারেন?'

টি. কে. রায় এবার টেবিল থেকে হাত তুলে চেয়ারের পিঠে পুরোপুরি হেলান দিয়ে অনুকম্পা ভরে হেসে বললেন, 'বাইরের সাইনবোর্ডটা দেখেছেন?'

'বাইরের সাইনবোর্ড।' ভূতনাথবাবু বিমূঢ়, 'ওই বাইরে যেটা লটকানো আছে। ও পুরোনো রংচটা টিনের লেখা তো ভালো করে পড়াই যায় না!'

চোখদুটো অর্ধনিমীলিত করে রায় সংক্ষেপে শুধু বললেন, 'ওই।'

ভূতনাথবাবুর হতভম্ব মুখ থেকে অস্ফুট একটা জিজ্ঞাসার সুর শুধু শোনা গেল, 'আজ্ঞে?'

'ওই হল প্রমাণ!' রায় আবার সোজা হয়ে বললেন, 'ও সাইনবোর্ড যদি ঝকঝক-তকতক করত, তাহলে বুঝতেন এখানে কথার চটকই আছে আসল কাজের বেলায় ঢু-ঢু।'

টেবিলের ধার থেকে একটা বাঁধানো খাতা রায় এবার ভূতনাথবাবুর দিকে এগিয়ে দিলেন। খাতাটা এক জায়গায় খুলে বললেন, 'আচ্ছা নাম ঠিকানাটা এবার তাহলে এই অর্ডার ফর্মে লিখে যান।'

সম্মোহিতের মতো ভূতনাথবাবু কলম ধরে সই করার পরই রায় বোতাম টিপে ঘণ্টা বাজালেন।

সিটি হাউস এজেন্টস-এর সবকিছুই বুঝি কলের চাকায় চলে। সঙ্গে-সঙ্গে বেয়ারা এসে হাজির। রায় বললেন, 'স্ট্যাম্প লাগাও।' তারপর মক্কেলের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁ, কী দিচ্ছেন চেক না ক্যাশ?'

'মানে?' ভূতনাথবাবুর বুদ্ধিটা তেমন সূক্ষ্ম নয়।

'মানে কমিশন!' টি. কে. রায় বিশদ হলেন, 'ওটা পুরো আগাম দেওয়াই নিয়ম। তবে আপনি পঞ্চাশ টাকাই এখন দিয়ে যেতে পারেন।'

'কমিশনটা আগে দিয়ে যেতে হবে!' ভূতনাথবাবুর গলায় একটু অস্বস্তির আভাস।

'সে আপনার যেমন ইচ্ছে।' টি. কে. রায় এসব তুচ্ছ ব্যাপারে উদার নির্বিকার, 'আগাম দিলে তেষট্টি, বাড়ি পাওয়ার পর দিলে ওর ডবল। এখন দিতে না চান, পরেই দেবেন।'

দুবার মাথা চুলকোলেও ভূতনাথবাবুর মনস্থির করতে বেশিক্ষণ লাগল না। ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'না, না আগামই নিন। কিন্তু বাড়িটা কবে নাগাদ পাব বলতে পারেন!'

'নিশ্চয়ই পারি।' টি. কে. রায় মূর্তিমান আশ্বাস, 'আজ হল চোদ্দই। তাহলে তেইশে—না, না। তেইশে থাকব দিল্লিতে, ওই তাহলে চব্বিশেই আসবেন সকাল এগারোটায়।'

'কিন্তু আপনি যে বললেন, তেইশে দিল্লি থাকবেন!' ভূতনাথবাবুর মনের সংশয়টুকু প্রকাশ না করে পারলেন না।

'তা তো থাকবই!' টি. কে. রায় একটু অনুকম্পার হাসি হেসে জানালেন, 'সেই রাত্রের প্লেনেই ফিরব। তাহলে ক্যাশই দিচ্ছেন?'

এরপর আর কোনও দ্বিধা-সংশয় থাকে! ভূতনাথবাবু ব্যাগ খুলে গুণে-গুণে পঞ্চাশ টাকা টেবিলের ওপর রেখে একটু কুণ্ঠিতভাবে বললেন, 'একটু জল খাওয়াতে পারেন?'

মুখের কথা খসতে না খসতেই বেয়ারা জলের গ্লাস নিয়ে সামনে খাড়া। জলের গ্লাস কখন আনতে হয় তা বুঝি দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় তার জানা।

জল খেয়ে গ্লাসটা মধুর হাতে ফিরিয়ে দিতে গিয়ে ভূতনাথবাবু একটু যেন থমকে গেলেন। ভুরু কুঁচকে বেয়ারার মুখে কবার চোখ বুলিয়ে বললেন, 'আচ্ছা তোমায়, তোমায় কোথায় যেন দেখেছি না? হ্যাঁ-হ্যাঁ ওই 'যা চাই পাবেন'-এর অফিসেই যেন দেখলাম!'

টি. কে. রায়ের হাসি এবার শোনা গেল, 'ও ভুল অনেকেই করে। ওখানে যাকে

দেখেছেন সে হল সিধু আর এ হল মধু। এরা যমজ ভাই। আচ্ছা নমস্কার।'

'নমস্কার!' বলে দাঁড়িয়ে উঠলেও ভূতনাথবাবুকে কেমন যেন একটু আচ্ছন্ন মনে হল। যেতে-যেতে দরজা থেকে মধুর দিকে আর একবার ফিরে না তাকিয়ে পারলেন না।

তাঁর ঘোর কাটল বোধহয়, সুরেশের কথার খোঁচায়। 'যা চাই পাবেন' অফিসের দরজাতেই সে যেন পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে।

'কী মশাই বাড়ি তো পেয়েই গেছেন বুঝতে পারছি। কবে উঠছেন গিয়ে!'

ভূতনাথবাবু এক মুহূর্তে সজাগ হয়ে ফোঁস করে উঠলেন, 'চব্বিশে মশাই চব্বিশে! চব্বিশে সকাল এগারোটায়।'

'হ্যাঁ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালটা খালি আছে শুনছি।'

সুরেশের ধারালো বিদ্রুপটা বুঝি বৃথাই গেল। ভূতনাথবাবু তখন হনহন করে করিডরের প্রান্তের সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করেছেন।

কিন্তু সিঁড়ির বাঁকে ভূতনাথবাবু অদৃশ্য হওয়ার পর সুরেশের মুখের চেহারায় হঠাৎ পরিবর্তন দেখলে একটু অবাক হতেই হয়।

কোথায় গেল তার সে মুখ বাঁকানো ভঙ্গি। চোখ-মুখ এখন তার সহজ-স্বাভাবিক। শুধু বুঝি সেখানে একটু উত্তেজিত উল্লাসের ছাপ।

করিডরে একটু এগিয়ে গিয়ে নিচের সিঁড়ির বাঁকে একবার উঁকি দিয়ে সে প্রায় তিন লাফে সিটি হাউস এজেন্টস-এর অফিস ঘরেই এসে হাজির।

তারপর তার উৎসুক প্রশ্ন, 'কী মামা? কাম ফতে?'

টি. কে. রায় তখন টেবিলের ওপরকার ম্যাপটা গুটিয়ে ড্রয়ারের মধ্যে ভরছেন। বেশ একটু মাতব্বরি হাসি হেসে বললেন, 'এখনও সন্দেহ? সি. এইচ. এ. থেকে পকেট খালি না করে কেউ গেছে কখনও!'

পকেট থেকে একটা নোট বার করে সুরেশের হাতে দিয়ে রায় আবার দিলদরিয়াভাবে বললেন, 'নে, যাওয়াব সময় নিউ মার্কেটটা ঘুরে যাবি। নতুন ল্যাংড়া উঠেছে।'

টাকা হাতে নিয়ে সুরেশকে একটু দ্বিধাগ্রস্ত মনে হল, 'সে যে অনেক দাম, মামা!'

'দাম হবে না তো কি মাগনা দেবে!' রায় স্নেহের ধমক দিলেন, 'টি. কে. রায় দামের পরোয়া করে না বুঝেছিস। নীলু তো কাল চলে যাচ্ছে। আমি ফেরার পথে তোদের কাকাবাবুকে আর একবার বাজিয়ে যাই। ওকে কাবু করতে না পারলে সব অন্ধকার। বাড়িভাড়ার মক্কেলরা আমাদেরই সরকারি লাল বাড়িতে নিয়ে তুলবে।'

'কিন্তু কাকাবাবু যেরকম রেগেছেন সহজে নরম হবেন বলে তো ভরসা হয় না!' সুরেশের গলায় উদ্বেগের সুর।

রায় কিন্তু আশাবাদী। বললেন, 'হবে রে হবে। তোরা ডাক্তার বনবিহারী ঘোষকেই চিনিস কাকাবাবু বলে। আর আমি সেই স্কুল থেকে ওকে চিনি। বুনো ঘোষ বলে ওকে ডাকতাম। বুনো মোষের মতো গোঁয়ার ছিল তখনও। তবে ওই শিং নাড়া পর্যন্তই...'

কথাটা শেষ করতে-করতেই রায়ের মুখের চেহারা হঠাৎ কেন বদলে গেল বুঝতে গেলে দরজার দিকে তাকাতে হয়।

ভূতপূর্ব মক্কেল ভূতনাথবাবু সেখানে ফিরে এসে দাঁড়িয়েছেন।

'দেখুন', বলে কী যেন জানাতে গিয়ে তিনি সুরেশকে দেখতে পেয়ে ভুরু কুঁচকে থমকে গেলেন।

মামার ভাগনে সুরেশ ততক্ষণে সামলে নিয়েছে। চোখ রাঙিয়ে কড়া গলায় তখন সে বলতে শুরু করেছে, 'আচ্ছা আমিও দেখে নেব, সিটি হাউস এজেন্টস-এর কত মুরোদ! মক্কেল ভাঙাবার শোধ যদি না নিই তাহলে আমার নাম সুরেশ ঘোষ দস্তিদার নয়।'

'নামটা এখন থেকেই বদলে ফেলো ছোকরা!' রায়ের পিত্তি জ্বালানো গলা, 'সেই সঙ্গে ওই সাইনবোর্ডটাও। 'যা চাই পাবেন' নয় লেখো কী ছাই পাবেন!'

'আচ্ছা!' বলে সুরেশ জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে চলে যাওয়ার পর, রায় আবার প্রসন্নমুখে ভূতনাথবাবুর দিকে ফিরলেন।'

'হ্যাঁ কী বলছিলেন?'

'আজ্ঞে বলছিলাম কী!'—ভূতনাথবাবু একটু কুণ্ঠিত, 'বাসাটা একতলায় না দোতলায়? বাড়ির লোকেরা জানতে চাইবে কি না!'

'কোন তলায় চান?' টি. কে. রায় কম কথার মানুষ।

'দোতলায় হলেই ভালো হয়।' নিবেদন করলেন ভূতনাথবাবু।

'তাই হবে!' রায় চটপট আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'দশ টাকা একস্ট্রা।'

'কেন?' ভূতনাথবাবু একটু বিমূঢ়।

'দোতলা বলে!' রায় এবার একটু হেসে বুঝিয়ে দিলেন, 'তেতলা হলে পাঁচ টাকা একস্ট্রা, চারতলা হলে আবার পাঁচ টাকা কম। এই রেট।'

ভূতনাথবাবুকে একটু দ্বিধায় পড়ে ভাবতে হল। তারপর মনস্থির করে ফেলেই বললেন, 'তাহলে ওই দোতলাই ঠিক করে দেবেন!'

'দেব।' রায় একেবারে কলের মানুষ, 'নমস্কার।'

'নমস্কার! ২৪শে সকাল দশটায় আসছি।'—ভূতনাথবাবু কথাটা একবার ঝালিয়ে নিতে চাইলেন।

'সাড়ে দশটায়!' রায়ের ভুলচুক হয় না।

'ও হ্যাঁ সাড়ে দশটা!' ভূতনাথবাবু একটু লজ্জিত। রায় একটা খাতা খুলে টেবিলের এধারে টেনে নিয়ে লিখতে-লিখতে বললেন, 'এই এনগেজমেন্ট বই-এ লিখেই রাখছি। কথার নড়চড় হবে না।'

রায়কে লিখতে দেখে খুশিমনে ভূতনাথবাবু চলে গেলেন। খাতায় লেখাটা দেখলে তেমন খুশি হতেন কী না বলা শক্ত।

সেখানে রায় লিখেছেন, 'ল্যাংড়া আম দশ টাকা, বুনো ঘোষের বাড়ি যাওয়া!'

দুই

আগের পরিচ্ছেদে মামা-ভাগনে টি. কে. রায় আর সুরেশ ঘোষ দস্তিদারের যে পরিচয় পাওয়া গেছে, তাতে দুজনকে কেউ যদি পয়লা নম্বরের ধাপ্পাবাজ-জুয়াচোর ভেবে থাকেন তাহলে তাঁকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না।

কিন্তু সত্যের খাতিরে বলতে হচ্ছে ধারণা তাঁর ভুল।

রায় ও সুরেশকে বর্তমানে নেহাত দায়ে পড়েই কিছুদিনের জন্যে ধাপ্পাবাজ সাজতে হয়েছে। ভাগ্য একটু মুখ তুলে চাইলেই এ সাজ ছেড়ে ফেলে ধাপ্পা বলে যা মনে হচ্ছে তা সত্য করে তুলবেন এই তাঁদের আশা।

ভাগ্য মুখ তুলে চাওয়া মানে অবশ্য ডাঃ বনবিহারী ঘোষের মত বদলানো।

এই ডাঃ ঘোষই খবরের কাগজের ভাষায় বর্তমান সঙ্কটজনক পরিস্থিতির মূল।

ডাঃ ঘোষ আমাদের পূর্বপরিচিত সুরেশের আপন কাকা। সুরেশ ও তার একটি বোন নীলাই ভাইপো-ভাইঝি হিসাবে তাঁর ও তাঁর স্ত্রী বিনতাদেবীর নয়নের মণি বলা যেতে পারে। ঘোষদম্পতির নিজেদের কোনও সন্তান নেই। বড় ভাই ও বউদি সুরেশ ও নীলাকে রেখে অকালে মারা যাওয়ার পর অনাথ ভাইপো-ভাইঝিকে সন্তানের অধিক স্নেহে ঘোষদম্পতি মানুষ করেছেন। কিন্তু সম্প্রতি একটি মুশকিল বেধেছে তাদের নিয়ে।

ডাঃ ঘোষের মনটা দরাজ ও ফুলের মতো কোমল হলেও একটি তাঁর মহৎ দোষ আছে! তা হল তাঁর অবুঝ গোঁ। একবার যদি কোনও কিছু সম্বন্ধে একটা ধারণা তাঁর মাথায় ঢোকে তাহলে তা থেকে তাঁকে নড়ানো প্রায় অসম্ভব।

কিছুদিন আগে ভাইঝি নীলুর বিয়ের ব্যাপার নিয়ে সেইরকমই তিনি একটা জেদ ধরে বসেছেন। আজকালকার রেওয়াজমাফিক ছেলেমেয়েদের বেশি বয়সে বিয়ের তিনি বিরোধী। তাতে জাতির ক্ষতি হয় বলে তাঁর বদ্ধমূল ধারণা। নীলুর বিয়ে তাই তিনি তাড়াতাড়ি দিয়ে দিতে চান। নীলু কিন্তু তাতে রাজি নয়। সে তখন বি-এ পড়ছে। অন্তত পরীক্ষাটা না দিয়ে সে বিয়ে করবে না এই তার পণ। কাকা-ভাইঝিতে এই নিয়ে মতভেদ চরমে উঠেছে। নীলু ডাঃ ঘোষেরই ভাইঝি। জেদ তারও কম নয়। সে রাগ করে বাড়ি ছেড়ে দিয়ে মামা টি. কে. রায়ের কাছেই এসে উঠেছে একদিন। বোনের মুখ চেয়ে কাকা অন্যায় একগুঁয়েমির প্রতিবাদে সুরেশকেও আসতে হয়েছে সঙ্গে।

টি. কে. রায় শুধু নীলু ও সুরেশের মামাই নন ডাঃ ঘোষেরও তিনি বাল্যবন্ধু। ডাঃ ঘোষের কলকাতায় কয়েকটা ফ্ল্যাট বাড়ি আছে। প্রধানত সেই ফ্ল্যাট বাড়িগুলির ভরসাতেই রায় আজ বহু বছর ধরে তাঁর সিটি হাউস এজেন্টস-এর ব্যবসা চালিয়ে এসেছেন।

নীলু ও সুরেশ ডাঃ ঘোষের জেদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে তাঁর কাছে এসে উঠবার পর সবদিক দিয়েই তিনি বেশ আতান্তরে পড়েছেন।

ডাঃ ঘোষ ভাইপো-ভাইঝির এ অবাধ্যতার মূলে রায়ের সমর্থন আছে ধরে নিয়ে তাঁর সমস্ত ফ্ল্যাট বাড়ির ভার রায়ের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছেন। বাড়ির এই আকালের দিনে তিনি সব খালি রাখবেন তবু কাউকে ভাড়া দেবেন না এই তাঁর পণ।

রায় প্রাণখোলা হাসিখুশি মানুষ। নিজে বিয়ে থা করেননি। ভাগনে-ভাগনির এই দায় হঠাৎ ঘাড়ে না চাপলে তিনি ঘোষের রাগ পড়ার জন্যে অম্লান বদনে বহুদিন অপেক্ষা করতে পারতেন। কিন্তু এখন সে উপায় নেই। সংসার খরচের জন্যেই যেমন করে হোক অফিস চালু রাখতে হবে। মক্কেলদেরও হাতছাড়া করা চলবে না। ফন্দি করে তাই সামনা-সামনি আরেকটি বাড়িভাড়ার অফিস তিনি সুরেশের নামে খুলিয়েছেন। দু-অফিসে লোফালুফি করে মক্কেলদের কিছুদিন যাতে ধরে রাখা যায়। অবশ্য ডাঃ ঘোষকে বুঝিয়ে-শুঝিয়ে তাড়াতাড়ি পথে না আনতে পারলে এ খেলা বেশি দিন চলবে না। সমস্যা শুধু তো ভাড়াটে বাড়ির নয়। আপাতত সুরেশ ও নীলা তাঁর কাছে যে বাড়িতে এসে উঠেছে সেটিও ডাঃ ঘোষেরই। বুনো মোষের মতোই গোঁ ধরে ডাঃ ঘোষ সে বাড়ি থেকে রায়কে ওঠবার নোটিশ দিয়েছেন।

ঘোষকে আর একবার বোঝাবার চেষ্টায় রায় অফিসফেরতা তাঁর বাড়িতেই গিয়ে উঠলেন।

বেশ বড় একটি তেতলা বাড়ি। নিচের তলায় ডাঃ বনবিহারী ঘোষ থাকেন। গেটের সামনেই নেমপ্লেটে লেখা ডাঃ বনবিহারী ঘোষ, এম-ডি। ওপাশে দোতলায় ও তেতলায়

যাওয়ার সিঁড়ি। সিঁড়ির কোলাপসিবল গেটে এখন তালা লাগানো। দোতলা ও তেতলার ফ্ল্যাট আগে ভাড়া দেওয়া হতো। এখন দুটি ফ্ল্যাটই খালি। রায়ের ওপর রাগ করে ডাঃ ঘোষ ভাড়া দেওয়াই বন্ধ করেছেন।

সিঁড়ির তালা লাগানো গেটের দিকে চেয়ে রায়ের মুখে একটু বিষণ্ণ কৌতুকের হাসিই দেখা গেল। ডাঃ ঘোষের এমন অবুঝ জেদ না ধরলে এই দুটি ফ্ল্যাট দিয়েই রায় তাঁর মক্কেলদের সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে পারতেন।

কলিংবেল টিপতে এ-বাড়ির পুরোনো চাকর রাখহরি এসে দরজা খুলে রায়কে দেখেই আনন্দে গদগদ।

'আসুন মামাবাবু আসুন। কতদিন আসেননি।'

'আসব কী রাখহরি!' রায় ঢুকতে গিয়ে যেন ভয়ে থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ভয়ে আসি না। সে ডালকুত্তাটা কোথায়?'

'আজ্ঞে ডালকুত্তা!' রাখহরি প্রথমটা হতভম্ব।

'হ্যাঁ, তোমার বাবু আমার অভ্যর্থনার জন্যে ডালকুত্তা পুষেছেন শুনলাম কিনা!' রায়ের মুখে আতঙ্কের ভান।

'আজ্ঞে না মামাবাবু!' রাখহরি হেসে ফেলল। সে এ-বাড়িতে ছেলেবেলা থেকে কাজ করছে। মনিব আর তাঁর বন্ধুর সম্পর্কটা ভালো করেই জানে। হেসে সে আবার বললে, 'বাবুর ডালকুত্তো থাকলে সেও আপনাকে দেখে ল্যাজ নাড়ত।'

'তুমি তো বলছ, কিন্তু ভরসা হয় না যে।'

রায় একটু হেসে ভেতরে ঢুকতে-না-ঢুকতে ডাঃ ঘোষের স্ত্রী বিনতাদেবী এসে উপস্থিত।

রায়কে দেখে অভিমানের সুরে বললেন, 'এই এতদিনে তাহলে মনে পড়ল।'

'মনে রোজই পড়ে,' রায় ঘরে ঢুকে সোফায় বসতে-বসতে বললেন, 'শুধু ভয়ে আসি না বুঝলে বৌঠান। দেখা হলেই তো হাতাহাতি!'

'আপনাদের দু-বন্ধুর কোনটা যে হাতাহাতি আর কোনটা গলাগলি আজও বুঝলাম না।' বিনতাদেবী অভিযোগের সুরে বললেন, 'কিন্তু আমার যে মাঝে থেকে প্রাণটা যায়!'

'প্রাণটা আমারও যাওয়ার দাখিল!' রায় বেশ একটা জোরালো দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন, 'কিন্তু কী করব বল? তোমার কর্তাটি যে চিরকেলে গোঁয়ার। ও যদি গোঁ একটু ছাড়ত!'

'গোঁ কি আপনার কম নাকি?' বিনতাদেবী পালটা অনুযোগ করলেন, 'ছেলেমেয়ে দুটোকে একবার আসতে পর্যন্ত দেন না।'

'ছি! ছি!' এবার রায় সত্যিই ক্ষুণ্ণ বিচলিত হয়ে বললেন, 'অমন কথা ভেব না। আমাকে তো অনেককাল ধরে দেখছ। আমি ওই যাকে বলে ধর্মের ষাঁড়। চিরকাল নিজের খেয়াল-খুশিতে চরে বেড়াই। আমার এসব ঝামেলা পোষায়! নেহাত দায়ে পড়ে না এ জোয়াল কাঁধে নিয়েছি। আর ওরা আমার কথা শোনবার পাত্র কি না! আমার কথাতেও ওরা এখান থেকে যায়নি, আমার কথাতেও আসবে না। আমার ভাগনে-ভাগনি হলে কি হয়, নিজেদের বংশের ধারা যাবে কোথায়!'

ডাঃ বনবিহারী ঘোষ যে ইতিমধ্যে ঘরে এসে ঢুকেছেন তা রায় টের পাননি। ডাঃ ঘোষের বেশ লম্বা চওড়া শক্ত সমর্থ চেহারা। ভারিক্কিমুখে একটা স্বাভাবিক প্রাণখোলা সরলতার ছাপ যেমন আছে, শক্ত খাঁজপড়া চিবুক ও মাথার কদমছাঁট চুলে তেমনি ভেতরের

একগুঁয়ে মেজাজটুকুরও। কোনও ডাক্তারি কলেই বোধহয় ঘোষ বেরিয়েছিলেন। হাতে ছোট চামড়ার ব্যাগ, পরনে গলাবন্ধ কোট আর প্যান্ট। কোটের নিচের পকেট থেকে স্টেথোসকোপের নল খানিকটা বেরিয়ে আছে।

ঘরে রায়কে দেখে আপনা থেকেই ঘোষের মুখটা প্রথমে একটু উজ্জ্বলই হয়ে উঠেছিল খুশিতে। তারপর বেদস্তুর ভেবেই বোধহয় সে খুশিমুখে ভ্রূকুটি ফুটিয়ে তুলে তিনি বললেন, 'কাদের বংশের গুণকীর্তন হচ্ছে টি কে রায় ধুরন্ধর।'

'এই তোমাদের।' রায় ঘোষের দিকে ফিরে কৌতুককুঞ্চিত মুখে বললেন, 'মনুষ্যকুলে যারা বরাহ্ অবতার।'

'হুঁ, বরাহ অবতার।' ঘোষের গলায় এবার চাপা গর্জন, 'আর তুমি যে একেবারে ভিজে বেড়ালটি। মিটমিটে ভণ্ড শয়তান। তা কী মতলবে হঠাৎ উদয় হয়েছ শুনি।'

'তোমার ওই মধুর সম্ভাষণগুলো অনেকদিন শুনিনি কিনা,' রায়ের মুখে কৃত্রিম গাম্ভীর্য, 'তাই কীরকম যেন হজমের গোলমাল হচ্ছিল।'

ঘোষ কিন্তু জবাব দেওয়ার আগেই রাখহরি এক প্লেট ফলমিষ্টি ও এক গ্লাস সরবৎ এনে রায়ের সামনের টিপয়ে রাখল।

রায় হাসিমুখেই চমকে ওঠবার ভান করে বললেন, 'আরে অবেলায় এসব আবার কী! বললাম না হজমের গোলমাল।'

'তা ওগুলো হজমের গোলমালেরই ওষুধ।' ঘোষ গলাটা তেতো করবার চেষ্টা করলেন, 'এখন তাড়াতাড়ি গিলে বিদেয় হও। আর যে মতলবেই এসে থাকো কোনও সুবিধে যে হবে না তাও আগে থাকতে জানিয়ে দিচ্ছি।'

'কী যা-তা বলছ!' বিনতাদেবী এবার স্বামীকে ধমক দিলেন, 'বন্ধুকে ওই বলে কেউ খেতে দেয় না, ও-কথা শোনবার পর কেউ জলগ্রহণ করে তোমার বাড়ি।'

'আমি করি বৌঠান, আমি করি!' নির্বিকারভাবে ল্যাংড়া আমের টুকরো একটির পর একটি পরম তৃপ্তিভরে মুখে দিতে-দিতে রায় বললেন, 'বললাম তো, এইসবই আমার হজমি গুলি। তুমি কুড়ি বছর ঘর করছ বটে বৌঠান, কিন্তু আমার চল্লিশ বছরের হাড়ে-হাড়ে চেনা। এই এমনি কদমছাঁট চুল গোমড়ামুখো একটা ছেলের সঙ্গে চল্লিশ বছর আগে ক্লাসে বেঞ্চির জায়গা নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল প্রথম। সেই গুঁতো-গুঁতি দিয়েই আমাদের বন্ধুত্ব।'

'বন্ধুত্ব!' ডাঃ ঘোষ নাসিকাধ্বনিটা অবজ্ঞাসূচক করবারই চেষ্টা করলেন, 'তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকা আমি অপমান বলে মনে করি। Worthless, good for nothing vagabond! ছেলেবেলা থেকে আমায় বকিয়ে দিয়ে শুধু মাথায় হাত বোলাবার ফন্দি এঁটেছ।'

'তোমার ওই নিরেট মাথায় হাত বুলিয়ে তো হাতে কড়া পড়ে গেল।—রায় একটি রাজভোগে কামড় দিয়ে বললেন, 'তবু যদি সত্যি তোমায় একটু বকাতে পারতাম তাহলে তুমিও তরে যেতে আর আমরাও শান্তি পেতাম। মিথ্যে গোঁ ধরে কী গেরোটি বাধিয়েছ বল তো?'

'আমি বাধিয়েছি!' ডাঃ ঘোষ সত্যি গরম হয়ে উঠলেন এবার, 'সব নষ্টের মূল তো তুমি। তোমার আস্কারা না পেলে ছেলেমেয়ে দুটো এমন গোল্লায় যায়! তবে আমিও বলে রাখছি, তোমার ওই ভাগনে-ভাগনি সুদ্ধ তোমায় আমি পথে না বসিয়ে ছাড়ব না। এই আমার ধনুকভাঙা পণ।'

উত্তেজনার মাথায় ডাঃ ঘোষ সামনের টেবিলটাই সজোরে চাপড়ে দিলেন।

'স্থিরোভব বন্ধু স্থিরোভব!' রায় আগের মতো অবিচলিত, 'ওটা ধনুক নয়, আমার পিঠও না। তোমারই টেবিল। আর যাদের ওপর তোমার এই ক্রুদ্ধ আস্ফালন তারাও শুধু আমারই ভাগনে-ভাগনি নয়, তোমারও ভাইপো-ভাইঝি, এইটুকু মনে করিয়ে দিচ্ছি।'

'না, মনে আমি করব না।' ডাঃ ঘোষ জ্বলে উঠলেন, 'আমার কেউ নয় ওরা। আমি মনে করি আমার দাদা-বউদি যেমন নেই তেমনি আমার ভাইপো-ভাইঝিও কোনওকালে ছিল না...'

ডাঃ ঘোষ আরও হয়তো কিছু বলতেন কিন্তু বিনতাদেবীর প্রায় কান্না জড়ানো প্রবল প্রতিবাদের স্বরে তাঁকে থামতে হল।

'ছিল না বললেই তোমাদের কাছে নেই হতে পারে, আমার কাছে তা হয় না।' বিনতাদেবী কাতরভাবে জানালেন, 'তোমাদের এই ছেঁদো ঝগড়ায় আমার অবস্থাটা একবার ভেবে দেখেছ! পেটে একটা ধরিনি। মা-বাপ মরা ওই ভাসুরপো-ভাসুরঝি দুটোই সব। আজ ছ'মাস একবার তাদের চোখের দেখাও দেখতে পাইনি। ওদের পথে বসিয়েই যদি তোমার সুখ হয় তাহলে সেইসঙ্গে আমাকেও বিদেয় করে দাও। জনমনিষ্যিহীন এই খাঁ-খাঁ পুরীতে আমি আর গুমরে-গুমরে মরতে পারব না।'

বিনতাদেবী চোখে আঁচল চাপা দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ডাঃ ঘোষের অসহায় বিব্রত অবস্থা এবার দেখবার মতো। থতমত খেয়ে রায়কেই অনুযোগের সুরে সাক্ষী মানলেন।

বললেন, 'দেখলে! দেখলে! কাণ্ডটা দেখলে? আমি—আমিই যেন ধরে-বেঁধে ওর ওপর জুলুম করছি।'

'তা করছই তো!'—সান্ত্বনার বদলে রায়ের কাছে বিনতাদেবীর কথারই সমর্থন পাওয়া গেল, 'শুধু বৌঠানের ওপর নয়, সকলের ওপর।'

'সকলের ওপর আমি জুলুম করছি!' ডাঃ ঘোষ আবার নরম, 'চোখ বুজে তোমাদের মতন সব আহাম্মক-মুর্খদের সঙ্গে তাল না দিলেই সেটা বলবে জুলুম? তা বল জুলুম। যা অন্যায় বলে মনে করি, তা এ-বাড়িতে আমি হতে দেব না।'

রায় কৌতুকদৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে চেয়ে বললেন, 'সাধে কি তোমায় ছেলেবেলায় বুনোঘোষ বলতাম! শিং বাগিয়ে যেদিকে ছুটলে সেদিক ছাড়া আর সব তোমার কাছে বেঠিক! যুগ পাল্টে গেছেরে ভাই। নীলুর বিয়ে নিয়েই তো এত কাণ্ড। কিন্তু কম বয়সে বিয়ে দিতেই হবে, আর মেয়েদের কলেজে পড়ানো অন্যায়, এসব গোঁড়ামি ওরা মানবে কেন? একালের ডাক্তার হয়ে এসব কথা বলিস কী করে?'

'ডাক্তার বলেই বলি।' ডাঃ ঘোষ এবার জোর দিয়ে বললেন, 'মেয়েগুলো বুড়ো বয়স পর্যন্ত আইবুড়ো থেকে আর ওই ভুয়ো কলেজীবিদ্যে শিখে জাতের কাঠামে যে ঘুন ধরিয়ে দিচ্ছে, সে বোঝবার বুদ্ধি তোমার আছে!'

'বুদ্ধি যাদের নেই তাদের কোতল করে তো তোমার মত মানাতে পারো না!' রায় হেসে বললেন, 'জোর জুলুম করেছিলে বলেই না ওরা আমার কাছে গিয়ে উঠেছে।'

এই শেষ কথাতে তপ্ত কড়ায় যেন তেলের ছিটে পড়ল। ডাঃ ঘোষ চিড়বিড়িয়ে উঠে বললেন, 'তোমার কাছে উঠেছে? তোমার কোন চুলোটা আছে শুনি! যেখানে মাথা গুঁজে আছ, সেটা কার বাড়ি? আমার।'

'তোমার তা কি অস্বীকার করছি!' রায়ের মুখে সেই প্রসন্ন কৌতুকের হাসি, 'শুধু ওটা কেন? এ শহরে তোমারই সব ফ্ল্যাট বাড়ি নিয়ে আমার সিটি হাউস এজেন্টস-এর কারবার শুরু। শুরু অবশ্য তোমার কথাতেই করেছিলাম। কিন্তু এখন তোমার মক্কেলদের কাছে নাস্তানাবুদ হয়ে জোচ্চোর বনতে চলেছি!'

'তাই হও।' ডাঃ ঘোষ এখনও খাপ্পা, 'ওই তো তোমার উপযুক্ত পেশা!'

'হ্যাঁ, দরকার হলে ওই পেশাই ধরব।' রায় খোশমেজাজেই বললেন, 'কিন্তু চোরের ওপর রাগ করে তুমি ভুঁয়ে ভাত খাচ্ছ দেখে হাসি পায়। নেহাত আহাম্মক না হলে এই বাড়ির টানের বাজারে এতগুলো ফ্ল্যাট ভাড়া না দিয়ে জেদ করে কেউ খালি রাখে! শেষে তো যাবে সরকারি রিকুইজিসনে!'

'তাই যাক!' ঘোষের নরম হওয়ার কোনও লক্ষণ নেই, 'তবু তোমাকে ওসব নিয়ে কারবার করতে দেব না। আর যেখানে আছ সেখান থেকেও তোমায় যদি এক মাসের মধ্যে না তাড়াই তো আমি বনবিহারী ঘোষ নই।'

রায় এই শেষ কথা শুনেই আসন ছেড়ে তখন উঠে পড়েছেন।

একবার রায়ের দিকে আর একবাব খাবারের প্লেটের দিকে চেয়ে ঘোষকে যেন একটু অপ্রস্তুত মনে হল। তারপরই তিনি গর্জে উঠলেন, 'ও কী! উঠে পড়লে যে ওর ল্যাংড়া আম ফেলে। বাজারের সেরা ল্যাংড়া! জানো এখন কত দাম!'

'জানতে চাই না!' রায়ের চোখে কৌতুকেব ঝিলিকেব সঙ্গে গলায় এবার ঝাঁজ। 'আমার প্রতিজ্ঞাটাও এবার শুনে রাখো বুনো ঘোষ। আমি যদি টি. কে. রায় হই তো তোর এই গোঁ আমি ভাঙব। যা নিয়ে এই কুরুক্ষেত্র সেই নীলুর বিয়ে আমি-ই দেব। আর এই এক মাসের মধ্যেই। তোকে জব্দ কবে তা যদি না দিতে পারি তাহলে—তাহলে...'

এদিক-ওদিক চেয়ে রায় তাঁর পক্ষে নিদারুণ কঠিন দিব্যি গেলে বসলেন। 'ওই ল্যাংড়া আমই আর জীবনে ছোঁব না।'

ল্যাংড়া আম বলতে যাকে চিরকাল অজ্ঞান বলে জানেন সেই রায়ের মুখেই এই অবিশ্বাস্য শপথ শুনে হতভম্ব হয়েই বোধহয় ঘোষের মুখে আর কথা বেরুল না।

সময়টা যে সত্যিই খারাপ যাচ্ছে আর বিপদ যে একা আসে না, বাড়ি থেকে তেজ দেখিয়ে নিজের বাসায় ফিরেই রায় তার প্রমাণ পান।

রায়ের বাসাবাড়িটি তেতলা। তেতলায় অবশ্য একটিমাত্র ঘর। সে ঘরটি আপাতত রায়ের হাতছাড়া। ডাঃ ঘোষের সঙ্গে ভাগনে-ভাগনি নিয়ে বিবোধ শুরু হওয়ার পরই তিনি সেটিতে তালা লাগিয়ে গেছেন। নিচের তলাটিতে কয়েকটি ভাড়া দেওয়া দোকানঘর এবং একটি গো-ডাউন।

রায়ের আস্তানা দোতলায়। যেখানে রান্নাঘর ও বাথরুম বাদে দুটিমাত্র ব্যবহারের যোগ্য ঘর। রায় তার একটি বৈঠকখানা ও একটি শোওয়ার ঘর হিসেবে ব্যবহার করতেন। সুরেশ ও নীলা তাঁকে আশ্রয় করার পর ভাগনি নীলাকে একটি ঘর ছেড়ে দিয়ে তিনি ও সুরেশ অন্য ঘরটিতে থাকেন।

সেদিন সিঁড়ি দিয়ে উঠে বারান্দা পেরিয়ে নিজেদের ঘরে ঢোকবার মুখে প্রথম দৃশ্যই তাঁকে একটু পীড়া দেয় বোধহয়।

কিছুক্ষণ আগেই জোরগলায় যা বর্জন করার শপথ করে এসেছেন তাঁর সেই অতি

প্রিয় ল্যাংড়া আমই একটি কাগজের ঠোঙা থেকে বার করে সুরেশ একধারের শেলফে সাজিয়ে রাখছে। দূর থেকে চেহারা দেখেই ল্যাংড়াগুলি যে সরেস জাতের তা বুঝতে দেরি হয় না।

মামাকে দেখে সুরেশ আম সাজাতে-সাজাতে বলে, 'খুব ভালো ল্যাংড়া পেয়ে গেলাম মামা। তাই রাবড়িও কিনে আনলাম।'

এতবড় সুখবর দেওয়ার ব্যাপারেও সুরেশের গলায় তেমন কোনও উৎসাহ যে দেখা যায় না, তার কারণটা পরের কথাতেই বোঝা যায়। মুখটা বিরস করে সে এবার বলে, 'কিন্তু সব গোলমাল হয়ে গেল। এসব আনাই একরকম মিথ্যে।'

'হ্যাঁ, তা মিথ্যে!'

রায় তাঁর নিজের শপথের কথা ভেবেই সায় দেন, কিন্তু সুরেশ তাতে অবাক হয়ে বলে, 'তার মানে? তুমি জানো নাকি?'

'জানি না আবার!' রায় তিক্ত মুখে জানান, 'এইমাত্র যে তোর কাকার কাছে দিব্যি গেলে এলাম এক মাসের মধ্যে নীলুর বিয়ে দিতে না পারলে ল্যাংড়া আম ছোঁব না।'

'এই দিব্যি গেলে এলে!' সুরেশের বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলাতে একটু দেরি হয়। তারপর সে শুকনো গলায় বলে, 'কিন্তু যার বিয়ে দেবে সেই তো নেই।'

'নেই মানে?' এবার রায়ের হতভম্ব হওয়ার পালা।

'তবে আর বলছি কী!' সুরেশ দুঃসংবাদটা জ্ঞাপন করে, 'বাসায় এসে দেখি একটি চিঠি লিখে রেখে নীলু দিদিমার কাছে চলে গেছে।'

মা'র কাছে কুসুমপুরে চলে গেছে! রায়ের ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হয়, এখন হঠাৎ কুসুমপুরে যাওয়ার মানে? দুদিন বাদে পরীক্ষার ফল বেরুবে।

'সেই জন্যেই তো!' সুরেশ রহস্যের মূল নির্ধারণ করে বলে, 'বুঝতে পারছ না, পরীক্ষায় ফেল হওয়ার ভয়েই আগে থাকতে পালিয়েছে।'

এ সমাধান রায়ের মনে ধরে না। অবাক হয়ে বলেন, 'ফেল করবার ভয়ে পালাবে! কেন? ফেল কি কখনও করে না! আরে তোদের মাতৃকুল-পিতৃকুল সব যে ফেল করা বাহাদুর! এই আমি! চারবার বি-এ পরীক্ষা দিয়ে বইখাতাগুলোই শেষে পুরোনো বই-এর দোকানে বিক্রি করে দিয়েছিলাম। তুই তো ম্যাট্রিকে দুবার, ইন্টারমিডিয়েটে তিনবার...'

সুরেশ ক্ষুণ্ণ স্বরে বাধা দেয়, 'তিনবার কোথায়? দুবার তো!'

'আহা ওই একই কথা!' রায়ের কাছে দুবার আর তিনবার ফেলে কোনও তারতম্য নেই বোঝা যায়, 'আর তোদের বাবা তো...'

'যা-তা বোলো না মামা!' সুরেশ পিতৃসমালোচনায় উষ্ণ হয়ে ওঠে, 'বাবা কি কাকাবাবু ফেল করেনি কখনও। বাবা শুধু নন-কোঅপারেশন করে কলেজ ছেড়েছিল।'

'আচ্ছা! আচ্ছা! তাই হল।' রায় নিজের যুক্তি খণ্ডিত হয়েছে বলে মনে করেন না, 'আসল কথা পরীক্ষায় ফেল করাটা আমরা ধর্তব্যই মনে করি না। ও নিয়ে মন খারাপ আবার কীসের!'

'ঠিকই তো!' এবার সুরেশ পূর্ণ সমর্থন জানায়, 'আর আমরা কি কেউ তা নিয়ে কিছু বলিওনি। বরং ভোলাবার চেষ্টাই করছি। এই ল্যাংড়া আম, রাবড়ি তাহলে কেন?'

পারিবারিক জীবন দর্শন নিয়ে আলাপ আরও অনেকক্ষণ হয়তো চলত কিন্তু হঠাৎ রসভঙ্গ করে মধু ও সিধু দুই যমজরূপ অফিসে যে মক্কেলদের বিভ্রান্তি ঘটায় সেই মধু বেয়ারার আবির্ভাব।

মধুর চেহারায় কিছু একটা অপ্রীতিকর ব্যাপারের আভাস পেয়ে রায় ও সুরেশ দুজনেরই মুখে একটু উদ্বেগ দেখা যায়।

'কী মধু! এরই মধ্যে চলে এলে যে!' জিজ্ঞাসা করে সুরেশ।

'তা আসবোনি তো করব কী! মধু বিরস মুখে জবাব দেয়, 'আপনারাও চলে এলেন, তারপর তিন-তিনজন এসে হাজির। দুজনায় আবার কী তম্বি! বলে, কোথায় তোদের বাবু? তার ঘর কোথায় দেখাবি চল।'

রায় এসব পরিস্থিতির জন্যে প্রস্তুত। জিজ্ঞাসা করেন, 'তুই কী বললি?'

'আজ্ঞে, আমি বললাম, ঘর আমি কেমন করে দেখাব!' মধুর মুখে এবার একটু কর্তব্য সম্পাদনের আত্মপ্রসাদ, 'সে আমার হুকুম নাই।'

'অ্যাঁ!' প্রথমে থ হয়ে সুরেশ তারপর রেগে ধমক দেয়, 'হতভাগা! একথা বলতে তোমায় কে বলেছিল? ঘর তুমি জানো না বলতে পারোনি?'

রায় ব্যাপারটাকে অত গুরুত্ব না দিয়ে বলেন, 'যাক-যাক ঠিক আছে। তা, এ ঠিকানা কাউকে বলনি তো?'

এবার মধুর মুখে গর্বের হাসি, 'আজ্ঞে ঠিকানা বলব আমি! অত বোকা মধু না। পুলিশ, আদালত কত কী বলে তেনারা ভয় দেখাল। আমি কি তবু কিছু বললাম! তারপর...'

'হ্যাঁ তারপর?' সুরেশ সমাপ্তিটুকু জানতে উৎসুক।

'তারপর তেনারা চলে গেলে,' মধু এবার নিজের বাহাদুরিটুকু উৎফুল্ল হয়ে জানায়, 'সেই বাবুকে চুপি-চুপি এখানে নিয়ে এলাম। ঠিকানা তবু বলি নাই।'

রায় ও সুরেশ দুজনের চোখই এবার বিস্ফারিত।

'ও হতভাগা! চুপি-চুপি কাকে নিয়ে এসেছ এখানে?' সুরেশের প্রায় আর্তকণ্ঠ।

'আজ্ঞে, ওই যে খুব ভালো বাবু!' মধু অম্লান বদনে জানায়, 'মালপত্র সব নিয়ে নিচে আসিছেন। আজ তেনাকে বাড়ি দেওয়ার কথা ছিল তাই আমি তেনারে নিচে দাঁড় করাই খবর দিতে উপরে আগে এলাম।'

মধুর এ কীর্তিতে রায়, সুরেশের মুখে খানিকক্ষণ আর কথা সরে না। মধুকে ভর্ৎসনা করে সময় নষ্ট করা এখন বৃথা বুঝে মামার দিকে চেয়ে হতাশ দিশাহারা কণ্ঠে সুরেশ বলে, 'এখন উপায়, মামা?'

রায়ও কম বিচলিত হননি। কিন্তু এ বিপদে মাথা ঠান্ডা রাখাই দরকার বুঝে তিনি গম্ভীর মুখে বলেন, 'একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হয়।'

'আচ্ছা! যদি দরজা না খুলি!' সুরেশ ফন্দি হাতড়ায়, 'তাহলে বুঝবে এটা ভুল ঠিকানা। আমরা কেউ এখানে থাকি না!'

'না, তা আর হয় না।' রায় চিন্তিতভাবে মাথা নাড়েন, 'এখন মোকাবিলা করতেই হয়। লোকটি কে তাই ভাবছি। মনে হচ্ছে এ তোমাব সেই মফস্বলী প্রদীপ দত্ত। আজই তার আসবার কথা ছিল না?'

'হ্যাঁ কথা তো অনেকেরই ছিল', সুরেশ শুকনো গলায় স্বীকার করে, 'তার মধ্যে এ ভদ্রলোক একেবারে মালপত্র নিয়ে হাজির হবেন কি ভেবেছি।'

'হুঁ, কিন্তু হাজির যখন হয়েছে তখন নিচে থেকে বিদেয় করা যাবে না।' রায় এবার মধুর দিকে ফিরে দরকারি প্রশ্নটাই করেন, 'কী রে! ভদ্রলোক কীরকম? খুব জবরদস্ত মনে হয়?'

'আজ্ঞে না বাবু!' মধু গদ-গদ হয়ে ওঠে, 'খুব ভালো লোক। আমায় পাঁচ টাকার নোট দিলেন, একটা ওষুধ কিনে আনতে। তা বাকি পয়সা আর ফেরতই চাইলেন না।'

'তবে রে পাজি হতভাগা!' সুরেশ মারমুখো হয়ে ওঠে, 'তুমি ঘুষ নিয়ে আমাদের সর্বনাশ করেছ!'

'ওই কথাটা বলবেন না ছোটবাবু!' মধুও ওঠে ফোঁস করে, 'বিধুভূষণের বেটা বংশীবদন তার বেটা আমি মধুসূদন। আমাদের বংশে ঘুষ কেউ কখনও নেবেনি, হ্যাঁ।'

'হ্যাঁ তুমি ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির।' রায় তাকে শান্ত করেন, 'এখন বল তো ভদ্রলোকের সঙ্গে আছে কজন?

'আজ্ঞে কেউ তো নেই!'

রায় একটু আশ্বস্ত হয়ে বলেন, 'তাহলে ঠিক আছে।'

'কী ঠিক আছে?' সুরেশ জানতে চায়।

'ঠিক আছে। দেখ না। নীলু তো বেশ কিছুদিন অন্তত ফিরছে না। আমাদের দুজনের এই একটা ঘরেই কুলিয়ে যাবে।'

'নীলুর ঘর তুমি ওই প্রদীপ দত্তকে দেবে!' সুরেশ হতভম্ব, 'তারপর নীলু এলে?'

'সে পরের ভাবনা পরে ভাবা যাবে!' রায় বেপরোয়া, 'এখন সমস্যা তো মিটুক।'

প্রদীপ দত্ত এসে পৌঁছবার পরে সমস্যা মেটে না আরও গুরুতর হয় বলা শক্ত।

প্রদীপ দত্ত অল্পবয়সি জোয়ান ছেলে। চেহারা-পোশাক দেখে বেশ সুপুরুষ ভব্যসভ্যই মনে হয়। কিন্তু তার সঙ্গে যে লটবহর এনেছে তা দেখে মামা-ভাগনে দুজনেরই একটু চক্ষুস্থির।

প্রথমে কুলিরা বয়ে এনেছে ছবি আঁকার সাজসরঞ্জাম, তারপর ডাম্বেল মুগুর, চেস্ট এক্সপ্যান্ডার জাতীয় জিনিস। তারপর একটা বেহালার বাক্স, সেই সঙ্গে একটা কাঠের বাক্স। তার ওপরের লেখা দেখে বোঝা যায় সেটা ওষুধের বাক্স গোছের কিছু।

'এ কী ধরনের ভাড়াটে? পাগল-টাগল নাকি!'

প্রদীপ দত্তকে ঘরের আসবাবপত্রের ফারনিশড রুম বলে খোঁড়া গোছের একটা কৈফিয়ত দিয়ে মামা-ভাগনে নিজেদের ঘরে চাপা গলায় সেই আলোচনা করতেই বসে।

'চিজটি কীরকম দেখছ মামা?' সুরেশ বলে, 'কেমন একটু অদ্ভুত মনে হচ্ছে না!'

'তা হচ্ছে!' টি. কে. রায় বলেন, 'কিন্তু তাতেই সুবিধে! ওরকম বাতিকগ্রস্ত লোক বেশিদিন কোথাও টেঁকে না। তবে ভাড়াটা আগাম নিতে হবে। অন্তত মাস তিনেকের!'

'মাস তিনেকের!' সুরেশ শিউরে ওঠে, 'কী বলছ মামা, মাস তিনেক থাকলে আমাদের উপায়!'

'আরে তিনমাস ও ছোকরা টিকবে নাকি এখানে। নিজে থেকেই তার আগে সরে পড়বে!' রায় আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'যাতে যায় সেই রকম ওষুধই দিতে হবে।'

'কী ওষুধ?'

'সেটা অবস্থা বুঝে!' বলে রায় দরজার দিকে এগিয়ে যান।

প্রদীপ দত্ত সেখানে কী যেন বলবার জন্যে দরজায় টোকা দিচ্ছে।

দরজা খোলবার পর প্রদীপ এক তাড়া নোট রায়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, 'এই নিন আপনাদের তিন মাসের ভাড়া আগাম।'

রায়কেও বেশ একটু অপ্রস্তুত মনে হয় এবার। বলেন, 'তিন মাসের ভাড়া আগাম

দিচ্ছেন, কিন্তু—'

'না', প্রদীপ যেন তাঁর সংশয়টাই দূর করে বলে, 'তিন মাসই থাকব এমন কোনও কথা নেই।'

সুরেশ উদগ্রীব হয়ে বলে, 'মানে আগেই চলে যাবেন?'

'না, না!' প্রদীপ ভ্রম সংশোধন করে, 'থাকব হয়তো অনেক দিন। অন্তত এক বছর তো যেমন করে হোক কাটাতেই হবে। শুধু ভাড়াটা তিন মাসেরই অগ্রিম দিয়ে রাখলাম। বলেন তো ছ'মাসেরও অবশ্য দিতে পারি।'

রায় মুখ খোলবার আগে সুরেশই বলে ওঠে, 'না, না, ওই তিন মাসই যথেষ্ট।'

প্রদীপ এবার বলে, 'আমার ঘরের জিনিসপত্রগুলো একটু অন্যভাবে সাজাতে চাই। আশা করি আপনাদের আপত্তি নেই তাতে।'

'বিলক্ষণ! বিলক্ষণ!' রায় উদার হয়ে ওঠেন, 'আপনার ঘর আপনি যেমন ইচ্ছে সাজান না! আপনার নিজের সুখ-সুবিধে নিয়ে কথা।'

সঙ্গে-সঙ্গে ওষুধটা এখন থেকেই প্রয়োগ করবার কথাটা রায়ের মাথায় আসে।

প্রদীপের সঙ্গে তার ঘরে গিয়ে একদিকের একটা জানালা দেখিয়ে একটু যেন কুণ্ঠিত হয়ে বলেন, 'তবে ওই জানালাটা না খুললেই ভালো হয়।'

'কেন?' প্রদীপ একটু অবাক।

'না, এমন কিছু নয়।' রায় তাচ্ছিল্যের ছলে ব্যাপারটা যতখানি সম্ভব গুরুতর সাজাবার চেষ্টা করেন, 'ওদিকে একটা ওষুধের কারখানা আছে কিনা! নতুন হয়েছে। মাঝে-মাঝে একটা গন্ধ আসে!'

'গন্ধ? কীরকম গন্ধ?'

ওষুধ ধরতে শুরু করেছে মনে হয় প্রদীপের ভুরু কোঁচকানো দেখে।

'বিশ্রী গন্ধ!' রায় নাক-মুখ কুঁচকে বলেন, 'স্বাস্থ্যের পক্ষে নাকি অত্যন্ত খারাপ।'

'তাই নাকি!' প্রদীপকে বেশ চিন্তিত মনে হয়, 'কিন্তু ওষুধের গন্ধ খারাপ হবে কেন?'

নিজেকেই আশ্বাস দিয়ে কি না বলা যায় না, প্রদীপ তারপর বলে, 'না, না ও আপনাদের ভুল ধারণা।'

সুরেশ এতক্ষণে প্যাঁচটা আঁচ করে ফেলেছে। মামার কথায় ঠেকো দিয়ে বলে, 'ভুল হলেই ভালো। তবে ও তো ঠিক তৈরি ওষুধের গন্ধ নয়। তৈরির আগের গন্ধ। শুনেছি ও গন্ধ বেশি শুঁকলে নাকি হাঁপানি হয়!'

রায় প্যাঁচটা আরেকটু কষেন, 'ও কারখানায় বেশিদিন কেউ নাকি কাজ করতেই চায় না!'

প্রদীপের মুখের চেহারা দেখে রায় আশান্বিত হয়ে ওঠেন।

অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে সে বলে, 'তাহলে এ তো খুব অন্যায় কথা।'

'অন্যায় তো বটে-ই!' রায় মনে-মনে উৎফুল্ল হয়ে উঠে মুখে হতাশার ভঙ্গি করে বলেন, 'আমরা নিজেরাই তাই এ বাড়ি ছাড়বার চেষ্টা করছি।'

'আপনারাই ছাড়বার চেষ্টা করছেন!'

প্রদীপের গলার সুরে বাজিমাত হয়ে গেছে ভাবাই উচিত। কিন্তু তার পরের কথায় একেবারে বসে পড়তে হয়।

প্রদীপ বেশ জোর দিয়ে বলে, 'বাড়ি ছাড়বার কোনও মানে-ই হয় না।'

এ পরিণতিতে রায় হতভম্ব। তবু শেষ চেষ্টা করে বলেন, 'কিন্তু এ গন্ধে শেষে একটা অসুখ-বিসুখ করবে!'

'তা করবে কেন?' প্রদীপ উত্তেজিতভাবে বলে, 'কারখানারই কোনও অধিকার নেই, রেসিডেন্সিয়াল এরিয়াতে এরকম গন্ধ ছড়াবার! হয় ওদের উঠে যেতে হবে অন্য জায়গায়, নয় গন্ধ যাতে না বার হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। দরকার হলে কেস করতে হবে কারখানার নামে। আচ্ছা সে আমি দেখছি। আপনাদের ভাবনা নেই।'

সুরেশ হতাশভাবে মামার দিকে তাকিয়ে বলে, 'উনি যখন বলছেন, 'তখন দেখাই যাক।'

তিন

সমস্যাটার অত সহজে মীমাংসা যে হবে না রায় ও সুরেশের তা এখন বুঝতে বাকি নেই।

কিন্তু সেটা যে অমন সাংঘাতিকভাবে ঘোরালো হয়ে উঠবে তা তারা কল্পনা করতে পারেনি।

প্রদীপকে বাসায় জায়গা দেওয়ার দিন দুই পরে সুরেশ তার 'যা চাই পাবেন' অফিসে যথারীতি তখন মক্কেল ঠেকাতে ব্যস্ত।

এবারের মক্কেলটি বেশ একটু কড়া গোছের মনে হয়।

সুরেশকে তাই ভিন্ন সুর ধরতে হয়েছে। সে তখন একটু যেন অপ্রস্তুত হয়েই বোঝাচ্ছে, 'তা কী করে হয় বলুন। একবার চাওয়ামাত্র মনের মতো বাড়ি পাবেন, কলকাতা শহরে সেদিন কি আর আছে! কিছুদিন অপেক্ষা করতেই হবে।'

'সেই কিছুদিনটা কত, তাই জানতে চাচ্ছি!' মক্কেল বেশ জবরদস্ত।

সুরেশ জুতসই একটা জবাব ভাবতে গিয়ে একেবারে ভূত দেখার মতো আঁতকে ওঠে।

নীলা মানে তার বোন নীলিমাই ছোট একটা সুটকেস হাতে অফিসের ভেতর ঢুকে দাঁড়িয়েছে। তার মুখ-চোখের ভাবও মক্কেলের চেয়ে মোলায়েম নয়।

সুরেশ নিজেকে সামলাবার আগেই নীলা একেবারে জ্বলন্ত স্বরে বলে, 'কলকাতা শহরে চাওয়ামাত্র বাড়ি পাওয়া যায় না জানি, কিন্তু পাওয়া বাড়িও তাই গা ঢাকা দিয়ে সরে পড়ল নাকি? ১৪ বি অঘোর ঘোষাল লেনের বাড়িটা এখন কোথায় তাই জানতে এসেছি।'

মক্কেল তাঁর দল ভারী হতে দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেও নীলার কথায় চোখ কপালে তুলে বলেন, 'সেকী! বাড়ি আবার ঠিকানা থেকে কোথাও যায় নাকি!'

'যায় মশাই, তাও আজকাল যাচ্ছে? নীলা মক্কেল ও সুরেশ দুজনকেই দুদিক দিয়ে হতভম্ব করে বলে, 'নিজের বাড়িতে ঢুকে হঠাৎ একদিন হয়তো দেখবেন, সেখানে আর কেউ সংসার পেতে বসে আছে।'

ব্যাপারটা যত আজগুবিই হোক মক্কেল দলের লোক পেয়ে উৎসাহিত হয়ে বলেন, 'বাড়িটা কি এই 'যা চাই পাবেন' থেকেই পেয়েছিলেন?'

নীলাকে জবাব দেওয়ার জন্যে মুখ খুলতে হয় না।

মক্কেল নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই করে নিয়ে আবার বলেন, 'বুঝেছি বুঝেছি, আর আপনাকে কিছু বলতে হবে না। সাইনবোর্ডের কারদানি থেকেই সন্দেহ হয়েছিল। এখন

একেবারে হাতে-হাতে প্রমাণ পেলাম। বাড়িকে বাড়িই লোপাট!'

টি. কে. রায় ততক্ষণে অফিসের দরজায় পৌঁছে গেছেন।

সুরেশের অফিসে নীলাকে দেখে তিনিও কম হতভম্ব হননি। কিন্তু তাঁর প্রথম কর্তব্য মক্কেল সামলানো।

যথারীতি বিদ্রুপের সুরে মক্কেলকেই তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'বাড়ি আবার লোপাট হল কোথায় মশাই!'

'এই যে শুনুন না এঁর কাছে।' মক্কেল নীলাকে দেখিয়ে দেন, 'এমন বাড়ি পেয়েছেন যে নিজের ঠিকানাতেই নেই। যাক খুব শিক্ষা আমার হয়েছে।'

মক্কেল করিডরে বেরিয়ে আসেন।

কিন্তু মক্কেলকে অমনভাবে চলে যেতে তো দেওয়া যায় না। রায় পেছন থেকে ডাক দিয়ে বলেন, 'শুনুন!

মক্কেল বেশ বিরক্তির সঙ্গে ফিরে দাঁড়িয়ে বলেন, 'আমায় ডাকলেন!'

'হ্যাঁ।' রায় তাঁর প্যাঁচ ছাড়তে শুরু করেন, 'বলছিলাম যে শিক্ষা আপনার এখনও হয়নি।'

'মানে?' মক্কেল একটু গবম।

'মানে, কামারের কাছে আপনি স্যাকরার কাজ চাইতে এসেছিলেন। আম পাড়তে গেছলেন আমড়া গাছে। পাবেন কী করে?'

সুরেশকে এবার ছকা চাল চালতে হয়। মামার দিকে বিষদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলতে হয়, 'হ্যাঁ, পাবেন আপনার কাছে কেমন? যান না মশাই, ওঁদের কাছেই যান না। আমড়ার বদলে একেবারে বোম্বাই আম খাইয়ে দেবেন।'

'তা দেব বইকী!' ভারিক্কি চালে বলেন, 'টি. কে রায়, 'অন্তত আমড়াকে আম বলে চালাব না।'

আজকের সব প্যাঁচই কিন্তু ফসকে যায়। মক্কেল একবার সুরেশ আর একবার রায়ের দিকে চেয়ে কড়া গলায় বলেন, 'যাই মশাই, কলকাতায় বাড়ি ভাড়ার শখ আমার মিটে গেছে। ও আম আর আমড়া আপনারাই চুষুন।'

চাবুকটার জ্বালা যতই হোক না ভুলে এবার নীলার দিকে মনোযোগ দিতে হয়।

মক্কেল চলে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই নীলার গলা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। রাগের জ্বালা না অভিমানের কান্না কোনটা তাতে প্রধান, বলা শক্ত।

'তোমরা মামা-ভাগনে মিলে এরকম একটা কেলেঙ্কারি বাধিয়েছ আমি ভাবতেই পারিনি। বাড়িতে ঢুকে তো একেবারে থ। শুধু গলা ধাক্কা খেতেই বাকি আছে। ভদ্রলোক শেষপর্যন্ত আমায় কী করে তাড়িয়েছেন জানো? পাগল বলে প্রায় পুলিশে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। আমি নিজে থেকে মানে-মানে না চলে এলে বোধহয় পুলিশই ডাকতেন! ব্যাপারটার মানে আমি জানতে চাই?'

সুরেশ থতমত অবস্থা কাটিয়ে উঠতে না পারলেও রায় ততক্ষণে সামলে নিয়েছেন। কোনও অবস্থাতেই দিশাহারা হওয়া তাঁর ধাতে নেই।

নীলাকে স্নেহের হাসি হেসে আশ্বস্ত করবার চেষ্টায় তিনি বলেন, 'জানবি! জানবি! সব জানবি। ভারি একটা গোলমালে পড়ে কিছুদিনের জন্যে ওই ব্যবস্থা করতে হয়েছে। যাক ও নিয়ে আর ভাবিসনি। সব ঠিক হয়ে যাবে!'

নীলা কিন্তু অত সহজে শান্ত হওয়ার পাত্রী নয়। ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, 'ভাবব না মানে! নিজের বাড়িতে নিজের ঘরে ঢুকে দেখি কে কোথাকার একটা অজানা লোক সেখানে মৌরসী পাট্টা করে বসে আছে। শুধু তাই নয় আমিই যেন সেখানে পাগল হয়ে, কি চুরির মতলবে ঢুকেছি এমনি তার কথার ধরন! তুমি বলছ কিনা সব ঠিক হয়ে যাবে! কে ও লোকটা আমার ঘর দখল করে আছে আগে বল।'

'কে আর? একজন ভাড়াটে!' রায় বোঝাবার চেষ্টা করেন, 'বুঝছিস না কেন? নেহাত দায়ে পড়ে ভদ্রলোককে কদিন জায়গা দিতে হয়েছে। তবে ভদ্রলোক ক'দিন আর থাকবে। বিদেয় হল বলে!'

'ও যতদিন না বিদেয় হয় ততদিন আমি কী করব কিছু ভেবেছিলে?'

'আহা তুই, মানে তুই তো দেশে গিয়েছিলি কি না!' সুরেশ হঠাৎ বেফাঁস বলে ফেলে।

'তাহলে চেয়েছিলে যে আমি দেশেই থাকি।' নীলা জ্বলে ওঠে, 'তা মুখ ফুটে বললেই পারতে! বেশ আমি দিদিমার কাছেই যাচ্ছি। আর যদি জীবনে...'

নীলা সুটকেস তুলে নিয়ে প্রায় রওনা হয় বুঝি।

রায়কে তাড়াতাড়ি সামলাতে হয়, 'আরে না, না, তুই দেশে যাবি কেন? সুরেশটা গুছিয়ে ঠিক বলতে পারেনি। মানে তুই ছিলিনি বলেই অবশ্য ঘরটা এখনকার মতো দায়ে পড়ে দিয়েছি। কিন্তু তোর থাকার ব্যবস্থা না করেই কি দিয়েছি। সে ব্যবস্থা আছে।'

'কোথায়?' নীলা এখনও আগুন, 'হোটেলে না ফুটপাথে? আমারই ভুল হয়েছে কাকাবাবুর ওপর রাগ করে চলে আসা।'

নীলার চোখে আবার জল দেখা দেয়।

তাকে বুঝিয়ে ঠান্ডা করতে রায়ের উপস্থিত বুদ্ধিও বুঝি আর কুলোয় না।

তা নীলার পক্ষে রাগ-অভিমান করা খুব অস্বাভাবিক বোধ হয না। পরীক্ষার খবর বার হতে তখন আর হপ্তাদুয়েক বাকি। ফলাফলের অপেক্ষায় কলকাতায় দুরু-দুরু বুক নিয়ে থাকা হঠাৎ অসহ্য মনে হয়েছিল বলেই ক'দিনের জন্য দেশে মামাবাড়িতে দিদিমার কাছে গিয়েছিল। ফিরে এসে এরকম অবিশ্বাস্য অবস্থায় পড়বে কল্পনাও করতে পারেনি।

বাড়িতে মধু না থাক দরজার চাবি তার কাছেও একটা আছে।

দরজার তালা কিন্তু খুলতে হয়নি। তার নিজের ঘরটাও খোলা। এসব দেখেও তেমন কিছু অবাক হয়নি। মধু হয়তো বাড়িতে আছে বলেই দরজাটা আর বন্ধ করেনি এই ধারণা হয়েছে।

অসন্দিগ্ধ ভাবে নিজের ঘরে ঢুকে সুটকেশটা রাখতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে কাঠ হয়ে!

সম্পূর্ণ অপরিচিত কে একজন ঘরের ওপাশে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে চেস্ট এক্সপ্যান্ডার নিয়ে ব্যায়াম করছে। ব্যায়ামবীর তার দিকে পেছন ফিরে আছে এই ভাগ্যি।

সে ভাগ্য কিন্তু টেঁকেনি।

স্বপ্ন দেখছে না নিজেরই মাথা খারাপ হয়ে গেছে বুঝতে না পেরে নীলার অবশ হাত থেকে সুটকেসটা হঠাৎ পড়ে গেছল এবার।

তার শব্দে নীলার ব্যায়ামবীর আমাদের প্রদীপও চমকে ফিরে দাঁড়িয়েছিল।

দুজনেই দুজনের দিকে চেয়ে তখন হতভম্ব।

কিন্তু এরকম চাল মাত অবস্থায় তো বেশিক্ষণ থাকা যায় না। নীলার নিজের বাড়ি নিজের ঘর। সুতরাং সেখানে অচেনা-অজানা কাউকে এমন জবরদখল করে থাকতে দেখলে তারই একটা কিছু বিহিত করা উচিত।

ঠোঁট কামড়ে নিজেকে শক্ত করে নিয়ে নীলাই তাই প্রথমে বলেছিল, 'দেখুন, আপনি মানে, আপনি কি এখানে থাকেন?'

যতখানি শক্ত হয়ে কথাটা বলা উচিত ছিল তা নীলা বোধহয় পারেনি।

ব্যায়ামবীর একটু হেসে বলেছিল, 'সেটা অস্বীকার করি কী করে—'

নীলা তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে আবার বলেছিল, 'মাপ করবেন, আমার এ প্রশ্ন করাটা ঠিক হয়নি। কিন্তু আপনি, মানে, এখানে কতদিন আছেন জানতে পারি?'

'আপনি মানে এখানে' শুনে কি না বলা যায় না জবরদখলকারের মুখে এবারও বিস্ময়ের সঙ্গে একটু হাসির রেখাও ছিল! বেশ সহজভাবেই বলেছিল, 'তা হপ্তাখানেক তো কেটে গেল।'

'হপ্তাখানেক ধরে এখানে আছেন!' নীলা নিজের কানকে বোধহয় বিশ্বাস করতে পারেনি, 'কিন্তু আমি তো ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না ঠিক।'

'সেটা আমিও পারছি না।' ব্যায়ামবীর হাতের চেস্ট এক্সপ্যান্ডারটা এক জায়গায় রেখে কেমন একটু অদ্ভুত ভাবে নীলাকে লক্ষ করে বলেছিল এবার, 'আপনি কি কাউকে খুঁজছেন এখানে? কাকে খুঁজছেন যদি বলেন তো...'

ব্যায়ামবীর কথাটা শেষ করেনি। নীলার তখন নিজের অবস্থাটা ভেবে হাসি-কান্না দুই-ই একসঙ্গে পাচ্ছে। তার নিজের ঘরে ঢুকে এরকম প্রশ্ন শুনতে হবে সে কি স্বপ্নেও কোনওদিন ভেবেছিল! ভদ্রলোক তাকে কী ভাবছেন তাঁর চোখের দৃষ্টি দেখেই নীলা তা খানিকটা অনুমান তখন করতে পেরেছে। নীলা সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ কিনা ভদ্রলোকের চোখে যেন সেইরকম সন্দেহেরই আভাস। কিন্তু ভদ্রলোক নিজেই কী তা কে বলতে পারে! চড়া গলা কড়া কথায় উলটো ফল হওয়ার ভয়ে নীলাকে তাই নিজেকে সামলে সহজ হওয়ার চেষ্টা করতে হয়েছে।

একটু কৌতুকের সুর দিয়ে তাই সে বলেছিল, 'কাউকে যে খুঁজছি তাই বা কী করে বলি! আচ্ছা এখানে আপনি ছাড়া আর কে থাকেন বলুন তো।'

ব্যায়ামবীরের দৃষ্টিতে নীলার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ এবার স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। বেশ একদৃষ্টে খানিকক্ষণ নীলার দিকে তাকিয়ে সে বলেছিল, 'বললে চিনতে পারবেন নিশ্চয়। এখানে আমি ছাড়া থাকেন মিঃ টি. কে. রায় আর তাঁর ভাগনে সুরেশবাবু। কিন্তু তাঁরা তো এসময়ে বাড়ি থাকে না। আপনি কি এসব না জেনেই এসে উঠেছেন? মানে আপনার ঠিকানা ভুল হয়নি তো?'

রাগ ও দুঃখের চেয়ে এবার কৌতুকটাই প্রধান হয়ে উঠেছিল নীলার গলায়, 'এখন তো সেইরকমই মনে হচ্ছে। এ বাড়ির ঠিকানা কী?'

'এটা ১৪বি অঘোর ঘোষাল লেন!' ব্যায়ামবীরের গলায় কোনও কৌতুক কিন্তু ছিল না, 'আপনি কোন ঠিকানা খুঁজছেন?'

'খুঁজছি তো এই ঠিকানাই!' নীলা বলতে বাধ্য হয়েছে, '১৪বি অঘোর ঘোষাল লেন।'

'তা কী করে হয়!' ব্যায়ামবীর এবার একটু রুক্ষস্বরে বলেছিল, 'এক নম্বর, এক

ঠিকানা তো দুটো বাড়ির হতে পারে না।'

'তা তো পারে না বলেই জানি!' নীলার মুখে তখন দুঃখের তিক্ত হাসি।

'মাপ করবেন!' ব্যায়ামবীর জোর দিয়ে বলেছিল, 'নিশ্চয়ই আপনার ভুল হয়েছে।'

'ভুলটা আমার বদলে আর কারুরও হতে পারে!' নীলা একটু বিদ্রুপ করেই বলেছিল এবার।

ব্যায়ামবীর বেশ একটু উত্তপ্তই হয়ে উঠেছিল তাতে, 'ভুল আপনার ছাড়া আর কার হবে! এ বাড়িতে কে কে থাকেন, সবই তো আপনাকে জানালাম। এখন ঘর-দোর দেখেও বুঝতে পারছেন না ঠিক জায়গায় এসেছেন কি না।'

নীলা চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে আসবাবপত্রের অদল-বদল লক্ষ করে বলেছিল, 'ঘর-দোরের চেহারা একটু অবশ্য আলাদাই মনে হচ্ছে।'

'দেখুন কিছু মনে করবেন না!' ব্যায়ামবীরের গলা এবার স্পষ্টই রূঢ় শুনিয়েছিল, 'আপনি ঠিকানাটা ভুল করেছেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। আপনি নম্বরটা আর একবার মনে করবার চেষ্টা করুন।'

সুটকেসটা যেখানে পড়েছিল সেখান থেকে সেটা তুলে এনে ব্যায়ামবীর নীলার হাতে তুলে দিয়েছিল যেন স্মরণ করবার সাহায্য হিসাবে।

'এটা আবার তুলে দিচ্ছেন কেন?' বলেছিল নীলু।

'না, না, নিজের জিনিস যেখানে সেখানে ফেলে যাওয়া উচিত নয়। আচ্ছা, তাহলে'... কথাটা অসমাপ্ত রেখে ব্যায়ামবীর নমস্কারের ভঙ্গিতে দুহাত একটু তুলেছিল। উদ্দেশ্যটা তার স্পষ্ট।

নীলা কিন্তু তখনও নড়েনি। হেসে একবার বলবার চেষ্টা করেছিল, 'ঠিকানাটা আমারই ভুল হয়েছে বলছেন! আমি বরং একটু ভেবে...'

ব্যায়ামবীর বাইরে যাওয়ার দরজাটা তখন খুলে ধরে বেশ যেন দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়েই দাঁড়িয়েছে। সেখান থেকেই বলেছিল, 'হ্যাঁ ভেবে দেখলেই মনে পড়ে যাবে। এই রাস্তায় যেতে-যেতেই বাড়িটা হয়তো চিনেও ফেলতে পারেন।'

এরপর সেখানে থাকা আর যায় না। সুটকেসটা নিয়ে বেরিয়ে গিয়েও তবু একবার থেমে নীলা বলেছিল, 'কিন্তু এখন রাস্তায় গিয়ে বাড়ি খোঁজাটা...'

ব্যায়ামবীর দরজার একটা পাল্লা ইতিমধ্যেই বন্ধ করে ফেলেছে। ফাঁকটা দিয়ে মুখ বার করে বলেছিল, 'না, না, এই তো খোঁজবার সময়। এই দিনের আলো থাকতে-থাকতে।'

দরজার অন্য পাল্লাটাও এবার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

অনেক কষ্টে নীলাকে বুঝিয়ে-শুঝিয়ে ঠান্ডা করে মামা-ভাগনে তারপর তেতলার এখানে ঘরটায় রেখে এসেছে। নীলাকে বুঝিয়ে রাজি করতে শুধু নয় এ-ঘর খুলতেও কম বেগ পেতে হয়নি তাদের।

বাড়িটা যে ডাঃ বনবিহারী ঘোষের তা আগেই বলা হয়েছে। বন্ধু ও তাঁর বাড়ি ভাড়া দেওয়ার এজেন্ট হিসেবে রায় এতদিন এখানেই নিশ্চিন্ত অধিকারেই কাটিয়েছেন। ভাইপো-ভাইঝির ব্যাপার নিয়ে খেপে যাওয়ার পর ডাঃ ঘোষ রায়কে এ-বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার নোটিশ দেওয়ার সঙ্গে তেতলার খালি ঘরটাতেও তালা লাগিয়ে গেছেন। ব্যবহারে না লাগলেও আগে সেটা রায়ের জিম্মাতেই ছিল। এখন আর তা নেই।

ডাঃ ঘোষ জানতে পারলে গোলমাল করবেন জেনেও বিপদে পড়ে রায় আর সুরেশকে

সে ঘরের তালা ভেঙে আপাতত নীলাকে সেখানে ঢোকাতে হয়েছে।

নীলা অবশ্য একবার প্রতিবাদ করলে, 'কাজটা কিন্তু ভালো হচ্ছে না মামা। কাকাবাবু একবার জানতে পারলে কী হবে তা তো জানো।'

'আর জানতে পারবে কেন?' রায় অভয় দিয়েছেন, 'তার আগেই তোর ঘর খালি হয়ে যাবে। কিছু ভাবিস না!'

'না ভাবব আর কী!' নীলা অনেক দুঃখে বিদ্রুপ করে বলেছে, 'তোমাদের মতো গুরুজনের হাতে যখন পড়েছি তখন সব দুর্ভোগের জন্যেই তৈরি থাকতে হবে!'

নীলা দরজা বন্ধ করার পর মামা-ভাগনে সন্তর্পণে নিচে নেমে এসে প্রদীপের খোঁজ করলেন। প্রদীপের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ দেখে তাঁরা বেশ একটু অবাক।

দুবার তাতে ধাক্কা দিতে প্রদীপ যেরকম সাবধানে দরজা খুলে একটু ফাঁক করে বাইরে উঁকি দিলে তাও স্বাভাবিক নয়।

তাঁদের দেখতে পেয়ে প্রদীপ অবশ্য আশ্বস্ত হয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। দরজাটা এবার খুলে ধরে বললে, 'আসন আসুন! আপনারা এসেছেন তা ভাবিনি। একটু তাড়াতাড়ি কিন্তু ঢুকে পড়ুন।'

বেশ হতভম্ব হয়ে রায় ও সুরেশ ঘরে ঢোকবার পরই প্রদীপ দরজাটায় তৎক্ষণাৎ খিল এঁটে দিলে ভেতর থেকে।

সবিস্ময়ে রায় বললেন, 'দরজা বন্ধ করলেন যে।'

'করছি কি সাধে!' প্রদীপ যেন নিরুপায়, 'কখন আবার আসবে ঠিক কী!'

ব্যাপারটা একটু অনুমান করলেও সুরেশ জিজ্ঞাসা করলে, 'কার কথা বলছেন?'

'আরে মশাই সে এক আচ্ছা ফ্যাসাদ!' প্রদীপ প্রায় আর্তস্বরে জানালে, 'কী বিপদে যে পড়েছিলাম!'

'বিপদে পড়েছিলেন! এই ফ্ল্যাটে!' রায় যেন বিমূঢ়।

'আজ্ঞে হ্যাঁ! বিপদ বলে বিপদ!' প্রদীপের এখনও যেন ভয় কাটেনি, 'তাই তো দরজা বন্ধ করে রেখেছিলাম। এবার ঘরে ঢুকলে আর কি বার করতে পারতাম।'

রায় ও সুরেশের বুঝতে তখন আর কিছু বাকি নেই। পরস্পরের মুখের দিকে একবাব তাকিয়ে নিয়ে রায়ই অজ্ঞতার ভান করে বললেন, 'ব্যাপারটা একটু খুলে বলুন তো। ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'আমিও কি বুঝেছি মশাই!' প্রদীপের গলায় সংশয়, 'পাগল-টাগল বলেই মনে হয়।'

'পাগল! পাগল এখানে ঢুকেছিল!' সুরেশকে বিস্ময় প্রকাশ করতে হল হাসি চাপবার জন্যেই।

'শুধু ঢুকেছিল নয় মশাই একেবারে মৌরসী পাট্টার মতলব। বাসাটা যেন তারই এমনি ভাবগতিক। ঠিকানা পর্যন্ত মুখস্থ।'

'বলেন কী?' রায় যেন উদ্বিগ্ন, 'কী ধরনের পাগল বলুন তো?'

'ধরন-ধারণ দেখে পাগল বলে বোঝা যায় না সেই তো মুশকিল!' প্রদীপকে অনিচ্ছার সঙ্গে স্বীকার করতে হল, 'দিব্যি ভব্য-সভ্য চেহারা। দেখতে তো সুন্দরী বলেই মনে হয়।'

'মেয়ে পাগল তার ওপর আবার সুন্দরী!' সুরেশ যেন ভাবিত, 'আপনার কিছু ভুল হয়নি তো?'

'ভুল!' প্রদীপ অপ্রসন্ন, 'স্বচক্ষে দেখলাম আর বলছেন, ভুল। দস্তুরমত সুন্দরী বলা চলে!'

'না, না সে কথা নয়।' রায় গম্ভীর মুখেই বললেন, 'পাগল কী না তাই বুঝতে চাইছি।'

'তা পাগল যদি না হয়, তাহলে তো আরও ভয়ের কথা!' প্রদীপ বিশ্লেষণ করে বোঝালে, 'কোনও মতলব নিয়ে পাগল সেজে এসেছিল তাহলে! কিন্তু এখানে ঢোকার কী মতলব থাকতে পারে বুঝতে পারছি না। যাই হোক মশাই দরজা আমি আর খোলা রাখছি না।'

প্রদীপের শেষ সঙ্কল্প শুনে রায় যেন একটু আশার আলো পেলেন। সুযোগের কুটিটি পর্যন্ত হেলা করতে নেই। তিনি যেন বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, 'তাহলে তো বড় ভাবনার কথা হল মশাই। এরকম পাগল-টাগল হানা দিলে তো এখানে থাকা দায় হয়ে উঠবে।'

'হ্যাঁ, তাই তো ভাবছি!' প্রদীপকে এবিষয়ে একমত দেখা গেল।

'আপনি তো ছবি-টবি আঁকেন!' সুরেশ উৎসাহিত হয়ে সমস্যাটা সঙিন করে দেখালে, 'এরকম উপদ্রব হলে কাজ করবেন কী করে?'

'না, খুবই অসুবিধে হবে!' স্বীকার করলে প্রদীপ।

'তাই ভাবছি', রায় এ সুযোগ আর ফসকে যেতে দেন, 'এর চেয়ে আপনার বোধহয় হোটেলে-টোটেলে থাকা ভালো।'

'হোটেল!' প্রদীপ যেন একটু অবাক।

'হ্যাঁ ভালো হোটেল!' রায় উৎসাহিত করবার চেষ্টা করেন, 'আমার জানা একটি যা হোটেল আছে একেবারে পয়লা নম্বরের। একেবারে নির্ঝঞ্ঝাটে থাকবেন।'

'কেন?' প্রদীপ কৌতূহলী, 'হোটেলে লোকজন নেই?'

'থাকবে না কেন?' সুরেশ মামার তালে তাল দিলে, 'কিন্তু সব ভারিক্কি ভদ্রলোক! যে যার নিজের কাজে থাকেন! বেশিরভাগই রিটায়ার্ড অফিসার।'

'ওঃ সবাই বয়স্ক লোক।' প্রদীপ উৎসাহিত কী না ঠিক বোঝা যায় না।

রায় টোপটা আরও লোভনীয় করে তুললেন, 'ওইটেই ও হোটেলের বিশেষত্ব। আজে-বাজে চ্যাংড়া কাউকে জায়গাই দেয় না। আর খাওয়া-দাওয়াও ভালো।'

নাঃ এ টোপে এবার বুঝি গাঁথবেই।

রায় ও সুরেশ উৎসুকভাবে প্রদীপের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কিন্তু সব আশায় ছাই পড়ল প্রদীপের কথায়।

প্রদীপ খানিক কী যেন ভেবে নিয়ে বললে, 'না, তাহলেই মুশকিল!'

'মুশকিল কোথায় দেখলেন!' রায় সত্যিই অবাক, 'সব ভদ্র-বয়স্ক বোর্ডার, তার ওপর খাওয়া-দাওয়া ভালো।'

'ওই দুটোতেই তো মুশকিল!' প্রদীপ ব্যাখ্যা করে বোঝালে, 'ওইসব প্যাঁচামুখো বুড়ো-হাবড়া পেনসন পাওয়া অথর্বদের ভেতর থাকলে দুদিনে আমিও বুড়িয়ে যাব। আর ভালো খাবারদাবার তো অসহ্য!'

'ভালো খাওয়া-দাওয়া অসহ্য!' এবার সুরেশ আর রায়ের চোখ সত্যিই কপালে উঠল।

'হ্যাঁ', প্রদীপ সহজ করে বুঝিয়ে দিলে, 'আমাদের ভালো খাওয়া-দাওয়া মানে তো গুচ্ছের তেল-ঘি-ঝাল-মশলা দিয়ে পোলাও কালিয়া কোপ্তা কাবাব, যাতে চল্লিশেই ডায়াবিটিস

নয়, ব্লাডপ্রেসার। না মশাই ও আমার চলবে না। তবে খাওয়ার কথা যখন তুললেন তখন বলেই ফেলি, আমি শেষপর্যন্ত আপনাদের এখানেই চার্জ দিয়ে খাব ঠিক করলাম। ভেবে দেখলাম সেইটেই আমার পক্ষে সুবিধে।'

হতভম্ব হয়ে সুরেশ একবার বলবার চেষ্টা করলে, 'কিন্তু আমাদের এখানে বুঝলেন কি না...'

সুরেশের অনুচ্চারিত আপত্তি আগেই খণ্ডন করে প্রদীপ অবিচলিতভাবে জানালে, 'সে জন্যে কিছু ভাববেন না। আমার খাওয়ার কোনও হাঙ্গামাই নেই। সিম্পল বয়েল্ড থিংস মানে শুধু নিরামিষ-সেদ্ধ ছাড়া আমি কিছু খাই না।'

অগত্যা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে রায় ও সুরেশকে এ ব্যবস্থা মেনে নিতেই হয়।

চার

সেই খাওয়ার ব্যাপার থেকেই অমন কাণ্ড হয়ে যাবে আগে কে ভাবতে পেরেছিল!

প্রদীপ শুধু নিরামিষ সেদ্ধই খায় জানিয়েছে। খাওয়ার টেবিলে আয়োজনও হয়েছিল সেইমতো।

প্রদীপের পাতে শুধু নানারকম সিদ্ধ! রায় ও সুরেশ তাঁদের নিজের রুচিমতো খাচ্ছেন।

প্রদীপ খানিক আগে এ ঘরের রেডিওটা বুঝি চালাবার চেষ্টা করে বিফল হয়েছে। সেই কথাই সে বলছিল।

বলছিল, 'আপনাদের রেডিওটা কীরকম মশাই? দুপুরের খবরের জন্যে একটু চালাতে গেলাম, তা আওয়াজই নেই।'

রায় হেসে বললেন, 'ও আমাদের মধুর মতো। মর্জিমাফিক আওয়াজ দেয়।'

সুরেশ প্রদীপের পাতের দিকে চেয়ে একটু দুঃখিত হয়েই বললে, 'আমাদের কিন্তু বড় খারাপ লাগছে, প্রদীপবাবু। আপনি শুধু ওই সেদ্ধগুলো খাচ্ছেন, আর সামনে বসেই চর্বচোষ্য খেতে আমাদের কি ভালো লাগে?'

'খারাপ তো আমারও লাগছে!' প্রদীপ উলটে সহানুভূতি জানালে, 'আমার সামনে ওইসব আজেবাজে জিনিস খেয়ে শরীর নষ্ট করছেন...'

কথাটা শেষ না করেই প্রদীপ হাঁ-হাঁ করে উঠল। মধু ভুলে তার পাতে একটা তরকারি ঢেলে দিয়েছে।

'আরে-আরে ...এটা কী করলে!' প্রদীপ বেশ বিরক্ত।

'আজ্ঞে মুড়িরঘন্ট দিয়ে ফেলেছি!' মধুকে বিশেষ লজ্জিত মনে হল না।

'মুড়িরঘন্ট!' প্রদীপ শঙ্কিত, 'মানে মাছের মুড়ো আছে?'

রায় ও সুরেশের তখন দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেছে।

হাসি চেপে রায় গম্ভীরভাবে বললেন, 'আছে তো অনেক কিছু, একটু চেখেই দেখুন না!'

'চেখে দেখব!' প্রদীপ যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না, 'ওইসব বার্বারস ফুড মানে বর্বর খাদ্য যাকে বলে!'

'আজ্ঞে বরবটি তো নেই।' মধু প্রতিবাদ না জানিয়ে পারল না, 'দিদিমণি নিজে...'

'দিদিমণি?' প্রদীপ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল।

রায় ও সুরেশকেও তৎক্ষণাৎ তৎপর হয়ে উঠতে হল, মধুর আহাম্মকি সামলাতে।

দুজনে একসঙ্গে যেন আকাশ থেকে পড়ে বলে উঠলেন, 'দিদিমণি কী আবার?'

রায়ই প্রথম যেন রহস্যটা উদ্ধার করলেন, 'ওঃ বুঝেছি। দিদিমণি নয় দিদিমা। মানে, আমার মা'র কথা বলছে আর কী! সুরেশের তিনি দিদিমা হলেন তো। মধুও তাই বলে।'

প্রদীপের দিকে চেয়ে হেসে এবার সুরেশই ব্যাখ্যাটা বিশদ করলে, 'হ্যাঁ, আমার দিদিমা মধুকে নিজে হাতে সব রান্না শিখিয়েছেন কি না!'

'ওঃ!' প্রদীপ তখন বেশ কয়েক গ্রাস খেয়ে ফেলেছে। অন্যমনস্কভাবে পাতটা প্রায় পরিষ্কার করতে-করতে বললে, 'আপনার দিদিমা এইসব রাঁধেন বুঝি?'

পাতটা লক্ষ করে রায় বললেন, 'হ্যাঁ, মা'র ওই সব স্বর্বর রান্না। তা প্লেটটা বদলে দেবে?'

'বদলে!' প্রদীপের প্লেট তখন প্রায় চাটাপোটা হয়ে গেছে।

সুরেশ মুখ টিপে হেসে বললে, 'বদলাবার দরকার কী, বরং আর একটু দিক, কেমন?'

'আর একটু!' প্রদীপ বেশ দ্বিধান্বিত, 'না, না এসব অত্যন্ত অনিষ্টকর।'

মধু কিন্তু ততক্ষণে বেশ খানিকটা প্রদীপের পাতে ঢেলে দিয়েছে।

'আরে! আরে! এটা কী করলে!' প্রদীপের প্রতিবাদ এবার তেমন জোরালো নয়, 'এসব জিনিস আমি যে ছুঁতে পর্যন্ত চাই না।'

'তা হাতে না ছুঁতে চান, চামচ দিচ্ছে!' রায় সমস্যাব সমাধান করে দিয়ে মধুকে আদেশ দিলেন, 'একটা চামচ নিয়ে আয় আর মাছের পাতুড়ি।'

'মাছের পাতুড়ি!' প্রদীপের চোখ তার কপালে, 'এর ওপর আবার মাছের পাতুড়ি! এ তো রীতিমতো ক্রিমিন্যাল গ্ল্যাটনি! এসব আপনারা রোজ খান?'

'না রোজ কি আর হয়!' কৌতুকটা উপভোগের আনন্দে বেফাঁস কথাটা সুরেশের মুখ দিয়েই ভুলে বেরিয়ে গেল, 'নীলু আজ এসেছে কি না...'

কথাটা শেষ করবার আগেই ভুলটা টের পেয়ে সুরেশ শেষ মুহূর্তে সামলাবার চেষ্টা করলে, 'মানে তাই আজ একটু বেশি রান্না হয়েছে।'

কিন্তু গোলমাল যা হওয়ার তখনই শুরু হয়ে গেছে।

'কে এসেছে বললেন।' প্রদীপ একটু কৌতূহলী, 'কে, নীলু মানে নীলুবাবু? তা তিনি কোথায়?'

'সে, মানে', রায়কে এবার মহড়া নিতে হল, 'সে পরে খাবে!'

'বাঃ এ খুব অন্যায়!' প্রদীপ মাছের পাতুড়ির সদ্ব্যবহার করতে-করতে ক্ষুণ্ণ স্বরে বললে, 'তাঁর জন্যেই রান্না। আর আমরা আগে খেতে বসে গেছি। তিনি আসবেন কখন?'

'ঠিক সময়েই আসবে!' রায় প্রসঙ্গটা বদলাতে পারলে বাঁচেন, 'আপনি ভাববেন না।'

'না, না, ভাবতে হবে বইকী!' প্রদীপ রীতিমতো উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল, 'শুধু তাঁর খাওয়ার কথা তো নয়, তাঁর থাকবার কথাও ভাবতে হবে। আপনাদের তো ওই একখানা ঘর। তাতে আপনারা দুজনে রয়েছেন। আপনাদের অসুবিধে যদি হয় তো নীলুবাবু আমার ঘরে থাকতে পারেন। আমার কোনও আপত্তি নেই।'

প্রদীপের এ উদারতায় সুরেশ হঠাৎ বিষম খেয়ে দম বন্ধ হয়ে প্রায় অস্থির। তাতেও রক্ষা ছিল কিন্তু তারই সঙ্গে কোথাও যেন একটা হাসির হিল্লোল উঠতে গিয়ে চাপা পড়েই বিপদ বাধাল।

'শুনলেন!' সন্ত্রস্ত হয়ে সটান দাঁড়িয়ে উঠে প্রদীপ বললে, 'শুনতে পেলেন হাসির শব্দ!'

'হাসির শব্দ আবার কোথায়? ও তো সুরেশের বিষম খেয়ে কাশির শব্দ!' রায় সামলাবার বৃথাই চেষ্টা করলেন।

প্রদীপ ততক্ষণে টেবিল ছেড়ে বাইরের দরজার দিকে ছুটে গেছে।

হাসিটা যে নীলার তা বলাই বাহুল্য। রান্নাঘরে লুকিয়ে থেকে সে মধুর পরিবেশনের তদারক করছিল। হঠাৎ প্রদীপের ওই অদ্ভুত মন্তব্য। চেষ্টা করেও হাসিটা প্রথম চাপতে পারেনি।

প্রদীপের পায়ের শব্দ পেয়ে তারপরই অবশ্য ছুটে পালিয়েছে। দরজা দিয়ে সিঁড়িতে আর সেখান থেকে সোজা ছাদে গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে খিল।

তার মুখ না দেখতে পেলেও সন্দিগ্ধ ও সন্ত্রস্ত হওয়ার মতো বেশ কিছু প্রদীপ কিন্তু তারই মধ্যে দেখে ফেলেছে। দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় নীলার চাবি বাঁধা আঁচলের কোণটা ছিটকিনিতে আটকে গেছল। সেটা ছাড়িয়ে নেওয়ার সময় নীলার একটা হাত প্রদীপ বেশ স্পষ্টই দেখতে পেয়েছে।

সিঁড়িতে গিয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে প্রদীপ একবার নিচে ও একবার ছাদ পর্যন্ত সন্ধান করে এসে হতাশ হয়ে পরস্পরের মুখ চেয়ে বসে থাকা রায় ও সুরেশকে সেই কথাই শঙ্কিতভাবে জানাল, 'ব্যাপার মোটেই সুবিধের নয়। বুঝেছেন।'

'কেন কী হল কী!' রায়ের ব্যাপারটা অগ্রাহ্য করবার চেষ্টা।

'আবার সেই!' প্রদীপ কিন্তু দস্তুরমতো উদ্বিগ্ন, 'মানে সেই পাগল আবার ঢুকেছিল!'

'না, না, নিশ্চয়ই আপনার ভুল হয়েছে!' রায় কথাটাকে আমলই দিতে চান না।

'ভুল?' প্রদীপ বেশ ক্ষুণ্ণ, 'আমি স্বচক্ষে তার শাড়ির আঁচল দেখলাম, আর আপনি বলছেন ভুল!'

'আহা শাড়ির আঁচল মানেই তো পাগল নয়?' সুরেশ হেসেই উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে, 'অন্য বাড়ির কোনও ঝি-টি হয়তো মধুর কাছে এসে থাকবে!'

'ঝি!' প্রদীপ এবার অসন্তুষ্ট, 'ঝি-এর হাতে রিস্টওয়াচ থাকে! না মশাই আমাদের আরও সাবধান না হলে নয়।'

'বেশ তাই হওয়া যাবে!' রায় এ দায় থেকে আপাতত নিষ্কৃতি পাওয়ার আশায় মেনে নিতে দেরি করলেন না, 'তা আপনি কী করতে বলেন? পুলিশে খবর দেব?'

'পুলিশে খবর?' প্রদীপ সরবে ভাবিত হল, 'না সেটা এখনও নয়। দরজা সবসময়ে বন্ধ রাখতে হবে, আর আর...'

হঠাৎ কথাটা মনে পড়ায় প্রদীপ আবার জিজ্ঞাসা করলে, 'আচ্ছা আপনাদের ছাদে একটা ঘর দেখলাম। ওখানে কে থাকে?'

'ওখানে!' সুরেশই দুবার ঢোক গিলে বললে, 'ওখানে কেউ থাকে না তো। ওটা বাড়িওয়ালার নিজের। তিনি তালা দিয়ে রাখেন।'

'কিন্তু তালা তো দেখলাম না!' প্রদীপ চিন্তিত, 'ঘরটা তো ভেতর থেকে বন্ধ।'

'তা হয়তো আজ তালা দিতে ভুলে গেছেন।' রায় কৈফিয়ত দিতে ব্যস্ত হলেন, 'কালই আবার এসে লাগাবেন।'

'কিন্তু ঘর খোলা পেয়ে ওখানেই সে গিয়ে ঢুকতে পারে তো!' প্রদীপ চঞ্চল হয়ে

উঠল, 'একবার গিয়ে ভালো করে খোঁজ নিলে হয়।'

'অমন কাজটি করবেন না।' রায় যেন ভয়ে শিউরে উঠলেন, 'সাংঘাতিক লোক ওই বাড়িওয়ালা। আমাদের তুলে দেওয়ার জন্যে মামলা করছে! তার ঘর বন্ধ থাক খোলা থাক উঁকি দিতে গেলেও জানতে পারলে সোজা কাঠগড়ায় তুলবে। ছাদে ওঠাই আমাদের বারণ।'

'কিন্তু বাড়িওয়ালার ভালোর জন্যেই তো যাচ্ছি!' প্রদীপ যুক্তি দেখালে।

'ভালো-মন্দ বিচার করবার মানুষই তিনি নন।' রায় গলায় তিক্ত হতাশা ফোটালেন, 'নইলে বিনা কারণে আমাদের তুলে দেওয়ার জন্যে মামলা করেন!'

'হুঁ'—প্রদীপ গম্ভীর হল। 'এরকম বাড়িওয়ালাকেও তাহলে শিক্ষা দেওয়া দরকার!'

'সেই আশাতেই তো আছি।' রায় যে দীর্ঘনিশ্বাসটা ছাড়লেন কথাটার সঙ্গে তার কোনও সঙ্গতি নেই।

পাঁচ

চোদ্দ নম্বর অঘোর ঘোষাল লেনে যার জন্যে সব সমস্যা এমন জটিল হয়ে উঠেছে সেই একেধারে ছবি আঁকিয়ে, ব্যায়ামবীর এবং বিশুদ্ধ ও সিদ্ধ নিরামিষভোজী হয়েও সুরন্ধনের সমঝদার প্রদীপ দত্তের একটু এবার পরিচয় দিতে হয়।

কলকাতা থেকে মাইলবিশেক দূরে একটি বর্ধিষ্ণু গ্রামে তার পৈতৃক বাড়ি। বাবা কলকাতার নামকরা কোন মার্চেন্ট অফিসে বড় চাকরি করতেন। এখন গত হয়েছেন। বাড়িতে মা আর ছোট একটি বোন ছাড়া আর কেউ নেই। বিষয়-আশয় গ্রামে যা আছে তার পরিমাণ নেহাত অল্প নয়। বিশ্বাসী একজন নায়েবের সাহায্যে মা-ই সেসব দেখাশোনা করেন। প্রদীপ সেসব দায় যথাসম্ভব এড়িয়ে চলে। সাংসারিক অবস্থা সচ্ছলের চেয়ে অনেক ভালো। প্রদীপের উপার্জনের অভাবে অচল হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। মা'র কিন্তু একান্ত ইচ্ছে প্রদীপ তার স্বর্গত পিতার অফিসেই একটা চাকরি নিয়ে তাঁর ধারা বজায় রাখে। প্রদীপের বাবার সেইরকম ইচ্ছাই ছিল তিনি বলেন। বাধ্য হয়ে প্রদীপকে তাই সে অফিসে চাকরির দরখাস্ত করতে হয়েছে ও এই বাজারে সে দরখাস্ত অবিশ্বাস্যভাবে মঞ্জুর হওয়ার পর হতাশভাবে চাকরিতে যোগ দেওয়ার জন্যে কলকাতাতেও আসতে হয়েছে বাড়ি ভাড়ার ব্যবস্থা করে। মা'র সেই রকমই আদেশ। প্রদীপ কলকাতায় চাকরি করে মেসে-হোটেলে থাকবে এ তাঁর ইচ্ছা নয়। একটি ছোট বাড়ি তাই তিনি ভাড়া নিতে বলেছেন। সুবিধামতো তিনি কখনও গ্রামে কখনও প্রদীপের কাছে তার বাসায় এসে যাতে থাকতে পারেন। তাছাড়া চাকরির সঙ্গে-সঙ্গে ছেলের বউ আনবার কথাও তিনি ভেবে রেখেছেন। তার জন্যেও কলকাতায় একটা বাসা তো না হলে নয়।

প্রদীপ কিন্তু কলকাতায় এসে কিছুতেই চাকরিতে যোগ দিতে পারেনি। ছেলেবেলা থেকে তার ধ্যান-জ্ঞান শুধু দুটি, শরীর আর শিল্পচর্চা। শিল্প মানে অবশ্য ছবি আঁকা। চাকরির বদলে বিজ্ঞাপনের জগতের ছবি এঁকেই সে একদিন একটা কেউকেটা হবে এই তার উচ্চাশা। এ বাসনা সে বিসর্জন দিতে পারেনি। তাই মা'র কাছে এখনকার মতো সে সত্য কথাটা লুকিয়েছে। ছবির জগতে একবার নাম করতে পারলেই মা'র ক্ষমা সে আদায় করতে পারবে বলে তার দৃঢ় বিশ্বাস।

কলকাতায় এসে ছবির জগতে ঢোকা কিন্তু যতটা সোজা ভেবেছিল তা এ পর্যন্ত

হয়নি। এ কয়দিনেই অনেক জায়গা ঘুরে তাকে হতাশ হয়ে ফিরতে হয়েছে। উৎসাহের অভাব বা চেষ্টার ত্রুটি অবশ্য তার নেই। মুরুব্বি শিকারের পদ্ধতিতেও তার বিশেষত্ব আছে। একটা উদাহরণ দেওয়াই বোধহয় যথেষ্ট।

প্রদীপকে নামকরা এক পাবলিসিটি অফিসের বসবার ঘরে দেখা যায়। সুসজ্জিত ঘর। দারোয়ান বেয়ারা রিসেপশনিস্ট কিছুরই অভাব নেই। কাজের জন্যে যাঁরা এসেছেন তাঁদের অনেককেই এদিক-ওদিকের সোফাসেটিতে চেয়ারে বসে থাকতে দেখা যায়।

বসে অপেক্ষা করবার পাত্র প্রদীপ নয়। পোশাকে-আশাকে চলনে-বলনে সে একেবারে চাবুক। সোজা রিসেপশনিস্টের টেবিলে গিয়ে সে সহাস্যবদনে জানায়, 'গুডমর্নিং।'

অভ্যাসবশেই গুডমর্নিং বলে রিসেপশনিস্ট একটু ভরু কুঁচকে প্রদীপের দিকে তাকান।

'আপনি! আপনি তো কাল এসেছিলেন না?'

'হ্যাঁ, মুশকিল দেখুন না!' প্রদীপের কৈফিয়ত একেবারে জিহ্বাগ্রে, 'আপনাদের বড় সাহেব আজ আবার আসতে বলে দিয়েছেন।'

বড়সাহেবের পক্ষে এটা বোধহয় একটু অস্বাভাবিক। রিসেপশনিস্ট একটু অবাক হয়ে বলেন, 'ওঃ! আপনার কার্ডটা?'

প্রদীপ কার্ডটা ততক্ষণে বার করে ফেলেছে। কিন্তু সেটা রিসেপশনিস্টের হাতে দিতে গিয়েও হঠাৎ হাতটা সরিয়ে এনে বলে, 'না কার্ডটা আর দেব না। আপনার বড়সাহেব আবার রোজ-রোজ কার্ড পাঠালে রাগ করেন। এই কালকেই বলছিলেন, 'আপনার আবার রোজ-রোজ কার্ড পাঠানো কীসের! আচ্ছা এখন আর আধঘণ্টাটাক কাউকে পাঠাবেন না। খুব জরুরি আলোচনা আছে কিনা।'

প্রদীপ বড়সাহেবের কামরার দিকেই রওনা হয়।

রিসেপশনিস্ট ব্যতিব্যস্ত হয়ে পেছন থেকে ডাকেন, 'ও মশাই শুনুন!'

বড়সাহেব কী একটা কাগজ দেখতে-দেখতে মুখ তুলে একটু অবাক হয়ে তাকান। পরমুহূর্তে তাঁর মেজাজ সপ্তমে চড়ে যায়।

'আপনি! আপনি আবার এসেছেন? কালই আপনাকে বলে দিয়েছি না, এসব ছবি চলবে না। তাছাড়া লোকেরও আমাদের দরকার নেই।'

'হ্যাঁ কাল বলেছিলেন বটে!' অনাহুতভাবে একটা চেয়ার টেনে বসে প্রদীপ বলে, 'কিন্তু তারপর চব্বিশ ঘণ্টায় আপনার মত বদলে যেতেও তো পারে। হয়তো কালরাত্রেই হঠাৎ আপনার আপশোস হয়েছে এরকম ছবি বাতিল করে দেওয়ার জন্যে। আপনাকে ভুল শোধরাবার সেই সুযোগটুকু দেওয়ার জন্যেই আমার আসা। এই যে দেখুন না আর একবার ছবিগুলো।'

অ্যাটাচি কেস খুলে প্রদীপ ছবিগুলো বার করবার উপক্রম করে।

বড়সাহেব গর্জন করে ওঠেন, 'আপনি ভালোয়-ভালোয় যাবেন কি না!'

একটু যেন অবাক হয়ে অবিশ্বাসের সঙ্গে প্রদীপ বলে, 'আশ্চর্য! আপনার মত তাহলে এখনও সত্যি বদলায়নি! আপনার কথাগুলো যেরকম রূঢ় শোনাচ্ছে বাইরের কেউ থাকলে মনে করত আপনি হয়তো সত্যি খেপে গেছেন।'

'মনে করত খেপে গেছি...আপনি!' রাগে বড়সাহেব প্রায় তোতলা হয়ে যান।

'আহা মিছিমিছি উত্তেজিত হবেন না!' প্রদীপ অবিচলিত, 'শুনুন, আপনার কথা শুনে রাগ করে আমিও চলে যেতে পারি। আপনাদের মতো এত নাম করা না হোক আর কোনও

বড় পাবলিসিটি ফার্ম কি শহরে নাই! কিন্তু আমারও জেদ আপনাকে দিয়েই সত্যের শিল্পের মর্যাদা আমি রক্ষা করাবই। এই ধরুন, এই ছবিটা আপনাদের ক্যালেন্ডার কম্পিটিশনে যদি সম্মান না পায়...'

বড়সাহেব কথা না বলে এবার সজোরে বেল টেপেন।

বেয়ারা বেল টেপার ধরনে হন্তদন্ত হয়ে এসে দাঁড়াতে জ্বলন্ত গলায় বলেন, 'দারোয়ানকো বোলাও।'

বেয়ারা চলে যেতেই প্রদীপ একটু হেসে বলে, 'দারোয়ানকে মিছেই ডাকতে পাঠালেন। এখন তো তাকে পাবেন না।'

'পাবো না!' বড়সাহেব যেন ইঞ্জিনের স্টিম ছাড়েন।

'হ্যাঁ', প্রদীপ অম্লান বদনে বলে, 'খবরের কাগজের ভাষায় এরকম একটা পরিস্থিতি হতে পারে জেনে তাকে আমি একটা কাজে পাঠিয়েছি কিনা। যৎসামান্য অবশ্য তার জন্যে ব্যয় করতে হয়েছে।'

'বড়সাহেব এবার আত্মহারা হয়ে চেয়ার ছেড়ে প্রায় লাফিয়ে উঠে বলেন, 'গেট আউট! গেট আউট, আই সে!'

'নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই!' প্রদীপও এবার উঠে পড়ে, 'ইংরেজিতে যখন বলছেন তখন যেতেই হবে। কিন্তু তবু এই একটা ছবি রেখে যাচ্ছি। কখন আপনাদের সুমতি হবে কিছু তো বলা যায় না।'

ছবিটা রাখতে গিয়েও বড়সাহেবের চোখের দিকে তাকিয়ে প্রদীপ বলে, 'না থাক। যা মনে হচ্ছে তাতে পোস্টে এটা পাঠানোই ভালো।'

ছবিটা তুলে নিয়ে চলে যেতে-যেতে হাসিমুখে প্রদীপ বলে যায়, 'আচ্ছা সো লং!'

প্রদীপ যখন তার ব্যক্তিত্বের মাধুর্যে পাবলিসিটি অফিসের বড়সাহেবকে বিগলিত করবার বৃথা চেষ্টা করে ফিরছে ঠিক সেই সময়ে নীলা তার তেতলাব ছাদের ঘরে দরজা বন্ধ করে নিজের ভোগ্য ও তাতে মামা ও দাদার অংশ সম্বন্ধে যা ভাবছিল তা জানতে পারলে রায় বা সুরেশ কেউই বোধহয় খুব স্বস্তি বোধ করতেন না।

মামা ও দাদার ওপর যত ভক্তি-শ্রদ্ধা-ভালোবাসাই থাক তাদের এ নির্বুদ্ধিতা সে কোনওমতেই ক্ষমা করতে প্রস্তুত নয়। কিন্তু এ সংকট থেকে উদ্ধারের উপায় যে কী তা-তো সে নিজেই বুঝতে পারছে না। ভাড়াটে ভদ্রলোককে প্রথমত জায়গা দেওয়াই অবশ্য অন্যায় হয়েছে, কিন্তু এখন তো আর সত্যি তাঁকে জোর করে তাড়িয়ে দেওয়া যায় না।

পরীক্ষার ফলাফল জানবার জন্যে আর অপেক্ষা না করে সে নিজেই আবার কুসুমপুরে দিদিমার কাছে চলে যাবে কি না ভাবছে, এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল।

প্রথমটা চমকে উঠলেও সুরেশের চাপা গলার ডাকে আশ্বস্ত হয়ে সে দরজা খুললে।

সুরেশ তার খাবারের থালা বাটি নিচে থেকে ওপরে বয়ে এনেছে।

দাদার মুখের দিকে চেয়ে নীলা হেসে ফেললে। বললে, 'কী দাদা, বড় মুশকিলে পড়ে গেছ মনে হচ্ছে!'

'মুশকিল, বলে মুশকিল!' সুরেশ অনভ্যস্ত হাতে থালা-বাটি সমেত দরজা দিয়ে সন্তর্পণে কাত হয়ে ঢুকতে-ঢুকতে বললে, 'একেবারে প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে গেল। আজকাল নীলুবাবু করে অস্থির। সারাক্ষণ খোঁজ করছে, কই আপনাদের নীলুবাবুকে তো দেখছি না।'

দাদার হাত থেকে থালা-বাটিগুলো ঘরের ছোট টেবিলে নামিয়ে রাখতে নীলা বললে, 'কিন্তু দোষ তো ও ভদ্রলোকের নয়। তোমরা মিথ্যে কথা বলে ওঁকে জায়গা দিতে গেলে কেন?'

'দায়ে না পড়লে আর এ বোকামি করি!' সুরেশ হতাশভাবে ঘরের মাঝখানে পাতা খাটটার ওপর বসল, 'তিনমাস ধরে টালবাহানা করে ভদ্রলোককে ঠেকিয়ে রেখেছিলাম। শেষে সেদিন মধুর আহাম্মকিতে একেবারে মালপত্র নিয়ে এসে হাজির। তখন বাধ্য হয়েই এখানে তুলতে হয়েছিল। কিন্তু যা ভেবেছিলাম তা তো হচ্ছে না।'

নীলা টেবিলে তখন খেতে বসেছে। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'কী ভেবেছিলে কী?'

'ভেবেছিলাম যেরকম নানা বাতিকওয়ালা মানুষ, দুদিন যেতে না যেতে নিজেই টিকতে পারবে না। কিন্তু তার তো কোনও লক্ষণই নেই।' সুরেশ ক্ষুণ্নস্বরে নীলার বিরুদ্ধেই এবার অভিযোগ জানালে, 'তোর ওই রান্নায় তো আরও গোল বেড়েছে।'

'আমার রান্নায়!' নীলা অবাক।

'তাছাড়া কী!' সুরেশ বিক্ষোভ প্রকাশ করলে, 'গোড়ায় তো খুব বাতিক দেখেছিলাম। সেদ্ধ ছাড়া কিছু খায় না। তারপর তোর রান্না একবার মুখে দিয়েই একেবারে কাত। পাত পর্যন্ত চেটে পুটে সাফ করছে। এই রান্নার লোভেই এখন আর নড়বে না মনে হচ্ছে।'

সন্তর্পণে রায়ও ইতিমধ্যে নিচে থেকে ওপরে এসেছেন ভাগনির খাওয়া দেখতে। সুরেশের শেষ কথায় সায় দিয়ে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তোর রান্নাটাই বাধ সাধছে আমাদের মতলবে।'

'তাহলে বল এমন রান্না রাঁধি যে মুখে দিয়ে পালাতে তর সইবে না!'

'হুঁ সেই রকমই একটা কিছু দরকার মনে হচ্ছে।' মন্তব্য করলেন রায়।

'বল কী মামা!' নীলা এবার হেসে ফেললে, 'ভদ্রলোককে এমনি করে তাড়াবে! ধর্মে সইবে তোমাদের?'

'আরে দুনিয়ার এখন ধর্মই এই।' রায় দার্শনিক হয়ে উঠলেন, 'আগে নিজে বাঁচো, তারপর পরের কথা ভেব। ওকে এখন না তাড়ালে আমাদের যে পাততাড়ি গুটোতে হয়। এই যে লুকিয়ে তালা খুলে তোকে এ ঘরে রেখেছি, এখন তোর কাকাবাবু হঠাৎ একবার হানা দিলেই তো চিত্তির! তাই যে কোনও ফিকিরে প্রদীপবাবুকে বাসা ছাড়াতেই হবে।'

'দরকার নেই তাহলে তোমাদের কোনও ফিকিরের।' নীলা এবার বেশ একটু ক্ষুব্ধ, 'আমি আজ সন্ধ্যার ট্রেনেই দিদিমার কাছে কুসুমপুরে চলে যাচ্ছি।'

নীলার কথা শেষ না হতেই সুরেশের সঙ্গে রায় হাঁ-হাঁ করে উঠলেন।

'কী বলছিস কী!'

'তোর এখন দেশে যাওয়া চলে!'

'কেন চলে না!' নীলার মেজাজ বেশ বিগড়েছে বোঝা গেল, 'আমি আসাতেই তো তোমাদের অসুবিধে হয়েছে। দিব্যি আমার ঘরে ভাড়াটে তুলেছিলে। তোমরা তো চেয়েছিলে যে আমি না আসি।'

'আহা তা চাইব কেন?' রায় ভাগনিকে বোঝাতে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন, 'ভেবেছিলাম গন্ডগোলটা দু-একদিনের মধ্যেই চুকিয়ে তোকে আসতে লিখব। কিন্তু এসে যখন পড়েছিস আর তোর যাওয়া চলে! তোর কাকাকে বাজিতে হারাতে হবে না?'

'কাকার সঙ্গে আবার কীসের বাজি!' নীলা অবাক।

'সে একটা দারুণ বাজি।' রায় বলতে গিয়েও চেপে গেলেন, 'এ বাজিতে হারলে যে আর মুখ দেখাতে পারব না!'

'না বুঝে-সুঝে যা-তা বাজি রাখতে যাও কেন?' নীলার গলায় সহানুভূতির বদলে সন্দিগ্ধ সুরই পাওয়া গেল, 'আমায় বিয়ের ব্যাপারে যদি কিছু হয়তো বলে দিচ্ছি, পাস না করলে আমি বিয়ে করব না।'

'করবি। করবি।' রায় এবার স্নিগ্ধ প্ররোচনা দেন, 'পাস করলেও বিয়ে করবি ফেল করলেও। আরে বলেছি তো, আমরা হলাম ফেলের গুষ্ঠি। পরীক্ষায় ফেল করেই আমরা জীবনে পাস করি।'

'ওঃ কত পাস-ই করেছ!' মামার কথার ধরনে নীলা না হেসে পারল না, 'বাড়ি ভাড়ার ব্যবসা করে নিজেদের বাসাটাও ঠিক রাখতে পারো না। আমি সাফ বলে দিচ্ছি, চোরের মতো এ ঘরে আমি দিনের পর দিন লুকিয়ে থাকতে পারব না।'

'আর ক'টা দিন।' রায় অনুরোধ জানান, 'ক'টা দিন কোনওবকমে চোখ-কান বুজে কাটিয়ে দে। তার মধ্যে একটা হেস্ত-নেস্ত ঠিক করে ফেলব।'

'আর এ-ঘরেই বা সারাক্ষণ থাকবার কী দরকার!' সুরেশের মাথায় নতুন বুদ্ধি এল, 'প্রদীপবাবু তো সারাদিন বাড়ি-ই থাকে না। এ-ঘরে তালা দিয়ে তখন নিচেই থাকবি।'

পরামর্শটা খুব খারাপ মনে হল না নীলার। প্রদীপের ঘরটা সম্বন্ধে একটু কৌতূহলও আছে তার মনে।

খাওয়া শেষ করে আঁচিয়ে এসে সে বললে, 'সত্যি একবার দেখে আসব ভদ্রলোকের ঘরটা!'

'তা আয় না!' সুরেশের সঙ্গে রায়ও আশ্বাস দিলেন, 'চুরি করতে তো আর যাচ্ছিস না!

মামা ও দাদার সমর্থন পেয়ে নিচে নেমে নীলা সাহস করে প্রদীপের ঘরে সত্যিই গিয়ে ঢোকে।

ঘরের অবস্থা দেখে তার মেজাজ একটু খারাপই হয় অবশ্য। পরিপাটি করে যে ঘর তার সাজানো থাকত সে ঘরের দুর্দশা দেখলে রাগ দুঃখ হওয়ারই কথা। ভদ্রলোক মানুষ যেমনই হোন না কেন দারুণ অগোছালো। জিনিসপত্র বই কাগজ ছবি এলোমেলোভাবে সারা ঘরে ছড়ানো। সব ফিটফাট রাখা যার স্বভাব এরকম বিশৃঙ্খলা দেখলে তার হাত নিশপিস করে।

নীলা আপনা থেকেই এলোপাথাড়ি বই কাগজগুলো একটু গুছিয়ে রাখবার চেষ্টা করতে গিয়ে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায় থেমে যায়। প্রদীপবাবুর ঘরের গোছগাছ করা কি ঠিক হবে? ভদ্রলোক ঘরের এই অবস্থাতেই অভ্যস্ত। এমনিতেই তাঁর সন্দেহের অন্ত নেই। অগোছালো ঘর হঠাৎ সাজানো-গোছানো দেখলে তো আগুনে ঘি পড়বে।

না, থাক। দরকার নেই। ভদ্রলোকের ঘর যেমন আছে তেমনি থাক। তিনি যদি খোঁয়াড়ে থাকতে ভালবাসেন তো তাই থাকুন। ওপরের ঘরে ড্রেসিংটেবল নেই। হাত আয়নায় চুল বাঁধতে বড় অসুবিধে হয়। আপাতত সে কাজটা এখানে সেরে ফেলা যায়। চুল বাঁধা কিন্তু তার হয় না।

একটা কাঁটা সবে মুখে রেখেছে এমন সময়ে ছবিগুলো তার নজরে পড়ে। ঘরে

বড়-ছোট ছবি অনেক আছে। ইজেলের ওপরই একটা অসমাপ্ত ছবি আটকানো। এ ছবিগুলো কিন্তু সে-জাতের নয়। ছোট-ছোট টুকরো কাগজে সব স্কেচ। টেবিলের ধারে একটা মোটা বই-এর তলা থেকে বেরিয়ে আছে।

ছবিগুলো দেখতে-দেখতে প্রথমে নীলার মুখে কৌতুকের হাসিই দেখা দেয়। তারপরই ক্ষুব্ধ ভ্রূকুটি।

ঠিক সেই সময়েই রায় ঘরে ঢুকে বলেন, 'কী রে, অত তন্ময় হয়ে দেখছিস কী? প্রদীপ বাবুর ছবি? ছোকরার এই ছবি আঁকাও এক বাতিক। কিন্তু ছবি দেখে মুখটা অমন ব্যাজার কেন?'

'কেন ব্যাজার?' নীলা গরম মেজাজে বলে, 'কত বড় অপমান করেছে আমায় তোমাদের ওই প্রদীপ দত্ত তা জানো?'

'অপমান!' রায় সত্যিই বিমূঢ় হন, 'অপমান আবার কখন করলে? না, না সেরকম ছেলে তো নয়।'

'না, খুব ভালো ছেলে! একেবারে ভেজা তুলসি পাতাটি! তারই কীর্তি দেখ না। অপমান ছাড়া এটা কী?' নীলা একটা ছবির কাগজ রায়ের দিকে এগিয়ে দেয়।

'আরে এটা কী!' রায় ছবিটা হাতে নিয়ে দেখে হেসে ওঠেন, 'এ তো তোর ছবি এঁকেছে দেখছি। কখন আঁকল কখন?'

'কখন আঁকল তা আমি কী করে জানব।' নীলা ক্ষুব্ধ স্বরে গজরায়, 'কিন্তু এই আমার ছবি! এটা অপমান ছাড়া আর কী? আমি উট! উটের মতো প্রথম নাকটুকু গলিয়ে সব দখলের মতলবে আছি?'

'কিন্তু'—ছবিটা বেশ মনোযোগ দিয়ে দেখতে-দেখতে হাসিমুখে রায় বলেন, 'কতটুকু মাত্র দেখে ঠিক তোর মুখের আদল এনেছে। যাই বল ছোকরার সত্যিই আঁকার হাত আছে।'

একথার পর রায়কে হাসতে দেখে নীলা আরও জ্বলে যায়। বলে, 'ও, আমার ছবি দেখে খুব হাসি পাচ্ছে, না? আচ্ছা তবে এটাও দেখ।'

কৌতুকভরেই নীলার হাত থেকে আর একটা ছবি নিয়ে একবার চোখ বুলোবার পরই রায়ের ভ্রূকুঞ্চিত হয়। বেশ একটু অপ্রসন্ন গলায় বলেন, 'হুঁ, এটা কী হল?'

এবার নীলার হাসির পালা। হাসতে-হাসতে বেশ একটু বিঁধিয়েই সে বলে, 'কই? এবার হাসি কোথায় গেল? এটা কী হল বুঝতে পারছ না? এটা তোমার ছবি। তুমি হলে দুমুখো সাপ। কেমন লাগছে এখন? কই, আর হাসছ না তো!'

'হাসব? এটা কি হাসির ব্যাপার!' রাগের গলায় বেশ ঝাঁজ, 'লুকিয়ে-লুকিয়ে ছোকরা আমাদের এই সব ছবি এঁকেছে! ছোকরা তো ডেঞ্জারাস দেখছি। না, এর একটা বিহিত করতেই হয়।'

যেন মূর্তিমান প্রতিকার হিসেবেই সেই মুহূর্তে সুরেশের আবির্ভাব ঘটে। মাথায় কম্ফর্টার জড়ানো, গায়ে মোটা কম্বল। ধুঁকতে-ধুঁকতে ঘরে এসে কাশতে-কাশতে সে বলে, 'হুঁ, হুঁ...আর ভাবনা নেই।'

নীলু ও রায় দুজনেই উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন।

'কী দাদা? কী হয়েছে!' ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করে নীলু।

'কী ব্যাপার? কী হল তোর!' ব্যাকুল হয়ে ওঠেন রায়।

কাশতে-কাশতে প্রদীপের খাটটার ওপরই বসে পড়ে সুরেশ কাতর স্বরে বলে, 'ঠিক

যা হওয়ার তাই! একেবারে সাংঘাতিক রোগ।'

আর একবার কাশির বেগ সামলে সুরেশ বেশ করুণ মুখ করে আবার বলে, 'তোমরা একটু দুরে-দুরে থাকো। বড় ছোঁয়াচে রোগ!'

নীলু ও রায়ের পক্ষে সত্যিই এবার অস্থির হয়ে ওঠা অস্বাভাবিক নয়।

'কী বলছ কী? কী হয়েছে তোমার?' নীলু প্রায় কাতর স্বরে জিজ্ঞাসা করে।

'এশিয়ান ফ্লু!' অতি সংক্ষেপে সর্বনাশা সংবাদটা জ্ঞাপন করে সুরেশ। সেই সঙ্গে সংবাদের গুরুত্বটা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যে বলে, 'সিভিয়ার টাইপ!'

রায় ও নীলার হাতের ছবিগুলোর দিকে এবার তার নজরে পড়ে। জিজ্ঞাসা করে, 'ওগুলো কী?'

এশিয়ান ফ্লু-র রোগী হয়েও সুরেশের এ কৌতূহলে রায়ের অবাক হওয়ারই কথা। তবু তার হাতে ছবিগুলো দিয়ে বলেন, 'দ্যাখ না। এসব আমাদের ছবি। ওই প্রদীপ ছোকরা লুকিয়ে-লুকিয়ে এঁকেছে। তোকে এঁকেছে তোতাপাখি করে। আমি যা শেখাই তাই বলিস, এই দেখিয়েছে।'

নিজের কার্টুনটা দেখতে-দেখতে সুরেশের মুখটা যে শক্ত হয়ে ওঠে তা রোগের যন্ত্রণাতেই ভাবা উচিত।

হঠাৎ আবার কাশতে-কাশতে সে বলে, 'শুধু এশিয়ান ফ্লু নয়, এর সঙ্গে খারাপ গোছের নিউমোনিয়াও না থাকলে নয়।'

এবার একটু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রায় বলেন, 'তার মানে? এখুনি তো তাহলে ডাক্তার ডাকা দরকার?'

'হ্যাঁ, তার ব্যবস্থাও করে এলাম।' সুরেশ জানায়, 'ডাক্তার সময়মতোই আসছে!'

কথাবার্তাগুলোর ধরন নীলার কেমন যেন লাগে। সে একটু বিমূঢ়ভাবে জিজ্ঞাসা করে, 'ডাক্তারকে তুমিই খবর দিয়েছ?'

'হ্যাঁ, না দিয়ে করি কী?' সুরেশ যেন নিরুপায়। 'কিন্তু প্রদীপবাবু কখন আসছেন সেইটেই জানা দরকার!'

'প্রদীপবাবু এসে কী করবেন?' নীলা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে।

'করবেন! করবেন! নিশ্চয়ই কিছু করবেন!' রায়ের মুখ-চোখের ভাব এখন অন্যরকম। সুরেশকে তিনি তাড়া দেন, 'তুই আর এঘরে কেন? ওঘরে গিয়ে শুয়ে পড়। আমি লেপ-কম্বল এনে দিচ্ছি।'

'হ্যাঁ, তাই দাও।' বলে সুরেশ যে মুখভঙ্গি করে চলে যায় তার মানেটা বুঝতে নীলার বেশ একটু সময় লাগে।

সেদিন বিকেলে প্রদীপ বাড়ি ফিরেই অবাক।

সিঁড়ি দিয়ে নিচে থেকে ওঠবার মুখেই কীরকম একটা ওষুধ-ওষুধ গন্ধ পেয়েছে।

ওপরে উঠে দেখলে রায়মশাই-এর নির্দেশে মধু ঘটা করে পিচকিরি দিয়ে কী যেন ওষুধ স্প্রে করছে।

'কী ব্যাপার মশাই!' প্রদীপ বিমূঢ়ভাবে জিজ্ঞাসা করলে।

'ডেটল স্প্রে করছে!' রায় অস্বাভাবিকরকম গম্ভীর, 'তার আগে লাইজল দিয়ে সব মোছা হয়েছে। আপনি এদিকটায় আর আসবেন না।'

'আসব না! কেন?' প্রদীপ হতভম্ব।

'না, না, মিছিমিছি বিপদের মুখে যাওয়ার দরকার কী?' রায় কুণ্ঠিতভাবে বলেন, 'দারুণ ছোঁয়াচে রোগ কিনা!'

'কোন ছোঁয়াচে রোগের কথা বলছেন?' প্রদীপ বিমূঢ়ভাবে জিজ্ঞাসা করলে!

'ওঃ আপনি জানেন না বুঝি এখনও। এশিয়ান ফ্লুর কথা কাগজে কিছু পড়েননি!' রায় যেন ক্ষুণ্ণ।

'ওঃ এশিয়ান ফ্লু।' প্রদীপ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, 'কিন্তু সে এপিডেমিকের ঢেউ তো চলে গেছে। আমি কলকাতায় আসবার আগেই কাগজে দেখেছি।'

'ঠিকই দেখেছেন!' রায় অত্যন্ত গম্ভীর, 'তারপর এটা এখন সেকেন্ড ওয়েভ! এই দ্বিতীয় ঢেউটাই ডাক্তাররা বলছে আরও দশগুণ সাংঘাতিক ও ছোঁয়াচে। সুরেশের যদি..'

রায়কে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই প্রদীপ শঙ্কিত বিস্ময় প্রকাশ করলে, 'সুরেশবাবুর ফ্লু হয়েছে!'

চট করে একবার প্রদীপের মুখে চোখ বুলিয়ে নিয়ে রায় গলাটা বিষাদের খাদে নামিয়ে ফেললেন, 'সেই জন্যেই তো যতখানি সম্ভব সাবধান হওয়ার চেষ্টা করছি।'

'কিন্তু যত সাবধানই হোন', প্রদীপের গলার স্বরে সন্দেহ, 'এক বাড়িতে থেকে ছোঁয়াচ বাঁচানো অসম্ভব।'

রায় যতখানি সম্ভব উদ্বেগ দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তা হলে কী করা যায় বলুন তো?'

'কী আর এখন করা যাবে।' প্রদীপ সরাসরি জবাব দিলে, 'ডাক্তার ডাকতে হবে। ডাক্তার ডাকিয়েছেন?'

রায় একটু যেন হতাশ হয়েই বললেন, 'তা ডাকিয়েছি।'

না, ডাক্তারের ব্যবস্থা করতে অবশ্য রায়ের ভুল হয়নি।

যথাসময়ে ডাক্তার এলেন, পরীক্ষাও করলেন খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে। তারপর হাত ধোওয়ার সময় যা করলেন নেহাত এশিয়ান ফ্লু না শুনলে সেটা বাড়াবাড়ি মনে হতো।

সাবান দিয়ে শুধু বারদুয়েক হাত ধুয়েই তিনি সন্তুষ্ট নন। শিশি থেকে রেক্টিফায়েড স্পিরিট বার করে সমস্ত হাতে লাগাতে ভুললেন না।

'কী দেখলেন ডাক্তারবাবু?' রায়ের গলা প্রায় কম্পমান।

'সুবিধের নয়!' ডাক্তার তোয়ালেতে হাত মুছতে-মুছতে মুখের ভাবটা যা করলেন, তাতে ভয় পাওয়ারই কথা।

হাত মোছা শেষ করে তিনি বললেন, 'আপনারা রুগিকে খুব সাবধানেই রেখেছেন দেখছি, কিন্তু রুগিকে আইসোলেট, মানে একেবারে আলাদা করতে পারলেই ভালো হয়। এখানে রাখা মানে গোখরো সাপের সঙ্গে বাস করা। তার চেয়েও বেশি সাংঘাতিক বলা উচিত।'

'কিন্তু আলাদা করা তো সম্ভব নয়!' প্রদীপই প্রতিবাদ জানাল, 'দেখছেন তো এই দুটি মাত্র ঘর!'

'তা তো দেখছি!' ডাক্তার একটু বিরক্তির সঙ্গেই বললেন, 'কিন্তু যা উচিত তা তো আমায় বলতে হবে! রুগির জন্যে নেহাত যাঁদের না থাকলে নয় তাঁরা ছাড়া আর সকলের এখন এ-বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়াই উচিত।'

ডাক্তার বেশ একটু অপ্রসন্ন মুখ দেখিয়ে চলে যাওয়ার পর রায়মশাই তাঁকে কিছুদূর এগিয়ে দিয়ে ফিরে এসে সেই কথাই আবার পাড়লেন।

'দেখুন প্রদীপবাবু বড় দুঃখের সঙ্গেই একটা কথা আপনাকে বলতে হচ্ছে। ডাক্তার যাওয়ার সময় নিচে গিয়ে আমায় কী বললেন জানেন?'

'কী বললেন?' সুরেশ তার রোগশয্যা থেকেই উদগ্রীব হয়ে উঠল।

বললেন, 'আপনার নিজের ভাগনে, সুতরাং সুরেশবাবুর দায় আপনাকে নিতে হবেই। কিন্তু আপনাদের ওই ভাড়াটে ভদ্রলোককে জেনেশুনে বিপদের মধ্যে রাখার আপনাদের কোনও অধিকার নেই। সেটা ক্রিমিন্যাল অফেন্স।'

'বোগাস!' প্রদীপের মন্তব্য শোনা গেল।

'বোগাস!' সুরেশ ও রায় দুজনেই প্রথমে হতভম্ব।

রায় তারপর যেন অত্যন্ত ক্ষুণ্ন হয়ে বললেন, 'বলেন কী প্রদীপবাবু! অতবড় ডাক্তার।'

'তবু বলছি উনি বোগাস।' প্রদীপের গলায় দ্বিধা-সংশয় নেই, 'দেখুন, রোগ সম্বন্ধে সাবধান থাকা সকলেরই উচিত। কিন্তু রোগের ভয়ে যে পালিয়ে যায় সে অমানুষ-কাপুরুষ। আমায় কি তাই মনে করেন?'

'না-না, তা মনে করব কেন?' রায় বেশ একটু ফাঁপরে পড়েই বোঝাবার চেষ্টা করলেন, 'কিন্তু আপনি আমাদের জন্যে মিছিমিছি এ বিপদটা ঘাড়ে নেবেন কেন? ভগবান না করুন, যদি আপনার এরকম কিছু হয়...'

'তাহলে আপনারা পালিয়ে যাবেন?' প্রদীপের সোজা প্রশ্ন।

'না, তা বলছি না। তবে—' রায় এবার দিশাহারা।

'তবে আর কোনও কথাই বলবেন না।' প্রদীপ জোর দিয়ে বললে, 'এশিয়ান ফ্লুর বদলে যদি প্লেগই হয়ে থাকে সুরেশবাবুর...'

'অ্যাঁ!' কথার মাঝখানে প্রায় আর্তনাদ করে উঠল সুরেশ, 'কী বলছেন প্রদীপবাবু!'

'না, না হতেও তো পারে!' প্রদীপের হৃৎকম্প ধরানো জল্পনা, 'প্লেগের গোড়ায় অনেকটা এই ধরনের লক্ষণই দেখা যায় কিনা।'

'কিন্তু প্লেগ আমার হবে কেন?' সুরেশের মুখে আতঙ্ক।

'হওয়া অসম্ভব কী?' প্রদীপ বৈজ্ঞানিক নির্লিপ্ততার সঙ্গে জানালে, 'ওরকম দু-চারটে কেস মাঝে-মাঝে ছিটকে আসে কিনা ভুল করে।'

'কী সাংঘাতিক!' সুরেশ বিছানা ছেড়ে প্রায় উঠে দাঁড়ায় আর কী।

'না, আপনার জ্বরটা সেরকম নাও হতে পারে।' কিঞ্চিৎ আশ্বাস দিলে প্রদীপ, 'কিন্তু প্লেগই হোক আর যাই হোক আমাদের কারুর চলে যাওয়ার কোনও কথাই ওঠে না।'

সুরেশ আর রায়মশাই দুজনেই এবার হতাশায় নির্বাক।

ছয়

না, এমন ভালো ফন্দিটাও ভেস্তে গেল রায় ও সুরেশের। মাঝখান থেকে অসুখের ভান করে হামেশা হাঁচতে আর কাশতে গিয়ে সুরেশের সত্যিকার চোখের জলে নাকের জলে হওয়া।

অনেক ভেবেচিন্তে সুরেশই এটা মাথা থেকে বার করেছিল।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রদীপ যে একটু বাতিকগ্রস্ত তা গোড়া থেকেই জানা গেছে। ওষুধের কারখানার দুর্গন্ধ ইত্যাদির ব্যাপার অগ্রাহ্য করলেও এরকম একটা ছোঁয়াচে রোগের নামে সে ভড়কাবে বলেই ধারণা হয়েছিল।

তাই সুরেশের ওরকম রুগি সাজা থেকে পাড়ার অ্যামেচার থিয়েটার দলের একজনকে পোশাক ভাড়া করে ডাক্তার সাজিয়ে আনানো পর্যন্ত আয়োজনের কোনও ত্রুটিই হয়নি।

কিন্তু ফল যা হল তা শেষ পর্যন্ত হিতে বিপরীত।

ভয় পেয়ে চলে যাওয়া দূরের কথা, প্রদীপ রুগির জন্যেই ব্যস্ত। পথ্যি ঠিক পড়ছে কি না, ওষুধ খাচ্ছে কি না সব কিছু সে তদারক করছে।

সুরেশের অবস্থা তাতে কাহিল। রুগি সেজে সারাক্ষণ বিছানায় পড়ে থাকতে তো হচ্ছেই তার ওপর প্রদীপ সামনে থাকলে বার্লি-সাবুও খেতে হচ্ছে বাটি-বাটি।

প্রদীপ যখন থাকে না তখন লুকিয়ে-চুরিয়ে অবশ্য ভালোমন্দ নীলা খাইয়ে যায়। কিন্তু অত ভয়ে-ভয়ে থাকলে কি সুখ পাওয়া যায় খাওয়ায়!

সেদিন নীলা সুযোগ পেয়ে এইরকম লুকিয়ে সুরেশকে খাওয়াতে বসেছিল!

সুরেশকে গোগ্রাসে খেতে দেখে সে হেসে ফেলে বলে, 'একটু আস্তে খাও দাদা! গলায় আটকাবে যে!'

'হ্যাঁ, আমি আস্তে-আস্তে খাই, আর প্রদীপবাবু এসে পড়ুক।' করুণ স্বরে বলে সুরেশ, 'খাওযারই তাহলে দফা-রফা! কী শাস্তি আমার হচ্ছে তা জানিস! সারাদিন ঘরে বন্দি, তার ওপর প্রদীপবাবুর তদারকের চোটে বাটি-বাটি দুধ-সাবু গেলা।'

'কিন্তু এ শাস্তি তো তোমার নিজেরই দোষে দাদা!' নীলা হেসে বলে, 'মিছিমিছি রুগি সাজতে না গেলে তো এ হয়রানি হয় না!'

'হুঁ', সুরেশ গুমরোয়, 'তখন কি জানি এ প্যাঁচে এমন উলটো ফল হবে। ভেবেছিলাম এশিয়ান ফ্লু শুনেই দৌড় দেবে। কিন্তু পালানো দূরের কথা, আরও জোঁকের মতো লেগে রইল। মাঝখান থেকে আমি মরছি কয়েদ হয়ে। ভালোমন্দ খেতে হবে চোরের মতো লুকিয়ে।'

'তা, এখন অসুখটা সেরে গেছে বললেই তো লেঠা চুকে যায়।' নীলা পরামর্শ দেয়।

'তাই বা বলি কী করে!' সুরেশ হতাশভাবে বলে, 'এতবড় সাংঘাতিক অসুখ! অমনি দুদিনে সেরে গেলেই হল।'

সুরেশ আরও কিছু হয়তো বলত, কিন্তু ঠিক সেই সময়েই বাইরে দরজা খোলার শব্দ শোনা যায়, সেই সঙ্গে প্রদীপের গলার আওয়াজ, 'হ্যাঁ ঠিক যা ভেবেছি তাই। দরজায় তালা নেই। এই মধুই আমাদের সর্বনাশ করবে।'

সুরেশ সভয়ে ফিসফিস করে বলে, 'এই খেয়েছে!'

তাড়াতাড়ি টেবিল ছেড়ে বিছানায় গিয়ে কম্বল গায়ে দিতে-দিতে সে চাপাগলায় নীলাকে বলে, 'শিগগির থালাবাটিগুলো সরিয়ে নিয়ে পালা।'

'এখন পালাব কোথা দিয়ে?' নীলাও দিশাহারা।

কিন্তু এখন আর দাঁড়িয়ে পরামর্শ করবার সময় নেই। নীলা থালাবাটি নিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে ঢোকে। সুরেশ কম্বলটা আপাদমস্তক মুড়ি দেয়।

কী ভাগ্যি, প্রদীপ সোজা এ ঘরে ঢোকে না। প্রথমে সে নিজের ঘরেই যায়।

কিন্তু সেখানে টেবিলের ওপর ছবির বান্ডিলটা রাখতে গিয়ে হঠাৎ ড্রেসিং টেবিলের

ধারে চুলের কাঁটাটা তার চোখে পড়ে যায়। নীলা কদিন আগেই ছবি দেখবার সময় এটা ফেলে গিয়েছিল। এ কদিন প্রদীপের যে চোখে পড়েনি, এইটেই আশ্চর্য।

চুলের কাঁটা দেখেই প্রদীপ প্রথমে বিস্মিত তারপর উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

'মধু কোথায়, মধু!' বলে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করে সে কাঁটাটা হাতে নিয়েই সুরেশের ঘরে গিয়ে ঢোকে।

সুরেশকে কম্বলমুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতে দেখে প্রদীপকে অবশ্য একটু নিজেকে সামলাতে হয়।

একটু কুণ্ঠিতভাবেই সে নিজের মনে বলে, 'সুরেশবাবু তো ঘুমিয়ে পড়েছেন দেখছি। ওষুধ খাওয়ার তো সময় হয়ে এল। মধু দুধ-সাবুটা খাইয়ে গেছে কি না বুঝতে পারছি না। দেখি রান্নাঘরে।'

প্রদীপের রান্নাঘরে যাওয়ার সঙ্কল্পের কথা শুনে সুরেশের ঘুমের ভান করে থাকা আর সম্ভব হয় না।

জেগে ওঠার ভান করে হাই তুলে তাকে ক্ষীণস্বরে বলতেই হয়, 'কে? প্রদীপবাবু!'

'হ্যাঁ! আপনাদের মধুর কাণ্ডটা দেখেছেন!' সুরেশকে জাগ্রত দেখে প্রদীপের গলায় আগের উত্তেজনা ফিরে এসেছে।

'কী হয়েছে কী?' সুরেশ যেন সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করে।

'কী হয়েছে!' প্রদীপ চুলের কাঁটাটা বাড়িয়ে ধরে চড়া গলায় বলে, 'দেখতে পাচ্ছেন, এটা কী? আমার ঘরে ছিল, বুঝেছেন?'

মানে বুঝতে সুরেশের দেরি হয়নি। তবু যথাসাধ্য তুচ্ছ করবার চেষ্টায় ক্ষীণকণ্ঠে তাকে বলতে হয়, 'ও তো একটা চুলের কাঁটা দেখছি। কেমন করে এসে গেছে বোধহয়!'

'কেমন করে আসবে মশাই!' প্রদীপ প্রায় রুক্ষ হয়ে ওঠে, 'থাকবাব মধ্যে তো আমরা কজন। আমরা কেউ চুলে কাঁটা দিই নাকি! আর অবশ্য এখনও যাঁকে চোখে দেখলাম না সেই আপনাদের নীলুবাবু আছেন। তা তিনিও নিশ্চয়ই চুলের কাঁটা রাখতে আমার ঘরে ঢোকেননি। না মশাই না, এ নির্ঘাত সেই উন্মাদ মেয়েটার কাজ। আপনি বিছানায় পড়ে আছেন আর মধু সব হাট করে কোথায় গেছে, সেই ফাঁকে ঢুকে পড়েছিল।'

'কিন্তু'—সুরেশ ক্ষীণ প্রতিবাদের চেষ্টা করে, 'কিন্তু ঢুকবে কখন! মধু তো এইমাত্র দোকানে গেল। আর তারপরই আপনি এলেন।'

'ওই সময়ের ফাঁকটুকুতেই তাহলে ঢুকেছে, আর-আর', বলতে-বলতে প্রদীপের চোখ একটা নিশ্চিত ধারণায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। 'এখনও নিশ্চয়ই বেরুতে পারেনি। এইখানেই কোথাও লুকিয়ে আছে। আজ আমি তাকে ধরবই। আগে রান্নাঘরটা...'

প্রদীপের কথা শেষ হতে না হতেই সিঁড়ির দরজার খিলটা খোলার শব্দ পাওয়া যায়। অবস্থা বেগতিক দেখে নীলা আর অপেক্ষা করতে সাহস করেনি।

শব্দটা শুনেই প্রদীপ সেদিকে ছুটে যায়। সিঁড়ির চাতালে কাউকে দেখা না গেলেও ওপরের ছাদে একটা পায়ের শব্দ যেন খুব অস্পষ্ট নয়।

তিন লাফে প্রদীপ এবার ছাদে গিয়ে ওঠে। কেউ সেখানে নেই। কিন্তু ছাদের সেই ঘরটা আজও ভেতর থেকে বন্ধ।

আজ আর প্রদীপ দ্বিধা করে না। সজোরে দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলে, 'কে আছেন ঘরে দরজা খুলুন! খুলুন বলছি দরজা!'

বেপরোয়া হয়ে প্রদীপ সজোরে এবার আঘাত করতে থাকে। দরকার হলে ভেঙে ঢুকবে এই যেন তার পণ।

নীলা খানিকক্ষণ সাড়া না দিয়ে চুপ করে থাকে। তারপর অসহ্য মনে হয় তার সবকিছু, এই লুকিয়ে থাকার গ্লানিটাই সবচেয়ে বেশি।

দৃঢ়পদে এগিয়ে এসে দরজাটা খুলে দাঁড়িয়ে সে বলে, 'কী চান?'

প্রদীপ প্রথমটা একটু থতমত খায়। যাকে অপরাধী হিসেবে ধরতে এসেছে তার এরকম চেহারা ও গলার স্বর সে আশা করতে পারেনি।

তবু একটু শক্ত হয়েই বলবার চেষ্টা করে, 'আপনি, মানে আপনি এ-ঘরে এসে লুকিয়েছেন কেন।'

'না লুকোইনি।' যেমন কঠিন নীলার মুখ তেমনি তার স্বর, 'এ-ঘরে আমি থাকি।'

'এ-ঘরে আপনি থাকেন!' চেষ্টা করেও প্রদীপ বিদ্রুপের সুরটা কথায় ঠিক লাগাতে পারে না। বিস্ময় বিমূঢ়তাই তাতে প্রধান হয়ে ওঠে।

'কেন? তাতে আপনাব আপত্তি আছে?' নীলার স্বরই তিক্ত ও তীক্ষ্ণ।

'না, না সে কথা বলছিলাম না!' প্রদীপ কথাটা ঠিক গুছিয়ে নিতে যেন পারে না, 'বলছিলাম মানে...'

'যা বলতে চান সেটা ভেবে নিয়ে পরে আসবেন।' বলে নীলা দরজাটা বন্ধ করতে যায়।

তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে এবার একটু ঝাঁজ মিশিয়েই প্রদীপ বলেন, 'না, দরজা বন্ধ করবেন না। আপনি এখানে থাকেন তো আমার ঘরে সেদিন ওভাবে ঢুকেছিলেন কেন? ভাব তো দেখিয়েছিলেন যেন আপনি নিচে ওখানেই থাকেন!'

'ভাব দেখাব কেন!' নীলার স্বর কঠিন, 'স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছিলাম।'

'অথচ এখন বলছেন এখানে থাকেন?' প্রদীপ গলাটা চড়ায়।

'হ্যাঁ তাই থাকি!' নীলা সেই সুরেই বলে।

'তাহলে কোনটা সত্যি?' প্রদীপের যেন কাঠগড়ার জেরা।

'দুটোই।' নীলা অবিচলিত।

'মানে?' প্রদীপ গরম হয়ে ওঠে।

'মানে জানতে চান?' নীলা এবার যেন নির্মম, 'সত্যি কথা সহ্য করতে পারবেন তো! তাহলে শুনুন। মানে হচ্ছেন আপনি। আপনিই সবকিছুর মূল।'

'আমি!' প্রদীপ অবাক, 'আপনার সমস্ত কথাই আবোল-তাবোল মনে হচ্ছে। সব কিছুর মূল হলাম কিনা আমি!'

'হ্যাঁ আপনি! আপনার জন্যেই এই সমস্ত গোলমাল আর আমার দুর্ভোগ।'

'কী বলছেন কী!' প্রদীপ উত্তেজিত হয়ে ওঠে, 'আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় কখনও হয়নি। সেদিন আমার ঘরে ঢোকবার আগে আপনাকে কখনও দেখিনি পর্যন্ত।'

'সেই দেখাটা একদম না হলেই ভালো হতো।' নীলা কঠিন স্বরে তার সিদ্ধান্ত জানায়।

এ ধরনের আঘাতের জন্যে প্রদীপ সত্যিই প্রস্তুত ছিল না। জবাবটা একটু ভেবে দিতে হয়।

'কিন্তু দেখা হওয়ার জন্যে তো আমি দায়ী নই, আপনার দুর্ভোগের জন্যেও।'

'না আপনিই দায়ী।' নীলা জোর দিয়ে বলে, 'আপনি নিচের ফ্ল্যাটে উড়ে এসে জুড়ে

না বসলে আমায় নিজের ঘর ছেড়ে চোরের মতো বে-আইনিভাবে এ-ঘরে ঢুকতে হয়?'

'এসব কী হেঁয়ালি!' প্রদীপ মেয়েটির মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে আবার সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে।

নীলা একটু তিক্তভাবে হেসে এবার বলে, 'এখনও হেঁয়ালি মনে হচ্ছে! শুনুন তাহলে। নিচের টি. কে. রায় আমার মামা, আর সুরেশবাবু আমার দাদা। আপনি যে ঘর দখল করে আছেন, সেটা আমার থাকবার। কদিনের জন্যে আমি মামার বাড়ি গেছলাম। ফিরে এসে যা দেখেছি তা আপনিও জানেন।'

ব্যাপারটা বুঝতেই প্রদীপের একটু সময় লাগে। বিহ্বলভাবে সে বলে, 'রায়মশাই আপনার মামা আর সুরেশবাবু ভাই!'

নীলা শুধু মাথা নেড়ে সায় দেয়।

'কিন্তু ওঁরাই তো দস্তুরমতো ভাড়া নিয়ে আমায় ওখানে থাকতে দিয়েছেন! আমি তো জোর করে দখল করিনি!' প্রদীপের গলায় ক্ষোভ আর বিমূঢ়তা সমানমাত্রায় মেশানো।

'না, আপনি জোর করে দখল করেননি ঠিকই। ওঁরাই নিরুপায় হয়ে আপনাকে থাকতে দিয়েছেন!' নীলা এটুকু স্বীকার করে আবার তিক্ত হয়ে ওঠে, 'কিন্তু অপরাধ যারই হোক শাস্তিটা তো আমিই পাচ্ছি। এ-ঘরের মালিক ইচ্ছে করলে আমায় জেলে দিতে পারে তা জানেন? তালা খুলে বে-আইনিভাবে কারুর ঘরে ঢুকলে কী শাস্তি পেতে হয় ধারণা আছে কিছু!'

'না, তা নেই!' প্রদীপ এবার বিদ্রুপ না করে পারে না, 'এসব কাজ করবার এখনও সৌভাগ্য তো হয়নি। কিন্তু এইরকম যখন ব্যাপার তখন জেনে-শুনে আপনার মামা আর দাদা আমায় ওখানে জায়গা দিলেন কেন?'

'সে অনেক ঘোরালো ব্যাপার।' নীলা অকপটভাবে জানায়, 'এইটুকু শুধু বলতে পারি যে, শিগগিরই অন্য একটা জায়গা আপনাকে দিতে পারবেন এই আশায় সাময়িকভাবে এখানে তুলেছিলেন। তাছাড়া আপনি সত্যি-সত্যিই এতদিন এখানে থেকে যাবেন তা ওঁরা ভাবেননি!'

'ভাবেননি মানে?' প্রদীপ বিস্মিত, 'থাকব না, এমন কিছু কি আমি জানিয়েছি?'

'তা জানাননি।' নীলা সোজা সত্য কথাটাই প্রকাশ করে, 'কিন্তু এখানে অসুবিধে তো বড় কম নয়, তাই হয়তো ওঁদের মনে হয়েছিল আপনার মত খুঁতখুঁতে মানুষ বেশি দিন টিকতে পারবে না।'

'ওঃ, আমি টিকতে পারব না, এই আশা করেছিলেন!'—এবার প্রদীপ রীতিমতো ক্ষুব্ধ, 'তা আমার থাকা যে চান না, তা স্পষ্ট জানালেই পারতেন।'

'সেটা একটু ভদ্রতায় বেধেছে বোধহয়!' নীলা মামা ও দাদার হয়ে সামান্য ওকালতি না করে পারে না, 'তবে হুঁশ থাকলে আপনি নিজেই বুঝতে পারতেন!'

'ওঃ!' প্রদীপ তিক্ত বিদ্রুপের সঙ্গে বলে, 'না বোঝাটা আমারই অন্যায়! বুঝে আমারই চলে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু জেনে রাখুন, বুঝলেও সুরেশবাবুকে এরকম অসুখের মধ্যে ফেলে বোধহয় যেতে পারতাম না। সে ধরনের মানুষ এখনও হতে পারিনি।'

'আমায় মাপ করবেন!' নীলার গলাটা এবার ভারী শোনায়, 'কারণ যাই হোক, আপনার সঙ্গে এরকম প্রবঞ্চনার জন্যে আমি লজ্জিত, অনুতপ্ত। আপনার কাছে নিছক সত্য কথাটা তাই স্বীকার করছি। দাদার ও অসুখটা আপনাকে বাসা ছাড়াবার জন্যে একটা ভান।'

'অসুখটা ভান!' প্রদীপ যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারে না।

'হ্যাঁ', নীলা অপরাধীর মতো বলে, 'আপনার কাছে সমস্ত ব্যাপারই এবার খুলে বলছি...'

সাত

ভাগ্যদেবতারও মাঝে-মাঝে কৌতুক করবার সাধ হয়, আর সে কৌতুক মানুষের কল্পনার বাইরে।

সেইরকম একটি অবিশ্বাস্য কৌতুকই সেই মুহূর্তে তিনি সুরেশকে নিয়ে করেছেন।

'অসুখটা ভান!' বলে প্রদীপের চোখ যখন কপালে উঠেছে, তার কিছু আগে থাকতেই সুরেশের মুহুর্মুহু হাঁচি শুরু হয়েছে। সেই সঙ্গে একটু থেকে-থেকে কাশিও। সকাল থেকেই শরীরটা কেমন জুত লাগছিল না। সেটা জোর করে বিছানায় শুয়ে কাটানোর দরুনই অস্বস্তি বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তা আর পারা গেল না। হাঁচিটা খানিক আগে থেকে রোখার প্রায় অসাধ্য হয়ে উঠেছে।

রায়মশাই এইমাত্র অফিস থেকে বাড়ি ফিরেছেন। ঘরে ঢুকে সুরেশের কাণ্ডকারখানা দেখে তিনি তাজ্জব।

এদিক-ওদিক চেয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে তিনি অবাক হয়ে বলেন, 'সে কী রে! কোথাও তো কেউ নেই। মিছিমিছি এখন কেশে মরছিস কেন! থাম-থাম এখন আর অত অভিনয় করতে হবে না!'

সুরেশ উদ্যত হাঁচিটা সামলে করুণ সুরে বলে, 'সখ করে হাঁচছি কাশছি নাকি!'

পরের হাঁচিটা সামলানো যায় না। সেটার দাবি মিটিয়ে অত্যন্ত কাতরভাবে সুরেশ বলে, 'সত্যি সর্দি লেগে গেছে যে! কেমন জ্বর-জ্বরও মনে হচ্ছে!'

'বলিস কীরে!' রায় এগিয়ে গিয়ে সুরেশের কপালে হাত দিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়েন, 'সত্যি গা যে পুড়ে যাচ্ছে রে! মিথ্যে রুগি সাজতে গিয়ে সত্যি জ্বর বাধিয়ে ফেললি! এখন উপায়! নীলু কোথায়?'

হাঁচির পর কাশির পালা। সে কাশির ফাঁকে-ফাঁকে সুরেশ বলে, 'প্রদীপবাবুর ভয়ে খানিক আগে তো ওপরে পালাল। প্রদীপবাবুও কী সন্দেহ করে বেরিয়ে গেলেন। এখনও তো ফিরলেন না।'

নীলার কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে ঠিক সেই মুহূর্তেই প্রদীপ ঘরে এসে ঢোকে।

রায় একটু উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করেন, 'কোথায় গেছলেন প্রদীপবাবু?'

'এই একটু ছাদে।' প্রদীপের মুখের ভাবটা কেমন একটু দুর্বোধ্য।'

'ছাদে!' রায় বিস্ময় প্রকাশ না করে পারেন না। 'ছাদে কী করতে?'

'হাওয়া খেতে!' প্রদীপের শুষ্ক, সংক্ষিপ্ত জবাব।

'ওঃ' বলে ব্যাপারটাকে আপাতত স্থগিত রেখে রায় বর্তমান সমস্যার কথা পাড়েন, 'এদিকে সুরেশের তো হঠাৎ জ্বর!'

কথাটা বলে ফেলেই রায়কে আবার তৎক্ষণাৎ শোধরাতে হয়, 'মানে হঠাৎ জ্বরটা বেড়ে গেছে!'

'তাই নাকি!' প্রদীপ যেন বিস্মিত।

'কীরকম কাশছে আর হাঁচছে দেখেছেন!' রায় অসুখের গুরুত্বটা বোঝাবার চেষ্টা

করেন।

'তাই তো দেখছি! একেবারে রিয়্যাল ব্রঙ্কাইটিস মনে হচ্ছে!'

প্রদীপের কথার সুরটা রায়ের কেমন সুবিধের ঠেকে না। সুরেশের তখন আবার হাঁচি শুরু হয়েছে।

প্রদীপ যেন সুরেশকে তারিফ করে বলে, 'বাঃ বেশ সহজেই হাঁচছেন তো!'

'সহজে হাঁচছি মানে?' সুরেশ প্রায় কাঁদো-কাঁদো, 'মাথা একেবারে ছিঁড়ে যাচ্ছে। আমার সত্যি এশিয়ান ফ্লু হয়েছে।'

'আরে সত্যি নয় তো কি!' প্রদীপ যেন আশ্বাস দেয়, 'এশিয়ান ফ্লু কি কখনও মিথ্যে হয়! প্লেগই যে হয়নি তা কে বলতে পারে।'

রায় প্রদীপের কথার ধরনে বেশ একটু অবাক হয়ে বলেন, 'ব্যাপারটা সত্যি গুরুতর প্রদীপবাবু! ভালো একজন ডাক্তার না ডাকলে নয়!'

'কেন?' প্রদীপ যেন সরলতার প্রতিমূর্তি, 'আপনাদের যে ডাক্তার, তিনি খারাপ কীসে? তাঁর প্রেসক্রিপশনে তো বেশ কাজ হয়েছে।'

'না, না মামাবাবু! সত্যি মানে' ভুলটা তাড়াতাড়ি শুধরে সুরেশ শঙ্কিত আবেদন জানায়, 'এবার ভালো একজন ডাক্তার ডাকাও। নইলে আমি বাঁচব না।'

নীলা ইতিমধ্যে সকলের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। সে কী যেন বলতে যায়। কিন্তু তার আগেই প্রদীপ এবার স্পষ্ট বিদ্রুপের স্বরে বলে, 'সত্যিকার ভালো ডাক্তার ডাকলে একটু বিপদ হবে না?'

'বিপদ!' রায় তখনও ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে না পেরে বলেন, 'ভালো ডাক্তার ডাকায় আবার বিপদ কী? ওঃ আপনি ভিজিটের কথা বলছেন, তা ভিজিট যতই হোক...'

'না, উনি ভিজিটের কথা বলছেন না!' নীলা এবার রায়ের কথায় বাধা দিয়ে এগিয়ে আসে, 'সত্যিকারের ডাক্তার এলে যা হবে, উনি সেই মজার কথা বলছেন!'

'মজা!' সুরেশ প্রদীপের দিকে অত্যন্ত আহতভাবে তাকায়, 'আমি, অসুখে মরতে বসেছি আর আপনি মজা ভাবছেন!'

'আপনার ব্যবহারটা ঠিক বুঝতে পারলাম না প্রদীপবাবু!' রায়ও বেশ ক্ষুণ্ণ স্বরে বলেন।

'তাহলে বলি শুনুন!' প্রদীপের স্বর অত্যন্ত কঠিন হয়ে ওঠে, 'আপনাদের ব্যবহারটাও আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনাদের কোনও ক্ষতি করেছি বলে তো মনে হয় না। তবু আমার সঙ্গে এসব চাতুরির মানে কী? আমার এখানে থাকায় যদি আপত্তিই ছিল তাহলে স্পষ্ট বললেই পারতেন!'

সুরেশ ও রায় অসহায়ভাবে পরস্পরের দিকে তাকান। রায় কোনওরকমে নিজেকে একটু সামলে বলেন, 'এসব কী বলছেন প্রদীপবাবু! কে বললে আমরা আপনার এখানে থাকা চাই না?'

'আমিই বলেছি!' নীলা দৃঢ়স্বরে জানায় এবার, 'সব কথাই ওঁকে বলেছি।'

'তুই বলেছিস!' রায় আর বলবার কিছু খুঁজে পান না।

সুরেশ আবার তখন কাশতে শুরু করেছে। সেদিকে অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে চেয়ে তিক্তস্বরে প্রদীপ বলে, 'আর হাঁচবার-কাশবার দরকার নেই সুরেশবাবু। আমি নিজে থেকেই দু-একদিনের মধ্যে চলে যাচ্ছি।'

'কিন্তু আপনি ভুল করছেন!' রায় বোঝাতে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন, 'সুরেশের সত্যি জ্বর...'

'কেন আর মিথ্যেটা চালাতে চাচ্ছ, মামাবাবু', নীলা ভর্ৎসনার সুরে বলে, 'যা জানবার উনি সবই জেনেছেন!'

'মিথ্যে! আমার জ্বরটা মিথ্যে!' সুরেশই এবার উত্তেজিত হয়ে ওঠে, 'দ্যাখ এসে গায়ে হাত দিয়ে, নিয়ে আয় থার্মোমিটার!'

'না।' নীলা কঠিন স্বরে বলে, 'তোমাদের এসব চালাকিতে আমার ঘেন্না ধরে গেছে।'

নীলা রেগে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে চায়, কিন্তু যাওয়া তার হয় না। তার ও সুরেশের কাকাবাবু এই বাড়ির খোদ মালিক, সিটি হাউস এজেন্টসের আসল ভরসা ডাঃ বনবিহারী ঘোষ স্বয়ং রঙ্গমঞ্চে এবার প্রবেশ করেন।

ঘরে ঢুকে সকলের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে বলেন, 'বাঃ, সবাই এখানেই যে হাজির দেখছি! ভালোই হয়েছে!'

'কাকাবাবু!' বলে নীলা তাঁব পায়ের ধুলো নিতে যায়।

কিন্তু ডাঃ ঘোষ সরে দাঁড়িয়ে বলেন, 'থাক! থাক! আমার পায়ের ধুলো নিয়ে কিছু লাভ হবে না।'

'কেন সেধে অপমান হচ্ছিস নীলু!' রায এবার তীক্ষ্ণ বিদ্রুপেব স্বরে বলেন, 'লাভ ছাড়া কেউ কিছু দুনিয়ায় যে করে বুনো ঘোষ এখন সেকথা ভুলে গেছে।'

'গেছিই তো!' ডাঃ ঘোষ গর্জন কবে ওঠেন, 'কিন্তু তোমার মতো ফাঁকিবাজ ঝুটো দালালের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করতে আমি আসিনি। আমি জানতে এসেছি আমার ওপরের ঘরের তালা কে ভেঙেছে!'

'তালা!' রায় যেন আকাশ থেকে পড়েন, 'ওপরের ঘবের তালা আছে কিনা তাই আমরা জানি না।'

'ওঃ জানো না!' ডাঃ ঘোষ জ্বলে ওঠেন, 'রাস্তার লোকজন সিঁড়ি দিয়ে উঠে শখ করে তালা ভেঙে গেছে অথচ জিনিসপত্র কিছু ছোঁয়নি!'

'উদার চোর বোধহয়!' রায় টিপ্পনি কাটেন।

ডাঃ ঘোষ তাতে কান না দিয়ে সুবেশের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকান, 'এই সুরো! কে তালা ভেঙেছে?'

'আমি কিছু জানি না কাকাবাবু!' গলাটা ক্ষীণ ও কাতর করবার জন্যে সুরেশকে চেষ্টা করতে হয় না।

'না, কেউ তোমরা কিছু জানো না!'—ধমক দিয়ে মুখ ফেরাতে এবার প্রদীপকে লক্ষ করে ডাঃ ঘোষ তীক্ষ্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করেন, 'এ আবার কে?'

'এ নয়, বল উনি?' রায় কড়া গলায় সংশোধন করে জানান, 'উনি আমাদের অতিথি, আমাদের বন্ধু!'

'ওঃ বন্ধু!'—ডাক্তাব ঘোষের গলায় টিটকিরিটা তেমন ফোটে না, 'তা টি কে. রায়ের যখন বন্ধু তখন আর পরিচয় দিতে হবে না। এখন জানতে চাই আমার ঘরের তালা কেন খোলা হয়েছে। জবাব দেবে, না পুলিশে খবর দেব?'

'না, পুলিশে খবর দিতে হবে না!' নীলার গলা এবার শোনা যায়, 'শুনুন কাকাবাবু...'

'না, না', রায় নীলাকে কথাটা শেষ করতে দেন না, 'যাক, বুনো ঘোষ পুলিশের

কাছেই যাক। গিয়ে বলুক ভাইপো-ভাইঝির নামে নালিশ করতে এসেছি।'

'আলবত তাই বলব।' ডাঃ ঘোষ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন, 'এখন ভাইপো ভাইঝি শোনাতে এসেছ। যেদিন থেকে ফুসমন্তর কানে দিয়ে তাদের এখানে এনেছ সেদিন থেকে ভাইপো-ভাইঝি আমার কেউ নেই বলে আমি ধরে নিয়েছি।'

'বেশ করেছ!' রায় ডাঃ ঘোষের গলার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বলেন, 'কিন্তু ওরা এখানে এসেছে কেন? তোমার গোঁড়ামির জুলুমে।'

'আমার গোঁড়ামির জুলুমে না তোমার আস্কারায়!' ডাঃ ঘোষ গলা ছাড়েন, 'তোমার আস্কারা পেয়ে ওই তো ধিঙ্গি হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ও মেয়ের আর বিয়ে হবে?'

'হয় কি না দেখিয়েই দেব!' রায় সদম্ভে জবাব দেন, 'ভুলে যাচ্ছ কেন যে দিব্যি গেলে বাজি রেখে এসেছি!'

'হ্যাঁ, টি. কে. রায়ের আবার দিব্যি!' ডাঃ ঘোষ অবজ্ঞাভরে বলেন, 'যা হোক না হোক আমি গ্রাহ্যই করি না। এখন আমার প্রশ্নের জবাব কেউ দেবে কি না? কে ও তালা খুলেছে!'

'আমি!' নীলার দৃঢ় স্পষ্ট স্বীকারোক্তি!

'তুমি!' ডাঃ ঘোষ একটু কি ভড়কে যান! পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে আবার গর্জন করে ওঠেন, 'ওই মামার মন্ত্রণায় নিশ্চয়ই। জানো সক্কলের নামে আমি পুলিশ কেস করতে পারি। একমাস বাদে এ-বাড়ি থেকে তো দূর করে দিচ্ছি। তার ওপর জেলে পাঠাতে পারি তা জানো।'

প্রদীপ এতক্ষণ নীরব দর্শকমাত্র ছিল। এবার কিন্তু সে মুখ খোলে। কঠিন স্বরে বলে, 'হ্যাঁ জানি। এখানে হম্বিতম্বি না করে তাই করুন না গিয়ে!'

'তুমি!'—ডাঃ ঘোষ একসঙ্গে উত্তেজিত ও বিচলিত, 'তুমি কে? তুমি এ-বাড়ির কেউ নও!'

'আমি যেমন কেউ নই', প্রদীপ তৎক্ষণাৎ জবাব দেয়, 'তেমনি আপনিও কেউ নন। আপনি নিজের মুখেই এইমাত্র বলেছেন যে ভাইপো-ভাইঝি কেউ আপনার নেই বলে জানেন। সুতরাং বাড়িওয়ালা হিসেবে যা করতে পারেন করুন!'

'ওঃ এত বড় কথা!' আর কোনও জবাব না পেয়ে ডাঃ ঘোষ রাগ দেখিয়ে চলে যেতে-যেতে বলেন, 'আচ্ছা!'

'দাঁড়াও!'—শুনে তাঁকে কিন্তু ফিরে দাঁড়াতে হয়। গরম মেজাজে বলেন, 'আবার দাঁড়াব কেন?'

'দাঁড়াতে তুমি বাধ্য।' রায় যেন হাকিমের হুকুম শোনান, 'তুমি তো ডাক্তার। রুগি দেখা তোমার কাজ। সুরেশকে দেখে যাও। ওর সত্যি জ্বর!'

'সত্যি জ্বর!' প্রদীপ ও নীলা চমকে ওঠে।

'হ্যাঁ, এবার সত্যি!'—বলে রায় তাদের সংশয় ঘুচিয়ে ডাঃ ঘোষের দিকে ফেরেন, 'কই! এসে দেখো।'

ডাঃ ঘোষের অবস্থাটা এবার দেখবার মতো। রাগের সঙ্গে উদ্বেগের লড়াই চলেছে তাঁর মুখে। তবু একটু তেজ দেখিয়ে বলেন, 'কী দেখব কী? জ্বর সত্যি-মিথ্যে দুরকম হয় না।'

'আমার সত্যি জ্বর কাকাবাবু!' সুরেশেরই কাতর নিবেদন এবার শোনা যায়।

'কাকাবাবু নয়, বলুন ডাক্তারবাবু!' প্রদীপ সুরেশকে সংশোধন করে ডাঃ ঘোষকে বলে, 'আসুন ডাক্তারবাবু। সত্যি-মিথ্যে দেখলেই বুঝবেন। ডাক্তার হিসেবে রুগি দেখে যেতে আপনি বোধহয় বাধ্য।'

'ও বাধ্য!'—ডাঃ ঘোষ ভাঙেন তবু মচকান না, 'আমার—আমার ফি বত্রিশ টাকা।'

'বেশ, বত্রিশ টাকাই আপনি পাবেন!' প্রদীপ অবজ্ঞাভরে কথা দেয়।

ডাঃ ঘোষ এবার সুরেশকে পরীক্ষা করতে বসেন। বুক-পিঠ দেখে পেট টিপে, জিভ দেখে থার্মোমিটারে গায়ের জ্বর নিয়ে প্রেসক্রিপশন লিখতে-লিখতে যেন আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগের সুরে বলেন, 'হুঁ, বেশ জ্বরটি বাধিয়েছ!'

'কী দেখলে?' জিজ্ঞাসা করেন রায়।

'যা দেখলাম তা তোমায় বলতে বাধ্য নই।' এবার ডাঃ ঘোষের মেজাজ দেখাবার সুযোগ, 'এই ওষুধটা দিনে তিনবার খাওয়াবে আর রাত্রে একবার ফুটবাথ দেবে।'

'কী হবে কাকাবাবু?' সুরেশের করুণ প্রশ্ন।

'হবে আবার কী?' ডাঃ ঘোষ যেন নির্বিকারভাবে বলেন, 'দিনকয়েক ভুগবে! যত তাডাতাড়ি সেরে উঠে এ-বাড়ি থেকে বিদেয় হতে পারো সেই ব্যবস্থাই করে গেলাম।'

ডাঃ ঘোষ উঠে দাঁড়াতেই প্রদীপ তাঁর হাতে বত্রিশটা টাকা গুঁজে দেয়, 'এই নিন আপনার ফি!'

প্রথমটা একটু যেন চমকে উঠে, ফি পেয়েই ডাঃ ঘোষ একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন কেন কে জানে!

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে বিশেষ করে রায়েব দিকেই তাকিয়ে বলে যান, 'আমি যাচ্ছি। কিন্তু আবার বলে যাচ্ছি ৩রা জুলাই তোমাদের জব্দ যদি না করতে পারি তো আমার নাম বনবিহারী ঘোষ নয়!'

কয়েকদিন পরের কথা।

প্রদীপ যথানিয়ম ছবির জগতে ঢুঁ মেরে ঢোকবার আশায় সেজেগুজে বার হওয়ার উপক্রম করছে, এমন সময় সুরেশ এসে ঘরে ঢুকল।

'বেরুচ্ছেন নাকি প্রদীপবাবু! এই আপনার টাকাটা!'—একটু কুণ্ঠিতভাবে কয়েকটা নোট সুরেশ এগিয়ে দিলে।

'টাকা!' প্রদীপ একটু অবাক। 'কীসের টাকা?'

'ওই যে সেদিন ভিজিটের টাকা দিয়েছিলেন।' সুরেশ কৃতজ্ঞভাবে জানালে।

'ওটা দেওয়ার জন্যে আপনি অসুস্থ শরীরে উঠে এলেন!' প্রদীপ মৃদু ভর্ৎসনা করলে।

'না, জ্বরটা তার পরদিনই ছেড়ে গেছে।' সুরেশ হেসে বললে, 'কাকাবাবুর রাগ যতই হোক চিকিৎসাটা ভালো করেন। আচ্ছা এই টাকাগুলো...'

'না, টাকাটা আমায় দিতে হবে না।' প্রদীপ জানালে, 'ওটা ভাড়া হিসেবেই জমা করে নিন।'

'আর তা হয় না, প্রদীপবাবু!' সুরেশের গলার আওয়াজ একটু গাঢ়—'সে সম্পর্ক বদলে গেছে।'

'মানে?' প্রদীপ একটু বিস্মিত।

'মানে, সোজা কথায় যা করেছি তার জন্যে আপনার কাছে মাপ চাইছি!' সুরেশের

গলায় আন্তরিক অনুশোচনা, 'তবে একটা কথা সেই সঙ্গে বলি। আমাদের স্বভাব-চরিত্র এতদিন যদি কিছু বুঝে থাকেন তাহলে এটুকুও আশা করি বুঝেছেন যে, চালাকি করে আপনাকে এখান থেকে সরাবার চেষ্টা করলেও তার মধ্যে শত্রুতা বা বিদ্বেষ কোথাও কিছু ছিল না। নেহাত নিরুপায় হয়ে ওসব ফন্দি খাটিয়েছি! সত্যি বলছি ওসব ফন্দি ভেস্তে গেছে বলে খুশিই হয়েছি।'

সুরেশের অনুশোচনার মধ্যেই নীলা ঘরে এসে ঢুকেছে। তার হাতে প্রদীপের আঁকা সেই কার্টুন ছবিগুলো। সেগুলো প্রদীপের দিকে এগিয়ে দিয়ে সে হেসে বললে, 'আপনার এই ছবিগুলো চুরি করেছিলাম। ফেরত দিতে এলাম।'

প্রদীপ ছবিগুলোর কথা বোধহয় ভুলেই গেছল। হাতে নিয়ে চমকে উঠে প্রথম একটু কুণ্ঠিত হয়ে পরে সরল ভাবে হেসে উঠল। বললে, 'আমিও এগুলোর জন্যে তাহলে মাপ চাইছি। আমার এ ছবিতেও কোনও আক্রোশ নেই। শুধু একটু মজা করতে এঁকেছিলাম।'

'যাক তাহলে শোধবোধ!' সুরেশ হাসল।

'হ্যাঁ, ওসব কথা আর মনে রাখবেন না।' প্রদীপ সহজ স্বরে জানালে, 'যা হওয়ার হয়ে গেছে। তবে আগে যদি একটু জানাতেন, এসব কষ্ট আপনাদের করতে হতো না। আমি অবশ্য আর কিছুদিন মাত্র আপনাদের কষ্ট দেব।'

'তার মানে? এখান থেকে চলে যেতে চান?—সুরেশ বেশ ক্ষুণ্ণ,—'মুখে সব শোধবোধ বলছেন, অথচ সত্যি করে ক্ষমা করতে পারছেন না!'

'না, না, অপরাধ বা ক্ষমার কোনও কথাই আসছে না।' প্রদীপ ব্যাকুলভাবেই প্রতিবাদ জানাল, 'আমার সত্যিই অন্য বিশেষ কারণে এখান থেকে চলে যেতে হচ্ছে।'

'কোথায়?' এতক্ষণে নীলা জিজ্ঞাসা করলে, 'নিজের বাড়িতে?'

'নিজের বাড়িতে!' ঝোঁকের মাথায় প্রদীপ হঠাৎ বলে বসল, 'বাড়ি-টাড়ির আমার বালাই নেই। যখন যেখানে থাকি সেই আমার বাড়ি। আমাকে এখন কী বলে একবার বোম্বে যেতে হবে তাই...'

প্রদীপকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে সুরেশ বললে, 'তা যেখানে দরকার হয় যাবেন। চিরকালের জন্যে তো আর যাচ্ছেন না! ফিরে এসে আবার এখানেই উঠবেন। তা না উঠলে সত্যি সন্দেহ করব যে আমাদের ক্ষমা করেননি। কী, আসবেন তো?'

'এ তোমার অন্যায় অনুরোধ দাদা!' নীলাই ভর্ৎসনার সুরে বললে, 'প্রদীপবাবুর নিজের বাড়ি না থাক, আপনার জন তো নিশ্চয়ই আছে, তাদের কাছে না গিয়ে উনি এখানেই বা ফিরবেন কেন?'

'না, না, আপনারা ভুল করছেন!' প্রদীপ প্রথম মিথ্যা কথাটার ডালপালা বাড়িয়ে বসল খেয়ালের ঝোঁকে, 'আপনার জন-টন আমার কেউ নেই। বিধাতা ওই দায় থেকে মুক্ত করে আমাকে একেবারে ঝাড়া হাত-পা করে দিয়েছেন। আমাকেও কারুর খোঁজ রাখতে হয় না, আমার খোঁজও রাখে না কেউ।'

ঝোঁকের মাথায় প্রদীপ যে মিথ্যাটা বলে ফেলেছিল ভাগ্যের কৌতুকে সেইদিনই সেটা এমনভাবে যে ফাঁস হয়ে যাবে সে নিশ্চয় কল্পনা করতেই পারেনি।

প্রদীপ যথারীতি ছবি বেচবার কাজে বেরিয়ে গেছে। রায় গেছেন অফিস চালু রাখতে, আর সুরেশ অসুখ থেকে সদ্য সেরে উঠে দুর্বল শরীরে একটু বিছানায় গড়াচ্ছে এমন সময় কলে একটা জামা সেলাই করতে-করতে নীলা বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ পেল।

এমন সময় কারুর তো আসবার কথা নয়।

প্রদীপবাবু বেলা দুটো-তিনটের আগে ফেরেন না। মামা ফেরেন সাধারণত বিকেলে মধুকে সঙ্গে করে। এখন তাহলে কে আসতে পারে?

বারান্দা দিয়ে গিয়ে বাইরে সিঁড়ির দরজা খুলে নীলা অবাক।

প্রৌঢ়-গোছের এক সাধারণ চেহারার ভদ্রলোক, বর্ষিয়সী সৌম্য স্নিগ্ধ চেহারার একজন মহিলা ও বছর দশেকের একটি ফ্রক পরা ফুটফুটে মেয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে।

নীলাকে দেখে প্রৌঢ় ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটা ১৪বি তো?'

'হ্যাঁ!' বলে নীলা একটু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতে বর্ষিয়সী ভদ্রমহিলা ইষৎ কুণ্ঠিত স্বরে বললেন, 'কিছু মনে কোরো না মা। আমি আমার ছেলের বাড়ি খুঁজছি। ১৪বি, অঘোর ঘোষাল লেনই তার বাসার ঠিকানা বলে জানি। কিন্তু তুমি মানে তোমরা কী এখানে থাকো?'

নীলা উত্তর দেওয়াব আগেই ছোট মেয়েটি হেসে উঠে বললে, 'মা'র যেমন কথা! এখানে না থাকলে উনি দরজা খুললেন কী করে?'

'হ্যাঁ তাই তো, তাই তো।' মেয়েটির মা একটু লজ্জিত হয়ে বললেন, 'মানে, এ বাড়িতে আর কেউ থাকে তা জানতাম না কিনা।'

বর্ষিয়সী মহিলার কুণ্ঠা দূর করবার জন্যই নীলা হেসে জিজ্ঞাসা করলে এবার, 'আপনার ছেলেব বাড়ির কী এই ঠিকানা? কী নাম তাঁর?'

'আমার ছেলের নাম দীপু, মা। এই ঠিকানাই সে চিঠিতে লিখেছে।'

আবার মা'র কথায় ছোট মেয়েটি হেসে উঠল, 'আচ্ছা মা, দীপু বললে কেউ বুঝতে পারে!' নীলাব দিকে ফিরে সে আবার বললে, 'শুনুন, আমার দাদার নাম প্রদীপ দত্ত। দাদা এখানেই থাকে কি?'

''হ্যাঁ, হ্যাঁ থাকেন বইকী।' মনে-মনে বিস্মিত হলেও নীলু জানাতে দেরি করল না, 'কিন্তু তিনি তো এখন বাড়ি নেই। তাহলেও আপনারা আসুন। আমি ঘর খুলে দিচ্ছি। আপনি তো তাঁর মা!'

বর্ষিয়সী মহিলাকে পা ছুঁযে প্রণাম করতে গিয়েও প্রথম পরিচয়ে কেমন একটু সঙ্কোচ বোধ করে নীলা হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে আবার বললে, 'আসুন আপনারা ভেতরে।'

'না, মা, এখন আর ভেতবে যাব না।' প্রদীপের মা স্নিগ্ধ স্বরে আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'কালিঘাট যাওয়ার জন্যে সরকারমশাই আর এই আমার মেয়ে ইলুকে নিয়ে এসেছি। বাড়িটা শুধু দেখে গেলাম। কালিঘাট থেকে ফেরার পথে আসব। দীপু ততক্ষণে অফিস থেকে ফিরবে বোধহয়?'

'অফিস থেকে!' নীলাকে একটু থতমত খেতে হল। মা-বোন ও নিজের ঘরবাড়ি থাকা সত্ত্বেও কিছুক্ষণ আগে প্রদীপের নিজেকে আত্মীয়বন্ধুহীন নিরাশ্রয় বলে প্রচার করবার বাহাদুরিটাই তার কাছে দুর্বোধ্য। তার ওপর অফিসের মিথ্যেটার জন্যে সে ঠিক প্রস্তুত ছিল না। তবু তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে সে বললে, 'হ্যাঁ, তা নিশ্চয়ই এসে যাবেন। তবু আপনারা একটু জিরিয়ে গেলে পারতেন।'

'একেবারে কালিঘাটের পুজো সেরে এসে জিরোব মা!' প্রদীপের মা স্নেহের দৃষ্টিতে নীলার দিকে চাইলেন, 'তোমরাও তাহলে এখানে থাকো?'

'হ্যাঁ', নীলাকে স্বীকার করতে হল একটু সাজিয়ে গুছিয়ে, 'আমরাও এখানকার ভাড়াটে, পাশে-ই থাকি।'

প্রদীপের ছোট বোন ইলুর আবার হাসি শোনা গেল। হাসতে-হাসতে বললে, 'দেখছ তো মা, দাদার কীরকম ভুলো মন। এসব কথা কিছু লেখেনি।'

প্রদীপের মা এই ব্যাখ্যা নিয়েই বোধহয় সন্তুষ্ট হয়ে ইলা ও সরকারমশাইকে নিয়ে কালিঘাটে চলে গেলেন।

তাঁরা চলে যাওয়ার পরও নীলা সিঁড়ির মাথায় খানিক দাঁড়িয়ে থেকে যখন দরজা বন্ধ করে ভেতরে গেল, তখন তার মুখে যে ভাবটা প্রধান সেটাকে ঠিক প্রসন্ন কৌতুক বলা চলে না।

প্রদীপের সেদিনের টহলদারি বৃথা গেছে।

এতদিন পর্যন্ত দরজায়-দরজায় প্রত্যাখ্যাত হয়েও তার উৎসাহে কখনও ভাঁটা পড়েনি। আজ না হয় কাল তার ক্ষমতা স্বীকৃতি পাবেই এ বিশ্বাসেই প্রতিদিন সে অম্লান মুখে বাসায় ফিরেছে।

আজ কিন্তু তার সন্দেহ জেগেছে নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধেই। কেমন মনে হতে শুরু করেছে যে নিজের ছবি সম্বন্ধে ধারণাই হয়তো তার ভুল। তা না হলে জনে-জনেই তাকে অমন করে ফিরিয়ে দেবে কেন?

আজ তাই সে যখন অন্য দিনের তুলনায় একটু আগেই বাসায় ফেরে তখন মনটা তার বেশ ভেঙে পড়েছে।

ছবিসমেত ফোলিওব্যাগটা বিছানার ওপরই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে অবসন্নভাবে চেয়ারটার ওপর বসে পড়ে। বাইরের পোশাকটা ছাড়বার পর্যন্ত তার উৎসাহ হয় না।

দরজায় সেই মুহূর্তেই নীলার গলা শোনা যায়, 'আসতে পাবি!'

'আসুন। আসুন!' নিজের হতাশাটা লুকোবার চেষ্টা কবে প্রদীপ উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানায়।

নীলা ঘরে ঢুকে কেমন একটু অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাব দিকে তাকিয়ে বলে, 'আজ যে এত তাড়াতাড়ি অফিস থেকে ফিরলেন?'

'অফিস!' প্রদীপ অবাক হয়ে বলে, 'আমার অফিস?'

'হ্যাঁ, আপনি তো কোন বড় অফিসে চাকরি করেন।' নীলার মুখে সরলতা মাখানো।

মনটা প্রদীপের খারাপই ছিল, একথায় মেজাজটাও একটু বিগড়ে যায়। একটু অপ্রসন্ন স্বরেই সে বলে, 'এসব বাজে কথা কে বললে আপনাকে?'

'কে বললে?' নীলা যেন ভাববার চেষ্টা করে বলে, 'কোথায় যেন শুনেছি মনে হচ্ছে। আপনিই হয়তো বলেছেন।'

'আমি! হতেই পারে না।' প্রদীপ জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ জানায়।

'তাহলে, তাহলে বোধহয় হাওয়ায় ভেসে এসেছে।' নীলা গম্ভীরভাবে বলে যায়, 'কত কথাই তো অমন ভেসে আসে। নইলে আপনার ডাকনাম দীপু, তাই বা আমার হঠাৎ মনে হবে কেন? ওকী, চমকে উঠলেন যেন!'

প্রদীপ চমকে ওঠে সত্যিই। তারপর সন্দিগ্ধভাবে ভুরু কুঁচকে সে জিজ্ঞাসা করে, 'এসব আজেবাজে কথার মানে? কোথায় এসব শুনেছেন?'

বাইরের দিকে কান পেতে নীলা এবার একটু মুচকি হেসে বলে, 'কোথায় শুনেছি জানতে চান? এখুনি বোধহয় জানতে পারবেন। যাই দরজাটা খুলে দিয়ে আসি।'

'কে? কারা এসেছেন?' প্রদীপের এবার সন্ত্রস্ত কণ্ঠস্বর।

'দেখতেই পাবেন এখুনি।' বলে নীলা বেরিয়ে যায়।

খানিক বাদেই প্রদীপের মা ও বোনকে সঙ্গে নিয়ে নীলা যখন ঘরে ঢোকে প্রদীপ তখন খানিকটা নিজেকে প্রস্তুত করবার সময় পেয়েছে। কিন্তু প্রস্তুত হয়েও এ অপ্রত্যাশিত অবস্থা সামলানো তার পক্ষে খুব সহজ হয় না।

ইলাকে নিয়ে মা ঘরে ঢুকতেই সে প্রণাম করে সত্যিকার বিস্ময় নিয়েই বলে, 'তুমি! তুমি আসবে ভাবতেই পারিনি!'

ইলু কৃত্রিম অভিমানের সুরে বলে, 'আর আমি যে এসেছি তা বুঝি দেখতেই পাচ্ছ না!'

'খুব পেয়েছি!' বলে ইলুকে আদর করে কাছে টানবার পরই তার বিপদ শুরু হয়।

ইলু হেসে জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি বুঝি অফিস পালিয়েছ দাদা?'

'হ্যাঁ রে!' মা-ও সেই সঙ্গে যোগ দেন, 'তুই যে এত তাড়াতাড়ি অফিস থেকে আসবি ভাবিনি। অফিস ছুটি হয়ে গেল বুঝি!'

'অফিস, হ্যাঁ—অফিস মানে,' প্রদীপ এবার রীতিমতো বিব্রত হয়ে যখন কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না তখন নীলাই তার সাহায্যে এগিয়ে আসবে সে সত্যিই আশা করেনি।

প্রদীপের মুখের অবস্থাটা আড়চোখে দেখে নিয়ে নীলা প্রদীপকে উদ্ধার করে বলে, 'হ্যাঁ, আজ আপনাদের কোম্পানির কোন ডিরেক্টর মারা গেছেন না? আগেই তো বলেছিলেন আজ সকাল-সকাল ছুটি হতে পাবে।'

'ও হ্যাঁ।' নীলার দিকে কৃতজ্ঞভাবে চেয়ে প্রদীপ বলে, 'ছুটি তাই একটু আগেই হয়ে গেল।'

অস্বস্তিকর প্রসঙ্গটা পালটাবার জন্যে তাড়াতাড়ি সে আবার বলে, 'কিন্তু তুমি যে আজ আসবে খবর দাওনি তো মা।'

'খবর আর কী দেব বাবা!' মা স্নিগ্ধ স্বরে বলেন, 'তোর চাকরি হওয়ার জন্যে কালিঘাটে মানত করেছিলাম। হঠাৎ সুবিধে হয়ে গেল। তাই একবেলার জন্যে সরকারমশাইকে নিয়ে চলে এলাম।'

ইলু ইতিমধ্যে ঘুরে-ঘুরে ঘরের চারদিক দেখছে। সে মা'র দিকে ফিরে অভিযোগের ভান করে বলে, 'দেখছ মা! দাদা এখানেও ছবি আঁকা কিন্তু ছাড়েনি। কত নতুন ছবি এঁকেছে দেখেছ!'

শেষ কথাটায় অভিযোগের বদলে দাদার জন্যে গর্বটাই ফুটে ওঠে।

মা-ও সেই গর্ব মেশানো ঈষৎ অভিযোগ জানান, 'ওই তো নেশা।'

তারপরই সস্নেহে নীলাকেই যেন সাক্ষী করে শুনিয়ে বলেন, 'তা আঁকুক, আঁকুক! চাকরি-বাকরি করে যত খুশি ছবি আঁকুক না, দোষ কী! কিন্তু ওর যে বড় বেয়াড়া জেদ ছিল! কাজকর্ম কিছু না করে শুধু ছবি-ই আঁকবে। আমাদের গেরস্থ ঘরে তাতে চলে? এ চাকরি তো কত আগে নিতে পারত! ওর বাবার পুরোনো অফিস। শুধু জামানতের টাকাটা দিলেই চাকরি। তা এতদিন কি রাজি হয়েছে! কতকষ্টে এইবার সে জেদ ছাড়িয়েছি।'

প্রদীপের দিকে ফিরে এবার তিনি বলেন, 'কিন্তু ছবি আঁকার নেশায় অফিসের কাজে ঢিলে দিসনি যেন! সবে নতুন চাকরি। তা এসব ছবি আঁকিস কখন?'

'ছবি, মানে ছবি তো...'

আবার প্রদীপ বিপন্ন।

এবারও নীলা তার সহায় হয়। বলে, 'অফিস থেকে ফিরে কত রাত পর্যন্ত তো ছবি আঁকেন! আমরা কত করে বলি যে অফিসের এই খাটুনির পর...'

নীলাকে কথাটা আর শেষ করতে হয় না। মা তাকে সমর্থন করে বলেন, 'ঠিক বলেছ মা। অফিসের খাটুনির পর অমন রাত জাগলে শরীর খারাপ হবে না? না, না, ওসব আর চলবে না। ছুটিছাটায় ছাড়া ছবি আঁকা এখন থেকে বন্ধ।'

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় মা প্রসঙ্গ বদলে বলেন, 'আচ্ছা দীপু, তুই তো এতদিনে দুটি মাত্র চিঠি দিয়েছিস, তাতেও এঁদের কথা তো কিছু লিখিসনি। পুরো একটা বাসা পেয়ে যেন একলা আছিস এইরকম তো লিখেছিলি।'

'ও। এঁদের কথা লিখিনি বুঝি।' প্রদীপকে একটা জুতসই কৈফিয়ত খুঁজতে হিমশিম খেতে হয়।

নীলাই আবার এগিয়ে আসে তার সাহায্যে। বলে, 'দেখুন, সেটা ঠিক ওঁর দোষ নয়। আমাদের অনেক আগেই চলে যাওয়ার কথা ছিল কিনা। বাড়ি কোথাও পাচ্ছি না বলে এখনও ওঁর ওপর জুলুম করছি।'

'না, না, জুলুম কীসের?' মা আন্তরিক প্রতিবাদ জানান, 'তোমরা আছো জেনে আমি তবু নিশ্চিন্ত হলাম। ওই তো ছেলের বুদ্ধিশুদ্ধি! একা একটা বাসা সামলানো কি ওর কাজ! আমারও হয়েছে মুশকিল। এখানে এসে যে বেশিদিন থাকব তার উপায় নেই। বিষয়-আশয় তাহলে পাঁচভূতে লুটে খাবে!'

মা'র কথা শেষ হওয়ার আগেই পাশের ঘরে সুরেশের গলা শোনা যায়।

'মধু! মধু! নীলু! সব এরা গেল কোথায়?'

সুরেশ খোঁজ করতে এ-ঘরের দরজায় এসে একবার উঁকি দেয়। নীলা ও প্রদীপের সঙ্গে অপরিচিতদের দেখে একটু অপ্রস্তুতভাবে বলে, 'ও, তুই এখানে!'

তাবপর চলে যাওয়ার চেষ্টা করতেই নীলা ইচ্ছে করেই ডেকে বলে, 'দাঁড়াও না দাদা! যাচ্ছ কেন? এই ইনি প্রদীপবাবুর মা, আর এইটি ছোট বোন।'

সুরেশ হাত তুলে নমস্কার জানায়, কিন্তু তার মুখের হতভম্ব ভাবটুকু দেখবার মতো।

'অ্যাঁ? মা!' বিস্ময়টা সে সশব্দে প্রকাশ করেও ফেলে।

দাদার অবস্থাটা উপভোগ করে আড়চোখে একবার প্রদীপের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে নীলা বলে, 'হ্যাঁ, ওঁরা হঠাৎ কালী-দর্শনে এসেছেন বলে খবর আর দিতে পারেননি।'

সুরেশের বিমূঢ়তা তখনও কাটেনি। সে দুবার ঢোক গিলে বলে, 'ওঃ, তাই—মানে খবরটা আমরাও আবার ঠিক...'

কথাটা সে শেষ করতে পারত কি না সন্দেহ। প্রদীপের মা তাকে সে দায় থেকে রেহাই দিয়ে স্নিগ্ধ স্বরে বলেন, 'হ্যাঁ বাবা, খবর দেওয়ার সময়ই ছিল না।'

'ওঃ, তা তো বটেই, আমরা মানে ভেবেছিলাম...'

দাদার ভাবনাটাকে আর ব্যক্ত হওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত নয় বলে নীলা তাড়াতাড়ি অন্য কথা পাড়ে এবার। বলে, 'জানো দাদা, প্রদীপবাবুর মা আমাদের বাড়ি না ছাড়তে বলছেন।'

'অ্যাঁ, ও, হ্যাঁ, ঠিক-ঠিক!' সুরেশ নিজেকে এতক্ষণে কিছুটা সামলায়, 'কী বলে, আমরাই কি আর সহজে বাড়ি ছাড়তে চাই!'

সুরেশের অসংলগ্ন কথাগুলোয় একটু অবাক হলেও নিজের মতো মানে করে নিয়ে প্রদীপের মা সাগ্রহে বলেন, 'ছাড়বে কেন বাবা! আমি তো চাই যে তোমরা থাকো।'

'থাকব? থাকব বলছেন?' এবার সুরেশ উৎসাহিত, 'আপনি যখন বলছেন, তখন নিশ্চয়ই থাকব। শুধু ওই মানে—খুড়োমশাই—মানে সে আপনি ভাববেন না। আচ্ছা আমি আসি।'

কথার মাঝখানেই নীলার চোখের ইঙ্গিত পেয়েই বোধহয় সুরেশ আর সেখানে দাঁড়ায় না।

সে চলে যাওয়ার পরে মা খুশি হয়ে মন্তব্য করেন নীলার দিকে চেয়ে, 'তোমার দাদাটি কিন্তু বেশ। ভারি সরল।'

নীলু একবার প্রদীপের দিকে চেয়ে একটু কেমন অসংলগ্নভাবেই বলে, 'হ্যাঁ, যে যা বলে তাই বিশ্বাস করে।'

প্রদীপের মা ও বোন ইলা সারাদিন এই বাসাতেই কাটিয়ে সন্ধ্যায় গ্রামের বাড়িতে ফেরবার জন্য রওনা হয়েছেন। প্রদীপ স্টেশনে গেছে তাঁদের ট্রেনে তুলে দিতে।

সামান্য কয়েক ঘণ্টা মাত্র মা এখানে কাটিয়েছেন, কিন্তু বড় ভালো লেগেছে তাঁর। বাসাটি তাঁর পছন্দ হয়েছে সেই সঙ্গে নীলার ব্যবহারেও তিনি অত্যন্ত খুশি হয়েছেন।

যতক্ষণ এখানে ছিলেন মা নীলার সঙ্গেই গল্প করেছেন। গল্প অবশ্য তাঁর সংসার আর প্রদীপের কথা নিয়ে। মা স্নেহেব উচ্ছ্বাসে যা বলে গেছেন তা শুনে প্রদীপের ছেলেবেলা থেকে এখন পর্যন্ত মোটামুটি কোনওকথাই বুঝি নীলার জানতে বাকি নেই।

যাওয়ার সময় নীলা আগের সঙ্কোচ ত্যাগ করে পায়ের ধুলো নিয়ে মাকে প্রণাম করতে মা তাকে সস্নেহে জড়িয়ে ধরে আদর করে আশীর্বাদ কবেছেন, 'রাজরানি হও মা। চির এয়োতি হও।'

প্রদীপ একটু চিমটি কাটবার লোভ সামলাতে পারেনি। হেসে বলেছে, 'আশীর্বাদটা কি তেমন জুতসই হল মা? আজকাল বাজ-রাজড়ার দিন ফুরিয়েছে। তার চেয়ে যদি বলতে মিনিস্টারনি হও তাহলে আশীর্বাদের মতো আশীর্বাদ হতো।'

'তুই থাম তো!' মা স্নেহের স্বরে ধমক দেওয়ার ভান করেছেন, 'রাজা কি শুধু রাজত্ব থাকলেই হয়। মানুষের মতো যে মানুষ সেই সত্যিকার রাজা।'

'ওঃ' প্রদীপ হেসে বলেছে, 'তুমি যে অভিধান পালটে দিয়েছ তা কী করে জানব!'

প্রদীপের মা ও বোন চলে যাওয়ার সময় যাকে বেশ হাসিখুশি দেখা গেছল সেই নীলা তারপরই কিন্তু কেমন একটু যেন গম্ভীর হয়ে যায়।

এই গাম্ভীর্যের কারণটা প্রকাশ পায় প্রদীপ ফিরে আসবার পর।

নীলা তখন বৃষ্টি আসছে দেখে প্রদীপের ঘরের জানালাগুলো বন্ধ করতে এসেছিল।

জানালা বন্ধ করে চলে যাওয়ার সময়ই প্রদীপ হাসিমুখে ঘরে এসে ঢোকে।

'কী! মাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে এলেন!' নীলা বোধহয় কথার কথা হিসেবেই জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু নিজের খুশিতেই ভরপুর না থাকলে তার গলার সুরের ঈষৎ কাঠিন্য প্রদীপের কানে বাজত।

'হ্যাঁ', প্রদীপ খুশিমনে জানায়, 'ভাগ্যক্রমে একটু ফাঁকা কামরাতেই বসাতে পেরেছি। মা আমার বড় হিসেবি তো! কিছুতেই ফার্স্টক্লাসে যাবেন না।'

এসব কথা যেন অগ্রাহ্য করে নীলা আবার বলে, 'নিশ্চিন্ত হলেন বোধহয় গাড়ি ছাড়বার পর...'

এবারও প্রশ্ন ও গলার স্বরের অস্বাভাবিকতাটা প্রদীপ লক্ষ করে না। সরলভাবেই বলে, 'হ্যাঁ, একটু হয়েছি। তবে তার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। আপনার কাছে আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ।'

'কৃতজ্ঞ কেন? ও, আপনার ফাঁকি ধরিয়ে দিইনি বলে। মাকে ঠকাতে আপনাকে সাহায্য করেছি বলে,—'

'ঠকাতে সাহায্য?' প্রদীপ একটু বিমূঢ়ই হয়।

'যা করেছি, তার আসল নাম তো ওই!'

এবার নীলার গলার স্বরের কাঠিন্যটা প্রদীপ লক্ষ না করে পারে না। একটু অবাক হলেও নীলার ক্ষোভের কারণটা অনুমান করে সে বোঝাবার চেষ্টা করে। একটু হেসে অনুনয়ের সুরে বলে, 'দেখুন, আপনি যদি সব কথা শোনেন—'

'কোনও কিছু শোনবার আমার দরকার নেই!' তিক্তকণ্ঠে নীলা বাধা দিয়ে বলে, 'আপনার কাছে এই মিথ্যা প্রবঞ্চনা হয়তো কিছুই নয়, আপনার মা'র সরল বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তাঁকে এভাবে ভুল বোঝাতে কী যন্ত্রণা যে আমি পেয়েছি কী গ্লানি যে আমার হচ্ছে তা আপনি বুঝতেও পারবেন না।'

শুনতে-শুনতে প্রদীপেব মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে। নীলার কথা শেষ হতেই সে আহত স্বরে বলে, 'থামলেন কেন? বলুন। বলে যান আরও। গায়ের ঝাল মিটিয়ে যা কিছু মনে আসে বলে ফেলুন।'

প্রদীপেব প্রতিক্রিয়ায় নীলা বুঝি একটু দ্বিধান্বিত হয় প্রথমে। তবু অন্যায় বলে যা মনে করে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদটা না জানিয়েও পারে না। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে, 'আমার কথাগুলো গায়ের ঝাল-মেটানো বলে আপনার মনে হচ্ছে? কী আপনি করেছেন আপনি নিজে বুঝতে পারছেন না? আমাদের কাছে মিথ্যে পরিচয় দিয়েছেন তাতে কিছু আসে যায় না কারণ আমরা আপনার কেউ নই। কিন্তু নিজের মার চোখে এমনি করে ধুলো দিতে একটু আপনার দ্বিধা হল না? আপনার সেই প্রবঞ্চনায় সাহায্য করেছি বলে আবার আমায় ধন্যবাদ দিচ্ছেন!'

'ধন্যবাদ আমার ফিরিয়ে নিচ্ছি।'—প্রদীপ লজ্জিত হওয়ার বদলে যেন আরও কঠিন হয়ে ওঠে, 'কিন্তু প্রবঞ্চনায় সাহায্য করতে আমি তো আপনাকে সাধিনি। সুযোগ তো স্পষ্টই পেয়েছিলেন। কেন, সব সত্য কথা জানিয়ে দিয়ে মা'র ভুল ভেঙে দেননি? কেন আমার মিথ্যাটাতেই সমর্থন করেছেন?'

'কেন? কেন জিজ্ঞাসা করছেন?' নীলার স্বর আহত বিস্ময়ে তীব্র হয়ে ওঠে।

'হ্যাঁ, করছি।' প্রদীপের কণ্ঠেও জ্বালা, 'নিজেই এইমাত্র বলেছেন যে আপনারা আমার কেউ নয়। তাহলে আমার জন্যে এত সহানুভূতির তো কোনও দরকার ছিল না!'

'সহানুভূতি আপনার জন্য নয়, আপনার মা'র জন্যে!' নীলা কঠোর কণ্ঠে বলে, 'তাঁর এত বড় স্বপ্নভঙ্গ চোখের সামনে দেখতে মন চায়নি বলেই আপনার মিথ্যায় সায় দিয়ে গেছি।'

'ওঃ, এত নরম দরদি যে আপনার মন তা-ও জানতাম না!' প্রদীপের স্বর এবার বিদ্রূপতিক্ত, 'কিন্তু মা'র জন্যেও এতটা দরদ বাজে খরচ না করলেও পারতেন। আমাদের

বোঝাপড়া আপনার সাহায্য ছাড়াই বোধহয় হতে পারত!'

প্রদীপ এতখানি নির্মম অন্যায় আঘাত দিতে পারে নীলা কল্পনা করতে পারেনি। অপমানে, ক্ষোভে তাব চোখে জল আসে। রুদ্ধকণ্ঠে, 'আমারই অন্যায় হয়েছে, আমি মাপ চাইছি', বলে দ্রুতপদে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। আর প্রদীপ স্তব্ধ হয়ে বসে পড়ে তার বিছানাটার ওপর। ক্ষুব্ধ উত্তেজনার মাথায় কী সে বলেছে এতক্ষণে যেন প্রথম সে উপলব্ধি করে। গ্লানিতে, অনুশোচনায় জর্জরিত হয়ে ওঠে তার মন।

চোখে আঁচল চেপে নীলা সোজা তার ওপরের ঘরে উঠে গিয়েছিল। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বিছানার ওপর শুয়ে পড়ে রাগ ও অভিমানের কান্না সে আর দমন করতে পারে না। মুখ গুঁজে-ধরা বালিশটা তার চোখের জলে ভিজে যায়।

বেশ কিছুক্ষণ কাঁদবার পর নিজেকেই সে ধিক্কার দেয় সবচেয়ে বেশি। এ অপমান সে তো নিজেই যেচে নিয়েছে! দুদিনের চেনা বাইরের একজনের জন্যে গায়ে পড়ে এমন হিতৈষী হতে সে গেছল কেন? প্রদীপের মা তাঁর ছেলের কপটতায় আঘাত পেলেন কি না পেলেন সেজন্য তার মাথাব্যথা কীসের? সত্যিই এ অপমান লাঞ্ছনা তার প্রাপ্য ছিল। প্রদীপ ভালো করেই তাকে অনধিকার চর্চার পরিণাম বুঝিয়ে দিয়েছে।

বালিশ থেকে মুখ তুলে নীলা এবার উঠে বসেই হঠাৎ দরজাব দিকে চোখ পড়ায় চমকে ওঠে।

প্রদীপ নিঃশব্দে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। ভেজানো দরজার একটা পাল্লা ঠেলে কখন সে যে সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে নীলা টের পায়নি। প্রদীপ নিশ্চয়ই তাকে বিছানায় লুটিয়ে কাঁদতে দেখেছে ভাবতেই লজ্জা ও অস্বস্তির তার সীমা থাকে না। সেই সঙ্গে প্রদীপের এই অন্যায় সুযোগ নেওয়ায় মুখটা কঠিনও হয়ে ওঠে রাগে ও অভিমানে।

রূঢ় একটা কিছু বলে প্রদীপকে এখন বিদায় কবে দিতেই তার ইচ্ছে করে। কিন্তু বলবার কথা যেন কিছু খুঁজে পায় না।

প্রদীপই প্রথম গাঢ় ব্যথিত কণ্ঠে বলে, 'আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি বলাই আমার উচিত। কিন্তু সেজন্যে সত্যিই আমি আসিনি।'

'যে জন্যেই এসে থাকুন।' নীলা এবার শুষ্ক স্বরে বলে, 'আপনার আর কোনও কথা শোনবার ইচ্ছে বা সময় আমার নেই। অনুগ্রহ করে আপনি যান।'

'না।' প্রদীপের কণ্ঠ ব্যথিত হলেও দৃঢ়, 'অনেক জুলুমই আপনাদের ওপর এ পর্যন্ত করেছি। এখন যা করছি এইটেই শেষ জুলুম মনে করতে পারেন। নিজের কয়েকটা কথা তোমায় না জানিয়ে আমি যাব না।'

'কিন্তু সে-কথা আমার জানবার কী দরকার!' নীলা ক্লান্ত, তিক্তস্বরে বলে, 'আমরা আপনার কেউ নই, তবু নির্লজ্জের মতো গায়ে পড়ে আপনার হিতৈষী হতে গেছি বলে উচিত শিক্ষাই তো আমায় দিয়েছেন। আর কিছু এরপর তো বলবার নেই।'

'আছে।' প্রদীপের স্বর আত্মগ্লানিতে তীব্র হয়ে ওঠে, 'আমি মিথ্যেবাদী, ভণ্ড, নিজের মাকে আমি ঠকাই এইটুকুই শুধু জেনেছ। আমি যে একটা দাম্ভিক, নির্বোধ, অপদার্থ এই কথাটাও তোমার জানা দরকার।'

প্রদীপের ঠিক এই ধরনের আত্মধিক্কার নীলা আশা করেনি। আবেগে, উত্তেজনায় আপনি যে একেবারে তুমি হয়ে গেছে তাও তার দৃষ্টি এড়ায় না। কেমন একটু অস্বস্তিবোধ করলেও নিজের আগের মনোভাবটাই সে ধরে রাখবার চেষ্টা করে বলে, 'না, না, নিজেকে

আপনি যা-ই বলুন, তা আমায় শুনিয়ে লাভ কী?'

'লাভ হয়তো কিছুই নেই', প্রদীপের গলায় তিক্ত হতাশার আত্মবিদ্রূপের সুর, 'তবু নিজের কথা কারুর কাছে না বলতে পারলে যেন আমার শান্তি নেই। ভুল করেও যে একবার সহানুভূতি দেখিয়েছে তার চেয়ে সে কথা শোনাবার যোগ্য লোক আর কোথায় পাব?'

একটু থেমে প্রদীপ আবার বলতে থাকে, 'শুনুন, নিজের সম্বন্ধে মস্ত বড় একটা ধারণা আমার ছিল। সেই ধারণা সত্য করে তোলবার জন্যে মাকে মিথ্যে বলতেও আমার বাধেনি। ভেবেছিলাম নিজের বাহাদুরিতে সবাইকে একদিন তাক লাগিয়ে দেব। তখন ছেলের কীর্তিতে তার সব অপরাধ মা ক্ষমা করবেন।'

অপমানের সব জ্বালা মুছে গিয়ে কঠিন বিরূপতা কখন গলে উৎসুক সহানুভূতি হয়ে উঠেছে নীলা বুঝি বুঝতেও পারেনি। প্রায় কোমল স্বরেই সে জিজ্ঞাসা করে, 'কীর্তি কীসের? ছবি আঁকার?'

'হ্যাঁ', প্রদীপ যেন নিজেকে আসামী করেই বলে যায়, 'জাত ছবি-আঁকিয়ে যাকে বলে তা আমি হতে চাইনি। আমি পেশাদার আঁকিয়ে হতে চেয়েছিলাম। যাকে কমার্শিয়াল আর্ট বলে সেই জাতের ছবিতে একদিন আমার কাজ বাজারে সাড়া তুলবে, এই ছিল আমার স্বপ্ন। চাকরির জামানত নিয়ে তাই আমি ভাগ্যের সঙ্গে জুয়া খেলেছি। মাকে ঠকিয়েছি, আপনাদের কাছে যা নই তাই সেজেছি। কিন্তু শেষপর্যন্ত ভাগ্য আমায় বুঝিয়ে দিয়েছে যে, যত স্বপ্নই দেখুক আরশোলা কখনও পাখি হয় না। এতদিন শহরের কোথাও চেষ্টা করতে বাকি রাখিনি। তবু কোথাও কেউ আমল দেয়নি। আমার ছবি কেউ দেখতেই চায় না। নেহাত মুখের তোড় না থাকলে বোধহয় ঘাড়ধাক্কাই খেতাম সব জায়গায়।'

'উলটোটাও তো হতে পারে।' নীলার মুখ এখন ঈষৎ কৌতুক মিশ্রিত সহানুভূতিতে স্নিগ্ধ।

'তার মানে?' প্রদীপ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করে।

'মানে, আপনি যাকে মুখের তোড় বলেন, তাইতেই হয়তো আপনার আসল গুণ লোকের চোখে দোষ হয়ে দাঁড়ায়।'

'না, মিথ্যে সান্ত্বনা আর দেবেন না।' প্রদীপ দুঃখের হাসি হাসে, 'আসল গুণ আমার কিছু নেই আমি বুঝেছি। তবু, শুধু আপনার ক্ষমা নয়, সহানুভূতিটুকুও যে আবার পেয়েছি, চলে যাওয়ার আগে এইটে সবচেয়ে বড় লাভ বলে জেনে গেলাম।'

'জেনে গেলেন!'

নীলার চোখে একটু বিস্মিত বেদনার ছায়া কি দেখা দেয়? সেটা সরিয়ে ফেলার চেষ্টায় সে জিজ্ঞাসা করে, 'এখন তাহলে চাকরিই করবেন বলে ঠিক করলেন?'

'চাকরি!' প্রদীপ বিষণ্ণভাবে হাসে, 'পারলে তাই করতাম। কিন্তু যে চাকরির নামে মা'র কাছে টাকা নিয়ে এসেছিলাম তার পথ তো ঘুচিয়েছি। অন্য চাকরি এখানে আমায় দেবে কে? ছবির নেশায় এসে যে টাকা নষ্ট করেছি তা তো আর মা'র কাছে চাইতে পারব না। সুতরাং নিজের লজ্জা ঢাকতে আর কোথাও আমায় চলে যেতে হবে দু-চার দিনের মধ্যে। আচ্ছা চলি এখন।'

প্রদীপ সত্যিই চলে যায়।

নীলা কেমন উদাস হয়ে বসে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর দেয়ালে একটা ক্যালেন্ডারের ছবির দিকে চোখ পড়ায় হঠাৎ তার মুখের ভাব বদলাতে থাকে। চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে

ওঠার সঙ্গে মুখে যেন একটু হাসি ফুটে ওঠে। একটা কিছু মতলব যে তার মাথায় এসেছে তার চোখমুখের ভাব-ভঙ্গিতে তা স্পষ্ট।

পরের দিন সকালের দিকে ডাঃ বনবিহারী ঘোষের বাড়িতে ফোনটা বাজছিল। ডাঃ ঘোষ তখন ঘরে নেই। তাঁর চাকর নিবারণ এসে ফোনটা ধরল।

ফোন কানে দিয়েই হাসি ফুটে উঠল নিবারণের মুখে।

'কে দাদাবাবু? আজ্ঞে হ্যাঁ আমি নিবারণ। একটু ধরুন আমি ডেকে দিচ্ছি।'

ফোনটা রাখতে না রাখতেই ডাঃ ঘোষ এসে ঘরে ঢুকলেন। নিবারণের মুখটা তখন শুকিয়ে গেছে। এ-বাড়ির নাড়ি-নক্ষত্র তার জানা। সে তাড়াতাড়ি সরে যাওয়ার চেষ্টা করলে।

কিন্তু যাওয়া হল না। ডাঃ ঘোষের কাছে রেহাই নেই। ডাঃ ঘোষ ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে ফোন করছে? কাকে ডাকছে? আমায়?'

প্রথমটার বদলে দ্বিতীয় প্রশ্নটারই জবাব দিয়ে নিবারণ বিপদটা এড়াবার চেষ্টা করলে। বললে, 'আজ্ঞে আপনাকে নয়, মাকে ডাকছেন!'

বিপদ তবু কাটল না। ডাঃ ঘোষ 'হুঁ' বলে একটু নাসিকাধ্বনি করে আবার সেই প্রথম প্রশ্নেই ফিরে গেলেন, 'কিন্তু ডাকছে কে?'

'আজ্ঞে!' নিবারণ থতমত খেয়ে মাথা চুলকে গাঁইগুঁই করল, 'ওই অ্যাঁ—'

'ওই অ্যাঁ কী!' ডাঃ ঘোষ ধমক দিলেন, 'ওই অ্যাঁ কারুর নাম হতে পারে না। হলেও তার বাংলা জানবার কথা নয়; যে ডাকছে তার নাম কী?'

'আজ্ঞে', নিরুপায় হয়ে নিবারণকে বলতে হল, 'ডাকছেন মানে দাদাবাবু।'

'ওঃ সুরো!' ডাঃ ঘোষের নাসিকা বিস্ফারিত হয়ে উঠল, 'লুকিয়ে-লুকিয়ে কাকিমাকে ডাকা হচ্ছে।'

ঘোষ এগিয়ে এসে ফোনটা ধরলেন। অন্য দিক থেকে শোনা গেল, 'কে কাকিমা?'

'না, আমি কাকাবাবু!' বজ্রগম্ভীর স্বরে জানালেন ডাঃ ঘোষ।

এই আওয়াজের দরকার ছিল না। গলার স্বর শুনেই ওদিকের ফোনে সুরেশের অবস্থা কাহিল। জেদ করে বোনের সঙ্গে বাড়ি ছেড়ে এলেও ফোনে কাকিমার সঙ্গে লুকিয়ে যোগাযোগটা ভাই-বোন দুজনেই রাখে। আজ একেবারে অতর্কিতে বাঘের মুখে পড়ে যাবে সুরেশ ভাবতে পারেনি।

বার কয়েক ঢোক গিলে আমতা-আমতা করে সে বললে, 'ও আপনি! কাকাবাবু? কী বলে, ভালো আছেন কাকাবাবু?'

জবাবে আবার ডাঃ ঘোষ গর্জন করে উঠলেন, 'ইডিয়টিক প্রশ্ন কোরো না। আমি ভালো থাকব না তো কি খারাপ থাকব? আমি সব সময় ভালো থাকি। তুমিও নিশ্চয়ই ভালো আছো?'

'আজ্ঞে, আজ্ঞে হ্যাঁ', সুরেশ কোনরকমে ফোনটা ছাড়তে পারলে বাঁচে মনে হল, 'খুব ভালো আছি। মানে আমার জ্বর সেরে গেছে।'

'জানতাম!' ঘোষ সেই ধমকের স্বরে বললেন, 'জ্বর ছেড়ে যেতে বাধ্য। যাতে ছাড়ে সেই ওষুধই দিয়েছি। তা-না হলে তোমরা জুলাই-এ বাড়ি ছাড়বে কী করে। মনে আছে তো তেসরা জুলাই?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ কাকাবাবু!' সুরেশ যেন সুসংবাদ শুনে বাধিত হয়ে জানাল, 'খুব মনে

আছে।'

নিষ্কৃতি পেয়েছে ভেবে ফোনটা সে বুঝি নামিয়ে রাখতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই আবার কড়া গলায় জেরা হল, 'কাকিমাকে ডাকছিলে কেন?'

'না, এই মানে', সুরেশ বেশ বিব্রত, 'মানে অনেক দিন দেখা হয়নি কি না।'

'দ্যাটস ইয়োর ফল্ট।' ঘোষের আবার ধমক, 'কিন্তু কাকুতি-মিনতি করে কোনও লাভ হবে না।'

'আজ্ঞে না কাকাবাবু।' সুরেশ সকাতরে জানাল, 'কাকিমাকে সেজন্যে ডাকছিলাম না।'

কিন্তু এগুলেও যা অবস্থা পিছোলেও তাই।

'ওঃ সেজন্যে নয়!' ডাঃ ঘোষ ক্ষিপ্ত হলেন। 'তা কাকিমাকে কাকুতি-মিনতি করবে কেন? তা করলে তো মানুষই হতে। শোনো, আমার কথার কোনও নড়চড় হবে না। তবু তোমাদের ওই শকুনি মামার খপ্পর থেকে বাঁচবার একটা শেষ সুযোগ দিয়েছি। চিঠি পেয়েছ আমার?'

'চিঠি!' সুরেশ এবার বিমূঢ়, 'আজ্ঞে না তো।'

'তাহলে আজকেই পাবে। মনে রেখো এই তোমাদের লাস্ট চান্স!' বলে ডাঃ ঘোষ সশব্দে ফোন নামিয়ে রাখলেন।

নিবারণ ইতিমধ্যে রান্নাঘরে গিয়ে বুঝি বিনতা দেবীকে ফোন সঙ্কটের খবর জানিয়েছে। তিনি কোনওবকমে হাতের কাজটা সেরে ছুটে এসে ঘোষকে ফোন নামাতে দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'ওকি ফোন নামিয়ে দিলে কেন? সুবো ফোন করছিল না?'

'হ্যাঁ করছিল।' ডাঃ ঘোষের গজরানি শোনা গেল, 'যা বলবার তাকে বলে দিয়েছি।'

'বলে দিয়েছ!' এবার বিনতা দেবীর গলা ঝাঁঝালো, 'তুমি বললেই হল?'

'নিশ্চয়ই।' ঘোষ অটল, 'বলবার আর কিছু নেই।'

'তোমাব নেই বলে আমাবও থাকতে পারে না?' বিনতা দেবী প্রতিবাদ করলেন। 'পরীক্ষার কথা জিগ্যেস কবেছ?'

'পরীক্ষা! কার পরীক্ষা?' ঘোষের ভ্রু কুঞ্চিত হয়ে উঠল।

'আহা কিছু যেন জানো না!' বিনতা দেবী ঝঙ্কার দিলেন, 'নীলু পরীক্ষা দিচ্ছে না? মেয়েটা এই পরীক্ষার জন্যেই এত কষ্ট করল।'

'কষ্ট করল তো আমাদের কী!' ঘোষ কথার মধ্যে বাধা দিয়ে গর্জে উঠলেন, 'পরীক্ষা দিয়ে আমাদের চোদ্দোপুরুষ উদ্ধার করেছে বোধহয়! হাজারবার না মানা করেছিলাম পরীক্ষাটরিক্ষা দেওয়ার দরকার নেই।'

'তোমার সেই মানা করাটাই তো অন্যায়!'

বিনতা দেবীর এই কথাতেই আগুনে যেন ঘি পড়ল। ডাঃ ঘোষ জ্বলে উঠে বললেন, 'অন্যায়! তুমি পর্যন্ত বলছ অন্যায়?'

'হ্যাঁ বলছি!' বিনতা দেবী শক্ত হয়েই জানালেন, 'তুমি চাইলেই তো আর গৌরী-দান করতে পারবে না।'

'গৌরীদান করতে চাইছে কে?' ডাঃ ঘোষের গলায় এবার কোণঠাসা হওয়ার ক্ষোভ। কিন্তু ওই কলেজি ডিগ্রির জন্যে সব জলাঞ্জলি দেওয়ার মানে আছে? এসব হুজুগ, বুঝেছ— আধুনিক হুজুগ। আর ওই রায়ই সব নষ্টের মূল।'

'ঠাকুরপোর কী দোষ হল?' বিনতা দেবী প্রতিবাদ করলেন।

'ওর দোষ নয়তো কার?' ঘোষ আবার সপ্তমে, 'ওর আস্কারা না পেলে ছেলেমেয়ে দুটো এত সাহস পায়? নিজে একটা লক্ষ্মীছাড়া বাউন্ডুলে। ভাগনে-ভাগনি দুটোকেও তাই করে তুলবে। তবে আমিও বনবিহারী ঘোষ। ওকে জব্দ যদি না করতে পারি তো এ নাম পালটে দেব।'

এবার বুঝি বিনতা দেবীর মুখে একটু হাসি দেখা দিল। খোঁচা দিয়ে বললেন, 'কিন্তু ঠাকুরপোকে জব্দ করতে গিয়ে নিজের ভাইপো-ভাইঝিকে যে জব্দ করছ! বাড়িছাড়া হয়ে ওরা যাবে কোথায়!'

'সেইটেই তো দেখতে চাই!' এবার ঘোষের গর্জনটা কেমন যেন একটু ফাঁপা। তবু গোঁ ছাড়বার পাত্র তিনি নন। একটু এলোমেলো ভাবেই তিনি বলে গেলেন, 'বাছাধনরা একটু বুঝুক এবার কত ধানে কত চাল। জানো, শুধু ওই শকুনি মামা নয়। কোথা থেকে আবাব সব বন্ধু জুটিয়েছে হতভাগারা। কোথাকার উটকো চ্যাংড়া এক ছোকরা। কত বড় আস্পর্ধা তার জানো? আমায় ভিজিট দেয়। সুরোকে চিকিচ্ছের জন্যে ডাঁট দেখিয়ে বত্রিশ টাকা ভিজিট আমার নাকের ওপর ধরে দিলে। হুঁ!'

শেষ নাসিকাধ্বনিটা দরজা পেরিয়ে সিঁড়ির মাথা থেকে শোনা গেল। ডাঃ ঘোষ স্ত্রীর সঙ্গে এসব আলোচনা বেশিক্ষণ চালাতে কেমন অস্বস্তি বোধ করেন।

ডাঃ ঘোষের নাকের ওপর তেজ দেখিয়ে যে ভিজিট ধরে দিয়েছিল সেই প্রদীপকে ঠিক সেই মুহূর্তে দেখলে নিতান্ত নিস্তেজ বলেই মনে হবে।

এ বাসা ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে সে তখন নিজের জিনিসপত্র গোছাবার ব্যবস্থা করছে।

মধুই তার বাঁধাছাঁদায় সাহায্য করছিল। প্রদীপের আঁকা ছবিগুলো গোছাতে গিয়ে সে বেশ বিব্রত। ছবি তো নেহাত কম নয়। প্রদীপ আগে যা এনেছিল তার ওপর এখানে এসে আরও যথেষ্ট এঁকেছে।

সেগুলোর কী ব্যবস্থা করবে ভেবে না পেয়ে মধু জিজ্ঞাসা করে, 'এগুলো কেমন করে নেবেন বাবু?

প্রদীপ ছবিগুলোর দিকে খানিক চেয়ে থেকে সঙ্কল্প স্থির করে বলে, 'এগুলো এখানেই থাকবে।'

'আজ্ঞে এখানে?' মধু কথাটা ঠিক বুঝতে পারে না।

'হ্যাঁ এখানে। তোমাদের চুলো ধরাবার কাজে কাগজ তো লাগে। ওইগুলো দিয়েই উনুন ধরিও।' প্রদীপ নিজেকেই যেন শাস্তি দেয় তিক্তস্বরে।

'ছবিগুলো তাহলে রেখে যাচ্ছেন?'

প্রদীপ ফিরে তাকিয়ে দেখে নীলা দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। সাজপোশাকের ঘটা যেন আজ একটু বেশি। নীলাকে বাইরে বেরুবার জন্যে এরকম পোশাকে সে কখনও দেখেনি। বিরসভাবে একটু হেসে প্রদীপ বলে, 'হ্যাঁ, এসব জঞ্জাল আর সঙ্গে নিয়ে কী হবে?'

'তা, জঞ্জালগুলো এতদিন যখন জমাতে পেরেছেন তখন আরও দুদিন না হয় থাক না!' কৌতুকের সুরে বলে নীলা মধুকে চলে যাওয়ার ইঙ্গিত করে।

মধু চলে যাওয়ার পর নীলা হাতের-ব্যাগ খুলে একটা কাগজের কাটা টুকরো বার করে প্রদীপের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, 'দেখেছেন এটা?'

কাগজের টুকরোটা হাতে নিয়ে কয়েক লাইন পড়েই প্রদীপ সেটা নীলাকে ফিরিয়ে দিয়ে বিষণ্ণ হাসির সঙ্গে বলে, 'দেখেছি অনেক আগেই। ক্যালেন্ডারের ছবির প্রতিযোগিতা। সবচেয়ে ভালো ছবির দুহাজার টাকা পুরস্কার! কিন্তু ও দেখে আমার লাভ কী!'

'কেন, এখানে একবার চেষ্টা করে দেখা যায় না?'—নীলা উৎসাহ দেওয়ার চেষ্টা করে দেখে।

কিন্তু প্রদীপ তাতে তিক্তই হয়ে ওঠে। একটু উত্তেজিতভাবেই বলে, 'চেষ্টার কিছু বাকি রেখেছি মনে করেন? এই বিজ্ঞাপন যারা দিয়েছে তাদের অফিসেও বারবার টুঁ মেরেছি। যেখানে ঢুকতে পর্যন্ত দিতে চায় না সেখানে শুধু নিজের কাজের নমুনাটা দেখাবার জন্যে ছলছুতো খোশামোদ জবরদস্তি কোনও কিছুই বাদ দিইনি। তবু ছবিগুলো একবার ছুঁতে পর্যন্ত চায়নি ওদের বড়সাহেব।'

'দোষ ছবিগুলোর না আপনার?' নীলার স্বরে কৌতুকের সঙ্গে সহানুভূতি মেশানো।

প্রদীপ কিন্তু আরও জ্বলে ওঠে, 'আমার দোষ! পুরস্কারটা আমায় দেখে দেবে, না আমার ছবি দেখে? বিচারটা আমার না ছবির?'

'বিচারটা দুটো জড়িয়েই হয়।' এবার স্নিগ্ধ স্বরে বলে নীলা, 'আচ্ছা ছবিগুলো তো ফেলে দিয়ে যেতে চান, আমি তাহলে দুটো একটা নিতে পারি?'

'দুটো-একটা কেন? সবগুলোই নিন না।' প্রদীপের তিক্ত বৈরাগ্য, 'কী করবেন ও জঞ্জাল নিয়ে? যা বললাম, সেই উনুন ধরাবেন?'

'সের দরে বিক্রি করতেও পারি!' বলে হেসে নীলা সত্যিই নিচু হয়ে বসে ছবিগুলোর ভেতর থেকে দু-একটা বেছে নেয়। তারপর দাঁড়িয়ে উঠে সে প্রায় মিনতির সুরে বলে, 'একটা শুধু অনুরোধ করছি। রাখবেন?'

'না শুনেই কী করে কথা দিই?' প্রদীপ একটু যেন সন্দিগ্ধভাবে নীলার দিকে চায়।

'না ভয় পাওয়ার মতো কোনও অনুরোধ নয়।' নীলা আশ্বাস দেয়, 'নেহাত গোঁ ধরে না থাকলে রাখতে পারবেন।'

'শুনিই আগে অনুরোধটা।' প্রদীপ এবার সহজভাবেই কৌতূহল প্রকাশ করে।

'ছবির দামটা না নিয়ে যাবেন না।' নীলা ইচ্ছে করেই একটু হেঁয়ালি করে বলে।

'তার মানে?'

'মানে, পুরস্কারই পাই আর সের দরেই বেচি, ছবির দাম তো কিছু মিলবে। সেটা আপনি না থাকলে দেব কাকে? সুতরাং দামটা না পাওয়া পর্যন্ত এ বাসা ছেড়ে যাবেন না এই অনুরোধ।'

প্রদীপ এবার হেসে ফেলে বলে, 'পুরস্কারের আশায় থাকতে হলে তো সারাজন্মই কেটে যাবে, তার চেয়ে সের দরেই বেচে দিন। তাড়াতাড়ি সব ল্যাঠা চুকে যাবে।'

'ছবি যখন আমায় দিয়ে দিয়েছেন তখন সে যা করবার আমিই করব। কিন্তু কথা দিচ্ছেন তো দাম না নিয়ে বাসা ছাড়বেন না?' নীলা উৎসুকভাবে প্রদীপের দিকে তাকায়।

প্রদীপ নীলার দিকে চেয়ে হেসে বলে, 'বেশ সেই কথাই দিলাম। কিন্তু আমার আর এখানে থাকা মানে আপনাদেরই শাস্তি।'

ছবি ক'টা একটা খবরের কাগজে মুড়ে বাঁধতে-বাঁধতে নীলা বলে, 'সে শাস্তি যথাসম্ভব কমাবারই চেষ্টা করব। নিশ্চিন্ত থাকুন।'

ছবির প্যাকেটটা নিয়ে কী মতলবে বলা যায় না নীলা সোজা নিচেই নেমে যাচ্ছিল। সিঁড়ির মাঝখানে সুরেশের সঙ্গে দেখা। একটা খোলা চিঠি পড়তে-পড়তে সে উঠে আসছে।

নীলাকে দেখে সে দাঁড়িয়ে পড়ে বলে, 'এই যে নীলু, তোকেই দেখাতে যাচ্ছিলাম।'

'আমার এখন সময় নেই দাদা।' নীলা পাশ কাটিয়ে যেতে-যেতে বলে, 'আমি একটা জরুরি কাজে বেরুচ্ছি।'

'আরে এটাও জরুরি।' সুরেশ জোর দিয়ে বলে, 'কাকাবাবুর কাণ্ডটা দ্যাখ!'

এবার থেমে নীলুর উঠে আসতে হয়। জিজ্ঞাসা করে, 'কী কাণ্ড?'

'এবার প্রলোভন!' সুরেশ গম্ভীবভাবে বলে।

'প্রলোভন!' নীলা অবাক।

'হ্যাঁ, এই যে আমায় চিঠি লিখেছেন।' সুরেশ ব্যাখ্যা করে এবার, 'গোড়ায় যা শাসাবার শাসিয়ে লিখেছেন, তোমার শকুনি মাতুল তোমার মস্তকটি তো সম্পূর্ণ চর্বন করিয়াছেন, সুতরাং তোমার সম্বন্ধে কোনও আশাই আর আমি পোষণ করি না। তবে নীলা বোধহয় এখনও চিকিৎসার বাহিরে যায় নাই। সে অন্তত ওই নীচ সংক্রামক সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া এখানে ফিরিয়া আসিলে ওবাড়ি হইতে তোমাদের উচ্ছেদের ব্যবস্থা রদ করিবার কথা আমি বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারি।'

'মামাবাবু এ চিঠি দেখেছেন?' জিজ্ঞাসা করে নীলা।

'হ্যাঁ, মামাই তো অফিস থেকে তোকে এখুনি দেখাতে আমায় পাঠালে।'

'আমায় কেন?' নীলা একটু বিস্মিত।

'মামা বলছে, সত্যিই তো আমি কিছু করতে পারলাম না। ফুটো নৌকোয় থেকে তোরা আর ডুবিস কেন? তোরা ফিরে যা।'

কথাগুলো বলে সুরেশ বোনের মুখের দিকে তাকায়। কথাগুলো শুনতে-শুনতেই নীলাব মুখ শক্ত হয়ে উঠেছে।

দৃঢ়স্ববে সে বলে, 'না।'

'তাহলে তুই যেতে চাস না?' সুরেশের মুখ এবার উজ্জ্বল।

'না।' অটলভাবে বলে নীলা, 'ফুটো নৌকো যদি মেরামত না করতে পারি তো তার সঙ্গেই ডুবব, তবু কাকাবাবুর অবুঝ জেদের কাছে হাব মানব না। কাকাবাবুর যদি জেদ থাকে তাহলে আমাদেরও আছে। আমাদেব গাযেও এই একই বংশের রক্ত।'

কথাটা শেষ করেই নেমে যেতে-যেতে নীলা আবার থেমে বলে, 'আমি একটা দরকারি কাজে যাচ্ছি দাদা। আজ নাকি রেজাল্ট বেরুবে শুনছি। একবার সেনেটে গিয়ে দেখে আসবে? আমার রোলনম্বর তো জানো।'

'জানিরে জানি। নিশ্চয়ই দেখে আসব।' সুরেশ সোৎসাহে জানায়, 'তুই ফিরে এসেই খবর পেয়ে যাবি।'

নীলা হঠাৎ সেজেগুজে কী উদ্দেশ্য নিয়ে বাড়ি থেকে সেদিন বেরিয়েছিল আধঘণ্টাটাক বাদেই তা জানতে পারা যায়।

কিন্তু প্রদীপের যেখানে ঘাড়ধাক্কা খেতে শুধু বাকি ছিল সেই পাবলিসিটি অফিসেই নীলার খাতির দেখে হতভম্ব না হয়ে পারা যায় না।

বাইরের সবক'টা বেড়া কী করে সে পেরিয়েছে কে জানে।

আপাতত তাকে বড়সাহেবের একেবারে খাসকামরায় বসে থাকতে দেখা যায়।

বড়সাহেব তাঁর বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে মুগ্ধ তন্ময়তার সঙ্গে একটি ছবি দেখছেন। ছবিটা যেন তন্ন-তন্ন করে দেখে তিনি বলেন, 'আশ্চর্য! এই ছবি নিয়ে আসতে আপনার দ্বিধা হচ্ছিল বলছেন।'

নীলা যথারীতি বিনীত সলজ্জ হাসি মুখে ফুটিয়ে রাখে। সেদিকে একবার চেয়ে বড় সাহেব নিজেকে আবার সংশোধন করেন, 'তবে আশ্চর্যই বা কেন? এইটেই বোধহয় স্বাভাবিক। বিষ যাদের নেই তাদেরই কুলোপানা চক্কর। ঐইরকম যা সব ছিনে জোঁকের পাল্লায় পড়তে হয় মাঝে-মাঝে। একজন তো সম্প্রতি একেবারে জ্বালিয়ে খেয়েছে। শেষকালে বললাম, কাগজ নষ্ট না করে জানলা-দরজা রং কর হে ছোকরা।'

বড়সাহেবের এরকম আশাতীত অন্তরঙ্গতার উত্তরে নীলাকে আরও একটু মধুর করে হেসে একটা কিছু বলতে হয়।

'ওঃ বললেন বুঝি!' বলে মুগ্ধ বিস্ময় দেখিয়ে সে আসল কথাটা জানাবার চেষ্টা করে, 'কিন্তু দেখুন এই ছবিগুলো ঠিক আমার...'

'না, না, আপনার সঙ্কুচিত হওয়ার কিছু নেই।' বড়সাহেব নিজের উচ্ছ্বাসে নীলাকে কথাটা শেষ করতে দেন না, 'আপনি যে এ ছবিতেও পুরোপুরি সন্তুষ্ট নন, এটাই তো সত্যিকার আর্টিস্টের লক্ষণ। হ্যাঁ আপনার নামটা?'

'নীলিমা ঘোষ।' নামটা জানিয়ে আবার নীলা সত্যটা প্রকাশ করতে চায়, 'কিন্তু এ ছবিগুলো...'

বড়সাহেব আবার তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে নিজের মতো ব্যাখ্যা করে বলেন, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, তা আগেই দেখেছি। ছবিতে শিল্পীর স্বাক্ষরে খুব প্যাঁচ করেছেন। যেন অন্যবকম মনে হয়। ওতে কিছু আসে-যায় না। আচ্ছা এখন এই কাগজটা একটু সই করে দিন তো।'

কাগজটা নীলার দিকে এগিয়ে বড়সাহেব বলে যান, 'আমি নিজেই কম্পিটিশনে এ ছবি এনট্রি করে নিচ্ছি। শুধু আপনার সই থাকলেই হবে। ঠিকানাটাও দেবেন।'

'আমাকে সই করতে বলছেন।'

'তা আপনাকে ছাড়া আর কাকে বলব!' বড়সাহেব এবারও নীলার দ্বিধাটা হেসে উড়িয়ে দেন, 'আপনি এন্ট্রি ফর্মে সই না করলে এ ছবি প্রাইজ কম্পিটিশনে যাবে কী করে!'

নীলা সত্যের মর্যাদা রাখবার শেষ চেষ্টা করে বলে, 'কিন্তু দেখুন ছবিগুলো ঠিক নিজের নামে দেওয়াটা...'

'সেজন্যে আপনি কিছু ভাববেন না।' বড়সাহেব নীলুর আপত্তির নিজের মতো মানে করে নিয়ে তাকে আর কিছু বলতে দেন না, 'আপনি নামটা যখন গোপন রাখতে চান আমরা তা প্রকাশ করব কেন? কিন্তু ধরুন এর চেয়ে কোনও ভালো ছবি যদি না আসে তাহলে পুরস্কারটা তো আপনাকেই দিতে হবে। সেই জন্যেই নাম-ঠিকানা দরকার। নিন লিখুন।'

নিরুপায় হয়েই বোধহয় সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যে যোঝা ছেড়ে দিয়ে ভাগ্যের অভিপ্রায় বলে নীলা ব্যাপারটা মেনে নেয়।

কাগজটা টেনে নিয়ে লিখে দেয় নিজের নাম-ঠিকানা।

পাবলিসিটি অফিস থেকে নীলা যে বেশ একটু উত্তেজিত ও উৎফুল্ল হয়ে বাড়ি ফেরে তা বলাই বাহুল্য।

প্রদীপকে খবরটা এখুনি দেওয়ার জন্যে তার মনটা ব্যাকুল হয়। কিন্তু ভেবেচিন্তে জানানোটা আপাতত মুলতুবি রাখার সিদ্ধান্ত সে করে।

প্রদীপের ঘরে ঢুকতে গিয়ে সে কিন্তু একটু অবাক হয়। প্রদীপ তন্ময় ও বেশ একটু চিন্তিতভাবেই কী একটা চিঠি পড়ছে।

বাড়ি থেকে কোনও খারাপ খবর এল নাকি!

নীলা উদ্বিগ্নভাবে সে কথা জিজ্ঞাসা করার আগেই প্রদীপের একটু চমকে মুখ তুলে হাসার ধরনে বোঝা যায় খবরটা আর যাই হোক সাংঘাতিক গোছের নিশ্চয়ই নয়।

হেসে প্রদীপ জিজ্ঞাসা করে, 'কখন এলেন! টের পাইনি তো!'

প্রদীপের প্রশ্নের ধরনে আশ্বস্ত হয়ে নীলা পরিহাস করে বলে, 'আমি কি বাড়ি কাঁপিয়ে আসব যে টের পাবেন!'

'না, মানে আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম কিনা?' প্রদীপ কৈফিয়ত দেয়।

'কেন?' নীলা প্রদীপের প্রতীক্ষার কারণটা অনুমান করবার চেষ্টা করে, 'ও আপনার সেই ছবি ক'টার জন্যে?'

'না, না সে ছবির জন্যে আমার কোনও মাথাব্যথা নেই।' প্রদীপ মুখে বিতৃষ্ণা ফুটিয়ে বলে, 'আপনি যা খুশি করতে পারেন ওগুলো নিয়ে। শুনুন যা বলছি—'

'না আপনি আগে শুনুন', নীলা বাধা দিয়ে একটুখানি ইঙ্গিত না দিয়ে পারে না, 'ধরুন এরই মধ্যে ছবি ক'টা যদি প্রায় বেচেই দিয়ে থাকি?'

'বেশ করেছেন।' সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত মনে হয় প্রদীপকে, 'শুনুন আমার কথা...'

'না, আমার কথাটা আগে। বেচে দেওয়ায় আপনার আপত্তি নেই তো?' নীলা কৌতুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে।

'বলেছি তো কোনও আপত্তি নেই। যা খুশি আপনি করতে পারেন—' প্রদীপ এবার একটু অধৈর্যের সঙ্গে বলে, 'এখন শুনুন, আমি বড়...'

নীলার কিন্তু পাবলিসিটি অফিসের বড়সাহেবের ছোঁয়াচ লেগেছে। সে আবার প্রদীপকে থামিয়ে বলে, 'কিন্তু দামটা যদি মোটারকমের হয়?'

'আঃ বলছি তো, মোটা-রোগা যাই হোক আমি জানতে চাই না।' প্রদীপ প্রসঙ্গটা যেন সহ্য না করতে পেরে মিনতি করে, 'এখন আমার কথা একটু শুনবেন?'

'শুনছি, বলুন।' নীলা এবার সুযোগ দেয় প্রদীপকে।

'বড় বিপদে পড়েছি।' কাতরস্বরে বলে প্রদীপ।

'তাই নাকি!' নীলা মুখ টিপে হেসে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলে, 'কই, বিপদ তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

'এদিক-ওদিক কী দেখছেন! বিপদ কি ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে না কি?' প্রদীপ অনুযোগের সুরে বলে।

'তাহলে কোথায় আছে না বললে বুঝব কী করে?' নীলা কৌতুকের সঙ্গে বলে, 'তাছাড়া আপনার বিপদ আমায় শুনিয়ে কোনও লাভ আছে?'

'আছে! আছে!' প্রদীপ ব্যাকুলভাবে জানায়, 'আপনিই এখন উদ্ধার করতে পারেন। করতেই হবে আপনাকে।'

এবার একটু কৌতূহলী হলেও নীলা হেসে বলে, 'একটু উলটো পুরাণ হয়ে যাচ্ছে না?'

'কেন?'

'মেয়েদের বিপদে পুরুষরাই ঝাঁপিয়ে পড়ে উদ্ধার করতে—এই তো দস্তুর। তার বদলে আপনার বিপদে উদ্ধার করব আমি!'

'আহা!' প্রদীপ এবার গম্ভীর হয়ে বলে, 'এ বিপদ সামলানো কি পুরুষের কর্ম! স্বয়ং ভীম, অর্জুনকে এ বিপদে ভ্যাবাচাকা হতে হত।'

'এমন বিপদ? কী সেটা!' নীলা এবার সত্যিই বিস্মিত।

'একটা শাড়ি কিনতে হবে।' প্রদীপের মুখে যেন দিশাহারা আতঙ্ক।

'শাড়ি কিনতে হবে আপনাকে?' নীলা সন্দিগ্ধ হয় একটু, 'সত্যি বলছেন!'

'নির্ভেজাল সত্যি!' প্রদীপ বলে, 'দোষটা অবশ্য আসলে আপনার।'

'আমার দোষ?' নীলা রাগ করবে না হাসবে ঠিক করতে পারে না, 'আমার দোষে আপনাকে শাড়ি কিনতে হবে! এ আবার কী হেঁয়ালি?'

'হেঁয়ালি নয়, সত্যি!' প্রদীপ এবার বিস্তারিত করে, 'একদিনের কী দেখা যে দেখেছে, সেই থেকে আপনি হয়েছেন আমার বোনটির মডেল। ফ্রক ছেড়ে এবার শাড়ি ধরবে। সেদিন আপনার যে শাড়ি দেখে গেছে তাই এক্ষুনি ওকে কিনে পাঠাতে হবে। এই দেখুন কড়া হুকুমের চিঠি। এখন আপনি সাহায্য না করলে...'

'বেশ তো!' নীলা বাধা দিয়ে বলে, 'শাড়ি তো দেখেছেন। আমি দোকানের ঠিকানা দিচ্ছি, কিনে আনুন।'

'ওরে বাবা!' প্রদীপের মুখে অসহায় আতঙ্ক, 'দোকানে গিয়ে শাড়ি চিনে কিনব আমি! তার চেয়ে আমায়, কী বলে, বাঘের চামড়া খুলতে খাঁচায় পাঠিয়ে দিন।'

'এত ভয়!' নীলা হেসে ফেলে, 'বেশ চলুন তাহলে, শাড়ি কিনে দিয়েই আপনাকে উদ্ধার করি।'

শাড়ি কিনতে যাওয়া কিন্তু হয় না। ও-ঘর থেকে সুরেশের ডাক শোনা যায়, 'নীলু কোথায় রে তুই!'

দাদাকে সেনেটে পাঠিয়েছিল মনে পড়ে নীলুর। সুরেশের ডাকে সানন্দ উৎসাহের সুর শুনে উৎসুকভাবে সাড়া দিয়ে সে বলে, 'এই যে আমি, প্রদীপবাবুর ঘরে।'

বলতে-বলতেই সুরেশ খুশি মুখে এ ঘরে এসে বলে, 'গেছলাম রে সেনেটে। রেজাল্ট দেখে এসেছি।'

'দেখে এসেছ?'—সাগ্রহে নীলা দাদার মুখের দিকে চায়।

'হ্যাঁ, ফেল!' সোল্লাসে বলে যায় সুরেশ। 'একেবারে পকেল ফেলতু ফেলু। নীলিমা তো নীলিমা, এবার দন্ত্য নই নেই একটা। আরে আমি তো আগেই জানতাম। ওসব পাশটাশ করা কি আমাদের পোষায়! কী লম্বা লিস্টিরে বাবা, পিঁপড়ের সারের মতো চলেছে তো চলেইছে। ওই ভিড়ের মধ্যে নাম ছাপতে আমাদের বয়ে গেছে।'

দাদার এ উচ্ছ্বাসে নীলার মুখের চেহারাটা প্রদীপের দৃষ্টি এড়ায় না। সে একটু সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করে, 'আপনি ভালো করে দেখেছেন তো সুরেশবাবু? অনেক সময় তাড়াতাড়িতে এক-আধটা নাম অমন চোখে পড়ে না।'

'তাড়াতাড়ি কী মশাই!' সুরেশ যেন অপমানিত বোধ করে জানায়, 'আমি ধীরেসুস্থে খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে লিস্ট দেখেছি। কোথাও নামের গন্ধ পর্যন্ত নেই। যাক বাবা! এখন একেবারে নিশ্চিন্দি। পাশ করার কি কম ঝামেলা! আবার ভর্তি হও, আবার বই কেনো। আর সে

সব দায় নেই। একেবারে ঝাড়া হাত-পা!'

দাদার উচ্ছ্বাস শুনতে-শুনতে নীলার মাথাটা আগেই নুয়ে পড়েছিল। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে সে প্রায় ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

'আরে চলে গেল যে!' সুরেশের এতক্ষণে বুঝি টনক নড়ে, 'রাগ করল নাকি? 'ও নীলু, নীলু!'

সুরেশের সরলতাটা বুঝলেও নীলার অবস্থাটা অনুমান করে প্রদীপ বিমর্ষ মুখে একটু খোঁচা না দিয়ে পারে না। বলে, 'থাক, এখন আর ডাকবেন না। ফেল করার খুশিটা সকলকে দেখাতে চায় না বোধহয়।'

তাৎপর্যটা সুরেশের মাথায় ঢোকবার আগেই রায়মশাই এসে পাশের ঘরে ঢোকেন।

কিন্তু রায়মশাইয়ের হঠাৎ হল কী! যেখানেই থাকেন মেতে ও মাতিয়ে রাখা যাঁর স্বভাব, বাড়িতে পা দিতে না দিতেই যিনি আনন্দের সাড়া তোলেন তাঁকে দেখে এখন হালভাঙা পাল ছেঁড়া নৌকোর কথাই যেন মনে পড়ছে।

রায়মশাই-এর ভাবগতিক দেখে সুরেশ ও প্রদীপ দুজনেরই সুতবাং একটু অবাক হওয়া স্বাভাবিক। সেই সদাপ্রফুল্ল মানুষটির আজ যেন অন্য চেহারা। পোশাকটাও আজ অবশ্য আলাদা। কোটপ্যান্টের বদলে আজ ধুতি-পাঞ্জাবির সঙ্গে চাদর নিয়ে বেরিয়েছিলেন। চাদরটা গলা থেকে খুলে আলনায় রেখে তিনি একটা চেয়ারে যেভাবে নীরবে বসে পড়েন সেটা তাঁর পক্ষে নিতান্ত অস্বাভাবিক।

সুরেশের সঙ্গে প্রদীপকেও এবার কাছে যেতে হল ব্যাপারটা বুঝতে।

'কী হল মামা? শরীর খারাপ?' উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলে সুরেশ।

'এ পোড়া শরীর কখনও খারাপ হতে দেখেছিস।' রায়ের মুখে একটু তিক্ত হাসি।

'ও নীলুর খবর পেয়েছ বুঝি?' সুরেশ তার সন্দেহটা ব্যক্ত করলে।

'কী খবর নীলুর?' রায় প্রায় উদাসীন।

'নীলু ফেল করেছে যে!' সুরেশ একটু যেন সোৎসাহেই জানাল।

'হ্যাঁ জানতাম। সবাই আমরা ফেল!' রায়ের যেন নির্বিকার হওয়ার চেষ্টা, 'তাই ভাবছি তোরা কাকার বাড়িতেই ফিরে যা।'

'তাই ভাবছ!' সুরেশ তীব্র প্রতিবাদ জানাল, 'আজ তোমাদের সকলের হয়েছে কী? আমাদের তুমি ফিরে যেতে বলছ, প্রদীপবাবু আমাদের অসুবিধের কথা ভেবে চলে যেতে চাইছেন...'

'তা প্রদীপবাবুর যাওয়াই ভালো!' রায় সুরেশের কথায় বাধা দিয়ে জানালেন।

'যাওয়াই ভালো।' সুরেশ এবার প্রায় ক্ষিপ্ত। 'তুমি আমাদের সকলকে তাড়াতে চাও।'

'তাড়াতে চাই না রে!' এবার রায়ের গলায় কাতরতা ফুটে উঠল, 'কিন্তু অপমান করে আর কেউ তাড়াবার আগে মানে-মানে নিজেরই যাওয়া ভালো নয় কি?'

'অপমান করে তাড়াবে কে?' এবার প্রদীপ না জিজ্ঞাসা করে পারলে না, 'ওই ডাঃ ঘোষ?'

'হ্যাঁ!' ক্লান্তভাবে স্বীকার করলেন রায়মশাই, 'আজ আদালতেও উচ্ছেদের ডিক্রি পেয়েছে। ওরা জুলাই পর্যন্ত এখানে থাকলে পুলিশ দিয়ে ঘাড় ধরে বার করবে।'

একটু থেমে রায় আবার ভারী গলায় বললেন, 'ও উচ্ছেদের ডিক্রিকে পরোয়া করি না, যদি আসল বাজিতে জিততে পারতাম। কিন্তু সে আশা আর নেই।'

'আসল বাজিটা কী, জানতে পারি?' প্রদীপ জিজ্ঞাসা করলে। প্রদীপের দিকে খানিক চেয়ে কী ভেবে নিয়ে রায় বললেন, 'বিপদ-আপদের সহায় হয়ে তুমি মানে আপনি ঘরের লোক হয়ে গেছেন প্রদীপবাবু।'

'তাহলে আর আপনি কেন?' হেসে বললে প্রদীপ।

'আচ্ছা-আচ্ছা তুমিই হল। তোমাকে বলতে সত্যি বাধা নেই। এদের কাকা বুনো ঘোষের জেদ ছিল স্কুল ছাড়লেই ভাইঝি মানে নীলুর বিয়ে দেবে। নীলুর সঙ্গে সুরেশ তাতে বেঁকে দাঁড়িয়েছে, আমিও তাল দিয়েছি। ওদের কাকার সঙ্গে তাই আমার আর ওদের ছাড়াছাড়ি। তার ধারণা আমার মতো হতভাগার পক্ষে এ মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করা অসম্ভব। এই বিয়ের ব্যাপার নিয়ে তর্কাতর্কির সময়ে সেদিন আমি কঠিন দিব্যি গেলে বাজি ধরে এসেছি যে নীলুর বিয়ে আমিই দেব আর ওই ৩রা জুলাই-এর মধ্যে। কিন্তু আর সে পণ রাখতে পারলাম না। সামনে আর ক'টা মাত্র দিন। পয়সাকড়ির জোর আমার নেই, তার ওপর নীলু আবার ফেল করেছে!'

'ফেল করা মেয়েরও বিয়ে হয় বোধহয়!' প্রদীপের যেন নির্লিপ্ত মন্তব্য।

'তা হয়। কিন্তু পয়সার জোর না থাকলেও খোঁজ-খবর তো দরকার। সে খোঁজখবর এর মধ্যে পাচ্ছি কোথায়? নীলুর যা এখন মেজাজ, তাতে কেউ দেখতে চাইলেও তো দেখাতে পারব না।'

'তবু', প্রদীপ যেন একটা রাস্তা খুঁজে পেয়ে বললে, 'ওই কী বলে, খবরের কাগজগুলো তো একটু দেখলে পারেন!'

'খবরের কাগজ? মানে পাত্র-পাত্রী সংবাদ!' রায় অবজ্ঞাভরে বললেন, 'ও ঢের দেখেছি হে। বিদ্যেয় সরস্বতী, গুণে লক্ষ্মী, রূপে তিলোত্তমা হলেই চলবে না, তার সঙ্গে অর্ধেক রাজত্ব যৌতুক। পাত্র কি না লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক। গেজেটেড অফিসার হলে তো বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি দিয়েও কূল পাবে না।'

'না, না, সকলের খাঁই কি ওরকম!' প্রদীপ মৃদু প্রতিবাদ জানাল, 'আপনাদের যখন শিরে সংক্রান্তি তখন একটু নজর রাখলে দোষ কী?'

'বেশ, বলছ যখন তাই রাখব!' রায় বিশেষ উৎসাহ ছাড়াই রাজি হলেন, কাল থেকে সব কাগজ কিনে আনিস তো সুরেশ, সবক'টা। বুঝলি?'

দিনকয়েক বাদেই অমন অভাবনীয় ব্যাপার যে ঘটবে রায় বা সুরেশ কারুর নিশ্চয়-কল্পনাতেও আসেনি।

সেদিন ঘরের মেঝেটা যেন খবরের কাগজের স্টল। বাংলাদেশ থেকে যেখানে যত ইংরাজি-বাংলা খবরের কাগজ বার হয় সব সেখানে রাশি-রাশি ছড়ানো। তারই মধ্যে বসে বিজ্ঞাপনের পাতা পড়তে-পড়তে সুরেশ, 'মামা!' বলে চিৎকার করে প্রায় লাফিয়ে ওঠে।

'কী রে হল কী।' রায় একটু শঙ্কিতভাবেই সুরেশের দিকে তাকান।

'শোন, একেবারে তাজ্জব ব্যাপার।' সুরেশ রায়ের কাছে এসে সোৎসাহে বসে পড়ে।

'তাজ্জব ব্যাপার!' রায় বিমূঢ় হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'বাজারে মেছুনির কাছে সস্তা সরষের তেল পাওয়া যাচ্ছে। না তেলের ঘানিতে সস্তায় মাছ?'

'না, না, ওসব কিছু নয়, পাত্র-পাত্রী সংবাদ! এই শোনই না'—সুরেশ পড়তে শুরু করে,—উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, নাতিদীর্ঘ সুশ্রী কায়স্থ পাত্রী চাই। নামের আদ্যক্ষর 'ন' হওয়া একান্ত প্রয়োজন। পিতৃমাতৃহীন ও এবৎসর বি-এ ফেলের দাবি সর্বাগ্রে। পাত্রের পরিচয় পরে জ্ঞাতব্য।

অবিলম্বে নিভৃতে প্রাথমিক সাক্ষাৎ ও আলাপের স্থান-কাল জানান। পাত্রীর উপস্থিতি বাঞ্ছনীয় নহে। বক্স নম্বর—০০০৭।

রায় খানিক হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থেকে বলেন, 'হ্যাঁরে সত্যি?'

সুরেশের হাত থেকে কাগজটা কেড়ে নিয়ে তিনি পড়েই ফেলেন নিজে। তারপর উত্তেজিত হয়ে বলেন, 'এ তো দেখছি আশ্চর্যরকম মিলে যাচ্ছেরে। কিন্তু নিভৃতে দেখা করতে চাইছে, আবার লিখছে পাত্রীর উপস্থিত থাকা চায় না। নীলু এই সোমবারে তো কোনও বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছে, আর প্রদীপও তো রোজ এগারোটার আগে বেরিয়ে যায়। তুই এখুনি সোমবার সাড়ে এগারোটার সময় দিয়ে চিঠি লিখে দে। এখুনি।'

সেই সোমবার।

ঘড়িতে এগারোটা বেজে কুড়ি মিনিট।

মামা-ভাগনে রায় ও সুরেশকে কেমন একটু অস্থির-অস্থির মনে হয়। ঘরের আসবাবপত্রগুলো একবার এদিকে নাড়ছেন আব একবার ওদিকে। কোথায় কোনটা রাখা হবে তাই নিয়ে চাপা গলায় আলোচনা চলছে।

নীলার আজ দুপুরে এক বন্ধুর বাড়ি নেমন্তন্ন।

সেজেগুজে তৈরি হয়ে বাইরে বেরুতে গিয়ে সে বেশ অবাক।

'এসব কী?' নীলা জিজ্ঞাসা করে, 'চেযার-টেবিল আলমারি সব নাড়ানাড়ি করছ কেন? খাটদুটো আবার দেয়ালের গায়ে দাঁড় করিয়েছ!'

'না, না, কিছু না!' রায় একটু লজ্জিতভাবে হাসেন, 'এই দেখছিলাম ঘরটা একটু অন্যভাবে সাজানো যায় কী না!'

'একরকম থাকলে বড় একঘেয়ে লাগে কিনা!' সুরেশ মামাকে সমর্থন করে।

'কিন্তু হঠাৎ আজই ঘর সাজাবার এত তাড়া পড়ে গেল!' নীলা ঠিক মেনে নিতে পারে না। তারপর নিজে থেকেই প্রস্তাব করে, 'তা আমি একটু থেকে সাহায্য করব?'

দেওয়ালঘড়ির দিকে চেয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠে রায় বলেন, 'না, না, তোর যে কোথায় আবার নেমন্তন্ন! মিছিমিছি দেরি করবি কেন?

'তাছাড়া ট্রামে-বাসে যা ভিড়! ক্রমশই তো বাড়বে। আগে-আগে রওনা হওয়াই ভালো।' সুরেশ মামার কথায় ঠেকো দেয়।

'কী বলছ কী দাদা?' নীলা কিন্তু ক্ষুণ্ণ, 'আমি গেলেই যেন বাঁচো মনে হচ্ছে। না হয় ফেলই করেছি।'

'এই দেখো মেয়ের মিথ্যে অভিমান!' রায় ঘড়ির দিকে চেয়ে বোঝাতে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, 'আরে ফেল করেছিস তো হয়েছে কী। এক জায়গায় যাবি বলে কথা দিয়েছিলি তাই আমরা ভাবছি ঠিক সময়ে যাওয়াই ভালো!'

'তাই ভাবছ তো ওরকম আবোলতাবোল বলছ কেন?'

'আবোলতাবোল!' সুরেশ ও রায় অবাক!

'হ্যাঁ, আবোলতাবোল নয়!' নীলা ক্ষুব্ধস্বরে বলে, 'এগারোটা বেজে গেছে, এখন বলছ ট্রামে-বাসে ভিড় বাড়বে।'

'ও, তাই বলেছে বুঝি সুরেশ!' রায় হেসে জিনিসটা হালকা করবার চেষ্টা করেন,

'সুরেশটা ওইরকম। এক বলতে ভুল করে আরেকটা বলে।'

'হ্যাঁ, ভুলটা যেন একটু বেশি হচ্ছে আজ!' নীলা এবার হেসে ফেলে বলে, 'আচ্ছা আমি যাচ্ছি। সেই বিকেলে ফিরব।'

নীলা বেরিয়ে যাওয়ার পর সিঁড়িতে উঁকি দিয়ে দেখে এসে রায় মধুকে ডেকে জিগ্যেস করেন, 'হ্যাঁরে, ও ঘরের দাদাবাবু বেরিয়ে গেছে ঠিক দেখেছিস তো?'

'হ্যাঁ, তেনা তো সেই দশটার আগেই সেজেগুজে বেরিয়ে গেলেন। আজ আবার কোট-প্যান্টালুন নয়, সিলিকের পাঞ্জাবি, ধুতি! আমারে বললেন...'

'আচ্ছা! আচ্ছা ঠিক আছে!' রায় মধুর উচ্ছ্বাস থামিয়ে দিয়ে বলেন, 'জলখাবারের ব্যবস্থা সব ঠিক রাখ গিয়ে যা। কজন আসবে কিছু তো ঠিক নেই।'

মধু চলে যাওয়ার পর সুরেশ বলে, 'আর তো মাত্র সাত মিনিট! বিজ্ঞাপনের যেরকম মিলিটারি ভাষা ঠিক কাঁটায়-কাঁটায় আসবে মনে হয়। আচ্ছা মামা, তুমি বরং এইখানে এই চেয়ারটায় বোসো। দরজার ঠিক মুখোমুখি। দরজায় ঢুকে একজন ভারিক্কি কাউকে দেখা দরকার।'

রায় চেয়ারটায় বসতে গিয়ে কিন্তু থেমে যান। ফিরে দাঁড়িয়ে বলেন, 'না-না, তুই এখানে বোস। ধর, পাত্র যদি নিজেই আসে তো সমবয়সী ছেলে-ছোকরা দেখলে, কী বলে অ্যাট ইজ—মানে স্বচ্ছন্দ বোধ করবে। আর দ্যাখ, খুব বেশি হামলে পড়িসনি। ভাববে বড্ড বেশি গরজ।'

'তুমি কিচ্ছু ভেব না মামা!' সুরেশ আশ্বাস দেয়, 'একেবারে নির্ভুল চাল চালব। সাড়ে এগারোটা বাজতে আর তিন মিনিট। দেখই না।'

'আচ্ছা!' রায় হঠাৎ একটু উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন, 'তুই ঠিকানা আর সময় ঠিক লিখেছিস তো। ভুল করিসনি?'

'ভুল করব আমি?' তিনবার চেক করেছি!' বলেই সুরেশ কানখাড়া করে বলে, 'কে যেন আসছে না?'

সুরেশ উঠে দাঁড়ায়। রায় বলেন, 'না, না তুই বোস। আমি দেখছি।'

তাঁকে আর দেখতে যেতে হয় না। 'আসুন! আসুন!' বলে অভ্যর্থনা করতে গিয়ে তিনি থেমে যান। ধীরেসুস্থে ঘরে এসে যে ঢোকে সে আর কেউ না, প্রদীপ।

'ওঃ আপনি!' রায়ের গলার হতাশাটা খুব অস্পষ্ট নয়।

'হ্যাঁ' প্রদীপ সহজভাবে বলে, 'আঙুলটা যেন ছড়ে গেল মনে হচ্ছে। একটু টিংচার আয়োডিন দিতে পারেন? আমারটা ফুরিয়ে গেছে।'

ঘড়ির দিকে চেয়ে রায় ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, 'ওরে সুরেশ শিগগির-শিগগির আয়োডিনের শিশিটা।'

সুরেশকে আর দুবার বলতে হয় না। হন্তদন্ত হয়ে শিশিটা নিয়ে এসে প্রদীপকে দেয়। বলে, 'নিন, তাড়াতাড়ি লাগিয়ে নিন!'

প্রদীপের কিন্তু কোনও তাড়া নেই। ধীরেসুস্থে শিশিটা ক'বার ঘুরিয়ে দেখে তার লেবেল পড়ে আস্তে-আস্তে ছিপি খুলে সে আঙুলে আয়োডিন লাগায়। তারপর সুরেশকে সেটা ফিরিয়ে দিয়ে বলে, 'ধন্যবাদ।'

সুরেশ শিশিটা হাতে নিয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে প্রদীপের দিকে চায়। প্রদীপ বেশ গ্যাঁট হয়েই দাঁড়িয়ে আছে। আয়োডিন লাগিয়েও তার নড়বার নাম নেই।

রায় একবার সুরেশ একবার প্রদীপের দিকে চেয়ে ব্যস্ত হয়ে বলেন, 'তোমার—মানে—তুমি কোথাও বেরুচ্ছ বুঝি?'

'না, বেরুব আর কোথায়?' প্রদীপ সোফাটার দিকে এগিয়ে যায়।

'না, কাজকর্ম যদি থাকে তাহলে অবহেলা করা উচিত নয়।' রায় সুপরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করেন।

'না, তা তো উচিত নয়!' প্রদীপ সোফার ধার ঘেঁষে একটু হেলান দিয়ে দাঁড়ায়, 'তবে অন্য কাজ-টাজ কিছু নেই, সাড়ে এগারোটাও বেজে গেছে...'

'বেজে গেছে!' সুরেশ উদ্বেগের সঙ্গে প্রতিবাদ জানায়, এখনও তো দু-মিনিট বাকি!'

'না।' প্রদীপ হাসিমুখে সংশোধন করে, 'আপনাদের ঘড়ি পাঁচমিনিট স্লো। আমার একেবারে রেডিওর সঙ্গে মেলানো।'

'তার মানে এখন এগারোটা তেত্রিশ!' সুরেশ বিস্ময় ও উদ্বেগ প্রকাশ করে, 'আশ্চর্য!'

'আশ্চর্য কীসের?' প্রদীপই যেন বিমূঢ়, 'এতে আশ্চর্য হওয়ার কী আছে! এগারোটা ত্রিশের পর একত্রিশ, তারপর বত্রিশ, তারপর তেত্রিশ, এই তো ঘড়ির নিয়ম! রোজ দুবেলাই হচ্ছে।'

'না, ঘড়িটা স্লো বলে সুরেশ অবাক হয়েছে!' রায় আর কথা বাড়াতে চান না, 'তোমার বাইরে আজ কোনও কাজ-টাজ নেই বুঝি?'

'বাইরে কাজ থাকলে আর এখানে ফিরে আসি?' প্রদীপ অমায়িকভাবে হাসে, 'আপনারা যেন কারুর জন্যে অপেক্ষা করছেন মনে হচ্ছে!'

'অপেক্ষা!' সুরেশ হেসে উড়িয়ে দিতে চায়, 'অপেক্ষা করব কার জন্যে?'

'না, মিছে লুকিয়ে লাভ কী?' রায় সত্যটা স্বীকার করা ছাড়া পথ দেখতে পান না, 'দ্যাখ তোমাকে বলতে বাধা নেই। আজ একজনের এখানে আসবার কথা। তার জন্যেই অপেক্ষা করছি।'

'ও!' বলে প্রদীপ সোফাটায় এবার বসে।

'তিনি একটু নিরিবিলিতে দেখা করতে চান।' সুরেশ যেন মিনতি জানায়।

প্রদীপ আর একটু আরাম করে সোফার পিঠে হেলান দিয়ে বলে, 'ও।'

'ব্যাপারটা খুব জরুরি কিনা।' রায় প্রায় করুণ স্বর ছাড়েন।

'ও!' বলে প্রদীপ একধারে প্রায় কাত হয়েই পড়ে এবার।

'তাই বলছিলাম, আপনি এখন এখানে থাকলে—মানে—' সুরেশের গলাটা এবার আর খুব মোলায়েম নয়।

'মানে, আমায় চলে যেতে বলছেন!' প্রদীপ সোজা হয়ে বসে।

'না, না, তা ঠিক নয়।' রায় একটু সামলাবার চেষ্টা করেন, 'তবে ধর তুমি যদি খানিকক্ষণ বাইরে কিংবা ওদিকের ঘরে...'

রায়ের কথায় বাধা দিয়ে প্রদীপ রীতিমতো ক্ষুণ্নস্বরে বলে, 'বুঝেছি! কেটে পড়তে বলছেন, কিন্তু সেটা কি ভালো হবে?'

'ভালো হবে না মানে?' রায় বিমূঢ়।

'মানে কথাবার্তাগুলো তাহলে...?'

কথাটা অসমাপ্ত রেখে প্রদীপ কেমন অদ্ভুতভাবে দুজনের দিকে তাকায়।

'কথাবার্তা? কীসের কথাবার্তা!' সুরেশ হতভম্ব, 'আপনার সঙ্গে কথাবার্তা কী বলবার থাকতে পারে!'

'না থাকে যদি তাহলে অবশ্য কিছু বলবার নেই!' প্রদীপ একটু ঘাড় ঝাঁকানি দিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

রায়ের চোখ-মুখ কিন্তু হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। উত্তেজিতভাবে তিনি বলেন, 'দাঁড়াও-দাঁড়াও। তুমি মানে, তাহলে তুমি-ই?'

প্রদীপ সবিনয়ে হেসে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে তাহলে, আমি মানে আমি-ই!'

'আপত্তি!' রায় অভিভূত হয়ে প্রদীপকে জড়িয়েই ধরেন, 'শোন, নিজের মুখে স্বীকার করছি আমি একটা আহাম্মক। আমার চশমা নেওয়া দরকার, বুঝেছ চশমা!'

'ব্যাপারটা কী হল?' সুরেশ এবার একটু অসন্তুষ্ট, 'আমি মানে আমি-ই, তুমি—তুমি-ই, এসব ধাঁধার মানে কী?'

'মানে তোকে আর বুঝতে হবে না!' রায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন, 'বানান পর্যন্ত হয়ে গেছে। হাতের কাছে হিরের টুকরো থাকতে আমি চিনতে পারি না, তাই আমার চশমা নেওয়া দরকার, বুঝলি? এখন তাহলে সব পাকা। ওই—ওই বুনো ঘোষকে কী ওস্তাদের মার দিই এবার দ্যাখ।'

'বুঝেছি! বুঝেছি!' সুরেশ এবার প্রায় চিৎকার করে ওঠে, 'বুঝে ফেলেছি মামা!'

'বুঝেছিস!' রায় একটু যেন সন্দেহ প্রকাশ করেন।

'হ্যাঁ, আমি কি বোকা নাকি!' সুরেশ নিজের ওকালতি করে, 'বুঝতে শুধু একটু দেরি হয়। আপনিই তাহলে ও বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন! আর আমরা কিনা...'

'হুঁ, তুই খুব বুঝদার।' রায় সুরেশের উচ্ছ্বাস থামিয়ে দিয়ে প্রদীপকে বলেন, 'এবার আসল কথাবার্তাগুলো একটু সেরে ফেলতে হয়। তুমি. .'

প্রদীপ হেসে বাধা দিয়ে বলে, 'না আমি আর কিছু নয়! এই ঠিকানা দিচ্ছি। যা লেখবার মাকে লিখুন।'

'তাতেই হবে?' রায় একটু চিন্তিত।

'হবে বলেই জানি।' বলে আশ্বাস দিয়ে প্রদীপ জানায়, 'তারিখটা শুধু আমি স্থির করতে চাই। এই তেসরা জুলাই।'

'তেসরা জুলাই।' সুরেশ উদ্বিগ্ন হয়ে বলে, 'কিন্তু সেটা যে বাড়ি ছাড়ার তারিখ!'

'সেই জন্যেই তো!' প্রদীপ জোর দিয়ে জানায়।

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিক আছে।' রায় সোৎসাহে সমর্থন করেন, 'ওই তেসরা জুলাই-ই ঠিক।'

কয়েকদিন পরের কথা।

নীলা ফেল করার দুঃখটা এ কয়েকদিনে অনেকটা সামলে উঠেছে। তাছাড়া খবরটা সুরেশ যেমন এনেছিল ততটা খারাপ নয়। আগের তালিকায় নাম না থাকলেও কম্পার্টমেন্টালে তার নাম আছে। সুরেশ সেইটেই দেখে আসেনি।

নীলার মেজাজটা তাই এখন প্রায় খুশিই বলা যায়।

মেজাজটা আরও খোশ হয়ে যায় সেদিন সকালেই তার নামে একটি চিঠি পেয়ে। সকালবেলা সুরেশই তার হাতে একটা বেশ বাহারে খাম এনে দেয়।

বলে, 'এই নে নীলু, তোর একটা চিঠি। কিন্তু এ যেন বড়-গোছের কোনও অফিসের চিঠি মনে হচ্ছে! দরখাস্ত করেছিলি নাকি চাকরির?'

'চাকরির দরখাস্ত? কই না তো!' নীলাও খামটা হাতে নিয়ে প্রথমে একটু অবাক হয়। তার নামে এরকম চিঠি কোথা থেকে আসতে পারে!

সুরেশ চিঠিটা দিয়ে চলে যাওয়ার পর সেটা খুলে পড়ে নীলা আর ধৈর্য ধরতে পারে না।

তৎক্ষণাৎ গিয়ে প্রদীপের দরজায় টোকা দিয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'আসতে পারি?'

'আসুন। দরজা খোলাই আছে।' ভেতর থেকে প্রদীপের গলা পাওয়া যায়।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে নীলার অদ্ভুত লাগে। প্রদীপও তার টেবিলে বসে একমনে একটা চিঠি পড়ছে। নীলা ঘরে ঢুকতে একবার সেদিকে চেয়েই সে আবার চিঠিতেই মনোযোগ দেয়।

'শুনছেন!' নীলা গলাটার উত্তেজনা চেপে রাখতেই পারে না।

'হুঁ।' প্রদীপের কিন্তু তেমন কোনও সাড়াই নেই।

এবার চিঠিটা সামনে এগিয়ে ধরে নীলা সোৎসাহে বলে, 'এই দেখুন চিঠি এসেছে! কোথা থেকে বলুন তো?'

প্রদীপ তবুও নিরুৎসুক। নিজের চিঠিটাই পড়তে-পড়তে সে যেন অন্যমনস্কভাবে বলে, 'কী করে জানব!'

নীলা তখনও নিজের উৎসাহেই ভরপুর। উত্তেজিতভাবে বলে, 'বুঝতে পারলেন না তো? এই চিঠি সেই আর্ট পাবলিসিটি করপোরেশন থেকে, যেখানে আপনি ছবি দিতে গেছলেন!'

এমন একটা খবরও প্রদীপ যেন গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না। যেন সম্পূর্ণ উদাসীনভাবে শুধু বলে, 'ওঃ।'

'শুধু ও!' এবার নীলাই বেশ ক্ষুণ্ণ। 'কী লিখেছে জানেন?'

'না।'—প্রদীপের সংক্ষিপ্ত নির্লিপ্ত জবাব।

নীলার আর ধৈর্য থাকে না। একটু ঝাঁজের সঙ্গেই বলে, 'কী বাজে চিঠি পড়ছেন?'

প্রদীপ নেহাত যেন অনিচ্ছায় চিঠিটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখার পর নীলা আসল খবরটা জানিয়ে প্রদীপকে চমকে দিতে চায়।

'শুনুন, ছবিটা ফার্স্ট হয়েছে কম্পিটিশনে! আপনার ছবিটা।'

এ খবর জানবার পরও শুধু একটু শুষ্ক গলায় 'তাই নাকি!' বলে প্রদীপ যদি আবার তার নিজের চিঠিটা পড়তে মন দেয় তাহলে নীলার মেজাজ বিগড়ে যাওয়া অন্যায় নিশ্চয়ই নয়।

বেশ একটু বিরক্তির সঙ্গে নীলা বলে, 'কথাটা বুঝতে পারলেন না বুঝি? না আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না? কী চিঠি পড়ছেন অত মন দিয়ে? কার চিঠি?'

'মা-র।' বলে প্রদীপ নীলার মুখের দিকে তাকায়।

মা-র নাম শুনে নীলার ক্ষোভটা অবশ্য তখুনি দূর হয়ে যায়। প্রদীপের এত মনোযোগ দিয়ে চিঠিটা পড়ার দরুন একটু উদ্বিগ্ন হয়েই জিজ্ঞাসা করে, 'কিছু খারাপ খবর আছে নাকি?'

'না, খারাপ ঠিক নয়। তবে' —প্রদীপ কিছু একটা যেন চেপে যায়।

'তবে কী?' নীলা জবাব চায়।

'মানে, আমায় বাড়ি যেতে হবে কালই।' প্রদীপ যেন অনিচ্ছার সঙ্গে জানায়।

'কালই? কেন?' নীলা ভুরু কোঁচকায়।

'আর কেন! জরুরি দরকার।' এবার প্রদীপের মুখে কি একটু হাসির আভাস?

'হ্যাঁ, কিন্তু জরুরি দরকারটা কী?' নীলার গলায় বিস্ময়ের সঙ্গে অধৈর্য।

'বিয়ে।' প্রদীপের সংক্ষিপ্ত জবাব।

'বিয়ে?' নীলা কেমন বিমূঢ়, 'কার? আপনার বোন ইলার?'

'না, আমার।' প্রদীপ যেন যন্ত্রের মতো রেডিওর খবর শোনায়।

'আপনার?' নীলার গলাটা কি হঠাৎ ধরে গেছে? মুখ-চোখের ভাবই বা অমন বদলে অসুস্থ দেখায় কেন?

'হ্যাঁ, মা সব ঠিক করে ফেলেছেন।' প্রদীপের যান্ত্রিক উত্তর।

'ও' থমথমে মুখে জিজ্ঞাসা করে নীলা, 'আপনি তাহলে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, মা-র যখন হুকুম।' প্রদীপ যেন মাতৃভক্তি ও বাধ্যতার আদর্শ।

'ও মা'র হুকুমে আপনি বিয়ে করছেন?' নীলার গলাটা আরও যেন ধরা মনে হয়।

'হ্যাঁ, আপনিই তো বলেছেন,' প্রদীপ নীলাকেই দায়ী করে, 'মা-র কথা অমান্য করা বা মাকে দুঃখ দেওয়া উচিত নয়।'

'তা তো বলেইছি।' নীলা জোর দিয়ে বলবার চেষ্টা করে, 'মা-র কথা অমান্য করবেন কেন? মা যখন বলেছেন তখন নিশ্চয়ই বিয়ে করবেন, সে যাকেই হোক।'

'হুঁ, তা না করে আর উপায় কী?' প্রদীপ যেন নির্বিকার।

'আচ্ছা, এই নিন আপনার ছবির প্রাইজ পাওয়ার চিঠি।' নীলা চিঠিটা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দেয়।

প্রদীপ সেটায় হাত না দিয়েই নিরাসক্তভাবে বলে, 'কিন্তু এ চিঠি আমাকে কেন?'

'আপনাকে ছাড়া কাকে দেব? ছবি তো আপনারই!' এবারে বেশ একটু ঝঙ্কার দিয়েই বলে নীলা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

নীলা চলে যাওয়ার পর প্রদীপের মুখে-চোখে অমন চাপা হাসি কেন ফুটে ওঠে সেটা অবশ্য ভাববার বিষয়।

নীলার আজকের দিনটা ভালোভাবে বোধহয় শুরু হয়নি।

প্রদীপের ঘর থেকে ঝড়ের মতো বেরিয়ে নিজের তেতলার ঘরে সে উঠে যায়। কিন্তু হঠাৎ তার কেমন যেন এ বাড়িটাই অসহ্য মনে হয়।

নেহাত সাধারণভাবে শাড়িটা বদলে সে একজন বন্ধুর বাড়ি যাওয়ার জন্যেই নিচে নেমে আসে।

সেখানেই বারান্দায় মামাবাবুর সঙ্গে দেখা।

যাচ্ছিস কোথায় নীলু?' রায় ডেকে বলেন, 'তোকেই যে খুঁজছিলাম।'

'আমায়? কী জন্যে?' নীলা অনিচ্ছার সঙ্গে দাঁড়ায়।

রায় কাছে এসে সস্নেহে বলেন, 'এবার কিন্তু তোর মত না দিলে চলবে না।'

'কীসের মত?' নীলা ভুরু কুঁচকে তাকায়।

'কীসের আবার! শুনলেই বুঝবি।' রায়ের মুখে গর্ব ও আনন্দের হাসি যেন ধরে না, 'এবার যা সম্বন্ধ করেছি।'

'কীসের সম্বন্ধ? বিয়ের?' নীলার মুখের ভ্রুকুটি আরও তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।' রায় তাড়াতাড়ি আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করেন, 'আগেই চটছিস কেন? আগে শোন না।'

নীলার জবাবে কিন্তু রায়কেই হতভম্ব হতে হয়।

'শোনবার আমার কোনও দরকার নেই। যেখানে যার সঙ্গে খুশি বিয়ে দিতে পারো। আমি রাজি।'

ঝাঁঝালো গলায় বেপরোয়াভাবে কথাগুলো বলে নীলা চলে যায়।

বিমূঢ় বিহ্বলভাবে রায় পিছু ডাকেন, 'ও নীলা, নিলু শুনে যা।'

কিন্তু নীলা তখন সে তল্লাটে নেই।

মামার ডাক শুনে সুরেশই ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

'কী হল কী মামা?' সুরেশ জিজ্ঞাসা করে, 'নীলাকে ডাকছ কেন?'

রায় যেন হতাশভাবে বলেন, 'নীলা রাজি।'

'রাজি!' সুরেশ উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, 'হবেই জানতাম। কিন্তু তুমি মুখখানা অমন করে আছ কেন?'

'আছি তাজ্জব বনে গিয়ে।' রায় চিন্তিতমুখে জানান, 'কে, কী, কোথায় কিছুই না জেনে নীলু রাজি হয়ে গেল!'

'তাও তো বটে!' সুরেশকেও এবার ভাবিত হতে হয়।

এতদিক কোনরকমে সামলাবার ব্যবস্থার পরও ঘাটের কাছে এসে বুঝি ভরাডুবি হয়!

সিটি হাউস এজেন্টস-এর অফিসে যাকে বলে সঙ্কটজনক অবস্থা। বিয়ের আর কদিন মাত্র বাকি। 'যা চাই পাবেন'-এর দরজা বন্ধ করে সুরেশ মামার অফিসঘরে বসে তাঁর নির্দেশে একগাদা খামের ওপর ঠিকানা লিখছিল। হঠাৎ দরজার দিকে চেয়েই তার চক্ষুস্থির। এক-আধজন নয়, দু-অফিসের বুঝি সব মক্কেলই একসঙ্গে সেখানে প্রায় মারমূর্তি নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের মুখ-চোখের চেহারা দেখেই বুঝতে বাকি থাকে না যে মামা-ভাগনের দু অফিসের সব চালাকি এবার ধরে ফেলেই তারা একজোট হয়ে এখানে এসে চড়াও হয়েছে।

রায় তখন বলছেন, 'হ্যাঁ, এবার লেখো মনোহর চন্দ্র তরফদার।'

দরজার দিকে পিছন ফিরে থাকার দরুন ব্যাপারটা তিনি তখনও বোঝেননি।

সুরেশ কিন্তু কলম তুলে নিয়ে পুরানো প্যাঁচটাই একবার চালাবার চেষ্টা করে দেখে। মুখে বিরক্তি ফুটিয়ে মেজাজ দেখিয়ে বলে, 'না, না ওসব আমি লিখতে পারব না। আপনার পাওনাদারের লিস্টি আমার লেখার কি দায় পড়েছে!'

পেছনে তাকিয়ে ও সুরেশের কথার ধরনের ব্যাপারটা আঁচ করে নিতে রায়ের দেরি হয় না।

'বেশ! বেশ! না লিখতে চাও লিখো না!' তিনিও নাক উঁচিয়ে অবজ্ঞাভরে বলেন, 'কিন্তু জেনে রাখো ছোকরা, এসব পাওনাদার নয়, ক্লায়েন্টস—মানে মক্কেল। এসব মক্কেল একটা-দুটো পেলে লালবাতিটা হয়তো তোমায় আর জ্বালতে হতো না। নেহাত নিজে এত সামলাতে পারছি না বলে তোমাকে কয়েকটা খয়রাত করছিলাম।'

কিন্তু এবার আর কথায় চিঁড়ে ভেজে না! এ চালে কাজ হয় না।

ভূতনাথ সামন্তই এ দলের চাঁই। পালিশ করা পিপের মতো চেহারা। ভাঁটার মতো গোল মুখে সতেজ কাইজারি গোঁফের বাহার।

সামনে এসে সেই গোঁফ নেড়ে তিনি যেন কথার গুলতি ছুঁড়ে বলেন, 'থাক।'

রায় ভেতরে-ভেতরে একটু প্রমাদ গণেন। কিন্তু বাইরে তা জানতে দেওয়ার পাত্র তিনি নন। স্রোত বুঝে হাল ঘোরানোই তাঁর কেরামতি।

যেন সমর্থন পেয়ে খুশি হয়ে তিনি বলেন, 'যা বলেছেন। আহাম্মককে তার নিজের ভালোও বোঝানো যায় না। ওই যে কথায় বলে...'

'থাক।'—আবার ভূতনাথ সামন্তর গুলতি।

রায়মশাই যেন অবাক হয়ে বলেন,—'আজ্ঞে?'

'আমি বলছি, থাক।'—ভূতনাথ ঈষৎ বিশদ হন।

'নিশ্চয়, নিশ্চয়।' রায় উপযুক্ত সমঝদার পেয়ে যেন বাধিত, 'আহাম্মককে সুবুদ্ধি দেওয়া আর বেনাবনে মুক্তো ছড়ানো দুই-ই সমান।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' ভূতনাথ সামন্ত কড়া গলায় বলেন, 'বৃথা আর ভাঁওতা দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। আপনাদের কোনও চালাকিই জানতে আমাদের বাকি নেই।'

রায় একবার মক্কেলদেব মারমূর্তি চেহারাগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে সুরেশের কাছেই বিমূঢ় আবেদন জানান, 'এঁরা কী বলছেন হে?'

'কী বলছি এখনও বুঝতে পারছেন না?' ভূতনাথ গুলতি ছেড়ে এবার মেশিনগান ধরেন, 'ভেবেছেন কী আপনারা? মামা-ভাগনে মিলে এই ফাঁকির ব্যবসায় চিরকাল পার পেয়ে যাবেন! দুজনে মিলে আমাদের নিয়ে একেবারে ছিনিমিনি খেলেছেন! সব চালাকির শেষ এবার কী করে করতে হয় দেখাচ্ছি। ঘুঘু-ই শুধু দেখেছেন, এবার ফাঁদ দেখিয়ে ছাড়ব। এই যাচ্ছি আমরা থানায়!'

'যাচ্ছেন, যান!' রায়েব এখন আবার অন্য চেহারা। অনেক উঁচু থেকে যেন অবজ্ঞা মেশানো বিদ্রুপের সুরে বলেন, 'তা নালিশটা কী করবেন, জানতে পারি? আমাদের মামা-ভাগনে হওয়াটা ঠিক ক্রিমিন্যাল জুরিসপ্রুডেন্সের মধ্যে পড়ে বলে তো মনে হয় না।'

ভূতনাথ সামন্ত এবার বুঝি একটু ভড়কে যান। তবু গলার তেজ না কমিয়ে বলেন, 'মামা-ভাগনে হয়ে আপনারা যে আমাদের সকলকে এতদিন ধরে...'

'থাক।' রায় সুদ সুদ্ধ ফেরত দেন।

'আজ্ঞে!' বেশ একটু চমকে ভূতনাথ আবার শুরু করেন, 'আমি বলতে চাই, মামা ভাগনে মিলে...'

'থাক।'

'কেন থাকবে কেন?' মেশিনগানের বদলে এবার যেন ভূতনাথ সামন্তর ভাষা বেহালার বিলাপ, 'আমাদের বাড়ি দেব বলে এতদিন যে সাট্‌ল্ কক-এর মতো এ অফিস থেকে ও অফিসে ছোড়াছুড়ি করেছেন'।

'আমি বলছি, বাজে কথা থাক।' ভূতনাথ সামন্তকে থামিয়ে দিয়ে রায় ভারিক্কি চালে বলেন, 'আপনারা বাড়ি চান অথচ পাননি, এই তো আপনাদের নালিশ?'

'আলবত তাই!' বলেন ভূতনাথ।

'কিন্তু বাড়ি পেলে তো আর নালিশ থাকবে না?' রায় নৈয়ায়িক হয়ে ওঠেন।

'না।' এবার ভূতনাথের সঙ্গে সমস্বরে বলেন মক্কেলরা।

'বেশ!' রায় বরাভয় মূর্তি ধারণ করেন, 'বাড়ি যাতে পান, সেই ব্যবস্থাই করছিলাম। দে সুরো, ওঁদের নামের সব চিঠিগুলো দিয়ে দে এবার।'

সুরেশকে আর দুবার বলতে হয় না। নাম দেখে-দেখে সকলের হাতে সে একটা করে লেফাফা গছিয়ে দেয়।

লেফাফাগুলো হাতে নিয়ে সবাই একটু হতভম্ব।

ভূতনাথ সামন্তই সকলের মনোভাবটা ব্যক্ত করেন, 'এ চিঠিতে হবে কী! এ তো বন্ধ চিঠি!'

'উঁহু, উঁহু!' মক্কেলদের একজনকে লেফাফাটা ছেঁড়ার উপক্রম করতে দেখে রায় আঙুল তুলে নিষেধ করে বলেন, 'এখানে নয়, বাড়ি গিয়ে চিঠি খুলবেন। ঠিকানা, সময় সবই ওতে দেওয়া আছে। ওই নির্দেশমতো হাজির হলেই বাড়ির সমস্যা আপনাদের মিটে যাবে।'

'হাজির হলেই মিটে যাবে?' ভূতনাথ সামন্ত বেশ সন্দিগ্ধ, 'আর যদি না মেটে?'

'থানা-আদালত তখনও খোলা থাকবে নিশ্চয়ই।' রায়ের সংক্ষিপ্ত সাফ জবাব।

'বেশ দেখি। এই শেষবার!' বলে ভূতনাথ সামন্ত আর সকলকে নিয়ে বেরিয়ে যান।

রায় চেয়ারে হেলান দিয়ে এলিয়ে পড়ে বলেন, 'পাখাটা আর একটা পয়েন্ট বাড়িয়ে দিতে পারিস?'

'বাড়াব কী!' সুরেশ করুণ সুরে বলে, 'পাখা তো ফুল পয়েন্টে চলছে!'

সাত

আজ সেই তেসরা জুলাই, বাংলামতে আঠারোই আষাঢ়।

সারা দিনটা ডাঃ বনবিহারী ঘোষের একটু খারাপই গেছে বলতে হয়।

সকালবেলা নিয়মিত চায়ের বদলে বাড়ির পরিচারক নিবারণ শুধু একগ্লাস সরবত রেখে গেছল। ডাঃ ঘোষ রেগে ধমক দেওয়ায় ঘোষজায়া নিজেই এসে বলেছিলেন যে আজ তাঁর ব্রতের জন্যে বাড়িতে অরন্ধন। আজ সারাদিন ডাঃ ঘোষকে তাই শুধু সরবত খেয়েই কাটাতে হবে।

ডাঃ ঘোষ তীব্র আপত্তি জানিয়েছেন।

ঘোষজায়া তাতে বলেছেন, 'ব্রতটা নীলুব কল্যাণের জন্যে। এখন খাওয়া না খাওয়া ডাঃ ঘোষের ইচ্ছে।'

ডাঃ ঘোষ মুখে তম্বি করেছেন, 'নীলুর কল্যাণ তো আমার কী! ওদের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক!'

সরবতের গ্লাসটা কিন্তু খালি হয়ে গেছে তারপর।

চাপা গর্জন করে ডাঃ ঘোষ তারপর বেরিয়ে গেছেন। ১৪ নম্বর অঘোর ঘোষাল লেন থেকে আজ সবাইকে তাড়াবার দিন।

বেলিফ দারোয়ান পুলিশ নিয়ে সেখানে গিয়েও কিন্তু হতাশ হয়েছেন। তিনি আসবার আগেই বাড়ি ছেড়ে সবাই হাওয়া। একা মধু সেখানে উপস্থিত। সামনাসামনি আস্ফালন করে তাড়াবার সুখটুকু সুতরাং তাঁর হয়নি।

বাড়ি ফিরে মেজাজ আরও গরম হয়ে গেছে। নিবারণের কাছে জেনেছেন যে গৃহিণী ব্রতের পুজো দেওয়ার জন্যে গাড়িটি নিয়ে চলে গেছেন। কোথায় গেছেন, কখন ফিরবেন

কিছুই বলে যাননি।

দুপুরে আর একবার শুধু সরবতই খেতে হয়েছে! তারপর বিকেলের একটু আগে ফোনে অদ্ভুত এক কল এসেছে। মফস্বল থেকে কোনও রুগিকে কলকাতার এক ঠিকানায় আনা হচ্ছে। বিশেষ গুরুতর কেস। সন্ধ্যার পর তাঁকে সেখানে কলে যেতে হবে।

সন্ধ্যার সময় বেরুবার জন্যে পোশাক পরতে গিয়ে একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছেন ডাঃ ঘোষ।

তাঁর নিত্য-নৈমিত্তিক কোট-প্যান্ট-শার্টের বদলে, কোঁচানো ধুতি-পাঞ্জাবি-চাদর এনে দিয়েছে নিবারণ।

খেপে উঠে ডাঃ ঘোষ বলেছেন, 'এই আমার পোশাক! আমি কি নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছি!'

'আজ্ঞে, মা তো এই বার করে দিয়ে গেছেন।' মাথা চুলকে বলেছে নিবারণ।

'তিনি বার করে দিয়েছেন বলে আমায় সং সাজতে হবে!' ডাঃ ঘোষ ধমক দিয়েছেন, 'বার কর আমার স্যুট।'

কোনও স্যুট তো আজ নেই।' নিবারণ জানিয়েছে, 'মা সব আলমারিতে বন্ধ করে গেছেন। চাবিও তেনার কাছে!'

অগত্যা সেই পোশাক পরেই ডাঃ ঘোষকে ট্যাক্সি ডাকিয়ে রুগি দেখতে বার হতে হয়েছে।

ঠিকানা খুঁজে বার করে তিনি হতভম্ব। ফুল-লতা-পাতা-আলোয় সাজানো একটা স্কুলবাড়ি। গেটের মাথায় মাচার ওপর সানাই বাজছে!

ট্যাক্সি থামিয়ে নামবেন কি না ভাবছেন এমন সময় রায়কেই ছুটে আসতে দেখে তিনি একেবারে পটকার বারুদ হয়ে ওঠেন।

রায় এসে একগাল হেসে দরজা খুলে বলেন, 'আসুন! আসুন ডাক্তারবাবু।'

ডাঃ ঘোষ এবার ফেটে পড়ে বলেন, 'তুমি! তোমার এই সব চালাকি? আমায় এখানে রুগি দেখতে ডেকেছ?'

'চালাকি নয় ভাই, সত্যি বড় কঠিন রোগ। রোগ আমাব নিজেরই।' রায় গম্ভীর হওয়ার ভান করে বলেন, 'মরণ-বাঁচন এখন তোমার হাতে।'

'আমার হাতে হলে তুমি বাঁচবে ভেবেছ!' ডাঃ ঘোষ বজ্রস্বরে শাসান, 'না, এখানে আর আমি এক মুহূর্তও থাকব না। বন্ধ কর দরজা!'

'আহা, যাবেন কোথায়!' রায় ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়েন, 'বৌঠান ডাকছেন যে!'

'বৌঠান মানে? আমার স্ত্রী! তিনি এখানে এসেছেন!' ঘোষের গলাটা একটু খাদে নামে।

'হ্যাঁ, না এসে পারেন? তোমায় ডাকছেন এখুনি!' রায় হাসেন।

'ডাকলেই আমায় যেতে হবে!' মুখে গজরালেও ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে ডাঃ ঘোষকে রায়ের পিছু-পিছু যেতেই হয়।

বাইরের উঠোনের সাজানো মণ্ডপ ছাড়িয়ে ভেতরের বাড়িতে ঢুকেই তিনি কিন্তু থমকে দাঁড়ান।

ব্যাপারটা কী আমায় বলবে!' গভীর সন্দেহের তীব্রস্বরে ডাঃ ঘোষ জিজ্ঞাসা করেন, 'বিয়ে হচ্ছে কার?'

'কার তা এখনও বুঝতে পারছ না!' রায় হেসে বলেন, 'তোমার ভাইঝি নীলুর।'

'নীলুর বিয়ে!' ডাঃ ঘোষ একেবারে অগ্নিশর্মা, 'তুমি নীলুর বিয়ে দিচ্ছ, আর আমায় কিছু জানাওনি!'

'এই তো জানাচ্ছি। না জানাতে চাইলে ডাকতাম!' রায় হাসেন।

জানাবার জন্যে ডেকেছ!' ডাঃ ঘোষের ঠান্ডা হওয়ার কোনও লক্ষণ নেই, 'মেয়েটার হাত-পা বেঁধে কোথায় জলে ফেলে দিচ্ছ তাই দেখাতে আমায় ডেকেছ, কেমন!'

'তা তুমি শানে আছড়ে মারছিলে, আমি না হয় জলে ফেলছি। জলটা কীরকম এখুনি তো দেখবে।' রায় কৌতুকের স্বরে বলেন।

'নিশ্চয়ই দেখব!' ডাঃ ঘোষ গর্জন কবে ওঠেন, 'আর এসেই যখন পড়েছি তখন মেয়েটাকে এমন করে জলে ফেলতে দেব ভেবেছ? ভূতপ্রেত-জংলি একটাকে জোগাড় করেছ নিশ্চয়! ঘাড় ধরে তাকে বার করে দেব!'

'এই যে! চ্যাঁচামেচি শুনেই বুঝেছি, তুমি এসে গেছ!' ডাঃ ঘোষের স্ত্রী, বিনতাদেবী সেখানে এসে দাঁড়ান, 'কই ব্যাগটা বার কর দেখি।'

'ব্যাগ বার করব!' ডাঃ ঘোষ বিমূঢ় হয়ে বলেন, 'ব্যাগ কেন?'

'টাকা দরকার বলে!' বিনতাদেবী গম্ভীরভাবে জানান, 'গোটা কুড়ি টাকা দাও। পান এসেছে। দাম দিতে হবে! আমার কাছে আবার সব একশো টাকার নোট!'

ব্যাগ থেকে টাকা ঠিক বাব কবে দেন ডাঃ ঘোষ, কিন্তু সেই সঙ্গে তীব্র অভিযোগও জানান, 'টাকাকড়ি দিয়ে তুমিও এ বিয়ের ব্যবস্থা কবতে এসেছ। সব তুমি তাহলে জানতে!'

'না জানলে তোমায় সারাদিন সরবত খাইয়ে রাখি, আর ধুতি-পাঞ্জাবি পরিয়ে আনবার ব্যবস্থা করি!' বিনতাদেবী মুখ টিপে হেসে চলে যান।

ডাঃ ঘোষ আবার ফেটে পড়েন, 'কিন্তু আমিও বলছি, এতটুকু খুঁত যদি পাই তো এ বিয়ে আমি ভেঙে দেবই।'

'তাই দিও, দিও।' রায় ঢালাও অনুমতি দেন, 'খানিক আগেই তো উলু দেওয়া আর শাঁখ বাজানো শুনলাম। বর এসে গেছে নিশ্চয়ই। চল, ঘাড়ধাক্কাটা ওই মণ্ডপে গিয়েই দেবে।'

চল বলে রণমূর্তিতে ডাঃ ঘোষ এগিয়ে যান।

মণ্ডপে গিয়ে কিন্তু রায়ই অবাক। বরকে বসাবার যে বিশেষ সাজানো আসন সেখানে পাতা, প্রদীপ তাতে নেই। কাছাকাছি দু-একজনকে জিজ্ঞাসা করেও সঠিক কিছু জানা যায় না।

'সে কি গেল কোথায়? হয় তোমাদের চিনে ফেলেছে, নয় আমার গলার আওয়াজ শুনেই হাওয়া!' ডাঃ ঘোষ বিদ্রুপ করেন।

'কে হাওয়া!' সুরেশ বাইরের কী কাজ থেকে ফিরে কাকাবাবু ও মামার কথা শুনে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে।

'এই যে শকুনি মামার দুর্যোধন ভাগনে!' ডাঃ ঘোষ বিঁধিয়ে-বিঁধিয়ে বলেন, 'দুই ঘুঘুতে মিলে যে প্যাঁচটি খেলেছিলে তা তো ফসকালো।'

'কী হয়েছে কী?'—সুরেশ বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করে।

'কী হয়েছে জানো না!' ডাঃ ঘোষ কড়া গলায় বলেন, 'ধরে-বেঁধে বোনের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার জন্যে যে হতভাগাকে এনেছিলে সে নিজেই পালিয়েছে।'

'পালিয়েছে?'—সুরেশ বিমূঢ়ভাবে মামার দিকে তাকায়।

'কী জানি, কিছু বুঝতে পারছি না।' রায় চিন্তিতভাবে স্বীকার করেন, 'এইখানেই তো থাকবার কথা। এরকম সময় যাবে কোথায়?'

'কোথায় আর যাবে!' ডাঃ ঘোষ মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দেন, 'যে বন থেকে ধরে এনেছিলে, ভড়কে সেখানেই পালিয়েছে। দ্যাখো, এখন বন্দুক-টন্দুক নিয়ে খুঁজে দ্যাখো।'

বিপদের ওপর বিপদ।

বাড়ির ভেতর থেকে হন্তদন্ত হয়ে একজন যা খবর আনে তাতে রায়মশাই আর সুরেশ দুজনেই চোখে একেবারে অন্ধকার দেখেন।

নীলা নাকি সাজাবার সময় থেকেই কাঁদাকাটি করছিল, তারপর হঠাৎ বেঁকে বসে একটা ঘরে গিয়ে দরজায় খিল দিয়েছে। সকলের সাধ্যসাধনাতেও কিছুতেই দরজা খুলছে না।

এদিকে বরের পাত্তা নেই, তার ওপর কনের এই খবর। রায় একেবারে দিশাহারা হয়ে পড়েন।

কথাটা ডাঃ ঘোষেরও কানে যায়।

'কী হয়েছে কী?' ডাঃ ঘোষ রায়ের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেন, 'নীলু ঘরে গিয়ে দরজা এঁটে দিয়েছে? দেবেই তো। ধরেবেঁধে তাকে জলে ফেলাব মতলব ধরে ফেলেছে নিশ্চয়।'

উত্তর না দিয়ে রায় সুরেশের সঙ্গে ভেতর বাড়ির দিকে ছোটেন। ডাঃ ঘোষও যান পিছু-পিছু।

অবস্থা সেখানে সত্যিই সঙিন।

বিনতা দেবী আর কয়েকজনের সঙ্গে বিরস মুখে সেখানে একটি বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

রায়ের সঙ্গে ডাঃ ঘোষ ও সুরেশকে দেখে তিনি হতাশভাবে বলেন, 'আমি হার মানলাম বাপু। তোমরা এখন যা পারো কর। মেয়ের এ বিয়েতে এত আপত্তি তা কি আগে জানি!'

'জানা উচিত ছিল।' ডাঃ ঘোষ টিপ্পনি কাটতে ছাড়েন না। 'টি. কে. রায় যেখানে পাণ্ডা সেখানে গোলমাল একটা কিছু থাকবেই।'

'তুমি থামো,' ধমকে ওঠেন বিনতা দেবী, 'গোলমাল তো তোমার ভাইঝি করছে। এ বিয়েতে যদি আপত্তি থাকে তবে আগে জানায়নি কেন?'

'আপত্তি জানলে এ বিয়ের ব্যবস্থা আমি করি!' রায় করুণ স্বরে জানান, 'নিজের মুখে তখন মত দিয়েছে। কী হয়েছে তাও না হয় একবার বলুক।'

রায় দরজার দিকে এগোতে বিনতা দেবী বাধা দিয়ে বলেন, 'কোনও লাভ নেই ঠাকুরপো। ও দরজাও খুলবে না, বলবেও না কিছু, ওই কাকারই তো ভাইঝি।'

'আলবত।' ডাক্তার ঘোষ তাঁর সমর্থন জানান।

'পাহাড় টলবে তবু ওরা টলবে না।' তিক্তস্বরে বলেন বিনতা দেবী, 'এখন সকলের কাছে মুখ দেখাব কী করে তাই ভাবছি।'

পাহাড় কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে সত্যিই টলে।

হঠাৎ দড়াম করে দরজা খুলে মুখ-চোখ রাঙা অবস্থায় বেরিয়ে এসে নীলা বলে,

'নাও এই এসেছি। কী করতে হবে বল।'

বলা বাহুল্য আনন্দের সাড়া পড়ে যায় চারিদিকে। বিনতা দেবী উচ্ছ্বসিত স্নেহে নীলাকে জড়িয়ে ধরে বলেন, 'লক্ষ্মী মা আমার। একটু ঠান্ডা হয়ে বোস। কী ভাবনায় যে ফেলেছিলি!'

'বেশ, আর তো ভাবনা নেই।' নীলার গলা কিন্তু ঝাঁঝালো, 'যা বলবে তাতেই রাজি আছি।'

'তুই রাজি হলেও আমি রাজি নই।' হঠাৎ বেসুরো হুঙ্কার ছাড়েন ডাঃ ঘোষ। 'ওদের মান রাখতে নিজের সর্বনাশ করতে তোকে দেব না। আমি দেখছি, ছেলের মতো ছেলে যদি না হয়, এ বিয়ে তাহলে বন্ধ।'

ডাঃ ঘোষ এগিয়ে যান।

বিনতা দেবী ব্যস্ত হয়ে ডাকেন, 'শোনো, শোনো। মিছিমিছি কেলেঙ্কারি কোরো না।'

'না, কোনও কথা শুনব না। দরকার হলে ছেলে খুঁজে এনে আমি বিয়ে দেব।' বলে হনহন করে ঘোষ বেরিয়ে যান।

নীলার হঠাৎ বেঁকে গিয়ে দরজা বন্ধ করা, আবার তেমনি আশাতীতভাবে বেরিয়ে আসার রহস্য একটু বোধহয় পরিষ্কার করা দরকার।

প্রদীপের নিজের বিয়ের খবর দেওয়ার ধরনে ভুল বুঝে রাগের মাথায় সে যে-কোনও জায়গায় বিয়েতে মত দিয়ে ফেলেছিল। কার সঙ্গে কোথায় বিয়ে হচ্ছে সে তারপর জানতে যেমন চায়নি, তেমনি সুযোগও হয়নি তার সে খবর জানার।

কিন্তু বিয়ের তারিখ যত এগিয়ে এসেছে তত মন তার বেঁকে দাঁড়িয়েছে।

শেষে বিয়ের কনে হয়ে সাজতে বসার সময় অসহ্য হয়ে উঠেছিল তার বুকের যন্ত্রণা। মরিয়া হয়ে শেষপর্যন্ত তাই সে যে-কোনও উপায়ে এ বিয়ে ঠেকাতে চেয়েছিল।

দরজায় খিল দিয়ে নিজেকে স্বেচ্ছাবন্দিনী করা আর পরে হঠাৎ নিজে থেকে তার বেরিয়ে আসার রহস্যে অবশ্য প্রদীপের হাত আছে।

বিয়ের আসরে প্রদীপকে ডাঃ ঘোষ সুরেশ ও রায় যে দেখতে পাননি তার কারণ নীলা যে ঘরের দরজা বন্ধ করেছিল তারই অন্য দিকের একটি খোলা জানালায় সে তখন গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

নীলা মেঝের ওপর দুই হাঁটুর ভেতর মাথা গুঁজে তখন বসে আছে।

জানলার দিক থেকে ক'বার মৃদু টোকার শব্দ শুনে সেদিকে তাকিয়ে সে অবাক হয়ে গেছে।

বিমূঢ়ভাবে জিজ্ঞাসা করেছে, 'আপনি এখানে!'

'হ্যাঁ, কাছাকাছিই তো।—প্রদীপ যেন শান্ত সহজভাবে বলেছে, 'আমার বিয়েও এই পাড়ায় কি না, তাই আপনার বিয়েটা কীরকম হচ্ছে একবার দেখতে ইচ্ছে হল।'

'ধন্যবাদ।'—নীলার স্বর কঠিন হয়ে উঠেছে, 'আপনার নিজের বিয়েটা হয়ে গেছে বোধহয়।'

'সে আর বলতে।'—প্রদীপ হাসিমুখে জানিয়েছে, 'কখন হয়ে গেছে!'

'কখন হয়ে গেছে? নীলা একটু বুঝি সন্দিগ্ধ, 'সেটা কীরকম? লগ্ন আগে ছিল নাকি?'

'ছিল বইকী।' প্রদীপ নির্বিকারভাবে বলেছে, 'একেবারে পরম লগ্ন। সত্যিকারের বিয়ে লগ্ন ছাড়া হয়?'

একটু থেমে প্রদীপ যেন উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, 'কিন্তু এখানে যেন কী গোলমাল হয়েছে শুনছি? বিয়ে নাকি নাও হতে পারে?'

'কে বললে?' নীলার গলায় ঝঙ্কার।

'না, এই সবাই বলাবলি করছে তাই কানে এল।' প্রদীপ যেন নির্লিপ্তভাবে জানিয়েছে, 'কেউ বলছে বর তেমন সুবিধের নয়; কেউ বলছে, আপনি নাকি বিয়ে করবেন না বলে বেঁকে দাঁড়িয়েছেন। তাই বিয়ে হয়তো হবে-ই না শুনছি।'

'মিথ্যে কথা।'—তীব্র কণ্ঠে বলেছে নীলা।

'ও।'—প্রদীপ যেন আশ্বস্ত, 'কিন্তু আপনি দরজা খুলছেন না কি না। তাই বোধহয় গুজব রটেছে।'

'আমি, আমি,' একটা কৈফিয়ত খুঁজে বার করেছে নীলা, 'ভিড়ের মধ্যে গরম হচ্ছিল বলে ঘরে এসে দরজা দিয়েছিলাম।'

'ও গরম হচ্ছিল! প্রদীপ অদ্ভুত একটু মুখভঙ্গি করে ঘরের ওপর দিকে তাকিয়েছে এবার। সেখানে ফ্যানটা বন্ধ হয়েই আছে।

প্রদীপের চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করে ওপর দিকে চেয়ে ধরা পড়ার লজ্জায় ভাগ্যের ওপর রাগে আর সমস্ত পৃথিবীর ওপর অভিমানে অস্থির হয়ে নীলা সশব্দে দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছে তারপর ঘর থেকে।

ডাঃ ঘোষ ভেতর বাড়ি থেকে নিজের মনে গজরাতে-গজরাতে বাইরে যাচ্ছিলেন।

হঠাৎ নমস্কার শুনে তাকে থমকে দাঁড়াতে হয়।

নমস্কারটা জানিয়েছে অবশ্য প্রদীপ। নীলার ঘরের পেছন থেকে ফিরে আসার সময় সামনে ডাঃ ঘোষকে যেতে দেখে সম্ভাষণ করবার লোভ সে সংবরণ করতে পারেনি।

ডাঃ ঘোষ ফিরে চেয়ে ভুরু কুঁচকে প্রদীপকে খানিক লক্ষ করে বলেন, 'তুমি! তোমায় কোথায় যেন দেখেছি! হুঁ। তুমি ওই সেই ঠগেদের বন্ধু, না? আমার নাকের ওপর সেদিন কী ধরে দিয়েছিলে?'

প্রদীপ একটু লজ্জিতভাবে বলে, 'দেখুন, সেদিন মানে—'

'নো, নো ডোন্ট অ্যাপলোজাইজ্!' ডাঃ ঘোষ অপ্রত্যাশিত উদার সুরে বলেন, 'লজ্জা পাওয়ার তাতে কিছু নেই। ইন্ ফ্যাক্ট্ টু বি ফ্র্যাঙ্ক; এরকম তেজি ছেলেই আমি পছন্দ করি। তখন চটেছিলাম কিন্তু তারিফও করেছিলাম মনে-মনে। তা তুমিও বিয়েতে এসেছ বুঝি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ,' প্রদীপ যেন অপরাধীর মতো স্বীকার করে, 'না এসে কী আর করি!'

'কিন্তু না এলেই ভালো করতে। এসে কোনও লাভ নেই!' ডাঃ ঘোষ গম্ভীরভাবে জানান।

'লাভ নেই?' প্রদীপ বেশ বিমূঢ়।

'না নেই, কারণ এ বিয়ে হবে না। হতে আমি দেব না।' ডাঃ ঘোষ অকপটে তাঁর সংকল্প জানিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'ভাবছ, কেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, তা একটু ভাবছি।' প্রদীপ তার বিমূঢ়তাটা লুকোয় না।

'নীলু—মানে এই নীলিমা আমার ভাইঝি হয়, জানো?' ডাঃ ঘোষ হঠাৎ প্রশ্ন করে বসেন, 'কীরকম মেয়ে নীলু?'

'আজ্ঞে, তা—তা...' প্রদীপকে একটু থতমত খেতেই হয়।

'ডোন্ট বি শাই!' ডাঃ ঘোষ ভরসা দেন, 'আমতা-আমতা করবার কিছু নেই। তুমি একজন ইয়ং ম্যান, নীলুকে লক্ষই করনি এমন হতে পারে না। হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অফ হার?'

'তা খুব ভালো মেয়ে!' প্রদীপ এবার অকুণ্ঠিতভাবে বলে, 'ওয়ান ইন এ মিলিয়ান। লাখে একটা!'

'ঠিক! ঠিক!' ডাঃ ঘোষ তারিফ করেন প্রদীপের স্পষ্টবাদিতার, 'ওই মেয়েকে একটা অকাল-কুষ্মাণ্ডের হাতে তুলে দিলে তুমি কী করতে?'

'আপত্তি করতাম! ভীষণ আপত্তি করতাম!' প্রদীপের এবার চটপট জবাব।

'বেশ!' খুশি হয়ে ডাঃ ঘোষ আবার জিজ্ঞাসা করেন, 'ওরকম মেয়ের কী ধরনের ছেলের সঙ্গে বিয়ে হওয়া উচিত মনে কর?'

'দস্তুরমতো ভালো ছেলে!' প্রদীপের আর আড়ষ্টতা নেই, 'বেশ সুস্থ সবল বুদ্ধিমান সাহসী সচ্চরিত্র আর চেহারাটা অন্তত চলনসই!'

'কারেক্ট!' ডাঃ ঘোষ অনুমোদন করে বলেন, 'কিন্তু শুধু কি তাই?'

'না, গুণও কিছু দরকার!' প্রদীপ উৎসাহের সঙ্গে জানায়, 'যেমন অবস্থা সচ্ছল, শিক্ষা-দীক্ষা কিছু থাকবে আর সেই সঙ্গে একটা কিছু বিশেষত্ব থাকলে ভালো হয়। এই যেমন—আপনি অনুমতি দিলে বলি—'

'হ্যাঁ, বল-বল।' ডাঃ ঘোষ উৎসাহ দেন।

'এই যেমন ধরুন,' প্রদীপ সবিনয়ে বলে, 'আমি একটু ছবিটবি আঁকি। আশা আছে একদিন সে ছবির আদর হবে।'

'নিশ্চয়ই হবে! নিশ্চয়!' ডাঃ ঘোষকে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ মনে হয়, 'এই তোমার মতো ছেলেও যদি একটা ওরা ধরে আনতে পারত।'

রায় আর সুরেশ খোঁজাখুঁজি করতে-করতে এদিকে এসে শেষ কথাগুলো শুনে ব্যাপারটা আন্দাজ করতে ভুল করেন না।

ডাঃ ঘোষ তাদের দেখে গম্ভীরভাবে বলেন, 'এই যে, তোমরা এসেছ। সে হতভাগাকে খুঁজে পাওনি নিশ্চয়ই। পাবেও না। কিন্তু এই তো একজন যাকে বলে আধুনিক তরুণ যুবক। আমি না হয় একটা প্রেজুডিসড ওল্ড ফসিল। কিন্তু এ-ও কী বলছে শোনো। নীলুর যেখানে সেখানে বিয়ে দেওয়া চলতে পারে না।'

'তা অবশ্য ঠিক!' রায় যেন বাধ্য হয়ে স্বীকার করেন।

'তা যদি ঠিক হয়, তো করেছ কী?' ডাঃ ঘোষ চড়াগলায় বলেন, 'এই তো এ ছেলেও তোমাদের সামনে ছিল। দি মোস্ট এলিজিবল ব্রাইডগ্রুম। চোখে কি ঠুলি দিয়ে ছিলে?'

'তা প্রদীপকে তোমার পছন্দ হয়?' রায় যেন নেহাত কথার কথা জিজ্ঞাসা করেন।

'একশোবার হয়!' জানিয়ে ডাঃ ঘোষ প্রদীপের দিকে ফেরেন, 'হ্যাঁ যদি কিছু মনে না কর, আর ইউ ম্যারেড?'

'আজ্ঞে না।' প্রদীপ সসংকোচে জানায়।

'খুব ভালো।' ডাঃ ঘোষ সোৎসাহে বলেন, 'তাহলে তৈরি হও এখুনি।'

'এখুনি তৈরি হতে বলছেন, কিন্তু...'

'কোনও কিন্তু এতে নেই। তুমি নিজেই বলেছ, নীলু মেয়ে হিসেবে লাখের মধ্যে

এক। আর তাছাড়া একটা মেয়েকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করবার মতো পৌরুষও তোমার থাকা উচিত।'

'হ্যাঁ, চোখ-কান বুজে রাজিই হয়ে পড় প্রদীপ।' রায় পরামর্শ দেন, 'ও বুনো ঘোষ যখন ধরেছে তখন আর ছাড়ান-ছিড়েন নেই।'

'কিন্তু যে হতভাগাকে আপনারা খুঁজে পেতে এনেছিলেন তার কী গতি হবে একটু ভেবেছেন?' প্রদীপ ফ্যাকড়া তোলে।

'সে কিছু ভাবতে হবে না।' ডাঃ ঘোষ ভরসা দেন, 'তাকে আমি এখুনি দূর করে আসছি!'

'আহা তুমি কেন? তুমি কেন?' রায় বাধা দেন, 'এসব নোংরা কাজের জন্যে তো আমি আছি। তুমি ততক্ষণ গিয়ে বসে পড়ো। তোমাকেই কন্যা সম্প্রদান করতে হবে কিনা।'

'আমাকে!'—ডাঃ ঘোষ একটু বিব্রত।

'আবার কাকে?' রায় এবার হুকুমের সুরে বলেন, 'যাও-যাও, দেরি কোর না। যা সুরো, প্রদীপকে নিয়ে যা। মেয়েদের মহলে খবর দে, আর ওই মক্কেলদের যে নেমন্তন্ন করে আনিয়েছি তাদেরও বলে দে তাদের সমস্যা মিটে গেছে।'

'মক্কেল? সে আবার কী!'—ডাঃ ঘোষ সন্দিগ্ধ।

'সে কিছু নয়।' রায় আশ্বাস দেন, 'এই বিয়ের আনুসঙ্গিক। তুমি এখন যথাস্থানে গিয়ে বোসো তো।'

'হ্যাঁ যাচ্ছি! চল প্রদীপ।' বলে এগিয়ে একটু আলোর জায়গায় পৌঁছেই প্রদীপকে লক্ষ করে ডাঃ ঘোষ হঠাৎ থেমে যান।

তারপর সবিস্ময়ে বলেন, 'আরে তোমার তো ফোঁটা-টোঁটা কাটাই আছে দেখছি! আশ্চর্য!'

'আজ্ঞে ওটা কী বলে ইন অ্যান্টিসিপেশন মানে ধরুন দূরদর্শিতা!' প্রদীপ সলজ্জভাবে জানায়।

'দূরদর্শিতা! অ্যাঁ?—ডাঃ ঘোষ কেমন বিমূঢ়।

'আসুন-আসুন কাকাবাবু!' সুরেশ তাঁর হাত ধরে টেনে বলে, 'দূরদর্শিতার কথা ভাবতে গিয়ে আবার কাজের লগ্ন না ফসকে যায়।'

সমাপ্তির পর একটু উপসংহার না থাকলে বুঝি চলে না।

বিয়ে অবশ্য নির্বিঘ্নেই সমাধা হয়েছে। শুভদৃষ্টির সময় একটু যা বেগ পেতে হয়েছিল নাপিত ও এয়োদের।

নীলা কিছুতেই প্রথমে মুখের ঢাকা খুলবে না।

সবাই যখন হার মেনে চিন্তিত হয়ে উঠেছে তখন বরই একটু মৃদু কৌতুকের স্বরে বলেছে, 'আপনারা চোখ চাওয়াতে অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? অন্ধ মেয়েরও কি বিয়ে হয় না?'

সেই মুহূর্তেই যেন ভোজবাজিতে চোখ থেকে হাত-ঢাকা সরে গেছে নীলার।

আর তারপর নীলার অবস্থাটা কী হয়েছে তা বোঝাবার চেষ্টা না করাই ভালো।

বিয়ের পাট চুকে যাওয়ার পর ডাঃ ঘোষকে নিয়েই যেন সমারোহ লেগে গেছে।

রায় নিজে বন্ধুকে ধরে নিয়ে গিয়ে গরদের ধুতি-চাদর ছাড়িয়ে পোশাক বদলাবার

ব্যবস্থা করেছেন। তারপর হাঁকডাক লাগিয়ে বলেছেন, 'কইরে সুরো, তোর কাকাবাবুর খাওয়ার ব্যবস্থা কই?'

সুরেশ মুখ টিপে হেসে বলেছে, 'সব ব্যবস্থা করে রেখেছি মামা। চলুন না।'

খাওয়ার জায়গায় যেতে-যেতে ঘোষ বলেছেন, 'শুধু আমি একলা খাব নাকি? তোমরা খাবে না?'

'খাব, খাব', রায় আশ্বাস দিয়েছেন, 'আমরা কি বাদ যাব! তবে তুমি সারাদিন একরকম উপোসী আছ, সরবত ছাড়া আর কিছুই তো জোটেনি, তাই।'

ঘোষ নেমে গিয়ে একটু সন্দিগ্ধভাবে বলেছেন, 'তুমি, তুমি কী করে জানলে আমি সরবত খেয়ে আছি?'

'আজ যে বৌঠানের অরন্ধন ব্রত-র দিন তা কি আমি জানি না।' বলে রায় অবস্থাটা সামলেছেন।

'খাবারের জায়গায় গিয়ে ঘোষ কিন্তু আবাব ভুরু কোঁচকান। এবার অবশ্য সন্দেহ বিরক্তিতে নয়, বিস্ময়ে। চর্বচোষ্য হরেক রকম তো আছেই তার ওপর বড়-বড় প্লেটে ল্যাংড়া আমের প্রায় পাহাড়।

'একী এত ল্যাংড়া আম কেন?' ঘোষ বলেন, 'আমি কি রাক্ষস নাকি!'

'সব কি আর তোমার জন্যে!' রায় মুচকে হাসেন, 'আমারও তো চাই।'

'তুমি! তুমি ল্যাংড়া আম খাবে কীরকম?' ঘোষ জবাবদিহি চান, 'তুমি না ল্যাংড়া আম ছোঁবে না বলেছিলে!'

'তা তো বলেছিলাম। কিন্তু সে দিব্যি কেটে গেছে কিনা!' রায়ের সেই মুখটেপা হাসি।

'কেটে গেছে মানে?' ঘোষ একটু সন্দিগ্ধ. 'বাজিতে তুমি জিতেছ?'

'তা নীলুর বিয়ে সেই এক মাসের মধ্যেই যখন হ'ল আর তোমার হাত দিয়েই। তখন জেতাই বলতে হয় বইকী?' রায়ের মুখে চাপা হাসি।

'ও! ও!' ঘোষ দুবার নাসিকাধ্বনি করেন। তারপর সদর্পে বলে ওঠেন, 'কিন্তু পাত্র! পাত্র জোগাড় করেছে কে? এই আমি তো?'

'নিশ্চয়ই।' রায় যেন মেনে নিয়ে বলেন, তুমিই যোগাড় করেছ, তবে তার আগে জুগিয়ে রেখেছিলাম এই আমরা।'

'কীরকম!' ঘোষ একটু বিমূঢ়, 'ওই প্রদীপই তোমাদের পাত্র!'

একটু থেমে বিস্ময়বিস্ফারিত চোখে ঘোষ আবার বলেন, 'ও তাই একেবারে ফোঁটা-টোঁটা কেটে তৈরি ছিল?'

জবাব না দিয়ে রায় কৌতুকভরা দৃষ্টিতে বন্ধুব দিকে তাকিয়ে থাকেন।

'আচ্ছা,' ডাঃ ঘোষ ফেটেই পড়েন। কিন্তু রাগে নয়, হাসিতে। হাসতে-হাসতে বন্ধুর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলেন, 'তাহলে টি. কে. রায়, শেষপর্যন্ত তোমারই জিত!'

'আরে না ভাই, জিত তোমারই!' রায় ঘোষকে জড়িয়ে ধরেন। 'তোমারই ছক, তোমারই ঘুঁটি। আমি শুধু একটু হাত চালিয়ে খেলেছি।'

হাসাহাসির মধ্যে দূরে কিছু একটা দেখে রায় একটু যেন চমকে যান।

ভূতনাথ সামন্ত আর তার দলবল নিমন্ত্রণ রক্ষা করে এই দিকেই আসছে।

হাসি থামিয়ে রায় ঘোষকে বলেন, 'ওহে শোনো, একটা জরুরি কথা আছে।'

'থামো।' ঘোষও গম্ভীর হয়ে রায়কে থামান, 'তার আগে আমার জরুরি কথাটা শোনো।'

'আহা আমারটাই শোনো না আগে!' রায় অনুরোধ করেন।

'না, আমারটা আগে।' ঘোষের জেদ।

'বেশ, তাই।' রায়কে মেনে নিতে হয় নিরুপায় হয়ে, 'তোমারটাই আগে বল।'

'দ্যাখো তুমি না সাহায্য করলে তো মুশকিল।' ঘোষকে বেশ একটু সঙ্কুচিত মনে হয়, 'ওই খালি বাড়িগুলোর ব্যবস্থা তো না করলে আর নয়। এদিকে তোমার বৌঠানের প্যানপ্যানানি আর ওদিকে বেশিদিন খালি রাখলে সরকারি রিক্যুইজিশনের হুমকি!'

'মুশকিলের ব্যাপার তো তাহলে।' সুরেশ পরিবেশন করতে-করতে মামার দিকে একবার চেয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে।

'হুঁ, একটা কিছু না করলে নয়। ভাড়াটের ব্যবস্থা এখুনি করা দরকার।' যেন চিন্তিত হয়ে পড়েন রায়।

ভূতনাথের দল তখন ঘরে ঢুকে পড়েছে। তাদের দিকে চেয়ে রায় যেন কোনও আশা না নিয়েই জিজ্ঞাসা করেন, 'আচ্ছা আপনাদের কারও বাড়ির দরকার আছে? মানে ভাড়াটে বাড়ির?'

'দরকার আছে মানে?' সকলের সমস্বরে জবাবটা একটু বুঝি হুঙ্কারের মতো শোনায়।

সেটা অগ্রাহ্য করে রায় মধুর হেসে বলেন, 'দবকার থাকলে কাল অফিসে যাবেন।'

সুরেশ শেষ ফোড়ন দেয়, 'কাল অফিসে গেলেই যার যা চাই পাবেন!'

বিয়ের অনুষ্ঠানের পর বর-কনে তখন বাসরঘরে বসেছে। ঘরভর্তি কলহাস্যমুখবা মেয়ের দল।

তারই মধ্যে হঠাৎ মধুব সঙ্গে আর্ট পাবলিসিটি অফিসেব সেই বড়সাহেবই এসে উপস্থিত হবেন কেউ বোধহয় কল্পনা করতে পারেনি।

মধু এসে তার বার্তা জানিয়ে নীলাকে বলে, 'দিদিমণি, এই ইনি আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছেন।'

'আপনি!'—নীলা বেশ একটু অবাক হয়ে উঠে দাঁড়ায়।

'হ্যাঁ. আপনার বিয়ের নিমন্ত্রণ পেয়ে সত্যিই আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও বাধিত নীলিমা দেবী। বড়সাহেব উচ্ছ্বসিতভাবে বলেন, 'আপনার জন্যে সামান্য একটু উপহার যা এনেছি তা আপনার হাতেই দিয়ে যেতে চাই। এ উপহার অবশ্য আমার নয়, আমাদের আর্ট পাবলিসিটি করপোরেশনের।'

'তার মানে?' নীলার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, 'এ সেই কম্পিটিশনের পুরস্কার?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ!' একটি বড় বন্ধ লেফাফা নীলার দিকে এগিয়ে দিয়ে বড়সাহেব বলেন, 'আপনার বিয়ের দিনেই এটা দেওয়ার একটা আলাদা মূল্য আছে বলে সাধারণ নিয়ম একটু জোর করে রদবদল করে নিজের হাতেই এটা নিয়ে এলাম।'

'অনেক ধন্যবাদ!' নীলা হাসিমুখে বলে, 'কিন্তু এটা এই এঁকে দিন।'

'এঁকে?' সবিস্ময়ে এতক্ষণে বড়সাহেবের প্রদীপের দিকে দৃষ্টি পড়ে।

'হ্যাঁ, এই আমাকেই,' প্রদীপ মুখ টিপে হেসে উঠে দাঁড়ায়, 'আজ থেকে ওঁর সব ভার আমার ওপর কিনা, তাই ওঁর পুরস্কার, তিরস্কার সব আমাকেই নিতে হবে।'

'বড়সাহেব কয়েক মুহূর্তের জন্যে একটু বুঝি গুম হয়ে যান। তারপর হেসে উঠে বলেন, 'হুঁ বুঝেছি। তার মানে ছবিটা আপনার আঁকা। ওঁর হাত দিয়ে আসার জন্যে আমি বেকুব বনেছি।'

'না, বেকুব আর বনলেন কোথায়!' প্রদীপ প্রসন্ন হাসিতে তাঁর ক্ষোভ ঘুচিয়ে দেয়, 'মানুষ চিনতে যদি বা ভুল করে থাকেন, ছবি চিনতে নয়।'

'তবু আমি লজ্জিত প্রদীপবাবু।' বড়সাহেব আন্তরিকভাবে জানান, 'না বুঝে আপনার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছি তার জন্যে মাপ চাইছি।'

'আমিও মাপ চাইছি আমার গায়ে পড়া অভব্যতার জন্যে।' প্রদীপ বলে, 'আমি অমন গুঁতিয়ে চড়াও হওয়ার চেষ্টা না করলে আপনিও নিশ্চয়ই ওরকম লগুড় তুলতেন না।'

বোঝাপড়ার পর হাসিমুখে সাহেব বিদায় নিয়ে গেলে কাকিমা ঘরে ঢুকে বাসরের মেয়েদের তাড়া দেন। 'কী গো তোমরা বর-কনেকে উপোসী করে রাখবে নাকি! ওদের একটু খেতে ছাড়তে হবে না?'

'আমরা কি ওদের ধরে রেখেছি নাকি?' নীলার কলেজের বন্ধুরা সহাস্যে প্রতিবাদ জানায়, 'উঠুন প্রদীপবাবু, ওঠ নীলিমা, কাকিমা আমাদের দোষ দিচ্ছে।'

সকলের সঙ্গে বেরিয়ে যেতে-যেতে প্রদীপ দাঁড়িয়ে পড়ে নীলার হাতটা একটু টেনে তাকে থামায়।

'আবার দাঁড়ালে কেন?' নীলা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে।

'দাঁড়ালাম, তোমার একটা পাওনা দেওয়ার জন্যে,' প্রদীপ হাসে।

'আমার আবার কী পাওনা!' নীলা কপট বিরক্তি দেখায়।

'আছে। আছে।' প্রদীপ হেসে বলে, 'পুরস্কারটা যেমন নিলাম, তেমনি তোমারও একটা হারানো জিনিস তোমাকে ফেরত দিচ্ছি।'

নীলা সত্যিই অবাক হয়ে প্রদীপের দিকে তাকায়, তারপর প্রদীপ পকেট থেকে যে জিনিসটা বার করে তা দেখে হেসে ফেলে বলে, 'ওমা, এটা তো একটা চুলের কাঁটা!'

'হ্যাঁ, দেখতে চুলের কাঁটা,' প্রদীপ গম্ভীর হয়ে বলে, 'কিন্তু আসলে এটি সেই খুদে দুষ্টু দেবতার পঞ্চবাণের একটি। এই চুলের কাঁটা থেকেই সবকিছু শুরু তা জানো তো।'

নীলা কিছু বলবার আগেই ওদিক থেকে কাকিমার গলা শোনা যায়, 'কী হলরে। ওদের খিদে-তেষ্টা আর নেই নাকি!'

গ্রন্থ পরিচয়

পথ ভুলে ঃ একই নামে প্রেমেন্দ্র মিত্র নিজেই এই চলচ্চিত্রায়িত কাহিনির উপন্যাস রূপ দেন। এটি প্রকাশিত হয় কামারপাড়া লেন, বরাহনগর থেকে, প্রকাশক রণেন্দ্রকুমার শীল। লেখকের লেখা বেশ কিছু উপন্যাসের উল্লেখ ছিল, কিন্তু প্রকাশক-সংস্থার নাম ছিল না (নাম সম্ভবত পর্ণকুটীর), কোনও উৎসর্গপত্রও ছিল না।

প্রতিশোধ ঃ এই চলচ্চিত্রটি একই নামে উপন্যাস হিসেবে লিখিত হয়েছিল, লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র স্বয়ং। লেখার গতিবিধি দেখে অনুমান করা যায়, চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য থেকেই তিনি উপন্যাসের রূপ দিয়েছেন।

দাবী ঃ চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য হিসাবেই প্রেমেন্দ্র মিত্র এটি রচনা করেন, উপন্যাস হিসাবে কাহিনিটি পুনর্লিখনের অবকাশ তিনি পাননি। সেভাবে এটির উপন্যাস রূপ দান করেন পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়। উপন্যাস হিসাবে এটি প্রকাশিত হয় কামারপাড়া লেন, বরাহনগরের পর্ণকুটির, প্রকাশক আর কে শীল। উৎসর্গপত্রে ছিল ঃ

শ্রীরমেন্দ্রকুমার শীল
শ্রীরণেন্দ্রকুমার শীল
স্নেহাস্পদেষু

নতুন খবর ঃ চলচ্চিত্রে রূপায়িত এই দীর্ঘ কাহিনিটি এই নামেই উপন্যাস হিসাবে রচনা করেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় মাঘ, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দে, প্রকাশ করেন কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের দি বুক এমপোরিয়ম লিমিটেড, প্রকাশক প্রশান্তকুমার সিংহ। কোনও উৎসর্গপত্র ছিল না।

কালো ছায়া ঃ প্রাথমিকভাবে চলচ্চিত্রের প্রয়োজনেই এটি চিত্রনাট্য হিসাবে রচনা করেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। চলচ্চিত্রে রূপায়িত হওয়ার পর কাহিনিটি অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, ফলে প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রিয় পাঠক-পাঠিকার অনুরোধে সেটি উপন্যাস হিসাবে প্রকাশেব প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সেই সময়ে অসম্ভব ব্যস্ততার জন্য প্রেমেন্দ্র মিত্র নিজে এই কাজে সময় করে উঠতে পারেন না, ফলে কালো ছায়া-র চিত্রনাট্যটিকেই অপরিবর্তিত নামে উপন্যাসের আকারে পুনরায রচনা করেন মন্মথ চৌধুরী। সেই বচনাই এখানে পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছে।

হানাবাড়ি ঃ চলচ্চিত্রায়িত এই উপন্যাসেব লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র স্বয়ং। উপন্যাস হিসাবে প্রথম প্রকাশের তারিখ জানা যায় না, তবে প্রথম কাহিনি-সংস্করণ হয় ১৩৯৪ বঙ্গাব্দে, প্রকাশ করেন প্রকাশালয় থেকে শ্যামাপদ সরকার। প্রকাশক তাঁর নিবেদনে যা লিখেছিলেন তাব অংশবিশেষ এখানে তুলে দেওয়া হল ঃ

'বাংলা সাহিত্যেব সব্যসাচী লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র-র 'হানাবাড়ি' বইটিব নতুন করে পরিচয় দেওযার দরকার করে না। এক সময়ে এই কাহিনি চিত্রায়িত হযে অসম্ভব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।.. ভূতে বিশ্বাস নাই যাদের তাদেব কাছেও ভৌতিক গল্পের আকর্ষণ অপ্রতিবোধ্য। সেদিক থেকে হানাবাড়ির আকর্ষণ চিরকালের।'

ওরা থাকে ওধারে ঃ এই নামের জনপ্রিয় চলচ্চিত্রটির কাহিনি চিত্রনাট্য হিসাবেই প্রেমেন্দ্র মিত্র রচনা করেন। এটিব উপন্যাস-রূপ তিনি দিতে পারেননি। এই সংকলনের জন্য তাঁর সেই চিত্রনাট্যটি স্বচ্ছন্দ ভাবে অনুসরণ করে এর উপন্যাস রূপ দিয়েছেন হীরেন চট্টোপাধ্যায।

ডাকিনীর চর ঃ উপন্যাস হিসেবে এটি রচনা করেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। প্রথম প্রকাশিত হয় ভাদ্র, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দে। কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের ডি. এম লাইব্রেরি থেকে এটি প্রকাশ করেন আশিসগোপাল মজুমদার। আখ্যাপত্রে লেখক কাউকে এটি উৎসর্গ করেননি।
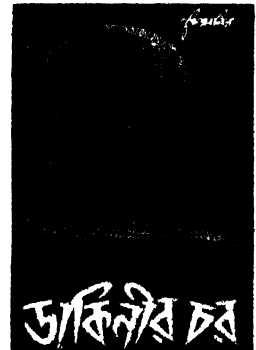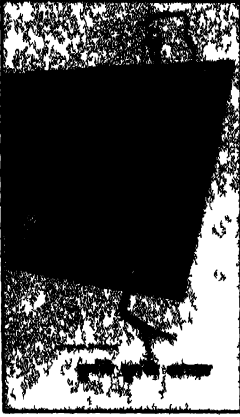
চুপি চুপি আসে ঃ একদা অতি জনপ্রিয় এবং সাম্প্রতিককালে বেশ কয়েকবার দূরদর্শনে প্রচারিত এই চলচ্চিত্রটি প্রেমেন্দ্র মিত্র নিজেই রচনা করেন উপন্যাস হিসাবে। তখন অবশ্য এই উপন্যাসের নাম ছিল 'হাতে হাত রাখো'। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে, প্রকাশ করেন উজ্জ্বল-সাহিত্য-মন্দির, প্রকাশক সুপ্রিয়া পাল।

হাত বাড়ালেই বন্ধু ঃ 'হাত বাড়ালেই বন্ধু' নামে জনপ্রিয় চলচ্চিত্রটির উপন্যাস হিসাবে নাম ছিল 'এলো অচেনা'। এটি উপন্যাস আকারে প্রথম প্রকাশিত হয় আষাঢ়, ১৩৪২ বঙ্গাব্দে। গ্রন্থটি প্রকাশ করেন বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রকাশক ময়ুখ বসু। উপন্যাসটিব উৎসর্গপত্রে ছিল ঃ

শ্রীমনোজ বসু
বন্ধুববেষু—